

Interesting Bangla Humorous Stories

সূচিপত্রের কোন অধ্যায়ে সরাসরি
যাওয়ার জন্য ...আপনার মোবাইল ই-
বুক রিডারের নিচের অপশন বারের
বুকমার্ক(Bookmarks) অথবা
[Content of Book] মেনু ওপেন

পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে
প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক ও
মজার ৭০০+ রম্য গল্প
সংকলন.....!

1) নবাবের জুতা

ইসলামপুর একসময় জুতা বেচাকেনার জন্য
বিখ্যাত ছিল। একজন বাবু এক দোকানে এসে
জুতা দেখতে চাইলেন। কিন্তু পছন্দ না হওয়ায়
আরেক দোকানে গেলেন। দোকানদার বুঝেছেন,
ক্রেতা কোনো ভালো জুতা খুঁজছেন। তাই
মওকা বুঝে ক্রেতাকে ফাঁসানোর ফন্দি
আঁটলেন।

দোকানদারঃ আপনাকে দেইখাই তো হালায়
বুঝছি যে আপনি যেমন তেমন লোক না,
আপনি হইলেন গিয়ে মহারাজ। আপনাকে
হালায় জুতা দিব কৈথেইকা।

বাবুঃ অত কথা বলার দরকার কী? আপনার কী
জুতা আছে তা-ই দেখান।

দোকানদারঃ মহারাজ, রাগ করতাহেন কেলাই।
আমরা আপনাকে খেতমত করণের লেইগাই
আছি। মাগার যে জুতা দেহামু হুজুর তার দাম
কিন্তুক জারা বেসি অইব।

বাবুঃ ঠিক আছে, ভালো জুতা হলে দাম কিছু বেশি দিতে আমার আপত্তি নেই।

দোকানদারঃ আসল কথাটা কই, হুজুর।

আমাগো ঢাকার নবাব আছে না, হেই নবাব সাব দুই জোড়া জুতার অর্ডার দিছিল। মাগার এক জোড়া আর নেয় নাই। হেই জুতা জোড়াই আপনেনে দিমু, মহারাজ।

বাবুঃ ঠিক আছে, আগে দেখাও না।

দোকানদার তখন এক জোড়া জুতা ভেতর থেকে বের করে পরম যত্নের সঙ্গে ক্রেতার সামনে এনে রাখেন। এরপর জুতার এক সোলের সঙ্গে আরেক সোল পিটিয়ে দেখান। জুতার তলায় পিতল সোল আঁটা।

দোকানদারঃ মহারাজ, আমার কথামতো জুতা জোড়া লইয়া যান। গেরান্টি হইল, আইজ থেইকা পাঁচ বছরের মধ্যে যদি জুতা ছিঁড়ে, তাহলে হেই ছিঁড়া জুতা লইয়া আইবেন। আর করবেন কী, হেই ছিঁড়া জুতা দিয়া এইগা (একটা) বাড়ি মাইরা টেকা ভি ফেরত লইয়া যাইবেন। দেখছেন হালায় জুতা কেমন চকচক করতাছে। করব না কেন? চামড়া যে গিলাছটিকের (গ্লেইজফিট)।

এমন সব মিষ্টি কথায় জুতা কিনে বাবু বাড়ি চলে গেলেন। কিন্তু পাঁচ বছর দূরে থাক, ছয় মাস পরেই জুতা জোড়া ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। জুতার তলা খুলে পড়ে গেছে। তখন বাবু জুতা হাতে নিয়ে সে দোকানে গেলেন।

বাবুঃ কি মিয়া, খুব তো গেরান্টি দিলেন, এখন কী হলো? আমি আপনাকে জুতাপেটা করতে চাই না, টাকাটা ফেরত দিলেই বাঁচি।

দোকানদারঃ আপনে মহারাজ গোস্সা অইছেন কেব্লাইগা?

বহেন, একটু ঠান্ডা অইয়া লন, তারপর দেহা যাক।

একটু পরে দোকানদার বাবুকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা মহারাজ, আপনে জুতা দিয়া কী করছিলেন?

বাবুঃ কেন? জুতা পায়ে দিয়েছি।

দোকানদারঃ মহা মুশকিলে পড়লাম, হালায়।

জুতা পায় দেবেন না তো মাথায় দেবেন? পায়ে দিয়ে কী করেছেন?

বাবুঃ কেন, হেঁটেছি?

দোকানদারঃ মহা ঝামেলায় ফাইস্যা গেছি।

হাটবেন না তো কি খাড়াইয়া থাকবেননি?
মাগার হাটছেন কোনহান দিয়া?
বাবুঃ কেন, রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি।
দোকানদারঃ ইস, এহন বুঝবার পারতাছি যে
এমন ইজ্জতওলা জুতার এমন দশা হইল কী
কইরা। আমারই বুল অইছিল, আপনেরে
আসলেই মনে করেছিলাম মহারাজা বইলা। তার
লেইগাই তো আমাগো নবাব সাবের অর্ডারি
জুতা আপনেরে দিলাম। হালায় বাবু আপনে
করছেন কী? আমাগো নবাব সাবের জুতার
ইজ্জত মারছেন। আরে বাবু, নবাব সাবের জুতা
পাইয়া আপনে গেছেন রাস্তা দিয়া হাটতে?
আপনার আক্কেলটা কী, কন দেহি?
বাবুঃ কেন? নবাব সাবরা জুতা পায়ে দিয়ে
রাস্তায় হাটে না বলতে চান?
দোকানদারঃ হুনে মশায়, নবাব সাবরা জুতা
পায়ে দিয়া লাল গালিচার ওপর দিয়া আস্তে
কইরা গিয়া মোটরগাড়িতে বসে। আবার আস্তে
কইরা নাইম্যা গালিচার ওপর দিয়া হাইটা যায়।
আর আপনে কিনা বাবু, বেয়াকেল্পের মতো
আমাগো নবাব সাবের জুতা পায় দিয়া রাস্তায়
রাস্তায় হাইটা বেড়াইছেন। তয় নবাব সাবের
ইজ্জতওয়ালা জুতা ছিঁড়ব না তো আস্ত থাকব?
আবার আইছেন টেকা ফিরত নিতে? যান, মানে
মানে বাড়িত যান গিয়া, আর বেইজ্জত হওনের
কাম নাই। সোজা রাস্তা দেহেন। আপেল মাহমুদ,
ঢাকা

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

২) লন্ডনি

লন্ডনপ্রবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল সিলেট। এখানকার
অনেকেই পরিবার-পরিজনসহ লন্ডনে বসবাস
করেন, যাতায়াতও হয় যখন-তখন।
লন্ডনপ্রবাসীরা সিলেটবাসীর কাছে ‘লন্ডনি’ নামে
পরিচিত। দেশে-থাকা আত্মীয়রাও ‘লন্ডনির
অমুক...’ প্রভৃতি নামে পরিচিত। তো সিলেটের
বাসিন্দা ‘লন্ডনি’ পরিবারের আত্মীয় এক সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।
ঢাকায় যাওয়ার আগে সবার কাছ থেকে তিনি
বিদায়-টিদায় নিচ্ছেন। সবার শেষে গেছে দাদির
কাছে। দাদি-নাতির কথোপকথন-
দাদিঃ ‘সালাম করছ কেনে? কই যাইতে?’
নাতিঃ ‘দাদি আমি ভার্শিটি চান্স পাইছি! দোয়া
করবায়।’

দাদিঃ ‘ভার্সিটিত! ভালা কথা, কোনানও
(কোথায়)?’

নাতিঃ ‘ঢাকাত।’

দাদিঃ ‘ইয়া...অত দূর! থাকবে কি লা বে?’

এরচে লন্ডন থাকলেই ভালা অইত। তোর খালা-
চাচার খান্দাত (কাছে) থাকতে। আর হুগায়
হুগায় (প্রতি সপ্তাহে) খবর লইতা পারতাম!’

উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

3) বাংলাদেশে জেমস বন্ড

ঢাকা বিমানবন্দরে নেমেই ঝামেলায় পড়লেন
জেমস বন্ড। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
(বিসিআই) আমন্ত্রণে একটা জটিল কেস
সমাধানের জন্য ঢাকায় এসেছেন বন্ড। নামতে
না নামতেই পকেট থেকে দামি মোবাইল ফোন
আর পাসপোর্ট হাওয়া হয়ে গেল। বন্ড বেশ
কয়েকবার পুলিশের একজন পদস্থ কর্মকর্তাকে
বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি একজন
বিদেশি নাগরিক। হারানো পাসপোর্ট আর
মোবাইল ফোন খুঁজে বের করা পুলিশের দায়িত্ব
ও কর্তব্য। পুলিশ কর্মকর্তা হেসে বললেন, ‘বাদ
দেন স্যার, বেশি খোঁজখবর করলে আপনার
আরও অনেক কিছু হারিয়ে যেতে পারে।’ বন্ডের
সারা শরীরে চোখ বোলালেন তিনি। সতর্ক
হলেন বন্ড। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে জন্মদিনের
পোশাকে বের হওয়া উচিত হবে না। বাধ্য হয়ে
ফোন বুথ থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে সব
জানালেন বন্ড। এক ঘণ্টা পর বিসিআইয়ের
গাড়ি তুলে নিল বন্ডকে। ড্রাইভার তাঁর মোবাইল
ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন, ইতিমধ্যে ওই পুলিশ
কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে
পাসপোর্টটা পাওয়া যায়নি। চিন্তার কিছু নেই।
বিসিআইয়ে কাজী যানোয়ার হোসেন নামে
একজন এক্সপার্ট রয়েছেন। তিনি বিদেশি
জিনিস অবলম্বনে খাঁটি জিনিস বানাতে সিদ্ধহস্ত।
আশা করি পাসপোর্টটা দুপুর নাগাদ হয়ে যাবে।
আর যা-ই হোক, বাংলাদেশের মেয়েরা খুব
সুন্দর-মনে মনে প্রশংসা করতে বাধ্য হলো বন্ড

ইলোরাকে দেখে। বন্ড তাঁর জন্য বিশেষভাবে তৈরি চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে ইলোরাকে বললেন, ‘ম্যাজেন্টা কালারের লিপস্টিকটা তোমার ঠোঁটে দারুণ মানিয়েছে। হলফ করে বলতে পারি, আধঘণ্টার মধ্যে ওই লিপস্টিক অদৃশ্য হয়ে যাবে।’

‘কেমন করে? আমি তো আজ লিপস্টিকই লাগাইনি।’ খিলখিল করে হেসে উঠল ইলোরা। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন বন্ড। চশমার লুকানো বোতামটা বারবার টিপতে লাগলেন। কোনো কাজ হলো না।

‘তোমার কোনো যন্ত্রই বিসিআই ভবনে কাজ করবে না বন্ড’, ইন্টারকমে বজ্রকণ্ঠ ভেসে এল রাহাত খানের, ‘বিসিআই ভবনে ঢোকামাত্র ওগুলো অচল হয়ে গেছে আমাদের প্রযুক্তির কল্যাণে। ইলোরা, ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।’ মনে মনে নিজেকে কষে একটা গালি দিল বন্ড। বিশ্বসেরা স্পাই কিনা বাংলাদেশে এভাবে নাকানি চোবানি খাচ্ছে! হাউ স্ট্রেঞ্জ!

‘মাসুদ রানা কয়েক দিন ধরেই ডায়রিয়া আর ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। বাধ্য হয়ে তোমার বস ‘এম’-এর কাছ থেকে তোমাকে ধার করতে হয়েছে’-একটু বিরতি দিলেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। ‘কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট থেকে আসল নোট পাচার করে কারা যেন নকল নোট রেখে আসছে। এই নাও ফাইল। এখানে সব ডিটেইলস পাবে; যদিও হাতের ছাপ বলতে প্রায় কিছুই নেই। হাতে চামড়ার গ্লাভস পরে কাজটা সারা হয়েছে।’ পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন রাহাত। বন্ডকে ইশারায় যেতে বললেন।

যদিও ফাইলে সবকিছু লেখা ছিল, তবু একদিন গ্রাহক সেজে বাংলাদেশ ব্যাংকে গেলেন বন্ড। খুঁজে খুঁজে বের করলেন সিকিউরিটি গার্ডকে। ‘হোয়াটস ইউর নেম, স্যার?’ প্রশ্ন করল গার্ড। মাই নেম ইজ বন্ড-জেমস বন্ড, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন বন্ড, ‘হোয়াটস ইউর?’

‘মাই নেম ইজ চৌধুরী। শাহরিয়ার চৌধুরী। আবু শাহরিয়ার চৌধুরী। মো. আবু শাহরিয়ার চৌধুরী। খান মো. আবু শাহরিয়ার চৌধুরী। রহমান খান মো. আ. শাহরিয়ার চৌধুরী। মিজানুর রহমান খান মো. আবু শাহরিয়ার চৌধুরী।’ ধৈর্য হারালেন বন্ড। বুঝতে পারলেন

নিজের স্টাইলে নাম বলা বাংলাদেশে অন্তত চলবে না। ঠিক করলেন এভাবে নিজের নাম আর বলবেন না। দুই.

গোদাগাড়ী। রাজশাহী।

প্রতি সপ্তাহে এখানে গরুর বিরাট হাট বসে। দেশিবিদেশি সব ধরনের গরুই পাওয়া যায় এখানে। বন্ডকে দেখা গেল মেলায় ঘোরাফেরা করতে। তাঁর দুচোখ কী যেন খুঁজছে। এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গেলেন। এক লোক মাটিতে বসে তিন তাসের খেলা দেখাচ্ছে। লোকটা বলল, ‘আসুন, আসুন। নিজের ভাগ্যকে যাচাই করে নিন। দশ টাকায় ত্রিশ টাকা। এক শ টাকায় তিন শ টাকা। আসুন, আসুন।’ বন্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখলেন। জুয়া তাঁর রক্তে ঢুকে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও তাঁকে খরচের ব্যাপারে উদার হতে বলেছেন। কাজেই হয়ে যাক না এক দান জুয়া। দশ হাজার টাকাই বাজি ধরলেন তিনি। অবাক হয়ে দেখলেন, লোকটার হাত সাফাই সত্যি সত্যি অসাধারণ। তিন.

দুদিন পর। ক্রিমিনালকে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে বিসিআই অফিসে ঢুকলেন বন্ড। অফিসের সবার বিনিত চোখ উপেক্ষা করে রাহাত খানের কক্ষে নক করলেন বন্ড। ‘কাম ইন’। রাহাত খানের বজ্রকণ্ঠ ভেসে এল। ঢুকে পড়লেন বন্ড। ‘স্যার, এই যে ক্রিমিনাল। এর চামড়ার গ্লাভস দিয়েই বাংলাদেশ ব্যাংকে চুরির কাজটা সারা হয়েছে, স্যার। এই-ই স্যার আসল ক্রিমিনাল।’

বিনিত রাহাত খান জেমস বন্ডের হাতে দড়ি বাঁধা গরুটা দেখলেন। বুঝতে পারলেন না দুজনের মধ্যে আসল গরু কোনটা। টাই দিয়ে বাঁধা যেটা-সেটা, নাকি দড়ি দিয়ে বাঁধাটা? বিশ্বজিৎ দাস, প্রভাষক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

4) যে কারণে আমি আর ব্যাংকে যাই না

ব্যাংকে গেলেই আমার কেমন যেন ভয় লাগে। ব্যাংকের ক্লার্ক থেকে শুরু করে দরজা-জানালা, কাউন্টার, টাকা-সবকিছু আমাকে ভীষণ নার্ভাস করে দেয়।

কিন্তু হঠাৎ আমার মাসিক আয় ৫০ ডলার বেড়ে

গেল। ভেবে দেখলাম, এই টাকা জমানোর জন্য ব্যাংকই সবচেয়ে উপযুক্ত।

একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাংকে গেলাম। ঢুকেই ক্লার্কের দিকে লাজুকভাবে তাকালাম। আমার ধারণা ছিল, অ্যাকাউন্ট খুলতে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করতে হয়।

‘অ্যাকাউন্ট্যান্ট’ লেখা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমি ভিরমি খেয়ে গেলাম।

গলাটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, ‘আমি কি ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে পারি?’

একা।’ আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না ‘একা’ শব্দটা কেন উচ্চারণ করলাম।

‘অবশ্যই পারেন’ বলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যানেজারের খোঁজ নিতে গেলেন।

ম্যানেজারকে দেখে রাশভারী লোক মনে হলো।

বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, ‘আপনিই কি ম্যানেজার?’

‘হ্যাঁ,’ তিনি জবাব দিলেন।

‘আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?’

একা।’ আবারও কেন অহেতুক ‘একা’ যোগ করলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না। ম্যানেজার আমাকে সতর্কভাবে জরিপ করলেন। তাঁর

ধারণা, আমি চরম গোপন কোনো কিছু তাঁর কাছে ফাঁস করতে এসেছি। ‘ভেতরে আসুন’ বলে তিনি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত কামরার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। দরজায় তালা

লাগিয়ে আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন, ‘এখানে আমরা নিরাপদ। বসুন।’ আমরা বসে

পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমি কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো স্বর বের হলো না।

ম্যানেজার বললেন, ‘আমার ধারণা, আপনি পিংকারটন থেকে এসেছেন।’

আমার রহস্যময় আচরণের কারণে ম্যানেজার আমাকে ডিটেকটিভ ভেবে বসেছেন। এটা বুঝতে পেরে আরও ঘাবড়ে গেলাম। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললাম, ‘না, না, পিংকারটন থেকে নয়। আসলে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এসেছি।’

ম্যানেজারের উদ্বেগ কিছুটা কেটে গেল। তিনি এখন সম্ভবত ভাবতে শুরু করেছেন, আমি কোনো বড়লোকের সন্তান। তিনি বললেন,

‘ধারণা করছি, আপনি খুব বড় অঙ্কের টাকা রাখবেন।’

‘অবশ্যই বড় অঙ্কের,’ আমি ফিসফিস করে বললাম, ‘আমি এখন ৫৬ ডলার রাখতে চাই। আর প্রতি মাসে ৫০ ডলার করে জমা রাখব।’ আর একটা কথাও না বলে ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অ্যাকাউন্ট্যান্টকে চড়া গলায় জানালেন, ‘মিস্টার মন্টোগোমারি, এই ভদ্রলোক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান।’

তারপর আমার দিকে ফিরে ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘গুড মর্নিং।’

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে গেলাম। তারপর ঝট করে টাকাগুলো তার টেবিলের ওপর ছুড়ে দিলাম, যেন আমি কোনো জাদুর কৌশল দেখাচ্ছি। কাঁপা গলায় বললাম, ‘এই টাকাগুলো আমার অ্যাকাউন্টে রাখুন।’

অ্যাকাউন্ট্যান্ট কথা না বলে টাকাগুলো ক্লার্কের দিকে ছুড়ে দিয়ে একটা ফরম বের করে আমাকে সিগনেচার করতে বললেন। আমি কী করছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পুরো ব্যাংক আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার অ্যাকাউন্ট কি খোলা হয়ে গেছে?’ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বললেন, ‘হ্যাঁ, হয়ে গেছে।’ ‘তাহলে আমাকে একটা চেক দিন, কিছু টাকা তুলব।’

কেউ একজন আমার হাতে একটা চেক বই ধরিয়ে দিলেন। আরেকজন বুঝিয়ে দিলেন কোথায় কী লিখতে হবে। কোনোমতে চেকটা লিখে ক্লার্কের হাতে দিলাম। চেকটা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল, ‘আশ্চর্য! আপনি কি সব টাকা তুলে নিতে চান?’ আমি বুঝতে পারলাম, ছয় ডলারের বদলে ৫৬ ডলার লিখে ফেলেছি! ভুলটা এখন বুঝিয়ে বলা অসম্ভব ব্যাপার। অন্য ক্লার্করা কাজ থামিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। যা হওয়ার হবে ভেবে একটু কঠিন স্বরে বললাম, ‘হ্যাঁ, পুরো টাকাই তুলতে চাই আমি।’

‘আপনি কি আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে চান?’ ‘নিশ্চয়ই, আমি তা-ই চাই।’ ‘কিছু টাকাও জমা রাখবেন না?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এক ক্লার্ক। আমি বললাম, ‘না।’

ক্লার্ক হয়তো ভাবছেন, তাঁদের কথায় বা আচরণে আমি ক্ষুদ্ধ হয়েছি, তাই অ্যাকাউন্ট বন্ধ

করতে চাইছি। তাঁরা যেন সে রকমই ভাবেন, এ জন্য মুখভঙ্গি ত্রুষ্ক করে তোলার চেষ্টা করলাম। ক্লার্ক আমাকে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি বললেন, ‘কত নোটে দেব?’

তাঁর কথা আমি বুঝতে না পেরে বললাম, ‘কী বললেন?’

‘আপনি কত ডলারের নোট চান?’

এবার বুঝতে পারলাম। কোনো চিন্তা না করেই উত্তর দিলাম, ‘৫০ ডলারের নোটে দিন।’

তিনি আমাকে একটা ৫০ ডলারের নোট দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাকি ছয় ডলার?’ আমি বললাম, ‘এক ডলারের নোটে দিন।’

তিনি আমার হাতে টাকাটা দিতেই আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

ব্যাংকের বড় দরজা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে সমবেত কণ্ঠে প্রচণ্ড অটুহাসি শুনতে পেলাম। বিল্ডিংটাই যেন হাসির শব্দে ফেটে পড়বে।

বুঝতেই পারছেন, তারপর থেকে আমি আর ব্যাংকে যাই না। এখন আমার টাকা পকেটেই রাখি। জমানোর মতো হলে একটা মোজার মধ্যে রেখে দিই।

রূপান্তরঃ শারমীন আফরোজস্টিফেন বাটলার
লিককঃ (১৮৬৯-১৯৪৪) কানাডিয়ান লেখক ও
অর্থনীতিবিদ। তিনি স্যাটার্ডারধর্মী ননসেন্সে
ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য
সাহিত্যকর্মগুলো হচ্ছে লিটারারি ল্যাপস,
ননসেন্স নভেল, আক্রেডিয়ান অ্যাডভেঞ্চার উইথ
দি আইডল রিচ ইত্যাদি। স্টিফেন লিকক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২,
২০০৮

5) একটি জ্ঞানগর্ভ রূপকথা

এক দেশে ছিল এক ভিক্ষুক। সে ছিল খুবই
সৎ। একদিন সে এক অভিজাত বাড়ির দরজায়
কড়া নাড়ল। বাড়ির চাকর দরজা খুলে জিজ্ঞেস
করল, ‘কী ব্যাপার। কী চান আপনি?’

ভিক্ষুক জবাব দিল, ‘ঈশ্বরের নামে একটু ভিক্ষা
চাই।’

‘আচ্ছা দাঁড়ান, বাড়ির কর্ত্রীকে আগে জিজ্ঞেস
করে দেখি।’ বাড়ির কর্ত্রীকে ভিক্ষুকের কথা
বলতেই তিনি ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত মুখে চাকরকে
বললেন, ‘জেরেমি, লোকটাকে একটা রুটি দিয়ে
এসো। গতকালের বাসি রুটি থাকলে সেটাই

দিয়ে।’

জেরেমি কখনোই মালিকের কথার অবাধ্য হয় না। তাই সে বেছে বেছে পাথরের মতো শক্ত একটা বাসি রুটি এনে দিয়ে বলল, ‘এই যে নাও।’

ভিক্ষুক বিড়বিড় করে বলল, ‘ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।’

জেরেমি ভারী ওক কাঠের দরজা বন্ধ করে দিল। রুটিটা হাতে নিয়ে ভিক্ষুক একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এল। এখানেই সে রাত কাটায়। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সে রুটি ছিঁড়ে খেতে শুরু করল। এমন সময় শক্ত কিছুতে তার কামড় পড়ল। মনে হলো যেন দাঁত ভেঙে গেল। মুখ থেকে জিনিসটা বের করে ভিক্ষুক তো অবাক। তার ভাঙা দাঁতের টুকরোর সঙ্গে মুক্তো ও হীরা বসানো একটা সোনার আংটি দেখতে পেয়ে উত্তেজনায় সে বিড়বিড় করে উঠল, ‘কী সৌভাগ্য! এটা বেচে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।’

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার বোধ জেগে উঠল। ‘না, এটা আসল মালিককে ফেরত দিতে হবে।’ ভালোমতো খেয়াল করে সে দেখল, আংটির ওপর দুটি অক্ষর লেখা আছে-জে এবং এক্স। ভিক্ষুক তাড়াতাড়ি পাশের একটা দোকানে গিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি চাইল। টেলিফোন বই ঘেঁটে এক্স অক্ষরে শুরু হওয়া নাম খুঁজতে লাগল। সে দেখল পুরো শহরে এ রকম একটা মাত্র পরিবারই বাস করে। সেটা হলো জোফেইনা পরিবার।

এই আবিষ্কারে ভীষণ খুশি হলো ভিক্ষুক। সে দোকান থেকে ঠিকানা মোতাবেক জোফেইনা পরিবারের খোঁজে বের হলো। একটু পরেই সে অবাক হয়ে দেখল, এই বাড়ি থেকেই সে কিছুক্ষণ আগে রুটি ভিক্ষা করেছিল। আবারও বাড়ির দরজা ঠক ঠক করল। চাকর জেরেমি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, ‘আবার কী চাও?’ ভিক্ষুক জবাব দিল, ‘কিছুক্ষণ আগে আপনি আমাকে যে রুটি দিয়েছিলেন, তার ভেতর আমি এই আংটিটা পেয়েছি।’

জেরেমি আংটিখানা হাতে নিয়ে বলল, ‘আচ্ছা দাঁড়াও, আংটিটা আমার মালিককে দেখাই।’ গৃহকর্ত্রী আংটি পেয়েই বললেন, ‘কী সৌভাগ্য! আরে এই আংটিই তো আমি গত সপ্তাহে রুটি

বানাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম! এই জে
এক হুচ্ছে আমার নামের আদ্যক্ষর-মানে
জোসারমিনা জোফেইনা।’

একটু থেমে তিনি বললেন, ‘জেরেমি, লোকটি
যা চায় তা-ই দিয়ে দাও। অবশ্য এটা খুব
একটা দামি আংটি নয়।’

জেরেমি দরজায় ফিরে এসে ভিক্ষুককে বলল,
‘তুমি খুব ভালো একটা কাজ করেছ। বলো, এর
জন্য তুমি কী চাও?’

ভিক্ষুক জবাব দিল, ‘শুধু এক টুকরো রুটি।
একটু পেট ভরে খেতে চাই আমি।’

জেরেমি এবারও তার মালিকের কথামতো কাজ
করল। তাই এবারও সে পাথরের মতো শক্ত
বাসি রুটি এনে ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিল।

‘এই যে নাও।’

‘ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।’

জেরেমি ভারী ওক কাঠের দরজা বন্ধ করে
দিল। ভিক্ষুক হাতে রুটি নিয়ে আগের খোলা
জায়গায় চলে এল। যেখানে সে রাত কাটায়।
সে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রুটি ছিঁড়ে
খেতে শুরু করল। হঠাৎ শক্ত কিছুতে কামড়
লেগে তার আরেকটি দাঁত ভেঙে গেল।

জিনিসটা বের করতেই ভাঙা দাঁতের সঙ্গে
একটা শক্ত কিছু বের হয়ে এল। জিনিসটা আর
কিছুই নয়, মুক্তা আর হীরা বসানো একটা
সোনার আংটি। ভিক্ষুক অবাক হয়ে ভাঙা
দাঁতের পাশে সোনার আংটির দিকে তাকিয়ে
রইল।

এই আংটির গায়েও দুটো অক্ষর লেখা-জে
এক্স। সে আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর আংটিটা
জোসারমিনা জোফেইনাকে ফেরত দিয়ে পুরস্কার
হিসেবে তৃতীয় আরেকটি রুটি নিয়ে এল।

তৃতীয় রুটির মধ্যেও সে আরেকটি আংটি খুঁজে
পেল। সেটা আবারও আসল মালিককে ফিরিয়ে
দিয়ে সে পুরস্কার হিসেবে চতুর্থ রুটি নিয়ে
গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। চতুর্থ রুটিটা
ছিঁড়ে খেতে গিয়ে দাঁতে শক্ত কিছুর সঙ্গে কামড়
লেগে আরেকটা দাঁত ভেঙে গেল। মুখ থেকে
জিনিসটা বের করে সে ভাঙা দাঁতের টুকরোর
সঙ্গে একটা...

সেই সৌভাগ্যের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত
সে বেশ সুখেই বেঁচে ছিল। তার জীবনে আর
কোনো খাদ্যসমস্যা হয়নি। তাকে শুধু রুটির

ভেতর থেকে আংটি বের করে আসল মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হতো। ফার্নান্দো সোরেনতিনো
বাংলা রূপান্তরঃ আবুল বাসারফার্নান্দো সোরেনতিনোঃ ১৯৪২ সালের ৬ নভেম্বর আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে জন্মগ্রহণ করেন। আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ছোটগল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক তিনি। তাঁর অধিকাংশ লেখা বিশ্বের প্রধান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে লা রিগ্রেসন জুলোজিকা, এন ডিফেন্সা প্রোপিয়া, পার কোল্লা ডেল ডটোর মুর এড আল্টি রাকোন্টি ফ্যান্টাটিসি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০০৯

6) হিমু এখন বাসে

[হুমায়ূন আহমেদের হিমু চরিত্র অবলম্বনে] ঘুম ভাঙল বাঁশির আওয়াজে। কে যেন করুণ সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে। পরক্ষণেই মনে হলো বাঁশি নয়, আমার ফোন বাজছে। ফোন ধরতেই খালু সাহেবের চাপা গলা শোনা গেল-

-কে, হিমু নাকি?

-হুঁ।

-বিরাত বিপদে পড়েছি। তুমি দ্রুত চলে আসো, কুইক!

-এখন আসতে পারব না, শীতের সকাল উপভোগ করছি।

-আরে রাখো তোমার শীতের সকাল! এই মহিলা আমার জীবন শেষ করে ফেলছে আর তুমি আছ শীত নিয়ে।

-কোন মহিলা?

-কোন মহিলা মানে? তোমার খালা। তোমার খালার জ্বালায় আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্লিজ, হেল্প মি!

-আমি কী হেল্প করব? আপনার বউ, আপনি সামলান। আমাকে ডাকছেন কেন?

-ফাজলামো কোরো না হিমু, আমি খুবই বিপদের মধ্যে আছি। বিপদের সময় ফাজলামো অসহ্য লাগে। তুমি আধা ঘণ্টার মধ্যে আমার সাথে দেখা করবে। ইটস মাই অর্ডার।

এ পর্যায়ে খালার কথা শোনা গেল ‘ফিসফিস করে কার সাথে কথা বলছ? দেখি, হ্যালো...হ্যালো...’

আমি চুপ করে রইলাম। খালার সন্দেহ আরও

ঘনীভূত হলো। খালা হ্যালো হ্যালো করতেই লাগলেন। আমি ফোন কেটে দিলাম। খালা আবার ফোন করলেন। এবার আমি ফোন বন্ধ করে দিলাম। মনে হচ্ছে কঠিন গিটু লেগেছে। বিছানায় বসেই দিনের পরিকল্পনা করতে লাগলাম। প্রথম কাজ হচ্ছে সুরুজ মিয়ার দোকানে বসে চা খাওয়া। সুরুজ মিয়ার চা অসাধারণ পর্যায়ের। চা বানানোর র্যাংকিং থাকলে সুরুজ মিয়া নিশ্চিত ১ নম্বর স্থান দখল করে নিত।

সুরুজ মিয়া আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন? শইলডা ভালা?

আমি মাথা নাড়লাম।

সুরুজ মিয়া গরম পানিতে কাপ ধুয়ে আমাকে চা দিল। চায়ে চুমুক দিয়েই আমার মন ভরে গেল। অসাধারণ চা! এই চা বারবার খাওয়া যায়। আমি চা খেতে খেতে বললাম-

-সুরুজ মিয়া, স্বর্ণের ভরি কত জান?

-ভাইজান মশকরা করেন? স্বর্ণের দাম আমি কেমনে বলব? চাপাতির দাম হইলে একটা কথা ছিল। স্বর্ণ দিয়া কি কাম? বিবাহ করবেন?

-তোমার হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম। দূর থেকে মানুষ দেখতে আসবে, সোনা বাঁধানো হাত দিয়ে সুরুজ মিয়া চা বানাচ্ছে।

-কি যে কন ভাইজান। সবই আফনের দোয়া।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আজকাল টিকিট সিস্টেমের বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। টিকিট কাটো, লাইনে দাঁড়াও, বাসে ওঠ। এটা নিয়েও পিতার কিছু উপদেশ ছিল। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

পিতা সম্ভবত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তবে বাসে ওঠায় আরামের চেয়ে ঝামেলা বেশি। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাদাগাদি করে বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে চ্যাপ্টা হওয়াকে আরাম বলা ঠিক হবে না। আমি টিকিট কেটে একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আমার পেছনে বিরাট লাইন তৈরি হয়েছে। একজন এসে একটু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাই এটা কিসের লাইন?’

‘মানুষের।’ আমি হাসিমুখে উত্তর দিলাম। তবে ভদ্রলোকের মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, ‘সেটা তো দেখতেই

পাচ্ছি, কিসের জন্য দাঁড়িয়েছেন?

-বাসের জন্য।

-আপনি তো দারুণ ত্যাড়া লোক। সোজা কথায় উত্তর দিতে পারেন না? কোন বাস?

-মাই লাইন। আমি হাসিমুখে বললাম। লোকটা গজগজ করতে করতে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় আধা ঘণ্টা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মানুষের হাঁটুর বাঁটি ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাসের দেখা নেই। সবাই কাউন্টারম্যানকে বকাঝকা করতে লাগল। তবে বকাঝকা গালাগালিতে রূপ নেওয়ার আগেই বাস চলে এল। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো লাইন ভেঙে ছুঁড়মুড় করে বাসে উঠতে লাগল। আগে থাকায় আমিও কোনোমতে উঠে গেলাম। উঠে দেখি বাসভর্তি সিট, কিন্তু একটাও খালি নেই। পেছন থেকে মানুষ ধাক্কা মারছে। যেভাবেই হোক একটা সিট দখল করতে হবে। ডান পাশের সিটে কলেজ ড্রেস পরা একটা ছেলে বসে আছে। ছেলেটার নাম আসিফ, নেমপ্লেটে তাই লেখা। কোনোমতে ছেলেটার পাশে গিয়ে বললাম, 'আরে আসিফ, কেমন আছ তুমি?' 'ভালো।' ছেলেটা বেশ অবাক হয়েছে।

-চিনতে পারছ না? আমি তোমার হিমু চাচা। তুমি কত ছোট ছিলে, এখন তো অনেক বড় হয়ে গেছ। তোমাদের বাসা কি আগেরটাই আছে, না চেঞ্জ করেছ?

-আগেরটাই আছে। ছেলেটা কী করবে বুঝতে পারছে না। বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি বললাম, 'বুঝলে আসিফ, দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ঝাঁঝি ধরে গেছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়?'

-চাচা, আপনি বসেন। বলে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। একটু গাঁইগুই করে আমি বসেই পড়লাম। যাক, এবার আর কোনো চিন্তা নেই। তবে আমি কিন্তু একটুও মিথ্যা বলিনি।

ছেলেটার নাম আসিফ, সে আগে আরও ছোট ছিল এবং আমি বয়সে তার চাচার মতোই হব। অনেকক্ষণ হলো বাস জ্যামে আটকে আছে। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে ঝিম মেরে বসে আছে। হেলপার সামনের বাসের হেলপারের সাথে গল্প করছে। আর বাসের ভেতরে চলছে রাজনৈতিক আলাপ। নতুন মন্ত্রিসভা কেমন হলো, কার কেমন পাওয়ার, এতগুলো মহিলা

মন্ত্রী দেওয়া ঠিক হলো কি না, এগুলো নিয়েই বিশাল আলোচনা। তবে তাদের আলোচনা আমার কানে ঢুকছে না। বাসের সিটটা অত্যন্ত আরামদায়ক। নিশ্চয়ই চায়নিজ মাল।

চায়নিজদের নাক বোঁচা হলেও এরা জিনিস খুব ভালো বানায়। আমার ঘুম চলে আসছে। খালু সাহেবের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম... মুকিত আলম, কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

7) শপিং - আহসান হাবীব

ঈদ আসছে। কাজেই ঈদের শপিংও শুরু হয়ে গেছে। তো, এক লোক গেছে এক দোকানে- একটা রুমাল দিন।

রুমাল?

হ্যাঁ, কেন রুমাল নেই?

থাকবে না কেন, কিন্তু তাই বলে শুধু রুমাল?

কী বলছেন আপনি? আমাদের কাছে শার্ট-প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি, জুতা, মোজা, পায়জামা-পাঞ্জাবি। ঈদে যা যা লাগে সবই আছে লেটেস্ট ডিজাইনের ঈদ স্পেশাল। আর আপনি চাইছেন শুধু রুমাল?

হ্যাঁ, আগে একটা রুমালই দিন।

দোকানদার বিরস মুখে একটা রুমাল দিল।

বউনির সময় শুধু একটা রুমাল! সে হতাশ।

ক্রেতা রুমালটা নিয়ে তার মুখ বাঁধল। যেমন

করে ডাকাতেরা মুখ বাঁধে। তারপর পকেট

থেকে একটা পিস্তল বের করল!

এবার দিন।

মা-মানে? দোকানদার এবার ভীত।

মানে একটু আগে যা যা দিতে চেয়েছিলেন সব

দিন। শার্ট-প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি,

জুতা, মোজা, পায়জামা-পাঞ্জাবি ঈদে যা যা

লাগে সবই লেটেস্ট ডিজাইনের। ঈদ স্পেশাল

বলে কথা!

জি জি। (দোকানদার ততক্ষণে বুঝে গেছে ইনি

কোন ধরনের শপিং করতে এসেছেন!) এটা

অবশ্য একটা অতিরঞ্জিত গল্প! এবার আসা যাক

বাস্তবে। এবারও একটা লোক এল। এটা

আরেক দোকান।

দুইটা রুমাল দিন।

রুমাল?

হ্যাঁ, কেন, নেই রুমাল?

থাকবে না কেন, কিন্তু তাই বলে শুধু রুমাল?
কী বলছেন আপনি? আমাদের কাছে শার্ট-প্যান্ট,
সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি, জুতা, মোজা,
পায়জামা-পাঞ্জাবিঃঃঈদে যা যা লাগে সবই
আছে লেটেস্ট ডিজাইনের।

ঈদ স্পেশাল আর আপনি চাইছেন শুধু দুইটা
রুমাল?

হ্যাঁ। দুইটা রুমাল?

দোকানদার বিরস মুখে দিল। দুই রুমালের দাম
মিটিয়ে লোকটা চলে যাচ্ছে। তখন
দোকানদারের কৌতূহল হলো।

ভাই, কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন
করতে পারি?

পারেন।

ঈদের শপিংয়ে এসে শুধু দুটো রুমাল কিনলেন
মাত্র?

ভাই রে, ঈদে বেতন-বোনাস কিছু পাইনি,
এখনো পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছি না। অফিসে
গ্যাঞ্জাম চলছে। তাই দুটো রুমাল কিনলাম
বাচ্চাদের জন্য।

আপনি কি মনে করেন বাচ্চারা শুধু রুমালে
শান্ত হবে? রুমাল দিয়ে কী করবে তারা?

তাদের চোখ বাঁধব। যেন ঈদের চাঁদ দেখতে না
পায়।

আসলে এটাও অতিরঞ্জিত গল্প, বরং প্রকৃত
বাস্তবে ফিরে আসি। আমার এক বন্ধু আছে।

বিরট পয়সাওয়ালা সে। ঈদ শপিং কখনো
দেশে করে না, বিদেশে করে। এবারও সে
যাচ্ছে।

দোস, তোর কিছু লাগবে? শপিংয়ে বাইরে
যাচ্ছি।

কেন, দেশে শপিং করা যায় না? দেশে
দোকানপাট নেই?

আছে, তবে বুঝলি না-বিদেশে ঈদ শপিং মানে
বেড়ানো, শপিং দুটোই-রথ দেখা আর কলা
বেচা একসঙ্গে।

কিন্তু জানিস তো পৃথিবী-বিখ্যাত এক পর্যটক
বলেছেন, ‘যারা ভ্রমণে গিয়ে কেনাকাটা করে,
তারা আসলে অন্ধ।’

বন্ধু এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে,
‘দোস, আমি সত্যি অন্ধ। চোখে ছানি পড়েছে,
অপারেশন করাতে যাচ্ছি!!’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম
আলো, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮

8) সাম্প্রতিক সময়ে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের আধুনিক মানে

জামিন: বাংলাদেশের আইনের একটি রহস্যময় শব্দ, যা বড় দুর্নীতিবাজদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, কিন্তু পাতি দুর্নীতিবাজদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

গ্রেপ্তার অভিযান/দুর্নীতি অভিযান: এক ধরনের চমৎকার চোর-পুলিশ খেলা, যা খেলা হয় শুধু মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। শেষমেশ যেখানে চোর বা পুলিশ কেউই লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বিদেশে চিকিৎসা: নেতা-নেত্রীরা যে কারণে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা কখনোই উন্নত করতে আগ্রহী হন না। উন্নতই যদি করা হয়, তাহলে তো মাঝেমধ্যে চিকিৎসার খাতিরে সপরিবারে বিদেশ ভ্রমণগুলো মাঠে মারা যাবে।

ভিআইপি বন্দী: ‘আইনের চোখে সবাই সমান’-বাক্যটির সত্যতা কতটুকু তা যাচাইয়ের একটি নিয়ামক।

জরুরি অবস্থা: এক ধরনের রাজনৈতিক চমক; যেখানে প্রথমে যারা আশাবাদী হয়, পরে তাদের হতাশ হতে হয় এবং প্রথমে যারা সন্ত্রস্ত থাকে, তারাই শেষে বিজয়োল্লাস করে।

যুদ্ধাপরাধী: জাতির যে দুর্গন্ধময় অংশটুকুর অস্তিত্ব সাধারণ মানুষই উপলব্ধি করে, কিন্তু সরকারের কাছে বরাবরই অদৃশ্য এবং যাদের বিচার প্রক্রিয়া এমন এক সময় আরম্ভ করার চিন্তাভাবনা চলছে, যখন তাদের শুধু মরণোত্তর সাজা দেওয়াই সম্ভব হবে।

উচ্ছেদ অভিযান: যে অভিযানকর্মে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তাদের বাসস্থান ও উপার্জনের উপায় দুটিই হারায়।

আইনজীবী: জামিন পেতে হলে যাদেরকে ধরতে হয়।

সুষ্ঠু নির্বাচন: যে রাজনৈতিক কাজে ‘সবার অংশগ্রহণ’ বলতে সব নেতা-নেত্রীর অংশগ্রহণ বোঝায়; যেখানে দুর্নীতিবাজ, যুদ্ধাপরাধী প্রভৃতি পদবি প্রার্থীদের অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ট্রুথ কমিশন: সত্য ও দুর্নীতির মধ্যেও যে একটি চমৎকার সম্পর্ক আছে, তা জানা যায় যার মাধ্যমে।

পরিবারতন্ত্র: গণতন্ত্রের রাজতন্ত্রী রূপ।

রাজনীতি: রাজাদের নীতি। আর রাজারা একটু খেয়ালি হন, তা কে না জানে। তাঁদের রীতিনীতি সাধারণের বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

সংস্কারপন্থী: দলীয় প্রধানের অনুপস্থিতিতে বিরাজমান ওই দলের একটি প্রগতিশীল শ্রেণী।

রাজনৈতিক জোট: ভিন্ন আদর্শ আর অভিন্ন উদ্দেশ্য-সংবলিত কিছু রাজনৈতিক দলের ঐক্য।

দ্রব্যমূল্য: যে শব্দটির স্থিতিশীলতা বা নিম্নগতি বলতে কিছু নেই।

লোডশেডিং: জ্যোৎস্নাবিলাসী জাতির অতি প্রিয় বিষয়। মাসুদুল হক

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮

৭) ঈদের পরে - আহসান হাবীব

ঈদ চলে গেল। ঈদের পর আর কোনো গল্প থাকে না। সব গল্প ঈদসংখ্যাগুলোয় লেখা হয়ে যায় বা আঁকা হয়ে যায় বা আইডিয়া পাচার হয়ে যায়। কিন্তু তার পরও বোধ হয় একটা গল্প ছিল।

এক লোক...ঈদের আগে আগে এ লোকটা হাইজ্যাক হয়েছিল। তার বেতন-বোনাস সব গেছে, ঈদ করা হয়নি। ধারদেনা করে কোনো রকমে চালিয়েছে। মেজাজ তার সেই যে খারাপ হয়েছে, এখনো ভালো হয়নি। ভালো হওয়ার কথাও না। সেই লোক অফিসে যাচ্ছে, হঠাৎ আবার হাইজ্যাকার! শুধু হাইজ্যাকার না, সেই হাইজ্যাকার-

‘তুমি?’

‘আপনি?’

‘তুমি আবার কী চাও? দাঁতে দাঁত চেপে বলল লোকটি।’

‘আর কী, কিছু ছাড়েন।’

‘হারামজাদা! তখন ঈদের কথা কয়া নিলি, এখন আবার কী?’

‘ওই মিয়া, মুখ খারাপ করেন ক্যান? আরে এক ঈদ গেছে তো কী হইছে, আরেক ঈদ তো আইসা গেছে!’

‘হারামজাদা! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!’ বলেই হাইজ্যাকারের কলার চেপে ধরে, ‘তোর জন্য আমি ঈদ করতে পারলাম না!’

‘আরে আপনার জন্য তো আমারও ঈদ হইল না।’

‘মানে?’

‘মানে আপনার বেতন-বোনাসের অর্ধেক টাকাই তো জাল ছিল।’ চিঁ চিঁ করে বলে হাইজ্যাকার। তার গলায় বজ্র আঁটুনি দিয়ে ধরেছে জীবন বাজি রেখে সেই লোক। হাইজ্যাকারের হাতের ছুরিকেও গুরুত্ব দেয় না। ‘বদমাইশ! আবার মিছা কথা কস!’ কলার আরও জোরে চেপে ধরে।

‘বিশ্বাস করেন, স্যার, আপনার নোট এখনো একটা পকেডে আছে।’ বলে সে পকেট থেকে বের করে একটা নোট দেখায়। ৩০০ টাকার নোট। ‘এই দেখেন, ৩০০ টাকার নোট। ৩০০ টাকার নোট হয়, শুনেছেন কখনো?’

লোকটার তখন সন্দেহ হয়। আরে এটা তো সে ভেবে দেখেনি। কারণ তার বস লোকটা দুই নম্বর। তাকে বেতন-বোনাস দিতেই চায়নি।

একসময় হঠাৎ দিয়ে দিল। তবে কি জাল টাকাই দিয়েছিল? সে তো টাকার বান্ডিল খুলেও দেখেনি, তার আগেই হাইজ্যাক! বস লোকটার অবশ্য অনেক রকমের দুই নম্বর ব্যবসা আছে, থাকেও মিরপুর ২ নম্বরে! সে হাইজ্যাকারের কাছ থেকে ৩০০ টাকার নোট ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল বসের কাছে। বস তখন অফিস থেকে বের হয়েছে সবে। লোকটি গিয়ে ধরল-

‘বস, আপনি আমারে জাল টাকা দিছেন?’

‘অ্যাঁ, ইয়ে...কে, কে বলেছে?’

‘কে বলেছে মানে? আমি তো ঈদই করতে পারলাম না। এই দেখেন, ৩০০ টাকার নোট, জাল নোট!’

‘ঠিক আছে, এই দেখো, এটা যদি জাল নোটই হবে, তাহলে নিশ্চয়ই এটা ভাঙানো যাবে না।’ বলে সে পাশের একটা দোকানে গেল। ‘এই, এই নোটটার ভাঙতি দাও তো।’

লোকটা মুহূর্তেই দুটো নোট বাড়িয়ে ধরল। দেড় শ টাকার দুটো নোট। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ০৬, ২০০৮

10) মেয়ে, তোমার বন্ধু কোনজন

ছেলেতে ছেলেতে, মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব যতটা সহজ-সরল, ঠিক ততটাই রহস্যময় হচ্ছে ছেলে আর মেয়েতে বন্ধুত্ব। প্রকৃতির কত রহস্যেরই কিনারা হলো, কিন্তু নারীকে রহস্যের কেন্দ্রে রেখে ছেলেদের দল কেন পাক খেতে থাকে, এই রহস্যের কোনো কিনারা হয়নি।

ছেলেদের কেউ হয় মেয়েটির বন্ধু, কেউ বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু ছেলে হলেই সবাই বয়ফ্রেন্ড হতে পারে না। সব বয়ফ্রেন্ডই ছেলে, কিন্তু সব ছেলেই বয়ফ্রেন্ড নয়। চাকরিতে যেমন আছে সিনিয়র-জুনিয়র, তেমনি একটি মেয়ের ছেলেবন্ধুদের মধ্যেও আছে নানা স্তর; স্তরভেদে আচরণের ভিন্ন ধরনও। ‘তোমার জন্য মরতে পারি ও সুন্দরী...’ মনোভাব সব ছেলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। এই লুকোচুরির কারণেই বাড়ছে রহস্যময়তা। ইদানীং মোবাইল ফোন এই রহস্যময়তা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও এক ধাপ। আসুন, প্রকৃতির এই রহস্যময় সম্পর্কটির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হই। সম্পর্কটা যখন কেবল বন্ধু এটি ছেলে আর মেয়েতে বন্ধুত্বের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে ছেলেটির অবস্থা ঘরে রাখা শো-পিসের মতো। মেয়েটির কাছ থেকে ছেলেটির দূরত্ব কম হলেও ছেলেটির কাছ থেকে মেয়েটি বেশ দূরে। মেয়েটি ইচ্ছে হলে তাকে ফোন দিয়ে অনেক কথা বললেও ছেলেটি নিজ থেকে কিছু জানার অধিকার তখনো অর্জন করে না। এ স্তরে ফোনালাপটা হয় কিছুটা একতরফাঃ

মেয়েঃ হ্যালো, আমি ঘুরতে যাচ্ছি, তুমি কি দুদিন পর একটা ফোন দিতে পারবে?

ছেলেঃ কোথায় যাচ্ছ?

মেয়েঃ ওটা তোমার বিষয় না, রাখি। (ধপ করে ফোন রেখে দেবে)। মোটামুটি ভালো বন্ধু এ পর্যায়ে ছেলেটি দূরত্ব কিছুটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তখন সে শো-পিস থেকে টিভি রিমোটের পরিণত হয়; মানে নিজের কিছু ফাংশন যুক্ত হয়। ব্যাটারি-দেওয়া হলেও মেয়েটির মোড বদলানোর কাজটি সে করতে পারে। এখন সে চাইলে অকারণে ফোন দিয়ে খুবই সাধারণ খোঁজ-খবর নিতে পারে। এ পর্যায়ে ফোনে কথাবার্তা একতরফা না হলেও পাল্লা মেয়েটির দিকেই ভারী থাকেঃ

ছেলেঃ হ্যালো, কী করছো?

মেয়েঃ আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তোমাকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি।

(দুদিন পর)

মেয়েঃ সেদিন কেন ফোন দিয়েছিলে?

ছেলেঃ এমনি, খোঁজ-খবর নিতে।

মেয়েঃ ও। আচ্ছা, রাখি। ভালো বন্ধু

এটি বেশ কাছের একটি অবস্থান। রিমোট থেকে সে এখন প্রেশারকুকারের সেফটি ভাল্ভের মতো হয়ে ওঠে। মেয়েটি কষ্ট পেলে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে হালকা হয়। এককথায় বললে, ছেলেটি এখন মেয়েটির জন্য দরকারি হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে ফোনালাপে মেয়েটি ভালো বক্তা হয়ে ওঠে আর ছেলেটি হয় অনুগত শ্রোতাঃ

মেয়েঃ জানো, ও না কিছু খাচ্ছে না। নিজের কাজেও মন দিচ্ছে না। আমার সঙ্গেও তেমন কথা বলে না। আমার মনে হয়, সে আমাকে এখন আর পছন্দ করে না।

ছেলেঃ ও-টা কে?

মেয়েঃ কেন, আমার বয়ফ্রেন্ড! তুমি শুনছো তো?
ছেলেঃ ও আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি শুনছি, বলে যাও। খুব ভালো বন্ধু

এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ সময় ছেলেটি প্রমোশন পেয়ে অটোরিকশাচালকের আসনে পৌঁছায়। মেয়েটিও তাকে ছাড়া কিছুই করে না। সে যেখানেই যাবে ছেলেটিকে তার সঙ্গে যেতেই হবে। ছেলেটির সঙ্গে ঘুরে মেয়েটি অনেক মজা পায়, তবে ছেলেটি মজা পাচ্ছে কি না এটা কোনো বিষয় না। ভুল বুঝবেন না, ছেলেটি কিন্তু তার বয়ফ্রেন্ডজাতীয় কিছু নয়। কিন্তু ছেলেটি ঠিকই একদিন ভুল করে তাকে বলে বসবে মনের গোপন কথাটিঃ

ছেলেঃ আমি যদি তোমার বয়ফ্রেন্ড হই, তোমার আপত্তি আছে?

মেয়েঃ আরে, বল কী! তুমি তো অনেক ফানি!

এ জন্যই তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু। আমার বয়ফ্রেন্ড সাকিব শুনলেও খুব মজা পাবে। সবচেয়ে ভালো বন্ধু

এবার বলা যায় ছেলেটি বিশেষ কিছু। এখন সে কখনো বন্ধু, কখনো অভিভাবক, কখনো ভাই-মোটকথা, টোটাল সিকিউরিটি। ছেলেটি তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবে, নোট লিখে দেবে, এমনকি হাত ধরেও হয়তো কোথাও বসবে। এ পর্যায়ে ছেলেটি একটি গুরুতর ভুল করবে। সে নিশ্চিত ধরে নেবে মেয়েটি তাকে ভালোবাসে।

কিন্তু এমনই এক দিনে মেয়েটি তার হবু জামাইয়ের সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দেবে যে কিনা বড় চাকরি করে; যার বাড়ি-গাড়ি আছে।

মেয়েঃ দোস্ত, এ হচ্ছে আমার জামাই। আর ও
হচ্ছে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তোমাকে
বলেছি না ওর কথা?

ছেলেঃ হ্যালো, কেমন আছেন? (হ্যাভশেক
করতে গিয়ে হাতের চাপে তার কবজি
মচকাবে। এখন তার ভগ্নহৃদয়,
ভগ্নকবজি)বয়ফ্রেন্ড

এটা বন্ধুত্বের সম্পর্কের শেষ পর্যায়। এরপর
আর ওপরে যাওয়ার জায়গা নেই। প্রেম হলো
তো বন্ধুত্বও শেষ। সম্ভবত এখান থেকেই
সম্পর্ক আবার নামতে থাকে। এ পর্যায়ে
আপনার সম্পর্ক থাকলে প্রস্তুত থাকুন; প্যারাসুট
থাকলে খুব ভালো হয়-কখন যে আবার লাফ
দিতে হবে! সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ১৩,
২০০৮

11) রহিমুদ্দীর ডাইয়ের বেটা - জসীমউদ্দীন

চাচা আর ভাস্তে সন্ধ্যাবেলায় দুইজনে
আলাপসলাপ করিতেছে। ভাস্তেঃ চাচা! আজ
বাজারে গিয়াছিলাম।

চাচাঃ যাবি না! তবে বাড়িতে বসিয়া থাকবি
নাকি?

ভাস্তেঃ একটা কুমড়া লইয়া গিয়াছিলাম।

চাচাঃ নিবি না? খালি হাতে বাজারে যাবি নাকি?

ভাস্তেঃ একটা লোক আসিয়া কুমড়াটার দাম
জিজ্ঞাসা করিল।

চাচাঃ দাম জিজ্ঞাসা করিবে না? তবে কি বিনা
পয়সায় কুমড়াটা লইবে?

ভাস্তেঃ আমি আট আনা চাহিলাম।

চাচাঃ আটআনা চাবি না? তবে কি মাগনা দিবি
অত বড় কুমড়াটা?

ভাস্তেঃ সে লোকটা দুই আনা বলিল।

চাচাঃ বলিবে না? অতটুকু কুমড়া তুমি আটআনা
চাহিলেই সে নিবে কেন?

ভাস্তেঃ আমি বলিলাম বাপের পুষি কুমড়া খাইছ
কোনো দিন?

চাচাঃ বেশ বলিয়াছিস। এত বড় কুমড়াটা বেটা
দুই আনা মাত্র দর করিল!

ভাস্তেঃ এমন সময় এক পুলিশ আসিল।

চাচাঃ আসিবে না? তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে
বলিয়াছ, বাপের পুষি কোনো দিন কুমড়া
খাইয়াছ? দেখ না কী হয়!

ভাস্তেঃ পুলিশ আসিয়া কুমড়াটার দাম জিজ্ঞাসা

করিল।

চাচাঃ দাম জিজ্ঞাসা করিবে না? পুলিশ বলিয়া কুমড়াটা মাগনা লইবে না কি?

ভাস্তেঃ আমি কুমড়ার দাম আট আনা চাহিলাম।

চাচাঃ বেশ! বেশ! আমার ভাস্তে! দাম চাহিবি না! পুলিশ দেখিয়া ডরাইবি না কি?

ভাস্তেঃ পুলিশ দুই আনা দাম করিল।

চাচাঃ করিবে না? পুলিশ দেখিয়া তাহারা জিনিসের দামদস্তুর জানে না? এতটুকু কুমড়া তার দাম দুই আনার বেশি আর কত হইবে? ভাস্তেঃ আমি বলিলাম বাপের পুষ্য কুমড়া খাইয়াছ কোনো দিন?

চাচাঃ বেশ বলিয়াছিস! পুলিশ বলিয়া ডরাইবি কেন? বেটা আট আনার কুমড়াটা দুই আনায় লইতে চায়?

ভাস্তেঃ তখন পুলিশ আমাকে ধরিয়া খুব মার দিল।

চাচাঃ দেবে না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? পুলিশের সঙ্গে বাহাদুরি!

ভাস্তেঃ মারিতে মারিতে আমাকে থানায় লইয়া গেল।

চাচাঃ থানায় লইয়া যাইবে না? পুলিশকে তুমি অপমান করিয়াছ।

ভাস্তেঃ সেখানে গেলে বড় দারোগা আসিল।

চাচাঃ আসিবে না? দেখ তোমার ওপর আরও কী দুর্গতি হয়।

ভাস্তেঃ বড় দারোগা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল।

চাচাঃ দেবে না? তুমি যে রহিমুদ্দীর ভাইর বেটা।

জসীমউদ্দীনঃ পল্লীকবি। নকসী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, ও মা যে জননীকান্দে তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্য। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ১৩, ২০০৮

12) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বরাবর হাতধোয়া দিবস সম্পর্কিত খোলা চিঠি

কলিযুগের হে প্রবাদপুরুষ

স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনি সবাইকে এক দিন বারবার হাত ধুতে বলেছেন। কিন্তু জনাব, আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের যে ওয়াসার পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে সে পানি কতটা বৈচিত্র্যময়। আমাদের এই ওয়াসার

পানিতে সহনীয় মাত্রার অনেক বেশি কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া বাস করে। আপনি নিশ্চয় কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া কী, কী করে, এসব বিষয়ে অবগত আছেন। হে মহান স্বাস্থ্যসচেতনতার অগ্রপথিক এই কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পেটে গেলে ডায়রিয়া হওয়ার আশঙ্কা শতভাগ, আরও কত কিছু যে হতে পারে, সেটাও কি বলতে হবে? কিন্তু বারবার এই পানি দিয়ে হাত ধুতে গেলে হাতে লাগা ব্যাকটেরিয়া তাড়াব কীভাবে? হে জনগণের বন্ধু

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের ওয়াসার পূতিগন্ধময় পানি দিয়ে বারবার হাত ধোয়া কোনোভাবেই না ধোয়ার চেয়ে ভালো হবে না! সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার ওয়াসার পানি ধরি বলে সে জন্য কী পরিমাণ ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করতে হয়, আপনি জানেন? না জানলে এ দেশে এসে টিভিতে ডিওডোরেন্টের বিজ্ঞাপন দেখে যাবেন। হে জ্ঞানতাপস

এই ওয়াসার পানি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন পানির অপর নাম জীবন। এই পানিতে ব্যাকটেরিয়ার মতো ছোটখাটো জীবন থেকে শুরু করে আপনি কেঁচোর মতো জীবন খুব সহজে খুঁজে পাবেন। সেই পানিতে হাত না ধুয়ে যদি ক্ষেতে সেচ দিতে বলতেন, সেটাই বেশি ভালো হতো। হে মান্যবর

আপনি নিশ্চয় শুনেছেন সেই প্রবাদটি-কুইনাইন নাহয় জ্বর সারাবে কিন্তু কুইনাইন সারাবে কে? এখন আমাদের বলতেই হচ্ছে, ওয়াসার পানিতে হাত পরিষ্কার নাহয় করলামই কিন্তু হাত থেকে ওয়াসার পানি পরিষ্কার করব কীভাবে? এই এক দিন সবার হাত ধোয়ার জন্য যদি আপনি লিটারখানেক মিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে নাহয় আপনার আইডিয়াটা সফল করতে এগিয়ে আসতাম। হে আলোকিত মানুষ

আপনার এই দিবসটি পালন করার জন্য বারবার ওয়াসার পানি ঘেঁটে আমরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না। আমাদের এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন। আমরা বারবার এই দূষিত পানি দিয়ে হাত ধুয়ে আমাদের বৈচিত্র্যময় এই জীবনটাকে রোগশোক দিয়ে আরও বৈচিত্র্যময় করতে চাই না। হে ক্ষমাশীল

মহান ওয়াসার কল্যাণে এই হাত ধোয়া
কর্মসূচির ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে
কোনোভাবেই একমত হতে পারলাম না বলে
দুঃখিত। আমাদের এই অপারগতাজনিত কারণে
আপনার মহান স্বাস্থ্যসচেতন কর্মসূচিতে অংশ
নিতে না পারার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।
বাংলাদেশি জনগণের পক্ষে খোলা চিঠিটি
লিখেছেন-জনৈক ওয়াসার পানি
ব্যবহারকারী। [সূত্রঃ](#) দৈনিক প্রথম আলো,
অক্টোবর ২০, ২০০৮

13) কথার কথা - আনিসুল হক

‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায়
না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’ বহুদিন আগে
জীবনানন্দ দাশের মা কবি কুসুমকুমারী দাশ
এই কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর লেখার ধরনটা
ছিল বড় মজার। রান্না করছিলেন হয়তো।
তাঁদেরই ব্রাহ্মসমাজ পত্রিকার সম্পাদক এসে
বললেন, লেখা দিতে হবে। তরকারিতে হালুদ
ছিটিয়ে দিতে দিতে কোলে খাতা মেলে ধরলেন।
তরকারি রান্না হওয়ার আগেই কবিতার
পরিবেশন শেষ। তবে কবিতাটিতে তিনি
লিখেছিলেন লাখ কথার এক কথা। বুঝেছিলেন,
বাঙালি মাত্রই কথায় পটু, কাজে তেমন নয়।
কথাই শুধু বলে গেলাম আমরা। দেশটা কেন
পিছিয়ে-এ নিয়ে কত কথা যে আমরা বললাম!
যার কাছে যাবেন, তার কাছেই সমস্যার সমাধান
আছে। কত কথা যে তিনি আমাদের বলতে
পারবেন! আর যে বিষয়ে যে কম জানে, সেই
বিষয়ে সে বলতে পারে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে
ভালো।

আগে তো কথা হতো শুধু সামনাসামনি, মুখে
মুখে; এখন কথা হচ্ছে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা।
হ্যাঁ, মোবাইল ফোনে তো বটেই, ওরা তো
স্লোগানই দিয়ে রেখেছে-ওরে, কত কথা বলে
রে! আরও আছে টেলিভিশন। শোর নামই টক
শো। নেন, কথা বলেন। চলছে কথা। খালি
কথা। ইস, কথার ওপর যদি ট্যাক্স নেওয়া যেত!
বলছে বলুক। অন্তত একটা গর্ব আমরা করতে
পারি, আমাদের বাকস্বাধীনতা আছে। তাই
আমরা বলেই চলেছি। বলার সময় কম বলি
না। আমাদের প্রতিটি জনসভা ‘ঐতিহাসিক’।
আমাদের প্রতিটি কর্মসূচি ‘স্মরণকালের বৃহত্তম’।
আমাদের প্রতিটি স্থাপনা ‘এশিয়া মহাদেশের

মধ্যে সেরা’।

সবকিছুতে আমাদের হারানো যাবে, কথায় যাবে না।

এবার বোধহয় আমাদের কথাগুলোকে কাজেও পরিণত করতে হবে। হবে তো বটে, কিন্তু করবে কে? আমি করব না। আপনি করুন।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২০, ২০০৮

14) ও ডাবওয়ালা!

মানুষটার মুখখানা বেশ হাসি হাসি। ঠোঁটের পরে বেশ পুরু একখানা গোঁফ। মাথায় কার্নিশওয়ালা লাল টুপি। গায়ে সাদা টি-শার্ট। হাতে একটা চকচকে চাপাতি। বড় একটা কাঠের বাক্সের ভেতর কী যেন বিকোচ্ছে লোকটা। তাঁর ওপর আমাদের চোখ আটকে যাওয়ার কারণ অবশ্য এসব কোনোটাই নয়। গাত্রবর্ণ আর হাবভাব দেখেই মনে হচ্ছে, এই লোক নির্ঘাত বাঙালি। চ্যানেল আইয়ের প্রতিবেদক মল্লিক ভাই সেই শুরু থেকে মহা উত্তেজিত, সিঙ্গাপুরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে একটা প্রতিবেদন না করলেই নয়। অতএব, সিঙ্গাপুর-প্রবাসী বাংলাদেশি অনুসন্ধান অভিযানে নেমেছি আমরা তিনজন। সেই উদ্দেশ্যেই বাঙালিদের মিলনমেলাখ্যাত মুস্তাফা মার্কেটে আমাদের আগমন। আর মার্কেটে ঢুকতে না-ঢুকতেই এই বাঙালিসদৃশ সগুস্ত্র ভদ্রলোককে দেখে আমরা যারপরনাই উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আনন্দধারার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অরুণদা এগিয়ে যান প্রথম। পেছন পেছন আমি আর মল্লিক ভাই। ‘তুমি কি বাঙালি?’ মুখে একগাল হাসি নিয়ে ইংরেজিতে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন অরুণদা। আমাদের আগ্রহে একরাশ পানি ঢেলে দিয়ে না-সূচক মাথা নাড়ে সে। কিন্তু আমরা হাল ছাড়ার পাত্র নই। ‘তবে কি তুমি তামিল?’ মরিয়া হয়ে পরের প্রশ্ন আমাদের। কে না জানে সিঙ্গাপুরে তামিল লোকজনের অভাব নেই। আর তারা দেখতেও প্রায় বাংলাদেশিদের মতো। কিন্তু লোকটা একদম যা-তা। সে যেন পণ করেছে, আমাদের কোনো অনুমান আজ সে কিছুতেই সত্যি হতে দেবে না। না, লোকটা তামিলও নয়। ‘আমি থাইল্যান্ডের লোক’-বেশ বিরক্তমুখেই জবাব দেয় সে। ততক্ষণে আরও দু-চারজন লোক জমে গেছে তাকে ঘিরে। মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছি, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে

মল্লিক ভাই সম্ভবত অন্যদিকে হাঁটা দেওয়ার কথা ভাবছেন। এ সময় লোকটা সামনের কাঠের বাক্স থেকে তার গোলগাল হালকা হলুদাভ জিনিসটা বের করল। তারপর চাপাতি দিয়ে এয়সা এক কোপ বসায় ওই গোলগাল জিনিসটার গায়ে, দেখেই আমাদের চম্ফু চড়কগাছ। ওমা, এ যে একদম অরিজিনাল ডাব, মানে নারকেল! এতক্ষণে আমাদের চোখ পড়ে লোকটার পেছনের লাল ব্যানারটার ওপর। সেখানে ছোট ছোট ইংরেজি হরফে লেখা, 'ফ্রেশ, কোকোনাট ফ্রম থাইল্যান্ড। ১.৫ ডলার।' চোখের সামনে এমন তরতাজা ডাব দেখে এইবেলা গলাটা একদম শুকনো ঠেকতে থাকে আমাদের কাছে। অরুণ দার অর্থায়নে ঝটপট তিনটা ডাব হাতে নিয়ে আমরা বসে যাই এককোণায়। শ্যামদেশীয় ডাবের পানিতে চুমুক দিয়েই ওই বেয়াড়া লোকটার বাংলাদেশি না হওয়ার অপরাধ মনে মনে ক্ষমা করে দিই আমরা; মানে ক্ষমা করে দিতে বাধ্য হই। আহ, ডাবের পানি এমন দারুণ মিষ্টি আর এমন ঠান্ডা হতে পারে-ভাবাই যায় না! কী কৌশলে এই ডাবের পানিকে এমন বরফশীতল করে তুলেছে এই থাই লোকটা, কে জানে। রহস্য ভেদ করার জন্য কাঠের বাক্সটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। নিচে বেশ কয়েক প্রস্থ বরফ বসিয়েছে সে বাক্সের ভেতর। তার ওপরই রেখেছে একদম নিখুঁতভাবে ছোবড়া-ছাড়ানো ডাবগুলো। বাংলাদেশি ডাবওয়ালাদের কথা মনে হয় আমার। প্রায়ই এই নারকেলসুধাপিয়াসী আমি ময়লা-নোংরা-কাদাটে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার চারপাশে ভনভন করে অগণিত মানুষ আর মাছি। এর মধ্যে ডাবের কাঁদি নিয়ে বসে থাকে আমাদের চিরচেনা ডাবওয়ালারা। তারা আমাকে মিষ্টি পানি আর কচি ডাবের লোভ দেখায়। দরাদরি করে শেষমেশ ১৫ টাকায় রফা হয়। ওরা আনাড়ি আর ময়লা হাতে ডাব কাটে; কিন্তু ডাবটা হাতে নিতে নিতে অর্ধেক উৎসাহই মরে যায়। কোনোমতে দু-এক চুমুক দিয়ে কেটে পড়তে বাধ্য হই। আহা! আমাদের ডাবওয়ালারাও যদি এই ডাব ঠান্ডা রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারত! মনে পড়ে গেল পাশের দেশের কলকাতার সদর স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিটের আনাচকানাচে অহরহ দেখা

মেলে ডাবওয়ালাদের। সাঁই সাঁই করে দা চালিয়ে অতি দ্রুত ডাব কাটার কাজটাকে ওরা রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সেই শিল্পটাও আমাদের ডাবওয়ালাদের নেই। ডাবের পানি খাওয়া শেষ হলে সিঙ্গাপুরি ডাবওয়ালা একটা প্লাস্টিকের চামচ আমাদের হাতে তুলে দেয়। ডাবের ভেতর বেশ পুরু শাঁস, প্লাস্টিকের চামচ দিয়ে তুলে খাও-ওটাই তো আসল মজা। ডাবওয়ালা সত্যি তোফা লোক। অবশ্য থাইল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুর এসে ডাব বিক্রি করে পেট চালানোটাও চাউখানি কথা নয়। ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন খন্দের জুটে গেছে। লোকটা ফটাফট ডাব কাটছে আর ডলার গুনছে-ডাবপ্রতি দেড় ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৮০ টাকা। তোফা বাণিজ্য!

কোনো একটা জায়গার লোকজনকে বোঝার জন্য নাকি দুটি জায়গা পরিদর্শন খুবই জরুরি। এক. স্থানীয় কাঁচাবাজার (ওখানকার মানুষ কী খায়, সেটা জানতে)। দুই. স্থানীয় বইয়ের দোকান (ওরা কী পড়ে, সেটা জানতে)। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের এই ফর্মুলা অনুসরণ করে আমি নিজেও একটি ফর্মুলা দাঁড় করিয়েছি। এই ফর্মুলার নাম ‘ডাবওয়ালা ফর্মুলা’-কোন দেশ কতটা এগিয়ে, সেটা জানতে চান? তবে সেখানকার ডাবওয়ালাদের কাছে যান। ইকবাল হোসাইন চৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২০, ২০০৮

15) সাহস - আহসান হাবীব

ধানমন্ডিতে সেদিন গিয়েছিলাম কী একটা কাজে। হঠাৎ আমার এক বেকার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। এই বয়সে বেকার বন্ধু থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার এই বন্ধুটি শখের বেকার। বউ যেহেতু একটা এনজিওতে বিরাট বেতনের চাকরি করে, কাজেই মাঝেমধ্যে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ায়। তারপর কিছুদিন পর ফের একটা চাকরি ধরে ফেলে (অবশ্য চাকরি ছাড়া এবং চাকরি ধরায় ইতিমধ্যে সে রেকর্ড করে ফেলেছে। বন্ধুরা তাকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে বা দিয়ে যাচ্ছে!)। সে যা-ই হোক, তো...তার সঙ্গে যখন দেখা তখন সে সদ্য আবার বেকার হয়েছে। ধানমন্ডি এলাকায় গায়ে বাতাস লাগিয়ে

বেড়াচ্ছে।

আরে দোস্ত, খাওয়া।

কী খাবি?

একটা কিছু খাওয়া। এদিন পর তোর সঙ্গে দেখা।

ধানমন্ডি এলাকা খাওয়াদাওয়ার জন্য রিস্কি। আমি বলি।

বার্গার খাওয়া...তাহলেই চলবে। আমি রাজি হলাম, হাজার হোক পুরোনো বন্ধু, বার্গার খাওয়া যায়।

কিন্তু কোথায় খাব। হঠাৎ দেখি একটা বিজ্ঞাপন- 'সাহস বদলে দেয় সবকিছু।' ঠিক কিসের বিজ্ঞাপন ধরতে পারলাম না। অবশ্য আজকাল বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা মুশকিল, কোনটা কিসের বিজ্ঞাপন। যেমন-সেদিন টিভিতে দেখি, এক লোক ভুঁড়ি কমানোর আশ্রয় চেষ্টা করছে। আমি যখন ধরে নিচ্ছি বিজ্ঞাপনটি বোধহয় ভুঁড়ি কমানোর কোনো যন্ত্রের হবে, তখন দেখা গেল, না, বিজ্ঞাপনটি আসলে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির।

ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ব্যবহারকারী সুন্দরী তরুণীকে আকৃষ্ট করতে সে ভুঁড়ি কমাচ্ছে। সে যা-ই হোক...আমরা দেখলাম সেই বিজ্ঞাপনের (সাহস বদলে দেয় সবকিছু) পাশ দিয়েই একটা ফাস্টফুডের দোকান দেখা যাচ্ছে। বেশ পশ দোকান। সাহস করে ঢুকে পড়লাম। যা থাকে কপালে, বার্গারই তো খাব। দুটো বার্গারের অর্ডার দেওয়া হলো, সঙ্গে দুটো ড্রিংকস।

খেয়েদেয়ে ঢেঁকুর তুলতে যাব। বিল এসে হাজির। ঢেঁকুর আর তোলা হলো না (ঢেঁকুর তোলার মতো অবস্থায় ঢেঁকুর আচমকা গিলে ফেলা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ, আমি টের পেলাম সেই প্রথম!)। দুটো বার্গার আর দুটো ড্রিংকসের বিল এসেছে একুনে ৫৫৮ টাকা (+ভ্যাট, টিপস তো আছেই)!! আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে গভীর মনোযোগে। জীবন বাজি রেখে কোনোমতে বিল দিয়ে বাইরে এসে আবার নজর পড়ল সেই বিজ্ঞাপনটির দিকে... 'সাহস বদলে দেয় সবকিছু!!' এবার আমি বিজ্ঞাপনের মর্মার্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম যেন। আমাদের সাহস আমার মানিব্যাগ বদলে দিয়েছে নিদারুণভাবে।

ফাস্টফুডের দোকানের বাইরে এসে বন্ধুকে

বললাম, আমাকে এখন ঘাড়ে করে বাসায় পৌঁছে দিবি তুই।

কেন?

আমি মানিব্যাগ খুলে দেখালাম, সেখানে গোটা-কয়েক ভিজিটিং কার্ড আর একটা দুই টাকার কয়েন ঠনঠন করছে। বেকার বন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ওঠ। তুই ঘাড়ে উঠতে পারলে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারব আশা করি...তোর ওজন আর কত হবে।'।

না, শেষ পর্যন্ত বন্ধুর ঘাড়ে করে বাসায় না পৌঁছে হেঁটেই রওনা দিলাম। অন্তত পায়ের ব্যায়াম হোক। এবং হাঁটতে হাঁটতে সাহসের ওপর চমৎকার একটা কোটেশন মনে পড়ল। 'তুমি তখনই সাহসী, যখন তোমার আশপাশের মানুষগুলো প্রচণ্ড রকম ভীতু।' কোটেশনটি ফ্রেড গেটিংসের। ফ্রেড গেটিংস একজন দার্শনিক ছিলেন, আবার একজন বিখ্যাত পামিস্টও ছিলেন। তবে তিনি সাহসী ছিলেন নিঃসন্দেহে।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২০, ২০০৮

16) ভূত-বিপ্রিস্তয়ানা

সুং টিংপো তখন যুবক। একদিন রাতে বেড়াতে বেরিয়ে পথে হঠাৎ একটা ভূত দেখে থমকে দাঁড়ায়। ভূতটা না থেমে তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করে উঠলেও, ভয় পেয়েছে, তাকে বুঝতে না দিয়ে কাছে আসতেই সরাসরি সে মুখের ওপর বলে উঠল, কে তুমি?

ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমি ভূত-তুমি কে?

টিংপো ঘাবড়ে না গিয়ে নিজের আসল পরিচয় চেপে বলে ওঠে, আমিও একজন ভূত।

ভূত প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

টিংপো উত্তর দেয়, ওয়াংসি।

আরে, আমিও ওখানেই যাব।

ভূতটা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, চলো, একসঙ্গে যাই!

অগত্যা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পর ভূতটা বলে ওঠে, আমরা কী বোকা! দুজন মিছিমিছি কেন হেঁটে মরছি? তার চেয়ে এসো, আমরা পালা করে একজন আরেকজনকে বয়ে নিয়ে যাই। তাতে দুজনেরই পরিশ্রম কম হবে।

টিংপো বলে, খুব ভালো কথা, আমার অমত নেই।

তখন ভূতটা প্রথমেই টিংপোকে নিল কাঁধে তুলে। মাইলখানেক হাঁটার পর তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে ভূতটা জিজ্ঞেস করে, ভূতের চেয়ে তোমার ওজন অনেক বেশি। ঠিক করে বলো তো, তুমি কি সত্যি একজন ভূত? এই সেরেছে, ধরে ফেলে বুঝি, টিংপোর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও চট করে একটা বুদ্ধি তার মাথায় খেলে যায়। ভূতের মনে বিশ্বাস আনার জন্য সে চট করে রেগে ওঠে-আমি তো নতুন ভূত, সেই জন্য আমার ওজন তোমার চেয়ে বেশি এখনো।

বলতে বলতেই টিংপো ভূতটাকে কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু ভূতটা এতই হালকা যে তার মনে হলো না কোনো ভার সে বহন করছে।

এইভাবে তারা পাল্টাপাল্টি করে একজন আরেকজনকে বহিতে থাকে। যেতে যেতে একসময় টিংপো ভূতটাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, ভূতেরা সবচেয়ে ভয় পায় কিসে? ভূতটা ভাবে, ও নতুন, বলে দেওয়া উচিত। তাই তখনই বলে ফেলে, ভূতেরা যা সবচেয়ে ভয় করে থাকে তা হলো, মানুষের মুখের থুতু। এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা নদীর ধারে এসে পড়লে টিংপো ভূতটাকে আগে নদীটা পেরিয়ে যেতে বলে। ভূতটা যখন পার হয়ে গেল, একটুও জলের শব্দ হলো না। তাই টিংপোর বেলা হুসহাস শব্দ শুনে ভূতটা আবার তাকে প্রশ্ন করে-ভূত তো জলের ওপর দিয়ে গেলে শব্দ করে না! আশ্চর্য, সত্যি কি তুমি একজন ভূত? ঠিক করে বলো?

টিংপোর মনে আবার ভয়, গেল বুঝি সব ফেঁসে, তীরে এসে তরী ডুবল! তাই আগের মতো আবার বুঝিয়ে দেয়-আশ্চর্য হচ্ছে কেন, আমি নতুন ভূত, এখনো নদী পার হওয়ার অভ্যাস হয়নি যে!

তারপর তারা শহরের কাছে পৌঁছালে টিংপো ভূতটাকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে এত জোরে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল যে ভূতটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

তখন আরও কষে ভূতটাকে চেপে ধরে টিংপো

চলতে থাকল। বাজারের কাছাকাছি এসে পড়তে টিংপো ভূতটাকে যেই পিঠ থেকে নামাল, সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ছাগল হয়ে গেল! অমনি টিংপো ছাগলটার ওপর থুতু ফেলল, যাতে সে আর অন্য কোনো রূপ ধরতে না পারে।

তারপর বাজারে দেড় হাজার ওয়ান নিয়ে সেই ছাগলটাকে বিক্রি করে আনন্দে ঘরে ফিরে গেল!

অনুবাদঃ সুমথনাথ ঘোষ

এই চীনা গল্পটির লেখকের নাম পাওয়া যায়নি।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২০, ২০০৮

17) আবার আসিব ফিরে - সৌরভ মাথাওয়াত

লোকজন দেখতে পেল ফাঁকা রাস্তা থেকে একটি গাড়ি সজোরে ছুটে যাচ্ছে পাশের ফসলি জমির দিকে। আর গাড়ির সামনে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে একটি মানুষ। কিছুক্ষণ পর জোরে একটা শব্দ ভেসে এল। বোঝা গেল লোকটির ভাগ্যে কী ঘটেছে।

দুর্ঘটনাকবলিত বাসের চালকের ব্যাখ্যাটা ছিল এমন-‘তখন কী-ই বা আমার করার ছিল। ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ কোথা থেকে যেন উদিত হলো পাগলটি। রাস্তার মাথায় এসে নাচতে শুরু করল। ভেবে দেখলাম, আমি যদি পাগলটিকে বাঁচাতে যাই তবে বাসসুদ্ধ সবাইকে মারতে হবে। আর বাসের সবাইকে যদি বাঁচাতে যাই তবে পাগলটিকে মারতে হবে। আমি পাগলটিকেই মারার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু আমি যখন পাগলটিকে মারতে গেলাম, পাগলটি তখনই দৌড়ে ছুটে গেল ফসলের ক্ষেতের দিকে!

২৮ অক্টোবরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতার লালসায় উন্মাদ ‘একদল খুনির’ হাত থেকে বাঁচাতে বুঝি এ সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। অস্বস্তির চেয়ে তখন সাধারণ মানুষের স্বস্তিই লেগেছিল বেশি। তারপর লাইনচ্যুত ট্রেনটি লাইনে তোলা হলো, নানা রকম অনিশ্চয়তা আর সংশয়ের মধ্যেও ট্রেনটি চলতে শুরু করল। কিন্তু ট্রেনটি এখন কোন পথে চলছে? বাসটির মতো যাত্রীদের বাঁচাতে ছুটছে না তো? বুঝতেই তো পারছেন

প্রতিদিন কলেজে যাওয়ার সময় রাস্তার মাথায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে। শিলা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেটি বলে ওঠে, ‘অ্যাঁই আপু,

আপনি খুব সুন্দর।' এর পরই বলে, 'আই লাভ ইউ।' শিলা অবাক হয়ে যায়। বয়সে ছোট একটি ছেলে কী করে এমন অসভ্যতা প্রকাশ করতে পারে! একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকলে শিলা ছেলেটির বাসায় গিয়ে অভিযোগ করে এল। ছেলেটির বাবা-মা নিতান্তই ভদ্রলোক। কথা দিলেন, ছেলেকে তারা শাসন করবেন। এমন আর হবে না। এর ঠিক এক দিন পরের কথা। শিলা রাস্তার মাথায় পৌঁছেই দেখে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। আগের মতো। এবার ছেলেটি আগের মতো কিছু বলেনি। তবে কাছে গিয়ে শুধু বলল, 'অ্যাই আপু...।' শিলা একটু রেগে বলল, 'আবার?' ছেলেটি বলল, 'বুঝতেই তো পারছেন।'

বাতাস বদলাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে চাঁদা চেয়ে ফোন আসা শুরু হয়েছে। অমুক ভাই তমুক ভাইয়ের নামে তোরণও শোভা পেয়েছে নগরে। পোস্টারে এলাকাবাসীর দোয়া চাইতে শুরু করেছে এত দিন গর্তে জীবন যাপন করা ছিঁচকে চোরেরাও। আর বিখ্যাতদের কথা বাদই দিলাম। সামনে নির্বাচনের কথা হচ্ছে। নির্বাচন হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারও চলে যাবে, কিন্তু তারপর কী?

'বুঝতেই তো পারছেন।'পরের স্টপেজ তিন বন্ধু ট্রেনে করে বেড়াতে যাচ্ছেন। একজন লম্বা একটা গল্প শুরু করলেন। অপর দুজন তা শুনছেন। এমন সময় আরও একজন যাত্রী তাঁদের পাশে এসে বসলেন। তিনিও বসে গল্পটা শুনতে লাগলেন। গল্পের মাঝামাঝি অপর দুই বন্ধু গল্পের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে মজা করা শুরু করলেন। প্রথম বন্ধু তাঁর গল্পটি শেষ করতে চাইছিলেন, কিন্তু অপর দুই বন্ধুর যত্নগায় তা পারছিলেন না। এমন সময় অপরিচিত যাত্রীটি দুই বন্ধুর একজনের দিকে ফিরে বললেন, 'দয়া করে কি ওনাকে গল্পটা শেষ করতে দেবেন? প্লিজ, আমাকে পরের স্টপেজে নেমে যেতে হবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো পরের স্টেশনে নেমে যাবেন, তবে আমাদের গল্পের শেষ পরিণতি কী হবে? নিচের গল্পটির মতো হবে না তো?

নিপাট পরিপাটি এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটি বাড়ির সামনে দরজায় ছোট একটি ছেলে বেল টেপার

আপ্রাণ চেপ্টা করছে, কিন্তু ঠিকমতো নাগাল পাচ্ছে না। আহা, বেচার! লোকটি এগিয়ে গিয়ে বেল টিপে দিলেন। হেসে বললেন, ‘কী ব্যাপার বাবু?’ বাবুটি বলল, ‘ব্যাপার গুরুতর, বাড়িওয়ালা দজ্জাল মহিলা। এই বুঝি দরজা খুলল, আপনি এবার বুঝুন, আমি পালাই।’ আবার আসিব ফিরে উকিল সাহেব বাড়ি ফিরেই বউকে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি করে সোনার গয়না, টাকাপয়সা, সব তোমার বাপের বাড়ি রেখে এসো।’ বউ অবাক হয়ে বললেন, ‘কেন?’ উকিল সাহেব বললেন, ‘আজ এক কুখ্যাত চোরের জামিনের ব্যবস্থা করেছে। সন্ধ্যার পর নাকি সে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসবে।’

সোনাডাঙ্গা মডেল থানা উদ্বোধন করতে গিয়ে পুলিশের আইজি বলেছিলেন, ‘যাঁরা হত্যা মামলার আসামিকে বাঁচাতে ২০ কোটি টাকা ঘুষ নেন, তাঁদের নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি।’ সেই দিন আবার ফিরে আসছে না তো? টিনচোর আর গমচোর এখন জামিনে বের হয়ে আসছে। কেউ অপেক্ষায় জেলখানায়, কেউ বা সীমান্তের বাইরে, তাঁদের একটাই অপেক্ষা। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো... আবার আসিব ফিরে।

কী ভয়ানক কথা! আমরা তখন কী করব? চাঁদা রেডি করব আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি লাইন ধার করব-তুমি কোন পথে যে এলে, এলে পথিক...। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২০, ২০০৮

18) পৃথিবীর সেরা চা - আনিমুল হক

চায়ের সঙ্গে আমি এখন আর দুধ-চিনি খাই না। ছোটবেলায় জানতাম, দুধ ছাড়া যে চা বানানো হয় সেটাকে র চা বলে। এখন দেখি সেটাকে বলে রং চা। তার মানে পৃথিবীতে হয় রং চা আছে, নয়তো রাইট চা আছে। ভালো চা-পাতা (নাকি পাতি) দিয়ে বানানো চা ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়, আহ, চা এসে গেছে। কী সুঘ্রাণ! একবার গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল চা বোর্ডের অফিসে, সেখানে গিয়ে শিখেছি, বাংলাদেশের চায়ের রং ভালো, দার্জিলিংয়ের চায়ের ভালো গন্ধ। আর ওই গন্ধটা নির্ভর করে আল্টিচুডের ওপরে, অর্থাৎ চা বাগানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উঁচুতে তার ওপরে। যা-ই হোক, বাঙালিরা

বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন, কয়েকটা দেশে
যাওয়ার সুযোগ নিজেও পেয়েছি, মোটামুটি নানা
দেশের নানা কোম্পানির চায়ের স্বাদই পেয়েছি।
দারজিলিংয়ে গিয়ে কেবল কারে চড়িনি, ভয়ে,
যদি ছিঁড়ে যায়, আমার ছোট্ট মেয়েটা পর্যন্ত
চড়েছিল, ডাঙায় ওদের জন্য অপেক্ষা করতে
করতে এক পাহাড়ি রমণীর বানানো চা
খেয়েছিলাম, সেই স্বাদ ভুলতে পারব না।
একবার, বহু বছর আগে, আমাদের
অকালপ্রয়াত সহকর্মী লতিফ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে
গিয়েছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে,
সেখানে নাট্যকার সেলিম আল দীন আমাদের
নিজ হাতে বানিয়ে খাইয়েছিলেন জেসমিন টি।
জাপানে গিয়ে খেয়েছি জাপানি চা, সেটা কিন্তু
আমরা যে চা খাই, একেবারেই সেটা নয়, তার
স্বাদটা অনেকটা সুপের মতো। এইবার আমি
বলব, আমার জীবনে খাওয়া শ্রেষ্ঠ চায়ের
গল্প। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা। আমার
বন্ধু সাকলাইন, বুয়েটের সিনিয়র ভাই মতিন
প্রমুখের সঙ্গে গেছি ক্যানবেরায়। বিকেলে
হাইকমিশনের মিলনায়তনে একটা অনুষ্ঠানমতো
হলো। বাংলা একাডেমি অস্ট্রেলিয়া তার
অন্যতম উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠান শেষে রাতের বেলা
আমরা হাজির হলাম জিনবিজ্ঞানী আবেদ
চৌধুরীর বাসায়। নৈশভোজ শেষে ভাবি
আমাদের হাতে তুলে দিলেন এক অপূর্ব অমৃত-
ধবধবে কাপে চমৎকার রঙের চা। পিরিচ হাতে
নেওয়ার আগেই নাকে এসে লাগল তার
সঞ্জীবনী সুঘ্রাণ। এক চুমুক দিয়ে বললাম, আহ,
এই তো পৃথিবীর সেরা চা। ভাবি হাসলেন।
কোথাকার চা জানেন? কোথাকার? কান খাড়া
করে বললাম। ভাবি সুনিত হাসি হেসে বললেন,
সিলেটের। সিলেটেও ভালো চা হয়। সাধারণত
মার্কেটে দেওয়া হয় না। সিলেটের বাগান থেকে
বেছে আনতে হয়। তা-ই হবে। আমার দেশ ছাড়া
এত ভালো চা আর কোথায় হবে? **সূত্রঃ** প্রথম
আলো, অক্টোবর ২৭, ২০০৮

19) কাক-বন্দনা

পাখি কার না ভালো লাগে। কিন্তু কারোরই প্রিয়
পাখির তালিকায় কাকের নাম নেই বললেই
চলে। কিন্তু হিমুভক্ত না হয়েও কাক আমার
পছন্দের শীর্ষে। কারণ, সৃষ্টিকর্তা যদি এই
প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব দিয়ে কাক না

পাঠাতেন, আর কাকেরা যদি মনোযোগ দিয়ে কাজটি না করত, তাহলে দেশটা মুহূর্তে দুর্গন্ধে ভরে উঠত। (আমি যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি, এটা কি বোঝা গেল?) অবশ্য কাককে পছন্দ করার আরেকটা শক্ত কারণ হলো, এর সাবান চুরি করার স্বভাব। আমার এক বড় ভাই একদিন আফসোস করে বলেছিলেন, দেশের কাকগুলোকে একটু অর্থনীতিতে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। কারণ জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, তিনি গোসলের জন্য পুকুরপাড়ে দামি সুবাসিত সাবান আর কম দামি কাপড় ধোয়া সাবান নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটি কাক তফাৎ না বুঝে কম দামি সাবানটিই নিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, বলুন তো, কাকের সাবান চুরি না করে উপায় কী? সারা দিন মনুষ্যসৃষ্ট ময়লা সাফ করে ওরা কি অপরিষ্কার অবস্থায় ঘরে ফিরবে? আমরা না বুঝে সাময়িক উত্তেজনার বশে কতই না বকাঝকা করে থাকি। আমরা যদি কাকদের জন্য ক্রো-বিউটি সোপ বানিয়ে দিতাম, তাহলে ওরা নামীদামি তারকাদের সাবান নিয়ে টানাটানি করত না। আর স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা কাকদের বরাবরই অত্যন্ত প্রবল। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে একটা মরা কাক জোগাড় করে বাড়ির বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখে দেখতে পারেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কাকেরা কিন্তু কাকের মাংস খায় না। আপনি চেষ্টা করেও খাওয়াতে পারবেন না। কথিত আছে, অতিরিক্ত লোভ করতে গিয়েই নাকি কাকদের রূপ হরণ করা হয়েছিল। কিন্তু একবার ভাবুন তো, কী অন্যায়! আমাদের জনদরদি নেতারা কি রিলিফের ডেউটিন চুরি করেননি? কই, তাঁদের চেহারার তো কোনো অবনতি দেখলাম না। কখনো কাকের চোখে চোখ রেখেছেন? একবার তাকিয়ে দেখুন না, কাকের ঘনকালো চোখে হারিয়ে যাবে মন। (একটু কাগজ-কলম হবে, প্লিজ, ভাব এসে গেছে, একটা কবিতা লিখতাম।)

যাঁদের সকালে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয় তাঁদের বলছি-আজই মোবাইল সেটটির রিং টোনে কাকের কা কা রব সেট করুন। যদি ব্যাটারি ভালো থাকে, তবে আপনার ঘুম ভাঙবেই ভাঙবে, কথা দিলাম। এদিকে কোকিলের ডিম সম্পূর্ণ বিনা খরচে কাকেরা ফোটাচ্ছে সেই আদিকাল থেকেই। কিন্তু সেই

ভবঘুরে কোকিলদের নিয়ে পাতার পর পাতা কবিতা-সাহিত্য লেখা হলেও তাদের বংশবৃদ্ধির ধারক কাকদের নিয়ে কোনো বন্দনাই নেই-এ নিছক পক্ষপাতিত্ব। ইদানীং কাকদের মধ্যে আঞ্চলিকতার ছাপ পড়া শুরু হয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, সিলেট শহরের কাকেরা নাকি আর কা কা করে ডাকছে না। সিলেটের আকাশে এখন খা খা রবে মুখর। দেশে জনসংখ্যা তো পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় শুধু ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট খেয়ে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দুর্গন্ধ বেড়েই চলেছে। তাই বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কথা উঠেছে, দু-তিনটা শিফটে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো যায় কি না। যদি কংসদে (কাকদের জন্য নির্দিষ্ট সংসদ) বিলটি পাস করানো যায়, তাহলে নিকট-ভবিষ্যতে দুর্গন্ধ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে কাকেরা আশাবাদী। মো. মাস্কুর রহমান

সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ২৭, ২০০৮

20) একহাত - শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

ছুটির দিন। দুপুর। রাজধানীর এক মহল্লায় রাস্তার ধারে এক মেসে খাওয়া শেষে বিছানায় শুয়েছে দুজন। এক বিছানায় রবিউল হক ওরফে রবি। আরেক বিছানায় দিদারউদ্দিন। যুবক রবি স্নাতকোত্তর শেষে চাকরির ধান্দা করছে। বছর তিনেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিচ্ছে সে। এত দিনে তার জুতার তলি তো গেছেই, চাঁদিও ফরসা হতে শুরু করেছে। এ জন্য মেজাজ প্রায় সারাক্ষণ তিরিক্ষি থাকে। দিদারউদ্দিন সরকারি চাকুরে। অবসর নিতে বেশি দেরি নেই। রবি তাঁকে সহ্য করতে পারে না। বুড়োর সঙ্গ মানে বুড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু কী করা? কপালের লিখন। বেকারত্বের কীট রবির সুন্দর স্বপ্নগুলো এক এক করে খেয়ে ফেলছে। এ যন্ত্রণায় সারা রাত ছটফট করে সে। ভোরের দিকে চোখ দুটো যেই ভারী হয়ে আসে, এ সময় খুট করে শব্দ। শব্দ তো নয়, যেন মাথার ওপর দশমণি হাতুড়ির বাড়ি! কে আর করবে? ওই দিদারউদ্দিন। অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চলতেই থাকে এই খুটখাট। এর মধ্যে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে যখন তিনি সালমার গান ধরেন, রবির তখন সিমির মায়ের মুখচ্ছবি কল্পনা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার

সময় পাশের বাড়ির সিমিকে চিঠি দিতে গিয়েছিল রবি। জানালা গলে যেই হাত বাড়িয়েছে, অমনি শিকারি বিড়ালের মতো খপ করে চিঠিসহ হাতটা ধরে ফেললেন সিমির মা। ওরে বাপ, তাঁর যে চাহনি। এখনো রবির জন্য তা রাগ দমানোর এক মোক্ষম দাওয়াই। আজ একটু আগে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট টেস্ট নিয়ে দিদারউদ্দিনের সঙ্গে রবির একচোট বাতচিত হয়েছে। দিদারউদ্দিনের মতে, মাশরাফির রান আউট দেওয়া ঠিক হয়নি থার্ড আম্পায়ারের। রবি ফস করে বলে উঠল, এত ভালো বুঝলে তো আপনিই আম্পায়ার হতেন। ব্যস, কথায় কথায় হয়ে গেল একচোট। শেষে দিদারউদ্দিন উপসংহার টানলেন, রবির বায়ুচড়া আছে। ফস করে জ্বলে ওঠে। এর সমাধান হচ্ছে উখিত পদাসন আর চিরতার পানি।

ঘটনা যখন এত দূর পৌঁছেছে, এমন সময় ঠকাস! সামনের রাস্তা থেকে সজোরে কিছু একটা লেগেছে দরজার ওপর। প্রথমে দিদারউদ্দিন ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। তারপর রবি। এক মিনিট স্থির হয়ে রইল দুজন। কিন্তু কৌতূহল মেটানোর আগ্রহ দেখা গেল না কারও। আবার দুজন গা এলিয়ে দিল বিছানায়। দুজনের চোখ যখন লেগে এসেছে, এমন সময় আবার ঠকাস! তড়াক করে উঠে বসল দুজন। সাধের ঘুম টুটে যাওয়ায় রবির চাঁদি গরম। এক ছুটে গিয়ে দরজা খুলল সে। দেখে, রোদ-ঝলমল রাস্তায় টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে একদল ছেলে। ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে তাদের বয়স।

রাগ দমাতে না পেরে চৈঁচিয়ে উঠল রবি, ‘এই পোলাপান, রাস্তায় খেলা কিসের? মাঠে যাও।’ এক ছেলে দাঁত বের করে বলল, ‘মাঠ নাই বইলাই তো রাস্তায় খেলতাছি।’

রবি বলল, ‘রাস্তায় খেলবা, ভালো কথা। এই দিকে যেন বল না আসে। আবার যদি দরজায় বল লাগে, খুব খারাপ হবে কিন্তু।’

দিদারউদ্দিন এর মধ্যে রবির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সব শুনলেন, দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ঘরে ঢুকে আবার শোয়ার আয়োজন করল দুজন। খানিক পর দুজন যখন গভীর ঘুমে ডুবতে যাবে, এমন সময় আবার

ঠকাস! একইভাবে আবারও জেগে উঠল দুজন। এবার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সবেগে ছুটে বের হলো রবি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটাতে লাগল, ‘ভালো কইরা বললে কথা কানে যায় না, না? গুডুম-গুডুম কিছু দিলে যাইব। শিগগির দূর হ। নইলে টেংরি ভাইঙ্গা হাতে ধরাইয়া দিমু।’ কিন্তু ছেলেদের মধ্যে ভয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং দু-তিনজন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, ‘ওই মিয়া, এত তেজ দেখান ক্যান? রাস্তা কি আপনার বাপের? পারলে দরজায় ফোম লাগান। শব্দ হইব না।’ এই বলে সবাই মিলে হি-হি হাসি।

পরাজিত রবি ফিরে এসে আপন মনে গজগজ করতে লাগল। দিদারউদ্দিন বললেন, ‘রাগ দেখিয়ে সবকিছু হয় না। বুদ্ধি লাগে।’ তেতে উঠে রবি বলল, ‘এখানে বুদ্ধির কী কাজ শুনি?’

‘শুনবে কী, তোমাকে আমি দেখাব।’

‘পারলে দেখান।’

পরদিন দুপুরে ছেলেরা যখন রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে এল, দিদারউদ্দিন গিয়ে মিষ্টি কথায় দুই মিনিটে তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেললেন। বললেন, ‘দেখো বাবারা, তোমাদের এ খেলা দেখে আমার শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমিও এমন করে ক্রিকেট খেলতাম। তোমরা যদি প্রতিদিন দুপুরে না খেলে বিকেলের দিকে খেলো, তাহলে অফিস করে এসে তোমাদের খেলা দেখতে পারব। এতে আমার দারুণ বিনোদন হবে।’

দিদারউদ্দিনের টোপ ঘপাত করে গিলে ফেলল ছেলেরা। তারা বলল, ‘এতে আমাদের কী লাভ?’

দিদারউদ্দিন বললেন, ‘এ জন্য তোমাদের প্রতি সপ্তাহে এক শ টাকা করে দেব।’

দিদারউদ্দিনের সঙ্গে চুক্তিমতো ছেলেরা পরদিন থেকে বিকেলে এসে খেলতে লাগল রাস্তায়।

রবিও বেঁচে গেল ঘুমের ব্যাঘাত থেকে।

দিদারউদ্দিনের ওপর থেকে সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে গেল তার।

কিন্তু দিদারউদ্দিন পড়লেন ফ্যাসাদে। প্রতি সপ্তাহেই ছেলেরা এসে এক শ টাকা করে নিয়ে যায়। এভাবে তিন সপ্তাহ পার হলো। চতুর্থ সপ্তাহে ছেলেরা এলে দিদারউদ্দিন বললেন,

‘বুঝলে বাবারা, আমার এক আত্মীয়ের ভয়ানক অসুখ। তার পেছনে এর মধ্যে অনেক টাকা ঢেলে ফেলেছি। এ সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকার বেশি দিতে পারব না।’

কিশোরেরা তা-ই মেনে নিল। পরের সপ্তাহে দিদারউদ্দিন ছেলেদের বললেন, ‘বাজারে জিনিসপত্রের দাম আরেক ধাপ চড়েছে। এ সপ্তাহে তিরিশ টাকার বেশি দিতে পারব না।’

ওরা তা-ই মেনে নিল। পরের সপ্তাহে দিদারউদ্দিন ছেলেদের বললেন, ‘তোরা শুধু টাকা টাকা করিস কেন? টাকাই সব নাকি। আমি একজন বুড়ো মানুষ। মুরব্বি হিসেবেও তো বিনোদন দিতে পারিস। তোদের কি মায়া-মমতা বলে কিছু নেই? এই নে, এবার ১০ টাকা নিয়ে যা। আর কিন্তু দিতে পারব না।’

টাকা না নিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ছেলেরা। ওদের দলপতি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, ‘কী যে কন, চাচামিয়া! ১০ টেকায় কি খেলা দেহান যায় নাকি? আমাগোর কি মানসসম্মান নাই? ওই, তোরা চল। দূর, এই রাস্তায় আমরা আর খেলুমই না।’ বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে

সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ২৭, ২০০৮

21) সম্পাদক সাহেবের অফিস - জেমস বার্নার্ড

নিউ ওয়েভ পত্রিকার নিজের কামরায় মুখে জোর করে একরাশ গান্ধীর্ষ টেনে বসে আছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব সম্পাদক সাহেব। কিছুক্ষণ আগে তাঁর এক বন্ধু এসেছিলেন। তিনি বেশ কিছু রসালো গল্প শুনিয়ে গিয়েছেন তাঁকে। চুইংগাম চিবুতে চিবুতে আপনমনেই সেই গল্পের জাবর কাটছিলেন তিনি। আর মাঝেমধ্যে আপনমনেই হেসে উঠছিলেন।

হঠাৎ তাঁর কামরায় এক তরুণের আবির্ভাব। দেখেই বোঝা যায়, ইনি একজন উঠতি লেখক। সংকোচ, লাজুক লাজুক মুখ আর চোখে ভীকু-সন্ত্রস্ত চাউনি। হাতে রোল করা একগুচ্ছ কাগজ। সম্ভবত স্বহস্তে রচিত গল্প, উপন্যাস অথবা কবিতার পাণ্ডুলিপি। এ পত্রিকায় ছাপানোর বাসনা নিয়ে সঙ্গে করে এনেছেন। এমনভাবে লেখাটি ধরে আছেন তিনি, যেন ওটা একটা সদ্য ফোটা গোলাপ, যা অতিসাবধানে তুলে এনেছেন প্রিয়াকে উপহার দেওয়ার জন্য। তরুণটিকে দেখামাত্র টেবিলে রাখা ফাইলে

গভীর মনোনিবেশ করলেন তিনি। তিনি এখন কাজে খুব ব্যস্ত-এটা বোঝানোর চেষ্টা।

জলজ্যন্ত তরুণটি তাঁর নজরেই পড়ল না। তাই সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আশ্তে করে গলা খাঁকারি দিলেন তরুণ। তারপর একটু উশখুশ করে সামনের টেবিলে ইচ্ছে করে দুইবার গুঁতোও দিলেন তিনি। কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত কাতর কণ্ঠে তোতলাতে তোতলাতে তরুণ বললেন, ‘একটা গল্প এনেছিলাম, যদি দয়া করে দেখতেন...। এর আগে আমি দু-চারটা অন্য ম্যাগাজিনেও লিখেছি...।’

সম্পাদক সাহেবের দৃষ্টি যেমন ফাইলে ডুবে ছিল তেমনি রইল। শুধু মুহূর্তের জন্য বাঁ হাতের আঙ্গুলটা উল্টে ‘কচু’ দেখানোর ভঙ্গি করলেন। আসলে তিনি ওই ঘরের মধ্যে বসে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন নিঃশব্দে।

কাঠপেনসিলের মতো সরু এক ভদ্রলোক সম্পাদকের আঙ্গুল বরাবর আয়েশ করে চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছেন। তাঁর সামনের টেবিলে পড়ে আছে বিশাল আকৃতির এক খাতা। হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে বিশাল ওই খাতাটায় তরুণের নাম-ধাম চটপট তুলে নিয়ে বললেন, ‘এখন আপনি আসতে পারেন।’

‘আমি আবার কবে আসব?’ আমতা আমতা করে বললেন তরুণ। চোখে মিনতি ঝরে পড়ল তাঁর।

‘আর আসতে হবে না আপনাকে। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানাব।’

এ জানানোটা যে কী আর ওই বিশাল আকারের খাতাটি যে কী ভয়ঙ্কর, তরুণ তা খুব ভালো করেই জানেন।

এরপর একে একে আরও তিন তরুণ ঢুকলেন সম্পাদকের কামরায়। তিনজনই পরপর নিস্তেজ-নিষ্প্রাণ হয়ে বেরিয়ে এলেন। দৃশ্যপটে প্রথম তরুণের আবির্ভাব ঘটল পুনরায়। জমা দেওয়া লেখাটির ব্যাপারে জানতে এসেছিলেন বোধহয়। কিন্তু চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখে চুরমার হয়ে গেল তাঁর ভেতরটা। হয়েছে কি, সম্পাদক সাহেবের টেবিলে চা রাখতে গিয়ে ছলকে পড়ল খানিকটা। সহকারী সাহেব মহা বিরক্ত হয়ে হাতের কাছে মোছার মতো কিছু না পেয়ে তরুণটির সাধের লেখাটি থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিলেন। তারপর টেবিলটা মুছে

টেবিলের নিচের ওয়েস্টপেপারের বক্সে ফেলে দিলেন। বাকিটুকুর কী হাল হবে বুঝতে দেরি হলো না তরুণের।

কিছুক্ষণ পর কামরার দৃশ্যপটে আবার পরিবর্তন এল। দৃশ্য পরিবর্তনের কারণ সুদর্শনা এক তরুণীর আবির্ভাব। তার সুগন্ধির সৌরভে ঋষির ধ্যান ভাঙল যেন। সম্পাদকের জমাটবাঁধা বিরক্তি মুহূর্তেই বরফের মতো গলে পানি হয়ে গেল। কান পর্যন্ত বিস্তৃত দেঁতো হাসিতে আর চকচকে আগ্রহী চোখে সাদর অভ্যর্থনায় তরুণীকে বসতে দিলেন তিনি।

তরুণীটি একটু হেসে সম্পাদক সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ‘একটা লেখা এনেছিলাম।’

‘অবশ্যই! আপনার মতো তরুণীদের ভালো লেখার জন্যই এতকাল আমি অপেক্ষা করছি।’ সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তরুণীর হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটি নিলেন। পাতা উল্টে দু-একটা লাইনে চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘ওহ, চমৎকার! অপূর্ব! আমার নিউ ওয়েভ পত্রিকার ক্রিসমাস সংখ্যাতেই ছাপাব এটি।’

সম্পাদকের অতি উচ্ছ্বাস দেখে অবাক তরুণী বললেন, ‘মাত্র দু-এক লাইনে চোখ বুলিয়ে কী করে বুঝলেন যে লেখাটি ভালো হয়েছে?’

‘আরে, আমি জল্পরি। আমি না চিনলে কে চিনবে বলুন!’

অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তরুণীটি উঠতে যাচ্ছিলেন। সম্পাদক সাহেব অনুরোধ করে তাঁকে আবার বসালেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে এক কাপ স্পেশাল চা আর ডাবল ডিমের পোচ আনতে বললেন। তরুণী লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘আবার এসব কেন।’

‘আরে, কী বলেন আপনি! আপনার মতো একজন লেখককে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব ভেবেছেন?’ তরুণীটি তখন হঠাৎ বললেন, ‘আপনি আমাকে লেখিকা ভেবেছেন বুঝি? এটা আমার লেখা নয়। এটা আমার বাবার লেখা!’

এ কথা শুনেই জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মুখের অবস্থা হয়ে গেল সম্পাদকের। তেতো ঢোক গিলে বললেন তিনি, ‘তা বাবার লেখা আপনি নিয়ে এসেছেন কেন?’

একটু যেন লজ্জা পেয়ে তরুণী বললেন, ‘বাড়িতে বিয়ের কারণে বাবা ব্যস্ত। আর তাঁকে

না জানিয়ে তাঁর লেখাটি পত্রিকায় ছাপলে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে তাঁকে।’
একরাশ বিষাদ নিয়ে সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ‘ও, বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত? তা কার বিয়ে?’
তরুণীটি লাজুক হেসে বললেন, ‘আমার!’
সম্পাদক সাহেব যেন বোবা হয়ে গেলেন।
নিস্তব্ধতা ভেঙে তরুণী বললেন, ‘লেখাটা একনজরে যখন আপনার এত পছন্দ হয়েছে, তখন ক্রিসমাস সংখ্যায় না হোক, পরবর্তী সংখ্যায় নিশ্চয়ই ছাপাবেন। কিন্তু আমি আর আসতে পারব না।’

‘কেন? আপনি কোথায় যাবেন?’
‘বিয়ের পরই বন থেকে হানিমুনে সুইজারল্যান্ড...তারপর রিভিয়েরা...।’
এমন সময় বেয়ারা এসে জানালেন, ‘স্যার, ক্রিস্টোফারের ডিমের অমলেট ভাজতে নাকি একটু দেরি হবে। ডিম নাকি ফুরিয়ে গেছে। তাই আনতে পাঠিয়েছে। তা এখন শুধু স্পেশাল চা-ই নিয়ে আসব? পরে নাহয় আনা যাবে ওটা...।’
খঁকিয়ে উঠে সম্পাদক সাহেব বললেন, ‘যা এখান থেকে, কিছুই আনতে হবে না। যা, ভাগ!’
রূপান্তরঃ শারমীন আফরোজ

সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ২৭, ২০০৮

22) হ্যামিলিনের মেলামিনওয়ালা

অনেক কাল আগের কথা। হ্যামিলিন শহরের মানুষের মনে কোনো সুখ ছিল না। সুখ থাকবে কী করে, হ্যামিলিনের ফুটফুটে সব শিশু-কিশোরের মনেই যে দুঃখ। সবার দুঃখের একটাই কারণ-শহরের সব গুঁড়োদুধে পাওয়া গেছে ক্ষতিকর মেলামিন। দুধ খাওয়াতে না পেরে তাই সব মা-বাবাই চিন্তিত। অন্যদিকে শিশুরা প্রথমে খুশি হয়ে ভেবেছিল-যাক, বিরক্তিকর দুধ আর খেতে হবে না। কিন্তু কয়েক দিন পরই তারা বুঝতে পারল, ‘দুধ’ খাবার হিসেবে আসলে ততটা খারাপ না! কিন্তু এখন বুঝতে পেরেই বা কী লাভ? মেলামিনের কারণে তো আর দুধ খাওয়া যাবে না। যেসব দুধে মেলামিন আছে, কর্মকর্তারা প্রথমে সেগুলো নিষিদ্ধ না করলেও সবার চাপে এখন মোটামুটি সব দুধই নিষিদ্ধ। ওদিকে দুধ খেতে না পেরে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। ফলে কারও মনে শান্তি নেই।

হ্যামিলিন শহরের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নগরকর্তাদের

নিয়ে বৈঠকে বসেছেন। কিন্তু বৈঠক করে কী হবে? মেলামিন তাড়ানোর কোনো উপায় কেউ বলতে পারল না। সবাই যখন হতাশ, তখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অদ্ভুত-দর্শন লম্বা এক লোক। তারপর সেলাম ঠুকে বলল, ‘আমি চাইলে হ্যামিলিনের সব দুধ থেকে সব মেলামিন ভ্যানিশ করে দিতে পারি।’

সবাই প্রথমে তাচ্ছিল্য করলেও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ভাবলেন, যদি সত্যি ও পারে, তাহলে মন্দ কী! তিনি বললেন, ‘কীভাবে?’

‘সেটা আমার ব্যাপার। তবে বিনিময়ে আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে।’

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা চমকে উঠলেন। বললেন, ‘বাপু, এটা শায়েস্তা খাঁর আমল পেয়েছ নাকি? তোমাকে বড়জোর ৫০০ টাকা দিতে পারি।’ কিন্তু লোকটি অনড়। তাই সবাই পাঁচ লাখেই রাজি হলো।

লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে তার ঝোলা থেকে একটি লম্বা সুন্দর বাঁশি বের করে বাজাতে লাগল। অমনি সবাই অবাক হয়ে দেখল- হ্যামিলিনের সব ফ্যাঙ্টরি থেকে, এর-ওর বাসা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো কী সব বের হয়ে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। সবাই বুঝল, এগুলোই মেলামিন। খালি চোখে দুধের সঙ্গে যে মেশানো তা বোঝা যায় না। মেলামিনের গুঁড়োগুলো লোকটির পেছন পেছন যেতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছে কোটি কোটি পিঁপড়া যাচ্ছে। তারপর লোকটি সব মেলামিনের গুঁড়ো পানিতে ফেলে দিল। সবাই খুব খুশি হলো।

লোকটি ফিরে এসে তার পাঁচ লাখ টাকা চাইলে সবাই খুব হাসাহাসি করল। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বললেন, ‘বাপু, শ পাঁচেক টাকা নিলে নাও, নয়তো ভাগো।’

এই বেঈমানি বাঁশিওয়ালা সহ্য করল না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আরেকটি বাঁশি বের করে বাজাতে লাগল। অদ্ভুত তার সুর। সেই সুরে পাগল হয়ে সব শিশু বের হয়ে বাঁশিওয়ালার পেছন পেছন ছুটতে লাগল। বাঁশির সুরে সবাই মোহিত হয়ে থাকায় কেউ বাধাও দিতে পারল না। বাঁশিওয়ালা তাদের ওই দূরপাহাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টার মুখে হাসি দেখা গেল, ‘যাক বাবা, ঝামেলা গেল!’

‘ঝামেলা গেল মানে?’ সবাই অবাক হলো।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বললেন, ‘এখন কোনো শিশুই নাই। অতএব শিশুখাদ্যেরও দরকার নাই। দুধে মেলামিন থাকুক আর স্টিল থাকুক-তাতে কী আসে-যায়? খাওয়ার মানুষই তো নাই!’ মহিতুল আলম পাভেল

সূত্রঃ প্রথম আলো, নভেম্বর ১৭, ২০০৮

23) আন্দালুশিয়ান দ্বন্দ্বযুদ্ধ

সেইন্ট অ্যানার চেনা এক সরাইখানায় যাওয়ার পথেই হাঁটছিল দুজন। তাদের হাঁটার ভঙ্গিই বলছিল তারা স্থানীয়।

চওড়া রাস্তার মাঝ বরাবর হাঁটা লম্বা লোকটাকে বেপরোয়া দেখাচ্ছিল। মাথায় চওড়া কানওয়ালা টুপি। তাতে তার জমানো পাপের মতো নিকষ কালো রঙের রিবন। গায়ে আলখেল্লা, পায়ে রাখালদের জুতা আর আটো পায়জামা। চুল কোঁকড়ানো। জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে চোখ। লম্বুর বেশভূষা দেখে দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল সে ওই সব লোকের প্রতিনিধি, যারা শিকারে গিয়ে শুধু ঘোড়াকে খাটিয়ে মারে। কিন্তু কোনো শিকার ধরতে পারে না। অকর্মার ধাড়ি!

হাঁটতে হাঁটতে দুজন সরাইখানাটায় ঢুকল।

ওদের পিছু পিছু ঢুকে পড়লাম আমিও। ওরা পান করছিল। ওদের নাম অলিভার বালবেসা ও রোনাল্ড পালপেট।

ওরা যেন আমাকে দেখতে না পায় সে জন্য দ্রুত চেয়ারে বসে পড়লাম। ওরা অবশ্য ফিরেও তাকাল না। বুঝি ভাবল, তারা দুজন ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। লম্বু, মানে অলিভার তার সঙ্গীকে বলল, ‘পালপেট, এখন আমরা হাতে ছুরি নিয়ে দুজন দুজনের মুখোমুখি হব। তুমি ওদিকটায় আর আমি এদিকটায়, ঠিক আছে? তার আগে এসো আরেকটু পান করি আর গান গেয়ে নিই।’

রোনাল্ড মেঝেতে থুথু ফেলে বলল, ‘বালবেসা, হয়তো কিছুক্ষণ পর তোমার ছুরির ফলায় আমি মারা যাব, কিন্তু আমি লা গরসার মতো ভীতু নই। চলো, আরেকটু পানীয় হোক। তারপর রক্ত... রক্তের লড়াই হবে...।’

গ্লাস ঠোকাঠুকি করে ওয়াইন পান করে উঁচু স্বরে গান শুরু করল তারা। শরীর থেকে আলখেল্লা খুলে এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলে খাপ খুলে ছুরি বের করল। নগ্ন ছুরিগুলো আলোয়

ঝকমকিয়ে উঠল। এই ছুরি দিয়ে তারা একজন আরেকজনকে আঘাত করবে! ছুরি দেখে মনে হলো, ওগুলো যুদ্ধের চেয়ে চোখের ছানি অপারেশনের জন্য বেশি উপযুক্ত।

দুজন বেশ কয়েকবার ছুরি চালান। কিন্তু কেউ কাউকে লাগাতে পারল না। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিই ঘটছিল।

হঠাৎ পালপেট হাত তুলল। তারপর হাঁসফাঁস করে বলল, ‘বালবেসা, বন্ধু আমার! প্লিজ, আমার মুখে মেরো না। আমি কুৎসিত হতে চাই না।’

‘ঠিক আছে।’

‘পেটেও মেরো না। এইমাত্র যা পান করলাম তা এখনো হজম হয়নি।’

‘ঠিক আছে, ওপরের দিকেই মারব।’

‘আমার বুকের দিকেও একটু খেয়াল করো।

ওটা সব সময়ই যে একটু দুর্বল, তুমি তো জানোই।’

‘তাহলে আমাকে বলো, আমি তোমাকে কোথায় আঘাত করব?’

‘আমার বাঁ হাতে একটা টিউমার আছে। সেখান থেকে তুমি ইচ্ছামতো মাংস কেটে নিতে পার।’

‘এখানে ওসব ফাঁকিবাজি চলবে না...’, এ কথা বলেই বালবেসা তীরের মতো ছুটে গেল পালপেটের দিকে। তীব্র যুদ্ধ শুরু হলো আবার।

কিন্তু কেউ কারও এক টুকরো চামড়া ছিলতে পারল না। এদিকে সরাইখানার মালিক গায়ের সব শক্তি দিয়ে গিটারে সুর তোলার চেষ্টা করছিল।

ঠিক এ সময় ২০-২২ বছরের একটি মেয়ে সরাইখানায় এল। তাকে দুঃসাহসী আর একই সঙ্গে সুন্দরী বলেই মনে হলো। তার পায়ের মোজা ও জুতা পরিচ্ছন্ন। কোমরে ছোট কালো স্কার্ট বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই সরাইখানার মালিক গিটার সরিয়ে রাখল।

সরাইখানার মালিককে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। বালবেসা ও পালপেট মেয়েটিকে আসতে দেখে প্রথমে বিরক্ত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যৎ পুরস্কারের লোভে তারা আক্রমণ আর লাফালাফি বাড়িয়ে দিল। তার পরও কেউ কারও একটা চুলও ছিঁড়তে পারল না।

মেয়েটির নাম ডোনা গরসা। সে নারীসুলভ আনন্দ নিয়ে দৃশ্যটা দেখল। কিছুক্ষণ পর তার ভ্রু কুঁচকে গেল। সে তার কমণীয় কান থেকে কোনো ফুল বা দুল নয়, একটা সিগারেটের টুকরো বীর যোদ্ধাদের দিকে ছুড়ে মারল। যুদ্ধ থামিয়ে দুজনই গরসার সামনে এসে দাঁড়াল। গরসা দৃঢ়ভাবে বলল, ‘এটা কি আমার জন্য খুব ভালো হচ্ছে?’

বালবেসা ও পালপেট হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘তোমার জন্য কে উপযুক্ত? আমি না হলে, কেউই না...’

‘শোনো! এ ধরনের কোনো চুক্তি বা চাপাচাপিতে আমি বিশ্বাস করি না। অর্থহীন কিছু করি না আমি। তোমরা যদি আমার জন্য যুদ্ধ করে থাক, তাহলে তোমরা ভুল করছ। আমি তোমাদের কাউকেই ভালোবাসি না। জাফরার মিনগালারিওসকে আমি পছন্দ করি। সাহস থাকলে আমার হবু বরের সঙ্গে লাগতে এসো, বিদায়।’ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যেভাবে সরাইখানায় ঢুকেছিল, সেভাবেই বেরিয়ে গেল সে।

দুই যোদ্ধা তার চলে যাওয়া পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল। ছুরিতে রক্ত লেগেছে, এমন ভাব করে ছুরি মুছে প্রায় একসঙ্গে যার যার খাপে ভরে ফেলল। একই সঙ্গে দুজনই বলে উঠল, ‘মেয়েদের জন্য পৃথিবী হারিয়ে গেলে বা মেয়েদের জন্য স্পেন হারিয়ে গেলেও কেউ কোনো দিন জানতে পারে না। এর জন্য কোনো কবিতা লেখা হয় না। এমনকি কোনো অন্ধ ভিক্ষুক এটা নিয়ে কোনো গান গায় না। কোনো বাজারে বা জনসভায় এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। অথচ দেখো, দুজন সাহসী মানুষ তাদের প্রেমিকার জন্য একজন আরেকজনকে খুন করতে যাচ্ছিল!’

হাত ধরে কথা বলতে বলতে রাস্তায় নেমে এল দুজন। পৃথিবীতে ওরা একজন আরেকজনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমাকে ফেলে রেখেই ওরা ওদের পথে চলে গেল।—সেরাফিন এস্টেবানেস কালদেরনরুপান্তরঃ শারমীন আফরোজ সেরাফিন এস্টেবানেস কালদেরনঃ জন্ম-২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৯, মৃত্যু-৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭। স্প্যানিশ কবি ও লেখক। তিনি এল সলিতারিও ছদ্মনামে বেশি পরিচিত ছিলেন। স্পেনের

মালাগায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ‘এসসেনাস আন্দালুসাস’ তাঁর সেরা কাজ বলে ধরা হয়।

সূত্রঃ প্রথম আলো, নভেম্বর ১৭, ২০০৮

24) আমি আসলে তানিয়ার বর - এস আই টুটুল

যত বড় মিউজিশিয়ান হোন না কেন, আমৃত্যু একজন এস আই হয়েই থাকতে হবে টুটুলকে।
জীবনে আপাতত বোধহয় তার এর চেয়ে বড় কোনো দুঃখ নেই। গান গেয়েও চেষ্টা করেছেন এস আই থেকে ওসি, এমনকি আইজি হওয়া যায় কি না। কিন্তু হয়নি। রস+আলোকে এ রকম নানা ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ কথা শুনিয়েছেন এস আই টুটুল। আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ কী?

-সারা জীবন এস আই রয়ে গেলাম। ওসি, এসপি কিছুই হতে পারলাম না।

নিজের ভাষাকে কেন মাতৃভাষা বলা হয়?

-বাবারা কথা বলার সুযোগ পান কোথায়?

একটা সিরিয়াস প্রশ্ন করব। আলোচনার শুরুতেই করে ফেলি। বলুন তো, পাক-ভারত স্বাধীনতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কোথায়?

-চুক্তিপত্রের একদম নিচের দিকে।

এ মুহূর্তে কী ভাবছেন?

-পূর্বজন্মে কোন পাপটা করেছিলাম! যে আমাকে রস+আলোর আলোচনে বাছাই করা হলো?

কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে...আপনার হয়েছে কোনটা?

-ভাবার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

কেউ একজন আপনার খুব ভক্ত। বলল যে এস আই টুটুল হতে চায়। তাকে আপনি কী বলবেন?

-বলব, দেখেন ভাই, কোর্টে গিয়ে নাম

অ্যাফিডেবিট করলেই হতে পারবেন। তবে তাঁর প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, তিনি যেন আইজি টুটুল নাম রাখেন। তাতে প্রমোশনের ফ্যাকড়াটা আর থাকল না আর-কি!

‘প্রেমের মরা জলে ডোবে না...’ কেন?

-সাঁতার জানে মনে হয়।

ধরুন, একদিন স্বপ্নে দেখলেন আপনি হুমায়ূন আহমেদ হয়ে গেছেন। তখন কী করবেন?

-ঘুমিয়েই থাকব স্বপ্নের বাকিটা দেখার জন্য, যেখানে হুমায়ূন আহমেদ স্যার টুটুল হয়ে যাবেন। নইলে তো নাটকে গান গাওয়াতে পারব

না।

আপনি আসলে কে?

-এস আই টুটুল। তানিয়া আহমেদের বর।

যায় দিন... যায় একাকী...

-আরে! কী বলে? তানিয়া নাই নাকি?

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই মানুষ টাকার পেছনে ছোটে। টাকা দিয়ে আসলে মানুষ কী করে?

-খরচ করে, জমায় আর ধার দেয়।

প্রেমে পড়লে প্রত্যেকেই কবি হয়, আর...

-টয়লেটে গেলে সবাই গান গায়।

মেয়েরা আসলে...

-কম্পিউটারের মতো। স্টার্ট নিতেও দেরি

করে। আবার হ্যাং হয়ে যায় বারবার।

আপনার ভালো লাগে না এমন একটি বিষয় বলুন।

-ইংরেজি ভাষা। কোনো নিয়মকানুন নেই।

‘হাসি’র ইংরেজি ‘লাফ’। অথচ হাসাহাসির

ইংরেজি লাফালাফি না। দূর! **সূত্রঃ** প্রথম আলো, নভেম্বর ১৭, ২০০৮

25) এক আড্ডায় - আহসান হাবীব

ইদানীং সর্বত্র উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। টু বি অর নট টু বি...কী হবে আর কী হবে না-আশা করি পাঠক ইতিমধ্যেই আন্দাজ করেছেন। ‘হোক আর না হোক, আমরা প্রস্তুত...’ এক আড্ডায় একজন আমাকে জানালেন।

-কিসের জন্য প্রস্তুত?

-কেন, আগুলে অমোচনীয় কালি লাগানোর জন্য?

-কিন্তু আমি পৃথিবীর কোনো মানুষকেই কোনো বিষয়ে ভোট দিতে রাজি নই। এক নিরাশাবাদী মন্তব্য করে বসে।

-এটা আবার কেমন কথা! তাহলে কাকে ভোট দেবেন?

-কেন, উটকে!

-উটকে!! উটকে কেন? যুক্তি কী? আমি জানতে চাই।

-কারণ, উট কোনো খাওয়াদাওয়া না করে সাত দিন কাজকর্ম করে যেতে পারে। আর মানুষ...এক সপ্তাহ (কিংবা তারও বেশি) কাজকর্ম না করেও দিব্যি খাওয়াদাওয়া করে যেতে পারে। এখন আপনিই বলুন...?

-আচ্ছা দুই নেত্রী কি আলোচনায় বসবেন?

আরেকজন আশাবাদী জানতে চায়।

-বসলে আমাদের কী? আমরা তো সব সময়
অন্ধকারে।

-তঁরা আলোচনায় বসলে কী কথা বলবেন?

-সেটা আমরা কখনোই জানতে পারব না।

জানতে জ্যোতিষ লাগবে।

-আমার বাবা ভালো জ্যোতিষ। আড্ডার
কনিষ্ঠতম শিশুটি হাত তোলে। যেন এটা একটা
স্কুল।

-তোমার বাবা জ্যোতিষ?

-হ্যাঁ।

-হ্যাঁ না, বলো জি। আরেকজন কার্টিসি
শেখানোর চেষ্টা করে বাচ্চাটিকে।

-কীভাবে বুঝলে? আমি জানতে চাই।

-তিনি যা বলেন তা ফলে যায়।

-কী রকম?

-এই তো ছয় মাস আগে তিনি বলেছিলেন আমি
ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করব। আমি ফেল
করেছি।

আমরা সবাই ভাবলাম উচ্চ স্বরে হেসে উঠি।

কিন্তু হাসলাম না। হাসি সব সময় সংক্রামক
নয়। তবে এ সময় আমাদের অবাক করে
একটি কুকুর ঢুকে গেল আমাদের এই অসংলগ্ন
আড্ডায়। ‘কুকুর! কুকুর!!’ কেউ কেউ চৈতাল।

-কুকুরকে ভয়ের কিছু নেই

-কুকুর মানুষের বন্ধু।

কিন্তু আড্ডার কনিষ্ঠতম শিশুটি যে দাবি করে
তার বাবা জ্যোতিষ, সে ফের চৈতিয়ে উঠল
ভয়ে।

‘না না, ভয়ের কিছু নেই।’ সবচেয়ে বয়স্কজন
তাকে সাহস দেয়। ‘...ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ও
তোমায় খেয়ে ফেলবে না।’

-খাওয়া শুরু করেনি কিন্তু চেখে দেখতে শুরু
করেছে! শিশুটি বলে।

কে জানে, হয়তো আমরা সবাই এখন ‘চাখার’
পর্যায়ে আছি ... টু বি অর নট টু বি ...!! সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৪, ২০০৮

26) অলটাইম পজিটিভ যারা -

ইকবাল খন্দকার

চারদিকে হতাশা আর নেগেটিভের ঢেউ এরই
মধ্যে সব সময় পজিটিভ কেউ কেউ-ঘটক
থাকুক মেয়ের হাজার খুঁত
দেখতে সে হোক জংলি ভূত,
তবু মেয়ে ভালো

এমন কথা বলবে ঘটক
মুখটা করে আলো। চাপাবাজ
না থাক পেটে ভাতের দানা
বলবে তবু খেলাম খানা
হোটেল সোনারগাঁয়,
ছোটখাটো হোটেলে কি
ডিনার সারা যায়? মডেল
পণ্যটা হোক মস্ত বাজে
নাই বা লাগুক কোনো কাজে
বলবে মডেল তবু-
এমন ফাটাফাটি জিনিস
আসেনি আর কভু। হাতুড়ে ডাক্তার
মরুক রোগী ধুঁকে ধুঁকে
ওষুধ তিনি দেবেন টুকে,
বলবেন আবার এই
এবার রোগী উঠবে সেরে
সমস্যা আর নেই। বাসের হেলপার
পিঁপড়ে ঢোকার না থাক ঠাই
তবু তারা বলবে-ভাই,
বাস পুরোটা খালি
যাত্রী টেনে তুলবে বাসে
দিন না যতই গালি। ক্ষমতাসীন নেতা
দেশের মানুষ ক্ষুধায় মরুক
বুক ফাটিয়ে কান্না করুক
বলেন তিনি হেসে,
উন্নয়নের জোয়ারে দেশ
যাচ্ছে নাকি ভেসে। কোচিংওয়ালা
ছাত্র যতই হোক না গাধা
তবু ও চান্স পাবে দাদা
গ্যারান্টিটা পাকা
শিওর থাকেন-চান্স না পেলে
ফেরত পাবেন টাকা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম
আলো, নভেম্বর ২৪, ২০০৮

27) একটি কাল্পনিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

দাঁড়িয়ে না থেকে আসুন বসি
মেহেদী আল মাহমুদ ও তাওহিদ
মিলটন খালেদাঃ আরে, হাসিনা আপা যে! কেমন
আছেন?
হাসিনাঃ আল্লাহ, এ যে দেখি খালেদা ভাবি!
আমি ভালো। ভাবি, আপনি কেমন আছেন?
খালেদাঃ আর ভালো থাকি কেমনে, আমাদের
রাখল সাব-জেলো! সেই দুঃখে-অপমানে মনে
হয়, বাকি জীবনটাই খারাপ যাবে। কত ছোট

নেতা-পাতি নেতার পূর্ণাঙ্গ সেলে জায়গা হলো, আর আমাদের জায়গা হলো সাব-জেলে! এর পরও আপা, আপনি ভালো থাকেন কীভাবে! হাসিনাঃ ভাবি, ওই কথাটা মনে করায় দিয়েন না, বুকটা হাহাকার করে।

খালেদাঃ ইচ্ছা ছিল, এরশাদ সাহেবের লাগানো বরইগাছ থেকে লবণ-মরিচ দিয়ে কয়েকটা বরই খাব। আহা রে! জেলে এমন একটা বরইগাছ লাগানোর আমারও কত দিনের শখ! আমরা না পারি, আমাদের যোগ্য বংশধরেরা তো ছিল। তারা একদিন নিশ্চয় সেই বরই খেতে পারত। হাসিনাঃ ভাবি, আপনি দেখি এখনো দেশি বরইয়ের কথা বলছেন! আরে এখন আপেলকুল না কী সব হাইব্রিড বরই বের হয়েছে না! এক বছরেই বাম্পার ফলনসহ বরই ধরে। খুব নাকি মিষ্টি।

খালেদাঃ বলেন কী! তাই নাকি! ইস্, কত বড় সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

হাসিনাঃ বাদ দেন ওই সব। পুরানা কথা বলে আর কষ্ট বাড়িয়ে কী লাভ! তা ভাবি, জেলে আপনার খাবার আসত কেমনে?

খালেদাঃ আমার জন্য তো টিফিন ক্যারিয়ারে করেই কোথেকে যেন খাবার রঁধে নিয়ে আসত।

হাসিনাঃ কোথেকে নয়। ওরা একচুলায় খাবার রঁধে দুই টিফিন ক্যারিয়ারে করে আমাদের জন্য নিয়ে আসত। জেল থেকেই ওরা আমাদের একত্র করার পরিকল্পনা করছে, বুঝলেন?

খালেদাঃ এত কষ্ট না করে আমাদের এক কক্ষেই রাখলে পারত। আমরা কি বলেছি আমরা আলোচনা করতে চাই না?

হাসিনাঃ ঠিক, তাহলেই বোঝেন এক বছর টানা আলোচনা করার সুযোগটা পেলে দেশের জন্য কত কিছুই ভাবতে পারতাম। সাথে কি আর বলছি, দেশ ও জাতির বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে।

খালেদাঃ তা আপা, আপনি নির্বাচনে যাওয়ার জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন? দু-চার দিন সবুর-টবুর করলে কী এমন ক্ষতি হয়! মনে হচ্ছে পারফরমেন্স খুবই ভালো যাচ্ছে আপনার? আমরা চার দল মিলে চারটা দফা দিলাম আর আপনি চৌদ্দ দল মিলে একটা দফাও দিতে পারলেন না!

হাসিনাঃ কী যে বলেন না ভাবি! এই বয়সে

আবার পারফরমেন্স! আর কদিনই বা বাঁচব।
তাই দফাটফা আর দিতে চাই না। এ ছাড়া শীত
আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে চাইছি।
শীতে বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি সহ্য হয় না।
খালেদাঃ শীতে আমারও সহ্য হয় না। কিন্তু
জেল থেকে বের হয়ে এখনো কাপড়চোপড়ই
তো ঠিকমতো কেনা হয় নাই। নির্বাচন করব
কি, কয়টা ভালো শাড়ির অর্ডার দিছি বাইরে।
ওগুলো এলেই নির্বাচনে নেমে যাব
ইনশাআল্লাহ। দফা দিবেন না ক্যান? মূল
রহস্যটা কী, কোনো গ্রিন সিগনাল পাইছেন?
হাসিনাঃ না, সেদিন রাতে স্বপ্নে দেখছি। দেশ
নিয়া আর এভাবে ছেলেখেলা খেলতে মন চাইছে
না। ক্ষমতা কয় দিনের। হয় আপনি থাকবেন,
নাহয় আমি। কিন্তু দেশ তো আমাদের এই
একটাই।

খালেদাঃ আমিও তো ইদানীং প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।
অনেক ভালো ভালো স্বপ্ন। আমারও মাঝেমাঝে
সত্যি সত্যি দেশ নিয়া কিছু একটা করার জন্য
মনটা আকুপাকু করে ওঠে। আসেন, আমরা
দুজন মিলে এবার দেশটাকে বদলে ফেলি।
হাসিনাঃ তার আগে বলেন, জামায়াত কি
এবারও আপনাদের সঙ্গেই থাকবে?
খালেদাঃ আর বইলেন না আপা, এমন শক্ত
আঁঠা জীবনে দেখি নাই। সত্যি কথা বলতে
আপা, ওরা কিন্তু মাঠে ভালোই খেলে। ২০০১-
এর নির্বাচনে ওরা আমাদের হয়ে না খেললে
তো আপনারাই কাপ নিয়া যাইতেন।
হাসিনাঃ আসেন আমরা আর কাপের চিন্তা না
করে দেশটাকে নিয়া চিন্তা করি।

খালেদাঃ একাত্তরে তো আপা আমরা-আপনারা
কেউ আলাদা ছিলাম না। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাক
দিল, আপনার ভাই বঙ্গবন্ধুর হয়ে ঘোষণাপত্র
পাঠ করল, দেশটা কী সুন্দর নয় মাসেই স্বাধীন
হয়ে গেল। কিন্তু এখন কী হইতে কী হয়ে
গেল। কেমন করে যে জামায়াত আমাদের সঙ্গে
মিশে গেল!

হাসিনাঃ জামায়াত মেশে নাই। আমরাই
জামায়াতের সঙ্গে মিশে গেছি। এখন কাঁধ থেকে
ওই ভূত নামাইতে হবে।

খালেদাঃ আসেন আমরা দুজনই ওদের বয়কট
করি, আমরা বয়কট করলে ওরা আর মাথা
তুলে দাঁড়াতে পারবে না। না হলে কিন্তু ওরাই

একদিন আমাদের দুজনকে নাকানি-চুবানি
খাওয়াবে।

হাসিনাঃ ঠিকই বলছেন। ক্ষমতার লোভে পড়ে
আমরা নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছি। আর
দেখছেন

ভাবি, আমেরিকার মতো একটা দেশে
পরিবর্তনের ঢেউ লাগছে?

খালেদাঃ দেখছি। বারাক ওবামার ্লোগানটা
কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে।

হাসিনাঃ আমারও খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে
দেশে এবার সত্যি সত্যি একটা বদল দরকার।

আর সেটা শুরু করতে হবে আমাদের
দুজনকেই, এখনই তার শ্রেষ্ঠ সময়।

খালেদাঃ এটা আপা সত্যি বলছেন। এ জন্য
প্রয়োজনে আমি আমার ঘর থেকেই সংস্কার
শুরু করব। এরপর দলের খারাপ লোকগুলোকে
ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।

হাসিনাঃ আমার দল থেকেও আমি খারাপ
লোকগুলোকে বহিস্কার করব। তাতে আমাদের
সংসদ ভালো মানুষে ভরে উঠবে।

খালেদাঃ আহা! কী যে শান্তি লাগছে শুনে।

আমরা যদি এমনটা করি তাহলে সত্যি সত্যি
দেশটা পাল্টাবে তো!

হাসিনাঃ আমরা আন্তরিক হলে অবশ্যই
পাল্টাবে। এ জন্য আগে আমাদের পাল্টাতে
হবে। আমরা পাল্টালে শুধু দেশ কেন, দেশের
মানুষও পাল্টাবে।

খালেদাঃ আমারও তা-ই মনে হয়, আমরাই এত
দিন দেশের জনগণকে নিজেদের স্বার্থের জন্য
বন্দী করে রেখেছি।

হাসিনাঃ এভাবে আর নয়। আপনি আমার
বাড়িতে আসবেন। আপনাকে নিয়ে ডালভর্তা
দিয়ে চারটা ভাত খাব। আর দেশের ভবিষ্যৎ
নিয়ে লম্বা একটা প্ল্যান করব।

খালেদাঃ অবশ্যই আপা, আপনাকেও কিন্তু
একদিন আমার বাড়িতে আসতে হবে, চারটা
ডাল-ভাত খেতেই হবে।

হাসিনাঃ দেশটা তো আমাদের সবারই। আমরা
দেশটাকে না দেখলে কে দেখবে, বলেন?

খালেদাঃ আজ আমরা শপথ নিলাম, দেশকে মন
থেকেই ভালোবাসব।

হাসিনাঃ দেশের সব সমস্যা-জঞ্জাল দূর করব।

আসেন ভাবি, সাংবাদিক ভাইদের এই

সুসংবাদটা জানিয়ে দেই। এও বলি, দেশের জনগণকে যেন আমাদের পরিবর্তনের কথাটা তারা বেশি ফুলিয়ে না লেখে।
খালেদাঃ ঠিক। এবার কথায় নয়, কাজে পরিচয় দিব।

হাসিনা ও খালেদাঃ আহা! দেশকে মন দিয়ে ভালোবাসলে যে এত আনন্দ, এত সুখ! এখন মরে গেলেও শান্তি পাব। আমরা আর ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশের মঙ্গল চাই। আমরা দেশকে ভালোবাসি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৪, ২০০৮

28) জাদুকরের প্রতিশোধ - স্টিফেন লিকক

‘লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন’, জাদুকর বললেন, ‘এই কাপড়টি ঝেড়ে দেখালাম, এর মধ্যে কিছু নেই। এবার এর ভেতর থেকে সোনালি মাছভরা একটি পাত্র বের করে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে!’

হলভর্তি লোক বলাবলি করল, ‘কী অদ্ভুত! কীভাবে যে করে!’ কিন্তু সামনের আসনে বসা সবজান্তা লোকটি উঁচু গলায় ফিসফিস করে আশপাশের লোকদের জানাল, ‘বুঝলেন না, ওটা ওর আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।’ শ্রোতারা হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, ‘ঠিক ঠিক।’ ক্রমে সারা হলঘরের লোকেরা নিচু স্বরে বলাবলি করল, ‘ওটা ওর আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছিল।’ জাদুকর বললেন, ‘এবার আপনাদের সেই বিখ্যাত হিন্দুস্তানি আংটির খেলা দেখাব। এই দেখুন, আংটিগুলো আলাদা আলাদা আছে। আমার একটি ঘায়ে সব জোড়া লেগে যাবে। (ঘটাং ঘটাং) এই দেখুন।’

দর্শকদের মুগ্ধ গুঞ্জনকে ছাপিয়ে সবজান্তা লোকটির ফিসফিসানি শোনা গেল, ‘নিশ্চয়ই আরেক সেট ওর আস্তিনের মধ্যে লুকানো ছিল।’ তখন সবাই মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলাবলি করল, ‘আংটিগুলো ওর আস্তিনের ভেতর ছিল।’ জাদুকরের মুখ কালো হয়ে গেল। দ্রুত কুঁচকে গেল। তিনি বললেন, ‘এবার একটা মজার খেলা দেখাব। একটা টুপির ভেতর থেকে যতগুলো ইচ্ছা ডিম বের করব। কেউ একটা টুপি দেবেন? এই যে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এবার দেখুন।’ টুপির ভেতর থেকে একে একে ১৭টা ডিম বের করলেন তিনি। দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু

কেবল ৩৫ সেকেন্ডের জন্য। তার পরই সামনের আসনের ওই সবজান্তা লোকটি ফিসফিস করে বলল, ‘ওর আস্তিনের ভেতর একটা মুরগি রয়েছে।’ তখন সবাই বলাবলি শুরু করল, ‘ওর আস্তিনের ভেতর অনেক মুরগি রয়েছে।’

ডিমের খেলা মাটি হয়ে গেল।

এমনি করেই চলল। সবজান্তা লোকটির ফিসফিসানি থেকে জানা গেল, জাদুকরের আস্তিনে আংটি, মুরগি ও মাছ ছাড়াও ছিল কয়েকটি তাস, একটা পাউরুটি, একটা পুতুলের দোলনা, একটা জ্যন্ত গিনিপিগ, একটা ৫০ সেন্টের মুদ্রা ও একটা রকিং চেয়ার।

জাদুকরের সুনামের পারা নামতে নামতে শূন্য ডিগ্রিও ছাড়িয়ে গেল। মরিয়া হয়ে তিনি একটা শেষ চেষ্টা করলেন।

‘লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান’, তিনি বললেন, ‘আমার শেষ খেলা একটি বিখ্যাত জাপানি ভেক্সি। টিপেরারির লোকেরা এই খেলাটা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।’ তিনি সবজান্তা লোকটির দিকে ফিরে বললেন, ‘স্যার, দয়া করে আপনার সোনার ঘড়িটা আমায় দেবেন?’ ঘড়িটা হাতে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করার অনুমতি চাই। পাব কি?’

সবজান্তা লোকটি সবজান্তার হাসি হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

জাদুকর ঘড়িটিকে একটি হামানদিস্তায় ফেলে পেলাই একটা হাতুড়ি তুলে নিলেন। দমাদম হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হলো। সবজান্তা ফিসফিস করে বলল, ‘ঘড়িটা ও আস্তিনের মধ্যে চালান দিয়ে দিয়েছে।’

‘এবার স্যার’, জাদুকর তাকে বললেন, ‘আপনার রুমালটি ফুটো করতে আমায় দেবেন কি? ধন্যবাদ। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান্ট, দেখুন, এতে কোনো ফাঁকি নেই। ফুটোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।’

সবজান্তা লোকটির পুরো মুখ কৌতুক-উত্তেজনায় ঝলমল করে উঠল। খেলাটার রহস্যটা তাকে আকৃষ্ট করেছে।

‘এবার স্যার, আপনার সিল্কের টুপিটা দয়া করে দেবেন? ওর ওপর আমি নাচব। ধন্যবাদ।’

এতক্ষণে সবজান্তার মুখে একটা বোকা বোকা

ভাব ফুটে উঠল। সে ফিসফিস করে বলল,
'ব্যাপারটা আমাকে গোলমালে ফেলেছে। রহস্যটা
ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'
দর্শকদের অথও নীরবতার মধ্যে জাদুকর সটান
খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবজান্তার ওপর একঝলক
অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে শেষ কথা বললেন,
'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন! আপনারা দেখলেন
যে আমি এই ভদ্রলোকের অনুমতি নিয়ে তাঁর
ঘড়ি ভেঙেছি, কলার পুড়িয়েছি, চশমা চুরমার
করেছি, তাঁর টুপির ওপর নেচেছি। যদি তিনি
তাঁর ওভারকোটটির ওপর সবুজ ডোরা আঁকার
অনুমতি আমায় দেন, তো সানন্দে তা করে
আপনাদের দেখাই। আর তা যদি না দেন, তো
আজকের মতো খেলা এখানেই শেষ।' সুমধুর
অর্কেস্ট্রা সংগীতের সঙ্গে যবনিকা নামল।
দর্শকেরাও বাড়িমুখো হলো। তারা বুঝল, জাদুর
খেলা যেমনই হোক, এর মধ্যে এমন কিছু
খেলাও থাকে, যা জাদুকরের আস্তিনে লুকানো
থাকে না।

অনুবাদঃ প্রকাশ জয়সূর্যস্টিফেন বাটলার
লিখকঃ জন্ম-১৮৬৯, মৃত্যু-১৯৪৪। ১৯০৮ থেকে
১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কানাডার ম্যাকগিল
ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও অর্থনীতিবিজ্ঞানের
অধ্যক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতিবিষয়ক রচনা এবং
রসরচনা দুটিতেই সিদ্ধহস্ত। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম
আলো, নভেম্বর ২৪, ২০০৮

29) শনিবারের বারবেলা - অমৃতলাল বসু

ঝি-রা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো,
জল ফুরুলো কলে।
বাজিয়ে শাঁখ ডাকায় নাক,
সাঁজের বাতি জ্বলে।।
বি এলে-বেলে পড়ছে ছেলে,
মাস্টার বসে তোলে।
বিছিয়ে পাটি চায়ের বাটি,
বউ-মা মুখে তোলে।।
মাতুল গুঁড়ি ফুলিয়ে ভুঁড়ি
ভরছে পিপে জলে।
মাপছে দেশি বেচবে বেশি
দোকান বন্ধ হলে।।
বিজলি ছুড়ি হয় না বুড়ি,
টানছে দেখ গাড়ি।
জ্বালছে আলো, ঘোরায়ে ভালো

পাঞ্জা বাড়ি বাড়ি ।।

নাট্যশালায় আলো জ্বালায়,

টিকিট-ঘরে মেলা ।

বাজবে ন-টা লাগবে ঘটা,

করবে শুরু খেলা ।।

দাঁড়ীর ফেরে তিন-পো মেরে

বেচবে লুচির পোয়া ।

পাপ কাটাতে তাই পাটাতে

দিচ্ছে ধুনোর ধোঁয়া ।।

পাহারওয়ালা লোকের চলা

ঠাউরে চোখে দেখে ।

কার বগলে কালো বোতলে

মাল চলেছে ঢেকে ।।

এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে

বলছে, মাতোয়ালা ।

চুকাও দাবি, নেই তো আবি

থানায় চলো শালা । অমৃতলাল বসুঃ নাট্যকার ।

(১৮৫৩-১৯২৯) সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,

নভেম্বর ২৪, ২০০৮

30) উনি একজন গোয়াল বদলকারী গরু

গরুদের মধ্যে আছে হাটবদলের প্রবণতা এবং

দড়ি নিয়ে টানাটানি । এবারের ঈদ সামনে রেখে

হাটবদল করা তেমনি এক গরুর সঙ্গে

অনুবাদযন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন আদনান

মুকিত দীপ্র । জনাব, অতি সম্প্রতি আপনি বাচ্চু

মিয়ার গোয়াল ছেড়ে সুরুজ মিয়ার গোয়ালে

যোগ দিয়েছেন । এ সম্পর্কে কিছু বলুন, কেন

এই গোয়াল ত্যাগ?

* ভেরি গুড কোশ্চেন । অ্যাকচুয়ালি, সুরুজ

মিয়ার হাটের আয়োজন আমাকে মুগ্ধ করেছে ।

এই আদর্শগত মিলের কারণেই আমি তার

গোয়ালে যোগ দিয়েছি ।

কিন্তু আমরা শুনেছি আপনি এ হাটে জায়গা না

পেয়ে গোয়াল ত্যাগ করেছেন ।

* ইমপসিবল । আসন্ন গরুর হাটে অংশ নেওয়ার

জন্য আমি নমিনেশন চেয়েছিলাম । কিন্তু

আমাকে না দিয়ে কিছু অযোগ্য গরুকে

নমিনেশন দেয় বাচ্চু মিয়া । তবে এ জন্য আমি

গোয়াল ত্যাগ করিনি । আমি ইউরিয়া সার

খাওয়া গরু । মনোনয়ন নিয়ে কান্নাকাটি করা

আমার স্বভাব নয় ।

কিন্তু সুরুজ মিয়া তো আপনাকে নমিনেশন

দিয়েছেন।

* সুরজ মিয়া একজন সৎ, আদর্শবান হাটের আয়োজক। তিনি কোনো ধরনের অন্যায়, অবিচার বরদাশত করেন না। তা ছাড়া এলাকায় আমার একটা গুডউইল আছে। আমাকে যোগ্য ভেবেছেন বলেই তিনি মনোনয়ন দিয়েছেন। এতে আমি খুবই আনন্দিত।

পুরোনো গোয়াল ছেড়ে আসায় আপনার সাবেক সতীর্থরা আপনাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন। এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

* ওসব ফালতু কথায় আমার কিছু যায়-আসে না। সচেতন হাটুরেরা এসব বিশ্বাস করবে না। বাচ্চু মিয়া আমাকে যা দিয়েছে, আমিও তাকে তাই দিয়েছি। তা ছাড়া আমি আগেও বহুবার গোয়াল ছাড়তে চেয়েছি; কিন্তু রাখালবাহিনী দিয়ে ধরে আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল। তবে পাস্ট ইজ পাস্ট। কে বিশ্বাসঘাতক, তা ক্রেতারাই বলে দেবে।

কিন্তু তাঁরা বলছেন হাটুরেরা আপনাকে গ্রহণ করবে না।

* কাকে হাটুরেরা গ্রহণ করবে, তা সময়ই বলে দেবে। তাদের ওপর আমার আস্থা আছে। তারা সারা হাট ঘুরে দেখে শুনে দাঁত গুনে সঠিক গরুকেই নির্বাচিত করবে। এ জন্য আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

আপনি কি এবারের হাটে অংশ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত?

* অফকোর্স। ইতিমধ্যেই আমার এলাকায় প্রচারণার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বোঝেনই তো, প্রচারেই প্রসার।

কী ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি?

* আমি নিয়মিত ইউরিয়া খাচ্ছি, আর নেতার নির্দেশমতো কাজ করছি। আমার প্রতি ক্রেতাদের ও দালালদের সমর্থনও আছে। কদিন আগেই দুজনকে গুঁতিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। আমি নিশ্চিত, জনগণ আমাকেই বেছে নেবে। দেশবাসীর উদ্দেশে কিছু বলুন।

* প্রিয় দেশবাসী, আমি সারা জীবন আপনাদের খেদমত করেছি। আপনাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেই আমি আসন্ন গরুর হাটে প্রার্থী হয়েছি। আমি সবার দোয়াপ্রার্থী। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০১, ২০০৮

31) উট-কো ঝামেলা - মাসুদুল হক

সেবার ঈদ ঘনিয়ে আসতেই আমার অতিব্যস্ত কাকা গরুর বাজারের হালহকিকত নিয়ে ব্যাপক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, টাকা-পয়সার অভাব তাঁর কোনোকালেও ছিল না। তাই বরাবরই পাড়ার সেরা গরুটা তাঁর বাড়ির সামনে বাঁধা থাকত। কিন্তু গতবার তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে পাড়ার জগলুল মিয়ার কাছে। জগলুল মিয়ার গরুর তুলনায় পাক্কা এক ইঞ্চি উচ্চতায় ও দুই ইঞ্চি প্রস্থে কম ছিল কাকার গরুটা। এবার তাই কাকা আদাজল খেয়ে নেমেছেন তাঁর সেই অপমানের শোধ তুলতে। তা ছাড়া কাকার গরুটা নিয়ে নিন্দুকেরা নানা কথা ছড়াচ্ছিল-সেবার গরুটার নাকি একটা চোখ ট্যারা, আর দাঁতের মধ্যে কয়েকটা বাঁধানো দাঁতও নাকি ছিল। কাকার ধারণা, বদমাশ জগলুল মিয়াই এসব নিন্দুকের নিন্দার বন্ধুকে রসদ জোগাচ্ছে।

তাই এবার এক হাত দেখে নিতে কাকা হাত খুলে খরচ করা শুরু করলেন। কোরবানির বাজারে আগেই কয়েকজন স্পাই নিয়োগ দিয়ে বসলেন; যারা প্রতি ঘণ্টায় বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারের আপডেটেড নিউজ জানাচ্ছিল কাকাকে। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। স্পাইরা নতুন আসা গরুদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে রিপোর্ট করতেই কাকা একে একে নাকচ করতে থাকেন। নাহ্, ওতে চলবে না, আরও বড় সাইজের নিশ্চয়ই হাজির হবে দুই দিন পর।

এভাবে ঈদের সপ্তাহখানেক বাকি থাকতে শোনা গেল জগলুল মিয়া একটি গরু কিনে ফেলেছে। তা সেটাকে গরু না বলে গুঁড় ছাড়া আর শিংওয়ালা হাতি বললেই বোধ হয় মানানসই হয়। ‘হাম্বা’ করে ডাক দিলে পাড়ার বিল্ডিংগুলোর সব জানালা ঝনঝন করে ওঠে। চারজন জওয়ান লোক রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যায় ওটাকে শান্ত রাখতে।

দেখেশুনে তো কাকার মাথায় হাত! তাঁর বাকি সম্মানটুকুও দেখি পাংচার হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার দশা। রেগেমেগে তিনি তাঁর নিয়োজিত স্পাইদের সেই দণ্ডেই বরখাস্ত করলেন, সবাইকে একসঙ্গে। ‘নিমক হারামের দল, এত দিন দানাপানি খাইয়ে রাখলাম, আর

শেষমেশ চোখের সামনে দিয়ে বড় গরুটা ওই ব্যাটা নিয়ে নিল।’ কাকা ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন।

সেই দণ্ডে আমি ভয়ে ভয়ে একটা প্রস্তাব দিয়ে বসি কাকাকে। টিভিতে কোরবানির হাটের নিউজ দেখে দেখে আমিও বাজারের আপডেটেড নিউজটা জানতাম। বললাম, ‘কাকা, না হয় একটা উটই কিনে ফেলেন, সঙ্গে একটা ছাগল ফ্রি দিচ্ছে।’

শুনে কাকা প্রথমে ধমকান, পরে থমকান এবং সবশেষে চমকান। তাঁর মুখে যেন ১০০ ওয়াটের ফুল রেঞ্জের বাতি জ্বলে ওঠে।

‘ভালো বলেছিস তো মন্টু। উটের গুরুত্ব তো গরুর গুরুত্বকেও হার মানায়। তা ছাড়া গলা লম্বা করে দাঁড়ালে কতটা লম্বাও হয় তা ভেবেছিস মন্টু, সে তুলনায় ওর গরুটা তো নেহাত...নেহাত...।’ কাকা ভাষা খুঁজে পান না, ‘মানে নেহাত গরু।’ কাকা থামেন। কিন্তু পা আর থেমে থাকে না। শেষ দণ্ডে কোরবানির পশুর হাটে রওনা হয়ে যান আমাকে সঙ্গে করে। হাটে গিয়েই আমরা আস্ত এক অ্যারাবিয়ান উটের অর্ডার দিয়ে আসি। তিন দিন আগে অর্ডার দিলেই তবে পাওয়া যায়। দাম যদিও খানিকটা বেশিই পড়ল। কিন্তু দামের সঙ্গে কাকার হাসির জেল্লাও বাড়তে থাকে।

বাড়ি ফিরেই কাকা বহু লোক লাগিয়ে দেন উটের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে। বাড়ির সামনের গ্যারেজটা বালি দিয়ে উঁচু করে বেড তৈরি করেন, আর সেখানে যাতে সূর্যের আলো ঠিকভাবে পড়ে তার জন্য গ্যারেজের চালটালও খুলে ফেলেন। দুই দিন পর ফ্রি খাসিসহ হাজির হয় লম্বা গ্রীবার উট। দেখে আমাদের উৎসাহ তো আর ধরে না;

যদিও নিন্দুকে এবারও ছড়াতে থাকে-এ নির্ঘাত রাজস্থানি উট, মোটেও অ্যারাবিয়ান নয়। কিন্তু তাতেও কাকার বিশেষ গায়ে লাগল না। ‘নাহ্, এবার সত্যি সত্যিই জগলুল মিয়াকে হেনস্তা করা গেছে।’ কাকার আত্মতৃপ্তি থামে না; কিন্তু ঝামেলাটা বাধল ঈদের আগের দিন। গ্যারেজে গিয়ে দেখি কাকা, চাচাতো ভাই ঝন্টু আর বোন বিনুকে নিয়ে হতবিস্মল দৃষ্টিতে উটটাকে দেখছেন। ঝন্টু মাথা নেড়ে নেড়ে কাকাকে যেন কী বোঝাচ্ছে, ওর এত মায়াময় কণ্ঠ আগে

শুনেছি বলে মনে পড়ল না। কাছে গিয়ে আমিও কিছুটা শুনি। যা বুঝলাম তা হলো, ঝন্টু শুধু পাড়ার ছোট ছেলেদের পটিয়ে নানা ফাইফরমাশ খাটায় তাই-ই নয়, বরং কাকার মতো রাশভারী লোককেও পটাতে ওস্তাদ। ও বোঝাচ্ছে, ‘দেখেন আব্বা, এই উটটা সুদূর মরুর দেশ থেকে এই বঙ্গভূমে এসেছে, কত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বন্ধুর খোঁজেই হয়তো, অথচ আমরা এটাকে এ দেশের হাওয়া-জলে আর কিছুদিন না চরিয়ে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি-কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?’ সঙ্গে সঙ্গে ঝন্টুর বোন বিনুর সীমাহীন সমর্থনে আমার কাকাও যে গলছে এর অন্যতম কারণ বোধ হয় তাঁরও এই তিন দিনে উটটার প্রতি ব্যাপক মায়া পড়ে গেছে। তাঁর চোখ দেখি ঝন্টুর বক্তব্যে অশ্রুসিক্ত।

আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উটের মাংস চাখার এমন সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সেই আশঙ্কায় বলে উঠি, ‘কাকা, যত মায়া পড়বে ততই ভালো।’

কিন্তু আমার এ বক্তব্য ঝন্টু-বিনুর কলকাকলিতে ঢাকা পড়ে যায়। তাই শেষমেশ উটটি পোষার জন্যই কাকা রেখে দিলেন।

সেবারও তাই জগলুল মিয়ার কাছে আমাদের এক রকম হারই হলো। উটের সঙ্গে ফ্রি পাওয়া প্রমাণ সাইজের ছাগলটা দিয়েই ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপিত হলো-আর সে আনন্দে উটটাও যে যোগ দিয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০১, ২০০৮

32) বেগুনভর্তা

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে থাকা রসিক বাঙালির মুখে মুখে ফেরে কত না হাস্যকৌতুক। কত না সরস গল্প। তারই কিছু নমুনা থাকল এখানে।

চাষিঘরের জামাই শ্বশুরবাড়ি গেছে একা।

সেখানে খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে মেখে পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে বেগুনভর্তা আর গরম ভাত খেতে দিয়েছে। অন্য সব সালুনের স্বাদ ফেলে এটাই মনে ধরেছে জামাইর। আবার খেতে হবে, তাই নামটা জপে জপেই আসছিল।

পথে পড়েছে ছড়া, বর্ষার দাপটে ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে উঠেছে। পার হওয়ার জন্যে আছে একটা মাত্র বাঁশের সাঁকো, ধরার কিছু নেই। বিকল্প কোনো পথও নেই। অগত্যা পা টিপে

টিপে সেটা পার হওয়ার ঝুঁকি নিতেই হলো। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে ভারসাম্য রেখে সাঁকো পার হতে গিয়ে সবটা মনোযোগ তো ঢেলে দিতে হয়েছে সে কাজে। ওপারে পৌঁছে দেখে, আরে, সেই তরকারির নামটা তো ভুলে গেছে! আহ, কিছুতেই মনে পড়ছে না-পটল, পেঁপে, কাঁকরোল, ঝিঙে, মুলা, শসা-কত সবজির নাম মনে পড়ছে কিন্তু আসলটা কিছুতেই মনে আসছে না।

হারানো নাম হাতড়াতে হাতড়াতে উদ্ধান্ত চাষি বাড়ি ফিরে বৌকে ডেকে বলল, হ্যাঁ রে, তোর বাপের বাড়ি আজ যা খেতে দিল, সেটার কী নাম?

বৌ বলল, ওমা, আমি কীভাবে বলব? খেয়েছ তুমি বলব আমি, এটা কেমন কথা?

চাষি বলে, বাহ, তোদের বাড়িতে কী কী খায়, কোনটা কোনটা বেশি স্বাদ হয়, সে-তো তুই-ই জানবি!

বৌ অবাক কণ্ঠে প্রতিবাদ করে, আরে, আমি কি গণক যে এখানে বসে ওখানকার খবর বলে দিতে পারব! তারপর একটু গর্বিত কণ্ঠে না বলে পারে না-তা ছাড়া, আমার মায়ের সব রান্নাই তো দারুণ স্বাদ হয়।

চাষি একটু মেজাজি। এসব শুনে বিগড়ে গেল তার মেজাজ। বৌকে পিটুনি দিল আচ্ছাসে। হৈচৈ শুনে পাশের বাড়ির ভাবি হা-হা করে বলে ওঠে-আহাহা, একরত্তি বৌটাকে মেরে একেবারে বেগুনভর্তা বানিয়ে দিল।

অমনি চাষি চিৎকার দিয়ে ওঠে-এটা বললেই তো হতো। বেগুনভর্তার কথাই তো বলছি আমি।

মেজাজ তার ভালো হয়ে গেল। আহা উল্ল করে বৌকে আদর করতে গেল। বৌ ঝাঁঝিয়ে উঠতেই সে একেবারে হাত ধরে অনুনয় শুরু করল।

তা দেখে প্রতিবেশী ভাবি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল বৌয়ের গায়ে হাত তোলা চলবে না, তুই-তোকোরি করাও চলবে না। তখন জলভরা চোখে নতুন বৌয়ের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। আবুল মোমেন, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

33) খইসি পইড়ি গিচে

ভোটের আগে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীরা গরিব-দুঃখী, ছোট-বড় সবার কাছেই ভোট ভিক্ষা করেন। ভোটের পর চেয়ারম্যানরা ওই সব সাধারণ মানুষকে ভুলে যান। তবুও গ্রামের সরল মানুষ বুঝে না-বুঝে ছোটখাটো সব প্রয়োজনেই এক বুক আশা নিয়ে ছুটে যায় চেয়ারম্যানের কাছে। এই নিয়েই গল্পটা।

হাটের ভেতর চেয়ারম্যান সাহেব হাটবাজার করতে ব্যস্ত। এমন সময় আচমকা এক লোক পেছন থেকে চেয়ারম্যান সাহেবকে ভিড়ের মধ্য থেকে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এসে বলে, ‘ওই যে বুলিচুন্স, খইসি পইড়ি গিচে।’ (ওই যে বলেছিলাম খসে পড়ে গেছে) চেয়ারম্যান সাহেব লোকটির কথার কোনো আগা-মাথা না পেয়ে হাঁ করে থাকেন। অবাক হয়ে জানতে চান ‘কবে কী বুলিচেলেন ভাই?’ তার চেয়েও অবাক হয়ে লোকটি জবাব দেয় ‘ক্যা, ভুইলিগিচেন? গেল হাটের দিন বুইলি গেনু, (গেল হাটের দিন বলেছিলাম) আমার গাঁয়ের সুবানের ব্যাটা আক্কাস তাই আমার মহিষের ল্যাজে কোব মারিচিলি। ল্যাজ খইসিই গিচিলি। ইটুজালা বাইদি আচিলি। আইজ বিয়ান বেলা তাই খইসি পইড়ি গিচে। এ দ্যাকেন, খসা ল্যাজ আপনেক দেকানির লাইগি গামচাত কইরি বাইন্দি লি আইচি। (আক্কাস আমার মহিষের লেজে কোপ দিয়েছিল। লেজটা একটুখানি বেঁধে ছিল। আজ সকালে পুরোটা খসে পড়ে গেছে। আপনাকে দেখানোর জন্য লেজটা গামছায় বেঁধে নিয়ে এসেছি।) আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

34) দেওয়ানির দুঃখের কথা

দেওয়ানির দুঃখ কেবল একটাই, তিনি একদম ক অক্ষর গো-মাংস। সুধীজন সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলে বসেন, ‘ডিগ্রি কলেজকে আমি ইন্টারমিডিয়েটে উন্নীত করব।’ এ নিয়ে দশ গ্রামের মানুষের হাসাহাসির অন্ত নেই। আড়ালে-আবডালে লোকে তাঁকে বলে, ‘মূর্খ দেওয়ানি।’ মনের দুঃখে দেওয়ানি সাহেব ঠিক করলেন একমাত্র ছেলেকে তিনি যেকোনোভাবেই হোক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। ভর্তি

হওয়ার পর দেওয়ানি সাত গ্রামের মানুষ ডেকে জেয়াফত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। এরপর দেওয়ানিকে আর পায় কে। ‘মোর ব্যাটা বিশ্ববিদ্যালয়োত ভর্তি হইছে, মূর্খ কাকে কয় সেইটাই এবার দেখাইম।’ বিভিন্ন সভামঞ্চে এভাবেই বক্তৃতা দিয়ে চলেন দেওয়ানি। ছেলের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করতে করতে তাঁর যে ত্রাহি অবস্থা হয়ে উঠেছে, সেদিকে তাঁর নজর নেই। আজ এটা বিক্রি করেন তো কাল অন্যটা। এমন করে বিক্রি করতে করতে অবশিষ্ট থাকে শুধু ভিটেবাড়ি। তো শেষমেশ ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়েছে। বাবার আনন্দের যেন শেষ নেই। বাড়িতে ফিরেছে ছেলে। ছেলের আগমন উপলক্ষে বিরাট সভা বসেছে। সভায় বক্তৃতা দিতে উঠল ছেলে। গ্রামবাসীর উদ্দেশে বলল, ‘আমি এককম পাস করিয়া বাবার কাছোত আসছি। আপনাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করছি।’ ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই বাবা চিৎকার করে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। একপর্যায়ে একদম মাটিতে গড়াগড়ি।

গ্রামবাসী কান্না থামাতে বলছে, কী হলো দেওয়ানি সাহেব, কী হলো। এ সময় তিনি বলেন, ‘চুপ করেন তো তোমরাগুলো বাহে...।’ এ অবস্থায় গ্রামবাসী বলাবলি করে, ‘ওনাক জিন ধরেছে, ভূতে ধরেছে। জিন-ভূত ছাড়াতে কবিরাজ ডাকতে হবে।’ কবিরাজ ডাকতে গ্রামের মানুষ ছুটে চলে। দড়ি দিয়ে দেওয়ানিকে একটি গাছের সঙ্গে দুই হাত বেঁধে রাখা হলো। শীতের দিন। বেশ শীত পড়েছে। কবিরাজ এসে হুঙ্কার দিতেই দেওয়ানির মুখে খই ফোটে, ‘মোর একনা ব্যাটার জন্য জমি বেচানু, (বেচলাম) ধান বেচানু। বেচে বেচেয়া শোগ (সব) শেষ করি ফেলানু (ফেললাম)। আর ব্যাটা কি না মোর ‘বেশি’ ‘বেশি’ পাস না করিয়া ‘কম’ পাস করি আইসে(আসল)। এইগলা দুঃখের কথা এলা মুই (আমি) কোন্টে (কোথায়) শোনাও (শোনাব) বাহে। আরিফুল হক রুজু, রংপুর

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

35) শাক

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গেছে জামাই। নয়া জামাইয়ের আগমন উপলক্ষে শ্বশুরবাড়িতে নানা রকম খাবারের আয়োজন। পিঠা, পায়েস,

পোলাও, মাছ, মাংস-আরও কত কী। দুপুরবেলা বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে জামাইকে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে খাবার দেওয়া শুরু হলো। প্রথমেই জামাইয়ের পাতে শাশুড়ি তুলে দিলেন পাটশাক। পাটশাক খাওয়ার পর শাশুড়ি বড় আগ্রহ নিয়ে জামাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাবা, শাক কেমন হয়েছে।’ জামাইয়ের সরল উত্তর, ‘ভালো হয়েছে মা।’ শাশুড়ির আবার প্রশ্ন, ‘কেমন ভালো বাবা।’ মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হয়ে জামাইয়ের আবার হাসিমুখে উত্তর, ‘খুব ভালো মা, খুব ভালো।’ শাশুড়ি তখন পাটশাকের বাটি থেকে আরও কিছুটা শাক নিয়ে জামাইয়ের পাতে দিয়ে বললেন, ‘বাবা, ভালো লেগেছে; তাই আরেকটু দিলাম, খাও।’ থালার সামনের আশপাশের মাছ-মাংস দেখে কিছুটা বিষণ্ণ মনে জামাই মনে মনে ভাবল, শাক খেয়েই তো তার পেট ভরে গেল, ওসব আর কখন খাবে।

ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু প্রকাশ না করে দ্বিতীয়বার দেওয়া পাটশাকও খেলেন জামাই মশাই। দ্বিতীয়বার পাটশাক খাওয়ার পর শাশুড়ি আবার বললেন, ‘বাবা, শাক কি খুব ভালো লাগছে।’ জামাই আগেরবারের মতো এবারও বলল, ‘জি, ভালো লেগেছে।’ একথা শুনে শাশুড়ি ‘বাবা, তাহলে আরেকটু খাও’ বলে আবার যেই জামাইয়ের পাতে শাক দিতে উদ্যত হলেন, অমনি জামাই একদম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, ‘মা, কষ্ট কইরা বারবার পাতে শাক দেওয়ার দরকার কী। পাট ক্ষেতটা একটু দেখ্যাইয়া দেইন। আমি ক্ষেতে গিয়াই পাটশাক খাইতে থাহি।’ নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ

সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০০৮

36) মশারি মশারি খেলা

খবরের কাগজে দেশ সম্পর্কে নতুন কোনো খবর বের হলে একদল লোক বেশ তারিয়ে তারিয়ে তা পড়ে এবং তার ইঞ্চি ইঞ্চি বিশ্লেষণ করে তবেই ছাড়ে। এক সহকর্মী আমাকে খবরের কাগজের একটা খবর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, পড়ে দেখুন। আমি বরাবরের মতো অনাগ্রহ নিয়ে তাকাই। বলি, এসব গা সওয়া বিষয়, বাদ দেন। তিনি ছাড়েন না-না না, আপনি বুঝতে পারছেন না, কত লোকের সর্বনাশ হয়ে গেছে এত দিনের আশ্বাসের আশায়। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি

বললেন-শোনে, একজনের ঘটনা বলি। প্রত্যেক এলাকাতেই এক ধরনের লোক থাকে, যারা চায়ের দোকানে আসর গরম করা লেকচার ঝাড়তে ওস্তাদ। আমাদের পাড়ার হাশেম সাহেব সে রকমই একজন গুণধর লোক। দেশের যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁর একটা বয়ান পাওয়া যাবে অবধারিত। তিনি আমাদের পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছুটির দিনে ঘণ্টাখানেক লোক জমায়েত করে রাখতেন অনায়াসে। ইদানীং সবাই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে। লোকজন তেমন আর মোড়ে দাঁড়িয়ে ছুটির সকালে আড্ডা দেয় না। সবারই নিজস্ব জগৎ এত বেশি যে অন্যকে সময় দেওয়া ভার। তবুও একেবারে যে হয় না, তা তো না। মোড়ে না হোক, বিকেলে চায়ের দোকানে খানিকটা হলেও জমে যায়। কিংবা ছেলেমেয়েকে স্কুল থেকে আনতে বা দিতে গিয়েও আলোচনার তুফান বয়ে যায়।

এখনো তো, এবারের পট পরিবর্তনের পর হাশেম সাহেব হাসিমুখে নানা জায়গায় নানা রকম মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন-এবারে বাছাধনেরা বুঝবে, কত ধানে কত চাল। আবার হয়তো বলে বসলেন-এখন বোঝো, লগি মেরে নৌকা কত দূর নেওয়া যায়। তার চেয়ে উৎফুল্ল দেখা গেল, যখন রাঘববোয়ালেরা সব গ্রেপ্তার হতে লাগল। একজন করে লাল দালানে যায় আর তিনি লাফিয়ে ওঠেন-এইবার বুঝেছে বাছাধনেরা, বাপেরও বাপ আছে। সবচেয়ে বেশি লাফিয়ে উঠলেন, আমাদের এলাকা যার পেশিবহুল হাতের নির্দেশে চলাফেরা করত সে যখন গ্রেপ্তার হলো। হাশেম সাহেব বহুদিন পর রাস্তার মোড়ে ছুটির দিনের আমেজে চাঁচিয়ে চাঁচিয়ে বলতে লাগলেন-বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান! এইবার যাবে কোথায়! তোমার ওস্তাদও চৌদ্দ শিকের ভেতরে, কে তোমায় বাঁচাবে এবার? এভাবে আরও কিছুদিন গেল।

বেশ কিছু বাড়িঘর ভাঙাচোরা হলো, আবার তার দ্বিগুণ হারে তৈরি হতেও দেরি হলো না। ক্রমে সবাই চোরকুঠুরি থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। শুধু তা-ই না, যাদের নামে অভিযোগের ফিরিস্তিতে খবরের কাগজের পাতা ভরে যাচ্ছিল, তারাও হাসতে হাসতে বের হয়ে আসতে লাগল। বুক আগের চেয়ে আরও ইঞ্চি দুয়েক বেশি ফুলিয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে

আমাদের মতো গিনিপিগদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। আর আমরা খাবি খেতে খেতে পুরোনো অভ্যেসগুলো রপ্ত করার চেষ্টায় আছি। কিন্তু হাশেম সাহেব! তাঁর অবস্থা কাহিল। সবে সেদিন সেই পেশিবহুল হাতের ওস্তাদ চৌদ্দ শিক থেকে বের হয়ে এসেছেন। দু-একজন পেশিবহুল লোকও বের হয়ে আসছে। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের এলাকার পেশিও বের হয়ে আসবে। আর সেই কথা চিন্তা করে হাশেম সাহেব শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছেন। এখন তাঁর অবস্থা গ্রিক দেবতা অ্যারিস্টিউসের ছেলে বিখ্যাত শিকারি অ্যাকটিয়নের মতো। শিকারে বের হয়ে দেবী আর্টেমিসের শাপে যে নিজেই শিকারে পরিণত হয়েছিল। সেদিন শুনলাম, তিনি নাকি এই এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও যাওয়ার চেষ্টায় আছেন। বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় হাশেম সাহেবের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, বিষয় কি, আপনি নাকি এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? মুখটা আমসি করে উত্তর দিলেন, কী ভুল যে করেছি! তালে পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কত কথা বলেছি। এখন থাকি কোন ভরসায়। বের হয়েই তো আমাকে ধরে বসতে পারে। বললাম, কিন্তু ওদের হাত তো অনেক লম্বা, পালিয়ে কোথায় যাবেন? চেহারার ওপর আরেক দফা কালির পোঁচ পড়ল, তাহলে কী করি, বলেন তো? হঠাৎ করে একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ে গেল। এক বিছানার মশারি শতচ্ছিন্ন। মশারা ছিদ্রপথে শিকারের আশায় দলে দলে ভেতরে ঢুকেছে, আর বিছানার মালিক দিব্যি মশারির বাইরে এসে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছে। সেই আলোকে হাশেম সাহেবকে বুদ্ধি দিলাম, এক কাজ করেন, কর্তৃপক্ষকে একটা দরখাস্ত দেন। তারা যেন আপনাকেই চৌদ্দ শিকের ভেতর ভর্তি করে নেয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হয়ে যাবে। সাজ্জাদ কবীর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৫, ২০০৮

37) আসুন, আমরা তুলনা করি

শীত এসেছে, সঙ্গে নির্বাচনও। প্রকৃতির এই মনমাতানো আয়োজনের সঙ্গে কিছুটা উষ্ণতার ছোঁয়া এনেছে আসন্ন নির্বাচন। শীত ও নির্বাচন

একসঙ্গে থাকবে আর তাদের মধ্যে মিল থাকবে না, এটা কীভাবে সম্ভব! নিজেই খুঁজে দেখুন সেই সম্ভাবনা।

লিখেছেনঃ রাকিব কিশোর ও মহিউদ্দিন মো. কাউসার অতিথি পাখি = নেতা!

অতিথি পাখির সাথে কারও তুলনা খুঁজে পাচ্ছেন না? বলেন কি? হয়তোবা গতকালই ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আপনার দরজায় ঠকঠক করে জানান দিয়েছে তার আগমন বার্তা। দরজা খুলে চেহারাটা কি চেনা চেনা লাগছে? আরে চেনেননি? আট বছর আগেই তো কোনো এক শীতে হয়তো তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল নির্বাচনী মাঠে। আবার এসেছে সেই পাখি, অতিথি পাখি। কুয়াশা = নেতার চরিত্র!

শীতের সকালে খোলা জানালায় তাকিয়ে কী সুন্দর কুয়াশা দেখা যাচ্ছে! কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা, কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। একটু খেয়াল করুন তো যে প্রার্থীকে আপনি ভোট দিতে যাচ্ছেন, তার ইতিহাস কি এ রকমই ঝাপসা ঝাপসা, ধোঁয়াটে? যদি তা-ই হয়, তাহলে তো মিলেই গেল কুয়াশা আর নেতার চরিত্র। শীতের পিঠা = ভোটদার!

ভাববেন না যে শীতের পিঠাটি অন্য কেউ। এটি স্বয়ং আপনিই, যার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নেতারা। আপনার তো এখন অনেক দাম। একটু সমঝে চলুন। খেয়ে ফেললেই কিন্তু শীতের পিঠার আমেজ শেষ। লোভ দেখান, লোভ! লোভ...আর ভাবুন কে আসলেই আপনার আর আপনার এলাকার কথা ভাবে। কে ভুলে যাবে দুদিন পরই সব। পাতা ঝরা = মনোনয়নবঞ্চিত নেতা

ঝরা পাতার মচমচ শব্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন? ভাবছেন, ঝরা পাতার মতো কেউ আছে কি না? আশপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান না। বিমর্ষ মুখে কি কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন? যদি থাকেন, তাহলে উনি সদ্যই মনোনয়ন তালিকা থেকে ঝরে পড়েছেন। মনোনয়নবঞ্চিত এসব নেতাকে সাঙ্ঘনা দিন। এঁরা তো আপনারই ভাইবেরাদার! শিশির = ভোটের আনন্দ

সাতসকালে চাদর গায়ে খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটতে খুব মজা, তাই না? আপনার একটু স্পর্শে ঘাস থেকে ছলকে পড়ছে মুক্তাদানার মতো শিশিরটুকু। আপনি যে ভোট দিতে

যাচ্ছেন, সেটা কি এটার মতোই না? সব আনন্দ, সব মজা ভোটের দিনই, খুব উৎসব উৎসব ভাব সবার চোখে-মুখে। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশির যেমন উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভোটের ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও উড়ে যায়, তাই না? খেজুরের রস = ভোটারের বাড়ি খেজুরের রসের লোভে পিঁপড়ের সারি দেখেছেন না? কত লম্বা! কী অসীম তাদের ধৈর্য, একের পর এক তারা খেজুরের রসের হাঁড়িতে আসছে আর মিষ্টি স্বাদের আমেজটুকু নিয়ে চলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার, দরজায় বেলের শব্দ পাচ্ছেন? এ রকম করে আজকের দিনে কতজন এসেই না বেল বাজাবে? অবাক হবেন না, নির্বাচনী এই মৌসুমে আপনার বাড়িটাই তো তাদের কাছে খেজুরের রস। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৫, ২০০৮

38) স্কুলের অঙ্ক

একদিন একটা ছোট ছেলে তার স্কুলের ব্যাগ বগলে নিয়ে দোকানে ঢুকল। দোকানটিতে সংসারের খাদ্যদ্রব্যই বিক্রি হয়। দোকানে তখন বেশ ভিড়। সে দোকানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখতে লাগল। আর নানা রকম আওয়াজ তার কানে আসতে লাগলঃ -এই যে, মাংসটা নিন-হেরিং মাছ পাবেন সামনের কাউন্টারে কেউ যদি চর্বি না চান, তাহলে তো মুশকিল ইত্যাদি সব কথা। খানিক পরে ছেলেটা সামনের একটা কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারের কাচের ভেতর দিয়ে দেখল সেলসম্যান বা দোকানি লোকটা আস্তিন গুটিয়ে কাজে খুব ব্যস্ত। ছেলেটা একদৃষ্টে দেখতে লাগল দোকানিকে। দোকানিটা বেশ চটপট সসেজ ওজন করে খদ্দেরকে দিচ্ছে। দোকানি হঠাৎ দেখল একটা ছেলে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাকে ডেকে বলল, কী চাই, খোকা?-খদ্দেরদের বলল, একটু সরে গিয়ে বাচ্চাটাকে আসতে দিন তো। ছেলেটা তার খাতা দেখে বলল, পিটারকে বলা হলো ১০০ গ্রাম সসেজ আনতে ২ রুবল ২০ কোপেক কিলো হিসাবে। দোকানি শুনেই একটা কাগজে লিখে নিল, ১০০ গ্রাম সসেজ।

-আর কী চাই, খোকা?

-দেড় শ গ্রাম মাখন ও রুবল ৬০ কোপেক হিসাবে। ছেলেটা তার খাতা দেখে বলল আবার।

দোকানি বলল, হ্যাঁ, লিখে নিই। ১০০ গ্রাম মাখনের দাম ৩৬ কোপেক, কাজেই আর পঞ্চাশের দাম হচ্ছে ১৮ কোপেক, মোট হচ্ছে ৫৪ কোপেক। আর?

-আর ২০০ গ্রাম মাংস ও রুবল ৭০ কোপেক কিলো হিসাবে। তা ছাড়া সাতটা লেবু ২৫ কোপেক করে।

-বেশ, ২০০ গ্রাম মাংস, সাতটা লেবু। আর?

-আর কিছু নয়। তাহলে পিটারকে কত দিতে হবে?

-বলছি, দাঁড়াও-দোকানি কাগজের ফর্দে যোগ দিয়ে বলল, মোট হচ্ছে ৪ রুবল ১৬ কোপেক। জিনিসগুলো ওজন করে দেব?

-না না। আমি শুধু হিসাবটা জানতে চাইছিলাম। ছেলেটা দিব্যি সরলভাবেই বলল কথাটাঃ মানে, ব্যাপারটা কী জানো, স্কুলে অঙ্কটা দিয়েছে, বেশ শক্ত অঙ্ক। তাই না?

ছেলেটা হিসাবের যোগফলটা তার খাতায় লিখে নিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই এক মহিলা হ্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ওই দোকানে। গায়ে কমলা রঙের স্কার্ফ, মাথায় ওড়না আর শক্ত হাতে ধরা সেই ছেলেটা।

-কোথায় সেই লোক? মহিলা চৈঁচিয়ে বলতে বলতে খদ্দেরের ভিড় ঠেলেঠুলে ঢুকতে লাগলেন, কোথায়, তাকে দেখা।

-ওই যে, কাউন্টারে। ছেলেটা ভয়ে ভয়ে দেখিয়ে দিল মাকে।

মহিলা কনুইয়ের গুঁতা মেরে মেরে সেই দোকানির কাউন্টারের সামনে হাজির হলেন। বললেন, ওহে, তোমাদের কমপ্লেন বইটা দাও। একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ইয়ার্কি করার মজা বুঝিয়ে দেব তোমাকে।

-কেন, কী হয়েছে, ম্যাডাম? দোকানি অবাক হলো! আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

-আমাকে চেনার দরকার নেই। বলি, এই ছেলেটাকে চেনো?-ছেলেটাকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন মহিলা। ছেলেটা স্কুলের অঙ্কের খাতায় একটা গোল্পা পেয়েছে, জানো? এই স্টেপান,

দেখা তোর খাতাটা। বলেই মহিলা খাতাটা
ছিনিয়ে নিয়ে দোকানির নাকের সামনে ধরলেন,
দেখলে, দেখলে ভালো করে?

দোকানি হকচকিয়ে বলল, দেখলাম তো। তা
আমি কী করেছি?

-তার মানে? তুমিই তো করেছ। মহিলা বললেন,
তুমিই তো হিসাব করে বলেছ ৪ রুবল ১৬
কোপেক। কিন্তু অঙ্কটা কষে দেখো তো-হবে ৩
রুবল ২৫ কোপেক।

এতক্ষণে দোকানি ব্যাপারটা বুঝল।

ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল, আপনার ছেলের স্কুলের
অঙ্ক দিয়ে আমি কী করব, ম্যাডাম? আমি
দোকানের জিনিসের বর্তমান দর হিসাবেই যা
লাগবে তা-ই বলেছি। এটা দোকান, ম্যাডাম,
স্কুল নয়। নাউম ল্যাবকোভস্কি

অনুবাদঃ কুমারেশ ঘোষনাউম ল্যাবকোভস্কিঃ
রাশিয়ান রস সাহিত্যিক। চার খণ্ডে প্রকাশিত
রঙ্গ-ব্যাঙ্গ গল্পগুচ্ছ, কয়েক শ চলতি ব্যঙ্গরচনা
এবং বিদেশি সরস ভ্রমণকাহিনীর লেখক
হিসেবে তিনি পরিচিত। জন্ম ১৯০৮ সালে।

সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব ১৯২৭ সালে। সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৫, ২০০৮

39) বুয়া কাহিনী

এই শহরে বরাবরই
বুয়ার কদর বেশি,
বুয়ারা কেউ স্থানীয়, আর
কেউবা নানান দেশি। নোয়াখালী, মমেনসিং আর
জামালপুরের বুয়া,
ভাষা যা হোক, লাগছে কাজে
কেউ যদিও ভুয়া। বুয়ার কদর দিনকে দিনে
যাচ্ছে যতই বেড়ে,
'বান্ধা' বুয়া হচ্ছে 'ছোট্টা'
ঘরের মায়া ছেড়ে। ছোট্টা বুয়ার লাভ বেশি তাই
ডিমান্ডও বেশ আজ,
সারা দিনে করতে পারে
সাত জা'গাতে কাজ। কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা
আর
বাসন ধোয়ার পরে-
ছোট্টা বুয়ার ক্লায়েন্ট বেশি
ছুটছে আরেক ঘরে। বান্ধা বুয়ার ডিমান্ড আবার
অন্য রকম তাই-
গৃহিণীদের বিশ্বাসী আর
মনটা বোঝা চাই। এই বুয়াদের হচ্ছে ট্রেনিং

গৃহিণীদের হাতে,
সোফায় বসে, টিভিও দেখে
আপত্তি নেই তাতে। ঘরের কে কী ভালোবাসে
কার কী করা মানা,
এই বুয়াদের পরিবারের
সবার বিহেভ জানা। বান্ধা বুয়া মাসে মাসেই
বেতন রাখে জমা,
ছোটখাটো হোক অপরাধ
কত্ৰী করেন ক্ষমা। বাড়ির সাহেব কেউ ‘দুলাভাই’
কাউকে ডাকে ‘খালু’,
বান্ধা বুয়ার ধান্ধা অনেক
দিন বাড়ে, হয় চালু! বছর বছর বান্ধা বুয়ার
বেতন যদিও বাড়ে,
মেয়ের বিয়ে নানান ছুতোয়
নগদ নিতেও পারে। গৃহিণীরা হয় কুপোকাত
বান্ধা বুয়ার টানে,
রান্নাঘরে কাজ করে আর
একলা বিজি গানে। বান্ধা বুয়ার বাড়তি কিছু
কাজকর্মও আছে,
বাড়ির মেয়ে বাইরে গেলে
বুয়ারা রয় পাছে। বখাটেরা টিজ করে যেই
অনেকে দেয় তালি,
সিকিউরিটি বুয়া তখন
আনমনে দেয় গালি। বাড়ির ছেলেমেয়ের প্রেমে
বান্ধা বুয়াই আগে-
এগিয়ে আসে, মেসেজ দিতে
এদের কাজে লাগে। বান্ধা বুয়ার ওপর যদি
বেশি ডিপেন্ড করে,
অনেক সময় অশান্তিও
আসতে পারে ঘরে। বাড়ির মালী, দারোয়ান আর
কাজের ছেলে নিয়ে,
ঘরের জিনিস চুরি করে
পালিয়ে করে বিয়ে। চোর ডাকাতের প্রলোভনে
পড়লে এসব বুয়া,
জীবন নিয়ে যখন তখন
খেলতে পারে জুয়া। বান্ধা বুয়ার পরে এবার
ছোট্টার পর্বে ফিরি,
জায়গা বুঝে এদের থাকে
নানান রকম ছিঁরি! ফকিরেরপুল, কমলাপুর
মুগদাপাড়া ঘুরে-
ছোট্টা বুয়ার জয়জয়কার
দেখবে শহরজুড়ে। ছোট্টা বুয়ার অভিজ্ঞতা
বান্ধা বুয়ার চেয়ে-

অনেক বেশি, বলেই কাজও
সহজে যায় পেয়ে। সাত বাসাতে কাজ করে হয়
নানান মানুষ দেখা,
সময় বুঝে অসুস্থ হয়
হিসাব মাথায় লেখা। মেসের ছোট্ট বুয়ারা কেউ
মওকা হাতে পেলো-
ব্যাচেলরের সব নিয়ে যায়
আর কি দেখা মেলে? পশ এলাকায় ছোট্ট বুয়ার
ডিমান্ড ভালো, তবে-
ডিশ দেখা আর ফেরার পথে
খাবার দিতে হবে। বড়লোকের অনেক গোপন
কিসসা এরা জানে,
প্রলোভনে পড়লে এরাও
বিপদ ডেকে আনে। খুন খারাবির মতো কাজেও
জড়িত হয় তারা,
ছোট্ট বুয়ার একেক জা'গায়
একেক কাজের ধারা। মন্দ বুয়ার পাশাপাশি
অনেক বুয়াই ভালো,
ব্যাঙ্গা, কালুর মা নামে কেউ
ঘরকে করে আলো। বুয়ারা হোক দুষ্ট, ওরা
লবণও দেয় চায়ে,
বিরক্তিতে চিমটি কাটে
ছোট্ট শিশুর গায়ে! তবুও ওরা কাজ করে খায়
হয় দিতে ঘর ভাড়া,
নিজের শ্রমে চালায় জীবন
দান খয়রাত ছাড়া। পঙ্গু স্বামীর চিকিৎসা আর
মেয়ের বিয়ে দিতে,
বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে কাজে
রৌদ্রে, ঝড়ে, শীতে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে
নিচ্ছে কত ঝুঁকি,
স্বপ্নগুলো হারায় আবার
কখনো দেয় উঁকি। ময়লা কাপড়, খেটে খেটেই
কয়লা ওদের জান,
অলংকারের মুখ দেখেনি
যদিও ফুটো-কান। ঠেকায় পড়ে কাজটা বুয়ার
করতে যখন হয়,
স্বামী-স্ত্রীতে থাকে তখন
ঝগড়া-ঝাঁটির ভয়! এই শহরের ফ্ল্যাট বাড়ি সব
বুয়ার হাতেই মোছা,
শান্তি পেতে সারা জীবন
লাগবে ওদের পোছা। ঝলমলে যেই পোশাক
পরো
বুয়ার হাতেই ধোয়া,

বুয়ারা হোক দীর্ঘজীবী

সবাই করি দোয়া। ওবায়দুল গনি চন্দন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৫,
২০০৮

40) প্রেমিকার সামনে অন্য মেয়ের প্রশংসা করি না - মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

ঢাকা শহরে জনসংখ্যা এত বেশি হওয়ার একটা কারণ হতে পারেন তিনি। তাঁর ভাই বেরাদারের সংখ্যা অনেক। তবে জনসংখ্যা বাড়ানোর কোনো দায়দায়িত্ব নিতে এখনো তিনি অপারগ, তাই বিয়ে করছেন না। তিনি আর কেউ নন, জনপ্রিয় পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। আলোচনে তিনি জানিয়েছেন অনেক গোপন তথ্য। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা। আপনি এত জনপ্রিয়, মৌসুমটাও নির্বাচনের, তাহলে নির্বাচনে প্রার্থী হলেন না কেন?

-কারণ, এখন যৌবন যার, কোনো নারীর পাণিপ্রার্থী হওয়ার তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার নয়।

আপনি এবং হিমেশ রেশমিয়া দুজনই কেন টুপি পরেন?

-আমি পরি ভাবে। আর হিমেশ পরে অ-ভাবে, চুলের অভাবে।

আপনার এত ভাইবেরাদার কেন?

-এর জবাব পরিবার পরিকল্পনা বিভাগকে দিতে হবে। খোদার কসম, এখানে আমার কোনো হাত ছিল না। এই ব্যর্থতার দায় তাদের।

এখনো আপনি অবিবাহিত কেন?

-এখানেও আমার কোনো হাত নেই। এটা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সমস্যা। তারা গাছের কী পরিচর্যা করেছে জানি না! আমার বিয়ের ফুল এখনো কলি হয়ে বুলে আছে, ফুটছে না।
কেমন কনে আপনার পছন্দ?

-সেই রকম!!!

প্রেমিকার কোন আবদারে আপনি 'না' ভোটই দিয়ে যাবেন?

-তোমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ডটা দাও না, ময়না পাখি।

প্রেমিকা কেন প্রেমিকের বুকে বাসা বাঁধতে চায়, অন্য কোথাও নয়?

-এ রকম বিনামূল্যে নিষ্কণ্টক প্লট আর কোথায় পাবে। উল্টো এই প্লটে বাসা বাঁধার

পুরস্কারস্বরূপ নানা উপটৌকন পাওয়া যায়।

এমন কী ব্যাপার আছে, যা সব সময় মেনে চলেন?

-প্রেমিকার সামনে অন্য মেয়ের প্রশংসা করি না।

প্রেমিক হিসেবে আপনি কেমন?

-দুর্ধর্ষ!!!

নির্বাচনে আপনি যদি প্রার্থী হন, তবে

ইশতেহারে দেওয়া প্রধানতম প্রতিশ্রুতি কী হবে?

-নির্বাচনের পর কাহাকেও চিনিব না। চোখে টিনের চশমা লাগাইব।

শেষ পর্যন্ত কোন প্রশ্নটা করা হয়নি বলে আপনি আনন্দিত?

-থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কবে মুক্তি পাবে? কারণ, একেকবার একেক তারিখ বলতে বলতে ক্লান্ত। তবে এইটুকু বলতে পারি, নতুন বছরের উপহার হিসেবে সাউন্ডট্র্যাক বাজারে আসবে। তার মাস দুয়েক পর ছবি।

আপনার অনেক ভক্ত। আপনি কার ভক্ত?

-আমি শক্তের ভক্ত, নরমের...

প্রেমের মরা জলে ডোবে না কেন?

-কারণ, প্রেমের মরা এমনই অপদার্থ যে জলও তাকে নিতে চায় না।

পাছে লোকে কিছু বলে-এই পাছের লোকটা সব সময় কী বলে?

-‘তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি। একি মোর অপরাধ’?

রাতে ঘুম না এলে কী করেন?

-জেগে থাকি।

ফুল ফোটে আবার ঝরে যায় কেন?

-সামিনা চৌধুরীকে একটা গান উপহার দেওয়ার জন্য। যাতে তিনি গাইতে পারেন ‘ফুল ফোটে, ফুল ঝরে...।’ পুরোনো ব্যালট বাক্স দিয়ে... বর্তমান নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে পূর্ববর্তী নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সগুলো বেকার হয়ে পড়েছে। সেগুলোকে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না! সেগুলোও কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা যায়। দেখা যাক কী কী কাজে লাগানো যায় সেগুলো-

- মোড়া বানানো যেতে পারে

ভোট দিতে আসা ভোটাররা লাইনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই

তাদের বিশ্রামের জন্য পুরোনো ব্যালট বাক্স দিয়ে মোড়া বানানো যেতে পারে। সেই মোড়ায় ভোটাররা বসে বসে হাতপাখা নিয়ে বাতাসও খেতে পারেন।

– ডাস্টবিন বানানো যেতে পারে
যেসব ভোট নষ্ট হবে, প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা সেগুলো ফেলার জন্য পুরোনো ব্যালট বাক্সকে ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
পুরোনো ব্যালট বাক্স বাতিল ভোটগুলো তো কমপক্ষে পাবে।

– দান বাক্স হিসেবে
নির্বাচন করতে গিয়ে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, তা ওঠানোর জন্য নির্বাচন কমিশন ভোটারদের লাইনে দান বাক্স হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কেউ যেন টাকার পরিবর্তে ভোট না দিয়ে ফেলে।

– জাদুঘরে রাখার জন্য
নতুন প্রজন্মকে পুরোনো ব্যালট বাক্স সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য সেগুলো জাদুঘরে রাখা যেতে পারে। দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা একটা ধারণা পাবে। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, ডিসেম্বর ডিসেম্বর ২২, ২০০৮

41) নির্বাচনে নির্বাসন - মাসুদুল হক

আমার বন্ধু জগলু এক বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়িয়ে নাড়িয়ে কী যেন বলছে। তার সামনে দাঁড়ানো ছিল তিন ষণ্ডামার্কা ছেলে। ছেলেগুলোর চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নিচের দিকে নামানো। না-কামানো দাড়িগুলো খোঁচা খোঁচা আকৃতি নিয়ে অবস্থান করছে চোয়ালে। আমাকে দেখেই জগলু চৈঁচিয়ে উঠে দৌড়ে এসে পেঁচিয়ে ধরল। ঈদের কোলাকুলিটা বাকি ছিল বোধ হয়। তারপর প্রায় টেনে নিয়ে চলল সেই ছেলেগুলোর কাছে। একজন আমাকে দেখে বলল, ‘আমাদের দলে আছ তো হে?’ আমি কিছু বলার আগেই জগলু বলল, ‘আছে মানে, নির্ঘাত আছে, ওর মতো দলভক্ত ছেলে এ পাড়ায় দুটি নেই।’ শুনে ‘সাবাস’ বলে তিনজনে একসঙ্গে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। তিন চাপড়ের ধাক্কায় আমি সামনে হেলে পড়ি। কত বড় নচ্ছার এ জগলুটা, কী মিথ্যাটাই না বলল আমার নামে। যা-ই হোক, খানিক পরে দেখি একজন জগলুর হাতে কিছু কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিল। আর যাওয়ার প্রাক্কালে আরেকজন দান পকেট থেকে

অন্যজনের বাঁ পকেটে কৌণিক আকৃতির এক ধাতব বস্তু স্থানান্তর করল। তা দেখে যদিও আমার হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরল, তবে এমন ভাব ধরলাম যে এ আর এমন কী! ফুঁ!দুপুরে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। ঠিক তখনই কানে এল জগলুর চৈঁচানি। ওর ওই বেসুরো গলায় আমার নাম ধরে একমনে এমনভাবে চৈঁচাচ্ছে যে ওতে মৃত মানুষও জেগে উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। নতুন কেনা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে আর মাথায় এক খাবলা জেল ঢেলে রাস্তায় বেরোই। আমাকে দেখেই জগলুও হাসা শুরু করল-কী যে হাসি, হাসি যে কত রকমের হতে পারে তা প্রথম উপলব্ধি করলাম। টানা দুই মিনিট হাসল নিরবচ্ছিন্নভাবে। রাস্তায় ছোট ছেলেদের জটলা বেঁধে গেল। ‘এত হাসলি ক্যান?’ আমি রেগেমেরে ওকে জিজ্ঞেস করি। ‘আরে না না, যা ভাবছিস তা নয়। তোর চেহারা দেখে হাসি পায় ঠিকই। কিন্তু আমি অতটা অভদ্র নই। আসলে সেদিন কেমিস্ট্রি ল্যাব ক্লাসে হঠাৎ করে খানিকটা নাইট্রাস অক্সাইড, মানে লাফিং গ্যাস দেহে ঢুকে পড়ে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তখন একটুও হাসি পেল না; বরং মুখ গোমড়া করেই বাড়ি ফিরলাম। তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই বুদবুদের মতো খানিকটা করে বের হয় আর হাসতে হাসতে মারা যাই প্রায়। কেমিস্ট্রি বিষয়টাতেই খুব মিস্ট্রি আছে, বুঝলি।’ আমি বললাম, ‘সে যাক, কিন্তু ষাঁড়ের মতো চৈঁচাচ্ছিল কেন, শুনি?’ ‘কেন, ভুলে গেলি, দলের হয়ে কাজ করতে হবে না?’ ‘দেখ জগলু, এসব রাজনীতির রীতিনীতি আমার ধাতে সয় না। তাদের রাজনৈতিক কাজে নৈতিক ব্যাপারস্যাপার খুব দুর্লভ। তা ছাড়া তাদের যে মার্কী, তাতে তাদের নেতার জেতার সম্ভাবনা তো হিমাক্কের নিচে।’ শুনে ও মুখ গোমড়া করে বলল, ‘তুই আমাদের বদনা মার্কী নিয়ে উপহাস করলি! তুই জানিস এই মার্কীর বদৌলতে আমাদের নেতা কেরামত ভাইকে দশ এলাকার মানুষ এক নামে চেনে। চল, আর বেশি বকিস না, এখন কেরামত ভাই ভাষণ দেবেন মাঠে, তোকে না দেখলে কিন্তু বড় ভাইয়েরা মাইন্ড করবে।’ অগত্যা ওর সঙ্গে রওনা দিই। পথে যেতে যেতে ও আমাকে বোঝাতে থাকে-কেরামত আলী ক্ষমতায় এলে আমাদের

কিরূপ প্রবৃদ্ধি হবে, ক্যাডার ভাইদের ছায়াতলে, ছলে বলে কত ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করা যাবে! মাঠে গিয়ে দেখি বেশ বড় জনসমাবেশ।

কেরামত আলীর লোকেরা এলাকার সব মানুষকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে সমাবেশে। জগলু আর আমি গিয়ে বসি সামনের সারিতে। বড় ভাইয়েরা এসে এক ফাঁকে বলে গেল, ‘হাতে তালি দিয়া আজকে হাতে ঘা বানায়া ফেলবি, বুঝছস, টিভি ক্যামেরা আসতেছে।’ নেপথ্যে শ্লোগান চলছিল-

কেরামত ভাইয়ের চরিত্র-ফুলের মতন পবিত্র
ব্রিজ করব মেরামত-আমগো নেতা কেরামত
স্কুল করব মেরামত-আমগো নেতা
কেরামত। নানা পাতিনেতার পর শেষমেশ
কেরামত আলী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেন, ‘ভাইসব, আপনারা অনেকে আমার মার্কা নিয়া উপহাস করেন, টিজ করেন। আপনারা জানেন, মানবজীবনে বদনার গুরুত্ব কতটুকু। আমাদের প্রত্যেকেই দৈনিক একাধিকবার বদনা ব্যবহার করতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা-আমার চরিত্র যে কী, তা আমার মার্কার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইছে। যেমন, আমি বদ না।’ যখন কেরামত মিয়া এলাকাসবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় চমৎকার অভিনয়কলা প্রদর্শনপূর্বক মেকি কান্না কাঁদছিলেন আর তাঁকে ভোটে জয়ী করলে কিরূপে তিনি উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেবেন, এসব বলছিলেন, তখন হঠাৎ মনে হলো, পাশ থেকে ভাইব্রেশন হচ্ছে। ব্যাপার কী-দেখি, জগলু রীতিমতো দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপছে-নিশ্চয়ই আবার লাফিং গ্যাস বুদবুদিয়ে উঠছে, আমি আশঙ্কা করলাম। তখন কেরামত আলীর মায়াভরা গলা ছাড়া পুরো জায়গায় আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো হাসির এক ঢেউ উঠল জগলুর পেটের ভেতর থেকে। আমি ওকে ধরার আগেই হো হো, হি হি-নানা রকম শব্দ বেরোতে লাগল ওর মুখ দিয়ে। হাসির একেবারে অগ্ন্যুৎপাত। বাঙালিরা স্বভাবতই স্পর্শকাতর। কেউ যদি কোনো কারণে হাসে, তাহলে সে হাসি দেখেই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায় অনেকে। কারণ না জেনেই। আর কেউ হাসলে ভদ্রতা করেও নাকি হাসতে হয়। সে ভদ্রতাজ্ঞান দেখলাম সবার

মধ্যে প্রচুর। তাই প্রথমে আমাদের আশপাশের কয়েকজন শুরু করল, তারপর ক্রমে পুরো জনসমাবেশের সবার মধ্যেই সংক্রমিত হলো। কেরামত সাহেবের বক্তৃতা এ হাসির হুল্লোড়ে অনেক আগেই থেমে গেছে, এখন বিষাদভরা নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সান্ধোপাঙ্গরা হাসির এ হুল্লোড় থামানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু জেগেছে বাঙালি, কে রোখে! এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ধরে কেরামত আলীর নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ আছে। শুনেছি কেরামত আলীর সান্ধোপাঙ্গরা জগলুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর কিছুদিন পরই নির্বাচন, বদনা মার্কীর হার হলে তার দায়ভারের কিছু অংশ যে জগলুর ঘাড়েও বর্তাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওর কোনো খোঁজখবর নেই, কোথায় ডুব দিয়েছে কেউ জানে না। এ নির্বাচন জগলুকে কত দিনের নির্বাসন দিল কে জানে! সূত্রঃ প্রথম আলো, ডিসেম্বর ডিসেম্বর ২২, ২০০৮

42) হ্যাপি নিউ ইয়ার! - আহসান হাবীব

নতুন বছর শুরু হলো... নতুন সরকার আসছে... সবকিছুই নতুন। নতুন তালিকায় নতুন ভোটাররা ভোট দিল। প্রায় দুই কোটি নতুন ভোটার... তারাই বদলে দিল দেশের সিনারিও... রাজাকারদের বিদায়পর্ব মোটামুটি সম্পন্ন। শুধু একটা জিনিসই পুরোনো রয়ে গেল। কোনটা? খালেদা জিয়ার বক্তব্য। মানে? ওই যে ‘প্রহসনের নির্বাচন বর্জন করলাম...’ এ তো খুবই কমন পুরোনো বক্তব্য। হারলেই মানুষ এমন বক্তব্য দেয়। তাঁর কাছে নতুন কোনো বক্তব্য আশা করেছিলাম। এক আড্ডায় কথা হচ্ছিল। একজন মন্তব্য করল। আসলে এটা সত্যি। এবার চমৎকার একটা নির্বাচন হলো। সেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মতো। সব নির্বাচনেই কিছু জোক তৈরি হয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তার একটা এ রকম-ভোটকেন্দ্রে এক লোক হাইমাউ কাঁদছে। কী হলো, ভাই? কাঁদছেন কেন? এক সাংবাদিক ছুটে এল। ‘আপনার সমস্যা কী?’ ভাইরে, ভোট দিতে পারলাম না।

কেন? এসে দেখি আমার ভোটটা আমার বাবা দিয়ে দিয়েছে।

মানে? এটা কী বলছেন? এবার তো এটা হওয়ার কথা না। সবার আইডি কার্ড আছে... ছবি আছে।

ভাইরে, ইইই (কান্না), বাবা ভোট দিয়ে গেছে, তাতে আমার আফসোস নেই... বাবা আর আমি এক দলই করতাম। ভোট ঠিক জায়গাতেই পড়েছে। কিন্তু আমি অন্য কারণে কাঁদছি।

কী কারণ?

বাবার সঙ্গে দেখা হলো না। আর ১০ মিনিট আগে আসলে দেখা হয়ে যেত।

এটা কেমন কথা, বাবার সঙ্গে দেখা ভোটকেন্দ্রে কেন করতে হবে? বাসায় করলেই হয়।

সেখানেই তো সমস্যা রে ভাই। বাবা তো ১০ বছর আগেই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন... ইইই...।

তবে এটা নেহাতই একটা জোক। এবার এমনটা শোনা যায়নি যে একজনের ভোট আরেকজন দিয়ে ফেলেছে। ছবি সংবলিত ভোটের তালিকা থাকায় সে সুযোগ এবার ছিল না। বিদেশি পর্যবেক্ষকেরাও সেটা স্বীকার করেছেন। এবার আমরা অপেক্ষা করছি নতুন সরকার আমাদের জন্য নতুন কী করে।

খালেদা জিয়া প্রসঙ্গে একজন বলল, 'তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী না হয়ে একদিকে ভালোই হলো।'

কী রকম?

উনার আসলে জাতিকে দেওয়ার আর কিছু নেই।

কেন?

তিনি গতবার তাঁর দুই ছেলেকেই সব দিয়ে দিয়েছেন; জাতিকে দেওয়ার আর তাঁর কিছু নেই।

সবশেষে নিউ ইয়ারের একটা টিপিক্যাল জোক। থার্ডিফাস্টের পার্টি অ্যাটেন্ড করে গভীর রাতে দুজন বাসায় ফিরে চলেছে টলতে টলতে। গলা পর্যন্ত পান করেছে তারা। দুজন একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। কাজেই ঠিকানা তো একটাই।

ওহে, চারদিক যেভাবে ঘুরছে, বাসায় পৌঁছাতে পারব বলে মনে হয় না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। এক কাজ করলে

কেমন হয়?

কী কাজ? কাছাকাছিই আমার শ্বশুরবাড়ি আছে, আজ রাতটা ওখানেই কাটাই।

তাই চল। কিন্তু কীভাবে যাব? চারদিক সবকিছু ঘুরছে যে।

এখানেই দাঁড়া, ঘুরতে ঘুরতে দেখবি শ্বশুরবাড়ি ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন টুক করে দরজা খুলে ঢুকে যাব।

গুড আইডিয়া।

তারা দাঁড়িয়ে রইল। ঘুরতে ঘুরতে শ্বশুরবাড়ি এল না। একটা গাড়ি এল। পুলিশের গাড়ি।

তাদের শ্বশুরবাড়িই নিয়ে গেল। তবে সে অন্য শ্বশুরবাড়ি!! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,

জানুয়ারী ০৫, ২০০৮

43) পাদুকাশিল্প রক্ষায় জাইদির সফল বেল-আউট

ইতিহাসে রাজনৈতিক মতলবে জুতা-বন্দনা সাহিত্য পদ-বন্দনার চেয়ে প্রাচীন। এই সেদিন, মাত্র কয়েক শ বছর আগে, জয়দেব গদগদ হয়ে শ্রীরাধাকে বললেন, ‘দেহি পদপল্লব মুদারম।’ অথচ তার হাজার বছর আগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে রওনা হলে তাঁর ভাই ভরতচন্দ্র রামচন্দ্রের জুতাজোড়া পা থেকে খসিয়ে নিয়ে এসে সিংহাসনের ওপর রেখে দিব্যি আয়েশে ১২ বছর রাজত্ব করলেন। পায়ের ব্যবহার কবি-সাহিত্যিকদের পদ-বন্দনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জুতার বহুমুখী ব্যবহার বিবর্তনের ধারায় অতি চমৎকার ক্রমবিকাশমান। মধ্যযুগে জুতা ব্যবহারের বহুমুখী ধারা খানিকটা ঝিমিয়ে থাকলেও আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের ‘জুতা আবিষ্কারের’ আগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে বেশ একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। একবার কলকাতায় মঞ্চনাটক দেখতে গিয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে দুর্যোধনবেশী মঞ্চাভিনেতার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র এক পাটি পাদুকা ছুড়ে মেরেছিলেন। ওই ঘটনায় ধনী এবং দানবীর ঈশ্বরচন্দ্রের মনের বড়ত্ব নিয়ে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর ছুড়ে মারা পাদুকা ছিল নম্বরবিহীন চটি-তাও দুই পাটি নয়, মাত্র এক পাটি। জুতা ব্যবহারের বিবর্তনের পথ বেয়ে একবিংশ শতাব্দীর তরুণ ইরাকি জাইদি ঈশ্বরচন্দ্রের তুলনায় অনেক বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন। ইরাকের চরম আর্থিক

দুর্দশার দিনেও তিনি এক পাটি নয়, পুরো একজোড়া এবং সস্তা চটি চপ্পল নয়, খাঁটি চামড়ার তৈরি ১০ নম্বর অক্সফোর্ড শু দিল খুলে বুশ সাহেবকে দান করেছেন। দুনিয়াব্যাপী মহামন্দা সৃষ্টির মহানায়ক বুশ সাহেব সম্প্রতি তাঁর নিজ দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে বিলিয়ন ডলারের বেল-আউট প্রোগ্রাম নিয়েছেন। অর্থাৎ সরকারি কোষাগার চেঁছেপুছে সব টাকা দেশের লোকসানি ব্যবসায়ীদের গাঁটে তুলে দিয়ে শেষরক্ষার জন্য তাঁর পেরেশানির শেষ নেই। অথচ তৃতীয় বিশ্বের ব্যবসায়ীরা এদিক দিয়ে একেবারেই এতিম। চামড়া ব্যবসায়ীদের কথাই ধরা যাক। মহামন্দার তাগুবে বেচারারা একেবারে দিশেহারা দিগ্বিদিকশূন্য। তবে এ সপ্তাহে ঘটে যাওয়া ইরাকি জাইদির ঘটনায় চামড়া ব্যবসায়ীরা এবার সুড়ঙ্গের শেষে উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পেয়েছেন। বুশ সাহেবের চাঁদমুখ লক্ষ করে ছুড়ে দেওয়া পুরো একজোড়া নয়, স্রেফ এক পাটি জুতার বাজারমূল্য এখন এক কোটি ডলার। সেই হিসাবে একজোড়া জুতার দাম দুই কোটি ইউএস ডলার। অর্থাৎ বাংলা টাকার বর্তমান মান হিসাবে একজোড়া জুতার দাম ১৫৬ কোটি টাকা। ধনী দেশের ব্যবসা বাঁচানোর জন্য বুশ সাহেবেরা সরকারি কোষাগার ভেঙে বিলিয়ন ডলারের বেল-আউট প্রোগ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের চামড়া ব্যবসায়ীদের বাঁচানোর জন্য জাইদির বেল-আউট প্রোগ্রাম নিজগুণে নিঃসন্দেহে ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ কাজে কোনো দেশের সরকারি কোষাগারে হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিশ্বসংসারে এমন মহতী উদ্যোগের সাফল্যের জন্য এখন বাগদাদ শহরে ধারণকৃত কয়েক সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনচিত্রটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। তবে ২০০৯-এর ২০ জানুয়ারির পরে বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হিসেবে বুশ রয়্যালটি দাবি করে বসলে বেচারাকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, মহামন্দার প্রভাবে বুশের পেটেও ছুঁচোর কেতন শোনা যেতে পারে। তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ০৫, ২০০৮

44) একটি ডিজিটাল গল্প - মহিতুল আলম পাভেল

‘হতচ্ছাড়া, বেলা দশটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমানো! আজ পিটিয়ে যদি তোর চামড়া না ছাড়াই...’ ডিজিটাল অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দেও হাসানের যে ঘুমটা ভাঙেনি, তাই চটে গেল বাবার এই হুকুমারে। রাগে ঘড়িটা ছুড়ে মারতেই তা আঘাত হানল দেয়ালে ঝুলানো ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিটাতে। বাঁধাই করা ছবিটা নিচে পড়েই ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। এত শব্দ হলো, ঠিক যেন ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড! ছবি ভাঙায় ঘরে হইচই আরও বেড়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাসান। তারপরই মনে পড়ল, ডিজিটাল রেডিওটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। খেলার আপডেটটা জানা যেত। হঠাৎ হাসানের চোখে পড়ল-একটি ডিজিটাল ওজন মেশিন নিয়ে একটি লোক বসে আছে। নাশতা না সেরেই বাইরে বেরিয়েছে হাসান। ওজন কতটুকু কমল মেপে দেখা দরকার। ওজন মেপে হাসানের মেজাজ আরও খারাপ হলো-তার ওজন নাকি ২৫ কেজি! হাসান বিকেলে যে ছাত্রটাকে পড়ায়, আজ তাকে দুপুরেই পড়াতে চলে এল। ডিজিটাল ক্যালকুলেটর দিয়ে অঙ্কটা ঠিক মতো করাতে পারলেও ব্যাঘাত ঘটল ইংরেজির বেলায়। হাসানের ছাত্র হঠাৎই আবিষ্কার করল, তার স্যার ডিজিটাল ডিকশনারি ব্যবহার করতে পারে না! যদিও স্যার স্বীকার না করে ওকে ধমকধামক দিয়ে চলে গেল। মোবাইল ফোনে সেভ করা ১১ ডিজিটের নম্বরটিতে অনেক চেষ্টা করেও কানেক্ট মানুষটির কণ্ঠ শুনতে পেল না হাসান। তখনই চোখে পড়ল একটি ডিজিটাল ব্যানার, ‘ফোন করা যায়।’ দোকানে ঢুকে ডিজিটাল ফোন দিয়ে নিশিদের বাসায় ফোন করল সে। নিশিই ফোন ধরল। ফোন বন্ধ থাকায় অনেক ‘সরি’ হয়ে বিকেলে হাসানকে দেখা করতে বলে নিশি। নিশির সঙ্গে সময়টা ভালোই কাটে হাসানের। আজও তা-ই কাটল। বিদায়বেলা নিশি তার ব্যাগ থেকে একটি ডায়েরি বের করে হাসানকে দিয়ে বলল, ‘এটা তোমার জন্য।’ ডায়েরিটা খুলতেই ‘হো হো’ হাসির ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। চমকে লাফিয়ে ওঠে হাসান। আর তাতেই হেসে ওঠে নিশি। বলে, ‘এটা একটা

ডিজিটাল ডায়েরি, এটা খুললেই এ রকম ভূতের হাসি শোনা যাবে। রাতে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে হাসান। ছিনতাইকারীকে কিছুই দিতে রাজি না হওয়ায় যথারীতি উত্তম-মধ্যম খেতে হয় তাকে। একটু পর হাসান নিজেকে আবিষ্কার করে একটি ডিজিটাল ল্যাবে। তাকে নাকি একটা ডিজিটাল এক্স-রে করাতে হবে।

২০২১ সালে নাকি বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ পরিণত হবে। তবে এ মুহূর্তে দুনিয়ার সব ডিজিটাল যন্ত্রের ওপরই তার চরম রাগ হচ্ছে। মহিতুল আলম পাভেল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২, ২০০৮

45) এখন কি আর বসে থাকার যুগ আছে!

এখন কি আর বসে থাকার যুগ আছে! সুমাইয়া শিমু কাঁদলে নিজেকে কেমন লাগে, সেটা দেখার জন্য তিনি আয়নার সামনে গিয়ে প্রায়ই কাঁদেন। কাঁদতে কাঁদতে ভাবেন-নাহ্, যতটা খারাপ লাগার কথা ছিল ততটা খারাপ লাগছে না। তাঁর ধারণা, কান্নানোজাইটিস নামের কোনো রোগ আছে তাঁর। কিন্তু এ নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতেও ভয় পান, যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকে, তখন তো কেঁদেও কুলকিনারা হবে না। এবারের রস আলোচনে নিজের সম্পর্কে এভাবেই বলেছেন সুমাইয়া শিমু, সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা ২০০৯ সাল এল। বছরের শুরুতে আপনার অনুভূতি কেমন? -২০০৮ সাল শেষ নাকি!

গেল বছরের সঙ্গে কোন ব্যাপারটি আপনার এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে?

-প্রতিদিন সকালে উঠেই মেকআপ নিতে হয়। আগেও অবিবাহিত ছিলাম, এখনো তা-ই আছি। আপনার মতে, নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের প্রথম অঙ্গীকার কী হওয়া উচিত?

-এবার নির্বাচিত হওয়ার পর যদি এ অঙ্গীকারগুলো পূরণ করতে না পারি, তবে আর কোনো দিনও অঙ্গীকার করব না।

এ যুগের মেয়েরা বিয়ে বসে না, বিয়ে করে, কেন?

-এখন কি আর বসে থাকার যুগ আছে!

এ দেশে শিক্ষিতের হার কবে শতকরা ১০০

ভাগ হবে বলে আপনার মনে হয়?

-এই ধরুন গিয়ে শতকরা ৯৯ শতাংশের পরপরই।

আপনার মতে এ দেশে সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিস কী?

-পরামর্শ (পয়সা লাগে না তো!)।

কোন বিষয়টা সব সময় মেনে চলেন?

-আমার কান্না রোগ আছে। যখন-তখন কাঁদি।

কান্নার সময় আয়নার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি। আয়নায় দেখতে দেখতে কাঁদি, খুব বেশি বিদ্রোহী লাগছে না তো!

আপনার কোনো এক ভক্ত বলা নেই, কওয়া নেই এসে যদি বলে, 'শিমু, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, আমাকে বিয়ে করো,' তখন আপনি কী বলবেন?

-আমাকে পেলেও কি তুমি অমর হবে? রাস্তা মাপো।

ভালো আছি, ভালো থেকো...

-নতুন নাটক নিয়ে ফেসবুকে কमेंটস লেখো। বইয়ের ভেতরে লেখা থাকে কেন?

-নইলে যে সবাই খাতা ভেবে ভুল করবে!

আপনার কাছে মোবাইল ফোনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি?

-বিদ্যুৎ চলে গেলে আলো জ্বালানো যায়।

ভাবতে ভালোই লাগে...

-টেলিভিশনে এখন আমাকে দেখা যায়।

মেয়েরা সব সময় তটস্থ থাকে কোন বিষয়টি নিয়ে?

-টেনশন না করার মতো বিষয়গুলো নিয়েই তারা সাধারণত টেনশনে থাকে।

পৃথিবীতে কার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি?

-আপনারা তো ভাবেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতির। আসলে কিন্তু বিদ্যুতের।

আপনার জীবনে কোন ব্যাপারটি প্রাপ্তি হয়ে ধরা দেয়নি?

-আমার হাতের লেখা এত খারাপ, অথচ তার পরও আমি ডাক্তার হইনি! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২, ২০০৮

46) ডিজিটাল বাংলাদেশ - একটি

জনমত জরিপ

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হবে। ঢাকা

শহরের কয়েকটি পরিচিত এলাকা ঘুরে
জনগণের কাছে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানতে
চাওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে--ডিজিটাল
বাংলাদেশ বলতে আপনি কী বোঝেন?
-ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে কী হবে?

-ডিজিটাল বাংলাদেশে আপনার প্রত্যাশা
কী?আগ্রহী-অনাগ্রহী অনেকেই নিজেদের
মতামত দিয়েছে। সেই মতামতগুলোই
ক্রমানুসারে তুলে ধরা হলো। হুমায়রা চৌধুরী
টুম্পা

পুষ্টিতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ আমার কাছে এমন হলে
ভালো হতো যেন সবার চোখের দিকে তাকালেই
বোঝা যায়, এ কেমন মানুষ, ভালো না খারাপ।
আর দুর্নীতিবাজ কি না, তাহলে সবাই কোনো
উল্টাপাল্টা কিছু করতে পারত না লজ্জায়। দুলাল
ঝালমুড়ি বিক্রেতা

‘কতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন।’
যখন দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, তখন মাথা
নামিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পেঁয়াজ কাটছিলেন।
তৃতীয় প্রশ্ন করতেই অসহিষ্ণুতার সুরে বললেন,
‘যান তো ভাই, কাম করতে দেন, যত্তোসব
আজাইরা প্যাঁচাল।’ ধমক খেয়ে যখন চলে
এলাম, তখন পেছন থেকে তিনি ডেকে বললেন,
‘ভাইজান, শুনেন, ‘আমরা আর কী চাই! দেশ
ভালো চললেই তো হলো।’সোহাগ

তেজগাঁও কলেজ

কথাটা শুনছি, কিন্তু কিছুই বুঝি নাই। লিটন
শ্যামলী

ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে সারা দেশে সার্বিক
সম্পর্ক সবার মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে আসবে। মিলন
আগারগাঁও

আমি আসলে জিনিসটাই বুঝি না। বেলাল
তালতলা

শেখ হাসিনা এটাকে যেভাবে বলেছেন, অনেকটা
তার ওপর নির্ভর করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ
বলতে আমি বুঝি বর্তমান অবস্থা থেকে মডার্ন
ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা, যেখানে
টেকনিক্যাল সব সুবিধা থাকবে। মলি

মিরপুর-১২

-কিছুই বুঝিনারে ভাই, আমারে বুঝাইয়া দেন।

-যদি আসলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়, তাহলে

আমি চাইব তথ্যের স্পষ্ট প্রকাশ। তাহলে কেউ
আর 'ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না'
জাতীয় কথা বলতে পারবে না। রতন

তৃতীয় শ্রেণী

আমি চাই যেকোনো ভিডিও গেমস খেলতে,
যেন তা চাইলেই পাই। হোটেলে যেমন ওয়েটার
থাকে, ঠিক তেমনি নতুন নতুন গেমস নিয়ে
তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। ডাকলেই গেমস দিয়ে
যাবে। সাইফুল ইসলাম

শেকুবি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমি বুঝি
টেকনোলজিক্যাল দিক দিয়ে অনেক উন্নতি ও
সরকারের মধ্যে কাগজবিহীন একটি যোগাযোগ
মাধ্যম, যাতে মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাগজের
দরকার না হয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি
বুঝি। শাহাদাত ও

ধীমান রায়

কাজীপাড়া

ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, তা-ই তো ঠিকমতো
জানি না। আমাদের দেশের রেজুলেশনটা এখন
সাদাকালো। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে আমাদের
দেশটা কালারফুল হবে। রোমান মানিক

শেকুবি

-ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে হলো এমন একটি
বাংলাদেশ, যেখানে অর্থব্যবস্থা কোনোভাবেই
টালমাটাল থাকবে না।

-ডিজিটাল বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
অনেক বেশি হবে। অনেক সময় সেভ হবে।
এতে আমরা অন্য কাজ করতে পারব।

-নেট সার্ভিসিং উন্নত করতে হবে। বাইরের
দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এখনো
ইলেকট্রনিকসের দাম বেশি। এগুলো সুলভ
করতে হবে। গ্রামের মধ্যেও ইন্টারনেট সুলভে
চালু করতে হবে। কৃষিব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর
করতে হবে। যেকোনো প্রযুক্তির সুবিধা আমরা
খুব সহজে পেতে চাই। মধ্যস্থ কারবারি চাই
না। বাদল

ঢাকা মেডিকেল

-যে বাংলাদেশে পুরা জীবনটাই অটো হইয়া
যাইব, সেটাই ডিজিটাল বাংলাদেশ।

-ডিজিটাল বাংলাদেশে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে
পারলেই আমি খুশি। মামুন

রিকশাচালক

-ডিজিটাল আমেরিকা হয় নাই, ডিজিটাল ইংল্যান্ড হয় নাই, ডিজিটাল বাংলাদেশ হইব কেমনে!

-প্রত্যাশা কিছু নাই। আমার যা বয়স তাতে তত দিন তো বাঁচুম না। নাজ, ডায়না, বর্ষা স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যাশা, নারীর সম-অধিকার থাকতে হবে। তাদের মত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। রিপন বুয়েট

-ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন? আমার থেকে শেখ হাসিনা অনেক ভালো বলতে পারবেন।

-ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে আবার অ্যানালগ বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য আন্দোলন হবে।

-খুশি মুখ চাই। লিপু, রিমেল, বাবলু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

হবে মনে হয় কিছু একটা, যখন হবে তখন আবার আইসেন, বইলা দিব। সাইদুল করিম পরশ

মিরপুর

কোথাও কোনো তৈলবাজি চলবে না। কারণ, ডিজিট চাপতে হয়, তেল দিতে হয় না। নারগিস সুলতানা শিবলী স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

-প্রযুক্তি ও তথ্যনির্ভর বাংলাদেশ, যেখানে প্রযুক্তি যেমন থাকবে, তথ্যনির্ভরতাও থাকবে। ডিজিটাল বাংলাদেশে শুধু ডিজিটই থাকবে।

-সবাই প্রযুক্তির সঙ্গে একাত্ম হবে। ইস, যদি মানুষকে ফ্যাক্স করে অন্য জায়গায় পাঠানো যেত! রফিকুল ইসলাম

নটর ডেম কলেজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমার মনে হয় একটি গ্রাফিক্যাল বাংলাদেশকে বোঝানো হচ্ছে।

সেটাতে বহির্বিশ্বের সবাই একবার নজর

বোলালেই বুঝতে পারবে যে আমাদের দেশটা কেমন। যেমন-আমরা ক্যালকুলেটরের দিকে তাকালে বুঝতে পারি যে এটা ক্যালকুলেটর, কম্পিউটারের দিকে তাকালে কম্পিউটার-এই রকম। সুফিয়া খাতুন

গৃহিণী

কী আর হইব, যোগাযোগ বাড়ব, অনেকের খোঁজখবর নেওয়া যাবে। আরাফাত

ষষ্ঠ শ্রেণী

-দূর, জানি না।

-আমরা ফ্রি ফ্রি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারব, রাস্তায় রাস্তায় গেমস খেলা যাইব।

-আমি চাই পড়ালেখা যেন মোবাইলের সিমের মতো মাথার ভেতরে ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, তাইলে অনেক মজা হইব। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২, ২০০৮

47) বাংলাদেশ ডিজিটাল ডিজিটালে টালমাটাল

ভাই বিদেশ থাকতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁর কোনো খোঁজখবর ছিল না। হঠাৎ একদিন বিদেশ থেকে চিঠি লিখলেন, তিনি দেশে টাকা পাঠাবেন। বললেন অ্যাকাউন্ট আইডি পাঠাতে। ছোট ভাই তাঁর যত ইয়াহু আর জি-মেইল অ্যাকাউন্ট আইডি ছিল, সবই পাঠিয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল যুগের ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাটা সঠিক বলা যায় না। ফেসবুক, হাই-ফাইভসহ এ রকম আরও অনেক সাইট আছে, যারা বন্ধুত্বের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে দুনিয়াজুড়ে। দিন-রাত চলে ছোট রুমে বসে আড্ডা, ইংরেজিতে বলে চ্যাট। কিন্তু এদের কতজনের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ হয়েছে? নেটে চ্যাট হচ্ছে, মেইল পাঠানো, প্রতিদিন প্রোফাইলের ছবি আপডেট হচ্ছে, এরপর আবার সশরীরে দেখা হওয়ার কী দরকার? সবকিছু মিলিয়ে তো বন্ধুটির সম্পর্কে আগাপাছতলা একটা ডিজিটাল ভিউ তৈরি হয়েই গেছে। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছে আড্ডার, ঠিক সাতটায় উপস্থিত থাকতে। কিন্তু বন্ধুটি সময়মতো আসতে পারছে না বলে ফোনে কল দিয়ে বলছে, ‘দোস্তু, বাসায় বিদ্যুৎ নাই, আইপিএসও ড্যাম, বিদ্যুৎ এলেই আড্ডায় (চ্যাটরুমে) ঢুকব।’ এখন ফেসবুকই সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট। দিন-রাত এ-ওকে ফ্রাইড চিকেন থেকে শুরু করে ঠান্ডা পানীয়-সবই পাঠাতে পারছে। খেতে ডাকলে ছেলেমেয়েরা জবাব দিচ্ছে, ‘আরেকটু, বার্গারটা ডাউনলোড হতে সময় লাগবে, বিগ সাইজ কি না!’ অথচ ইন্টারনেটিং শেষ করেই সে বলে ওঠে, ‘মা, টেবিলে ভাত দাও, খাব।’ তাহলে এতক্ষণ যা খেলি তাতে কী উপকারটা হলো, বিগ সাইজ বার্গারটা নামানোরই বা অর্থ কী? প্রতিদিন

এভাবে যে পরিমাণ হিউম্যান আওয়ার
ইন্টারনেটিংয়ে আনপ্রোডাক্টিভলি ব্যয় হচ্ছে, তা
এক করলে কী করা যেত, সেটা হিসাব কষে
বলতে হবে। ভালো কিছু তো বটেই। এখনকার
বন্ধুবান্ধব বাসায় আসার আগে মানুষজনের খবর
না নিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাসায় নেট আছে তো?
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ,
এমনই জালে জড়ালে গো ধরা,
তোমাতেই মজেছে সকলে,
মানবিকতা রয়ে গেল অধরা। বছরে কয়টা
নতুন জাতের ধান, খাদ্যশস্য আবিষ্কার হচ্ছে
আর কয়টা নতুন প্রযুক্তি আসছে বাজারে?
সিআরটি মনিটর বদলে নতুন করে একটা
এলসিডি মনিটর কেনো, ওটা চোখের জন্যও
ভালো, দেখতেও সুন্দর। বিজ্ঞাপনে এলসিডির
পাশে গ্লিম সুন্দরীর সহাবস্থানটাও
নজরকাড়া। মোবাইল ফোন আমাদের অনেক
কাজই সহজ করে দিয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু
আমাদের মতো দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ
টাকা মোবাইল ফোনে কেবল অপ্রয়োজনীয় কথা
বলে ওড়ানো হয়, তার কত ভাগ টাকা বছরে
খাদ্য উৎপাদনে ব্যয় হয়? এই হিসাবটা আমার
জানা নেই, জনাব শাইখ সিরাজ, আপনি একটি
উদ্যোগ নিতে পারেন। যা-ই হোক, ডিজিটাল
যুগে মানুষকে ডিজিটালি ভুক্ত রাখার ব্যবস্থা
নিতে হবে, না হলে কাঁহাতক আর অভুক্ত
শরীরে ডিজিটাল বিনোদন সহ্য হবে? মন
বিদ্রোহ করলে শরীর ভোগে, কিন্তু যখন শরীর
বিদ্রোহ করবে তখন? একটি ইংরেজি মাধ্যমের
স্কুলের বিজ্ঞাপনে লেখা হলো তাদের স্কুলের
মতো এত বড় প্লে-গ্রাউন্ড আর কারও নেই।
একসঙ্গে সব ছেলেমেয়ে যা ইচ্ছা খেলতে
পারবে। জায়গা-জমির এই দুর্মূল্যের যুগে
এমন কথা শুনে কার না স্কুলটি দেখতে ইচ্ছে
করে! পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেল প্লে-গ্রাউন্ড
বলতে মাঝারি সাইজের একটি কক্ষ। সেখানে
দুই শতাধিক কম্পিটারের মনিটর পিটপিট করে
জ্বলছে। ছেলেমেয়েরা সেখানে কেউ ফুটবল,
কেউ ক্রিকেট, কেউ ক্রস-পাজল, কেউ মোটর-
রেস, কেউ কমান্ডো খেলা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত।
দারুণ ডিজিটাল উত্তেজনা। এ-ওকে গোল
দিচ্ছে, কেউ ছক্কা হাঁকাচ্ছে, কেউ মাইকেল
শুমেখারকে পেছনে ফেলে দারুণ উচ্ছ্বসিত,

কেউ আবার কমান্ডো হয়ে ইয়া বড় বড়
শত্রুঘাঁটি নিমিষেই গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ এদের
কেউই সকালে একা একা স্কুলে আসতে পারে
না, ছুটি হলে বাবা-মা-চাচা-বুয়ার জন্য গেটে
অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, বইয়ের ওজনে
ঠিকমতো সোজা হয়ে হাঁটতেও ওদের কষ্ট হয়।
এখনকার আন্ডা-বাচ্চারা ঠিকমতো হাঁটতে না
পারলেও কম্পিউটার ওপেন করে ঠিকই মোটর-
রেসে অংশ নিতে পারে। ডিজিটাল যুগের
ডিজিটাল বাচ্চা-কাচ্চা, বড় হয়ে বাস্তববাদী
(অ্যানালগ) মানুষ হবে, এটাই আশা।

ডিজিটালের ভেতরে এখনো অ্যানালগ। বলেছি
যখন, ব্যাখ্যা করা জরুরি। ডিজিটাল এসেছে
ডিজিট থেকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্দায় সংখ্যা, ছবি
ভাসবে। কিন্তু পর্দায় এই সংখ্যা আর ছবি ফুটে
ওঠার আড়ালে আছে অনেকগুলো ছোট বাতির
জ্বলা-নেভা। ঠিক যেমন বাসায় ১০০ ওয়াটের
বাতিটি জ্বলে ও নেভে। আর আছে শক্তি, যা
খেয়ে বাতিগুলো জ্বলে। অতএব এটা পরিষ্কার,
খাওয়া এবং সেই অ্যানালগ জ্বলা-নেভা ছাড়া
ডিজিটাল প্রযুক্তি অসম্ভব। সুতরাং, মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী, ডিজিটাল বাংলাদেশ বানানোর
ঘোষণা দিয়েছেন ভালো কথা, এবার সবার জন্য
সহজলভ্য খাদ্য নিশ্চিত করুন, ডিজিটাল
এমনিতেই হয়ে যাবে। কৃষকেরা নিশ্চয় মাঠে
সারের বদলে ডিজিট ছিটাবে না, কিংবা
ফসলের বিনোদনের জন্য এমপিথ্রিও বাজাবে
না। মানুষ ডিজিটাল বুঝলেও মাঠের ফসল
ডিজিটাল বোঝে না। বোঝে খাদ্য, বোঝে সার।
বাঁচার জন্য ওটাই মূল কথা-ফসলই হোক আর
মানুষই হোক। তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২,
২০০৮

48) তাঁদের রাষ্ট্রপতি বানানো হলে...

হুমায়ূন আহমেদ

-জ্যোৎস্না রাতে পুরো মন্ত্রিসভাকে

বাধ্যতামূলকভাবে বনে যেতে হবে অথবা গলা
পর্যন্ত বালুতে ডুবে জোছনা দেখতে হবে।

-নির্বাচিত সাংসদদের হলুদ পাঞ্জাবি পরে

সংসদে আসতে হবে। মুহম্মদ জাফর ইকবাল

-দেশের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলোগ্রাফিক

স্ক্রিনে দেখানো হবে।

-সংসদে বাচ্চাকাচ্চাদের প্রবেশের জন্য আলাদা কোটা থাকবে। আহসান হাবীব

-সংবিধান কমিকস আকারে বের হবে, যাতে দেশের আপামর জনগণ এমনকি বাচ্চারাও তা বুঝতে পারে।

-যেকোনো অধ্যাদেশ কার্টুনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস

-সাংসদদের বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষুদ্রঋণ নিতে হবে।

-নির্বাচিত সাংসদদের সবাইকে গ্রামীণ চেকের পোশাক পরতে হবে। কাজী জামাল উদ্দিন

-সবাইকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর জন্য খাঁটি সরিষার তেল দেওয়া হবে।

-সংসদ ভবনকে তেলের খনি হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হবে। জুয়েল আইচ

-অধিবেশনের সময় বিরোধী দল সংসদে না এলেও জাদুর মাধ্যমে তাদের প্রতিকৃতি হাজির করা হবে।

-বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচি থাকলে তিনি বঙ্গভবনকে হাওয়া বা ভ্যানিশ করে দেবেন। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

-পুরো সংসদ ভবন ভাইবেরাদরে ভরে যাবে।

-কাউকে ভণিতা করে শুদ্ধ বলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হবে না। সম্রাট শেরশাহ

-ফেসবুক, মেইল, এসএমএস, মোবাইল-সবকিছু বাদ দিয়ে আবার 'ঘোড়ার ডাক'-এর প্রচলন করা হবে।

-বঙ্গভবনকে তিনি নরসিংদীর ঘোড়াশালে স্থানান্তর করবেন। সম্রাট শাহজাহান

-তাজমহলকে জাতীয় সংসদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

-যেহেতু মমতাজকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের শুরু, বাংলাদেশের শিল্পী মমতাজকে জাতীয় শিল্পী বানানো হবে। বিবি রাসেল

-মন্ত্রী হওয়ার জন্য সাংসদদের ক্যাটওয়াকে অংশ নিতে হবে। যিনি সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করবেন তিনি সবচেয়ে ভালো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবেন।

-বিসিএসে ফ্যাশন ডিজাইনের কোটা থাকবে। সিদ্দিকা কবীর

-সংসদ ভবনে অধিবেশন চলাকালে রান্নাবান্নার আয়োজন থাকতে হবে।

-সিদ্দিকা কবীরস রেসিপি বদলে প্রেসিডেন্টস
রেসিপি নামে অনুষ্ঠান বানানো হবে। নবাব
সিরাজউদ্দৌলা

-তাঁর জন্মদিনে 'বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা'-এই
রেকর্ড চালানো হবে।

-বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার কূটনৈতিক
সম্পর্ক জোরদার করা হবে। শফিক রেহমান

-প্রতি সংসদ অধিবেশনে সবাইকে লাল গোলাপ
দেওয়া হবে।

-‘মৌচাক দেখলেই টিল মারতে হবে’-এ জাতীয়
আইন করা হবে। শাইখ সিরাজ

-সংসদ ভবনের আশপাশের খালি জমিতে
চাষাবাদ করা হবে এবং ওই জমি থেকে
উৎপাদিত ফসল দিয়ে সাংসদদের ভরণপোষণ
করানো হবে।

-ঈদের সময় সাংসদদের নিয়ে একটি
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যার নাম হবে
‘সাংসদদের ঈদ আনন্দ’। রস+আলোর সম্পাদক

-প্রতি সোমবার নতুন সংবিধান/সংবিধান
সংশোধনী সংখ্যা বের হবে।

-সাংসদদের রস+আলোর আইডিয়া দিতে বাধ্য
করা হবে। লিখেছেন কিশোর ও দীপ্র

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১২,
২০০৮

49) একদিন আমির খান শাহরুখ খান হত্বিকের সঙ্গে অভিনয় করব

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার কল্যাণে
প্রতিদিনই তারকাদের নানান রকম সাক্ষাৎকার
পড়তে হয় আমাদের। সেসব সাক্ষাৎকারে
অনেক গতানুগতিক প্রশ্নের অতি পরিচিত কিছু
উত্তর দিয়ে থাকেন তারকারা। তারা যা বলেন
আর এর বিপরীতে তাদের মনে কি থাকে সেটা
খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন আত্মবাদ,
চট্টগ্রামের মিল্টন খন্দকার। রস+আলোঃ আচ্ছা,
ইদানীং আপনাকে টিভিতে খুব একটা দেখা
যাচ্ছে না যে!

তারকাঃ আসলে আমি এখন অনেক বেছে বেছে
কাজ করছি। আগের মতো হুটহাট করে স্ক্রিপ্ট
না দেখেই সাইন করে ফেলি না। অনেকেই
আসেন নানা অফার নিয়ে, কিন্তু স্ক্রিপ্ট তেমন
পছন্দ হচ্ছে না। এছাড়া সামনে পরীক্ষার
কারণে পড়াশোনা নিয়েই একটু বেশি ব্যস্ত।
(পরীক্ষা না ছাই। কেউ আমাকে কাজের জন্য

না ডাকলে কি করবো। আর এখনকার নাটকে কি কোন স্ক্রিপ্ট থাকে নাকি? পর্দায় মুখ দেখানোটাই আসল।)রআঃ ওহ! তা জানতে চাইছি, আপনার কয়টা কাজ দর্শক ভালোভাবে নিয়েছে, ব্যবসাসফল হয়েছে বলে মনে করেন? তারকাঃ ওভাবে তো সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না। তবে সংখ্যাটা অনেক। আমার তো সব কাজই ব্যবসাসফল। হলে সিনেমা একদিন চললেও সেটা ছিলো হাউজফুল।

(অমুক প্রযোজক আঙ্কেল তো আমাকে নায়িকা করে এখন পথের ফকির।)রআঃ তা আপনি এ জগতে এলেন কীভাবে? মানে শুরুটা হয়েছিল কীভাবে?

তারকাঃ আমার এক আঙ্কেল একদিন বাসায় আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজের অফার করে বসলেন!

(মুগ্ধ না ছাই, আমি নিজেই উনাকে যে পরিমাণ ফোন করেছি তাতে উনি বিরক্ত হয়ে একদিন আমাকে ডেকেছিলেন।)রআঃ আপনার শুরুটা কীভাবে?

তারকাঃ আমি আসলে ছোট বেলা থেকেই একটা সাংস্কৃতিক আবহে বড় হয়েছি। বাফায় ক্লাসিকাল নৃত্য শিখেছি ছয় মাস, অমুক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছি এক মাস। নতুন কুঁড়িতে অংশ নিয়েছি।

(হিন্দি সিনেমা ছোটবেলা থেকেই ছিলো আমার প্রাণ।)রআঃ তা চরিত্রের প্রয়োজনে আপনি কতটুকু খোলামেলা হতে রাজি আছেন?

তারকাঃ দেখুন, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যদি আমাকে খোলামেলা দেখানোর প্রয়োজন হয়, আমি হব। এটা আসলে ডিপেন্ড করে পরিচালক কে, গল্প কী, কতটুকু খোলামেলা হতে হবে এসবের ওপর।

(সত্যজিৎ বলে কোনো কথা নয়, পারিশ্রমিক দিলে খোলামেলা হতে অসুবিধা কই?)রআঃ বিয়ে করবেন কবে?

তারকাঃ ওমা, আমি তো এখনো বাচ্চা? এখনই ওসব নিয়ে ভাবছি না।

(বিয়ের কথা বলে কেন কষ্ট দিচ্ছেন। বিয়ে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তো দিনের পুরোটাই যায়। শুধু বিয়ে করলে ডিমান্ড থাকবে না এই ভয়ে বিয়ে করতে পারছি না।)রআঃ বিয়ে যখন করবেন তখন কি এ লাইনের কাউকে করবেন?

তারকাঃ আমি চাই আমার স্বামী হবে অনেক কেয়ারিং, দায়িত্বশীল-আমাকে যেন বুঝতে পারে। এ জগতের হলে তো সমস্যা নেই। (যে জগতেরই হোক না কেন টাকাওলা হতে হবে।) রআঃ নতুন উঠতি নায়ক খান্না খানের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে কীসব গুজব চলছে, এর কতটা সত্যি?

তারকাঃ পুরোটাই মিথ্যা, বানোয়াট। আসলে আমাদের দুজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্বকে হিংসা করে ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন এসব ছড়াচ্ছে।

(ভাই, দিলেন তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ওই বদ নায়কের নামটা শুনলেই আমার গা জ্বলে। ও একটা ঠগ, প্রতারক, বিশ্বাস করে ঠকেছি।) রআঃ কার সঙ্গে কাজ করতে পারলে ধন্য মনে করতেন?

তারকাঃ আমি তো প্রতিদিনই ভাবি একদিন আমার খান, শাহরুখ খান, হৃত্বিকের সঙ্গে অভিনয় করব। এ ছাড়া হলিউডের ব্রাডপিট, টম ক্রুজকেও সহঅভিনেতা হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে।

(দেশীয় ভুঁড়িওয়ালা নায়কের পাশে মূল নায়িকা হিসেবে একটা চান্স পেলেই আপাতত বাঁচি, হলিউড-বলিউড তো স্বপ্নেও দেখি না।) রআঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য।

তারকাঃ আপনাকেও ধন্যবাদ। ঠিকমতো সময় দিতে পারিনি বলে মনে কিছু নিয়েন না।

(বড় বাঁচা বাঁচালেন ভাই, এই আকালের দিনে একটা ইন্টারভিউ ছাপবেন! ঠিকমতো সময় কী, আপনি চাইলে পুরো সপ্তাহ ধরে ইন্টারভিউ দিতাম।) সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

50) নেতাদের কসুর

দেখিনু সেদিন খবরে
প্রতিপক্ষ বলে বাবু সাব তারে প্রকাশ্যে পাঠায়
কবরে

চোখ ফেটে এল জল
এমনি করিয়া জগত জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে জনগণের শ্রম দিয়ে ওই অর্থনীতিটা চলে,
দুর্নীতিবাজ তাতে জেঁকে বসে, জনগণ পড়ে
তলে।

উন্নতির জোয়ারে ভাসাইয়া দিয়াছ? চুপ রও যত
মিথ্যাবাদীর দল!

গণমানুষের টাকা খেয়ে খেয়ে কত ক্রোর পেলি

বল?

রাজপথে তব ফাটিতেছে বোমা, দুর্নীতিটাও চলে,
ঘরে ঘরে চলে লোডশেডিং আর দেশটা পড়েছে
জলে।

বলো তো এসব কাহাদের দান? কোটি টাকার
অটালিকা,
কার খুনে রাঙা? অতীতেই দেখ প্রতিক্ষণে আছে
লিখা

আইন জানে নাকো কিন্তু দেশের জনসাধারণে
জানে,

ওই বোম, ঘুষ ওই দুর্নীতি অটালিকার মানে!
আসিতেছে দুর্দিন

দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দাম দেনা শোধার
আশা ক্ষীণ-

হকিস্টিক, কাস্তে, লগি চালাইয়া ভাঙিল যারা
নগর,

নগরের পাশে রচিল তাহারা মানবতার কবর,
যাহারে সেবিতো গড়িয়া উঠিল ক্যাডার ও
চামচাগুলি

যাহারে বহিতে জনগণের আজ শান্তি হয়েছে
ধূলি,

তাহারাই নেতা, তারাই দেবতা (!), গাহি
তাহাদের গান-

তাদেরি ‘মহৎ’ গলায় ঝুলিয়া অগণতন্ত্রের
উত্থান। [কাজী নজরুল ইসলামের কুলি-মজুর
অবলম্বনে] ফারহানা ইয়াসমিন, দিনাজপুর

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

51) ফুটবল সংগীত

চল্ চল্ চল্

আমরা খেলিব ফুটবল

বলের শরীরে হানি আঘাত,

বিপক্ষকে করিব মাত

টুটাব তাদের জেতার স্বাদ

পাশ দিয়ে যাই চল।

তড়িৎবেগে ছুটিয়া যাস

নির্নে উতলা মাঠের ঘাস,

জয়ের ধ্বনি শুনিতে পাস

চল্ চল্ চল্।

নব জয়ের গাহিয়া গান

বল লয়ে মারিব টান,

হইব নাকো হয়রান

চরণে নবীন বল।

চলরে নওজোয়ান

শোনরে পাতিয়া কান

কিক মার ওই গোলবারে

শোন বিজয়ের আহ্বান।

চল্ চল্ চল্

আমরা খেলিব ফুটবল। [কাজী নজরুল

ইসলামের রণসঙ্গীত অবলম্বনে] মো. তাসরিক

সিকদার সৌরভ, পোস্তুগোলা, ঢাকা

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

52) অধিনায়কের তৃতীয় হাত

খেলায় নামার আগে

রস+আলোঃ দলের পারফরমেন্স নিয়ে আপনি
কতটা সন্তুষ্ট?

অধিনায়কঃ পুরোপুরি সেটিসফাইড। বিশ্ব মানের
যেকোনো দলের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আমরা।

(আমার নিজের যা পারফরমেন্স, তাতে বাকি
সবাইকে তো ফিটই বলা যায়। বিশ্বমান তো
দূরে থাক, পাড়ার টিমের সঙ্গে পেরে উঠি কি
না?) রআঃ পরের সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দল
কেমন করবে বলে মনে হয়?

অধিনায়কঃ নিঃসন্দেহে ভালো করব। আমরা
মাঠে নামব সিরিজ জিততে।

(সিরিজ জেতা দূরে থাক, অস্ট্রেলিয়ার নাম
শুনলেই মনে হয় কেন শুধু শুধু দুই দল রোদে
পুড়ে কষ্ট করি।) রআঃ দলের কোন দিকটা বেশি
ভালো মনে হচ্ছে, ব্যাটিং না বোলিং?

অধিনায়কঃ আমাদের বর্তমান দলটা অতীতের
যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যালেন্সড টিম। ব্যাটিং,
বোলিং দুটোই আমাদের খুব ভালো হবে।

(এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে নড়বড়ে টিম।

ব্যাটিং-বোলিং কোনোটিতেই এখনো ভরসা
করার মতো কেউ নেই। শুধু সবার মোবাইলে
এখনো ব্যালেন্সটা ঠিক আছে বলেই বলেছি
ব্যালেন্সড টিম।) রআঃ ব্যাটিং, বোলিংয়ে নতুন
কোনো চেঞ্জ কিংবা চমক থাকবে কি?

অধিনায়কঃ হ্যাঁ, চেঞ্জ তো থাকবেই। ছোটখাটো
দু-একটা পরিবর্তন হয়তো হবে। আর আমি তো
মনে করি, আমাদের সবার যে কেউ যেকোনো
সময় চমক দেখানোর ক্ষমতা রাখে।

(দিন-রাত নিজের চেঞ্জের আশঙ্কা কইরা কূল
পাই না। আমি যে এখনো অধিনায়ক আছি

এটাই তো সবচেয়ে বড় চমক।) খেলায় হারার
পরেরআঃ দলের পারফরমেন্সকে এখন কীভাবে
দেখেন?

অধিনায়কঃ আমি মনে করি, আমরা উন্নতি করেছি।

(আমি ছাড়া সবাই ভালো করেছে। ওদের উন্নতি দেখে নিজের আসন নিয়ে আমি শঙ্কিত।) রআঃ ব্যাটিংয়ের সমস্যা তো গেল না?

অধিনায়কঃ এটা আসলে পিচ কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করে। ওরা যে কন্ডিশনে খেলে আমরা ওই কন্ডিশনে খেলে অভ্যস্ত না।

(আসল কথা হলো, অধিনায়ক হিসেবে ডান ও বাম হাতের পাশাপাশি অজুহাত হচ্ছে, আমার সবচেয়ে বেশি উপকারী হাত।) রআঃ দলের বোলিং নিয়ে কী ভাবছেন?

অধিনায়কঃ আমি তো মনে করি বোলিং অনেক ইমপ্রুভ করেছে।

(আগে ৫০ ওভার বল করতে হলেও এখন পরে ব্যাটিং করলে বিপক্ষ দলের জিততে ৫০ ওভার লাগে না।) রআঃ দল কি আরও ভালো করতে পারত?

অধিনায়কঃ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। আমরা আমাদের সাধ্যমতো খেলেছি। কিন্তু তার পরও হয়তো আরও ভালো খেলতে পারতাম।

(যান-প্রাণ দিয়ে যতটুকু খেলেছি তাতেই শরীর দিয়ে চিকন ঘাম ছুটে গেছে। এর চেয়ে ভালো কীভাবে খেলব?) রআঃ ফিল্ডিংয়ে তো অনেক সমস্যা। কয়েকটা ভালো ক্যাচ মিস হয়ে গেছে। এমনটা কেন হলো?

অধিনায়কঃ ক্যাচ মিস হয়েছে এটা আমি বলতে চাই না। আসলে ওগুলো ছিল অনেক দুঃসাধ্য ক্যাচ। ধরতে পারলে নিঃসন্দেহে ভালো হতো।

(এত কাছ থেকে ওদের ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখে আমরা এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে কখন ক্যাচ উঠেছে টেরই পাইনি।) রআঃ দলের

ধারাবাহিকতা নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠছে, সেগুলোকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

অধিনায়কঃ দেখুন, ক্রিকেটই হচ্ছে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা। দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে।

(অস্ট্রেলিয়া জিতবে এটাই তো ঘটনা, হারলে ওটা হতো দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা নিশ্চয় কারও কাম্য নয়?) রআঃ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ঠিক করেছেন?

অধিনায়কঃ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলেছি এটাই অনেক কিছু। সামনে বিদেশের মাটিতে সিরিজ আছে বেশ কয়েকটা। আশা করি এখানকার

ছোটখাটো ভুলগুলো শুধরে নিয়ে সেখানে কাজে লাগাব।

(আপাতত আত্মীয়স্বজনের বাজারের লিস্ট তৈরি নিয়ে ব্যস্ত আছি। ফাউ খরচে বিদেশভ্রমণে যাব এই খুশিতেই বাঁচি না! শেখাশেখির সময় কই?) রআঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

অধিনায়কঃ আপনাকেও। আমাদের জন্য দর্শকদের দোয়া করতে বলবেন।

(এই সাংবাদিক প্রজাতিটাই যদি পৃথিবীতে না থাকত, সবকিছু কত সহজ হয়ে যেত। দোয়া করার দরকার নেই, খালি গালাগালি না করলেই চলবে।) সুমাইয়া মুনতাহা, উপশহর, রাজশাহী

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

53) আধুনিক শকুন্তলা

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা অবলম্বনে]

অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে দুনন্ত নামে এক সম্রাট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি জানতে পেরেছেন, বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় সুন্দরবন স্থান পেয়েছে। তাই তিনি বেশ কজন বিশ্বস্ত সঙ্গীসাথি নিয়ে সুন্দরবনে মৃগয়ায় এসেছেন।

সুন্দরবনের সুন্দর রূপ দেখে রাজা দুনন্তের মন একেবারে দ্রব হয়ে গেল। প্রচণ্ড আবেগে তিনি গান গাইতে লাগলেন। গান শুনে আশপাশের গাছ থেকে বানরেরা প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পালাতে লাগল। রাজাও গান বন্ধ করলেন।

কারণ তাঁর গান শুনে সব পশুপাখি পালিয়ে গেলে তিনি শিকার করতে পারবেন না। রাজা একটি অত্যাধুনিক জিপে বসেছিলেন। সুন্দরবন জিপ চালানোর জন্য উপযোগী না হওয়ায় তিনি হেঁটে হেঁটেই মৃগের সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু কোথাও কোনো মৃগ দেখতে পেলেন না। রাজা বনের আরও গভীরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেনাপতি রাজাকে বাধা দিতে চাইলেও ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ একটা হরিণশাবক দেখতে পেয়ে

থমকে দাঁড়ালেন রাজা। রাজাকে দেখেই হরিণশাবক দৌড়ে পালাতে লাগল। সম্ভবত রাজার গানের খবর তার কানেও পৌঁছে গেছে। রাজাও হরিণশাবকের পেছনে দৌড়াতে

লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর হরিণটাকে বাটে পেয়ে রাজা সেনাপতিকে আদেশ দিয়ে বললেন, ‘সেনাপতি, আমার তীর-ধনুক রেডি করো। হরিণশাবককে বাটে

পাইয়াছি।’সেনাপতি বললেন, ‘মহারাজ! এই ডিজিটাল যুগে তীর-ধনুক দিয়া হরিণশাবক মারিলে মানসম্মান এই বাদাবনের কাদায় গিয়া নিপতিত হইবে। এই বনের হরিণেরা অত্যন্ত বিটলা প্রকৃতির। তীর-ধনুকে এদের কিছু হয় না। আপনি এই উন্নত রাইফেল দিয়া হরিণ শিকার করুন।’ এই বলে সেনাপতি রাজার হাতে রাইফেল তুলে দিলেন। সামান্য হরিণশাবককে এত শক্তিশালী রাইফেল দিয়ে হত্যা করতে রাজার বিবেক সাড়া দিচ্ছিল না। পরক্ষণেই রাজা ভাবলেন ইসরায়েলের কথা। নিরীহ মানুষকে মারতে ইসরায়েল যদি হোয়াইট ফসফরাস ব্যবহার করতে পারে, তাহলে হরিণ মারতে তিনিও রাইফেল ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হরিণশাবকের দিকে রাইফেল তাক করলেন। এমন সময় চারপাশ থেকে ধূপধাপ আওয়াজ করে অদ্ভুত পোশাক পরা কতগুলো মানুষ এল। রাজা ভাবলেন, এরা নিশ্চয়ই সুন্দরবনের তপস্বী। রাজা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এই তপস্বীদের জন্যই তিনি তপোবনে বাটে পেয়েও হরিণ মারতে পারেননি। এখানেও একই ঘটনা। তপস্বীদের মধ্যে একজন দুই হাত তুলে উচ্চ স্বরে বলল, ‘খবরদার! এইটা আমাগো এলাকার হরিণ। এরে মারার চেষ্টা করলে পিটাইয়া হাঁটুর বাটি খুইলা ফালামু।’রাজাকে অপমান! সেনাপতি গর্জে উঠলেন, ‘খামোশ! ওহে পামর, বর্বর, তোমরা চন্দ্রবংশীয় রাজা দুনন্তের সঙ্গে বেয়াদবি করছ। আমি চাইলে এখনই তোমাদের গ্রেপ্তার করতে পারি।’ সেনাপতির কথায় ওরা হাসতে হাসতে বলল, ‘মহারাজ, আপনার অস্ত্র বাসায় রেখে দেওয়ার জন্য, হরিণ মারার জন্য নয়।’ আরেকজন বলল, ‘শোনে, এইটা ত্যাড়া আক্কাসের এলাকা। চলেন আমাদের সঙ্গে। ওস্তাদের দাওয়াত কবুল করেন। ওরা রাজাকে ধরতে এগিয়ে আসতেই সেনাপতিসহ রাজার সঙ্গীরা অস্ত্র তাক করল। কিন্তু ওরাও পাল্টা অস্ত্র তাক করল। ওদের অস্ত্রগুলো আরও আধুনিক। সঙ্গী সাথিসহ ত্যাড়া আক্কাস বাহিনীর হাতে আটক হয়ে রাজা বনের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। রাজা ভাবলেন, ত্যাড়া আক্কাস নিশ্চয়ই অনেক বড় তপস্বী। কিন্তু তার লোকজনের ব্যবহার মোটেই ভালো নয়। এ ব্যাপারে তিনি

ত্যাড়া আক্বাসের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘মহর্ষি কি আস্তানায় আছেন?’ একজন বলল, ‘জি না, উনি জরুরি কাজে সিঙ্গাপুর গেছেন। তবে ওনার পালিত কন্যা শকুন্তলা আছেন, তিনিই আপ্যায়ন করবেন।’ পথের ধারে গুলির খোসা, সিগারেটের বাঁট দেখে রাজা বুঝলেন, তিনি আস্তানার কাছে চলে এসেছেন। আস্তানার কাছে আসতেই রাজার বাম চোখ লাফাতে লাগল। সুন্দরবনে বিপদসূচক লক্ষণ দেখে রাজা বিনিত হলেন। অতঃপর আস্তানায় প্রবেশ করে রাজা দেখলেন, গাছের নিচে একজন অতি রূপবতী তরুণী বসে আছে। ত্যাড়া আক্বাসের একজন লোক বলল, ‘ম্যাডাম, এরা হরিণ মারতে আইছে। মালপানি ভালোই আছে। কী করুম?’ রাজা বুঝলেন ইনিই শকুন্তলা। শকুন্তলার রূপে রাজা মুগ্ধ হয়ে শকুন্তলাকে বললেন, ‘তোমার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; বাহ্যুগল কোমল বিটপের মতো বিচিত্র শোভায় বিভূষিত। এরূপ রূপবতী আমার অন্তঃপুরেও নাই।’ শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, ‘এই কে আছিস, এদেরকে সাইজ কর।’ আদনান, মিরপুর, ঢাকা

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

54) প্যারোডি প্রোফাইল

নামঃ জুলি

বাবার নামঃ আলী

মায়ের নামঃ বুলি

জাতেঃ বাঙালি

বাড়িঃ নোয়াখালী

পেশাঃ মালী

প্রিয় খাবারঃ জেলি (পানীয়)

প্রিয় দেশঃ চিলি

প্রিয় প্রসাধনীঃ লিলি

প্রিয় গানঃ ভাটিয়ালি

প্রিয় ফুলঃ বেলি

প্রিয় পাখিঃ বুলবুলি

প্রিয় রংঃ কাঁঠালি

প্রিয় লেখকঃ শাহেদ আলী

প্রিয় বইঃ গীতাঞ্জলি

প্রিয় ছবিঃ কুলি

প্রিয় নায়িকাঃ পলি

প্রিয় খেলাঃ ভলি

প্রিয় ফুটবল দলঃ ইতালি
প্রিয় ক্রিকেটারঃ ব্রেট লি
প্রিয় সময়ঃ গোধূলি জুয়েল রানা, ময়মনসিংহ
সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

55) বিয়ের ঘড়ি

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী অবলম্বনে]
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
চেয়ারেতে বসে আছি মনে হতাশা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
পত্রিকা পড়া সারা,
মারিতেছি কত মাছি কত যে মশা।
চেয়ারেতে বসে আছি মনে হতাশা। ছোটখাটো
চেম্বার আমি একেলা।
রোগীর আশায় কাটে সারাটা বেলা।
যদি কোনো রোগী আসে,
ডাকিয়া বসাব কাছে।
শেষ হবে অসময়, গোনার পালা।
রোগীর আশায় কাটে সারাটা বেলা। হঠাৎ শব্দ
শুনি সিঁড়ির ধারে।
একজন রোগী তবে এল এবারে।
অনেক যতন করি,
দেখি বলক্ষণ ধরি,
প্রেসক্রিপশন দিই বিশদ করে।
একটা ভিজিট বুঝি পাব এবারে। কিন্তু রোগীটি
বলে, শোনেন কাকা,
যক্ষ্মায় ভুগে মরি নেইকো টাকা।
আমিও যে নিরুপায়,
এরে ছেড়ে দেওয়া দায়,
রিকশা ভাড়াটি নাই, পকেট ফাঁকা।
ঘোড়েল রোগীটি বলে বাঁচান কাকা। কোনো
কথা নাই শুনে, কোনো টাকা নাই গুনে
মক্কেল চলে যায় কী আর করি।
পরে দেখি সর্বনাশ,
মাথায় মেরেছে বাঁশ।

নিয়ে গেছে মোবাইল ও বিয়ের ঘড়ি!!! বিপ্লব
ভট্টাচার্য, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

56) নিয়তির পরিহাস

[হুমায়ুন কবীরের মেঘনার ঢল অবলম্বনে] শোন
মা আমিনা, বদনাটা কই, ত্বরা করে মোরে বল
প্রকৃতির ডাক আসিয়াছে, তাই এখনি লাগিবে
জল।

নদীর কিনারা ঝোপেঝাড়ে ভরা,
প্রকৃতির ডাকে আছে মোর ত্বরা
কই রে আমিনা, তাড়াতাড়ি কর, জলদি বদনা
আন,
কাপড় নষ্ট হইলে কিন্তু ছিঁড়িব তোর দু'কান। কী
যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত পূর্ণিমার এই রাত্রি,
জনমানবহীন এই প্রান্তরে চাঁদ মোর সহযাত্রী;
নদীর কিনারে দারুণ আঁধার,
হেথা যেতে ভয় করিছে আমার;
আজ যদি মোর নিজের ঘরেতে থাকিত বাথরুম,
তবে প্রকৃতির কাজে টুটে হেরে যেত না শেষ
রাত্রের ঘুম। এই জায়গাটা যথোপযুক্ত, এখানে
সারিব কাজ

ঝোপে আর ঝাড়ে প্রাকৃতিক কাজে পুরুষের
নাই লাজ;

সহসা বিকট শব্দ শুনিয়া

হাত হতে গেল বদনা ছুটিয়া

বদনা বিহনে কীভাবে সারিব মোর প্রাকৃতিক
কাজ

হায় ইশ্বর, এরেই কী কয়-‘নিয়তির
পরিহাস’? বর্ষণ সেন, গোলাপ সিংহ লেন,
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

57) সিংহ ও ইঁদুর

সনাতন রূপঃ একটা ছোট ইঁদুর ঘুমন্ত সিংহের
মুখের ওপর দিয়ে ছোট্টাছুটি করতে গিয়ে তার
ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সিংহ খুব রেগে ইঁদুরটাকে
ধরে মেরেই ফেলছিল, তখন ইঁদুর খুব কাকুতি-
মিনতি করে তাকে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও,
একদিন হয়তো আমি তোমাকে রক্ষাও করতে
পারি।

ইঁদুরের কথা শুনে সিংহ হেসেই বাঁচে না, তবু
কী মনে করে তাকে ছেড়ে দিল।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে, হঠাৎ
একদিন সেই সিংহ একটা শিকারির জালে
আটকা পড়ে গেল। সিংহের গর্জন শুনে ইঁদুর
ছুটে এসে তার ধারালো দাঁত দিয়ে জালের দড়ি
কাটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিংহ মুক্তি
পেয়ে যায়। ইঁদুর বলল, দেখেছ, তুমি আগে
বিশ্বাস করোনি, কিন্তু প্রয়োজনে একটা ছোট
ইঁদুরও তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

সুবচনঃ ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়া যায়।

আধুনিকঃ সিংহ একটা মাল্টিন্যাশনাল

কোম্পানির জিএম। নেংটি ইঁদুর সেই কোম্পানির পিয়ন। সিংহ প্রতিদিন দুপুরে লাঞ্চ করে তার এয়ার কন্ডিশনড ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দিবানিদ্রা দেয় এবং তখন কেউ তাকে বিরক্ত করে না।

একদিন সিংহ তার দৈনন্দিন দিবানিদ্রা দিচ্ছে, তখন হঠাৎ করে একটা জরুরি ফাইলের দরকার পড়ল। নেংটি ইঁদুর পা টিপে টিপে সিংহের টেবিল থেকে ফাইলটি নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাতে লেগে পানির গ্লাসটা নিচে পড়ে গিয়ে ঝন ঝন শব্দ করে ভেঙে গেল। সিংহ সেই শব্দে চমকে জেগে উঠল। ইঁদুরকে দেখে খপ করে ধরে ফেলে হুক্কার দিয়ে বলল, তোকে কতবার বলেছি ঘুমোনের সময় শব্দ করবি না? ইঁদুর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ভুল হয়ে গেছে স্যার। ভুল? সিংহ গর্জন করে বলল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। তোর চাকরি যদি আমি এখন না খাই-তোকে আমি আস্ত গিলে খাব!

ইঁদুর হাত জোড় করে বলল, মাপ করে দেন স্যার। আর এই ভুল হবে না। ছেলেমেয়ের সংসার, না খেতে পেয়ে মারা যাব।

তুই মারা গেলে আমার কী? সিংহ চোখ লাল করে বলল, তোর মতো বেজন্মা অপদার্থ একটা নেংটি ইঁদুরের তো মরার উচিত।

নেংটি ইঁদুর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ও রকম করে বলবেন না স্যার, কিছু বলা যায় না, এ রকম তো হতেও পারে যে একদিন আপনাকে আমি বিপদ থেকে রক্ষা করব।

তুই বিপদ থেকে রক্ষা করবি আমাকে? সিংহ হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বলল, তোর কথা শুনে আমি হেসে মরে যাই।

হাসতে হাসতে সিংহ বিষম খেয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী মনে করে সে নেংটি ইঁদুরকে ছেড়ে দিল।

বছরখানেক পর এন্টিকরাপশন অফিসারেরা জাল পেতেছে দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের ধরার জন্য। আর সেই সঙ্গে ধরা পড়ল সিংহ। কঠিন জাল, আটকা পড়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে সিংহ। সেই চিৎকার শুনে তার পিয়ন নেংটি ইঁদুর ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, স্যার?

দেখছিস না, এন্টিকরাপশনের জালে আটকা

পড়েছি!

নেংটি ইঁদুর জালটা ভালো করে পরীক্ষা করে
বলল, শক্ত জালে আটকা পড়েছেন স্যার। এই
যে ফাঁসটা আপনার ঘুষ খাওয়ার ফাঁস। এইটা
আপনার বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের ফাঁস।
এইটা অফিসের জিনিসপত্র নিজের ব্যক্তিগত
কাজে ব্যবহারের ফাঁস। এইটা স্ত্রীর নামে
বেআইনিভাবে সম্পত্তি কেনার ফাঁস। এইটা
তহবিল তছরূপের ফাঁস। এইটা...

কথা বন্ধ কর নেংটি ইঁদুর। পারলে আমাকে
বাঁচা।

নেংটি ইঁদুর বলল, কঠিন সমস্যা, তবে দেখি
চেষ্টা করে।

তখন সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে কুট কুট করে
ফাঁস কাটতে শুরু করল। একটা একটা করে
সবগুলো ফাঁস কেটে দেওয়ার পর সিংহ শেষ
পর্যন্ত ছাড়া পেল। ইঁদুর দাঁত বের করে হেসে
বলল, বলেছিলাম না স্যার, ছোট বলে অবহেলা
করতে হয় না! এত বড় বিপদ থেকে আপনাকে
উদ্ধার করে দিলাম কিনা?

সিংহ মাথা নাড়ল, বলল, তা ঠিক। আয় কাছে
আয়।

নেংটি ইঁদুর কাছে এগিয়ে গেল, ভাবল, সিংহ
নিশ্চয়ই এখন মোটা হাতে বকশিশ দেবে। কিন্তু
ইঁদুর কাছে যেতেই সিংহ তাকে খপ করে
মুঠোর মাঝে ধরে ফেলে বলল, তোকে আর
বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, তুই আমার সব কথা
জেনে গেছিস। তোকে ছেড়ে দিলে সব
জানাজানি হয়ে যাবে!

এই বলে সিংহ কপ করে ইঁদুরকে গিলে
ফেলল।

দুর্বচনঃ ভেবেচিন্তে মানুষের উপকার করতে
হয়।[আধুনিক ঈশপের গল্প থেকে সংগৃহীত]
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সূত্রঃ প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৯, ২০০৮

58) বাংলা ভাষাবিষয়ক গোলটেবিল

ভাষার মাস উপলক্ষে রস+আলো এই তো
কয়েক দিন আগে রস+আলো উৎপাদন
কারখানায় আয়োজন করেছিল এক গোলটেবিল
বৈঠকের। আলোচনা অনুষ্ঠান প্রত্যুষে শুরু
হওয়ার কথা থাকলেও গোল একটি টেবিলের
অভাব হেতু অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ বিলম্বে শুরু হয়।
সেখানে তাঁরা ভাষা নিয়ে বলেছেন অনেক

গোপন কথা। রস+আলো আয়োজিত কাল্পনিক
এই গোলটেবিল বৈঠকে যাঁরা অংশ নিয়েছেন:-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মহাকবি

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি

-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক

-কায়কোবাদ, মহাকবি

-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপরাজেয় কথাশিল্পী

-কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি

-জীবনানন্দ দাস, প্রকৃতির কবি

-সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিশোর কবিসঞ্চালক :

মেহেদী হাসান অপূরস+আলোঃ আপনারা কষ্ট
করে এত দূর এসেছেন। আপনাদের সবাইকে
অনেক ধন্যবাদ।

রবীন্দ্রনাথঃ নিকটে প্রমত্ত পদ্মা না থাকায়

যন্ত্রচালিত গাড়িতে আসিতে কষ্ট হইয়াছে।

যানজটে পড়িয়া ভীষণ শাস্তি পাইয়াছি।

মধুসূদনঃ কবিগুরু ঠিকই ধরেছেন, ঢাকা শহরে
যানজট একটু বেশি। অচিরেই এই যানজট বধ
করা হবে, ডিজিটাল সরকারের কাছে এই আশা
রাখি।

নজরুলঃ বল বীর, যানজটকে ভেঙে করি

পায়েস আর ক্ষীর। আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,

যেদিন ঢাকায় থাকবে না যানজট, আমি সেই
দিন হব শান্ত।

সুকান্তঃ কেন পুরাতনদের ফেলে নতুনদের জন্য
জায়গা ছেড়ে দিতে চাই, সেটা স্পষ্ট। পুরাতনরা
অহেতুক প্যাঁচাল পেড়ে সময় নষ্ট করেন। তা

মশায় বলবেন, আজকের সভার এজেন্ডা

কী? সুকান্তের কথা শেষ হওয়া মাত্র সভায় একটু

শোরগোলের সৃষ্টি হলো। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন,

নজরুল-সবাই সুকান্ত অকালে পেকে গেছে বলে
ছাড়পত্র দিয়ে শান্ত হলেন।

রস+আলোঃ আসলে আপনাদের কাছে জানতে

চাই, আপনারা তো সবাই বাংলা ভাষায় সাহিত্য

রচনা করেছেন। যদি বাংলা ভাষার সৃষ্টি না

হতো, তাহলে কী করতেন?

রবীন্দ্রনাথঃ কলিকাতা ও কুষ্টিয়ার জমিদারি

দেখাশোনা করতুম। যদি জমিদারি না থাকিত,

তাহলে সোনার তরীখানি লইয়া পদ্মায় জাল

ফেলিয়া মাছ ধরিয়া খাইতাম।

জীবনানন্দঃ তাহলে আমি ডাহকের ভাষায়,

শালিকের ভাষায়, হুঁদুর, প্যাঁচা, হরিণ, কুহুক

আর বেলেহাঁসের ভাষায় রূপসী বাংলার সৌন্দর্য

বর্ণনা করতাম।

বন্ধিমচন্দ্রঃ এমন তৃণশরবিদ্ধকর প্রশ্ন শ্রবণে

আমার কিঞ্চিৎ জলবিয়োগ সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাশয়রা আবার ভাবিয়া লইবেন না আমি

ডায়াবেটিসের রোগী।

মধুসূদনঃ তার পূর্বে একটি অভিযোগ, একটু

আগে সুকান্ত ছোঁকড়া আমাদের অপমানসূচক

কথা বলেছে। বাংলা সাহিত্যের এমন অমিতধর

কবি-সাহিত্যিকদের খোঁচা মারা হলো অথচ

কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না, একেই কি বলে

সভ্যতা?

নজরুলঃ বাদ দিন মধুবাবু, সুকান্তর এখন ১৮

বছর বয়স, রক্ত গরম। ও তো দেখছি আমার

মতোই বিদ্রোহী হবে।

সুকান্তঃ মধুবাবু শুধু শুধু আমাকে অসভ্য বলে

গালি দিলেন। অথচ উনি বাঙালি হয়ে ইংলিশ

ম্যাম ক্যাপটিভ লেডির পেছনে পেছনে

ঘুরেছেন। যেন বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

রবীন্দ্রনাথঃ শান্ত হন সবাই, আপনারা একে

অপরকে চোখের বালি মনে করিবেন না। মধু ও

সুকান্ত, আপনারা দয়া করিয়া ঘরে-বাইরে এমন

গোরা আচরণ করিয়া সুন্দর পরিবেশ বিঘ্নিত

করিবেন না।

শরৎচন্দ্রঃ বর্মা মুল্লুকে পার্বতীকে লইয়া জলসা

দেখিতেছিলাম, সেই ভালো ছিল। শুধু শুধু

এখানে এসে সময় নষ্ট করছি।

রস+আলোঃ বাংলা ভাষা এখন ইংরেজি ও

বাংলার মিশ্রণে এফএমীয় ভাষায় পরিণত হতে

চলেছে। বিষয়টা আপনারা কীভাবে দেখেন?

কায়কোবাদঃ বাংলা ভাষার এমন মিশ্রণে আমি

শঙ্কিত। বাংলা ভাষার হাজার বছরের গৌরবের

পটভূমিটি মহাশ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শরৎচন্দ্রঃ বিষয়টি লইয়া আমি গভীরভাবে

ভাবিয়াছি। আমার মেজদিদি একটি এফএম

রেডিওর রেডিও জকি। তাঁর কথা শুনিয়া আমার

গা জ্বলে। ওকে একটা বাল্যশিক্ষা দিতে হইবে।

বন্ধিমচন্দ্রঃ জলবিয়োগে কিঞ্চিৎ লেট হইল

বলিয়া সরি। কী হে জীবনানন্দ, অমন আধো

মুখকালো বিষণ্ণ বদনে চাহিয়া কাহারে

ভাবিতেছ, সুরঞ্জনাকে?

সুকান্তঃ দেখলেন, বন্ধিম নিজেই বাংলার সঙ্গে

ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছেন। বাংলা ভাষার

কপালে নিশ্চিত তিনি আগুনের কুণ্ডলী ছড়িয়ে

দেবেন।

মধুসূদনঃ অনেকক্ষণ আলোচনা করে গলা শুকিয়ে এসেছে। মহাশয়, একটু জলযোগের ব্যবস্থা করবেন। বিদেশি জলের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

রবীন্দ্রনাথঃ যাঁহারা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করিতেছেন, তাঁহারা নষ্ট নীড়ের লোক।

আমাদের সকলের মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজি বলিলে ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি মিশাইয়া বলিলে বাঙালি হওয়া যায় না।

রস+আলোঃ বাংলা ভাষা এখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষার এমন গৌরবে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী?

মধুসূদনঃ ব্যাপারটা আমি অনেক আগে আঁচ করতে পেরেছিলাম। তাই বাংলা ভাষার এই অর্জন লক্ষ করে লিখেছিলাম তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

সুকান্তঃ মধুবাবু, আপনি মিথ্যা বলে সমস্ত গৌরব নিজের বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন। ১৮ বছর বয়স মিথ্যা সহ্য করার নয়, ১৮ বছর...।

রবীন্দ্রনাথঃ থামো বাপু সুকান্ত, অনেক খোঁচাখুঁচি হইয়াছে। বলি, বাংলা ভাষাকে সবার পূর্বে বিশ্বদরবারে কে পোঁছাইয়া দিয়াছে? বিশ্বকবি উপাধিটা কার আয়ত্তে রহিয়াছে শুনি?

নজরুলঃ গুরু, আমার মতো আপনাকে তো আর জেলে থেকে পচতে হয়নি। রুটির দোকানে কাজও করতে হয়নি। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে বিশ্বকবি উপাধিটা নিতে পেরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রঃ বাংলা ভাষার গদ্যে প্রাণসিঞ্চনরস সঞ্চিত করিবার একমাত্র গৌরব বঙ্কিমের। ইহা একপদমনোবাক্যে সকলেরই শীঘ্রই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। আরও বলিবার আছে... তবে আবার একটু জলবিয়োগ আসিয়াছে।

কায়কোবাদঃ বুঝতে পেরেছি, আজ এখানে বাংলা ভাষার আলোচনায় বঙ্কিমের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পানিপথের চতুর্থ যুদ্ধ আসন্ন।

জীবনানন্দঃ আমাকে উঠতে হবে। বিকেলবেলা আমি আবার ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করি। বয়স হয়েছে, শরীরটা তো ঠিক রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রঃ যান যান, জীবনানন্দ মশায়, আমরা সবই বুঝি। বনলতা সেনের সঙ্গে নিশ্চয় ডেটিং

আছে। এক জীবনে আর কত, বলুন! সাবধান, এই বয়সে ছাঁকা খাইয়া আবার দেবদাস না হইয়া যান।

মধুসূদনঃ ছ্যা, ছ্যা, সবার কথার ভেতরেই কাণ্ডজ্ঞানের বড় অভাব দেখিতেছি। সৃষ্টিশীল কিছুই হচ্ছে না। ভাবতে আমার কষ্ট হইতেছে যে আজ বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকদেরও এমন অধঃপতন।

রস+আলোঃ আজকের মতো গোলটেবিল আলোচনা এখানেই সমাপ্ত। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০২, ২০০৯

59) বিয়ের আগে ময়ূর ছিলাম

আশপাশের সবাই তাঁকে মাশরাফি নামে ডাকে বলে তিনি বুঝতে পারেন তিনিই মাশরাফি বিন মুর্তজা। তবু মাঝে মাঝে ওভারপ্রতি রান বেশি দিয়ে দিলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পারেন না। আন্তর্জাতিক বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর বোলার জীবনযাপনে মোটেও নয়ছয় করেন না। বাধ্য ছেলের মতোই থাকেন। রস+আলোর আলোচনেও তিনি সুবোধ বালকের মতো প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা আপনি যে মাশরাফি বিন মুর্তজা-এর প্রমাণ কী?

-আশপাশের সবাই আমাকে মাশরাফি বলেই তো ডাকে দেখি!

ক্রিকেটে প্রতি ওভার শেষে দুই ব্যাটসম্যান একত্র হয়ে কী বলে?

-গার্ড ঠিকমতো লাগানো আছে কি না খেয়াল রাখিস।

বোলিং করার সময় আপনার মাথায় কী কাজ করে? মানে বিপরীত দলের ব্যাটসম্যান নিয়ে কী ভাবেন?

-খা...খা...খা...বক্ষিলারে খা!

ঝাড়ে বংশে খা!!!

মানুষ বিয়ে করে কেন?

-পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।

ক্রিকেটের বদৌলতে তো অনেক দেশ ঘুরতে হয়। ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা পড়তে হয়নি?

-আমি তো আসলে বাংলায় বলি। ভাব প্রকাশের বাকি কাজটা তো আমার হাত-পাগুলো করে।

বিয়ের আগে আপনি কেমন ছিলেন?

-ময়ূর ছিলাম রে ভাই! ময়ূর ছিলাম। শরীরে অনেক রং ছিল।

বিয়ের পর কেমন আছেন?

-পেখম থেকে পুচ্ছের পালক একটি একটি করে খসে পড়ছে।

ভালো কথা, তবে গথড়ড়মথবপ-এর ফৎয়ৎড়প য়পষড়প কী?

-আমি একটি বাংলাদেশ 'এ' টিম বানাব।

আমার ক্ষেত্রে তাই গথড়ড়মথবপ-এর ফৎয়ৎড়প য়পষড়প ইঅইণ.

গরু ও মানুষের মধ্যে মিল কোথায়?

-উভয়ই শিশুকালে গরুর দুধ খায়।

এ জীবনে আপনার সবচেয়ে বড় না-পাওয়া কী?

-রসের ভেতর এ কী কষ নিয়ে এলেন হঠাৎ?

বাংলাদেশের মানুষের কী নেই?

-হেরে গেলে মেনে নেওয়ার মানসিকতা।

কী আছে?

-যখন যা খুশি বলার স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

-ওরাও মানুষ! দেবদূত নয়।

ক্রিকেটকে জেন্টলম্যানস গেম, মানে

ভদ্রলোকের খেলা বলা হয় কেন?

-মানুষকে বোকা বানানোর জন্য। যেন তারা

খেলা দেখার সময় ভাবে তারা ভদ্রলোক।

ক্রিকেট খেলার বড় সুবিধা কী?

-ইচ্ছেমতো পেপসি খাওয়া যায়। সূত্রঃ প্রথম

আলো, ফেব্রুয়ারী ০২, ২০০৯

60) স্পোকেন স্টাইল

পড়ালেখা বাদ দিয়ে কমলকে টিভিতে মি. বিন

দেখতে দেখে ভীষণ মেজাজ খারাপ হলো

সজলের। পেছন থেকে তার মাথায় একটা চাটি

মেরে সজল বলল, 'কিরে, পড়ালেখা নাই?'

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কমল বলল, 'শুধু

শুধু মারলে কেন, ভাইয়া? ইংরেজি শেখার

জন্যই তো মি. বিন দেখছি।'

'আমার সাথে একদম চালাকি করবি না।

ইংরেজি শেখার জন্য মি. বিন ! আরে মি. বিন-

এ তো কোনো সংলাপই নেই, তুই ইংলিশ কী

শিখবি?'

কমল ওর খালাতো ভাই। ওর চেয়ে ছয় মাসের

বড়। ইদানীং ইংরেজি শেখার ভূত চেপেছে

মাথায়। ওর জন্যই তো মি. বিনটা দেখা হলো

না।

সব চ্যানেল ঘুরে বিবিসিতে এসে স্থির হলো

কমল। খুব মনোযোগ দিয়ে খবর শুনছে। ভাবটা

এমন যেন সব বোঝে, আসলে কিছুই বোঝে না। খবর শুনতে শুনতে কমল বলল, ‘এই সজল, যা, কালুকে ডেকে আন।’

সজল উঠল। কালু ওদের বাড়িতেই কাজ করে। তবে কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশি। প্রায়ই সে দোকান থেকে টুথপেস্টের বদলে রং ফর্সা করার ক্রিম নিয়ে আসে। সজলের ডাকে কালু আসতেই কমল বলল, ‘কালু, মামুনের হোটেল থেকে ২০টা কিমাপুরি আন তো। কিমাপুরির বদলে ডালপুরি আনলে কিন্তু তোর খবর আছে।’ কালু মাথা নেড়ে চলে গেল। তবে ও যে ডালপুরি, কিমাপুরি কোনোটাই না এনে ২০টা আলুপুরি আনবে, এ বিষয়ে সজল ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

রাতে খাওয়ার টেবিলে সজলের বাবা ফরিদ সাহেব বললেন, ‘কমল, তুমি নাকি সারা দিন ইংরেজি সিনেমা দেখ?’

‘জি খালু। আমি স্পোকেন কোর্সেও ভর্তি হয়েছি।’

‘স্পোকেন কোর্স? কী হয় শেখানে?’ ‘ইয়ে... মানে কথা বলা শেখায়।’ ‘কথা বলা শেখায়? তুমি কি কথা বলতে পার না?’ ‘না মানে ইংরেজিতে কথা বলা শেখায়। কাল থেকেই ক্লাস।’

‘ভালো। তবে এসব কোর্সফোর্স কোনো কাজেরই না, বুঝলে?’

কমল মাথা নাড়ল।

পরদিন সকালে বেশ ফিটফাট হয়ে স্পোকেন কোর্সের প্রথম ক্লাস করতে গেল কমল।

জানালার পাশের চেয়ারটাতে বসতেই ‘হ্যালো, ওয়েলকাম, গুডমর্নিং’ বলতে বলতে এক লোক ক্লাসে ঢুকলেন। কমল তাঁকে ছাত্রই ভেবেছিল, কিন্তু পরে বুঝল উনিই টিচার। পরিচয় পর্ব শেষ করেই লোকটা ইংরেজিতে এমন বকবক শুরু করল যে কমল কিছু বুঝতেই পারল না। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে। হঠাৎ সে খেয়াল করল, লোকটা ‘ক’র জায়গায় ‘খ’ বলছে। ‘স্পোকেন’কে বলছে ‘স্পোখেন’, ‘কনটিনিউ’কে ‘খনটিনিউ’, ‘ক্যাট’কে ‘খ্যাট’, ‘কালেক্টিভ’কে ‘খালেক্টিভ’, ‘কল’কে ‘খল’। কমল বেশ অবাক হলো। সে ভাবল এভাবে ‘ক’র জায়গায় ‘খ’ উচ্চারণ করলেই ইংরেজিতে কথা বলাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। পুরো ক্লাস

করে তার ধারণা আরও পাকাপোক্ত হলো।
ক্লাস শেষে খুশি মনে বেরিয়ে এল কমল। সে
এখন ইংরেজিতে মোটামুটি কথা বলতে পারবে
এটা ভেবেই আনন্দে মনটা ভরে গেল তার।
স্পোকেন কোর্সটার বিজ্ঞাপনে প্রথম দিন
থেকেই ইংরেজিতে কথা বলার যে প্রতিশ্রুতি
ছিল তা আসলেই সত্যি! বাসায় ফেরার জন্য
রিকশা খুঁজতে লাগল কমল। একটা খালি
রিকশা পেয়ে বলল, ‘এই খালি, খলাবাগান
যাবেন?’ কমলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল
রিকশাচালক। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে
থেকে বলল, ‘উঠেন।’ রিকশাচালক অবাক
হওয়ায় আরও খুশি হলো কমল। সে নিশ্চিত যে
তার খাঁটি ইংলিশ টান শুনে রিকশাচালক বিভ্রান্ত
হয়ে গেছে। কমল ঠিক করল এখন থেকে
নিয়মিত ইংরেজিতে কথা বলবে।
বাসায় ফিরেই ভুল-শুদ্ধ মিশিয়ে অনবরত
ইংরেজিতে কথা বলতে লাগল সে। কমলের
মুখে ইংরেজি কথা শুনে বিনয়ে সজলের মুখ হাঁ
হয়ে গেল। কমল বলল, ‘হেই সজল, হাউ আর
ইউ ম্যান? হোয়্যার ইজ মাই আন্টি?’ কোনো
কথা না বলে আঙ্গুল তুলে রান্নাঘরের দিকে
ইঙ্গিত করল সজল। রান্নাঘরে ঢুকেই কমল তার
খালাকে বলল, ‘হেই আন্টি, হাও আর ইউ?
হোয়াট ইজ ইউ ডুয়িং?’ ওর কথা শুনে হাসতে
হাসতে সজলের মা বললেন, ‘এইসব কী
বলছিস উল্টাপাল্টা? যা, ভাগ এখান থেকে।’
কমল বলল, ‘ও নো আন্টি, ইউ নো, প্রথম
প্রথম একটু ভুল তো হবেই। এটা কোনো
ম্যাটার না। বাট হোয়্যার ইজ খালু?’
‘কেন, তাকে তোর কী দরকার?’
‘ওকে দোকান থেকে কিমাপুরি আনতে পাঠাব।
হোয়্যার ইজ হিম...?’ কমলের কথা শেষ হওয়ার
আগেই গর্জে উঠলেন সজলের মা। হাতের
গোলআলুটা কমলের দিকে ছুড়ে মেরে চোঁচিয়ে
বললেন, ‘কী বললি? বেয়াদব কোথাকার! তোর
খালুকে তুই কিমাপুরি আনতে দোকানে পাঠাতে
চাস! তোর এত বড় সাহস! আজ তোকেই আমি
কিমাপুরি বানাব।’ এই বলে তিনি আরেকটা
আলু ছুড়ে মারলেন কমলের দিকে। এক দৌড়ে
রান্নাঘর থেকে নিজের ঘরে চলে এল কমল।
অবস্থা বেগতিক দেখে সজলও এক দৌড়ে ঘরে
ঢুকে কমলকে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাইয়া, তুমি কী

এমন ইংলিশ বললে যে মা এত রেগে গেল?’
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমল বলল, ‘কী আর
বলব, আমি শুধু স্পোকেন স্টাইলে কালুকে খালু
বলেছিলাম!’ আদনান মুকিত দীপ্র

সূত্রঃ প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০২, ২০০৯

61) কাছারে যেন ভালোবাসিতাম

বয়স তখন বিশ চোখে নয় আশা
ঢাকায় নতুন আমি নিই ভাড়া বাসা।
বাসা মানে সাবলেট একটাই ঘর
ভাড়াটিয়া প্রিয়জন নয় খুব পর।
মায়ের চাচাতো ভাই ছোট করণিক
মাসের প্রথমে দিই ভাড়া ঠিক ঠিক।
ভাড়া হলো অল্পই আট শত টাকা
খেতে দিই পনের শ, কোনোমতে থাকা।
টিউশনি করি আর পড়ি ভার্শিটি
একদিন ঘরে পাই নীল খামে চিঠি।
চিঠি ছিল ভাড়াটিয়া মামাতো বোনের
যুগটা চিঠির, নয় মোবাইল ফোনের।
বোনটা আমার চেয়ে দু বছর বড়
মন বলে তাতে কী? প্রেমে তুমি পড়-
মামাতো বোনের নাম? থাক না গোপন
হাওয়ায় প্রেমের বীজ করেছি রোপণ। একটা
ছাদের নিচে দুই ঘরে থেকে
প্রেম চলে চোখে চোখে দূরত্ব রেখে।
বিটিভির যুগ সেটা, শমী-তৌকীর
প্রেম করে পর্দায়, উন্নত শির। আমাদের প্রেম
যায় ইনডোর ছেড়ে
রমনা পার্কে সুখ ঘোরে আর ফেরে।
পার্কে বাদাম খাই ঘুরি আর ফিরি
আমরা দুজন যেন ফরহাদ-শিরি।
বিএ পাস করে শিরি ইডেনে এমএ
পড়ছিল, পড়াশোনা যায় নাই থেমে।
বাড়ি থেকে টাকা আসে সেই টাকা সাথে-
টিউশনি করি, মাসে ছ’হাজার হাতে।
চায়নিজে দুজনেই যাই মাঝে মাঝে
একদা করুণ সুর বেহালায় বাজে...
আমাদের বিষয়টা মামা-মামি জেনে
একরাতে দুজনকে টিভি রুমে এনে
মামি রাগে, মামা সাথে দেয় খুব তাল
‘বাসা থেকে বের হয়ে যাবে তুমি কাল’
আমার উপর এই নির্দেশ আসে
কথামতো বাসা ছাড়ি আমি সেই মাসে। নতুন
জীবন আহা তারপর চলে

বাসা ছেড়ে আমি উঠি বন্ধুর হলে
হলের খাবার খাই ডাল মানে পানি
ভাতে কণা, মাছের তো নামটা না জানি।
পড়েছি প্রেমের বুঝি আমি মহা বাটে-
দিন যায় এক দুই... সপ্তাহ কাটে। শিরির সঙ্গে
আর হয় না তো দেখা
ইডেনের গেটে যাই ফিরে আসি একা।
মামার বাড়ির পাশে সন্ধ্যায় যাই
গলির মোড়ের সেই দোকানে দাঁড়াই
একবার তার দেখা যদি যাই পেয়ে
'কেমনে থাকিস একা ও পাষাণী মেয়ে'-
বলব এমন কথা কিন্তু হতাশ
পাই না শিরির দেখা, কেটে যায় মাস। একদিন
ইডেনের পাশ দিয়ে হাঁটি
আমাকে দেখেও শিরি করল না রা'টি-
হন হন হেঁটে যায় রিকশার কাছে
দ্রুত ওর পাশে যাই, বলি, কথা আছে
রিকশায় উঠে বলে, সামনের মাসে
হচ্ছে আমার বিয়ে-বলে শিরি হাসে। দিন যায়
রাত আসে হয় না তো ভোর
ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ে প্রেম ইনডোর।
রমনা পার্কে সেই দিন স্বর্ণালি
নীল শাড়ি, চুড়ি, টিপ কত বর্ণালি!
ফ্ল্যাশব্যাকে ধরা পড়ে আরও কত সিন
সবটা যায় না লেখা, কত না রঙিন!
কিছু সুখ ্ন্তি হয়ে এই মনে থাক
আমার মামাতো বোন ভুলে সব যাক। কদিন
আগেই হলো মৌচাকে দেখা
আমার মামাতো বোন নয় আর একা
কেনাকাটা করছিল পাশে ছিল স্বামী
পরিচয় করে দেয় ছোট ভাই আমি
বলি আমি, ভালো আছি আপনি তো ভালো?
জামাইটা মোটাসোটা শ্যামলা না কালো
কালো লোক পছন্দ করত না বোন
এখন ঠিকই কালো তার প্রিয়জন।
কেমন চলছে দিন জানতে ও চায়
কষ্টের পাখি যেন বুকেতে খোঁচায়।
কথা শেষে এসে যায় বিদায়ের পালা
দুলাভাই ডাকি আমি গুণধর শালা। রিকশায়
চলে যায় বোন-দুলাভাই
পাঠক বিদায় আজ টা টা গুডবাই। সারওয়ার-
উল-ইসলাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৯,
২০০৯

62) ব্লড সস্তা বলে দাড়ি নেই

ভালোবাসা করে কয়?

– যদি আবার প্রেমে পড়া যেত, তাহলে বলা যেত ভালোবাসা করে কয়। সময় সময় ভালোবাসার অর্থ বদলায়। তবে জ্যামিতিকভাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা হতে পারে-একটি ছেলে ও একটি মেয়ের হাতের রেখা যদি পরস্পর একদিকে যায়, তবে তারা পরস্পর যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাকেই ভালোবাসা বলে।

আপনাকে যদি ভ্যালেন্টাইনস ডেতে কোনো মেয়ে প্রেম নিবেদন করে, আপনি তাকে কী বলবেন?

– তাকে বুদ্ধিমতী হওয়ার পরামর্শ দেব।

আপনাকে এ শহরের মেয়র নির্বাচন করা হলে আপনি সর্বপ্রথম কী করবেন?

– এ শহরে প্রেমের কোনো আলাদা জায়গা নেই। প্রেমের জায়গা তৈরি করব। সর্বোপরি শহরটাকে এমন করব, যেন শহরে পা দেওয়া মাত্র মনে হয়, এ শহরে একজন ‘মেয়র’ আছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ কী বলে মনে হয়?

– অনেকে ভাবেন বুঝি, প্রেমিকার মন জয় করা। আসলে কিন্তু না। মন জয় করা প্রাথমিক একটি ধাপ কেবল। কঠিন হচ্ছে মন জয়ের পর তাকে ঠিকঠাক রাখা। ঋঃধনষব রাখা আরকি! আপনার জীবনে সবচেয়ে রোমান্টিক মুহূর্ত কী ছিল?

– একজন আমাকে বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জীবনের এতগুলো দিন কেটে গেছে, ভাবাই যায় না।’ এটাই আমার কাছে এখন অবধি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক মুহূর্ত। সবচেয়ে বেশি ভয় পান কাকে?

– স্বামীমাত্রই যাকে ভয় পায়।

আপনার দাড়ি নেই কেন?

– ব্লড তো এখনো বাজারে বেশ সস্তা!

প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর অবদান থাকে। আপনার ক্ষেত্রে তিনি কে?

– বলাটা তো খুব রিস্ক। আপনার কাছে দাবিদারদের কোনো তালিকা আছে?

বাংলাদেশ টেলিভিশন কথা বলে...।

- সাউন্ড অন থাকলে...।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনার মন
কী চায়?

- ফাঁকা টয়লেট।

আপনার কাছে ভালোবাসা কী?

- শৈশবে বাবা-মা আর খেলনা; কৈশোরে শচীন
টেডুলকার, ব্রিটনি স্পিয়ার্স, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি;
যৌবনে মনের মানুষ, মাঝবয়সে স্ত্রী, সন্তান;
শেষ বয়সে নিজের জীবন আর এই পৃথিবীটা।
নিজের লেখা বই কাকে উৎসর্গ করে সবচেয়ে
আনন্দিত হয়েছিলেন?

- নিজেকে। উপনায়ক উপন্যাস নিজেকে
নিজেই উৎসর্গ করেছিলাম।

আপনি প্রধানমন্ত্রী হলে প্রেমের জন্য কী সুযোগ
দিতেন?

- ১৪ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রেমভাতা চালু
করতাম।

ঝামেলা মনে হয়...।

- মাঝেমধ্যে যখন সত্যি কথা বলতে হয়।

ভাবতে ভালোই লাগে...।

- তাকে এখনো ভালোবাসি।

মিলন হবে কত দিনে...?

- আমি তো হয়েই আছি। যে আসবে তার
ওপর। আমার দিক থেকে কোনো বাধা
নেই। ইমদাদুল হক মিলন

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ জিনাত রিপা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৯,
২০০৯

63) প্রেমের টিকিট - একটি সম্পূর্ণ রঙিন চিত্রনাট্য

দৃশ্য ১

নায়ক-নায়িকা একই বাসে করে যাচ্ছে। নায়ক
বুঝতে পারে নায়িকার কাছে টিকিট নেই।

নায়ক নিজের টিকিটটি নায়িকার হাতে গুঁজে
দেবে। টিকিট না থাকার অপরাধে নায়ককে
টিকিট চেকার বাস থেকে নামিয়ে দেবে।

নায়কের এমন আত্মত্যাগে নায়িকা তার প্রেমে
পড়ে যাবে! তার জন্য নায়িকার খুব মন খারাপ
হয়।

টিকিট চেকারঃ দেখে তো ভদ্রই মনে হচ্ছে।

টিকিট ছাড়া বাসে চড়ার এ অভ্যেস কত
দিনের?

নায়িকা (মনে মনে)ঃ আজ আমার জন্য তাকে

এত কথা শুনতে হলো। তার মানে নিশ্চয় আমাদের মধ্যে প্রেম হয়ে গেছে। দৃশ্য ২
এরপর নায়ক প্রতিদিন ওই পথে নায়িকাকে খোঁজে। কিন্তু নায়িকার আর দেখা নেই।
একদিন হঠাৎ চিৎকার-বাঁচাও, বাঁচাও।
নায়িকাকে গুপ্ত আক্রমণ করেছে। নায়ক ইয়া
টিসুম টিসুম শব্দে মারামারি করে নায়িকাকে
গুপ্তমুক্ত করবে।

নায়িকাঃ ছেড়ে দে শয়তান। চিল্লানিটা দিয়ে
নিই, তখন দেখবি, নায়ক এসে তোদের
কীভাবে শায়েস্তা করে।

নায়কঃ আমি ০ থেকে ১-এর বেশি গুনতে পারি
না। সুতরাং এর ভেতরেই ছেড়ে দে ওকে।

এরপর নায়ক-নায়িকা দুজনই পরস্পরের দিকে
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। পাশেই দেখুন
সেই সোশ্যাল অ্যাকশন দৃশ্যটি। দৃশ্য ৩

দু-এক দিন পরের দৃশ্য। নায়ক-নায়িকা একটি
পার্কে বসে প্রেম করবে। দুজন বাদাম খাবে।
নায়িকা তার ব্যাগ থেকে সেই টিকিটটি বের
করে নায়কের হাতে দেবে। নায়ক আবেগাপ্লুত
হয়ে নায়িকাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। এর পরই
একটা বৃষ্টিভেজা গান উইথ নৃত্য মানে দুজনের
শারীরিক কসরত। এখন বৃষ্টিভেজা সেই
রোমান্টিক গানটি দেখুন, নিচের দৃশ্যে।

নায়কঃ আজ এই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে কাপড়ের
যত ময়লা...

নায়িকাঃ তবু ধুয়ে যাবে না এই মেকআপের
রং... (গান) দৃশ্য ৪

নায়ক-নায়িকা সব সময় ছটফট করে দুজন
দুজনকে দেখার জন্য। এক মুহূর্তের জন্য কেউ
কাউকে ছাড়তে চায় না। একদিন নায়কের বাবা
নায়কের মায়ের কাছ থেকে শুনবেন, তাঁর ছেলে
প্রেমে পড়েছে। নায়কের বাবা আধুনিক
স্কুলশিক্ষক। তাই তিনি খুশি হতে পারেন। তিনি
পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে সস্ত্রীক মেয়ের বাড়িতে
বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবেন।

বাবাঃ শাকরাশ বাপকা ব্যাটা! তোর মাকেও তো
আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

মাঃ এই বুড়ো বয়সে ছেলের সামনে তোমার
লজ্জা করে না এসব বলতে? দৃশ্য ৫

মেয়ের বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে এসেই ঘটনা প্যাঁচ
খেয়ে যাবে। মেয়ের বাবা শহরের সবচেয়ে বড়
সন্ত্রাসী গডফাদার ফকির শাহ, যাকে নায়কের

বাবা ২০ বছর ধরে খুঁজছেন। এই সেই ফকির শাহ, যে তাঁকে গ্রাম থেকে ভিটেমাটি ছাড়া করে পথে নামিয়েছিলেন (এখানে একটা ফ্লাশব্যাক)। নায়িকার বাবাও চিনতে পেরে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেবেন তাঁকে।

ফকির শাহঃ সামান্য স্কুলমাস্টার হয়ে তুমি আমার মেয়ের দিকে তাকিয়েছ, তুমি জানো না তেলে-জলে কখনো মিশ খায় না? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। এরপর তিনি তাঁর মেয়েকে ঘরে বন্দী করে রাখবেন। আরেক ব্যবসায়ীর গুণ্ডামার্কী ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবেন ফোনে। দৃশ্য ৬

বাবাকে অপমান করেছে শুনে নায়ক বিশাল এক চিৎকার দেবে। চিৎকারের পরই দেখা যাবে, সে নায়িকার বাড়ির সামনে। কিন্তু নায়িকা বন্দী ঘরে থেকে বিরহের গান গাইছে আর কাঁদছে। নায়কও তখন গান শুরু করবে। এ সময় বিজলী চমকানোসহ বৃষ্টি শুরু হবে। নায়কের হাতে একটা পানির বোতলও থাকবে। তখন নায়কের পুলিশ অফিসার বন্ধু এসে হাজির হয়ে নায়ককে বাড়ি নিয়ে যাবে। যেতে যেতে-

নায়কঃ ওই ফকির শাহ...তুই আমার বাবাকে অপমান করেছিস, আমিও আজ তোর বাবাকে...দৃশ্য ৭

নায়কের মুখে সবকিছু শুনে পুলিশ বন্ধু নায়িকার বাবাকে চিনতে পারবে। সেও তাকে খুঁজছে। সে শহরের অনেক বড় ক্রিমিনাল। তারা দুজন মিলে নায়িকাকে উদ্ধার করতে যাবে। এদিকে এই পুলিশ অফিসারের তৎপরতা বন্ধের জন্য নায়িকার বাবা পুলিশ অফিসারকে খুন করার জন্য সন্ত্রাসী পাঠাবে। এ সময় নায়িকার মা এসে জানাবে, নায়িকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভিলেন বাবা তখনই লোক পাঠিয়ে দেবে নায়কের মা-বাবাকে ধরে আনার জন্য।

ভিলেনঃ হা হা হা, আমার মেয়েকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে হিরু, আমি তোমার মা-বাবাকে ধরে আনাচ্ছি। দৃশ্য ৮

নায়িকাকে নিয়ে নায়ক বাসায় এসে দেখবে, তার মা-বাবা নেই। বাড়ির কাজের ছেলে মরতে মরতে জানাবে ফকির শাহর লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে। জানিয়েই সে মারা যাবে। এবার নায়ক আরও বড় একটা চিল্লানি দেবে

ফ...কি...র...শা...হ... বলে। চিল্লানি শেষ হওয়ার আগেই সে পৌঁছে যাবে নায়িকার বাড়িতে। কিন্তু বাড়ি ফাঁকা। এ সময় নায়িকার মা আসবেন। নায়িকার মা এত দিন ধরে তাঁর স্বামীর অনেক অপরাধ সহ্য করেছেন, আর নয়। তিনিও স্বামীর বিপরীতে অবস্থান নেবেন।

নায়িকার মাঃ আমি এত দিন অনেক সহ্য করেছি, বাবা, আর নয়। ওরা গাজীপুরের শালবনের আস্তানায় গেছে। তোমরা এম্ফুনি যাও। দৃশ্য ৯

নায়ক, নায়িকা আর পুলিশ বন্ধুটি মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে গাজীপুর শালবন আস্তানায়। ভিলেন বন্দীদের নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা-মশকরা করবে। এমন সময় একদিক থেকে কাচ ভেঙে শূন্য দেহে নায়ক, অন্যদিকে দরজা ভেঙে মোটরসাইকেল নিয়ে পুলিশ অফিসার এবং আরেক দিক দিয়ে নায়িকা প্রবেশ করবে আস্তানায়। এরপর শুরু হবে সামাজিক অ্যাকশন। তখন নায়ক ভিলেনের পিস্তলের সামনে পড়ে যাবে।

ভিলেনঃ এখন তোমাকে কে বাঁচাবে, হিরু...? হা...হা...

নায়কঃ আমাকে মারার ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে কারও জন্ম হয়নি।

বন্ধু পুলিশ অফিসার ভিলেনের হাতে গুলি করলে তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যাবে। ওটা তুলে নেবে নায়ক। দৃশ্য ১০

এ সময় নায়িকার মা আরও পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হবে। পুলিশ এসে দেখবে নায়ক ভিলেনকে মনের ঝাল মিটিয়ে মারছে। পুলিশ বলবে, ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।’ এরপর পুলিশ সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। তারা তখন সবাই মুক্ত। দৃশ্য কাট করে চলে যাবে নায়ক-নায়িকার গানের দৃশ্যে। গান উইথ সেই রকম নৃত্য।

নায়িকাঃ যৌবন একটা লাল টমেটো...

নায়কঃ প্রেম একটা দিল্লিকা লাড্ডু...সতর্কতাঃ বিনা অনুমতিতে ছবছ এই গল্প কিংবা এর কোনো অংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ক থো প ক থ ন

নায়ক

আমার জীবনে আমি অনেক ছবি করেছি কিন্তু এমন অসাধারণ কাহিনীনির্ভর সামাজিক গল্পের ছবিতে আগে কখনো অভিনয় করিনি।

নায়িকা

হি...হি...আমি আসলে কি বলব, কাহিনীটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হি... হি...।

পরিচালক

আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, এ রকম চলচ্চিত্র এ দেশে এর আগে কেউ বানাতে পারেনি। আপনি একবার ভাবুন, সামান্য একটা টিকিট থেকে একটা ছবির কাহিনী হতে পারে তা কি এর আগে কেউ ভাবতে পেরেছে...?

কাহিনী ও চিত্রনাট্যঃ তাওহিদ মিলটন

সংলাপঃ আদনান মুকিত

সম্পাদনাঃ সিমু নাসের

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৯, ২০০৯

64) অটোগ্রাফ

কথা ছিল ছোট মামা বইমেলায় নিয়ে যাবেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই তিনি বইমেলায় নিয়ে গেলেন আমাদের। মেলায় ঢুকে বিভিন্ন স্টলে ঘোরার আগেই দেখলাম, একদল ছোট ছেলেমেয়ে খাতা-কলম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, আর অখ্যাত-বিখ্যাত কোনো লেখকের দেখা পেলেই অটোগ্রাফ নিতে ঘিরে ধরছে। বড়রাও কম যাচ্ছেন না। লেখককুঞ্জের আশপাশে কিংবা কোনো স্টলে ভালো কোনো লেখককে পেলে তাঁরাও নিচ্ছেন অটোগ্রাফ। এসব দেখছি আর মেলায় ঘুরছি, এমন সময় বেজে উঠল মামার মোবাইল ফোন। মামার কথাবার্তাতেই আমরা বুঝে গেলাম, মামার অফিসের কোনো জরুরি ফোন। নিশ্চয় জরুরি কোনো কাজে চলে যাবেন তিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পারামাত্রই ইশারায় আমরা বুঝিয়ে দিলাম, মামাকে আমরা ছাড়ছি না। অগত্যা যিনি ফোন করেছেন, মামা তাঁকেই মেলাতে আসতে বললেন। মামার অফিস মতিঝিল। সেখান থেকে বইমেলায় আসতে কতক্ষণ লাগে, আমরা তা না জানলেও দেখলাম, লোকটি মিনিট বিশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেছেন মেলায়। সম্ভবত গাড়ি নিয়ে এসেছেন। লোকটি এসে মামাকে জানালেন, দু-একটা কাগজে এন্ফুনি স্বাক্ষর করতে হবে। খুব জরুরি। মামা কাগজগুলো হাতে নিয়ে স্বাক্ষর দিতে লাগলেন।

স্বাক্ষর করা শেষ হতেই মামা টের পেলেন, সেই শিশু-কিশোরের দল তাকে ঘিরে ধরেছে।

প্রত্যেকেই বলছে, ‘আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন!’ হতবাক মামা বললেন, ‘আমি কী অটোগ্রাফ দেব, কেন দেব?’ পিচ্চিদের সঙ্গে থাকা বয়স্ক একজন লোক বললেন, ‘আপনি একজন লেখক, তাই তো ওরা অটোগ্রাফ চাইছে। দিয়ে দিন না। বাচ্চা মানুষ...।’ মামা আরও অবাক হয়ে বললেন, ‘কিন্তু আমি তো তেমন কোনো লেখক নই।’ লোকটি এবার বললেন, ‘এ আপনার বিনয়ের কথা। দিয়ে দিন না অটোগ্রাফ।’ বাধ্য হয়ে সব বাচ্চাকেই অটোগ্রাফ দিলেন মামা। সম্ভবত মামাকে স্বাক্ষর করতে দেখে বাচ্চারা ভেবেছিল, মামা কোনো লেখক এবং তিনি বুঝি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন।

বাচ্চারা ভুল করতেই পারে-সে না হয় মানা গেল। কিন্তু ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুজন তরুণ এসে মামাকে বলল, ‘স্যার, একটা অটোগ্রাফ।’ আরেকজন জানতে চাইল, ‘কিছু মনে করবেন না, স্যারের এবার কী বই বেরিয়েছে?’ আমরা ততক্ষণে হাসিতে ফেটে পড়েছি। তবে বুঝতে পারছি, মামা আর পারছেন না। এম্মুনি রাগে ফেটে পড়বেন।

মহিতুল আলম

সূত্রঃ প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০০৯

65) এত বই পাঠক কই?

এক ডিসেম্বরে আমার এক বন্ধু বিনা মেঘে ছাঁকা খেয়ে বসল। বিচ্ছেদের স্বাভাবিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তিনটি-কেউ দেবদাস হয়, কেউ কবিতা লিখতে শুরু করে, ধুরন্ধরেরা নতুন প্রেমিকা খোঁজে। আমার বন্ধুর ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিক্রিয়া নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র মেনে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এক ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে আমরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, অবাধ্য-অবিন্যস্ত চুল-গোঁফের রুখু রুখু চেহারার এক দেবদাস; দিনমান কবিতা লেখায় ব্যস্ত এক কবি এবং তাঁর নিজের ভাষায়, ‘কাব্যের সঙ্গে প্রেমে মত্ত এক প্রেমিক’-এর খোঁজ পেলাম! পুরো ডিসেম্বরে সেই বন্ধু, ধরা যাক তাঁর নাম দেবা (এটা দেবদাসের সংক্ষিপ্ত রূপ, ‘মুখোপাধ্যায়’ পদবিধারী কারও সঙ্গে মিলে গেলে তা কাকতালমাত্র), প্রায় শ পাঁচেক কবিতা লিখে ফেলল!

তা লিখুক। আমাদের আপত্তি নেই।

কাব্যপ্রতিভায় বাধা দেওয়ার মতো বেরসিক আমরা নই। কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁর লেখা ‘অশেষ পঙ্কের/ পঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কাল মহাকাল/ ভ্রষ্ট জাঁতাকলে ত্রস্ত বামাল/ শব্দহীন কানে দূষিত বাতাস/ আর পাংচারায়িত টায়ার’ টাইপের কবিতা পড়ে ইতিমধ্যে কেউ কেউ কয়েকটা দাঁত হারাল। শুনতে গিয়ে শ্রবণ-প্রতিবন্ধী হয়ে গেল কেউ কেউ! কবি থেকে কয়েক ধাপ পদোন্নতি পেয়ে যখন সে কবিরাজের দিকে এগোচ্ছিল, আমাদের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। অবশেষে কেউ একজন বুদ্ধিটা দিল, যাকে বলে অমোঘ দাওয়াই। দেবাকে বলল, ‘সামনেই তো বইমেলা। বন্ধু, তুমি পুস্তক বাহির করিয়া ফেল। তোমার কাব্যরস যেভাবে উছলিয়া পড়িতেছে, তাহাতে বইমেলার শুষ্ক ধুলো-প্রাঙ্গণ প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।’ প্রস্তাবটা তাঁর মনে ধরল। বইমেলায় নিজের পকেটের টাকা খরচ করে, কোনো এক ‘ছাদ আছে ঘর নাই’ প্রকাশনী থেকে বের হয়েছিল তাঁর বই। প্রথম এডিশনে প্রকাশক বলেছিলেন, বের হবে ২০০ কপি। কিন্তু ২০টার বেশি বই কখনোই স্টলে হাজির হয়নি। প্রয়োজনও পড়েনি। কারণ, বইমেলা শেষে ওই ২০ কপির ১৯টাই ফেরত গেছে। একটা কপি কে কিনল সেটা আজও আমাদের কাছে অমীমাংসিত এক রহস্য। স্টলের ছেলেটা জানিয়েছিল, কোনো এক বোরকা আচ্ছাদিতা নাকি কিনে নিয়ে গেছে তালগাছের একটা পা, গরুর আছে চারটা নামের সেই কাব্যগ্রন্থ। দেবার দাবি, ওই মেয়ে তাঁর হারানো প্রেমিকা। আমাদের সন্দেহ, সেটা দেবা নিজেই! এর পর কী হলো সংক্ষেপে বলিঃ সেই বইমেলা শেষে বন্ধুর মাথা থেকে কবিতার ভূত পুরোপুরি নেমে গেছে। ক্লিনশেভড করে এখন সে ধোপদুরন্ত বাবু। পায়ে ঝা-চকচকে জুতো। টয়লেটে গেলেও ‘ইন’ করে যায়! পরে মার্কেটিংয়ে এমবিএও করেছে এবং এখনো লিখছে। না, কবিতা নয়, লিখছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি (বিপণন কৌশল) নিয়ে। এবার মেলায়ও ওর গবেষণাধর্মী একটি গ্রন্থ আসছেঃ আছে বই, কিন্তু পাঠক কই?

সেদিন আজিজ মার্কেটের নিচে দেখা হতেই ও

হাসিমুখে আমাকে জানাল বইটার কথা। দুই কাপ গরম চায়ের লোভে চিরকালের ছাপোষা বাঙালি এই আমি হাসিমুখে তার বইয়ের আইডিয়া হজম করে গেলাম। ‘বুঝলি, এই বইটার বিশেষত্ব হলো, এই বই দিয়ে শুধু বই বিক্রি বাড়ানোর কৌশলই বাতলানো হবে না, ওই একই কৌশল এই বইয়ের মার্কেটিংয়েও ব্যবহার করব।’ ‘কী রকম?’ আমার কৃত্রিম কৌতূহল। ‘২৫ জনের একটা দল থাকবে। ওরা আবার পাঁচজন করে ভাগ হয়ে পাঁচটি উপদল হয়ে যাবে। পাঁচটি দল থাকবে পাঁচটি জায়গায়। কেউ লাইনে, কেউ গেটের পাশে, কেউ বিভিন্ন স্টলে। এরা দর্শকদের শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করবে। ধর, লাইনের দলটা নিজেদের মধ্যে আলাপ করবে। একজন উচ্ছ্বাস নিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করবে, ‘এবার গোবিন্দ ধরের বান্দরবানে বাঁদরামি উপন্যাস পড়েছিস? দারুণ না!’ একবার চিন্তা করে দেখ। মেলায় লাইন থেকে ঢোকান মুখে কেউ যদি তিনবার এই কথা শোনে, তার মগজে শুধু একটাই কথা ঘুরবে, বান্দরবানে বাঁদরামি, বান্দরবানে বাঁদরামি...। এইটাই আমার প্রথম কৌশল। আর দ্বিতীয় কৌশল হলো, ওই দলটাই পরে ঘুরেফিরে নামকরা প্রকাশকদের স্টলে স্টলে ঘুরবে। আর গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, ভাই বান্দরবানে বাঁদরামি বইটা আছে? চিন্তা করে দেখ, দিনে যদি ৫০টির মতো লোক এসে ওই একটা বই চায়, ওই প্রকাশক নিজেরা গোবিন্দ ধরকে ধরে পরেরবার নির্ঘাত পাঁচটা বই বের করবে। এরই মধ্যে শুনলাম, ওর ভাড়াটে ভক্ত ২৫ জনের ২০ জনই নাকি প্রথম দিনের পেমেন্ট নিয়েই ভেগেছে। খুব আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছি, এবার বইমেলা শেষে দেবা না আবার কবি হয়ে যায়! রাজীব হাসান

সূত্রঃ প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০০৯

৬৬) বিস্তারিত জানাচ্ছেন...

আজকাল সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা তেমন কিছুই জানাতে চান না। বিস্তারিত জানানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন প্রতিবেদকদের ওপর। দৈনন্দিন জীবনেও যদি আমরা বিস্তারিত জানানোর দায়িত্বটা পাশের জনের ওপর চাপিয়ে দিই, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়, আসুন তো দেখি। দেখাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার। পাবলিক বাসে উঠে

কন্ডাক্টরের কাছে ভাড়া কত জানতে চাইলেন। কন্ডাক্টর নিজে কিছু না জানিয়ে বলে দিল, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছে আমাদের হেল্পার মতলব মিয়া। জি, জনাব! কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা। এখানে কোনো কমিশনের বন্দোবস্ত নেই। ছাড়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। উত্তর উঠবে দূরের কথা। পাঁচ টাকার বিনিময়ে যাত্রাপথে আপনি পাবেন পর্যাপ্ত খোলা আলো-বাতাস। কারণ, আমাদের গাড়ির সব গ্লাস ভাঙা। এ ছাড়া দাঁড়িয়ে গেলেও আপনাকে রড ধরতে হবে না। কারণ, পাশের যাত্রীদের চাপাচাপিতে আপনি এমনভাবে সোজা হয়ে থাকবেন যে পড়ে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই। শপিং মলে গেলেন কেনাকাটা করতে। মনে করুন মোবাইল ফোনসেট কিনবেন। দোকানের মালিক কিংবা ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন নতুন আসা সেটটি সম্পর্কে। ম্যানেজার নিজে কিছু না জানিয়ে বলে দিলেন, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সেলসম্যান আসগর আলী। হ্যাঁ, ভাই, সেটটা গতকাল মাত্র এল। এই সেটের নানা সুবিধা। এই সেট দিয়ে আপনি যেকোনো নম্বরে ফোন করতে পারবেন। এই সেটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি দিয়ে কথা বলাও যায়, আবার শোনাও যায়। শুধু তা-ই নয়, মিসকল দিলে কোনো টাকাও কাটবে না। এই সেট দিয়ে যার সঙ্গে কথা বলবেন, তাকে দেখতেও পাবেন। কারণ, ফোন এলে স্ক্রিনে তার ছবি ভেসে ওঠে। দু-তিন দিন ধরে আপনার প্রেমিকা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। কী হয়েছে, এটা জানতে চেয়ে তার বাসার নম্বরে ফোন করতেই সে বলল, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছে আমাদের কাজের মেয়ে নসিমন। জি, ভাইজান, গত কয়েক দিন আফার খুবই সমস্যা আছিল। একটুর লাইগা আফারে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় নাই। ক্যামনে কী অইল হেইডাও জানায়া দিতাছি। আফায় হাইহিল জুতা কিনা আনছিল। হিলগুলো প্রায় হাফ ফুটখানেক উঁচা আছিল। আফায় এগুলো পইরা ইস্টাইল করতে করতে সিঁড়ি দিয়া নামতেছিল। আংকা পা পিছলায়া পইড়া গড়াইতে গড়াইতে তিনতলা থেইকা নিচতলায় চইলা গেছিল। কোথাও গিয়ে হয়তো রাস্তা

চিনছেন না। জিজ্ঞেস করলেন কাউকে। সে
নিজে না বলে দেখিয়ে দিল পাশের জনকে।
আরও বলল, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছে
আমার খুব কাছের ছোট ভাই বদরুল। এই রাস্তা
দিয়ে আপনি শুধু বাংলাদেশের না, পৃথিবীর
যেকোনো জায়গায় যেতে পারবেন। মনে করেন,
আপনি আমেরিকায় যাবেন। ব্যস, কয়েক কিলো
সামনে গিয়ে বাসে উঠে চলে যাবেন ঢাকা,
তারপর বিমানে উঠে সোজা আমেরিকা। এই
রাস্তা দিয়া যেহেতু আমেরিকাও যাওয়া যায়,
আপনি যেখানে যেতে চাচ্ছেন, তা তো খুব
সোজা। নাক বরাবর সামনে যাবেন। তারপর
হয়তো ডানে যাবেন, নয়তো বাঁ দিকে। আশা
করা যায়, আজকের দিনের মধ্যেই পেয়ে
যাবেন। টিউশনি করবেন। কথা হচ্ছে
অভিভাবকের সঙ্গে। আপনি ছাত্রীর বাবার কাছে
জানতে চাইলেন, সপ্তাহে আপনাকে কয় দিন
পড়াতে আসতে হবে। তিনি নিজে কিছু না বলে
বললেন, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমার
সহধর্মিণী আকতার বেগম। যে কয় দিন আমরা
বাড়িতে থাকি, প্রতিদিনই আসতে হবে। যেদিন
বাড়িতে থাকব না, সেদিন খালি বাড়িতে একা
একা আমার মেয়েকে পড়াতে আসার কোনো
দরকার নেই। আর হ্যাঁ, খুবই সাধারণ
পোশাক আশাকে আসতে হবে। আমার মেয়েকে
জোরে জোরে পড়াতে হবে। যাতে বাইরে
থেকেই শোনা যায়-পড়ালেখাবহির্ভূত আপত্তিকর
কোনো কথাবার্তা হচ্ছে কি না। সবচেয়ে বড়
কথা হলো, আমাকে আন্টি ডাকা যাবে না।
ডাকতে হবে ‘আপা’। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম
আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০০৯

67) ভুলে যাওয়া রূপকথা

পুরোনো দিনের সেই সব রূপকথা-সেসব আর
ভালো করে মনে পড়ে না। সেই সব রূপকথা
মনে করতে গিয়ে কী যে মনে পড়ল, কতটুকু
যে ঠিকঠাক মনে পড়ল আর কতটুকু বিকৃত
হয়ে গেল কে জানে। তবু পড়ে দেখুন।
লিখেছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। রাজকুমার ও
কিডন্যাপার
এক দেশে ছিল এক রাজকন্যা। তবে সে অন্য
রাজকন্যাদের মতো মূর্খ ছিল না। সে
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। একদিন ওই
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্যাডার তাকে কিডন্যাপ

করল। এ খবর পেয়ে পাশের দেশের রাজকুমার বাড়তি ভাড়ায় সিএনজি ঠিক করে সোজা চলে এল রাজকন্যার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। কিন্তু কোনো কূল-কিনারা করতে না পেরে সে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ক্যাডারের কাছে। সে রাজপুত্রকে বলল, ওই কিডন্যাপকারীকে মারতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে যেতে হবে। সেই হলে আছে একটি দলীয় রুম, সেই রুমে আছে একটি বিছানা, সেই বিছানায় আছে একটি বালিশ, সেই বালিশের নিচে আছে একটি চাবি, সেই চাবি দিয়ে বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা সুটকেসটা খুলতে হবে। সেই সুটকেসের মধ্যে আছে একটি চাদর, সেই চাদরের নিচে আছে একটি বিদেশি পিস্তল। ওই পিস্তল দিয়েই কিডন্যাপকারীদের বশ করতে হবে। সাহসী রাজকুমার সবকিছু কথামতো করে উদ্ধার করে আনল রাজকুমারীকে। রাজকন্যার ঘুম এক দেশে ছিল এক রাজপুত্র। আরেক দেশে ছিল এক রাজকন্যা। রাজকন্যার এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, সে শুধুই ঘুমাত। তার ঘুম কখনো ভাঙত না। এ সংবাদ পেয়ে ওই রাজকুমার ঘোড়ায় চেপে ছুটে গেল সেই রাজকন্যার দেশে। তারপর সে ওই ঘুমন্ত রাজকন্যার গায়ের ওপর পানি ছিটিয়ে দিল, চামড়া আর শঁটকির ঘ্রাণ শুঁকাল কিন্তু রাজকন্যার ঘুম আর কিছুতেই ভাঙে না। অবশেষে রাজকুমার তার ল্যাপটপ অন করল। তারপর ‘রাজকন্যার ঘুম ভাঙানোর উপায়’ লিখে গুগলে সার্চ দিল। কম্পিউটারের বলে দেওয়া উপায় অনুযায়ী রাজকুমার রাজকন্যার শিয়রে রাখা মাশকারা আর আইলাইনার ডান চোখের নিচে ছোঁয়াল। অমনি রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারপর তারা বিয়ে

করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে

থাকল। রাজকন্যাদের ভালোবাসা

একবার এক রাজা তাঁর তিন মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাদের একে একে জিজ্ঞেস করলেন, তারা রাজাকে কেমন ভালোবাসে। সব থেকে বড় রাজকন্যা বলল, সে তার বাবাকে গোলাপ ফুলের মতো ভালোবাসে। রাজা তো শুনে মহাখুশি। এরপর দ্বিতীয় রাজকন্যা বলল, সে তার বাবাকে সমুদ্রের মতো ভালোবাসে। রাজা তো এবারও খুশিতে গদগদ। সব থেকে

ছোট রাজকন্যা বলল, সে তার বাবাকে ফ্যানের মতো ভালোবাসে। শুনে রাজা খুব ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মেয়ে তার ভালোবাসাকে নগণ্য ফ্যানের সঙ্গে তুলনা করল! রাগের মাথায় রাজা তাঁর ছোট মেয়েকে বনবাসে পাঠালেন। এরপর রাজা একদিন গোলাপ বাগানে ঘুরতে গিয়ে গোলাপের ঘ্রাণ নেওয়ার সময় একটা পোকা রাজার নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর সে কী কাণ্ড! এরপর একদিন রাজা সমুদ্রে পানিতে নেমে ডেউয়ের আছাড় খেয়ে নাস্তানাবুদ হলেন। সবশেষে একদিন পুরো রাজ্যে লোডশেডিং হলো। ঘুরল না ফ্যান, ঘর্মাক্ত রাজা বুঝতে পারলেন ফ্যানের গুরুত্ব। তারপর বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনলেন ছোট রাজকন্যাকে। রাজকুমারীর বিয়ে এক রাজ্যে এক রাজার ছিল এক সুন্দরী রাজকন্যা। রাজকন্যা বিবাহযোগ্য হওয়ায় রাজা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। আর তাতে নিমন্ত্রণ করলেন সব দেশের রাজকুমারদের, যাতে রাজকুমারী তার পছন্দসই পাত্র খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু রাজকুমারীর কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না। হঠাৎ বিকট শব্দে একটি হেলিকপ্টার এসে সামনের মাঠে নামল। আর সেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল সুদর্শন রাজকুমার। কিন্তু পাইলট মিটারের থেকে ১০ টাকা বেশি চাইতেই ঝামেলাটা শুরু হলো। রাজকুমার তো কিছুতেই মিটারের থেকে ১০ টাকা বেশি দেবে না। ওদিকে পাইলটও ছাড়বে না। কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতি, তারপর বিশালদেহী পাইলটের এক চড়ে রাজকুমার ছিটকে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। আর এই দৃশ্য দেখে রাজকুমারী ‘না, নাহ্’ বলে চিৎকার দিয়ে স্কচটেপ মারা একটি ১০ টাকার নোট হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল আর নোটটা ছুড়ে মারল পাইলটের মুখে। তার পরের কাহিনী তো বুঝতেই পারছেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০০৯

68) ম্যালা বই ব ইমেলাতে - আহম্মান হাবীব

আমার এক বন্ধু আছে (বন্ধু বলব, না শত্রু বলব, ঠিক বুঝতে পারছি না)। তার ধারণা, এই জাতি বই পড়ে পড়ে উচ্ছল্নে যাচ্ছে! বই পড়ে এই জাতির ব্রেন (তার ভাষায় ঘিলু) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা গেছে। বই পড়া বাদ দিয়ে বরং

বাথরুমে আছাড় খেয়ে পড়া ভালো...এতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাথার ঘিলু নাকি নড়ে ওঠে এবং নতুন করে কাজ করতে শুরু করে। এই বন্ধুর বাসায় একবার বহু আগে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তার বাসায় কুল্লে নটা বই! তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেলিফোন ডাইরেক্টরি, বাকি আটটা তার এইটে পড়ুয়া পুত্রের পাঠ্যবই! তো সেই বন্ধু হঠাৎ ঘোষণা দিল, সে বইমেলায় যাবে এবং আমার বই কিনবে (বলাই বাহুল্য, সে তার সুদীর্ঘ জীবনে একবারও বইমেলায় আসেনি)!

-এবার হঠাৎ বইমেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলি? আমি প্রশ্ন না করে পারি না।

-কাগজে দেখলাম, তোর বই বেরিয়েছে।

-তো?

-তাই ভাবলাম, তুই যদি লেখক হতে পারিস, আমিও বইমেলায় যেতে পারি।

যাই হোক, সে সত্যি সত্যিই একদিন পুত্রের হাত ধরে বইমেলায় এসে হাজির।

-তোর কটা বই বেরিয়েছে?

-বেরিয়েছে কয়েকটা।

-আরে বাবা, বল না কটা! তোর সব বই কেনার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন।

তখন আমাকে পরিষ্কার গলায় বলতে হলো, 'বারোটা-এক ডজন' (পাঠক আবার ভাববেন না...এই চাসে আমি রস+আলোতে বইয়ের বিজ্ঞাপন শুরু করেছি)।

-বারোঅঅঅটা...বন্ধুর মনে হলো বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা! তারপর চিকন গলায় চিঁ চিঁ করে বলল, 'বারোটাই কিনতে হবে?' আমি বললাম, না, কোনোটাই কিনতে হবে না।

আমার বই কেনে পাঠকেরা, আর তুই তো পাঠক না।

-আমি কী?

-তুই পাঠক না...শুধু ঠক।

-আমি ঠক??

-হ্যাঁ, কারণ তোর বাসায় কোনো বই নেই। তুই বই না পড়ে নিজেকে ঠকাচ্ছিস, তোর ছেলেকে ঠকাচ্ছিস...তোর বউকেও ঠকাচ্ছিস...।

-এই কথা তু-তুই বলতে পারলি?

আমার বন্ধু মনে হলো বজ্রাহত হলো, যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাতিত। তাকে আমার দুইটা বই গিফট করলাম...একটা সে বহু কষ্টে

কিনল (এখন তার বাসায় বইয়ের সংখ্যা হলো এক ডজন!)।

এবারের বইমেলায় বিদেশ থেকে অনেকে এসেছেন। তাঁরা মেলা উপলক্ষেই আসেন, সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো, যিনি ১১ বছর পর দেশে এসেছেন এবং তিনি হতাশ! তিনি এ দেশে এসে আবিষ্কার করেছেন, এ দেশে কেউ ‘সরি’ আর ‘প্লিজ’ শব্দ দুটি বলে না...এবং যে কারণে এ দেশের উন্নতি হচ্ছে না বা হবে না। তাঁকে বলতে পারলাম না, ওই শব্দ দুটি বিদেশে চট করে বলে, কারণ শব্দ দুটি ছোট আর তারা (বিদেশিরা) শব্দ দুটি আসলে ভেতর থেকে বলে না, অভ্যাসবশত বলে...সে তুলনায় এর বাংলা দুঃখিত আর অনুগ্রহপূর্বক বেশ বড়। কাজেই সব সময় আমাদের (বাংলাদেশিদের) পক্ষে বলা হয় না বা বলে না। তা ছাড়া এমনিতেই আমরা অনেক দুঃখের মধ্যে আছি। আবার ঘন ঘন মুখে ‘দুঃখিত’ বলে বলে মুখে ফেনা ওঠানোর কোনো মানে দেখি না। আর আমরা বাঙালিরা খারাপ-ভালো যা-ই বলি, সরাসরি ভেতর থেকেই বলে ফেলি, ভান করি না।

এক তরুণ লেখকের সঙ্গে পরিচয় হলো, যার প্রথম বই মেলায় আসছে। সে খুবই উত্তেজিত। অলরেডি তিনটি জাতীয় দৈনিকে তার বইয়ের (প্রচ্ছদসহ) রিভিউ বের হয়ে গেছে! কিন্তু বইয়ের খবর নেই! সে খুবই টেনশনে আছে। কারণ প্রকাশক নাকি ধরা দিচ্ছে না। যখনই বইয়ের প্রসঙ্গ আসে, সে বাইন মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ‘আহসান ভাই, আমি এখন কী করি বলেন তো? প্রকাশক তো ধরা দিচ্ছে না...বারবার পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে!’

-ছাই দিয়ে ধরো। আমি বুদ্ধি দিই।

-ছাই পাব কোথায়? ঢাকা শহরে ছাই আছে নাকি?

-আছে আছে...মেলায় অনেক ছাইপাস বই (আমারগুলোসহ) বের হয়, ওখান থেকে ছাই জোগাড় করো। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০০৯

৬৭) আজকাল আর লজ্জা পাই না - নির্মলেন্দু গুণ

আপনার নামের সার্থকতা কোথায়?

* শুরুতেই বলি, আমার নামটা আমার নিজের

রাখা লেখক-নাম (পেন নেম) নয়। ওটা আমার পিতৃদত্ত নাম। আমার ইমিডিয়েট বড় এক ভাই ছিলেন। বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন কালিদাস। কালিদাস মাত্র তিন বছর বয়সে মারা যান। ফলে আমার পিতার স্বপ্ন পূরণ করে মহাকবি কালিদাসের যথাসম্ভব মানরক্ষার দায় বর্তায় আমার ওপর। সেই দায় অত্যন্ত অপাত্রে বর্তেছে বলেই সংশ্লিষ্ট সবার মতো আমিও বিশ্বাস করি। আমার পিতৃদত্ত নাম নির্মল (পরিষ্কার)+ইন্দু (চন্দ্র/চাঁদ)+গুণ। শাহবাগের রেডিও বাংলাদেশের প্রবেশপথে দায়িত্বপালনরত একজন সদ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী জোয়ান (১৯৭৫) আমার নাম লিখেছিলেন-নির্মল হিন্দু গুণ। এন্ট্রি বুকে আমার নাম লিপিবদ্ধ করার আগে নিজের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে না পারার জন্য সেদিন তিনি আমাকে মৃদু ভৎসনাও করেছিলেন। এখন যদি আমাকে আমার নাম নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমি আমার নাম রাখব-অনির্মলচন্দ্র দোষ। আপনি কবি না হলে কী হতেন?

* এটি একটি অত্যন্ত উদ্ভট প্রশ্ন! মানুষের এখতিয়ার-বহির্ভূতও বটে। কবির পক্ষে কবি না হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। কবিরা জন্মসূত্রেই কবি।

আপনি লজ্জা পান কখন?

* আমি লজ্জা পাই দিনের বেলায়। তবে চারপাশে নির্লজ্জদের অবাধ বিচরণ দেখে দেখে আজকাল আর দিনের বেলাতেও খুব একটা লজ্জা পাই না। শাস্ত্র বলে, লজ্জা হচ্ছে নারীর ভূষণ। তাহা নরগণের বেলায় প্রযোজ্য নহে। নির্লজ্জদের হাসতে দেখে আমি রাতের বেলাতেও লজ্জা পাই।

বর্তমান যুগের কোন বিষয়টি আপনার খারাপ লাগে?

* আগে ভিক্ষা করত কেবল ভিথিরিরা, এখন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও ভিক্ষা করেন। তবে বৈচিত্র্য এসেছে ভিক্ষার ধরনের মধ্যে। অনেক সময় বোঝা যায় না।

আপনাকে যেকোনো একটি কবিতার প্যারোডি করতে বলা হলে আপনি কোন কবিতাটির প্যারোডি করবেন?

* ঠিক প্যারোডি নয়। একটি বিখ্যাত কবিতার নবমূল্যায়ন করব। কবিতার নাম সোনার তরী।

কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এত কবিতা থাকতে ওই বিখ্যাত কবিতাটি কেন? আমার সদ্য প্রকাশিত এবং প্যারিস গ্রন্থে আমি তার কারণ ব্যাখ্যা করেছি।

পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদ সফরে যান, তখন মীর জাফর তাঁকে খুশি করার জন্য ৭৫টি নৌকা বোঝাই করে বাংলার ধনসম্পদ উপটৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন বা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা-জহরত এবং অন্যান্য ধাতব মুদ্রা দিয়ে ৭৫টি নৌকা বোঝাই করে কলকাতার পথে রওনা হন রবার্ট ক্লাইভ। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মাণ ক্লাইভের নৌবহরের দিকে তাকিয়ে মীর জাফর তখন কী ভাবছিলেন, তা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতায় কিছু পাওয়া যায়।

‘...যত আছে তত লও তরণী পরে।/আর আছে?
আর নাই দিয়েছি ভরে,/’
এবার আমারে লহ করুণা করে।

....
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি-;/যাহা ছিল নিয়ে
গেল সোনার তরী।’ ক্লাইভের জীবনী পাঠ করতে
গিয়ে আমি যখন ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনের
এই ভয়াবহ ঘটনাটির সঙ্গে পরিচিত হই, তখন
রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতার এই নতুন
ব্যাখ্যাটি আমার মনে আসে।

অভিনয় করতে বলা হলে আপনি কোন চরিত্র
বেছে নেবেন?

* রবীন্দ্রনাথ। সাদা চুল-দাড়িতে আমাকে ওই
চরিত্রে মানাবে বলেই মনে হয়। সত্যি সত্যি তো
আর আমি তাঁর চরিত্রে অভিনয় করছি না।
শুনেছি, স্বপ্নের ভেতরে বুদ্ধিমানেরা ভাতের
বদলে বিরিয়ানি খেতেই বেশি পছন্দ করেন।
কখন নিজেকে অসহায় লাগে?

* ‘মরে যাব’ এই কথা জেনে পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করে না কোনো শিশু। পরে ক্রমশ সে
ভয়াবহ মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হয়। তখন থেকে
তার মধ্যে মৃত্যুর বোধ ও ভীতি জন্ম নেয়।
মনুষ্যজীবনের সবচেয়ে বড় অসহায়ত্বটা
সেখানেই। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

কোন বস্তু হারিয়ে গেলে আপনার একটুও কষ্ট
হবে না?

* ক্ষয়ে যাওয়া নড়বড়ে কোনো দাঁত।

ঘুম না এলে কী করতে ভালো লাগে?

* দেখতে। লিখতে। পড়তে। ভাবতে।

কী খেতে আপনার মোটেও ভালো লাগে না?

* ছাঁকা এবং বিষ।

বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হলে
কোথায় যাবেন?

* তেমন প্রয়োজন হবে না বলেই আমার আশা।

তারপরও যদি হয়, তবে সম্ভবত আমি যাব
টোকিও অথবা প্যারিস। সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ

জিনাত রিপা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩,
২০০৯

70) রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!

বাঁশবাগানে মাথার ওপর

চাঁদ ওঠে না আর

আকাশ জুড়ে টুইংকেলের

লিটিল লিটিল স্টার। তাই আধুনিক আন্টি, পাপা

আর আধুনিক মাম্টি

সোনামণির বুকে বসায়

হামটি এবং ডামটি। কাজল চোখেও হারায় না
কেউ

রাগ কোরো না দেবী,

হঠাৎ যদি ডাকি তোমায়

ডল্, হানি বা বেবি। রোমান হরফ দিয়ে আমি

বাংলা মেসেজ লিখে

জানিয়ে দেব দেখা হবে

রাত দশটার দিকে। লাউঞ্জ কিংবা কফি শপে

যুগের দুষ্টুমিতে

ডিনার হবে ইউরোপীয়

পিৎজা, স্প্যাগেটিতে। গ্লোবাল হয়ে ওঠাই নাকি

দাবি মহাকালের

বিলবোর্ড তাই ঝুলিয়ে দিলাম

হিন্দি সিরিয়ালের। সারাটা দিন মগ্ন থাকি

জি-টিভি, স্টার প্লাসে

তার পরেও নির্লজ্জ

‘মহান একুশ’ আসে। বাহান্নতে যা পেয়েছি

হজম করে সাবাড়...

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-এর

শ্লোগান উঠুক আবার! অনিক খান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২৩,
২০০৯

71) সমর্থক ও বোমা

ধরা যাক, তার নাম কাদের। বাসায় ফিরে কাদের তাঁর বন্ধু রাম বা রহিমকে বললেন, ‘আজ স্টেডিয়াম থেকে বেরোতেই বিরাট এক কাণ্ড! শতানেক লোক কোথেকে দৌড়ে এসে ঘিরে ধরল আমাকে...।’

‘সে কী!’

‘হ্যাঁ। আমিও তো অবাক। বলে কিনা অটোগ্রাফ চাই। কেউ আবার ক্যামেরা বের করে ছবি তুলছে। সে কী ঝামেলা গেল!’

একেবারে বাতাসের মানুষ (মাটির মানুষের চেয়ে নিরীহ আর কি) কাদের নিতান্ত বিনে পয়সায় টিকিট পেয়ে খেলা দেখে এসে এমন গল্প বলছে! আপনি-আমি হলে যা করতাম, রাম বা রহিমও তা-ই করল। চোখ আকাশে বা তারও ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করল,

‘স্টেডিয়ামের বাইরে একসঙ্গে ১০০ লোক তাহলে অন্ধ হয়ে গেল বলতে চাস?’

‘আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? ১০০ তো কম বলেছি। আমার ধারণা, অন্তত শতিনেক লোকের ভিড় ছিল। বিশ্বাস না হয় মাশরাফিকে জিজ্ঞেস করে দেখিস। আমার ঠিক সামনে মাশরাফি দাঁড়ানো ছিল।’

ভিড় জমা নিয়ে কথা। সে মাশরাফিকে দেখে ভিড় জমুক আর কাদের সাহেবকে দেখে; তফাৎটা কী?

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাবিবুল বাশার ও রকম ভিড় দেখলেন। আইসিএলের ম্যাচ খেলতে ঢাকা ওয়ারিয়র্সের হাবিবুলেরা তখন আহমেদাবাদে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে হাবিবুল দেখলেন সেই ভিড়। একজন ক্রিকেটারকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জনা পঞ্চাশেক লোক। ভারতের মতো দেশে ক্রিকেটারকে ঘিরে ভিড় হতেই পারে। কিন্তু হাবিবুল চমকালেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো মোহাম্মদ রফিককে দেখে। হাবিবুলের চমকটা কাটতে না কাটতেই আরেক দফা চমক।

রফিক কী একটা নির্দেশ দিলেন। ভিড়টা সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠে সবাই মিলে এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবিবুলের ঘোর আর কাটে না।

সুশৃঙ্খল সৈনিকের মতো লাইন বেঁধে দাঁড়ানো

লোকগুলোর হাতে এবার রফিক একটা একটা করে কী যেন ধরিয়ে দিচ্ছেন। প্রত্যেকে রফিকের হাত থেকে দুই হাত পেতে রহস্যময় সেই জিনিসটা নিয়ে আবার মাথা নিচু করে কী যেন বলছে। আর রফিকও মুখ গম্ভীর করে কী যেন বলে উত্তর দিচ্ছেন। এই ভারতে এসে রফিক তাহলে নিশ্চয়ই সাধুটাধু হয়ে গেছেন! ওদের বর দিচ্ছেন এখন নিশ্চয়ই।

হস্তদন্ত হয়ে হাবিবুল নিচে নামতেই সিঁড়ির গোড়ায় দেখা রফিকের সঙ্গে। সাধু রফিক হাসতে হাসতে ফিরছেন, ‘ওদের টিকিট দিলাম।’

‘টিকিট!’

‘হ্যাঁ, ফ্রি যে টিকিটগুলো পেয়েছিলাম আমরা, সেগুলো এই লোকগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। তবে বিনা শর্তে দিইনি...।’

‘কী শর্ত দিয়েছিস?’

‘বলেছি, আমাদের টিকিট নিয়ে খেলা দেখবা, মাঠে এসে আমাদের সাপোর্ট করতে হবে!’ ওই লোকগুলো সমর্থন করেছিল কি না, তা আর বোঝার উপায় রইল না। মুম্বাইতে বোমা আক্রমণে খেলাটেলা ফেলে তড়িঘড়ি করে ফিরে আসতে হয়েছে দেশে। জীবন বাঁচানো বড় পুণ্য। জীবন বাঁচানোও কি সহজ কাজ। আইসিএলের আমাদের একজন ক্রিকেটার মুম্বাই ঘটনার সময় জীবন বাঁচাতে কী না করেছেন!

ভদ্রলোকের নাম নাহয় না-ই বলি। শুধু এটুকু জানুন, তিনি একজন বড় বোলার, বাঁহাতি স্পিনার; নাম ধরুন শফিক। বেশ সাহসী মানুষ বলে পরিচিত বলে আমাদের ভীতু হাবিবুল (তিনি জোর গলায় দাবি করেন, তিনি ভীতু মানুষ) ঠিক করলেন, শফিকের রুমে গিয়ে রাত কাটাবেন। বলা যায় না, মুম্বাই থেকে আক্রমণ তো আহমেদাবাদেও পৌঁছাতে পারে!

আগে থেকে বলে রাখা কথামতো রাতের বেলায় শফিকের রুমে গিয়ে নক করলেন হাবিবুল। নক করতেই হুড়মুড় করে কী একটা শব্দ হলো। কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না। আবার নক করলেন, ডাকাডাকি করলেন, দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রম করলেন হাবিবুল। কারও সাড়া নেই।

সতীর্থদের ডেকে আনা হলো। সবাই মিলে একটানা ডাকাডাকি করতে করতে অবশেষে

তিনি দরজা খুললেন। মাথায়, হাতে ময়লা লেগে রয়েছে, বিধ্বস্ত চেহারা। মুখটা করুণ করে বললেন, ‘আমি তো বাইরে শব্দ পেয়ে ভাবলাম, আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তাই খাটের তলে...।’ ও রকম আক্রমণের ভয়ে ভীত আইসিএলের একজন ক্রিকেটার (এবার আর কিছুতেই নাম বলা যাবে না) বিমানে উঠতে চাইছেন না-যদি বিমানে বোমা আক্রমণ হয়? (তার সঙ্গে মিলিয়ে একটি কৌতুক জুড়ে দিয়ে চলুন লেখাটা শেষকরি।) তাকে সবাই মিলে বোঝাল, বিমানে বোমা আক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম। ‘কত কম?’-সেই ক্রিকেটার প্রশ্ন করলেন।

‘শতকরা এক ভাগ।’

কী যেন ভেবে আবার ওই ক্রিকেটার জানতে চাইলেন, ‘এই বিমানে আলাদা দুই পক্ষ বোমা নিয়ে ওঠার আশঙ্কা কতটুকু?’

একজন বিমান ‘বিশেষজ্ঞ’ ভেবে জবাব দিলেন, ‘কোটি ভাগের এক ভাগ।’

‘ঠিক আছে। কাল আমি বোমা নিয়ে তবে বিমানে উঠব। ওই কোটি ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাটুকুও আমি অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে চাই না।’ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০২, ২০০৯

72) প্রেম কখনোই পরিকল্পনামতো ঘটে না

সুকুমার রায়ের ‘বাবুরাম সাপুড়ে’ এক ঝটকায় উঠে এসেছে মিলার গলায়। সে গানে এবার আর শুধু সাপই নাচছে, তা নয়, নাচতে শুরু করেছে দর্শক-শ্রোতাও। মিলা এবার আলোচনে এসেছেন পাঠক মতামতে। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা। আপনি কেন গান করেন?

– আর কী করলে প্রশ্নটা করতেন না, বলুন তো?

আপনার সবচেয়ে বড় দুঃখ কী?

– রস+আলোতে সাক্ষাৎকারটা দিতে বেশ দেরি হয়ে গেল! আমার আরও আগে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

কোন রোগের কোনো ওষুধ নাই?

– প্রেম রোগের। তবে ব্যাপারটা হলো, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।

আপনাকে একটি সংস্কারের সুযোগ দেওয়া হলে আপনি কী করবেন?

– আমি ‘সংস্কার’ বানানের সংস্কার করব।

যুক্তাক্ষর বড় ঝামেলা করে!

বাংলা সিনেমার শিক্ষণীয় দিক কোনটি?

- সব ধরনের বাংলা সিনেমা দেখা যে ঠিক নয়, তা শেখা যায়।

আপনার বয়স কত?

- জন্মমুহূর্ত থেকে পরবর্তী স্মৃতি আমার মনে নেই। তাই সঠিক বয়স বলতে পারছি না।

চিংড়ি তো মাছ নয়, তবু আমরা খাই কেন?

- পায়েশ কিংবা কাঁঠাল তো মাছ নয়। সেগুলো আমরা খাই যে কারণে, চিংড়িও সে জন্য খাই।

কী হারিয়ে গেলে খুব খুশি হবেন?

- এক মাস থেকে ১০টি করে দিন। তাতে ব্যস্ততা খানিক কমবে। শেষ জীবনে মনে হবে, অনেক বছর তো বাঁচলাম!

এমন কেউ কি আছেন, যার নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পান না?

- অর্থমন্ত্রী। বুঝি না এমন কেন? সামনে গিয়ে যদি টাকা চাই, পাব, বলুন?

সবচেয়ে কঠিন কাজ কী মনে হয়?

- ছুরি দিয়ে পানি কাটা।

এ দেশের কার গতি সবচেয়ে বেশি?

- জিনিসপত্রের দামের।

‘চিকন স্বাস্থ্য মোটা করিয়া থাকি’-এ ধরনের বিজ্ঞাপনের সার্থক প্রতিষ্ঠান কোনটি?

- এফডিসি।

মোবাইল ফোন আপনার কাছে কী ধরনের যন্ত্র?

- উপকারী যন্ত্রণা।

দুটি ভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে মিল দেখাতে পারেন?

- রাজনৈতিক নেতা ও জ্যোতিষী। একজন হাত নেড়ে ভবিষ্যৎ নির্দেশ করেন, দ্বিতীয়জন করেন হাত ধরে।

কোন ব্যাপারটি কখনোই পরিকল্পনামতো ঘটে না?

- প্রেম আর লোডশেডিং। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০২, ২০০৯

73) একটি এয়ারলাইন্সের চমৎকার সার্ভিস

সময়টা ছিল ২০০৭ সালের মার্চ মাস। বার্মিংহাম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে বসে আছি। গন্তব্য ছিল ডেনমার্ক। ছিল বলছি, কারণ

এয়ারলাইন্সের ৭৬৭ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। তথ্যকেন্দ্র থেকে জানতে পারলাম, সবার টিকিট

নতুন আরেকটা ফ্লাইটে রি-বুক করা হবে। কী আর করা, কফি বারে বসে কফি খাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর টার্মিনালের স্পিকারে ভেসে এল একটি সুরেলা কণ্ঠ। বলা হচ্ছে, যারা ৭৬৭ ফ্লাইটের যাত্রী, তারা যেন ১৪ নম্বর কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ায় টিকিট রি-বুক করার জন্য।

ঘোষণা শুনে কফিতে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খুঁজে খুঁজে যখন ১৪ নম্বর কাউন্টার পেলাম, দেখি বেশ লম্বা লাইন হয়ে গেছে। লাইনের শেষেই দাঁড়িয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর যে ঘটনাটি ঘটল, আমার মনে হলো এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে বসা মহিলাকে তার রসবোধের জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত। ঘটনাটা খুলেই বলি।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ভদ্রলোক, যিনি বেশ বিরক্তিতে বারবার নড়েচড়ে উঠছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

তিনি লাইন ভেঙেই এগিয়ে গেলেন এবং কাউন্টারে সজোরে টিকিট রেখে বললেন, ‘আমাকে এই ফ্লাইটেই যেতে হবে এবং আমি ফাস্ট ক্লাসের টিকিট চাই।’ কথা শুনে কাউন্টারে বসা মহিলা আন্তরিকভাবে বললেন, ‘আমি সত্যি দুঃখিত। আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে, যাঁরা লাইনে আছেন তাঁদেরটা শেষ করে, আপনারটাও করে দিচ্ছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে লাইনে আসুন।’

কথা শুনে যাত্রী মহোদয় মোটেও আশ্বস্ত হলেন না। তিনি খুব উত্তেজিত স্বরে বারবার বললেন, ‘আপনি জানেন, আমি কে? আমি কে?’

তৎক্ষণাৎ মহিলাটি দাঁড়িয়ে একটি চমৎকার হাসি দিয়ে সামনের মাইক্রোফোনটি অন করে বলতে লাগলেন, ‘অএওএওউঘএওওঙঘ চখউঅঝউ!’ মহিলার আওয়াজ পুরো টার্মিনালে শোনা যাচ্ছিল। ‘গেট নম্বর ১৪তে একজন যাত্রী পাওয়া গেছে, যিনি জানেন না উনি কে। যদি কেউ তার পরিচয় জানাতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে ১৪ নম্বর কাউন্টারে আসুন, ধন্যবাদ।’

লাইনের সবাই তখন হাসিতে গড়াগড়ি। তা দেখে যাত্রী মহোদয় আরও রেগে গেলেন, ‘দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখে নেব।’

কাউন্টারের মহিলা আরেকটা চমৎকার হাসি দিয়ে বললেন, ‘স্যার, আমি দুঃখিত। এর জন্যও

আপনাকে সিরিয়ালে আসতে হবে।’ –

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত এই গল্পটি নিজের বলে চালিয়েছেন মুনাস ইকবাল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০২, ২০০৯

74) জোয়া জায়া

পরিবারটা ছোট, কিন্তু দিলটা বড়-মেহমান ছাড়া কোনো দিন খেতে বসে না। সারা দিনের কাজবাজ সেরে প্রতিদিন বিকেলে ওদের বাবা বেরিয়ে যান নদীর ঘাটে মেহমানের খোঁজে। বাগদাদের পশ্চিমে দজলা নদী। কত জাহাজ আসে। কত জাহাজ যায়। ওদের বাবা দাঁড়িয়ে থাকেন-যদি বা জাহাজযাত্রী এই বিদেশি সওদাগরদের কেউ দয়া করে তাঁর মেহমান হয়ে যায়।

সেদিন কোনোমতেই মেহমান পাওয়া যাচ্ছিল না। একজন যাত্রী আসে তো দশজনে টানাটানি।

শেষে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, অনেক রাতে, একজন মেহমান পদধূলি দিলেন। সেও কত কন্ডিশনে, ‘বেশি খাওয়াবেন না তো?’ ‘না। শুধু সাদা পোলাও। সাদা কোরমা।’ ‘এক বেলার বেশি নয় তো?’ ‘স্রেফ এক বেলা।’ ‘আমিরি অভ্যর্থনা?’ ‘না না। ওসব কিছু না-আসুন।’ এতগুলো কন্ডিশনে তবে মেহমান ভয়ে ভয়ে রাজি হন এবং গুটি গুটি পায়ে রওনা হলেন। মেহমান এসেছেন। মেহমান এসেছেন। তাঁবুর ঘর, সেই ছোট পরিবারটিতে মৃদু একটা আনন্দের গুঞ্জন ওঠে। দুম দুম করে তাঁবুর দরজা খুলে যায়। শিগগিরই পরিবারের ছেলেমেয়েগুলোর জটলা বসে গেল। কত গল্প করেন তিনি। গল্পে গল্পে একসময় খাবারের সময় আসে।

ওই তো একখানা গোলটেবিলের চারধারে চেয়ার পেতে ওরা বসে গেল খেতে। বাপ-মা, দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে, আর মেহমান-মোট সাতজন।

প্রথম কিস্তিতে এল ঘিয়ে ভাজা আস্ত পাঁচটা কবুতর। এতক্ষণ গল্প শোনার পর ছেলেমেয়েদের জবর খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেহমান না দিলে তো আর ওরা নিতে পারে না। ও দেশের নিয়ম হলো, মেহমানই পরিবেশন করবেন।

এদিকে মানুষ সাতজন, অথচ কবুতর পাঁচটা।

মেহমান পড়লেন মুশকিলে। মনে মনে কী ভেবে
মেহমান বাপ-মাকে একটা কবুতর, ছেলে
দুটোকে একটা কবুতর, আর মেয়ে দুটোকে
একটা কবুতর দিয়ে, নিজের পাতে নিয়ে
বসলেন দুটো কবুতর।

মেহমানের কীর্তিখানা দেখে ছেলেগুলো ‘হাঁ’
করে তাকিয়ে রইল। তাহলে এতক্ষণে
মেহমানের স্বরূপখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ,
কথাবার্তায় মিষ্টি বটে; কিন্তু স্বার্থের বেলায় ষোল
আনা সজাগ।

তারপর এল দ্বিতীয় দফা। মস্ত বড় একটা
তেলতেলে মুরগিকে আস্ত রোস্ট করে একখানা
চিনামাটির প্লেটে করে এনে দেওয়া হলো
মেহমানের সামনে, তিনি ভাগ করে দেবেন
বলে।

এবার ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি ছুরি-কাঁটা খুঁজে
এনে দিলে, কী জানি দৈবাৎ কেটে ভাগ করে
দেওয়ার যন্ত্রপাতির অভাবে যদি মেহমান সবটা
মুরগি নিজের পাতেই নিয়ে বসেন। কিন্তু কার্যত
মেহমান যা করলেন, সেটা সবটা নেওয়ারই
শামিল। করলেন কী মেহমান? শাঁই করে
ছুরিখানা দিয়ে কেটে ‘রান’ দুটো ছেলে দুটোকে
দিলেন, ডানা দুটো মেয়ে দুটোকে দিলেন, আর
গলাটা কেটে মুড়োটা দিলেন মা-বাবাকে! আর
বাদবাকি যা রইল সবটা নিয়ে বসলেন নিজের
পাতে।

এহেন ভদ্র মেহমানের এতখানি
আত্মপক্ষপাতিত্বে ছেলেমেয়েগুলো কেমন যেন
পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। কী
নির্লজ্জ মেহমান রে! কোথায় বিনয় করে নিজের
পাতে কম কম নেবেন, আর সবাইকে বেশি
বেশি করে দেবেন, সে জন্যই তো মেহমান
দেওয়ার প্রথা, না, সবকিছুই নিজের পাতে!
পরদিন মেহমান বিদায় নেবেন। একে একে
সবাই বিদায় দিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ছোট
ছেলেটি আমতা আমতা করে শেষে বলেই
ফেলল, ‘মেহমান সাহেব, যাওয়ার আগে কিন্তু
একটা কথা বলতে হবে। কাল রাতে যে আপনি
খাবার ভাগ করলেন, সবকিছুই আপনার পাতে
বেশি বেশি করে নিলেন, এটা কি ন্যায় হলো?’
এমন স্পষ্ট আক্রমণে মেহমান কিন্তু কুণ্ঠিত
হলেন না। ‘কেন ভাই, আমি তো সাম্য বজায়
রেখে সমান ভাগ করে বেঁটেছি বলেই মনে

পড়ে। তোমরা তো আমায় পাঁচখানা কবুতর দিয়েই খালাস। এদিকে আমি পড়লুম মুশকিলে-মানুষ সাতজন, কবুতর পাঁচটা। কী করি? হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

‘করলুম কী আমি? মা-বাবা আর একটা কবুতর এই তিন, ছেলে দুটো আর একটা কবুতর এই তিন, মেয়ে দুটো আর একটা কবুতর এই তিন, আর আমি আর দুটো কবুতর এই তিন। তিন, তিন, তিন। সবই তিনের ভেতর ফেলে দিলুম, কেমন? সমান ভাগ হয়ে গেল, নয় কি?’ ভাগের হিসাবের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

‘বেশ বেশ। তাহলে মুরগির বেলায় সাম্যটা হলো কেমন করে শুনি?’

‘মুরগি? সেটা আমি নিয়েছিলুম আর এক হিসাবে। ততক্ষণে ছুরি-কাঁটাও এসে গেল কিনা। ভাবলুম, ছুরিই যখন এসেছে, তাহলে ভগ্নাংশেই যাওয়া যাক। দেখলুম, মা-বাবা সংসারের কর্তা। তাঁরাই সংসারের মাথা। কাজেই গলাটা ছিঁড়ে মাথাটা দিয়ে দিলুম তাঁদের। তারপর ভাবলুম, মেয়ে দুটো তো দুদিন বাদে বিয়েশাদি হয়ে পরের ঘরেই উড়ে চলে যাবে। কাজেই দিলুম ঠুকে তাদের দুজনাকে দুটো ডানা-উড়ে যেতে সাহায্য করবে বলে। ফের ভাবলুম, মা-বাবাও বুড়ো হয়ে যাবেন, মেয়ে দুটোও চলে যাবে, ছেলে দুটোর ওপরই একদিন না একদিন গোটা সংসারের চাপ পড়বে, যেমন মুরগির সমস্ত শরীরের ওজন পড়ে ওর রান দুটোর ওপর। কাজেই তাদের দিয়ে দিলুম রান দুটো। মুরগির শরীরে আর বাদবাকি যা থাকে, তাকে দেখতে অনেকটা জাহাজের মতো দেখায় না কি?’ ‘হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।’

‘এখন, আমি এসেছিলুম একখানা জাহাজে করে। কাজেই ভাবলুম, ওটা আমারই প্রাপ্য।’ এ পর্যন্ত বলে মেহমান বললেন, ‘আচ্ছা, ভাই, আজ তবে আসি।’ বলেই তাঁর লম্বা পাগড়ি আর জোঁকাজোঁকগুলো তুলে নিয়ে গুটি গুটি পায় তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রায়। (ঈষৎ সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)সাজেদুল করিম, শিশুসাহিত্যিক।

পেশাগত জীবনে অর্থনীতির শিক্ষক। জন্ম-

১৯১৫, মৃত্যু-১৯৯৪। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,
মার্চ ০২, ২০০৯

75) বিচারের বাণী...

চৈনিক কোনো এক জ্ঞানীপ্রবর নাকি বলে
গেছেন, সামান্য হাতের ইশারায় একই সঙ্গে ১১
জন জিগরি দোস্তু আর ১১ জন খুনে শত্রু যে
তৈরি করতে পারে, তাকে রেফারি বলা হয়!
আবার ইংরেজ কোনো এক সাহেব পণ্ডিত
বলেছেন, ২২ জন খেলোয়াড়, দুজন লাইসেন্সম্যান,
একজন অসহায় দর্শক আর কয়েক হাজার
রেফারি নিয়ে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

আম্পায়ারদের যে বন্ধু থাকে না, এটা কথার
কথা নয়। একেবারে পরীক্ষিত সত্য। আর এই
সত্য না জেনে এক ভদ্রলোক পড়েছিলেন মহা
বিপাকে। কোনো একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল।
ধরুন, ভারত-পাকিস্তান বা আবাহনী-

মোহামেডান ম্যাচ। ওই ভদ্রলোক বিনা টিকিটে
চলে এসেছেন খেলা দেখতে। তা লোকজন
দেখতে দেবে কেন। আয়োজকদের একটা
ইজ্জতের ব্যাপার আছে না?

‘আমি আপনাদের এই ম্যাচের একজন কর্তার
বন্ধু।’ ভদ্রলোক কাতর হয়ে বললেন
স্টেডিয়ামের গেটে দাঁড়ানো রক্ষীকে। দুয়ারের
পাহারাদার এবার খতমত খেয়ে গেলেন, ‘তাই
নাকি! তাই নাকি! তো আপনার বন্ধু কে?’ এবার
হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন সেই বিনা টিকিটের
লোকটা, ‘ওই যে আম্পায়ার, নাম...’
নাম পর্যন্ত আর বলা হলো না। এক
নিরাপত্তাকর্মী তেড়েমেড়ে এলেন, ‘ঘাড় ধরে
বের করে দে এই লোককে। মিথ্যেবাদী,
জালিয়াত...’

‘কেন, কেন? এমন বলছেন কেন!’
‘মিথ্যেবাদী ছাড়া আর কী? এই দুনিয়ায় কোনো
আম্পায়ারের আবার বন্ধু থাকে নাকি?’
আম্পায়ারদের প্রধান ‘শত্রু’ মাঠে নিশ্চয়ই
খেলোয়াড়েরা। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে বসে এই
শত্রুকে তো কিছু বলাও যায় না। তাই বলে
ছেড়েও তো দেওয়া যায় না। একের পর এক
খারাপ সিদ্ধান্ত (পড়ুন নিজেদের বিপক্ষে
সিদ্ধান্ত) পেয়ে চটে গেছেন এক অধিনায়ক।
চটে গেছেন, কিন্তু কিছু বলতে গেলেই আইনের
ফাঁকড়া।

অবশেষে অধিনায়ক আস্তে আস্তে আম্পায়ারের

কাছে হেঁটে গেলেন, বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, ‘স্যার, মনে মনে কিছু চিন্তা করলে কি আইসিসি কোনো শাস্তি দেয়?’

‘নাহ্। চিন্তা করলে শাস্তি কেন হবে!’ আম্পায়ার মহোদয় বিনিত।

‘ও আচ্ছা।’ একটু নিশ্চিত হলেন ফিল্ডিং দলের অধিনায়ক। তারপর আরও কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ‘স্যার, আমরা সবাই এখন চিন্তা করছি আপনি একটা গর্দভ, চিন্তা করছি আপনাকে কীভাবে কড়া একটা পিটুনি দেওয়া যায়, চিন্তা করছি...।’

চিন্তার দৌড় কত দূর ছিল কে জানে!

আম্পায়ার মহোদয়েরা, আমার ওপর চটবেন না। এসব অভিজ্ঞতা যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের নিশ্চয়ই আছে। অন্তত মাঠে দাঁড়িয়ে পেছনের গ্যালারি থেকে ‘ভুল সিদ্ধান্ত’-এর সমালোচনা নিশ্চয়ই হাজারবার শুনেছেন-এটা কী করল? এটা কি ওয়াইড হয় নাকি! ইশ, এমন এলবিডব্লিউটা দিল না! ব্যাটা আম্পায়ার কি কানা নাকি?

এক আম্পায়ার এসব কথা শুনতে শুনতে আর সহ্য করতে পারলেন না। খেলা বন্ধ করে মাঠ ছেড়ে গ্যালারিতে চলে গেলেন। সবচেয়ে বেশি সমালোচনা যে দর্শক করছিলেন, নির্বিকারভাবে তাঁর পাশে বসে অন্য আম্পায়ারকে বললেন, ‘তুমি একাই খেলা চালাও। আমি এখান থেকে দেখি।’

সঙ্গী আম্পায়ার কিছু বলার আগেই পাশের দর্শকটি চটে উঠলেন, ‘এখান থেকে দেখবেন মানে? এখান থেকে দেখে কি খেলা চালানো যায় নাকি?’

এবার আম্পায়ারের বলার পালা, ‘কেন? এতক্ষণ তো আপনার কথায় মনে হচ্ছিল, এখান থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায়।’

একই সিদ্ধান্তে একদল রাগ হবে, একদল ক্ষুব্ধ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের এই ঢাকায় আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল ম্যাচে এক সিদ্ধান্ত দিয়ে দুই দলেরই স্কোভের (নিন্দুকেরা বলে শারীরিক আক্রমণের) শিকার হওয়ার ঘটনাও নাকি ঘটেছে।

বেশি পেছনে যেতে হবে না। গত মৌসুমেই চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হকি ম্যাচ অসমাপ্ত রেখে মাঠ ছেড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, সন্ত্রস্ত

হয়ে আম্পায়ার সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমি আর ম্যাচ চালাতে পারব না। সামান্য কয়টা টাকার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যায় না।’ এ রকম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করতেন এক রেফারি। ভদ্রলোক মারা গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওপরের কেউ একজন জানতে চাইলেন, ‘জীবনে কোনো সাহসের পরিচয় দিয়েছেন? সাহসী লোকদের সম্মান দেখানোর নিয়ম আছে।’

অনেক ভেবে সেই রেফারি বললেন, ‘মনে পড়ছে না।’

‘ভালো করে ভেবে বলুন।’

‘ও হ্যাঁ। একবার আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল ম্যাচের শেষ মিনিটে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলাম...।’

‘বাহ্, বাহ্! এ তো বিরাট কাণ্ড! বাহবা। তো কত আগের ঘটনা এটা?’

‘এই যে স্যার, মিনিট দুয়েক আগে।’ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৯, ২০০৯

76) উত্তর যদি এমন হয়

এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত। শুধু প্রশ্নগুলোর সঙ্গেই নয়, উত্তরের সঙ্গেও পরিচয় রয়েছে আমাদের। কিন্তু উত্তরগুলো যদি গতানুগতিক না হয়ে একটু ভিন্ন রকম হয়? লিখেছেন ইকবাল খন্দকারকোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে সেখানে পাঠানো হয় রিপোর্টারকে। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন সংবাদপাঠক। তবে কথা শুরুর আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?’

উত্তরঃ না, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। তবে খুব ভালো করে যে শুনতে পাচ্ছি, তাও কিন্তু না। এই না শুনতে পাওয়ার জন্য আমি টেলিফোন লাইনকে দোষারোপ করছি না। কারণ মূল সমস্যা আমার কানে। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার কানে প্রচুর ময়লা জমেছে। তবে আমি যত শিগগির সম্ভব ময়লা পরিষ্কারের জন্য নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের কাছে যাব।

–

উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যাপারে এলাকার লোকজনের মন্তব্য নেওয়া হয়। এলাকার যিনি গণমান্য ব্যক্তি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়,

‘বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?’

উত্তরঃ বিষয়টি ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই। এ জন্য এটিকে আমি খালি চোখে না দেখে পাওয়ারফুল চশমা দিয়ে দেখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ পাওয়ারফুল চশমাই হলো ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার উত্তম উপায়। তবে টেলিস্কোপ বা একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলে হয়তো আরেকটু ভালো হতো।

—
কোনো কাজ করে যদি নামধাম কুড়ানো যায়, তাহলে সবাই সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে শুরুর দিকের কথা জানতে চাইতে পারে। যেমন, নামীদামি অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আপনি কীভাবে অভিনয়ে এলেন?’

উত্তরঃ দেখুন, আমার যেহেতু দুটি পা আছে, অতএব যেকোনো জায়গায় আমি হেঁটে হেঁটে যেতেই পছন্দ করি। অভিনয়ে আসার ক্ষেত্রেও আমি একই পন্থা অবলম্বন করেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করেছি, হালকা নাশতা করেছি। তারপর পোশাক-আশাক পরে সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি অভিনয়ে, মানে অভিনয় করতে। বিলিভ মি, সিএনজি কিংবা রিকশায় উঠিনি।

—
ছোট কোনো ছেলেমেয়ের সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় হয়, তাহলে নানা রকম প্রশ্ন করেন তাকে। এগুলোর মধ্যে কমন একটা প্রশ্ন হলো, ‘তোমার বাবা কী করেন?’

উত্তরঃ আমার বাবা অনেক কিছু করেন। সকালে মা যখন নাক ডেকে ঘুমুতে থাকেন, তখন তিনি উঠে চা-নাশতা বানান। তারপর মাকে ডেকে তুলে খাওয়ান। বুয়া না এলে মায়ের জামাকাপড়ও ধুয়ে দেন। শপিংয়ে গেলে মায়ের ব্যাগ বহন করেন। কোনো কারণে মা রেগে গেলে উনি হাতজোড় করে ক্ষমা চান। এ ছাড়া প্রতি রাতে মশারি তো টানানই। এমনকি মশারির ভেতর মশা ঢুকলে তিনিই লাইট জ্বেলে মারেন।

—
আজকাল সমবয়সী বা এই টাইপের কারও কুশল জানতে চাওয়ার অতি প্রচলিত একটি প্রশ্ন হলো, ‘কী অবস্থা?’

উত্তরঃ যেহেতু এখন আমি জেগে আছি, অতএব

জাগ্রত অবস্থা। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার হলো, এখন আমি আছি বসা অবস্থায়। কিছুক্ষণ পর হয়তো দাঁড়ানো কিংবা হাঁটা অবস্থায় থাকতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি এখন আছি নরমাল অবস্থায়। কারণ জরুরি অবস্থা সেই কবেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

– সবশেষে যে প্রশ্নটার কথা বলব, সেটা মৌখিক নয়, লৈখিক। বাস বা অন্যান্যজায়গায় লেখা থাকে, ‘কিছু ফেলে গেলেন কি?’

উত্তরঃ জি, ফেলে গিয়েছি। তবে সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমার ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো পেলেও আমাকে ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। এগুলো আমার আর লাগবে না। ও হ্যাঁ, আমি যা ফেলে গিয়েছি তা হলো বাদামের খোসা আর ঝালমুড়ির ঠোঙা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৯, ২০০৯

77) আমার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ ‘নিজে’

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, আপনি আর অমিতাভ রেজা নেই। অমিতাভ বচন হয়ে গেছেন। কী করবেন?

– আমার যত মেধাবী গরিব বন্ধু ছবি বানাতে চায়, টাকার অভাবে পারছে না, তাদের সবাইকে টাকা দেব ছবি বানানোর জন্য।

আপনি অমিতাভ রেজা। আপনাকে এক নামে চেনে সবাই। প্রমাণ দিন।

– চেনে নাকি?

রাস্তায় নেমে সর্বরোগের ব্যথানাশক মলমের বিজ্ঞাপন করতে বলা হলে, আপনি মডেল হিসেবে কাকে নেবেন?

– বাংলা চলচ্চিত্রের কোনো একজন জনপ্রিয় খলনায়ককে বেছে নেব। কারণ, তারা আমজনতার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।

আপনার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ কী?

– আমার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ ‘নিজে’। এতে দুই কূলই রক্ষা হয়। শব্দটা উল্টে দেখুন।

কোন কাজ করতে আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?

– সকালে উঠে এক কাপ চা নিয়ে বাথরুমে যেতে।

দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ আপনার কাছে কী?

- জেনিকে হাসানো।

বলুন দেখি সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবসা কোনটি?

- প্যারাসুট কোম্পানি খুলে বসা।

কেন?

- 'প্যারাসুট ঠিকমতো কাজ করছে না।-এমন

অভিযোগ আনার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আগে হতো ধারাবাহিক নাটক। এখন হয়

ধারাবাহিক (সিকুয়েল) বিজ্ঞাপন। যদি পূর্ণদৈর্ঘ্য

বিজ্ঞাপন বানাতে বলা হয়, কী করবেন?

- দেশ ছেড়ে পালাব। ৩০ সেকেন্ডের

বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণাতেই জান দফা-রফা।

ছেলেরা আসলে কেমন?

- গাড়ির পার্কিং স্পেসের মতো। সবচেয়ে

ভালো ও সুন্দর অবস্থান দেখে বেছে নেওয়া

হয়।

অভিনয় করতে বলা হলে কেমন চরিত্র বেছে

নেবেন?

- যেখানে সাত নায়িকার এক নায়ক।

বলুন দেখি এখানে কে বেশি বুদ্ধিমান, প্রশ্নকর্তা,

নাকি উত্তরদাতা।

- উত্তরদাতা। কারণ আপনি তো কেবল

বুদ্ধিমতী হতে পারেন।

আমাদের দেশে কিসের কোনো অভাব নেই?

- ফমলশ শথরপড়।

জনপ্রিয় হওয়ার সবচেয়ে সোজা পথ কী?

- দেশের উঠতি জনপ্রিয় কোনো নায়িকাকে

পটিয়ে বিয়ে করে ফেলা।

আপনার প্রিয় উক্তি কী?

- অতিরিক্ত ওজন হয়ে গেলে যদি কেউ

শরীরের বাড়তি অংশ ফেলে দিতে চান, তবে

নিঃসন্দেহে মাথাটাকে ফেলে দিতে

পারেন। অমিতাভ রেজা, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

জিনাত রিপা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৯, ২০০৯

78) চাকরির বিজ্ঞপ্তির তদন্ত - যাহা

কয়, তাহা নয়

প্রতিদিন পত্রিকাজুড়ে থাকে নানা ধরনের

চাকরির বিজ্ঞপ্তি। সেখানে থাকে অনেক ধরনের

প্রলোভন। ইন্টারনেট অবলম্বনে এসব চাকরির

বিজ্ঞপ্তির ময়নাতদন্ত করে এর অন্তর্নিহিত

তাৎপর্য উদ্ধারের নিষ্ফল প্রয়াস চালিয়েছেন

মুনাস ইকবালবেতনঃ ২৪,০০০-৩২,০০০

আসলে বেতন হবে ২৪,০০০ টাকা।

বেতনঃ আলোচনাসাপেক্ষ

যিনি সবচেয়ে কম চাইবেন, তাকেই নেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক (স্নাতকোত্তররা অগ্রাধিকার পাবেন)

অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী কাজটা পাবেন, কিন্তু বেতন হবে স্নাতক মানের।

বিশেষ সুবিধাঃ কোম্পানির বিশেষ সুবিধা প্যাকেজ

আপনাকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে দেওয়া হবে, যা মরণোত্তর সুবিধা বলে বিবেচিত হবে।

ধরনঃ নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী

আপনাকে এমন কাজ করতে হবে, যা বর্তমান স্টাফরা করতে চাইছে না বা করলেও অতিরিক্ত টাকা দাবি করছে।

অফিস লোকেশনঃ চমৎকার লোকেশনে সুন্দর অফিস

জানালাবিহীন নতুন বিল্ডিং (১২ তলা, লিফটবিহীন), যার অফিসরুমগুলোর দেয়ালে কার্পেটের সঙ্গে মিল রেখে ছবির ফ্রেম টাঙানো।

প্রশিক্ষণঃ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে

প্রথম দিকে গুরুতর কয়েকটা ভুল করলেও সমস্যা নেই।

পদঃ এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

অফিসের সবচেয়ে ক্ষমতাধারী পদ (সূর্যের চেয়ে বালি গরম নীতি অনুসারে)।

যোগ্যতাঃ উদ্যমী/কর্মে উদ্দীপনাসম্পন্ন

আপনাকে প্রতিদিন সর্বনিম্ন ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে, যত দিন না আপনাকে জোরপূর্বক অবসর নিতে বাধ্য করা হয়।

বেতনঃ কম্পিটিটিভ স্যালারি

আপনার বিগত চাকরি থেকে সর্বোচ্চ ১ শতাংশ বেশি বেতন দেওয়া হবে, এর এক টাকাও বেশি নয়।

কর্মক্ষেত্রঃ কাজের মনোরম পরিবেশ

অফিসের বেশির ভাগ লোক আপনার সঙ্গে কথা বলবে না।

বিশেষ যোগ্যতাঃ টেলিফোনে ব্যবহার ভালো হতে হবে

দিনের বেশির ভাগ সময় টেলিফোনেই কাটাতে হবে। চাকরিটা রিসেপশনিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অভিজ্ঞতাঃ প্রফেশনাল অ্যাপিয়ারেন্স প্রয়োজনীয়

২০,০০০ টাকা/মাস চাকরি করে ১০,০০০

টাকা/মাস কাপড় কিনতে হবে।

অন্যতম যোগ্যতাঃ পাবলিক রিলেশন ভালো

একজন রিসেপশনিস্ট চাওয়া হচ্ছে।

মনোভাবঃ টিম প্লেয়ার

কয়েকজন বিপজ্জনক সহকর্মীর সঙ্গে কাজ

করতে হবে, যারা বেশির ভাগ সময় আপনাকেই

গিনিপিগ বানাবে।

প্রতিষ্ঠানঃ প্রগতিশীল কোম্পানি

সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আপনি জিন্স পরতে

পারবেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৯,

২০০৯

79) দুটি বাজে গল্প - সুকুমার রায়

দুই বন্ধু ছিল। একজন অন্ধ আর একজন

কালো। দুইজনে বেজায় ভাব। কালো বিজ্ঞাপনে

পড়িল, আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন

যাত্রা হইবে, সেখানে সঙরা নাচগান করিবে।

কালো বলিল, ‘অন্ধ ভাই, চল যাত্রায় গিয়া দেখি।’

অন্ধ হাত নাড়িয়া গলা খেলাইয়া কালাকে

বুঝাইয়া দিল, ‘কালো ভাই, চল যাত্রায় নাচগান

শুনিয়া আসি।’

দুইজনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল। রাত দুপুর

পর্যন্ত নাচগান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, ‘বন্ধু,

গান শুনিলে কেমন?’ কালো বলিল, ‘আজকে তো

নাচ দেখিলাম-গানটা বোধহয় কাল হইবে।’ অন্ধ

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘মূর্খ তুমি! আজ

হইল গান-নৃত্যটাই বোধহয় কাল হইবে।’

কালো চলিয়া গেল। সে বলিল, ‘চোখে দেখ না,

তুমি নাচের মর্ম জানিবে কী?’ অন্ধ তাহার কানে

আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিল, ‘কানে শোনো না, গানের

তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কী?’ কালো চিৎকার

করিয়া বলিল, ‘আজকে নাচ, কালকে গান।’

অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল,

‘আজকে গান, কালকে নাচ।’

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি। কালো বলে,

‘অন্ধটা এমন জুয়াচোর-সে দিনকে রাত করিতে

পারে।’ অন্ধ বলে, ‘কালোটা যদি নিজের কথা

শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত সে কত বড়

মিথ্যাবাদী!’২

কতগুলো ছেলে ছাতের উপর হুড়োহুড়ি করে

খেলা করছে-এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ

শোনা গেল। তার পরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে

গিয়ে সবাই মিলে ‘হারু পড়ে গেছে’ বলে

কাঁদতে কাঁদতে নিচে চলল।

খানিক বাদেই শূনি একতলা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠছে। বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশবাবু ছিলেন-তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে?’ শুনতে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে, ‘হারু পড়ে গিয়েছে।’ বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির, কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, ‘এদিকে তো পড়েনি, ভেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয়।’ কিন্তু ভেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, ‘এখানে তো পড়েনি-আমরা তো ভাবছি বার-বাড়িতে পড়েছে বুঝি।’ বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘কোথায় রে? কোথায় হারু?’ তারা বললে, ‘ছাতের উপর।’ সেখানে গিয়ে তারা দেখে, হারু বাবু অভিমান করে বসে বসে কাঁদছে! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে পড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। ‘হারু পড়ে গেছে’ বলে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানানো হচ্ছে যে ‘হারুকে আমরা ফেলে দিইনি-সে পড়ে গেছে বলে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।’

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল-হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তার-সুদ্র এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে তার আর নালিশ করাই হলো না। যা হোক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুশি হলো যে শাসনটাসনের কথা কারও মনেই এল না। সবচেয়ে বেশি জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কানে শোনেন কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি এত কাঁদছিলেন কেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি কি অত জানি? দেখলুম ঝিয়েরা কাঁদছে, বৌমা কাঁদছেন, তাই আমিও কাঁদতে লাগলুম-ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাকবে।’ সুকুমার রায়ঃ প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। জন্ম-১৮৮৭, মৃত্যু-১৯২৩।

৪০) এসএমএস কাব্য

[হঠাৎ করেই কি মাঝেমধ্যে উল্টে যায় না ভাবনার জগৎ? ঠিক তখনই জানিয়ে দিন...] আমার ফোনের অন্য পাশে

কণ্ঠ যখন তোমার নয়

প্রযুক্তি সব মিথ্যা লাগে

বিজ্ঞানটাও বিষাদময়।

আমার ফোনের অন্য পাশে

কণ্ঠ যখন তোমার রয়

ইচ্ছে করে বিজ্ঞানী হই-

তোমারও কি এমন হয়? অনিক খান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৯, ২০০৯

81) জোকস নিয়ে কথা

জোকস সম্পর্কে রস+আলোতে লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের জোক সম্পর্কিত সেই অতি প্রাচীন মুখরোচক গল্পটিঃ মধ্যবয়সী বিলেতি মেমসাহেব বেড়াতে এসে বর্ষাকালে বন্যাপ্লাবিত গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটছিলেন। ডাঙায় উঠে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর এক পায়ে কালো পিচ্ছিল এক প্রাণী মাংসপেশির সঙ্গে লেপ্টে আছে।

মেমসাহেব ভীত-বিহ্বল হয়ে কাছেই উপবিষ্ট গাঁয়ের এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হোয়াই ইজ ইট’, মানে এটা কী? লোকটি সামান্য ইংরেজি জানত, কিন্তু জোকের ইংরেজি যে লিচ এটা সে জানত না। তাই সে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে জবাব দিল, ‘ইট ইজ জোক’।

মেমসাহেব আতঁচিৎকার করে উঠলেন, ‘হাফ এন ইঞ্চ ইনসাইড মাই বডি, অ্যান্ড স্টিল ইটস এ জোক!’ অর্থাৎ ‘আমার শরীরের ভেতরে আধা ইঞ্চির মতো ঢুকে গেছে, আর তুমি বলছ এটা হাসি-ঠাট্টা!’

সে যা হোক, প্রসঙ্গত আরেকটি গল্প মনে পড়ে গেলঃ অফিসের মাঝারি পর্যায়ের এক কর্মকর্তা দুপুরে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ে একসঙ্গে চা-নাশতা খেতেন আর জোকস তথা হাসির গল্প বলে সবাইকে হাসাতেন। তো একদিন যখন তিনি এভাবে জোকস বলছিলেন, তখন লক্ষ করলেন সবাই হাসছে বটে, কিন্তু একজন অর্থাৎ ভূপতিবাবু একেবারে চুপচাপ। তিনি ভূপতিবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আপনি আজ হাসছেন না কেন? আপনার কি মন খারাপ?’ ভূপতিবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ‘যারা হাসার তারা তো ঠিকই হাসছে। আমি হাসব কেন? আমি তো আর আপনার আন্ডারে চাকরি করছি না, গতকাল থেকে অন্য সেকশনে বদলি হয়ে গেছি।’

প্রসঙ্গত, জোকস-সংক্রান্ত সেই জাপানি গল্পটিও স্মর্তব্যঃ জাপানিরা খুব ভদ্র জাতি, ওরা পারতে কাউকে অখুশি করতে চায় না। একবার এক মার্কিন জেনারেল জাপানের সেনাছাউনি পরিদর্শনে গেলেন, সঙ্গে জাপানি দোভাষী। দোভাষীকে তিনি বললেন, ‘আমি উপস্থিত সেনাসদস্যদের একটি জোকস শোনাব। কিন্তু ওরা তো ইংরেজি বুঝবে না, আপনি সেটা তর্জমা করে দেবেন, দেখবেন ওরা হাসিতে লুটিয়ে পড়বে।’ অতঃপর তিনি প্রায় দুই মিনিট ইংরেজিতে একটি লম্বা জোকস বলে দোভাষীকে সেটা তর্জমা করতে ইশারা করলেন। দোভাষী জাপানি ভাষায় ছোট একটি বাক্য বলার পরপরই সব সেনাসদস্য হাসিতে ফেটে পড়ল। জেনারেল অবাক হয়ে এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রথমে দোভাষী কিছুই বলতে রাজি হলো না। পরে পীড়াপীড়ি করায় থলের বিড়াল বেরিয়ে এল।

‘আপনার জোকসটিতে আমি হাসির কিছুই খুঁজে পাইনি।’ দোভাষী বলতে লাগল, ‘কিন্তু আপনি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আপনাকে তো আর অসন্তুষ্ট করা যায় না। তাই আমি সেনাদের বলেছি-জেনারেল সাহেব এই মাত্র একটি জোকস বলেছেন, আপনারা সবাই হাসুন। আর তাতেই কাজ হয়েছে।’

তবে হ্যাঁ, আনাড়িদের হাতে পড়লে কিন্তু জোকের বারোটা বেজে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তেমনি একটা জোকস বলা যায়ঃ জাহাজের যাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে জাহাজের ডেকে ভিড় করেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি ছোট বাচ্চা পানিতে পড়ে গেল। উপস্থিত সবাই ধরো ধরো বললেও কেউই এগিয়ে এল না। হঠাৎ দেখা গেল এক বুড়ো যাত্রী পানিতে পড়ে বাচ্চাটিকে আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার আশ্রয় চেষ্টা চালাচ্ছেন। জাহাজ থেকে রশির মই ফেলে দুজনকেই উদ্ধার করা হলো। এই ঘটনায় সবাই বুড়োর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলল, ‘এখনকার যুগে এরূপ পরহিতৈষী লোক বিরল।’ সব শুনে বুড়ো চারদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণের পর বলে উঠলেন, ‘সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাই, আমারে ধাক্কাটা দিছিল কেডা?’ আমার এক সাবেক সহকর্মী একবার এই গল্পটা আমাকে বলতে গিয়ে মধ্যক্ষণে বলে বসলেন,

‘সবাই বলছেন ধরো ধরো, কিন্তু কেউই এগিয়ে আসছে না। হঠাৎ এক বুড়োকে একজন ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিল...।’ আমি তখন তাঁকে সহাস্যে বললাম, “আপনার হাতে পড়ে জোকসটি মাঠে মারা গেল। প্রতিটি জোকসের একটি করে ‘পাঞ্চলাইন’ থাকে, যেটা সবশেষে বলতে হয়, এটা প্রথমেই বলে দিলে জোকস আর জোকস থাকে না।”

আর হ্যাঁ, একটি জোকসের সফলতা যতটা না নির্ভর করে কথকের ওপর, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে শ্রোতার ‘রিসিভার’ তথা ‘অ্যান্টেনা’র ওপর। আমি দেখেছিঃ আমার বিবেচনায় খুব মজার একটি জোকস বলেছি; অথচ শ্রোতাবিশেষ কিংবা শ্রোতাদের কাছে ওটা হালে পানি পায়নি। আবার অতি সাধারণ জোকস ব্যক্তিবিশেষের কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটিকে ইংরেজিতে ‘ক্লিক’ করা বলে। রস+আলোর পাঠক, জোকস বলার সময় পাঞ্চলাইন আর কখন কোন জোকস বললে সেটা ‘ক্লিক’ করবে সেদিকে বিশেষ নজর দিন, না হয়জোকটি হাটে-ঘাটে-মাঠে মারা পড়বে এবং এর দায়ভার কেউই নিতে রাজি হবে না।

আতাউর রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৬, ২০০৯

82) বৃদ্ধস্য তরুণী ভাৰ্যা

আমাদের বুড়ো পোস্টমাস্টার স্যাদকোপেজভের স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁর স্ত্রীকে কবরে পাঠিয়ে আমরা পোস্টমাস্টারের ঘরে সমবেত হয়েছিলাম প্রচলিত প্রথামতো মৃতের আত্মার স্মরণে।

কিন্তু যেইমাত্র টেবিলে ‘প্যানকেক’ সাজানো হলো, সদ্য-পত্নীহারা বৃদ্ধের শোক যেন উথলে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ‘ওই প্যানকেক দেখে আমার স্ত্রীর কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে গো। সে ছিল এমনই সুন্দর...’

আমরা সায় দিলাম, তিনি সত্যি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

‘নিশ্চয়ই, যে তাকে দেখত সেই মুগ্ধ হতো।’

পোস্টমাস্টার স্যাদকোপেজভ বলতে লাগলেন,

‘কিন্তু জেনে রাখো, আমি আমার স্ত্রীকে তার

সৌন্দর্য কিংবা নম্র মেজাজের জন্য

ভালোবাসতাম না। এমন গুণ জগতের অনেক

স্ত্রীলোকের মধ্যেই আছে। আমি তাকে

ভালোবাসতাম কারণ সে ছিল স্বামীর প্রতি

একান্ত বিশ্বাসিনী। সে আমাকে কখনো অবহেলা করেনি, যদিও তার বয়স মাত্র কুড়ির বেশি নয়, আর আমি ষাট বছর অতিক্রম করতে চলেছি।’ আমাদের মধ্যে সেক্সটোনের খুকখুক কাশি শোনা গেল।

অমনি বৃদ্ধ বললেন, ‘কী, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?’

‘না, ঠিক তা নয়’ সেক্সটোন এবার আমতা আমতা করে বলল, ‘তবে কিনা মানে-মানে-আজকালকার তরুণী বউরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওই যাকে বলে সুপুরুষের প্রতি-মানে স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে।’

-বুঝেছি, তুমি সন্দেহ করছ? বেশ, তাহলে খুলেই বলি-বুড়ো বিপত্নীক বলতে শুরু করলেন-আমি আমার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা বজায় রাখার জন্য কিছু কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। আমার এই কৌশল, যা খুবই শিল্পসম্মত বলা যায়, তা আমার স্ত্রীকে আমার প্রতি বিশ্বস্ত না রেখে পারেনি। আমার এই কৌশলই আমার দাম্পত্য জীবনকে নিরাপত্তা দিয়েছে, আর এর মূলে ছিল আমার স্ত্রীর সম্পর্কে আমারই বানানো কিছু রটনা।

-কী রটনা?

-তোমরাও তা জানো। এই শহরের মধ্যে আমি নিজেই আমার স্ত্রী সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে দিলাম যে আমার স্ত্রী ইয়েলেনা এই শহরের পুলিশপ্রধান আলেক্সেই স্যালিকভাফির সঙ্গে প্রণয়সূত্রে বাঁধা। এই একটি রটনাই যথেষ্ট ছিল। একজন লোকেরও সাহস হয়নি ইয়েলেনার প্রেমে পড়ে পুলিশপ্রধানের বিরাগভাজন হতে। অবস্থা এমনই ছিল, ইয়েলেনা নিজেও যদি কারোর দিকে চোখ তুলে তাকাত, সেই লোক তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেত সামনে থেকে, কে জানে পুলিশপ্রধান যদি জানতে পারে, এই ভয়ে।

বলতে বলতে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ বিপত্নীক। হাসতে হাসতেই বললেন, আর পুলিশ-প্রধানের পেছনে লাগার মজা কে না জানে!

এবার বিনিত কণ্ঠে বললাম, ‘তাহলে এত দিন যে শোনা যেত আপনার স্ত্রীর আলেক্সেই স্যালিকভাফির সঙ্গে প্রেম আছে, তা সত্যি নয়?’ ‘মোটাই নয়। তোমাদের ওই জানানোটাই তো আমার কৌশল।’ হাসতে হাসতে বললেন বৃদ্ধ

বিপত্নীক স্ল্যাদকোপেজভ। ‘এভাবেই আমার তরুণী স্ত্রীর কাছ থেকে তোমাদের মতো ছোকরাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, এত দিনে সেটা জানলে তোমরা।’

মিনিট তিনেক আমরা হতভম্ব হয়ে রইলাম।

ক্রমে ক্রমে অসহ্য অপমান আমাদের গ্রাস করতে লাগল। সামনে বসা ওই মোটা নাকওয়ালা বুড়োটা এত দিন আমাদের কী ঠকানোটাই না ঠকিয়েছে।

‘ভগবান তোমার আর একটা বিয়ে করার মতি দিন।’ সেক্সটোনের অস্কুট স্বর শোনা গেল।

অনুবাদঃ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তন চেখভঃ রাশিয়ান ছোট গল্পকার ও নাট্যকার। জন্ম-২৯ জানুয়ারি ১৮৬০, মৃত্যু-১৫ জুলাই ১৯০৪

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৬, ২০০৯

৪৩) দুটি গরু আছে?

নানা দেশে নানা কীর্তি। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ। আপনার অথবা কারও যদি দুটি গরু থাকে, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিণতি কী ঘটবে, বিভিন্ন ওয়েবসাইট অবলম্বনে তা গবেষণা করার চেষ্টা করেছে মুনাস ইকবালসমাজতন্ত্রঃ আপনি একটি গরু রাখতে পারবেন এবং অন্যটি আপনার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিতে হবে। সাম্যবাদঃ সরকার দুটি গরুই নিয়ে নেবে এবং আপনাকে নিয়মিত দুধ সরবরাহ করা হবে। কঠোরপন্থীঃ সরকার দুটি গরুই নিয়ে নেবে এবং আপনার কাছে এদের দুধ বিক্রয় করবে। কূটনৈতিকঃ সরকার দুটোই নিয়ে নেবে। একটি মেরে ফেলবে, অন্যটি থেকে দুধ দোয়ানো হবে। ওই দুধের মূল্য আপনাকে দেওয়া হবে, অতঃপর সেই দুধ নষ্ট করা হবে। পুঁজিবাদঃ আপনাকে একটি গরু বিক্রয় করে একটি ঘাঁড় কিনতে বাধ্য করা হবে। করপোরেটনীতিঃ একটি বিক্রি করা হবে এবং অন্যটিকে দুই গরুর সমপরিমাণ দুধ প্রদানের জন্য বাধ্য করা হবে। অতঃপর গরুটি মারা গেলে দারুণ অবাক হবে! গণতন্ত্রঃ সরকার আপনার ওপর কর আরোপ করবে এই শর্তে যে আপনি অবশ্যই দুটো গরুই বিক্রি করে কর প্রদান করবেন। এ আদায়কৃত কর বিদেশে অবস্থিত একটি লোকের জন্য ব্যয় করা হবে, যার একটি গরু রয়েছে এবং তা এই সরকারের

পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। নাৎসিনীতিঃ রাষ্ট্র দুটি গরু জোরপূর্বক নিয়ে নেবে এবং আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। এখন দেখা যাক বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কী দাঁড়ায়- জাপানঃ গরুগুলোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আকৃতি দশ ভাগের এক ভাগ নামিয়ে আনা হবে এবং বিশ গুণ বেশি দুধ প্রদানে সক্ষম করা হবে। তারপর তারা গরুগুলোর একটি মজার কার্টুনচিত্র 'কাউকিমন' তৈরি করে সারা বিশ্বে বাজারজাত করবে। রাশিয়াঃ গরুগুলো গুনবে এবং দেখবে পাঁচটি গরু আছে। গরুগুলো আবার গুনবে এবং দেখবে পঁচিশটি গরু আছে। গরুগুলো আবার গুনবে এবং দেখবে দুটি গরু আছে। গণনা থামিয়ে আরেক বোতল ভদকা খুলবে। চীনঃ দুটি গরুর দুধ দোয়ানোর জন্য ৩০০ জন লোক কাজ করবে। সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা ঘোষণা করা হবে এবং বলা হবে যে কেউ এখানে বেকার নেই। অতঃপর যে সাংবাদিক সঠিক তথ্য তুলে ধরবেন, তাঁকে আটক করা হবে। ভারতঃ দুটি গরুকে অনেকেই ভক্তি নিবেদন করবে। পাকিস্তানঃ দুটি গরু থাকার সত্ত্বেও তারা দাবি করবে ভারতের গরুগুলো তাদের। সেই গরুগুলো নিজেদের কবজায় আনতে তারা আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য, চীন থেকে সমরাস্ত্র, ব্রিটেন থেকে রণকৌশল, ইতালি থেকে সন্ত্রাস, জার্মান থেকে প্রকৌশলবিদ্যা, সুইজারল্যান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবে। আমেরিকাঃ দুটি গরুকে গাধার মতো খাটানো হবে। জোরপূর্বক দুধ দোয়ানো হবে এবং যখন গরুগুলো মারা যাবে তখন এর দায়ভার চাপানো হবে এমন একটি রাষ্ট্রের ওপর, যাদের অনেক গরু রয়েছে এবং দাবি করা হবে ওই জাতি বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। অতঃপর সেই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশ্বকে বাঁচানো হবে এবং সব গরু নিয়ে নেওয়া হবে। যুক্তরাজ্যঃ দুটি গরুরই ম্যাড কাউ রোগ হবে। জার্মানঃ ইঞ্জিনিয়ারিং করে গরুর আয়ু ১০০ বছর বৃদ্ধি করা হবে, তারা মাসে একবার খাবে এবং নিজেরাই দুধ দোয়াবে। সুইস (সুইজারল্যান্ড)ঃ আরও ৫০০ গরু আনা হবে, যার একটিরও মালিক তারা নয় এবং এই গরু দেখাশোনার জন্য গরুর মালিককে চার্জ করা

হবে। বাংলাদেশঃ হরতাল, ধর্মঘট হবে, রাস্তা
অবরোধ করা হবে-এক দফা এক দাবি হবে-
আমাদের আরেকটি গরু দিতে হবে। সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৬, ২০০৯

84) মন্দা

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা নেমেছে। সংবাদপত্রের
এই শিরোনাম দেখে অর্থনীতির প্রথম বর্ষের
ছাত্ররা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা পুরো
সংবাদটি খুঁটিয়ে পড়ে বুঝতে চাইল ঘটনাটি
কী। তবে ঠিকভাবে বুঝতে পারল না। কিন্তু
এটা তো আর বাইরে কাউকে বলা যায় না।
বিশেষ করে অন্য বিষয়ে অধ্যয়নরত বন্ধুরা যদি
মন্দা নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন তো মহা
মুশকিল হবে।

বড় ভাইয়েরা লাইব্রেরিতে মোটা মোটা বই নিয়ে
বসে ছিল। সামনে তাদের মাস্টার্স ফাইনাল
পরীক্ষা। বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তবু হাতে-
পায়ে ধরে কয়েক মিনিটের জন্য কয়েকজনকে
বাইরে নিয়ে আসা হলো। গম্ভীরমুখে বড় ভাইরা
খবরটি পড়ল। তারপর একজন বলল, ‘তাতে
সমস্যাটা কী? মন্দা তো বিশ্ব অর্থনীতিতে,
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নয়।’

প্রথম বর্ষের ছেলেরা বলল, তারা মন্দার বিষয়টি
বুঝতে চায়।

‘তোমাদের এখনো বোঝার সময় হয়নি,’
আরেকজন বড় ভাই বলল। ‘আগে বেসিক
ইকোনমিকস পড়া শেষ করো।’

জুনিয়ররা হতাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু বড়
ভাইয়েরা নিজেরা পড়ল চিন্তায়। ‘ওদের তো
ভাব দেখিয়ে বিদায় করে দিলাম,’ বলল
একজন। ‘অথচ নিজেরাও তো মন্দার বিষয়টা
বুঝতে পারছি না।’

শেষে তারা গেল বিভাগীয় অধ্যাপকদের কাছে।
সব শুনে তাঁরা তো মহা খাপ্পা। বললেন, ‘কয়েক
দিন পরে অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করবে,
অথচ মন্দা বোঝা না। যাও, লাইব্রেরিতে গিয়ে
ভালোভাবে পড়ো।’

মাস্টার্সের ছাত্ররা চলে যাওয়ার পর অধ্যাপকেরা
নিজেরা একে অপরের দিকে তাকালেন। শেষে
একজন বললেন, ‘বিষয়টা নিয়ে একটা
সেমিনার করতে হবে।’ অন্যরাও তাতে সমর্থন
দিল। পিয়নকে ডাকা হলো সেমিনারের নোটিশ
লেখার জন্য কাগজ দিতে। শিরোনাম লেখা

হলো, ‘বিশ্বমন্দার কারণঃ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া’।

‘এবার যাও, এটা কম্পোজ করিয়ে আনো,’ নির্দেশ দিলেন একজন অধ্যাপক। কাগজটা পড়তে পড়তে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পিয়ন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, এই একটা ছোট ও সাধারণ বিষয় নিয়ে এত বড় সেমিনার করবেন?’

‘মানে?’

‘স্যার, মন্দা হলো সেই সময়, যখন আমার প্রতিবেশী চাকরি হারায়।’

‘হুম,’ রাগত স্বরে বললেন প্রধান অধ্যাপক, ‘তাহলে মহামন্দা কী?’

‘যখন আমি চাকরি হারাই।’ – আসজাদুল কিবরিয়া, ইন্টারনেট অবলম্বনে

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৬, ২০০৯

85) টিভি চ্যানেলের ময়নাতদন্ত

ব্যাঙের ছাতার মতো না হোক
বছর হলেই পার,
দুটি করে চ্যানেল গজায়
ঠেকায় সাধ্য কার? নানা রকম অঙ্গীকার আর
নতুন ব্লোগান দিয়ে,
ছ’মাস দেখি টেস্টে থাকে
ওল্ড প্রোগ্রাম নিয়ে। নতুন কী কী থাকবে এতে
চলছে যখন থিম,
বাগিয়ে আনার চেষ্টা তখন
অন্য টিভির টিম। ডাবল বেতন অফারে কেউ
যোগ দেয় সেই দলে
পুরোটা টিম তৈরি হতে
অনেক প্রসেস চলে। জয়েন করেও ব্যাক করে
কেউ
এমন লোকও আছে,
নতুন চ্যানেল না দাঁড়ালে
ঠকতে হবে পাছে। নতুন চ্যানেল, গবেষণার
বাদ পড়ে না কিছু,
চামচা ঘোরে ডজনখানেক
ডিরেকটরের পিছু। টিভির লোগো কয়েকটা হয়
সিলেক্ট কি আর সোজা?
কোনটা স্ক্রিনে লাগবে ভালো
যায় না আগেই বোঝা! লোগোর পিছে লাগবে
টাকা
আপত্তি নেই ঢালো,
দুই-তিনবার করলে বদল

হতেও পারে ভালো। লোগোর সমস্যাটা যখন
যায় চ্যানেলের মিটে,
ডেকোরেশন ফাটাফাটি
কালার করো ইটে। দুই-তিনবার যায় পিছিয়ে
সম্প্রচারের ডেট,
এমপ্লয়িরা একটু হতাশ
হচ্ছে কেন লেট? ঘটা করে বিশেষ দিনে
চ্যানেল হলে চালু,
নিউজ বিভাগ, ব্রডকাস্টের
গরম মাথার তালু। প্রোগ্রাম পায় একটু রিলিফ
বাইরে থেকে কেনা,
নিজেদের আর কেনা প্রোগ্রাম
সহজে যায় চেনা। শুরুর দিকে তারকা সব
মেকার যদিও আসে,
কিনতে গিয়ে সেই প্রোগ্রাম
অনেক চ্যানেল ফাঁসে। সব প্রোগ্রাম তেমন করে
নজর কি আর কাড়ে?
হিট মেকারের ফ্লপ প্রোগ্রাম
দোষ চ্যানেলের ঘাড়ে। রান্না এবং গানের ইভেন্ট
সব চ্যানেলেই আছে,
নাটক, ম্যাগাজিনের চেয়েও
প্রিয় কারও কাছে। নানান রকম শোয়ের পরেও
টক শো থাকে মাস্ট,
শুদ্ধ ভাষায় হয় না নাটক
ওসব এখন পাস্ট। খুইজ্যা দ্যাখো, খায়া ফালাও
চলতি ভাষার ড্রামা,
তরুণ সমাজ নিলেও মানতে
নারাজ খালু, মামা! বাংলা ছবির কদর তবে
সব চ্যানেলেই রয়,
বাড়ির বুয়া এসব ছাড়া
কাজেই রাজি নয়! গৃহিণীরাও দেখেন এসব
দুপুরবেলা শুয়ে-
পিচ্চি যেসব পাকনা, দেখে
মুখের খাবার থুয়ে। ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে নিউজ
দেখেন অনেক লোক,
লাইভ টেলিকাস্ট খাচ্ছে সবাই
বিষয় যেটাই হোক। সেলুলার ফোন ডায়াল
করেও
নিউজ যাবে জানা,
ফোনে ফোনেই রিপোর্টারের
জীবন প্রায়ই ফানা... বিজ্ঞাপনের বিরতিতে
দর্শক দেয় ঘুম,
চ্যানেলগুলোয় টক শো করার

পড়ছে এখন ধুম। একই বিষয়, একই মানুষ
সব চ্যানেলেই থাকে,
বক্তার নেই একটু সময়
সব শোতে হয় ডাকে! এসব অনুষ্ঠানেই নাকি
চ্যানেল ওঠে জমে,
কারও বাড়ে টিআরপি ফের
কারও আবার কমে। সমালোচক চ্যানেলগুলোর
নিন্দা করুক, তবে-
তথ্য এখন ড্রয়িং রুমে

এটাও মানতে হবে। ওবায়দুল গনি

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৬, ২০০৯

৪৬) ঈষৎ ভুল বোঝাবুঝি

মার্কিন এক ভদ্রলোক গেছেন ক্রিকেট খেলা
দেখতে। এর আগ পর্যন্ত ‘ক্রিকেট’ শব্দটির
একটাই অর্থ জানতেন তিনি-ঝাঁঝিঁ পোকা!
ব্রিটিশ বন্ধুর পীড়াপীড়িতে খেলা দেখতে গিয়ে
বুঝলেন ব্যাপারটা মন্দ নয়; একজন বল
ছুড়ছেন, আরেকজন সেটা পেটানোর চেষ্টা
করছেন (কখনো কখনো সফলও হচ্ছেন)
আবার জনা দশেক লোক মাঠের মধ্যে বিনা
কাজে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন।
দেখতে দেখতে এক ওভারের খেলা শেষ হয়ে
গেল। আম্পায়ার বোলারের হাতে সোয়েটার,
চশমা ফেরত দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা
করলেন-ওভার। বেচারি আমেরিকান উঠে
দাঁড়িয়ে বন্ধুটিকে বললেন, ‘খেলাটা খারাপ না।
কিন্তু বড় কম সময়ে শেষ (ওভার) হয়ে গেল।’
ভুল বুঝেছিলেন ভদ্রলোক। আম্পায়ার ‘ওভার’
বলতে ‘সমাপ্ত’ বোঝাননি।

সে যাই হোক, ক্রিকেটে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিটা
বেশ হয়। তা না হলে দুই ব্যাটসম্যান রান নিতে
গিয়ে এক প্রান্তে পৌঁছে যান কী করে?

সেই ১৯৫০-৫১ মৌসুমে এমন একটা মহা ভুল
বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে
ব্যাট করছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার শেষ জুটি-
জনস্টন ও ইভারসন। অ্যালেক বেডসারের
একটা বল বাউন্ডারির দিকে পাঠিয়ে দিয়ে
রাজসিক ভঙ্গিতে রানের জন্য হাঁটা শুরু করলেন
জনস্টন-রান তো হয়েই যাচ্ছে। উইকেটের
মাঝামাঝি এসে বোলারের সঙ্গে গল্প শুরু
করলেন তিনি। ওদিকে চোখ-কান বুজে রানের
জন্য দৌড় শুরু করেছেন ইভারসন (চোখ বুজে
না থাকলে সঙ্গীকে দেখতে পাবেন না?)। এক

রান, দুই রান, তৃতীয় রানের জন্য দৌড় শুরু করলেন ইভারসন! তখন জনস্টনের খেয়াল হলো, বল বাউন্ডারির আগে থামিয়ে ফেলেছেন এক ফিল্ডার।

এবার জনস্টন পড়িমরি করে নিজের উইকেটের দিকে দৌড় শুরু করলেন এবং খেয়াল করলেন সঙ্গী ইভারসন আক্ষরিক অর্থেই তাঁর ‘সঙ্গী’! অর্থাৎ দুজনই একই দিকে দৌড়াচ্ছেন। এবার বোধহয় চোখ খুলল ইভারসনের। তিনি আবার উল্টো দৌড় দিলেন। এবং বিনয়কর সত্যি হলো, বল ফেরার আগে ইভারসন আবার নিজের প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। বলুন তো কত রান হলো?

কচু হলো! ইভারসন চারবার উইকেটে দৌড়েছেন (সাড়ে তিন+আধা) আর জনস্টন অর্ধেক রান নিয়েছেন। কিন্তু রান হয়নি একটিও!

ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। তবে পরেরটি বড় মর্মান্তিক। এটি অবশ্য ব্যাটসম্যানদের নয়। এক পিতা এবং একজন ক্লাব কর্মকর্তার ভুল বোঝাবুঝি।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে এক ভদ্রলোক গেছেন অফিসে (সম্ভবত পত্রিকায় চাকরি করতেন)। বেচারার মন অস্থির। বারবার হাসপাতালে ফোন করছেন। আবার করলেন, কিন্তু রং নাম্বার হয়ে গেল। ফোন চলে গেল এক ক্রিকেট ক্লাবের কর্মকর্তার কাছে। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘ভাই কী অবস্থা?’

‘অবস্থা খুবই ভালো। এই মাত্র আরেকটা বেরিয়ে এল।’

‘আরেকটা মানে কী! কয়টা হয়েছে?’

‘এ পর্যন্ত সাতটা চলে এসেছে। এর মধ্যে তিনটেই আবার হাঁস (ডাক)।’

ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন, ‘বলেন কী ভাই! সব মিলে কতগুলো আসবে বলুন তো?’

‘কেন আপনি জানেন না! ১০টা আসবে।’

বেচারা পিতা! সন্তান ভেবে উইকেটের গল্প শুনছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

87) রপ্তানি লাইন্স টেলিভিশন

একটা সময় ছিল, যখন এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রটার কাছে

ছুটে যেতেন টিভি-সাংবাদিকেরা। মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, ‘আপনার কেমন লাগছে?’

এখন আর কৃতী ছাত্র হতে হয় না। পেছনে বিডিআর জওয়ানদের উন্মত্ত গোলাগুলি থেকে বাঁচতে আপনি প্রাণভয়ে, সন্তানকে কোলে লুকিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন। আপনার গতি রোধ করে দাঁড়াতে টিভি-সাংবাদিক। ঠাঠাঠাঠা গর্জন পেছনে রেখে জানতে চাইবে, ‘আপনার কেমন লাগছে?’

কিংবা ধরুন, আপনি দমকল বাহিনীর একজন কর্মী। আগুন লেগেছে বহুতল বিপণিবিতানে। কাঁধে পানির পাইপ নিয়ে আপনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। আপনার পৌঁছানোর ওপর নির্ভর করছে আগুন কত দ্রুত নেভানো সম্ভব হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, হঠাৎ আপনার পিছু ধাওয়া করবে টিভি ক্যামেরা। পথ আগলে দাঁড়াতে টিভি-সাংবাদিক। হাতে ধরা ‘বুম’টা দুম করে এগিয়ে দিয়ে জানতে চাইবে, ‘এই যে এত বড় দালানে আগুন লাগল, আপনি নেভাতে যাচ্ছেন, কেমন লাগছে আপনার?’

পাবলিকও কম যায় না। কিছুদিন আগে কোনো এক শবযাত্রার ছবি দেখাচ্ছিল একটা চ্যানেলে। শোকাবহ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। হঠাৎই সেটা গুবলেট পাকিয়ে গেল। অতি উৎসাহী এক শবযাত্রী কী বুঝে জানি দেখাল ‘ভি’ চিহ্ন! শোক প্রকাশে? নাকি যমদূতের বিজয় বোঝাতে? তীব্র পানিসংকটের এই কালে আমাদের দেশ আর ‘সুজলা’ না-ই থাকুক, কিছু ক্ষেত্রে এখনো বেশ ‘সুফলা’। বর্তমানে সবচেয়ে ফলবতী ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ‘টিভি চ্যানেল’ বোধহয় অন্যতম। হু হু করে বাড়ছে আমাদের টিভি চ্যানেল।

কিছুদিন হলো এই চ্যানেলগুলোতে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ‘লাইভ’ নামের এক আজব দর্শনীয় বস্তু। সঠিক পরিবেশনার অভাবে সুস্বাদু খাবারও বিস্বাদ লাগতে পারে। সেটাই হয়েছে আমাদের প্রায় সব টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রে। যেটি টিভি চ্যানেলগুলোর অহংকার হতে পারত, সেটিকে তারা নিয়ে গেছে হাস্যকর পর্যায়ে।

সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের কথাই ধরুন। একদম পড়শি বাড়িতে আগুন লাগার মতো ঘটনাটি ঘটেছে বলে বেশ দ্রুত সেটা ‘লাইভের’ কবজায়

নিয়ে আসতে পেরেছে টিভি চ্যানেলগুলো। কিন্তু দেখা গেল, এখানেও সেই হাস্যকর দৃশ্য। এক সংবাদ-পাঠক প্রায় মিনিট দশেক ধরে ভাঙা রেকর্ডের মতো বলে গেলেন, ‘দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। আমরা সেটা সরাসরি সম্প্রচার করছি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে...!’

ভাঙা রেকর্ডও একসময় থামে। শেষ পর্যন্ত সেই সংবাদ-পাঠকও থেমেছেন। হয়তো ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলেই। ওদিকে আরেক চ্যানেলের সাংবাদিককে ‘লাইভ’-এর শেষ পর্যায়ে স্টুডিওর উপস্থাপক বারবার বলছেন, ‘ঠিক আছে, আমরা কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছি।’ কিন্তু কে শোনে কার কথা? তিনি বলেই চলছেন, ‘আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি...।’

উল্টোটাও ঘটেছে। ‘এখন আমরা সরাসরি যোগ দেব তাঁর সঙ্গে’ বলে যে সাংবাদিককে ধরা হলো ক্যামেরায়, তিনি তখন ফোনেই নেই, পাশের জনের সঙ্গে গল্পে মশগুল। স্টুডিও থেকে মাঝেমধ্যে উপস্থাপক আবার জুড়ে দিচ্ছেন অদ্ভুত সব আবিদার, ‘আচ্ছা, আগুন কেন লাগল আপনি জানতে পেরেছেন? ভেতরে যারা আগুন নেভাচ্ছে, তাদের কাছে গিয়ে জিঞ্জেস করুন না...!’

ব্যাপারটা আরও আকর্ষণীয় করতে স্পট থেকে নিজেদের এক সহকর্মীকে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো স্টুডিওতে। যে ঘটনা পাঁচ মিনিটে বলে ফেলা সম্ভব, তিনি সেটা ৫০ মিনিটে ব্যাখ্যা করলেন। এরপর তাঁর কথা শেষ। তিনিও নিরন্তর, উপস্থাপকও নির্বাক। দর্শক হিসেবে সবার মধ্যেই চাপা টেনশন শুরু হলো-এখন কী হবে! সেই সহকর্মী কিছু বুঝে না উঠতে পেরেই গলাটা যথাসম্ভব খাদে এনে ফিসফিস করে জিঞ্জেস করলেন, ‘আমি কি আরও বলব?’ উপস্থাপকের হুঁশ ফিরল, ‘না না, থামবেন না। বলে যান বলে যান।’

এঁদের থামানো যাচ্ছে না। বিডিআরের ওই ঘটনায় জিম্মিদশা থেকে মুক্ত, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষজনকে গেট দিয়ে বের করে আনা হতে না হতেই চারদিক থেকে মৌমাছির মতো হামলে পড়ে ক্যামেরা। অসহায় এক পিতাকে করজোড়ে

অনুরোধও করতে দেখা গেল, ‘প্লিজ ভাই, আমাদের ছেড়ে দিন। এ অবস্থায় কথা বলতে পারব না।’

দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, পরলোকে বসে হতাশায় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন জন বেয়ার্ড, টেলিভিশন নামের এই বিভীষণ আবিষ্কারের হতাশায়। সুযোগ থাকলে টিভি ক্যামেরা পৌঁছে যেত তাঁর কাছেও। বুম বাড়িয়ে জানতে চাইত, ‘এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি কী?’ রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

৪৪) পরাধীনতায় কে বেশিঃ জেল না অফিস?

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা। কিন্তু যারা চাকরি করি, তারা স্বাধীন হয়েও পরাধীনতার এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছি। চিন্তা করছেন, কীভাবে? আসুন না দেখি অফিসের জীবন আর জেলহাজতের জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না! জেলঃ একজন বেশির ভাগ সময়ই ৮ বাই ১০ একটি ঘরে সময় কাটায়।

অফিসঃ একজন বেশির ভাগ সময় কাটায় ৬ বাই ৮ কিউবিকলে। জেলঃ হাজতি দিনে তিন বেলা খাবার বিনামূল্যে পায়।

অফিসঃ আপনি মাত্র একটা মধ্যাহ্ন বিরতি পাবেন এবং খাবারের জন্য টাকা দিতে হবে।

জেলঃ আপনার জন্য একজন গার্ড থাকে সব সময়, যে আপনার দরজা খুলে বা বন্ধ করে দেয়।

অফিসঃ আপনার নিজেকে কষ্টকর একটি সিকিউরিটি কার্ড বহন করতে হয় এবং সব দরজা নিজ দায়িত্বেই খুলতে এবং বন্ধ করতে হয়। জেলঃ ভালো ব্যবহারের পুরস্কার হিসেবে আপনাকে বিনোদনের সময় দেওয়া হয়।

অফিসঃ ভালো ব্যবহারের পুরস্কারস্বরূপ আপনাকে বেশি করে কাজ দেওয়া হয়। জেলঃ আপনার জন্য খেলাধুলা ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

অফিসঃ টিভি দেখা ও খেলাধুলা করার কারণে আপনাকে বহিষ্কার করা হবে। জেলঃ নিজস্ব টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে।

অফিসঃ কমন টয়লেট ব্যবহার করতে হয়। জেলঃ আপনার পরিবার ও বন্ধুরা আপনার

সঙ্গে দেখা করতে পারে।

অফিসঃ অনেক ক্ষেত্রে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ থাকে। জেলঃ সব খরচ আদায়কৃত ট্যাক্স থেকে পূরণ করা হয়। এর জন্য কোনো কাজ করতে হয় না।

অফিসঃ অফিস করতে হয় আপনার নিজের সব খরচ চালানোর জন্য

এবং বেতন থেকে সরকার ট্যাক্স কেটে নেয়, যার একটি অংশ

জেলেও খরচ হয়। জেলঃ ভালো ব্যবহার ও স্বভাবের কারণে অনেক সময় সরকার মেয়াদের আগেই মুক্ত ঘোষণা করে থাকে।

অফিসঃ ভালো ব্যবহার ও সৎ হলে আপনার অবসর বাতিল করে চাকরির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। জেলঃ অনেক সময় জেলে বদমেজাজি ওয়ার্ডেন দেখা যায়।

অফিসঃ তারা ম্যানেজার নামে পরিচিত। জেলঃ আপনি বই পড়া, বই লেখা, ছবি আঁকার মতো সৃজনশীল কাজ করতে পারেন।

অফিসঃ কাজের চাপে আপনার সৃজনশীলতা বিলীন হতে থাকে। জেলঃ বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

অফিসঃ বিশেষ দিন বড়জোর ছুটি থাকে, ভালো-মন্দ খাবারের সুযোগ নেই। জেলঃ সকল প্রকার যাতায়াতের জন্য সরকারি গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে।

অফিসঃ বেশির ভাগ যাতায়াতের খরচ নিজের পকেট থেকে যায়। জেলঃ আপনি বড় মাপের কেউ হলে আপনার জন্য বিশেষ জেল বানানো হবে, যেখানে সকল প্রকার বিনোদন ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

অফিসঃ আপনি যত বড় মাপেরই হোন না কেন, আপনাকে করপোরেট অফিসের জন্য নির্দিষ্ট অফিস ঘরেই কাজ করতে হবে।

এখন ভাবুন, আগামীকাল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাবেন, নাকি জেলে? -ওয়েবসাইট অবলম্বনে

মুনাস ইকবাল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

৪৭) বিদেশের হামলায় বাংলাদেশি

তদন্ত প্রতিবেদন

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ব্রিটিশ

হাইকমিশনারের ওপর হামলা এবং সম্প্রতি

বিডিআর হামলা-সবকিছু শেষেই এফবিআই, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এসে তদন্ত করে যায় কিন্তু কী প্রতিবেদন দেয়, সেটা আর জানা যায় না! ইউরোপ-আমেরিকায়ও বোমা হামলা হয়, তখন যদি বাংলাদেশ থেকে তদন্তের জন্য গোয়েন্দা নেওয়া হয়, তবে কী ধরনের প্রতিবেদন দেবেন তাঁরা, এর কাল্পনিক রূপ তুলে ধরছেন শাত শামীমশুরুতেই বলে রাখছি, আমাদের তিন সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপে কেউই ওউখএক্স করিনি। অতএব স্থানীয় কর্মকর্তারা যে যা-ই বলুক আমরা আকারে-ইঙ্গিতে আমাদের মতো করে বুঝে নিয়েছি। বাংলাদেশে বসেই যখন এ ঘটনার কথা শুনতে পেলাম, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এর সঙ্গে বিরোধী দলের সম্পৃক্ততা আছে! এসে যে আলামত দেখলাম, তাতেও মনে হলো ঘটনার সঙ্গে বিরোধী দলের সম্পৃক্ততা আছে। তবে কিছু আলামত দেখে মনে হচ্ছে, ঘটনার সঙ্গে আরব দেশীয় কোনো জঙ্গির সম্পৃক্ততাও থাকতে পারে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা বেশ কিছু চুলজাতীয় জিনিস পাই। এতে মনে হয়, হামলাকারীদের কেউ নারীও থাকতে পারে। যেহেতু চুলের রং নিয়ে আমার সহকর্মীরা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, তাই আমরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। পড়ে থাকা চুলগুলো কি হামলাকারীর, না হামলায় নিহত কারও, নাকি হামলার পর বাতাসে উড়ে এসেছে, সেটাও আমরা বলতে পারছি না। এগুলো দীর্ঘ গবেষণার বিষয়। এগুলোর মীমাংসা করে প্রতিবেদন দিতে হলে অনুগ্রহ করে আমাদের ভিসার মেয়াদ বছরখানেক বাড়াতে হবে।

এই হামলাটি সরকার নিজে করেই অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছে কি না, এ বিষয়টি আমরা একদম উড়িয়ে দিচ্ছি। কোনোভাবেই সরকারের কারও এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই। অন্তত যে সম্মান করে আমাদের ডেকে এনে খাইয়েছে, তাতে মনে হয়, তাদের এমন মন থাকতেই পারে না। ভাববেন না নুন খেয়ে গুণ গাইছি!

সন্দেহ করে যাকে আটক করা হয়েছে, আমরা তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছি। কথা বলে যতটুকু বুঝেছি, তাঁর একটা বড় শপিং মল আছে, সেখানে তিনি আমাদের যত খুশি তত ফ্রি

কেনাকাটার দাওয়াত দিয়েছেন। যাঁর মন এত বড়, তিনি কোনোভাবেই এ রকম হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন না। তাঁকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁকে যতক্ষণ আটকে রাখা হবে, ততক্ষণই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে! হামলায় যে ধরনের বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর আলামত দেখে আমরা নিশ্চিত, ইউরোপ-আমেরিকায়ও আজকাল দুই নম্বর জিনিস তৈরি হয়। অথবা বোমাগুলো আমাদের জিনজিরার মতো নকল জিনিস তৈরির কোনো কারখানা থেকে এসেছে।

এই প্রতিবেদন লেখার আগে আমরা বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে কথা বলেছি। লোকটার কথাবার্তাও সন্দেহজনক। আমরা আশা করেছিলাম, তিনি ভদ্রতাবশত হলেও আমাদের বিমান ভাড়ার টাকাটা উপহার দেবেন। কিন্তু এই লোক বিরাট কপ্পাস। সুতরাং এ রকম লোকের পক্ষেই এ ঘটনা ঘটানো একদম সম্ভব। আশা করি, আমরা এ দেশ ত্যাগ করার পরপরই তাঁর বিচারকাজ শুরু হবে। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

90) তেনালি রমণের দুটি গল্প

ভারতীয় লোককাহিনীর জনপ্রিয় চরিত্র তেনালি রমণ। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের রাজসভার আটজন জ্ঞানী ব্যক্তির একজন ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে মজার মজার অনেক গল্প রয়েছে। এখানে দুটি গল্প তুলে ধরা হলো।

বীরত্ব
শীতের সন্ধ্যা। মাঠে আগুনের ধারে বসে গল্প করছেন রমণ। সঙ্গে কয়েকজন অবসর নেওয়া সেনাসদস্য। কথায় কথায় তাঁদের গল্প বেশ জমে উঠল। এক সেনাসদস্য তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বলতে গিয়ে একাই সাত শত্রুকে ঘায়েল করার রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিলেন। আরেক সেনাসদস্য একাই একদল শত্রুকে হটিয়ে দেওয়ার এমন বর্ণনা দিলেন, ফড়ফড়িয়ে সবার গায়ের রোম খাড়া। এভাবে প্রত্যেক সেনাসদস্যই যাঁর যাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী বীরত্বে কেউ কারও চেয়ে কম নন।

সবশেষে এল রমণের পালা। কিন্তু তিনি তো আর সেনা নন, কাজেই তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে এক

সেনা ফস করে বলে উঠলেন, ‘তোমার তো মনে হচ্ছে আমাদের মতো বীরত্বের কোনো কাহিনীই নেই।’

‘থাকবে না কেন,’ তেড়েফুঁড়ে জবাব দিলেন রমণ। ‘আমাকে কী মনে করো তোমরা? লড়াইয়ের তালিম ছিল বলেই তোমরা বীরত্ব দেখাতে পেরেছ। আর আমি তো কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বীরত্ব দেখিয়েছি।’

‘তা শুনি কী বীরত্ব দেখালে?’ একসঙ্গে সবাই উৎসুক হলেন জানতে।

রমণ বলতে লাগলেন, ‘একদিন সন্ধ্যায় একলা এক বিশাল মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বড়সড় এক তাঁবু দেখতে পেলাম। ভারি কৌতূহল হলো। আস্তে করে গিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। দেখি ভেতরে মাদুরের ওপর পেল্লাই এক দেহ। এত বড় ধড় আর কখনো দেখিনি। বুঝতে আর বাকি রইল না, এ রঘু ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়।’

এই বলে দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন রমণ। অমনি ব্যাকুল শ্রোতারা তাড়া দিলেন তাঁকে, ‘তারপর, তারপর।’

রমণ বললেন, ‘এমন কুখ্যাত ডাকাতকে বাগে পেয়ে কি আর ছাড়া যায়? কোমর থেকে চাকু বের করে তার এক পায়ের বুড়ো আঙ্গুল কেটেই ঝেড়ে দৌড় দিলাম। যা-ই বলো ভাই, সে তো সাধারণ মানুষ নয়। একটা ডাকাত! প্রাণের মায়া কার না আছে?’

শ্রোতারা হতাশ হয়ে বললেন, ‘দূর, এটা কী করলে! পায়ের আঙ্গুল কাটার মধ্যে বীরত্ব আছে কোনো? মাথা কাটতে পারলে না হয় শাবাশ দেওয়া যেত।’

রমণ এবার রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বললেন, ‘ও কাজটি করার সুযোগ আর পেলাম কোথায়? আগেই তো কে যেন কাজটা করে গিয়েছিল।’

—————বোকার তালিকাএকদিন রাজা কৃষ্ণদেবের কাছে এক ভিনদেশি লোক এলেন। নিজেকে তিনি একজন ঘোড়া বিক্রেতা হিসেবে দাবি করলেন। সঙ্গে নাকি তাঁর কিছু ভালো জাতের ঘোড়া আছে। লোকটা ছিলেন বাকপটু। রাজা সহজেই তাঁর কথায় পটে গেলেন।

লোকটার কথামতো হাজার পাঁচেক সোনার মোহর তাঁকে আগাম দিলেন তিনি। রাজাকে শিগগির ঘোড়া এনে দেওয়ার কথা দিয়ে

ভিনদেশি চলে গেলেন। দেখতে দেখতে দুটো দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু ঘোড়া বিক্রেতার কোনো দেখা নেই।

তৃতীয় দিন রাজা তাঁর বাগানে একাকী ঘুরছেন, দেখেন ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে রমণ খুব মন দিয়ে কী যেন লিখছেন। এগিয়ে গিয়ে রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছ রমণ?’ রমণ ঝটপট জবাব দিলেন, ‘রাজ্যের সবচেয়ে বোকা লোকদের একটা তালিকা করছি।’

কৌতূহলী হয়ে রাজা জানতে চাইলেন, ‘তা এক নম্বরে স্থান পেল কে?’

‘বেয়াদবি নেবেন না, রাজামশাই। এক নম্বর আসনটি আপনিই দখল করেছেন।’

রমণের ওপর ভয়ানক খেপে গেলেন রাজা।

তাঁর রাজসভার সামান্য এক কর্মচারীর এত দূর স্পর্ধা! পেয়াদা ডেকে রমণকে শূলে চড়াতে ইচ্ছা হলো তাঁর। কিন্তু তাঁকে বোকার হৃদ ঠাওরানোর কারণ আগে জানতে হবে। এ জন্য রাগ চেপে তিনি রমণকে শুধালেন, ‘তা আমাকে সবচেয়ে বেশি বোকা ঠাওরানোর কারণটা কী?’ রমণ বললেন, ‘যে মানুষ অপরিচিত এক লোকের কথায় ভজে অবলীলায় পাঁচ হাজার সোনার মোহর দেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করেন, তিনি বোকা নন তো কী?’

‘কিন্তু ওই লোক যদি সত্যি সত্যি ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসে, তখন? সময় তো আর চলে যায়নি।’

রমণ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এর সমাধান তো খুব সহজ, রাজামশাই। সে ক্ষেত্রে আপনার নাম মুছে ওই তালিকার শুরুতে ঘোড়াওয়ালার নাম বসিয়ে দেব।’ – ইংরেজি থেকে ভাষান্তর শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

91) অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রিসভার জন্য মনমতো অর্থমন্ত্রী খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

শেষে তিনি কয়েকজনকে একটি বৈঠকে ডাকলেন। উদ্দেশ্য, এঁদের ভেতর থেকে একজনকে অর্থমন্ত্রী করা হবে। কিন্তু বৈঠকে কারও কথাবার্তাই রাষ্ট্রপতির কাছে জুতসই লাগছিল না। মনে মনে তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন। একপর্যায়ে চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠল। তা

দেখে একজন বললেন, ‘স্যারের কি আমাদের পছন্দ হচ্ছে না?’

‘পছন্দ হবে কীভাবে?’ রাষ্ট্রপতি বিরক্তি সহকারে বললেন। ‘আপনাদের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।’

‘সেকি কথা!’ আরেকজন বললেন। ‘পরীক্ষা করেই দেখুন না?’

‘তাহলে একজন একজন করে বলুন তো দুই আর দুই মিলে কত হয়?’

‘এটা একটা প্রশ্ন হলো,’ প্রথমজন বললেন।

‘চার হয়।’

‘হ্যাঁ, চার হয়,’ দ্বিতীয়জন সমর্থন দিলেন।

‘যোগ করলেও চার হয়, গুণ করলেও চার হয়,’ তৃতীয়জন যোগ করলেন।

পঞ্চমজন একটু সামনে ঝুঁকে নিচু গলায় আঞ্চলিক ভাষার টানে বললেন, ‘দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ হয়। আপনি কতো চান?’

প্রচলিত আছে, পঞ্চমজনকেই অর্থমন্ত্রী করা হয়েছিল।— আসজাদুল কিবরিয়া, সংগৃহীত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৩, ২০০৯

92) খেলার চেয়ে খুলা বেশি - ওঠানামার খেলা

পটলডাঙার সেই বিখ্যাত টেনিদার পাল্লায় পড়ে একবার ক্রিকেট খেলে ফেলেছিল প্যালারাম বাড়জ্জে। মাঠে দুই আম্পায়ারকেও ফিল্ডিং দলের লোক ধরে নিয়েছিল প্যালারাম। তার হিসাবে ফিল্ডিং দলের খেলোয়াড় দাঁড়াল ১৩ জন মাত্র!

যদিও জ্ঞানী লোকেরা বলেন, দলে খেলোয়াড় থাকবে ১১ জন, কিন্তু জ্ঞানী লোকদের কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। শুধু প্যালারাম নয়, এক দলের ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় মাঠে দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে।

১৯৮৬ সালে ভারত-ইংল্যান্ড লিডস টেস্টের ঘটনা। তৃতীয় দিনের খেলা চলছিল। সাহেবদের দেশের আবহাওয়ার গুণে বা বিলেতি খাওয়ার কারণে, ভারতের খেলোয়াড়দের মাঠের চেয়ে ড্রেসিং রুমই বেশি টানছিল। খেলোয়াড়েরা বারবার মাঠ ছেড়ে উঠছিলেন (মাঠ ছেড়ে গিয়ে কী করছিলেন সে আলোচনা না হয় না-ই করি)। মাঠ তো আর ফাঁকা থাকতে পারে না।

একজন খেলোয়াড় মাঠ ছাড়ছেন, তার বদলে বদলি ফিল্ডার ঢুকছেন। এ-ই চলছিল। একবার এ উঠছে, ও নামছে। আবার ও নামছে, সে উঠছে। এ রকম করতে করতে কে উঠল আর কে নামল, সে হিসাব আম্পায়াররাও গুলিয়ে ফেললেন। ফলে একসময় আবিষ্কৃত হলো, মাঠে ভারতীয় ফিল্ডার (বোলার-উইকেটরক্ষক মিলে) ১২ জন! মানে আসল খেলোয়াড় মাঠে ফিরলেও বদলি ফিল্ডার উঠে যেতে ভুলে গিয়েছিল!

টেস্ট ক্রিকেটে এমন আজব ঘটনা আর নেই। তবে কাউন্টি ক্রিকেটে এ রকম ওঠানামা গুলিয়ে ফেলার নজির আরও মেলে। ওঠানামা গুলিয়ে ফেলার সবচেয়ে বড় কেলেক্কারিটা বোধহয় ১৯৩৫ সালে ইয়র্কশায়ার আর এসেক্সের একটা ম্যাচে। মানুষ কথায় বলে, ব্যাটসম্যানরা উইকেটে যাওয়া-আসার মিছিল লাগিয়েছেন। সেদিন তা-ই হয়েছিল এসেক্সের। ব্যাটসম্যান যে গতিতে যাচ্ছে, এর দ্বিগুণ গতিতে আউট হয়ে ফিরে আসছে। কে আউট হলো আর কে এল, তা খেয়াল রাখার উপায় নেই!

এক ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন ক্যাচ তুলে দিয়ে। তাঁর সঙ্গী নিকোলস এরই মধ্যে দৌড়ে স্ট্রাইকিং প্রান্তে চলে এসেছেন। নিশ্চিত্তে বোলার পরের বলটা করে ফেললেন। দর্শকদের ‘অভিভূত’ করে দিয়ে নিকোলস ছয় মেরে দিলেন। কিন্তু বল বাউন্ডারির বাইরে যেতেই আবিষ্কৃত হলো, নিকোলসের তখন সঙ্গী বলে কেউ নেই। মানে অন্য প্রান্তের নতুন ব্যাটসম্যান তখনো মাঠে এসে পৌঁছাননি। কেলেক্কারির এখানেই শেষ নয়। নতুন ব্যাটসম্যান আসার পর সত্যিকারের যে বলটা হলো, সেটাতেই আউট নিকোলসও!

যা-ই হোক, মাঠে এগারো না বারোজন খেলোয়াড় থাকবেন, আন্তর্জাতিক সেই অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অলিফ্যান্ট-কালাম নামে সেই ভদ্রলোকের ঘটনা বলে শেষ করা যাক। অলিফ্যান্ট-কালাম মোটেও বিখ্যাত কেউ নন। তবে হলে হতেও পারতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেকের কথা ছিল সেদিন।

কেন্টের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ‘একাদশে’ নিজের নাম দেখে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে অভিষেকের আনন্দে টগবগ করছিলেন। মাঠে

নেমেও ছিলেন। দুই দল সারি বেঁধে মুখোমুখি
দাঁড়ানোর পরই ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হলো।
অক্সফোর্ড আসলে ‘একাদশ’ নয়, মাঠে নামিয়ে
ফেলেছে বারো জনের দল! কেলেক্কারি চাপা
দিতে একজনকে তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে তুলে
দেওয়া হলো। সেই জনটা কে? ওই যে
অলিফ্যান্ট-কালাম। বেচারি! আর কোনো দিন
সেই অভিষেকের সুযোগ হয়নি তাঁর।
প্যালারাম বাড়ুজ্জের কথা মেনে নিলেই হতো।
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ প্রথম আলো, এপ্রিল ০৬, ২০০৯

৭৩) হাওয়া, পাথর আর বাড়ি খোঁজার গল্প

ঢাকায় থাকিতে আসিয়া আবাসনসংক্রান্ত
জটিলতায় যাঁহারা পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের
উদ্দেশে এই রচনাখানি নিবেদিত। ভাড়া বাড়ি,
বিশেষত মেসবিষয়ক কিছু কাহিনী আপনাদের
সম্মুখে পাড়িতে চাই। ঘটনা যদি আপনার
জীবনের সহিত মিলিয়া যায়, তাহার দায়ভার
আপনার, এই লেখকের নহে!
প্রথমেই মনে পড়িতেছে আমার ঘনিষ্ঠ এক
বন্ধুর কাহিনী। আমরা তখন সদ্য ঢাকায় আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার
নিমিত্তে কোচিং গ্রহণ করিব। আমি আশ্রয়
পাইয়াছিলাম আমার এক নিকটাত্মীয়ের
বাড়িতে। আমার বন্ধুটি একটি মেসের সদস্যপদ
জোগাড় করিতে পারিয়াছিল। কোচিংয়ে
প্রতিদিনই পরীক্ষা লাগিয়া থাকিত। বন্ধুটি
পরীক্ষায় ক্রমাগত খারাপ করিতে লাগিল।
একদিন তাহাকে শুধাইলাম, ‘মেসে পড়ালেখার
কি বিশেষ অসুবিধা?’ বন্ধুটি বিরস মুখে বলিল,
‘আর বলিও না। প্রতিদিন বাড়ি খুঁজিয়া
পাইতেই তো আড়াই-তিন ঘণ্টা সময় অপচয়।’
প্রতিদিন কার বাড়ি খোঁজে সে? বুঝিতে না
পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘প্রতিদিন এত কার
বাড়ি খোঁজো?’ বন্ধু নির্বিকারভাবে বলিল, ‘কেন,
আমার!’

বন্ধুটিকে লইয়া সেদিন হাস্যপরিহাস
করিয়াছিলাম। কিন্তু কী বলিব, বছর পাঁচেক পর
একই দুর্দশা আমারও হইয়াছিল। মাস তিনেক
আত্মীয়ের বাসায় কোচিং করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
অবতীর্ণ হই। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি
বছর প্রজাপতির মতো কীরূপে উড়িয়া গিয়াছিল,

ঠাহর পাই নাই। সংবিৎ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাড়িয়া দিয়া যখন মিরপুর ২ নম্বরের মাকড়সার জালের মতো অলিগলিসমৃদ্ধ এলাকাটিতে মাথা গুঁজিলাম। সেই বাড়িতে আমার সঙ্গী হইল কোচিংয়ের সেই বন্ধু। এত দিনে সে রাস্তাঘাট বহু চিনিয়াছে। মিরপুরের এই মাকড়সা গলিও তাহার কাছে হস্তরেখার মতো আটপৌরে ব্যাপার। কিন্তু বিপদে পড়িলাম আমি। প্রায়শ বাড়ি খুঁজিয়া পাই না। অনেক দিকচিহ্ন মুখস্থ রাখিতে হয়। তাহার পরও প্রায়-প্রায়ই অফিস হইতে সন্ধ্যায় সেই অলিগলিতে ঢুকিয়া বাড়ির গলিটির আর সন্ধান করিতে পারি না। কিন্তু কাহারেও মুখ ফুটিয়া এই বিপদের কথা বলিতে পারি না; সেই বন্ধুটিকে তো নয়ই। পাছে সে পাঁচ বছর আগে হাসা আমার সেই হাসিটির বদলা নিয়া ফেলে!

এইবার একটু হাওয়ার গল্প করি। ইয়ামিন নামের আমার এক বন্ধু ঢাকায় আসিয়া ফার্মগেট এলাকায় একটি কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। কক্ষটি ছিল তাহার পরিচিত এক বড় ভাইয়ের ফ্ল্যাটের অংশবিশেষ। নাগরিক পরিভাষায় এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘সাবলেট’ বলিয়া থাকে। ইয়ামিন যখন সেই কক্ষটিতে উঠিল, দেখিতে পাইল, একটি সিলিংফ্যান ছাদ হইতে ঝুলিতেছে। দুইটি মাস সেই কক্ষে অতিবাহিত করিল সে।

সিলিংফ্যানের বাতাসও খাইল পুরাদমে। দুই মাস পর, তৃতীয় মাসে বড় ভাইকে ইয়ামিন বলিল, ‘ভাইয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছি। কক্ষটি ছাড়িয়া দিতে চাই।’ বড় ভাই বলিলেন, ‘তোমার তো কিছু বকেয়া রহিয়াছে।’ ইয়ামিন ভাবিল, বকেয়া থাকিবার তো কথা নহে। মাসের ভাড়া আগেই পরিশোধ করা হইয়াছিল। কিছু বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় ভাইয়ের পানে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিল সে। বড় ভাই বলিলেন, “ভ্রাত, তোমার কক্ষে একটি সিলিংফ্যান রহিয়াছে। যদিও ফ্যানটি তোমার নহে, তথাপি দুই মাসকাল তুমি ইহার হাওয়া খাইয়াছ। অতএব, এই বাবদ তোমার নিকটে পাওনা হইয়াছে। ‘ব্যবহারমূল্য’ হিসাবে তোমাকে পাঁচ শত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।”

ইয়ামিন প্রথমে ভাবিয়াছিল, বড় ভাই রঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু একটু পরেই বুঝিল, ঘটনা

ভিন্ন। পরিশেষে, দরাদরির পর, ‘বাতাসের দাম’ হিসাবে দুই শত টাকা পরিশোধ করিয়া আমার বন্ধু ইয়ামিন উদ্ধার পাইল।

আবাসনসংক্রান্ত সর্বশেষ গল্পটি আমার চল্লিশোর্ধ্ব এক বড় ভাইয়ের। ইহা তাঁহার প্রথম জীবনের গল্প। ঢাকার কাঁঠালবাগানে একটি মেস ভাড়া লইয়াছিলেন। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া থাকিবেন। মেসে উঠিয়া, উত্তরাধিকারস্বরূপ তাঁহারাও একখানি বস্তু পাইলেন। আর কিছু নহে, প্রমাণ আকৃতির একখানি প্রস্তরখণ্ড। এটি কী উদ্দেশ্যে আনীত হইয়াছিল, তাঁহারা ঠাহর করিতে পারিলেন না। তবে এই প্রস্তরখণ্ডই একদিন তাঁহাদের বিশেষ উপকারে লাগিয়া গেল। ঘটনা এইরূপঃ রাত্র ১১ ঘটিকার পর হইতে তাঁহাদের মেস যে তলায়, তাহার উপরের তলা হইতে একটানা শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। একটানা, বিরক্তিকর, কোনো কিছুতে আঘাত করিবার গুমগুম শব্দ। মেসের কেহই কোনো কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না; নিদ্রা তো অসম্ভব ব্যাপার। অবস্থা বেগতিক হইয়া পড়িলে আমার সেই বড় ভাই মেসের অন্য সদস্যদিগকে বলিলেন, ‘পাথরখানি লইয়া আসো।’ প্রস্তর আনা হইল। এরপর বড় ভাই সবাইকে বলিলেন, ‘মেঝেতে এই পাথর ঘষো।’ সবাই যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তরখণ্ডটি মেঝেতে ঘষিতে লাগিল। বেশ কিছুক্ষণ ঘষার পর নিচের তলা হইতে লোকজন উঠিয়া আসিয়া অভিযোগ করিল, ‘ভ্রাত, এত শব্দ কিসের?’ মেসের সবাই উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সমস্বরে বলিল, উপরে, উপরতলায়! লোকজন উপরতলার পানে ছুটিল! এইখানে রচনার ইতি টানিতেছি। সকলের সুবুদ্ধি হউক। তানিম হুমায়ুন

সূত্রঃ প্রথম আলো, এপ্রিল ০৬, ২০০৯

94) সিএনজি ভাড়া করতে গেলে মানুষ দিনের বেলাও তারা দেখে

সামিনা চৌধুরী -

সাক্ষাৎকারটি কাগজে-কলমে তুলে এনেছেন
জিনাত রিপা গান গাওয়ার পাশাপাশি ইদানীং
আর কী করছেন?

- খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুমুচ্ছি, ছেলেদের পড়া দেখিয়ে
দিচ্ছি-এই তো!

গান কেন গান?

- রান্নাঘরে আর কদিন গাইব বলুন?
কী ভেবে খুব আশ্চর্য হন?
- রাষ্ট্রের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়। মানলাম।
নেপাল তো প্রজাতন্ত্র, তবে কেন তাদের
প্রধানকে প্রজাপতি বলা হয় না!
মানুষ দিনের বেলা তারা দেখে কখন?
- সিএনজি ভাড়া করতে গেলে।
দিন আর রাতের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়?
- রাতে ছিঁচকে চুরি হয় বেশি। আর দিনের
প্রায় সব চুরিই হয় পুকুরচুরি।
আজকের সামিনা চৌধুরী আগামী দিনের-
- আমার ছেলেদের বাচ্চার দাদি।
হানিমুন থাকলেও হানিসান নেই কেন?
- সূর্যের তাপে নতুন বউয়ের ত্বক কালো
হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে।
যা পাওয়ার যোগ্যতা আপনার আছে, কিন্তু
এখনো পাননি-
- মায়ের হাতের মার।
ব্যবসা হিসেবে কোনটি লাভজনক বলে মনে হয়
আপনার কাছে?
- আফ্রিকা মহাদেশে রং ফরসা করা ক্রিমের
ব্যবসা।
গান যদি পৃথিবীতে না-ই থাকত-
- রবীন্দ্র, নজরুল কী করে হতো!!!
এই বয়সেও তারুণ্য ধরে রাখার রহস্য কী?
- এই বয়সে মানে!
আপনি সবচেয়ে অপমানিত বোধ করেন কখন?
- অপমানিত বোধ করার পর্যাপ্ত কারণ থাকা
সত্ত্বেও যখন অপমানিত বোধ হয় না।
সবার ওপরে মানুষ সত্য-কথাটা কি ঠিক?
- কী করে ঠিক বলি বলুন? আমি তো দেখি
সবার ওপরে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র।
মানুষ কলা ছিলে খায় কেন?
- তারা যে ছাগল না, এটা প্রমাণের জন্য।
গভীর রাতে কী ভাবেন?
- সূর্য বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।
একটু পরই সকাল। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, এপ্রিল
০৬, ২০০৯

95) আসল কারণ

খবরটা শোনার পর থেকে একদমই শান্তি
পাচ্ছিলেন না ফরিদ সাহেব। খুবই দুশ্চিন্তা
হচ্ছিল তাঁর। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতে
করতে তাঁর স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু ফরিদ সাহেবের চোখে ঘুম নেই। ঘুম আসবে কী করে, পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাঁর মাথায় তেমনি ঘুরপাক খাচ্ছে দুশ্চিন্তা। ফরিদ সাহেবের দুশ্চিন্তার কারণ তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়ে ঢাকার রোকেয়া হলে থেকে লেখাপড়া করে। লেখাপড়ার সুবিধার জন্য কদিন আগেই মেয়েকে একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নাকি এক রুমে একটার বেশি কম্পিউটার রাখতে দেবে না। হলে নাকি কম্পিউটারবিরোধী অভিযান চলছে। এর কোনো মানে আছে! তিনি নিজে ঢাকায় গিয়ে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মেয়েকে কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। নাহ! এর একটা বিহিত করতেই হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলবে, অথচ হলে কম্পিউটার রাখতে দেবে না, এটা তো হতে পারে না। কম্পিউটার রাখার জন্য কি আলাদা বাসা ভাড়া করবে নাকি...? ফরিদ সাহেবের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। কল রিসিভ করতেই শোনা গেল তাঁর মেয়ের গলা-হ্যালো বাবা, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন থেকে এক রুমে তিনটা কম্পিউটার রাখার অনুমতি দিয়েছে। তিনটার বেশি কম্পিউটার থাকলে যে রুমে কম্পিউটার নেই সেই রুমে সিট দেওয়া হবে। মেয়ের কথা শুনে ফরিদ সাহেবের সব দুশ্চিন্তা উধাও হয়ে গেল। যাক! কম্পিউটার কেনাটা তাহলে বৃথা যায়নি। তিনি খুশি মনে বারান্দায় চলে এলেন। ফরিদ সাহেবের মাথা এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তিনি পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে খবরের কাগজ পড়ছেন। হঠাৎ তাঁর চিন্তা করার মুড চলে এল। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আজকাল প্রায়ই তাঁর চিন্তা করার মুড চলে আসে। তিনি ভাবতে লাগলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো যেনতেন লোক নয়। এরা না বুঝে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তা ছাড়া তিনি শুনেছেন, ওখানে পানি-বিদ্যুতের তেমন সমস্যাও নেই। তাহলে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত তারা নিল কী করে? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো উচ্চমার্গীয় কারণ আছে। ব্যাপারটা শেয়ার করার জন্য তিনি তাঁদের কাজের লোক আবুলকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা আবুল, বল তো রুম থেকে

ওরা কম্পিউটার কেন সরিয়ে নিল?’

আবুল হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল, ‘এইটা তো একদম ইজি বিষয় খালুজান, জিনিসটার নামেই তো ‘কম’ আছে। এইটা তো কম থাকাই ভালো।’

আবুলের কথা শুনে বিরক্তিতে ফরিদ সাহেবের কপাল কুঁচকে গেল। দেশের কাজের লোক সম্প্রদায়ের জ্ঞানের পরিধি দেখে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। চিন্তার মুড়ে না থাকলে কষে একটা চড় দিয়ে তিনি আবুলের দাঁত ফেলে দিতেন। তিনি আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। প্রথমেই স্থানের বিষয়টা তাঁর মাথায় এল। রোকেয়া হল তো বিশাল ফিউচার পার্ক নয় যে যার যে কম্পিউটার আছে তা-ই এখানে নিয়ে আসবে। এখানে জায়গা কম, তাই কম্পিউটারও কম। ফরিদ সাহেব কর্তৃপক্ষের কথাই যখন ঠিক বলে ধরে নিয়েছেন, তখনই তাঁর মাথায় এল ল্যাপটপের কথা। ‘জায়গা কম’ এটাই যদি মূল কারণ হয়, তাহলে তো ল্যাপটপ রাখতে নিষেধ করার কথা নয়। ল্যাপটপ তো বালিশের চেয়েও ছোট। তাহলে কারণটা কী? ফরিদ সাহেবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারণটা সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছেন।

প্রাণপ্রিয় কম্পিউটার জন্ম করলে ছাত্রীরা মনের দুঃখে হল ছেড়ে দেবে। তখন কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দমতো নতুন ছাত্রী ভর্তি করতে পারবে। একেবারে পানির মতো সহজ কারণ।

কিন্তু...পরে তো আবার কম্পিউটার রাখার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। নাহ। এ কারণটাও জুতসই হলো না। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল খবরের কাগজে। চীনা এক গোয়েন্দা সংস্থা নাকি পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারগুলোতে প্রবেশ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতিয়ে নিয়েছে। রোকেয়া হলও তো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। চীনারা এখানকার কম্পিউটারে হামলা চালাতে পারে, এটা ভেবেই হয়তো কম্পিউটারগুলো সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন, চীনারা কাজটা করেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। রোকেয়া হলের সব কম্পিউটারে তো আর ইন্টারনেট নেই। তা ছাড়া হামলার আশঙ্কা করলে তো সব কম্পিউটারই সরিয়ে নিত। সব রুমে একটা করে রেখে দিত না। ফরিদ সাহেবের মেজাজ খারাপ হতে শুরু

করল। চীনারা বোঁচা নাক নিয়ে এত কিছু কীভাবে করে, তা তাঁর মাথায়ই এল না। তাঁর নিজের নাকও বোঁচা। কই, তিনি তো কম্পিউটারের ক-ও বোঝেন না। তা ছাড়া কম্পিউটার সরানোর আসল কারণটাও তিনি বের করতে পারছেন না।

হঠাৎ আবুল বলল, ‘খালুজান, আমার মনে হয় হলের আপাগো মধ্যে কোনো মিলমিশ নাই। তারা নিজের কম্পিউটার নিয়ে নিজের মতো থাকে। এর জন্যই একটা রাইখা বাকিগুলো সরায় দিচ্ছে।’

আবুলের কথা শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধা চলে এল ফরিদ সাহেবের। এই সামান্য ব্যাপারটা তাঁর মাথায়ই আসেনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন, অথচ হলের মেয়েদের মধ্যে ঐক্য থাকবে না, এটা কেমন কথা! হল কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি আছে বলতে হবে। এক রুম এক কম্পিউটার। সবাই মিলেমিশে এক কম্পিউটার ব্যবহার করলে সময়জ্ঞান, দায়িত্বজ্ঞান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। এতে মেয়েদের মধ্যে একতাও বাড়বে আবার বিদ্যুৎও কম খরচ হবে। আহা! কী অসাধারণ বুদ্ধি। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এই পরিকল্পনায় ফরিদ সাহেব চমৎকৃত হলেন। তা ছাড়া আসল কারণটা বুঝতে পেরে তাঁর মনটাও আনন্দে ভরে গেছে। কিন্তু এখন তো আবার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে। এক রুমে শুধু তিনটা কম্পিউটারই নয়, কারও ল্যাপটপ থাকলে সেটাও রাখা যাবে। নাহ! এ জাতিকে আর ঐক্যবদ্ধ করা গেল না। ফরিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আদনান মুকিত

সূত্রঃ প্রথম আলো, এপ্রিল ০৬, ২০০৯

96) কোট গায়ে মেয়েটি

ওই যে মেয়েটি, শিল মাছের চামড়ার কোট গায়ে দিয়ে ঘোরে। ওকে সবাই জানে, বেশ শান্ত-শিষ্ট, অবলা। কিন্তু সময় বদলায়, সেই সঙ্গে মানুষও বদলায়।

একবার মস্কোর গণ-আদালতে একটি মামলা উঠেছিল। একটি মেয়ের হ্যান্ডব্যাগ ছিনতাইয়ের অপরাধে একটি যুবক ধরা পড়েছিল। মামলা তারই বিরুদ্ধে। অবশ্য ছিনতাইকারী যুবক তার দোষ স্বীকার করেছিল।

আদালতে জজ সাহেবকে সে অকপটে বলেছিল,

‘হুজুর, আমি পায়রা পুষে থাকি। পাড়ার ছেলেরা আমার একটা দামি টারম্যান পায়রার সঙ্গে তাদের বাজে পায়রা মিশিয়ে দিয়ে সেটা হাতিয়ে নিয়েছে বুঝতে পেরে আমার খুব রাগ হলো। আবার একটা কিনতে হবে। আমি তাই আমার বন্দুকটা নিয়ে পাড়ার গলিতে ঢুকলাম। অবশ্য কাউকে জখম করার মতলব ছিল না আমার। হঠাৎ নজরে পড়ল এক সুবেশা তরুণী, হাইহিল জুতো পরা, ব্যাগ ভর্তি কী যেন নিয়ে চলেছে। গায়ে শিলের চামড়ার কোট। ওর হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগও রয়েছে। আমার মনে হলো, আমি যদি ওকে ভয় দেখাই, তবে ও ভয়ে বসে পড়ে চিৎকার শুরু করবে। আর মজা করতে আমি তা-ই চাই।’

এই পর্যন্ত বলে যুবকটি আদালতে বসা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখাল, ‘ওই যে কোট গায়ে বসে আছে, ওই মেয়েটি।’

আবার বলতে লাগল আসামি যুবক। ‘ওই মেয়েটি সামনের একটা বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াল কলবেলটা টেপার জন্য-হ্যাঁ, ওর ওই বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে। আর বড় ব্যাগটা ওর হাতেই রইল। হাতে ছোট হ্যান্ডব্যাগটা থাকায় বেল টিপতে অসুবিধে হবে দেখে ও ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। আমি সেই ফাঁকে চুপিসারে ওর পেছনে গিয়ে চট করে ব্যাগটা নিয়েই দে চম্পট। রাস্তায় কোনো লোক ছিল না। আমি বেশ খানিকটা দৌড়ে এসে পেছন ফিরে দেখি ওই মেয়েটাও আমার পিছু নিয়েছে। হাতের বড় ব্যাগটা রেখে দিয়ে আমার পেছনে দৌড়াচ্ছে। ভালো করে যাতে দৌড়াতে পারে তাই কোটের সামনের বোতামগুলো খুলে দিয়েছে। তবুও ও মেয়েছেলে, আমার সঙ্গে পারবে কেন দৌড়ে।

আমি আরও জোরে দৌড়াতে লাগলাম। সামনে একটা ইটের প্রাচীর দেখে তার ওপরে লাফিয়ে উঠলাম। প্রাচীরটা, হুজুর, খুবই সরু ছিল। আপনিও চলতে গেলে উল্টে পড়ে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রাচীরে উঠে দেখি ওই মেয়েটাও প্রাচীরে উঠে আমাকে ধাওয়া করছে। তখন কী করি? প্রাচীরের ওদিকে ছিল একটা ডাস্টবিন। পড়িমরি করে লাফ দিয়ে পড়লাম ওই ডাস্টবিনের মধ্যে। কাছেই ছিল একটা গুদাম। তাড়াতাড়ি উঠলাম তার চালের ওপর। এবার

মনে মনে ভাবলাম, এইবার ঠিক জন্ম। একে মেয়েছেলে, তার ওপর পায়ে ছিল হাই হিল জুতো। গায়ে চামড়ার কোট, কাজেই আর এগোতে হচ্ছে না বাছাধনকে। কিন্তু বলব কী, হুজুর, ওই মেয়েটি প্রাচীর থেকে দিব্যি ঝাঁপ দিল ওই ডাস্টবিনের মধ্যে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে ও-ও উঠল গুদামের চালে। অবশ্য সে জন্য ও ওর পরনের স্কার্টটাকে একটু তুলে ধরেছিল মাত্রই। বুঝুন, চালটা প্রায় আট নয় ফুট উঁচু। তখন কী করি, দিলাম ঝাঁপ গুদামের চাল থেকে। যাক, এবার বাঁচোয়া। ছাই! দেখি ওই মেয়েটাও চাল থেকে লাফিয়ে পড়েছে। ওর জুতোর হিল দুটিই ভেঙে গেল। তাতে ওর আরও ভালো হলো। আমি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে দেখি ও-ও ঠিক দৌড়াচ্ছে আমার পেছনে পেছনে। এ তো মহা বিপদ হলো! হাঁপিয়েও পড়েছি। আর যেন দৌড়াতেও পারছি। এখুনি হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। যাক, দেখলাম কাছেই পাহাড়-প্রমাণ কয়লা গাদা করা রয়েছে এক জায়গায়। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে কয়লার ঢিপির একটা গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে লুকোলাম। যাক, মেয়েটা আর আমাকে খুঁজে পাবে না। ভুল। ঠিক, আমাকে খুঁজে বের করল ওই মেয়েটা। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে হিড়হিড় করে টেনে বের করল আমাকে কয়লার ঢিবির গর্ত থেকে। আর এইসা চেপে ধরল আমাকে যে অনেক চেষ্টা করেও ওর হাত থেকে ছাড়া পেলাম না আমি। তারপর আর কী, আমাকে টেনে নিয়ে হাজির করল থানায়।’

গণ-আদালতের হাকিম তাঁর গোঁফের আড়ালে মৃদু হেসে পায়রা কারবারি যুবকটির কথা সব শুনলেন। তারপর বাদী মেয়েটিকে বললেন, ‘তোমার কিছু বলার আছে?’ মেয়েটি উত্তরে বলল, ‘ওই আসামি যা বলেছে সবই সত্যি।’ তারপর ব্যঙ্গ করে বলল, ‘ওই ছোড়া আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেটাই আমার আত্মসম্মানে লেগেছিল। যদি আমার পায়ে হাই হিল জুতো না থাকত আমি হলপ করে বলতে পারি প্রথম ৫০ ফুটের মধ্যেই ওকে আমি পাকড়াও করে ফেলতাম। আমি কয়েক বছর ধরেই স্পোর্টসে সব বিষয়ে বিজয়িনী চ্যাম্পিয়ন।’

মেয়েটি তার নাম বলতেই আদালতের সবাই চমকে উঠল। সোভিয়েত স্পোর্টস ক্লাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ ওই চামড়ার কোট গায়ে নিরীহ দেখতে মেয়েটি। অনুবাদঃ কুমারেশ ঘোষ মাত্ভেই রাইসমানঃ রাশিয়ান লেখক।

সূত্রঃ প্রথম আলো, এপ্রিল ০৬, ২০০৯

97) নরসুন্দর

মাঝারি গোছের চাকুরে ইমরান আহমেদ। ত্রিশের ওপর বয়স। রোজ রোজ দাড়ি-গোঁফ কামানোর ঝামেলাটা তিনি নিজেই পোহান। কিন্তু চুল ছাঁটাতে নরসুন্দরের কাছে ধরনা না দিয়ে উপায় কী? বাসা থেকে কিঙ্কর শীলের সেলুন হাঁটা দূরত্বের পথ। চুল ছাঁটতে তাই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হন ইমরান। সকাল নয়টার মতো বাজে, এর মধ্যে সেলুনের কাঁচি, ক্ষুর ও চিরুনিগুলো সচল হয়ে উঠেছে। সেলুনের চারটি চেয়ারেই গ্যাঁট হয়ে আছে খদ্দের। তবে ইমরান সাহেবের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এ মুহূর্তে সেলুনের অপেক্ষমাণ খদ্দের বলতে তিনি একাই। ইমরানকে দেখে পান রাঙানো দাঁত বের করে কিঙ্কর বলে, ‘আদাব, দাদা। ভাবি আর ছেলেটা ভালো তো? দুই মিনিট বসেন, পত্রিকা পড়েন।’ তোতা পাখির মতো কথাগুলো আওড়ায় কিঙ্কর। অভ্যাসবশে অকারণে ক্যাঁচাক্যাঁচ শব্দে কাঁচি চালায় সে। মন দেয় খদ্দেরের চুল ছাঁটায়। ইমরান এক নজর দেখেই বোঝেন, কাজটা কেবল ধরেছে কিঙ্কর। নির্ঘাত মিনিট বিশেকের ফের। তা লাগুক। পত্রিকা পড়তে পড়তে চলে যাবে এটুকু সময়। কিঙ্করের দোকানে একাধিক পত্রিকা রাখা হয়। সবই স্বল্পমূল্যের দৈনিক। এসব পত্রিকা রেখে এক টিলে দুই পাখি মারে সে। খদ্দেরের সময় কাটে, একই সঙ্গে চুল-দাড়ির জঞ্জাল নিকেশের অবলম্বন হয়। স্নেফ সময় পার করতেই একটা পত্রিকা তুলে ওল্টাতে থাকেন ইমরান। এমন সময় দ্বিতীয় খদ্দেরের আগমন ঘটে। ইমরানের পাশের আসনটি সে দখল করে নেয়। তাকেও সাদর সম্ভাষণ জানায় কিঙ্কর। তা দেখে ইমরানের উসখুস শুরু হয়। কিঙ্কর এ সেলুনের সেরা ক্ষৌরকার। কাজেই খদ্দেররা তাকে দিয়েই কাজ সারাতে চায়। লোকটার সঙ্গে কিঙ্করের

বেশি খাতির কিনা কে জানে। কথায় বলে ‘নাপতে বুদ্ধি’। পছন্দের লোককে আগে সুযোগ দিতে কিঙ্কর এমন প্যাঁচ কষবে, তা উতরানো ইমরানের কস্ম নয়।

লোকটা যাতে কিঙ্করের কাছ থেকে কোনো সুবিধা বাগাতে না পারে, এ জন্য কৌশলে নিজের অগ্রাধিকারের বিষয়টি জানান দেন ইমরান। তিনি বলেন, ‘কই কিঙ্করদা, তোমার দুই মিনিট শেষ হতে আর কতক্ষণ লাগবে?’ ‘আরেকটু কষ্ট করেন, দাদা। এই তো হইয়া আসছে।’

কমপক্ষে আরও ১০ মিনিট অপেক্ষা। তা হোক, ইমরানের কৌশল কাজে লেগেছে। অপেক্ষমাণ দ্বিতীয়জন আরেক ক্ষৌরকারের উদ্দেশে বলে, ‘অবিনাশ দা, এর পরই কিন্তু আমি।’

অবিনাশ কথা না বলে হাসে। হাসিতে সম্মতি। সেলুনে কিঙ্করের পরই অবিনাশের স্থান।

লোকটা তা ভালো করে জানে। বাকি দুই ক্ষৌরকার কার্তিক ও শিবুর মধ্যে প্রথম জনের চুল ছাঁটা তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু শিবুর হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। ইমরানকে ফুসলে একবার চুল কাটার যন্ত্র দিয়ে ‘কঠিন’ এক ছাঁট দিয়েছিল সে। বাড়ি ফেরার পর গিন্নি রেগে আগুন, ‘তোমার এ সর্বনাশ করল কে?’ হাটবাজারে পকেটমার ধরা পড়লেও তো এ অবস্থা হয় না!’

সেই থেকে শিবু সম্পর্কে ইমরান সতর্ক। অন্যরাও যে সতর্ক, এর জোরালো প্রমাণ মিলল আরেকজন খদ্দেরের আগমনে। সেও নির্দিধায় শিবুকে বাদ দিয়ে কার্তিককে রাজি করাল তার জন্য। এর মধ্যে অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে। শেষ হয়ে এসেছে কিঙ্করের খদ্দেরের চুল ছাঁটা। কাঁচি আর সরু চিরুনির শেষ ধাপ চলছে বুপোচুলোর মাথায়। সহসা একটা বাজখাঁই কণ্ঠ!

‘কী রে কিঙ্কইরা, তোর গায়ে আইজকাইল মনে হয় চর্বি জইমা গেছে!’

শুধু কিঙ্কর নয়, সেলুনের সব মানুষ এ কণ্ঠে হকচকিয়ে যায়। কারুকাজ করা লাল পাঞ্জাবি পরা এক মোছুরা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে। বিশাল বপুর সামনে পেল্লাই ভুঁড়ি। ভুঁড়িওয়ালা এ মহল্লায় অতি পরিচিত। তার আঙ্গুলের তুড়িতে অনেক কিছু হতে পারে, যা বেশির ভাগ

ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক নয়।

ভুঁড়িওয়ালার ধমকে চিরুনি-কাঁচি পড়ে গেল
কিঙ্করের হাত থেকে। এমনভাবে সে হাসল,
যেন বহু কষ্টে একটা বেগ সামলাচ্ছে।

‘কাইল যে খবর দিলাম, বাসায় গেলি না ক্যান?’
‘শরীরটা খারাপ ছিল, দাদা। আজ যাব।’

‘যাব কী রে ব্যাটা, এখনই যা। পোলাটা অপেক্ষা
করতাকে।’

‘এখনই যাইতেছি, দাদা।’

এই বলে সত্যি সত্যি চুল কাটার সরঞ্জাম নিয়ে
কিঙ্কর রওনা হলো ভুঁড়িওয়ালার বাড়ির দিকে।
ইমরান পড়ে গেলেন মহা মুশকিলে। শূন্য থেকে
আছাড় আর কি! বাকি তিন নরসুন্দরের মধ্যে
অবিনাশ আর কার্তিক দখল হয়ে গেছে। বাকি
আছে শিবু। ইমরানকে এখন শিবুর হাতেই চুল
কাটাতে হবে। এর মধ্যে শিবুর কাজও শেষ
হয়ে এসেছে। আর তিন-চার মিনিট লাগবে।
এমন সময় এক মুঠি আশার আলো নিয়ে
আরেকজন খদ্দের হাজির।

হঠাৎ কোনো জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে,
এমন ভঙ্গিতে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসেন
ইমরান। মনে মনে নতুন খদ্দেরের উদ্দেশে
তিনি বলেন, ‘যা বেটা, ছিল্লা মুরগি সাজ গে
শিবুর হাতে।’

ইমরান মিনিট দশেক কাটানোর মতো একটা
উপায় খুঁজতে থাকেন। এর মধ্যে নতুন
খদ্দেরকে বসিয়ে সাদা কাপড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে
আটকে চুল কাটা শুরু করবে শিবু। ইমরানকে
আবার বসে থাকতে হবে অবিনাশ বা কার্তিকের
হাত খালি হওয়ার অপেক্ষায়। তবু ভালো।
শিবুর হাতে ‘পকেটমার’ সাজার চেয়ে তো
ভালো।

একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েন ইমরান।
মিনিট দশেক পার করে দেন চা পানে। তারপর
আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে আসেন। এবার একটু
পা চালিয়েই হাঁটেন তিনি। দেরি হলে ভিড়ের
চক্রে পড়তে হবে। তখন অপেক্ষার পালা বেড়ে
যাবে আরও।

সেলুনে ঢুকে হকচকিয়ে যান ইমরান। ওকে
দেখা মাত্র একটা উল্লাস উথলে উঠেই থেমে
যায়। শিবু দাঁত বের করে বলেন, ‘আসেন দাদা,
আসেন। আপনার জন্য তেনাদের আটকাইয়া
রাখছি। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না আপনে

ফিরা আসবেন।’

সেলুন এরই মধ্যে ভরে উঠেছে খদ্দরে। তাদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ইমরানের দিকে তাকিয়ে। কাঁধের তোয়ালে দিয়ে শিবু খদ্দরের আসন ঝাড়তে ঝাড়তে ইমরানকে আবার আমন্ত্রণ জানায়, ‘কী হইল দাদা, আসেন। অনেক কাস্টমার অপেক্ষা করতাকে।’ ইমরানের ইচ্ছা নেই, তবু পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে যায় শিবুর দখলে থাকা আসনটির দিকে।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৩, ২০০৯

98) হারানো রেবা

পয়লা বৈশাখে ঘুরতে এসে হারিয়ে গেলে দেওয়া হবে এই স্পেশাল সেবা। হারানো সেবা পেতে রেজিস্ট্রেশন করুন আপনার কিংবা অন্য যে কারও মোবাইল ফোন থেকে। রেজিস্ট্রেশন করতে টাইপ করুন ‘কই আইলাম’ আর সেভ করুন ৯৬৯৬ নম্বরে। সেবাটি সম্পর্কে আপনাদের জানাচ্ছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দধরা যাক, এই বিজ্ঞাপন দেখে হারিয়ে যাওয়া একজন এই সেবা পাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করল।

তার পরের কল্লিত কথোপকথন-

: অভিনন্দন আপনাকে।

- কী! আমি হারায়া গেছি, আর আফনে কন অভিনন্দন?

: না না, তা নয়। হারানো সেবা সার্ভিসে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

- ওই সব রাখেন। এখন কী করুম হেইডা কন।

: ওয়েল! প্রথমেই আমি জানতে চাইব আপনি কতজন সঙ্গীকে হারিয়েছেন। একজন হলে এক চাপুন, দুজন হলে দুই চাপুন, তিনজন হলে...

- থামেন, থামেন। ১১ হইলে কত চাপুম হেইডা কন?

: মাই গুডনেস! ১১, থাক থাক, আপনাকে আর কিছু চাপতে হবে না। তা, আপনি ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, নাকি ক্রিকেট টিমের প্র্যাকটিসে যাচ্ছিলেন?

- ফাউ প্যাঁচাল রাখেন, এখন কী করুম হেইডা কন।

: ওয়েল। এবার জানতে চাইব আপনার পাঞ্জাবির রং সাদা হলে এক চাপুন, কালো হলে

দুই চাপুন, নীল হলে...

- মেরুন, মেরুন রঙের, কত চাপমু?

: থাক, আপনাকে আর কষ্ট করে চাপতে হবে না। আমি বুঝে নিচ্ছি।

- এখন? এখন কী করুম?

: আপনার আশপাশে কোনো ওজন মাপার যন্ত্র থাকলে এক চাপুন, না থাকলে দুই চাপুন...

- ভাই, ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে কী হবে?

: আছে আছে, দরকার আছে। আপনার ওজন মাপতে হবে।

- কিন্তু আমি তো আমার ওজন জানি।

: ওয়াও! ভেরি গুড। আপনার ওজন ১০ কেজি হলে এক চাপুন, ২০ কেজি হলে দুই চাপুন...

- কী কন আফা! আমার ওজন ৫৫ কেজি।

: ওহ! এবার এক চাপুন যদি আপনার গায়ের রং কালো হয়, দুই চাপুন যদি সাদা হয়, তিন চাপুন যদি...

- শ্যামলা, শ্যামলা। এখন কী করুম।

: আপনার আশপাশে কোনো মাইকের দোকান থাকলে এক চাপুন, না থাকলে...

- আছে আছে।

: সোজা সেখানে যান, তারপর একটি মাইক ভাড়া করে আপনার গায়ের রং, ওজন, পাঞ্জাবির রং, যে ১১ জনকে হারিয়েছেন তাদের নাম ইত্যাদি বলে মাইকিং করা শুরু করুন।

- ওয়াও! কী বুদ্ধি দিলেন, রাখি আপা, রাখি তাইলে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৩, ২০০৯

৭৭) রান তো আর উড়ে উড়ে নেওয়া যায় না

সাকিব আল হাসান

খুব বেশি কথা নাকি তিনি বলেন না, এমন একটি জনশ্রুতি আছে। নিন্দুকের মুখে ছাই ঢেলেই যেন গড়গড় করে বলে গেলেন মজার সব কথা। কে বলবে, এই ছেলেটিকে সবাই অন্তর্বিমুখ বলে! আলোচনায় এসে নিজেকে প্রমাণ করলেন 'রসিক সাকিব' হিসেবে। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপাআপনিই যে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, প্রমাণ করুন।

- প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সৃষ্টিকর্তাকে।

তারপর আমার কৃতজ্ঞতা আমার পরিবার, টিমমেট...

আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। অন্য একটি প্রশ্ন

করি। জাতীয় দলের অধিনায়ক হতে পারেন, এমন কোনো যোগ্যতা আপনার আছে?

- আমি মোটামুটি সঠিকভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারি।

কে বেশি জনপ্রিয়? নায়ক শাকিব খান, নাকি ব্যাটসম্যান সাকিব আল হাসান?

- এ ব্যাপারে সামান্য Doubt আছে। তবে জানেন তো, Benefit of Doubt সাধারণত ব্যাটসম্যানই পেয়ে থাকেন।

কোনটা বেশি উপভোগ করেন? ফিল্ডিং করা, না ফিল্ডিং মারা?

- আপনি শুধু পেশাটাই দেখলেন, আমার বয়সটা দেখলেন না?

যিনি ব্যাটিং করেন তাঁকে ব্যাটসম্যান কেন বলা হয়? Batma☆ বললে কী হয়?

- দৌড়ে দৌড়ে রান নিতে হয় রে ভাই! উড়ে কী আর নেওয়া যায়?

বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ। শেষ দুই ওভারে ৭২ রান দরকার। ক্রিজে আছেন আপনি। সঙ্গী হিসেবে কাকে আশা করবেন?

- জুয়েল আইচকে।

কিসের অভাবে বিশ্বসেরা স্পিনার হতে পারছেন না বলে মনে করেন?

- মুরালিধরনের মতো দুটি চোখ, যা দিয়ে দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাটসম্যানের খুঁতগুলো দেখতে পাওয়া যায়।

আপনার এক ওভারের ছয় বলে কেউ ছয়টি ছক্কা পেটালে কী করবেন?

- ঘুমটা কখন ভাঙবে সেই অপেক্ষা করব।

আপনি জানেন যে আপনি আউট হননি। তার পরও যদি আম্পায়ার উইকেট নির্দেশক আঙুল উঁচিয়ে তোলেন, আপনার কী করতে ইচ্ছা করে?

- চিৎকার দিয়ে ‘খেলুম না! আলাব্বু!!’ বলে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কী হিসেবে বেশি খেলেছেন, ব্যাটসম্যান, নাকি বোলার?

- দুধ-ভাত।

শচীন টেন্ডুলকার যদি আপনার কাছে টিপস চাইতে আসেন, আপনি তাঁকে কী টিপস দেবেন?

- সবার আগে বলব, যেন নামটা বদলে সাকিব আল হাসান রাখেন। আর যা-ই হোক, রেকর্ড

বুক একটা স্মার্ট লুক পাবে, কী বলেন?

উইকেটরক্ষক উইকেট রক্ষা না করে ভাঙতে

এত ব্যস্ত থাকেন কেন?

- নইলে সতীর্থ খেলোয়াড়েরা যে তাঁর মাথা

ভাঙবে, এটা তাঁর জানা আছে।

কোন জিনিসটা আয়ত্তে আনতে পারলেই

বাংলাদেশ দল নিয়মিত জয়ের দেখা পাবে?

- আম্পায়ারের আঙুল।

ব্যাটসম্যানরা রানার নিতে পারলেও বোলার

কেন তা পারেন না?

- রানার দিলে শেষে থ্রোয়ারও চেয়ে বসতে

পারেন। মানুষের স্বভাব তো! অল্পে খুশি না।

ইদানীং বিভিন্ন পণ্যের মডেল হিসেবে আপনাকে

দেখতে পাওয়া যায়। কী করতে আপনার বেশি

ভালো লাগে? খেলতে, নাকি মডেলিং করতে?

- ফালতু সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৩, ২০০৯

100) আমার স্ট্রেচারি

আমার নাম উসাচেভ-ভালেন্তিন গ্রেগরিয়েভিচ

উসাচেভ। আমি একজন চিত্রশিল্পী। আমার

আঁকা ছবি প্রায় সব প্রদর্শনীতেই দেখানো হয়।

আমাকে সবাই সৎ আর সম্মানীয় ব্যক্তি বলেই

জানে। অনেক দিন ধরেই আমার নিজের

ধারণাও তা-ই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার মনে

সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ব্যাপারটা হচ্ছে, এখনো আমাদের মধ্যে এমন

লোকও আছে, যাদের ব্যবহারে আমাকে বাধ্য

হয়ে সৎ পথ আর শান্তির পথ ছেড়ে অন্য পথে

যেতে হয়।

গত বছরই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। আমার

মেয়ে আনার অসুখ হলো। ডজনখানেক ডাক্তার

দেখানো হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শেষে একজন পরামর্শ দিল কর্ণরোগ-বিশারদ

ডাক্তার দেখাতে। তিনি আমার অজানাও নন।

কানের রোগ ধরতে তিনি ওস্তাদ।

আমি কর্ণরোগ-বিশারদকে ফোন করলাম। মনে

হলো, বিখ্যাত যাঁরা, তাঁরা নিজেরা ফোন ধরে

উত্তর দেন না। এক মিহি গলার মহিলা

জানালেন, তিনি তো এখন খুবই ব্যস্ত।

শিগগিরই যে আপনার কেসটা দেখতে পারবেন,

তা বলেও মনে হয় না। ঠিক সেই সময় আমার

বন্ধু ভূতভবিদ ইভান নিকোলায়েভিচ এসে

উপস্থিত। আমি তাকে ব্যাপারটা বললাম। দুজন

বসে পরামর্শ করলাম, আনার কানের অসুখের বিষয়ে কী করা যায়।

হঠাৎ ভূতত্ববিদ লাফিয়ে উঠল, হয়েছে, হয়েছে।

ওই ডাক্তারের ফোন নম্বরটা দে তো। আমি তাঁকে ফোন করব। মনে হয়, তিনি আর আপত্তি করবেন না।

-ওঁকে চিনিস নাকি?

আমি বন্ধুকে ফোন নম্বরটা দিলাম, যদিও জানি, সে কিছুই করতে পারবে না।

ভূতত্ববিদ ফোনে বলতে লাগল, এটা কি প্রফেসর এনের বাড়ি? আমি চিত্রশিল্পী উসাচেভের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফোন করছি। উনি খুবই চিন্তিত হয়েছেন...ডক্টর... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভূতত্ববিদ জানাল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কর্ণরোগ-বিশারদ আসছেন।

-তার মানে?

-মানে সোজা। তোর মেয়ের কান দেখতে আসছেন।

-তা তো বুঝলাম। কিন্তু কেন? কী করে?

-অত জেরা কোরো না বাপু।

তবে বলল, ব্যাপারটা খুবই সহজ-সরল। এখনো এমন অনেক লোক আছে, সোজাসুজি কোনো কিছু পছন্দ করে না। ভড়ং চায়। উপাধিহীন লোকের গান-বাজনা ছবি বা লেখা সবকিছুই ওদের কাছে বাজে, বাতিল। আবার উপাধির চেয়েও বড় হচ্ছে প্রাইভেট সেক্রেটারি। প্রাইভেট সেক্রেটারি যার নেই, সে কিসসু নয়। আর যার আছে, সে-ই ভিআইপি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমার ঘরটা পরিষ্কার করার দরকার হলো। আমি মস্কোর সব জায়গায় ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম। কেউ আসতে রাজি হলো না। শেষে মতলব খাটলাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে এক নামকরা ক্লিনিং সংস্থাকে ফোন করলাম, যদিও আমি নিজে গিয়েও তাদের আসতে রাজি করাতে পারিনি।

-হ্যালো, আমি চিত্রশিল্পী উসাচেভের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফোন করছি। তিনি জানতে চাইছেন...

আমাকে তাঁরা থামিয়ে দিলেন। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তাঁর নির্দেশমতো সবকিছুই হবে।

আমাদের কাজে তিনি খুশিই হবেন আশা করি।’
এরপর আমার কোট-প্যান্ট ড্রাই ক্লিনারের কাছে
কাচাতে নিয়ে গিয়ে নিজেকে উসাকেভের
প্রাইভেট সেক্রেটারি বলেই পরিচয় দিয়েছি।
তাতে খাতির পেয়েছি। এভাবে করতে করতে
শেষ পর্যন্ত এমন হলো, নিজের কাছে নিজেকেই
ছোট মনে হতে লাগল, আমার সেক্রেটারি
আমার কাছে বড় হলো। আমিই নিজেকে বলতে
লাগলাম, উসাকেভ, তোমার প্রাইভেট
সেক্রেটারির কাছে তুমি একটা অকর্মার ঢেঁকি।
ক্রমে আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে খাতির
পেতে লাগলাম। অনায়াসে অপেরার টিকিট
পেতে লাগলাম। গৃহ-সংস্থাকে দিয়ে আমার ঘর
সাজিয়ে নিতে পারলাম। নিয়মিত খবরের
কাগজ পাওয়া গেল-আর সবই আমার ওই
অস্তিত্ব না থাকা প্রাইভেট সেক্রেটারির কৃপায়।
আমার সেক্রেটারি কখনো বেআইনি কিছু
করেনি। তবে আইনত কোনো কিছু না পেলে
তখনই আমি প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্য
নিতাম।

অবশ্য মাঝেমধ্যে তাকেও হার মানতে হতো।
শুনতে হতো, কমরেড উসাকেভকে জানাবেন, এ
কাজটা করা গেল না বলে দুঃখিত।

তবে বেশির ভাগ কাজই যে কীভাবে হাসিল
করত, তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারতাম
না।

যাক, তোমাদের সময় আর বেশি নষ্ট করব না।
আমাকে আবার বাড়ি যেতে হবে। আমি থাকি
তো শহরের বাইরে। একটা ট্যাক্সি ডাকা
দরকার। যদি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ফোন করে বলি,
একটা ট্যাক্সি পাঠিয়ে দাও তো এই ঠিকানায়,
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসবে, স্ট্যান্ডে কোনো ট্যাক্সি
নেই। শিগগির পাওয়াও যাবে না।

অগত্যা আমাকে রিসিভার নামিয়ে তখনই আবার
ফোন করতে হবে ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে: শিল্পী
উসাকেভের প্রাইভেট সেক্রেটারি কথা বলছি।
এই ঠিকানায় একটা ট্যাক্সি এম্ফুনি দরকার
তাঁর। ...কী, মিনিট পনেরোর মধ্যে আসবে? ঠিক
আছে।

কাজেই এখন বুঝতে পারছ, আমার সেক্রেটারি
কী দরের লোক। একেবারে শয়তানের
যাসু গ্রিগরি রিকলিন

অনুবাদ: কুমারেশ ঘোষ

গ্রিগরি রিকলিন: রাশিয়ান রম্য লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৩, ২০০৯

101) খাঁজকাটা

ভীষণ গরম পড়েছে আজ। সবাই ঘেমে নেয়ে অস্থির। ক্লাসরুমের বাইরের দিঘিটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে শিক্ষককে। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। তাই আজ পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি ক্লাসের সবাইকে বললেন রচনা লিখতে। যার যা মনে আসে, সে তার ইচ্ছেমতো ওই বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে। সবাই লিখতে শুরু করল। শিক্ষক আরাম করে চেয়ারে বসে একটা খাতা দিয়ে বাতাস করছেন নিজেকে। একে একে সবাই খাতা জমা দিল। শিক্ষক সবারটা দেখলেন। কেউ লিখেছে গরু, কেউ বিদ্যালয়, কেউ বা আমাদের গ্রাম, বাজার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এদের মধ্যে এক ছেলে রচনা লিখেছে কুমির নিয়ে। অন্য রকম বিষয় দেখে নড়েচড়ে বসলেন শিক্ষক। ছেলেটা লিখেছে কুমির উভচর প্রাণী।

কুমিরের আছে দুটি চোখ, একটি নাক, দুটি কান ও চারটি পা। আর বিশাল একটা মুখ এবং দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো। কুমিরটির সারা দেহে খসখসে শক্ত চামড়ার আবরণ রয়েছে। আর আছে বিশাল লম্বা একটি লেজ। সেই লেজে আছে খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা...

শিক্ষক হুঙ্কার দিলেন-এই বদমাশ, এগুলো কী লিখেছিস! এত খাঁজকাটা কেন? জবাবে ছাত্র বলল, 'স্যার, অনেক লম্বা লেজ তো, তাই অনেক বেশি খাঁজকাটা।'

শিক্ষক বললেন, 'হয়েছে, তোর আর কুমির নিয়ে রচনা লিখতে হবে না। কালকে গরু নিয়ে রচনা লিখে আনবি।'

পরদিন ছাত্র ২০ পৃষ্ঠার একটা রচনা এনে শিক্ষককে দিল। শিক্ষক তো অবাক! গরু নিয়ে ছেলেপেলেরা আধা পৃষ্ঠা লিখতে পারে না, আর এই ছেলে ২০ পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছে! পড়তে শুরু করলেন তিনি...

গরু একটি গৃহপালিত প্রাণী। তার দুটি চোখ, দুটি কান, চারটি পা, দুটি শিং ও একটি লেজ আছে। গরু অনেক নিরীহ একটি প্রাণী।

আমাদের একটি গরু ছিল, তার গায়ের রং ছিল

ধবধবে সাদা। রোজ বিকেলে রাখাল তাকে ক্ষেতে চরাতে নিয়ে যেত। একদিন রাখাল তাকে নদীর ধারে চরাতে নিয়ে গেল। হঠাৎ সেই নদী থেকে একটি কুমির উঠে এসে গরুটিকে কামড়ে নদীতে নিয়ে গেল। সেই কুমিরের ছিল দুটি চোখ, দুটি কান ও চারটি পা। তার ছিল বিশাল একটা মুখ, তার দাঁতগুলো ছিলো ভীষণ ধারালো। কুমিরের সারা দেহে ছিল খসখসে শক্ত চামড়া, আর ছিল বিশাল লম্বা একটা লেজ। সেই লেজে ছিল খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা... খাঁজকাটা...

এরপর শিক্ষক যতই পৃষ্ঠা উল্টান সব পৃষ্ঠাতেই খাঁজকাটা লেখা। চিৎকার দিয়ে ডাকলেন তাকে। ‘হতভাগা, কী লিখেছিস এসব’?!

জবাবে ছাত্র বলল, ‘স্যার, অনেক বড় লেজ তো, অনেক বেশি খাঁজ।’ শিক্ষক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘ঠিক আছে, তুই কালকে ‘আমাদের বাড়ি’ নামে একটা রচনা লিখে আনবি।’

যেই কথা সেই কাজ। পরদিন ছাত্র বিপুল উদ্যমে ৩৪ পৃষ্ঠার রচনা লিখে আনল। শিক্ষকের হাতে দিতেই তিনি শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছাত্রের দিকে তাকালেন। এবার পৃষ্ঠা আরও বেশি, খাতা আরও ভারী, হবেই বা না কেন! একটা বাড়ির ওজন তো আর কম নয়। খাতার মধ্যে আমাদের বাড়ি লিখলে তার ওজন তো বেশি হবেই। খুশি মনে পড়তে শুরু করলেন তিনি। আমাদের বাড়িটি গ্রামের মধ্যমণি। টিনের চালাঘেরা এই বাড়ির দেয়াল তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। আমাদের বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ রয়েছে। ফলের মৌসুমে পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে।

আমাদের বাড়িটি ঘিরে সব সময়ই মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যায়। গতবার বর্ষা মৌসুমে ভীষণ বৃষ্টি হলো। নদীর পানি উপচে বন্যা হয়ে গেল সব জায়গায়। পানি উঠল আমাদের বাড়িতেও। কোমরসমান পানি। সেই পানিতে একদিন সকালে দেখা গেল মস্ত এক কুমির। সেই কুমিরের ছিল দুটি চোখ, দুটি কান ও চারটি পা। তার ছিল বিশাল একটা মুখ, আর তার

দাঁতগুলো ছিল ভীষণ ধারালো। সেই কুমিরের সারা দেহে ছিল খসখসে শক্ত চামড়া আর ছিল বিশাল লম্বা একটা লেজ। সেই লেজে ছিল খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা... শিক্ষক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পাতার পর পাতা শুধু খাঁজকাটা লেখা। এই ছেলেকে যা-ই লিখতে দেওয়া হয়, তা-ই সে কুমির বানিয়ে ফেলে। ভাবতে বসলেন শিক্ষক, ‘নাহ্, এবার এমন কিছু নিয়ে লিখতে দিতে হবে, যাতে সে কুমির আনার সুযোগ না পায়।’ ডাকলেন তিনি ছাত্রকে, “এই পণ্ডিত, এদিকে আয়, কালকে তুই ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নিয়ে রচনা লিখবি।” ‘কিন্তু স্যার, পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে আমি তো কিছুই জানি না। আমাকে কিছুটা বলে দিন, বাকিটা আমি লিখতে পারব।’

শিক্ষক বললেন, ‘পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে, তখন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি থাকলেও তিনি তাঁর সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে গেছেন যুদ্ধে। নবাব জানতেন যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক, তার পরও তাঁকে যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে রাখাটাই ছিল তাঁর মস্তবড় ভুল...” এতক্ষণে ছাত্র চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, ‘হইছে স্যার, আমি পারমু বাকিটা। কাইলকাই আপনারে পলাশীর যুদ্ধ রচনা লেইখ্যা দিমু।’ শিক্ষক মনে মনে সন্তুষ্ট, বাপধন, এইবার তুমি কুমির পাইবা কই...

পরদিন ছাত্র ‘পলাশীর যুদ্ধ’ রচনা লিখে এনে দিল শিক্ষকের হাতে। ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

বাংলার বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে। তখন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি হলেও তিনি তাঁর সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে গিয়েছিলেন যুদ্ধে। নবাব জানতেন যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক। তার পরও তাঁকে সেনাপতি হিসেবে বহাল রেখে তিনি খাল কেটে কুমির এনেছিলেন। সেই কুমিরের ছিল দুটি চোখ, একটি নাক, দুটি কান ও চারটি পা। তার ছিল বিশাল একটা মুখ আর

দাঁতগুলো ছিল ভীষণ ধারালো। সেই কুমিরের সারা দেহে ছিল খসখসে শক্ত চামড়া আর ছিল বিশাল লম্বা একটি লেজ। সেই লেজে ছিল খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা খাঁজকাটা ...- সংগ্রহেঃ মাসুদুল ইসলাম, হাতিয়া, নোয়াখালী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

102) বোকা গেলুর কাণ্ড

এক গ্রামে এক বিধবা তার একমাত্র ছেলে গেলুকে নিয়ে থাকত। বয়স হলেও গেলুর মাথায় কোনো বুদ্ধি ছিল না। বিধবা অনেক কষ্টে ধারদেনা করে সংসার চালাত। কিন্তু এভাবে আর কত দিন। তাই সে ঠিক করল, গেলুকে ঢাকায় তার চাচার বাসায় পাঠাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন সকালে গেলু রওনা হলো ঢাকার উদ্দেশে। অনেক কষ্টে সে তার চাচার বাসায় পৌঁছাল। তখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। চাচা গেলুকে বলল, ‘যা গোসল করে আয়। অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছিস।’ ‘পুকুর কোথায়?’ গেলুর প্রশ্ন। চাচা হাসতে হাসতে তাকে বাথরুম দেখিয়ে বলল, ‘এটাই পুকুর।’ ভেতরে ঢুকে তো গেলু অবাক! এখানে তো কোনো পানি নেই। কী করবে সে? বাথরুমের যন্ত্রপাতি এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। গেলু হঠাৎ দেখে ওপর থেকে ঝামাঝাম পানি পড়ছে। থামছেই না। গেলু তার চাচা-চাচিকে ডেকে বলল, ‘সর্বনাশ! ওপর থেকে পানি পড়ছে। আমাদের গ্রামে তো মাটির নিচ থেকে পানি ওঠে।’ গেলুর কথা শুনে সবাই তো হেসে খুন। শহরে গেলুর ভালো না লাগায় সে কিছুদিন পর আবার গ্রামে ফিরে গেল। তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। সে শহরে সব জায়গায় টিউবলাইট দেখেছে। তাই সে মনে মনে ভাবল, ‘টিউবলাইট দিয়ে আলো জ্বালানো তো খুব সহজ, অথচ আমরা তা জানতাম না।’ তাই সে রাতের বেলা গ্রামের প্রায় সব কলাগাছ কেটে ভেতর থেকে বগলি (কলাগাছের ভেতরে অবস্থিত লম্বা, সাদা প্রায় টিউবলাইটের মতো অংশ) নিয়ে আশপাশে সব জায়গায় লাগাল। কিন্তু আলো জ্বলে না কেন? সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলু দেখে গ্রামের সবাই তার মায়ের কাছে বিচার দিতে এসেছে। তাদের কলাগাছ যে আর একটাও রাখেনি গেলু। গেলুর মন খারাপ। এত

কষ্টের পরও যে আলো জ্বালানো গেল না। –

সংগ্রহেঃ সুলতানা জাহান

পূর্ব মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

103) চতুর দুলাভাই ও তার বোকা সম্বন্ধীরা

এক গ্রামে এক কৃষক ছিল। তার ছয় পুত্র ও এক কন্যা। সবাই বোকা। কৃষকের অনেক জমিজমা ছিল। তা সত্ত্বেও বোকা হওয়ার কারণে কেউ কন্যাটিকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল না। তাই কৃষক গ্রামের এক রাখাল ট্যাপার সঙ্গে তার মেয়ে টেপির বিয়ে দেয়। ট্যাপা ছিল খুব বুদ্ধিমান।

বিয়ের কিছুদিন পর কৃষক মারা যায়। এদিকে ট্যাপা কৃষকের সব সম্পত্তি একা ভোগ করার জন্য নানা রকম বুদ্ধি আঁটতে থাকে। ট্যাপা তার গরু মাঠে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধত। আর গরুগুলো কৃষকের জমির ফসল নষ্ট করত। ছয় ভাই এসে তাকে বারণ করলেও সে আবার তা-ই করে। এর ফলে ছয় ভাই একদিন তার গরু জবাই করে তার বাড়ি পাঠায়। ট্যাপা এই দেখে পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন সে টেপিরে কয়, ‘এই টেপি, কাল সকাল সকাল ভাত রানবি, আমি এই মরা গরুর হাড় নিয়ে হাড়মুড়মুড়ির হাটে যাব।’ পরদিন সে হাড় নিয়ে রওনা হয়। রাস্তায় হঠাৎ এক ব্যক্তি তাকে বলে, ‘ভাই, আমার এই টাকার বস্তা ধরেন, আমি একটু ইয়ে করে আসি।’ লোকটি ট্যাপারে টাকার বস্তা দিয়ে ইয়ে করতে গেলে ট্যাপা তা নিয়ে বাড়ি চলে আসে। তখন সে টেপিরে কয়, ‘এই দেখ তোর ভাইরা তো আমার একটা গরু মারল, তার হাড়ের দাম এত, আর তোর ভাইগো মতো যদি বড় বড় গরু থাকত, তবে দেখতিস কত টাকা যে আনতাম!’ পরদিন সকালে টেপি গিয়ে তার ভাইদের এসব কথা বলে। সব শুনে তারা ট্যাপার ধারে সব শুনতে আসে। ট্যাপা কয়, ‘হ্যাঁ ভাইজান, হাড়মুড়মুড়ি হাটে হাড়ের জন্মের দাম। আর বেলা যত বেশি হবে, দাম তত বাড়বে।’ সব শুনে বলদ ছয় ভাই তো পরদিন সকালে নিজেদের গরু মেরে সেই মরা গরুর হাড় নিয়ে হাটে যায়। আস্তে আস্তে বেলা হতে থাকে, আর দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। সবাই তাদের বারণ করলেও তারা

শোনে না। তারপর হাটের লোকজন বিরক্ত হয়ে তাদের ধরে মার দেয়। তারা বাড়ি এসে ট্যাপার ওপর রাগ করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার ঘর পুড়িয়ে দেয়। ট্যাপা তখন টেপিরে কয় ছাই বস্তার মধ্যে ভরতে এবং সে ছাই মুড়মুড়ির হাটে যাবে। পরদিন সে হাটে রওনা দেয় এবং একজন লোক তার কাছে টাকার বস্তা রেখে ইয়ে করতে যায় এবং ট্যাপা তা নিয়ে বাড়ি চলে আসে। টেপি তার ভাই বাড়িতে গিয়ে বলে, ‘তোমরা তো আমার একটা ঘর পুড়াই দিছ, তাই তোমাগো জামাই কত টাকা নিয়ে আইছে। আর তোমাগে মতো যদি এত ঘর থাকত, তবে দেখতে কত টাকা আনত।’ সব শুনে ছয় ভাই ট্যাপার ধারে আসে এবং ট্যাপা বলে, ‘তোমরা হাটের দক্ষিণ দিকে বসবা এবং বাতাস আসলি ছাই উড়িয়ে দিবা। লোকজন যত বারণ করবে, তত বেশি উড়াবা।’ ছয় ভাই তো তার কথামতো হাটে গিয়ে কাজ করে। লোকজন ছাই ওড়াতে বারণ করলেও শোনে না। ফলে তারা ছয় ভাইকে ধরে মার দেয়। এদিকে তাদের আসতে দেখে ট্যাপা বাড়ি গিয়ে তাদের বউদের বলে যায় যে, ‘তোমাগে বাড়ি কয়ডা ভূত আসতিছে। তোমরা ইটপাটকেল গুছাই রাখো তারে মারার জন্য।’ ছয় ভাই বাড়ি আসলিই তাদের বউরা তাদের মারতে থাকে। তারপর অনেক বলার পর তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের স্বামী। তারা সবকিছু শুনে বুঝতে পারে, এই সবকিছু ট্যাপা করাইছে। তাই এইবার তারা পরিকল্পনা করল, ট্যাপাকে বস্তায় করে নদীতে ফেলে দেবে। এই জন্য ছয় ভাই মিলে ট্যাপাকে ধরে বস্তায় ভরল। তখন ট্যাপা বলল, ‘ভাইজান, আমারে তো মারবেন, তা আমারে একখান ছুরি দিয়ে দেন। কারণ মরার পর নদীর তলে যাইয়ে গরুর ঘাস কাটব।’ যেই তাকে নদীতে ফেলল, সেই ট্যাপা ছুরি দিয়ে বস্তা কেটে ফেলল এবং নদীর ওপার থেকে কিছু গরু নিয়ে বাড়ি ফিরল। সে ভাইজানদের বলল, ‘নদীর তলে যে কত গরু আর আমারে যদি একটা লাঠি দিতেন, দেখতেন কত গরু আনতাম।’ সব শুনে বোকা ছয় ভাই গরু আনার জন্য ট্যাপাকে বলল তাদের বস্তায় বেঁধে ভেতরে লাঠি দিয়ে নদীতে ফেলায় দিতে। ট্যাপাও তাদের নদীতে ফেলে দিল এবং তারপর তাদের বউদের তাড়িয়ে

শ্বশুরের সব জমির মালিক হলো। – সংগ্রহেঃ

বাপন কুমার হালদার, রূপসা, খুলনা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

104) চোরার পোলা হাবলু

‘আরে ও হাবলুর মা, কই গেলি, মরলি নাকি? সরিষার তেল নে, তাড়াতাড়ি মালিশ কর, পিঠের ছাল তুইল্ল্যা নিল দেখ, কাইন্দা কইলাম কুল পাবি না।’ মাঝরাতে চুরি করতে গিয়ে ধরা খেয়ে, গৃহস্থের হাতে মার খেয়ে এসব বলছিল কুদ্দুস চোরা। ১০ বছরের ছেলে হাবলুটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল চুরিবিদ্যা শেখাতে। হাবলুটার কারণেই কুদ্দুস চোরাকে আজ রামধোলাই খেতে হলো। পাশের বাঁশঝাড়ে ছেলেকে রেখে বাপ গেল চুরি করতে। যাওয়ার আগে বলল, ‘খবরদার হাবলু, এক্ষেত্রে শব্দ করবি না, তাইলে কইলাম ধরা খামু।’ হাবলু ভাবল, ‘ধরা’ এটা নিশ্চয় কোনো খাবারের নাম। না হলে খাওয়ার কথা বলল কেন? তখন হাবলু বলে, ‘বাপজান, ধরা তুমি একলা খাইবা না কইলাম, আমার লাইগাও একটু আনবা।’ তখন কুদ্দুস চোরা বলে, ‘চুপ কর হাবলুর বাচ্চা, বইসা থাক, আল্লায় জানে, কেন যে তোরে আনছিলাম।’ ঘরের ভেতর ঢুকে যেই না কুদ্দুস চোরা আলমারি খুলল, অমনি হাবলু হারামজাদাটা চিৎকার জুড়ে দিল-‘বাপজান, আঁরে ও বাপজান, কই গেলা? মশা তো আমারে খাইয়া ফালাইল, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ, এতক্ষণ কী চুরি করো, তাড়াতাড়ি আইস, ভয় লাগতাছে।’ ওই দিকে ছেলের কাণ্ড দেখে কুদ্দুস চোরা অন্ধকারে খেই হারিয়ে ফেলে। ঘরের লোকজন জেগে ওঠে। হাবলুটা আবার শুরু করে, ‘ও বাপজান, মনে হইতাছে এই আন্ধারে আমারে ভূতে ধরতাছে। আমি তো বেহুঁশ হইয়া যাইতাছি। চক্ষু আন্ধার দেহি, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ-আমার লাইগা ধরা না আনলে কইলাম আন্মারে কমু, তুমি একলাই ধরা খাইছ।’ ছেলের এহেন চাঁচামেচিতে ঘরের লোকজন সব জেগে উঠল, আর কুদ্দুস চোরাকে ধরে যার যেমন ইচ্ছা পেঁদানি দিতে লাগল। অবশেষে নাকে খত দিয়ে তারপর ছাড়ল। এরপর কুদ্দুস চোরা খুব কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে হাবলুর কাছে এল। তাকে দেখে হাবলু বলতে লাগল, ‘বাপজান ধরা আনছ?’ কুদ্দুস বলল, ‘হজম করবার পারবি?’ ‘দিয়াই দেখো না।’

হাবলু বলল। তখনই কুদুস চোরা বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি ভেঙে হাবলুটাকে পেদানি দিতে লাগল। আর অমনি হাবলুটা চিৎকার জুড়ে দেয়, ‘খামু না, খা-মু-না।’ – সংগ্রহেঃ সিমলা চক্রবর্তী বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

105) ঠেলাঠেলির ঘর

একজনের দুই বউ। কথায় বলে, ‘ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর।’ দুই বউকে নিয়ে স্বামী বেচারার বড়ই মুশকিল। তারা একে অপরের দোষ ধরার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। এক বউকে কোনো কাজ দিলে সে অপর বউয়ের ঘাড়ে চাপাতে চায়।

স্বামী হালচাষ করতে মাঠে গেছে। দুই বউ ঠেলাঠেলি করে রান্না করেনি। দুপুরবেলা বাড়ি এসে স্বামী ভাত পায় না। বাড়ির ধারে বেগুনক্ষেতে পানি দেওয়ার কথা। এ বউ বলে, তুমি পানি দাও; ও বউ বলে, তুমি পানি দাও। মাঝখান থেকে বেগুনক্ষেতে পানি না দেওয়াতে এক দিনের রোদেই চারাগাছগুলো শুকিয়ে যায়। অনেক ভেবেচিন্তে স্বামী বউদের যার যার কাজ ভাগ করে দিল। আর এক দিন অন্তর একজনকে রান্না করতে বলল।

আজ বড় বউয়ের রান্নার পালা। ছোট বউ তাকে তাকে আছে। যেই বড় বউ একটু ওদিকে গেছে, অমনি ছোট বউ এসে তরকারির হাঁড়িতে অনেকখানি লবণ ঢেলে দিয়ে গেল। খাওয়ার সময় লবণের কারণে কেউ খেতে পারল না। বড় বউয়ের বদনাম হলো, কিন্তু সে বুঝতে পারল, এটা কার কাজ।

পরদিন ছোট বউয়ের রান্নার পালা। কাল বড় বউয়ের রান্নার বদনাম হয়েছে। আজ ছোট বউ এমন রান্না করবে যে বাড়ির লোক খেয়ে ধন্য ধন্য করবে। কত সুন্দর করে বাটনা বেটে, নানা মসলা দিয়ে ছোট বউ অতি পরিপাটি করে রান্না করছে। যেই ছোট বউ একটু ওদিকে গেছে, অমনি বড় বউ এসে তরকারির মধ্যে অনেকখানি মরিচের গুঁড়া ফেলে দিয়ে গেল। ঝালের কারণে সেদিন কেউই খেতে পারল না। বাড়ির সবাই ছোট বউয়ের রান্না নিয়ে ছি ছি করতে লাগল।

এমনি করে আজ তরকারিতে ঝাল বেশি, কাল লবণ বেশি, পরশু হলুদ বেশি, স্বামী বেচারা

বড়ই মুশকিলে পড়ল। কিছুতেই ধরতে পারে না, এমন কাজ কে করে।

সেদিন রান্না করছিল ছোট বউ। তরকারিতে এত লবণ পড়েছে যে, মুখে দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বামী একটু চালাকি করল। সে খেতে খেতে বলল, ‘আজ যে তরকারিতে মোটেও লবণ পড়েনি, এমন লবণ ছাড়া কি তরকারি খাওয়া যায়?’

তখন বড় বউ বলল, ‘ও তো একেবারেই লবণ দেয়নি, আমি আড়াল থেকে সামান্য লবণ তরকারিতে দিয়েছি। তাই খেতে পারলে। না হলে আজ তোমার খাওয়াই হতো না।’ তখন স্বামী বড় বউয়ের চুলের মুঠি ধরে মারল এক কিল, ‘তবে রে শয়তানি! তুই লুকিয়ে তরকারিতে লবণ দিয়েছিস?’

তারপর স্বামী ছোট বউকেও ধমকিয়ে বলল, ‘আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোরা একজন অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই একে অপরের তরকারিতে লবণ ফেলে দিস, ঝাল ফেলে দিস। এরপর যদি কারও রান্নায় লবণ-ঝাল বেশি হয়, তবে দুজনেরই চুলের মুঠি ধরে এভাবে মারব।’ সেদিন থেকে দুই বউ ভালোমতো রান্নাবান্না করতে লাগল।— সংগ্রহেঃ আসকার সাঈদ, নাটোর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯
106) মাছ

জামাই অনেক দিন পর শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে একটি বড় পাঙ্গাশ মাছ নিয়ে। শাশুড়ি ছিল কৃপণ। খাওয়ার সময় তিনি জামাইকে বিভিন্ন তরকারি দিয়ে খেতে দিলেন। কিন্তু পাঙ্গাশ মাছ দিলেন না। জামাই অনেকক্ষণ বসে খেয়েও মাছের তরকারি পেল না। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল জামাই তখন ঘুমাল না। সে ঘুমের ভান করে নাক ডাকছিল এবং বলছিল-পাঙ্গাশ...ঘড়-ঘড়...পাঙ্গাশ...। সবাই কিছুই বুঝতে পারছিল না। শাশুড়ি বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর তিনিও ঘুমের ভান করে নাক ডাকছিলেন এবং বলছিলেন-ঘড়-ঘড়...আইজ না কাইল খাইস...ঘড়-ঘড়...আইজ না কাইল খাইস...।—

সংগ্রহেঃ শরীফ হোসেন, খুলনা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

107) একজন কিপটের গল্প

(সম্পূর্ণ বগুড়ার ভাষায়) অ্যাডা কিপটার গল্প কমু। তোমরা শুনবিন আর হাসপিন। এক গাঁয়েত এক কিপটা থাকিতচেলো। শালা এতই কিপটা আছলো তা কবার লয়। উঁই অ্যাডা পাঞ্জাবি কিনিছিলো, সেড্যা বছর পাঁচেক পরার পর যখন দেখিছে অ্যাডা পরা যাবে না, তখন ওড্যা ক্যাট্যা ফতুয়া বানাছে। সেই ফতুয়া আরও পাঁচ বছর ব্যবহার কোর্যা সেডা গেঞ্জি বানাছে। সেই গেঞ্জি আবার ম্যালা দিন ব্যবহার করিছে। তারপর যখন দেখিছে আর ব্যবহার করা যাবে না, তখন সেড্যা আবার ক্যাট্যা হাত উরমাল (রুমাল) বানাছে। সেই উরমালও ম্যালা বার ব্যবহার কর্যা যখন ত্যানা ত্যানা হয়্যা গেছে তখন সেড্যা নেকড়া বানাছে। সেই নেকড়ার ওপর নির্যাতন চ্যাল্যা চ্যাল্যা যখন দেখিছে অ্যাডা দিয়া আর কাম হবি না, তখন অড্যা আগুনত দিয়ে ভাত রানধিছে। সেই নেকড়ার ছাই দিয়া পরের দিন সকালে কিপটা দাঁত ম্যাজ্যা পুকুরেত কুলি করিছে আর কচে-৭০ টাকা পানিত ফেল্যা দিন্যু! হায়! ৭০ টাকা পানিত ফেল্যা দিন্যু!- সংগ্রহেঃ এস এম নাজমুল হক সান্তাহার (চা-বাগান), বগুড়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

108) মুরগির এক দা

একটি বাসা ভাড়া নিয়ে একা একাই থাকেন সিরাজুল। মাসিক টাকার বিনিময়ে একজন বাবুর্চি রেখেছেন রান্নাবান্না, ঘরদুয়ার দেখে রাখার জন্য। কোনো খাওয়াদাওয়ার কথা নেই। প্রয়োজনীয় কাঁচাবাজার, মাছ, মাংস ইত্যাদি সাহেব নিজেই আনেন এবং মাছ-মাংস সংখ্যা গুনে বাবুর্চির লিখিত স্বাক্ষর রেখে বুঝিয়ে দিয়ে যান। দুপুরে এসে রান্না মাংসগুলো সংখ্যায় ঠিক আছে কি না মিলিয়ে নিয়ে খেতে বসেন। একদিন একটি মুরগি রান্না করে, সব কাজ শেষ করে সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে বাবুর্চি। কিন্তু বাবুর্চির মুরগির মাংসের ওপর প্রচণ্ড লোভ হয়। সে মুরগির একটি রান নিয়ে খেতে বসে। তখনই তার সাহেবের গণনার কথা মনে হয়ে যায়। তাই শুধু মাংসে লেগে থাকা ঝোলটুকু চেটে খেয়ে পুনরায় তা পাতিলের মধ্যে ঢুবিয়ে রাখে। কিন্তু ক্রমশ তার খাওয়ার লোভ বেড়ে যায়, তাই হঠাৎ একটি রান খেয়ে ফেলে।

জানালার পাশে বসে ভীষণ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। সাহেব এসে গুনে রান তো পাবেন না। তখন কী হবে-ভাবতে ভাবতে সে দেখে, জানালার বাইরে গাছের নিচে একটি মোরগ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাহেবের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। সাহেব এসে খেতে বসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মুরগির রান একটি কম কেন? নিশ্চয় তুই খেয়ে ফেলেছিস।’ ‘না স্যার, আমি খাইনি। এই মুরগির এক পা ছিল।’ ‘তুই কি আমাকে মফিজ পেয়েছিস?’ ‘বিশ্বাস না করেন, যখন আপনি গ্রামে যাবেন, খেয়াল করলে একপায়া মুরগি দেখতে পাবেন।’ সাহেব একদিন গ্রামে বেড়াতে গিয়ে একটি গাছের নিচে সত্যি একটি একপায়া মোরগ দেখতে পেয়ে বাবুর্চির কথা মনে পড়ে। আর একটু কাছে গিয়ে দুই হাত তুলে হুস করার সঙ্গে সঙ্গে মোরগটি লুকানো পা বের করে দুই পায়ে দৌড়ে চলে যায়। এরপর বাসায় এসে বাবুর্চিকে ডেকে বলেন, ‘গ্রামে একপায়া মুরগি দেখে এসেছি।’ বাবুর্চি বলে, ‘স্যার, সেদিন আমাকে অবিশ্বাস করেছিলেন।’ ‘থাম, মন দিয়ে আমার কথা শোন, আমি কাছে গিয়ে দুই হাত তুলে হুস করার সঙ্গে সঙ্গে মোরগটি লুকানো পা বের করে দৌড়ে দুই পায়ে পালিয়ে যায়।’ বাবুর্চি বলল, ‘স্যার, সেদিন আমি মুরগি জবাই ও রান্না করার সময় হুস করিনি-এখন থেকে মুরগি জবাই ও রান্না করার সময় হুস করব, অবশ্যই লুকানো পা বের হয়ে যাবে!’- সংগ্রহেঃ হাসমত আলী

পাবনা চকছাতিয়ানী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

109) মতবাদী

একদা ব্রিটিশ শাসনামলে এক গ্রামে এক সৎ, প্রতিবাদী ফাদার বাস করত। সে প্রায় প্রতিদিনই চার্চে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কথা বলত। একদিন ফাদারের কথা ব্রিটিশ প্রশাসনের কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠানো হলো ফাদারকে ধরতে। সৈন্যরা ফাদারের নাম জানে, কিন্তু কখনো দেখেনি। তারা খুঁজতে খুঁজতে দৈবক্রমে ফাদারের কাছে এল এবং জিজ্ঞেস করল, অমুক নামের কোনো ফাদারকে সে চেনে কি না। ফাদার চিন্তায় পড়ে গেল। তাকে তো সত্য কথা বলতেই হবে। কী করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি

এল মাথায়। নিজের দাঁড়ানো স্থান থেকে দুই পা পেছনে সরে গেল। তারপর দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তারা যাকে খুঁজছে সে এইমাত্র এখান থেকে সরে গেছে।’ এই বলে সে তার আগের দাঁড়ানো স্থানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সৈনিকেরা মনে করল, ফাদার যখন কিছুক্ষণ আগে এখানেই ছিল, তাহলে হয়তো কাছাকাছিই তাকে পাওয়া যাবে। এই ভেবে সৈনিকেরা প্রস্থান করল।— সংগ্রহেঃ

আদনান জাদীদ, মহেশখালী, কক্সবাজার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

110) গ্রামবাংলার করুণ গল্প

গ্রামের মোড়লের ছেলে বিলেত থেকে ফিরেছে। মোড়লবাড়ির এক লোক তাকে আনতে গেছে শহরে। তার কাছে মোড়লের ছেলে জানতে চায়, ‘বাবা, দাদি, আমার ঘোড়াটা, কুকুরটা, সবাই ভালো আছে তো?’

লোকটা করুণ স্বরে বলে, ‘বাবু, কুকুরটা মারা গেছে।’

ছেলেটা কষ্ট পায়, ‘আহা, আমার খুব প্রিয় ছিল ও।’

লোকটা আবার বলে, ‘অবশ্য কুকুরটার আর কী দোষ! ঘোড়াটা মরে গেল। ওই ঘোড়ার পচা মাংস খেয়েই কুকুরটি মরল।’

‘আহা, আমার ঘোড়াটাও মরে গেছে?’

‘ঘোড়াটার আর কী দোষ! দাদিমা মরে গেল, তাঁর শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র শহর থেকে আনতে- নিতে গিয়েই ঘোড়াটা মরল।’

‘বলো কি! আমার দাদিমাও মারা গেছে?’

‘দাদিমার আর কী দোষ! চোখের সামনে নিজের ছেলেকে মরতে দেখলে কে-ই বা বাঁচতে পারে!’

এবার ছেলেটা পড়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে মরেই গেল-

মোড়লবাড়ির লোকটা সেটা বুঝতে পারল না।—

সংগ্রহেঃ রুবাইয়াৎ হোসেন, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

111) বোকা কুমিরের কথা

কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল।

কিসের চাষ করবে? আলুর চাষ। আলু হয়

মাটির নিচে, আর গাছ থাকে মাটির ওপরে। তা

দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বোকা কুমির সে

কথা জানত না। তাই সে শিয়ালকে ঠকানোর জন্য বলল, গাছের আগার দিক আমার আর গোড়ার দিক তোমার।

শুনে শিয়াল হেসে বলল, আচ্ছা, তা-ই হবে। তারপর যখন আলু হলো, কুমির তখন সব গাছের আগা কেটে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে দেখে তাতে একটাও আলু নেই। তখন সে মাঠে গিয়ে দেখল, শিয়াল মাটি খুঁড়ে সব আলু তুলে নিয়ে গেছে। কুমির ভাবল, তাই তো! এবার বড্ড ঠকে গিয়েছি। আচ্ছা, আসছে বার দেখব।

তারপর হলো ধানের চাষ। এবার কুমির মনে মনে ভাবল, আর কিছুতেই ঠকা যাবে না। তাই সে আগে থেকেই শিয়ালকে বলল, ভাই, এবার কিন্তু আমি আগার দিক নেব না, এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে।

যখন ধান হলো, শিয়াল সে ধানসুদূর গাছের আগা কেটে নিয়ে গেল। কুমির তো এবার ভারি খুশি! ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব ধান তুলে নেবে। ও কপাল! মাটি খুঁড়ে দেখে কিছু নেই! লাভের মধ্যে খড়গুলো গেল।

তখন কুমির তো বড্ড চটেছে আর বলছে, দাঁড়াও শিয়াল বাছা, তোমাকে দেখাচ্ছি। এবার আর আমি তোমাকে আগা নিতে দেব না। সব আগা আমি নিয়ে আসব। সেবার হলো আখের চাষ।

কুমির তো আগেই বলেছে, এবার আর সে আগা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই সে শিয়ালকে গোড়া নিতে বলল। আখ হওয়ার পর শিয়াল তাকে আগাগুলো দিয়ে নিজে আখগুলো নিয়ে ঘরে বসে মজা করে খেতে লাগল।

কুমির আখের আগা ঘরে এনে চিবিয়ে দেখল, খালি নোনতা, তাতে একটুও মিষ্টি নেই।

তখন সে রাগ করে আগাগুলো ফেলে দিয়ে শিয়ালকে বলল, না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও!'-

সংগ্রহেঃ নাদিয়া নাসরিন নাবিক কলোনি,
চট্টগ্রাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

112) মন আটকা পড়েছে

-আমার কী হবে গো মাসি!

-কেন, কী হয়েছে তোমার?

-মনটা য্যান ক্যামন ক্যামন কচ্ছে!

-আহা! খুলে বল দিকি। বয়স হলো তবু ঢঙ
গেল না!

-না গো মাসি, ও তুমি বুঝবে না...

-তা বুঝিয়ে দেখো না, না বললে কিরূপে বুঝি?

-এর তো কোনো রূপ নেই লো! রূপে বুঝবে
কীভাবে?

-উফ

113) মাছ সমাচার

একদা এক গ্রামে এক দম্পতি বাস করত।
একদিন গৃহকর্তা বাজার থেকে তিনটা মাছ
কিনে আনল। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা মানুষ
দুজন। মাছ তিনটা। বাকি মাছটা খাবে কে?
কেউ ছাড় দিতে চায় না। অবশেষে সিদ্ধান্ত
হলো, যে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারবে, সে-ই
খাবে বাকি মাছটা। শুরু হলো প্রতিযোগিতা।
দুজনই চুপ। দিন যায়, রাত আসে, কেউ কথা
বলে না। এদিকে পাড়াপড়শিরা বলাবলি করতে
লাগল, তারা মারা গেছে। গ্রামের মোল্লাকে খবর
দেওয়া হলো। দুজন মোল্লা পুণ্য লাভের আশায়
সহযোগীসহ ওই দম্পতিকে কবরে নিয়ে গেল।
সন্ধ্যার আঁধারে সবকিছু আবছা আবছা লাগছিল।
মোল্লা অত্যন্ত মোটা ছিল। একাই কবর খুঁড়ল।
স্বামী-স্ত্রী দুজনকে কবরে রাখা হলো। এদিকে
এমনিতে না খেয়ে থাকা, তার ওপর আবার
কবরে ফেলা হলে গৃহকর্তার ঘুম ভেঙে গেল।
ঘুম জড়ানো কণ্ঠেই সে তার স্ত্রীকে বলল,
‘আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি খাবে দুইটা আর আমি
একটা। তবে হ্যাঁ, মোটাটা আমিই খাব।’ শুনে
কবর দিতে আসা মোটা মোল্লাসহ উপস্থিত
তিনজন যে যদিকে পারল পালাল। – সংগ্রহেঃ
আদনাম মো. জাদীদ মহেশখালী, কক্সবাজার
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

114) হ্যারহেরি ড্যারডেরি, যোন

যোন মুখ লাড়ি!!

একবার একটা গৃহপালিত ছাগল হাঁটতে হাঁটতে
ঘাস খেতে খেতে বনের দিকে যাচ্ছিল। বাড়ির
উত্তর পাশে ছিল বন। ছাগলটার আর খেয়াল
ছিল না যে সে বনের দিকে যাচ্ছে। একসময়
সে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। বাড়ি ফেরার পথ
সে আর খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিকে সন্ধ্যা নেমে
আসছে। ছাগলটি তাই বাড়ি ফেরার চিন্তা মাথা
থেকে সরিয়ে ফেলল। সে একটা আশ্রয় খুঁজতে

লাগল। বনে বাঘের ভয় আছে। তাই সে সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখতে দেখতে একটা গুহার কাছে গেল। গুহার কাছে গিয়ে বুঝল যে এটা বাঘের গুহা। ভয়ে ভয়ে গুহার মধ্যে সে দেখল যে কেউ নেই। এমন সময় গুহার মালিকবাঘটি গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল। গন্ধ শুঁকে বুঝল যে তার গুহায় কে যেন আছে। তখন সে হুস্কার ছাড়ল, ‘হালুম, হালুম! ভেতরে কে রে? শিগগির বাইর হ, নইলে...’ ছাগলটি তখন বুদ্ধি করে বলল, ‘আমার নাম হ্যারহেরি ভারভেরি, ঘোন ঘোন মুখ লাড়ি, যদি এই গুহায় বাঘেরে পাই!!’

বাঘ ভাবল কী জাতের কী এক ভয়ংকর জন্তু এসেছে তার গুহায়। না জানি কত বড় সেই জন্তু! এই ভেবে বাঘ ঝেড়ে দৌড় মারল। এমন সময় বাঘকে দৌড়াতে দেখে গাছ থেকে এক বানর তাকে ডাক দিল, ‘ও বাঘমামা! মামা! যাও কই?’ বাঘ উত্তর দিল, ‘আর কইয়ো না ভাগিনা, আমার গুহায় খুবই ভয়ংকর একটা প্রাণী আইছে। বাপ রে, কী তার নাম, হ্যারহেরি ভারভেরি। নাম শুনলেই তো সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকাইয়া যায়।’ বানরের মনে খটকা লাগল। বলল, ‘আরে কিসের ভয়! আমার মতো ভাইগ্না থাকতে কিসের ভয়!’ বাঘ বলল, ‘আমার লগে লও। তয় ডরাইয়া পালাইতে পারবা না কিন্তু।’ বানর বলল, ‘তাইলে আমার ল্যাজের লগে তোমার ল্যাজ গিঁট দিয়া লও।’ বাঘ তার ও বানরের লেজ গিঁট দিয়ে নিল। এরপর বানরকে নিয়ে বাঘ সেই গুহার কাছে আবার গেল। বানর বলল, ‘ওই!! ভেতরে কেডা?!’ ছাগল বলল, ‘আমি হ্যারহেরি ভারভেরি, ঘোন ঘোন...!’ কথা শেষ হতে না হতেই বাঘ ভয়ে দৌড়। বাঘ ভাবল, ‘আর গিয়ে কাজ নেই। সাহস দেখাতে গিয়ে জানটাই না চলে যায়!’ বানর তখন তার লেজের সঙ্গে বাঁধা, বানরটা মাটির সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, কাঁটাঝোপের গুঁতা খাচ্ছে। বাঘটি দৌড়ে জমির আইলের ওপর দিয়ে যেতে লাগল, এমন সময় বানর জমির আইলে ব্যথা পেতে লাগল। বানর বাঘকে বলতে লাগল, ‘মামা, আইলে, আইলে!!’ অর্থাৎ সে জমির আইলে ব্যথা পাচ্ছে। ওদিকে বাঘ ভাবল, সেই জন্তুটা তাদের দিকে আসছে। সে আরও জোরে দৌড়াতে লাগল। বাঘ তখন গ্রাম ছেড়ে দূরে পালিয়ে গেল। পথে

বানরটি মারা গেল।

এদিকে সকাল হলে ছাগলটি নাচতে নাচতে
বাড়ি ফিরে এল।- সংগ্রহেঃ নাফিসা আবেদীন
ও জাহিন আবেদীন, কলেজ এভিনিউ, বরিশাল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

115) বোকা বুড়ি

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ি। তারা ভারি
গরিব। বুড়ি বেজায় বোকা। আর ভয়ানক বেশি
কথা বলে। যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে
জুড়ে দেয় গল্প। বুড়ো একদিন তার জমি চষতে
চষতে মাটির নিচে একটি কলসি পেল। সেই
কলসি টাকা-পয়সা ভরা। সে চিন্তা করল, এটা
বাড়িতে নিয়ে গেলে বুড়ি টের পেয়ে যাবে,
সবাইকে সে বলে দেবে। তা ভেবে ভেবে সে
এক ফন্দি আঁটল। সে ঠিক করল, বুড়িকে সে
বলবে কিন্তু এ রকম উপায় করবে, যাতে বুড়ির
কথা কেউ বিশ্বাস না করে। তখন সে একটা
মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা
গাছের ওপর রাখল। আর একটা খরগোশ এনে
নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে
জড়িয়ে রাখল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে
বলল, ‘একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম!
গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর
খরগোশ জলে খেলা করে। আমাদের
গণকঠাকুর বলেন, মৎস্য বসে গাছে, জলে
খরগোশ নাচে। গুপ্তরত্ন খুঁজলে পাবে ঘুরলে
তারি কাছে।’ বুড়ি বলল, ‘তোমার যেমন কথা!’
বুড়ো বলল, ‘হ্যাঁ! এ রকম নাকি সত্যি সত্যি
দেখা গেছে।’ এই বলে বুড়ো আবার কাজে
বেরোল। আধাঘণ্টা যেতে না যেতেই বুড়ো
আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়িকে টাকা
পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো-বুড়ি মিলে
টাকা আনতে চলল। পথে বুড়ো সেই গাছতলায়
এসে বলল, ‘গাছের ওপর নড়ছে জিনিসটা কী?’
এই বলে সে একটা টিল ছুড়তেই মাছটা পড়ে
গেল। বুড়ি অবাক। তখন বুড়ো বলল, ‘নদীতে
জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কি না দেখে
আসি।’ জাল টানতেই বুড়ো অবাক হওয়ার ভান
করে বলল, ‘ওমা, খরগোশ যে!’

তখন বুড়ো বলল, কেমন! গণকঠাকুরের কথা
বিশ্বাস হলো? টাকা পেয়েই বুড়ি বলল, ‘ঘর
করব, বাড়ি করব।’ বুড়ো বলল, ‘ব্যস্ত হয়ো না।
ধীরে ধীরে সব করব।’ বুড়ি টাকা পাওয়ার কথা

একে বলে, ওকে বলে। একদিন সবাই এসে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, টাকা পাওয়ার কথা সত্য কি না। বুড়ো বলল, ‘সেকি! বুড়ির মাথা ঠিক নেই, সে কত আবোল-তাবোল বলে।’ বুড়ি বলল, ‘আবোল-তাবোল না। সেদিন যে গাছে মাছ বসেছিল, নদীতে খরগোশ ছিল?’ বুড়ির কথা শুনে সবাই হেসে চলে গেল। তখন বুড়ি আর কোনো কথা বলত না। (হাজং লোককাহিনী)

– সংগ্রহেঃ প্রিজম হাজং, নেত্রকোনা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

116) নালু ঠগ

এক রাজ্যে নালু নামে একজন লোক ছিল। সব সময় সে মানুষকে ঠকাত। একদিন রাজদরবারে গিয়ে নালু বলল, মহারাজ, আমি রাজ্যের প্রায় সব মানুষকে ঠকিয়েছি। আমার শেষ ইচ্ছা, আপনাকে ঠকাব। রাজা বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাকে ঠকাও দেখি। নালু বলল, মহারাজ, আজকে আমি ঠকানোর যন্ত্রপাতিগুলো বাড়িতে রেখে এসেছি। আপনার ঘোড়াটি দিলে তাড়াতাড়ি যাব আর আসব। রাজা নালু ঠগকে তাঁর ঘোড়াটি দিলেন। নালু ঘোড়ায় করে বাড়ি চলে এল। এদিকে রাজা অপেক্ষায় আছেন, কখন নালু ঠগ তার সঙ্গে ঠকবাজি খেলা খেলবে। অনেকক্ষণ হলেও নালু ঠগের পাত্তা নেই। রাজা অস্থির হয়ে নালু ঠগের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন, এদিকে নালু তার মাকে বলল, মা, আমি রাজাকে ঠকাব। রাজা যখন আসবে তখন তুমি এই বাঁশি বাজাবে, আমি অমনি উঠে দাঁড়াব। রাজা এই বাঁশি আমাদের কাছ থেকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে নেবেন। নালু তার গলায় লাল রং মেখে বিছানায় শুয়ে রইল। রাজা যখন তাঁর বাহিনীসহ নালুর বাড়িতে এলেন, অমনি নালুর মা বাঁশি বাজাতে লাগল। রাজা ভাবলেন, নালুর গলায় রক্ত, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে জখম করেছে। নালুর মা বাঁশি বাজাতে বাজাতেই নালু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। রাজা দেখে অবাক হলো, এ কেমন বাঁশি, মরা মানুষ ভালো হয়। সেনাপতি বলল, মহারাজ, এই বাঁশি আমাদের হাতে রাখতে পারলে আর কোনো দিন কোনো সেনা মরবে না। রাজা নালুকে বলল, তোমার বাঁশিটা আমাকে দিয়ে দাও। নালু বলল, না মহারাজ,

এটা আমার জীবন, আমি কোনো দিন মরব না, যতবার মরব ততবার জীবিত হব। রাজা বলল, বাঁশিটার পরিবর্তে এই নাও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কয়েক দিন পর রাজা তার সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গেলেন। তাদের বললেন, তোমরা সবাই জীবন দিয়ে যুদ্ধ করবে, মরার চিন্তা করবে না। তোমরা মরলে আমি এই বাঁশি বাজালেই আবার জীবিত হয়ে যাবে। যুদ্ধ চলতে থাকল, রাজার অর্ধেক সেনা মারা গেল। তখন রাজা বাঁশি বাজাতে লাগলেন। কিন্তু কোনো সেনা জীবিত হলো না। পরাজিত হয়ে রাজ্যে ফিরে এসেই রাজা বস্তায় ভরে নদীর মধ্যে ফেলে নালু ঠগকে হত্যার আদেশ দিলেন। রাজার দুজন সেনা তাকে বস্তায় ভরে নদীর ধারে নিয়ে যাচ্ছিল। নালু ঠগ বস্তার ভেতরে বলতে লাগল, স্বর্গের হুররা, চিন্তা করো না, কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তোমাদের মাঝে এসে পৌঁছাব। সেনা দুজন নদীর ধারে গিয়ে ভাবল, এই নদী দিয়ে মনে হয় স্বর্গে যাওয়া যায়। তাই এক সেনা অন্যজনকে বলল, তুমি চলে যাও, একাই আমি এই বস্তা নদীতে ফেলে দিতে পারব। দুজন স্বর্গে যাওয়ার বুদ্ধি করে একজন আরেকজনকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তখন নালু ঠগ বলল, ঠিক আছে, তোমরা দুজন স্বর্গে যাও, আমি পরে যাব। দুই সেনা মহা খুশি হলো। নালু বলল, আমাকে বস্তা থেকে বের করে তোমরা বস্তায় ঢুকে পড়ো। তারা তা-ই করল। নালু ঠগ দুজনকে দিল নদীর মধ্যে ফেলে। তারপর নালু ঠগ বাড়িতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগিয়ে রাজদরবারে এসে হাজির হলো। রাজা নালু ঠগকে দেখে আশ্চর্য হলো। নালু ঠগ বলল, মহারাজ, আমি স্বর্গ থেকে উঠে এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। রাজা ভাবলেন, আমিও নালুর সঙ্গে স্বর্গে চলে যাই। তিনি নালু ঠগকে বললেন, ভাই নালু, আমাকে একবার স্বর্গে নিয়ে যাও। নালু বলল, ঠিক আছে, আজ ভোরে স্বর্গে চলে যাব। রাজা নালুর সঙ্গে রওনা দিল। নদীর ধারে এসে নালু বলল, মহারাজ, আমি আপনাকে স্বর্গের মধ্যে ফেলে দেব। তাই বস্তায় ঢুকে যান। রাজা স্বর্গ দেখার লোভে বস্তায় ঢুকল। নালু বস্তা ভালো করে বেঁধে বলল, মহারাজ, আপনাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম। একের পর এক ঠকিয়েছি, এবার

আপনি নদীতে যান, আমি হব এই রাজ্যের
রাজা-বলে রাজাকে দিল নদীর মধ্যে ফেলে।
নালু এসে রাজসিংহাসনে বসল। নালু ঠগ
রাজ্যের রাজাকেও ঠকিয়ে রাজা হয়ে গেল।—

সংগ্রহেঃ ওবাইদুর রহমান, দিনাজপুর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

117) কৃপণ

এক কৃপণের শুধুই খাই খাই অভ্যাস ছিল। সে
সবার থেকে শুধু নিতেই পছন্দ করত, কাউকে
কিছু দিত না। একদিন নদীর ধার ধরে হাঁটতে
হাঁটতে হঠাৎ সে পানিতে পড়ে গেল। কিন্তু
দুঃখের বিষয়, কৃপণ সাঁতার জানত না। সে
নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। নদীর তীরে দাঁড়ানো
এক লোক ব্যাকুল হয়ে বলল, ‘ভাই, হাতটা
দেন, আমাকে হাতটা দেন।’ কৃপণ হাতটা দিতে
গিয়ে হঠাৎ কী ভেবে পিছিয়ে গেল। মনে মনে
বলল, আমাকে সবাই দেয়। আজ একটা তুচ্ছ
ঘটনার জন্য আমি দেব? আমি কখনো পরাজিত
হব না, দরকার হলে পানিতে ডুবে মরব।
এদিকে লোকটা চিৎকার করেই যাচ্ছে। অনেক
লোক জড়ো হয়ে গেল তীরে। অবস্থা যখন এ
পর্যায়ে তখন পাশ থেকে একজন লোক বলে
উঠল, ‘এভাবে বললে কখনো সে হাত দেবে না,
অন্য কোনোভাবে বলে দেখুন।’ লোকটা
নিজেকে সংশোধন করে বলল, ‘মাথামোটা,
তোর যখন শুধু নেওয়ারই ইচ্ছা, নে, ধর আমার
হাতটা, তোর হাত দিতে হবে না। এবার পানি
থেকে ওঠ।’ অতঃপর কৃপণ হাতটাই নিল।—

সংগ্রহেঃ দ্বিবা, সৈয়দবাড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

118) চশমার কারিশমা

আদম আলী আমার দাদু। বেশ আগে একবার
শহরে বেড়াতে গিয়েছিল দাদু। দাদু দেখল, কী
একটা বস্তুতে যেন অনেকেরই চোখ ঢাকা।
দেখতে স্বচ্ছ অথবা কালো গ্লাস বাঁকা দুটি
আংটা দিয়ে কানের সঙ্গে জড়ানো। শহরে
এটাকে বলে ‘চশমা’। কারও চোখে বা কপালে
ওটা দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত দাদু।
বাড়ি আসার সময় পথের পাশে এক চশমার
দোকানে ঢুকে এপাশ-ওপাশ দেখেও একটা
জুতসই চশমা বের করতে পারল না দাদু।
দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, ভালো চশমা হবে?
-কম পাওয়ারের নিবেন, না বেশি পাওয়ারের?

-দাম কোনটার কত, শুনি?

-দাম সব একই।

-তাহলে বেশি পাওয়ারই দিন, কমটা নিয়ে লাভ কী?

চশমা নিয়ে ফুরফুরে মনে গাঁয়ে চলে এল দাদু।

একদিন চশমাটা চোখে দিয়ে মাছবিক্রেতাকে দাদু হাঁকাল, এই ইলিশ মাছটার দাম কত রে? মাছওয়ালা তো থ! বড় বড় চোখে ডালার দিকে তাকাল। ডালার এক পাশে একটা ছোট পুঁটি মাছ ঝিলঝিল করছে রোদে। অটুহাসি দিয়ে মাছওয়ালা বলল, দাদা, ২০০ টাকা দিন।

-অত চাইলে বিকিবি কী করে শুনি? বড্ড বেশি হলো রে!

-দিন না টাকা পঞ্চাশ কম!

-হয়েছে! টাকা আমার ব্যাগে।

দাদু ১০০ টাকার একটা কচকচে নোট দিয়ে বাড়ি এসে দাদিকে বলল, বড় একটা ইলিশ আছে ব্যাগে।

দাদি দা-বাঁটি নিয়ে কাটতে গিয়েই বাধল ঝামেলা। সারা ব্যাগ খুঁজে কোথাও দাদুর বর্ণিত ইলিশের কোনো অস্তিত্বই পাওয়া গেল না।

ভুঙ্কার ছুটল দাদুর পানে।

-কই তোমার ইলিশ মাছ, আমার কালাচান!

-চক্ষু তো একেবারেই দেখ না। দেখি? এই, এই যে ইলিশ-বলে ব্যাগের এক কোনা থেকে বের করলেন।

জামার কলারে দাদির হাতের টান লাগতেই দাদুর চশমা ছিটকে পড়ল মাটিতে। খালি চোখে মাছটা দেখেই দাদুর চোখ দুটি ছানাবড়া!

অতটুকুন চুনোপুঁটি কিনেছে ১০০ টাকা দিয়ে!

মনের খেদে পরদিনই গেল শহরে। চশমাটা দোকানে ফেরত দিয়েই হাঁটা দিল। একটু হাঁটতেই এক বৃদ্ধ রমণী কপালে চশমা ঠেকিয়ে মুখটা বাঁকিয়ে চলে গেল।

অসম্ভব! চশমা আমার লাগবেই। দাদু ফিরে এল দোকানে। দোকানিকে বুঝিয়ে একটা কম পাওয়ারের চশমা নিল এবার। এখন আর ঝামেলা নেই-এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দাদু।

একদিন নাতনির বাড়িতে নিমন্ত্রণ পড়ল। দাদু চলল সবার আগে। সামনে পড়ল নদী। চশমাটা তখনো চোখেই ছিল। এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে ডানে-বাঁয়ে সরে গিয়ে ভালোভাবে

পর্যবেক্ষণ করল দাদু।

-একটা ছোট নোনা। ওপারে যেতে পাঁচ কদমই যথেষ্ট। অথচ বোকা মানুষগুলো খালি খালি নৌকা ডাকে।...

দাদু হাত দশেক পেছনে সরে পাঞ্জাবিটা গোছাল। জুতো দুটো নিল দুই হাতে। মারল দৌড়। হেইয়া বলে দিল লাফ! পড়ল গভীর জলে। চশমাটা চোখেই। মাথা উঁচিয়ে দেখে কয়েক হাত দূরেই কিনারা! ডুবে ডুবে, সাঁতরে সাঁতরে সামনে এগোল দাদু। আবার তাকিয়ে দেখল, তীর খুবই কাছে! অতঃপর হাত-পা চালান দ্রুত। আবার হুপ করে মাথা উঁচিয়ে দেখল, সামনেই তীর। আবার চলল, কিন্তু কূল পাচ্ছে না কেন! হঠাৎ পেছনে টান পড়ল। কে যেন দাদুকে টেনে ওঠাচ্ছে একটা ছোট নৌকায়।

দাদু বলল, এ নৌকায় আমার ভার সহবে না। শিগগিরই তলিয়ে যাবে। উঠাস নে, তোরা ডুবে যাবি! ছেড়ে দে আমাকে...।

দাদুকে তীরে তোলা হলো। হাত-পা কাঁপছে থরথর। পেটটা ফুলেছে ডুবে ডুবে জল খেয়ে। চশমাটা কপালে ঠেকিয়ে কৃতকর্মের সমীকরণ কষছে দাদু!

দাদি এসে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, ওরে বুড়ো! সাঁঝের বেলায় ফুলবাবু হয়ে সাঁতরাবার শখ হয়েছে?

-ইচ্ছে তো মাঝেমধ্যে হয়।

গম্ভীর গলায় দাদু চশমাটা দেখিয়ে বলল, এ-ই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ভালোই বলতে পার।

দাদি ছোঁ মেরে চশমাটা নিল। দাদুর বাধা সত্ত্বেও এক ঢিলে নদীর মাঝখানে ফেলতে ফেলতে বলল, বুড়োকে ডুবিয়েছ জলে, এবার তুমি যাও তলে। - সংগ্রহে: জহির গাজী, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

119) চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এক ব্যক্তি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন: ‘ভাইসব, আমি যদি নির্বাচনে জিততে পারি, আমি এলাকার উন্নয়ন করব। নতুন রাস্তা করব, কাঁচা রাস্তা পাকা করব। আমার যা কিছু আছে তার সবই আপনাদের কল্যাণে ব্যয় করব। আমাকে ভোট

দিন।’ সবাই তাঁকে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানায়।

মাতৃহীন কন্যা ও কাজের বুয়া নিয়েই নতুন চেয়ারম্যানের সংসার। চেয়ারম্যান বাড়িতে এসে বুয়াকে বলেন, ‘আমি নির্বাচনের আগে গ্রামবাসীকে আমার যা কিছু আছে সবই দেব বলেছি। তুমি কিন্তু কিছুই দেবে না।’ এই বলে চেয়ারম্যান গঞ্জে চলে যান।

গ্রামের আবুল এসে বলে, ‘চেয়ারম্যান সাব বাড়িতে আছেন নিকি, ও চেয়ারম্যান সাব?’ কাজের বুয়া বলে, ‘চেয়ারম্যান বাড়িতে নাই, কী লাগবে কও।’ আবুল জানায়, তার ছোট মেয়ের অসুখ, হাসপাতালে নিতে হবে।

কাজের বুয়া বলে, ‘তাতে চেয়ারম্যান সাবের কী?’ আবুল বলে, ‘মানে চেয়ারম্যান সাবের সাইকেলটা যদি দেন।’ কাজের বুয়া বলে, ‘অত সব ভঙ্গি করে লাভ নাই। চেয়ারম্যান সাব সাইকেল দিতে মানা করেছেন।’

আবুল রাগত স্বরে ‘কী! এত বড় কথা, নির্বাচন আসুক, দেখবানে’ বলে চলে যায়।

রাতে চেয়ারম্যান বাড়িতে এসে বুয়াকে জিজ্ঞেস করেন। বুয়া বলে, ‘আবুল আইসা সাইকেল চাইল। আমি বলছি, সাইকেল দেওয়া যাবে না। আপনার মানা আছে।’ চেয়ারম্যান বলে, ‘করছস কী! বলবি, সাইকেল চলে না। ব্রেক নষ্ট, স্পোক ভাঙ্গা, পাম নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।’

পরের দিন চেয়ারম্যান সকালেই গঞ্জে চলে গেলেন। গ্রামের মদন আসে চেয়ারম্যানের গরুটা ধার নেওয়ার জন্য। ওর হালের গরু মারা গেছে। কাজের বুয়া বলে, ‘গরু চলে না, গরুর স্পোক ভাঙ্গা, গরুর ব্রেক ফেল ইত্যাদি।’ মদন বলে, ‘এসব কী, চেয়ারম্যান গরু দিব না, তাই কও। সামনের নির্বাচনে চেয়ারম্যান কীভাবে জিতে দেখবানে।’

চেয়ারম্যান রাতে বাড়িতে এলে বুয়া বিস্তারিত সব বলে। চেয়ারম্যান হায় হায় করে বলেন, ‘করছস কী! আমারে তো ডুবাবি।’ তিনি যথারীতি বুয়াকে বোঝান, ‘কেউ আসলে বলবি, গরুর পিঠে ফোঁড়া, পা খোঁড়া, চলতে পারে না।’ পরদিন হবু বেয়াই ঘটক নিয়ে চেয়ারম্যানের মেয়েকে দেখার জন্য এল। উল্লেখ্য, আগেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কাজের বুয়া জানায়, ‘চেয়ারম্যান গঞ্জে গেছে। কী লাগবে

আমারে কন।’

কাজের বুয়ার কথা শুনে ঘটক আমতা আমতা করে বলে, ‘চেয়ারম্যানের কন্যা...।’ অমনি কথা কেড়ে নিয়ে বুয়া বলে, ‘চেয়ারম্যানের মেয়ের পিঠে ফোঁড়া, পা খোঁড়া, চলতে পারে না।’

এ কথা শুনে হবু বেয়াই বিয়ে ভেঙে দেন।

যাওয়ার আগে গ্রামবাসীকে সব খুলে বলেন।

রাতে চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলে বুয়া সব স্বীকার করে। চেয়ারম্যান বুয়াকে মারতে মারতে বিদায় করে দেন। তারপর রাতের অন্ধকারেই বাপ ও মেয়ে দেশান্তরি হন।— সংগ্রহেঃ সাকিব হাসান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

120) বোকা তাঁতি

তাঁতি আর তাঁতির বউয়ের ছিল সুখের সংসার।

কিন্তু সমস্যা একটাই-তাঁতি যে বড্ড বোকা।

ব্যাপারিরা এসে তাঁতির কাছ থেকে খুবই কম

দামে কাপড় নিয়ে যায়। একবার তাঁতির

শালাবাবু বেড়াতে এসে এ অবস্থা দেখে বলে,

‘আপনি নিজেই হাঁটে গিয়ে কাপড় বিক্রি করুন

না, তাতে আর ঠকতে হয় না।’

বুদ্ধিটি তাঁতির মনে ধরল। তিনি তাঁর নৌকাটি

পরিষ্কার করে একটি ছড়ি দিয়ে ঘাটে বেঁধে

রাখলেন। ভাবলেন, রাতে রওনা হবেন।

রাতে তাঁতি কাপড়ের বোঝা নৌকায় রেখে

নৌকা চালাতে শুরু করলেন। কিন্তু সমস্যা কিছু

একটা হয়েছে, তাঁতি তা বুঝতে পারলেন না।

তিনি নৌকা বেয়ে একটু সামনে যান, আবার

স্রোতে ভেসে পিছিয়ে আসেন। এভাবে তিনি

সারা রাত নৌকা চালালেন। খানিকটা এগিয়ে

যান, আবার পিছিয়ে যান। এভাবে তিনি একটুও

সামনে যেতে পারেন না। কিন্তু তিনি ভাবলেন,

তিনি বুঝি অনেকখানি চলে এসেছেন।

সকালে এক মহিলাকে নদীতে পানি নিতে দেখে

তাঁতি বলেন, ‘মা জননী, এটা কোন ঘাট গো?’

তাঁতি নৌকা চালাতে এত মগ্ন ছিলেন যে ওই

মহিলা যে তাঁর বউ তা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের

পাননি। তাঁতির বউ রেগে বললেন, ‘তবে রে

মিনসে, ভীমরতি হয়েছে নাকি?’ পরক্ষণেই

তাঁতির হুঁশ ফিরল। তিনি বউকে চিনতে পেরে

বললেন, ‘আচ্ছা বউ, সারা রাত নৌকা বাইলাম,

কিন্তু একটুও এগোতে পারলাম না কেন?’

তাঁতির বউ বললেন, ‘বলি নৌকা যে বাইলে,

নৌকার দড়ি খুলেছিলে?’

তাঁতি দেখলেন, তাই তো। নৌকা তো এখনো
খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।- সংগ্রহেঃ ফাহিমদা
আলম, মিরপুর, ঢাকা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

121) একটা কথায় এত!

জামাই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কোনো কথা বলে
না। শালা-শালিরা কত ঠাট্টা-তামাশা করতে
আসে, সে কোনো উচ্চাচ্য করে না। শ্বশুর
গিয়ে জামাইয়ের বাপকে বলল, ‘দেখুন, আপনার
ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে চুপ করে বসে
থাকে, কোনো কথাবার্তা বলে না। সবাই বলে
জামাই বোকা।’

বাপ বলল, ‘আমার ছেলে তো বাড়িতে বেশ
ভালোমতোই কথাবার্তা বলে! আচ্ছা, তাকে
আমি বেশ করে ধমকে দেব।’

বাড়ি এলে বাপ ছেলেকে ডেকে বলল, ‘কিরে,
শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কথাবার্তা বলিস না কেন?
সেখানে গিয়ে সবার সঙ্গে আলাপসলাপ করবি।
শালা-শালিদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করবি, তবেই
না লোকে বলবে, বেশ ভালো জামাই!’

ছেলে মাথা নত করে রইল। বাপ বুঝল এবার
ছেলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কথা বলবে।

ঈদের ছুটিতে জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে। এসে
বৈঠকখানার এক কোণে চুপ করে বসে আছে।
শ্বশুর এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী বাবাজি, চুপ
করে বসে আছ কেন? বাড়িতে সবাই ভালো
তো?’

জামাই উত্তর দিল, ‘ভালো আর আছে কই? কয়
দিন হলো আমার বাপের মাথা খারাপ হয়ে
গেছে। হাতে একখানা লাঠি নিয়ে যাকে দেখেন
তাকেই মারতে আসেন।’

শ্বশুর বলল, ‘তবে তো খুব খারাপ কথা, আমি
কালই তোমার বাবাকে দেখতে যাব।’

জামাই বলল, ‘শ্বশুর সাহেব, যাবেন যে খুব
সাবধানে যাইয়েন। একটা লাঠি হাতে নিয়ে
ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইয়েন। আমার বাবা যদি
আপনাকে মারতে আসেন, লাঠি উঠিয়ে তাঁকে
মারতে যাবেন। দু-একটা লাঠির ঘা মাথায়
পড়লে বাবা শান্ত হয়ে যাবেন। তারপর আর
কিছু বলবেন না।’

শ্বশুর বললেন, ‘আচ্ছা, আমি তা-ই করব, কাল
সকালে তোমার বাবাকে দেখতে যাব।’

জামাই শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এল। বাপ জিজ্ঞেস করল, ‘কিরে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন?’

ছেলে বলল, ‘ফিরে না এসে উপায় কী? আমার শ্বশুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাকে দেখেন, তাকেই লাঠি ঘুরিয়ে মারতে আসেন।’

বাপ বলল, ‘তবে তো খুবই খারাপ খবর! কাল সকালেই তোর শ্বশুরকে দেখতে যাব।’

ছেলে বলল, ‘আপনি যে যাবেন, খুব সাবধানে যাবেন। একখানা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে যাবেন। আমার শ্বশুর যদি আপনাকে মারতে আসেন, লাঠির কয়েক ঘা তাঁর গায়ে মারবেন। তিনি তখনই থেমে যাবেন। কিন্তু কয়েক ঘা মারলে তিনি আপনাকে মারতেই থাকবেন। সাবধান, সঙ্গে লাঠি না নিয়ে যাবেন না।’

পরদিন সকালে দুই গ্রাম থেকে বাপ আর শ্বশুর লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বের হলো, মাঝপথে এসে দুই বেয়াইয়ের দেখা। শ্বশুর লাঠি উঁচু করে বলল, ‘এই!’ বাপও তেমনি লাঠি ঘুরিয়ে বলল, ‘এই!’ তারপর দুই বেয়াইতে লাঠিপেটাপেটি আরম্ভ হলো। সে কি যেমন-তেমন মারামারি! পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে দুই বেয়াইকে আলাদা করে ধরে রাখল।

তারপর বলল, ‘তোমাদের হলোটা কী! দুই বেয়াইয়ের মধ্যে এমন ভাব-মহব্বত। এখন এভাবে তোমাদের মারামারির কারণ কী?’

শ্বশুর তখন বলল, ‘কাল জামাইয়ের মুখে গুনলাম বেয়াই পাগল হয়ে গেছে। যাকে দেখে তাকেই মারতে আসে, আর লাঠি দিয়ে দুই-এক ঘা মারলেই নীরব হয়ে যায়।’ বাপ বলে, ‘ওই শয়তান ছেলে বেয়াইয়ের বিষয়ে এমন কথা আমাকেও বাড়ি এসে বলেছে!’

এখন দুই বেয়াই একে অপরের সঙ্গে আলাপ করে সব জানতে পারল। বাপ বাড়ি ফিরে ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, ‘ওরে বেল্লিক বেহায়া! তোর শ্বশুর সম্বন্ধে এমন মিথ্যে কথা আমাকে বলেছিলি কেন?’

ছেলে বিনীতভাবে উত্তর দিল, ‘আপনি আমাকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেখানে গিয়ে একটিমাত্র কথা বলেছি তাতেই এত! অনেক কথা বললে না-জানি কী হতো!’- সংগ্রহেঃ রুকাইয়া

আঞ্জুমান, কলাপাড়া, বরিশাল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

122) লোভ

দুই ভাইয়ের মধ্যে মধু বড়, কদু ছোট। মধু খুব লোভী। পক্ষান্তরে কদু অল্পতে তুষ্ট। মধু জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর কদু বন থেকে কাঠ কেটে এনে তা বিক্রি করে। এক বর্ষার দিনে কদু বনের অনেক ভেতরে গেল কাঠ কাটতে। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি নামায় সে একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল। কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই নেই। কদু দিল এক ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক রাত, বৃষ্টি থেমে গেছে। গুহার বাইরে নূপুরের আওয়াজ। ভয়ে ভয়ে বাইরে বের হয়ে কদু দেখল, একদল পরি রিনিঝিনি শব্দে তন্ময় হয়ে নাচছে। কদুকে দেখতে পেয়ে তারা তাকেও সঙ্গে নাচতে বলল। কী আর করা! কদু ভয়ে ভয়ে নাচতে শুরু করল। কদুর নাচ দেখে পরিরা খুব খুশি। কদুকে এক থলে সোনার মোহর দিয়ে পরিরা বলল, তারা প্রতি রাতে নাচে। সেও যেন আসে। কদু পরের দিন আসতে রাজি হলো। হঠাৎ এক পরি বলে উঠল, ‘ওকে বিশ্বাস নেই। এর চেয়ে ওর কাছ থেকে ওর একটা মূল্যবান জিনিস রেখে দিই, যার জন্য হলেও ও আসবে।’ সব পরি এ কথায় সম্মত হলো। কদুর বাঁ কানে বড় ধরনের একটা টিউমার ছিল, যার জন্য তাকে খুব বিস্ত্রী দেখাত। কিন্তু পরিরা মনে করল, ওটা বুঝি তার শরীরেরই প্রয়োজনীয় একটা অঙ্গ। কদুর বাঁ কান থেকে ব্যথাহীনভাবে টিউমারটা তুলে নিয়ে পরিরা তাকে বলল, ‘কাল যদি না আসো, তবে এটা পাবে না।’ কদু মহা খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এল। একদিকে টিউমার নেই, অন্যদিকে সোনার মোহর। সে সবার কাছে ঘটনাটা বলল। কদুর বড় ভাই মধুরও বাঁ কানে বড় ধরনের একটা টিউমার ছিল। আর সোনার মোহরের লোভ তো আছেই। পরদিন মধু রাতের বেলা বনে গেল। গভীর রাতে পরিরা নাচতে এল। মধুও তাদের সঙ্গে নাচল। কিন্তু মধুর নাচ পরিদের খুশি করতে পারল না। তারা কদুর টিউমারটি মধুর ডান কানে বসিয়ে দিল। এখন কানের দুলের মতো মধুর ডান ও বাঁ কানে শোভা পায় দুটি টিউমার!– সংগ্রহেঃ সঞ্জয়

দেবনাথ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

123) চোর

অনেক বছর আগের কথা। অনেক গ্রামেই তখন অতিথিশালা ছিল। সেই অতিথিশালায় একবার রাত কাটাতে এল গোপাল নামের সহজ-সরল এক লোক। খাওয়াদাওয়া শেষ করে গোপাল যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, তখনই সেখানে আরেকজন অতিথি এল। নাম তার হরিপদ। কুশল-বিনিময়ের পর তারা দুজনই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাতে কিসের যেন শব্দে গোপালের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল, ঘরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছে। গোপাল ভালো করে তাকিয়ে দেখল, ঘরের ভেতর হরিপদ হাঁটছে। শুধু হাঁটছেই না, ঘরের জিনিসপত্র সব তার ঝোলার মধ্যে ভরছে। এমনকি গোপালের জামা আর জুতো জোড়াও! হরিপদ যে একটা চোর, গোপালের তা বুঝতে আর বাকি রইল না। সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। সবকিছু নিয়ে হরিপদ যখন বেরোতে যাবে, তখন গোপাল ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে চোর চোর বলে চৈঁচাতে লাগল। হরিপদ বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে। বাঁচার জন্য সেও চোর চোর বলে চৈঁচাতে লাগল। বাড়ির লোকজন এসে দেখে, দুজনই চোর চোর বলে চিৎকার করছে। গোপাল বলে হরিপদ চোর, হরিপদ বলে গোপাল চোর। বাড়ির লোকজন খুব সমস্যায় পড়ল। বাড়ির কর্তা বলল, ‘দুজনকেই রশি দিয়ে বাঁধো।’ বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাছের সঙ্গে বাঁধা হলো। কিন্তু আসল চোর কে কিছুতেই বের করা যাচ্ছে না। তখন বাড়ির কর্তা দুজনের ঘাড়ে একটা লাশ উঠিয়ে দিয়ে শ্মশানে যেতে বলল। লাশ নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে গোপাল বলল, ‘জীবনে কী পাপ যে করেছিলাম! চোর ধরতে গিয়ে শেষে নিজেই চোর বনে গেলাম।’ তখন হরিপদ বলল, ‘তোমার জন্যই তো হলো না। কী সুন্দর চুরি করছিলাম, তুমি আমাকে ধরে সব মাটি করে দিলে। এখন বোঝো মজা!’

হরিপদের কথা শুনেই হঠাৎ লাশটা বলে ওঠে, ‘ওই ব্যাটা হরিপদ চোর, থাম। আমাকে নিচে নামা।’

এভাবেই বাড়ির কর্তার বুদ্ধিতে চোরটা ধরা

পড়ে।- সংগ্রহেঃ মুশফিকুর রহমান, সোনাডাঙ্গা, খুলনা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

124) আহোল

তোমরা কি কখনো এমন রোগে পড়েছ যে একটি জিনিস দুটি করে দেখেছ? আমাদের সময় এমন রোগ হলে লোকে তাকে বলত ‘আহোল’। আহোল সবকিছু দুটো করে দেখত। তখন যে মজার মজার কাণ্ড ঘটত, তা আর বলার মতো না।

এমনই এক আহোলের বাড়িতে একদিন একটি মুরগি চলে এল। একটি মুরগি, কিন্তু চোখে সমস্যা থাকায় আহোল দুটি মুরগি দেখল। একটু পর একজন লোক এসে বলল, ‘এই মুরগিটা আমার। আমি নিয়া গেলাম।’

আহোল তখন বলল, ‘আমারে বোকা পাইছেন? মুরগি হইল দুইডা, আর আপনে কইতাছেন একটা। তার মানে এই মুরগি দুইডার মালিক আপনে না, অন্য কেউ।’

মুরগির মালিক বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কী আহোলের পাঙ্লায় পড়লাম রে!’

আহোল আরও খেপে গেল। বলল, ‘ফাইজলামি করেন? আমি যদি আহোল হইতাম, তাইলে দুইডা মুরগি কি চাইরটা দেখতাম না?’-

সংগ্রহেঃ তানজিনা মিলি, শিক্ষা বোর্ড ল্যাব. কলেজ, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

125) ফার্মগেটের টিভি

গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে বেড়াতে এসেছে এক বোকা লোক। গাবতলীতে বাস থেকে নেমে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ফার্মগেট। হঠাৎ তার চোখ গেল বড় স্ক্রিনটার দিকে। ‘আরে, এত্ত বড় টিভি!’ হাঁ করে সে টিভি দেখতে লাগল।

হঠাৎ পেছনে একজনের আগমন, ‘অ্যাঁই, এখানে কী করিস?’

‘দেখছেন, কত্ত বড় টিভি। আচ্ছা, ওটা ওইখানে কেন?’ বোকা লোকটি প্রশ্ন করল।

‘ও! এটা তো আমারই। বিক্রি হবে। তাই ওপরে উঠিয়ে রেখেছি।’

‘কত দাম?’

আপাদমস্তক ওকে মাপল লোকটা, ‘বেশি না, দুই হাজার টাকা মাত্র। তুই নিলে দুই শ টাকা কম।’

‘পাঁচ শ টাকা হয় না?’

‘ঠিক আছে। তোর জন্য আরও তিন শ টাকা কম, পনের শ টাকা।’

‘আট শ!’

‘চৌদ্দ শ!’

শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকায় দরদাম ঠিক হলো।

‘তুই এখানেই থাক, আমি মই নিয়ে আসছি।’

এই বলে এক হাজার টাকা নিয়ে লোকটি চলে গেল। টিভিবিফ্রেতা লোকটি আর এল না।

বাধ্য হয়ে গাবতলীতে ফিরে গেল সে। ওখানে কোনোমতে রাত কাটিয়ে সকালে আবার সে ফিরে এল ফার্মগেটের ওভারব্রিজে।

প্রতারক লোকটি আবার এল। ‘অ্যাঁই, এখানে কে রে?’ পেছন থেকে ডাকল সে। গ্রামের লোকটিকে দেখে সে তার ভোল পাণ্টে ফেলল, ‘আরে তুই! কোথায় গিয়েছিলি? আমি তো রাতে মই এনে দেখি তুই নেই!’

‘ঠিক আছে, এখন টিভি নামায় দ্যান।’

‘আজ তো টিভির দাম বেড়ে গেছে। আজ পাঁচ শ টাকা বেশি লাগবে।’

ট্যাঁক থেকে টাকা বের করল গ্রামের লোকটি।

‘ঠিক আছে, নেন পাঁচ শ টাকা। কিন্তু আজকে মই আনতে আমি যাব।’ – সংগ্রহেঃ বিশ্বজিৎ দাস, দিনাজপুর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০০৯

126) বিদায়ের আগে

শিরোনামগুলো...

সংবাদ শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগ মুহূর্তে সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা ঘটা করে জানিয়ে যান শিরোনামগুলো। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যদি এর প্রভাব পড়ে, তাহলে কেমন হয় সেটাই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার। অনেক দিন থাকার পর বিদায় নেবে মেহমান, বিদায় নেওয়ার আগে সে এই বাড়িতে থাকার সময়ের নানা বিষয় বলতেই পারে শিরোনাম আকারে- নিচ্ছি বিদায়, বিদায় নেওয়ার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার-

-মেয়াদোত্তীর্ণ মাছের তরকারি খেয়ে পেটের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।

-টয়লেটের সিটকিনির নাজুক অবস্থা এবং টয়লেটে ফুটো বদনার অবস্থান।

- থাকার ঘরে পর্যাপ্ত মশা ও ছারপোকার আনাগোনা।
- একান্তই পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে এই কয়েক দিন অবস্থান।
- সজ্ঞানে আর কখনো এই বাড়িতে বেড়াতে না আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। চেনাজানা এক দোকান থেকে অনেক কিছু কেনার পর এবার বিদায়ের পালা। আর বিদায়ের আগে শিরোনামগুলোর পরিবেশনা-
- একই দোকানে সব জিনিস পাওয়া যাওয়ায় আমাদের ব্যাপক সন্তুষ্টি।
- কিছু কমিশন দেওয়ায় এই সন্তুষ্টিতে নতুন মাত্রা যোগ।
- বকেয়া টাকাগুলো মাস দুয়ের মধ্যে না চাওয়ার জন্য ম্যানেজারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান।
- নির্দিষ্ট সময়ের আগে জামার রং নষ্ট হয়ে গেলে ফেরত দেওয়ার হুমকি।
- ম্যানেজারের পক্ষ থেকে চা না খেয়ে কফি খাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অনেক দিন জেল খাটার পর শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে জেল থেকে বিদায়। বিদায়ের আগে শিরোনামগুলো আরেকবার-
- ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেলকে 'শ্বশুরবাড়ি' আখ্যাদান।
- বছর বিশেক বিনা খরচাপাতিতে কাটিয়ে দিতে পারায় ব্যাপক উচ্ছ্বাস।
- এমন ঝঙ্কিঝামেলামুক্ত জীবন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করায় বিস্তর মনঃক্ষুব্ধতা।
- জেলখানায় বসে বসে আমি ধরা খাইছি বইয়ের রচনাকাজ সমাপ্ত।
- ফুলের মালা নিয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ চেলাপেলার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ। রাজনীতি থেকে আজকাল বিদায় নিচ্ছেন অনেক প্রবীণ নেতাই। বিদায়ের আগে তাঁরা জানিয়ে যেতে পারেন তাঁদের দীর্ঘ রাজনীতিজীবনের ঘটনাবলি শিরোনাম আকারে-
- দলের স্বার্থে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার চেয়ার ছোড়াছুড়ি।
- মন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে বলেও না-দেওয়া এবং প্রতারণা।
- বাচ্চা নেতারা 'বুইড়া' বলে ডাকায় ব্যাপক উত্তেজনা।
- উড়িয়ে দেওয়া যায় না নতুন দল গঠনের

সম্ভাবনাও।

-এখন থেকে নিজের বাজার নিজে করা যাবে, কাজের ছেলে টাকা মারতে পারবে না-এ জন্য অতিমাত্রায় খোশ আমদেদ।যে আপনার দীর্ঘ সময়ের সফরসঙ্গী, একসময় অবশ্যই সে বিদায় নেবে। বিদায়ের আগে শিরোনামগুলো-

-জানালার পাশে বসতে না দেওয়ায় কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টি।

-নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে দু-একবার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ায় মানসিক ক্ষোভ।

-শুরুর দিকে মলম পার্টির সদস্য হিসেবে সন্দেহ করলেও এ মুহূর্তে ভালো মানুষ হিসেবে স্বীকৃতিদান।

-মজার মজার গল্প বলে ভ্রমণটা মজাদার করে তোলার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

-মোবাইল ফোনের নম্বর বিনিময় এবং ফোন করার অনুরোধ।কাজকর্মে ফাঁকি দেওয়ায় চাকরি চলে যেতেই পারে আপনার। তখন কর্মস্থল থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিদায় নেওয়ার আগে শিরোনামগুলো-

-বসের কাছে একাধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা।

-মনে মনে বসের চৌদ্দগুষ্টি তুলে গালিগালাজ।

-এক দিনের মধ্যে গত মাসের বেতন পরিশোধের আলটিমেটাম।

-বসকে বাগে পেলে দেখে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

-‘দেশে কি চাকরির অভাব নাকি’ বলে আত্মসাত্বনা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

127) ঢাকা শহরে মানুষ

বিন্যাস...

ঢাকা শহরে মানুষ এখন প্রায় দুই কোটি। শহরের আনাচ-কানাচে যে যেখানে পারছে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে নিচ্ছে। প্রচণ্ড গরম, পানি সমস্যা, যানজট-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লোডশেডিং। এসবের মধ্যে অনেকেই তাদের কাক্ষিত মানুষকে খুঁজে পেতে গলদঘর্ম হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে এলাকাভিত্তিক মানুষ বিন্যাস করলেই কিন্তু এ সমস্যা আর থাকে না। চলুন, সেই রকম কিছু বিন্যাসকৃত এলাকা দেখা যাক। শহর ঘুরে সেটাই জানাচ্ছেন রাকিব কিশোর।মিরপুর

শুধু মির বংশীয় লোকজন এ এলাকায় থাকবেন। অন্য কোনো বংশ বা গোত্রের লোক এখানে থাকতে পারবেন না। যাঁদের নামের আশপাশে মির কথাটি যুক্ত থাকবে, তাঁরা এই এলাকার বাসিন্দা হতে পারবেন। যেমনঃ মির কাশেমমহাখালী
যাঁরা সব হারিয়েছেন, একেবারে নিঃস্ব-
জমিজিরাত এমনকি ঘটিবাটিও পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা যাঁদের নেই, তাঁরাই এই এলাকায় থাকবেন।

(বি. দ্র.)-যাঁরা প্রথম প্রথম বা নতুন নতুন সর্বহারা বা একেবারে খালি হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিবাসস্থল হিসেবে নোয়াখালীকে বেছে নিতে পারেন। কল্যাণপুর

দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় যাঁরা সব সময় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, তাঁরাই কেবল এ এলাকায় অবস্থানের সুযোগ পাবেন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা অগ্রাধিকার পাবেন। নীলক্ষেত

প্রতিনিয়ত প্রেমে পড়ে ছাঁকা খেয়ে যাঁরা ব্যথা-বেদনায় নীল হয়ে গেছেন, যাঁরা একটু নড়াচড়া করলেই বিগত প্রেমের ব্যথা ঝিলিক মেরে বের হয়ে আসে-তাঁরাই হতে পারেন নীলক্ষেত এলাকার নাগরিক। মগবাজার

যাঁদের বাসায় এত এত মগ আছে, যা দেখলে যে কেউ আপন মনে বলে ওঠে, ‘এ তো রীতিমতো মগের মল্লুক দেখছি’, কেবল সেসব পরিবারই মগবাজার এলাকায় নিজস্ব আবাসভূমি গড়ে তুলতে পারে। মালিবাগ

বাগান থাকুক বা না থাকুক, যাঁরা জীবনে একবার হলেও বাগানে এক দিনও কাজ করেছেন, অথবা কমপক্ষে এক হাজার গাছ লাগিয়েছেন, তাঁরাই মালিবাগকে আপন করে নিতে পারেন। সদরঘাট

যেসব লোক সবাইকে দেখান যে তাঁরা অনেক বড়লোক, কিন্তু আদতে তাঁদের কিছুই নেই, ভেতরে পুরোপুরি সদরঘাট, কেবল তাঁরাই এ এলাকায় থাকার ভিসা পাবেন। কচুক্ষেত
যাঁরা জীবনে সব ক্ষেত্রে পরাজিত, যেখানে গেছেন শুধু কচুই দেখেছেন, কিছুই পাননি এ ভুবনে, কেবল তাঁরাই কচুক্ষেতে রাত কাটাতে পারেন।

(বি. দ্র.)-এখানেও যদি কেউ বিছানা-বালিশ

কেড়ে নিয়ে আপনাকে কচু দেখায়, তাহলে আপনি কচুক্ষেতের এলিট শ্রেণী হিসেবে আজীবন সম্মাননা পাবেন। যাত্রাবাড়ি নাটক সিনেমার এই যুগে দেশ থেকে যাত্রা উঠেই যেতে বসেছে। এখনও অনেকে আছেন যারা এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। অতীতে যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন এমন লোকরাই এখানে বসবাস করতে পারবেন। বনানী

যাঁদের নানি এখনো জীবিত, কেবল তাঁরাই নানিসহ এ এলাকায় থাকতে পারবেন। নানি গত হয়ে গেলেই তাঁরা র্যাংকিং অনুযায়ী ঢাকার অন্য যেকোনো জায়গায় শিফট হতে পারবেন। গুলশান

চাপাবাজিতে বা গুলমারার ক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের অসীম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, যাঁদের একনামে সারা দেশের পোড় খাওয়া মানুষ চেনে, কেবল তাঁরাই এই স্থানে বসবাসের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। শান্তিনগর বাংলাদেশে শান্তি একটি আপেক্ষিক ধারণামাত্র। তবুও যাঁরা ভাবেন যে অনেক শান্তিতে আছেন, তাঁদের জন্য এই এলাকা। তবে ঢাকা শহরের যে অবস্থা তাতে কোনো প্রকৃত লোক পাওয়া যাবে না যে এই এলাকার আসল বাসিন্দা হতে পারেন। ফার্মগেট

যেসব লোক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে গাধা, গরু উপাধি পেয়েছেন, কেবল তাঁরাই হবেন ঢাকার এই খামার অংশের উপযুক্ত দাবিদার। জীবনে দুঃসাহসী কাজ করে যাঁরা বাঘের বাচ্চা ও সিংহের বাচ্চা উপাধি অর্জন করেছেন, তাঁরাও অগ্রাধিকার পাবেন। বাংলা সিনেমার নামকরা নায়িকারা যখন ইচ্ছে এখানে বেড়াতে আসতে পারেন। তবে খুব সাবধানে, আশপাশের লোকজন যেন উঠে না যায়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

128) কিছু হারানো বিজ্ঞপ্তি

কেউ হারিয়ে গেলে তার গায়ের রং শ্যামলা বা তার উচ্চতা ৫-২২ এগুলো কোনো মানুষকে চেনার জন্য শনাক্তকারী কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বাংলাদেশে কত লাখ শ্যামলা মানুষ আছে, এর কি কোনো ঠিক আছে? কাজেই

এমন বিভ্রান্তিকর হারানো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে নিম্নোক্তভাবে নতুন করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। হারানো বিজ্ঞপ্তি মধ্যবয়স্ক এক হাফ মেন্টাল ব্যক্তি হারানো গেছে। তাকে চেনা খুব সহজ। আপনি তার সামনে পড়লেই সে আপনাকে নানা কাজের আদেশ দেবে, হুমকি দেবে আর চিৎকার করে বলবে, ‘আমি পেরসিডেন বুশ, বুশ, বু...শ।’ তাকে যদি কিছুতেই শান্ত করতে না পারেন, তাহলে লাদেনের ভয় দেখান। তাহলেই সে একেবারে চুপসে যাবে। তারপর তাকে পোঁছে দিন আমাদের ঠিকানায়। হারানো বিজ্ঞপ্তি ফুটফুটে, মিষ্টি চেহারার বাচ্চা একটি মেয়ে হারানো গেছে। তাকে আদর করে আইসক্রিম কিনে দিলে সে খুব খুশি হয়ে আইসক্রিমটি নেবে। তারপর আইসক্রিমদাতার গালে কষে একটি চড় কষাবে। এটাই হচ্ছে তার ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা। এরপর যদি ওকে ওর নাম, বাসার ঠিকানা এসব জিজ্ঞেস করেন, তাহলে ও কিছুই বলবে না; চুপচাপ আইসক্রিম খাবে। আইসক্রিম খাওয়া শেষ করে আইসক্রিমের কাঠি দিয়ে আপনার চোখের ভেতর খোঁচা দেবে। এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাচ্চা মেয়েটির দেখা পাওয়ামাত্রই ওকে পোঁছে দিন আমাদের ঠিকানায়। হারানো বিজ্ঞপ্তি বাচাল প্রকৃতির একটি বাচ্চা মেয়ে হারানো গেছে। তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার নাম কী?’ তাহলে সে বলবে, ‘আইসক্রিম খাব’। যদি বলেন, ‘তোমার বাসা কোথায়?’ তাহলে সে বলবে, ‘আইসক্রিম খাব, আইসক্রিম খাব’। যদি আরও কোনো প্রশ্ন করেন, তাহলে সে ‘আইসক্রিম, আইসক্রিম’ চিৎকার করে আপনার দুই কানের না হলেও অন্তত এক কানের পর্দা ফাটিয়েই ফেলবে। অন্য কানের পর্দা অক্ষত রাখতে ওকে আইসক্রিম কিনে দিন। তারপর আইসক্রিমের দাম আর যাতায়াত ভাড়া নিতে চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

129) বাড়ির বিভিন্ন অংশ তৈরির ইতিহাস

বর্তমান সময়ের খুব আলোচিত বিষয় হচ্ছে বাড়ি। একটি বাড়ির রয়েছে হরেক রকম অংশ। ভবিষ্যতে নিজের একটি বাড়ি বানানোর লক্ষ্যে

সেই অংশগুলো নিয়েই গবেষণায় মেতেছেন
মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। দরজা
এক দেশে ছিল খুব বোকা একজন লোক।
বোকা বলে তার মনে খুব দুঃখ। একদিন সে
কোথায় যেন গুনল চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
তার পর থেকেই সে ভাবতে থাকল কী করা
যায়! কী করা যায়! একদিন বুদ্ধি বের করল,
চোরকে পালাতে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে
সেটা সম্ভব? সে একটা ঘর বানাল, তারপর
চোর প্রবেশের জন্য সামনের দিকে একটি
দরজা বানাল, আর চোর পালানোর জন্য
পেছনের দিকে বানাল আরও একটি দরজা।
জানালা

জানালা তৈরির পেছনে যে জিনিসটির অবদান
সবচেয়ে বেশি, সেটি হচ্ছে ভালোবাসা। মূলত
ভালোবাসাকে পালানোর সুযোগ করে দিতেই
জানালা তৈরি। এর পর থেকে সংসারে অভাব
দেখা দিলেই ভালোবাসা পেছনের জানালা দিয়ে
পালাচ্ছে। ছাদ

আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা দেখে
মানুষ একসময় খুব ভয় পেত। কখন আবার
আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ে-এই ভয়ে তারা রাতে
ঘুমাতেই পারত না। তখনই তারা মাথা খাটিয়ে
মাথা বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করল-তৈরি
করল ছাদ, যাতে আকাশ ভেঙে পড়লেও মাথায়
না পড়ে। সিঁড়ি

তখনকার দিনে মানুষ ওপরের তলায় ওঠার
জন্য দড়ি ব্যবহার করত। কিন্তু কোনো এক
বছরে পাট উৎপাদন কম হওয়ায় দড়ির দাম
গেল খুব বেড়ে। তখন দড়ির বিকল্প হিসেবে
ব্যবহার শুরু হলো মইয়ের। এতে শুরু হলো
এক নতুন সমস্যা। লোকজন দোতলা, চার
তলায় তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে শুরু করল।
অবশেষে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তৈরি
করা হলো কংক্রিটের সিঁড়ি। দেয়াল

তখন সারা দেশে প্রবল নির্বাচনী হাওয়া। কিন্তু
চুনকাম করার জায়গা না থাকায় নেতারা
মানুষের শরীরেই নির্বাচনী পোস্টার লাগাত,
আর চুনকাম করত। আর ওই লোক সারা দিন
কষ্ট করে রোদে দাঁড়িয়ে থাকত। এই কষ্টের
হাত থেকে বাঁচতেই দেয়াল তৈরির আইডিয়া।
দেয়াল তৈরির ফলে এখন কত সহজেই সেখানে
পোস্টার লাগানো যায়, আর চুনকাম করা

যায়! থিল

ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতেই দরজা, জানালা, বারান্দা ও ছাদে ব্যবহারের জন্য থিল তৈরি। কিন্তু মশাদের প্রযুক্তিও অনেক উন্নত হওয়ায় থিলে আর কাজ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সেই থিল বর্তমানে মশারিতে রূপ নিয়েছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

130) আলাদিনের চেরাগ পেলেতা জাদুঘরে দিয়ে দেব

হুমায়ুন ফরীদি

তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। যাঁরা জানেন না, শুধু তাঁদের জন্য বলা। ব্যক্তিজীবনে দারুণ মজার এক মানুষ তিনি। কতটুকু মজার? তা বোঝাতেই এবার এসেছেন আলোচনে। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা। হুমায়ুন ফরীদি কেন বিখ্যাত?

-আমি কি বিখ্যাত নাকি? তাজ্জব ব্যাপার!!!
বুদ্ধিমান আর বোকার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

-প্রথমে বরং মিলটা বলি। দুটোই 'ব' দিয়ে শুরু। আর পার্থক্য? বানানে।

কী পাওয়ার যোগ্যতা আপনার আছে, যা এখনো পাননি?

-মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপ...

দুঃখ পান কী ভেবে?

-এত সুখ কেন?

আশ্চর্য হন...

-চাকা নেই, তবু দেশটা ঠিকঠাক চলছে!

আশ্চর্য!!!

কোনো ব্যাংকে ডাকাতির পর প্রথম কোন কাজটা করা হয়?

-এ দেশে যেকোনো দুর্ঘটনা মানেই তদন্ত কমিশন গঠন।

ঢাকা শহরে এখনো যে দু-একটি গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তার পেছনে কী কারণ বলে মনে করেন?

-আমাদের দৃষ্টিশক্তি এখনো জীবিত!

আলাদিনের চেরাগ পেলে কী করবেন?

-জাদুঘরে দিয়ে দেব।

কোথায় আপনার হারিয়ে যেতে নেই মানা?

-মনে মনে...

কী কারণে এখনো অস্কার বিজয়ী অভিনেতা হতে পারেননি?

-পক্ষপাত, বুঝলেন, পক্ষপাতের কারণেই

এখনো আমাকে অস্কার দেওয়া হয়নি।

ভিন্ন ধরনের একটি প্রশ্ন করি। আচ্ছা, বলুন দেখি, অপারেশনের সময় অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসক বাদে অন্য কাউকে কেন থাকতে দেওয়া হয় না?

-সবাই অপারেশন শিখে ফেললে চিকিৎসক কী করে থাকেন?

লবণে আয়োডিন থাকলেও চিনিতে থাকে না কেন?

-এক শরীরে আর কত লাগে?

আজকের হুমায়েন ফরীদি আগামী দিনের...

-দেশের একজন বৃদ্ধ নাগরিক।

গভীর রাতে কী ভাবেন?

-ভোর আসছে...

ঘুমানোর আগে শেষ কোন কাজটি করেন?

-চোখ দুটো বন্ধ করি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

131) আমরা কি এমন অন্ধকার চেয়েছিলাম?

রবিন তার সদ্য কেনা কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারছে না। যখনই কাজটার ৭০ থেকে ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয় তখনই বিদ্যুৎ চলে যায়। তাকে আবার শুরু থেকে কাজটা করতে হয়। ২০২১ সালে যদি দেশটা সত্যি সত্যি ডিজিটাল হয়ে যায় তারই প্রস্তুতি হিসেবে বেচারা নতুন কম্পিউটার কিনেছিল। সেদিন বিকেলে ভয়ানক বিরক্তি নিয়ে তার বাবা যখন অফিস থেকে এসে বাথরুমে ঢুকে আধা গোসল হয়ে বের হলেন তখন রবিন বাবার দিকে তাকিয়ে ইয়াহু বলে একটা ছোটখাটো চিৎকার দিল। এমনিতেই তার বাবার মেজাজ তিরিক্ষি, সেই সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাওয়ার সময় দেখেছেন বাসায় বিদ্যুৎ নেই, এখন এসেও দেখছেন বিদ্যুৎ নেই। এই অবস্থায় ফাজিল ছেলেটা এমন কী পেয়েছে যে ইয়াহু বলে চিৎকার শুরু করবে।

‘বাবা, বাবা পৃথিবীতে তো টাইম মেশিন আবিষ্কার হয়ে গেছে।’ ধমক না দিলেও বাবা তার দিকে যে চাহনি দিলেন সেটা রীতিমতো যুদ্ধ শুরুর নির্দেশের মতো। কিন্তু বরাবরের মতো রবিন বাবার মেজাজকে তোয়াক্কা না করে বলেই চলল, ‘আচ্ছা বাবা, ধরো ইংল্যান্ড,

আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন শিক্ষিত লোক যদি বাংলাদেশে আসে, তাহলে সে কী দেখবে?’ বাবা চুপ, তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে; কিন্তু টেবিলে বসতে পারছেন না বিদ্যুৎ নেই, ফ্যান না ঘুরলে তিনি আবার খেতে পারেন না। এবার বোধহয় তিনি একটু মনোযোগ দিয়েছেন ছেলের কথায়। আপাতত বিদ্যুৎ না আসা পর্যন্ত যতক্ষণ ফালতু আলোচনা করে সময় কাটানো যায়, ততই মঙ্গল। ‘সেই ভদ্রলোক তাদের ইতিহাস বইয়ে যা যা পড়েছিল তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তার বাস্তব চিত্র এখানে দেখতে পাবে। তার মানে সে তার সময়ের অতীতে চলে গেল। আবার বাংলাদেশের একজন যদি ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া যায়, সে গিয়ে কী দেখবে? সে যা কল্পনাও করতে পারেনি ওখানে তা-ই চলছে। তার মানে কী? একই পৃথিবীতে আমরা চাইলে অতীত এবং ভবিষ্যতে চলে যেতে পারি। টাইম মেশিনের ধারণাটা তো এ রকমই ছিল, তাই না বাবা?’ অন্য সময় হলে ছেলের এমন মন্তব্য শুনে হয়তো কষে একটা থাপ্পড় লাগাতেন; কিন্তু এই লোডশেডিং, রাস্তার অসহনীয় জ্যাম আর আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর অরাজকতার খবরের মধ্যে তাঁর মনে হলো রবিন খুব একটা মিথ্যে বলেনি।

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর প্রযুক্তিবিদ ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় সেদিন এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তিকে কয়েক বছরের মধ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। শুনে খুব ভালো লেগেছে। আমরা নিশ্চয় বর্তমান সরকারের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ খুব শিগগিরই পেয়ে যাচ্ছি। আরও ভালো লাগত যদি তিনি বলতেন ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি চালাতে কোনো বিদ্যুৎ লাগে না।

বিদ্যুৎ পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণে আফ্রিকার বেশির ভাগ মানুষই কৃষ্ণবর্ণের হতো, ইদানীং কিছুটা পরিবর্তন এসেছে; ওসব জায়গায় এখন সাদা মানুষও দেখা যায়। একটি টিভি চ্যানেলে এক বিজ্ঞাপনদাতা এসে অভিযোগ করলেন, আমরা আর বিজ্ঞাপন দিব না। যে হারে বিদ্যুৎ যায়, তাতে মানুষ টিভিই তো দেখার সময় পায় না।

প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল ঘুরে এসে এক প্রতিনিধি তাঁর পত্রিকার সম্পাদককে লোডশেডিংয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘ওখানে প্রতিদিন সতেরো-আঠারোবার কারেন্ট যায়, আর একবার গেলে সাত-আট ঘণ্টা কারেন্ট আসে না।’ ব্যাপারটা কিছুটা তা-ই, ঠিক বোঝা যায় না কতক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে আর কতক্ষণ থাকে না।

আপনি কি জানেন ছাত্রলীগ কেন ক্যাম্পাসে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে? কারণ হচ্ছে লোডশেডিংয়ের ফলে তারা ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারছে না। তাই জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা প্রতিবাদের এই ভিন্নপথ বেছে নিয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য তো আর বিরোধী দলকে দোষী করলে হবে না, তাই মারামারিটা লাগে নিজেদের মধ্যেই।

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে নিজেদের ইশতেহারকে বলেছিলেন দিনবদলের সনদ। সেটা বোধহয় অনেকে ভুলে গেছেন, ভুলে যাওয়াটাই সংগত। আওয়ামী লীগের সব নেতা-কর্মী-সমর্থকের জন্য একটা পরীক্ষার আয়োজন করা দরকার। সেখানে শুধু একটাই প্রশ্ন থাকবে, ‘২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার ছেপেছিল সেখান থেকে যতটুকু পারো মুখস্থ লেখো।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পরীক্ষাটা আপনিও দিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু সেদিন পরীক্ষার হলে যদি বিদ্যুৎ না থাকে তার জন্য পরীক্ষা বাতিলের ব্যবস্থা থাকবে কি না, সেটাও ভাবা দরকার।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সকালে ভোটকেন্দ্র থেকে খুব হাসি-খুশিভাবে ফেরে কৌশিক। পরদিন ভোরে তার হাসি কান পর্যন্ত লম্বা হয়। টিউশনির জমানো টাকা দিয়ে বাজার করে আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করে খাওয়ায়। খাওয়ার টেবিলে ঠিক প্রধানমন্ত্রীর মতো করে সেও বলেছিল দিনবদলের কথা, নতুন বাংলাদেশের কথা। এবারই প্রথম ভোটের হয়েছিল সে। প্রথমবারেই তার ভোট দেওয়া দল ক্ষমতায় গেছে। তার তো খুশি হওয়ার কথাই। কৌশিক এখন আর কোনো আত্মীয়ের বাসায় যায় না। কারও সঙ্গে দেখা হলে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে। মনে মনে শুধু ভাবে, ‘আমরা কি এই আওয়ামী লীগ চেয়েছিলাম? আমরা কি

এমন একটি সরকার চেয়েছিলাম? তাহলে কি এ দেশের মানুষের ভাগ্য কোনো দিনও বদলাবে না?

হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, ‘আমাদের যায় দিনগুলো ভালো যায়।’ আজ তো বিদ্যুৎ তাও কয়েকবার এসেছিল, কিন্তু আগামীকাল?

তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

132) ডলি

আমার স্ত্রী একদিন বললেন, দেখো, আমাদের বাড়িতে একটা কুকুর পুষলে বেশ ভালো হয়। আমাদের একঘেয়ে জীবনটা বিস্তীর্ণ।

কথাটা শুনে মনে একটু আঘাত পেলাম। আমার সঙ্গী তাহলে তাঁর কাছে একঘেয়ে লাগছে! এ ছাড়া ভাবলাম, মানুষের জীবনে কুকুর প্রায় বন্ধুর মতোই। খুব উপকারী বন্ধু। কাজেই স্ত্রীর কথায় রাজি হলাম।

তারপর একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম, আমার বিছানার ওপর একরাশ কালো উল পড়ে আছে। খানিকটা উল লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে লেজের মতো। আমি ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই উলের রাশ থেকে গরর-গরর গর্জন শোনা গেল। আমি তার দিকে চোখ পাকিয়ে রইলাম। সেও। অর্থাৎ প্রথম দর্শনে দুজন দুজনকে পছন্দ করলাম না।

স্ত্রী গদগদ হয়ে বলল, জানো, এ হচ্ছে ডলি। মেয়ে তো, তাই নাম ডলি।

ডলি তার উলের ভেতর থেকে খুব ভক্তিভরে আমার স্ত্রীর দিকে চাইল। ডলির চোখের ভাব দেখে মনে হলো, সে তার মালিককে জিজ্ঞেস করছে-এই অদ্ভুত লোকটা কে? এখানে কেন? দেব নাকি কামড়ে?

আমি স্ত্রীর মন রেখে বললাম, বাহ্, বেশ তো কুকুরটা! তা এ সপ্তাহটা কাটবে ভালো আমাদের।

-তার মানে? এক সপ্তাহ বলছ কেন?

-মানে, কুকুর এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না, জায়গা বদল করতে চায়। নিকোলাইকে দিয়ে দিলেই হবে।

-সে কি কথা! কী যা-তা বলছ! ডলি আমাদের কাছেই থাকবে।

কুকুররা বোধহয় মানুষের কথা বুঝতে পারে।

ডলিও পারল বোধহয়। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার

স্ত্রীর হাতখানা চাটতে লাগল, আর আমার দিকে এমন কটমট করে চাইল যে লজ্জায় আমি এতটুকু হয়ে গেলাম।

আমি মনে মনে কুকুরটাকে বয়কট করলাম। ঠিক করলাম ওটাকে একদম পাত্তা দেব না। আর সুযোগ-সুবিধা পেলেই পশ্চাদ্দেশে লাথি কষাব। ওকে বুঝিয়ে দেব, ও এ বাড়িতে একটা সামান্য কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকে মাথা তুলতে দেওয়া ঠিক হবে না। সে কি আমার মনের কথাও বুঝতে পারল? সে তার দুপাটি ধারালো দাঁত বার করে আমার দিকে চেয়ে আবার শব্দ করল, গরর...গরর। একদিন সকালে উঠে দেখি আমার খাটের নিচে চটিজোড়া নেই। আমি সারা ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াতে লাগলাম আর ডলি সর্বক্ষণ আমার পেছন পেছন ঘুরতে লাগল। মুখে-চোখে তার কী আনন্দ! আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এই অপকন্ম ডলিরই। কিন্তু হয়, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। সেই চটিজোড়া আমার স্ত্রী পরে বার করলেন ঘরের ময়লা ফেলার ঝড়ির ভেতর থেকে। আমি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ছড়িটা বার করে ডলিকে দেখিয়ে শাসিয়ে বললাম, ফের এ রকম করলে ছড়িটা তোর পিঠে ভাঙবে।

ডলি মনে হলো আমার কথাটা বেশ মন দিয়েই শুনল। এমনকি মনে হলো সে মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে কথাটা। আর সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমার ছড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল না। আহা, ওটা আমার শখের ছড়ি। আমার এক বন্ধুর উপহার। এখন তো শীতকাল, বাইরে বরফ পড়ছে। ডলির তো বাইরে যাওয়ার কথা নয়। সে কি হজম করে ফেলল ছড়িটা, না কি বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এল?

ক্রমেই ডলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তেতো হয়ে উঠল। কিন্তু বদমায়েশি মতলব আঁটার অনেক সময় তার। অথচ আমার অত সময় নেই।

আর এমন বদমায়েশ এই ডলি যে কী বলব, আমার স্ত্রীর বন্ধুরা যখন বাড়িতে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে কী ভদ্র ব্যবহার! যেন একটি লেডি। তাঁরা গায়ে হাত বোলালে ও কিছু বলে না। আর আমার বন্ধুরা যখন আসে, তখন তার ভদ্রতাটুটুতা সব চুলোয় যায়। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দাঁত বার করে নাক কুঁচকে চোখ

পাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। পারে তো জামাটামা টেনে ছিঁড়ে দেয়।

একবার আমার এক পুরোনো বন্ধু এসেছিল আমার বাড়িতে। তাকে বসিয়ে রেখে আমি গেলাম দোকানে কিছু খাবার কিনে আনার জন্য। ফিরে এসে দেখি, আমার সে বন্ধু ভয়ে লাফাচ্ছে আর ডলি ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাচ্ছে। আর বেচারার প্যান্টের নিচের দিকটা ডলি তার দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাকে দেখে ডলি তাকে ছেড়ে দিয়ে তার শিকারের প্রতি একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজয়গর্বে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

ডলি আমার স্ত্রীর ভালোবাসা আদায় করেছে। শুধু এ জন্যই বাধ্য হয়ে তার বেয়াদবি ক্ষমা করতে হলো। এমনকি কষ্ট করে জোগাড় করা একটা ফুটবল ম্যাচের টিকিট পর্যন্ত ডলি গলাধঃকরণ করেছে জেনেও নিজেকে বহু কষ্টে সংযত রাখলাম। একদিন বারান্দায় বালিশের ওয়াড়গুলো যখন শুকোচ্ছিল, তখন ওই ডলি সবগুলো ক্লিপ থেকে টেনে খুলে নিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিল। মনে হলো, সাদা পাখিরা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি নিচে ছুটে নেমে গিয়ে সেগুলো এদিক-ওদিক থেকে কুড়িয়ে আনলাম। তা দেখে পাড়ার ছোড়াগুলোর কী তখন সিটি মারা! যেন মঞ্চের তাদের প্রিয় নায়ককে দেখতে পেয়েছে।

এবার আমি ধৈর্য হারালাম। স্ত্রীকে বললাম, আর পারা যায় না। এখন উচিত হচ্ছে ওই ডলিকে জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া। আমার এই প্রস্তাবে স্ত্রী গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে জানালেন, আমার মতো নিষ্ঠুর নাকি এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। অতএব, ঠিক হলো ডলিকে একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে অন্তত ১০ কিলোমিটার দূরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে...।

তা-ই হলো। বেশ বড় এক টুকরো হ্যাম অতি যত্নে ডলিকে খাওয়ানো হলো। পরে তাকে ট্যাক্সিতে তোলা হলো। ১০ কিলোমিটার দূরে একটা খোলা নির্জন জায়গায় তাকে ট্যাক্সি থেকে নামানো হলো এবং আমি আমার মনের আনন্দে ডলির পশ্চাদ্দেশে সজোরে মারলাম একটা লাথি। ডলি ছিটকে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। আমি ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে

বাড়ির পথে রওনা দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ি ফিরে দেখি ডলি আমার চেয়েও আগে এসে পৌঁছে গেছে বাড়িতে। আমাকে দেখেই সে তার ধুলোভর্তি গা-টা এমন জোরে ঝাড়ল যে আমার পোশাক, চোখ-মুখ সব ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। ডলি আমার দিকে লোমের ফাঁক দিয়ে কুতকুত করে চেয়ে দেখে নিল একবার।

ভাবখানাঃ কেমন মজা! তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে ঢুকে গেল ফ্ল্যাটের ভেতর।

অগত্যা আমাদের একসঙ্গে আবার ঘর করতে হলো। মনে মনে বুঝলাম, এই ডলির হাত থেকে আমার পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কাজেই আমি কেবলই ভাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কুকুরই হচ্ছে মানুষের একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু।

কী, এই রকম একটি বিশ্বাসী বন্ধু চাই নাকি? তাহলে কিছুদিন ধৈর্য ধরো। ডলির বাচ্চা হলে তোমাকে একটা দেব। কথা দিচ্ছি। ডি সানিন, রাশিয়ান রম্য লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

133) লোডশেডিং সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন

কোন পাখিকে লোডশেডিংয়ের প্রতীক বলা যেতে পারে?

-কাক ও কোকিল (পৃথিবীর কোনো রং ফরসাকারী ক্রিমই তাদের কাজে আসে না)।

মাথা থেকে চুল পড়া কিসের লক্ষণ?

-মাথায় লোডশেডিংয়ের লক্ষণ।

ভিটামিন 'এ'র অভাবে কী হয়?

-চোখে রাতের বেলায় লোডশেডিং হয়।

রাজপথে কখন লোডশেডিং হয়?

-যখন ওই পথে কোনো ভিআইপি যায়।

হার্ট অ্যাটাক কখন হয়?

-শ্বাস-প্রশ্বাসে লোডশেডিং হলে।

বিয়েবাড়িতে মরিচবাতি জ্বলে-নেভে কেন?

-বাতিগুলোতে লোডশেডিং হয় বলে।

ইলেকট্রিসিটি একবার আসে একবার যায়।

মোবাইলের ব্যালেন্সে লোডশেডিং হলে মানুষ কী করে?

-পরিচিতদের মিসকল দেয়।

কোন খেলার সঙ্গে লোডশেডিং জড়িত?

-টিভি গেম বা কম্পিউটার গেমের সঙ্গে।

শীতকালে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় না কেন?

-আকাশে মেঘের লোডশেডিং থাকে, তাই।

মহাশূন্যে এত অন্ধকার কেন?

-সেখানে এখনো বিদ্যুতের লাইন পৌঁছায়নি বলে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি লোডশেডিং কোথায় হয়?

-লাইট, ফ্যান ও টেলিভিশনে।

আকাশে কখন লোডশেডিং হয়?

-দিনের বেলা সূর্যগ্রহণ হলে।

অমাবস্যা হয় কখন?

-যখন চাঁদ ফিউজ হয়ে যায়।

শহরের বেশির ভাগ লোক ওয়াসার পানি পায় না কেন?

-ওয়াসার পাইপলাইনে লোডশেডিং হয় বলে।

দাঁত দেখার সময় ডাক্তাররা মুখের ভেতর লাইট মারেন কেন?

-মুখের ভেতর কারেন্ট থাকে না, জায়গাটা অন্ধকার থাকে, তাই। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

134) পরীক্ষার হল থেকে...

পরীক্ষা চলছে। পিনপতন নীরবতা হলে। একটু পর পর শুধু পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। কারণ লোডশেডিং। গরমে ঘেমে একেকজন অস্থির। অসহ্য গরম যখন পরীক্ষক-পরীক্ষার্থী কেউই সহ্য করতে পারছে না, তখনই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল একটি ছেলে-কারেন্ট আসছে! চিৎকার শুনে সবাই প্রথমে তাকাল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি ততক্ষণে বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েছে। মিনমিন করে সে বলল, আসলে হঠাৎ কারেন্ট চলে আসায় খুশি হয়ে পড়েছিলাম।- কথাটা শুনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে সবাই। একজন পরীক্ষক বলেন, ভাগ্য ভালো, খুশিতে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করো নাই। তাহলে হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট ছুটে আসতেন! মহিতুল আলম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৭, ২০০৯

135) আমার মাথায় ৫০ লাখ ১৮

হাজারটা চুল

মা দিবস মানেই কি শুধু মায়ের সঙ্গে কথা বলা? সন্তানের সঙ্গে কথা বলেও বুঝে নেওয়া যায় মায়ের হাঁড়ির খবর। আজ আলোচনে কথা বলেছেন আজকের সন্তান এবং আগামীরা মা

দীঘি। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা। মা দিবস মানে বোঝ?

- স্কুলের মিস বলেছে, মা দিবস মানে মায়ের দিন। এক দিনে আম্মু আর বিশেষ কী করবে? তাহলে কি আম্মু ওই দিন বকা আর কানমলা আরেকটু বেশি দেবে?

ঠিক আছে, বাদ দাও। এবার বলো, তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে?

- বাবা।

সে কি? মা দিবস উপলক্ষে তোমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। আজ অন্তত মায়ের কথা বলতে পারতে!

- ওমা! আম্মুই তো শিখিয়ে দিল বাবার কথা বলতে।

ধরো, এক দিনের জন্য তোমাকে আম্মু আর আম্মুকে দীঘি বানিয়ে দেওয়া হলো। কী করবে?

- মা, না, আম্মু হওয়া যাবে না। আম্মু বকা দেবে।

তুমি তো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছ। ভিলেন দেখলে ভয় করে না?

- না তো!

কেন? তবে কারা ভিলেন হলে ভয় পেতে তুমি?

- তেলাপোকা, মাকড়সা কিংবা টিকটিকি, ওরে বাবা!

বলো তো, কোন প্রাণী আমাদের জন্য দুধ, মাংস, ঘি, মাখন সরবরাহ করে? আবার পায়ের জুতা পর্যন্ত জোগায়?

- কেন, বাবা!

কখন তুমি কিছুতেই চোখের পানি আটকে রাখতে পার না?

- আম্মু যখন পেঁয়াজ কাটে।

কী ভাবলে হাসি পায় তোমার?

- নানু বলেছে, বেশি করে আখ খেতে। তাহলে নাকি দাঁত শক্ত হবে। তবে তো সেটা নানুরই বেশি খাওয়া উচিত। তাই না? (হিঃ হিঃ)

তোমার প্রিয় লেখক কে?

- বাবা। বাবাই তো আমার রিপোর্ট কার্ডে নাম সই করে দেন।

কোন ঋতু তোমার মোটেই ভালো লাগে না?

- শীত। আম্মু শুধু তখন বেশি বেশি সবজি খেতে দেয়।

আম্মুকে এমন কিছু বলতে চাও, যা এখনো বলোনি?

- তরকারিতে ঝাল বেশি হলে কি আমি

আম্মুকে কিছু বলি? তাহলে ক্লাস টেস্টে ২ নম্বর কম পেলেই আম্মু এমন করে কেন?

কী খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে তোমার?

– পেনসিল।

আচ্ছা শেষ প্রশ্ন, বলো তো তোমার মাথায় চুল কতগুলো?

– ৫০ লাখ ১৮ হাজার।

সে কি! তুমি গুনেছ নাকি?

– তবে যে বললেন, আগেরটাই শেষ প্রশ্ন! সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৪, ২০০৯

136) মন্দারস

নিউইয়র্কের এক বাসিন্দা গিয়েছে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে। নির্দিষ্ট বোতাম চাপার পর পর্দায় ভেসে এল লেখাঃ ‘পর্যাপ্ত অর্থ নেই।’ লোকটি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ফোন করল সে তার বান্ধবীকে।

বান্ধবী সব শুনে বলল, ‘পর্যাপ্ত অর্থ তোমার থাকলেও এটিএম বুথের অর্থাৎ ব্যাংকের নেই।’

২০০৮ সালের শেষভাগ থেকে আমেরিকায় আর্থিক সংকট শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যাংকে ধস নামে। আমানত হারানো মানুষজন তাই এখন এ রকম নানা কৌতুক করে নিজেদের সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মন্দার ইতিহাস অবশ্য বলে যে আর্থিক সংকটের সঙ্গে হাসি-তামাশার একটি সহসম্পর্ক রয়েছে। ১৯৩৩ সালে মহামন্দার সময় নিউইয়র্ক সান পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে এই মহা বিপর্যয়ের সময়ও কেউ কেউ ঋণ দিতে রাজি। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, ঋণগ্রহীতার বয়স ৮০ বছরের বেশি হতে হবে। এটাই শেষ নয়। দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত হলো, ঋণগ্রহীতার সঙ্গে তার পিতামহকে থাকতে হবে। (অর্থনীতিতত্ত্বের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তের বিধিটি ্রণযোগ্য)।

আর্থিক সংকট থেকে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ যেমন উত্তর আমেরিকা থেকে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে আঘাত হেনেছে, এসব ঠাটা-মশকরাও যেন মুহূর্তে সীমানা ছাড়িয়ে পড়েছে। আর দুটোই ঘটেছে তথ্যপ্রযুক্তির উৎকৃষ্ট যোগাযোগের কল্যাণে! বিশ্বের আর্থিক বাজারগুলো আজ অনলাইন-ব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

টোকিওতে বসে নিউইয়র্ক বা ফ্রাংকফুর্ট স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের ব্যবসা করা যায়। তাই তো এক বাজারের বিপর্যয় ভাইরাসের মতো আরেক বাজারে আঘাত হানে। একইভাবে আমেরিকার কৌতুক সিঙ্গাপুরেও মানুষের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এবং শেয়ারবাজারে।

শেয়ারবাজারে ক্রমাগত ধসে কপর্দকশূন্য হয়ে একজন আতর্কণ্ঠে বলে উঠল, ‘হায় ঈশ্বর! এটা তো তালাকের চেয়ে খারাপ অবস্থা!’

মন্দায় সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় পড়েছে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো, যাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে গিয়ে ফাটকাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং লোকসান গুনেছে। তাই এখন এসব ব্যাংকের কর্মীদের ওপর ক্ষুব্ধ সবাই। এ রকম দুই ক্ষিপ্ত ব্যক্তি পরস্পর আলাপ করছিল ওয়ালস্ট্রিটে দাঁড়িয়ে। একজন বলল, ‘আচ্ছা, বলো তো দেখি, একটা পিৎজা আর একজন বিনিয়োগ ব্যাংকারের মধ্যে পার্থক্য কী?’

দ্বিতীয়জন বলল, ‘এ আবার কেমন প্রশ্ন? দুটোর মধ্যে তুলনা করব কীভাবে?’

‘আরে নির্বোধ, একটা পিৎজা দিয়ে আমাদের একটা পরিবারের এক বেলা খাওয়া হয়। কিন্তু একটা বিনিয়োগ ব্যাংক একজন মানুষের ক্ষুধাও মেটাতে পারছে না।’

বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা বোঝার জন্য আর্থিক বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্সশিট) দেখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই বলে মনে করেন

বিনিয়োগকারীরা। কারণ, উদ্বৃত্তপত্রের লেফট সাইড (বাঁ পাশে) আসলে কিছু (লেফট) নেই। আর রাইট সাইডে (ডান পাশে) আসলে কিছুই ঠিক (রাইট) নেই। এই যখন দুরবস্থা তখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছে এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে।

তাতে আরেক উদ্ভট পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বেশির ভাগ ব্যক্তিই এমবিএ (ব্যবসায় প্রশাসনে মাস্টার্স) ডিগ্রিধারী। তাঁরা নাকি এখন দলে দলে ছুটে যাচ্ছেন ডিগ্রি প্রদানকারী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। উদ্দেশ্য হলো, ডিগ্রি ফেরত দিয়ে অর্থ ফেরত নেওয়া। এই মন্দার সময় কাজ যখন নেই, তখন আক্ষরিক অর্থেই ডিগ্রি

বেচে যদি কিছু নগদ অর্থ হাতে আসে, মন্দ কী! অবশ্য জনগণের হাতে নগদ অর্থ দিয়ে চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতি চাঙা করার চেষ্টা করছে মার্কিন সরকার; বলছে, আমেরিকার তৈরি পণ্য কিনতে যেন দেশের মধ্যেই অর্থ খরচ করা হয় এবং তা যেন দেশে থাকে।

‘কিন্তু আমাদের জন্য কাজটি আসলে খুব কঠিন,’ বললেন একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ। ‘কেন?’ ‘যদি আমরা ওয়ালমার্টে গিয়ে কাপড় কিনি, তাহলে ডলার চলে যাবে চীনে। যদি গাড়ির জন্য তেল কিনি, ডলার যাবে মধ্যপ্রাচ্যে। যদি কম্পিউটার কিনি, ডলার যাবে ভারতে। যদি ফলমূল ও সবজি কিনি, তাহলে ডলার যাবে মেক্সিকোতে। আর যদি গাড়ি কিনি, তাহলে ডলার যাবে জাপানে।’

‘সর্বনাশ! তাহলে উপায় কী?’ ‘উপায় আছে। লাস ভেগাসে গিয়ে জুয়া খেলে ডলার উড়িয়ে দাও, পানশালায় যাও। সব ডলার দেশেই থাকবে।’ [ওয়েব অবলম্বনে]

আসজাদুল কিবরিয়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৪, ২০০৯

137) মন্দায় আশ্রয় একটি রচনা

মি. সোলায়মান হন্যে হয়ে একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুঁজছেন। তাঁর বাড়িতে পানি সরবরাহব্যবস্থায় তীব্র মন্দা চলছে। যখন লাইনে পানি আসে তা বিভিন্ন পাত্রে ধরে রাখা হয়, যা পরে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিপত্তিটা বাধে তখন, যখন ওই সংরক্ষিত পানির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি, পরে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানে একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুঁজে আনেন মি. সোলায়মান। তিনি পরিবারের সব সদস্যের বয়স, অভ্যাস, পেশা প্রভৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কে কত মিমি পানি ব্যবহার করবে, এর তালিকা তৈরি করে দিয়ে যান। এই সমাধানে ঝামেলা মিটলেও হঠাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, যখন ওই পরিবারের একজন সদস্য ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলো। তার পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের পানিবণ্টনব্যবস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের উইকেটের মতো চোখের পলকেই ধসে পড়ল।

মি. সোলায়মানের পরিবারের মতো লাখো

পরিবার এখন নাগরিক মন্দায় ভুগছে। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস-সবকিছুতেই যেন এক অদৃশ্য মন্দা লেগে গেছে। মন্দা শব্দটা হঠাৎ যেন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খুব ব্যবহার হচ্ছে শব্দটির। এই তো সেদিন এক ঠোঁটকাটা ছাত্রের অভিযোগে স্যার খেপে উঠলেন, ‘তবে রে হতচ্ছাড়া! আমি ফাঁকি দিই? কম পড়াই? জানিস না, সারা দেশে এখন কী মন্দা চলছে! খবর রাখিস কিছু? পত্রিকা পড়িস? এমন মন্দায় একটু তো কমই পড়াব।’ দেখলেন তো, সবাই কেমন সুযোগ নিচ্ছে। ওই ছাত্রও কিন্তু কম যায় না। পরদিন সে স্কুলে এল অর্ধেক পড়া শিখে। কেন অর্ধেক পড়া শেখেনি এর উত্তরে সে স্যারকে বলল, ‘জানেনই তো স্যার, মন্দা চলছে। এখন কি আর পুরোটা শিখলে চলে?’ হুঙ্কার তুললেন স্যার, ‘দুই পা তুলে দাঁড়িয়ে থাক!’ বুদ্ধিমান (!) ছাত্রটি ‘স্যার, এখন তো মন্দা, দুই পা তুললে কি আর চলে’, বলে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গেল আর মনে মনে ভাবল, স্যারকে আজ ভালোই শিক্ষা দেওয়া গেল। কোথায় যেন অর্থনীতি বিশ্লেষকের একটি সংজ্ঞা পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, ‘অর্থনীতি বিশ্লেষক হচ্ছেন তিনি, যিনি আগামীকাল বলতে পারবেন যে তাঁর গতকালের করা ভবিষ্যদ্বাণীটি কেন ভুল ছিল।’ অতএব বুঝতেই পারছেন, তাঁদের কথার ওপর কতটা ভরসা করা যায়। একটা কুইজ শুনেছিলাম। কুইজটা এমন- অর্থনীতির বিশ্লেষক থাকায় কারা বেশি লাভবান হয়েছেন-ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী, নাকি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী? সঠিক উত্তর এল- আবহাওয়াবিদ।

কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম-আবহাওয়াবিদ!? ব্যাখ্যা শোনার পর যা বোঝা গেল তা এমন- আবহাওয়াবিদেরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা কদাচিৎ মেলে! এমন একটি বদনাম আবহাওয়াবিদদের ঘাড়ে অনেক দিন থেকেই আছে। কিন্তু এবার নাকি এই বদনাম এককভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফলে এই বদনাম থেকে মুক্তি পেয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। সারা দুনিয়ার শেয়ারবাজারগুলোর অবস্থা দেখে এক বিনিয়োগকারী ভাবলেন, তিনি শেয়ারবাজারে আর বিনিয়োগ না করে অন্য

কোনো ব্যবসা করবেন। পরামর্শের জন্য তিনি গেলেন একজন অর্থনীতিবিদের কাছে, যিনি বর্তমান বৈশ্বিক মন্দা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁর কাছে গিয়ে লোকটি বললেন, ‘আমি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে চাই, কীভাবে করব?’ অর্থনীতিবিদ পরামর্শ দিলেন, ‘প্রথমে আপনি একটি বৃহৎ ব্যবসা শুরু করুন; তারপর খুব শিগগির আপনি দেখতে পাবেন সেটি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।’

একবার কলম হাতে পেলে একটি বিষয় নিয়ে এক-আধটু খোঁচাখুঁচি না করলে তো পেটের ভাত হজমই হয় না। সেটি হলো বাংলা সিনেমা। বাংলা ছবির দর্শক মন্দা, অভিনেতা মন্দা, নির্মাতা মন্দা... আরও কত মন্দা। থাক! এসব কিছুই বলব না, কী লাভ! নায়িকার পোশাকেও তীব্র মন্দা-সবই আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। তবে কষ্ট লাগে আইপিএলের খেলা দেখতে বসলে। বিশ্বজুড়ে যে কী ভয়াবহ মন্দা চলছে, তা বোঝা যায় আইপিএলের চিয়ার্স গার্লদের পোশাক দেখলে-সত্যি, কষ্ট হয়!

মেহেদী মাহমুদ আকন্দ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৪, ২০০৯

138) কী দেখলেন স্যার

বিদেশে কী দেখে এলেন স্যার? কত কি! না দেখলে তোমার বিশ্বাসই হবে না। যে স্বদেশ কোনো দিন বিদেশ হবে। এই চওড়া চওড়া রাস্তা। মসৃণ, তকতকে, ঝকঝকে। তার ওপর দিয়ে আশি, নব্বই, এক শ কিলোমিটার বেগে রংবেরঙের গাড়ি ছুটছে। রাস্তা এত মসৃণ যে তুমি গাড়ির আসনে বসে, স্বদেশে ফেলে রেখে যাওয়া টেপী কিংবা বুঁচিকে প্রেম-পত্র লিখতে পারো। গাড়ি লাফাবে না, ঝাঁপাবে না, ডাইনে বামে কাত মারবে না। যেন আঠার মতো রাস্তার সঙ্গে লেগে আছে।

গর্ত নেই স্যার? ছোট, বড় মাঝারি মাপের গাড়াসমূহ?

না, গাড়াসমূহ নেই।

কেন নেই স্যার?

যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো কেন নেই! ও বিষয়ে কোনো সিটি মেয়রের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়নি।

সুন্দরী রমণীর গালে টোল নেই, মাইলের পর মাইল রাস্তার গর্ত নেই, এ তো পরিকল্পনার এক

ধরনের ত্রুটি। মানুষ কত বিশ্রীভাবে সৎ হলে
তবেই না অমন কাণ্ড হয়! জঞ্জাল আছে স্যার?
দু হাত অন্তর অন্তর আবর্জনার স্তুপ?
পাগল হয়েছ? রাস্তার ধারে আবর্জনা এ কি
তোমার স্বদেশ, এর নাম বিদেশ!
কী দুঃখের দেশ স্যার! মানুষ ভালোভাবে খেতে
পায় না। পেলো রাস্তার ধারে, মাঠেঘাটে সর্বত্র
জঞ্জাল পড়ে থাকত।

তোমার মুণ্ড। ও দেশের মানুষ দিনে-রাতে চার
থেকে পাঁচবার খায়। ঘুরছে-ফিরছে কুপ কুপ
খাচ্ছে। ফুট জুস, হট ডগস, হ্যামবার্গার, চিকেন
লেগস, প্যাটিস, প্যাসট্রিজ, ব্রেড, বাটার,
ওমলেটস, রোলস। সে খাওয়া যে কী খাওয়া,
তুমি ইমাজিন করতে পারবে না।

হৃদয়হীনের দেশ স্যার। এত বড় স্বার্থপর,
অন্যের কথা ভেবে আঁস্‌তাকুড় তৈরি করে না,
আর পাঁচজন কী খাবে একবারও ভাবে না।
তার মানে?

স্যার, যারা আবর্জনা খুঁটে খাবার সংগ্রহ করে
তাদের কী হবে! এর নাম খ্রিষ্টান!

তুমি একটি অজমূর্থ। ও দেশে কাউকে জঞ্জাল
খুঁটে খাবার বের করতে হয় না। সবাই
মোটামুটি বড়লোক।

কী বিশ্রী দেশ স্যার! যে দেশে অভাব নেই, সে
দেশের আর রইল কী! সবাই এক বউ নিয়ে ঘর
করছে।

তার মানে?

মানুষের তো দুই বউ স্যার! স্বভাব আর অভাব।
ওদের অভাব নেই, স্বভাবটাই কেবল আছে।

অমন দেশে যান কেন? রেশনের দোকান আছে?
রেপসিড তেল ঠিকমতো পাওয়া যায়?

তোমার অসীম অজ্ঞতায় আমার রাগে শরীর
জ্বলছে।

রেশনে কি চাল দেয় স্যার? ভাঙা আতপ, না
বোগড়া সেক্স!

গর্দভ! ও দেশে রেশন নেই।

সে কী, পুরোটাই কালো বাজার! একটাই মাত্র
মার্কেট! হোয়াইটের দেশে ব্ল্যাক মার্কেট!

ভবিষ্যতে ও দেশে আর যাবেন না, চরিত্র
বিগড়ে যাবে।

এ অর্বাচীনের সঙ্গে কথা বলে কী হবে। নেহাত
ওই বিপ্লবের দিনে শিখেছিলুম দেশের কুকুর
ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। তা না হলে

তোমাকে আমি ঘাড় ধরে দূর করে দিতুম।

রাগ করছেন কেন স্যার? আমরা তো কোনো দিন বিদেশে যেতে পারব না, তাই তো জানার বাসনা। ওখানে সকালে দুধের ডিপোর সামনে লাঠালাঠি হয় স্যার! ট্যাঁ ফোঁ, ভোঁ।

না, ও দেশের মানুষের অত সময় নেই।

সাতসকালে উঠেই তেলাপিয়া মাছের মতো বাজারে, ডিপোর সামনে ইজিরবিজির করবে, সে দেশ এ দেশ নয়। দরজায় দরজায় ভোরবেলা দুধের বোতল, সংবাদপত্র, ফুল এই সব রেখে যায়। ঘুম থেকে উঠে ও দেশের বউমারা টুক করে দরজা খোলে, পুটপুট করে সব ভেতরে টেনে নেয়।

কে রেখে যায় স্যার। বউমার পূর্বপ্রেমিক?

প্রেমিক আসছে কোথা থেকে গবেট! অপ উপন্যাস পড়ে পড়ে মগজ ধোলাই হয়ে গেছে! ওই যে ফুলের কথা বললেন স্যার। ফুল, বোতল আর সংবাদপত্র।

ওহে ইডিয়েট! ওরা ওমর খৈয়ামের নীতিতে বিশ্বাসী। রোজগারের সবটাই ওরা পেটায় নমঃ করে না। ফুলের জন্য কিছু রাখে। ফুল আর ফল, যেমন আমাদের কান আর মাথা।

ফল? কোন ফলের কথা বলছেন স্যার, কর্মফল? আঙুর না, গীতার ফল নয়, গাছের ফল।

কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙ্গুর, আখরোট, খেজুর, কাজু। খাবার-টেবিলে থরে থরে সাজানো। ফুলদানিতে ফুল। ছবিটবি দ্যাখোনি কোনো দিন! ওল্ড মাস্টারসদের আঁকা স্টিল লাইফ জীবনে দ্যাখোনি?

ছি ছি কী দুর্নীতিপরায়ণ ওরা!

কেন?

ঘুষের পয়সা ছাড়া এসব হচ্ছে কী করে? এ দেশে দু বেলা দু মুঠো জোটাতেই আমাদের আধ হাত জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ফুল, ফল! শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

আরে না রে বাবা, ওদের রোজগারও তেমনি। তার মানে ওয়াগন ভাঙে, ্নাগল করে, ব্যাংক ডাকাতি করে।

তোমার মাথা। ওখানে বড় বড় কল, কারখানা, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য। টাকার বন্যা বইছে।

স্যার ধর্মঘট নেই? মিছিল নেই? রোজ বিকেলে, চলবে না, চলবে না।

না, ওসব চোখে পড়েনি।

বাজে জায়গা।

ঠিক বলেছ, থার্ড ক্লাস জায়গা। যেখানে-সেখানে, যত্রতত্র, যা-তা করা যায় না। ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব। এখানে দ্যাখো, দেয়াল দেখলেই তুমিও পা তুলছ, কুকুরও পা তুলছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক [জন্ম-১৯৩৪]

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৪, ২০০৯

139) কুস্তির প্যাঁচ

মিরাজ হোসেনের দশাসই শরীর। যেমন ওজন, তেমনি সাইজ। তরুণ বয়সে এপাড়া-ওপাড়ার ছেলেদের মধ্যে মারামারির সময় তাঁর এ বপুর বেজায় কদর ছিল। ঘাড়ে লাঠি ফেলে কাছা মেরে দাঁড়িয়ে কুঁদে উঠলে, ওপাড়ার ছেলেরা ঝেড়ে দৌড় লাগাত।

মিরাজের ইচ্ছা ছিল কুস্তিগির হবে। এ জন্য এক আখড়ায় কিছুদিন কুস্তির প্যাঁচ রপ্ত করেছে সে। এতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। এ দেশে কুস্তিগিরদের ভাত নেই। বিশাল ধড়টাকে কাজে লাগাতে কিছুদিন সে এফডিসিতেও ধরনা দিয়েছে। ছবির নির্মাতারা আফসোস করে বলতেন, ‘পোড়া কপাল তোমার। ফ্যান্টাসি ছবির যুগ নেই। থাকলে দৈত্যের চরিত্র করে দু পয়সা কামাতে পারতে।’

এভাবে অনেক ধান্দা করেও শরীরটাকে জুতসই কোনো কাজে লাগাতে পারেনি মিরাজ। এ জন্য চেনাজানা অনেকে ফাঁক পেলেই টিপ্সনী কাটে, ‘এত বড় শরীরটা কোনো কাজেই লাগাইলা না মিয়া।’

এখন রাজধানীর বেসরকারি এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে মিরাজ। বেতন মন্দ নয়। কিন্তু দুর্মূল্যের বাজারে টাকা কি আর রাখা যায়? চাল, ডাল, তেল, নুন কিনতে কিনতে ঝরা পাতার মতো উড়তে থাকে টাকা। এর পরও খুব চেপে চুপে, লাঞ্চ আওয়ারে প্রতিদিন পুরি-নিমকি খেয়ে কিছু টাকা জমিয়েছে মিরাজ। সামনে তার পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী। বউ তাকে প্রায়ই খোঁটা দেয়, ‘কিছু দেওয়ার মুরাদ নেই, আবার বিয়ে করে বসেছে!’

মিরাজ ঠিক করেছে, বউয়ের মুখে কুলুপ আঁটতে এবার ভালো কিছু উপহার দেবে সে। এ জন্য আজ ব্যাংক থেকে পুরো টাকাই তুলেছে সে। কয়েক বছরে একেবারে খারাপ জমেনি। লকেট ঝোলানো গলার একখান হার তো

হবেই।

বিকেলে অফিসের কাজ শেষে ফুরফুরে মেজাজে বের হয় মিরাজ। রাজধানীতে গয়নার মার্কেটের অভাব নেই। মনে মনে একটা বেছে নিয়ে রিকশায় করে সেদিকে রওনা হয় সে। টাকার তোড়াটা প্যান্টের ডান পকেটে রেখেছে মিরাজ হোসেন। নিজের অজান্তেই তার হাত বারবার চলে যাচ্ছে টাকার ওপর। তার এ সন্দেহজনক গতিবিধি নজর কেড়ে নেয় দুই ছিনতাইকারীর। তারা টের পায়, শিকারটাকে আটকাতে পারলে মোটা অঙ্কের টাকা মিলবে। মিরাজের নজর এড়িয়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে তারা। তারপর নির্জন এক চিপাগলিতে মিরাজের রিকশা যেই ঢুকেছে, অমনি দুই ছিনতাইকারী যমদূতের মতো সামনে খাড়া। মাদকসেবী বলে দুটোরই রোগাপটকা চেহারা। দেখলে বোঝা যায়, গায়ে তেমন জোর নেই। তাই বলে তেজ কম নয় তাদের। রিকশাওয়ালাকে অকারণে গোটা কয়েক চড়চাপড় দিল একজন। অপরজন মিরাজের দিকে পিস্তল বাগিয়ে গর্জে উঠল, ‘পকেটে যা আছে জলদি বাইর কর, নইলে ভুঁড়ি ফুটা কইরা দিমু।’

আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা অসীম। মিরাজের হাত চট করে পকেটে গিয়ে টাকার তোড়া বের করে আনল। কিন্তু তোড়াটা দিতে গিয়ে মিরাজের মনে হলো, তার কলজেটা যেন ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। চিঁ চিঁ করে সে কাতর কণ্ঠে বলল, ‘টাকা নেন আফসোস নেই, তবে একটা উপকার করে যান ভাই।’

গা থেকে মিরাজ চট করে কোটটা খুলে বলল, ‘পায়ে পড়ি ভাই, এই কোটের পিঠে একটা গুলি করে যান।’

‘কেন, কেন?’ অবাক দুই ছিনতাইকারী।

‘বউয়ের কাছে গিয়ে অন্তত বলতে পারব, আপসে টাকা দিইনি। লড়াই করে দিয়েছি।’

পিস্তলধারী ছিনতাইকারী সানন্দে কোটের পিঠ ফুটো করে দিল। অমনি মাতম করে উঠল

মিরাজ, ‘হায় হায় ভাই, এটা কী করলেন!

কোটের ঠিক মাঝখানে যে ফুটো করলেন, এতে তো আমার বুক ফুটো হওয়ার কথা। আমার বউ এত বোকা নয়, সে ঠিকই বুঝবে আমি চালাকি করেছি। দয়া করে কোটের এমন জায়গায় ফুটো করুন, যাতে শরীরে গুলি লাগার কোনো

সুযোগই থাকবে না।’

ছিনতাইকারীরা এবার কোটের এক হাতা ফুটো করে দিল। অমনি হা-হা করে উঠল মিরাজ, ‘আরে ভাই, আবার তো ভুল হয়ে গেল। এ গুলি তো হাতে লাগার কথা।’

পিস্তলধারী ছিনতাইকারী এবার বেজায় চটে গেল। আক্রোশ ঝেড়ে সে বলল, ‘এত ঝামেলার চেয়ে তোর ভুঁড়ি ফুটা করাই তো ভালো ছিল রে! তোর সৌভাগ্য যে পিস্তলে আর গুলি নাই।’ এবার মিরাজ হোসেনকে আর পায় কে। এক লাফে রিকশা থেকে নেমে দুই হাতে দুই ছিনতাইকারীকে পাকড়াও করল সে। হুংকার ছেড়ে বলল, ‘এবার দেখ বেটারা, কুস্তির প্যাঁচ কাকে বলে!’ তার বিশাল দুই বাহুর ভেতর পটকা ছিনতাইকারীরা তড়পাতে লাগল ফাঁদে পড়া নেংটি হুঁদুরের মতো। [বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে] শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

140) ক্যাপওয়ালা ও বানর

এক ছিল ক্যাপ ব্যবসায়ী। গ্রামের মেঠোপথে জ্যেষ্ঠের খর রোদের মধ্যে সে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে এ-বাড়ি

ও-বাড়ি ক্যাপ বিক্রি করত। দূরের গঞ্জ থেকে সে বেছে বেছে রংবেরঙের সুন্দর সুন্দর ক্যাপ নিয়ে আসত বলে তার পণ্য পছন্দ করত ছেলে-বুড়ো সবাই। একদিন ভরদুপুরে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে ঝাঁকা নিয়ে। বিক্রি তেমন হয়নি।

অন্যদিকে আজ আবার হাটবার, তাড়াতাড়ি যেতে হবে বাজারে। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে সে যখন ক্লান্ত, তখন একটা আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসল। পাশেই ক্যাপভর্তি ঝাঁকা রেখে গামছা দিয়ে ঘাম মুছে গা এলিয়ে দিল গাছের ছায়ায়। অনেক আম ধরেছে গাছে। ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁচা আমগুলো নড়ছে অনবরত, দেখতে দেখতে দুই চোখে অবসাদের ঘুম নেমে এল ক্যাপওয়ালার।

ওদিকে পাশের আমগাছে আম খাচ্ছিল বানরদের একটা দল। তারা দেখল ক্যাপওয়ালা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার রংবেরঙের ক্যাপগুলোর দিকে বানরদের নজর অনেক দিন ধরেই। ছোট বাচ্চাগুলো কী সুন্দর মাথায় দিয়ে ঘোরে, তখন থেকেই তক্কে-তক্কে আছে তারা। আজ মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে। চুপি চুপি নেমে এল গাছ

থেকে। নিজেদের পছন্দমতো এক এক করে
ক্যাপ তুলে নিয়ে ভেঁ দৌড় আবার গাছের
ওপরে।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙল ক্যাপওয়ালা। চোখ
খুলেই দেখল পুরো খালি তার ঝাঁকাটি। যত দূর
চোখ যায় কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ খুঁজে
যখন হয় হয় অবস্থা, তখন সে মাথায় হাত
দিয়ে বিধাতার কাছে হতাশা ব্যক্ত করার জন্য
ওপরের দিকে তাকায়। ৩০ থেকে ৪০টি বানর
ক্যাপ মাথায় দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।
ক্যাপওয়ালা যতই চেষ্টা করলে ক্যাপ আর পায়
না। সে গাছে ওঠার চেষ্টা করে বানরগুলো
দৌড়ে পালায়, ঢিল মারলে বানরগুলো আম
ছুড়ে মারে, লাঠি দেখালে বানরগুলো হলুদ দাঁত
দেখায়। কিছুতেই কিছু হয় না। সে যা করে,
বানরগুলোও তা-ই করে। তাকে ভেংচি দেখায়।
হঠাৎ করে তার মাথায় একটু বুদ্ধি এল। সে
তার নিজের ক্যাপটি খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে
দিল। বুদ্ধিমান(!) বানরগুলো ভাবল, এটাও
বোধহয় কোনো খেলা, তারাও মাথা থেকে ক্যাপ
খুলে সবাই মাটিতে ফেলে দিল। আর যায়
কোথায়, ক্যাপওয়ালা তাড়াতাড়ি সেগুলো তার
ঝাঁকায় উঠিয়ে নিল। যাওয়ার আগে বানরদের
উদ্দেশ্যে বিশাল একটা ভেংচি মেরে গেল।
অসহায় বানরগুলো বুঝল তারা কী বোকামি
করেছে।

এর অনেককাল পরের কথা, ওই ক্যাপওয়ালার
নাতি উত্তরাধিকার সূত্রে দাদার ক্যাপ বিক্রির
ব্যবসাটা করে যেতে লাগল। সেও গ্রামে গ্রামে
হেঁটে হেঁটে ক্যাপ বিক্রি করত। একদিন ক্লান্ত
হয়ে পাশে ক্যাপের ঝাঁকা রেখে আমগাছের
তলে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।
ওদিকে তখনো গ্রামে বানর ছিল। তারা নেমে
এসে সেই ক্যাপ উঠিয়ে যার যার মাথায় দিয়ে
গাছে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর নাতির ঘুম
ভাঙলে সে দেখল, তার ক্যাপের ঝাঁকা পুরো
ফাঁকা। চট করে ওপরে তাকিয়ে দেখল,
বানরগুলো ক্যাপ মাথায় দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে
তার দিকে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে
পড়ল দাদার কথা। দাদা বলেছিলেন, নিজের
মাথার ক্যাপটা ফেলে দিলেই বানরগুলো ক্যাপ
ফেলে দেবে। তাই সে আর অন্য কোনো চেষ্টা
না করে নিজের মাথার ক্যাপটা খুলে ফেলে

দিল।

কিন্তু বানরগুলো আর ক্যাপ ফেলে না। সে অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল! নাহ! বানরগুলো কেউ তো ক্যাপ ফেলছে না। তখন সে ক্যাপটা আবার উঠিয়ে মাথায় দিল, আবার ফেলল, কিন্তু বানরগুলো ফেলছে না। আবার ওঠাল, আবার ফেলল। কাজ হচ্ছে না।

এমন সময় ক্যাপ পরিহিত একটা বানর নেমে এল গাছ থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে তার গালে বিশাল এক চড় মেরে বলল, ‘বোকারাম, দাদা খালি তোর একারই ছিল? আমাদের ছিল না? আমাদের দাদারা যেই ভুল করেছিল, তুই কেমনে ভাবলি, আমরা সেই ভুল আবার করব? খালি তোর দাদাই তোকে শিখাইছে? আমাগো দাদা কিছু শিখায় নাই?’ রায়হান রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

141) সময়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংবাদ

এমনিতে টিভিতে বলা হয়-সকালের খবর, দুপুরের খবর, রাতের খবর। কিন্তু সকাল, দুপুর বা রাতের সঙ্গে এই খবরটার কোনো সম্পর্ক থাকে না। যদি সম্পর্ক বজায় রেখে খবরটা পরিবেশন করা হয়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়, আসুন দেখা যাক। সংবাদগুলো পরিবেশন করছেন ইকবাল খন্দকারসকালের খবর

এখন সকাল। কেউ কেউ হয়তো বস্ বা বউয়ের ঝাড়ির ভয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। আবার যাঁরা একটু সাহসী, তাঁরা হয়তো এখনো সিদ্ধান্তই নেননি যে ঘুম থেকে ওঠা দরকার। যেসব বাসায় অধিকাংশ লোক উঠে গেছে, সেখানে টয়লেটে লম্বা লাইন লাগাটা স্বাভাবিক। এ ছাড়া পরোটার সঙ্গে সবজি হবে না হালুয়া হবে, এ নিয়েও বাগ্‌বিতণ্ডার সূচনা হতে পারে। হয়তো কোনো কোনো জায়গায় সূচনা হয়েও গেছে। তবে সঠিক খবর দিতে পারছি না।

কারণ, আমাদের রিপোর্টার এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। দুপুরের খবর

এখন দুপুর। ইতিমধ্যে ১২টা বেজে গেছে।

অনেকেই হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে দুপুরের খানাপিনার। বাইরে এখন প্রচণ্ড রোদ। এ জন্য বোধহয় এসির মধ্যেও গরম লাগছে। অনেকেই ঠান্ডা খাবারের জন্য ফ্রিজের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। কান ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়

করিয়ে রাখার জন্য দুপুরের রোদ খুবই উপযোগী। এ সময়টা ছাদে যাওয়ার জন্য একদমই উপযোগী নয়। অতএব যাঁরা ছাদকে ফিল্ডিংয়ের স্পট হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যাঁরা দুপুরের প্রচণ্ড গরমে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য শুভনিদ্রা। বিকেলের সংবাদ এখন বিকেল। এমনই কোনো এক বিকেলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল ‘তুমি রোজ বিকেলে আমার বাগানে ফুল নিতে আসতে’ গানটি। আপনার বাসার সামনে বাগান থাকলে আপনিও হয়তো আড্ডায় মেতে উঠছেন বিশেষ কারও সঙ্গে। কেউ কেউ আবার নাশতার নামে জবরদস্ত খানা খেয়ে ফেলছেন। তবে অনেকেই দুপুরের ঘুমের রেশ কাটাতে না পেরে এখনো নাকে তীব্র আওয়াজ তুলে ঘুমাচ্ছে বলে জানা যায়। এ সময়টা জগিংয়ের কথা বলে সাংসারিক ঝামেলা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার মোক্ষম একটা সময়। সন্ধ্যার সংবাদ এখন সন্ধ্যা। সন্ধ্যা মানেই ছাত্রদের পড়তে বসার যন্ত্রণা। কিন্তু ঘাড় ত্যাড়া ছাত্ররা পড়তে বসছে না বলে তাদের মায়েরা লাঠির সন্ধান করছেন। কেউ কেউ আবার লোডশেডিংয়ের দোহাই দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আড্ডা দেওয়ার জন্য। এ সময়টায় মশারা গণসংগীতে লিপ্ত হয়। পুঁটি মাছের আত্মাবিশিষ্ট স্বামীরা তাঁদের বাঘিনী গিল্লির ভয়ে যত দ্রুত সম্ভব সব কাজ সম্পন্ন করে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, মন্দার সঙ্গে সন্ধ্যার উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকলেও অন্য কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে আমাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জানান। রাতের সংবাদ এখন রাত। রাত মানেই ঘুম। আর ঘুম মানেই মশারি টানানো। এই মশারি টানানো নিয়ে অধিকাংশ দম্পতির মধ্যে ‘গালিফক্সী’ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এর সূত্র ধরে অনেকের মধ্যে কোলবালিশ এবং টব বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে থাকে। রাতে ডায়েট কন্ট্রোল করতে গিয়ে অনেকেই ভাত খায় না। তবে ভাতের পরিবর্তে এটা-সেটা যা খায়, তাকে বলা যায় ভাতের বাবা। রাতের চাঁদ যে কাউকে কবি বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রেখে থাকে। তবে সেই কবিতা মানুষের মেজাজ বিগড়ানোর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের

ধারণা। মধ্যরাতের সংবাদ

এখন মধ্যরাত। জানি, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, খবর শোনার কেউ নেই। তবু পড়ছি। কী করব, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না মানলে আমার চাকরি থাকবে না। কেউ কেউ যে জেগে নেই, তা কিন্তু নয়। তবে যারা জেগে আছে, তারাও মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। রাত ১২টার পর ২৫ পয়সা মিনিট বলে কথা। যারা টিভি ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, সেসব অলসের জন্য বিশেষ গুডনাইট। সংবাদ এখানেই শেষ করছি। কারণ, আমারও ঘুম পেয়েছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

142) আফসোস! মশাকে কামড়াতে পারি না

‘নুরুল হুদা’ বলেও অনেকে যাকে চেনেন, তিনি মাহফুজ আহমেদ। অভিনেতা পরিচয়ের আড়ালে ঢেকে গেছে যাঁর ‘একসময়কার সাংবাদিক’ পরিচয়। অভিনেতা হিসেবে সফল তিনি। আজ সফল রসালাপেও। সঙ্গে ছিলেন জিনাত রিপা ‘মাহফুজ’ অর্থ তো সুরক্ষিত। আপনি কোন অর্থে সুরক্ষিত?

– আমি ইতিমধ্যে বিবাহিত।

ভালো আর খারাপের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

– জাল আর নির্ভেজালের মধ্যে পার্থক্য যতটুকু।

ধরুন, একটি নৌকায় আপনি, আপনার স্ত্রী ও আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আছেন। হঠাৎ নৌকা বিপদগ্রস্ত। আপনি প্রথম কাকে বাঁচাবেন? স্ত্রীকে নাকি বন্ধুকে?

– নৌকাটিকে!

ঠোঁটে ঠোঁট লাগলে কী হয়?

– হবে আবার কী? মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

বলুন দেখি, ইডুথমষ কাকে বলে?

– সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যা সাধারণত খুলে যায়, কিন্তু এসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন শুনলে আবার বন্ধও হয়ে যায়।

আপনি নিজেকে কতটা ক্ষমতাবান মনে করেন?

– মশার চেয়ে কিঞ্চিৎ কম। মশা আমাকে কামড়াতে পারে। আফসোস! আমি মশাকে কামড়াতে পারি না।

ক্ষমতা দেওয়া হলে কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে চান?

– নিজের বয়স আটাশ বছরে থামিয়ে দেব!

আপনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রে

অভিনয়ের জন্য একজন অভিনেতার মূলত কী জানতে হয়?

– নাচ, গান, মারপিট-সবই জানতে হয়। শুধু অভিনয়টা না জানলেও চলে!

পুনর্জন্ম হলে কী হবেন বলে মনে হয়?

– মনে হয় ‘নুরুল হুদা’!

সেই পুরুষই বিয়ে করেন...

– যার অ-নে-ক সাহস!

স্বাধীনতা আসলে কী?

– বিয়ের পর ছেলেরা যা হারায়, আর মেয়েরা যা পায়!

এমন কী হারিয়েছেন, যা আর কখনো ফিরে পাবেন না?

– ব্যাচেলর জীবন।

কোথায় আপনার হারিয়ে যেতে নেই মানা?

– সুন্দর মন আর সুন্দরবনে।

আপনার প্রিয় উক্তি কী?

– পাগল আর আমার মধ্যে একটাই পার্থক্য; আর তা হলো, আমি পাগল নই। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

143) চলছে কথার গাড়ি, কাজের সঙ্গে আড়ি

কথাশিল্প

কথা বলা নাকি একটা শিল্প। কিন্তু আমাদের শিল্পমন্ত্রী কথা বলেন কম। আসলে ফড়িয়ার দেশে শিল্পটিল্প তো কিছু নেই। যেগুলো আছে সেগুলোও বন্ধ। বেচারিা দিলীপ বড়ুয়া ‘কথাশিল্পী’ হয়ে তো আর সেগুলো সচল করতে পারবেন না। কম কথার জন্য এক কথায় সাধুবাদ। কথাবাণিজ্য

কথা আবার বাণিজ্যও। আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী বোধহয় বিষয়টা ধরতে পেরেছেন। তিনি ধুমসে কথা বলছেন। তিনি গত মাসে হঠাৎ বললেন, রমজানে যেন কেউ দাম বাড়িয়ে বাজার অস্থিতিশীল করতে না পারে তার জন্য টিসিবির মাধ্যমে তেল আমদানি করা হবে। তিনি তো বলে খালাস। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বসে থাকার লোক নন। তাঁরা কথার (তথ্য) ফাঁকে বাণিজ্য খোঁজেন। বিশ্ববাজার স্থিতিশীল, দেশেও আমদানি সমস্যা নেই; তবু মন্ত্রীর ঘোষণার কয়েক দিন পরই তাঁরা তেলের দাম হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন। রমজানে যদি সত্যি সত্যি টিসিবি তেলের বাজারে বেল ভাঙে! বেচারিা

বাণিজ্যমন্ত্রী! তিনি তেলওয়ালাদের নিয়ে
বসলেন। ফুটন্ত তেলের মতো টগবগ করে
বললেন, দাম কিছুতেই বাড়তে পারে না।
তেলওয়ালারা পামঅয়েলের মতো মুখ করে
টিভি ক্যামেরার সামনে বললেন, ‘আমরা
মিলগেটে এত টাকা দরে বেচব। তারপর খুচরা
বাজারে কী হয় আমরা জানি না।’ তেলদর্শিতা
(নাকি দূরদর্শিতা) দেখাতেই হোক আর
ভোটরদের উদ্দেশে কথায় তেল ভাজতে গিয়েই
হোক, মন্ত্রী মহোদয় যা করেছেন তাতে
রমজানের আগেই তেল-বাণিজ্য সরগরম। কথা
পায় না কথার ঠাঁই
এক. বিডিআরের ঘটনার সঙ্গে জঙ্গিরা জড়িত।
দুই. বিডিআরের ঘটনায় জঙ্গিদের সঙ্গে বাইরের
লোকও জড়িত। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে-জঙ্গিরা
কি তাহলে বিডিআরের ভেতরের লোক? তিন.
হত্যাযজ্ঞে জঙ্গিরা বিডিআরকে ব্যবহার করেছে।
চার. পিলখানার ঘটনায় রাজনৈতিক দল বা
গোষ্ঠী সম্পৃক্ত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তাই তদন্তে দেরি হচ্ছে। পাঁচ. হত্যাকাণ্ডের
পরিকল্পনাকারীদের নাম কয়েক দিনের মধ্যে
জাতিকে জানানো হবে। ছয়. যারা দেশের
স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, যারা সশস্ত্র বাহিনীর
ক্ষতি চায়, তারাই বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।
সাত....। থাক! নাম তো ফারুক খান, ক্ষণে ক্ষণে
তথ্যের গান। ওফ, যারা ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা
বোধহয় কনফিউজ। হক কথা, টক কথা
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর তার ওপর কিছু
আলোচনা তো হওয়া উচিত। ‘তদন্তের আগে
কাউকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়’-আইনমন্ত্রী বলে
কথা! ব্যাপক সাড়া। কথায় পেয়ে বসল
তাঁকেও-‘কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি প্রজননকেন্দ্র।’
বেচারি শিক্ষামন্ত্রী! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে এত বড়
তথ্য বাজারে ছাড়লেন আইনমন্ত্রী। কাঁচা কথা
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে টিভি ক্যামেরার সামনে
কথা বলছেন-আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো
যায়। ইতিমধ্যে দাম তো কমতে শুরুও করেছে।
কথার মাঝখানে একজন সাংবাদিক বললেন,
‘আপা, এবার জঙ্গি নিয়ে কিছু বলেন।’ সঙ্গে
সঙ্গে মন্ত্রীঃ জি? ‘আপা, জঙ্গি নিয়ে...।’ ‘ও আচ্ছা,
আমরা জঙ্গিদের রুটস খুঁজে বের করব। কোনো
ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা তাদের রেহাই

দেব না। আমি জীবনবাজি রেখে হলেও তা করতে চাই। তাদের মদদদাতা, তাদের পেছনে যারা আছে...। আমরা, আমরা...’সত্য কথা লোডশেডিং বন্ধ করার মতো আলাদিনের চেরাগ আমার হাতে নেই-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। কম কথা পরিমিত কথা বলে ‘ভীতিকর অবস্থা’ তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইদানীং তাঁকে নাকি অনেকে বুঝতে পারে না। আর বেশি কথা বলে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করছেন কয়েকজন মন্ত্রী। তাঁদের কেউ ভুলতে পারছে না। ব্যক্তিগত কথা

আমার এক বছর বয়সী মেয়ে নাবীহাকে খাওয়াতে হয় টেলিভিশন চালিয়ে। অনুষ্ঠান নির্ধারিত; বিজ্ঞাপন। ওরে...! কত কথা বলে রে...! জাতীয় বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে নির্বিঘ্নে খেলেও শুধু কথার অনুষ্ঠান (টক শো) তার চোখ টিভিতে আটকে রাখতে পারে না। আহ, বু বু বু বলে খেপে যায় সে। মন্ত্রীরাও মানুষ কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী-‘মন্ত্রীদের কম কথা বলাটা আমিও পছন্দ করি। সরকারি দলের কাছে মানুষ কথা কম চায়, কাজ বেশি চায়। কথা বলার জন্য তো বিরোধী দল আছেই।’ আরও আছে, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। সরকার ও সরকারি দল আওয়ামী লীগের মুখপাত্র। তবে তাঁর মুখে কথা শোনা দুষ্কর। পাদটীকা

নগরে শব্দদূষণ বেড়েছে। এটি কথার কথা নয়, সাচ্চা তথ্য। মতিঝিলে ২০০৪ সালে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৯৬ ডেসিবেল। এ বছর এ মাত্রা বেড়ে হয়েছে ১০৩। গত ৬ জানুয়ারি মতিঝিলের জনসংখ্যায় যুক্ত হয়েছেন ৪৫ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা-সহকারী। এই মতিঝিলেই তাঁদের দপ্তর-সচিবালয়। শাহেদ মুহাম্মদ আলী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

144) বিজ্ঞান বইয়ের উপেক্ষিত অথচ কিছু বাস্তব সূত্র

নাসিকা সূত্র

আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকা যখন আপনার চোখে চোখ রেখে প্রবল আবেগে আপনার দুই হাত চেপে ধরবে, ঠিক তখনই আপনি সম কিংবা অধিকতর বেগে নাক কিংবা পিঠ চুলকানোর প্রবল প্রয়োজন অনুভব করবেন। জুতানিক সূত্র

দোকানের যে জুতাটি আপনার পায়ে একদম মাপমতো হবে সেটি দেখতে খুব একটা ভালো হবে না, হলেও জুতাটিতে কোনো একটা সমস্যা থাকবে। অন্য একজোড়া দিতে বললে বলবে, এই ডিজাইনের জুতা স্টোরে আর নেই। নিলে এটাই নিতে হবে। হ্যালোসিক সূত্র

প্রয়োজনীয় নম্বরে ডায়ালের পর ডায়াল করেও অনেক সময় ব্যস্ত পেতে পারেন, কিন্তু ভুল নম্বরে ডায়াল করে ফেললে সেটা কখনো ব্যস্ত থাকে না। ভুল নম্বরে ডায়াল করলেই ওপাশ থেকে বাজখাঁই হ্যালো আসবেই এবং আপনার বিল উঠবেই। আছাড়িক সূত্র

আপনার সামনে রাস্তায় কোনো বৃদ্ধ বা শিশু হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলে আপনি যদি তাকে ধরে ওঠান, তবে আপনার এই মহান কর্মটি দেখার মতো রাস্তার আশপাশে তেমন কাউকেই খুঁজে পাবেন না, অথচ আপনিই যদি কলার খোসায় আছাড় খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়েন, তবে সেই দৃশ্য দেখার জন্য আশপাশে দর্শকের অভাব হবে না। ফাদারসিক সূত্র

যেদিন দেহিতে ঘুম ভাঙার কারণে স্কুলে দেহি করে যাবে আর দেহির কারণে জানতে চাইলে স্যারকে বলবে, ‘আবার শরীলটা খারাপ’, ঠিক সেদিনই স্কুলের বেতন দিতে বাবা সশরীরে (সম্পূর্ণ সুস্থ) স্কুলে এসে উপস্থিত হবেন। সাবানিক সূত্র

গোসলের সময় পুরো গায়ে ফেনা তুলে সাবানের শেষ ডলাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মোবাইল ফোনসেট বেজে উঠবে। তাড়াতাড়ি করে হাত ধুয়ে-মুছে ফোনসেটের ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ভেতর পৌঁছাতেই রিং বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর টানা ১০ মিনিট সাবান গায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কলার আর কল ব্যাক করবে না। কিন্তু পুনরায় সাবান হাতে নিয়ে গায়ে প্রথম ডলাটি দিতেই আবার ফোন বাজা শুরু করবে। পুনর্দেখা সূত্র

সদ্য পরিচিতা (সম্ভাব্য প্রেমিকা) বান্ধবীর সঙ্গে কোথাও চা-কফি খেতে বসলে সেখানেই এসে উপস্থিত হবেন আপনার মুখরা বড় খালা বা আগ্রাসী কোনো পাওনাদার। অথচ সে সময় কখনো দেখা হবে না এমন কারও সঙ্গে, যার কোনো উপকার করেছিলেন বা এমন কেউ যে আপনাকে গুরুতুল্য শ্রদ্ধা করে। ঘূর্ণন সূত্র

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে ফ্যান ঠিক করে চলে যাওয়ার পর সেই ফ্যান আবারও ঘোরা বন্ধ করে দেবে। তবে সারা রাত গরমে ঘেমে পরদিন সকালে ধমকধামক দিয়ে আবারও ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ডেকে আনার পরপরই (মিস্ত্রি ফ্যান স্পর্শ করার আগেই) আবারও সেটা পূর্ণ গতিতে ঘোরা শুরু করবে এবং সে চলে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে যাবে। সারি সূত্র কোনো সভা-সেমিনার বা সিনেমা হলে আপনার সারিতে যার সিট পড়েছে সবচেয়ে ভেতরে, তিনিই আসবেন সবচেয়ে দেরিতে। আর আপনি যদি পৌঁছান সবচেয়ে আগে, তবে আপনার সিটটাই পড়বে সারির একদম মুখে। রং সূত্র নতুন জামার ঝলমলে রং এক ধোয়াতেই সিংহভাগ উঠে যাবে, অথচ সেই কাপড়েই অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি সামান্য কোনো কালি বা রং লেগে যায়, সেটা শুধু লব্ধিতে ধোলাই কেন, গ্যারেজে ডেন্টিং করলেও উঠবে না! হারানো সূত্র ঘরের ভেতর হাত থেকে কিছু পড়লে সেটি সব সময় খাট বা আলমারির নিচের দুর্গম এলাকায় গিয়ে স্থির হবে। ব্যামো সূত্র পুরো ছুটির সময় শরীরে ঠান্ডা, জ্বর-কাশি লেগে বাসায় পড়ে থাকলেও ঠিক যেদিন থেকে অফিস বা স্কুল-কলেজ শুরু হবে, সেদিন থেকেই শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগবে। [ওয়েবসাইট অবলম্বনে]

ওয়ালিউল্লাহ খান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

145) ডেজালের উৎপত্তি

চাল, তেল, মাছ ও মিঠাইয়ের আকাল। আবার ভূতেরও আকাল যাচ্ছে।

বাড়িওয়ালাদের প্রতি অনুকম্পাবশত ভূতেরা শহরের বাস তুলে পাড়াগাঁয়ে আস্তানা জুটিয়েছে, তা-ও নয়। ভূতের উপদ্রব পাড়াগাঁয়েই বা কই? দু-একটা যা শোনে, অনুসন্ধান প্রকাশ পেয়েছে, ভূত নয় তারা-ভূতবেশী মানুষ। শহরের অগুনতি হানাবাড়িতে এবং পল্লীর শ্মশানে, গোরস্থানে, বাঁশবাগানে এত যে ভূত থাকত, গেল কোথায় তারা সব? শুনুন বলি। কিন্তু তারও আগে জন্মান্তরবাদটা কিঞ্চিৎ সড়গড় করে নিন।

ধরুন, মরে গেলাম। আপনারা নন, বালাই ষাট।-আমি একলা। মৃত্যুর পর দেহ-খাঁচা থেকে

আত্মা ছাড় পেল। যমদূত ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে
অমনি যমের দরবারে হাজির করে দেবে।
রেজিস্ট্রি খাতায় আত্মা নম্বরভুক্ত হলো, তারপর
ছুটি। এ অবস্থার নাম ভূত। পরলোকের কর্তারা
অতিশয় বিবেচক-দেহ-খাঁচার অভ্যন্তরে এত
দিন কষ্ট করে এলে, ছুটি ভোগ করো এবারে।
যদিই না আবার আত্মা আসছে।
তা-ই করে বেড়ায় ভূতেরা। গাছের চূড়ায় চড়ে
প্রাণ ভরে মুক্তবায়ুর নিঃশ্বাস নিচ্ছে খানিক, ঝুপ
করে নেমে পড়ে টিল-পাটকেল ছুড়ছে এর
বাড়ি-তার বাড়ি। এলো চুলে ছুঁড়ি দেখে
শেষমেশ তার কাঁধেই বা চেপে পড়ল। তারপর
একদিন তলব এসে যায়। পিতামহ ব্রহ্মা
ফরমান পাঠিয়েছেনঃ ঘূর্ণিঝড়ে আড়াই লক্ষ
মানুষ মারা গেছে, অতএব সমপরিমাণ আত্মা
জরুরি আবশ্যিক। চিত্রগুপ্ত লিস্টি করে দিলেন,
দূতগণ ভূতের আস্তানায় আস্তানায় ছোটাছুটি
করছেন, ফুটিফাটি অটেল হলো, আবার কী।
ডিউটিতে ঢুকে পড়ো এবারে।
সেই বন্দী জীবন। দুই, পাঁচ, পনেরো, পঁচিশ,
পঞ্চাশ-তেমন তেমন আয়ুনান হলে নব্বই-
পঁচানব্বই বছর অবধি টানবে। মানুষটা না-মরা
অবধি ছুটি নেই।
এই নিয়ম চলে আসছে বরাবর। ইদানীং অবস্থা
বড় জটিল-ছুটি কমতে কমতে একেবারে শূন্যের
কোঠায় ধেয়ে আসছে- এই বেরোল এক দেহ
থেকে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে ঢুকে পড়ার
পরোয়ানা। নিঃশ্বাস ফেলার ফুসরত দেয় না।
আবার ওদিকে মরণ ব্যাপারটা লোপ পেয়ে
যাচ্ছে। সার্জারিও এমনি নিখুঁত-একটা আস্ত
মানুষ কেটে দুই খণ্ড করে বেমালুম আবার জুড়ে
দিচ্ছে। ফলে যমরাজের সেরেস্তায় কাজকর্ম প্রায়
বন্ধ। এবং ধরণিতে হু-হু করে জনসংখ্যা
বাড়ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে-
নিতান্তই বালির বাঁধ, স্রোতের মুখে দাঁড়াতে
পারছে না।
বিষম গণ্ডগোল-যেমন এই ধরালোকে তেমন
পরলোকেও। ছুটি বন্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ ভূতেরা
ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে।
ব্যাকুল হয়ে যমরাজ নিজেই সেকশনে ছুটলেন।
ম্যানেজার চিত্রগুপ্ত টেবিলে পা তুলে নাসাধ্বনি
করে ঘুমুচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে কৈফিয়ত দেয়ঃ
মরে না মানুষ-কী করব?

দূতগুলো তোমার কী করে? শুয়ে-বসে আর
তাস খেলে ভুঁড়ি যে ওদের পর্বতাকার হলো।
ধরাতলে নেমে পড়ুক।

আপসে একটা লোকও মরবে না, বিনি
ক্যানভাসিংয়ে আপন নিয়মে কাজ হবার
দিনকাল চলে গেছে। দূতেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে
বুঝিয়েসুঝিয়ে দেখুক, আত্মা জোটাতে না পারলে
বরখাস্ত করবে। চাকরির দায় বড় দায়।
যমদূতেরা দুড়দাড় বেরিয়ে পড়ল। চিত্রগুপ্তও
চুপচাপ থাকতে পারে না-চাকরির উদ্বিগ্নে
নিজেও বেরোল একসময়।

গিয়ে হাজির কলকাতার এক বাড়িতে। কামারের
হাপরের মতো শাঁ শাঁ একটা আওয়াজ আসছে
একটানা বাড়ি থেকে। বাড়ির নিচের ঘরে ঢুকে
মা-জননী বলে ডাক দিল চিত্রগুপ্ত, হাঁপানির বড়
কষ্ট মা-জননী, প্রাণ যে নিগড়ে বের করে।
বেরোয় না, তবু যে আপদ-বালাই মরলে তো
বেঁচে যেতাম।

একটা কথা ছুড়েই চিত্রগুপ্ত এতখানি ফল
প্রত্যাশা করেনি। পুলকিত চিত্রগুপ্ত আরও
তাতিয়ে দিচ্ছেঃ রত্নগর্ভা আপনি মা, আপনার
লেখক-ছেলেকে দুনিয়াসুদ্ধ একডাকে চেনে।
আপনার মরা তো পাঁচিখেদির মরা নয়-মরে
দেখুন, কী মজা তখন।

মা-জননী আত্ননাদ করে ওঠেন, সেটি হচ্ছে না,
আগুনে পুড়তে পারব না বাপু। ভীষণ জ্বালা
করে। বাঁ পায়ে কেটলির জল পড়ল সেবার,
চৈঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিলাম। ঠান্ডা করার
মানসে চিত্রগুপ্ত বলে, ধর্মীয় আপত্তি না উঠলে
কবরের ব্যবস্থা হতে পারে।

না-বাপু, অন্ধকারে থাকতে পারিনে, ঘরে আমার
সারা রাত আলো জ্বলে। মাটির নিচে ঘুরঘুটি,
পাতালে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না।

কিছু বিরক্ত হয়ে চিত্রগুপ্ত শুধায়ঃ তবে কি রেখে
দিতে বলেন দেহটা?

ওয়াক থু, পোকা পড়বে, গন্ধ হবে-।

ধৈর্য হারিয়ে মা-জননী গর্জে উঠলেনঃ মোলা যা।
ঘরে শুয়ে আমি হাঁপ টানি আর জগবাম্প
বাজাই-কোথাকার কোন মুখপোড়া এসে মরা-
মরা করছে দেখ! বেরো! এভাবে কোথাও
সুবিধে করতে পারল না চিত্রগুপ্ত।

রাগে গরগর করতে করতে চিত্রগুপ্ত যমলোকে
ফিরল। যমদূতেরাও শয়ে শয়ে ফিরে এল সব

দেশ থেকে। একই খবর-আপসে কেউ মরবে না।

যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন। আত্মার দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর উপায়টা কী?

মাথা খুলে গেল হঠাৎ-চিত্রগুপ্তেরই। বলে, ভেজাল-

একটুখানি ভেবে নিয়ে কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, অব্যর্থ দাওয়াই। রামা শ্যামা ইতরজনদের কাছে যাওয়া ভুল হয়েছে-যেমন আছে থাকুকগে, ওদের ঘাঁটা দিয়ে কাজ নেই। দূতেরা চলে যাক এবার সেরা সেরা লোকের কাছে-যারা ম্যানুফ্যাকচারার, বিজনেস ম্যাগনেট। পাইকার-দোকানদারগুলোকেও চোখ টিপে আসবে।

প্ল্যানটা লুফে নেবে ওরা। দুধে নর্মদার জল, চায়ে চামড়ার কুচি, চালে কাঁকর, ওষুধে ময়দা, ময়দায় তেঁতুলবিচি-এসব বহু পরীক্ষিত পুরোনো রেওয়াজ, কোলের বাচ্চাটা-অবধি জানে। চুমরে দিলে মাথা আরও কত শত নতুন মসলা বের করবে, ভেজাল খেয়ে কতকাল মানুষ ‘সুন্দর ভুবন’ আঁকড়ে ধরে থাকে দেখা যাক।

প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভালো করে বিবেচনা করে দেখে যমরাজ সায় দিলেনঃ মন্দ বলোনি-কাজ হতে পারে।

পরমোৎসাহে চিত্রগুপ্ত বলে, ভিআইপি রাজপুরুষের কাছেও দূতেরা যাবে। জেনেশুনে তাঁরা যাতে চোখ বুজে থাকেন। ভেজালে তড়িঘড়ি ফলপ্রাপ্তি ঠিকমতো চালু হলে জনসংখ্যা তরতর করে নেমে আসবে।

যমরাজ ভাবছিলেন। তাঁরও মাথায় সহসা আলাদা এক প্ল্যান চাড়া দিয়ে উঠল। বলেন, নরলোকে খাদ্য ভেজাল দিক-আমরাও এদিকে আত্মার ভেজাল চালিয়ে যেতে পারি। মানুষ-আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু-গাধা, নেড়িকুত্তা, পাতিশিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে যাও। সাপ-ছুঁচো কেনো-বিছেতেই বা দোষ কী। বায়ুভূত নিরাকার জিনিস-ভালো রকম মিশাল করে দিয়ো, বুড়ো ব্রহ্মার পিতামহও ধরতে পারবে না।

সেই জিনিস চলছে। নবসমাজে ইদানীং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, গুড় রহস্য এইখানে।

(সংক্ষেপিত)মনোজ বসু : ভুলি নাই, চীন দেখে

এলাম, জলজঙ্গল, মানুষ গড়ার কারিগর ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। যশোর জেলার ভাঙ্গাঘাটা গ্রামে ১৯০২ সালে জন্ম।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১১, ২০০৯

146) বিনামূল্যে পাঠ্যবই

সারা পৃথিবীতে ‘ফ্রি’ শব্দটা সবার মাথায় একদম ফ্রি ভাবে ঘোরাফেরা করছে। একটা কিনলে একটা ফ্রি, রিচার্জ করলে এসএমএস ফ্রি, বন্ধ সংযোগ চালু করলে টকটাইম ফ্রি, ফ্রিজ কিনলে টিভি ফ্রি, টিভি কিনলে ডিভিডি ফ্রি-এমন আরও কত কিছু যে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে, এর কোনো হিসাব নেই। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগের পর এখন চলছে ফ্রি যুগ। এই ফ্রির যুগে সরকার তো আর পিছিয়ে থাকতে পারে না, তাই তারা শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিনামূল্যে মানে একদম ফ্রি।

প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই বিনামূল্যে বই পাবে-এটা খুবই আনন্দের সংবাদ। পাঠ্যবই কিনে কেউ দেউলিয়া হয়েছে কি না, এ তর্ক আর চলবে না। তবে পয়সা দিয়ে বই কিনতেই মার্চ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বিনামূল্যে দিলে বই পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর পরও পাঠ্যবই কিনতে কোনো টাকাপয়সা লাগবে না, এটা ভাবতেই কেমন শান্তি শান্তি লাগছে। বইয়ের দাম বেশি-এ কথা ভেবে যে ব্যক্তি তাঁর চার সন্তানের একজনকে স্কুলে ভর্তি করাতেন, তিনি হয়তো চারজনসহ বাসার কাজের ছেলে বা মেয়েটিকেও স্কুলে ভর্তি করাবেন। এতে শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি হবে; কিন্তু এ খবরে যাদের খুশি হওয়ার কথা, সেই ছাত্রছাত্রীরাই তেমন খুশি নয়। আমার সপ্তম শ্রেণী-পড়ুয়া ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, তোদের তো পাঠ্যবই ফ্রি দেবে, খুশি লাগছে না? সে গম্ভীর মুখে বলল, খুশি হওয়ার কী আছে? আমি অবাক হয়ে বললাম, খুশি হওয়ার কী আছে মানে?

পাঠ্যবইয়ের জন্য কোনো টাকা লাগবে না, এটা খুশি হওয়ার খবর নয়? ছোট ভাই নির্বিকারচিত্তে বলল, আমরা তো পাঠ্যবইয়ের চেয়ে নোটবই বেশি পড়ি। নোটবই যদি ফ্রি দিত, তাহলে হয়তো খুশি হতাম। আমি চমকে উঠলাম। বলে কি! ওর কথার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে

দেখি, আসলেই তাই। নোটবইগুলোর পাতা ছেঁড়া, দাগাদাগিতে ভরপুর। অথচ পাঠ্যবইয়ে ওসবের কোনো চিহ্নই নেই। একেবারে নতুন বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

অনেকেই বিনামূল্যে বই দেওয়াটাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না। যেমন আমার খালু। খালুর ধারণা, পাঠ্যবই ফ্রি দেবে কেন? পাঠ্যবই কি গ্লাস না বাটি যে ফ্রি দেবে? এর কোনো দাম নেই নাকি? এত লোক কষ্ট করে বই লিখবে, অথচ তার কোনো দাম থাকবে না, এটা কেমন কথা! তা ছাড়া, ভালো জিনিস তো কখনো ফ্রি দেওয়া হয় না। তবে কি আমাদের পাঠ্যবই ভালো নয়? খালুকে বোঝাই, এমন মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। সবকিছু উনি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ভাবেন।

আমাদের এলাকায় বিরোধী দলের একজন নেতা থাকেন। এ খবর শুনে তিনি এমন রাগলেন যে আমি ভাবলাম, উনি এখনই রাজপথে নেমে আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি সরকারের এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বললেন, সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যবই দিলেও তিনি পয়সা দিয়েই কিনবেন। তা তো কিনবেনই। সরকারের সব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাই বিরোধী দলের কাজ। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। বিনামূল্যে পাঠ্যবই দিলে বেশ কিছু জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হবে। ঝরে পড়বে অনেক নিবেদিতপ্রাণ চলচ্চিত্রপ্রেমী, যারা বই কেনার টাকা নিয়ে সোজা সিনেমা হলে প্রবেশ করত, সেসব চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের কী হবে? এতে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প যে কত বড় হুমকির মুখে পড়বে, তা একবারও কেউ ভাবল না। তা ছাড়া এখন তো সবাইকে বই কিনেই পড়তে হয়। ক্লাসে স্যার যখন প্রশ্ন করেন, কী রে, তুই বই আনিসনি কেন, তখন ছাত্র নিশ্চিন্তে উত্তর দেয়, স্যার এখনো বই কেনা হয়নি; কিন্তু বিনামূল্যে বই দিলে তো এ অজুহাত একেবারে মাঠে মারা যাবে। তখন ছাত্ররাই প্রশ্ন করবে, কী ব্যাপার স্যার, আজও বই আনেননি? স্যার হয়তো বলবেন, কী করব বল? এখনো বই পাইনি।

তবে এ ব্যাপারে পাশের বাসার রহিম সাহেব খুব খুশি। উনি বেশ হাসিমুখেই সেদিন বললেন, সরকার নাকি ফ্রি বই দেবে। ভালোই তো।

কেউ পড়ুক আর না পড়ুক, বইগুলো সেরদরে
বিক্রি করলেও তো কিছু টাকা লাভ হবে। কী
বলেন? আমি মাথা নাড়ি। ব্যবসায়ীদের এই
এক সমস্যা। সব জায়গায় লাভ খোঁজে! আদনান
মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৮, ২০০৯

147) জাদুঘর

আজ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। বিখ্যাত
ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর তাঁদের ব্যবহৃত
জিনিস নিয়ে গঠিত হয় নৃতি জাদুঘর। অমর
এসব ব্যক্তি যদি এই যুগে জন্মাতেন, তাহলে
তাঁদের নৃতি জাদুঘরে যেসব জিনিসপত্র স্থান
পেতে পারত তাই নিয়ে এই ফিচার। ভেবেছেন
মেহেদী মাহমুদ আকন্দরবীন্দ্র আধুনিক জাদুঘর
ইন্টারনেট মডেম

‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী’-
রবীন্দ্রনাথের এই গানেই বোঝা যায় দেশ-
বিদেশজুড়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি। আর
রবীন্দ্রনাথের এই পরিচিতি সম্ভব করেছিল
ইন্টারনেট। সোনার কি-বোর্ড

সেই আমলেই তো রবীন্দ্রনাথের সোনার কলম
ছিল, এই আমলে হলে তো নির্ঘাত তাঁর সোনার
কি-বোর্ড থাকত। বিদ্যাসাগর স্মৃতি জাদুঘর
সিডি, ফ্লপিড্রাইভ, পেন ড্রাইভ

ঈশ্বরচন্দ্র নাকি একটি বই একবারই পড়তেন।
এ যুগে জন্মালে শিক্ষামূলক সিডি, পেনড্রাইভ-
সব একবার পড়ে ছুড়ে ফেলে দিতেন তিনি।

তারই কিছু স্থান পেয়েছে এই
জাদুঘরে। পারসোনাল কম্পিউটার
মোট কতগুলো বই পড়া হলো, তা বিদ্যাসাগর
এই কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব
করতেন। আধুনিক পল্লীকবি জাদুঘর
এফএম রেডিও

গ্রামের পথেঘাটে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এই
এফএম রেডিওতে গান শুনতেন। স্পিড বোট
নদীঘেরা দুর্গম পল্লী গ্রামে ভ্রমণের জন্য কবি
এই স্পিড বোটটি ব্যবহার

করতেন। মধুসূদন নৃতি জাদুঘর
পাসপোর্ট

তাঁর বিদেশপ্রীতির কথা তো সবারই জানা।
তাঁর পাসপোর্ট আর বিভিন্ন দেশের ভিসার পাতা
স্থান পেয়েছে এই জাদুঘরে। টাকা গণনার মেশিন
‘মধুসূদন দত্ত কাহাকেও টাকা গুনিয়া দেন না’-

কেন জানেন তো? আলসেমি। তাই তিনি এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন। শরৎচন্দ্র আধুনিক জাদুঘর মোবাইল

এই মোবাইল ফোনটিতে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত এসএমএস-সমগ্র সেভ করা আছে। হোম থিয়েটার

সিনেমাগাল শরৎচন্দ্রের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই হোম থিয়েটারটি। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক জাদুঘর

এই জাদুঘরে স্থান পেয়েছে ইন্টারনেটে ব্লগে লেখা জীবনানন্দ দাশের একটি লেখা-

হে বনলতা সেন, তোমার মোবাইলে কল করতে করতে আমার মোবাইলের ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ সিম চালু করার এমন সব লোভনীয় অফার থাকা সত্ত্বেও তুমি যে কেন তোমার বন্ধ সিম এখনো চালু করছ না, তা বুঝতে পারছি না। অতি শিগগির সিমখানা চালু করে অফার গ্রহণ করো আর আমাকে মিসকল প্রদান করো। নজরুল আধুনিক জাদুঘর
লোহা কাটার যন্ত্র

নজরুল ‘কারার ঐ লোহকপাট’ ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেটা তো আর ভাঙা সম্ভব না, কাটতে হবে। এ জন্যই এই যন্ত্র। হেলমেট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যদিও মোটরসাইকেল চালাতেন না, তবুও তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে এই হেলমেটটি ব্যবহার করতেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৮, ২০০৯

148) সরকার-ই ব্যয়

প্রতি পাঁচ বছর পর সরকার পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কী?

ক. নতুন উন্নয়নের খাত তৈরি হয়।

খ. জনগণ নতুন করে স্বপ্ন দেখে।

গ. জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ঘ. দেশ পাঁচ বছর এগিয়ে যায়।

আসলে এটি একটি কনফিউজিং প্রশ্ন। উত্তর ওপরের একটিও নয়। প্রাপ্তি একটাই-বিগত সরকারের দুর্নীতি, অপরাধ আর লুটপাটের সঠিক একটা বিবরণ পাওয়া যায়। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে বলেছে, আওয়ামী লীগ দেশ চেটেপুটে শূন্য করে দিয়েছে। এবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর একে একে বেরিয়ে আসছে বিএনপির থলের বিড়াল।

(অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও অনেক বিড়াল বেরিয়েছিল সবার থলে থেকে। এখন আরও বের হচ্ছে। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর থলেতে যে কত বিড়াল থাকে, সেটা বোধহয় তারা নিজেরাও জানে না।) কবিতাটি যদি এমন হয়-এক সরকার চলে যায় রেখে যায় নৃত্য/নতুন সরকার এসে দেখে শুধু দুর্নীতি!

গত দুই বছর জরুরি অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক সরকার না থাকলেও এ জমিতে একজন সরকার ছিলেন। তিনি ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। বিএনপির সরকারের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হলেও এ সরকারের তখনো মেয়াদ শেষ হয়নি। সরকার ছিলেন, তাই ব্যয়ও ছিল; সরকারি ব্যয় যাকে বলে! সংসদে কোনো সাংসদ না থাকলেও কাল্পনিক সাংসদদের জন্য রাষ্ট্র থেকে মাত্র ৫৪ লাখ টাকার ওষুধ কেনা হয়েছে। আর মাত্র ৫০ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের বিদেশ সফরের জন্য, বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সফরগুলোতে এক দলে বেশির ভাগ সময় স্পিকার নিজেই ছিলেন এবং অন্য দলে ছিলেন তাঁরই ডেপুটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সাবেক সাংসদদের জন্য বিশাল বরাদ্দ দেওয়া হয়, ব্যাপারটা কেমন ভৌতিক না?

বিগত বিএনপির সরকারের ভেতরই বাস করতেন এই সরকার। একসঙ্গে একটা হাতি পালা যায়, দুটো পালতে গেলে খরচের দড়ি মানে না। দেখুন সংসদের খাতাপত্র কী বলছে, জমিরউদ্দিন সরকার কেবল তাঁর বাসা সাজানোর জন্য ২০০২-০৩ অর্থবছরে রাষ্ট্র থেকে নিয়েছেন ১২ লাখ ২৬ হাজার ৮৪৪ টাকা। কিন্তু মাত্র ছয় বছরের মাথায় গত কয়েক দিন আগে তাঁর ২১ বেইলি রোডের বাসায় কোনো ফার্নিচারই পাওয়া যায়নি, ওগুলো নাকি নষ্ট হয়ে গেছে! প্রশ্ন আসে, ১২ লাখ টাকায় উনি এমন কোন কাঠের ফার্নিচার কিনেছেন যে ছয় বছরেই নষ্ট হয়ে গেল! এ ছাড়া ক্ষমতায় থাকার সময় প্রতিবছর তিনি বাসায় গাছপালা লাগানোর নামে নিয়েছেন এক লাখ টাকা করে। একবার ভাবুন তো, এক লাখ টাকার গাছ যদি রাস্তার পাশে লাগানো যেত, কত কিলোমিটার রাস্তায় গাছ লাগানো যেত? এ ছাড়া অভিযোগ উঠেছে

২০০৩-০৪ সালে বিদেশে চিকিৎসা বাবদ নিয়েছেন প্রায় ২০ লাখ আর ২০০৬-০৭ সালে নিয়েছেন প্রায় ২৮ লাখ টাকা মাত্র। এমনিতেই ফি-বছর রাষ্ট্র থেকে তাঁর জন্য চিকিৎসার খরচ বাবদ বরাদ্দ থাকত আড়াই লাখ টাকা! গ্রামে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, নাপিত দেখলেই চুল কাটাতে ইচ্ছে করে। আমাদেরও বোধহয় রাষ্ট্রীয় টাকা দেখলে খরচ করতে ইচ্ছে হয়। খুব জানতে ইচ্ছে করে, ক্ষমতায় আসার আগে তিনি কতবার বিদেশে গিয়ে এত টাকা ব্যয় করে চিকিৎসা করিয়েছেন? ব্ল্যাকহোলের নাম নিশ্চয় সবাই শুনেছি। আমাদের ক্ষমতাবানেরা হলেন একেকজন হিউম্যান ব্ল্যাকহোল, রাষ্ট্রের যেকোনো সম্পদই তাঁরা গিলে হজম করতে পারেন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। সেখানে ১০-১২ লাখ টাকার ফার্নিচার, ৫০-৬০ লাখ নগদ টাকা তো মামুলি বিষয়। সে দিক থেকে ডেপুটি স্পিকার সরকারি অর্থের অনেক কম শ্রদ্ধ করেছেন। খুব সম্ভবত তাঁর নামের শেষে সরকার নেই বলে খরচের লাগাম ছিল। তিনি শুধু একবার সরকারি বরাদ্দের আড়াই লাখ টাকার পর সোয়া এক লাখ টাকা অতিরিক্ত নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ আছে।

সরকারি ব্যয়ের কথা বলব অথচ সাবেক চিপ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের কথা বলব না, তা কি হয়! আগে একটা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ! ওনি সেদিন এক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে শাসিয়ে বলেছেন, অভিযোগ আনলে সঠিক অভিযোগ আনতে হবে। তখন ওই কর্মকর্তা ২০০৬ সালে সিঙ্গাপুরে তাঁর চিকিৎসা বাবদ ছয় লাখ টাকা ব্যয়ের কথা ওঠালে তিনি বলেন, চিকিৎসা বিষয়টা খুবই মানবিক। নিজের পেটের অপারেশনের দাগের কথাও বর্ণনা করে দিয়ে দেন কর্মকর্তাকে। চিকিৎসার জন্য তিনি রাষ্ট্র থেকে কিছু টাকা বেশি নিতেই পারেন, রাষ্ট্রের এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁকে তো আর চিকিৎসাহীন রাখা যায় না! চলুন একটু পেছনে ফিরে যাই। আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর দিকে চোখ বুলাই। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সাহেব, চিফ হুইপ থাকাকালে সংসদের ক্যান্টিন থেকে নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও বহুদিন দুই বাসার নামে যে চাল-ডাল-তেল-নুন, আলু, পিঁয়াজ, আদা,

জিরা, গোলমরিচ-তেজপাতা-পাঁচফোড়ন, ঘি, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট থেকে শুরু করে লাখ লাখ টাকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন, সেগুলোও কি মানবিক হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত? দুই বাসার জন্য ক্যান্টিন থেকে কোন তারিখে কোন পণ্য কতটা নিয়ে যাওয়া হতো পত্রিকায় ছাপা হওয়া সেই ফর্দটা এখনো সবার মনে আছে। যত্ন করে সবাই মনে রেখেছে কারন তিনি যদি আবার কখনো যদি চিফ হুইপ হন, আগেরবার কী কী নিয়েছিলেন সেগুলো তাঁর মনে নাও থাকতে পারে- মানবিকতার বিষয়টি মাথায় রেখেই যেন তখন তাঁকে সেটি মনে করিয়ে দেওয়া যায়। নির্বাচনের আগে এক প্রার্থী এক যুবকের কাছে ভোট চাইতে আসেন। যুবক সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থীর ইন্টারভিউ নিতে শুরু করেন। প্রার্থী জানতে চান কেন ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। যুবকটি তখন তাঁকে বলেন, ‘আপনাকে দেশ চালানোর মতো এত বড় একটা চাকরি দেব, তার আগে আপনার দেশ চালানোর মতো যোগ্যতা আছে কি না সেটা দেখব না?’ যোগ্যতাটা আসলে কী? লুটপাট করার ক্ষমতা? তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৮, ২০০৯

149) হিংস্রটে সৎমা

একদা এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম তোমা। এই সময়ে এক ভদ্রমহিলারও স্বামী মারা গেলেন। তাঁরও একটি মাত্র মেয়ে। নাম দুসিয়া। একদিন বিপত্নীক ভদ্রলোকটি ওই বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেন। অতএব, তোমা হলো ওই বিধবার সৎ মেয়ে এবং সে কারণেই সাবেক বিধবাটি হলেন সৎমা।

তার পরই গোলমাল শুরু হলো।

অবশ্য আজকালকার সৎমায়েরা আগেকার রূপকথার সৎমায়েদের মতো নিষ্ঠুর হন না তেমন। তবে নিয়মের হেরফের সব ব্যাপারেই দেখা যায়। এই যেমন তোমা’র সৎমায়ের ব্যাপারে।

তোমা’কে প্রথম দেখেই সৎমায়ের মনটা বিধিয়ে উঠল। ঠিক করলেন, মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন। কিন্তু সেটা করবেন কায়দা করে। খোলাখুলি কিছু করার মতো বোকা তিনি নন। কারণ পেটে তাঁর বিদ্যা আছে, মাথায় বুদ্ধিও।

তা ছাড়া ওই সৎমায়ের অনেক রূপকথাও পড়া আছে। সিন্ডিরেলার গল্পও তিনি পড়েছেন। তাঁর বেশ মনে আছে, সিন্ডিরেলার সৎমা তাকে কষ্ট দিলেও সে দিন দিন রূপে-গুণে সবাইকে মুগ্ধ করে; এমনকি শেষ পর্যন্ত এক রাজপুত্র এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যায় (রূপকথার রাজপুত্রেরা কষ্ট পাওয়া গরিব মেয়েদের বিয়ে করে তাদের উদ্ধার করার জন্য যেন মুখিয়ে থাকে)।

তোমা'র সৎমা তাই ঠিক করলেন, একটু সাবধানে কাজ হাসিল করতে হবে। তা ছাড়া তাঁর নতুন স্বামী; তাঁরও রূপকথার গল্প পড়া আছে নিশ্চয়ই। আর বিয়ের সময় রেজিস্ট্রারের সামনে তো স্পষ্টই বললেন তাঁকে, 'দেখো, আমার মেয়ে তোমাকে আদরযত্ন করতে হবে। তা না করলে তোমাকে ডিভোর্স করব।' দিন যেতে লাগল। তোমা দিন দিন সুন্দরী হয়ে উঠল। দিন দিন নয়, যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়। আর যেন ঠিক সেই তালে তালেই তার সৎমা হতে লাগলেন হিংসুটে।

শেষে সৎমা ভেবেচিন্তে গেলেন এক যোগীবাবার কাছে। আজকালকার দিনে কেউ আর তুকতাক বিশ্বাস করে না বলে যোগীবাবার পসার তেমন নেই। আর যা-ও বা তুকতাক জানেন, তা-ও সব সেকেলে ধরনের।

যোগীবাবা বললেন, এক কাজ করো। ওকে কোনো কাজে সমুদ্রের তলায় পাঠিয়ে দাও। সেখানে সমুদ্রের রাজা আছেন, তিনি তাকে দেখলেই গিলে খাবেন।

-যাহ্! এটা হয় নাকি।

-তবে এক কাজ করো, ওকে দিন-রাত খাটাও। সৎমায়ের এসব কিছুই পছন্দ হলো না। রুশ আইনে কাউকে দিন-রাত খাটানোর নিয়ম নেই। তা ছাড়া পাড়ার লোকজনই বা কী বলবে? আর ব্যাপারটা জানাজানি হলে কাগজে উঠতে কতক্ষণ। তখন?

দূর ছাই! যোগীবাবা কোনো মতলবই দিতে পারলেন না। সৎমা বাড়ি যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন কী করা যায়।

পরের দিন সকালে উঠে দেখেন, তাঁর মেয়ে দুসিয়া আর তাঁর স্বামীর মেয়ে তোমা তাঁদের ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

সৎমা ঘরে ঢুকেই তাঁর মেয়ের গায়ের কম্বলটা

টেনে খুলে দিয়ে চৌঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, ‘এই দুসিয়া, ওঠ শিগগির। আমার সঙ্গে কাজ করবি আয়। এখনই তোর বাবার জন্য, বোনের জন্য সকালের খাবার তৈরি করতে হবে।’

মায়ের ধাক্কায় দুসিয়া উঠে বসে বলল, ‘তুমি মা ভুল করছ। তুমি বোধ হয় তোমা’কে ডাকতে গিয়ে আমাকে ডাকছ। আমি তো তোমার নিজের মেয়ে!’

-জানি জানি। এখন ওঠ দিকি ছুঁড়ি!

-কী যে বল তুমি মা, তার ঠিক নেই। আমার নরম হাত দুটোকে শক্ত ঝামা করতে চাও নাকি? মা, লক্ষ্মীটি-

-না, না, তুই আয়, খাবার করবি।

-আর তোমা?

-তোমা শুয়ে থাক। ঘুমোক একটু। বেচারী কাল রাতে একটুও ঘুমোতে পারেনি।

কাজেই দুসিয়াকে উঠতে হলো, মায়ের সঙ্গে কাজে লাগতে হলো। আর তোমা বিছানায় পড়ে ঘুমোতে লাগল অনেক বেলা পর্যন্ত। তোমা যখন বিছানা ছেড়ে চোখ রগড়ে উঠল, তখন দেখে তার স্কুলের বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে গুঁজে ছুটল স্কুলের দিকে।

এমন করেই রোজ তার স্কুলের বেলা হয়ে যেতে লাগল। আর দেখা গেল, স্কুলের অঙ্কগুলো না পারলে তার সৎমা এসে সেগুলো তার হয়ে কষে দিতে লাগলেন। তোমা ভাবল, সত্যি তার সৎমা কী ভালো!

আর ওদিকে দুসিয়া বাড়ির ধোয়াধুয়ি মাজামাজি-সব কাজ করতে লাগল মায়ের বকুনির ভয়ে। সৎমা একদিন স্বামীকে বললেন, দেখো তোমা’র রোজ স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। সে জন্য যদি দরকার হয়, অফিস থেকে ধার নেওয়াও উচিত। এদিকে দুসিয়া যদি স্কুলে অঙ্ক না পারে, অমনি মায়ের কাছে বকুনি খায়, ‘নিজে কষার চেষ্টা করো।’

তা ছাড়া সব কাজ দুসিয়ার ঘাড়ে। অসুখ হয়েছে, যা, ডাক্তার ডেকে আন; দুধটা নিয়ে আয় তো ইত্যাদি।

আর তোমা? কুটোগাছটাও নাড়ায় না। আর নড়াচড়া না করায় তোমার তেমন খিদেটিদেও হয় না। শরীরটাও কেমন দুর্বল মনে হয়। চেহারাটাও দিন দিন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে তোমা বেশ মোটা হয়ে পড়ল। গাল-টাল ভারী হয়ে গেল। সৎমা তাকে জোরজোর করে ভালো-মন্দ মণ্ডা-মিঠাই খাওয়াতে লাগলেন। ক্রমে তোমার এমন অবস্থা হলো যে সে নড়ে বসতে পারে না, একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে পাড়ায় সৎমায়ের কী প্রশংসা! অমন ভালো সৎমা দেখাই যায় না। বাপও খুব খুশি। সংসারে অশান্তি নেই, মেয়েটাও খুব যত্নে আছে। স্বাস্থ্যটাও বেশ ফিরেছে তার। কিন্তু কেউই বুঝতে পারলেন না সৎমায়ের মতলবটা- তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে কাজে আর লেখাপড়ায় খুব ভালো করে তুলেছেন, আচার-ব্যবহারও শেখাচ্ছেন ভালোই। আর সৎমেয়েটাকে কুঁড়ে আর অকস্মার ঢেঁকি করে তুলছেন।

গল্পটাকে বেশি না ফেনিয়ে বলি, একদিন তোমার বাপ ভদ্রলোক অসুখে পড়লেন। চিকিৎসক এসে দেখে ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে বললেন, স্ট্রবেরি ফলটা খাওয়া এ সময় খুব উপকারী। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে স্ট্রবেরি কোথায় পাবে?

দুসিয়া বলল, মা, আমি বনের মধ্যে একবার দেখি, সেখানে স্ট্রবেরি পাওয়া যেতে পারে হয়তো। অনেক গল্পে পড়েছি। ভাগ্য যদি ভালো হয়, তবে কোনো জিনিস বনের মধ্যে খোঁজ করলে সেটা পাওয়া যায়। একবার দেখি। বনের মধ্যে স্ট্রবেরি খুঁজতে গিয়ে দুসিয়ার সঙ্গে দেখা হলো এক অপূর্ব সুন্দর ছেলের। তার নাম ভাস্যা। অনেক কষ্টে স্ট্রবেরি নিয়ে ফেরার পথে ভাস্যা দুসিয়াকে তার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দুসিয়ারও বেশ ভালোই লাগল ভাস্যাকে। তার বাপ-মায়েরও বেশ ভালো লাগল ছেলেটিকে- বেশ ভদ্র, শিক্ষিত, দেখতেও বেশ। ওর সঙ্গে দুসিয়ার বিয়ে দিলে কেমন হয়?

এবং তা-ই হলো। দুসিয়ার সঙ্গে ভাস্যার বিয়ে হলো।

এই বিয়েতে তোমা হিংসায় জ্বলে উঠল। সেও ঠিক করল বনে যাবে। সেখানে গিয়ে সেও দুসিয়ার মতো শিক্ষিত সুন্দর বর খুঁজে আনবে। তোমা কাউকে কিছু না বলেই বনে গেল। আর সেখানে সে গেল এক নেকড়ের পেটে।

না, না। এটা বানিয়ে বললাম। তোমা নেকড়ের পেটে যায়নি। কারণ সে বনেই যায়নি। যাবে কী

করে? তার ওই মোটা শরীর নাড়াতেই অস্থির
সে। লাজার ল্যাগিন

অনুবাদঃ কুমারেশ ঘোষ

লাজার ল্যাগিন : রাশিয়ান রম্য লেখক। অনেক
বই লিখেছেন রঙ্গব্যঙ্গের। ছোটদের জন্যও
অনেক লিখেছেন। প্রাভদা থেকে প্রকাশিত তাঁর
বিখ্যাত বই অফেনসিভ টেলস ব্যাপক সাড়া
জাগিয়েছিল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৮, ২০০৯

150) নরসুন্দরের সামনে মাথা নোয়াতেই হয়

তুমি যত বড়ই হও না কেন, নরসুন্দরের সামনে
মাথা নোয়াতেই হয়

-এজাজুল ইসলাম

টেলিভিশনের পর্দায় যাঁর মুখ ভেসে উঠলে
ছেলে-বুড়ো সবার ঠোঁটই কানে গিয়ে ঠেকে,
পর্দায় হাসানোর পাশাপাশি বাস্তবে যিনি লোকের
রোগশোক সারাতেই সিদ্ধহস্ত, তিনি এজাজুল
ইসলাম। এসেছেন আলোচনে। সঙ্গে ছিলেন
জিনাত রিপাআপনি ডাক্তার। দয়া করে বলবেন
কি, আসলে ব্যবস্থাপত্রে এমন কী লেখা থাকে
যে ডাক্তার আর ওষুধ বিক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ
বুঝতে পারে না?

- ‘আমারটা আমি কামিয়ে নিয়েছি। এবার
তোরাটা তুই বুঝে নে!’

আপনি দীর্ঘদিন ধরে হুমায়ূন আহমেদের নাটকে
অভিনয় করেছেন। তাঁর নাটকে কাজ করার
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক কোনটি?

- খুব গুরুত্বপূর্ণ সিকোয়েন্সের গুটিংয়ের সময়
স্যার সামনে থাকেন না। স্যার যখন পরিচালনা
করেন, তখন অল্প একটু ভুল করলেও খুব
রেগে যান। এ জন্য সব সময় তটস্থ থাকতে হয়
ইউনিটের সবাইকে। এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ শটের
সময় স্যার নিজেই উঠে চলে যান আমাদের
কথা ভেবে। স্যার চলে গেলেই সবাই টেনশন
ছাড়া দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলতে পারেন।
স্যার থাকলেই বরং টেনশনে বারবার ভুল হয়
আর স্যার রেগে যান।

আচ্ছা, অপারেশন থিয়েটারে রোগী বাদে ডাক্তার
অন্য কাউকে ঢুকতে দেন না কেন?

- তবে একটা মজার ঘটনা বলি। আমি তখন
রংপুরে। একবার এক অপারেশন থিয়েটারের
দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে আমিও পড়লাম। তো

সেদিন রংপুরের ডিসি সাহেবের খুব মজি হয়েছে তিনি অপারেশন দেখবেন। যতই তাঁকে বোঝানো হচ্ছে, তিনি ততই গোঁ ধরছেন। তাঁর বক্তব্য-তিনি ডিসি মানুষ। জীবনে কত বড় বড় ঘটনা দেখেছেন। ও মা! যেই না অপারেশন শুরু হলো, একটুখানি রক্তপাত দেখেই তিনি অজ্ঞান! বুঝুন, ঠেলা।

আমাদের দেশের কোন ব্যাপারটি আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয়েছে?

- ভেজাল খাবার। রোগশোক লেগেই আছে। এতে ডাক্তারিতে সুবিধা হয়। আর অভিনয়ে ভালোবাসা। (ভালোবাসা ডাক্তারিতেও প্রযোজ্য)। 'তারা তিনজন'-আপনার এবং ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরুর একটি জনপ্রিয় সিক্যুয়েল নাটক। আপনাদের তিনজনের কোনো মজার ঘটনা আছে একসঙ্গে?

- একবার একটি নাটকের কাজে শীতের মৌসুমে লন্ডন গিয়েছি। সারা রাস্তা, শহর বরফে ঢাকা। আমরা বুদ্ধি করে চিনি নিয়ে বের হলাম। যেখানকার বরফ একটু বেশি পছন্দ হয়, চিনি দিয়ে খেয়ে ফেলি। ঘটনাটা মনে পড়লে এখনো ওভাবে আইসক্রিম বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করে। উন্নত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে কোন দিক দিয়ে?

- আচার বনাম টমেটোর সসে।

আর পিছিয়ে?

- ওখানকার ছোট শিশুরাও পটাপট ইংরেজিতে কথা বলে!

মোবাইল ফোনের সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক কোনটি?

- শ্যামলী থেকেও বলে দেওয়া যায় ফার্মগেট। যার যেমন সুবিধা আরকি!

শুরুটা এক হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ এমন দুটি শব্দ বলুন।

- তুষ আর তুষার।

দুই নৌকায় পা দিলে কী হয়?

- প্যান্ট ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

ডাক্তারি বিদ্যা আপনার কী কেড়ে নিতে পারেনি?

- সুন্দর হাতের লেখা।

কোনো ব্যাংকে ডাকাতির পর প্রথম কোন কাজটা করা হয়?

- ব্যাংকের সামনে কড়া পুলিশি প্রহরা বসানো

হয়।

জীবনের বড় দুঃখ কী?

- জীবনে কখনো অস্কার পাব না।

এমন কোনো পেশা আছে, যেখানে সব মানুষ ওই পেশাজীবীর সামনে মাথা নুইয়ে রাখতে বাধ্য হয়?

- নরসুন্দর।

নরসুন্দরের পেশার সঙ্গে মিল আছে কোন পেশার?

- রাখালি। একজন কাটে ঘাস, আর অন্যজন চুল। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৮, ২০০৯

151) ফল নিয়ে বিফল প্রলাপ

-ফল সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছেন? বলেন কী?

সেমিস্টারও ফলের হয়? সে কি তবে আম-কাঁঠাল সেমিস্টার?

-আরে না। যা-ই হোক, এখন অবশ্য আম-কাঁঠালের ছুটি চলছে।

ফলের আকাল এ বঙ্গদেশে কোনোকালেই অবশ্য ছিল না। আজকাল আরও কত ফলই না যোগ হয়েছে। সেসব যোগ করলেও তো দাঁড়ায় যোগফল

152) তিনি বদলে গেলেন

ঘুম ভাঙতেই মোতালেব সাহেব ঠিক করলেন, আজ থেকে তিনি বদলে যাবেন। তিনি দেখলেন, তাঁর স্ত্রী স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তিনি বললেন, কই যাও?

-কই যাই মানে? তুমি জানো না আমি একটা স্কুলে চাকরি করি? ন্যাকামি কর?

-তোমার স্কুলে যাওয়া হবে না।

-মানে?

-মানে আজ থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ। আমি আরও আধা ঘণ্টা ঘুমাব। এর মধ্যে তুমি আমার নাশতা প্রস্তুত করবে। আমি যখন নাশতা খাব, আমার পাশে বসে থাকবে। তারপর অফিসে যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবে। একটা বিদায় চুম্বনও দিতে পার চাইলে।

স্ত্রী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! এই তার স্বামী? তিনি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে নাশতা তৈরি করতে গেলেন।

মোতালেব সাহেব অফিসে পৌঁছে দেখেন তাঁর রুমে দুজন লোক বসে আছেন আগে থেকে।

-আপনারা?

-স্যার, ওই যে আমাদের ফাইল দুটো।

-ও আচ্ছা। টাকা এনেছেন?

-টাকা?

তঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন।

-টাকা ছাড়া ফাইল নড়বে না।

-স্যার, আপনি টাকা চাইলেন? আপনার মতো ঋষিতুল্য মানুষ!

-হুঁ! চাইলাম। কারণ 'আমি বদলে গেছি'।

বজ্রাহত হয়ে বসে থাকেন দুই লোক। তারপর পকেটে হাত ঢোকান টাকা বের করতে!

অফিস শেষে মোতালেব সাহেব উঠলেন। এ

সময় দুই-তিনজন তরুণ অফিসার ঢোকেন তাঁর রুমে।

-স্যার!

-তোমরা?

-কেন, স্যার, যাবেন না?

-কোথায়?

-বাহ! ভুলে গেলেন, স্যার? আমরা অফিস ছুটির পর আপনার সাথে 'চা বারে' যাই। সেখানে চা খেতে খেতে আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। আমরা সেখান থেকে জীবনে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাই!

-ও আচ্ছা! মনে পড়েছে। হ্যাঁ, চলো। তবে চা বারে নয়।

-কোথায়?

-আসল বারে। আমরা একটু পান করব!

হতভম্ব তরুণ অফিসাররা এ ওঁর মুখের দিকে চান। এ কী শুনছেন তাঁরা? ঋষিতুল্য স্যার এ কী বলছেন?

গভীর রাতে পাঁড় মাতাল হয়ে মোতালেব সাহেব তাঁর এলাকায় ঢুকলেন। দুজন নাইট গার্ড ডিউটি করছিলেন। তাঁরা ছুটে এলেন।

-স্যার, আপনার একি অবস্থা? আপনি মাতাল! আপনি মদ খেয়ে টাল হয়ে বাড়ি ফিরছেন?

-হ্যাঁ, মদ খেয়েছি। আমি যে বদলে গেছি!

-কিন্তু কেন, স্যার?

-কারণ...ওরা বদলাতে বলেছে, কিন্তু যারা আগে থেকেই বদলে আছে তারা কী করবে? তাদেরও তো বদলাতে হবে, না কি? তাই...হিক্।

টলতে টলতে এগিয়ে যান মোতালেব

সাহেব।(প্রিয় পাঠক, তবে এ ধরনের বদলানো কিন্তু আমাদের কাম্য নয়! হে হে...!!) আহসান

হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৫, ২০০৯

153) ফল পরিচিতি

কাঁঠাল

কাউকে খোঁচা দেওয়া ও খোঁচা খাওয়ার জন্য উপযুক্ত বহিরাবরণের এ ফলটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এটি খাওয়ার আগে ভাঙতে হয়, তবে যেখানে-সেখানে ভাঙলে চলে না। এটি অন্যের মাথায় ভেঙে খেতে হয়। তবে হ্যাঁ, কাঁঠালটা কিন্তু পাকা হতে হবে। আর যদি পাকা না হয়, তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে কাঁঠালের গায়ে কিল মারতে শুরু করুন। তারপর কিলিয়ে পাকানো কাঁঠাল অন্যের মাথায় ভেঙে আরামে খান। আখ

কখনো খাওয়া, কখনো খাওয়ানো-কোনো কাজেই আখের জুড়ি নেই। খাওয়া বলতে আখের রস আর খাওয়ানো বলতে আখকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে মার খাওয়ানোর কথা বলা হচ্ছে। আম

কাঁঠালকে জাতীয় ফলের মর্যাদা দেওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ ফল হচ্ছে আম। নিজেদের জাতীয় ফল দাবি করে তারা আন্দোলনেও নামে, কিন্তু কাঁঠালের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। সেই সব আন্দোলনকারী আহত আমাদের আমরা ‘ল্যাংড়া’ আম নামে চিনি। জাম

এটি এমন একটি ফল, যা খাওয়ার সময় খাবারের চেয়ে পোশাকের দিকে বেশি নজর দিতে হয়। নইলে জামের রঙে জামা রঙিন হতে সময় লাগবে না। উল্লেখ্য, রাস্তাঘাটের জ্যাম আর ফল জামের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। কমলা

আপেলের মতো দেখতে হলেও কমলা কিন্তু ছুঁলে খেতে হয়। আর এর ছালেরও আছে বহুমুখী ব্যবহার। অন্যের চোখে কমলার ছালের রস ছিটানো, বাসে বমি বমি ভাব হওয়া যাত্রীর নাকে ধরা ইত্যাদি কাজের কাজি হচ্ছে এই কমলা। কলা

বাংলার অন্যতম বিনোদনধর্মী একটি ফলের নাম কলা। কলার খোসায় আছাড় খেয়ে পড়া মানুষকে দেখে কত মানুষ যে কত মজা পেয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। লিচু ব্যতিক্রমী এ ফল শ হিসাবে বিক্রি হয়। তবে গুনে না নিলে বাসায় খাওয়ার পর ১০০ ফলের

জায়গায় কতটি পাবেন তা বলা মুশকিল। আর এসব লিচুচোরের কর্মকাণ্ডে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘লিচু-চোর’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। বেল

এটি এমন একটি ফল, যেটি পাকলে কাকের কিছু যায় আসে না। এই যে কথায় বলে, ‘গাছে বেল পাকিলে তাতে কাকের কী!’ টাক মাথার লোকদের জন্য ভয়াবহ এক বিভীষিকার নাম এই বেল। জানেন তো, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। লেখাঃ মেহেদী মাহমুদ আকন্দ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৫, ২০০৯

154) করপোরেট নৌকাবাইচ

একটি বাংলাদেশি কোম্পানি ও একটি জাপানি কোম্পানি নিজেদের মধ্যে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। ঠিক হলো, বুড়িগঙ্গা নদীতেই নৌকাবাইচ হবে। দুই দলই বেশ জমজমাট প্রস্তুতি নিল। অনেক প্রশিক্ষণ ও কঠিন শ্রমের পর এল সেই প্রতীক্ষিত দিন।

বেশ উৎসবমুখর পরিবেশ চারদিকে।

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। জাপানি দল প্রায় এক মাইল ব্যবধানে জিতে গেল।

বাংলাদেশ দলটি তখন বেশ আশাহত এবং কোম্পানি এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়ে খুবই মর্মান্বিত। একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করা এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্পর্কে দিকনির্দেশনার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

এক মাস তদন্তের পর কমিটি তার প্রতিবেদনে বলল, পরাজয়ের কারণ নৌকাবাইচে জাপানি দলের আটজন দাঁড় বাইছিল আর একজন দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল, যেখানে বাংলাদেশ দলে একজন দাঁড় বাইছিল আর আটজন দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল।

বাংলাদেশি করপোরেটের ম্যানেজমেন্ট টিম সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদেশি কনসালটেন্সি ফার্মকে এই বিষয়ে গবেষণা করে সঠিক কর্মপন্থা বের করার এবং কর্মদক্ষতা উন্নয়নের দায়িত্ব দিল। বেশ কিছু মাস ও কোটি কোটি টাকা খরচের পর কনসালটেন্সি ফার্ম জানাল, নৌকাবাইচে বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিযোগী দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল, যেখানে সমন্বয়ের অভাব ছিল এবং পর্যাপ্ত দাঁড় বাওয়া হয়নি। অতএব পরবর্তী বছর যাতে

জাপানি কোম্পানির কাছে না হারে, সে জন্য তারা একটি চমৎকার কর্মপন্থাও বের কর ফেলল। আর তা হলো-

নৌকাবাইচে চারজন প্রধান দিকনির্দেশক থাকবে, তিনজন সহযোগী দিকনির্দেশনার কাজ করবে এবং একজন সমন্বয় সাধন করবে। অপরদিকে বাকি একজনকে দাঁড় বাওয়ার ওপর বেশ কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তার দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তবেই জাপানি কোম্পানির সঙ্গে জেতা সম্ভব।

যেমন কথা তেমনি কাজ। পরবর্তী বছর আবার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। এবার বাংলাদেশ দলটি দুই মাইলের ব্যবধানে হারল। ফলাফল দেখে বাংলাদেশি কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট টিম বেশ কিছু কার্যকরি পদক্ষেপ নিল। যিনি দাঁড় বাইছিলেন তাঁকে তাঁর অদক্ষতার জন্য বহিষ্কার করল। ওই নৌকাটি নিলামে তুলে বিক্রি করে দিল এবং এ সংক্রান্ত যত অর্থ লগ্নি ছিল তা ফিরিয়ে নেওয়া হলো। কনসালটেন্সি ফার্মকে তার দক্ষ কর্মপরিকল্পনার জন্য পুরস্কৃত করা হলো। যা টাকা থাকল, ম্যানেজমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের বোনাস হিসেবে প্রদান করা হলো।

আর এভাবেই করপোরেট নৌকাবাইচের ইতি ঘটল। মুনাস ইকবাল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৫, ২০০৯

155) অবাক করা বিয়ের প্রজেক্ট

লীনা আর লতিফের বিয়ে হয়ে গেল সেদিন। লীনা ইঞ্জিনিয়ার জব্বার সাহেবের মেয়ে। আর লতিফ? সেই যে একহারা সুশ্রী চেহারার ছেলেটি। বিলেত না আমেরিকা থেকে দু-দুটো পাস দিয়ে সবে এসে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছে। বিয়েতে গিয়ে দেখি, প্রজেক্টের যেন পাহাড় বনে গেছেঃ ঘড়ি, শাড়ি, বই, গয়না-মোট কথা, সুশ্রী সুন্দর আরামদায়ক আধুনিক রূপসজ্জার যা কিছু কল্পনা করা যেতে পারে, কিছুই বাদ পড়েনি।

যাক, বিয়ে তো হয়েই গেল এবং লীনা-লতিফ এক নতুন বাসায় গিয়ে উঠল। বেশ সুন্দর বাসাটি। সামনে একখানা বাগানের মতো। পেছনটা খোলা। হুঁ করে বাতাস বইছে সারা দিন। বড্ড স্বাস্থ্যপ্রদ জায়গাটা। তবে তারা বড্ড একলা পড়ে গিয়েছিলঃ চাকরবাকর তখনো

জোগাড় করে উঠতে পারেনি।

এমনই সময় হঠাৎ একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যা সত্যি ভোলার নয়।

সেদিন সকালে চা খাবার আগে লতিফ বসে শেভ করছিল। তাকে নাকি তাড়াতাড়ি সেক্রেটারিয়েটে যেতে হবে। জরুরি একটা কাজ আছে। ডাকপিয়ন সামনে একখানা খাম ফেলে দিয়ে চলে গেল। ঈষৎ নীলাভ খামখানাঃ দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লীনা-লতিফের নাম লেখা। লতিফ ভাবে, আমাদের বিয়ে তো হয়ে গেল সেদিন। এ আবার কার বিয়ের চিঠি? লতিফের ডান হাতখানা তখনো শেভিংয়ে ব্যস্ত। বাঁ হাতে খামের কভারটা খুলে সে একটুখানি দেখল। ততক্ষণে লীনাও এসে বসে পড়েছে পাশে।

লতিফ বলল, ‘দেখ তো, চিঠিপত্র নেই, এ কেমন ধরনের খাম।’ লীনা খামের মধ্যে আঙ্গুল গলিয়ে বলল, ‘কী যেন দুটো কাগজের টুকরোর মতো ঠেকছে।’ সঙ্গে সঙ্গে লীনা যে দুটো জিনিস টেনে বার করল, বিয়ের রাজ্যে এমন প্রেজেন্ট কেউ আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়নি। বা রে! এ যে দুটো সিনেমার টিকিট! কে যেন পরম যত্নে অ্যাডভান্স বুকিং করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আজকেই সন্ধ্যা ছয়টার শো। গুলিস্তানে। ড্রেস সার্কেল। অবশেষে খামখানা আরও একটু ভালো করে ঝাড়া দিতেই ছোট্ট একখানা প্লিপও বেরিয়ে পড়ল। তাতে লেখাঃ ‘লীনা-লতিফ, তোমাদের বিয়েতে শরিক হতে না পেরে বড়ই দুঃখিত। তাই ডাকযোগে এ দুটো ক্ষুদ্র উপহার প্রেরণ। যদিও নিতান্তই সামান্য, আশা করি গ্রহণে কুণ্ঠিত হবে না। প্রার্থনা করি তোমাদের মধুচন্দ্রিমা মধুর হোক।

‘ইতি, তোমাদের নাম না জানা বন্ধু’ (নাম জানতে চেয়ে লজ্জা দियो না)।

বিনয়ে-আনন্দে লীনা-লতিফ কতক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। বিয়ের প্রেজেন্ট তারা বহু পেয়েছে, বহু দিয়েছে। কিন্তু সিনেমার টিকিটের মাধ্যমে এমন অবাক করা বিয়ের প্রেজেন্ট! ওঃ, এ যে রীতিমতো স্বপ্নের মতো সুন্দর! তাই তারা তখনই ঠিক করে ফেললঃ এ ছবি তারা দেখবেই।

কিন্তু একটা বিষয়ে তাদের মনে ক্ষোভ থেকে গেল। কে এই অবাক করা বন্ধু, শুধু দানই করে

গেল কিন্তু জানতে দিল না, কে সে?

সুতরাং লীনা-লতিফের খুব খারাপ লাগল, সারাটা দিন তাদের আর কোনো কাজে মন বসল না। লতিফ তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু তাড়াতাড়িই তাকে ফিরে আসতে হলো। অফিসের কোনো কাজে আজ তার মন বসেনি। এদিকে সিনেমার তখনো অনেক দেরি। লীনা কাপড়চোপড় পরে আগেভাগেই তৈরি হয়ে বসে আছে। লীনার মনে মনে বিশ্বাস, যতই নাম ঢাকুক না কেন, ভদ্রলোক সিনেমার হলে নিশ্চয়ই একবার দেখা দেবেন। তাই চা ঢালতে ঢালতে লীনার প্রস্তাবঃ ‘চিঠিখানা আরও একবার ভালো করে দেখলে হয় না? হয়তো ভদ্রলোক নাম-ঠিকানা সবই দিয়েছেন। আমরা খেয়াল করিনি।’ লতিফ বলে, তাই হোক। লিপখানা এনে তারা উল্টেপাল্টে অনেকক্ষণ দেখল। কিন্তু নাম-ঠিকানা কিছুই পাওয়া গেল না। হঠাৎ হস্তাক্ষরটা দেখে লতিফের একটা কথা মনে পড়লঃ ‘লীনা, এসব মুস্তাফিজের কারসাজি নয় তো?’

মুস্তাফিজ ছিল লীনা-লতিফের ছেলেবেলার খেলার সাথি। সেই যে সেবার স্কুল পালিয়ে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হলো। আহা! বেচারী! তারপর আজ ২০-২২ বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। লতিফ শুনেছে, ইতিমধ্যে সে নাকি এক বিরাট কারবারের মালিক হয়ে বসেছে এবং বিয়ে-শাদিও করেছে।

লতিফ বলল, ‘আচ্ছা, ছিঁড়ে ফেলা খামখানা আবার আনো তো দেখি। ছেঁড়া খামখানা এনে ওরা দুজন অনেকক্ষণ পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের কাজ চালাল। গোটা গোটা অক্ষরে লীনা আর লতিফের নাম স্পষ্ট করে লেখা। লিপখানায়ও গোটা গোটা হরফ। ক্রমশ লতিফের সন্দেহ বেড়ে যায়ঃ ‘তাই তো! এমন ধারা গোটা গোটা অক্ষরে মুস্তাফিজই তো একমাত্র লিখত তাদের ক্লাসে।’ লীনারও সন্দেহ অনুরূপ। শেষে লতিফ আর থাকতে পারল নাঃ ‘না হে, আমার আর বুঝতে বাকি নেই। এ মুস্তাফিজেরই কীর্তি।’ তারপর তারা মুস্তাফিজকে স্মেহের গাল দিতে দিতে মনে মনে ঠিক করে রাখল, যদি কোনো দিন মুস্তাফিজের সঙ্গে দেখা হয়, তবে আর রক্ষে নেই।

রাত নয়টায় ছবি দেখে যখন তারা বাসায়

ফিরল, এমন নির্মল আনন্দে মনপ্রাণ ভরে গেল যে সে আর বলার নয়! ওঃ, কী মনমাতানো ছবিখানা! যেমন গেটআপ, তেমনি প্রযোজনা, অ্যাক্টিং, গান, সংলাপ, টেকনিক, প্লট! সব। একেবারে অনবদ্য! সত্যি এমন রুচিসম্পন্ন একজন বন্ধু যে এতক্ষণ নির্দয়ের মতো গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে, ভাবতেও লীনার রাগ ধরে যায়ঃ ‘কই, সিনেমার কক্ষেও তো ভদ্রলোক একবার এসে দেখা দিতে পারতেন। দিলে কী ক্ষতি হতো তাঁর?’ ইত্যাদি। ইত্যাদি। লতিফ বলল, ‘লীনা, ওসব ভেবে আর কী লাভ? এখন খাবারের জোগাড় করা যাক। রাত যে প্রায় ১০টা। কাজেই লীনা খাবার জোগাড় করবে বলে ভেতরে চলে গেল এবং সুইচ টিপল। তার পরেই এক বুকফাটা চিৎকার!

লতিফ দৌড়ে গেল।

গিয়ে দেখে, লীনা প্রায় বেহুঁশের মতো পড়ে আছে, আর ঘরে চেয়ার-টেবিলগুলো সব ওলট-পালট। পেছনের দরজাখানা খোলা, আর জানালার শিকগুলো ভাঙা। কে যেন তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিয়ের প্রেজেন্টগুলোসহ দামি দামি গয়নাগাটি নিয়ে ভেগে পড়েছে। সবসুদ্ধ ৫০ হাজার টাকার মাল! এমন সময় দেখা গেল আর একখানা ছোট ্‌লিপ, সেই রকমেরই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। তাড়াতাড়ি ্‌লিপখানা কুড়িয়ে নিয়ে লীনা-লতিফ পড়তে বসে গেল।

“লীনা-লতিফ,

প্রথমত, আমার ভালোবাসা নিয়ো।

হ্যাঁ, তোমাদের ভালোবাসা সত্যি ভালো! এমন ভালোবাসাতে তো আর যা তা ধরনে প্রবেশ করা চলে না। তাই ঠিক করা গেলঃ ‘টিকিট কেটে সিনেমায় পাঠানো যাক।’ আশা করি ছবিখানা দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছ। যেমন আমিও আনন্দ পেলুম তোমাদের বাসাখানাকে শূন্য করে।

হ্যাঁ, সত্যি তোমাদের দারুণ ভালো বাসা! আজ তবে আসি। সাবধানে থেকো। ইতি।”সাজেদুল করিম, শিশুসাহিত্যিক। জন্মঃ ১৯১৭, মৃত্যুঃ ১৯৯৫।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৫, ২০০৯

156) পঞ্চম বল

পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস। বিজ্ঞানের স্যার সাধারণত গম্ভীর হয়ে থাকেন। কিন্তু আবদুল মজিদ স্যার ব্যতিক্রম। তিনি সুযোগ পেলেই পদার্থবিজ্ঞানের বাইরে চলে যান। তিনি কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ‘বাবা, আজ আমি তোমাদের মৌলিক বল পড়াব। মৌলিক বল চার প্রকার। বুঝা, পদার্থবিজ্ঞান কবিতা নয়। কঠিন জিনিস। কবিতা হইল প্রেমকাহিনী। কবিতা পইড়া এই জগতে কোনো উন্নয়ন হইব না। একটা কবিতা লিখলে মানবজাতির সামান্যতম কল্যাণ হয় না। আবার না লিখলেও কারও কোনো ক্ষতি হয় না। বলো হয়?’

‘না, স্যার, হয় না।’ আমরা চিৎকার করে জবাব দিই।

এক কবি লিখছেন-

‘যদি আমায় মনে পড়ে

মেঘের ডানায় চড়ে

ভাসব উড়ে ু’

এটা ডাহা মিথ্যা কথা। মেঘ হইল কুয়াশার মতো। মেঘে চইড়া মানুষ উড়তে পারলে আর বিজ্ঞানীদের প্লেন বানানোর প্রয়োজন পড়ত না। আর ডানা এল কীভাবে?

‘আফসোস, তোমরা গাঁটের পয়সা খরচ করে এই ডাহা মিথ্যা কথা ক্রয় করো। এসব অর্থহীন কথাবার্তা পড়ো। সময় নষ্ট করো। সত্য আছে বিজ্ঞানের মধ্যে। সত্য জানতে হলে বিজ্ঞান পড়া। বাবারা, আমি কি জানি বলছিলাম। ও মনে পড়েছে, মৌলিক বল। মহাবিশ্বে চার প্রকার মৌলিক বল বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণীর হলো মহাকর্ষীয় বল। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষীয় বল বলে। এই যে চাঁদ দেখছ, পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। এর কারণ মহাকর্ষীয় বল।’ দুই.

পরের দিন স্যার ক্লাসে বললেন, ‘আজ তোমাদের পড়াব দুর্বল বল ও নিউক্লীয় বল। এটাই হইল... বাবারা, চতুর্থ প্রকার বল হলো তড়িৎ চৌম্বক বল। দুটি বিপরীত ধর্মের বস্তুর মধ্যে এই বল কাজ করে।’

এরপর স্যার মৌলিক বল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলেন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু ক্লাসে এ ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি

না বুঝতে পারছি না। থাক, ক্লাস শেষ হোক।
স্যারের রুমে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা
করব। ক্লাস শেষে স্যার বললেন, ‘বাবা, তোমরা
মৌলিক বল নিশ্চয়ই বুঝেছ। এই চার প্রকার
বল মহাবিশ্বকে শাসন করে।’তিন।

একদিন আমার বন্ধু মোতালেবকে দেখি
কলেজের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা বিলকিসের
দিকে তাকিয়ে আছে। বিলকিসও আড় চোখে
মোতালেবকে দেখে। দুজনের চোখাচোখি হয়।
মোতালেব এগিয়ে যায়। অজানা এক আকর্ষণ
তাকে টেনে নিয়ে যায়। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে।
বিলকিস ক্লাসে চলে যায়। মোতালেবও পেছনে
পেছনে যায়। সে বিলকিসের কাছাকাছি একটি
বেঞ্চিতে বসে।

এ ঘটনার পর থেকে বিলকিস-মোতালেব
একসঙ্গে ক্লাসে আসে। একসঙ্গে বাড়ি ফেরে।
দুজন পাশাপাশি হাঁটে। নদীর পাড়ে যায়। ছুটির
দিন তারা বেড়াতে যায় দূরে কোথাও। বিলকিস
কলেজে না এলে মোতালেব কলেজে থাকে না।
সে বিলকিসের বাড়ির আশপাশে ঘোরে।
বিলকিস হাসলে মোতালেব হাসে। বিলকিস
কাঁদলে মোতালেব কাঁদে।চার।

স্যার তাঁর রুমে বসে আছেন। একা। এখনই
সুযোগ আমার নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে
বিস্তারিত আলোচনা করার।

আমি বললাম, ‘স্যার, আপনি বলেছিলেন এই
মহাবিশ্বে চার প্রকার মৌলিক বল আছে।’

‘জি।’

‘এই চার প্রকার বলের বাইরে কি কোনো বল
নেই?’

‘না।’

‘স্যার, এই চার প্রকার বল ছাড়া পৃথিবীতে
আরও এক প্রকার বল আছে, যা মানুষকে
শাসন করে।’

স্যার মুচকি হেসে বলেন, ‘সত্যি?’

‘জি, স্যার। আমি আবিষ্কার করেছি।’

‘এত দিন পর আমি তাহলে একজন বৈজ্ঞানিক
ছাত্র পেলাম। তা বলো, তোমার এই পঞ্চম
বলের নাম।’

‘যেহেতু এটা মানুষের মনের মধ্যে থাকে। মনের
ব্যাপার। তাই এর নাম দিয়েছি মনস্তাত্ত্বিক বল।
ইংরেজিতে হয় সাইকোলজিক্যাল ফোর্স।’

‘তা বৈজ্ঞানিক সাহেব, একটি উদাহরণ দিলে

আরও ভালোভাবে বুঝতাম। বৈজ্ঞানিক সূত্রের সঙ্গে উদাহরণ দিতে হয়।’

‘একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে এই বল ক্রিয়া করে। যেমন আমাদের ক্লাসের মোতালেব ও বিলকিসের মধ্যে এই বল কাজ করে। তারা দুজন পাশাপাশি থাকতে চায়। তা ছাড়া একজন দূরে গেলে অন্যজন টান অনুভব করে। এই বলের ধর্ম মহাকর্ষ বলের উল্টো। যত দূরে যাবে, টান তত বাড়বে।’

‘এটা কোনো প্রমাণ হলো?’

‘স্যার, বস্তুগত প্রমাণ আছে। মোতালেবের ব্যাগের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের বই নেই। সব কবিতার বই। ও বলে, পদার্থবিদ্যা দিয়ে মহাবিশ্ব বোঝা যায়, মানুষের মন বোঝা যায় না। মানুষের মন বুঝতে হলে কবিতা পড়তে হবে।’

স্যার থমথমে গলায় বললেন, ‘তুমি এখন যাও। পরে এ নিয়ে কথা বলব।’ ছয়।

পরের দিন দেখি, স্যার রেগে বোমা হয়ে আছেন। স্যার আমাকে বললেন, ‘মোতালেবের ব্যাগ খুলে চেক করো?’

আমি ব্যাগ খুলি। সব কবিতার বই। কোনো পদার্থবিদ্যার বই নেই।

স্যার বললেন, ‘এগুলো কী? কবিতা লিখবা।

মজনু হইবা। মজনুগিরি আমার ডিপার্টমেন্টে চলব না।’

মোতালেব ক্লাস ত্যাগ করার সময় বলল, ‘স্যার, আমি মহাবিশ্ব না, মানুষের মন বুঝতে চাই।’

আমার এই যুগান্তকারী পঞ্চম বল আবিষ্কারের ফলে মোতালেব পদার্থবিদ্যা ছেড়ে আর্টসে চলে গেল সাহিত্য পড়তে। সঙ্গে বিলকিসও!—

আব্দুল্লাহ আল মামুন

খুন্না, ওসমান মঞ্জিল, হিজলা, বরিশাল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

157) তবারক মিয়া - একজন বিজ্ঞানী

‘মোরগগুলোর কী খবর?’

‘তারা তো ডিম পাড়ছে।’

‘মোরগ কি ডিম পাড়ে?’

‘কেন নয়, আমার হাইব্রিড মোরগগুলো ডিম পাড়ে।’

‘তা, এই ডিমগুলোর সঙ্গে মুরগির ডিমের পার্থক্য কী?’

‘মুরগির ডিমে বাচ্চা হয়, কিন্তু মোরগের ডিমে

বাচ্চা হয় না।’

কথা বলছিলাম বিজ্ঞানী তবারক মিয়ার সঙ্গে।
আমার অডুত বন্ধু। অডুত কেন? তাহলে বলি,
শুনুন। এই তো সেদিন আমার বাসায় এসেছিল
বেল্টের পরিবর্তে চেইন দেওয়া শার্ট-প্যান্ট
পরে।

তোমার প্যান্ট-শার্ট অন্য রকম লাগছে।

হ্যাঁ, এখন তো প্যান্টের কোমরেও চেইন
লাগানো হয়েছে। ফলে দুটো সুবিধা হলোঃ এক.
প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে সরাসরি কানেক্টেড হয়ে গেল
এবং দুই. শার্ট ইন করার বাড়তি ঝামেলাটুকু
থাকল না।

তা বেল্ট পরা কি বাদ দিয়েছ?

না, বেল্ট দিয়ে তো অন্তর্বাস পরি।

কী, বেল্ট দিয়ে অন্তর্বাস পরো?

হ্যাঁ, ছিনতাই-রাহাজানির এই দুনিয়ায় কি কিছু
রাখা যায়। তাই সবকিছু রাখি অন্তর্বাসের বিভিন্ন
পকেটে। ফলে সেটা ভারী হয়ে যায়, তাই বেল্ট
দিয়ে পরা।

জুতাগুলোও দেখছি অন্য রকম মনে হচ্ছে!

সেগুলোতে মোটর লাগানো হয়েছে। রিমোট
কন্ট্রোল টিপ দিলেই চলতে শুরু করে। ততক্ষণে
টেবিলে কফি দেওয়া হয়ে গেছে। আমি বললাম,
নাও, কফি খাও।

কফি আর কি, ক্যাফেইন তো। আমার কাছে
ক্যাফেইন ট্যাবলেট আছে। ওটা খেয়ে নিলেই
তো হয়। এক গ্লাস পানি দাও তো।

আমার কাছে এ ঘটনাটা ঠান্ডা পানি দিয়ে কফি
খাওয়ার মতো মনে হলো। আমার হঠাৎ মনে
পড়ল মশার কথা। কিছুদিন

আগে মশা মারার যন্ত্র বানানোর কথা বলেছিল।
জিজ্ঞাসা করতেই জানাল, তার বাসার মশারা
নাকি রক্ত খায় না। তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন
করা হয়েছে।

তাহলে ওরা কী খায়?

ওদের জন্য স্পেশাল স্যুপ বানানো হয়েছে, যার
স্বাদ মানুষের রক্তের মতো।

এতে তো দুধ দিয়ে সাপ পোষা হলো।

কিন্তু তুমি তো জীববৈচিত্র্যের একটা অংশ বাদ
দিতে পার না।

তা যা বলেছ।

তা সমসাময়িক কিছু বানিয়েছ নাকি?

ভাত খাওয়ার জন্য একটা প্লেট বানিয়েছি।

প্লেট তো আমার বাসায়ও আছে। এ আবার নতুন কী?

ধরো ভাত খাচ্ছি। এ সময় ফোন এল। উঠে গেলাম রিসিভ করতে অথবা ভুল করে ল্যাভে ঢুকে গেলাম আর বের হতে ভুলে গেলাম। এমন পরিস্থিতিতে দেখা যাবে, ভাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই প্লেট দিয়ে তুমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাবারটা গরম করে নিতে পারবে। চুলায় নেওয়ার বাড়তি ঝামেলাটুকু নেই।

অসাধারণ!

আমি এখন উঠি।

সেকি, আরেকটু বসো। ভালোই তো লাগছে। কথা বলে আমরা কি তরঙ্গের যথেষ্ট অপচয় করিনি!

সে তো বটে। তা এই তরঙ্গ দিয়ে আর কী করা যেত?

চুলা জ্বালানো যেত। যেমন ধরো, আমি চুলার কাছে গিয়ে বলি, ‘জ্বলে ওঠো’। অমনি ফ্রিকোয়েন্সির কারণে তা জ্বলে ওঠে।

এই বলেই সে চলে গেল। বিদায়টুকুও নিল না।

সম্ভবত তরঙ্গ বাঁচানোর জন্য। – তারেকুল মজিদ

এমবিবিএস, চমেক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

158) ইয়া ২০২১ সালের গল্প

‘জব্বার, এক কাপ চা দাও তো।’ কথাটা বলেই ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল সিডিসি। সিডিসির হাতে রস+আলোর ডিজিটাল সংখ্যা। প্লাস্টিকের পাতায় তৈরি রস+আলো পড়ে হাসছে সিডিসি। তবে হাসিটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, ভিনগ্রহের মানুষের দাঁত নেই।

‘স্যার, আপনার চা।’ ঘরে ঢুকল জব্বার।

রস+আলো বন্ধ করে জব্বারের দিকে তাকাল সিডিসি। তারপর বলল, ‘বাংলাদেশে মানুষ জাতির কতজন মানুষ আছে, বলতে পার?’

উত্তরে না-সূচক মাথা নাড়াল জব্বার। এবার সিডিসি বলল, ‘এই ডিজিটাল বাংলাদেশে মানুষকে কেমন যেন বেমানান মনে হয়। এটা তো আর ২০০৯ সাল না। এটা ২০২১ সাল। বাংলাদেশে এখন সবকিছুই ডিজিটাল।

তোমাদের মতো মানুষ দিয়ে ডিজিটাল কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে ওই ভিনগ্রহে পাঠিয়ে দেব। ওখানেই

এমন সব বাংলাদেশি বাস করে।’

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন বেজে উঠল। এগিয়ে গেল সিডিসি। তারপর রিসিভার কানে চেপে কী যেন বলল। জব্বার কিছুই বুঝতে পারল না। ২০ রাতের আঁধার আলো করে পৃথিবীতে নেমে এল একটা ভিনগ্রহের যান। তিনজন নেমে এল যান থেকে। এগিয়ে গেল সিডিসির বাড়ির দিকে। তারপর সিডিসির সঙ্গে পরামর্শ করে জব্বারকে পাঁজাকোলা করে তুলে যানের কাছে নিয়ে এল। তারপর যানের ভেতর ঢুকিয়ে দিল জব্বারকে। এবার সিডিসি এগিয়ে এসে বলল, ‘বুঝলে জব্বার, টেলিফোনে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম এই বাংলাদেশে তুমিই একমাত্র মানুষ। আর সবাই এখন ভিনগ্রহবাসী। তাই চিন্তা করে দেখলাম তোমার এই দেশে থাকা ঠিক হচ্ছে না। তুমি ওই ভিনগ্রহে চলে যাও। ওখানেই সব বোকা বাংলাদেশি বাস করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ চালাতে হলে আমাদের মতো ভিনগ্রহবাসী দরকার।’ – মো. মাসুদ রানা

সান্তাহার, ইয়ার্ড কলোনি, বগুড়া

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

159) বুঝেবাং

হোয়াইট হাউস। ৩০ সেকেন্ডের জন্য পাওয়ার কাট। তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ডাক পড়ল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। কেউ কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। গম্ভীর মুখে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। সামনে মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান। টেবিলে স্যান্ডউইচ আর কফি। কেউ কোনো কথা বলছে না। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাটা সাট স্যান্ডউইচ মুখে পুরে যাচ্ছেন। আর ওদিকে, বিদ্যুৎমন্ত্রী কফিতে ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন। ফুরুরত ফুরুরত শব্দ হচ্ছে।

আচমকা প্রেসিডেন্ট হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘খাওয়া বন্ধ করেন!’

সব্বলে চমকে উঠল। প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘হোয়াইট হাউসের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আগে ঘটেনি। আর আপনারা বসে বসে চপড় চপড় করে খাচ্ছেন?’ প্রেসিডেন্ট ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, ‘যান, চার ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে কারণ খুঁজে আমার সামনে পেশ করুন। নইলে...’ কথা শেষ হতে

না হতেই সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। কেউ বেরিয়েই মোবাইল ফোন টিপতে শুরু করল। কেউ মিটিং রুমের বাইরেই ল্যাপটপ নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। শুধু প্রেসিডেন্ট মিটিং রুমে একা বসে রইলেন। দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেগে গেল।

প্রেসিডেন্টের সামনে পর্দায় গ্লোবাল পজিশন প্রোজেক্ট হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, কোন দেশ এই চক্রান্তের পেছনে থাকতে পারে। এমন সময় তিনি লক্ষ করলেন স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি পাঠানো গ্লোবাল পজিশনের ইমেজটা কেমন বেকে বেকে যাচ্ছে। এরপর ঝিরঝির। এরপর আবার পরিষ্কার, তবে এটা স্যাটেলাইট ইমেজ নয়। পরিষ্কার হোয়াইট হাউসের পেছনের বাগানের ছবি। নড়েচড়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট। স্ক্রিনে এলিয়েন!! প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, এটা কি হলিউডের কোনো মুভি! ভুল ভাঙল স্ক্রিনের পাশে হোম থিয়েটার সিস্টেম থেকে অডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে। স্ক্রিনের এলিয়েন কথা বলে উঠল, ‘সুপ্রভাত, প্রেসিডেন্ট। আপনার ৩০ সেকেন্ড বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে আমাদের কারণেই। আসলে আমরা এখানে এসেছি একটি মিশন নিয়ে। শুনেছি আপনারা নাসা নামের প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ভয়ানক মারণাস্ত্র বানাচ্ছেন, যা গ্যালাক্সি থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এর আগে আমরা আপনাদের কবজা করতে এসেছি। তবে যেহেতু আপনাদের বিপুল পরিমাণে পানির সোর্স আছে, সেহেতু আপনাদের পুরোপুরি ধ্বংস করা হবে না। শুধু পানি শোষণ করা হবে। পানি শেষ হয়ে গেলে মানবজাতি এমনিতেই নাই হয়ে যাবে।’

প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। কিন্তু মনের ভেতর সিঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। সারা শরীর দরদর করে ঘামছে, কিন্তু কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। এলিয়েনটা বলেই চলল, ‘আমরা আপনাদের টেকনিকই ফলো করেছি। ইরাক ওয়ার স্ট্র্যাটেজি। তবে আমরা শুধু পানি চাই।’

প্রেসিডেন্টের চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে, তিনি দেখেন এলিয়েন নয়, চোখের সামনে জলজ্যান্ত আজরাইল। প্রেসিডেন্ট খুব ভয়ে ভয়ে মুখ খুললেন, ‘তোমরা যত খুশি পানি নিয়ে যাও। কিন্তু তোমরা আমার কাছে কেন এলে?’

এলিয়েন বলল, ‘তুমি নাকি বিশ্ব মোড়ল, তোমার কথাতেই পুরো বিশ্ব নাচে, তাই তো তোমার কাছেই এসেছি।’

প্রেসিডেন্ট এবার আরেকটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, ‘ভাই এলিয়েন, আমি তো ইরাক থেকে তেল আনছি, পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে দিচ্ছি সুরক্ষা, তোমরা আমাদের কী দেবে?’

এলিয়েন এবার মুচকি হেসে বলল, ‘কেন, গণতন্ত্র!’ নিয়ম নির্ধার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

160) ভিনগ্রহের ফুটবল

খেলা...

ভিনগ্রহের ফুটবল খেলছে বাসেলোনা। খবরটা শুনে আমিনুল সিদ্ধান্ত নিল, কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়কে নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভিনগ্রহে যাবে। বিভিন্ন তথ্য জেনে এসে জাতীয় দলের পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে চাঁদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বাফুফের অনুমতিক্রমে চাঁদে গেল আমিনুল বাহিনী। এমিলি প্রথম আলোর প্রতিবেদনে জেনেছেন ভিনগ্রহের কথা। কিন্তু ভিন্ন উপগ্রহের দল কেমন হবে তা নিয়ে তাঁর মনে সংশয়। অন্যদিকে এনামুল ভাবলেন, ‘সময় তো কম হয়নি, কিন্তু ক্ষুধা লাগছে না কেন?’ কথাটা রবিনকে পাস করে দেওয়ায় রবিন বললেন, ‘পৃথিবীতে যা খেয়েছ, তাতেই চলবে।’ অপরদিকে জাহিদ ভাবছেন, অক্সিজেন সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে ভিনগ্রহের ফুটবলাররা এত ভালো কীভাবে খেলে? পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট দল সিদ্ধান্ত নিল, এই উপগ্রহের সেরা দলটির অনুশীলন দেখবে ও তাদের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ নেবে। তাদের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলবে তা নিয়ে মতৈক্য দেখা দিল না দলটির। সর্বসম্মতিক্রমে আমিনুল বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সেরা দলের অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে ‘হ্যালো’ বলায় যে উত্তর এল তা পালাক্রমে সবাই শুনলেন, কিন্তু কেউ বুঝলেন না। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, যেভাবেই হোক চাঁদে অনুশীলন করে দেশে ফিরবেন। এমিলি বললেন, ‘চলো সবাই, আমিনুলকে কিক করি।’ আমিনুল বললেন, ‘জাতীয় দলের অধিনায়ককে কিক মারতে চাও?’ আমিনুল ভুল বুঝেছেন বুঝতে পেরে এনামুল বললেন, ‘না, না, সেটা

কীভাবে হয়? আমরা আসলে তোমার দিকে বল
লাথি মারব অর্থাৎ কিপিং প্র্যাকটিস।’

মিডফিল্ডার জাহিদ যে কিকটা মারলেন তা
ধরতে ডান দিকে ঝাঁপ দিয়ে খাট থেকে ফ্লোরে
পড়ে পরবর্তী এক মাস হাসপাতালে কাটালেন
আমিনুল।- শুভংকর দত্ত

রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

161) আমি ও জিমি

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে স্কুলের বন্ধুদের
সামনে ইজ্জত আর থাকছেই না। আমার তীব্র
দাবির মুখে বাবা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন।
বাসায় আসে একটা তৃতীয় প্রজাতির রোবট।
বন্ধুদের কাছে আমার ইজ্জতটাও রক্ষা হয়।
রোবটটার নাম রাখলাম জিমি। যাবতীয়
ফরমায়েশ পালনে জিমির জুড়ি নেই। সারা দিন
বন্ধুর মতো পাশে পাই। একদিন ঘটল এক
দুর্ঘটনা। মা-বাবা বাসায় নেই। আমি বাগানের
বেড়া মেরামত করছি। কিন্তু একটা পেরেক
কোনোভাবেই আটকাতে পারছিলাম না।
মেজাজটা হয়ে গেল খারাপ। জিমিকে ডেকে
পেরেকটা আটকে দিতে বললাম। তার পাল্টা
প্রশ্ন, কোথায় আটকাব? মেজাজ হয়ে গেল
আরও খারাপ। বললাম, আমার মাথায়। আমাকে
চরমভাবে বিনিত করে জিমি হাতুড়ি আর
পেরেক নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে
লাগল। আমি আতঙ্কে দৌড়াতে শুরু করলাম।
হঠাৎ একটা ইটের টুকরায় পা আটকে পড়ে
যাই। বিজয়ীর বেশে সামনে এসে দাঁড়ায় জিমি।
এক হাতে হাতুড়ি আরেক হাতে পেরেক নিয়ে
আমার দিকে ঝুঁকে আসে। আমি তীব্র চিৎকারে
জ্ঞান হারাই। এ ঘটনার দুই দিনের মাথায়
আমরা জিমিকে বিক্রি করে দিই। সেদিন ভাগ্য
অতি সুপ্রসন্ন ছিল বলে বাবা বাসায় এসে
আমার চিৎকার শুনে বাগানে আসেন এবং
পেছন দিক থেকে জিমির সুইচটা বন্ধ করে
দেন। সব সময় তো এমনটা নাও হতে পারে।-
মো. ফেরদৌস রাশেদ
মাধবদী, নরসিংদী।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

162) মধুর রেষারেষি

সায়েন্স ফিকশন লেখক আইজ্যাক আজিমভ এবং আরেক সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার সি ক্লার্কের মধ্যে চাপা রেষারেষি ছিল। তবে এ রেষারেষি ছিল মধুর রেষারেষি। সায়েন্স ফিকশন লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে সফল, বিশেষ করে অর্থকড়িতে ছিলেন আর্থার সি ক্লার্ক। আজিমভ ও ক্লার্কের ভেতর রেষারেষি খেলাটা হতো চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কারণ, আর্থার সি ক্লার্ক বাস করতেন শ্রীলঙ্কায় আর আজিমভ বাস করতেন ম্যানহাটানে। আজ দুজনের কেউই ইহজগতে নেই। আছে কিছু হাস্যরসাত্মক নৃত্তি। আজিমভ তাঁর এক বইয়ে এসব হাস্যরসাত্মক নৃত্তিকথা লিখে গিয়েছিলেন। নিচে দেওয়া হলো তাঁর নৃত্তিকথার দু-তিনটিঃ ১.

বছর দুয়েক আগে আইওয়াতে একটি প্লেন ক্রাশ করে। সৌভাগ্যক্রমে প্লেনের যাত্রীদের অর্ধেক বেঁচে যায়। বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের মধ্যে একজন খবরের কাগজের প্রতিবেদককে বলেন যে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে মনকে দূরে রাখার জন্য মনোযোগ দিয়ে তিনি আর্থার সি ক্লার্কের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন।

এই কাহিনী খবরের কাগজে ছাপা হয় এবং অবশ্যই আর্থার সেই খবরের অংশটুকু কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয় (আমি ওর কাছে দাবি করলাম এই খবরের অংশটুকু সে সবার কাছে পাঠিয়েছে, কিন্তু আর্থার জানাল যে সে শুধু আমার কাছেই পাঠিয়েছে)। খবরের অংশটুকুর শেষে আর্থার নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলেনঃ ‘যদি ওই যাত্রী তোমার কোনো বই পড়ত তাহলে সে দুর্ঘটনা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকত।’ জবাবে আমি একটা উত্তর পাঠালামঃ ‘উল্টো বললে এমন হয়, লোকটা তোমার বই পড়তে পড়তে ভেবেছিল, এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য দুর্ঘটনার মৃত্যু অনেক ভালো। তাই সে বিচলিত ছিল না।’২.

একবার আর্থার আমাকে চিঠি লিখে আনন্দের কথা জানাল যে আমার সব উপন্যাসের পেপারব্যাক সংস্করণ এশিয়ায় প্রায় দেশের বইয়ের দোকানগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। সে আরও লিখেছেঃ ‘আমার নিজের বই পাওয়া যায় না। দোকানে শেলফে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়।’

জবাবে আমি লিখলাম, ‘এর মানে হলো দোকানমালিক তোমার বই পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শেলফ থেকে দ্রুত গোড়াউনে সরিয়ে ফেলে বলেই তোমার বই শেলফে দেখা যায় না।’৩.

একবার এক সায়েন্স ফিকশন সম্মেলনে একজন মহিলা ভক্ত আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ‘ড. আজিমভ, আমি আপনার লেখা চাইল্ডহুড এন্ড উপন্যাসটি মাত্র পড়া শেষ করেছি। উপন্যাসটি আমার ভালো লেগেছে, এর পরও আমি বলব না যে আপনার অন্য উপন্যাসগুলোর মতো ভালো।’

ব্যাপারটা বুঝতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। মূল সমস্যাটা হলো, আর্থার ও আমার লেখার ধরন প্রায় একই, তাই যেকোনো পাঠকের কাছে তার বই আমার বই মনে হতে পারে, আবার আমার বই তার বই মনে হতে পারে। চাইল্ডহুড এন্ড আর্থারের লেখা প্রথমদিককার সবচেয়ে সফল উপন্যাসগুলোর একটি।

তাই আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মজা করার জন্য বললাম, ‘জি, ম্যাম। আমি নিজেই উপন্যাসটির ব্যাপারে চরম হতাশ। আমার কাছে মনে হয়েছে বাজে উপন্যাস। সে কারণেই বইটি আর্থার সি ক্লার্ক জুনিয়র ছদ্মনামে লিখেছি।’ হাসান খুরশীদ রুমী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

163) ময়

সাল-২০৮৭। মানবজাতির সামনে গভীর সংকট। খুব বেশি দিন হয়নি সারা দুনিয়া ডিজিটাল হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির যে সংকট তা ডিজিটালে সমাধান সম্ভব নয়। বাঘা বাঘা ক্ষমতার কম্পিউটার ফেল মেরেছে। কিছু করতে হলে মানুষকেই করতে হবে। মানুষ এর আগে অনেক বড় সমস্যা পার হয়ে এসেছে। এর মধ্যে সব থেকে বড় দুটি নিরূপঃ

সমস্যার নাম মাত্রা

- ১। হিটলারি সমস্যা ৩২.৯৯ (টেনেটুনে পাস)
- ২। বুশ (বাবা ও ছেলে) প্রবলেম এটার মাত্রা এখন পর্যন্ত হিসাব করা যায়নি। কিন্তু বর্তমান সমস্যার যেন কোনো মা-বাপ নেই। মনে হচ্ছে বুশ-প্রবলেমও এটার কাছে কিছুই না। নাকি এটাও বুশ-প্রবলেমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘটনা পরিষ্কার করা যাক। কিছুদিন আগে সুদূর মিন্জ গ্যালাক্সিতে ম্রয় নামের একটা গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষ সেটা আবিষ্কার করেছে তা বলা যাবে না। বরং বলা যায় ম্রয়বাসীই পৃথিবীকে খুঁজে বের করেছে। এর পরই শুরু হয়েছে এই জ্বালাতন। ম্রয়ুসরা (ম্রয়বাসীদের বলা হয় ম্রয়ুস) তাদের সৃষ্ট সব প্রাকৃতিক বর্জ্য পৃথিবীতে এনে ফেলছে। ম্রয়ুসদের বর্জ্য এমন দুর্গন্ধ! ম্রয়ুসরা দুর্গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। সামান্য দুর্গন্ধেই তারা জ্ঞান হারায়। দুর্গন্ধের মাত্রা একটু বেশি হলেই মৃত্যু। তাই বিশেষ ভ্যাকুয়াম ব্যাগে প্রাকৃতিক কাজ সেরে সেগুলো পৃথিবীতে এনে ফেলে ব্যাগগুলো মানুষকে দিয়েই পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আগে এগুলো অন্য নির্জন গ্রহে ফেলত। কিন্তু পৃথিবী খুঁজে পাওয়ার পর এখানে ফেলছে। কোনো যুক্তিই মানছে না। যুদ্ধ করেও তাদের সঙ্গে পারা যাবে না। ম্রয়ুসের সংখ্যা যদিও অনেক কম, কিন্তু প্রযুক্তি ও মারণাস্ত্রে তারা অনেক উন্নত। এ সমস্যা সমাধানে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মাথার ঘাম ডিজিটাল এসির কল্যাণে মাথাতেই শুকাচ্ছে।

দার্শনিকদের কথা যখন এলই, তখন অবশ্যই বলতে হয় মিছর কথা। বাংলাদেশি তরুণ এই দার্শনিক দুর্দান্ত ফাজিল। স্কুলজীবনে এমন কোনো দিন নেই, যেদিন সে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নয়ছয় করেনি, সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত তিন শো সিনেমা দেখেনি। কিন্তু তারুণ্যের শুরুতেই পরাবাস্তবতার ২১টি ভয়াবহ ব্যাখ্যা দিয়ে সে সবাইকে মুগ্ধ করেছে।

ম্রয়সমস্যা সম্পর্কে সব জেনেও মিছ এসব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সুগন্ধে-দুর্গন্ধে তার কাছে এমন কোনো পার্থক্য নেই। রকি পর্বতমালার এক নির্জন গুহায় ডিজিটাল বাথটাবে শুয়ে সে একটা প্রাচীন গল্প পড়ছিল। হঠাৎই সে ভেজা শরীরে ‘পাইছি, পাইছি’ বলে শুরু করল দৌড়। এক দৌড়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তর। তারপর জাতিসংঘের প্রধানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক।

বাকিটুকু ইতিহাস। ম্রয়ুসপ্রধানকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে পৃথিবী থেকে ৫০০ সদস্যের প্রতিনিধিদল গেল ম্রয়ুসদের জীবনযাত্রা দেখতে। রওনা হওয়ার আগে তারা মিছর বুদ্ধিমতো ভালোমন্দ

খেয়ে নিতে ভুলল না। দৃশ্যমান মারণাস্ত্র নিয়ে যেখানে ম্রুয়ে পৌঁছানো অসম্ভব, সেখানে ৫০০ মানুষের পেটে ভরে দেওয়া হলো অদৃশ্য বায়বীয় মারণাস্ত্র। ম্রুয়ে পৌঁছানোর পর যখন সব ম্রুয়ুস একত্রে এই প্রতিনিধিদলকে দেখতে এল, তখনই এরা ঘটাল ভয়াবহ নিঃসরণ। ব্যস, এতেই কর্ম সাবাড়। এই নিঃসরণ এমনই দুর্গন্ধ সৃষ্টি করল যে তাতে সব ম্রুয়ুস তো বটেই, প্রতিনিধিদলের ১৩২ সদস্য পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল।

এ ঘটনা ্রনরণে বিখ্যাত কবি গুলু লিখল তার বিখ্যাত কবিতা ‘কার্যসিদ্ধি’। কবিতাটা এমন-
মিছ দিল বুদ্ধি
তাতেই কার্যসিদ্ধি
ঘোড়ার পেটে দখল ট্রয়
মানুষের পেটে হারল ম্রুয়।
বলা বাহুল্য, মিছ গুহায় বসে ট্রয়ের কাহিনীটাই পড়ছিল। এবং ইতিহাসের শিক্ষাই মানবজাতিকে আরেকবার রক্ষা করল।- সবুজ ওয়াহিদ
অভয়নগর, যশোর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

164) টাইম মেশিন, কী দেখাইলা মোরে!

৩০০৯ সাল, ১ জানুয়ারি। এক কৃপণ বিজ্ঞানী একটি যুগান্তকারী ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেললেন। সময়কে এগিয়ে নেওয়া বা পিছিয়ে নেওয়ার ফর্মুলা। অর্থাৎ টাইম মেশিনের মূল ভিত্তি। কিন্তু তিনি খুশি হতে পারলেন না। কারণ, এটি বানাতে যে যে পার্টস দরকার, তা তাঁর খরচের সীমা অতিক্রম করবে। একদা তিনি শপথ করেছিলেন যে প্রতিদিন দুই ইউনিটের বেশি খরচ করা যাবে না। তাই তিনি টাইম মেশিনের এত কাছে গিয়েও দুই পা পিছিয়ে এলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হলো, এটি বানাতে হয়তো কোনো অ্যাওয়ার্ড এসে তাঁর জমানো ইউনিট আরও বাড়তে পারে। তিনি আর দেরি করলেন না। কিছু ধারদেনা করে বানিয়ে ফেললেন একটা টাইম মেশিন। একটি প্রথম প্রজাতির রোবট নিয়ে চেপে বসলেন টাইম মেশিনে। সেটিতে করে চলে এলেন ১৮০৯ সালে। তখন তাঁর দেশ সুজলা, সুফলা, ঐশ্বর্যপূর্ণ। দেশের মানুষও ছিল অতিথিপরায়ণ। তারা তাঁকে ভালো করে

খাওয়া। আম, জাম, মিষ্টি, দই, মধু কিছুই বাদ রাখল না। যখন ফেরার সময় এল, তখন তাঁর হাতে একটা বস্তা ধরিয়ে দিয়ে বলল যে এখানে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস আছে। বিজ্ঞানী ভাবলেন, মনে হয় প্রাচীন খনিজ সম্পদ হীরা-সোনাই হবে। তখন তো তাঁর খুশি আর ধরে না। তিনি ভাবলেন, এ সুযোগে ধনী হওয়ার সাধ পূর্ণ হয়ে গেল। রোবটটিকে নিয়ে আবার ফিরে এলেন ৩০০৯-এ। উজ্জ্বল মুখে বস্তা খুলে দেখলেন, কালো কালো হীরা জহরত(!), কিন্তু তা থেকে এত দুর্গন্ধ বের হওয়ায় তাঁর সন্দেহ হলো, রোবটের ডেটাবেইসে ‘এটা কী’ প্রশ্নটা প্রবেশ করাতেই হতচ্ছাড়া রোবটের বাচ্চা বলে উঠল, এটা নাকি গরু নামের এক প্রাচীন প্রাণীর বিষ্ঠা, যা ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। এটাই সেকালের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ!

শুনে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বিজ্ঞানী মূর্ছা গেলেন। – কাজী রাগীব ইশরাক
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

165) টিনখোর

বিজ্ঞান কমিটির প্রধান নির্বাহী নারা। যেকোনো বৈঠকে সাধারণত তিনিই সবার আগে কথা বলেন। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম হলো। সবার আগে কথা বলে বসলেন মাঝারি মানের জীববিজ্ঞানী দিশু। ‘মহামান্য নারা, মাফ করবেন। আমি একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছি।’

নারাসহ আরও অনেক সিনিয়র সায়েন্টিস্ট বিরক্তভরা দৃষ্টিতে দিশুকে দেখলেন। সে আবার বলল, ‘মহামান্য নারা, আমি আর উত্তেজনা সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বলতে দিন। দয়া করে অনুমতি দিন।’ নারা গম্ভীরভাবে বললেন, ‘অনুমতি দেওয়া হলো।’ দিশু বলতে শুরু করলেন, ‘মহামান্য বিজ্ঞানীরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি সবাইকে আজ এমন একটা তথ্য জানাব, যাতে সবাই চমকে উঠবেন। আজ ৫০০৯ সালের ২ জানুয়ারি। আমাদের এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে। আমরা সবাই তা জানি। মানবজাতির বিবর্তন সম্পর্কেও আমরা অবহিত। মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও আমরা জানি। মানুষ সাধারণত খাদ্য হিসেবে জৈব পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমরা এটা জানি না যে কালের

বিবর্তনে এক বিশেষ শ্রেণীর মানব হারিয়ে গেছে, যারা ধাতুখণ্ডকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত।' সবার মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিল। গুঞ্জন উঠল, 'অসম্ভব, অসম্ভব।' দিশু আবার শুরু করলেন, "অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছিল আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের কিছু মানুষ। এরা বাস করত হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ও বঙ্গোপসাগরের উত্তরে একটি সমতল এলাকায়। এরা 'টিন' নামের এক ধরনের ধাতব পাত ভক্ষণ করত। তৎকালীন একটি দৈনিক পত্রিকায় এদের 'টিনখোর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এরাই তখন নেতৃত্ব দিত ওই সমতল এলাকার মানুষদের। স্থানীয় ভাষায় এদের 'এমপি' ও 'চেয়ারম্যান' প্রভৃতি বলে ডাকা হতো।"

পুরো বিজ্ঞান কমিটি স্তব্ধ। সেদিনের বৈঠক বাতিল করা হলো। সবাই এখন এই অদ্ভুত প্রজাতির মানুষের বৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করছে। কিন্তু তারা কি আদৌ কোনো ফল পাবে? টিনগুলো যে টিনখোরদের জোটে যায়নি, গিয়েছিল গুদামঘর আর পুকুরের পানিতে। রেকর্ড তো তিন হাজার বছর আগেই মুছে ফেলা আছে। - এস এ নির্ঝর মুনশীবাড়ী, আলাইপুর, নাটোর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

166) মহাপুণ্যে আতঙ্ক

'নেগেটিভ', সি-৪২০র যান্ত্রিক কণ্ঠ শুনে অভিযান ৮৯ শিপের যাত্রীদের হাহাকার অবস্থা। দশম মাত্রার কসমিক বেগের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবার হালুয়া টাইট। হতচ্ছাড়া সাপার কম্পিউটারের জন্যই আজ তাদের এ অবস্থা। ২৯৯৫ সাল। প্রথম যাত্রা শুরু করল অভিযান শিপ আর্থার ২ প্ল্যানেটের উদ্দেশে। প্রথমবার হাইপার ড্রাইভ দেওয়ার সময় যাত্রীদের অবস্থা লে হালুয়া। তাই দ্বিতীয়বারের সময় সবাই ক্যাপসুলে ঘুমিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। ব্যস্, এক ড্রাইভে ৮২০ কোয়াদ্রিলিয়ান মাইল পার। তখন ৩০০০ সাল, যাত্রীরা লম্বা জার্নি করল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। অবশেষে তারা জেগে উঠল। সকালে উঠে যা হয় আর কি, প্রত্যেকের ব্যাপক ইয়ে চাপল। এটা তো যেমন-তেমন ইয়ে নয়, পাঁচ বছর ধরে পুষে রাখা সুপ্ত ইয়ে। কিন্তু

যখনই তারা কসমিক ডাকে সাড়া দেবে, তখনই সি-৪২০ চরম বাস্তব সত্য কথাটা প্রকাশ করল, ‘দুঃখিত মহামান্য যাত্রীগণ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে টয়লেট ক্যাপসুলগুলো ড্রাইভের সময় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, যা আনুমানিক ৮২০ কোয়াদ্রিলিয়ন মাইল দূরে ভাসমান আছে, এক মহাশূন্যের গহিনে হারিয়ে গেছে, মূলত গ্যালাকটিক গাইডের ৪২০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওগুলোর কোনো লজিক্যাল প্রয়োজন পাওয়া যায়নি।’ বলছে কী কম্পিউটার! ‘ইয়ে’ আবার কোনো লজিক মানে নাকি। যাও, দ্রুত কোনো গ্রহ খুঁজে ল্যান্ড করো, জলদি। ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিল। হঠাৎ চিৎকার দিল আলটামন্ট, ‘ক্যাপ্টেন লি, দেখুন সামনে ক্লাস্টার বোর্ডে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে পিএক্স-১০ প্লানেট গ্যালাকটিক মানের টয়লেটের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে, বড়টা পাঁচ কেনিজি আর ছোটটা দুই কেনিজি মাত্র।’ ওফ, গ্যালাকটিক টয়লেটের ভাড়া এত বেশি। ঠিক আছে, কম্পিউটার দ্রুত হাইপার ড্রাইভ দাও পিএক্স-১০-এর দিকে। কিছুটা উত্তেজিত ক্যাপ্টেন। ‘আর হ্যাঁ, ড্রাইভটা একটু আস্তে দিয়ো, প্রথমবার যে ড্রাইভটা দিলে না! ওফ, আমার ইয়ে তো দ্বাদশ মাত্রায় উঠে গিয়েছিল।’ সবাই ক্যাপ্টেনের কথায় একমত। বাপরে, প্রথম ড্রাইভের কথা মনে এলে আর২ডি২ রোবটেরই ইয়ে এসে পড়ে। হঠাৎ সি-৪২০ বলে, ‘কিন্তু মহামান্য ক্যাপ্টেন লি, পিএক্স-১০ প্লানেট তো আনুমানিক ফোর টু নাইন হেক্সাকোয়াদ্রিলিয়ন মাইল দূরে।’ কী! ৪৯ হেক্সাকোয়াদ্রিলিয়ন মাইল! উত্তেজনার চোটে ক্যাপ্টেন ভুল শোনে। ‘না ক্যাপ্টেন, ৪২৯ হেক্সাকোয়াদ্রিলিয়ন মাইল।’ ভুল শুধরে দেয় সি-৪২০। এত দূরে গ্রহটা, চৌদ্দপুরুষ পার হয়ে যাবে পৌঁছাতে পৌঁছাতে। কথা শুনে লিয়াভার তো পেট খারাপ হওয়ার দশা। ইতিমধ্যে সে সপ্তম মাত্রার মর্মান্তিক সুবাসযুক্ত গ্যাসীয় বিকিরণ করায় সবাই কিঞ্চিৎ অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে। ‘কম্পিউটার, এখন সমাধান কী?’ ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলল, ‘দুঃখিত মহামান্য, আমার নিকট এ রকম পরিস্থিতির কোনো ডেটা এন্ট্রি হয়নি, সুতরাং আমরা ‘০’ মাত্রা বিবেচনায় অসংজ্ঞায়িত বলতে পারি।’ সি৪২০-এর কথা শুনে সবার সংজ্ঞা

যায় যায় অবস্থা। যাই হোক, সবাই বুঝতে পারছে, কী ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে, কিন্তু হায়! হতচ্ছাড়া কম্পিউটারটা তা বুঝছে না।- মো. মাসুদুল ইসলাম ইব্রাহীম
সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর-১০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

167) এক্সপেরিমেন্ট

‘যখন সুইচ টিপে ধরবেন, তখন ওই মানুষটি ইলেকট্রিক শক খাবে।’

তখন মহিলা বললেন, ‘কিন্তু কেন আপনারা তাকে শক দেওয়াচ্ছেন।’ অধ্যাপক বললেন, ‘এটা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, আমরা দেখতে চাচ্ছি মানুষ সর্বোচ্চ কত ভোল্ট কতক্ষণ সহ্য করতে পারে। এ জন্য তাকে অর্থও দেওয়া হবে।’

তখন মহিলা ওই লোকটিকে শক দিতে শুরু করলেন। সবাই বাইরে চলে গিয়ে মনিটরে সব দেখছে। মহিলা ক্রমাগত ভোল্টেজ বেশি করে শক দিয়েই চলেছেন। আর লোকটা অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে।

মনিটরে মহিলার কঠিন মুখ দেখে অধ্যাপক সহকর্মীকে বললেন, ‘কেমন দেখছ?’ তখন সহকর্মী বলল, ‘অবিশ্বাস্য, একজন মানুষ যে অকারণে আর একজনকে এত কষ্ট দিতে পারে তা আজ প্রথম দেখলাম। আমার রীতিমতো শরীর খারাপ লাগছে।’ অধ্যাপক বললেন, ‘কেন তোমার শরীর খারাপ লাগবে। তুমি তো জানোই এখানে কোনো ইলেকট্রিক শক দেওয়া হচ্ছে না। পুরোটাই ওই চেয়ারে বসা লোকটির অভিনয়।’ তখন সহকর্মী বলল, ‘জানি, কিন্তু মানুষটির অভিনয় দেখে মনে হচ্ছে সে সত্যিই শক খাচ্ছে।’ তখন অধ্যাপক বললেন, ‘আমরা তো আসলে মহিলাটিকে নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করছি। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারছেন না।’

তখন সহকর্মী বলল, ‘কী লাভ এই এক্সপেরিমেন্ট করে? আমরা তো এমনিই জানি মানুষ কতটা নিষ্ঠুর।’ তখন অধ্যাপক বললেন, ‘টাকা দিয়েছে আমাদের এ কাজ করার জন্য, তাই।’ তখন সহকর্মী বলল, ‘যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে সে পরিমাণ খরচ নেই।’ অধ্যাপক বললেন, ‘বোধ হয় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানুষটা গাধা টাইপের।’ কোম্পানির

তখন সহকর্মী বলল, ‘কী লাভ এই এক্সপেরিমেন্ট করে? আমরা তো এমনিই জানি মানুষ কতটা নিষ্ঠুর।’ তখন অধ্যাপক বললেন, ‘টাকা দিয়েছে আমাদের এ কাজ করার জন্য, তাই।’ তখন সহকর্মী বলল, ‘যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে সে পরিমাণ খরচ নেই।’ অধ্যাপক বললেন, ‘বোধ হয় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানুষটা গাধা টাইপের।’ কোম্পানির

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঠিক সেই মুহূর্তে অধ্যাপকের ঘরে গোপনে বসিয়ে রাখা ক্যামেরায়

অধ্যাপককে লক্ষ্য করছিলেন। পাশে বসে থাকা সেক্রেটারির উদ্দেশে বললেন, ‘আমরা এ রকম একটা ফালতু এক্সপেরিমেন্টের জন্য এত টাকা ঢালছি, তাদের কাছে এটা বোকামি মনে হতেই পারে। কিন্তু ওরা তো আর জানে না আমরা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য এসব করি।’

সেক্রেটারি বলল, ‘না জানারই কথা, শুধু ওই নতুন গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সে নাকি ত্যাঁদড় টাইপের।’

গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান সহকর্মীকে বললেন, ‘পুরোটা রেকর্ড করেছ?’

সহকর্মীঃ হ্যাঁ।

প্রধানঃ আজকালের ইলেকট্রনিকস

সারভেলেন্সের খবর তো রাখে না, তাই এসব উল্টোপাল্টা কথা বলে। আসলে আমরা তো সব কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ওপর চোখ রাখছি। কাল ব্যাটারে ডেকে এনে পুরো ভিডিওটা দেখিয়ে বলব, এখন কে ত্যাঁদড়, বাবা?

সহকর্মীঃ তাহলে তো স্যার সবকিছু জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই বুঝে যাবে যে আমরা সবাইকে চোখে চোখে রাখছি।

প্রধানঃ জানুক, টাকা কামানোর এই তো সুযোগ। ওই ব্যাটার কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করব।

সহকর্মীঃ কিন্তু প্রেসিডেন্ট আমাদের এটা গোপন রাখতে বলেছেন।

প্রধানঃ বলুক। কোথেকে শালা বুড়ো হাবড়াটা প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট দেয়ালে লাগানো মনিটরে দেখে বললেন, ‘শালার ব্যাটার কত বড় সাহস, আমাকে বলে কিনা বুড়ো হাবড়া!

ওকে আচ্ছা করে শাস্তি দিতে হবে।’

তখন প্রেসিডেন্টের মাথায় একটা মহাজাগতিক প্রাণী উঁকি দিয়ে দেখছে। আসলে প্রেসিডেন্ট কী শাস্তি দেবেন।

দুই বছর থেকে মহাজাগতিক প্রাণীরা মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।— সংগ্রহেঃ আসিফ তাজওয়ার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

168) ডিজিটাল যুগে আমি

ঘুম থেকে উঠেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।
আমি কোথায়? কাল রাতে সেগুন কাঠের বক্স
খাটে আকাশি রঙের বিছানার চাদরের ওপর ঘুম
দিয়েছিলাম। দেয়ালের রংও ছিল আকাশি।
পাশে আমার মফিজ টেডি বিয়ারটিকে নিয়ে
ঘুমিয়েছিলাম। আজ ঘুম ভাঙতেই এসব আজব
জিনিস কী দেখছি!

খাটটি পারদ রঙের। দেয়ালের, বিছানার
চাদরের এবং পর্দার রং গাঢ় নীল। খাটটি মনে
হয় দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আমি ঘুমের
মধ্যে অনুভব করেছি, পাশে মফিজ নেই। মাথার
ওপর যে ফ্যানটি ঘুরছে সেটাকে অনেকটা
বিকলাঙ্গের মতো লাগছে। অর্থাৎ রোবটিক
লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ একে নিয়ন্ত্রণ করছে।
লক্ষ করলাম, ফ্যানেরও লাল রঙের দুটি চোখ
রয়েছে এবং কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ফ্যানটি বলে
উঠল, ‘এত জোরে বাতাস দিচ্ছি, তবুও আপনি
ঘামছেন? আচ্ছা, আমি আমার আরও ছয়টি
পাখা বের করছি।’ ফ্যানটি আস্তে আস্তে আরও
ছয়টি পাখা বের করে সজোরে ঘুরতে শুরু
করেছে। আমার রুমের সব জানালা
আপনাআপনি খুলে যেতে লাগল এবং সঙ্গে এক
সুরেলা কণ্ঠ ভেসে উঠল, ‘শুভ সকাল।’

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি হাঁ হয়ে রইলাম।
আকাশ মুহূর্তে তার রং বদলাচ্ছে। একবার
আকাশি, একবার গোলাপি, একবার কমলা,
একবার বাদামি প্রভৃতি বর্ণ সৃষ্টি করছে দেখে
আমার অস্বস্তি লাগছে। তখন হঠাৎ পেছন থেকে
কে যেন বলে উঠল, ‘মিস-সি১৬০৯০২২ উঠে
পড়ুন, আপনার ব্রেকফাস্ট রেডি। তাড়াতাড়ি
শাওয়ার করে খেতে বসুন।’ কণ্ঠটা শুনে আমি
ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আজব কণ্ঠ, সম্পূর্ণ
রোবটিক। পেছনে ফিরে আমি হতভম্বের মতো
বলে উঠলাম, ‘আরে, এটা তো মফিজ!’ তখন
মফিজ আকৃতির টেডি বিয়ারটি বলল, ‘সরি,
আপনি ভুল করছেন, আমার নাম মফিজ নয়,
আমার নাম টিবি১৩০৪৯৬।’ ‘কিন্তু তোমার নাম
তো মফিজ!’ আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে
বললাম। মফিজ রোবটটি ধমকের সুরে বলল,
‘আপনি এর পর থেকে এসব আজেবাজে নামে
আমাকে ডাকবেন না। আপনার এসব নাম
শুনলে আমার বমি আসে; যদিও আমি বমি

করতে পারি না, কিছু খেতে পারি না। আমার মনে আছে আপনি আপনার বান্ধবীদের সঙ্গে খেলার ছলে অনেক খাবারদাবার আমার মুখে ঠেসে দিয়েছিলেন। আবার না খাওয়ার ফলে আমাকে অনেক লাথি-ঘুষিও সহ্য করতে হয়েছে। আবার আপনার বান্ধবীরা আমাকে দিয়ে পুতুল বিয়েও খেলেছেন, মিস-সি১৬০৯০২২, আপনি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন।’ এবার আমি খেপে বললাম, ‘এই মফিজ খবরদার, আমাকে এই সি১৬০... যাই হোক ওই নামে ডাকবি না।’ সেও বলল, ‘আপনিও আমাকে মফিজ বলে ডাকবেন না, আমার নাম টিবি১৩০৪৯৬ এবং আপনার নাম সি১৬০৯০২২। আর এখন থেকে আপনাকে আমার ইচ্ছায় চলতে হবে এবং আমিই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করব। এটা ওই যুগ না, আপনি এখন অন্য মাত্রার যুগে।’ আমি হাঁ হয়ে রইলাম। আমি অন্য যুগে, আবার আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে মফিজ! তখনই একটি যন্ত্রের মাধ্যমে আমাকে বাথরুমে নেওয়া হলো। বাথরুমে দাঁত মাজা থেকে শুরু করে চুলে শ্যাম্পু লাগিয়ে সাবান মেখে গোসল করানো সব যন্ত্রের কাজ। আমি শুধু পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সবকিছু এখন কেন যেন স্বাভাবিক লাগছে। গোসল শেষে একটি চেয়ারের মতো যন্ত্র আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ডাইনিং টেবিলে তিনজন রোবট মানব বসে আছে। একজন বলে উঠল, ‘শুভ সকাল, মামণি।’ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, উনি আমার বাবা! সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের কণ্ঠের মতো একজন রোবট মানবী বলে উঠল, ‘তোমার আত্মাদেই মেয়েটি এত অলস হয়েছে। দেখছ না, কী দেরিতে ঘুম থেকে উঠল।’ তার মেটালিক বর্ণের চুলগুলো ঝিলিক মারছে।

তাহলে আমার পাশে যে বসা সে আমার বড় ভাই! আমার বড় ভাই সব সময়ের মতো তামাশা করে বলতে লাগল, ‘আমরা ডিজিটাল যুগে আসার পর সবকিছু বদলালেও আমার বোনের আলসেমি বদলাবে না।’ ‘কী ডিজিটাল যুগ!’ তাহলে আমিও কি ডিজিটাল মানব!!!- ফাইরুজ আয়ুব

তালতলা, টাঙ্গাইল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

169) ফ্লাইং সান

রবি হঠাৎ অদ্ভুত একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে বসল। যন্ত্রের ওপর দুটো বড় পাখা আছে। যন্ত্রটি পিঠে লাগিয়ে চালু করে দিলেই পাখা দুটি ঘুরতে থাকে, তারপর উড়ে চলে যাওয়া যায় পাখির মতো। তো এ যন্ত্র আবিষ্কারের পর রবির নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রবি যন্ত্রটির নাম রাখল ‘ফ্লাইং সান’। এই যন্ত্র সে নিয়ে এল জনসমক্ষে, তারপর পরীক্ষামূলকভাবে তা পিঠে লাগিয়ে উড়ে গেল আকাশে। কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নেই গেল। তারপর হঠাৎই তার পিঠে প্রচণ্ড আঘাত পেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্কোরিত হলো যন্ত্রটি। সে নিচে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু রবি অনুভব করল, কে যেন তার মাথা ধরে তাকে ওপরে নিয়ে উঠে যাচ্ছে। এরপর সে আবার পিঠে আঘাত অনুভব করল। ২.

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল রবি। দেখল, বাবা এক হাতে তার চুল ধরে আছে আর অন্য হাতে বেত নিয়ে তাকে শাসাচ্ছে এই বলে, ‘পড়তে এসে ঘুমানো হচ্ছে না, দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।’ কিন্তু রবি যেন এসবের কিছুই বুঝল না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বাবার দিকে।— প্রদীপ্ত ভাস্কর রক্ষিত আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

170) টাইম মেশিন

ইয়াল্হ! দীর্ঘ দুই বছরের গবেষণা শেষে আজ আমি টাইম মেশিন আবিষ্কার করে ফেলেছি। আনন্দে মেশিনটার চারপাশ ঘিরে কতক্ষণ নাচানাচি করে ছুট লাগালাম বসুন্ধরা সিটিতে। দুটি এন৯৬ মোবাইল ফোনসেট কিনে বাসায় নিয়ে এলাম। ১৬জিবি মেমোরি পুরোটা গান ও সিনেমা দিয়ে ভরে ফেললাম। আগেই জোগাড় করে রাখা মেশিনগান আর মোবাইল দুটো নিয়ে চড়ে বসলাম টাইম মেশিনে। গন্তব্য প্রাচীন মিসরের রানি ক্লিওপেট্রার কাছে! টাইম মেশিন থেকে নেমে রানির প্রাসাদের দিকে যেতেই আমাকে একদল সেনা আটকাল। কী চাই? জিজ্ঞেস করতেই বললাম, আমি রানির সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই। এই

রোগাপটকা শরীর নিয়ে যুদ্ধ করবে! বলে সবাই হাসাহাসি শুরু করল। অবশেষে সেনাপতি রাজি হলেন এক শর্তে, আমাকে সবার সামনে থাকতে হবে। আমিও তা-ই চাই! দুদিন পরই পার্শ্ববর্তী এক রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রানির বিরুদ্ধে। সবার সামনে আমি মেশিনগানটা নিয়ে এগোতে লাগলাম। তরবারির বদলে এই কিম্বৃত অস্ত্র নেওয়ায় সবাই খুব হাসাহাসি করতে লাগল। বিপক্ষ দলের সেনাপতি সামনে আসামাত্র তাঁর কপাল লক্ষ্য করে মেশিনগানের ট্রিগার ঠেলে দিলাম। ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন সেনাপতি। বিপক্ষ দলের সেনারা তো ভয়ংকর অবাক। যুদ্ধ বাধার আগেই মারা গেলেন সেনাপতি, এর ওপর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ। গড়িমসি করে ছুটে পালাতে লাগল তারা। আমার বীরত্ব শুনে রানি অবাক। আমার সম্মানে আয়োজন করলেন ডিনার পার্টি।

প্রাসাদে পৌঁছে আমি রানিকে একটি মোবাইল ফোনসেট উপহার দিলাম। এটা কী? জিজ্ঞেস করায় রানিকে আমি কীভাবে গান বাজাতে হয় দেখিয়ে দিলাম। এত কিছু দেখে রানি ভয়ানক তাজ্জব বনে গেলেন। রানির গান দেখার ফাঁকে প্রাসাদে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করে ফেললাম আমি। রানিকে ফোন রিসিভ করা শিখিয়ে প্রাসাদের বাইরে এসে আমি তাঁর সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম। আমি প্রাসাদে প্রবেশ করতেই সিংহাসন ছেড়ে রানি দৌড়ে আমার কাছে এলেন। আমার গলায় ঝুলে বললেন, ‘জাদুকর! ওহ আমার জাদুকর! তুমি আমায় কী জাদু দেখালে? কী চাও তুমি আমার কাছে, বলো।’ আমি বললাম, ‘তোমাকে চাই!’

রানি বললেন, ‘শুধু আমি কেন, তুমি যদি পুরো মিসরটা চাইতে, তাও দিয়ে দিতাম।’ পরদিন ধুমধাম করে রানির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। মাস দুয়েক রানির সঙ্গে কাটিয়ে একদিন টাইম মেশিনে চড়ে আমি বর্তমান সময়ে চলে এলাম। ইতিহাসবিদ ব্যাটারা বুঝবে মজা! কোথায় সিজার? কোথায় অ্যান্টনি? ক্লিওপেট্রার স্বামীর জায়গায় আমার নাম বসাতে গিয়ে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ জুড়ে তাদের করতে হবে কাটাকুটি। মরুক ব্যাটারা। এই ফাঁকে আমি দৌড় লাগলাম ব্যাংকে। লাখ পাঁচেক টাকা নিয়ে চড়ে বসলাম টাইম মেশিনে। গন্তব্য শায়েস্তা

খাঁর আমল। মাত্র ৫০ টাকা একরে ঢাকা নামক স্থানের অধিকাংশ জায়গা কিনে ফেললাম আমি। দলিল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্র সব নিয়ে টাইম মেশিনে চড়ে আমি আবার বর্তমান সময়ে চলে এলাম। আগামীকাল হাইকোর্টে যাব। ঢাকা শহরের অধিকাংশ জায়গা যে আমার, এই মর্মে মামলা ঠুকতে হবে। তবে সব জায়গা একসঙ্গে নয়, প্রথমেই মামলা দেব কারওয়ান বাজারে সিএ ভবন যেখানে অবস্থিত, সেই জায়গার জন্য। প্রথমেই ওই জায়গা কেন? কারণ আছে ভাই। ওই ভবনে একটা পত্রিকা অফিস আছে। নাম প্রথম আলো। তার একটা বাচ্চা আছে, নাম রস+আলো। রস+আলোর বি.স. ব্যাটা ভয়ানক পাজি। এত লেখা পাঠালাম, একবারও ছাপাল না। এবার বাচ্চাধন! সব যখন শুনবে লেখা না ছাপিয়ে যাবে কোথায়! লেখা তো ছাপাবেই, উল্টো এসি রুমে বসিয়ে ঠান্ডা খাওয়াতে খাওয়াতে বলবে, ‘বাবাগো, আমাদের উচ্ছেদ কইরেন না। এই গরমে উচ্ছেদ করলে কোথায় দাঁড়াব।’ – রাজীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

171) ঘুড়ি

সুন্দর বাতাস বইছে, সেই বাতাসে অপূর ঘুড়ি সাঁই সাঁই করে ওপরে উঠছে। আজ সে তার ঘুড়িকে ওপরে নিয়ে যাবে। সুতা কিনে এনেছে দুই বাউল। ঘুড়িটা এত ওপরে উঠেছে যে সেটাকে একটা গোল বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস দেখল অপু, কালো রঙের গোল একটা চাকতির মতো প্লেন তার ঘুড়ির অল্প দূরে স্থির হয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। সেটা থেকে কেমন যেন লাল আলো বের হচ্ছে।

স্পেসশিপ ম্যাগপাই পৃথিবীর ওজোনস্তরে ঢুকে পড়েছে। পৃথিবী ধ্বংস মিশনের প্রথম দল এটি। কিছুদিন আগে তারা পৃথিবী নামক একটা গ্রহের সন্ধান পেয়েছে, যেখানে নিচু স্তরের বুদ্ধিমান প্রাণী বসবাস করে। এই সৌরজগতে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকুক তারা সেটা চায় না। তাই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য প্রায় ২২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের কিউবি গ্রহ থেকে তারা এসেছে।

স্পেসশিপে এখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। উত্তেজনার কারণ, স্পেসশিপের ৪০ গজ দূরে

একটা বর্গাকৃতির বস্তু দেখা যাচ্ছে এবং সেটা নড়ছে। এই অভিযানের প্রধান ক্যাপ্টেন পালবা সুপার প্রোগ্রাম কিউ৩৬ ওপেন করলেন।

-স্বাগতম ক্যাপ্টেন পালবা।

-ভণিতা না করে ওই বর্গাকৃতির বস্তুটা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দাও। বিরক্তভরা কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন পালবা। যেকোনো বিষয়ের ওপর তথ্য দিতে কিউ৩৬ খুব কম সময় নেয়। কিন্তু দুই মিনিট পর কিউ৩৬ জানাল, দুঃখিত, কোনো প্রকার তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

-কেন?

-কারণ বস্তুটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু পদার্থ দ্বারা তৈরি এবং এর নির্মাণশৈলী জটিল ও কঠিন। ক্যাপ্টেন পালবার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে বললেন, এ... এ... এটা কে পরিচালনা করছে।

-এই বর্গাকৃতির বস্তুটি একটা বালক পরিচালনা করছে। মনিটরে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল।

স্পেসশিপ ম্যাগপাইয়ের অর্ধশত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী চরম বিনয় নিয়ে দেখল একটা বালক। সবুজ মাঠের মধ্যে সে একা। তার হাতে চোঙাকৃতির বস্তু, যা দেখতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মতো। সেটা সে দুই হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছে। মাঝেমধ্যে তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করে মুখের মধ্যে দিচ্ছে। ২.

অপু অবাক হয়ে প্লেনটা দেখছে। প্রায় প্রতিদিনই সে প্লেন দেখে। বড় বাজপাখির মতো একটা জাহাজ দুই ডানায় ভর করে প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে চলে যায়। কিন্তু এটা কেমন প্লেন, কালো, আবার গোল, এ রকম প্লেন সে জীবনেও দেখেনি। সবচেয়ে বড় কথা, প্লেনটা স্থির হয়ে আছে। অপূর মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি ভর করল। সে পকেট থেকে একমুঠো চানাচুর গালে দিয়ে জামায় হাতটা মুছে নাটাইটা ডান দিকে কাত করে ঘোরাতে লাগল। ফলে ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে প্লেনটার দিকে ছুটল। কিউ৩৬ বিপৎসংকেত দিতে শুরু করল। ‘বর্গাকৃতির বস্তুটি স্পেসশিপের শক্তিবলয় অতিক্রম করে এগোচ্ছে...।’

ক্যাপ্টেন পালবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কিউ৩৬ কে বললেন, ‘কী ব্যাপার, বস্তুটা আমাদের শক্তিবলয় ভেদ করল কীভাবে?’

-আমি আগেই বলেছি, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ

দিয়ে তৈরি, আর এ কারণে শক্তিবলয় চিহ্নিত করতে পারছে না। ফলে বল প্রয়োগও করতে পারছে না।

-এ... এটা তো আমাদের দিকেই আসছে।

-জি।

-এখন কী করব?

-আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত। এ বস্তুটির অকল্পনীয় পারমাণবিক শক্তি থাকার সম্ভাবনা শতকরা ৮৩ দশমিক ০২ ভাগ।

ক্যাপ্টেন পালবা দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন কী করা যায়। রাগে-দুঃখে তার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে। এত বড় অভিযান ভণ্ডুল হয়ে গেল। আজ এই প্রথম তিনি কোনো মিশনে বিফল হলেন। জিম কাল্টনকে (ম্যাগপাইয়ের চালক) তিনি কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বললেন, ‘ফিরে চলো।’ স্পেসশিপ ম্যাগপাই পৃথিবী ছেড়ে প্রচণ্ড গতিতে কিউবির দিকে ছুটে চলেছে। ক্যাপ্টেন পালবার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ৩।

অপু হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে এত অবাক সে কখনো হয়নি। ঘুড়িটা প্লেনের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় প্লেনটা উধাও। ওপরে, না নিচে গেল, নাকি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? অপু যখন আর একমুঠো চানাচুর মুখে পুরবে তখন বাঁ কানে সূক্ষ্ম একটা ব্যথা অনুভব করল। তারপর বাঁ দিকে ফিরে দেখে তার বাবা।

‘হারামজাদা ইস্কুল ফালাইয়া ঘুড়ি উড়াও! তোরে অইজ খাইয়াই ফালামু...বাড়ি চল...।’

বাবা অপূর কান ধরে টানতে টানতে বাড়ির দিকে গেলেন। কিউবি গ্রহের বিজ্ঞান একাডেমি পৃথিবী ধ্বংসের সব পরিকল্পনা বাতিল করেছে। সে গ্রহের একটা বালক যদি তাদের এভাবে ঘোল খাওয়ায়, তবে বয়স্করা কী করবে তা ভেবেই তারা শিউরে ওঠে। তবে তারা পৃথিবীর মানুষের বন্ধু হতে চায়। শিগগিরই তারা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

অপুকে সেদিন তার বাবা খুব ধোলাই দিয়েছিলেন। সে বাবাকে বলেছে, জীবনে আর কোনো দিন ঘুড়ি ওড়াবে না।- মেহেদী হাসান নবম শ্রেণী, মডেল একাডেমি, মিরপুর-১, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

172) টাইম ট্রাভেল

রিকি একটি টাইম মেশিন বানিয়েছে। সে এতে করে ভবিষ্যৎ পরিভ্রমণে যাবে ঠিক করেছে। সে

একটা প্রাচীন বইয়ে পড়েছে যে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা জ্ঞানীর কাজ আর সে নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করতে যেকোনো কিছু করতে পারে। তাই সে ভবিষ্যৎ পরিভ্রমণে যাওয়াই ঠিক করেছে।

রিকি টাইম মেশিনের ফর্মুলাটা এক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে কিনেছে। সে বলেছে, এটি ফুল প্রফ ফর্মুলা, কোনো খাদ নেই। রিকি তাই এটি মোটা দাম দিয়ে কিনেছে। এমনিতে সে যন্ত্রপাতির খুব বেশি জানে না, কিন্তু মাঝেমধ্যে ফর্মুলা জোগাড় করে এটা-ওটা বানিয়ে ফেলে। সে তার টাইম মেশিনে ঢুকে মেশিনকে ১০০ বছর ভবিষ্যতে যাওয়ার কমান্ড দিল। মেশিনের দরজা বন্ধ করতেই তার ভীষণ শীত করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে সে হতবাক হয়ে গেল। সে সত্যি সত্যি টাইম ট্রাভেল করে ফেলেছে, কিন্তু কিছুই বদলায়নি কেন? এমনকি মানুষগুলো পর্যন্ত একই আছে, কারণ সে জিটাকে দেখতে পাচ্ছে। জিটা রিকিকে দেখে কাছে এগিয়ে এল। তারপর বলল, ‘একি রিকি, অসময়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন! কাজে যাবে না?’ রিকি জবাবে বলল, ‘হাহ্ কাজ? আমি তো তোমাদের সময়ে অতিথি হয়ে এসেছি, এখানেও কাজ করব নাকি?’ জিটা ভাবল, রিকির মাথা আগেই একটু খারাপের মতো ছিল, এখন বুঝি পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে। একে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। এর কথায় সায় দেওয়াই ভালো। তারপর বলল, ‘তুমি কি আমাকে সব খুলে বলবে? আমি তো ঘটনার কিছুই বুঝছি না।’ রিকি মনে মনে ভাবল, মানুষগুলো এখন কী বোকা হয়ে গেছে? তারপর বলল, ‘আরে, আমি একটি টাইম মেশিন বানিয়েছি। তারপর এতে চড়ে টাইম ট্রাভেল করে ৩৯০৪ সাল থেকে ৪০০৪ সালে চলে এসেছি।’ ‘ও, তাহলে এই কথা।’ জিটা মনে মনে ভাবল। তারপর রিকিকে বলল, ‘রিকি, তুমি কি আমাকে তোমার মেশিনটা দেখাবে? আমি তো একজন বিজ্ঞানী, জিনিসটা দেখতে পেলে খুব উপকার হতো।’ রিকি জিটাকে তার টাইম মেশিন দেখাতে রাজি হলো। তারপর সে তাকে তার মেশিনের কাছে নিয়ে গেল। জিটা আলমারির মতো চৌকো মেশিনটা দেখে হেসেই বাঁচে না। তারপর জিটা অনেক কষ্টে হাসি

থামিয়ে বলল, ‘রিকি, তুমি এবারও ফ্রিজে ঢুকে বসেছিলে। হা হা হা হা...’

রিকি খুব বিরক্ত হয়ে ভাবল, ‘ঘটনা কী? এ নিয়ে পর পর ছয়বার একই ঘটনা ঘটল। ওই ঠগবাজ বিজ্ঞানীটা নিশ্চয়ই আগেও আমার কাছে তার ফর্মুলা বিক্রি করেছে। তাই তো তাকে এত চেনা চেনা লাগছিল। আসুক, এরপর ওর টাইম মেশিনে করে ওকেই আমি ১০ হাজার বছর সামনে পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ...আমার নামও রিকি।’—

রিজন সরকার

পাবনা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

173) এলিয়েনের খবরে

কলবেল বেজে উঠল। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। দরজাটা খুলেই চমকে উঠলেন তিনি। এরা কারা! ভাবলেশহীন মুখে কয়েকটি এনরয়েড তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

‘আপনিই কি জাফর ইকবাল?’ অদ্ভুত স্বরে কথা বলে উঠল একটি এনরয়েড। না না এটা কোনো এনরয়েড না, এনরয়েডদের গলা এমন হয় না। এরা অবশ্যই এলিয়েন। বিনিত এবং ততোধিক ভীত জাফর ইকবালের গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোল না। তিনি কেবল মাথা নাড়লেন।

‘আপনিই কি তবে আমাদের নিয়ে বই লেখেন? আচ্ছা, আপনি আমাদের ব্যাপারে কতটুকু জানেন? কিছুই জানেন না। অথচ আমাদের নিয়ে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।’

জাফর ইকবাল এবারও কোনো কথা বলতে পারলেন না। অন্য একটি এলিয়েন চোঁচানো স্বরে বলতে লাগল, মানুষেরা কোনো কিছু না জেনেই শুধু কল্পনা করে অনেক কিছু লিখে ফেলে। কিন্তু আমরা তো এটা পারি না।

আমাদের গ্রহের ‘কষ+অন্ধকার’ ম্যাগাজিন সায়েন্স ফিকশনধর্মী লেখা চেয়েছে। আমরা ঠিক করেছি মানুষকে নিয়ে লিখব। তাই মানুষ সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। রিসার্চ করার জন্য আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।’

‘আমাকে!’ এবার চিঁ চিঁ স্বর বেরিয়ে এল জাফর ইকবালের গলা দিয়ে। ‘হ্যাঁ, আপনাকেই। চলুন আমাদের সঙ্গে।’ কিন্তুত প্রাণীগুলো তাঁর হাত টানতে লাগল। কোনো বাধা দিতে পারলেন না

তিনি।

হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি ঘামছেন দরদর করে। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন। রস+আলোর লেখকদের এম্মুনি সাবধান করতে হবে। তা না হলে ‘কষ+অন্ধকার’ ম্যাগাজিনের লেখকেরা না-জানি আবার কার স্বপ্নে হানা দেয়!- তানভীর সিরাজ

স্টেশন রোড, জামালপুর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

174) জিল্লু স্যারের টাইম মেশিন

দুলাল ও মতিন বিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজে তাদের প্রিয় স্যার জিল্লু স্যার। তিনি পদার্থবিজ্ঞান পড়ান। জিল্লু স্যার বিজ্ঞানী মানুষ। সারা দিন গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কলেজেও তেমন একটা যান না। জিল্লু স্যার এখন নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত। তিনি টাইম মেশিন তৈরি করছেন। তাঁর দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট দুলাল আর মতিন। তারা দিন-রাত খেটে দীর্ঘ ছয় মাস পরিশ্রমের ফলে যেটা তৈরি করল, সেটা দেখে নিন্দুকেরা বলল, ভটভটিও নাকি দেখতে এর চেয়ে ভালো। তবু টাইম মেশিন বলে কথা। কয়েক দিনের মধ্যেই লোকজনের ঢল নামল দেখতে।

দুলাল একদিন জিল্লু স্যারকে বলল, ‘স্যার, আমরা যদি টাইম মেশিন দেখতে টিকিটের ব্যবস্থা করতাম, তাহলে ভালোই ইনকাম হইত। ওই টাকায় একটা মোটরসাইকেল কিনলে, আমি স্যার আপনাকে নিয়ে কলেজে আসতাম।’ এটা ডাहा মিথ্যা কথা। আসল ঘটনা হচ্ছে মিলি। তাদের কলেজে পড়ে। পরির মতো দেখতে। মিলির এক কথা, একমাত্র মোটরসাইকেলের মালিক হলেই তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে। দুলালের এখন একটা মোটরসাইকেলের খুব প্রয়োজন। কেউ যদি টাইম মেশিন নিয়ে তাকে একটা মোটরসাইকেল দেয়, তাহলে দুলাল টাইম মেশিনটা চুরির ব্যবস্থা করবে।

মতিন বলল, ‘স্যার, আমি যদি এই টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে, ধরেন ১০ বছর পেছনে ফিরে যাই, তখন কি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা দেখতে পারব?’

‘সেটা সম্ভব না। টাইম মেশিনে চড়ে আমরা শুধু ভবিষ্যতে যেতে পারব। অতীতে নয়।’

‘তাইলে চলেন স্যার আমরা ভবিষ্যৎ থেকে ঘুরে আসি।’

কিন্তু সমস্যা জটিল। জিল্লু স্যারের টাইম মেশিন পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা ভবিষ্যতে যেতে পারবে। ফিরতে পারবে না বর্তমানে।

কেউ টাইম মেশিনে চড়তে রাজি হচ্ছে না।

দুনিয়ার মায়া বড় মায়া, ঘর-সংসার বউ-বাচ্চা ছেড়ে কেউ ভবিষ্যতে যেতে রাজি হচ্ছে না।

জিল্লু স্যার পড়লেন মহা টেনশনে। এসব মায়ার জন্যই এ জাতির কপালে কিছু নেই।

দুলাল ভাবল, আর সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। অনেক দিন মিলির সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

এবার নিশ্চয়ই টাইম মেশিনের খবরে সে খুশি হবে।

তাকে দেখে মিলি ফিক করে হেসে উঠল।

কিসের হাসি ঠিক বোঝা গেল না। ‘দুলাল ভাই, আপনারা নাকি কী মেশিন বানাইছেন?’

‘হুম। এই একটা টাইম মেশিন।’

‘এখন কি এই মেশিন দিয়া আখের শরবত বানাইয়া বাজারে বেইচ্চা মোটরসাইকেল কিনবেন?’

দুলাল রাগে কষ্টে অভিমানে আর দাঁড়াল না।

এক দৌড়ে জিল্লু স্যারের বাড়িতে। স্যার টাইম মেশিনের সামনে চেয়ার পেতে বসে আছেন।

তাঁর হাতে ইংরেজি স্পোকেন বই। ইংরেজিতে কথা বলার প্রাকটিস করছেন- যদি টিভিতে

সাক্ষাৎকার দিতে হয়, তারই প্রস্তুতি! দুলাল

বলল, ‘স্যার, আমি আর এই সময়ে থাকতে চাই না। আমারে ভবিষ্যতে পাঠায়ে দেন।’

দুলালের কথা শুনে জিল্লু স্যার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সুযোগ তিনি হাতছাড়া

করতে রাজি নন। তিনি প্রায় ঠেলে দুলালকে টাইম মেশিনের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। তারপর

জানালা দিয়ে বললেন, ‘আমারও এই

মানবসমাজে থাকতে ইচ্ছা করে না। আমিও

তোমার সঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু আমি চলে

গেলে টিভিতে সাক্ষাৎকার দেবে কে।’

সত্যি কথা বলতে কি, তিনি কষ্ট করে

ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার মুখস্থ করেছেন। টাইম

মেশিন তৈরি করার চেয়ে ইংরেজি শেখা বেশি

কঠিন। তিনি দুলালের পাশে তাঁর পোষা

কুকুরটাকে বসিয়ে দিলেন। দুলালকে সাহস দিয়ে বললেন, ‘ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তুমি চাইলে ১০০ বছর আগের কুকুর বলে এটাকে বেশি দামে বেচে একটা মোটরসাইকেল কিনতে পারবে।’

স্যার টাইম মেশিনের গায়ের কি-বোর্ডে একের পর এক বোতাম চেপে যাচ্ছেন। হঠাৎ যন্ত্রটা নড়ে উঠল। চুলায় ভাত ফোটান মতো একটা শব্দ শুরু হলো। শব্দের তীব্রতা বাড়ছে।

দুলালের ইচ্ছে করছে মিলিকে দেখতে। একবার যদি মিলিকে দেখতে পেত! এর মধ্যে কুকুরটা কিঁউ করে কেঁদে উঠল। রূপ করে অন্ধকার নেমে এল।

সাদা একটা ঘর। চারদিকে সাদা। হঠাৎ ফিসফিস শব্দ। অর্থহীন কথাবার্তা। এরপর দীর্ঘ নীরবতা। একটি নারীকণ্ঠ বলল, ‘পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে।’

দুলাল হাসপাতালে। মতিন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘দোস্ত, তোর হায়াত আছে। টাইম মেশিন বাস্ট হয়েছিল। স্যারের কুকুরটা মরে গেছে। তুই বাঁচা গেছিস।’

মিলিও এসেছে। সে দুলালের পাশে বসল। সে কাঁদছে, ‘আমার হাত ধরে শপথ করো।

আমাকে ছেড়ে আর ভবিষ্যতে যাবে না।’

দুলালের মনে অনেক কথা, কিন্তু বলতে পারে না। শুধু ভাবে, মিলিকে ছেড়ে আপাতত সে আর কোথাও যাবে না।— আহমেদ মামুন প্রিয়াংকা হাউজিং, মিরপুর-১, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

175) চাঁদে অভিযান

নিল আর্মস্ট্রং পৃথিবীর মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রথম চাঁদে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি চাঁদে অবতরণ করে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে দেখলেন, এক জায়গায় এক লোক বসে আছে। তিনি ভাবলেন, আমি আর কী বিজ্ঞানী, এই লোকটা দেখছি আমার চেয়েও বড় বিজ্ঞানী, এ লোক আমারও আগে চাঁদে এসেছে। নিল আর্মস্ট্রং লোকটির কাছে গেলেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, আপনি এখানে কী করছেন? লোকটি উত্তর দিল, ‘আই হুইনচি, আমনে ইয়ানে আইবেন। এল্লাই আই ইয়ানে হান-সিগারেটের দোয়ান দিছি।’ অবাক হয়ে নিল আর্মস্ট্রং বললেন, ‘বুঝতে পারছি, আপনি খুব চালাক।’ সঙ্গে সঙ্গে লোকটি

জবাব দিল, ‘আই কী চালাক, আঁর তনও বড়
চালাক পাশের জেলার হেতারা। হেতারা আঁর
ইয়ানে আই আরতন বাকিতে হান-সিগারেট খাই
চলি গেছে।’- সাব্বির হোসেন
লক্ষ্মীপুর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

176) মিথ্যুক ডিটেক্টর

মিরাগো সান একজন মহাকাশ পর্যটক, সেই
সঙ্গে একজন বিজ্ঞানী। তাঁর নিজস্ব একটি
স্পেসশিপ আছে। সেটি একই সঙ্গে মহাকাশযান
এবং একটি টাইম-কার। দূর গ্যালাক্সির গ্রহ-
নক্ষত্র ও সময়, দুটোর মধ্যেই ভ্রমণ করে
বেড়ান তিনি। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছেন
পৃথিবীতে। এর আগেও অবশ্য এসেছিলেন।
এবারের পৃথিবী ভ্রমণে বেছে নিয়েছেন এশিয়া
মহাদেশের বাংলাদেশকে। ২০০৮ সাল।

ল্যান্ড করার আগে স্পেসশিপ অদৃশ্য করে
নিলেন, নামালেন একটা ঝোপের পেছনে।
কস্টিউম মেশিন তাঁকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে
পোশাক তৈরি করে দিল। একটা ভুসভুসে জিঙ্গ
আর গ্রামীণ চেকের ফতুয়া। সবার অলক্ষ্যে
ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি,
কেউ জানতেও পারল না যে মধ্যবয়স্ক এই
মানুষটি বহুদূরের একটি গ্রহের ভবিষ্যতের
মানুষ।

বিজ্ঞানী মিরাগো ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখছেন।
কথাবার্তা বোঝার ও বলার জন্য তাঁর সঙ্গে
আছে ল্যাংগুয়েজোন-কন্ট্রোলার। তাই অন্যদের
কথা বুঝতে পারছেন, তিনি যেটা বলবেন
সেটাও অন্যরা বুঝতে পারবে। হাঁটতে হাঁটতে
চলে এলেন একটা মাঠে। মাঠভরা মানুষ, সবাই
মুগ্ধ হয়ে আজগর হোসেনের বক্তৃতা শুনছে।
এবারের সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী তিনি। জিতে
গেলে কীভাবে তাঁর এলাকায় উন্নয়নের বন্যা
বইয়ে দেবেন সেটাই বলছেন। মিরাগো সানের
মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। লোকটা যে মিথ্যা
বলছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, এর পরও
সবাই হাততালি দিচ্ছে কেন! মিরাগো সানের
কিছু একটা করতে ইচ্ছে হলো। ছুটে গিয়ে
স্টেজে উঠলেন। কেউ কিছু বলার আগেই
মাইকটা নিয়ে বললেন, ‘আমার কাছে একটা
যন্ত্র আছে, যেটা দিয়ে তিনি সত্য না মিথ্যা
বলছেন সেটা বোঝা যাবে। আমি সেটা ব্যবহার

করব, আপনারা সব রাজি আছেন?’

সবাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘রাজি, রাজি।’

আজগর হোসেন আর তাঁর দলের এত মানুষের কথার প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না।

মিরাগো সান আজগর হোসেনের হাতে ট্রান্সমিটারের তার দুটি লাগিয়ে দিলেন।

বললেন, ‘এবার বক্তৃতা দিন। কথা সত্যি হলে স্ক্রিনে সবুজ বাতি দেখাবে, মিথ্যা হলে লাল বাতি।’ আজগর হোসেনের গলা শুকিয়ে গেল।

তিনি কাঁপা গলায় বললেন, ‘আ-আ-আমার নাম আজগর হোসেন।’

স্ক্রিনে সবুজ বাতি দেখাল।

এরপর তিনি বলতে লাগলেন তাঁর দেশের বাড়ি, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাসার ঠিকানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকজন চিৎকার করে বলল, ‘ইলেকশনে জিতলে কী করবেন সেইটা কন।’

আজগর হোসেনের হঠাৎ ভয় লাগতে থাকে।

যদি লাল বাতি দেখায় তখন সবাই ভয়ংকর রকম খেপে যাবে।

আজগর হোসেন বললেন, ‘নির্বাচনের পরে...ইয়ে মানে...ইয়ে এলাকার উন্নয়ন করে যাব।’ বলেই ভয়ে ভয়ে তাকালেন ট্রান্সমিটারের দিকে। লাল বাতি জ্বলল। মিরাগো সান ট্রান্সমিটারটা উঁচু করে দেখালেন সবাইকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চিৎকার। সবাই একসঙ্গে গালি দিতে লাগল আজগর হোসেনকে। আজগর হোসেন তখন বিড়বিড় করে বললেন, ‘নিজের উন্নতি করব।’ বলেই আজগর হোসেন বুঝলেন কত বড় ভুল করে ফেলেছেন তিনি। সেটা শুনেও ফেলল সবাই।

ট্রান্সমিটারে জ্বলল সবুজ বাতি। এবার ভয়ংকর রকম খেপে উঠল জনতা। কেউ জুতা ছুড়ে মারল, কেউ ইট। তারপর সবাই ছুটে আসতে থাকে স্টেজের দিকে। আজগর হোসেন হাত থেকে ট্রান্সমিটারের তার খুলে ফেললেন। স্টেজ থেকে কোনোমতে নেমে দিলেন ছুট। সব লোক তাঁর পেছনে ছুটতে লাগল। মিরাগো সান ভিড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে গেলেন।

কিছুদূর যেতেই বুঝলেন, কেউ একজন আসছে তাঁর পিছু পিছু। তিনি থামলেন। লোকটি এসে বলল, ‘আমি একজন সাংবাদিক। আপনার যন্ত্রটা আমাকে দেবেন প্লিজ? সামনে নির্বাচন,

এটা থাকলে এ রকম লোকগুলোর হাত থেকে দেশটাকে বাঁচানো যাবে।’

মিরাগো সান তাঁর ‘মিথ্যুক ডিটেক্টর’ লোকটিকে দিয়ে চলে এলেন। তাঁর মনটা হঠাৎ করে কেমন জানি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। – মুশফিকুর রহমান

সপ্তম শ্রেণী, ক শাখা, গভর্নমেন্ট ল্যাব, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

177) একটি সাইবারদ্রৈনিক

লাভ লোটার...

প্রিয়তমা লুসিয়া জিওভ্যানিলি রাটিউলিস রেজিলাস, আশা করি উননব্বই মাত্রায় খারাপ আছ। আমার চিন্তায় রাতে নিশ্চয়ই তোমার ঘুম হয় না! আমাদের গ্রহে তিনটা সূর্য তো, তাই রাতই হয় না। ফলে রাতে আমারও ঘুম হয় না। মহাকাশের বেলাঙ্কিক্স নক্ষত্রের কসম, ‘না হাউ কিবিটা সামআবে চিনুস’ ইয়ে মানে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, অনেক ভালোবাসি তোমায়। তুমি কি বোঝ না তোমাকে ৪২০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সামনে দেখতে না পেলে আমার মনে দ্বাদশ মাত্রার টাইফুন ওঠে। তোমার জন্য আমি মঙ্গলের দুটি চাঁদ এনে দিতে পারি, শনির বলয় দিয়ে আংটি বানিয়ে দিতে পারি, ব্ল্যাক হোলের অতল গহ্বরে মরতে পারি। গত সপ্তাহে যে চিঠিটা রোবট এক্সএল২৩ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, তা কি তুমি পাওনি? অবশ্য এ রকম একটা কিছু হবে আমার নবম ইন্দ্রিয় আগেই টের পেয়েছিল। রোবটটাকে আর বিশ্বাস করা যায় না, সেদিন হলো কি, গ্লোবেল পুরস্কারখ্যাত গ্যালাকটিক মানের কবি ‘র্যাবিন্দ্র নাট-টিকোর’ লেটেস্ট বই লাস্ট পয়েমটা তোমার কাছে পাঠাব বলে ওকে দিলাম। হতচ্ছাড়াটা অন্য এক মেয়ে রোবটকে গিফট করে এল। যা-ই হোক, এবার নতুন প্রজাতির একটা রোবট পাঠাচ্ছি। তুমি কি জানো, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের তলে বসে বাঁশি বাজিয়ে তাদের প্রিয়াকে ভালোবাসা জানাত? ওটা জুরাসিক আমলের কথা। আমিও বাঁশি বাজিয়ে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিট করে মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্যালাক্সির প্রতিটি মেয়েকে আমার ভালোবাসার কথা জানাব।

প্রিয়তমা, আগামীকাল সেরেস গ্রহাণুর ১৭ নম্বর
হালের সামনে এসো, আমরা একসঙ্গে
রোমান্টিক মুভি মহাশূন্যের অতলে প্রেম ধরে
ফাটলেটা দেখব। মনে রাখবে, কোনো
সুপারনোভাই আমাদের আয়নিক বন্ধন ছিন্ন
করতে পারবে না। ও হ্যাঁ, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে
জানতে পেরেছি যে ফ্যান্টাবুলাস গ্যালাক্সির
ভংচং ৪৭ গ্রহের রাজা হামুনের দ্বিতীয় স্ত্রী
মিটাকুলাসের ছোট ছেলে টাংকিউলিস নাকি
তোমাকে ডিস্টার্ব করছে। ওকে সাফ জানিয়ে
দিয়ো, যেন বামন হয়ে চার হাজার দুই শ
মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোয়াসারের দিকে
হাত না বাড়ায়। ভালো থেকো।

ইতি

তোমার ভালোবাসার ফিউতিন গাইচ তপুন্তিভক্ষি
চিম্পারচেফা

সিলডা ফামিন পেরেখদিয়া নিশ্চায়ক

ফিভিস্কি দা গামা

[বিদ্র. আমার নামটা এক নিঃশ্বাসে বলার

কোনো প্রয়োজন নেই। দু-চারটা দম নিয়ে

নিয়ো]- মাসুদুল ইসলাম

সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

178) ভালোবাসা যুগে যুগে

বিংশ শতাব্দী

১৯০২ কবি-কবিতার পরিচয় হলো এক গানের
আসরে। ভালো লাগা, বন্ধুত্ব, প্রণয়।

১৯০৪ কবি যায় রাজধানীতে আর কবিতা

মফস্বলে থাকে, কথা হয় মনে মনে, দেখা হয়
চিঠিতে!

১৯০৯ কবি-কবিতার বিয়ে হলো। কবিতা

পাড়াগাঁয়ে থাকে আর কবি থাকে শহরে।

দুজনের দেখা হয় দুই দিনের লঞ্চভ্রমণ শেষে।

তিন মাসে একবার। কবি-কবিতার মনে খুব
কষ্ট। একবিংশ শতাব্দী

২০০২ টোনাটুনির পরিচয় হলো নেটে। ভালো
লাগা, বন্ধুত্ব, প্রেম।

২০০৪ টোনা যায় বিদেশ, টুনি দেশে থাকে।

কথা হয় চ্যাটে। দেখা হয়

ওয়েবক্যামে।

২০০৯ টোনাটুনির বিয়ে হলো। টোনা থাকে

ঢাকা, টুনি পড়ে চিটাগাং। দুজনের দেখা হয় ছয়

ঘণ্টা বাসভ্রমণ শেষে মাসে দুইবার। টোনাটুনির

মনে খুব কষ্ট। দ্বাবিংশ শতাব্দী

২১০২ ফুটো-ফুটিকার পরিচয় হলো

ইন্টারগ্যালাকটিক সাইবার কানেকশনে। ভালো
লাগা, বন্ধুত্ব, প্রেম।

২১০৪ ফুটো মঙ্গলে যায়, ফুটিকা পৃথিবীতে
থাকে। কথা হয় পারসোনেল স্যাটেলাইটে।

দেখা হয়, এক্সট্রা পাওয়ার হাই ফিল্ড
টেলিস্কোপে।

২১০৯ ফুটো-ফুটিকার বিয়ে হলো। ফুটো থাকে
মঙ্গলের ফোবসে, ফুটিকা থাকে বৃহস্পতির এক
উপগ্রহে। দুজনের দেখা হয় ছয় মিনিটের
আলট্রাসনিক এয়ার ভ্রমণ শেষে, দিনে একবার।
ফুটো-ফুটিকার মনে খুব কষ্ট।- ডা. তাহসিনা
আফরিন

কলাবাগান, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

179) ইনি একজন বাঙালি বিলিয়নিয়ার

তার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ-২১ মে ২০০৯। রাত
১১টা ১৫ মিনিট। বসে ছিলাম স্ব-উদ্ভাবিত টাইম
মেশিনে। টাইপ করলাম ‘২১ মে ২০,০০৯, দিন
১১টা ১৫ মিনিট’।

সঙ্গে সঙ্গেই চোখে সরষে ফুল দেখলাম প্রচণ্ড
ঝাঁকুনির চোটে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই
নিজেকে আবিষ্কার করলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে।
টাইম মেশিনসহ আমি তখন পার্কের মতো এক
জায়গায় অবস্থান করছিলাম। বোতাম টিপে
টাইম মেশিনকে হাওয়া করে দিলাম। রিমোট
কন্ট্রোল রাখলাম পকেটে পুরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস
নেব, এমন সময় দেখি দুজন ফিনফিনে
মিড়মিড়ে পুলিশ আমার স্বন্ধদেশে চাপ দিয়ে
মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে ঝুলিয়ে নিয়ে
যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ধারণা সত্যি
হলো। এরা আসলে প্রতিরক্ষী রোবট।

আমাকে নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে
গেল। সভা, সেমিনার সব হলো। কিন্তু কোনো
মানুষের ‘ম’-ও কোথাও খুঁজে পেলাম না। এই
পৃথিবী নামক গ্রহটাতে আর কোনো মানুষই
অবশিষ্ট নেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, আমাকে চিড়িয়াখানায়
রাখা হবে। তা-ই হলো।

দর্শনার্থীদের কেউ কেউ আমাকে খোঁচা মারে,
কেউ বাদাম দেয়, কেউ কলা দেয় ইত্যাদি

ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য, এই রোবটদের ব্যবহার মানুষের চেয়ে ভিন্ন ধরে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। এরা মনে হয় আমাকে বিরক্ত করে খুব মজা পাচ্ছে; আমরা যে রকম বানরকে বিরক্ত করি।

একদিন এদের সঙ্গে আমি যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। বিশেষজ্ঞ টাইপ এক রোবটকে আমি বোঝালাম, ‘আমাকে সুযোগ দিলে আমি আমার দেশে ফিরে গিয়ে আরও কয়েকজন বন্ধু নিয়ে আসতে পারি। তবে কথা হলো, আমাকে এমন কিছু দিন, যা দেখে আমার বন্ধুরা বুঝতে পারবে যে ঠিকই আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম।’ একটু বুদ্ধি খাটিয়েছিলাম আর কি।

সিদ্ধান্ত হলো, আমাকে ১০ পিলোন (১ পিলোন = ১,২৩,৫৮০ ক্যারেট) হীরা দেওয়া হবে।

আর তাই তো আজ আমি বিল গেটসদের বিল গেটস-‘বেঙ্গলি বিলিয়নিয়ার।’- সাজ্জাদ হোসেন মকবুলার রহমান ছাত্রাবাস, পঞ্চগড়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০১, ২০০৯

180) বদন চৌধুরীর শোকসভা

বদনচন্দ্র চৌধুরী একজন নবাগত নারকী।

যমরাজ নরক পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। তাঁকে দেখে বদন হাতজোড় করে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যম বললেন, কী চাই তোমার?

-আজ্ঞে, দুই ঘণ্টার জন্য ছুটি।

-কবে এসেছ এখানে?

-আজ এক মাস হলো।

-এর মধ্যেই ছুটি কেন?

-আজ্ঞে, একবার মর্তলোকে যেতে চাই। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় ইউনিভার্সিটি

ইনস্টিটিউটে আমার জন্য শোকসভা হবে, বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখে আসি।

যমালয়ের নিবন্ধক অর্থাৎ রেজিস্ট্রার চিত্রগুপ্ত কাছেই ছিলেন। যম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই প্রেতটার প্রাক্তন কর্ম কী?

চিত্রগুপ্ত বললেন, এর পূর্বনাম বদনচন্দ্র চৌধুরী, পেশা ছিল ওকালতি তেজারতি আর নানা রকম ব্যবসা। এক মাস হলো এখানে এসেছে, হরেক রকম বজ্জাতির জন্য হাজার বছর নরকবাসের দণ্ড পেয়েছে। বর্তমান আচরণ ভালোই। ঘণ্টা দুয়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

শোকসভায় ওর বন্ধু আর স্তাবকেরা কে কী বলে

তা শোনার জন্য আগ্রহ হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

-ও খবর পেল কী করে যে আজ শোকসভা হবে?

-খবরের অভাব কী ধর্মরাজ, রোজ কত লোক মরে সোজা নরকে চলে আসছে।

-বেশ, দুই ঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দাও, সঙ্গে একজন প্রহরী থাকে যেন।

চিত্রগুপ্ত হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে কাকজঙ্ঘ, তুমি এই পাপীর সঙ্গে মর্তলোকে যাও। ঠিক দুই ঘণ্টা পরই ফেরত আনবে।

‘যে আঙে’ বলে যমদূত কাকজঙ্ঘ বদন চৌধুরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনন্তর যমরাজ অন্য এক মহলে এলেন। তাঁকে দেখে ঘনশ্যাম ঘোষাল কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হলেন।

যম বললেন, তোমার আবার কী চাই?

-আঙে, দুই ঘণ্টার জন্য ছুটি। একবার মর্তলোকে যেতে চাচ্ছি।

-তোমারও শোকসভা হবে নাকি? এখানে এসেছ কবে?

-দুই বছর হলো এখানে এসেছি। আমার জন্য কেউ শোকসভা করেনি প্রভু। বন্ধুরা বড়ই নিমকহারাম, আমার মৃত্যুর পর আমারই ‘কালকেতু’ কাগজে মোটে আধ-কলম ছেপেছিল, একটা ভালো ছবি পর্যন্ত দেয়নি। বদন চৌধুরী বন্ধু ছিলেন, তাঁর শোকসভায় যাওয়ার জন্য ছুটি চাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা দেখে বললেন, তুমি অতি পাঁজি প্রেত, যমালয়ে এসেও মিছে কথা বলছ। তোমার কাগজে তো চিরকাল বদন চৌধুরীকে গালাগালি দিয়েছ।

-মরণের পর শত্রুতার অবসান হয়েছে, আমরা আবার বন্ধু হয়ে গেছি।

যম চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাকগে, দুই ঘণ্টার জন্য একেও ছেড়ে দিতে পারো। সঙ্গে যেন একটা প্রহরী থাকে।

চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূত ভূঙ্গরোল ঘনশ্যামের সঙ্গে গেল।

পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় খুব লোকসমাগম হয়েছে। বেদির ওপর আছেন সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায়বাহাদুর গোবর্ধন মিত্র, তাঁর ডান পাশে প্রধান বক্তা

অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী, বাঁ পাশে বদনের বন্ধু ও সভার আয়োজক ব্যারিস্টার কোকিল সেন। বক্তাদের জন্য দুটো মাইক্রোফোন খাড়া হয়ে আছে এবং সভার বিভিন্ন স্থানে কতক লাউডস্পিকার বসানো হয়েছে।

বদন চৌধুরী তাঁর রক্ষী যমদূতের সঙ্গে বেদির ওপরই দাঁড়িয়েছিলেন।

ঘনশ্যাম ঘোষালকে দেখে বললেন, তুমি কী মতলবে এখানে এসেছ? সভা পণ্ড করতে চাও নাকি?

ঘনশ্যাম বললেন, আরে না না, পণ্ড করব কেন, তুমি হলে আমার পুরোনো বন্ধু। তোমার গুণকীর্তন শুনে প্রাণটা ঠান্ডা করতে এসেছি। দুই যমদূত নিজের নিজের বন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে রইল। সভার কোনো লোক এই চারজনের অস্তিত্ব টের পেলেন না।

প্রথমে শ্রীযুক্তা ভূপালী বসুর পরিচালনায় সংগীত হলো। -আজি ্রণ করি পুণ্য চরিত বদনচন্দ্র চৌধুরীর, সেই স্বর্গগত রাজর্ষির; লোকমান্য অগ্রগণ্য কর্মযোগী ধর্মবীর। ...ইত্যাদি। তারপর অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মৃত মহাত্মার কীর্তিকথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন।

আরও কয়েকজন বক্তৃতা দেওয়ার পর ব্যারিস্টার কোকিল সেন দাঁড়ালেন। আগের বক্তারা যেটুকু বাকি রেখেছিলেন তা নিঃশেষে বিবৃত করে ইনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের একটি মর্মরমূর্তি দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপন করা হোক এবং তদুদ্দেশে চাঁদা তোলা আর অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য অমুক অমুককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক।

পেছন বেঞ্চ থেকে একজন শ্রোতা বললেন, বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। মরা মানুষের নিন্দে করতে চাই না, কিন্তু তার মূর্তির জন্য আমরা কেউ একপয়সা চাঁদা দেব না।

সভায় হাততালি হলো, প্রথমে অল্প, যেন ভয়ে ভয়ে, তারপর খুব জোরে। গোলমাল থামলে সভাপতি গোবর্ধন মিত্র উঠে তাঁর ভাষণটি পড়ার উপক্রম করছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘনশ্যাম তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন।

যমদূত ভূঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম নিমিষের মধ্যে গোবর্ধনবাবুর কানের ভেতর দিয়ে তাঁর মরমে প্রবেশ করলেন।

তারপর ঘনশ্যামের প্রেতাত্মা তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করল।-

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বেশি কিছু বলার নেই। শেষের বেঞ্চেও ওই ভদ্রলোকটি যা বলেছেন তা খুব খাঁটি কথা। তার খোশামুদে আত্মীয়স্বজন তাঁকে দেবতা বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন আর ধাপ্লাবাজি চলবে না। বদন স্বর্গে যায়নি, নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর ছাঁচড় হারামজাদা লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর অ্যাসেমব্লিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে, পারমিটে আর কালোবাজারে লাখ লাখ টাকা-

বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাকজঙ্ঘকে একধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি অধ্যাপক আগ্নিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদনচন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়াস কাগজি গুপ্তা কালকেতুর সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতাই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গোবেচারার ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে- সভাপতির জবানিতে ঘনশ্যাম বললেন, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। সেই বজ্জাত বদনার ভূতই অধ্যাপক আগ্নিরস গাঙ্গুলী মশাইকে কাবু করে যা-তা বলছে-

আগ্নিরস গাঙ্গুলীর মারফত বদন চৌধুরী বললেন, আপনারা কি সেই ব্লাকমেইলার শয়তান ঘনা ঘোষালকে ভুলে গেছেন? ব্যাটা টাকা খেয়ে তার কাগজে কালোবাজারি চোরদের প্রশংসা ছাপত, টাকা না পেলে গাল দিত। মন্ত্রীদের ভয় দেখিয়ে সে নিজের ওয়ার্থলেস ছেলেমেয়ে শালাশালীদের জন্য ভালো ভালো চাকরি জোগাড় করেছিল।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। এই সময়ে দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র আর আগ্নিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বলল, বেরিয়ে এসো শিগগির, দুই ঘণ্টা কাবার হয়েছে। দুই প্রেতাত্মা সুড়ুং করে বেরিয়ে এল, যমদূতেরা তখনই তাদের নিয়ে উধাও হলো। (সংক্ষেপিত) পরশুরামঃ

কথাসাহিত্যিক। জন্ম-১৮৮০, মৃত্যু-১৯৬০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০০৯

181) ব্যক্তিগত কারণসংবলিত

পদত্যাগপত্র

পদত্যাগের চর্চা এ দেশে কম হলেও দু-চারবার যা হয়, নেপথ্যের কাহিনী যা-ই হোক পদত্যাগপত্রে উল্লেখ থাকে ব্যক্তিগত কারণ। কিন্তু কী হতে পারে সেসব ব্যক্তিগত কারণ, তা অনুমান করে কয়েকটা পদত্যাগপত্র থেকে চুম্বক নমুনা তুলে ধরছেন শাত শামীমজনাব, ...আজকাল আমার অতিমাত্রায় ঘুম বেড়ে গেছে। সকাল সকাল উঠতে বিরাট কষ্ট হয়। তার ওপর শুনছি ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়া হবে। এমনিতেই কোনো রকমে ঠিক সময়ে অফিসে এলেও দুপুরের খাবারের পর লাগাতার ঝিমুনি আসে। আমি একটু নির্বিঘ্নে ঘুমানোর ব্যক্তিগত কারণে...

নিবেদক

আবদুর রহমানজনাব,

...আমার স্ত্রী রান্নার ওপর একটা শর্টকোর্স করেছে। প্রায়ই দুপুরে সে নানা রকম খাবার তৈরি করে। সেদিন শখ করে কাঁঠালের বিচি দিয়ে চ্যাপা শুঁটকির এমুন ভর্তা তৈরি করেছে, শুনেছি পুরা মোহাম্মদপুর এলাকায় তার সুঘ্রাণ ছড়িয়েছে। কিন্তু কাজের চাপে আমি যেতে পারলাম না। তা ছাড়া দুপুরে বাইরে খেয়ে খেয়ে এযাবৎ দুবার মহাখালীর ডায়রিয়া হাসপাতালে গেলাম। সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে স্ত্রীর অনুরোধে আমি...

নিবেদক

খাইরুল হকজনাব,

...আমার রুমের অপর ডেস্কে সদ্য নিয়োগ পাওয়া মেয়েটি আমার দিকে প্রায়ই কেমন কেমন করে তাকায়। আমি বিরাট লজ্জায় পড়ে যাই চোখাচোখি হলে। আমার ধারণা, মেয়েটি আমার বিষয়ে আগ্রহী। অফিসে আমি এমন পরিবেশে কাজ করি, এটা শুনলে আমার মা-বাবা ভীষণ কষ্ট পাবেন। তাই আমি...

নিবেদক

মকবুল মিয়াজনাব,

...আপনি জানেন, গতবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর আমি হার্টের অসুখে দুই বছর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলাম। এখন ফিরে

জয়েন করার পর থেকে স্বপ্নে দেখছি, খালি আমি ক্রসফায়ারে পড়েছি। এক হুজুর বাবা আমাকে বলেছেন দেশ ত্যাগ করতে। তাই আমি...

নিবেদক

মতিন চৌধুরীজনাব,

...আপনি হয়তো গুনিয়েছেন, সম্প্রতি আমি বিবাহ করিয়াছি। আমার শ্বশুর আবার খুশি হইয়া আমাকে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি উপহার দিয়েছেন। যে বাড়ির ভাড়া পুরোটাই আমার স্ত্রী নিয়ে যায়, কারণ আমি নিজে কামাই করি। ভাবলাম কষ্ট করে চাকরি করার কী দরকার। বাসায় বউকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করব আর ভাড়ার একটা পার্সেন্টেজ পকেট খরচ বাবদ নেব। তাই আমি ওই পদ থেকে...

নিবেদক

রোমিও খান সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০০৯

182) বিজ্ঞাপন রঙ্গ

নিচের বিজ্ঞাপনগুলো কিন্তু সত্যি সত্যি বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সংগ্রহ করেছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। মালিক হউন

এই অফিসের কর্মচারী হিসেবে কাজ করে প্রতি ঘণ্টায় ১০০ টাকায় আপনার পোষাচ্ছে না?

আপনি চাইলেই এই অফিসের একজন মালিক হয়ে যেতে পারেন; হতে চাইলে এখনই দুই লাখ টাকা দিন আর প্রাথমিক পর্যায়ে ঘণ্টাপ্রতি ৮০ টাকা হিসাবে কাজ শুরু করুন। ক্রটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক খুঁটি

একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির গায়ে একটি সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা, 'এটি একটি ক্রটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক খুঁটি। এতে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাবেন। কাজেই কেউ এই খুঁটিতে হাত দেবেন না।

-আদেশক্রমে কর্তৃপক্ষ

বিদ্রঃ এই আদেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হৃদয় বিক্রি হবে দুই বছরের ওয়ারেন্টিসহ একখানা ব্র্যান্ড নিউ হৃদয় বিক্রি হবে [ম্যানুয়ালসহ]।

স্পেশাল ডিসকাউন্ট চলছে,

৫০% ছাড়

[কেন হৃদয় বিক্রি হবে, সে এক বিরাট ইতিহাস] খাবার দেবেন না

চিড়িয়াখানায় পশুর খাঁচার সামনে লেখা,
'চিড়িয়াখানার পশুদের খাবার দেবেন না।
আপনার কাছে যদি বাড়তি খাবার থাকে, তাহলে
তা চিড়িয়াখানার গার্ডদের দিন।' প্রবেশ নিষেধ
হাসপাতালে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিশেষ কক্ষের
বাইরের নির্দেশনা বোর্ডে লেখা, 'শিশুদের প্রবেশ
নিষেধ'। খোলা থাকে
এই রেস্টুরেন্ট সপ্তাহে সাত দিন এবং শুক্রবারও
খোলা থাকে। সব ঠিক করি
ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দরজায় ঝুলছে সাইনবোর্ড।
লেখা, 'যেকোনো প্রকারের ইলেকট্রনিক
যন্ত্রপাতি ঠিক করতে জোরে জোরে দরজায় নক
করুন, কল বেলটা নষ্ট'। চলাচলের অনুপযোগী
রাস্তার পাশে সাইনবোর্ডে লেখা, 'পানির নিচে
থাকার কারণে যখন এই রাস্তাটি একেবারেই
দেখা যাবে না, তখন বুঝবেন রাস্তাটি চলাচলের
অনুপযোগী'। মাত্র ৫০ টাকায়!
মাত্র ৫০ টাকায় পাচ্ছেন ফ্রিজ, টিভি, ভিসিডি
প্লেয়ার, কম্পিউটার সাজানোর জন্য রঙিন
কারুকাজ করা কাপড়। বাচ্চা চাই
তিন বছরের ছোট একটি বাচ্চাকে সঙ্গ দেওয়ার
জন্য তিন বছরের একটি বাচ্চা চাই।
বিদ্র: এ কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের প্রাধান্য
দেওয়া হবে। আমরাই তো আছি
প্রতারিত হতে অন্য কোম্পানির শরণাপন্ন হবেন
না; আমরাই তো আছি। আমাদের কাছে
আসুন। এম্ফুনি লিখুন
বয়স্ক শিক্ষাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠানের
বিজ্ঞাপন, 'আপনি কি লিখতে-পড়তে পারেন
না? লেখাপড়া শিখতে চাইলে এম্ফুনি চিঠি লিখুন
আমাদের ঠিকানায়'। সোফা বিক্রি হবে
নতুনসদৃশ একখানা সোফাসেট বিক্রি হবে। পাঁচ
বছরের ওয়ারেন্টি, সঙ্গে পাচ্ছেন দুই মাসের ফ্রি
সার্ভিসিং। কিঞ্চিৎ ঘুণে ধরেছে, কিঞ্চিৎ কাঠপচা
ঘ্রাণ পাওয়া যায়, মোটা মানুষ বসলে ক্যাঁচক্যাঁচ
আওয়াজ হলেও সোফাসেটটি দেখতে একদম
নতুন মনে হয়। কণ্ঠশিল্পী চাই
একটি উদীয়মান রক ব্যান্ডের জন্য একজন
কণ্ঠশিল্পী প্রয়োজন। শিল্পীকে অবশ্যই ছেলে
অথবা মেয়ে হতে হবে। সময় হয়েছে
একটি গাড়ির গায়ে লেখা, 'আপনি কি এই
লেখাটি পড়তে পারছেন? যখন পারবেন না
তখন বুঝবেন যে গাড়িটি ধোয়ার সময়

হয়েছে'। ধোপার বিজ্ঞাপন

আমরা আপনার কাপড়কে যন্ত্র দ্বারা নির্মমভাবে
নির্যাতিত করি না। যা করার আমরা নিজ
হাতেই করি। কর্মী চাই

একটি বোমা তৈরির কারখানায় জরুরি ভিত্তিতে
কিছু লোক নিয়োগ করা হবে।

বিশেষ শর্তঃ যেকোনো সময় বিমান ছাড়াই উড়ে
যাওয়ার শখ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিক্রি
হবে

৪৫ খণ্ডের একখানা বিশ্ব জ্ঞানকোষ বিক্রি হবে
মাত্র ৫০০ টাকায়। এই বিশ্বকোষটির মালিক
এটি বিক্রি করছেন। কারণ, তাঁর জীবনে এটির
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি বিয়ে
করেছেন এবং আর দশজন স্ত্রীর মতো তাঁর
স্ত্রীও সবকিছুই জানেন। মাথা দেখুন

রোলার কোস্টারে লেখা, 'ভয় লাগলে নিজের
মাথার দিকে তাকানোর চেষ্টা করুন'। পিনপতন
লাইব্রেরিতে কাগজের বোর্ডে লেখা, 'একটি পিন
ফেলুন, পিনপতন নিস্তর্রতা পরীক্ষা
করুন'। ব্যবসায়ী সিডিকেট

প্রথমে জমা করুন, তারপর বিক্রি করুন।

বিদ্রঃ সর্বোচ্চ একটি জমা করতে পারবেন।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০০৯

183) পরিগুলো উড়ে যায়, পড়ে থাকে কল্পনা

তোমার জন্য মরতে পারি ও সুন্দরী...

– যদিও মরতে চাই না, তোমার জন্য বাঁচাই
কঠিন, বাঁচার সুযোগ পাই না।

কোন দুটি জিনিসের মধ্যে আপনি কোনো
পার্থক্য খুঁজে পান না?

– মশা আর প্রেম!

ওমা, এ দুটো ব্যাপার এক হলো কেমন করে!

– ভাই রে! প্রেম হোক আর মশা কামড়াক,
রাতের ঘুম হারাম!

এক লোকের মাথাভরা টাক, তবু সে প্রতিদিন
সেলুনে যায়। কেন?

– কারণ, সে সেলুনের মালিক!

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম কী দেখতে ইচ্ছা
করে?

– আমার অফিস থাকে বলে এত সকালে উঠতে
হয় যে ঘুম থেকে উঠে আমার মাঝেমধ্যে দুপুর
দেখতে ইচ্ছে করে।

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু...

– মন না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না।

কোন বইটি আপনার জীবনে পড়া সবচেয়ে বড়
রহস্যের বই?

– বীজগণিতের বই।

বিবর্তনবাদের উদাহরণ দিন তো দেখি!

– অনেক দরিদ্র স্বামী এককালে ধনী ব্যাচেলর
ছিলেন!

বন্ধুত্ব আসলে কেমন হওয়া উচিত?

– চোখের মতো! এরা সারা জীবন একসঙ্গে
পাশাপাশি কাটায়। চোখে ধুলো পড়লে একসঙ্গে
দুই চোখে কষ্ট হয়, দুঃখে কাঁদে একসঙ্গে।

এমনকি ঘুমানোর সময়ও দুই চোখ বন্ধ হয়
একই সঙ্গে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এমন বন্ধুত্বে কখনো
ফাটল ধরবে না...

– কে বলেছে, সামনে শুধু একটি মেয়ে এসে
দাঁড়াক না!

মার খেয়েছেন কখনো?

– ছোটবেলায় একবার স্কুলের ভটা (ভটাচার্য)
স্যারের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম। তবে
আমার কিন্তু কোনো কষ্ট হয়নি!

মার খেলে কষ্ট হয় না বুঝি?

– স্যার প্রতিদিন ক্লাসে ঢুকতেন একটা বেত
নিয়ে। ছেলেগুলো সবাই মার খেত আর ক্লাসের
মেয়েগুলো হাসত। আমার পালাও এল একবার!
প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও আমি নির্লিপ্ত নয়নে,
কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব ধরে থাকলাম।
ফলাফলে মেয়েগুলো আমার দারুণ ভক্ত হয়ে
গেল।

রাস্তায় যেতে যদি একগোছা টাকা আর সুন্দরী
কোনো মেয়েকে দেখেন, আপনি কার দিকে
তাকাবেন?

– দুটোর দিকেই তাকানোর প্রশ্ন আসছে কেন?
দ্বিতীয়টি তাকানোর, প্রথমটি তো নিয়ে কেটে
পড়ার!

আমাদের দেশে যেকোনো পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত
কী হয়?

– পরিগুলো উড়ে যায়, পড়ে থাকে কল্পনা।
আপনি মিথ্যে বলেন?

– এখনো বুঝতে পারেননি, না? নোবেল
সাম্রাজ্যিক গ্রহণঃ জিনাত রিপা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০০৯

184) মোবাইলে স্বাস্থ্যসেবা

মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা পেতে রেজিস্ট্রেশন করেছেন একজন। চলুন তাঁর পরিণতি দেখি।
ভেবেছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। আপনি কোন ভাষায় কথা বলতে চান-বাংলা হলে ১ চাপুন, ইংরেজি হলে ২ চাপুন, চায়নিজ হলে...

ভাই, বাংলা, বাংলা, ১, ১, আমার বুকে ব্যথা।
ওয়েল! বুকের বাঁ পাশে ব্যথা হলে ১ চাপুন, আর ডান পাশে হলে ২ চাপুন।

ভাই, মরে গেলাম। কী করব তাড়াতাড়ি বলুন।
ব্যথা কখন থেকে। সকাল থেকে হলে ৬ চাপুন, দুপুর থেকে

হলে ৭, সন্ধ্যায় হলে...

উহ্! ইহ্! একটু আগে থেকে বেশি ব্যথা,
তাড়াতাড়ি ওষুধের কথা বলুন...

আপনার পরিবারের কোন কোন সদস্যের বুকে
ব্যথা হয়-দাদার হলে ৩ চাপুন, জ্যাঠাতো
ভাইয়ের হলে ৪ চাপুন, দুলাভাইয়ের হলে...
আহ্! হিঃ! উহ্! ...

হ্যালো! হ্যালো!! কথা বলছেন না কেন? অজ্ঞান
হয়ে গেলে ১ চাপুন, আর মরে গেলে ২ চাপুন...
হ্যালো, আমার ভাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ওহ্ হো! উনার মনে হয় হার্টঅ্যাটাক হয়েছে।
জলদি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান।

অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন। কোনো একটি
হাসপাতালের ফোন নাম্বার দিন
দুঃখিত!

হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স-সংক্রান্ত তথ্য জানতে
আপনাকে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
রেজিস্ট্রেশনের জন্য টাইপ করুন ঐডংঢঃ আর
সেন্ট করুন ৯৬৯৬ নাম্বারে।

হাসপাতাল তথ্য সেবায় আপনাকে স্বাগতম।
আপনি ধন্যবাদ দিতে চাইলে ১ চাপুন, কোনো
পরামর্শ চাইলে ২ চাপুন...

ভাই, অ্যাম্বুলেন্স লাগবে। তাড়াতাড়ি একটি
অ্যাম্বুলেন্স পাঠান।

আপনি ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা হলে ১ চাপুন,
মহাখালী হলে ২ চাপুন, ভূতেরগলি হলে ৩
চাপুন...

থামেন, থামেন... খিলগাঁও হইলে কত চাপতে
হইব হেইডা কন।

ওয়াও! ভেরি গুড! ওখানে আমাদের পরিচিত
হাসপাতাল আছে। অ্যাম্বুলেন্স এম্ফুনি দরকার

হলে ১ চাপুন, এক ঘণ্টা পরে দরকার হলে ২ চাপুন...

ভাই, মনে হয় লাগবে না। রোগী মনে হয় মারাই গেছে।

ওয়েল! নাড়ি পরীক্ষা করুন। নাড়ি খুঁজে পেলে ১ চাপুন, না পেলে ২ চাপুন।

আর ১, ২ চাইপা লাভ কী! রোগী তো মরেই গেল।

মৃত্যু-পরবর্তী পরামর্শ ও সেবা পেতে রেজিস্ট্রেশন করুন। রেজিস্ট্রেশন করতে আপনার কিংবা অন্য যে কারও মোবাইল ফোনসেটের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন অফয়পড় নপথয়ভ আর সেন্ট করুন ০০০০ নাম্বারে।

স্বাগতম! আপনার বন্ধু মারা গিয়ে থাকলে ১ চাপুন, আত্মীয় মারা গেলে ২ চাপুন...

ভাই, কাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে। ওকে বলছি, মার্কিন কাপড় চাইলে ১ চাপুন, নরমাল সুতির কাপড় চাইলে ২ চাপুন... কাপড় একটা হইলেই চলে। তা ছাড়া...

দুঃখিত! পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স না থাকায় আপনার সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হলো। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০০৯

185) কে কীভাবে বাজেট ঘোষণা করতেন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই অর্থমন্ত্রীরা বাজেট ঘোষণা করে আসছেন। বাজেট ঘোষণা করাই তাঁদের কাজ। কিন্তু এ কাজটি অন্য পেশার মানুষ করলে কেমন হতো তা-ই ভেবে বের করেছেন আদনান মুকিত। হানিফ সংকেত

এই মিলনায়তন এবং এই মিলনায়তনের বাইরে যে যেখানে বসে আমাদের এই বাজেট অনুষ্ঠান দেখছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ।

বাজেট লাগে যেকোনো কাজ শুরুর আগে।

সবাই বাজেট চান। তাই শুরুতেই বাজেট নিয়ে গান। গানটির কথা লিখেছেন মো. রফিকুজ্জামান এবং সুর করেছেন আলী আকবর রুপু। আরজে হ্যালো ডিয়ার লিসেনারস, শুনছেন রেডিও বাজেট। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অ্যানাউন্স করব ২০০৯-১০ ইকোনমিক ইয়ারের বাজেট। এর আগে নিচ্ছি এ সুইট লিটল ব্রেক, স্টে উইথ আস। ফুটপাথের ক্যানভাসার

যাঁরা আমার এই বাজেট ঘোষণা শুনছেন,
তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। মুসলমান ভাইদের
আমার সালাম, হিন্দু ভাইদের নমস্কার এবং
অন্য ধর্মের ভাইদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
ভাইজান, এই বাজেট নিয়ে নানাজনের রয়েছে
নানা রকম চিন্তা। বাজেটের চিন্তায় অনেকের
পেট কামড়ায়, মাথা ঝিমঝিম করে, রাতে ঘুম
হয় না, প্রেসার বেড়ে যায়...। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, বাজেট হাতে
এসে গেছে নাহি ভরসা।' আজ এই মেঘমেদুর
বরষা দিনে উত্তাল শীতল হাওয়ায় এই
অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করিতে আসিয়া
আমার মনে কাব্য আসিয়া গেল, 'বাজেট আমার
বাজেট ওগো বাজেট জীবন ভরা...'নবাব
সিরাজউদ্দৌলা

আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাজেট ঘোষণা
করতে এসে মনে পড়ে গেল বাংলা, বিহার,
উড়িষ্যার সেই মহান অধিপতির কথা, যাঁর শেষ
উপদেশ আমি ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন, ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুযোগ দিয়ো না। তারা এ
দেশ কেড়ে নেবে। তাই আমি বাজেটে
বিদেশিদের কোনো সুযোগই দিইনি
জনাব...। কাজী নজরুল ইসলাম

মম এক হাতে ভারি দেশের বাজেট আর হাতে
রণতুর্য...। আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, বাজেট পড়িয়া
হব শান্ত...। আজ বাজেট পড়ার উল্লাসে মোর
চোখ হাসে, মোর মুখ হাসে...। ধনী শোষকের
শৃঙ্খল ভাঙি, দূর করি ব্যবধান, গাহি সাম্যের
গান...। চৌধুরী জাফর উল্লাহ শরাফত

সুপ্রিয় দর্শক, জাতীয় সংসদ ভবন থেকে
সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জাফর উল্লাহ
শরাফত। আজ ঘোষিত হতে যাচ্ছে ২০০৯-১০
অর্থবছরের বাজেট। এ এক দারুণ ঐতিহাসিক
মুহূর্ত, সারা দেশের মানুষ আজ টানটান
উত্তেজনা ও চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা
করছে। এ উৎকণ্ঠা, এ অপেক্ষা, এ
কৌতূহল...। মাজহারুল ইসলাম

হ্যাঁ ভাই, এ এক চরম ক্লাইমেক্স। কিন্তু এ কী,
সব মানুষের মধ্যে আজ কেন এত উৎকণ্ঠা?
কেন সবার চোখ আটকে আছে টিভি পর্দায়? হ্যাঁ
ভাই, সগৌরবে আসিতেছে...আওয়ামী লীগ
প্রযোজিত, অর্থমন্ত্রী প্রণীত ২০০৯-১০
অর্থবছরের... বাজেট... বাজেট... বাজেট...

বাজেট...। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

186) সময় শুধু বয়ে নয়, এগিয়েও যায়

রহমান সাহেব পড়েছেন ভীষণ মুসিবতে। পুরান ঢাকা ছেড়ে মোহাম্মদপুরে বাড়ি বানাতেও এখনো কোনো কিছুতে বিনয় প্রকাশ করতে ‘আব্বের হালায় কয় কি!’ই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

কোনো ‘মুসিবতে’ পড়লে তিনি সাধারণত আমার কাছেই আসেন শলাপরামর্শ করতে। দেখলেই মুখ থেকে জর্দার ঘ্রাণ ছুটিয়ে বলে ওঠেন, ‘আরে ছাংঘাতিক (সাংঘাতিক নয়, সাংবাদিকের অপভ্রংশ) ছাহেব, আইছেন...কেমুন আছেন?’

সেদিন প্রায় হত্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন আমার কাছে। মুখ থমথমে। ‘ছাংঘাতিক ছাহেব, হুনছেননি, ঘড়ির কাঁটা নাকি ছরকারে আগায় দিবার কইছে। আব্বের হালায় কয় কি! ঘড়ির কাঁটা পামু কই। আমার বাড়িতে কুনো ঘড়িতেই তো কাঁটা নাইক্কা। ছবগুলান ঘড়িই তো ডিজিটাল।’

ডিজিটাল ঘড়িতে কাঁটা এগিয়ে আনা মুশকিলই বটে। তার চেয়েও বড় মুশকিলে পড়েছে দেবা। দেবা হলো সেই প্রজাতির একজন, যারা জন্ম থেকেই ‘লেট লতিফ’। ভানু বাবুর ভাষায়, ‘সেই যে জন্মের সময় দুই ঘণ্টা ১০ মিনিট লেট, আজও কাভার করতে পারল না।’

শৈশবে খেলার মাঠে দেখেছি, সবাই হাজির। শুধু দেবার পদধূলি পড়ল ঠিক দেড় ঘণ্টা পরে! কয়েকবার ‘ডেটিং’য়ের টাইম ঠিক রাখতে না পারার দায়ে দেবা দেবদাস পর্যন্ত হয়েছে। সেই মুশকিল আসান হয়েছে চাকরিজীবনে! কোনো রকমে একটা সরকারি চাকরি বাগিয়ে নিয়েছে দেবা। সেখানেতো লেট লতিফদেরই জয়জয়কার।

আমরা পরিচিতরা অবশ্য ওর সময়ের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা নয়, দেড় ঘণ্টাই এগিয়ে রাখি। আর তাই ১০টায় কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলে সাড়ে ১১টার আগে ওই এলাকাই মাড়াই না। এই নিয়মে দিব্যি চলছে। এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ঘণ্টা এগিয়ে যাওয়া মানে তো দেবা পিছিয়ে পড়ল পুরো আড়াই ঘণ্টা! এই নিয়ে দেবা নিজেও ইদানীং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

তবে কদিন আগে রেডিওর একটা লাইভ ফোনইন অনুষ্ঠান শোনার পর মনে হলো, দেবা এতটা দুশ্চিন্তায় না ভুগলেই পারে। সেখানে এক বক্তার সাফ জবাব, আমরা জাতিগতভাবেই লেট-লতিফ। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে ‘বাঙালি-টাইম’ বলেই একটা অলিখিত নিয়ম চালু হয়ে গেছে। এখানে সবার ঘড়ির কাঁটা এমনিতেই কম-বেশি এগিয়ে রাখা আছে। নয়টার ট্রেন কয়টায় ছাড়ে- মোবাইল ফোনের ওই বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলি-এ প্রশ্ন শুধু বাংলায় সম্ভব।

আরেক বক্তা ওই একই অনুষ্ঠানে দেখলাম (আসলে শুনলাম) বেশ ঝাঁজাল গলায় তাঁর মন্তব্য দিলেন, “ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনায় সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বে এ দেশের নিপীড়িত, অভাবী জনতা, যারা দু বেলা অন্ত পায় না। দিনের সময় বেড়ে গেলে তাদের ক্ষুধা লাগবে বেশি বেশি। কে দেবে এই খাবার? এ জন্যই কবি বলে গেছেন, ‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়...’।”

শুধু শুধু বাঙালির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। সময় নিয়ে কারচুপি সেই খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সাল থেকেই চলে আসছে! ওই সময় রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার চান্দ্রবর্ষের বদলে সৌরবর্ষ চালু করেন। আগের ভুলসর্বস্ব ক্যালেন্ডারের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে নতুন ক্যালেন্ডারটির নভেম্বর-ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দুটি অতিরিক্ত মাস যোগ করা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে যোগ করা হয় অতিরিক্ত তিনটি সপ্তাহ, যার ফলে বছরটি পৃথিবীর ইতিহাসের দীর্ঘতম বছরে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ৪৪৫ দিনে গড়ায়!

ওই সময় সিজারের বিরুদ্ধে সময় চুরির অভিযোগ পর্যন্ত আনা হয়েছিল। এ-ই হয়, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর! তবে জুলিয়ান বর্ষপঞ্জিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাধান দিতে পারেনি। পারেনি বলেই ১৫৮২ সালে চালু হয়েছিল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। এখন যাঁরা, ‘আহা, খামোখাই এক ঘণ্টা বয়স বেড়ে গেল’ বলে আফসোস করছেন, জেনে খুশি হবেন, পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি আমলে এক-দুই ঘণ্টা নয়, এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাক্কা ১০ দিন! তাই ১৫৮২ সালের ৫ থেকে ১৪ অক্টোবরের কোনো হদিস নেই ইতিহাসের পাতায়! ১৫৮২

সালের ৪ অক্টোবর মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল এবং পরদিন ঘুম থেকে উঠে অবাক বিনয়ে আবিষ্কার করল, সে দিনের তারিখটা ৫ নয়, ১৫ অক্টোবর!

সে সময়ও কম হাঙ্গামা হয়নি। আয়ুষ্কালেরই ১০-১০টা দিন কেড়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছেন পোপ-এমন অভিযোগও তোলা হয়েছিল।

‘ফিরিয়ে দাও ১০ দিন’ লোগান প্রকম্পিত করেছিল ভ্যাটিকান সিটির সদর দরজা।

তাই এক ঘণ্টা এগিয়ে নেওয়ার সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নেওয়াই ভালো। বিশেষ করে রেডিওর ওই বক্তা যখন দাবি করছেন, আমরা বাঙালি জাতিগতভাবে লেট-লতিফ! রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

187) ছোটবেলার ভাবনা

ছোটবেলায় কত সব উদ্ভট ভাবনাই না আমাদের মাথায় আসত। দেখুন আপনার সঙ্গে মিলে যায় কিনা? ভেবেছেন সিমু নাসের ও মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। নড়াইলে হরতাল

নড়াইল যে একটি জায়গার নাম, সে তো এখন খুব জানি; কিন্তু যখন এটা জানতাম না, তখন একদিন কোনো এক পত্রিকার পাতায় লেখা দেখেছিলাম-নড়াইলে হরতাল। দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম! কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না-কী, নড়াইলে হরতাল? কী এমন জিনিস হতে পারে, যেটা নড়াইলেই হরতাল দিতে হবে? কুশীলব টিভিতে নাটক শুরু হওয়ার আগে স্ক্রিনে নাটকের নাম আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম দেখানোর রীতি তো অনেক পুরোনো। একদিন দেখলাম, নাটকের নাম স্ক্রিনে দেখানো হলো, তারপর লেখা কুশীলব। এরপর যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম দেখাল, তাঁদের তো মোটামুটি চিনতে পারলাম, কিন্তু এই কুশীলবটা যে কে, তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। এরপর আরও অনেক নাটকে এই নাম দেখলেও, সে কোন চরিত্রে অভিনয় করছে, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারিনি। দীর্ঘদিন পর জানতে পারলাম যে কুশীলব কারও নাম নয়, এর অর্থ অভিনেতা-অভিনেত্রী। সদর থানা

সাধারণ জ্ঞানের জন্য বাংলাদেশের সব থানার নাম মুখস্থ রাখার চেষ্টা করেছিলাম। পরীক্ষায় প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়, অমুক থানা কোন জেলায় অবস্থিত। কিন্তু খুব দ্বিধায় পড়ে

গিয়েছিলাম, যখন দেখলাম প্রতিটি জেলায়ই একটি করে থানা আছে, যার নাম সদর থানা। খুব টেনশনে ছিলাম, যদি প্রশ্ন করে সদর থানা কোন জেলায় অবস্থিত, তাহলে কী জবাব দেব! বিদ্যা অমূল্য।

বাংলা বইয়ে পড়েছিলাম, বিদ্যা অমূল্য ধন। ছোটবেলা থেকেই আমি আবার তুখোড় প্রতিভার অধিকারী! তাই বুঝতে দেরি হয়নি যে এই অমূল্য মানে যার কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু এটা বুঝতাম না যে এই মূল্যহীন বিদ্যার জন্য কেন স্যার প্রতিদিন কান ধরিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখতেন, মা মাইক টাইসনের মতো মারধর করতেন! অভিভূত হলাম।

অমুক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে জনাব তমুক অভিভূত হয়ে গেলেন! এমন লাইন বইয়ে পড়ে প্রথম চেষ্টাতেই বুঝে গিয়েছিলাম যে লোকটি ওই ঘটনা দেখে বড় সাইজের কোনো ভূত হয়ে গেছেন। ভূত মানে তো নরমাল সাইজের ভূত কাজেই অভিভূত মানে একটু বড় সাইজের ভূতই হবে বলে আমার বিশ্বাস ছিলো। কি আপনারও ছিল নাকি? আততায়ীর গুলিতে ইতিহাস বইয়ে পড়তাম, অমুক দেশের প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর গুলিতে নিহত, তমুক দেশের প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত। এসব পড়েই মনে মনে খুব ভয় হতো-এই আততায়ী লোকটা তো খুবই ভয়ঙ্কর! সে শুধু সবাইকে খুন করে। জানতে ইচ্ছে হতো এই আততায়ী নামের লোকটা কে, কোন দেশের অধিবাসী। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

188) স্কুলের অঙ্ক

একদিন একটা ছোট ছেলে তার স্কুলের ব্যাগ বগলে নিয়ে দোকানে ঢুকল। দোকানটায় সংসারের খাদ্যদ্রব্যই বিক্রি হয়।

দোকানে তখন বেশ ভিড়। সে দোকানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখতে লাগল। আর নানা রকম আওয়াজ তার কানে আসতে লাগলঃ

-এই যে, মাংসটা নিন। হেরিং মাছ পাবেন সামনের কাউন্টারে। সবাই যদি চর্বি না চান, তাহলে তো মুশকিল-ইত্যাদি সব কথা।

খানিক পরে ছেলেটা সামনের একটা কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারের

কাচের ভেতর দিয়ে দেখল সেলসম্যান বা দোকানি লোকটা আস্তিন গুটিয়ে কাজে খুব ব্যস্ত। ছেলেটা একদৃষ্টে দেখতে লাগল দোকানিকে। দোকানি বেশ চটপট সসেজ (এক রকমের শুয়োরের মাংস) ওজন করে খদ্দেরদের দিচ্ছে।

দোকানি হঠাৎ দেখল, একটা ছেলে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাকে ডেকে বলল, কী চাই খোকা? খদ্দেরদের বলল, একটু সরে গিয়ে বাচ্চাটাকে আসতে দিন তো।

ছেলেটা তার খাতা দেখে বলল, পিওতরকে বলা হলো ১০০ গ্রাম সসেজ আনতে দুই রুবল ২০ কোপেক কিলো হিসাবে।

দোকানি শুনেই একটা কাগজে লিখে নিল, ১০০ গ্রাম সসেজ।

-আর কি চাই, খোকা?

-দেড় শ গ্রাম মাখন তিন রুবল ৬০ কোপেক হিসাবে। ছেলেটা তার খাতা দেখে বলল আবার।

দোকানি বলল, হ্যাঁ, লিখে নিই। ১০০ গ্রাম মাখনের দাম ৩৬ কোপেক, কাজেই আর পঞ্চাশের দাম হচ্ছে ১৮ কোপেক, মোট হচ্ছে ৫৪ কোপেক। আর?

-আর ২০০ গ্রাম মাংস তিন রুবল ৭০ কোপেক কিলো হিসাবে। তা ছাড়া সাতটা লেবু ২৫ কোপেক করে।

-বেশ, ২০০ গ্রাম মাংস, সাতটা লেবু। আর?

-আর কিছু নয়। তাহলে পিওতরকে কত দিতে হবে?

-বলছি, দাঁড়াও। দোকানি কাগজের ফর্দে যোগ দিয়ে বলল, মোট হচ্ছে চার রুবল ১৬ কোপেক। জিনিসগুলো ওজন করে দেব?

-না না। আমি শুধু হিসাবটা জানতে চাইছিলাম। ছেলেটা দিব্যি সরলভাবেই বলল কথাটাঃ মানে, ব্যাপারটা কি জানো, স্কুলে অঙ্কটা দিয়েছে, বেশ শক্ত অঙ্ক। তাই না?

ছেলেটা হিসাবের যোগফলটা তার খাতায় লিখে নিয়ে চলে গেল।

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরই এক মহিলা হস্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ওই দোকানে। গায়ে কমলা রঙের স্কার্ফ, মাথায় ওড়না আর শক্তহাতে ধরা সেই ছেলেটা।

-কোথায় সেই লোক? মহিলা চোঁচিয়ে বলতে

বলতে খদ্দেরের ভিড় ঠেলেঠেলে ঢুকতে

লাগলেন, কোথায়, তাকে দেখা!

-ওই যে কাউন্টারে। ছেলেটা ভয়ে ভয়ে দেখিয়ে
দিল মাকে।

মহিলা কনুইয়ের গুতো মেরে মেরে সেই
দোকানির কাউন্টারের সামনে হাজির হলেন।

বললেন, ওহে, তোমাদের কমপ্লেন-বইটা দাও।

একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ইয়ার্কি করার মজা
বুঝিয়ে দেব তোমাকে।

-কেন, কী হয়েছে ম্যাডাম? দোকানি অবাক
হলো। আমি তো আপনাকে চিনতে পারছিনে?

-আমাকে চেনার দরকার নেই। বলি, এই
ছেলেটাকে চেন? ছেলেটাকে ঠেলে এগিয়ে
দিলেন মহিলা। ছেলেটা স্কুলের অঙ্কের খাতায়
একটা গোছা পেয়েছে, জানো? এই স্তেপান,
দেখা তোর খাতাটা! বলেই মহিলাই খাতাটা
ছিনিয়ে নিয়ে দোকানির নাকের সামনে ধরলেন,
দেখলে, দেখলে ভালো করে?

দোকানি হকচকিয়ে বলল, দেখলাম তো! তা
আমি কী করেছি?

-তার মানে? তুমিই তো করেছ! মহিলা বললেন,
তুমিই তো হিসাব করে বলেছ চার রুবল ১৬
কোপেক। কিন্তু অঙ্কটা কষে দেখ তো, হবে ৩
রুবল ২৫ কোপেক!

এতক্ষণে দোকানি ব্যাপারটা বুঝল।

ঝাঁজ দেখিয়ে বলল, আপনার ছেলের স্কুলের
অঙ্ক দিয়ে আমি কী করব ম্যাডাম? আমি
দোকানের জিনিসের বর্তমান দর হিসেবেই যা
লাগবে তাই বলেছি। এটা দোকান ম্যাডাম, স্কুল
নয়। নাউম ল্যাবকোভস্কিঃ রাশিয়ান রম্যলেকথক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

189) বাজেটীয় ব্যাখ্যা

বাজেট ও বাজেটসংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দ কিংবা
শর্তাবলি সাধারণ মানুষের জন্য প্রায়ই দুর্বোধ্য।

এই দুর্বোধ্য শব্দগুলোর একটু সহজ ব্যাখ্যা
দিতেই এই আয়োজন করেছেন মেহেদী মাহমুদ
আকন্দ। ভর্তুকি

সেই পুরোনো মোবাইলে কি আর এখন প্রেস্টিজ
থাকে! এটা বিক্রি করে নতুন একটি হাইফাই
মোবাইল সেট কিনতে হবে। পুরোনো মোবাইল
বিক্রির টাকার সঙ্গে যে টাকা যোগ করে নতুন
মোবাইল কিনতে হবে সেই টাকা যদি বড় ভাই
কিংবা বড় আপা দেয় তাহলেই সেটা হচ্ছে

মোবাইল খাতে বড় ভাই-আপা কর্তৃক প্রদত্ত
ভর্তুকি। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প
দেশে যত দরিদ্র আছে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে
এদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার প্রকল্পই হচ্ছে
দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। বুঝতেই পারছেন, এই
প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ থেকে দরিদ্রতা দূর না
হলেও কিছু লোকের দারিদ্র্য (?) ঠিকই দূর
হবে। কালো টাকা
কখন ছিনতাইকারী কিংবা প্রেমিকার কবলে
পড়েন সেই ভয়ে আপনি সব টাকা মানিব্যাগে
রাখেন না। কিছু টাকা মানিব্যাগের বাইরে অন্য
কোনো গোপন পকেটে লুকিয়ে রাখেন। যে
টাকার খবর আপনি কারও কাছে প্রকাশ করেন
না-সেই টাকা হচ্ছে কালো টাকা। ট্যাক্স
আপনি নিয়মিত এলাকার এক ছোট বোনকে
দিয়ে আপনার প্রেমপত্রগুলো সঠিক গন্তব্যে
প্রেরণ করেন। এ কাজের জন্য এলাকার ওই
ছোট বোনকে নিয়মিত হারে যে টাকা প্রদান
করতে হয় তাই ট্যাক্স। অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ
পরীক্ষার হলে কলমের কালি শেষ হয়ে গেলে,
ক্যালকুলেটরের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেলে, স্টকে
থাকা নকল কমন না পড়লে পরীক্ষার হলের
বাইরে না গিয়ে আশপাশের কারও কাছ থেকে
ঋণ নিয়ে তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণকে বলে
অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ। ঘাটতি বাজেট
আপনার হাত খরচের টাকা জোগাতে আপনাকে
খুব হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক
ঘাটতির সময়ে কীভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায়,
কার পকেট, কার ভ্যানিটি ব্যাগে হামলা চালানো
যায়-এই অবস্থাকেই বলে ঘাটতি
বাজেট। অনুন্নয়নমূলক ব্যয়
যে সরকারি প্রকল্পে সরকারদলীয় নেতা-
কর্মীদের অবস্থার খুব একটা উন্নয়ন হয় না
সেই প্রকল্পের ব্যয়কে দলীয় নেতা-কর্মীরা
অনুন্নয়নমূলক ব্যয় নাম দিয়েছেন। বৈদেশিক
সাহায্য
নিজ এলাকার মেয়েকে পটানোর জন্য যদি অন্য
এলাকার ছেলেপেলেদের সাহায্য নেওয়া হয়
তবে তাকে বলে বৈদেশিক সাহায্য। লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
যে মাত্রার মধ্যে পাশের বাড়ির বারান্দা থাকলে
চিঠিখানা টিল দিয়ে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব
তাকেই লক্ষ্যমাত্রা বলে। আর সফলভাবে এই

কার্য সম্পাদন করতে পারলেই তাকে বলে
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। দ্রব্যমূল্য
এটি একটি একমুখী প্রবাহ-বাজেটে কমানোই
হোক আর বাড়ানোই হোক বাজারে দ্রব্যমূল্য
সদাসর্বদাই বেড়ে যায়। নিরাপত্তা ব্যয়
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিদেশ থেকে দেশে
ফেরার পর জনরোষ থেকে তাদের নিরাপত্তা
দিতে যে ব্যয় হয় তাই হচ্ছে নিরাপত্তা
ব্যয়। গরিব মারার বাজেট
এটি একটি কাল্পনিক ধারণা। প্রবাদ-প্রবচনও
বলা যেতে পারে। যখন যে দলই বিরোধী দলে
থাকুক না কেন তারা বাজেট সম্পর্কে যেসব
মন্তব্য করে তার মধ্যে খুবই কমন একটি উক্তি
হচ্ছে গরিব মারার বাজেট। আমদানি শুদ্ধ
ফুলদানিতে ফুলের মতো আমদানিতে আম
রাখার জন্য পাশের বাগানের মালীকে আম
সরবরাহ বাবদ যে ঘুষ দিতে হয় তা-ই হচ্ছে
আমদানি শুদ্ধ। অর্থনৈতিক মন্দা
অর্থনৈতিক মন্দা হচ্ছে এমন এক অর্থনৈতিক
অবস্থা যখন এলাকার সব দোকানের হটলিস্টে
আপনার নাম থাকবে। কারণ দোকানগুলোর
বাকির খাতায় সর্বোচ্চ বাকি রাখার রেকর্ডের
দৌড়ে আপনি যথেষ্টই এগিয়ে
থাকবেন। উচ্চাভিলাষী বাজেট
ঈদকে সামনে রেখে গৃহকর্ত্রী যখন একক
কর্তৃত্বে ঈদ মার্কেটিংয়ের বাজেট ঠিক করে
তখন সেই বাজেটই হয় উচ্চাভিলাষী বাজেট।
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

190) একটি অন্য রকম বাজেট

বক্তৃতা

প্রতিবছর বাজেট মানেই একটি নাতিদীর্ঘ
‘বাজেট বক্তৃতা’। সেই বক্তৃতা অনেকের কাছে
এতই দুর্বোধ্য ও বোরিং মনে হয় যে অনেকেই
তা শুনতে চায় না। কিন্তু বাজেট বক্তৃতাটি একটু
অন্য রকম হলে তা হয়ে উঠত বেশ জনপ্রিয়।
সে রকমই একটি কাল্পনিক বাজেট বক্তৃতার
নমুনা জানাচ্ছেন মহিতুল আলম ও
ফাল্গুনী। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটের পূর্ণ
বিবরণ

মাননীয় স্পিকার

১। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে আষাঢ়ে
বৃষ্টিস্নাত সুন্দর এক বিকেলে আমাকে বাজেট
উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে

ধন্যবাদ। জ্যৈষ্ঠের রসাল ফল এখন দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। এমন মনোরম সময়ে বাড়িতে ফলোৎসব না করে আমি দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছি।

২। বাংলাদেশে সমস্যার কোনো শেষ নেই। এই সমস্যাগুলো সমাধানের অনেকটাই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের ওপর দিয়ে ‘আইলা’ চলে গেলেও আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। বিশ্বমন্দা

মাননীয় স্পিকার

৩। ‘আইলা’ শুধু আমাদের দেশ নয়, বলা যায় বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনীতির মধ্যেই বিরাজমান। বিশ্বমন্দার কারণে আমেরিকাই যেখানে নাজেহাল সেখানে তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়তে পারে। কিন্তু আমরা তা পড়তে দিইনি।

শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৪। বরাবরের মতো এবারও সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। ...শিক্ষার কথা যখন এলই তখন শিক্ষা নিয়ে দু-একটা জোকস না বললেই নয়-

ক. শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমাকে শিক্ষা ও টাকা দুটির মধ্যে একটি নিতে বললে কোনটি নেবে?

ছাত্রঃ টাকা।

শিক্ষকঃ টাকা? আমি হলে কিন্তু শিক্ষাই নিতাম।

ছাত্রঃ স্যার, যার যা অভাব সে তো তাই নেবে!

খ. শিক্ষকঃ ৫টা প্রাণীর নাম বলো।

ছাত্রঃ স্যার, চারটা হাতি আর একটা বিড়াল!

মাননীয় স্পিকার

৫। নোট বই পড়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় কৌতুকটির মতোই ভুল শিক্ষা লাভ করছে।

তাই আমরা পাঠ্যবই ফ্রি দেব। যোগাযোগ খাত

মাননীয় স্পিকার

৬। দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে রাস্তা রয়েছে ০.৭ কিমি। আমাদের উচিত রাস্তা চওড়া করা এবং আরও সেতু নির্মাণ করা। সেতু প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে গেল-

জনৈক ড্রাইভার আহত হয়ে হাসপাতালে

আছেন। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি

এভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন কেন?

ড্রাইভারঃ আসলে আমি প্রথমে দেখলাম একজন মানুষ, তাকে সাইড দিলাম, তারপর দেখলাম একটা ছাগল, তাকে সাইড দিলাম। এরপর একটি সেতু দেখলাম, তাকেও সাইড দিতে গিয়েই এ অবস্থা।

৭। আমাদের বাজেটকে সবাই সব সময় ‘গরিব মারা বাজেট’ বলে থাকে। তাই আমরা এবার একটি ‘বড়লোক মারা বাজেট’ প্রণয়ন করতে চাই। এরই ধারাবাহিকতায় আমি গাড়ির দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিচ্ছি। স্বাস্থ্য খাত মাননীয় স্পিকার

৮। স্বাস্থ্য খাতে এবার আমি ব্যাপক জোর দেওয়ার প্রস্তাব করছি।...আমাদের এ বাজেট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে বলে আশা করছি-কৃষি মাননীয় স্পিকার

৯। কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো এখন অতীব জরুরি। তাই আমরা কৃষি খাতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে প্রস্তাব করছি। এতে খরচ হবে...এ বাজেট বাস্তবায়িত হলে কৃষকেরা কুদ্দুস বয়াতির ওই বিজ্ঞাপন চিত্রের মতোই হাসবে আর গাইবে। ১০। তা ছাড়া এখন মানুষ কৃত্রিম পণ্য খেতে খেতে ভুলে গেছে সত্যিকার কৃষিজ ফসলের স্বাদ। অনেকেই বাজেটের সঙ্গে মুলা ঝোলানোর তুলনা করেন। আমরা তাঁদের জন্য দেখাতে চাই একটি আসল মুলার ছবি। তথ্যপ্রযুক্তি মাননীয় স্পিকার

১১। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আমি কম্পিউটারের দাম কমানোর প্রস্তাব করছি। কম্পিউটার প্রসঙ্গে একটি জোকস তবে বলেই ফেলি-

ইন্টারভিউয়ের সময় প্রশ্নকর্তা জানতে চাইলেন, আপনার স্পিড কত?

কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি প্রার্থী বললেন, ২৫।

প্রশ্নকর্তা বললেন, মাত্র ২৫।

প্রার্থীর জবাব, সরি। মিনিটে এর চেয়ে বেশি ভুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তামাক ও তামাকজাত পণ্য

মাননীয় স্পিকার

১২। দেশের যুবসমাজকে সিগারেট ও মাদকের

হাত থেকে বাঁচানো জরুরি।...তাই আমি সিগারেটের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। এমনিতেই সিগারেটের কুফল সম্পর্কে সবাই জানে। যা হোক, বাজেটের এ পর্যায়ে আমি নিচ্ছি ‘পান সুপারি বিরতি’। বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসব।

মাননীয় স্পিকার

১৩। বিরতির পর আবারও স্বাগতম। আমি যে বাজেট প্রস্তাব করলাম সে সম্পর্কে যে কেউ পরামর্শ দিতে পারেন। আমরা সেগুলো গ্রহণ করব। এ ব্যাপারে ফেসবুকে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। মাননীয় স্পিকার

১৪। আশা করি, বাজেটের মতো জটিল একটি বিষয় আমি অনেক সহজ করে বুঝিয়েছি। এই দীর্ঘ বক্তৃতায় আপনিসহ আপামর জনগণ তথ্যের সঙ্গে বিনোদনও পেয়েছে। এতে জনগণ নিশ্চয়ই বাজেটের পুরোটা বুঝতে পেরেছে। কারণ যে তথ্য বিনোদনের সঙ্গে পরিবেশিত হয় না, সেটা মানুষ নিতে পারে না। স্বাধীন বাংলায় এই প্রথম আমরাই কেবল তা পেরেছি। বিগত সরকারগুলো কিন্তু তা পারেনি। ১৫। বাজেট প্রস্তাবনা এখানেই শেষ হলো। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৫, ২০০৯

191) সাধারণ বিষয়ে সাধারণের

উদ্দেশ্যে

বুয়েটের মধুর কিছু স্মৃতি মনে উঁকি দিচ্ছে। বুয়েটের পোস্টারিং সংস্কৃতি কী অকৃত্রিম বিনোদনটাই না দিয়েছে আমাদের! বুয়েটে বেশ কিছু আন্দোলন আমরা পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম মানে করেছিলামও। যেমন ২০০৫-এ বন্যা আন্দোলন। অবশ্য এসব আন্দোলন একটা চূড়ান্ত দাবিতে গিয়েই ঠেকত। পরীক্ষা পেছানো। (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বেশির ভাগ আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত হয়ে যেত পরীক্ষা পেছানো আন্দোলন। আর আন্দোলন মানেই আমাদের হলগুলোর ডাইনিংয়ের সামনে যে দীর্ঘ টেবিল, তা ভরে উঠত পোস্টারে পোস্টারে। প্রতিটি পোস্টারেই বিভিন্ন দাবিদাওয়া এবং সব পোস্টারের শেষেই প্রচারক হিসেবে লেখা থাকত ‘বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রী’ কথাটা। ব্যাপারটা এমন, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো ছাত্রের মনে হলো, পিএল (পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার ছুটি) আরও চার

সপ্তাহ বাড়ুক। তো, সে একটি পোস্টার লিখবে। পোস্টারের বক্তব্য হবে-এই সংকটময় মুহূর্তে কোনোভাবেই পরীক্ষা দেওয়া যায় না। অতএব পিএল আরও চার সপ্তাহ বাড়ানো হোক। পোস্টারের নিচে লিখে দেবেন ‘প্রচারে-বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রী’! ২০০৬-এর ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বুয়েটে দীর্ঘবিস্তৃত আন্দোলন হয়েছিল। বিশ্বকাপ ফুটবল দেখব, তাই পরীক্ষা দেব না-এটাই আন্দোলনের মূলমন্ত্র। পুলিশও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। আন্দোলনকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে, ‘মৃদু’ লাঠিচার্জও করেছে। এ রকম হুল্লোড়ময় এক সন্ধ্যায় আমি শেরেবাংলা হলের দ্বিতীয় তলার টয়লেটের দিকে এগোচ্ছিলাম। শেরেবাংলা হলের এই ফ্লোর থেকে নিচের রাস্তা সরাসরি দেখা যায়। তো দেখি, সেই রাস্তা ধরে আমার প্রিয় বন্ধু আমিন হেঁটে আসছে। লম্বা, টিংটিঙে; একটু বাঁকাত্যাড়া হয়ে সে হাঁটে। নিচ থেকে আমাকে দেখেই হাঁক ছাড়ল। তার গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ, ‘...এর পুত, বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা পুলিশের লাঠির বাড়ি খাইতেছে, আর তুমি এইখানে খাড়ায় খাড়ায় তামশা দেখো!’ একটু ভড়কে গেলাম। নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী লাগতে শুরু করল। বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি? কিন্তু তখনো ঘটনার পরিহাসময় অংশটা জানতে পারিনি। সেটা জানতে পারলাম আন্দোলন ঠান্ডা হওয়ার পর। ব্যাপারটা হলো, সাধারণ ছাত্র বিষয়ে ডায়ালগ দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমিন আসলে নিজেই পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়ে হলে ফিরছিল! ‘সাধারণ’ শব্দটা নিয়ে একটি যুগান্তকারী আইডিয়া বের করেছিল শেরেবাংলা হলের আমার আরেক বন্ধু রানা। সে একটি কোম্পানি খুলবে, যার নাম হবে ‘সাধারণ কেমিক্যাল কোম্পানি’। এই কোম্পানির আয়ের মূল উৎস হবে মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা। কীভাবে? দাঁড়ান, খুলে বলি। ‘সাধারণ কেমিক্যাল কোম্পানি’ সাবান, শ্যাম্পু, পাউডার, ক্রিম সবই তৈরি করবে। সব পণ্যের নাম হবে ‘সাধারণ’। মানে ‘সাধারণ সাবান’, ‘সাধারণ শ্যাম্পু’, ‘সাধারণ টয়লেট ক্লিনার’-এ রকম আর কি। এতে ফায়দাটা কী? খেয়াল করে দেখবেন, টেলিভিশনে সাবান, শ্যাম্পু যারই বিজ্ঞাপন

দেখানো হোক না কেন, সেখানে সাধারণ সাবান, সাধারণ শ্যাম্পুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। যেমন-‘আমাদের এই সাবান সাধারণ সাবানের চেয়ে দ্বিগুণ ময়লা সাফ করে’; কিংবা ‘সাধারণ টয়লেট ক্লিনার যেখানে ৭০ ভাগ জীবাণু সাফ করে, সেখানে আমাদের কোম্পানির টয়লেট ক্লিনার জীবাণু সাফ করে শতকরা ১০০ ভাগ’। রানার কোম্পানি বাজারে আসামাত্র অন্য সব কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করবে। কারণ, সবাই ‘সাধারণ সাবান’ কিংবা ‘সাধারণ টয়লেট ক্লিনার’-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত! সেই মামলার ক্ষতিপূরণ বাবদ আয়টা কত হতে পারে, একবার ভেবে দেখুন। আবার আমিনের ঘটনায় ফিরি। নিজেকে সাধারণ ভাবা কিন্তু বিশেষ একটি ব্যাপার। আমরা কেউই নিজেদের সাধারণের দলভুক্ত করতে চাই না। আপনি একজন ঘুষখোর সরকারি কর্মচারীর সামনে বলুন যে সরকারি কর্মচারীরা সাধারণত ঘুষ খান-ব্যাপারটাকে তিনি অপমান হিসেবে নেবেনই না। কারণ, সাধারণে যা করে তাতে তাঁর কী আসে-যায়? তিনি তো আর সাধারণ নন! আমরা যখন বলি, জনসাধারণ রাস্তা ময়লা করে, শব্দদূষণ করে, পরিবেশ দূষণ করে-তখন কিন্তু আমরা নিজেদের দিকে ফিরে তাকাই না। অথচ জনসাধারণকে গালি দেওয়া মানে তো নিজেকেও গালি দেওয়া। কবে যে আমরা নিজেদের ‘সাধারণ’ ভাবতে শিখব! তানিম হুমায়ুন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২, ২০০৯

192) পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ

সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা সংবাদ শেষ করার সময় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কথা হচ্ছে, পরবর্তী সংবাদ যে আমরা দেখব, তার কী নিশ্চয়তা? অথচ কত আয়োজন করেই না তাঁরা পরিবেশন করেন সংবাদটা। আমরা না দেখলে সব মাটি। আমাদের আকৃষ্ট করার জন্য তাই তারা পরবর্তী সংবাদের জন্য বলে যেতে পারেন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা। ভেবেছেন ইকবাল খন্দকার। পরবর্তী সংবাদ যিনি পড়বেন, তাঁর ব্যাপারে বলতে পারেন-
- তিনি যে শাড়িটা পরে সংবাদ পড়তে আসবেন, সেটা সরাসরি আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়েছে। এটি পরে এর আগে

তিনি আর কোথাও যাননি। শাড়িটি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাইলে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখুন।

- আমাদের এই সংবাদ পাঠিকার হাসি এমনই মারাত্মক যে অনেকেই বলে থাকেন, ঐশ্বরীয়া নাকি লবিং করে বিশ্বসুন্দরী হয়েছেন। নইলে তাঁরই হওয়ার কথা ছিল। লোকজনের এই কথাটা সত্য কি না, এটা প্রমাণ করার জন্য পরবর্তী সংবাদটা দেখুন।

- তিনি অতিমাত্রায় মিশুক। না না, মিশুক বলতে ওই টেম্পোর কথা বলছি না। বলছি, তিনি খবরের ৩০ সেকেন্ড পরপরই 'প্রিয় দর্শক' বলে সম্বোধন করবেন। অর্থাৎ আপনার প্রিয় হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। যিনি রিপোর্ট করবেন, তাঁর ব্যাপারে-

- সংবাদ পাঠকেরা যেখানে উচ্চারণের কোর্স করে থাকেন, আমাদের রিপোর্টারও ঠিক সেখানেই কোর্স করেছিলেন। সার্টিফিকেট আছে। এবার বুঝুন তাঁর রিপোর্টটা কেমন হবে।

- আমাদের রিপোর্টার বাংলা রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজিতে দু-চারটা বাক্য বলে ফেলারও যোগ্যতা রাখেন এবং সেগুলো শুদ্ধ।

- 'আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন' বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনে ফেলেন। তাঁর কানে ময়লা নেই।

- এ ছাড়া স্ক্রিনে আমাদের রিপোর্টারের চেহারা মোটামুটি ভালোই আছে। গালের ব্রণের দাগগুলো একদম দেখা যায় না। খবরের ফাঁকে ফাঁকে যেসব বিজ্ঞাপন যাবে, সেগুলোর ব্যাপারে-

- কোনো কোনো খবর দেখে আপনি মানসিকভাবে পেরেশান হয়ে ঘেমে যেতে পারেন। তখনই আমরা প্রচার করব টিস্যু অথবা রুমালের বিজ্ঞাপন।

- কোনো কোনো খবর দেখে আপনি আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারেন। আপনার এই অবস্থার কথা মাথায় রেখে আমরা প্রচার করব কম্বলের বিজ্ঞাপন।

- কিছু কিছু খবর আপনার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে, যে কারণে ছুটে যেতে পারে রাতের ঘুম। নো টেনশন। আমরা প্রচার করব আরামদায়ক ফোমের বিজ্ঞাপন। ঘুম আসবেই।

- কোনো কোনো খবর শুনে রাগে-ক্ষোভে আপনার মরে যেতে ইচ্ছে হতে পারে। তখন

আমরা দেব ইঁদুরের বিষের বিজ্ঞাপন। রাগ মেটাতে হয়তো খাবেন, তবে মরবেন না। খবরের সত্যতার ব্যাপারে-

- আমরা সরকারের চামচামি করে সংবাদ পরিবেশন করি না, বরং সরকারকে খোঁচা দিই। কারণ বেশ কয়েকবার আমাদের চ্যানেলের মালিক তাঁর এলাকা থেকে নমিনেশন চেয়ে পাননি।

- আমাদের খবর সবার আগে। এমনকি কোনো কোনো খবর ঘটনা ঘটার আগেই আমরা অনুমানের ওপর করে ফেলি। এ জন্য জ্যোতিষীর সহায়তা নিই।

- আমাদের খবর কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে করবেন। এতে সমস্যা হয় হবে; চাকরি চলে যায় যাবে। আমরা ভয় পাই নাকি? অন্য জায়গায় বেশি বেতনে চাকরি রেডি আছে। খবরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে-

- আমাদের সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা অন্যদের তুলনায় উচ্চ আওয়াজে খবর পাঠ করেন, যে কারণে কষ্ট করে আপনাকে টিভির ভলিউম বাড়াতে হবে না।

- আমাদের খবরের আগে-পরে এমনকি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে জবরদস্ত মিউজিক বাজানো হয়। এমন মিউজিক আপনি মাইকেল জ্যাকসনের সিডিতেও পাবেন না।

- শুরুতে একবার শিরোনাম, যাওয়ার আগে একবার শিরোনাম, প্রতি বিজ্ঞাপন বিরতিতে একবার করে শিরোনাম বলা হয়। এত শিরোনাম সুবিধা আর কেউ দেবে না।

- আমাদের খবরের নিচ দিয়ে ব্রেকিং নিউজ ভাসতেই থাকে, ভাসতেই থাকে। আর হ্যাঁ, এগুলোয় কোনো বানান ভুল থাকে না। অতএব বাচ্চাদের এগুলো দেখিয়ে বানান শেখাতে পারবেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২, ২০০৯

193) মোবাইল ফোন কোম্পানির বর্ধিত সেবা

মোবাইল ফোন কোম্পানি আমাদের নানা রকম সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকেই যাচ্ছে। এসব সুবিধার অংশ হিসেবে তারা যদি এ বিষয়গুলো স্পষ্ট করত-বন্ধ নম্বরে ফোন করলে ‘এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না’ বলেই তারা খালাস। কেন সম্ভব

হচ্ছে না, সেটি তারা পরিষ্কার করতে পারত এসব বিষয় উল্লেখপূর্বক-

- তার চার্জার নষ্ট। চার্জ দিতে না পারায় মোবাইল ফোন বন্ধ। তাই সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

- তার কাছে বহু লোকে টাকা পায়। কোনো পাওনাদার ফোন করে কি না, এই ভয়ে বন্ধ রেখেছে। কীভাবে সংযোগ দিই!

- মোবাইল ফোনটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছে তো। চাপ লেগে কখন জানি বন্ধ হয়ে গেছে। টের পায়নি।

- তিন-চার রাত দাঁত ব্যথায় ঘুমাতে পারেনি। তাই এখন মোবাইল ফোন বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে।

- তার মোবাইল ফোন চুরি হয়ে গেছে। চোরেরা সিমকার্ড খুলে ফেলেছে। আমরা কীভাবে সংযোগ দিই, বলুন। আজকাল মোবাইল ফোন কোম্পানি যে বাড়তি সুবিধাটা দিচ্ছে, তা হচ্ছে দেখার সুবিধা। যেমন, অমুক চ্যানেলের খবর দেখার সুবিধা, অনুষ্ঠান দেখার সুবিধা ইত্যাদি। এ সেবার পরিধি বাড়ানো যায় এভাবে-

- ডায়াল করুন এবং দেখুন আপনার প্রেমিকা এখন কার সঙ্গে বসে চিনাবাদাম খাচ্ছে।

- ডায়াল করে দেখে নিন বাসায় রেখে আসা আপনার জামার পকেট থেকে আপনার বউ নোট সরানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে কি না।

- ডায়াল করুন এবং দেখুন পাশের ঘরে আপনার সন্তান পড়ছে, নাকি টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমাচ্ছে, নাকি কাঁথার নিচে মাথা ঢুকিয়ে কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে ফুসুরফাসুর করছে।

- নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করে দেখুন আপনার মেয়ের বিয়েতে আসা মেহমানেরা চায়ের কাপ বা পানির গ্লাস পকেটে ঢোকাচ্ছে কি না।

- ডায়াল করে দেখে নিন, আপনার ফাইল এখন কোন টেবিলে, কোন অবস্থায়

আছে। কারও কাছে এসএমএস পাঠালেন। সেই এসএমএস যে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই রিপোর্ট আসে। তবে যাঁর কাছে পাঠিয়েছেন, তিনি ঠিকঠাকমতো পড়েছেন কি না, সেটা জানা যায় না। মোবাইল ফোন কোম্পানি সেটা বিস্তারিত জানাতে পারে এভাবে-

- ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ায় আপনার এসএমএস তিনি পড়তে পারেননি পুরোপুরি।

ডিকশনারি খুঁজছেন।

- চশমাটা পাচ্ছেন না। তাই পড়তে আরও

কিছুক্ষণ বিলম্ব হতে পারে।

- সাইলেন্ট করা আছে মোবাইল ফোন। তাই

আপনার এসএমএস এখনো টের পাননি।

- আপনার এসএমএস পড়তে গিয়ে ভুল বাটনে

টিপ দিয়ে ভুল করে ডিলিট করে ফেলেছেন।

- আপনার পাঠানো এসএমএসটা তিনি

পড়েছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তরও দেবেন,

ওয়েট। আপনি যাকে ফোন দিয়েছেন তাঁর নম্বর

খোলা। তবু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না।

কারণ ফোন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফোনে

লেখা উঠেছে ‘নম্বর বিজি’ অথবা ‘ওয়েটিং’।

তারা যদি এ লেখাগুলো বিস্তারিত লেখে-

- এ ব্যস্ততা কতক্ষণ থাকবে, আমরা বলতে

পারছি না; যতক্ষণ তিনি কথা চালিয়ে যাবেন,

ততক্ষণ ব্যস্ত থাকবে। আর তিনি যেহেতু নিজের

টাকায় কথা বলছেন, আমরা তো না করতে

পারি না।

- ওয়েটিং লেখা উঠেছে, ওয়েট করতে থাকুন।

ওয়েটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও করতে পারেন,

আরামকেদারায় বসেও করতে পারেন।

- রেলস্টেশনে ওয়েটিং রুম থাকে। কিন্তু কল

ওয়েটিংয়ের জন্য আপনাকে আমরা কোনো

ওয়েটিং রুম দিতে পারছি না বলে দুঃখ প্রকাশ

করছি। আজকাল কোনো সমস্যাই যেন সমস্যা

নয়। কৃষি সমস্যা বলেন আর

রোগবলাইসংক্রান্ত সমস্যা বলেন, নির্দিষ্ট নম্বরে

ডায়াল করামাত্রই সব সমাধান মিলে যায়।

নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করে আরও সেবা পাওয়া

যেতে পারে এসব বিষয়ে-

- টয়লেটের ছিটকিনি নষ্ট? এটা কোনো

সমস্যাই নয়। ছিটকিনির জায়গায় একটা কাঠি

অথবা কালিবিহীন কলম ঢুকিয়ে দিন। কাজ

চলে যাবে।

- খুব মশা কামড়াচ্ছে? নো টেনশন। পাশের

মুদি দোকানির সঙ্গে কথা বলুন। তিনি গোল,

প্যাঁচানো একটা জিনিস দেবেন। দেশলাই দিয়ে

জ্বালান।

- ভাত কাদা কাদা হয়ে যাচ্ছে? কোনোভাবেই

ঝরঝরে হচ্ছে না? মেন্যু পাল্টান। খিচুড়ি রান্না

করুন। এ ধরনের আতঙ্ক পোহাতে হবে না।

- শার্টের বোতাম খুলে গেছে? এর জন্য আবার

● <http://facebook.com/tanbir.cox>

ফোন করতে হয়? বাড়িতে সুই নেই? ইকবাল
খন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২, ২০০৯

194) এর উত্তর কে দেবে!!!

আমাদের মনে প্রায়ই অনেক উদ্ভট প্রশ্ন জাগে,
যার উত্তর খুঁজে পাই না। কাউকে জিজ্ঞাসা
করলে বলে, ‘বোকার মতো প্রশ্ন কোরো না।’

ইন্টারনেট অবলম্বনে তেমনই কিছু বোকার
মতো প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন মুনাস

ইকবাল।- আমরা ঘুম আনার জন্য চোখ বন্ধ
করে ভেড়ার পালের ভেড়া গুনি। তাহলে
ভেড়ারা ঘুমানোর জন্য কী গোনেন?

- আমরা বাজারে গেলেই দেখি ‘ফ্রি’ গিফটসহ
পণ্য। সব গিফট কি ফ্রি নয়?

- বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যাটারি
দ্বারা চলে, কিন্তু ব্যাটারি কিসে চলে?

- আলোর গতিবেগ রয়েছে, শব্দেরও গতিবেগ
রয়েছে। সে ক্ষেত্রে গন্ধের কি কোনো গতিবেগ
আছে?

- আমরা প্রায়ই রং নম্বরে কল করি। রং নম্বর
কেন কখনো ব্যস্ত থাকে না?

- রোমান অঙ্করে আমরা নম্বর ও, ওও, ওওও
লিখি, বলুন তো শূন্য (০) লেখে কীভাবে?

- যখন প্রথম ঘড়ি তৈরি করা হলো, তখন তারা
কীভাবে জানল যে সময় কততে সেট করতে
হবে?

- ‘রেস্টরুম’কে কেন আমরা রেস্টরুম বলি,
যখন সেখানে আমরা কেউই রেস্ট নিই না?

- অভিধানে যদি ভুল বানান থাকে, তাহলে
আমরা বুঝব কী করে?

- মেয়েরা কেন মাসকারা দেওয়ার সময় চোখ
বন্ধ করে রাখে?

- ফ্রিজের ডালা খুললেই বাতি জ্বলে ওঠে, কিন্তু
ডিপ ফ্রিজে কেন বাতি থাকে না?

- ‘কর্ন অয়েল’ যদি কর্ন থেকে আসে,
‘ভেজিটেবল অয়েল’ যদি ভেজিটেবল থেকে
আসে, তবে ‘বেবি অয়েল’ কোথা থেকে আসে?

- কেউ যখন বলে আকাশে কোটি কোটি তারা
আছে, আমরা তা সহজেই বিশ্বাস করি। কিন্তু
যখন বলা হয় এখানে কাঁচা রং রয়েছে, আমরা
কেন তা সব সময় ছুঁয়ে দেখি?

- গ্রিনল্যান্ডের নাম গ্রিনল্যান্ড কেন হলো, যখন
পুরোটাই সাদা বরফে ঢাকা?

- যদি একটি অ্যামুলেস কাউকে বাঁচানোর জন্য যাওয়ার পথে কাউকে ধাক্কা মারে, তবে কি তা ওই লোকটিকে বাঁচানোর জন্য থামবে?
 - ‘মিনারেল ওয়াটার’ বলা হয় ঝরনার সুমিষ্ট প্রাকৃতিক পানিকে। তা-ই যদি হয়, তাহলে যে পানি যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি ঝরনাধারায় থাকে, সেটি বোতলে ঢুকলেই কেন এক্সপায়ার ডেট দেওয়া হয়?
 - আমরা কেন সব সময় চুলকানো বা খামচি ওপর থেকে নিচের দিকে দিই?
 - কেন ব্যাংকে দরজা খুলে রাখা হয়, কিন্তু ভেতরে কলম সুতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়?
 - কেন আমরা রিমোটের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে জেনেও জোরে জোরে বোতাম টিপতে থাকি?
 - ‘কমলা’কে যদি কমলা বলা হয়, ‘লেবু’কে কেন সবুজ বলা হয় না?
 - প্লেনের ‘ব্ল্যাক বক্স’টি কখনোই ধ্বংস হয় না, সে ক্ষেত্রে পুরো প্লেনটি কেন এই উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় না?
 - কেন লেমন জুস তৈরি করা হয় আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভার ব্যবহার করে, অথচ ‘ডিশওয়াশিং লিকুইড’ তৈরি করা হয় আসল লেবুর নির্যাস থেকে?
 - আমরা যখন গাড়ি চালানোর সময় কোনো ঠিকানা খুঁজতে থাকি, তখন রেডিওর সাউন্ড কমিয়ে দিই কেন?
 - টারজানের কেন দাড়ি থাকে না? **সূত্রঃ**
- দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২, ২০০৯

195) চুরি করতে গিয়ে

সিঁধেল চোরটা টপ করে জানালার ভেতরে ঢুকে পড়ল, তারপর সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল। সুদক্ষ সিঁধেল চোররা কখনো তাড়াহুড়া করে না।

চোরটা একটা সিগারেট ধরাল।

মুখোশ পরেনি সে, পায়ে রবারের জুতাও নেই। খালি একটা ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার তার পকেটে।

খুব বড় কিছু চুরি করার আশায় আসেনি সে। আইনত যেটুকু তার ব্যবসার পক্ষে লাভজনক, তার বেশি আর সে কিছু স্পর্শ করবে না। সে দেখতে পেল জানালাটা খোলাই রয়েছে। এ সুযোগ সে গ্রহণ করল।

বাড়ির মালিক বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন।

ড্রেসিংটেবিলের ওপরে অনেক জিনিস এলোপাতাড়ি ছড়ানো। চোরটি ড্রেসিংটেবিলের দিকে তিন পা এগিয়েছে, এমন সময় ভদ্রলোক একটা গোঙানির শব্দ করে চোখ খুললেন। তিনি তাঁর ডান হাতটা বালিশের তলায় ঢোকালেন কিন্তু বের করার সময় পেলেন না।

চোরটি কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, ‘নড়বেন না।’ প্রথম শ্রেণীর চোরদের মতো তৃতীয় শ্রেণীর সিঁধেল চোররা ‘হিস’ শব্দ করে চুপ করায় না; বিছানায় শোয়া ভদ্রলোকটি চোরের রিভলবারের গোল মাথাটার দিকে চেয়ে যেমন ছিলেন তেমনিই রইলেন।

চোর হুকুম করল, ‘হাত উঁচু করুন।’ বিরক্ত মুখে ভদ্রলোকটি বিছানায় উঠে বসে তাঁর ডান হাতটা মাথার ওপরে তুললেন।

চোর হুকুম করল, ‘অন্য হাতটাও তুলুন।’ ভদ্রলোক মুখটা বিকৃত করে বললেন, ‘ও হাতটা তুলতে পারি না।’

‘কেন, ওতে কী হয়েছে?’

‘কাঁধে বাতের মতো হয়েছে।’

‘ফুলেছে?’

‘ফুলেছিল, কিন্তু এখন ফোলাটা গেছে।’

চোরটি ভদ্রলোকের দিকে রিভলবারটা ধরে দু-এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে একবার ড্রেসিংটেবিলের ওপরে মালগুলোর দিকে চেয়ে দেখল, পরে একটু আধা অপ্রস্তুত হয়ে বিছানার ওপর ভদ্রলোকটার দিকে দেখল। পরে হঠাৎ একটা অদ্ভুত মুখোভঙ্গি করে হাসল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন। বললেন, ‘ও রকম করে আমার দিকে চেয়ে ঠাট্টা কোরো না। চুরি করতে এসেছ তো করো না। ওই তো কয়েকটা জিনিস পড়ে রয়েছে।’

চোরটি বলল, ‘আমাকে মাফ করবেন। আমারও একটু বাতের ব্যথা উঠল এখনই।’

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ‘কত দিন হলো তোমার বাত হয়েছে?’

‘চার বছর।’

ভদ্রলোক একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কখনো ঝুমঝুমি সাপের তেল ব্যবহার করেছিলে?’

সিঁধেল চোরটি বলল, ‘পিপে পিপে ব্যবহার করেছি। আমি যত সাপের তেল ব্যবহার করেছি, সেগুলো যদি যোগ করা হয়, তাহলে

এখান থেকে শনিগ্রহ যত দূর তার আট গুণ লম্বা হবে, আর ঝুমঝুমির শব্দ ইন্ডিয়ানার ভ্যালপ্যারিসো পর্যন্ত শোনা যাবে; আবার তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসবে।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘কেউ কেউ চিজেলামস পিল ব্যবহার করে।’

চোরটি বলল, ‘একেবারে বাজে, পাঁচ মাস আমি খেয়েছি, কিছু হয়নি। আমি এক বছর ফিঙ্কেলহ্যামস একস্ট্রাক্ট, বাম-অফ-জিলেড-পুলটিস আর পটস পেন-পালভারাইজার ব্যবহার করে একটু আরাম পেয়েছিলাম।’

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ‘ব্যথাটা তোমার রাতে বাড়ে, না সকালে?’

চোরটি বলল, ‘রাতে, আর ঠিক ওই সময়টাতেই আমার কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, এবার আপনার হাতটা নামিয়ে নিন। একটা কথা-আপনি কখনো ব্লিকারস্টাফর ব্লাড-বিল্ডার ব্যবহার করে দেখেছেন?’

‘না, আমি কখনো ব্যবহার করিনি। তোমার ব্যথাটা কি মাঝেমধ্যে হয়, না সব সময়ই লেগে আছে?’

চোরটি বিছানার পায়ের দিকে বসল, তার রিভলবারটা তার নিজের জোড়া হাঁটুর ওপর রাখল।

বলল, ‘এটা হঠাৎ হয়। যখন হওয়ার কোনো কথা নয়, তখনই হয়তো ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠে। সে জন্য দোতলা বাড়িতে আমি চুরি করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, কয়েকবার মাঝখানেই আটকে গিয়েছিলাম। তবে আপনাকে বলি-আসলে ডাক্তাররাও বলতে পারেন না কিসে এ রোগ সারে।’

‘ঠিক বলেছ, আমি প্রায় হাজার ডলার খরচ করেছি, কিন্তু কোনো উপকার পাইনি। তোমার ফোলে?’

‘হ্যাঁ, সকালবেলাটা, আর যখন বৃষ্টি হয়, সে যে কী কষ্ট!’

ভদ্রলোক বললেন, ‘আমারও। সামান্য এক ঝাপটা জোলো হাওয়াও কখন ফ্লোরিডা থেকে এখানে রওনা দিতে শুরু করল তা আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি। আর ম্যাটিনি-শোর দিনে থিয়েটারের পাশ দিয়ে যদি কখনো যাই তো ভেতরের এয়ারকন্ডিশনারে ঠান্ডা হাওয়া আমার হাতে এসে লাগলে এমন কনকনানি হয়

যে আমি একেবারে দাঁতের ব্যথার মতন লাফিয়ে উঠি।’

সিঁধেল চোরটি বলল, ‘যাকে বলে একেবারে নরক-যন্ত্রণা।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘তুমি ঠিক বলেছ।’

চোরটি এবার তার রিভলবার পকেটে পুরে একটু আরাম করে বসল।

বলল, ‘আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, কখনো অপোডেলডক ব্যবহার করেছেন?’

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বললেন, ‘বাজে, তার চেয়ে রেস্টুরেন্টের মাখন মাখা ভালো।’

চোর একমত হলো, বলল, ‘ঠিক বলেছেন, বাচ্চা ছেলেদের বেড়ালে আঁচড়ে দিলে সেখানে

লাগালে কাজ হয়। ওসব জিনিসে আমাদের কাজ হবে না, এই আপনাকে বলে রাখছি।

একটা জিনিসে শুধু এর আরাম হয়। বলব?

ছোট ওষুধ বটে কিন্তু সেটা বেশ আরামদায়ক।

সেটা হলো মদ। আচ্ছা, আজকে নাহয় চুরি করাটা থাক, আপনার জামাকাপড়টা পরে নিন না, একসঙ্গে দুজনে বেরিয়ে একটু খাওয়া যাক, কিন্তু উঃ! ওই আবার ব্যথাটা চাগিয়েছে।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘এক সপ্তাহ ধরে আমার কী হয়েছিল, কারোর সাহায্য ছাড়া আমি জামাকাপড় পর্যন্ত পরতে পারতাম না। আমার চাকর টমাস বোধ হয় এখন ঘুমুচ্ছে, আর-’

চোরটি বলল, ‘আপনি উঠুন, আমি আপনার জামা পরিয়ে দিচ্ছি।’

সংস্কারে যেন বাধতে লাগল ভদ্রলোকের। তিনি তাঁর কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত দিলেন।

বলতে গেলেন, ‘না না, এটা খারাপ দেখায়-’

সিঁধেল চোরটি বলল, ‘এই আপনার শার্ট নিন।

উঠে পড়ুন। আমি একটা লোককে জানি, যিনি মাত্র দুহপ্তা অস্বেরিস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করে এমন ভালো হয়ে গেলেন যে দুহাত দিয়ে তাঁর পোশাক পরতে পারতেন।’

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে ভদ্রলোক হঠাৎ পেছন ফিরলেন।

বললেন, ‘সঙ্গে টাকা নিতে ভুলে গেছি, ড্রেসিংটেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিলাম কাল রাতে।’

চোরটি তাঁর ডান হাতটা ধরে থামিয়ে দিল।

বলল, ‘আসুন আসুন, আমি আপনাকে আসতে বলেছি। টাকার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না,

আমার কাছে টাকা আছে। আচ্ছা, কখনো উইচ
হ্যাজেল আর উইনটার-গ্রিনের তেল ব্যবহার
করেছেন?’ অনুবাদঃ বিমল মিত্র
ও হেনরি, বিখ্যাত গল্পকার ও হেনরির আসল
নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। জন্ম ১১
সেপ্টেম্বর ১৮৬২। মৃত্যু ৫ জুন ১৯১০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২, ২০০৯

196) আপনার সম্পর্কে

আপনার সম্পর্কে ১২টি চরম সত্য ঘটনা যা
আমি জানি- ১. আপনি এই মন্তব্যটি পড়ছেন।
২. বুঝে ফেলেছেন যে এটা আপনাকে বোকা
বানানোর একটি কৌশল।
৪. খেয়াল করে দেখুন ৩ নম্বরটি বাদ পড়েছে,
এটা আপনি ধরতেই পারেননি।
৫. আপনি এইমাত্র তা পরীক্ষা করে দেখলেন
যে ঘটনা সত্য।
৬. নিজের বোকামি টের পেয়ে এবার আপনি
মুচকি হাসছেন।
৭. তার পরও আপনি এই লেখাটি পড়ছেন।
৮. এবং মানতে বাধ্য হচ্ছেন, যা বলছি সবই
সত্য।
১০. আপনি আবারও খেয়াল করেননি যে আমি
৯ নম্বরটাও এড়িয়ে গেছি।
১১. আপনি আবার তা পরীক্ষা করে দেখছেন।
১২. আর আপনি খেয়ালই করেননি যে আসলে
এখানে ১০টি চরম সত্য বলা হয়েছে, ১২টি
নয়। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২২,
২০০৯

197) নামে কী বা আসে-যায়?

শিরোনামের কথাটা ধার করা। বলেছিলেন
শেক্সপিয়ার মহাশয়। ভুল বলেছিলেন! কতটা
ভুল বলেছিলেন, সেটা তিনি নিজেই বুঝতেন,
যদি কেউ তাঁর নামের বানানে একটু গড়বড়
করে ‘শ’-এর বদলে ‘স’ দিয়ে শুরু করত। কী
বিচ্ছিন্নি কাণ্ডটাই না হতো!

নাম যে কত ‘বড়’ একটা ব্যাপার, এ ধারণা
আমি স্কুলজীবনেই পেয়েছিলাম। নবম শ্রেণীতে
পড়ার সময় শিক্ষা বোর্ডের পাঠানো ওএমআর
ফরম পূরণ করতে হতো। সেই ফরম পূরণ
করতে গিয়েই বাধল বিপত্তি। আমাদের এক
সহপাঠীর নাম-পাঠক, একটা লম্বা দম নিন-
আবুল কাশেম মোহাম্মদ হেদায়েতুল বারি বিন

রকিবুল হাসান রকেট। এত লম্বা নাম তো পূরণ করার কায়দা নেই। এতগুলো ঘরই নেই ফরমে। এ নিয়ে উত্তেজনা উঠল চরমে। স্যাররা বললেন, ‘রকেট বাবা, তুমি তোমার নাম ছোট করো।’ তার অভিভাবকদের ডাকা হলো।

রকেটের দাদা প্রধান শিক্ষকের টেবিলে বাড়ি মেরে হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘নাম ছোট করব মানে! প্রশ্নই আসে না। নাতির নাম আমি আট-আটটা খাসি কোরবানি দিয়ে রেখেছি।’ আমরা এই ভেবে স্বস্তি পেলাম, ভাগ্যিস খাসির সংখ্যা এক ডজন ছিল না!

ওই সমস্যার সমাধান কীভাবে হয়েছিল, সেটা আজ আর মনে নেই। তবে এতটুকু মনে আছে, বন্ধু মহলে রকেট তার প্রকৃত নামটার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। সেটা কেউই পারে না। বন্ধুরা নিজস্ব রীতিতে নতুন নামকরণ করে। ওটাই রেওয়াজ। বিশেষ করে যদি একই ব্যাচে একাধিক বন্ধুর নাম একই থাকে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই বলি। স্কুলে আমাদের ক্লাসেই ছিল চারজন রাজীব! দ্বিপদ নামকরণ অনুসারে তাই শেষ পর্যন্ত কেউ আর কেবল পিতৃ প্রদত্ত নাম নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারিনি। আসল নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে লেজ। কেউ হয়ে গেছে ‘গুড় রাজীব’ (কথিত আছে, তার দাদা নাকি একসময় গুড় বিক্রি করতেন)। ষণ্ডা প্রকৃতির যে ছিল, তাকে ডাকা হতো ‘ক্ষুর রাজীব’ (না, এর দাদা-নানা কেউ নাপিত ছিলেন না। ক্ষুর দিয়ে ক্ষৌরকর্মের পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই তো করা যায়, নাকি?)। সুবোধ বালকটির নাম হয়ে গিয়েছিল সোনামণি রাজীব। আর আমার? বলব না, যাহ্ লজ্জা লাগে!

এত এত রাজীব নামকরণের পেছনে ভারতের রাজীব গান্ধী পরোক্ষভাবে কোনো ভূমিকা রেখেছেন কি না আমি জানি না। তবে শৈশবে এটা নিশ্চিত জানতাম, ‘গান্ধী’ উপাধিটি খুব একটা সুখকর কিছু নয়। ভারতের জাতির জনকের খবর তখনো আমার কাছে পৌঁছায়নি। আর তাই কেউ আমাকে, তা সে আদর করেই হোক না কেন, ‘গান্ধী’ বলে ডাকলে গর্ব করার বদলে গন্ধ ছড়ানো একটা পোকাকর কথাই মনে পড়ে যেত!

স্কুল ছেড়েছি সেই কবে। কিন্তু নামবিভ্রাট এখনো পিছু ছাড়েনি। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা তো

এই সাংবাদিক জীবনেই পেতে হলো। সম্প্রতি আমাদের প্রথম আলোয় এসে যোগ দিয়েছেন নতুন সহকর্মী। তাঁর নামও রাজীব। এবং কী কান্নার ব্যাপার, তাঁর নামের শেষেও ‘হাসান’। আ-কার ই-কার সব মিলে যায়। দুজন দেখতেও গড়নে-চলনে প্রায় একই রকম! হররোজ নামবিভ্রাটে পড়তে হচ্ছে। হয়তো দেখা গেল জরুরি কোনো লেখা লিখছি, মাঝপথে অভ্যর্থনা থেকে ফোনঃ ‘রাজীব ভাই আপনার গেস্ট।’ এমনিতে ক্রীড়া বিভাগ থেকে অভ্যর্থনা কক্ষ পর্যন্ত আসতে আমার মতো হাড়-আলসের জান কাবার হয়ে যায়। তো বহু ক্রোশ পাড়ি দিয়ে গেস্ট রুমে এসে, অপরিচিত অতিথির সঙ্গে মিনিট দশেক আলাপ-আলোচনা করে, গোটা তিনেক চা খাইয়ে বোঝা গেল, অতিথি আমার কাছে নয়, এসেছেন অন্য রাজীবের কাছে! স্কুলজীবনে আরেকটা নাম ‘কমন’ ছিল-স্বপন। সে ক্ষেত্রে নামকরণটা প্রধানত হতো শারীরিক আকৃতি দিয়ে। কারও নাম বাইটা স্বপন, কেউ লম্বু স্বপন, কেউ মোটকু, কেউ চিকনা, কেউবা হয়ে গেল দাঁতু স্বপন। একজন ছিল ব্যতিক্রম। যার নামকরণ করা হলো ভুয়া স্বপন! কেন? বেচারার চাপায় চর্বি একটু বেশি ছিল। আর সেই চর্বি গলাতে হররোজ চাপা মেরে যেত। ফলে ওর কোনো কথাই আমরা বিশ্বাস করতাম না। বন্ধুদের দেওয়া নাম নিয়ে কারও খুশি হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে না। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে এই নামগুলোকে অস্বীকার করারও আর কোনো উপায় থাকে না। এই তো সেদিন মোবাইল ফোনে অচেনা নম্বর থেকে একটা ফোন এল। ‘হ্যালো, কে বলছেন?’ ‘দোস্তু, আমি স্বপন।’ ‘কোন স্বপন?’ ‘ইয়ে...ভুয়া, ভুয়া স্বপন!’ শুধু কি বন্ধুরা নাম পাল্টায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেখেছি, অনেকেই সেকেন্ড ইয়ারে উঠতে না উঠতেই বেশ-ভূষা, চলন-চালন, কথা বলার ভঙ্গি, চুলের ছাঁট আর জ্রর আকার পাল্টানোর পাশাপাশি নামটাও পাল্টে ফেলে। রোজিনা হয়ে যায় রোজ, মোকসেদ হয়ে যায় ম্যাক। সাহিত্যিক সমাজেও এই চল আছে বৈকি। পিতামহের একাধিক খাসি কোরবানির কথা হাসিমুখে ভুলে গিয়ে অনেকেই নাম রাখেন রাশভারী। অখ্যাত এক কবিকে চিনি, যিনি

আদিত্য উলফাত নামে লেখেন। সন্দেহ করি,
তাঁর আসল নাম আবেদ মিয়া। হয়তো রইস
উদ্দিন হয়ে যায় রাশা রাসপুটিন।

মাঝেমধ্যে অবশ্য শেক্সপিয়ারের কথাটাও সত্যি
বলে মনে হয়। আসলেই তো, নামে কী বা
আসে-যায়? দেখবেন, ভীরু-কাপুরুষ কারও নাম
বিপ্লব কিংবা পাড়ার দাপুটে মাস্তানটার নাম
শান্ত। হায়রে কপাল, এফএম রেডিওতে অনর্গল
কথা বলে যাওয়া উপস্থাপকের নাম কিনা নীরব!
রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৯, ২০০৯

198) নিসা নিশা নেশা

উচ্চ আদালতের এক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী
আমাদের পড়াতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন শুধু
আইনজীবী, এই কারণে ওনার বিয়ের সময়
নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। একবার নাকি
ছেলে ব্যবসা করে শুনে মেয়ের পরিবার রাজি।
আংটি বদলও হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই শুনল
আইন ব্যবসা, তখন আংটি ফিরিয়ে দিয়ে গেল!
এ ঘটনা জানার পরও আমাদের বন্ধু আফজাল
ফার্মেসি বিভাগের নিসার প্রেমে পড়ে গেল।
একদম জীবন-মরণ প্রেম। আমরা তাকে
বোঝালাম, এমনিতেই পড়ছ ল, এর ওপর মেয়ে
পড়ে ফার্মেসি। এখানে তেলে আর জলে কি
মিশ খাবে? বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন
সাবজেক্ট পড়তে কত লাগে, এর ওপর স্ট্যাটাস
নির্ভর করে। লয়ের চেয়ে কমপক্ষে চার গুণ
বেশি টাকা লাগে ফার্মেসি পড়তে। কিছুকাল
পরই নিসার অ্যানাগেজমেন্টের খবরে বেচারী
এমন ভেঙে পড়ল যে নির্দোষ কারও ফাঁসির
আদেশ আপিল বিভাগে বাতিল হওয়ার পর যে
দশা হয়। ক্রমেই তার অবস্থা খারাপ হতে
লাগল। ক্লাসে আসে না, শেভ করে না, ফোন
বন্ধ রাখে। আফজালের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর।
তার বাবা স্কুলশিক্ষক। পুত্রধনের করুণ কাহিনী
তাঁর কানেও গেল। কিন্তু কী হয়েছে, সেটা তিনি
জানেননি। আফজালের এক রুমমেটের কাছে
ভদ্রলোক ফোন দিয়ে জানতে চাইলেন, তাঁর
ছেলের আসলে কী হয়েছে। রুমমেটের বাড়ি
ছিল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ। সে বলে দিল,
আংকেল, ফয়সাল ক্যাম্পাসের নিসার জন্য
এমন করছে। নোয়াখালীর লোকজন ‘স’কে
উচ্চারণ করে ‘শ’। আবার নেশাকে বলে নিশা।

তো ভদ্রলোক নিসা কোনো মেয়ের নাম এটা ভাবতে পারেননি। তিনি ভেবেছেন তাঁর সুসন্তান শহরে গিয়ে নেশা করা শুরু করেছে। পরদিন সকালে ভদ্রলোক ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলেন এবং সে রাতেই আত্মীয়স্বজন সবার কাছে কেঁদেকেটে বললেন তাঁর ছেলে নেশা করে। ঢাকায় এসে ছেলের চেহারার হাল দেখে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। মেসের সামনে চিৎকার-চোঁচামেচি করে পুরো বিল্ডিংয়ের মানুষকে জানান দিলেন তাঁর ছেলের কুকীর্তির কথা। আফজালসহ তার রুমমেটরা তখন যতই চেষ্টা করছে তাকে বোঝাতে যে ব্যাপারটা আসলে তা নয়, কিন্তু ভদ্রলোক একজন শিক্ষক হয়ে তাঁর ছেলে নেশা করবে, এটা শুনে আগামী শীত না আসা পর্যন্ত ঠান্ডা না হওয়ারই কথা। শেষমেশ রীতিমতো টেনে-হিঁচড়ে আফজালকে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করান হলো। আফজালের কোনো কথাই তাঁর বাবা বিশ্বাস করলেন না এবং মাদক নিরাময় কেন্দ্রে আদেশ দিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে এক মিনিটের জন্যও যেন না ছাড়া হয়। শেষ পর্যন্ত নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসকের হাতে-পায়ে ধরে সাত দিন পর আফজাল ছাড়া পেল, তত দিনে নিসার বিয়ে হয়ে গেছে। শাত শামীম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৯, ২০০৯

199) ভুল, সবই ভুল

কোনো এক দার্শনিকপ্রবর নাকি রাতে বাসায় ফিরে হাতের ছড়িটিকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। আর ভদ্রলোক নিজে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সারা রাত ছড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন! এত বড় ভুল করাটা বাড়াবাড়ি! তবে মানুষই ভুল করে। আর ক্রিকেটার, আম্পায়ার ও কর্মকর্তারা যেহেতু মানুষ তাঁদেরও কিঞ্চিৎ ভুলের নজির আছে।

১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডে ‘জেন্টলম্যান’ বনাম ‘প্লেয়ার’ দলের মধ্যে একটি ম্যাচের ঘটনা। তখন নিজের দলের সব খেলোয়াড়কে সবাই ঠিকমতো চিনতেন কি না সন্দেহ। জেন্টলম্যান দলে খেলার জন্য চিঠি পাঠানো হলো মিলস নামের এক খেলোয়াড়ের কাছে। মিলসরা ছিলেন দুই ভাই। এক ভাই ক্রিকেট খেলতেন আর এক ভাই খেলতেন না। চিঠিতে শুধু ‘মিস্টার মিলস’ লেখা ছিল, তাই যে ভাই

ক্রিকেট জানতেন না তিনিই চলে এলেন
খেলতে!

প্রায় একই ধরনের একটা গোলমাল লেগেছিল
১৮৯০ সালে ইংল্যান্ড সফরে আসা অস্ট্রেলিয়া
দলে। নির্বাচকেরা তাসমানিয়ার ই জে কে বার্ন
নামের এক খেলোয়াড়কে দলে নির্বাচন
করেছেন বিকল্প উইকেটরক্ষক হিসেবে। বার্নও
দিব্যি জাহাজে চেপে বসেছেন। জাহাজ ছেড়ে
দিল। তখন আলাপ-আলোচনায় বার্ন বললেন,
তিনি জীবনে কোনো দিন উইকেটরক্ষণ
করেননি! স্রেফ ভুল করে আরেক বার্নের চিঠি
চলে গেছে তাঁর কাছে!

এটুকুও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ভুল করে কি
কেউ আউট হতে পারে? আজকাল পারুক আর
না-ই পারুক, সেই ১৮৭০ সালে ওভালে সারে
বনাম এমসিসি ম্যাচে ভুল করে আউট
হয়েছিলেন জে সাউদারটন। ভদ্রলোক
ভেবেছিলেন উইকেটরক্ষকের ধরা বলটা তাঁর
ব্যাট ছুঁয়ে গেছে। এ চিন্তায় বোলার আবেদন
করার আগেই উইকেট ছেড়ে চলে গেলেন
সাউদারটন।

আজকের দিনের আইন অনুযায়ী এ রকম
ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানকে আম্পায়ার ফিরিয়ে আনার
কথা। কিন্তু এ আইন তখন ছিল না। তাই
সাউদারটন আউটই হলেন। কিন্তু স্কোর কার্ডে
কী লেখা হবে? অসহায় স্কোরার লিখে
রেখেছিলেনঃ

জে সাউদারটন-অবসর, ভেবেছেন তিনি আউট-
০

ভুল করে নয়, ইচ্ছা করে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার
নজিরও আছে। ট্রেন্ট ব্রিজে বডিলাইনখ্যাত দুরন্ত
ফাস্ট বোলার লারউডের (যার বলের আঘাতে
অনেক ক্রিকেটারের হাসপাতালে যাওয়ার দুর্ভাগ্য
হয়েছে) মুখোমুখি হয়েছিলেন ন্‌নিথ নামের এক
৯ বা ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান। কোনোক্রমে একটা
বল খেললেন, ক্যাচ উঠল, ফিল্ডার ধরলেন কি
ধরলেন না। ন্‌নিথ ব্যাট বগলদাবা করে হাঁটা
শুরু করলেন। সঙ্গী ব্যাটসম্যান ডাক দিয়ে
বললেন, ‘দাঁড়াও, যেয়ো না। ওটা তো ভালো
ক্যাচ না, সম্ভবত ড্রপ ক্যাচ হয়েছে।’ ন্‌নিথ
ফিরে বললেন, ‘আউট হওয়ার জন্য ক্যাচটা
হয়তো ভালো হয়নি, কিন্তু আমাকে বাঁচানোর
জন্য যথেষ্ট ভালো হয়েছে।’

বাঁচানো মানে লারউডের হাত থেকে বাঁচানো।
প্রায় একই রকম আরেকটা গল্প শোনা যায় এন
এ নক্স নামের এক ফাস্ট বোলারের ক্ষেত্রে।
কোনো এক ব্যাটসম্যান নাকি নক্সের বল
খেলতে গিয়ে এতই ভয় পেয়েছিলেন যে ইচ্ছা
করে স্টাম্প বাড়ি দিয়ে ফেলে দিয়ে ফিরে
যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় সবাইকে উদ্দেশ্য করে
বলে গিয়েছিলেন, ‘শুভ বিকেল, ভাইয়েরা। আমি
গেলাম, বাড়িতে আমার জন্য কান্নার মতো বউ-
ছেলে-মেয়ে কেউ নেই।’

এই দ্যাখেন। ভুলের গল্প ভুল করে কোথায় চলে
গেছে। যাক গে। ভুল দিয়েই শেষ করা যাক।
এবার আমাদের দেশি একটা ভুল।

কদিন আগের ঘটনা। দেশের ক্রীড়া বিভাগের
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মানুষ জাতীয়
ক্রিকেট দলের অনুশীলন দেখতে গেছেন
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। গিয়েই
আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন,
‘আচ্ছা, আমাদের সেই আশরাফি খেলোয়াড়টা
কই?’

বাংলাদেশ দলে আশরাফুল আছে, মাশরাফি
আছে। আশরাফিটা আবার কে! কিন্তু
আশপাশের লোকজন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস
করলেন ‘আশরাফি কে?’ কর্মকর্তা মহাবিরক্ত
হয়ে বললেন, ‘ওই যে আশরাফি, আশরাফি।
ভালো খেলে। অনেক টাকা দিয়ে আইপিএল না
আইসিএল কারা জানি কিনেছে।’

ততক্ষণে সবাই বুঝে ফেলেছেন যে আশরাফি
বলে আলাদা কেউ নেই। কর্মকর্তা আশরাফুল
আর মাশরাফিকে মিলিয়ে ‘সংকর’ ক্রিকেটার
তৈরি করেছেন! কিন্তু এখন উপায় কী?
‘আশরাফি’কে কীভাবে হাজির করা যায়।

এক ক্রিকেট কর্মকর্তা বুদ্ধি করে দুজনকেই
নাকি ডেকে এনেছিলেন। ভাবখানা এমন-বেছে
নিন আপনার আশরাফি! দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৯, ২০০৯

200) দরখাস্তের নেপথ্য কারণ

স্কুল-কলেজে আমরা নানা প্রয়োজনের কথা
উল্লেখ করে নানা সময় নানা প্রকারের দরখাস্ত
লিখেছি। এসব দরখাস্তের অনেকটাতেই
সত্যিকারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা
হয়নি। যদি সত্যিকারের প্রয়োজনের কথা
উল্লেখ করে দরখাস্ত লেখা হতো, তাহলে

দরখাস্তগুলো কেমন হতো? চলুন দেখা যাক।
ভেবেছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দবরাবর,
প্রধান শিক্ষক
খাই খাই উচ্চবিদ্যালয়বিষয়ঃ ক্যান্টিন স্থাপনের
আবেদন। স্যার,
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের
বিদ্যালয়ে কোনো ক্যান্টিন নেই। ফলে
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন
হচ্ছে। স্কুলের পাশের বাড়ির আমগাছ থেকে
আম চুরি করার পর আম কাটার জন্য ছুরি-বাঁটি
পাওয়া যাচ্ছে না, তেঁতুল গাছ থেকে তেঁতুল চুরি
করার পর লবণ পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি।
এমতাবস্থায় স্কুলের ছাত্রদের এজাতীয় সব
সমস্যার সমাধানকল্পে অবিলম্বে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে
একটি ক্যান্টিন স্থাপনে সুআজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক

খাই রুল

দশম শ্রেণী। বরাবর,

প্রধান শিক্ষক

সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়বিষয়ঃ নতুন সময়ে
স্কুল পরিচালনার আবেদন। স্যার,
আপনি অবগত আছেন যে বর্তমান সরকার
ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে এনেছে, কিন্তু
আমাদের স্কুলে এখনো আগের সময়েই ক্লাস
হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের প্রতিবেশী সরকারি
বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘড়ির কাঁটার
সঙ্গে ক্লাসের সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে এনেছে।
ফলে তাদের স্কুল এক ঘণ্টা আগেই ছুটি হয়ে
যাচ্ছে। এতে আমি সঠিক সময়ে গার্লস স্কুলের
গেটে পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছি।

এমতাবস্থায় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে
কাজে লাগাতে এবং আমার সুবিধার্থে নতুন
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুলের সময়
নির্ধারণের আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। বরাবর,

প্রিন্সিপাল

হিমাগার বেসরকারি কলেজবিষয়ঃ স্কুল
লাইব্রেরিতে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রাখার
আবেদন। স্যার,

আপনি জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইবেন যে আমি
অত্যন্ত শৌখিন একজন ছাত্র এবং আমার প্রিয়
শখ হচ্ছে নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা

ছবিসংবলিত পেপার কাটিং সংগ্রহ করা। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিতে বর্তমানে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন না থাকায় আমার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় আপনার কাছে আমার আকুল আবেদন, অবিলম্বে স্কুল লাইব্রেরিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন এবং বিশেষ করে রঙিন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রাখিতে সুআজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক

লাল মিয়া

দ্বাদশ শ্রেণী।বরাবর,

প্রিন্সিপাল

চান্স টেক কলেজবিষয়ঃ শিক্ষাসফর আয়োজনের আবেদন।স্যার,

বিনীত নিবেদন এই প্রতিদিনকার একঘেয়ে ক্লাস, ল্যাব, পরীক্ষণ ইত্যাদিতে কলেজের ছাত্ররা যারপরনাই ত্যক্ত-বিরক্ত। এমতাবস্থায় একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। শিক্ষাসফর উপলক্ষে অন্তত তিন দিন ছুটি পাওয়া গেলেও ঘরে বসে তিন দিন ঘুমানো যায়।

এমতাবস্থায় বাসায় বসে বিশ্রাম নেওয়া এবং ঘুমানোর সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করিতে সুআজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক

সুযোগসন্ধানী সূজন

দ্বাদশ শ্রেণী।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৯, ২০০৯

201) পণ্ডিতের মুখ থেকে বেরোনো পাখি

এক ছিলেন পণ্ডিত। ওই দূরের এক গাঁয়ে তাঁর বাড়ি। একদিন তিনি মাঠ পেরিয়ে ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বিষম এক কাশি এল। আর মুখের ভেতর থুতুর সঙ্গে কী একটা অস্বস্তিকর জিনিসের অস্তিত্ব যেন টের পেলেন সেই পণ্ডিত। ওয়াক থু করে থুতু ফেলতেই মুখ থেকে পড়ল পাখির ছোট এক পালক।

পণ্ডিত অবাক হলেন। ভাবলেন এ কী কাণ্ড! তিনি তো পাখির মাংস খাওয়া দূরে থাক, পাখি নেড়েও দেখেননি। ভারি ভাবনায় পড়লেন তিনি। ধুতির খুঁটে সেই পালক বেঁধে একরাশ

দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বামুন পণ্ডিত। বাড়ি ফিরে ধপ করে একটা জলচৌকিতে বসে মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগলেন। বউ কাছে এসে বললেন, হ্যাঁগো, তোমার হয়েছে কী? অমন খুবড়ো মুখ করে বসে পড়লে যে!

বামুন মুখটা আমসি করে বললেন, হয়েছে এক মহাভজকট। কাউকে বলবে না, এ শর্তে কথাটা ভাঙতে পারি। বামুন পণ্ডিতের বউ বলেন, তুমি হলে স্বামী দেবতা। তুমি বারণ করছ, তার পরও আমি গোপন কথা দুই কান করব-এমনটা ভাবতে পারলে? বামুন পণ্ডিত ধুতির খুঁটি থেকে পাখির পালক বের করে বউয়ের হাতে দেন। বামনি পালকটা দেখে বলেন, মিনসের কাণ্ড দেখ না। মাঝেমধ্যে ধুতির খুঁটি খুলে পয়সাকড়ি দেয়, আজ দিচ্ছে কি না একটা পাখির পালক! বুড়া-হাবড়ার এ আবার কোন ঢং! পণ্ডিত বলেন, না বউ, মশকরা নয়। বিষয়টা বড়ই উদ্ভট, তাই খুব চিন্তায় পড়েছি। এই বলে বউকে ঘটনাটা খুলে বলেন। আর দিব্যি করায়, খবরদার কাউকে এ ঘটনা বলবে না কিন্তু! বউ বলে, পাগল হয়েছে, ঘরের কথা পরের কাছে বলব!

কিছুক্ষণ পরে বউ গেছে পুকুরে জল আনতে। সেখানে দেখা নীরুবালার সঙ্গে। নীরুবালা পণ্ডিতদের পড়শি। বামনি এ কথা-সে কথা বলে কিন্তু পেটের ভুটভাট যায় না। খালি গোপন কথাটা বেরিয়ে আসতে চায়। শেষে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলে, অই নীরু, তুই আমার সহ। তোকে কোনো কথা না বলে পারি না। আজ একটা বড়ই গোপন কথা আছে, কাউকে বলবি না বল, তাহলে তোকে বলি।

নীরু বলে, বামনি দিদি! তোমার সহ নীরুর পেট একখানা সিঁদুক। কোনো কথা সেখানে পড়লে তা আর বের হয় না। তো, বামনি তাকে তার স্বামীর খুতু আর পাখির পালকের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলে।

নীরুবালা আশ্বাস দিয়ে এবং এটা কোনো অলক্ষুণে ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বিদায় নেয়।

রাস্তায় যেতে যেতে নীরুর দেখা হয় মোল্লাগিনি হাশমতির সঙ্গে। হাশমতি অন্য সম্প্রদায়ের,

তবে দিলখোলা মিশুক। এ গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলঝিলও বেশ। নীরু বলে, দিদি একটা কথা, কিন্তু বড়ই গোপন। কাউকে না বললে তোমাকে বলতে পারি। তোমার সোয়ামিকেও বলা যাবে না। ভগবানের কিরে, বলবা না কিন্তু।

হাশমতি বলে, দিদিরো, পুকুরঘাটে কত কথাই তো হয়। কোনো দিন হুঁচ, হাশমতি কথা লাগাইয়া-পারাইয়া বেড়ায়? আল্লা-রসুলের কছম, কথা গোপন থাকব। এই প্রতিজ্ঞা করার পর নীরু বলে, শুনছ আজ কী হয়েছে? পণ্ডিতের বউয়ের কাছে মাত্রই শুনলাম, পণ্ডিত মাঠের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তার মুখের ভেতর থেকে একটা মস্ত পাখি বেরিয়ে উড়াল দিয়ে চলে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোটা গ্রামবাসী জানল পণ্ডিতের মুখ থেকে একটার পর একটা পেঁল্লায় পাখি বের হচ্ছে, আর উড়ে যাচ্ছে। নানা রঙের পাখি, নানা দেশের। সে এক অলৌকিক ঘটনা বটে!- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত গ্রামবাংলার রঙ্গ রসের গল্প থেকে সংগৃহীত।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৯, ২০০৯

202) আলাভোলা জ্যাকসন

পপতারকা মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে সাংস্কৃতিক জগৎ সব সময় সরব। বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে নন্দিত হওয়ার পাশাপাশি নানা ঘটনায় তিনি নিন্দিতও কম হননি। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, সবকিছু মিলিয়ে দিলখোলা এক সরল মানুষ ছিলেন তিনি। আজব যত খেয়ালে গা ভাসানো এই সংগীত তারকার ভেতর বাস করত সুন্দর একটি শিশু।

২০০২ সালের ঘটনা। নিউইয়র্কের রেডিও সিটি মিউজিক হলে এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের পুরস্কার বিতরণ চলছে। টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে অনুষ্ঠান।

একপর্যায়ে জনপ্রিয় পপতারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স মঞ্চে আমন্ত্রণ জানালেন তারকাদের সারিতে বসে থাকা মাইকেল জ্যাকসনকে। ব্রিটনির উদ্দেশ্য ছিল কেক কেটে জ্যাকসনের ৪৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা। জ্যাকসনকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় ব্রিটনি তাঁকে ‘আর্টিস্ট অব দ্য মিলেনিয়াম’ (সহস্রাব্দের শিল্পী) বলে অভিহিত করেন।

সরলমতি জ্যাকসন ভাবলেন, পুরস্কারের

আয়োজকেরা বিগত হাজার বছরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা শিল্পী নির্বাচিত করে তাঁকে আর্টিস্ট অব দ্য মিলেনিয়াম সম্মানে ভূষিত করেছেন। আনন্দে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন জ্যাকসন। উপস্থিত তারকা এবং টিভির পর্দায় চোখ রাখা বিশ্বের অগণিত দর্শকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি যখন ছোট ছিলাম, মানে ইন্ডিয়ানায় বড় হচ্ছিলাম, তখন যদি কেউ আমাকে বলত, আমিই একদিন আর্টিস্ট অব দ্য মিলিনিয়াম অ্যাওয়ার্ড পাব, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।’ এ সম্মাননা পাওয়ার জন্য জ্যাকসন ঈশ্বর, মা-বাবা ও জাদুকর ডেভিড ব্লেইনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৯৯১ সালের কথা। মাইকেল জ্যাকসনের মাথায় হকার সাজার ভূত চাপল। এ জন্য আজব এক সাজ নিলেন তিনি। ঢলঢলে সুট পরে, মাথায় পরচুলা চাপিয়ে, গালে দাড়ি লাগিয়ে, চোখে রোদচশমা এঁটে বাড়ি বাড়ি পত্রিকা বিলি করতে বেরোলেন তিনি। কোন পত্রিকা? ওয়াচটাওয়ার নামে এক সাময়িকী। কিন্তু এক বাড়ির পোষা কুকুর জ্যাকসনের এই আজব সাজ পছন্দ করল না। ঘেউঘেউ করে পপতারকার দিকে ধেয়ে গেল কুকুরটা। আর জ্যাকসনও মারলেন ঝেড়ে দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতেই তিনি তাঁর আজব পোশাক খুলে ফেললেন। সেই সঙ্গে তাঁর হকার সাজার ভূতও নেমে গেল।

একবার একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকায় খবর বের হলো, জ্যাকসন গুরুতর অসুস্থ। তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন-এমন ছবিও ছাপা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন জ্যাকসন। জোর গলায় তিনি দাবি করলেন, রোগবালাই কিছুই হয়নি তাঁর। তিনি দিব্যি সুস্থ। আর ওই ছবি তিনি একজন সাংবাদিকের কথামতো ভঙ্গিতে তুলেছেন। তবে তাঁর ভুলটি ছিল, এ ছবি ছাপার অনুমতিও তিনি দিয়েছিলেন।

মাইকেল জ্যাকসনের কাছে একবার তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের দাওয়াত এল। তিনি সানন্দে দাওয়াত কবুল করে যথাসময়ে হোয়াইট হাউসে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে যে আনুষ্ঠানিক সম্মান জানানো হয়, এতে তিনি গর্বিত না হয়ে বরং ঘাবড়ে

যান। হোয়াইট হাউসের ডিপ্লোমেটিক রিসেপশন কক্ষে যখন তিনি পা রাখেন, এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে একদৌড়ে তিনি একটি বাথরুমে গিয়ে লুকান। আর সেটি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বাথরুম।

১৯৭৭ সালের এক সন্ধ্যা। ম্যানহাটনের একটি দামি ফরাসি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করতে গেছেন জ্যাকসন। সঙ্গে একজন সাংবাদিক। জ্যাকসনের পেটে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা। এসব রেস্তোরাঁয় সবাই কমবেশি কেতাবি নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু ক্ষুধার সময় এসব নিয়ম মানে কে। অন্তত জ্যাকসন নন। তিনি গলায় ন্যাপকিন ঝোলালেন ঠিকই, কিন্তু খাবার আসামাত্র কাঁটাচামচ ও ছুরির ধার না ধরে হাত দিয়েই গপাগপ সাবাড় করতে লাগলেন সব খাবার।

২০০২ সালের আরেকটি ঘটনা। নভেম্বরে বার্লিন সফরে গেছেন জ্যাকসন। সেখানকার বিলাসবহুল অ্যাডলন হোটেলে ওঠেন তিনি। ওই হোটেলের চতুর্থ তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি নিচে সমবেত অগণিত ভক্তের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি এক হাতে তাঁর শিশুপুত্র দ্বিতীয় প্রিন্সকে কয়েক সেকেন্ড নিচে ঝুলিয়ে আবার ফিরিয়ে নেন। শিশুটি তাঁর হাত ফসকে পড়ে গেলেই হয়েছিল আর কি! কিন্তু জ্যাকসন এ কাণ্ড করে বুঝিয়ে দেন, শিশুরা তাঁর হাতে কতটুকু নিরাপদ। সেবার শিশুদের প্রতি অশেষ দয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পুরস্কার নিতেই জ্যাকসন জার্মানি সফর করেন।

অব দ্য ওয়াল অ্যালবাম তৈরি করার সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েছিলেন জ্যাকসন। একটানা কয়েক দিন গোসল না করায় তাঁর গা দিয়ে কটু গন্ধ বের হচ্ছিল। এতে অ্যালবামের প্রযোজক কুইন্সি জোনস তাঁকে আড়ালে ‘েনেলি’ বলে ডাকতে শুরু করেন, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘দুর্গন্ধময়’। এ কথা একসময় তরুণ জ্যাকসনের কানে যেতেই তাঁর মাথা গরম হয়ে যায়।

জোনসকে পাকড়াও করে জ্যাকসন বলেন, ‘আপনি নাকি আমাকে েনেলি বলে ডাকেন?’ চতুর জোনস উপস্থিত বিপদ কাটাতে চট করে বলেন, “আরে, তুমি তো ভুল বুঝছ আমাকে। ‘কুল’ শব্দটার একটি প্রচলিত রূপ হচ্ছে ‘েনেলি’। তুমি খুব ঠান্ডা স্বভাবের কিনা, তাই এ সম্বোধন করি।” শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

কয়েকটি ওয়েবসাইট অবলম্বনে।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৬, ২০০৯

203) হাবুলের বুদ্ধি

নবীনবাবু খেতে বসেছেন। নবীনবাবুর আবার
খাওয়ার শেষে একটু দই খাওয়ার অভ্যেস।

দইয়ের ভাঁড়টা কিরণবালা পাতের পাশে রেখে
যেতেই বাড়ির পোষা বিড়ালটা মুখ দিল।

সে দই খাওয়া চলে না, তাই কিরণবালা বাড়ির
চাকর হাবুলকে ডেকে তার হাতে একটি টাকা
দিয়ে বললেন, ‘সামনের দোকান থেকে এক
টাকার দই নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। দেরি
করিসনে।’

‘আচ্ছা। দেরি হবে কেন? এই আমি যাব আর
আসব।’ গेट পর্যন্ত গিয়ে হাবুল দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেখান থেকে চেষ্টা করে বলল, ‘মিষ্টি দই আনব?’
কিরণবালা চেষ্টা করে উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’

হাবুল সেই গেল, আর তার দেখা নেই। হাত
চেটে চেটে একসময় উঠে পড়লেন নবীনবাবু।
দই খাওয়া তাঁর হলো না।

বিকেল চারটার সময় যখন নবীনবাবু ঘুম থেকে
উঠেছেন, হাবুল তখন ফিরল খালি হাতে।

‘কী ব্যাপার? এত দেরি হলো কেন?’ নবীনবাবু
শুধোলেন।

হাবুল বলল, ‘সামনের দোকানে মিষ্টি দই ছিল
না। তাই ওরা বলল, শ্যামবাজার পাবি মিষ্টি
দই। এত বেলায় ওখানে ছাড়া কোথাও মিষ্টি
দই পাওয়া যাবে না। এই রাধাবাজার থেকে
শ্যামবাজার যেতে বাস ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা
লাগল। বাকি পঞ্চাশ পয়সার মিষ্টি দই দেবে না
দোকানি। তাই ফিরে এলাম বাবু পয়সা নিতে।’

হাবুলের গলা শুনে কিরণবালা ঘর থেকে
বেরিয়ে এসে বললেন, ‘তোর আর মিষ্টি দই
আনতে হবে না। বাকি পঞ্চাশ পয়সা ফেরত দে
আমাকে? হতচ্ছাড়া পাজি ছেলে।’

হাবুল বলল, ‘শ্যামবাজার থেকে বাসে ফিরতে
সে পয়সাও তো বাস ভাড়ায় গেছে। হেঁটে এলে
তো আরও দেরি হতো ফিরতে।’

কিরণবালা বললেন, ‘বুদ্ধির ঢেঁকি। যা, চান করে
খেয়ে নে। আমাকে উদ্ধার কর খেয়ে নিয়ে।’

নবীনবাবু বললেন, ‘আহা, অত রাগ করছ কেন।
ওর যদি অত বুদ্ধি থাকত, তাহলে তো
অফিসেই চাকরি করত।’

হাবুল চান করে খেতে বসল। সে বুঝতেই

পারল না তার অপরাধ কোথায়!

কিরণবালার কোমরের যন্ত্রণাটা কদিন হলো

বেড়েছে। রাতে মোটেই ঘুমুতে পারেন না।

ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ওষুধ আনা না

হলে উপায় নেই!

নবীনবাবু বললেন, ‘হাবুলকে পাঠাও না। ও ঠিক

আনতে পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই ওকে

বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি।’

কিরণবালা বললেন, ‘তাই দাও। আমার শরীরের

যা অবস্থা, তাতে ডাক্তারখানা পর্যন্ত যাওয়া খুবই

কষ্টকর।’

নবীনবাবু হাবুলকে ডেকে ওর হাতে পাঁচটি

টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন,

‘ডাক্তারবাবু যে ওষুধ লিখে দেবেন, সেই

কাগজখানা ওষুধের দোকানে দেখাবি, বলবি, যা

দাম লাগে কেটে নিয়ে বাকি পয়সা এই রুমালে

বেঁধে দিন।’

‘আচ্ছা’, বলে হাবুল চলে গেল।

ডাক্তারবাবু সব শুনে ওষুধ দিলেন এক শিশি।

বললেন, ‘দাম এখন দিতে হবে না। দিনে

চারবার খাবেন এই ওষুধ। প্রতিবারে দুচামচ

করে। বুঝলি? দুদিনের ওষুধ দিলাম। পরশু

এসে বলবি কেমন থাকেন।’

হাবুল বাজার থেকে ষোলখানা চামচে কিনে

বাড়ি ফিরল। ওষুধ আর চামচেগুলো দিল

কিরণবালাকে।

কিরণবালা ওষুধ আর ষোলখানা চামচে দেখে

চমকে উঠে বললেন, ‘এত চামচে আনলি কেন

রে?’

‘ডাক্তারবাবু বলেছেন।’

‘ডাক্তারবাবু বলেছেন! কেন? অতগুলো চামচে

দিয়ে কী হবে?’

হাবুল বলল, ‘দিনে চারবার ওষুধ খাবেন।

প্রতিবারে দু-চামচ করে। ওষুধ হলো দুদিনের।

তা হলে ষোলখানা চামচেই তো লাগবে। আমি

ষোলখানাই এনেছি। বেশি চামচে আনলাম

কোথায়?’ রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৬, ২০০৯

204) যে গল্পটি পুরস্কার

দেয়েছিল...

নিশ্চিতপুর রাজ্যে একবার আষাঢ়ে গল্পের বিরাট

প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আজকাল বিভিন্ন টিভি

● <http://facebook.com/tanbir.cox>

চ্যানেলে যেমন তারকা, তারকাদের তারকা, তিন চাকার তারকা, দুই হাঁড়ির তারকা-এ রকম বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়, সেকালে এসব হতো রাজসভায়।

তো, আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যায় ল্যাংড়া আমের আঁটি চুষতে চুষতে হবুচন্দ্র রাজা ভাবলেন, একটা আষাঢ়ে গল্পের প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়।

যেমন ভাবা তেমন কাজ, দুই দিনেই আষাঢ়ে গল্পের তারকাদের তারকা নির্বাচনের ‘তোমাকেই খুঁজছে রাজসভা’ পোস্টার, লিফলেটে রাজ্য ছেয়ে গেল।

পাছে নির্বাচনে কোনো ভুল হয়, রাজা তাই এ গুরুদায়িত্ব অন্য কাউকে দিতে রাজি হলেন না।

রাজা নিজে হলেন বিচারক, মন্ত্রী আর কোতোয়াল হলেন সহবিচারক। প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলল।

দুনিয়ার যেখানে যত চাপাবাজ ছিল তারা এসে একে একে গল্প শোনাতে লাগল। রাজার কোনোটাই পছন্দ হয় না। কোনো গল্পের শুরুটা সত্যের মতো লাগে, কোনো গল্পের শেষটা মনে হয় হলেও হতে পারে।

রাজা ত্যক্তবিরক্ত। রাজার বিরক্তি যত বাড়ে, সেই সঙ্গে মন্ত্রীর মুখও শুকায়। হায় হায় কী উপায়! সত্যিকার আষাঢ়ে গল্প কি আর পাওয়াই যাবে না এবার বর্ষায়!

এ রকম একদিন এক চিমসেমুখো মানুষ এসে হাজির হলো রাজসভায়। তার নাম তোতা মিয়া। প্রতিযোগিতা তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আগামীকাল থেকেই শুরু হবে শ্রাবণ মাস।

শ্রাবণ মাসে তো আর আষাঢ়ে গল্প বলার কোনো সুযোগ নেই। গবুচন্দ্র মন্ত্রী ভাবলেন, কত হাতিঘোড়া গেল তল, তোতা পাখি বলে কত জল! আচ্ছা, এসেছেই যখন, তখন তার আষাঢ়ে গল্পটাও না হয় শোনা যাক। তোতা মিয়াকে হাজির করা হলো রাজার সামনে।

তোতা মিয়া বলল, ওয়াস আপন এ টাইম, মানে কোনো এককালে কোনো একটা দেশ ছিল।

সেই দেশে রাজা ছিল না, তবে গন্ডা গন্ডা মন্ত্রী ছিল।

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। এ কেমন দেশ, যেখানে ভূরি ভূরি মন্ত্রী আছে, কিন্তু রাজা নেই! এমন দেশ হয় নাকি আবার! বেশ

একটা আঘাতে গল্পের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে
তাহলে। রাজা বললেন, তারপর?
তোতা মিয়া, সেই দেশটা ছিল নদীমাতৃক, মানে
তাদের দেশে অনেক নদী। তবে দেশের
লোকজন সেখানে নদীর ওপর কোনো সেতু
তৈরি করত না। তারা রাস্তা কেটে সেখানে সেতু
তৈরি করত!

হবুচন্দ্র মুচকি হেসে বললেন, বেড়ে বলেছ তো
হে! রাস্তা কেটে নদী তৈরি করত!

তোতা মিয়া বলল, জি হুজুর। তারা যে শুধু
রাস্তা কেটে নদী তৈরি করত এমন না, ধানি
জমির ওপর, গোচারণ ভূমির ওপর, এমনকি
বড় বড় নেতার বাড়ির উঠোনে পর্যন্ত সেতু
তৈরি করত! এই সেতুগুলোর সংখ্যা এত বেশি
হয়ে গিয়েছিল যে দেশের সবচেয়ে বড় পত্রিকা
একবার এই সেতুগুলোর ছবি দিয়েই পুরো এক
দিনের সংখ্যা নামিয়ে ফেলেছিল।

রাজার হাসি আর ধরে না। এতক্ষণে পাওয়া
গেছে এক আসল গল্পকার।

রাজা কৌতূহল নিয়ে বললেন, এত অনাচার,
সেগুলো দেখার জন্য কেউ ছিল না? দেশ চালাত
কারা?

তোতা মিয়া বলল, সেই দেশ চালাতে হলে
আগে অনেক কালো টাকার মালিক হতে হয়।
তারপর ধরেন, যার যত বেশি মামলা, যে যত
বেশি অনাচার করেছে, সে-ই বেশি ভোটে
দাঁড়াত।

রাজা বললেন, বলো কী হে! কেন, ওই দেশে
পাইক-পেয়াদা ছিল না? কাজির দরবার ছিল
না? সেখানে বিচার হতো না?

তোতা মিয়া বলল, পাইক-পেয়াদা ছিল হুজুর।
তবে তারা কাজির ধার ধারত না। নিজেরাই
চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমাশ ধরত। ধরার পর
তাদের নিয়ে গভীর রাতে অস্ত্র উদ্ধারেও যেত।
গবুচন্দ্র মন্ত্রী বললেন, অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যেত
অন্ধকারে?

তা পাওয়া যেত মাঝেমধ্যে। কিন্তু মজার বিষয়
হলো, যত গোপনেই অস্ত্র উদ্ধারে যাক না কেন,
কীভাবে কীভাবে যেন তাদের সঙ্গী-সাথিরা খবর
পেয়ে যেত, তারা আক্রমণ করত পাইক-
পেয়াদাকে। এ সময় কখনোই আর কোনো
সঙ্গী-সাথির কিছু হতো না, কিন্তু আক্রমণ
করামাত্রই গ্রেপ্তার হওয়া লোকটি টপ করে

গুলির সামনে পড়ে মরে যেত। যতজনকে নিয়েই অস্ত্র উদ্ধারে যেত, প্রতিবার একই ঘটনা।-তোতা মিয়া বলল।

প্রতিবার!-রাজার বিনয় বাঁধ মানেন না।

তোতা মিয়া বলে, জি, প্রতিবার।

গবুচন্দ্র মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, তা, শুধু কি অস্ত্রপাতি উদ্ধার হতো? চুরি-বাটপারির টাকা উদ্ধার হতো না?

তোতা মিয়া হেসে বলল, চুরি-বাটপারির টাকা তো সেই দেশে বৈধ ছিল। কেউ যদি সৎ পথে টাকা রোজগার করত, তাহলে তাকে অনেক টাকা আয়কর দিতে হতো! কিন্তু ঘুষ, চুরি-বাটপারি, এগুলোর জন্য এত টাকা দিতে হতো না।

রাজা বললেন, নিশ্চয়ই সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হতো।

তোতা মিয়া জবাব দিল, না হুজুর, সেই দেশে অবৈধ টাকা থাকলে অল্প কিছু টাকা সরকারকে দিলেই সরকার আর ওই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করত না। সৎ পথে রোজগার করলে বেশি টাকা দিতে হতো, কিন্তু কালো টাকা রোজগার করলে কম টাকা দিলেই চলত।

রাজা গল্পে মজা পেয়ে গেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কিন্তু এভাবে একটা রাজ্য তো চলতে পারে না! সবাই যদি চুরিধারি করতে থাকে, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠবে! ব্যবসা বাণিজ্য চলে না সে রাজ্যে?

তোতা মিয়া মাথা চুলকে বলল, তা নিশ্চয়ই চলে, হুজুর। ধরেন, যার ব্যবসা সবচেয়ে ফেল, সেই বেশি ব্যবসা করে।

গবুচন্দ্র বললেন, সেটা কীভাবে সম্ভব?

সেটাই হয় হুজুর! যেমন ধরেন, একজন লোক, তার ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না; সে ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে ব্যবসা করে, ব্যবসা চলে না বলে সে ব্যাংকের টাকা দেয় না-এভাবে না দিতে দিতে সে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ফেলমার্কি ব্যবসায়ী হয়ে গেল। ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়া দশটা ব্যবসার মধ্যে তার আছে চারটা; সেই লোককে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিতেন বেসরকারি খাত উন্নয়নের উপদেশ দেওয়ার জন্য।

তোতা মিয়া আরও কী কী যেন বলতে চাইছিল। কিন্তু তখন আষাঢ়ের শেষ প্রহর, আষাঢ়ে গল্প শেষ না করলে শ্রাবণী গল্প হয়ে যাবে।

কিন্তু রাজা খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তোতা মিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর রাজসভা কাঁপিয়ে হাসতে থাকলেন। আষাড়ে গল্প বলেছে বটে, পুরো একটা রাজ্য নিয়ে আষাড়ে গল্প। রাজা আশপাশে তাকিয়ে বললেন, তোতা মিয়া, আর বলতে হবে না, সময় শেষ। তবে এ রকম উল্টাপাল্টা রাজ্যের গল্প কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারবে না, তোমারটা পুরো আষাড়ে গল্প হয়েছে।

ওরে, কে আছিস, তোতা মিয়াকে প্রথম পুরস্কারটা দিয়ে দে। এর চেয়ে আজগুবি গল্প আর কেউ শোনাতে পারবে না।

গবুচন্দ্র মন্ত্রী তখন মনে মনে ভাবলেন, ভাগ্যিস, এমন কোনো উল্টাপাল্টা রাজ্য নেই, পুরোটাই আষাড়ে গল্প। তিনিও ফিক করে হেসে পুরস্কার আনতে ছুটলেন। আরিফ জেবতিক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

205) আষাড়ে রোগ

মাইকেল জ্যাকসনের ওই গানটা শুনেছিস-‘আই শ্যাল নট লেট ইউ গো চোটা মামা?’
শুনিনি।

শোনার কথা নয়। এটা এক্সক্লুসিভলি আমাকে নিয়ে গাওয়া। কোনো অ্যালবামে যায়নি। আমি যখন ইন্ডিয়ানা থেকে চলে আসি, মানে যখন আমাকে ইন্ডিয়ানা থেকে প্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, তখন কেঁদে কেঁদে ওই গানটা গেয়েছিল-ছোট মামা, আমি তোমাকে যেতে দেব না।

উপমা একটুখানি কেশে বলল, ছোট মামা, তোমার আষাড়ে রোগটা পুরো সারেনি?

ছোট মামা গেয়ে উঠল, আষাড়-শ্রাবণ মানে নাকো মন, ঝরঝর ঝরঝর ঝরিছে।

ছোট মামা মানে কী? ছোটদের মামা, না মামাদের মধ্যে ছোট? যেটাই হোক তাঁর পরিচিতি ছোট মামা হিসেবে। থানার ওসি ডাকে ছোট মামা, সংস্কৃতিমন্ত্রীও ডাকে ছোট মামা, মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলে চোটা মামা।

পড়াশোনা করতেই তার ইন্ডিয়ানা যাওয়া, কিন্তু লেখাপড়া করে নষ্ট করার মতো সময় তার কোথায়? তার প্যাশন হচ্ছে গান। ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার ছবিঅলা টি-শার্ট আর কার-বুট সেল থেকে কেনা গিটার-দেখলেই চেনা যায় এই হচ্ছে ছোট মামা। ভূগর্ভে মেট্রো স্টেশনে সিনাত্রার গান

গেয়ে দু-চার ডলার কামিয়েছে সত্য, কিন্তু টার্গেট থেকে সরে আসেনি। কনভেনশন হলে গাইতে হবে।

জায়গাটাতে বর্ণবাদীদের আসর। কালো রঙের শিল্পীরা স্টেজে উঠতে পারে না।

‘কী করেছি শোন, শরীরের ওপরের দিকটা, শুদ্ধ বাংলায় যাকে চলে উর্ধ্বাঙ্গ, পুরোদস্তুর চুনকাম করিয়ে নিলাম। নিচের অংশ প্যান্ট ও জুতো-মোজার ভেতরেই থাকে, সমস্যা নেই। পুরোনো দিনের ইংরেজি গান গেয়ে কনভেনশন সেন্টার মাতিয়ে দিলাম। অডিয়েন্স থেকে কেবল ভেসে আসছে, ওয়ান মোর চোটা মামা।’

‘দর্শকদের মধ্যে পুলিশও ছিল। পুলিশ গান শুনতে পারবে না এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বিবিসি, এনবিসি, সিএনএন...ইন্টারভিউ শেষ করতেই পুলিশ বলল, স্যার, আর একটা ইন্টারভিউ। তখন আমার হাতে মাইকেলের অটোগ্রাফ খাতা, সই করা হয়নি। খাতাসুদ্ধ নিয়ে এল পুলিশ স্টেশনে। শুদ্ধ বাংলায় মানবদেহের যে অবস্থাকে তোরা বলিস দিগম্বর, আমাকে ঠিক তা-ই করা হলো। আমাকে ইন্টারোগেট করতে এসেছেন বড় সাহেব। তাঁর স্যুট, ওভারকোট, মাফলার ও হ্যাট দেখে আমার লজ্জা পাওয়ার অবস্থা।’ তিনি বললেন, ‘লজ্জা কিসের? তোমাদের মিস্টার গান্ধীও প্রায় দিগম্বরই থাকতেন।’

আমরা গান্ধী পাব কোথায়? তিনি বললেন, সত্যি কথা বলো, ওপরের দিকটা সাদা আর নিচের দিকটা কালো হলো কেমন করে? কোনটা জেনুইন?

ছোট মামা এত সহজ প্রশ্নে ঘাবড়ানোর লোক নয়। পটাপট বলে দিল, ‘আমার গ্র্যান্ডমা হোয়াইট লেডি আর গ্র্যান্ডপা বেঙ্গল ব্ল্যাকম্যান। এটা জিন ক্রোমোজোমের ব্যাপার। তুমি যত বড় পুলিশই হও না কেন, বুঝবে না। কন্সিনেশনের সময় গ্র্যান্ড মার হোয়াইট রংটা লেগেছে আমার উর্ধ্বাঙ্গে আর দাদুর কালোটা নিচে।’

পুলিশ সাহেব বললেন, মোস্ট ইউনিক জেনেটিক কন্সিনেশন। যা হোক, তোমাকে আমরা চোখে চোখে রাখব-মানে আন্ডার ওয়াচ। জ্যাকসন ফ্যামিলি তোমাকে তাদের জিম্মায় নিতে চাইছে। গ্র্যান্টেড।

থানা থেকে ছোট মামাকে ছাড়িয়ে নিল জোসেফ

ও ক্যাথেরিন জ্যাকসন। তাদের নয় সন্তানের পাঁচজন ‘দ্য জ্যাকসন ফাইভ’-জ্যাকি, টিটো, জার্মেইন, মার্লোন ও মাইকেলও এসেছে। ‘বুঝলি, টেনেহিঁচড়ে বাসায় নিয়ে গেল। ছোট বাসা, মানুষ ১১ জন। ক্যাথেরিন বলল, ১১ জনের যখন জায়গা হচ্ছে, ১২ জনেরও হবে। আমার স্বামীর ইচ্ছে, তুমি আমার বাচ্চাদের, বিশেষ করে মাইকেলকে ক্লাসিক্যালটা একটু ধরিয়ে দাও। তোমার থাকা-খাওয়ার চিন্তা আমাদের।’

মাইকেল ছোট মামার গলা জাপটে ধরে চুমু খেতে খেতে বলল, ‘গট দ্য আইডিয়া চোটা মামা। কী করতে হবে বুঝে গেছি। অর্ধেকটা নয়, পুরোটাই ব্লিচিং করে সাদা বানিয়ে ফেলতে হবে।’

‘বুঝলি, এভাবেই কালো ছেলেটা সাদা হয়ে গেল। হোয়াইটদের ধোঁকা দেওয়ার অপরাধে আমার ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়। তত দিনে আমি মাইকেলের মনে বঙ্গ-সংস্কৃতির বীজ বুনে দিয়েছি। ওই গানটা শুনিসনি-দ্য ওয়ে ইউ মেক মি ফিল-রূপে আমার আগুন জ্বলে যৌবন ভরা অঙ্গে কিংবা লম্বা সাদা মোজা পা আর দস্তানায় হাত ঢেকে নাচার সময় একটু পর পর নাজুক অঙ্গ চেপে ধরা-এর মানে মাইনকা চিপায় পড়ছিরে ভাই কেয়ারটেকার সরকার নিয়া। মন খারাপ ছোট মামার। আষাঢ় মাসের ১১ তারিখে মাইকেল জ্যাকসন বিদায় নিল। ছোট মামা বলল, এবার আমার পালা। রোগের প্রকোপটা বেড়ে যাচ্ছে। আন্দালিব রাশদী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

206) জাতীয় আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ়ের গল্পের মতো কিছু আজব গল্প আমাদের জাতীয় জীবনে মিশে আছে। এ গল্পগুলো এত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যে এগুলো এখন আষাঢ় ছাড়িয়ে বারোমাসি গল্পে পরিণত হয়ে গেছে। সে রকম কিছু গল্প শোনাচ্ছেন শাত শামীমতদন্ত কমিটি যেকোনো বড় ঘটনার পরই গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। এবং বলা হয়, এক-দুই সপ্তাহের মধ্যেই তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষীদের যত দ্রুত সম্ভব শাস্তি দেওয়া হবে। তদন্তের স্বার্থে এ মুহূর্তে আর বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে

তদন্ত সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে! তদন্তের পর দোষী যে দলেরই হোক না কেন; শাস্তি দেওয়া হবে। ক্রসফায়ার

কুখ্যাত সন্ত্রাসী আয়না মজিদ ধরা পড়েছে। তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর গভীর রাতে তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যায় র্যাব বাহিনী। সেখানে ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে র্যাবকে। শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। একপর্যায়ে ক্রসফায়ারে নিহত হয় আয়না মজিদ। ভোরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থলে তিনটি গুলিসহ অস্ত্র পাওয়া যায়! সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই

যেকোনো দলই ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে, সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। সে যে দলেরই হোক, শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা অতীতেও সন্ত্রাসীদের ছাড় দিইনি। নিজ দলের কেউ যদি দোষী চিহ্নিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহিস্কার করা হবে-এই আমাদের ওয়াদা! হরতালে বিটিভির সংবাদ

আজ সকাল থেকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব কটি বড় শহরের জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। অফিস-আদালতসহ স্কুল-কলেজে উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। দূরপাল্লার বাস ও ট্রেন ছেড়ে গেছে যথাসময়ে। ঢাকাসহ বড় কোনো শহরেই কোনো ধরনের সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। রাজধানী ঢাকায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। সংসদে যেতে চাই

বিরোধী দল মুখে মুখে সব সময়ই সংসদে যেতে চায়। টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে বলে, ‘আমরা অবশ্যই সংসদে যেতে চাই। জনগণের হয়ে কথা বলতে চাই। দেশ গড়ার কাজে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু সরকারই চায় না আমরা সংসদে যাই, জনগণের জন্য কথা বলি!’ সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

207) উল্টা কাহিনী

ঘুম ভাঙতেই ভীষণ চমকে উঠলাম আমি। এ কোথায় শুয়ে আছি? লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছাদের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। হঠাৎই বুঝতে পারলাম, আমি শুয়ে আছি খাটের নিচে। অবাক কাণ্ড! খাটের নিচে এলাম কী করে? তাড়াতাড়ি

বের হয়ে বাইরে এলাম। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি,
চুলার কাছে দুলাভাই। হচ্ছে কী এসব?

‘দুলাভাই, আপনি রান্নাঘরে কী করছেন?’

‘ডিম ভাজি করছি।’

‘মানে কী? আপা কই?’

‘তোমার আপা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ
পড়ছেন। যাও, তাড়াতাড়ি ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে
ফেলো। কুইক।’

‘ঝাড়ু দেব মানে? কী বলছেন এসব?’

আমি দ্রুত বারান্দায় চলে এলাম। এসে দেখি,
সত্যি সত্যি আপা খবরের কাগজ পড়ছেন।

পাশেই চায়ের কাপ। আপাকে বেশ কড়া গলায়
বললাম, ‘বাড়িতে উল্টাপাল্টা এসব কী হচ্ছে?

দুলাভাই রান্নাঘরে, তুমি এখানে বসে চা খাচ্ছ,
ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি খাটের নিচে-এসবের
মানে কী?’

‘ফাজলামো করছিস? জন্মের পর থেকে তুই তো
খাটের নিচেই ঘুমাচ্ছিস। শুধু তুই কেন, সারা
বিশ্বের মানুষ খাটের নিচে ঘুমাচ্ছে আর তোর
কাছে এটা নতুন লাগছে? যা চোখ-মুখে পানি
দিয়ে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে দে।’

‘আমি ঝাড়ু দেব?’

‘হ্যাঁ, তুই তো প্রতিদিনই ঝাড়ু দিস, আজ হঠাৎ
কী হলো? আর শোন, চায়ের কাপটা নিয়ে যা,
তোর দুলাভাইকে বল তাড়াতাড়ি নাশতা দিতে,
আমার অফিসের সময় হয়ে এল।’

আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। খবরের
কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ ছানাবড়া!

হেডলাইনগুলো সব ছোট করে লেখা আর
খবরগুলো লিখেছে বড় করে। নাহ্! আমি
নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছি। আর খবরও তো সব
উল্টাপাল্টা। উপকূলীয় এলাকায় গাছ লাগানোর
অপরাধে ২০ জন গ্রেপ্তার, ঘুষ না খাওয়ায়
পাঁচজনের ১০ বছরের জেল! আমি খেলার
পাতাটা খুললাম। আর যা-ই হোক, এখানে
অন্তত উল্টাপাল্টা কিছু থাকবে না। কিন্তু এ কী!
এখানেও একই ঘটনা। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে বিশ্ব
রেকর্ড করলেন মশরাফি, রেসলিংয়ের শিরোপা
জিতলেন রজার ফেদেরার, ৫ উইকেট পেলেন
শারাপোভা! নাহ্, পাগল যে হয়ে গেছি, এ
ব্যাপারে আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি, টেবিলে বসে আপা
দুলাভাইকে বলছেন,

‘আরে কী হলো, শুধু ডিম দিলে হবে? পরোটা কোথায়? অফিসের দেরি হয়ে গেল তো।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপা, বুয়া কোথায়?’

‘উনি ঘুমিয়ে আছেন। ওনাকে একদম বিরক্ত করবি না। কিছু দরকার হলে তোর কাছে চাইবে, তুই ব্যবস্থা করবি।’

মাথাটা খুব ব্যথা করছে। টিভিরুমে গিয়ে দেখি, আমাদের বুয়া টিভি দেখছে। আমাকে বলল, বেলা পইড়া আইল, অহনও নাশতা হয় নাই, তোমাগো দিয়া কোনো কাম ঠিকমতো হয় না। আমি চলে আসছিলাম, বুয়া আবার বলল, তুমি কিন্তু কামে খুব ফাঁকি দিতাছ। দুই দিন আগে কইছি বাথরুমটা পরিষ্কার কইরা দাও, এখনো করো নাই। এমন করলে আমি কিন্তু তোমার আপার কাছে নালিশ দিমু। যা করার সে করবে।...ইয়ে, একটু এম টিভিটা দাও তো দেখি!

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ওখানেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

208) বদলে যাওয়া বাংলাদেশ

সোবাহান সাহেব এসেছেন এনার্জি সেভিং বাল্ব কিনতে। দোকানদার তাঁকে বলল।

-ভাই, কত ওয়াটের দেব?

-আমার একটু বেশি ওয়াট লাগবে। ৫০০ থেকে ১০০০ ওয়াট হলেই ভালো হয়।

-তত বোধহয় পারব না। আচ্ছা, আপনি এই বাতি লাগাবেন কোথায়?

-আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে।

-কিসের ব্যবসা আপনার?

-আইপিএসের।

-কী বলছেন আবোল-তাবোল! বাংলাদেশে এখন আর কেউ আইপিএসের ব্যবসা করে নাকি?

-ভাই, বাংলাদেশে বিদ্যুৎব্যবস্থার এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

-ঠিক বলেছেন ভাই, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা হঠাৎ করেই তাপবিদ্যুৎ আবিষ্কার করলেন। আর তাতে দেশজুড়ে বিদ্যুতের খাম্বাগুলো কেমন কাজে এল দেখেছেন?

-আরে ভাই, যখন এই খাম্বাগুলো বসানো হয়, তখন তো দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে গেল। সবাই বলছিল, হাজার হাজার কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে শুধু

খাস্তা বসিয়ে দেশের ক্ষতি হয়েছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসলে ভাই, কারও ভালো করতে নেই। এখন দেখুন, এই খাস্তাগুলো রোদে গরম হচ্ছে। আর গরম খাস্তা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমরা এখন আমেরিকাতেও বিদ্যুৎ রপ্তানি করছি। আর এই সময়ে কিনা আপনি আইপিএসের ব্যবসা করছেন?

-করছি না তো। একসময় আইপিএসের সিরিয়াল নিতেও মানুষ লাইন দিত। আর এখন তো ব্যবসায় লালবাতি জ্বালানো ছাড়া গতি নেই। আপনার কাছে ১০০০ ওয়াটের লালবাতি থাকলে দিন। কোম্পানির গেটে লাগাব। দূর থেকেও যেন বোঝা যায় আইপিএসের ব্যবসায় লালবাতি।

-আপনি বরং একটা লাল ফ্লাড লাইট নিয়ে যান। এমন সময় রাস্তাজুড়ে বিশাল ব্যান্ড পার্টি আসতে দেখা গেল। সোবাহান সাহেব বললেন, এরা কারা?

-এটা ঢাকা সিটি করপোরেশনের আনন্দ মিছিল। বাংলাদেশ অলিম্পিক সাঁতারে গোল্ড মেডেল পেয়েছে, তাই।

-কিন্তু বিজয় মিছিল তো ক্রীড়া পরিষদের করা উচিত। আরে না, গোল্ড মেডেল পাওয়া সাঁতারু কী বলেছেন শোনেননি? তাঁর এই বিজয়ের পেছনে সবটুকু অবদান ঢাকা সিটি করপোরেশনের। ঢাকার জলাবদ্ধতা এখন এমন পর্যায়ে যে শীতকালেও রাস্তায় পানি জমে থাকে। আর তাই তিনি অফিসে যেতেন সাঁতার কেটে, অফিস লেট হওয়ার ভয়ে তিনি দ্রুত সাঁতার কাটতেন। ঢাকার জলাবদ্ধতা না থাকলে তাঁর সাঁতার শেখাই হতো না। তাই জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি সিটি করপোরেশনের কাছে কৃতজ্ঞ।

-আচ্ছা, আমার লালবাতির দাম রাখুন।

-ভাই, একটা অনুরোধ। আপনার কাছে কালো টাকা থাকলে প্লিজ, কালো টাকা দিন।

-না রে ভাই। আমার সব টাকাই সাদা।

ইস, দেশে এখন কালো টাকার এত কদর! অথচ কোনোভাবেই আমি কালো টাকা জোগাড় করতে পারছি না।

দেশে কালো টাকার মালিকেরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কালো টাকার মালিক সরকারি রেশন পান, মাসিক ভাতা পান, তাঁদের

ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাও ফ্রি। তাঁদের বউয়েরা প্রতি মাসে একবার সরকারি খরচে বিদেশে শপিংয়েও যান। তাই কালো টাকা না থাকার দুঃখে তারা দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মারুফ রেহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

209) বড় চাচার ফান ম্যাগাজিন

বড় চাচার ঘরে ঢুকতেই দেখি, বাড়ির ছোটরা সব তাঁর ঘরে। ঘটনা কী! গল্পটোল্লের ব্যাপার নেই তো? আমাকে দেখেই বড় চাচা বললেন, তুই নাকি এটাতে লিখিস, তোর নামও দেখলাম?

বড় চাচার হাতে রস+আলোর এ সপ্তাহের সংখ্যাটা। আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললাম, লিখি মাঝে মাঝে।

- কী ছাইপাঁশ লিখিস এসব?

ছোটদের সামনে বড় চাচার এ ধরনের সরাসরি মন্তব্যে অপমানিত বোধ করার কিছু আছে কি না, সেটাই যখন ভাবছিলাম, তখনই বড় চাচা বললেন, এসব ছাইপাঁশ পড়ে এরা আবার হাসেও দেখি। আরে, এতে হাসির কী আছে? হাসির পত্রিকা বের করতাম আমি আর আমার বন্ধুরা। সে গল্প বলব বলেই তোদের ডেকেছি। সেরেছে! যা ভেবেছিলাম, তা-ই। বানিয়ে একটা অজুহাত দিতে যাব, তার আগেই বড় চাচা শুরু করলেন, তখন আমরা সবে কলেজে উঠেছি। তোরা তো জানিসই, পড়ালেখায় আমরা সব বন্ধুই ছিলাম অসাধারণ। সবাই...

বড় চাচাকে থামিয়ে দিয়ে ঋতু বলে উঠল, এসএসসিতে তোমার কী রেজাল্ট ছিল, বড় চাচ্চু?

-আরে, সে তো আরেক ঘটনা। আমি, মশিউর... বড় চাচা আরেক গল্প ফাঁদতে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে বাধা দিই আমি, থাক, এটা পরে শুনব, তুমি আগে ওটা শেষ করো। বড় চাচা আবার শুরু করেন, তো আমরা কলেজে ভর্তি হওয়ার ছয় মাস যেতে না যেতেই লক্ষ করলাম, কলেজের দুই বছরের বই-ই আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। পড়ার আর কিছুই নেই! আমরা তখন কী করি? কিছু ভাবা না। তখন মশিউর বলল, আয়, একটা ফান ম্যাগাজিন বের করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আনন্দে ইউরেকা ইউরেকা বলে পুরো কলেজে একটা চক্র দিয়ে

দিলাম। সেই ‘ইউরেকা’ই হলো পত্রিকার নাম। তারপর থেকেই মনে হয়, মানুষ হঠাৎ কিছু পেয়ে গেলে ‘ইউরেকা’ বলে!

বড় চাচা বলে চলছেন, প্রথম সংখ্যাতেই তাক লাগিয়ে দিলাম। যে পড়ে সে-ই হাসে। যখন পড়ে তখন তো হাসেই, যখন পড়ে না, তখনো হাসে। একদিন মকবুল স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। তিনি নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা বলতেই আমিনুলটা হো হো করে হেসে উঠল। স্যার রেগে গিয়ে বললেন, নিউটনের এ সূত্রের কোন জায়গাটি হাসির, আমাকে বুঝিয়ে বল। কে শোনে স্যারের কথা, আমিনুল তখনো হেসেই চলেছে। স্যার ওকে মারতে যাবেন, এমন সময় ও হাসতে হাসতেই কোনোমতে বলল, তিন দিন আগে নাকি ও আমাদের পত্রিকার একটা লেখা পড়েছিল, সেটা মনে পড়েছে বলেই হাসছে! স্যার এবার আমাদের মারতে এলেন। বললেন, পত্রিকা বের করে ছেলেপেলোদের মাথা খাচ্ছ? দেখাচ্ছি মজা। আমি তখনই বুদ্ধি করে ব্যাগ থেকে আমাদের পত্রিকাটা বের করে দিলাম। প্রচ্ছদ দেখেই স্যারের সে কী হাসি! মজার ব্যাপার হলো, সপ্তাহ খানেক পর স্যার যখন আলোর প্রতিসরণ পড়াচ্ছিলেন, তখন নিজেই হেসে উঠলেন। তাঁর নাকি আমাদের পত্রিকার একটা কার্টুনের কথা মনে পড়েছে।...

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি কে জানে। সজাগ হতেই দেখি, চাচার গল্প প্রায় শেষ। ছোটরা একেকজন একেক প্রশ্ন করছে। আমিও কিছু একটা না জিজ্ঞেস করলে খারাপ দেখায়। তাই বুদ্ধি করে জানতে চাইলাম, বড় চাচা, তোমার পত্রিকাটা তো এখন আর বের হয় না। তা এটা বন্ধ হলো কেন?

বড় চাচা ফিসফিস করে বললেন, কাউকে বলিস না যেন! আমাদের পত্রিকা পড়ে মানুষজন হাসত, রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি খেত, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু একবার আমাদের পত্রিকা পড়ে একজনের হাসতে হাসতে পেট ফেটে গেল! তারপর আরও দুজনের একই অবস্থা। তারপর আরও অনেকের। এই যে লোকে বলে না, ‘হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাওয়া’-এ কথা তো এ ঘটনার পরই সৃষ্টি হয়েছে! এ রকম চলতে থাকলে তো আমাদের পুলিশে ধরত, ঠিক ফাঁসি হয়ে যেত। তাই গোপনে ওটা বন্ধ করে

দিলাম। আর সব কপিও পুড়িয়ে ফেললাম,
নয়তো আবারও যদি কারও হাসতে হাসতে
পেট ফেটে যায়!

রাতে ঘুমানোর আগে হঠাৎ বড় চাচার ঘর
থেকে তাঁর হাসির শব্দ শুনলাম। ব্যাপারটা কী
জানতে জানালা দিয়ে তাঁর ঘরে উঁকি দিতেই
দেখি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি রস+আলো
পড়ছেন! মহিতুল আলম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

210) লেট লতিফের গল্প

লতিফ সাহেব অফিসে সব সময় লেট করেন।
তবে ঘটনাটা কিন্তু তাঁর নামের কারণে নয়।
কীভাবে কীভাবে যেন লেট হয়ে যায়। প্রতিবারই
তাঁর বস জিজ্ঞেস করেন-

কী লতিফ সাহেব, আজকের লেট হওয়ার গল্পটা
কী?

স্যার, আমি ঠিক দুই ঘণ্টা আগে বাসা থেকে
বেরোলাম। আগে থেকেই একটা সিএনজি রেডি
করে রেখেছিলাম, যাতে আজ আর লেট না হয়।
তারপর রওনা দেব... সেই মুহূর্তে স্ত্রী বলল,
'এক মিনিট ওয়েট করো, আমি তৈরি হয়ে
আসি। আমাকে একটু রাপা প্লাজা নামিয়ে দিয়ে
যেয়ো...'। আমি ওর জন্য এক মিনিট ওয়েট
করলাম। তারপর দুজন একসঙ্গে বেরোলাম।
পথে দেখি স্যার, 'বানর-বন্ধন'।

মানে?

মানে এত দিন মানুষেরা 'মানববন্ধন' করেছে,
এবার দেখি ঢাকা শহরের সব বানর রাস্তা ব্লক
করে 'বানর-বন্ধন' করে দাঁড়িয়ে আছে!

ফাজলামো করেন মিয়া? ঢাকা শহরে বানর
পেলেন কোথায়?

কী বলেন স্যার, পুরান ঢাকায় গিয়ে দেখেন,
এখনো ছাদে ছাদে অনেক বানর দিবি ঘুরে
বেড়াচ্ছে। তারাই সব দলবেঁধে সংসদ ভবনের
সামনে বানর-বন্ধন করেছে।

তাদের দাবি কী?

তাদের দাবি, সংসদ ভবনের ওপর মোবাইল
টাওয়ার কেন? সংসদ ভবন পৃথিবীর দশটা
বিখ্যাত স্থাপত্যের একটি। এর ওপর কেন
টাওয়ার থাকবে? আপনি কি স্যার তাজমহলের
ওপর কোনো মোবাইল টাওয়ার চিন্তা করতে
পারেন?

তাতে বানরদের সমস্যা কী?

ওরা তো স্যার, আফটার অল আদি মানব... কেন স্যার, আপনি ডারউইন পড়েননি? ওদের ফিলিংস...

শাট আপ!! বস আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। কেন স্যার? আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

না, এটা সর্বৈব মিথ্যা!

স্যার, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে ঢাকার বানরেরা বানর-বন্ধন করতে পারে?

তা হয়েছে, তবে... ওই যে বললেন আপনার স্ত্রী এক মিনিটে রেডি হয়ে এলেন, এটা সর্বৈব মিথ্যা... চাপা! মেয়েরা কখনো এক মিনিটে রেডি হতে পারে না... নেভার এভার! ঠিক আছে যান... কাজ করেন। আপনাকে শেষ ওয়ার্নিং দিলাম। এরপর লেট করলে আমি আপনাকে ফায়ার করব।

পরদিন যথারীতি দেড় ঘণ্টা দেরি করে এলেন আব্দুল লতিফ। বস ডেকে পাঠালেন। থমথমে মুখ।

আজকের লেট হওয়ার গল্পটা কী?

স্যার, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। অফিসে যাতে দেরি না হয়, সে জন্য গতকাল আমি বাসায় যাইনি। অফিসের কাছে একটা গলির মোড়ে হোটেলে ছিলাম। তো সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালাম...দেখি গ্যালিলিও।

মানে?

মানে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি আমার কাছে একটু হেল্প চাইলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টটা করতে চান, সেই যে পাখির পালক আর লৌহখণ্ড পিসার টাওয়ার থেকে ফেলেছিলেন... দুটো একই সঙ্গে এসে নিচে পড়ে... মাধ্যাকর্ষণের টানে... সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট তিনি বাংলাদেশে করতে চান। বোঝেন স্যার, কত বড় মানুষ! তাঁকে না করি কীভাবে। তিনি বললেন, আমাকে একটা উঁচু টাওয়ারে নিয়ে যাও... তাঁর হাতে সময় কম। কী করি। একটা সিএনজি নিলাম মিটারে...তারপর দুজন ছুটলাম শিল্প ভবন। ২৪ তলার ছাদে উঠলাম। মহামান্য গ্যালিলিও পকেট থেকে একটা বার্গার আর পালক বের করলেন। আমি বললাম, ‘পালক ঠিক আছে কিন্তু বার্গার কেন?’ তোমাদের এখানে লোহা পেলাম না... আর এই

বাসি বার্গারটা লোহার চেয়েও শক্ত!

যা হোক, তিনি দুটোই ২৪ তলার ছাদ থেকে ছুড়ে দিলেন। আর তখনই আমার মাথায় ক্লিক করল। আমি চোঁচিয়ে উঠলাম, ‘স্যার, আপনার পরীক্ষা বাংলাদেশে ভুল প্রমাণিত হবে।’

কেন?

পালক আর বার্গার একসঙ্গে পড়বে না। বার্গার আগে পড়বে!

কেন?

কারণ বার্গার যে ফাস্টফুড!!

শাট আপ!! ... না পাঠক, গ্যালিলিও ধমক দিলেন না, দিলেন লতিফ সাহেবের বস!

স্যার, আপনি গল্পটা বিশ্বাস করলেন না?...

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে গ্যালিলিও গ্যালিলি ঢাকায় এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সেটা বিশ্বাস করেছি।

তাহলে?

ওই যে বললে, মিটারে সিএনজি নিয়ে গেলে।

এটা সর্বৈব মিথ্যা!! যাও, ইউ আর ফার্ড... গেট আউট।

চাকরি হারিয়ে আব্দুল লতিফ একটা পার্কে এসে বসলেন। মনটা খারাপ, সত্যি সত্যিই চাকরিটা গেল। এখন কী করা। তবে কি নামটা বদলে ফেলবেন? আসলে এখন মনে হচ্ছে, নামের কারণেই সবকিছুতে লেট হয়ে যাচ্ছে...

উল্টাপাল্টা হচ্ছে। কী করা? এসব নয়-ছয় যখন ভাবছিলেন, তখন হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল।

আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ... তিনি কাকভেজা হয়ে বসে রইলেন। তখনই তাঁর চোখ গেল ঘড়িতে! আরে,

কী আশ্চর্য! তাঁর দামি সুইডিশ ঘড়ি তো সব

সময় ২৪ ঘণ্টা ফাস্ট ...এত দিন খেয়ালই

করেননি। তার মানে তিনি কখনোই লেট

করেননি বরং এক দিন আগে অফিস করেছেন।

এত দিন কেউ বুঝতে পারেনি...তিনি ছুটলেন

অফিসে, বসকে বিষয়টা বোঝাতে হবে। অবশ্য

ঘাউড়া বস বুঝলে হয়!! আহসান হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

211) একটি আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ় মাস। আকাশ ঢাকা কালো মেঘে, ভেজা

বাতাস। টঙ্গীতে তুরাগের তীর ঘেঁষে সোমাদের

বাড়ি। বারান্দা থেকে নদীর অস্থির নাচন দেখতে

দেখতে সকালের চা খেয়েছে। এখন বেরিয়ে

পড়তে হবে। ক্লাস শুরু নটায়, যদিও মন পড়ে আছে আষাঢ়ের ঘনঘটায়। কিন্তু ভাই, ডিজিটাল মেজাজের স্যার, নটা মানে নটা। এক মিনিট দেহিতে গেলে দরজা বন্ধ সব কটা।

হাতে ছাতা আর আধা ঘণ্টা সময় নিয়ে বেরোল সোমা। তার সামনে যাওয়ার দুটি পথ, আকাশ-বাস অথবা পাতালরেল। বাড়ির সামনে থেকেই উড়ান-পুল, বাস নামে কলাভবনের কোলে। ২৬ মিনিট। পাতালে গেলে টিএসসি মোড়। ১৫ মিনিট। ডিজিটাল স্যারের কথা ভেবে পাতালেই নামল সোমা। ট্রেনে বেশ ভিড়, কিন্তু বসার জায়গা পেল। ছাতাটা ভাঁজ করে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ খুলে ই-কাগজে চোখ মেলল। খুব খারাপ একটা শিরোনাম, ‘খাদ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন’। কুষ্টিয়া কারাগারে খাবার খেয়ে এক বন্দীকে যেতে হয়েছে হাসপাতালে। ‘খাদ্যে কেন ই-কোলাই? মন্ত্রীমশাই জবাব চাই’ শিরোনামে সম্পাদকীয়টাও কড়া। মন্ত্রী এই গ্লানি মাথায় নিয়ে দিনাতিপাত করতে চান না। বন্দী যা হোক সেরে উঠেছে, মারা পড়েনি। তাহলে

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও পদত্যাগ করতে হতো। সোমা আরও পড়ল, বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ৫-০ তে ক্রিকেট টেস্ট সিরিজ জিতেছে। এটি অবশ্য ভালো খবর। কিন্তু মিডিয়া ভীষণ খেপেছে, ক্যাপ্টেন কেন দুই খেলায় ১৯০-এর ঘরে আউট হলেন সে জন্য। ‘দলপতির লজ্জাজনক ইনিংস’ প্রহারিক ই-আলো ক্রীড়া শিরোনাম করেছে। সোমা আনন্দিত, তার প্রতিবেশী টঙ্গীবাসী সাবরিনা টেনিসে উইম্বলডন শিরোপা জিতেছে। উইম্বলডন আবার আষাঢ়ে খেলা।

ট্রেনে রবীন্দ্রসংগীত বাজছে, কিন্তু শুনছে কে! সবার কানেই ওয়াইপড। কেউ গুনগুনিয়ে বা মনে মনে গাইলেও ওয়াইপড সেটিকে পূর্ণাঙ্গ সংগীতে সাজিয়ে কানে বাজায়। অর্থাৎ কেউ অন্য কারও গান শুনছে না, নিজেদের গলায় গাওয়া নানা সব গানই শুনছে। ‘ওয়াইপডের জমানায় কে কাকে হার মানায়’ গ্লোগানটা ট্রেনের গায়ে সাঁটা বিজ্ঞাপনেও আছে। সেটি দেখে সোমা হাসল।

কিন্তু কানে ওয়াইপড নেই একটি ছেলের। ২৫-২৬ বয়স। বসেছে সোমার উল্টা দিকে।

ছেলেটিকে আগেও কয়েকবার দেখেছে সে।

হয়তো গাজীপুর-রাজেন্দ্রপুর কোথাও থাকে।

চেহারাটা মায়াময়, চোখ দুটি যেন সারা দিন মেঘে ভেসে বেড়ায়। ওই মুহূর্তে যদিও সে দুটি মেলা তার পামটপের ওপর। পামটপটি ছোট, কিন্তু মহাশক্তিশালী। কে জানে, কোন সাইবার দিগন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলেটি। তার মনে গোপন একটা অভিলাষ জন্মালঃ ছেলেটার পাশে গিয়ে বসা চাই, কিন্তু কীভাবে?

ডানে-বাঁয়ে তাকাল সোমা। ডানে বসা লোকটাকে চেনা চেনা মনে হলো। ওহো! যোগাযোগমন্ত্রী। চোখাচোখি হতে সালাম দিল সোমা। মন্ত্রী একগাল হেসে বললেন, ‘কোনো অসুবিধা?’ সোমা বলল, ‘তেমন নয়, তবে গতকাল দুই মিনিট দেরিতে ছেড়েছে ট্রেনটি।’ মন্ত্রী বললেন, অভিযোগ পেয়ে নিজেই তদন্তে নেমেছেন। ‘দুই মিনিট! অসম্ভব!’ মন্ত্রী বললেন, ‘মানুষের সময় নিয়ে এ রকম ছিনিমিনি খেললে সহ্য করা যায়, বলুন।’

একটা স্টেশনে স্কুলের একগাদা ছেলেমেয়ে উঠল। মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে একজনকে বসতে দিলেন। সোমাও। বাচ্চারা হইচই করছে আর মায়াময় ছেলেটি মৃদু হাসছে। সোমা নিচু হয়ে বলল, ‘বাচ্চাগুলো কি কিউট, তাই না?’ ছেলেটির হাসি বন্ধ হলো। ‘কিউট একটি ইংরেজি শব্দ। এর বাংলা নেই?’ ছেলেটির পাশে কোনোক্রমে বসতে বসতে সোমা বলল, ‘আছে, মায়াময়।’

‘তাহলে বলুন, মায়াময়।’ ‘হ্যালো, মায়াময়’, সোমা বলল। এবং হাত বাড়িয়ে দিল। সোমার হাত নিজের হাতে নিতে ছেলেটির ভেতর একটা পুলকের স্রোত বয়ে গেল। কেন, ছেলেটি জানে না। একটা মুহূর্ত তার মুখে কথা জোগাল না। কিন্তু পামটপে কিছু আলো জ্বলল-নিভল। অর্থাৎ ছেলেটির শরীরের নিউরন-টিউরনগুলোতে ইঁশিয়ারি চলে গেল, ও মিয়া, সামাল দাও। ধাতস্থ হয়ে ছেলেটি বলল, ‘ইমন’। ‘সোমা’, ইমনের হাতটা ফিরিয়ে দিতে দিতে সোমার মনে হল, হাতটা বেশ দৃঢ়, মোটেও মায়াময় নয়। কিন্তু হাতের স্পর্শে পুলক তারও কিছু কম হলো না।

ছেলেটা বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ স্পেস পাওয়ার প্রজেক্টে কাজ করছে। কাজটা হচ্ছে মহাকাশে ভেসে বেড়ানো বিদ্যুৎ কণা মাটিতে নামিয়ে জাতীয় গ্রিডে জোগান দেওয়া।

ছেলেটির কথাগুলোও কী বিদ্যুৎময়! সোমার মনে হলো, তার ভেতরের সবগুলো অলিন্দে-জানালায় যেন আলো জ্বলে উঠল।

‘বলুন’, সোমা তার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে বলল।

মন্ত্রী নেমে যাবেন। সোমাকে বললেন, ‘কোনো সমস্যা হলে আমাকে একটা হাই-মেইল পাঠিয়ে দেবেন।’

হাই বা হাইপার মেইল হলো শুধু গ্রাহকের নাম লিখে যেকোনো টার্মিনাল থেকে ছেড়ে দেওয়া চিঠি। মন্ত্রীদের মানুষ অভিযোগ জানায় হাই-মেইলে। দিনে দুটো বা তিনটে হাই-মেইল পেলেই সাড়া পড়ে যায় সচিবালয়ে। দেশে হচ্ছেটা কী?

সোমা হেসে বলল, ‘জানাব’, কিন্তু আপাতত তার মনজুড়ে ইমন। টিএসসিতে না নেমে কার্জন হল মোড়ে নামল সোমা। ইমনের সঙ্গে আজ এনার্জি পার্কে যাবে। মাটির নিচে বিশাল দালানে চলছে বিরাট সব কাজ। ইমনের কাজের সময়ে ঢুকে পড়েছে সোমা, নিজের ক্লাসও বিসর্জন দিয়েছে। অথচ খারাপ লাগছে না কারোরই, বরং এক ফাঁকে কার্জন হলের ক্যাফেটেরিয়ায় একটা টেবিলে বসে পড়ল দুজন।

সোমার পাশের টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন চার অধ্যাপক। দুজনকে সে চেনে, রসায়নে নোবেল পেয়েছেন। অথচ কী সাদাসিধা, যেন নোবেল কী জিনিস তা-ই বুঝতে অপারগ। তাঁদের সঙ্গে একজন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। যেন কত বন্ধু তাঁরা।

জানালার কাছে আষাঢ়ের আঙ্গুল। সোমার ভেতরটা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সোমা বুঝল, কাজ ফেলে এই বসে বসে আষাঢ়ের-নাকি ইমনের-আঙ্গুলে আঙ্গুল চেপে শুধু কথা বলা আর কথা শোনা-এরই নাম ভালোবাসা।

কথাটা ইমনও বোঝে। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ‘কাজ’, জানাল ইমন।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। একটা ক্যাম্পাস-বাসে উঠে এখন যাবে সে কলাভবন, ঝকমকে তকতকে রাস্তা, চারদিকে কী সবুজ, আর কী সুন্দর সব দালান, যেন সাবান ডলে তাদের গোসল দিয়েছে আষাঢ়। আকাশ-পুলে চলছে এল ট্রেন, অথচ কোনো শব্দ নেই, তাড়া নেই, কোলাহল নেই।

ছবির মতো।

সোমা বলল, কাল দেখা হবে তো?

ইমনের চোখ ভেজা। ইমন কাঁদছে কেন? সোমা খুব অবাক হলো, আবার খুব আনন্দও হলো তার। কাঁদছে কেন, সে তো জানে! কিন্তু ইমনই বলুক, কেন।

‘ইমন?’ সে জিজ্ঞেস করল।

ইমন কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাত বাড়িয়ে সোমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। সেটি নিয়ে বুকের ডান দিকে রাখল।

ধুকপুক। একটি নয়, এক জোড়া ধুকপুকানির শব্দ। বুকের ডান দিকে।

ইমনের বুক থেকে হাত সরিয়ে মাথা নিচু করে পথে নামল সোমা। ছাতাটা ফেলে এসেছে ক্যাফেটেরিয়ায়। এখন সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হেঁটে যাবে কলাভবন অথবা অন্য কোথাও।

অথবা তার প্রিয় স্বাধীনতা উদ্যানে।

এখন সোমাকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হবে।

ইমনকেও। ইমনের কষ্ট, সে যদি মানুষ হতো!

না, কথাটা ঠিক হলো না, ইমন অমানুষ নয়, খুবই উৎকৃষ্ট মানুষ বরং, কিন্তু ছবির মানুষের মতো হলেও সে যে এক অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যান্ডি। ই-মন।

সোমার বোঝা উচিত ছিল প্রথমেই। ই-মন!

অ্যান্ডিদের প্রিয় নাম ই-মন। দুটো হৃৎপিণ্ড আছে বলে তাদের মনটা মানুষের মন থেকেও ভালো।

উদার। কিন্তু ওই পর্যন্তই, বাকিটা সব যন্ত্রময়।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সোমার হাসি পেল।

এখন তার কোনো বন্ধু তাকে দেখলেও বলতে

পারবে না, সে কাঁদছে। অথচ সে কাঁদছে, আর

এই হাইপার আষাঢ়টাও কাঁদছে তার সঙ্গে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

212) দৈনন্দিন জীবনে আষাঢ়ে গল্প

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা হামেশাই

নানা রকমের আষাঢ়ে গল্প ব্যবহার করি।

আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা এমন কিছু

আষাঢ়ে গল্পের নমুনা হাজির করছেন মেহেদী

মাহমুদ আকন্দ। কলেজছাত্রীর আষাঢ়ে গল্প

আম্মু, সামনে তো পরীক্ষা, পড়াশোনার খুব

চাপ। নোট তৈরি করার জন্য আজকে

অনেকক্ষণ লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হবে।

বুঝতেই তো পারছ, অনেক খাটা-খাটুনি যাবে।

বাসায় ফিরতে কিন্তু মা আজ অনেক দেরি হবে, তুমি আব্বুকে একটু বুঝিয়ে বোলো। ক্রিকেট দলপতির আঘাতে গল্প

আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি। প্রতিটি ম্যাচ থেকেই আমাদের শেখার কিছু আছে। গত যে সিরিজে আমরা হোয়াইটওয়াশ হলাম সেটা থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখেছি। সামনের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হলেও সেটা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, সেই মানসিক প্রস্তুতিও আমাদের সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল কোম্পানির আঘাতে গল্প

আমরাই দিচ্ছি সর্বোচ্চ গ্রাহকসেবা, আর সর্বনিম্ন কলরেট। ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে আমাদের গ্রাহকসংখ্যা এখন প্রায় ১০ কোটি। এখনো কথা বলতেই শেখেনি এমন শিশুরাও ব্যবহার করছে আমাদের ফোন। কাজেই আর দেরি কেন, বাকি চার কোটি মানুষও নিয়ে নিন আমাদের ফোন। প্রেমিকের আঘাতে গল্প

তুমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে তো আমি চোখ তুলেই তাকাই না, মেয়েদের স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি মুখে রুমাল দিয়ে যাই (শুধু চোখটা খোলা রাখি, নইলে তো আবার রাস্তা দেখতে পাব না)। বিশ্বাস করো, তুমিই আমার প্রথম প্রেম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আঘাতে গল্প

সব ধরনের টেস্টের ক্ষেত্রে ৬০% ছাড়। সম্পূর্ণ নির্ভুল রোগ নির্ণয়। ২৪ ঘণ্টা স্পেশাল সেবা। রেডি অ্যান্ডুলেস (কল করার পর শুধু লাইনে গ্যাস নিতে যতটুকু সময় লাগে)। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন... সর্বোপরি বাঁচুন আর মরুন, আমাদের হাসপাতালেই আসুন। শপিং মলের আঘাতে গল্প

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সর্ববৃহৎ মার্কেট, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (শুধু বাথরুম আর কানিকোনাতে এসি নেই), দরদামের বিচারেও সব মহাদেশের সর্বোচ্চ-এমন মার্কেটে শপিং করতে চাইলে এখনি চলে আসুন আমাদের শপিং মলে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

213) এসেছিলে তবু আসো নাই

আমার অস্থিরতা শুরু হলো মিলির ফোন আসার পর। সে আমাকে ডাকে ‘বর’। বর ডাকাই সংগত। কারণ, কয়েক দিন আগে গোপনে আমরা বিয়ে করে ফেলেছি। বিয়ের পর একটি

মেয়ে আহ্লাদ করে তার স্বামীকে বর ডাকতেই পারে। সেই স্বামী যতই অপদার্থ হোক। আমি পুরোপুরি অপদার্থ না হলেও কিছুটা অপদার্থ টাইপ। বাজে একটা সাবজেঞ্চে মাস্টার্স করেছি। চাকরিবাকরি পাইনি। স্কুলের নিচু ক্লাসের দুটো গবেট ছাত্র পড়াই। ওতে আমার হাতখরচটা চলে। বাবা ছোট চাকরি করতেন। সাত মাস হলো রিটায়ার করেছেন। সংসার চলে এখন বাবার পেনশনের টাকায়। পুরান ঢাকার বিশাল এক ছয়তলা বাড়ির ছোট একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকি আমরা। বাড়িটা মিলিদের। ওরা দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট জোড়া দিয়ে একটা করে থাকে। বাকি বাইশটা ভাড়া দেওয়া। মিলি তার মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। ভাবা যায়, এই মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম!

ঘটনাটা অবশ্য আমি আর মিলি ছাড়া কেউ জানে না।

আমাদের ঘটনা সিনেমার মতো। এই বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে আসার পরই মিলির সঙ্গে আমার প্রেম হয়। কয় দিন আগে গোপনে আমরা বিয়ে করে ফেলেছি। গোপনে বিয়ে সেরে না রাখলে ওর জাঁদরেল বাপ কিছুতেই তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার মতো অপদার্থের বিয়ে দেবেন না। আমরা দুজনেই আছি দুই কঠিন বাপের পাল্লায়। মিলির বাপ জাঁদরেল আর আমার বাপটা খুবই খ্যাড়খ্যাড়া টাইপের। রিটায়ারমেন্টের পর সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকেন আর আমার মুণ্ডুপাত করেন।

আমি একটু স্বপ্নজীবী টাইপের ছেলে। সারাক্ষণ মিলিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। মিলির ফোন এলে দরজা বন্ধ করে, চোরের মতো ফিসফিস করে কথা বলি। আপন বউয়ের সঙ্গে ‘তোমাকে খুব ভালোবাসি’ কথাটাও গলা খুলে বলতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে মিলি বলেছে, আজ আমার রুমে বাসররাত হবে। সন্ধ্যা থেকে আষাঢ় মাসের ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিই রোমান্টিক করে তুলেছে মিলিকে। একটু রাত হওয়ার পর নিঃশব্দে নিজের রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে সে। তার আগে আমাকে একটা মিসড কল দেবে। আমি যেন দরজা খুলে রাখি। মিলি আসার পর তাকে আমার রুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেব। ভোররাতের দিকে সে আবার একই কায়দায় ফিরে যাবে। সন্ধ্যা থেকে ছটফট

করছি কখন বাবা ঘুমাবে, কখন মিলি এসে
টুকবে আমার রুমে।

একসময় বাবা তাঁর রুমে চলে গেলেন। আমিও
লাইট অফ করে আমার রুমে ঘুমিয়ে পড়ার
ভান করছি আর মিলির স্বপ্ন দেখছি। কখন
আসবে মিলি, কখন?

একসময় মিলির মিসড কল এল। বিড়ালের
মতো নিঃশব্দে দরজা খুললাম। নির্বাধগাটে মিলি
আমার রুমে এসে টুকল। মিলিকে জড়িয়ে ধরে
মাত্র চুমু খাব, তখনই ডাইনিংস্পেসের লাইট
জ্বলে উঠল। আর আমার রুমের দরজায় ধুম
ধুম কিল। সঙ্গে বাবার গম্ভীর গলা, দরজা খোল
বাবলু। তাড়াতাড়ি। আমি প্রথমে হতভম্ব,
তারপর দিশেহারা। হায় হায়, বুঢ়া দরজা
খুলতে বলছে কেন? কী হবে এখন? আমার
মতো অবস্থা মিলিরও। লুকানোর জায়গাটা শেষ
পর্যন্ত সে-ই বের করল। আমার খাটের তলায়
গিয়ে নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে রইল। আমি দরজা
খুললাম। বাপধন টুকলেন। তোর রুমে কে
টুকেছে?

বাবার সামনে আমি সব সময়ই ‘মেকুর’ হয়ে
থাকি। মেকুর অর্থ বিড়াল। বিড়ালের মতো
মিউমিউ করে বললাম, কে টুকবে? আমি তো
দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে ছিলাম।

না না, টুকেছে। আমি টের পেয়েছি।

আমি মিউমিউ করে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা
করলাম। বাবা পাত্তাই দিলেন না। প্রথমে
এটাচড বাথরুম খুলে দেখলেন। কেউ নেই।
আমার পড়ার টেবিলের তলা, ওয়ারড্রবের পেছন
দিকটা, এমনকি ড্রয়ারগুলো পর্যন্ত খুলে
দেখলেন। না, কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত খাটের
তলায় তাকালেন, আমি ততক্ষণে আর বেঁচে
নেই, জিন্দা লাশ হয়ে গেছি।

আশ্চর্য ব্যাপার, খাটের তলায় বাবা মিলিকে
পেলেন না। তন্নতন্ন করে অনেকক্ষণ ধরে
খুঁজলেন, তারপর নিশ্চিত হয়ে একটা হাঁপ
ছাড়লেন। না, কেউ নেই। আমার সন্দেহ
হয়েছিল এ জন্য খুঁজলাম।

বাবা নির্বিকার ভঙ্গিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর
দরজা বন্ধ করে লাইট অফ করে ফিসফিসে
গলায় মিলিকে ডাকলাম। বেরিয়ে এসো মিলি।
এখন নো প্রবলেম।

মিলির সাড়া নেই। আমি আবার ডাকি। সাড়া

নেই। আবার। না, নো সাড়া। কী ব্যাপার,
খাটের তলায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?
লাইট জ্বলে খাটের তলায় তাকাই, না, মিলি
নেই। খাটের তলায় ঘাপটি মেরে থাকা বউটি
আমার কোথায় গেল?

আমি তারপর আমার বাপধনের কায়দায় সারা
ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজি, বাথরুমের দরজা খুলে
খুঁজি। না, মিলি নেই। মিলি কোথাও নেই।

ইমদাদুল হক মিলন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

214) আজব অভিযানের গল্প

ব্যারন ম্যুনহাউজেন

ছাদে ঝুলছে ঘোড়া ঘোড়ায় চড়ে রাশিয়া
যাচ্ছিলাম। সময়টা ছিল শীতকাল। প্রবল তুষার
পড়ছিল। চলতে চলতে আমার ঘোড়াটি এত
ক্লান্ত হয়ে গেল যে বেচারা হোঁচট খেতে লাগল।
সেই সঙ্গে আমারও প্রচণ্ড ঘুম পেতে লাগল।
পথে একটি বাড়িও আমার নজরে পড়েনি। কী
আর করা! বাধ্য হয়ে খোলা ময়দানেই শুয়ে
পড়তে হলো। কিন্তু কী মুশকিল! চারদিকে
কোনো ঝোপঝাড়, গাছ কিছুই নেই। কেবল
একটা ছোট্ট খুঁটি বরফের মাঝখানে বের হয়ে
আছে। সেই খুঁটির সঙ্গেই আমার ঘোড়াকে
কোনোমতে বেঁধে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই কী অবাক কাণ্ড! মাঠ,
বরফ সব উধাও। দেখতে পেলাম মাঠের
পরিবর্তে আমি একটি গ্রামের রাস্তায় শুয়ে
আছি। চারদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। ব্যাপার
কী? আমার ঘোড়াটাই বা গেল কোথায়? হঠাৎ
শুনি আমার ঘোড়ার সেই পরিচিত ডাক। কিন্তু
কোথায় সে? শব্দটি আসছে যেন আকাশ থেকে।
ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার ঘোড়াটি এক
গির্জায় ঝুলছে। তাও আবার বাঁধা আছে
একেবারে একটি ক্রুশের সঙ্গে।

এবার ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো।
গতকাল তুষার পড়তে পড়তে শহরটি মানুষসহ
বরফে চাপা পড়েছিল। গির্জা উঁচু ছিল বলে এর
ছাদের ক্রুশ বরফ থেকে বের হয়েছিল। আমি
না বুঝে এই ক্রুশটাকে খুঁটি ভেবে এর সঙ্গে
ঘোড়াটা বেঁধেছিলাম।

আর রাতে যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, আক্লিক
গরম পড়ায় সব বরফ গলে যায়। সেই সঙ্গে
আমিও বরফের নিচের মাটিতে পড়ে থাকি।

কিন্তু আমার বেচারা ঘোড়াটি ওপরেই রয়ে যায়।
কেননা, সে তো ত্রুশের সঙ্গে বাঁধা ছিল।
কী করা যায়? মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। টান মেরে
আমার পিস্তলটা বের করে নিশানা ঠিক করি
এবং দড়ির ঠিক মাঝখানে গুলি করি। দড়ি দুই
ভাগ। ঘোড়াটি উল্কাবেগে আমার কাছে নেমে
এল। আমি লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে
বাতাসের বেগে ছুটতে থাকি। নেকড়ে টানা
গাড়ি

কিন্তু শীতকালে বরফের ওপর ঘোড়ায় চলতে
খুবই অসুবিধা। তার চেয়ে ঘোড়াচালিত গ্লেজে
চলা উত্তম। তাই আমি একটি ভালো গ্লেজ
গাড়ি কিনে বরফের ওপর তীরবেগে ছুটতে
লাগলাম।

সন্ধ্যার দিকে চলতে চলতে আমি এক বনে
প্রবেশ করলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম ঘোড়ার
ভীতসন্ত্রস্ত ডাক। পেছন ফিরে দেখি ধারালো
দাঁতযুক্ত মুখ হাঁ করে এক ভয়ঙ্কর নেকড়ে
আমার গ্লেজের পেছনে ছুটছে।

বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। আমি গ্লেজের
মেঝেতে শুয়ে ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। আমার
ঘোড়াটি পাগলের মতো গ্লেজ টেনে ছুটে
যাচ্ছিল। আমি ঠিক আমার কানের কাছে
নেকড়ের গর্জন শুনতে পেলাম। কিন্তু ভাগ্যের
ব্যাপার, নেকড়েটি আমাকে খেয়ালই করল না।

সে লাফ দিয়ে আমার ঘোড়ার ওপর চড়াও
হলো। নিমিষে ঘোড়ার পেছনের অর্ধেক অংশ
তার ক্ষুধার্ত পেটে অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনের
অংশটি তখনো আতঙ্ক আর ব্যথায় ছুটছিল।

নেকড়েটি ক্রমেই সামনের অংশটিকে খেয়ে
ফেলতে লাগল। আমার বোধোদয় হতেই আমি
মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছোঁ মেরে চাবুকটি
তুলে নিয়ে জন্তুটাকে চাবকাতে শুরু করলাম।
সে ব্যথায় অস্থির হয়ে সামনে লাফ দিল এবং
নেকড়েটি লাগামের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি নেকড়েটাকে চাবকাতে থাকলাম। সে বাধ্য
হয়ে গ্লেজটিকে তীরবেগে টেনে চলল। তিন
ঘণ্টা পর এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পিটার্সবার্গের
মানুষ মুগ্ধ হয়ে দলবেঁধে রাস্তায় নেমেছিল
ভয়ঙ্কর নেকড়েকে কাবু করা বীরকে দেখতে।

অবিশ্বাস্য শিকার

পিটার্সবার্গের বিস্তীর্ণ হৃদে অসংখ্য বুনোহাঁস
কিলবিল করছিল। এদিকে আমার বন্দুকে

একটিও গুলি ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার ব্যাগে রাখা এক টুকরা চর্বির কথা। হুররে! ব্যাগ থেকে চর্বি বের করে তাড়াতাড়ি সেটা লম্বা চিকন রশির সঙ্গে বেঁধে পানিতে ফেলে দিই। একটি হাঁস লোভীর মতো তা গিলে ফেলে। কিন্তু চর্বি ছিল পিচ্ছিল এবং তা দ্রুত হাঁসটির পাকস্থলী অতিক্রম করে পেছন দিয়ে বের হয়। এভাবে হাঁসটি আমার রশিতে গাঁথা হয়ে যায়। অতঃপর আরেকটি হাঁস চর্বির নিকটবর্তী হয় এবং তার বেলায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

একের পর এক হাঁসগুলো চর্বি গিলতে থাকে এবং আমার রশিতে গেঁথে যায় ঠিক যেন মালার মতো। ১০ মিনিট যেতে না যেতেই সব কটা হাঁস আমার রশিতে বন্দী হয়ে গেল। খেঁকশিয়াল সুচের মাথায়

একবার রাশিয়ার গহিন জঙ্গলে আমি খেঁকশিয়ালের দেখা পেয়েছিলাম। তার চামড়াটা এত সুন্দর ছিল যে গুলি করে চামড়াটা নষ্ট করতে মায়া হলো।

এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে আমি বন্দুক থেকে গুলি বের করে সেখানে একটা সুচ ভরলাম; ঠিক যেমনটি মুচিরা জুতা সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। সুচ ভরা শেষ হতেই আমি খেঁকশিয়ালটিকে গুলি করলাম।

খেঁকশিয়ালটি একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল বলে সুচটা তার লেজ ভেদ করে তাকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। আমি তাড়াহুড়ো না করে খেঁকশিয়ালটির কাছে হেঁটে গেলাম এবং চাবুক দিয়ে তাকে চাবকাতে শুরু করলাম।

খেঁকশিয়ালটি ব্যথায় এত উন্মাদ হয়ে গেল যে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু সে তার চামড়া থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ খালি গায়ে পালিয়ে গেল। আর চামড়াটি আমি পেয়ে গেলাম একেবারে অক্ষত অবস্থায়। ব্যারন ম্যুনহাউজেনঃ ইতিহাস বিখ্যাত গুলগল্প সম্রাট ছিলেন ব্যারন।

১৭২০ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বলা গল্পগুলো রুডলফ এরিখ রাসপে সংগ্রহ করে ১৭৮৬ সালে দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্যারন ম্যুনহাউজেন নামে প্রকাশ করেন। সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

215) ভাবছেন আষাড়ে?

তৃতীয় তলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে
নিচতলায় পৌঁছালেও তাঁর হাত-পা কিছুই ভাঙল
না। শুধু মাথায় আঘাত লেগে নৃতীশক্তি চলে
গেল। দেশি-বিদেশি হাজারো চিকিৎসক,
কবিরাজেও কোনো ফায়দা হলো না। শেষমেশ
মাথার ওই জায়গায় আস্ত এক বাঁশের বাড়ি
খেয়ে নৃতীশক্তি ফিরে এল। ভাবছেন এটা
আষাড়ে গল্প?

হাজার হাজার টাকা খরচ করে আজকালের
মায়েরা কত সাধ্য-সাধনা করছেন বাচ্চাদের বড়
করতে। কিন্তু তাঁর মায়ের এ নিয়ে কোনো দিন
ভাবতেই হয়নি। একটা গান গাইলেন, আর তিন
মিনিটেই তাঁর ছেলে বড় হয়ে গেল। ভাবছেন
গুল মারছি?

পূর্ণ তারুণ্যে তিনি এখন টগবগে। ভর্তি হলেন
কলেজে। সারা বছর তিনি প্রেম করে বেড়ালেন,
বিজয় দিবস কিংবা কলেজে নবীনবরণে গান
গেয়ে বেড়ালেন। সব করতে দেখা গেল, শুধু
পড়তেই দেখা গেল না। তবু পরীক্ষার ফল
প্রকাশের দিন ইয়াহু! বলে তিনি লাফ দিলেন।
ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হলেন। কলেজের কৃতি ছাত্র
হিসেবে বক্তৃতাও তিনিই দিলেন। এও সম্ভব!
কলেজের ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়েও আজ তিনি
বেকার, পথে পথে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে
ঘুরলেন, জুতাও পলিশ করলেন, কিছুতেই ভাগ্য
ফিরল না। অবশেষে কিনলেন এক লটারির
টিকিট এবং প্রথমবারেই কেজ্জা ফতে! মুহূর্তে
কোটিপতি, রমরমা অবস্থা। একটু অপেক্ষা
করুন, এটা আষাড়ে গল্প নয়!

ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ে কখনো নাস্তানাবুদ
হয়েছেন? টাকা না থাকলেও গায়ের জামা
নিশ্চয়ই হারিয়েছেন? তাঁর ঘটনা উল্টো। নিরস্ত্র
একজন মানুষ, খালি হাতে ১০ জন মানুষকে
লাশ করে ফেললেন। ছুরি, চাপাতি, হকিস্টিক-
সবই ফেল মারল, এমনকি বন্দুকের গুলিতেও
কিছু হলো না; গুলি পিছলে গেল, দাঁত দিয়ে
আটকে ফেললেন!

কোনো এক দুর্ঘটনায় পরিবার থেকে তিনি
বিচ্ছিন্ন। না পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, না মাইকে
ঘোষণা, তবু তিনি ফিরে পেলেন হারানো মা,
বাবা, ভাই-বোন। কীভাবে? একটি গান গেয়ে,
যা তিনি ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলেন।

বুঝতে পারছি না গানের মহিমা, নাকি গলার জোরের মহিমা! যা-ই হোক, এটাও আষাঢ়ে গল্প নয়।

গুন্ডা-বদমাশ কিংবা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে। হাত-পা, গলা, মুখ-কিছুই অক্ষত নেই। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, কোনো দাগও তাঁর শরীরে নেই! কোনো প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়াই তিনি আগের মতোই ঝকঝকা, ফকফকা। তবে হ্যাঁ, স্পটক্রিমও তিনি ব্যবহার করেন বলে কেউ দেখেনি। বলছি তো, এটি কোনো আষাঢ়ে গল্প নয়!

গরিব ঘরের সন্তান, ঠিকমতো খেতে পান না।

তার পরও তাঁর পোশাকের অভাব নেই।

যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো

পোশাক পেয়ে যাওয়া তাঁর বাঁ হাতের খেল।

আর সেই সব পোশাকও বাহারি, ঝলমলে

নতুন। আর পোশাকের ডিজাইন? সেটা সম্পূর্ণ

তাঁর মেজাজের ওপর নির্ভরশীল!

প্রেমিকার সঙ্গে ডেটিংয়ে যাওয়া নিয়ে তাঁকে

কোনো দিন চিন্তা করতে হয় না। কী পরবেন,

কী বলবেন কিংবা কোন চায়নিজ রেস্টুরেন্টে

বসবেন-এসব চিন্তা দূরে থাক, তাঁকে আসার

ভাড়াটাও জোগাড় করতে হয় না। বিদেশে

থাকলে তাঁকে কুমির নদী পার করে দেয়।

নইলে তিনিই দৌড়ে চলে আসেন। দূরত্ব তাঁর

কাছে কোনো ব্যাপারই না! স্ট্যামিনা বটে। যা-ই

বলুন না কেন, এটা মোটেই আষাঢ়ে গল্প নয়!

গান গাওয়া আজকাল খুব বেশি কঠিন কিছু না,

অনেকেই জানেন। কিন্তু তালের আকালের এ

যুগে তাঁর কণ্ঠে নিঁখুত তাল ও লয়সমৃদ্ধ গান

বেজে ওঠে। আর বাদ্য? সে তো না চাইতেই

হাজির। অলৌকিকভাবে গান ও বাজনা

আকাশে-বাতাসে ভাসতে থাকে। শুধু তাঁর

মেজাজের ওপর নির্ভর করে গানটা রোমান্টিক

হবে, নাকি দুঃখের হবে। এও সম্ভব, সত্যি

বলছি।

নির্দিধায় তিনি মানুষ হত্যা করেন। জোতদার,

অপরাধী, যে-ই তাঁর ক্ষতি করে থাকুক না কেন,

তার মৃত্যু অবধারিত। এবং সবচেয়ে অবাক

ব্যাপার হলো তার কখনো ক্রসফায়ার হয়না,

হত্যার শাস্তি মাত্র ছয় মাস হাজতবাস। হাজত

শেষে সসম্মানে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ

করে এলাকাবাসী। পাঠক, ভাবছেন এতক্ষণ

যেসব কথা বলছি পুরোটাই আষাঢ়ে গল্প?
ফালতু কথা? মোটেই না। যার কথা বলছি তিনি
আমাদের অতি পরিচিত-তিনি একজন বাংলা
সিনেমার নায়ক। খাদিজা ফাল্গুনী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৩, ২০০৯

216) সত্যি স্নেহকাম

একজন ভদ্রমহিলা বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে
তিনজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। মুহূর্তের
মধ্যেই তিনজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হাতাহাতিতে
রূপ নিল। ঘটনা বেশিদূর এগোনোর আগেই
হেলপার সবাইকে ঠান্ডা করল। কাহিনীটা খুবই
স্বাভাবিক-বয়স্ক ওই ভদ্রমহিলা বাসে উঠেছেন
দেখে তাঁরা তিনজনই নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে
ওই মহিলাকে বসতে দিতে চেয়েছিলেন।

সবারই এক কথা, ‘উনি আমার সিটে বসবেন।’
ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর বুকটা আমার গর্বে
ভরে উঠল-আহা! আমার সোনার দেশ! অথচ
কোনো এক দেশের কথা সেদিন পত্রিকায়
পড়লাম, সে দেশে নাকি মহিলাদের জন্য বাসে
সংরক্ষিত আসন রাখা আছে, তার পরও নাকি
ছেলেরা সেসব আসনে বসে থাকে; মহিলারা
বললেও তারা আসন ছাড়ে না, নানা রকম তত্ত্ব
বয়ান করে।

বাস আবার চলতে শুরু করেছে। আমার পাশের
আসনের লোকটি সাত দিনের অভুক্ত মানুষের
মতো বাদাম চিবিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ছাগলটা
বাদামের ছাল পকেটে রাখছে কেন? বাদাম
খেয়ে পেট না ভরলে বোধহয় ছাল খাওয়া শুরু
করবে। বাস এত দ্রুত যাচ্ছে, আমার অফিসের
তো এখনো তালাই খোলা হয়নি। বাসটা
সিগন্যালে থামল। অমনি পাশের লোকটা দৌড়ে
বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে
বাদামের ছালগুলো ফেলে আবার বাসে উঠল।
আহা! ধন্য ধন্য আমার দেশের মানুষ!!

পুরোনো এয়ারপোর্টের সামনের সিগন্যালে নেমে
পড়লাম। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি,
আমাদের প্রধানমন্ত্রী হেঁটে হেঁটে তাঁর কার্যালয়ের
দিকে যাচ্ছেন! সঙ্গে কোনো পুলিশ বা অন্য
কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার একেবারে
কাছাকাছি চলে এলে মুচকি হেসে সালাম
দিলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে সালামের উত্তর
দিলেন, রাস্তায় দাঁড়িয়েই কেমন আছি, কী
করছি, বাসায় কে কে আছে জানলেন। এদিকে

আমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, চা-বিস্কুট না খাইয়ে তিনি ছাড়বেনই না। অনেক কষ্টে রেহাই পেলাম তাঁর হাত থেকে। মোটামুটি দৌড়ে দৌড়ে অফিসের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম এক ট্রাফিক সার্জেন্ট এক বাস-চালককে গরম পানি দিয়ে কুলকুচা করাচ্ছে আর তার হাত ধুয়ে যাচ্ছে। ওই বাসের যাত্রীদের কাছে জানতে পারলাম, কাগজপত্রহীন ওই বাসটি ট্রাফিক সার্জেন্ট আটকানোর পর ড্রাইভার ঘুষ দিতে চেয়েছিল। এমন অন্যায় কথা যে মুখ দিয়ে বলেছিল, সেই মুখ পরিষ্কার করতেই এই কুলকুচা, আর যে হাত দিয়ে ঘুষ দিতে চেয়েছিল সেই হাত ধোয়ার অভিযান চলছিল। আহা! ওহো! আহ্! শান্তি! সোনার দেশ আমার! সেদিন বিদেশি কোনো পত্রিকায় পড়লাম-সে দেশে ট্রাফিক সার্জেন্টরা রাস্তা আটকে চাঁদাবাজের মতো চালকদের কাছ থেকে বখরা আদায় করে। কোথায় সে দেশ আর কোথায় আমার সোনার বাংলাদেশ! আহা! দৌড়াতে দৌড়াতে অফিসে ঢুকে দেখি, সবাই নিজ নিজ ডেস্কে বসে কাজ করছে। অথচ ইন্টারনেটে সেদিন এক দেশের কথা পড়লাম, সে দেশে অফিস সময়ে নাকি কাউকে পাওয়াই ভার; বেশির ভাগ সময়ই তারা বিভিন্ন চ্যানেলে টক শোতে কাটায়। সত্যি বিচিত্র সেসব দেশ! তারা আমাদের এই সোনার দেশকে যে কেন আদর্শ হিসেবে নেয় না, বুঝি না। মেহেদী মাহমুদ আকন্দ

সূত্রঃ প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০০৯

217) চাঁদ থেকে যায় দেখা

৪০ বছর আগে আজকের এই দিনে নিল আর্মস্ট্রংরা বেড়িয়ে এসেছেন চাঁদ মামার বাড়ি থেকে। আমরা আরও ৪০ বছর পরও মামার বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারব না, কিন্তু তার পরও রস+আলোর পক্ষ থেকে চাঁদের বুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, চাঁদ থেকে তিনি বাংলাদেশকে চিনতে পারছেন। চাঁদ থেকে চাঁদের বুড়ি কী কী দেখে বাংলাদেশকে চিনতে পারলেন তা-ই জানাচ্ছেন শাত শামীমমোবাইল ফোনের টাওয়ার

আইফেল টাওয়ার বানিয়ে কী বাহাদুরি করে ফ্রান্স, আর বাংলাদেশের মোবাইল কোম্পানিগুলো দেশের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত

কয়েক হাজার টাওয়ার বানিয়ে চুপচাপ বসে আছে! কোনো ঢাকটোল পেটানো নেই, অহংকার নেই। বুড়ি হয়ে গেছি তো, চোখে আগের মতো দেখতে পাই না। তার পরও দেখি, কী সুন্দর টাওয়ারের মাথায় একটা লাল বাতি জ্বলছে। এত লাল বাতি জ্বলা দেখলেই বোঝা যায় বাংলাদেশ ওইখানে! সংসদ ভবন মাঝখানে অনেক দিন এটা চোখে পড়েনি। এখন আবার লাইট জ্বলে, হালকা-পাতলা আওয়াজ আসে এখন, সুন্দর দেখতে পাই। চীনারা বলে, আমি নাকি কেবল গ্রেটওয়াল দেখতে পাই! তাহা মিথ্যা কথা। নিল আর্মস্ট্রং এসে আমাকে দুরবিন দিয়ে গেছে, আমার চোখে দুটি লেন্স বসিয়ে দিয়ে গেছে। যাক, শুনেছি এ ঘরটায় নাকি বড় নেতারা কথা বলে, গরিব একটা ছোট দেশে নেতাদের জন্য এমন একটা ঘর বুঝি আমার চোখে পড়বে না! ভাঙা সেতু শুকনা জায়গা লম্বা লম্বা সেতু, আবার কোথাও কোথাও অর্ধেক আছে অর্ধেক নাই। আবার কোথাও পুরো সেতু আছে কিন্তু আগা-গোড়া নাই, এমন অদ্ভুত সুন্দর জিনিস আর কোথাও দেখি না, সময় পাইলে আমারে একটু জানাইয়ো, এগুলো কেন এমন দেখতে। বুড়িগঙ্গা সারা পৃথিবী ঘুরে বেশির ভাগই তো দেখি শুধু পানি আর পানি। কিন্তু এমন কালো পানি আর কোথাও দেখি নাই। আমার ঘ্রাণশক্তি অত ভালো না, তার পরও এদিক দিয়া যাওয়ার সময় নাক-মুখ টিপ দিয়া যাইতে হয়। পল্টন ময়দান খোলা আকাশের নিচে প্রায় প্রতিদিন একই জায়গায় এত লোক কী করে, কেন জমা হয় আমার মাথায় ধরে না। প্রথম প্রথম ভাবছিলাম কোনো খেলাধুলা হয় বা সিনেমার শো দেখায়। কিন্তু না, আবহাওয়া ভালো থাকায় একবার ভালো করে তাকাইয়া দেখি একজন একটু উঁচুতে দাঁড়ায়ে কী বলছে। মজার কোনো জোকস হলে আমারে বলতে পারেন! আবহাওয়া ভবন নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স আর এডউইন অলড্রিন যখন এত কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছে, তখন আমার সম্পর্কে অনেক গোপন কথা তাদের বলে দিয়েছি। এখন প্রায় সবাই এগুলো ধার করে শুনে অনেক কিছু আগে থেকেই জেনে যাচ্ছে। কিন্তু একটা ভবন আছে,

যারা শুধু উল্টাপাল্টা বলে। দেখা গেল পরদিন থেকে কড়কড়া রোদ থাকবে, বলে কিনা ভারী বর্ষণ হবে। দেখলেই হাসি পায়! **সূত্রঃ** প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০০৯

218) দিনকাল

বিলাস গরু চরাতে মাঠে এসেছে। এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে রিমোট কন্ট্রোল। প্রতিটি গরুর কানের কাছে একটি করে রিসিভার যন্ত্র। পাচনবাড়ির দরকার হয় না, রিমোটের বোতাম টিপেই ত্যাগড় গরুকে বশে রাখা যায়। সবুজ দেড় বিঘা লম্বা পুষ্টিকর ঘাসে ছাওয়া মাঠটি। পাশেই রামরতন ঘোষের মস্ত ধানক্ষেত। ক্ষেতের পাশে একটা বেলুন চেয়ারে বসে রামরতন তার রিমোট কন্ট্রোলে ক্ষেতে ধান রুইছে। রামরতনের রোবট যন্ত্রটি দেখতে অবিকল একটা বাচ্চা মেয়ের মতো। প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে। যন্ত্র-বালিকা ঠিকমতোই ধান রুইবে। তবে রামরতনের যন্ত্র-বালিকাটির দোষ হলো, চোখের আড়াল হলেই খানিকটা এক্কাদোকা খেলে নেয়। হয়তো আগে অন্য রকম প্রোগ্রাম করা ছিল, সেটা পুরোপুরি তুলে না দিয়েই নতুন প্রোগ্রাম বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য রামরতনের একটু ঝামেলা হচ্ছে। বিলাস তার বেলুন চেয়ারটায় বসতে বসতে হাঁক মারল-ও রামরতন দাদা, বলি করছটা কী? রামরতন বিরক্ত মুখে বলল, চার একর জমিতে ধান রুইতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগার কথা। আর ওই বিচ্ছু মেয়ে ঝাড়া দুই ঘণ্টায় এক একরও পারেনি। বিলাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দাও না। রামরতন বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে তো কথাই ছিল না। যেই স্পিড বাড়াব, অমনি ফাঁক ফাঁক করে বুনতে শুরু করবে। তাতে কাজ বাড়বে বই কমবে না। যন্ত্রটা তাহলে তোমাকে খারাপই দিয়েছে। বদল করে নাও না কেন? রামরতন টিস্যু কাগজে মুখ মুছে বলে, সে চেষ্টা কি আর করিনি নাকি? যন্ত্র-বালিকা হলে কী হয়, মাথায় খুব বুদ্ধি। মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে বাবা আর আমার গিনিকে মা বলে ডাকতে শুরু

করেছে। এখন আমার গিন্নির এত মায়া পড়ে গেছে যে মৃগনয়নীকে ফেরত দেওয়ার কথা শুনলেই খেপে ওঠেন।

মৃগনয়নী কি ওর নাম?

আমার গিন্নির দেওয়া। ওই দেখ, আবার খেলতে লেগেছে।

বাস্তবিকই মৃগনয়নী ধান রোয়া ফেলে একটা স্কিপিং দড়িতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। মুখে হাসি।

রামরতন রিমোটটা তুলে ধরে বোতাম টিপে মেয়েটাকে ফের কাজে লাগিয়ে দিলে বলল, সারাক্ষণ এই করতে হচ্ছে।

ফেরত না দাও, রিপ্ৰোগ্রামিং করিয়ে নিলেই তো পারো। ওরা ডিস্কটা ভালো করে পুঁছে আবার প্রোগ্রাম করে দেবে।

রামরতন বিমর্ষ মুখে বলে, সে চেষ্টাও কি আর করিনি? গিন্নি তাও করতে দিচ্ছে না। বলে, ও যে দুষ্টুমি করে, খেলে তাতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

দুজনে কথা হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ আকাশে একটা গোল গোল মেঘ দেখা দিল, আর ছ্যাড় ছ্যাড় করে বৃষ্টি হতে লাগল।

বিলাস চমকে উঠে বলে, আরে বৃষ্টি হচ্ছে কেন?

এখন তো বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। বলে

রামরতন হাতের রিমোটটা উল্টে নম্বর ডায়াল করতে লাগল। রিমোটটার উল্টো পিঠটা টেলিফোনের কাজ করে।

রামরতন বলল, হাওয়া অফিস? তা ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে এখন বৃষ্টি হওয়াচ্ছেন কেন? আমরা তো বৃষ্টি চাইনি।

হাওয়া অফিস খুব লজ্জিত হয়ে বলে, এঃ হেঃ সরি, একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা হওয়ার কথা সাহাগঞ্জের মাঠে। ঠিক আছে, আমরা মেঘটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মেঘটা হঠাৎ একটা চক্রর খেয়ে ভেঁ করে মিলিয়ে গেল। আবার রোদ দেখা দিল।

বিলাস ক্ষুব্ধ গলায় বলে, হাওয়া অফিসটা আর মানুষ হলো না। ওরে ও বিলাস, তোর গরু যে আমার ক্ষেতে ঢুকে যাচ্ছে, এখনই সব তছনছ করবে।

বিলাস তাড়াতাড়ি রিমোট তুলে বোতাম টিপতেই কেলে গরুটা থমকে একটু শিং নাড়া দিল।

তারপর সুড়সুড় করে আবার ফিরে এসে ঘাস

খেতে লাগল। বিলাস বলল, রামরতনদা, তোমার রিমোটটা আমাকে দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি মৃগনয়নীকে সামলে রাখবখন।

বাঁচালি ভাই, এই নে, বলে রিমোটটা বিলাসকে দিয়ে রামরতন সবে চোখ বুজেছে, এমন সময় হঠাৎ মৃগনয়নী কাজ ফেলে দুড়দাড় করে দৌড়ে এল। ও বাবা!

রামরতন বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে বলল, কী বলছিস?

ভূতে ঢেলা মারছে যে!

অ্যাঁ!

এই এত বড় বড় ঢেলা। এই দেখ। বলে মৃগনয়নী একটা ঢেলা হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

আর এই সময়েই আরও দু-চারটে ঢেলা ওদিককার ক্ষেত থেকে উড়ে এসে আশপাশে পড়ল। ব্যাপারটা নতুন নয়, আগেও দু-চারবার হয়েছে। রামরতন শুনকোনো মুখে বিলাসের দিকে চেয়ে বলে, কী করি বল তো!

বিলাস বলল, কার ভূত?

তা কী করে বলব?

দাঁড়াও, থিওসফিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।

বিলাস ডায়াল করে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে কার ভূত দৌরাত্ম্য করছে তা জানেন?

ও হলো ষষ্ঠীচরণ সাহার ভূত। ওকে চটাবেন না।

কিছু একটা করুন। ক্ষেতের কাজ যে বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সে আমাদের কন্ম নয়। ভূতের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে? চোখ-কান বুজে সয়ে নিন।

বিলাস ফোন বন্ধ করে বলে, ষষ্ঠী খুড়োর ভূত। কেউ কিছু করতে পারবে না।

রামরতন একটু খিঁচিয়ে উঠে মৃগনয়নীকে বলে, তোর এত আদিখ্যেতা কিসের? ঢেলা পড়ছে তো পড়ুক না। তোর তো আর ব্যথা লাগার কথা নয়।

মৃগনয়নীর চোখ ভরে জল এল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না লাগেনি বুঝি! এই দেখ না, কনুইয়ের কাছটা কেমন ফুলে আছে।

সত্যিই জায়গাটা ফোলা দেখে রামরতনের চোখ

ছানাবড়া হয়ে গেল। বিলাসের দিকে চেয়ে বলল, এ কী রে? রোবটেরও যে ব্যথা লাগছে আজকাল।

বিলাস বলল, শুধু কি তাই? চোখে জল, ঠোঁটে অভিমান, নাঃ, দিনকাল যে কী রকম পড়ল! রামরতন মৃগনয়নীকে বকবে বলে বড় বড় চোখ করে ধমকাতে যাচ্ছিল, মৃগনয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না কেন বাবা?

রামরতনের রাগ জল হয়ে গেল। ঠিক বটে, সে মানুষ আর মৃগনয়নী নিতান্তই যন্ত্র-বালিকা। কিন্তু সব সময় কি আর ওসব খেয়াল থাকে? রামরতন হাত বাড়িয়ে মৃগনয়নীকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কাঁদিসনে মা, তোকে খুব সুন্দর একটা ডলপুতুল কিনে দেব।

বিলাস মুখটা ফিরিয়ে একটু হাসল।

[সংক্ষেপিত]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ঃ ভারতীয় লেখক। ১৯৩৫ সালে তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

সূত্রঃ প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০০৯

219) খামের আঠা কি স্বাস্থ্যসম্মত?

খামের আঠা কি স্বাস্থ্যসম্মত?

এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন শের শাহ (এর আগে ঘোড়ার ডাকতে পারত না বলে প্রচলিত আছে)। আর নিঝুম রাতে হ্যারিকেন হাতে রানারের ছুটে চলার চিহ্নসংবলিত ডাক বিভাগের প্রচলনের ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন না হওয়ারই কথা। আধুনিক (?) এই ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধানে আঠাযুক্ত হলুদ খামের আবির্ভাবের ইতিহাসও তাই খুব একটা প্রাচীন নয়। আমাদের আজকের এই মহান রসকীর্তির আলোচ্য বিষয়ও এই হলুদ খাম।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, খামের পেছনের ওপরের দিকে জনগণের সুবিধার্থে অগ্রিম আঠা লাগিয়ে দিয়েছে ডাক কর্তৃপক্ষ। জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে সেটি জুড়ে দিতে হয়। সঠিকভাবে খামটি জুড়ে দেওয়ার জন্য সেই আঠা খুবই অপরিয়াপ্ত। এর চেয়ে বড় কথা, সেখানে যে আঠা ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি কি স্বাস্থ্যসম্মত? ডাক বিভাগ জেনে শুনে কিসে মুখ দিতে বাধ্য করছে আমাদের?

এমনিতেই আমাদের মাছে, ফলে, সবজিতে ফরমালিন; বাতাসে সিসা। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে খাবার। এর ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যদি সরকারি ডাক বিভাগও একই রাস্তায় হাঁটে, তবে সেটি অবশ্যই আতঙ্কের বিষয়। খামে ব্যবহৃত সেই আঠা ফুড গ্রেডেট কি না, বিএসটিআই অনুমোদিত কি না- এসব নিয়ে দেশের কোনো মহলেই কোনো আলোচনা নেই। জিভ দিয়ে সেই আঠা সিঁদ্ধ করতে গিয়ে সবাইকে কিছু না কিছু পরিমাণ আঠা খেতেই হচ্ছে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী যে প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে কেউ বিচলিত নয়। এই আঠার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে হতে পারে যেকোনো মারাত্মক রোগ। তাই আসুন, আমরা নিজেরা সচেতন হই, ডাক কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই আঠাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ঘোষণা না করা পর্যন্ত জিভ না লাগিয়ে অন্য আঠা দিয়ে খাম জোড়া লাগাই। অন্তত শুকনো আঠা ভেজাতে পানি ব্যবহার করি। আশা করি, কর্তৃপক্ষ খামে স্বাস্থ্যসম্মত ফুড গ্রেডেট আঠা ব্যবহারে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, জুলাই ২০, ২০০৯

220) সত্যিকারের আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ় মাসের রাত। বৃষ্টি হচ্ছে ঝুম। গল্পের বই পড়তে পড়তে কখন যে বাতি না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। মাথার কাছে ঠান্ডা কিছুর স্পর্শে ঘুম ছুটে গেল। চোখ খুলেই টের পেলাম, একটা ধাতব কিছু আমার পাশে দাঁড়িয়ে-ওই প্রাণীটা।

‘যাও, বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে।’ ধাতব কণ্ঠে আদেশ দিল সে।

গর্দভটা বলে কী? কোথায় সে এই অসময়ে আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য মাফ চাইবে, তা না করে বলে কিনা হাত-মুখ ধুয়ে আসতে।

এর আগেও সে কয়েকবার এসেছিল। তার একটাই চাওয়া, তাকে পৃথিবীর সাহিত্য-জগৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া।

আমি তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে খাটে গিয়ে বসলাম। ভিনগ্রহের প্রাণীটা আমার চেয়ারে বসে আছে।

তারপর বলো, কী খবর তোমার? গত কয় মাস

কেমন দেখলে পৃথিবী?

ভালোই। তোমরা প্রযুক্তিতে এখনো পিছিয়ে থাকলেও সাহিত্যে অনেক এগিয়ে গেছ।

আমাদের সাহিত্য নিয়ে ব্যাটার ছোট মুখে বড় কথা একদমই মানাচ্ছে না। আমার মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল। পারলে তার চুলহীন টাক মাথায় দুটো চাঁটি মারি।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি এই অসময়ে আমার আরামের আশাড়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর কারণটা জেনে তাড়াতাড়ি তাকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি। হ্যাঁ, বলো তোমার সিরিয়াস কথাটা কী?

‘তোমাদের সাহিত্য নিয়ে আমার টিম গত কয় মাস বেশ স্টাডি করেছে। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের অনেক কিছুই আমরা নিতে পারছি না। বিশেষ করে ইলজিক্যাল বিষয়গুলো।

আমরা তোমাদের মতো ইমোশনাল কিংবা অ্যান্টিলজিক্যাল না। তোমাদের ঈশপের গল্পগুলো সেদিক থেকে বেশ লজিক্যাল।’

তাহলে তোমাদের দিয়ে সাহিত্য হবে কী করে? সাহিত্যে তো ইমোশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্ট, যেটা তোমাদের নেই বলেই আমি নিশ্চিত।

কিন্তু আমি আরও একটা ধারা পেয়েছি, যেটা নিয়ে আমরা বোধহয় কাজ করতে পারব?

আমি খুব অবাক হলাম। এই জাতের

ইমোশনলেস একটা প্রাণী আমাদের পৃথিবীতে কী এমন খুঁজে পেতে পারে? আমি অবাক ভাবটা না দেখিয়ে খুবই নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কী সেটা?

আশাড়ে গল্প।

আশাড়ে গল্প! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এ কী বলে সে! আশাড়ে গল্প নিয়ে ওরা কী করবে? তোমাদের গ্রহে কী বৃষ্টি হয়? আশাঢ় মাস আছে? আমি মোটামুটি প্রায় খেপে উঠলাম। তুমি লজিকহীনভাবে রেগে উঠছ। শোনো, তোমাদের দেশের বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে আমি আশাড়ে গল্পের ভাবটা বেশ পেয়েছি। আমাদের বিজ্ঞাপনে তুমি আশাড়ে গল্পের কী দেখতে পেলো?

আমি টিভিতে দেখেছি মডেলরা সেজেগুজে বিভিন্ন প্রসাধনের গুণগান গায়। কিন্তু আমি ওই সব বিজ্ঞাপনের শুটিং দেখেছি। ওদের হাজার

হাজার টাকা খরচ করে পারলার থেকে
মেকআপ করিয়ে এনে ১০-২০ টাকার পণ্যের
গুণগান করতে বলা হয়। ওরা তা-ই করে।
আমি মনে মনে গাধাটার একটু প্রশংসা করতে
বাধ্য হলাম। তো, এখন তুমি আমার কাছে কেন
এসেছ?

তোমার সঙ্গে আমার যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে
আলোচনা করতে আসা, সেটা আমি করে
ফেলেছি।

আমার মনেই ছিল না এই গাধাটা আবার ওদের
গ্রহের স্পেশাল এজেন্ট। থট রিডিং-জাতীয়
একটা কাজ সে খুব অনায়াসে নাকি করতে
পারে।

আমি এখন যাব। বলেই ভিনগ্রহের প্রাণীটা
যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। ঠিক এই সময়
আমার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছোট বইটা
তুলে নিল। তারপর বলল, তবে আমাদের
গবেষণায় তোমাদের গ্রহের সবচেয়ে সেরা
আষাঢ়ে গল্প যেটাকে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে,
এই জাতীয় গল্পের বইগুলো।

গাধাটাকে আমি কী করে বোঝাই যে ওটা গল্পের
বই না।

আমরা এর মধ্যে এ রকম অনেক বই সংগ্রহ
করেছি। বলেই সে ব্যালকনির দিকে পা বাড়াল।
ওগুলো দিয়ে তোমরা কী করবে?

কিছু না। আমাদের গ্রহের আষাঢ়ে গল্প
লেখকদের স্যাম্পল হিসেবে এই বইগুলো
পড়তে দেব। বলেই ব্যালকনিতে রাখা তার
ছোট স্পেস ডাইভটি সূক্ষ্ম শোঁ শোঁ শব্দে চালু
হয়ে গেল।

আমি রীতিমতো অবাক। ভিনগ্রহের প্রাণী
সম্পর্কে এত দিনের আমার উঁচু ধারণাগুলো
গাধাটা সত্যি সত্যি নষ্ট করে দিয়ে গেল। আমি
কোনোভাবেই ভেবে পাই না, রাজনৈতিক দলের
নির্বাচনী ইশতেহার কীভাবে ওদের চোখে
পৃথিবীর সেরা আষাঢ়ে গল্প হতে পারে। তাওহিদ
মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৭, ২০০৯

221) ছোটবেলার বন্ধু

প্রচণ্ড গরমে ঘেমে বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু
করলাম। মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাকে
জোর করে ওভেনে ভরে মুরগি গ্রিল করার
মতো করে গ্রিল করছে। এই গরমে হেঁটে

বাসায় যাওয়া অসম্ভব। সুন্দর একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে পড়তে হবে। কিছুক্ষণ এসির বাতাসে রেস্ট নিয়ে রোদটা কমলে তারপর হাঁটা শুরু করব। রাস্তার পাশেই অনেক ফাস্টফুডের দোকান। সবগুলোতেই এসি আছে। হাতের ডান পাশের দোকানটায় ঢুকে পড়লাম। আহ! কী শান্তি! এই দোকানে যারা কাজ করে, তাদের মতো সুখী আর কে আছে? কী ঠান্ডা! কোনার দিকের একটা টেবিলে বসতে গিয়ে চমকে উঠলাম আমি। একেবারে পেছনের টেবিলে ওটা কে? নাজমুল না? হ্যাঁ, তাই তো। সঙ্গে আবার একটা মেয়েও আছে দেখছি। শালা, তোকে কত খুঁজেছি। সব বেকার খোঁজে চাকরি আর আমি খুঁজেছি তোকে। আমার ১১ হাজার ১৬৪ টাকা মেরে দিয়ে এখানে বসে আরামে জুস খাচ্ছিস! আজ কে তোকে আশা দেবে? টাকা আমি আদায় করবই। দ্রুত নাজমুলের সামনে গিয়ে বললাম, ‘আরে দোস্ত, তুই?’ নাজমুল থতমত খেয়ে বলল, ‘কবির, কেমন আছিস? কত দিন পর দেখা। জলি, ও আমার ছোটবেলার বন্ধু কবির। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস।’ আমি বসলাম। মেয়েটার নাম তাহলে জলি। কোনো ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি টাকার কথাটা তুললাম আমি, ‘নাজমুল, তুই মনে হয় আমার ১১...’ পায়ে একটা লাথি খেয়ে চুপ করে গেলাম। নাজমুল বলল, ‘আরে ভুলিনি। তুই অঙ্কে ১১ পেয়েছিলি। তারপর স্যার তোকে ১১টা বেতের বাড়ি মেরেছিল, সব মনে আছে। এত দিন পর দেখা, একটু ভালো খাওয়াদাওয়া না হলে কি হয়? চল, অর্ডারটা দিয়ে আসি।’ ব্যাটার মতলবটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না। বলেই ফেললাম, ‘নাজমুল! তুই টাকা দিবি কি না বল। বহুদিন ঘুরিয়েছিস, সিম বদলিয়েছিস। ভেজাল করলে তোর সব প্রেমের ইতিহাস ওই জলির কাছে বলে দেব।’ একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল নাজমুল। বলল, ‘দোস্ত, তোর পায়ে ধরি, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা হয়ে আছে, পাগড়ি-শেরওয়ানিও কিনে ফেলেছি। প্লিজ, তুই এসব কিছু বলিস না। পারলে আমার সম্পর্কে ভালো কিছু বলিস। আমি এখান থেকে বেরিয়েই তোর টাকা দিয়ে দেব। এই তো পাশেই এটিএম বুথ।’ এবার একটু শান্তি পেলাম। সোজা কথায় কোনো কাজ

হয় না। টেবিলে ফিরে এসে ভাবছি, ওর সম্পর্কে ভালো কী বলব? ওর কোনো কিছুই তো ভালো না। ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতে বললাম, ‘বুঝলেন ভাবি, নাজমুল ছিল তুখোড় ছাত্র। একবার হায়ার ম্যাথে ১০০-তে ৯৫ পেয়েছিল! তাই নারে?’ নাজমুলের মুখে কোনো কথা নেই। জলি বলল, ‘কী যে বলেন ভাই, ওর তো হায়ার ম্যাথই ছিল না, আপনি হয়তো ভুল করছেন।’ ‘ও তাই তো, অনেক দিন আগের কথা, হতে পারে, হতে পারে। তবে ও ভালো ক্রিকেট খেলত। ছয় মেরে একবার জালাল স্যারের চশমা ভেঙে ফেলেছিল।’ জলি খুব অবাক হয়ে বলল, ‘কই, খেলার কথা তো আমাকে বলোনি। তুমি তো বলেছ খেলাধুলাই করতে না। মিথ্যে বলেছ কেন?’ নাজমুল আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, ‘ওই দু-এক দিন খেলেছি, তেমন কিছু না। ইয়ে...তোরা বস, আমি একটু এটিএম বুথ থেকে আসছি।’ এটিএম বুথে যাচ্ছে! তার মানে আজ টাকাটা পাব! ১১ হাজার ১৬৪ টাকা দিয়ে কী করব তাই ভাবছিলাম, হঠাৎ জলি বলল, ‘আপনারা খুব পুরোনো বন্ধু, তাই না?’ ‘হ্যাঁ, একদম ওয়ান থেকে কলেজ পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এমনকি স্কুল থেকে আমাদের টিসিও দিয়েছিল একসঙ্গে।’ জলি খুশি খুশি কণ্ঠে বলল, ‘ওমা, তাই নাকি? কী সুইট!’ আমার উঠল রাগ। দুজনকে একসঙ্গে টিসি দিয়েছে এর মধ্যে সুইটের কী আছে? নাহ! দেশের অবস্থা খুব খারাপ। জলি ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কথা শেষে বলল, ‘কবির ভাই, আপনি বসেন, আমি একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছি।’ ‘যান, কোনো সমস্যা নেই।’ আবার টাকার কথা ভাবতে লাগলাম আমি। একটা মুরগি সদকা দেব নাকি? এত দিন পর টাকাটা পাব! দোকানের বাকিটাও শোধ করতে হবে... শালা নাজমুল, এত দিন পালিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হলো না। এমনি হয়, ভালো মানুষের টাকা নিয়ে বেশি দিন বিটলামি করা যায় না। কিন্তু ব্যাটা এখনো আসছে না কেন? এটিএম বুথটা তো পাশেই। জলিও তো আসছে না। কী যে করি! ওয়েটার ৭১৮ টাকার বিল দিয়ে গেছে। মানে কী? এই টাকা কে দেবে? ওয়াশরুমের

সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, অন্য এক মহিলা বেরিয়ে এল। ঘটনা বুঝতে আর বাকি রইল না। দরজা খুলে বেরোতে যাব, ওয়েটার বলল, ‘স্যার, বিলটা...।’ মানিব্যাগে ৭২০ টাকা ছিল, দুই টাকা রেখে পুরোটা দিয়ে এটিএম বুথের কাছে এলাম। বুথের গার্ড ছাড়া কোথাও কেউ নেই। হায় হায় রে! টাকার আশায় ওর বাসার ঠিকানা, নম্বর কিছুই নেওয়া হয়নি। আমি ফুটপাথেই বসে পড়লাম। নাজমুল রে, তুই এটা কী করলি! আবার পালালি! আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৭, ২০০৯

222) ভালুক কানে কানে

বলল...

সেই যে এক ভালুক এক বন্ধুর কানে কানে বলেছিল, বিপদেই বন্ধুর প্রকৃত পরিচয়! ভালুক কীভাবে কানে কানে কথা বলেছিল, সে প্রশ্ন সেদিনও কেউ করেনি, আজও কেউ করছে না। প্রকৃত বন্ধু-সম্পর্কিত তেমনই কিছু গল্প শোনাচ্ছেন মেহেদী মাহমুদ আকন্দ ওভারব্রিজ, চাকু ও দুই বন্ধু দুই বন্ধু ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎ একজন লোক দুই হাতে দুই চাকু নিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। উল্টো দিকে ভেঁ দৌড় দিয়ে পালাতে গিয়ে একজন আছাড় খেয়ে পড়ল। অন্যজন হাতের ব্যাগ, পায়ের স্যান্ডেল ফেলে কোনো রকমে ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আছাড় খেয়ে পড়া লোকটি যখন নিচে নেমে এল, তখন ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া লোকটি রাস্তার পাশে বসে ব্যথায় চাপা চিৎকার করছে। বন্ধুকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, কী খবর দোস্ট, ছিনতাইকারী কী করল, কী বলল? একগাল হেসে বন্ধুটি উত্তর দিল, উনি বললেন, চাকু বিক্রেতাকে ছিনতাইকারী ভেবে নিজের বন্ধুকে ফেলে ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ নয়। ফেইসবুক বন্ধু ফেইসবুকে এক মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে সোহেলের। তারপর একদিন সে তার বন্ধু তারেককে নিয়ে ওই মেয়ের সঙ্গে পার্কে দেখা করতে গেল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু কাঁপছে-কোনো ঝামেলা হবে না তো? ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল, মেয়েটা হেঁটে হেঁটে আসছে। তার দুই পাশে হোমরাচোমরা দেখতে

দুই তরুণ। তারেক কিছু বুঝে ওঠার আগেই
সোহেল ‘পালা, পালা’ চিৎকার দিয়ে দৌড় দিল।
তারেক অনেক চেষ্টা করেও দৌড় দিতে পারল
না, ভয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। মেয়েটা এসে
ওর সামনে দাঁড়াল। লোক দুটো পাশ কাটিয়ে
চলে গেল। পরদিন দেখা হলে সোহেল
তারেককে জিজ্ঞেস করল, ‘দোস্ত, মাইর কি
বেশি পড়ছে? মেয়েটা কী কইল?’ মেয়েটি
বলল, তোকে আজই ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে বাদ
দিয়ে দেবে আর আমাকে অ্যাড
করবে। নকল(বাজ) বন্ধু!

রায়হানের জানে জিগার বন্ধু সাকিব। নকল
করা এবং নকল করে ধরা পড়া উভয় কাজেই
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে সে। নকল করে
ধরা পড়ার পর তার প্রতিক্রিয়াও ছাত্রছাত্রী
মহলে বেশ নজর কেড়েছে। ধরা পড়ার সঙ্গে
সঙ্গে সে স্যার বা ম্যাডামের পায়ে ধরে
একেবারে সোজাসুজি মেঝেতে শুয়ে পড়ে। মাফ
না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। একবার এক স্যার এর
পরও মাফ করতে রাজি না হওয়ায় স্যারের
পায়ে কামড়ে দিয়েছিল ও। যা হোক, ফাইনাল
পরীক্ষা চলছে। রায়হানের পেছনের সিটেই
বসেছে সাকিব। যথারীতি চলছে নকল করা।
বড়সড় একটা প্রশ্নের উত্তর লেখা প্রায় শেষ।
এমন সময় ম্যাডাম এদিকেই আসছেন দেখে
তড়িঘড়ি করে নকলটা সামনের দিকে টিল দিয়ে
রায়হানের টেবিলে ফেলল সাকিব। ম্যাডাম এসে
রায়হানের টেবিলে নকল পেয়ে ওর খাতা নিয়ে
গেলেন। পেছন পেছন গেল রায়হান। অনেক
কাকুতি-মিনতির পর ম্যাডাম ২০ নম্বর মাইনাস
করে খাতা ফেরত দিলেন। রায়হান নিজের
সিটে এসে বসলে সাকিব জিজ্ঞেস করল, কী
রে, ম্যাডাম তোকে কী বললেন রে? রায়হান
জবাব দিল, ম্যাডাম বললেন, সঠিক উত্তরপত্র
সরবরাহকারী বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। যে প্রশ্নের
উত্তরপত্র আমার কাছে পাওয়া গেছে, সে প্রশ্ন
নাকি আজকের পরীক্ষায় আসেইনি। ভালুক নয়,
চিতা বাঘ

দুই বন্ধুকে তাড়া করেছে এক চিতা বাঘ।
কিছুতেই ওদের সঙ্গে পেরে উঠছে না বাঘটি।
একটু পরই দুই বন্ধুর একজন হোঁচট খেয়ে
মাটিতে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি না
পেয়ে মরার ভান করে পড়ে রইল সে। অন্য

বন্ধুটি যথারীতি গাছের মগডালে উঠে পড়ল। চিতা বাঘ এসে দেখল, একজন মরার মতো পড়ে আছে। তারপর বুদ্ধিমান ওই চিতা বাঘ কোথেকে কোথেকে চামড়ার জুতা, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি এনে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তখন মগডালে বসে থাকা বন্ধু মরার ভান করে পড়ে থাকা বন্ধুর মোবাইলে ফোনে জিজ্ঞেস করল, ‘চিতা বাঘ তোর কানে কানে কী বলল?’ সে উত্তর দিল, ‘বাঘ বলল, চিতা বাঘ কিন্তু গাছেও উঠতে পারে।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৭, ২০০৯

223) উল্টো জন্ম

গ্রামের এক বড়সড় বাজার। মানুষজনের আগমন, বেচাকেনার ধুমধাম আর পকেটমার, চাপাবাজ, টাউটবাটপারের আনাগোনাও কম নয়। সেই বাজারের এক কোণায় একটু নিরিবিলিতে দু-তিনটি হোটেল। সেই হোটেলগুলোর একটার ভেতরে বসে হোটেলের মালিক ও তার এক বন্ধু গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিল। তখন একটা লোক বড় একখানা ধামা হাতে করে হোটেলের সামনের রাস্তায় দাঁড়াল। তার খুঁতনিতে ছাগলা দাড়ি, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ কোটরাগত, মাথাভর্তি টাক। দেখতে অনেকটা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া পেশাদার সাক্ষীর মতো। লোকটি ইতিউতি তাকাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সে কাউকে খুঁজছে। হোটেলমালিকের বন্ধু বলল, লোকটা চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মতলব সুবিধার না। হোটেলের মালিক বলে, ‘না, কারও জন্য অপেক্ষা করছে। তাই আগন্তকের দৃষ্টি পথের দিকে, বারবার উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে।’ হোটেলমালিকের বন্ধু বলে, ‘যেভাবে তাকাতাকি করছে, তাতে একে একটু প্যাঁচে ফেলা যায় না? একটু রগড় তো হবে!’ হোটেলওয়ালা বলল, ‘চেহারা দেখে মনে হয়, সহজ মাল না। তবে যেভাবে ব্যাকুলের মতো হাবভাব করছে তাতে ভালোমতো বিপদে ফেলা যায়। তবে তা না করে রগড়ের ঢংয়ে একটু চিকনে মাইর দিয়া কিছু আদায় করা যায়।’ বন্ধু বলল, ‘চাঁদাবাজির যুগে বুদ্ধিটা মন্দ না।’ হোটেলওয়ালা বন্ধুকে নিয়ে বাইরে এল। বাইরে আসার আগে বাবুর্চিকে ডেকে গোশতে খুশবুদার

মসলা দিয়ে বাগাড় দিতে বলল। ফলে অল্প সময়েই রান্না করা গোশতের গন্ধে চারদিক ম-ম করতে থাকল।

হোটেলমালিক ছাগলদাড়ি টাকমাথার কাছে গিয়ে বলে, ‘ওই মিয়া, খিদা লাগছে? হোটেলের ভিতরে আইসা অর্ডার দেন, যা খুশি খান।

তারপর বিল মিটাইয়া চইল্যা যান। তা না কইরা রাস্তায় খাড়াইয়া অর্ধেক খাওন খাইতেছেন।

এইডা কী কারবার!’

লোকটি বলল, ‘অর্ধেক খাওন খাইতেছি মানে?

আমি একজন মানুষের জন্য খাড়াইয়া আছি।’

হোটেলমালিক বলল, ‘মিয়া, ফাঁকতালে অর্ধেক

ভূরিভোজনের তালে আছেন তা বুঝি না মনে

করছেন? জানেন না, ঘ্রাণ শুকলে অর্ধভোজন

হয়ে যায়! দাম ফালান।’ লোকটা হঠাৎ অন্য

রকম হয়ে যায়। দৃষ্টি কঠোর, চোয়াল শক্ত এবং

চেহারা প্রচণ্ড আস্থা। ফিচকে হাসি হেসে বলে,

‘ও, ঘ্রাণে অর্ধভোজনের সেই গন্ধ? রান্নায়

জিহ্বায় পানি আনা গন্ধ তো ঠিকই পাচ্ছি। নাক

সুখ পাচ্ছে, কিন্তু উদর তো চোঁ চোঁ করেও

পাচ্ছে না কিছু!’ এই বলে সে কুঁচকানো

পাঞ্জাবির পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের

করে হোটেলওয়ালার কানের কাছে কয়েকবার

টং টং করে বাজিয়ে বলল, ‘আমার নাকের

সুখানুভূতিতে অর্ধেক ভোজন যদি হয়ে থাকে,

তাহলে পয়সার টং টং শব্দ কানে শুনে

তোমারও অর্ধেক দাম পাওয়া হয়ে গেছে। ইবার

ফুট। গিরিজি কইরো মানুষ চিনা!’ শামসুজ্জামান

খান সম্পাদিত গ্রামবাংলার রঙ্গ রসের গল্প

থেকে সংগৃহীত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৭, ২০০৯

224) বাসে রোদ চাট

যাত্রীসেবায় বাসমালিকদের আরও দূরদর্শী হওয়া

উচিত দেশের সর্বস্তরের স্বল্প আয়ের মানুষের

যাতায়াতের জন্য বাসই একমাত্র ভরসা।

এমনকি শিশু-বৃদ্ধরাও বাসেই যাতায়াত করে

থাকেন। এদিকে দিনের বেলায় প্রচণ্ড রোদের

মধ্যে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ জ্যামে আটকে থাকতে

হয়। তার ওপর প্রধান যে সমস্যা সেটি হলো

বাসে উঠে বসতে গিয়ে অনেক যাত্রীর কোন

দিকে বসলে গায়ে রোদ পড়বে না এটা ঠিক

করতে অনেক সময় লেগে যায়। অনেক সময়

সব হিসাব-নিকাশ করে বসার পরেই দেখা যায়

হিসাবে ভুল ছিল। যে আসনে বসেছে, ঠিক সেটার ওপরই এসে রোদ পড়ছে। সে রোদে পুড়ে কিমা হয়ে গেলেও অন্য পাশের যাত্রীরা ছায়ায় বসে বসে ঝিমায়। আবার অনেক সময় প্রথমে হিসাব ঠিক আছে মনে হলেও কিছুক্ষণ পর বাস রাস্তায় মোড় নিলেই টের পাওয়া যায় হিসাবে ভুল ছিল, রোদ এসে পড়ে গায়ের ওপর। এই সমস্যার কারণে অনেক রূপ ও ত্বক সচেতন মানুষকে প্রায়ই নিদারুণ সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে অনেকে এই জটিল হিসাবে না গিয়ে আসন খালি থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে যাওয়াটাকে ভালো মনে করেন। এতে বাসের ভেতরে অনাকাঙ্ক্ষিত এক জটলার সৃষ্টি হয়। তাই, এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে প্রতিটি বাসেই ভাড়ার চার্টের সঙ্গে একটা রোদ চার্টও থাকা উচিত। কোন বাস সকাল কয়টা থেকে কয়টার সময় কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত যাবে, এই সময়ে কখন রোদ কোন দিকে থাকবে-এসব খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত লেখা থাকবে সেই চার্টে। তাহলে যাত্রীরা বাসে উঠেই রোদ নিয়ে এই জটিল হিসাব কষাকষি থেকে মুক্তি পাবে। এর বিকল্প হিসেবে প্রতিটি জানালায় রোদনিরোধক কাচ লাগিয়ে রোদের ছোবল থেকে অতিসত্বর বাসযাত্রীদের রেহাই দেওয়া হবে, এ আমাদের প্রত্যাশা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৭, ২০০৯

225) জলাবদ্ধ ঢাকা!

গত ষাট বছরেও নাকি এত বৃষ্টি হয়নি। রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে, ৩৩৩ মিলিমিটার। সন্ধ্যাস, জ্যাম, দুর্নীতি, লোডশেডিং, জনসংখ্যা-এসবে ঢাকা আগেই ডুবে ছিল, এবার ডুবল ফ্রেশ বৃষ্টির পানিতে। এতই ডোবা ডুবল যে পরদিন আমার মোবাইল ফোনে নানা রকম এসএমএসে এসওএস আসতে শুরু করল। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাকঃ আমার বাসায় হাঁটপানি, আপনাদের কী অবস্থা? তাকে জানাই, আমরা ভালোই আছি, পানি ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা এসএমএসঃ আমাদের এখানে কোমরপানি, আপনাদের কী অবস্থা?

তাকেও জানাই, আমরা ভালোই আছি, পানি ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা এসএমএসঃ

আমাদের এখানে গলাপানি, আপনাদের কী অবস্থা?

তাকেও জানাই, আমরা ভালোই আছি, পানি ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে ফের আরও একটা এসএমএস এসে হাজির!

আমাদের বাসায় হাঁটপানি, আপনাদের কী অবস্থা?

এবার আমি চিন্তিত হই। প্রথম এসএমএসে যখন বলেছিল হাঁটপানি, তখন অত চিন্তিত হইনি। কিন্তু এবার কেন চিন্তিত হলাম? আসলে শেষ এসএমএসে যে লিখেছে তার ঘরে হাঁটপানি, সে থাকে চতুর্থ তলার এক ফ্ল্যাটে, বনানীতে। তবে কি বনানীতে আলাদাভাবে ৩৩৩ মিটার বৃষ্টি হলো? না, তা নয়, ব্যাপারটা একটু পরে ক্লিয়ার হলাম। তাদের নতুন ফ্ল্যাটের ছাদের সব পানি কীভাবে যেন বাইপাস হয়ে নিজেদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে! সেই কারণে চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটে ঘরে ঘরে হাঁটপানিতে থই থই!!

আরেকজন ফোন করে হাহাকার করে উঠল, তার নতুন কেনা গাড়ি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে বৃষ্টির পানিতে...এ গাড়ি কি ঠিক হবে? আমি গাড়ির পত্রিকার সম্পাদক (অটোলাইন) হিসেবে আশ্বাস দিই, 'অবশ্যই হবে।' পরদিনই অবশ্য তার খুশি খুশি গলায় ফোন পাই। আমি ভাবলাম, বোধ হয় পানি সরে গেছে, গাড়িও স্টার্ট নিয়েছে। তা না, সে জানাল, পানি অনেকখানি সরে গেলেও গাড়ির চার চাকা এখনো পানির তলে খাবি খাচ্ছে। তবে গাড়ির ভেতর মাছ ভর্তি! পাশেই একটা পুকুর ছিল বলে সব মাছ বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই। তারই একাংশ তার গাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল হয়তো। ফলে গাড়ির মালিকের পোয়াবারো, আগামী কয়েক দিন বাজার না করলেও চলবে!

রস+আলোর পাঠকদের ভাবার কারণ নেই যে নিজের ঘরে পানি ঢোকেনি দেখে এই জলাবদ্ধতা নিয়ে আমি তাদের সঙ্গে রস করতে বসেছি। পানির বিপদ আমি বুঝি। ১৯৮৮ সালের বন্যায় আমার একতলা ভাড়া বাসা পুরোটাই ডুবে গিয়েছিল রাতারাতি! আমি হতভম্ব হওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাইনি। তখন থাকতাম কল্যাণপুরে, এক ভাড়া বাসায়। হঠাৎ হু হু করে পানি বাড়ছিল রাতের বেলা। এর

মধ্যেই পুরো এলাকায় কারেন্ট অফ করে দেওয়া হলো। বাসায় ছিল বড় ভাইয়ের তিন মেয়ে ও বোনের মেয়ে। তারা তখন ছোট ছোট। আমার বাসায় বেড়াতে এসেছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম! রাতটা কোনোমতে জেগে থেকে কাটিয়ে ভোরে প্রায় গলাপানি ভেঙে কীভাবে যে ওদের নিয়ে বের হয়ে এসেছিলাম, তা নিচে আমি জানি, আর ওপরে জানে বন্যা দেনেঅলা! এবারের বৃষ্টির জলাবদ্ধতাও কিন্তু ঠিক সে রকম ঘটনাই ঘটিয়েছে। পার্থক্য শুধু বন্যার পানি আর বৃষ্টির পানিতে।

সাধারণ মানুষের বিপদ হয়েছে সীমাহীন। এর মধ্যেও তারা হাস্য-কৌতুক করে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছে। একজনকে দেখলাম, মোবাইল ফোনে চিৎকার করে বলছে, ‘আমার বাড়িঘর তো সব ডোবছে...বউ-বাচ্চা লয়া কী করি, কই যাই...তোর ওইখানে কি আমু?’ যার ওইখানে সে যেতে চেয়েছে, সে হয়তো ‘না’ বোধক কিছু বলেছে। তখন সে উচ্চ স্বরে বলল, ‘তাইলে আরকি, ওভারব্রিজে উইটা ডিজিটাল বাংলাদেশ দেহি বয়া বয়া!’ তার কথায় আশপাশের লোকজন হেসে উঠল।

ঢাকার এই ভয়াবহ জলাবদ্ধতার কারণ খুঁজতে গিয়ে টিভির সাংবাদিকেরা ওয়াসা আর সিটি করপোরেশনে ছোট্টাছুটি করেছেন।

কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা অবশ্য একে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে দাগানোর চেষ্টা করেছেন বলে মনে হলো। তবে বৃষ্টির পানিতে গুলি ড্যাম বলে বোধ হয় কোনোটাই সেভাবে ফুটল না। তবে এ রকম জলাবদ্ধতা চলতে থাকলে ওই দুই প্রতিষ্ঠানকেও একদিন পানির নিচে যেতে হবে। কাজেই তাদের গা-ঝাড়া দেওয়া দরকার!

শেষে একটা গল্প বলি, গল্পটা আমাদের নয়, অন্য দেশের। অন্য একটা দেশ একদম আমাদের মতো। এ রকম হঠাৎ বৃষ্টিতে তাদেরও রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, অফিস-আদালত সব ডুবে গেল। এমনকি তাদের দেশের প্রেসিডেন্টের বাসার সামনেও গলাপানি।

প্রেসিডেন্ট এর মধ্যেই রওনা হয়েছেন তাঁর কার্যালয়ে। তাঁর গাড়িবহর যখন জমাট পানিতে ঢেউ তুলে ছুটছে, তখন সাঁতার না-জানা এক সাধারণ লোক পানিতে প্রায় তলিয়ে গেল। সে

হয়তো হঠাৎ পানির ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

সে চৈঁচিয়ে উঠলঃ

‘মি. প্রেসিডেন্ট, আমাকে বাঁচান,

আমি ডুবে যাচ্ছি...আমি সাঁতার

জানি না!’ প্রেসিডেন্ট তার কথা শুনলেন, তবে

বেশ বিরক্ত হলেন

বলে মনে হলো। মনে মনে বললেন, ‘আরে,

অনেকেই অনেক কিছু জানে না। আমিও যেমন

দেশ চালাতে

জানি না, তাই বলে সেটা চৈঁচিয়ে সবাইকে

জানাতে হবে?...গাধা কোথাকার!! আহসান হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৩

226) নিত্যনৈমিত্তিক

আমার চাচার বাসা থেকে স্টেশন যেতে

হাঁটাপথে আট মিনিট লাগে। চাচা সর্বদাই

বলেন, ‘দেখ, হাতে ১৫ মিনিট সময় নিয়ে

আস্তেসুস্থে যেতে হয়।’

তিনি অবশ্য সর্বদাই যা করে থাকেন তা হলো,

পাঁচ মিনিট আগে তৈরি হয়ে দৌড় লাগান।

চাচা ঘুম থেকে ওঠেন সেই ফুটি সকালে।

কখনো এর অন্যথা হয় না। কিন্তু হলে হবে কী,

ঠিক শেষ মুহূর্তে যত রাজ্যের ঝঞ্ঝাট দেখা

দেবেই। প্রাতরাশ শেষ হওয়ার পর তাঁর কাজ

হবে খবরের কাগজটা হারিয়ে ফেলা। কোনো

জিনিস হারালে চাচা কখনো বলেন না, ‘আমি

কী ভুলো লোক, দেখ! সব জিনিস আমি কেমন

হারিয়ে ফেলি, কোথায় যে কোন জিনিসটা রাখি

তা আমার মনেই থাকে না। বুড়ো হয়েছি তো,

আর সেটাকে খুঁজে পাই না। আমার জন্য আর

পাঁচজনের কী ভোগান্তি।’

আসলে কোনো কিছু হারালেই তিনি নিজেকে

ছাড়া আর সবাইকেই দায়ী করবেন। চৈঁচিয়ে

উঠে বলবেন, ‘এক মিনিট আগেই তো ওটা

আমার হাতে ছিল।’

চাচি হয়তো বললেন, ‘ওটা বোধ হয় তুমি

বাগানে ফেলে এসেছ।’

‘বাগানে ফেলে আসতে যাব কেন? বাগানে

আমার কাগজের কী দরকার? কাগজটার

প্রয়োজন ট্রেনে।’

‘তোমার পকেটে পোরোনি তো?’

‘তোমার ধারণা কি এই নটা বাজতে মাত্র পাঁচ

মিনিট বাকি, আর আমি এটা খুঁজে মরছি

নিজের পকেটে পুরে? আমাকে বোকা ঠাউরেছ

নাকি?’

একজন হয়তো এ সময় বলল, ‘এটা কী?’ -
ভাঁজ করা একটা কাগজ তাঁর সামনে তুলে
ধরে।

রেগেমেগে তিনি বলে উঠবেন, ‘আমি চাই
আমার জিনিসপত্র যেমন আছে তেমনি যেন
থাকে। কেউ তা ঘাঁটাঘাঁটি করুক তা আমার
একদম পছন্দ নয়।’

তারপর ব্যাগ খুলে সেটিকে ভরতে গিয়ে
একবার নজর বুলিয়েই দম মেরে চুপ হয়ে
রইলেন।

‘কী হলো?’ চাচি হয়তো জিজ্ঞেস করলেন।
কাগজটা টেবিলের ওপর সজোরে আছড়ে চাচা
হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘এটা তো কালকের কাগজ।’
শেষ পর্যন্ত অবশ্য আসল কাগজটা পাওয়া গেল।
দেখা গেল, সেটার ওপরই তিনি বসে আছেন।
করণ হাসি হেসে চাচার উক্তি, ‘তোমাদের
চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ...।’ ভাবটা এই
যে যত সব নিরেট নির্বোধদের সঙ্গে তাঁকে
থাকতে হয়।

তারপর চাচা ছুটবেন হলঘরে। চাচির নৈমিত্তিক
কাজ হচ্ছে সেখানে চাচাকে বিদায় জানাতে
বাচ্চাকাচ্চাদের জড়ো করা।

ওদের একজনকে যথাসময়ে পাওয়া যাবে না
এবং শুরু হয়ে যাবে তাকে হাজির করার জন্য
চিৎকার-চেষ্টামেচি। কয়েক মিনিট এভাবেই
কেটে যাবে এবং ইতিমধ্যে চাচা তাঁর ছাতা আর
চশমা খুঁজে পাবেন না। যখন হলঘরে সবাই
হাজির হলো, তখন দেখা গেল, ঘড়িতে টং টং
করে নটা বাজছে। বড় ছেলেটা বলে উঠল,
‘ঘড়িটা পাঁচ মিনিট ্রলো যাচ্ছে! কাল আমার
স্কুলে যেতে দেরি হয়েছিল, তাই বলছি।’

এই শুনে চাচা হত্তদন্ত হয়ে গেটের দিকে দৌড়
শুরু করবেন এবং যেতে যেতে টের পাবেন যে
ছাতা আর ব্যাগ দুই-ই ফেলে এসেছেন।

শেষমেশ তিনি যখন নিষ্পন্নান্ত হলেন, তখন
দেখা গেল যে হলঘরের টেবিলে তাঁর সবচেয়ে
দরকারি জিনিসটাই পড়ে আছে। বাড়ি ফিরে
এসে তিনি কী কাণ্ডটাই না বাধাবেন, সবারই
এই এক ভাবনা।

অনুবাদঃ অমলকৃষ্ণ গুপ্তজেরোম কে জেরোমঃ
ইংরেজি রসসাহিত্যে এক অতি উল্লেখযোগ্য
লেখক। তাঁর বিখ্যাত রম্যরচনা দি আইডল

থটস অব অ্যান আইডল ফেলো ২৫টি
সংস্করণেরও বেশি বিক্রি হয়েছে। বইটি তিনি
উৎসর্গ করেন তাঁর অতিপ্রিয় বন্ধু ধূমপানের
'পাইপ'কে এবং সে জন্য বিশেষণ ব্যবহার
করেছেন পুরো এক পাতা। ওপরের গল্পটি
তাঁরই একটি উপভোগ্য ছোট নকশা। জেরোম
কে জেরোম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৩, ২০০৯

227) রিকশায় মিটার - যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করুরি

ঢাকাসহ প্রায় সারা দেশের যাত্রীদের এক
বিশাল অংশ এখনো প্রতিদিন রিকশায় চড়ে
গন্তব্যে যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দূরত্ব অনুযায়ী
রিকশা ভাড়া সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হলেও
কোনো রিকশাওয়ালাই তা মানছে না। ফলে
নানাভাবেই তারা যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া
দাবি করে। নিরুপায় হয়ে যাত্রীরাও ওই ভাড়ায়
যেতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় নানা
অজুহাতে তারা অতিরিক্তি ভাড়া দাবি করে।
যেমন, কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা যদি রিকশায়
ওঠে, রিকশাওয়ালা হাসিমুখে ২০ টাকা বেশি
চাইবেই। প্রেমিকার সামনে প্রেস্টিজ ইস্যু
হওয়ায় প্রেমিকও বাধ্য হয়ে ২০ টাকা বেশি
দিচ্ছে। কিন্তু এটা একরকম জুলুম।

রিকশাওয়ালারা অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে।
এ ছাড়া বৃষ্টি হলে কিংবা কড়া রোদ উঠলে,
ভ্যালেন্টাইনস ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে, ঈদের দিন-
এই সব দিনের জন্য তারা যেন মুখিয়ে থাকে।
এ ছাড়া প্রায়ই ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালা ও
যাত্রীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা লেগে থাকে, যা রাস্তার
স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে।
এমন অনেক যাত্রীই আছে, যারা সবার সামনে
রিকশাওয়ালার গালে একটা থাপড় বসিয়ে
নিজের বীরত্ব জাহির করার সুযোগ হাতছাড়া
করে না। এই সব ছোটখাটো কারণে অনেক
সময় রাস্তায় তীব্র জ্যামের সৃষ্টি হয়।

তাই যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে রিকশায় মিটার
লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মিটারের
উৎস হিসেবে আমরা সিএনজিচালিত ট্যাক্সির
মিটারগুলোই রিকশায় লাগানোর প্রস্তাব করছি।
কারণ এখন দেশের কোনো সিএনজিচালিত
ট্যাক্সি মিটারে চলে না। ফলে সেসবের
মিটারগুলো একরকম অকাজেই পড়ে থাকে।

রিকশায় মিটার লাগালে যাত্রী ও রিকশাওয়ালা উভয় পক্ষই ভাড়া-সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। এ ব্যাপারে শিগগিরই সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৩

228) তবুও ভূত

-জানিস বল্টু, আমি কাল ভূত দেখেছি।

-কখন?

-রাতে। যখন আমি পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন।

-ভূতটা দেখতে কেমন?

-আলকাতরার মতো কালো কুচকুচে দেহ, সিলিন্ডার আকৃতির ভুঁড়ি, হাতির মতো কান, লাল লাল চোখ এবং চেঙ্গিস খানের মতো ইয়া বড় গোঁফ।

-ভূতটা তোকে কী বলল?

229) আহ-মরণ সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড

মধ্যরাত। বাঁশবাগানের পেছনে শ্মশানঘাটে আয়োজন করা হয়েছে জমকালো এক অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে ‘আহ-মরণ সম্মাননা পুরস্কার’। সেই পুরস্কারের দাবিদার হিসেবে অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন দেশের সব জ্ঞানী-গুণী আত্মা।

অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হলেন সুকুমার রায়। সহাস্যে বললেন- ‘জানতে পেলাম ইন্টারনেটে

আজ রাতে শ্মশান ঘাটে,

অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে মোরে

তাই তো ছুটে এলাম তেড়ে।’

প্রতিবাদ জানান বিদ্রোহী কবি-

‘আমি হলাম আন্ধার রাইতের পাখি,

অ্যাওয়ার্ড নিবি তুই চশমু

মোরে দিয়া ফাঁকি?’

পেছনের সারিতে বসে থাকা জীবনানন্দ উঠে

আসেন সামনে। শান্ত কণ্ঠে বললেন-

‘আমিও এসেছি ফিরে,

বাকি সব আত্মার ভিড়ে-এই শ্মশানে

বনলতার জন্য নয়, শুধু এই অ্যাওয়ার্ডের তরে;

তোরা না হয় অ্যাওয়ার্ড নিস আমি নেওয়ার

পরে!’

কবিদের এই অন্তর্কোন্দলে শামিল
হন যতীন্দ্রমোহন বাবু।
‘বাঁশবাগানের মাথার উপর কাউয়া ডাকে ওই,
সবাই অ্যাওয়ার্ড নিয়ে গেল আমার অ্যাওয়ার্ড
কই?’

এমন সময় ‘হারে রে রে রে রে,
আমার অ্যাওয়ার্ড নিবি তোরা কেড়ে?
কবিদের মাঝে আমি কবিগুরু,
আমায় ফেলে অ্যাওয়ার্ড নেয়,
দেখি কোন গরু?’

বড়দের ভিড়ে এতক্ষণে মুখ খোলার
সুযোগ পেলেন তরুণ সুকান্ত-
‘শাবাশ, কবিগুরু

ভূতেরা অবাক তাকিয়ে রয়,
নোবেলখানা তুমি পেলেও
এই অ্যাওয়ার্ড তোমার নয়।’
কবিদের এই গলাবাজিতে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন
পল্লীকবি। বললেন-

‘এই বুড়োরা, এই ধাড়িরা

চুপটি করে থাক

চুপ থাকতে না পারলে

এখান থেকে ভাগ।’

ঠিক সেই সময় বাঁশঝাড়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া
দিতে এসেছিল মকবুল। কান পেতে কিছুক্ষণ
কবিদের এই ফিসফিসানি শোনার পর ‘ডাকাত
ডাকাত’ বলে পুরো গ্রাম মাথায় তোলে সে।

ভয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে যায় সব
আত্মা। শ্মশানঘাটে শুধু পড়ে থাকে ‘আহ-মরণ
সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড’। বর্ষণ সেন
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১০, ২০০৯

230) তোতা মামার ভূত

অনেক দিন ধরে চুরি করতে না পারায় কালুর
হাত-পা নিশাপিশ করছিল। আগে যা বাজারের
পাশের তেঁতুলগাছে উঠে মানুষকে ভয় দেখাত,
এখন সেটাও হয় না। মানুষ আর আগের মতো
ভয় পায় না। কেমন যেন চালাক হয়ে গেছে।
এমন সময় কালুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল।
আমার দূরসম্পর্কের এক মামা আছেন। নাম
তোতা মামা। তিনি একটু বোকা আর ভীতু
টাইপের। কালু তোতা মামাকে ডেকে এনে
বলল, ‘তোতা, তেঁতুলগাছে যে একটা ভূত
থাকে, তোর মনে আছে?’

‘মনে আছে তো।’ তোতা মামা বলল।

-কালকে রাতে আমারে তো প্রায় ধরেই ফেলছিল!

-বলো কী?

-আমারে কী বলল জানিস? ঘাড় মটকাব!

-বাপ রে!

-আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, কার? কী বলল জানিস?

-না, জানি না।

-বলল, তোতার।

শুনে তোতা মামার মুখ চুপসে গেল।

-আরে ভয় পাইস না। আমি আছি না? জিজ্ঞেস করলাম কখন?

-কখন?

-আজকে রাতে।

-ওরে আল্লা! আমি গেছি!

-ভয় পাইস না। আমি আছি কী জন্য? তুই খালি আমার কথা শোন। তাহলে দেখবি কিছুই হবে না।

-কী শুনব?

-মোস্তফা ভাইজান তোর চাচাতো ভাই না?

-হুম।

-তুই আজকে রাতে মোস্তফা ভাইজানের খাটের নিচে লুকিয়ে থাকবি। তাহলে ভূত তোকে খুঁজে পাবে না।

-সত্যি কালু?

-হুম। আর যদি ভয় পাস তুই, সে জন্য আমিও আজকে তোর সঙ্গে থাকব। তুই খালি অর্ধেক রাতে দরজাটা খুলে দিবি। কাউকে বলিস না আবার। পারবি না?

-হুম, পারব। সে রাতে কালু মনের সুখে তোতা মামার বাসায় চুরি করল। উম্মে সালমা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১০, ২০০৯

231) চিংড়ি-ফড়িংয়ের জন্মদিনে - সাজেদুল করিম

চিংড়ি আর ফড়িং। দুই বোন! যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী।

আঁকের ক্লাসে আমরা বসে থাকতুম ‘থ’ হয়ে। বিদ্যুতের মতো আঁক কষে যেত দুবোন। গেল সন ওদের ‘জন্মদিন’। আমরা ক্লাসের বান্ধবীরা প্রেজেন্ট নিয়ে গেলুম দেখতে। অঙ্কের মিস জামিলা মেহতাব আমাদেরও আগে এসে যোগ

দিয়েছেন। মিস জানালেন, তিনি এসেছেন

ম্যাজিক দেখাতে-আজকে এ জন্মদিনে।

ম্যাজিক? জামিলা আপা ম্যাজিক জানেন?

কিছুক্ষণ পর মিস গিয়ে দাঁড়ালেন হলের

মধ্যখানে। ডাকলেন, ‘বয়।’

একজন বয় আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে।

ডাকতেই সে ভেতরে এসে কতগুলো জিনিস

টেবিলে, আর মাটিতে একটা দাঁড়িপাল্লা রেখে

গেল।

‘এদিকে এসো।’ জামিলা আপা আমাদের

ডাকলেন।

আমরা গিয়ে দেখি, টেবিলের ওপর আটটা

সোনার দুল চকচক করছে।

মিস বললেন, ‘আটটা দুল দেখছ তো? বিশেষ

ফরমাশে তৈরি এগুলো। প্রতিটি দুলই অবিকল

সমান ওজনের; একটি ছাড়া। সামান্য একটু

খাদ মেশানো আছে বলে একটা দুল ওজনে

একটু কম। বলো তো কোনটা?’

আমরা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া

করলুম। কী সুন্দর প্যাটার্ন! আটটাই অবিকল

এক রকম। কোনটাতে যে খাদ আছে, বের করা

শক্ত।

কী ভেবে চট করে চিংড়ি এসে সামনে দাঁড়াল।

বলল, ‘আপা, আমি কিন্তু পারব।’ বলেই সে

দাঁড়িপাল্লাটা তুলে নিলে! মজা দেখতে আমরা

বসে পড়লুম।

দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে চিংড়ি আটটি দুলের চারটি

রাখলে এ-পাল্লায় আর চারটি রাখলে ও-পাল্লায়।

এখন যদিকের পাল্লা ওজনে কম হলো বলে

ওপরের দিকে উঠে গেল, বোঝা গেল খাদওয়ালা

কম ওজনের দুলটা সেদিকেই আছে। কাজেই

পাতলা দিকের দুল চারটি নিয়ে ফের পরীক্ষা

চলল। দুটো এদিকে, দুটো ওদিকে রাখা গেল

দাঁড়ির। যদিকটার পাল্লা ওপরের দিকে ঝুঁকল,

বোঝা গেল সেদিকটাতেই খাদওয়ালা দুলটা

আছে। আবার সে দুটোকে নিয়ে পরীক্ষা চলল,

একটা এদিকে, একটা ওদিকে। এবার

যদিকের পাল্লা ওপরের দিকে ঝুঁকল, স্পষ্ট

বোঝা গেল, সে দুলটিই খাদওয়ালা। চিংড়ির

বুদ্ধি দেখে সবাই খুশিতে হেসে উঠলাম।

মিস কিন্তু হাসলেন না। বললেন, ‘চিংড়ি, তুমি

তো তিনবার দাঁড়ি ব্যবহার করেছ খাদওয়ালা

দুলটা বের করতে। নয় কি?’

চিংড়ি বলে, ‘হ্যাঁ।’

‘তিনবার কেন? দুবারে কি পারা যায় না?’

চিংড়ি একটু বিনিত হলো।

‘আপনি কি বলতে চান আপা, দুবার মাত্র দাঁড়ি

ব্যবহার করে আটটা দুলের ভেতর থেকে

খাদওয়ালা দুলটা বের করতে পারা যাবে?’

‘হ্যাঁ’

‘সে কেমন করে হবে, আপা? সে যে অসম্ভব!’

এতক্ষণ ফড়িং কোনো কথা বলেনি। সে যেন

মনে মনে ভীষণ একটা চিন্তা করছিল। এখন

সে এসে দাঁড়াল! বলল, ‘আপা, আমি পারব।’

‘পারবে? কবারে? দুবারে?’

‘দুবারে।’

আমাদের একজন বলল, ‘বোকা মেয়ে।’

‘দেখই না।’ বলে ফড়িং আটটা দুলের তিনটে

রাখল দাঁড়ির এ-পাশায়, তিনটে ও-পাশায় আর

বাকি দুটো রাখলে মাটিতে। দেখা গেল, দাঁড়িটা

কোনো দিকেই হেলছে না। ফড়িং বলল, ‘এ

থেকে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, খাদওয়ালা দুলটা

দাঁড়িতে নেই। মাটিতে আছে। নয় কি?’

আমরা সমস্বরে বললুম, ‘হ্যাঁ।’

তারপর মাটি থেকে দুল দুটো তুলে নিয়ে সে

ফের চাপাল দাঁড়িতে-এদিকে একটা, ওদিকে

একটা। যদিকের পাশা ওপরের দিকে ঝুঁকল,

সেদিকের দুলটিই খাদওয়ালা বোঝা গেল।

কাজেই পরিষ্কার দেখা গেল, দুবারের বেশি দাঁড়ি

ব্যবহার করতে হলো না।

আমরা বললুম, ‘কিন্তু?’

‘কিন্তু কী?’

‘দাঁড়ি ভাগ্যচক্রে সমান থাকতে যেন তুমি

বুঝতে পেরেছ মাটিতে আছে খাদওয়ালাটা।

কিন্তু ফড়িং, দাঁড়ি সমান না-ও তো থাকতে

পারত।’

‘তবে তো আরও মজা হতো’, বলল ফড়িং

হেসে, ‘দাঁড়ি সমান না থাকলে নিশ্চয় একদিকে

ঝুঁকত। বোঝা যেত, যদিকটা ওপরের দিকে

ঝুঁকছে, সে দিকটাতেই খাদওয়ালা দুলটা আছে।

তারপর আমি করতুম কী? পাতলা দিকের দুল

তিনটে নিয়ে ফের দাঁড়িপাশায় চাপাতুম-এদিকে

একটা, ওদিকে একটা, আরেকটা রাখতুম

মাটিতে। এখন যদি দাঁড়িপাশাটা হেলত, তবে

বুঝতাম, যদিকটা ওপরের দিকে হেলছে,

সেদিকটার দুলটিই খাদওয়ালা। আর যদি

কোনো দিকেই না হেলত, তবে বোঝা যেত যে মাটির দুলটিই খাদওয়ালা। নয় কি? কাজেই খাদওয়ালা দুলটা বের করতে কোনো সময়ই দাঁড়ি দুবারের বেশি ব্যবহার করতে হতো না।’ মেয়ের বুদ্ধি দেখে ফড়িংয়ের মা-বাবার তাক লেগে গেল। আমাদের তো আনন্দ আর ধরে না। এতক্ষণে মিস মেহতাব হাসলেন। বললেন, ‘দেখলেন তো আমার ম্যাজিশিয়ান মেয়েদের, তাদের এ জন্মদিনে। কিন্তু ভাগ করে দেবার ভার আপনার ওপরেই রইল!’ বলে এগিয়ে এসে মিস মেহতাব আটটা চকচকে লোভনীয় সোনার দুল চিংড়ি-ফড়িংয়ের বাবার হাতে তুলে দিলেন।

সংক্ষেপিত

সাজেদুল করিমঃ শিশুসাহিত্যিক। জন্ম ১৯১৫ সালের ২৮ এপ্রিল। মৃত্যু ১৯৯৪ সালের ৯ ডিসেম্বর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৭, ২০০৯

232) এ জার্নি বাই ট্রেন এগারোসিন্দুর

নগর হিসেবে কিশোরগঞ্জ লন্ডন কি প্যারিস নয়, এ কথা শতবার মানি। তাই বলে আন্তনগর পদমর্যাদার ট্রেন এগারোসিন্দুর কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে মেথিকান্দা স্টেশনে দাঁড়াবে, এত বড় অপমান মেনে নেওয়া কঠিন। অপমানের জ্বালা জুড়ানোর আগেই ধীরগতি ট্রেনের জানালা গলে আমার কপালে মিসাইলের আঘাত।

ভাবলাম মরে গেছি। খানিক পরে কোনোমতে বেঁচে আছি নিশ্চিত হয়ে চোখ মেলতেই দেখি, স্টেশনে দাঁড়ানো রোগা-পটকা ছেলেটা দাঁত কেলিয়ে হাসছে। পাশে দাঁড়ানো আরও চিকন ঝটকে শয়তান সমবয়সীকে হেসে হেসে আঙুল তুলে বলছে, ‘পাথরটা ওই বেডির কপালে লাগছে।’ এ যেন অ্যাপাচির পাইলটের মুখে সাফল্যের হাসি, যদি গোলাটা তোরাবোরা গুহায় লাদেনের গায়ে লাগত! শতভাগ সাফল্যের দাবিদার ছোকরাকে দু-চার ঘা লাগিয়ে আসব কি না এমন ভাবাভাবির মধ্যে ছেলেটি তার বাপের হাত ধরে আমার কম্পার্টমেন্টে আমার সামনে হাজির। কপালের ব্যথায় কাতর আমি তেড়ে ওর বাপটাকে বললাম, ‘আপনি কি জানেন, আপনার ছেলে কত বড় বদমাশ?’ ‘আরে সর্বনাশ! বদমাশ মানে, মহা বদমাশ! স্বভাবে-খাসলতে অক্লরে মামুর গুপ্তি। আচ্ছা যাউক গা! আপনে এই খবর জানলেন

কীভাবে?’

‘আপনার ছেলে ট্রেনে ওঠার আগে আমার কপালে পাথর ছুড়ে মেরেছে।’

‘আরে বেআক্কেলের ঘরের বেআক্কেল। পাথর মারবি ট্রেন ইস্টিশন ছাইরা চইলা যাওনের কালে-ট্রেন আওনের কালে পাথর মাইরা কেউ ধরা খায়?’

নির্বোধ ছেলের ঘাড়ে বেগে ধাক্কা দিয়ে রাগে গজগজ বাপ অন্য কামরায় মিলিয়ে যেতে কলমভর্তি ট্রে গলায় ঝুলিয়ে কামরায় আরেক কিশোরের প্রবেশ। কিশোরের বয়ান থেকে বোঝা গেল, বারবার শিষ বদলে ওর কলম শতবর্ষী। ১০০ বছর ব্যবহারেও ওর কলম যে ভাঙবে না, মচকাবে না, এই তথ্য প্রমাণ করতে গিয়ে ছেলেটি ট্রেনের বাংকারের গায়ে মধ্যম মাপে কলমের এক ঘা মারতেই হাতের কলম ভেঙে দুইখান। কামরা ভর্তি লোকজনের হাসির হুল্লোড় থেকে ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য আমার পাশে বসা জ্ঞানী চেহারার মানুষটা গম্ভীর গলায় বলেন, ‘শোনো হে বালক, মসি অসি অপেক্ষা শক্তিশালী এ কথা সত্য; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে...।’ লোকটার মুখের বাণী না ফুরাতে রক্তচক্ষু কিশোর টিটমোরগের মতো রোয়া ফুলিয়ে এগিয়ে আসে। বলে, ‘ওসির ভয় দেখান কারে? পুলিশরে আমি ডরাই? কলম কি আপনার মাথায় বাড়ি দিয়া ভাঙছি? ভাঙা কলম দিয়া আপনার চোক্ষে গুল্লা দিছি? তাইলে আপনি আমারে ওসির ভয় দেখান, বিষয়টা কী?’ বিষয়টি অমীসাংসিত রেখে ছেলেটিকে কামরা ছেড়ে নেমে যেতে হলো, কারণ ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। সহযাত্রীর জ্ঞানের বাণী বিফলে যাওয়ার ব্যথা মুছে দেওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে বলি, ‘আপনার জ্ঞানের কথা অতি ওজনদার; কিন্তু শব্দ নির্বাচনে ভুল হয়ে গেছে। ছেলেটি অসি না চিনলেও ওসি চেনে। আর যেটুকু চেনে তাতে ওর ক্ষিপ্ত হওয়ার...।’ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জ্ঞানী মানুষটা আমার ওপর অবোরে জ্ঞানবর্ষণ শুরু করেন। তাঁর তাবৎ বাণীর সারকথা, দেশটা মূর্খ-অবীচীন আর চোরচোড়ায় ভরে গেছে। নীতিমান জ্ঞানী মানুষটি এখন এই দুই গ্রুপ লোকের জ্বালায় ভীষণ বিরক্ত। নীতিমান মানুষটির জ্ঞানের বাণী শুনতে শুনতে পথ ফুরিয়ে যায়। ট্রেন এসে

কিশোরগঞ্জ স্টেশনে ভেড়ে। স্টেশনে নামব বলে ট্রেনের মাথার দিকে হাতটা দিতেই জ্ঞানী সহযাত্রী ধমকের সুরে বলেন, ‘ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? স্টেশনের গেটে দাঁড়ানো চোরগুলো টিকিট দেখতে চাইবে। না দেখাতে পারলে ফের ২০ টাকা ঘুষ দিতে হবে।’

‘এই তো আমার টিকিট আমার হাতে। আপনার টিকিট কি হারিয়ে গেছে?’

‘ট্রেন জার্নির সময় আমি নৈতিক দায়িত্ব থেকে টিকিট কিনি না। রেলওয়ের পিয়ন থেকে বড়সাহেব, সব ব্যাটা চুর। ২০০ টাকা খরচ করে টিকিট কিনলে সে টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়ে ১০টা চুরের পকেটে যাবে। তার চেয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে ২০ টাকা চেকারের হাতে গুঁজে দিলে একজন চুরের পেট ভরল। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে পেছনের কম্পার্টমেন্ট দিয়ে নেমে কাঠগুদামের পেছন দিয়ে বাউলি কেটে শহরে ঢুকে যাবেন। এ দেশে টাকা দিয়ে টিকিট কেনা রীতিমতো অনৈতিক।

অহিফেন সেবনে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল-বিনা অফিমেই আজ আমার জ্ঞানচক্ষু বিস্ফারিত। ভাবলাম, টিকিট কেনার আগে কেন এই অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি-নীতিমান মহাপুরুষের দেখা পেলাম না। তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৪, ২০০৯

233) অফিসের ১০টি নিয়ম, একটি মিসিং

১. সব সময় হাতে একটা কাগজ রাখুন
যাঁরা হাতে সব সময় একটা কাগজ বা কলম রাখেন, তাঁদের দেখলেই পিঁপড়ার কথা মনে পড়ে। মানে, পিঁপড়ার মতো পরিশ্রমী মনে হয়। তাই অফিসের সহকর্মীদের কাছে কাজের চাপ বোঝাতে হাতে কিছু কাগজ রাখুন। তবে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে হাঁটা ঠিক শোভন দেখাবে না। প্রাকৃতিক কর্ম সারতে খবরের কাগজের বহুল ব্যবহারের কথা শোনা যায়। অফিসের পাশাপাশি বাড়ির পরিবেশও ঠিক রাখতে চাইলে একগাদা কাগজের বোঁচকা বেঁধে বাসায় ফিরতে পারেন। আপনার পরিশ্রমী স্বভাব সম্পর্কে ঘরে-বাইরে কোথাও কারও কোনো সন্দেহ থাকবে না। ২. কম্পিউটারে ব্যস্ত থাকুন
কম্পিউটারে সারা দিন অকাজ করলেও বোঝা

মুশকিল। চ্যাটিং বা ফেইসবুকে বঁদ থাকলেও দেখে মনে হয়, এই লোক ছাড়া পুরো অফিস যেন অচল। তিনি অফিসে যোগ দেওয়ার আগে অফিস কীভাবে চলছিল সেটা নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছে করে। অবশ্য এই ফাঁকিবাজিটা অফিসের কর্তার চোখে পড়তে বেশি দিন নাও লাগতে পারে। তার জন্য প্রস্তুত থাকুন। বমাল ধরা পড়লে কর্তাকে বোঝান, অফিসের জন্য দরকারি নতুন এক সফটওয়্যার নিজে নিজেই শেখার চেষ্টা করছিলেন। অফিসের টাকায় প্রশিক্ষণ না নিয়ে কত টাকা বাঁচিয়ে দিলেন! ৩. টেবিলে একটা পাহাড় বানান

অফিসের কর্তার টেবিল সব সময় পরিষ্কার থাকতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অন্যদের টেবিল পরিষ্কার থাকা মানে তারা নিশ্চয়ই কোনো কাজ করে না। তাই টেবিলে ফাইল বা কাগজের স্তুপ বানিয়ে রাখুন। এটা নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতে পারেন। কাউকে আপনার টেবিলের দিকে আসতে দেখলে ফাইলের পাহাড় থেকে কয়েকটি ফাইল নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজার চেষ্টা করুন। কী খুঁজবেন সেটা আপনার ব্যাপার। ৪. মুখে একটা নেতিবাচক ভাব ফুটিয়ে তুলুন

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যস্ত লোকের মধ্যে সব সময় অধৈর্য আর বিরক্তির ভাব থাকে। তাই আপনার মধ্যেও এ ধরনের একটা ভাব ফুটিয়ে রাখুন। তাতে অফিসের কর্তার আর বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। অবশ্য তার আগে বিশেষজ্ঞদের কথাটা একটু জানিয়ে রাখতে পারেন। ৫. সবার শেষে অফিস ছাড়ুন

চেষ্টা করুন সবার শেষে অফিস থেকে বের হতে। বিশেষ করে কর্তা অফিসে থাকলে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে অফিস ত্যাগ করাই ভালো। এ সময়টা ম্যাগাজিন বা রগরগে কোনো থ্রিলার পড়ে কাটিয়ে দিতে পারেন। অফিস থেকে বের হওয়ার সময় কর্তাকে নিজের চেহারাটা একবার দেখাতে ভুলবেন না। ৬. ছুটির দিনটাও কাজে লাগান

গুরুত্বপূর্ণ অফিশিয়াল ই-মেইল অফিস সময়ের বাইরে পাঠান (যেমন, রাত নয়টা ৩৫ মিনিট বা সাতটা আট মিনিট)। মনে রাখবেন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো এসব কাজের জন্য উত্তম। এতে

অফিসের নির্ধারিত সময়ের পরও যে আপনি কাজ করেন তা প্রমাণিত হবে।৭. মেঝেতে বই ছড়িয়ে রাখুন

টেবিলে কাগজ আর কাগজপত্র রাখার পাশাপাশি টেবিলের পাশের মেঝেতে কিছু বই ছড়িয়ে রাখুন। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের নাদুসনুদুস ম্যানুয়াল বইগুলো উত্তম।৮. কঠিন শব্দের ব্যবহার বাড়ান

মাঝেমধ্যে কম্পিউটার ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা করুন। সেখান থেকে কঠিন ও জটিল শব্দগুলো বেছে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলুন। কর্তা বা সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই শব্দগুলো উগরে দিন। নিশ্চিত থাকুন, আপনার কর্তা শব্দগুলোর অর্থ না বুঝলেও মুগ্ধ হবেনই।৯. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আপনার অফিসের কর্তাকে এই লেখাটা পড়তে দেবেন না। তাহলে সব মাঠে মারা যাবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৪, ২০০৯

234) রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে একেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। ‘না হে, মনটা ভালো নেই।’ রাজার মন ভালো করতে সেনাপতি আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তার পরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। ‘মনটা বড় খারাপ রে।’ তখন মন্ত্রিমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলস্কর, পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, ‘হায় হায়! মনটা একদম ভালো নেই।’

ওদিকে ভাঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রিমশাইয়ের মাথায় একটু গুণ্ণগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ-পুরোহিত হোমযজ্ঞের এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে

গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। সভাপণ্ডিতেরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুলবাগিচায় বসে আছেন। হঠাৎ সিংহ গর্জনে বলে উঠলেন, ‘গর্দান চাই!’ মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, ‘কার গর্দান, মহারাজ?’

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, ‘দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হলো, কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।’

মন্ত্রী বললেন, ‘ভাবুন, মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।’

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হলো, এবার রাজার মনমতো একটা গর্দান দিলে বোধ হয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভায় কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, ‘না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।’

সেই দিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চোঁচিয়ে বললেন, ‘বিছুটি লাগা। শিগ্গির বিছুটি লাগা।’ মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন।’

‘বিছুটি!’ বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়িবোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই। রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল। খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, ‘পুঁতে ফেললে কেমন হয়!’

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে

বিগলিত হয়ে বললেন, ‘খুব ভালো হয়, মহারাজ। শুধু হুকুম করুন।’

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, ‘কিসের ভালো হয়? কিছুতেই ভালো হবে না, মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।’

সেই রাতেই মন্ত্রী রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, ‘ওরে, তোরা চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি।’

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, ‘রাজামশাই রাতে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।’

আরেকজন বলল, ‘রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব বলে খুকখুক করে কাঁদছেন।’

আরেকজন এসে খবর দিল, ‘রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চাছেলের হাত থেকে একটা মগ্না কেড়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এই মাত্র।’

মন্ত্রী বললেন, ‘ঠিক আছে, নজর রেখে যা।’

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, ‘আজ্ঞে, রাতে শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, ‘নজর রাখছিস? রাখ।’ বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।’

দ্বিতীয়জন বলল, ‘আজ্ঞে, আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই আমাকে বললেন, ‘কানে কেনো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।’

তৃতীয়জন কান চুলকে বলল, ‘আজ্ঞে, আমি রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, ‘ওরে, ভালো গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।’ বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।’

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনো এসে পৌঁছায়নি।

সকালবেলা রাজার শোয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল রাখহরি। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, ‘মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি আপনার ওপর নজর রাখছি।’

রাজা ্ণিত হেসে হাই তুলে বললেন, ‘বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।’

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি

ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, ‘চিমটি দে। রাম চিমটি দে।’

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, ‘করিস কী, করিস কী?’

রাখহরি বলল, ‘বললেন যে।’

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

বিকেলে রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।’ বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন! রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, ‘হুঁ।’

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনো ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা একটু হাসলেন।

আপত্তি করলেন না। কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘ঠান্ডা জলে চান করব।’ রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের কলসের সবটুকু জল রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে-কেশে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো না।

রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, ‘আচ্ছা, শুগে যা।’

রাখহরি না শুয়ে পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘দে, বুকে ছোরা বসিয়ে দে।’...চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচেকা খেয়ে রাজা বললেন, ‘থাক, থাক, তোর কথা আমার মনে ছিল না।’

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোক ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দুহাতে পেট চেপে ধরে বললেন, ‘ওরে, আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে!’

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘যাক বাবা! মন খারাপটা

গেছে তাহলে।’

তার পর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেলো। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা গেল আবার। রাজা সব সময় কেবল ফিকফিক করে হেসে ফেলছেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক-ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক-ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক-ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে। [সংক্ষেপিত] শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ঃ ভারতীয় লেখক। ১৯৩৫ সালে তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৪, ২০০৯

235) সোয়াইন মুখোশ

মামা সব সময়ই প্রচণ্ড শব্দ করে হাঁচি দেন। হাঁচির সময় মামার কাছাকাছি থাকলে প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমার ধারণা, এই বিকট হাঁচির কারণেই তার ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। আমি তাঁকে বহুবার বুঝিয়েছি যে মামা, এত জোরে হাঁচি দেওয়া ঠিক না। এমনিতেই বাবার হাটের অসুখ। দেখা যাবে হাঁচির শব্দেই তাঁর হাট অ্যাটাক হয়ে গেছে। মামা অবাক হয়ে বলেন, হাঁচি কি মেপে দেওয়া যায় নাকি? তুই এক কাজ কর, আমার ঘরটা সাউন্ড প্রুফ করে দে, তাহলে আর তাদের ডিস্টার্ব হবে না। মামার সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বোকামি। তার পরও মামার ঘরে গিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

কী কথা?

দেশে সোয়াইন ফ্লু দেখা দিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তো, আমি কী করব? সোয়াইন ফ্লুকে আসতে মানা করব?

এত কষ্ট তোমাকে করতে হবে না। তুমি শুধু মুখ ঢেকে হাঁচি দিয়ো। এ রোগ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বেশি ছড়ায়। আর মুখ ঢেকে হাঁচি দিলে আমাদের কান একটু বিশ্রাম পাবে।

তুই কি আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছিস? দু-একটা আউট বই পড়ে খুব জ্ঞান হয়েছে, তাই না? সোয়াইন ফ্লু বানান জানিস?

জানব না কেন, দন্তস্য ওকার...

খামোশ! বাংলা বানান করছিস কোন ভরসায়?

এটার উৎপত্তি হয়েছে মেক্সিকোতে। মেক্সিকান ভাষায় বানান কর।

মামা! মেক্সিকান ভাষা আমি জানব কীভাবে?
না জেনে কাউকে জ্ঞান দিতে আসবি না। ছাগল কোথাকার, সোয়াইন ফ্লু বানান পারে না, যা ভাগ!

আমি গোমড়া মুখে নাশতা খেতে বসলাম।
সবাই সোয়াইন ফ্লু নিয়ে আলোচনা করছে।
মামা এসে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে গম্ভীর মুখে বাবাকে বললেন,

দুলাভাই, আপনার গুণধর পুত্র যে লেখাপড়া কিছু করে না, এই তথ্য কি আপনি জানেন?
লেখাপড়া করে না মানে? কী করে ও?
মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। সে বলে আপনি নাকি দুর্বল চিন্তের অধিকারী, সামান্য হাঁচির শব্দেই নাকি আপনার হাটে মেজর অ্যাটাক হতে পারে। তাই মুখ ঢেকে হাঁচি দিন, জীবন বাঁচান-এ ধরনের উপদেশ। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, ও সোয়াইন ফ্লু বানান পারে না। বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন, দুলাভাই, এতবড় ছেলে, সে সোয়াইন ফ্লু বানান পারবে না?

বাবা আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুই দূরে বসেছিস বলে চড় দিতে পারছি না। কাল থেকে আমার কাছাকাছি বসবি। কষে চড় না দিলে তুই সোজা হবি না।

আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এই বাসায় ভালো কোনো কিছুর দাম নেই। এ জন্যই মাঝে মাঝে এ সংসার ছেড়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মতো বনে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

বাবা মামাকে বললেন, জামিল, দেশে তো সোয়াইন ফ্লু মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমরা যাতে সুস্থ থাকি সে ব্যবস্থা করো। ওই মুখোশ-টুখোশ যা লাগে তোমাকেই কিনতে হবে। তুমি ছাড়া এ বাড়িতে তো আর কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই।

মামা আস্ত একটা ডিম শেষ করে বললেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, দুলাভাই। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই এখানে বসে আছিস কেন? যা, পড়তে বস। আর শোন, 'বাংলাদেশে নবাগত সোয়াইন ফ্লু ও এর

প্রতিকার'-এ বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে একটা রচনা লিখে আন। ৩৫ মিনিট সময়।

কী বিপদ! এমনিতেই মুখস্থ না করে রচনা লিখতে পারি না, তার ওপর কী কঠিন এক বিষয়। সোয়াইন ফ্লুর প্রতিকার নিয়ে সরকারেরই কোনো ধারণা নেই, আমি কী লিখব! ভয়ের চোটে বাবাকে কিছু বলতেও পারছি না। বসে বসে খাতায় কাটাকুটি খেলছি, হঠাৎ শুনি ড্রইংরুম থেকে বাবার উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, বাবা রাজনৈতিক নেতাদের মতো মামাকে বকাঝকা করছেন। ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মামার ঘরে গিয়ে দেখি মামা মন খারাপ করে বসে আছেন। আমি বললাম, মামা, বাবা হঠাৎ এত খেপে গেলেন কেন? যেকোনো সময় তো হাটে অ্যাটাক হতে পারে। আরে হাটের অ্যাটাকের কথা ঝেড়ে ফেলে দে। একটু পর আমার ওপরই অ্যাটাক হতে পারে। তুমি কী করেছ, মামা?

আর বলিস না, দুলাভাই সোয়াইন ফ্লুর জন্য মুখোশ আনতে বলেছিল। আমি এনেছি। মুখোশ দেখেই দুলাভাই...

মামা আমাকে একটা মুখোশ দেখাল। মুখোশ দেখে আমি তো হাসতে হাসতে আরেকটু হলে মাটিতে পড়ে যেতাম। কোনোমতে মামাকে বললাম, মামা, তুমি সোয়াইন ফ্লু ঠেকাতে এই মিকি মাউসের মুখোশ নিয়ে এসেছ! ভালোই হয়েছে, পাশের বাসার বাচ্চাটাকে দিলে ও এটা দিয়ে খেলতে পারবে।

মামা আমার দিকে কটমট করে তাকাতেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাবা এখনো চেষ্টাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত হলাম। যাক, আজকে আর রচনা লিখতে হচ্ছে না। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩১, ২০০৯

236) সোয়াইন ফ্লু অবকাশ

তুমি তো ডাক্তারি পড়ছ, তাই না? এত বড় ঘরে শব্দগুলো ভীষণ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে।

ইকোসিস্টেমের বারোটা বাজানো এক সাউন্ড সিস্টেম আমার ঠিক মাথার ওপর। বক্তা আমার কাছ থেকে প্রায় ২০ ফুট দূরে তাঁর ডেস্কে বসা। কথা বলছেন একটা মাইক্রোফোনে। সেটা আবার তাঁর টাইয়ের সঙ্গে লাগানো।

-জি, পড়েছিলাম, তবে শেষ করতে পারি নাই।

-তা কেন পার নাই সেটা তো বুঝতে পারতেছি।
জলের মতো সব পরিষ্কার। সোয়াইন ফ্লু নিয়া
রিপোর্টটা কার?

-জি, ওইটা তো ফারুক ভাইয়ের লেখা।

-ফারুক তো লিখছে জানি, কিন্তু সে তো বলল
তুমি নাকি সব ইনফরমেশন তারে সাপ্লাই দিছ।
সাউন্ড সিস্টেমের কারণেই কিনা কথাগুলো বেশ
চিবানো শোনাচ্ছে। বজলু ভাই রেগে আছেন কি
না বোঝার উপায় নেই। কারণ, বাতি জ্বলছে
আমার মাথার ওপর, তাঁর টেবিলে অন্ধকার।
মনে হচ্ছে ইন্টারোগেশন রুমে আছি। এখন
প্রশ্নটার জবাব কী দেব বুঝতে পারছি না।

ফারুক ভাই আমার খুব কাছের মানুষ। প্রায়ই
চা-সিগারেট খাওয়ান, টাকা-পয়সা ধারটার দেন।
স্বাস্থ্য বিট করেন। আমার বেশ কজন সহপাঠী
ও বড় ভাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ বেশ কিছু বড়
পোস্টে আছে। তাই এই খাতির। কদিন আগে
আমাকে ধরলেন যে তাঁকে একটা স্পেশাল
অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে।
প্যানডেমিক এইচওয়ানএনওয়ান ভাইরাস, শূকর
থেকে ছড়ায়। এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানা
নেই, নেট ঘেঁটে কিছু তথ্য দিয়েছিলাম তাঁকে।
এমনিতে ফারুক ভাই ব্লান্ডার তেমন করেন না,
করার সুযোগ নেই বলে। কারণ, বেশির ভাগ
সময় প্রেস কনফারেন্সের কাগজটাই কম্পোজের
পর হালকা এডিট করে তিনি ধরিয়ে দেন
নিউজ এডিটরকে। সেগুলো ছাপাও হয়
বাইলাইনে-তাঁর নামে। একবারই শুধু ‘নাম
প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বাস্থ্যসচিব’ লিখে একটু
ঝামেলায় পড়েছিলেন। স্বাস্থ্যসচিব একজনই
থাকেন, আর তাঁর নাম প্রকাশ না করলেও
পদবি প্রকাশ করলেই নাম জানা যায়। তবে
সেটাও অনেক আগের কথা।

এসি রুমে ঘামতে ঘামতে আমার মুখ থেকে
কোনোমতে জি বের হয়। কানে সেটা চিঁ করেই
বাজে। বজলু ভাইয়ের পরের প্রশ্ন, তুমি কি
জানো সোয়াইন ফ্লু সম্পর্কে? কীভাবে বুঝবা?
এর প্রিভেনশন কী?

-ইয়ে মানে, সর্দি-কাশি-হাঁচি টাইপের রোগ।
ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো। শাকসবজি আর ভিটামিন
সি বেশি করে খেতে হয়। নিয়মিত ব্যায়াম
করতে হয়।

-থামো মিয়া। এসব ক্লাস ওয়ান-টুর

পোলাপাইনও জানে। জ্বর হইলে প্যারাসিটামল আর পেটে গ্যাস হইলে এন্টাসিড। এ জন্য এই দেশে সার্টিফাইড ডাক্তারের থিকা তোমার মতো ডাক্তার বেশি। সবাই সব রোগের ওষুধ জানে। ফারুকরে তুমি ডিকটেশন দিছ এইটা নিয়া? কী কইছ সেইটা কও।

-মানে, বজলু ভাই, বেশি কিছু তো আমি জানি না, যা জানি তা-ই বলেছি।

-আচ্ছা! এইবার বলো সাভারে শূকরের ফার্ম হইল কবে থিকা। কবে থিকা শূকর ডিম পাড়া শুরু করল। আর কবে সেখানকার শূকর ব্যবসায়ীরা গর্ত খুঁইড়া সব শূকর পোড়াইয়া মারল?

বলে কি! পেছনে দেয়াল থাকায় চেয়ার উল্টে পড়ি না আমি। হতভম্ব হয়ে আমি বজলু ভাইয়ের স্টাইলে বলে উঠি, ঈমানে না, এসব তারে আমি কখখনো বলি নাই। ফারুক ভাই মিথ্যা কথা কইছে আপনারে।

-তাই, না! দেশে সোয়াইন ফ্লু বিস্তার লাভ করায় সাভারের সব শূকর ব্যবসায়ী তাদের ফার্মের সব শূকরের ডিম নষ্ট করে ফেলছে আর আক্রান্ত শূকরগুলো গর্ত খুঁইড়া পোড়াইয়া মারছে, এইটা তুমি বলো নাই?

-না, বজলু ভাই। জীবনেও না।

-তাইলে কী বলেছ? সে এসব লেখল ক্যান? সে তো কাইন্দাকাইটা কসম কইরা বলল, সে তোমার কথার ওপর ভিত্তি কইরাই এসব লিখছে।

এবার আমি সত্যি ভড়কাই। আর সত্যিটাও আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। ফারুক ভাইয়ের ভ্যানভ্যানানিতে অস্থির হয়ে বলেছিলাম যে সিম্পটমগুলো সব এরকম-ওরকম। বাকিটা ওই বার্ড ফ্লুর মতোই। ফারুক ভাইও তাঁর ভিত্তিতে পোলট্রি ফার্মের মুরগির জায়গায় শূকর বসিয়ে দিয়েছেন! এই রিপোর্ট ছাপা হয়ে গেছে নাকি!!

বজলু ভাই অভিজ্ঞ সম্পাদক। আমার মনের কথা ঠিক বুঝে নেন অভিব্যক্তি দেখে। বলেন, 'রিপোর্টটা আমি দেখছি বইল্যা বাঁচছো। ছাপানো হইলে তোমাগো দুইজন যেন জীবনেও কোনো পত্রিকায় চাকরি করতে না পারো সেই ব্যবস্থা করতাম। ফারুক আমার পুরান লোক, ওরে এক মাসের ছুটি দিছি। তুমিও যাও। অফিসে

টুইক্যাই আমারে তোমার চেহারা দেখতে হয়।
আর আগামী এক মাস আমি হাই ব্লাডপ্রেসার
নিয়া অফিস করতে ইচ্ছুক না। আমি কাগজে
সই কইরা দিছি, তুমি নাম আর কারণটা
বসাইয়া ঐচ্ছিক ছুটি কাটাইয়া আসো কয় দিন।’
পুরো ব্যাপারটা শাপে-বর হলো কি না বুঝতে
পারছি না। আলম ভাইয়ের টেবিলে ছুটির
দরখাস্তটা জমা দিই। কারণের জায়গায় লেখি
‘সোয়াইন ফ্লু অবকাশ’। আমি রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩১, ২০০৯

237) নতুন কিছু রোগ

সম্প্রতি নতুন রোগ হিসেবে সোয়াইন ফ্লুর
আগমন ঘটেছে। এরই মধ্যে অনেকে নবীন
রোগ হিসেবে বরণ করে নিয়েছে সোয়াইন
ফ্লুকে। তা ছাড়া ফেইসবুক এডিকশন ডিজ-
অর্ডার নামে আরেকটি নবীন রোগ আবিষ্কার
করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ অবস্থায় রস+আলো তো
আর বসে থাকতে পারে না। তাই আরও কিছু
নতুন রোগ আবিষ্কার করেছেন আদনান
মুকিত। রি-ট্যালেন্ট হান্ট ভাইরাস
এটি একটি ভয়াবহ সংক্রামক রোগ। সাধারণত
টিভি চ্যানেলগুলোর কর্মকর্তারা এ রোগে
আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি
টিভি চ্যানেলেই এ ধরনের রোগীর সন্ধান
পাওয়া গেছে। এ রোগে আক্রান্ত রোগী খেটে
খাওয়া সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অন্য
গ্রহের এলিয়েনদের মধ্য থেকেও প্রতিভা
অন্বেষণ করতে চায়।

কোনো প্রতিভা দেখলেই ‘এ ধরনের প্রতিভা
সারা দেশে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সুযোগের
অভাবে উঠে আসতে পারছে না’-এমনটা ভাবাই
এ রোগের লক্ষণ। রোগী কারও প্রতিভা না
থাকলেও তাকে প্রতিভাবান প্রমাণ করতে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। লেটনাইট টকশো অ্যাটেন্ডিং
ডিজ-অর্ডার

টিভি চ্যানেলের টকশোগুলোয় সাম্প্রতিক আর্থ-
সামাজিক ঘটনা নিয়ে তুমুল বাকযুদ্ধে লিপ্ত
হওয়া এ রোগের প্রধান কারণ। অতিরিক্ত কথা
বলায় মস্তিষ্কের কথা থামানোর প্রোগ্রামটি
আনইনস্টল হয়ে যায়, ফলে রোগী কথার ওপর
থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ করেই কেউ
যদি নিজেকে অতিজ্ঞানী ভেবে সাধারণ বেগুন
থেকে শুরু করে ভয়াবহ আগুন পর্যন্ত সব

বিষয়ে একাই আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে 'লেটনাইট টকশো অ্যাটেন্ডিং ডিজঅর্ডার' রোগে আক্রান্ত। এতে আক্রান্ত হলে রোগী অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একাই বকবক করে যাবে।

লাইটফোবিয়া

মারাত্মক এই রোগের রোগীর সংখ্যা দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোডশেডিংয়ের কারণে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাই এ রোগের প্রধান কারণ।

আক্রান্ত রোগী টিউব লাইটসহ সাধারণ ২৫ ওয়াটের বাল্বের আলোও সহ্য করতে পারে না। আলো জ্বালালে রোগী চোখ বন্ধ করে ১, ২, ৩ গুনতে থাকে এবং মোমবাতি জ্বালাতে বলে। মোমবাতি বা হারিকেনের আলো জ্বললে রোগী শান্ত হয়। এবং সবাইকে দু-এক ঘণ্টা ধৈর্য ধরতে বলে কিম্বা মেরে পড়ে থাকে। তবে এ রোগটি ছোঁয়াচে নয়, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় না। সিরিয়াল ওয়াচিং সিনড্রোম টিভিতে প্রচারিত বিভিন্ন সিরিয়ালের (যেমন কাহানি কাউ কাউ কি) প্রতি তীব্র আকর্ষণ এ রোগের প্রধান ও একমাত্র কারণ।

নিয়মিত স্টার প্লাস, সনি-এই চ্যানেলগুলো দেখা এবং নিজেকে এই সিরিয়ালের একজন ভাবা এ রোগের লক্ষণ। রোগ প্রকট আকার ধারণ করলে রোগী অন্য কোনো চ্যানেল দেখে না এবং কোনো কারণে দেখতে না পারলে টিভির রিমোট ভাঙচুর করে। সিরিয়ালের কাহিনী অন্যের কাছে নিজের ঘটনার মতো বর্ণনা করা এবং সে রকম পোশাক পরা ও মেক-আপ করাও এ রোগের লক্ষণ। সাধারণত নারীরাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। জ্যামেনজাইটিস এটি অত্যন্ত মারাত্মক একটি রোগ। দীর্ঘক্ষণ জ্যামে আটকে থাকার কারণে এ রোগ হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এখনো এ রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেবে এবং রোগীর প্রেশার বেড়ে যাবে। রোগী হঠাৎ দাঁড়িয়ে সামনে কী আছে তা দেখার চেষ্টা করবে এবং বাসে থাপড় দেওয়ার মতো করে হাতের কাছে যা পাবে তাতে থাপড় মারবে। রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে রোগী ট্রাফিক, সার্জেন্ট এবং সরকারবিরোধী গালিগালাজ করবে।

রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা পাবে। এখন পর্যন্ত এ রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩১, ২০০৯

238) তোতা কাহিনী

ইরান দেশের এক সওদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুয়ার। সওদাগর তাই ফুরসত পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সওদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। জোগাড়-যন্ত্র তদণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কী সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না-তাকেও শুধালেন সে কী সওগাত চায়। তোতা বলল, ‘হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।’

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওদা কেনা হলো, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখনই তাদের দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে বললেন, ‘তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?’ কোনো পাখিই খেয়াল করল না সওদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনই বাজ হানল যে সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সওদাগর বিস্তর আফসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্লা বদখবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্য। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গুণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সওদাগর সওদা বিলালেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই ‘জয় হিন্দ’ বলেছিলেন ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি-সওদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়-গোঁফ কামানোর পরও হাত ওঠে অজান্তে চাড়া দেওয়ার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়-অস-সালাম আলাই কুম ও রহমত উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চৈঁচাল। সওদাগর ‘হেঁ হেঁ’ করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, ‘হুজুর, সওগাত?’ সওদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সওদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গডড্যাম ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা! কী আর করেন সওদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন। যেই না বলা, তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এ রকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্তু তোতাটি মারা যাওয়ায় সওদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। ‘হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দু-বার করলুম।’ পাগলের মতো মাথা থাবড়ান সওদাগর। কিন্তু তখন আর আফসোস, ফায়দা নেই-ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সওদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সওদাগর তাজ্জব-হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সংবিত ফিরে শুধালেন,

‘মানে?’ তোতা এবার প্যাঁচার মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘হিন্দুস্তানি যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরেনি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠাল, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাব।’

সওদাগর মাথা নিচু করে বললেন, ‘বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাওয়ার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।’

তোতা বলল, ‘মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরার চেষ্টা করো।’[সংক্ষেপিত]

সৈয়দ মুজতবা আলীঃ প্রখ্যাত রম্যসাহিত্যিক।

তোতা কাহিনী আড্ডার মেজাজে লেখা। ফলে গল্পের সঙ্গে মিশেছে সুমিষ্ট মশকরা, তত্ত্বকথার চাটনি আর বিদ্যার বৈভব। তাঁর জন্ম ১৯০৪ ও মৃত্যু ১৯৭৪ সালে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩১, ২০০৯

239) বিবর্তনঃ দেবতাতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র

বিবর্তনঃ দেবতাতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র
মানত থেকে ইশতেহার এখন গণতন্ত্রের যুগ।
এ যুগে পলিটিশিয়ানদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির
একমাত্র উৎস গণদেবতা। আর গণদেবতাকে
তুষ্ট করার নাম নির্বাচনী ইশতেহার।
দেবতাতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক
সব শ্রেণী-পেশার মানুষের চাওয়া-পাওয়ার উৎস
ছিল দেবতাকুল। আর তাদের তুষ্ট করার নাম
‘মানত’। গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচন এলে
রাজনীতিবিদেরা মোটা দাগে ওয়াদা করে
হামেশা সেটা ভঙ্গ করে বলে শক্তিধর গণদেবতা
এখন ভারি ক্ষুব্ধ। অথচ তারা একবারও ভাবে
না, ভঙ্গ করার জন্য ওয়াদা করার বিদ্যা
রাজনীতিবিদেরা গণদেবতার কাছেই হাতে-
কলমে শিখেছে। এই তো, আমার নিজ গ্রামের
সাদা-সরল কৃষক দেবতাতন্ত্রের যুগে মা কালীর
কাছে ওয়াদা করে কেমন সরল নিয়মে সেটা সে
ভঙ্গ করে বসল।

সে বছর ভরা বর্ষায় কৃষকের ছেলেটা অসুখে
ভুগে একেবারে মরমর। দিশেহারা কৃষক সেদিন
মা কালীর পায়ে মাথা কুটে বলল, ‘হে মা কালী,

আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দে মা। আমি তোর
পায়ে জোড়া মোষ বলি দেব।’

কৃষকের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে মা কালী
বললেন, ‘তথাস্তু।’ মা কালীর দোয়ায় কৃষকের
ছেলে তক্ষুনি দিব্যি সুস্থ। নিশ্চিন্ত-নির্ভর কৃষক
মনের সুখে খায়দায়, দোল উৎসবে যাত্রা দেখে
বেড়ায়; কিন্তু জোড়া মোষ বলির নামটিও মুখে
আনে না। মা কালী তো আমার দেশের
গণদেবতার মতো বেভুলো আলাভোলা মানুষ
নন। আপসে মানত আদায়ের আশায় কিছুদিন
অপেক্ষা করে কুপিত মা কৃষকের ঘুমের রাজ্যে
হানা দিয়ে বলেন, ‘ও রে নরাধম, তোর জোড়া
মোষ বলির খবর কী?’

ভয় পেয়ে ঘুম চটকে থতোমতো কৃষক খানিক
থিতু হয়ে বলে, ‘মা গো, আমি গরিব মানুষ।
জোড়া মোষ কোথায় পাব? অনুমতি করো মা,
সামনের ঘোর অমাবস্যার রাতে তোমার থানে
জোড়া পাঠা বলি দেব।’

মা কালী দয়ার বশে বলেন, ‘তথাস্তু।’ এদিকে
অমাবস্যা গড়িয়ে শুক্লপক্ষও শেষ হওয়ার পথে।
কৃষকের জোড়া পাঠা বলির কোনো লক্ষণ নেই।
মানত আদায়ে অনড় মা কালী ফের স্বপ্নে দেখা
দিয়ে কৃষককে চোখ রাঙাতেই কৃষক একবুক
সাহস নিয়ে গলা তুলে বলে, ‘জোড়া পাঠার দাবি
ছেড়ে দে মা। ওসব এখন স্বপ্নে পোলাও
খাওয়ার মতোই অবাস্তব। বাস্তবে খুব খেটেখুটে
তোকে এক জোড়া পায়রা দিতে পারি। এর
বেশি আমি অপারগ।’ তিতিবিরক্ত মা কালী
বেজার মুখে বলেন, ‘বেশ। তুই সেটাই দে।’
রাত পোহালে জোড়া পায়রা বলির কথা বেমালুম
ভুলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে থাকে
কৃষক। ক্ষুব্ধ দেবী কৃষককে ফের স্বপ্নে দেখা
দিয়ে বলেন, ‘কি রে নচ্ছার! আমার জোড়া
পায়রার খবর কী?’

মা কালীর বোকামি দেখে কৃষক এবার চোখ
মটকে রাজনৈতিক হাসি হাসে। বলে, ‘ধানের
দামের বেহাল দশা, মা। তায় আবার বিশ্বমন্দা।
জোড়া পায়রার বদলে তোমার পায়ে এক জোড়া
ফড়িং বলি দিই। সময়ের মন্দ গতিক বুঝে তুমি
ওটাকেই জোড়া মোষ বলে ধরে নিয়ো, মা।’
কৃষকের ছলাকলায় নিরুপায় মা কালী ক্লান্ত
গলায় বিষণ্ণ সুরে বলেন, ‘তথাস্তু।’

যথারীতি দিন গড়িয়ে মাস কাবার। তুচ্ছ জোড়া

ফড়িং বলি দেওয়ার কথাও কৃষক বেমালুম ভুলে বসে থাকে। কৃষকের রাজনৈতিক আচরণে দেবী এবার সত্যি তিতিবিরক্ত। অগ্নিমূর্তি মা কালী আবার কৃষকের সুখের ঘুমে হানা দিয়ে চড়া গলায় বলেন, ‘ও রে অকৃতজ্ঞ, নরাধম। তোর হাত থেকে তুচ্ছ জোড়া ফড়িং বলি পাওয়ার আশায় আমি আর কত কাল পথ চেয়ে বসে থাকব?’

কাঁচা ঘুমে হুটহাট ধাক্কাধাক্কিতে মহা বিরক্ত কৃষকও আজ মরিয়া। দেবতার জ্বালাতন বলে সে মেলা সয়েছে-আর কত? চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে দাঁত-মুখ খিচে কৃষক বলে, ‘তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, মা? চোখের সামনে হাজার ফড়িং ডানায় রোদ মেখে ঘাসের ডগায় নাচে-গায়। একটু গা নেড়ে খপ করে ধরে দুটো মুখে পুরবে-এ কথা তোমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে হবে?’ কৃষকের চোখ রাঙানিতে সেদিন দেবতাতন্ত্রের অবসান-গণতন্ত্রের সূচনা। গণতন্ত্রের যুগে পলিটিশিয়ানরা নির্বাচনের নিদানে গণদেবতার পায়ে পদ্মাসেতু মানত করতেই পারে। নির্বাচনে জেতার পরে মানতের কথা ভুলে গেলে ওদের ওপর খেপে ওঠা গণদেবতার ভারি অন্যায়। মা কালী অমর দেবতা হয়ে যদি মানতের ফড়িং নিজের হাতে ধরে খেতে পারেন তাহলে মাটির ওপর দুই পায়ে চরে খাওয়া রক্ত-মাংসের গণদেবতা নিজেই পদ্মার ওপর দু-চারটা বাঁশ ফেলে সাঁকো বেঁধে চলাচল করবে-এতে আপত্তি কোথায়? তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৭, ২০০৯

240) জন্ডিস রোগের ইতিহাস

আমার বন্ধু সদ্য ডাক্তারি পাস করেছে। সে বেচারা প্রেমে পড়ে হঠাৎ একদিন বিয়ে করে বসল। বাসাতেও জানাজানি হলো; কেউ খুব একটা আপত্তি করল না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে বউ নিয়ে কোথায় উঠবে? একান্নবর্তী পরিবার, সে নিজেই থাকে ড্রইংরুমের সোফায়! গার্জেনরা বলল, ‘আলাদা বাসা নে।’ সেই সংগতি তার এই মুহূর্তে নেই! কী করা, অন্তত বাসর রাতটা তো করা চাই! শেষ পর্যন্ত সে নিজেই একটা বুদ্ধি বের করল! সে জন্ডিসের রোগী হিসেবে সাত দিনের জন্য এক

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল! ওই হাসপাতালের ডাক্তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করল। সব ঠিক, বউ এসে থাকবে; জন্ডিস রোগীর সেবা তো দরকার!

তা অবশেষে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। নির্দিষ্ট কেবিনে বউও এসে হাজির। বেশ রোমান্টিক অবস্থা! হঠাৎ রাত ১০টায় তার মা আর দুই বোন এসে হাজির! তিনি কীভাবে কীভাবে খবর পেয়েছেন, তাঁর ছেলে সিরিয়াস জন্ডিস বাধিয়ে হসপিটালাইজড। এসেই হুলস্থূল লাগিয়ে দিলেন, ‘তোরা এত খারাপ অবস্থা, আমাদের জানালি না...বউমা, তুমিও তো জানাতে পারতে। বিয়ে করেই ভুলে গেলি... বউমা, তুমি বাড়ি যাও, নতুন বউয়ের হাসপাতালে থাকার দরকার নেই, আমরা আছি...’ সে রাত মা আর বোনদের সেবা নিয়েই আমার ডাক্তার বন্ধুকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে পরদিনই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। জন্ডিস রোগের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এত দ্রুত কাউকে পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। ছোটন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৯

241) লেমিনেশন করে প্রেমপত্র

নসু মামা নতুন লেমিনেশনের ব্যবসায় নেমেছেন। তাই যা-ই পান, তাই লেমিনেশন করে ফেলেন। যেমন, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সার্টিফিকেট, বাসার ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল-কোনো কিছু বাদ নেই লেমিনেশনের। আমরা তাঁকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসিও করতাম। যা-ই হোক, সেই নসু মামা প্রেমে পড়লেন এবং ঢাকটোল পিটিয়ে তাঁর প্রেমিকাকে বাসায় এনে পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। এর কয় দিন পর আমি দুই বছরের জন্য বিদেশ চলে যাই। ফিরে এসে শুনি, মামা ছাঁক খেয়েছেন; লেমিনেশনের ব্যবসাও আর নেই। এর মধ্যে একদিন এক বন্ধুর বড় ভাইয়ের বিয়ে খেতে গেছি। গিয়ে দেখি নতুন বউ আর কেউ নয়, সেই নসু মামার প্রেমিকা! এর কয় দিন পর একদিন বন্ধুর বাসায় গিয়ে নতুন ভাবিকে (মানে ভূতপূর্ব নসু মামি) সুযোগমতো পেয়ে জানতে চাইলাম, আমাদের নসু মামাকে কেন তিনি ত্যাগ করেছিলেন? উত্তরে তিনি একটু অপ্রস্তুত

হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, ‘দেখো, সে আমাকে প্রেমপত্র দিত লেমিনেশন করে...’
বাকিটা আমি আর শুনতে চাইনি। কোনোমতে হাসি চেপে বাসায় ফিরেছি। বাবলু
আজিমপুর, ঢাকা

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৯

242) সেদিন শুক্রবার

প্রতিদিন মেয়েকে ভোর সাতটায় স্কুলে দিয়ে তার কাজে চলে যায় আমার স্ত্রী (সে একটা স্কুলের টিচার)। আর ১০টায় আমি মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বাসায় রেখে অফিসে যাই। এই হচ্ছে প্রতিদিনকার ডিউটি। একদিন সর্বনাশ হলো! আমার যেটা কখনোই হয় না। ঘুম ভাঙল সাড়ে ১০টায়! আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম!! মেয়ের স্কুল ছুটি হয় ১০টায় আর আমি সাড়ে ১০টায় উঠলাম! কোনোরকমে শার্টটা পরে প্রায় ছুটে বেরোলাম। বাসা থেকে স্কুলে এমনিতে রিকশায় যাই, সেদিন স্কুটার নিলাম। গুলির মতো স্পিডে স্কুলে পৌঁছালাম, গিয়ে দেখি স্কুল বন্ধ! শুক্রবার! আমি হতভম্ব হয়ে বাসায় ফিরে এসে দেখি, আমার মেয়ে আমার পাশেই তখনো ঘুমাচ্ছে। স্ত্রী বাথরুমে। আমি সমস্ত ব্যাপারটাই চেপে গেলাম। হাসান মাহমুদ, কৃষি ব্যাংক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৯

243) ঈদে বাড়ি ফেরার গল্প

সাত দিন আগে থেকেই এক বন্ধুকে বলছিলাম, ‘ভাই, টিকিট কেটে না ফেললে তো বিপদ! একটা কিছু করা দরকার।’ বন্ধুটি আমার দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান খুব সহজে করে ফেলে।

সেবারও মুখ হাসি হাসি করে বলল, ‘কিছু ভাবিসনে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লোক আছে, টিকিট কেটে রাখবে।’

দেখতে দেখতে ‘শেষের সেই দিন’ চলে এল। ব্যাগ কাঁধে পড়ি-মরি করে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখি, আমার সেই বন্ধুর কোনো খোঁজ নেই। কথিত ‘আমাদের বাস’ ছেড়ে যাওয়ার ঘণ্টা আধেক পর বন্ধুবর হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, ‘আর বলিসনে। আমার সেই লোক ফাঁকি

দিয়েছে। টিকিট তো পেলামই না, টাকাটাও জলে গেল।’

এখন? এখন কী হবে! এখন এই অকূল বাসস্ট্যাণ্ডে কে দেখাবে আমাদের ভরসার আলো, কে শোনাবে আশার বাণী? বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবও তো আর নেই! এখন উপায়?

এই যে ঈদটা চলে গেল, তারই গল্প করছি বুঝতেই পারছেন। আর কী? সেই খোড়-বড়ি-খাড়া, পায়ের বাত কমিয়ে বাড়ি ফেরা!

অবশ্য পায়ের বাত আমাদের কমাতে হলো না। কেবল ‘এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভালো’ পর্যন্ত ভেবেছি, এর মধ্যে সত্যিকারের এক ‘মুশকিল আসান’ হাজির। খুঁতনির কাছে দাড়ি, কানে দুল, এমনকি বহু পকেটওয়ালা প্যান্টও পরা তার! এহেন আধুনিক এক যুবক (বা তরুণ, বা কিশোর) দুলতে দুলতে এসে বলল, ‘বাগেরহাট যাবেন?’

‘জি ভাই। কোনো উপায় হয়?’

‘হয়। ৭০০ টাকা কইরা দিতে হবে।’

আমার বন্ধু কী যেন বলতে গিয়েছিল, দরদাম করতে চাচ্ছিল মনে হয়। আমি আর কথা বাড়াতে না দিয়ে ‘জি, দেব, দেব’ বলে রাজি হয়ে গেলাম।

এখন কি দরদামের সময়! একটা বাস পাওয়া গেছে, তাতে দুজনেরই আবার একটা করে আস্ত সিট!

কোথায় সিট? ভাই, আমাদের সিটটা কোথায়?—আমরা দুজন শুধু না; পুরো বাসজুড়ে তখন সিট নিয়ে মাতম শুরু হয়ে গেছে। তার মানে আমরা সিট পাব না?

এবার আমার বন্ধু কেরামতি দেখাল।

সুপারভাইজারকে পাশে ডেকে নিয়ে কী যেন বলল আর হাতে কী যেন গুঁজে দিল (ঘুষ বলে সন্দেহ করবেন না)। একটু পর সুপারভাইজার এসে আমাদের ডেকে নিয়ে বাসে তুলল। বাসের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আমরা আবার গাবতলী থেকে সায়েদাবাদ চলে যাচ্ছি মনে হলো।

না, অত দূর যাওয়ার আগেই বাসের শেষ প্রান্তে চলে এলাম। সেখানে বিশাল লম্বা একটানা একটা বেঞ্চ দেখিয়ে সুপারভাইজার বলল, ‘এই আপনোগো সিট।’

‘সিট কই! এ তো বেঞ্চ!’

বন্ধু বলল, ‘বেঞ্চও তো না। এ তো কাঠের চেয়ার!’

‘চেয়ারই তো থাকবে। দেখেন না চেয়ার-কোচ লেখা আছে!’—সুপারভাইজার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

চেয়ারের কারিশমাটা খানিক পর বুঝলাম। আমরা বসে আছি সেই বেঞ্চের ডান দিকে। আর বাঁ দিকে বসেছেন চিকন গড়নের লম্বা দুজন ভদ্রলোক। বেঞ্চের মাঝে আরও দুজন! চিকন লম্বা দুজনের ঠিক সামনের দুই সিটে এক প্রবীণ ও এক নবীন। নবীন ভদ্রলোক বাসের ওই নিভু নিভু আলোতেই চোখে চশমা স্টেটে কী একটা বই খুলে পড়ছেন। আহা, বড় ভালো লাগল। এমন করেই না বিদ্যাসাগর জন্মাবে দেশে।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের কপাল খারাপ। খানিক পর পড়ার আরামের জন্য বেচারী তাঁর সিটে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ‘মড়াত্’!

ভেঙে পড়ে গেল বিদ্যাসাগরের সিটের পেছনের অংশটা। আর পড়বি তো পড় সেই চিকন লম্বা ভদ্রলোকের পায়ের ওপর। মড়াত্ শব্দ মেলাতে না-মেলাতেই চিকন লম্বা ভদ্রলোকের ‘বাবারে’ আত্ননাদে বাস কেঁপে উঠল। অবশ্য কাঁপুনিটা স্টার্ট নেওয়ারও হতে পারে।

বাস চলল, একই সঙ্গে চলল ‘সুপারভাইজার, সুপারভাইজার’ বলে চিৎকার। সুপারভাইজার ছুটে এসে কোনো সমাধান দিতে পারল না। সিটের বিচ্ছিন্ন অংশটা হেলে রইল ভদ্রলোকের হাঁটুর ওপর।

অবশেষে সমাধান হলো, বিদ্যাসাগর সারা রাত আর সিটে হেলান দিতে পারবেন না! বিদ্যাসাগর রাজি। কিন্তু তাঁর ঘুম তো আর এই চুক্তি মানে না।

রাত বেশ হয়েছে। বাস বেশ ছুটছে। একটু চোখ ধরে এসেছে। হঠাত্ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল—ওরে বাবারে! ডাকাত পড়ল নাকি?

নাহ, আবার সেই চেয়ার। বিদ্যাসাগর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ফলে চেয়ারের পেছনের অংশটা আবার গিয়ে পড়েছে ভদ্রলোকের হাঁটুতে। এবার গুণ্ডগোল লেগে গেল। এতক্ষণ চুপ করে থাকা চিকন লম্বা ভদ্রলোকের সঙ্গী এবার গর্জে উঠল, ‘ওই মিয়া! কথা বুঝ না? বলছি না হেলান দিবা

না! এরপর হেলান দিলে জালনা দিয়া ফেইলা দিব।’

যদিও অত বড় ছেলেটাকে জানালা দিয়ে ফেলা যাবে কি না, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

কিন্তু ভয়েই কি না ছেলেটা বলল,

‘হেলান কি ইচ্ছে করে দেই? ঘুম আসে তো!’

‘ঘুমাবা না। আর ঘুমাইলে খবর আছে।’

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বলল, ‘কী খবর?’

‘কী খবর, সেটা ঝিনাইদহ গেলে টের পাবি।’

‘তোমার বাড়ি কি ঝিনাইদা নাকি? কোনো দিন দেহি নাই তো!’—এবার আরেকটা কণ্ঠ শোনা

গেল। উঁকি দিয়ে দেখি বিদ্যাসাগরের পাশে বসা প্রবীণ ব্যক্তি জেগে উঠেছেন। দাড়িতে হাত

বোলাতে বোলাতে বললেন, ‘কী করবা ঝিনাইদা গেলে।’

‘গেলেই দেখবেন।’

‘আচ্ছা, চলো দেখি। আমিও জানি, কীভাবে মানুষ ঠান্ডা করতে হয়।’

‘আপনি কী জানেন?’

‘চল্ ঝিনাইদা, তারপর দেখবি। তোরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।’—প্রবীণ ভদ্রলোক

এবার তুইতে নামলেন।

গাড়ির সামনে থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল,

‘চাচা, টুকরো টুকরো করে যদি কাটেনই,

তাইলে আরেকটু সামনে যাইয়া কাইটেন।’

‘কেন, কেন?’

‘না, ওইখানে ভালো দা পাওয়া যায় তো।

কাটতে সুবিধা হবে।’

এমন সময় মশকরা! ব্যস, শুরু হয়ে গেল

হাতাহাতি। বাসের কেউ বাদ যাচ্ছে না।

আমরাও দু-চারটে ফাও পেলাম।

প্রবল গুণ্ডাগোলের ধাক্কাতেই কিনা বাস থেমে

গেল। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার! বাস থামল

কেন?

‘ইঞ্জিনে ঝামেলা করতেছে। এইখানে গ্যারেজ

আছে। সকালে মেকানিক আসলে দেখাইয়া

তারপর স্টার্ট দিতে হবে। ততক্ষণ গাড়ি যাবে

না।’—বিরস বদনে জানিয়ে দিল সুপারভাইজার।

‘কী! গাড়ি যাবে না! ধর ড্রাইভাররে।’—নবীন,

প্রবীণ, বিদ্যাসাগর, চিকন, লম্বা, খাটো, বেঁটে—

সব দল এবার এক হয়ে ছুটল ড্রাইভারের

দিকে।

আমাদের আর ছুটে কাজ নেই। আবার হয়তো

ফাওটাই জুটবে! দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৮,
২০০৯

244) অর্বাচীনের অভিধান

কান: যা অনুপস্থিত থাকলে চোখে সমস্যা হলে
আমাদের কনটাক্ট লেন্স পরতে হতো।

কোপানল: কোপ দিয়ে যে অনল বা অগ্নি তৈরি
হয়, যেমন: দেশলাই ব্যবহার করে রান্নার জন্য
আমরা কোপানল তৈরি করি।

কোন্দল: দলাদলির মাধ্যমে সৃষ্ট ঝামেলা।

ঝামেলার দায়ভার একদল অপর দলের ওপর
দিয়ে থাকে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায়,
ঝামেলার জন্য দায়ী কোন দল? এ প্রশ্নের
সমাধান হয় না বলে এ ঝামেলার এ রকম
নামকরণ।

কাক: সর্বজনীন ভ্রাতুষ্পুত্র। উঠতি

কাব্যচর্চাকারীদের বেসরকারি পরিসংখ্যানে
যাদের সংখ্যা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়।

কৈফিয়ত: টাকা-পয়সার হিসাবের জবাবদিহি
থেকে উৎপত্তি হয়েছে। (যদিও এখন সব
ধরনের জবাবদিহিতায় ব্যবহৃত হয়) স্কুল-
কলেজের নানা ফির কথা বলে টাকা মারিংকরণ
প্রতিরোধে অভিভাবক মহোদয় যখন জিজ্ঞাসা
হন, 'কৈ কৈ এত ফি লাগছে?' সেখান থেকেই
বাক্যের 'কৈ' ও 'ফি' যোগে অত্যাধুনিক
ব্যাকরণমতে 'এত' থেকে 'য়ত' হয়ে
(কৈ+ফি+এত/য়ত) শব্দের উৎপত্তি।

কেবিনেট: কেবি+নেট

যে নেট স্পিড কিলোবাইট বা কেবি পার

সেকেন্ডে হিসাব করা হয়। যেমন: ৩০০

কেবিপিএস। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে এর
স্পিড খুবই কম।

কেদারা: ইংরেজি চেয়ারের কঠিন ব্যাঁকা (সহজ-
সরলের বিপরীত শব্দ) বাংলা প্রতিশব্দ। 'কে' ও

'দাঁড়া' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'কে' 'দাঁড়া'
শব্দদ্বয়ে আদেশমূলক ও অবিনীত ভাব আছে

এবং বসার জিনিসে দাঁড়ানোর নির্দেশ আছে।

এই সব নানা কথা চিন্তা করে বাঙালিমাত্রই এই
প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে চেয়ারই ব্যবহার
করে।

কেঁচো: সাপুড়েরা সাপ ধরার জন্য প্রায়ই যাদের
খুঁড়তে বের হয়।

কেউটে: সাপবিশেষ, যাদের কামড়ে কেউ বেঁচে

থাকে না বা টেকে না। ‘কেউ টেকে না’ —এই বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রথমে এ সাপের নাম ছিল ‘কেউটেকেনা সাপ’। কিন্তু সরকার বন্য প্রাণী কেনা ও বেচা নিষেধ করায় ‘কেউটেকেনা’ নামের ‘কেনা’ অংশ বাদ দিয়ে শুধু ‘কেউটে’ নামই স্থির হয়।

কৃপণ: যে পণ (প্রতিজ্ঞা) করে, কাউকে কখনো পণ (যৌতুক) দেবে না। দেশে কৃপণ বাড়ানোর জন্য গণসচেতনতা দরকার।

কোষাগার: কোষ বা সেলদের আগার, যেমন: প্রাণীদেহ।

ক্লোন: ক্লোন...ক্লোন...ক্লোন...ক্লোন... (দূর, শব্দেরও হয় জানতাম না তো!)

কোলাকুলি: একধরনের কোলা পানীয়, যা দিয়ে কুলি করতে হয়। সম্ভবত ব্যাপারটা দাঁতের জন্য ভালো।

কুশীলব: যে অভিনয়শিল্পী বিটিভির বাংলা নাটকের প্রায় প্রতিটিতে অভিনয় করেছেন। সমস্যা হলো, এ মহান শিল্পী খুবই আত্মপ্রচারবিমুখ, তাই প্রায় কেউই তাকে চেনে না।

কুয়াশা: মন্দ আশা। বাক্যগঠন—সমীরের হাবভাব ভালো মনে হচ্ছে না। ওর মনে কোনো কুয়াশা জমেনি তো?

কবি: প্রখর সূর্যকে মায়াময় চন্দ্র কিংবা মাকড়সাকে বর্ণিল প্রজাপতি ইত্যাদি কল্পনা করতে সক্ষম মানবসম্প্রদায়বিশেষ, যারা কোনো কথাকে জিলাপির চেয়ে অন্তত আড়াই গুণ বেশি প্যাঁচ না দিয়া মুখনিঃসৃত হতে দেন না।

কলঙ্ক: অঙ্ক করার কল বা মেশিন। যেমন: ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি।

কবিরাজ: King poet-এর বাংলা। যে রাজা কবি বা যে কবি রাজা কিংবা যে কবি নিজেকে রাজা ভাবেন। যেমন: ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।’ এ উক্তিটি যে কবি করেছেন তিনি সম্ভবত একজন কবিরাজ।

কোণঠাসা: অস্বস্তিকর জ্যামিতিক পরিস্থিতি, যেখানে সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ, স্থূলকোণ ইত্যাদি ধরনের কোণ দিয়ে তৈরি গাণিতিক সমস্যা থাকে।

বাক্য গঠন: আজকের ম্যাথ প্রশ্ন এত কঠিন ছিল, একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছি।

কর্মফল: ক্লান্তি, অবসন্নতা ইত্যাদি। যেকোনো

কর্মসাধনের পরপরই এসব কর্মফল পাওয়া যায়।

কপিকল: কপি করার কল। যেমন: ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার ইত্যাদি।

কারবারি: গাড়ি (কার) ও বাড়ি হয় যার মাধ্যমে। যেমন: চোরাকারবারি বলেই তো ওর আজ গাড়ি-বাড়ি হয়েছে।

কলোপ: ‘ক’ দূর হয় বা লোপ পায় যার মাধ্যমে। ধারণা করা যায়, এখানে ‘ক’ দ্বারা বিশেষ ধরনের শুভ কেশকে বোঝানো হয়।

কদাচার: একধরনের মুখরোচক আচার। সম্ভবত কদবেল দিয়ে তৈরি হয় বলে এ নামকরণ।

কমনীয়তা: স্বল্পতা। যেমন: তার কথায় কোনো কমনীয়তা নেই, সবকিছুই আগাগোড়া বলছে।

মাসুদুল হক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৯

245) বংশের পরিচয়ে ব্যবহার

‘ব্যবহারে বংশের পরিচয়’ কথাটি যুগ যুগ ধরে চলে এলেও আজকাল বোধ হয় ‘বংশের পরিচয়ে ব্যবহার’ বললেই সবচেয়ে খাঁটি কথাটি বলা হয়। এ ভেজালের জমানায় একটি খাঁটি কথা বলা কিন্তু কম সাহসের কথা নয়।

যা-ই হোক, খাঁটি কথাটি বলার সাহস পেলাম কীভাবে, সে প্রশ্নেই যাওয়া যাক। ছোট একটি ঘটনা বলি। আমার এক বন্ধু বংশীয় পদবি হিসেবে তার নামের সঙ্গে লেখে ‘পাঠান’। তাকে দেখামাত্র আমার আরও কিছু বাঁদর বন্ধু আছে, যারা বলবেই বলবে, ‘পাঠান সাহেব, আপনি তো পাঠান। এক কাজ করেন, আমার হয়ে মলিকে কিংবা লাবণিকে একটা মেসেজ পাঠান না।’

কেউ কেউ বলবে, ‘আমি বিদেশে যেতে চাচ্ছিলাম। পাঠান সাহেব, আমাকে একটু বিদেশে পাঠান।’ আমাদের পাশের পাড়ায় আরেকটি ছেলে আছে। নাম সবুজ খান। তাকে দেখলেই ছেলেপেলেরা খ্যাপাবে, ‘তাই তো বলি, দিন দিন আমাদের দেশ থেকে সবুজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে কেন। কারণ একটাই। আপনি সবুজ খান। মানে সবুজ খেয়ে ফেলেন।’ বংশের পরিচয় পাওয়ার পর ব্যবহারের ধরনটা কেমন হয় একটু তো পূর্বাভাস পাওয়া গেল, তাই না? পূর্বাভাসের পর এবার পশ্চিমাভাস-উত্তরাভাস-দক্ষিণাভাস সবই হবে। বংশ অনুযায়ী ব্যবহার

করার বিষয়টি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি মেনে চলে গ্রামের মানুষ। মনে করুন, কারও পূর্বপুরুষ অথবা পূর্বনারী পাগল ছিল। শহরের মানুষ হয়তো তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারই করবে। কিন্তু গ্রামের মানুষ এই বংশীয় পরিচয়ের কারণে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে যে এই বেচারাকে হয়তো সারা জীবন কুমারই রেখে দেবে। কারণ তাদের একটি ধারণা, বংশের মধ্যে কেউ পাগল থাকলে এর প্রভাব কারও না কারও ওপর পড়বেই। বংশের পরিচয়ে তারা যে কারও সঙ্গে শুধু নেতিবাচক ব্যবহার করে তা-ই নয়, ইতিবাচক ব্যবহারও করতে জানে। কীভাবে, সেটা বলার আগে একটু স্মৃতিচারণা করে নিই। হাইস্কুলে পড়াকালে একটি বাংলা ছবি দেখেছিলাম। নামটি ঠিক মনে নেই। তবে ভিলেনের সেই বিখ্যাত ডায়লগটি খুব মনে আছে। স্মৃতিশক্তি ভালো হলে যা হয়। ভিলেন কথায় কথায় ডায়লগ দিত, ‘এই জানস, আমি রাজনীতি বংশের লোক।’ এটি বলার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকজন নড়েচড়ে বসত। রাজনীতি বংশের লোক বলে তার প্রতি তাদের ব্যবহার মুহূর্তেই বদলে যেত। যদিও তখন বদলে যাওয়ার স্লোগান চালু হয়নি। তার মানে কেউ রাজনীতি বংশের লোক হলে তার প্রতি ব্যবহারটা করতে হবে অন্য রকম। শহরের মানুষ পরস্পরকে খুব কমই চেনে। গ্রামের মানুষ একজন আরেক জনকে একেবারে চৌদ্দগোষ্ঠীসহ চেনে তো, তাই তারা ব্যবহারটাও করে সেই অনুযায়ী। বিশেষ কোনো রাজনীতি বংশের না হোক, অন্তত চেয়ারম্যান বংশের লোক হলেই তারা অন্য রকম আদব-লেহাজ করে। অবশ্য না করে উপায়ও নেই তাদের। সহজ-সরল মানুষ। কোনো রকম গ্যাঞ্জাম বাধাতে চায় না। ওই সব বংশের লোকেরা আবার গ্যাঞ্জাম বাধানোর ওস্তাদ কি না! ‘জন্ম হোক যথা-তথা, কর্ম হোক ভালো’। অর্থাৎ বংশ যা-ই হোক না কেন, কর্ম বা ব্যবহারটা ভালো হতে হবে—এটি আপনি আমি মানলেও আমাদের দেশের রাজনীতি অঙ্গনে মানা হয় না। যদি মানা হতো, তাহলে আপনি আমিও এত দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারতাম। এখানে মানা হয় কর্ম হোক

যাহা তাহা জন্ম হোক ভালো; মানে—ভালো বংশে। আর এই নিয়মটিই চলে আসছে সেই স্বাধীনতার পর থেকে। যে কারণে আমাদের রাজনীতি বা সরকার গঠনের ব্যাপারটা বংশকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে পুরোপুরি। আগামী কয়েক যুগের মধ্যে আমরা এই ধারা থেকে বের হতে পারব বলে মনে হয় না। ইচ্ছে করলেই আমাদের পক্ষে এ দুই বংশের সদস্য হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হওয়াও সম্ভব নয়। বংশের পরিচয়ে ব্যবহারের ব্যাপারটা কোথায় নেই, বলুন। বছরের পর বছর জুতার তলা ক্ষয় করেও যখন চাকরি হয় না, তখন আমরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, ভাই রে, আমার তো আর মামা-চাচার জোর নেই যে চাকরি হবে। তো এই যে মামা-চাচার জোরের ব্যাপারটা, এখানেও কিন্তু বংশের বিষয় জড়িত। কারণ মামা-চাচা তো আর আকাশ ফুঁড়ে বের হয় না; বংশেই হয়। আপনার যদি ওই ক্যাটাগরির দু-একজন মামা-চাচা থাকে, তাহলে চাকরিদাতারাই আপনাকে স্যার স্যার করবে। আর অন্য প্রার্থীরা আপনাকে দিনে পাঁচবার সালাম দেবে। কারণ তাদের আশা একটাই, আপনার মামা-চাচার কল্যাণে যদি তাদের ভাগ্যের দরজা না হোক, অন্তত জানালাটা খোলে। জানালাও যদি না হয় যাতে ভাগ্যের ভেন্টিলেটরটা খোলে। জন্মের পর থেকেই আমরা শুনে আসছি একটা প্রবাদ—জাতের মেয়ে কালো ভালো। এখানেও বংশের জয়জয়কার। অর্থাৎ বংশ ভালো হলে মেয়ে কালো হলেও সমস্যা নেই। ক্রিম কিংবা বিউটি পারলারের কল্যাণে গায়ের রং ফরসা করা যাবে। কিন্তু জাত বা বংশ ঠিক করা যাবে না। বাপ-দাদার নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার কাজটা আমরা প্রায় সবাই করে থাকি। এখানেও বংশের পরিচয় দিয়ে ভালো ব্যবহার পাওয়ার বাসনা। শুধু মানুষ কেন, পশুদের মধ্যেও জাত বা বংশের বিষয়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জন্যই সাধারণ জাতের গাভীর প্রজনন ঘটানো হয় উন্নত জাতের যাঁড়ের সঙ্গে। ব্যবহারে বংশের পরিচয় হোক আর বংশের পরিচয়ে ব্যবহার হোক—আমরা কোনোটার সঙ্গেই দ্বিমত পোষণ করব না, তবে আমাদের ছোটখাটো একটা প্রত্যাশা-আমড়া কাঠের টেকিরা যেন বংশীয়

পরিচয়ের জোরে জাম বা কাঁঠাল কাঠের ঢেঁকির কদর না পেয়ে যায়। তাহলে এই ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবে দূরের কথা, পৃথিবীতেই অকর্মা হয়ে যাবে। ইকবাল খন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৯

246) পূজাসংখ্যা বনাম প্রেস

রাস্তায় আমাদের পাড়ার প্রেসের ম্যানেজার দ্বিজেনবাবু কীসব আপন মনে বকছেন।

কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলাম, দ্বিজেনবাবু বলছেন, “দুশো ‘জ’, ছশো ‘ং’, একশো ‘ঙ’, দুশো ‘ক’।” আমি বললাম, ‘দ্বিজেনবাবু কী বলছেন, কী হলো?’

দ্বিজেনবাবু বললেন, “এই তো মাটি করে দিলে সব। আমি সব এক এক করে ভাবছিলাম, আর তুমি এসে সব গুলিয়ে দিলে—বুর্জোয়ার ‘জ’, পিকিংয়ের ‘ং’, লগুনের ‘ঙ’, আর নিউইয়র্কের ‘ক’, কিন্তু এতে তো হবে না। আরও বাড়াতে হবে।”

আমি বললাম, ‘ঠিক বুঝতে পারছি না।’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে। আরও ং-এর দরকার হবে।’ আমি বললাম, ‘ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে কেন?’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘ং ছাড়া ওয়াশিংটন আপনি কী দিয়ে লিখবেন? তা ছাড়া এবং-এর ং আছে। ছশোয় কুলোবে কি না সন্দেহ।’

আমি বললাম, ‘ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?’ দ্বিজেনবাবু আমার কথা বোধ হয় শুনতেই পেলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, ‘এর পর আছে আবার হংকং, ইয়াং-সিকিয়াং।

হাজার খানেক ং দরকার।’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘আর বোলো না ভাই। এই আমার ব্যবসা। পুজোর সময়ে পত্রিকা ছাপিয়ে যা হয়, বছর প্রায় চলে যায়। কিন্তু ছাপাতে গেলে টাইপ কিনতে হয়, নিজে তো টাইপ বানাই না। কিছু কিছু টাইপ অবশ্য মজুদ থাকেই, কিন্তু হঠাত্ এক এক টাইপের বেশ দরকার হয়ে পড়ে! তাই হিসাব করছিলাম, এবারে কী টাইপ বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে!’

আমি বললাম, ‘ও, বিশেষ টাইপের কথা ভাবছিলেন বুঝি?’

দ্বিজেনবাবু বললেন, “হ্যাঁ ভাই, ভাবছিলাম। কত রকম যে এর হিসাব আছে, তার কি সীমা

আছে? পুজোসংখ্যা যখন, তখন সুন্দর, শক্তি, ভক্তি এসব কথার বান ডাকবে। অতএব এক মাস আগে থাকতেই আমি ‘ন্দ’, ‘জ’, এসব জমিয়ে রেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হয় ওই কমিউনিস্টদের বেলায়। ওরা আমাকে দিয়ে মাঝেমধ্যে কাগজ ছাপিয়ে নেয়, কী করি, ব্যবসার খাতিরে সবার সঙ্গেই ভাবটাব রাখতে হয়। কিন্তু ওদের ঠিক থাকে না সব সময়। কত ফর্মা হবে, কে লিখবে, এক বই ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালটে যায়, কিন্তু ওরা টাকা দেয় ভালো—ওদের জন্য ‘জ’ কিছু রাখি।” ‘কেন?’

“বুঝলে না? ওরা প্রবন্ধ লিখলে বুর্জোয়া কথাটা ব্যবহার করবেই। প্রতি তিন লাইনে একটা বুর্জোয়া। ষোল পাতার ফর্মা, ওখানেই চলে গেল আটচল্লিশটা ‘জ’, অন্তত তিন-চার ফর্মার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, তাই শ দুই ‘জ’ আনতে হবে, তাই ভাবছিলাম। এ গেল এক্সট্রা, আমার ‘জ’ একেবারে নেই তা নয়। কবিরাজ ‘জ’ তো কম ব্যবহার করে না!”

‘কবিরাজ? ওরাজ কি কমিউনিস্ট?’
দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘সব কবিই যে কমিউনিস্ট তা নয়, তবে মোটামুটি আমার ধারণা, অধিকাংশ কমিউনিস্ট। নইলে ওরা প্রায় জর্জর হয় কেন? কবিতা পড়লেই দেখবেন কবিরাজ বেদনায় ঝুঁকছে। অধিকাংশই জর্জর। তবে তারাপদ যে আমাকে ডোবাবে ভাবিনি।’

‘আপনাকে তারাপদ ডুবিয়েছে?’
“মশাই, ওর জন্য সেবার একটি ফর্মার দেড়শো জ লেগেছিল!” ‘দেড়শো?’

দ্বিজেনবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, ‘দেড়শো। প্রথম দু-পাতা ধরে তো বিদেশি জিনিস বর্জন সম্বন্ধে বিরাট বক্তৃতা। তারপর বৈপ্লবিক কথাবার্তা—সার্জারি কথাটা ব্যবহার করল পাঁচিশবার। তাও ভালো অস্ত্রোপচার করেনি—তাহলে যেতাম।’ ‘অস্ত্রোপচার করলে আপনি যেতেন কেন?’ ‘অস্ত্রোপচার করলে কেউ বাঁচে? যা-ই হোক, সে কথা ঠিক নয়। আমার ‘স্ত্রী’ মাত্র দশটা ছিল শেষমেশ।’ ‘শেষমেশ কেন? এর আগে স্ত্রী খুব ব্যবহার করে ফেলেছিলেন বুঝি?’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘আমি ব্যবহার করব কেন? এইটুকু পুচকে মেয়ে—হারুদার মেয়ে চপলা, সে পাড়ার ম্যাগাজিনে স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে এক

পেন্সাই প্রবন্ধ লিখেছিল, ব্যস, আমার 'স্ট্রী' খতম। এবার স্ট্রী মজুদ রেখেছি ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম।'

দ্বিজেনবাবু বললেন, 'প্রেসের কাজে বড় ঝঞ্ঝাট, মশাই। আমরা কয়েকটা 'দু' রাখি। সেবার আমাদের প্রেস থেকে একটি নতুন লোক 'দু' চুরি করে সরে পড়ল। দু-সের 'দু' ছিল মশাই। অত ভালো 'দু' কি আর পাব? সেই ইংরেজ আমলের দু। ভালো 'দু' মশাই! প্রেস চালানোর মতো বদ কাজ আর নেই।'

বললাম, 'তবে যে শুনি সম্পাদকের মতো বদ কাজ আর হয় না?' দ্বিজেনবাবু বললেন, 'ভুল। ভুল শুনেছ।' বলতে না বলতেই চলতি একটা ট্রামে উঠে পড়লেন।

এমন সময় দেখি, প্রিয়ব্রতবাবু দৌড়াতে দৌড়াতে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। বললাম 'ও প্রিয়ব্রতবাবু, হলো কী?' প্রিয়ব্রতবাবু একজন লেখক। তাঁর দু-খানা বই সিনেমাওয়ালা কিনেছে, আর দু-খানা বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে; বিরাট নামকরা লোক। আমি গিয়ে বললাম আবার, 'ও প্রিয়ব্রতবাবু, হলো কী?'

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, 'দড়ি বেয়ে নেমে এলাম।' 'আপনি তো তিনতলায় থাকেন? সেখান থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এলেন?'

'নেমে এলাম।' তিনি বললেন, 'এক সম্পাদক দেখা করতে এসেছিলেন।' 'কেন?'

'মশাই, আর বলবেন না। উপন্যাস দেব বলেছিলাম—দিয়েছি, কিন্তু ভুল করে, নেহাত ভুল করে একটা ছোটগল্প ওর মধ্যে চলে গিয়েছে—সে গল্পটা অন্য একটি কাগজের জন্য লিখেছিলাম। এখন মুশকিল হয়েছে কি, ওরা তো আমার উপন্যাসের মধ্যে ছোটগল্পটা ছেপে দিয়েছে। তাই আর কি, সম্পাদকের চাকরি যায় যায়। এখন তিনি একটা পকেট-হাতুড়ি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তাই দেখেই দড়ি বেয়ে নেমে এসেছি।' 'দড়ি বেয়ে! দড়ি কোথায় পেলেন?' 'বহু দিন আগে থেকেই দড়ির খেলা শুরু করেছি। গোলমাল তো আজ নতুন হলো না। একবার একটি ছোটগল্প লিখেছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম 'ভুবন তো আজ হল কাঙাল'। ব্যস, আমার প্রাণ অতিষ্ঠ।' 'কেন?'

'মাসিকপত্রের মালিকের নাম ভুবন জানতাম না।

শেষ পর্যন্ত নাম বদলে দিতে বাধ্য হলাম!’

‘কী নাম দিলেন?’

‘সুবীর তো আজ হল কাঙাল!’

‘কেল্লা ফতে?’ ‘না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট হেডপিস করল, ‘সুবীর তো আজ হল কাঙাল’!

কেউ লক্ষ্য করেনি। যখন ছাপা হলো তখন মালিক বললেন, সম্পাদককে, ‘এ কিডা লিখছে?’ বুঝুন ঠালা, সম্পাদক দুজন গুল্ডা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ওই দড়ির খেলায় বেঁচে গিয়েছিলাম।’

জিঙ্গেস করলাম, ‘এবার কতগুলো লিখছেন?’ প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, ‘সাতখানা উপন্যাস, পনেরোটা গল্প আর ছটি কবিতা।’ ‘কবিতা?’ ‘কবিতা লিখতে পারি জানতাম না। একবার একজন সম্পাদক আমাকে লেখার জন্য চিঠি লিখলেন, পঁচিশ টাকা দেবেন একটি পুজোসংখ্যার গল্পের জন্য। আমি লিখলাম: ভাই, কী করে লিখি। টাকাও তো বেশি নয়।

জামাকাপড় ইত্যাদি বাবদ যা খরচ হবে, তার জন্য পঁচিশ টাকা অতি সামান্য নয় কি? পঞ্চাশ হলে দেখতে পারি। ইতি।

তারপর আর কোনো সাড়া নেই। দেখি ওরা কবিতা বিভাগে ওই চিঠিটাই ছেপেছে—

ভাই,/গল্প কী করে/লিখি?/টাকাও তো বেশি নয়।/জামাকাপড় ইত্যাদি বাবদ/যা খরচ হবে তার/জন্য পঁচিশ টাকা অতি সামান্য।/ নয় কি? পঞ্চাশ হলে/দেখতে পারি।

তারপর থেকে কবিতাও লিখতে শুরু করেছি।’ বললাম, ‘কিন্তু অতগুলো উপন্যাস লেখা কি কম পরিশ্রমের?’ প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, ‘বড় উপন্যাস তো লিখি না। ওই এক-একখানা দশ-বারো পাতার উপন্যাস লিখি।’ আমি বললাম, ‘অত ছোটকে উপন্যাস বলেন কেন?’

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, ‘এককালে যেগুলোকে রসমুণ্ডি বলা হতো, তার নাম আজকাল রসগোল্লা হয়েছে, দেখেছেন?’ ‘হ্যাঁ’ ‘এও তাই। শুনছি, দু-একজন বড় ঔপন্যাসিক তিন পাতার উপন্যাসও লিখতে লেগে গিয়েছেন।’ তারপর প্রিয়ব্রতবাবু দেখলেন, দূরে কে যেন চলে যাচ্ছে। তারপর বললেন, ‘আজ আসি?’ প্রিয়ব্রতবাবু চলে গেলেন।

খানিক পর দেখি, দ্বিজেনবাবু ফিরছেন রিকশায় করে। আমাকে দেখে রিকশা থামালেন।

বললেন, ‘সর্বনাশ হয়েছে, সব পেলাম কিন্তু ‘ং’ আর পেলাম না। খুব কাটতি হয়েছে ওই ং-এর। ভারত, তিব্বত আর চীন সীমান্ত নিয়ে সব পত্রিকাতেই দুটো করে গড়ে প্রবন্ধ যাচ্ছে।’

বললাম, ‘এবারে তাহলে কী করবেন?’

দ্বিজেনবাবু বললেন, “এবংগুলো কেটে ‘ও’ করব। আর কিছু ‘ঙ’ দিয়েও কাজ চালাব।

চালাতেই হবে। উপায় কী?” [সংক্ষেপিত]

হিমাদীপ গোস্বামী: লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৯

247) জ্যোতিষীর চেস্বারে

এই জ্যোতিষীটির কথা আপনারা শুনে থাকবেন!

ভয়াবহ ঐর ক্ষমতা। এক স্কোয়াড জিনের পালক। হুজুরের ফি হচ্ছে বিডিটি দেড় হাজার এক (টাকা)। তো, সে বার একটা জালিয়াতির কাজে কনসালটেন্সি করে আমি কিছু পয়সা কামাই। ওটা রাখি গোপন অ্যাকাউন্টে। বউকেও বলি না। কেননা, বউয়েরা স্বামীর লুকোনো টাকা-পয়সার খোঁজ বের করে ফেলতে বিশেষ দক্ষ। ইতিমধ্যে ওই জালিয়াতির দুর্গন্ধ পুলিশের নাকে যায়। কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে আমিও তখন সড়াৎ করে চলে যাই

আন্ডারগ্রাউন্ডে—একদম ফ্রম শেখেরটেক টু মাদারটেক। পুলিশ বলতেই এখনো মনে আসে সেই খাকি পোশাক। তো, একদিন মাদারটেক বাজারে খাকি পোশাক পরা বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন দেখে আমি হাতের ঝোলা-মোলা ফেলে ঝেড়ে দৌড়। দুর্গতির একশেষ আর কি! এভাবে টেনশনে গেলাম শুকিয়ে। যখন-তখন ভাইরে, খালি চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে। প্যান্টের ডিলে হয়ে যাওয়া কোমর এক হাতে সামলে রাখতে হয়। ঘুমের মধ্যে স্ত্রীর হাত গায়ে এসে পড়লে— ‘হুজুর আই অ্যাম নির্দোষ!’ বলে চিৎকার করে উঠি। এ অবস্থায় ওই জ্যোতিষীর সন্ধান মেলে।

এক সোমবারে পকেটে দুই বাউল অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আমি হাজির হই তাঁর চেস্বারে।

উরি-ব্রাপ্, যেমন বিশাল দেহ, তেমনই জমকালো পোশাক! টেবিলের ওপর সুন্দরভাবে বিছিয়ে রাখা তাঁর এক্সট্রা লং দাড়িখানা যেন প্রদর্শনীর আইটেম। আমাকে দেখেই হুংকার ছাড়লেন, ‘তেরে নাপাক জেব মে হারাম চিজ হয়। জলদি নিকাল, হারামজাদা!’ অর্থাৎ, তোর

অপবিত্র পকেটে অবৈধ বস্তু রয়েছে, জলদি বের কর। আমি তৎক্ষণাত্ আদেশ পালন করলাম। তিনি হেসে বললেন, ‘টোটাল কিতনা চুরায়া?’ অর্থাৎ, মোট কত চুরি করেছিস? আমি কেঁদে উঠে বললাম, ‘পেটের দায়ে ওনলি দুই লাখ কামাতে বাধ্য ছুয়া, স্যার। আপনার জিন দিয়ে আমাকে বাঁচান।’ হুজুর বললেন, ‘আমার পুরো জিন স্কোয়াডটাই অ্যাসাইনমেন্টে চলে গেছে। এদের কাউকে কল ব্যাক করতে গেলে খচ্চাপাতি একটু বেশি পড়ে যাবে।’ আমি বললাম, ‘জো হুকুম, জাহাপনা।’ তিনি আমার টাকার বান্ডিল দুটো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, ‘যা, আগামীকাল ডিজিটাল টাইম রাত তিনটা ৫৬ মিনিটে আমার জিন তোর কাছে গিয়ে কেসের ডিটেল নোট করে আনবে। মামলা চলবে, আর তুই প্রত্যেক সোমবারে ডবল ফিসহ এখানে এসে হাজিরা দিতে থাকবি। তা না হলে...এই বলে তিনি হিংস্রভাবে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচালেন। আমি কোনোমতে শুধু বললাম, ‘তবে স্যার, আমার বিবি জিন-ভূত খুব ভয় পাতা হয়। আন্ডার দ্যা সিচুয়েশন’... জ্যোতিষী খ্যাঁক খ্যাঁক করে বাজে ধরনের একটা হাসি দিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা নে, তোর বিবির জন্য এই কবচটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, তোর শার্টের হাতার ভাঁজে লুকিয়ে রাখা ওই ৫০০ টাকার নোটটা আমাকে দে।’ ভাইরে, এভাবে দিন যায়। নো জিন সার্ভিস। নো অগ্রগতি। ওনলি হাজিরা, ডবল ফি, আংটি-পাথর অ্যান্ড খচ্চাপাতি। হুজুর বলেন, ‘নেক্সট সোমবার আসুক।’ এদিকে আমার টাকা-পয়সা সব প্রায় শেষ। তো, গত সোমবারে চেম্বারে পৌঁছে দেখি দরজায় তালা লাগানো। দেয়ালের কাছে উবু হয়ে বসে একটা লোক সেদিনকার ‘রস+আলো’ পড়ছে। সে-ই সংক্ষেপে আমাকে জানাল, জইতিশি হুজুর তাঁর জিন স্কোয়াড ছালায় ভরে আফগানিস্তানে চলে গেছেন জরুরি অ্যাসাইনমেন্টে। আনটিল ফারদার অর্ডার, বাংলাদেশে তাঁর কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। কাওসার আহমেদ চৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৯

248) মিষ্টি কথায় চিনি উজাড়

ঈদের দিন মফস্বলের এক রেস্টোরাঁয় বসে চা খাচ্ছিল দুই বন্ধু। চা এমনিতে আট টাকা কাপ।

রেস্তোরার টিভিতে সন্ধ্যার সংবাদে চিনির দাম বাড়ার খবরটা প্রচারিত হলো। দুই বন্ধু চায়ের বিল দিতে গিয়ে অবাক। চায়ের দাম এরই মধ্যে বেড়ে গেছে প্রতি কাপে দুই টাকা!

আরেকটা ঘটনা। ঈদের পরপরই দেশে বিয়ের ধুম লেগেছে। বিয়ের ধুমে ঘুম নেই বাবুর্চিদের, কসাইদের। দীর্ঘদিন প্রেম করে এলাকার হার্টথ্রব মেয়েটা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বসল এক ব্যবসায়ীকে। লোকটার আগের বউ গত হয়েছেন মাস তিনেক আগে। এ মেয়ের এমন একজন মধ্যবয়সী লোককে বিয়ে করার পেছনে দ্বিতীয় কোনো কারণ নেই। একটাই কারণ, সেটা হলো, লোকটার গুদামে তখন কয়েক হাজার মণ চিনি ছিল। চিনির লোভে পিঁপড়া আসে। দিন পাটেছে। ইদানীং চিনি ব্যবসায়ীরাই সুন্দরী বউ পায়। এ থেকে দেশের

তরুণসমাজের কিছু শেখার আছে। তা হলো, শুধু শুধু প্রেম করে, ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করে, ফুল কিনে প্রেমিকার পেছনে ছুটে ছুটে সময় নষ্ট না করে চিনির ব্যবসায় নামুন; প্রেমিকাই আপনাকে খুঁজে বের করবে।

অনেক দিন আগের কথা। কর্ণফুলী নদীর পানি একবার নাকি মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা আর কিছুই না। চিনিবাহী একটা জাহাজ ডুবে গিয়েছিল কর্ণফুলীতে। তখন অনেকেই নাকি কর্ণফুলীর পানি বাসায় নিয়ে চা বানিয়ে খেয়েছেন।

যে দেশের পানিতে চিনি আর নেতাদের কণ্ঠে বারো মাস মিষ্টি ঝরে, সে দেশের জনগণ চিনি কেনে দ্বিগুণ দামে, মেনে নেওয়া সত্যি একটু কঠিন। ‘চিনি জাফর’ নামে জাতীয় পার্টির একজন নেতাও আছেন। তিনি চিনি নিয়ে একসময় ছিনিমিনি করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি বাধিয়েছিলেন। এর পর থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় চিনি জাফর। একজন চিনি জাফরই সব নয়, দেশে এখন ভূরি ভূরি চিনিব্যক্তিত্ব। তাঁদের সবার নাম কি আর আমরা জানি? সেদিন পত্রিকায় ছাপা হলো, একটি গুদাম থেকে হাজার হাজার বস্তা চিনি আটক করেছে র্যাব। এর পরদিন খবর পেলাম, পুলিশি পাহারায় চিনি বিক্রি হয়েছে অনেক বেশি দামে। পুলিশ বলেছে, তাদের কাজ বিক্রি নিশ্চিত করা, চিনির দাম কমানো নয়। আসলে দাম বাড়ানো নিশ্চিত

করতে পারলেই আমাদের প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ, কমানোর দায়িত্বটা যে কার, সেটা একটা রহস্য।

সব সময় দেখে এসেছি, প্যাকেটজাত পণ্যের কদর বেশি থাকায় অসাধু (!) ব্যবসায়ীরা রাতের বেলা নিজেরাই বস্তার পণ্য মোমবাতি জ্বালিয়ে দোকানের ভেতরই প্যাকেট করেন। কিন্তু এবার চিনির বেলায় ঘটেছে উল্টো ঘটনা। এবার রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে নয়, দিনের বেলায় ৩০ টাকার বিভিন্ন প্যাকেটজাত চিনির প্যাকেট কেটে বস্তার চিনির সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করেছেন আমাদের সুযোগসন্ধানী মহান ব্যবসায়ীরা। তবে যে যা-ই বলুক, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের ইউনিটি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এসব দেখে এবং সরকারপক্ষের কথার ফুলঝুরি শুনে মনে হয়, ক্যাপিটালিজমের রঙিন প্যাকেটে মোড়া সোশ্যালিজমের ফ্লেভার দেওয়া এক অনন্য গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি আমরা। দিব্যি খাই, ঘুমাই যেন—চিনি!

কেন, কী হয়েছে?

প্রতিদিনই তো কিনি।

দাম বেড়েছে ওটার?

কই, একটুও তো টের পাইনি!

অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেলে অনেক কিছুই টের পাওয়া যায় না। এ দেশের জনগণ টের পাওয়াপাওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে। তবে চিনির দাম বাড়ায় এর একটু ভিন্ন রকম প্রভাব পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। দুটি প্রধান দলেরই কিছু নেতার মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বের হয়নি। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা জনাব জলিল সাহেব দল নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নিয়ে ইদানীং যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো খুবই তেতো। যেন চিনিমাখা দুধভাতে তেঁতুলের টক মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে বিএনপি সব সময়ের মতো আবারও বেকায়দায় পড়েছে কুকুরের লেজবিষয়ক তার বিশেষজ্ঞ মুখরা নেতা সাকা চৌধুরীকে নিয়ে। তিনি বলছেন, তিনি নাকি বিএনপির অ্যান্টিবায়োটিক। সাকা সাহেবকে নিয়ে অনেক হয়েছে, নতুন করে আর কিছু বলার নেই। শুধু বলতে ইচ্ছে হয়, এই যদি হয় অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে রোগের ধরনটা না-জানি কী! তাঁদের জন্য হলেও ব্যবসায়ীদের চিনির দাম কমানো উচিত। চিনি

খেয়ে যদি তাঁদের মুখ কিছুটা মিষ্টি হয়, জনগণ না হোক, দলের অন্য নেতারা যাতে একটু মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে আরামে ঘুমাতে পারেন।

ঈদের পরপরই একজন বলল, চিনির কেজি নাকি ৭০ টাকা। চিনি বিষয়ে এমন তেতো কথা শুনে ব্লাডে সুগার বেড়ে প্রেশার বেড়ে গেলেও নিচু স্বরে কারণ জানতে চাইলাম। লোকটা বলল, সরকারের কেউ একজন নাকি চিনির দাম কমানো নিয়ে কী একটা বলেছেন, এর পরপরই দাম বেড়ে গেছে। এ যেন মিষ্টি কথায় চিনি উজাড়। আমাদের সরকারগুলো যদি সব সময় যা বলা উচিত এর উল্টোটা বলত, তাহলে জনগণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কেন জানি তাদের কথাগুলো সব সময় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের মতো বিপরীত ফল দেয়! তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ০৫, ২০০৯

249) আগে হাসায় পরে ভাবায়

এখন অক্টোবর মাস। নোবেল পুরস্কারের মৌসুম। বিশ্বের অনেক খ্যাতনামাদের মনটা দুরুদুরু করছে। অনেক দিনের আরাধ্য নোবেল পুরস্কারটি হাতে আসবে তো। আমরা যারা আমজনতা, তাদের এতে আর কী আসে যায়? রস-কসহীন বিজ্ঞানের ওই জটিল গবেষণাগুলোকে কেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তা আমাদের মাথায় ঢুকতেই চায় না। সাধারণ মানুষের এ অবস্থাটা হয়তো বুঝতে পেরেছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিদ্রূপাত্মক বিজ্ঞান সাময়িকী অ্যানালস অব ইমপ্রোবেবল রিসার্চ। তারা ১৯৯১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কারের আগে আগে দিচ্ছে মজার ‘ইগ নোবেল’ পুরস্কার। এ পুরস্কারের মাধ্যমে সেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেগুলো ‘আগে মানুষকে হাসায়, পরে ভাবায়’।

ইগ নোবেল প্রাইজ যে নোবেল প্রাইজের প্যারোডি এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনে রাখুন, সত্যিকারের নোবেল বিজয়ীরাও কিন্তু এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসেন, বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আর পুরস্কারগুলো মজার গবেষণার জন্য দেওয়া হলেও, এর প্রতিটিরই কিন্তু বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। অনেক গবেষকই সাদরে এ পুরস্কার গ্রহণ করে। অবশ্য অনেকেই এর রসাত্মক দিকটা বুঝতে না পেরে

রাগান্বিত হন।

গত বৃহস্পতিবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যান্ডার্স থিয়েটারে হয়ে গেল ১৯তম ইগ নোবেল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত থেকে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী ওরহান পামুক, রিচ রবার্টস (চিকিৎসা, ২০০১), পল ব্রুগম্যান (অর্থনীতি, ২০০৮) ছাড়া আরও ৬ জন নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব।

গর্ভবতী নারীরা কেন ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়েন না, গরুরা কি মানুষের মমতা টের পায়, আঙুল ফোটালে কি আর্থ্রাইটিস হয়—এ ধরনের আরও অনেক প্রশ্নের জবাব মিলেছে এবারের আয়োজনে।

ওয়েবসাইট অবলম্বনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরীফ উল্লাহ চিকিৎসা

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার থাউজেন্ড ওকসের বাসিন্দা ডোনাল্ড এল আগার ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেবল বাঁ হাতের আঙুল ফুটিয়েছেন, কখনোই ডান হাতের আঙুলগুলো ধরেননি। তিনি এটা করেছেন শুধু এটা দেখার জন্য যে আঙুল ফোটালে আর্থ্রাইটিস হয় কি না।

ছেলেবেলায় ডোনাল্ডের মা তাঁকে আঙুল ফোটাতে নিষেধ করেছিল। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মা সর্বজ্ঞ। কিন্তু একটু বড় হয়ে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে মায়ের এই আদেশের প্রতি একটু সন্দিহান হয়ে উঠলেন তিনি। এরই ফসল এই দীর্ঘ ৬০ বছরের সাধনা। তিনি প্রতিদিন দুবার বাঁ হাতের আঙুল ফোটাতে। কিন্তু ৬০ বছর পর তাঁর কোনো হাতেই আর্থ্রাইটিস হয়নি। ‘মা, তুমি ভুল বলেছিলে’—স্বর্গবাসী মায়ের উদ্দেশে এটাই ডোনাল্ডের বক্তব্য। অর্থনীতি

আঙুল ফুলে কলাগাছ—অর্থনীতিতে এ প্রবাদটি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতির ইগ নোবেল জিতল আইসল্যান্ডের চারটি ব্যাংক। কপথিং ব্যাংক, ল্যান্ডসবাংকি ব্যাংক, গ্রাইনির ব্যাংক ও সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আইসল্যান্ডের পরিচালক, নির্বাহী ও অডিটররা সন্দেহাতীতভাবে অর্থনৈতিক মন্দার সাময়িক সুফল দেখাতে পেরেছেন। এ সময় ছোট ব্যাংকগুলোও ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে। এবং ধ্বস নামাটাও কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে

দাঁড়ায়। আর এ তত্ত্ব জাতীয় অর্থনীতির জন্যও প্রযোজ্য। শান্তি

ভরা বিয়ারের বোতল, না খালি বিয়ারের বোতল—মানুষের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা হলে কোনটা কম ক্ষতিকর তা বের করেছেন সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের স্টিফান বলিগার, স্টিফেন রস, লার্স ওয়েসটারহেলওয়েগ, মাইকেল থালি ও বিট নিউবুয়েহল। এ জন্য শান্তিতে ইগ নোবেল জিতে নিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, খালি বোতলের চেয়ে ভরা বিয়ারের বোতলগুলো কম ক্ষতিকর। ভরা বোতলগুলো ৩০ জুল পর্যন্ত আঘাত সহ্যে পারে। খালি বোতল সহ্যে পারে ৪০ জুল। অবশ্য দুই ধরনের বোতলই মানুষের খুলির দুর্বল অংশ ভাঙতে সক্ষম। ভেটেরিনারি মেডিসিন গরুর বেশি দুগ্ধ উৎপাদনের রহস্য ভেদ করার জন্য ভেটেরিনারি মেডিসিনের পুরস্কারটি পেয়েছেন ব্রিটেনের নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের গবেষক ক্যাথেরিন ডগলাস ও পিটার রাওলিনসন। ৫১৬টি খামারে জরিপ চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, গরুর সুন্দর একটা নাম রেখে নিয়মিত সে নাম ধরে ডাকলে তারা নামহীন গরুর চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি দুধ দেয়। গবেষকদের মতে, গরুর নাম ধরে ডাকলে তারা খুশি হয় ও নিশ্চিত থাকে। এটাই তাদের একটু বেশি দুধ উৎপাদন করতে সহায়তা করে।

সদ্য মা হওয়ায় ক্যাথেরিন অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। তবে তিনি গরুর মতো পোশাক জড়ানো তাঁর নতুন সন্তান ও একটি গরুসহ তাঁর ছবি পাঠিয়েছেন। গণিত জিম্বাবুয়ের নাগরিকেরা এখন আর বড় কোনো সংখ্যা দেখে ঘাবড়ায় না। এর পুরো কৃতিত্ব কিন্তু জিম্বাবুয়ের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর জাইডেন গোনোর। ২৩ কোটি শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতে এক সেন্ট (.০১) থেকে এক শ ট্রিলিয়ন ডলার (১০০,০০০,০০০,০০০,০০০) পর্যন্ত ব্যাংকনোট প্রচলন করেছেন তিনি। জিম্বাবুয়ের শিশুরাও এখন তাই বিশাল বিশাল সংখ্যা নিয়ে খেলা করতে পারছে। রসায়ন মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাভিয়ার মোরালেস,

মিণ্ডয়েল অ্যাপাটিগা ও ভিক্সর এম ক্যাসটানোর ওপর সে দেশের মদ্যপায়ীরা খেপতে পারে। কারণ তাঁরা মাতাল করা ছাড়াও মদের অন্য রকম ব্যবহার বের করেছেন। মেক্সিকোর জনপ্রিয় পানীয় টাকিলা থেকে খুবই শক্তিশালী সেমিকন্ডাকটর ডায়মন্ড ফ্লিম (ঈশ্বর জানে, এটা কি কাজে লাগে) তৈরির জন্য তাঁরা পেয়েছেন রসায়নের ইগ নোবেল পুরস্কার। পদার্থবিদ্যা গর্ভবতী নারীরা হাঁটতে গিয়ে কেন উল্টে পড়ে না, এর কারণ বের করেছেন সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথেরিন কে উইটকাম, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল ই লিবারম্যান ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের লিজা জে শাপিরো। ছোট শিশুরা ছাড়া গর্ভবতী কোনো নারীকে এ প্রশ্নটা করার সাহস করে না কেউই। তাঁরা সাহস করে এ গবেষণা করার জন্য পদার্থবিদ্যায় ইগ নোবেল পেয়েছেন।

তাঁরা বের করেছেন নারীদের পিঠের নিচের অংশ ছেলেদের চেয়ে বেশি বাঁকা। তাই মেরুদণ্ডের ওপরের অংশ একটু পেছনে হেলে থাকে। গর্ভাবস্থায় এটা তাদের চলাফেরায় ভারসাম্য আনে। জনস্বাস্থ্য বক্ষবক্ষণীর প্রাণ রক্ষাকারী ব্যবহার বের করার জন্য জনস্বাস্থ্য পুরস্কার জিতেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এলেনা এন বডনার, রাফায়েল সি লি ও সান্দ্রা মারিজান। তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন গ্যাস মাস্কে রূপান্তর যোগ্য বক্ষবক্ষণী। জরুরি অবস্থায় জামার নিচ থেকে একটানে খুলে এ বক্ষবক্ষণী দিয়ে দুটো গ্যাস মাস্ক বানানো যাবে। একটা নিজের জন্য রেখে আরেকটা দেওয়া যাবে সঙ্গীকে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট পেয়েছে এই বক্ষবক্ষণী। এলেনা বডনার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে এ বক্ষবক্ষণীর কার্যকারিতা প্রদর্শন করেন। চেরনোবিল দুর্ঘটনার সময় তিনি ইউক্রেনে ছিলেন। জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে প্রস্তুত থাকার বিষয়টি তো তাঁর মাথাতেই বেশি খেলবে। আগুনের ধোঁয়ার সময় তো বটেই, পারমাণবিক দুর্ঘটনা ও জীবাণু অস্ত্রের হামলায় কাজে আসবে ব্রা কাম মাস্ক। সাহিত্য আয়ারল্যান্ডের ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ সে দেশে সবচেয়ে ঘন ঘন ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী নাগরিক প্রাউয়ো জাজডির বিরুদ্ধে ৫০টিরও

বেশি মামলা করেছে। আর এসব নথি লেখা ও উপস্থাপনা করতে গিয়ে পুলিশ বিভাগ জিতে নিয়েছে সাহিত্যে ইগ নোবেল পুরস্কার। পোলিশ ভাষায় ‘প্রাউয়ো জাজডি’র নামের অর্থ আবার ‘ট্রাফিক লাইসেন্স’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোলিশ নাগরিক ক্যারোলিনা লিউয়েসটাম। তিনি আয়ারল্যান্ডের সব পোলিশ চালকের হয়ে আইরিশ পুলিশ সার্ভিসের শুভ কামনা করেছেন। জীববিদ্যা

জাপানের সাগামিহারার কিতাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিকেল সায়েন্সের ফুমিয়াকি তাগুচি, সং গুফু ও ঝ্যাং গুয়াংলি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন জায়ান্ট পান্ডার মল। তাঁরা দেখিয়েছেন, জায়ান্ট পান্ডার মলে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় গৃহস্থালী জৈব আবর্জনা পঁচানোর জন্য বেশি কার্যকর। **সূত্রঃ** প্রথম আলো, অক্টোবর ০৫, ২০০৯

250) বহরুদী

এখন শহরের অলি-গলিতে সাংবাদিক, ৩০ বছর আগে এ রকম ছিল না। তখন আমরা সাংবাদিককে দেখতে খবরের কাগজের অফিসে যেতাম।

বর্তমানে সাংবাদিক-পপুলেশন বৃদ্ধির কারণ—এ যুগটাই হচ্ছে সংবাদের যুগ।

কিছুকাল আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হঠাত্ আলাপ। আমার বাড়ির সামনে কয়েক দিন তাঁকে ঘুরতে দেখেছিলাম, একখানা নোটবই ও পেন্সিল হাতে। দেখতাম, তিনি মাঝেমধ্যে সেই নোটবইতে কী সব টুকে রাখছেন। পুলিশের লোক ভেবেছিলাম আগে। কৌতূহলে একদিন দু-এক কথায় আলাপ শুরু করলাম, ক্রমে আলাপ জমে উঠল।

তখন কলকাতা শহরে দুর্ভিক্ষে পথে পথে লোক মরছিল। একদিন বলেছিলাম তাঁকে, ‘কেমন দেখছেন সব?’ আমার প্রশ্নটি অবশ্য নিতান্তই অর্থহীন; উদ্দেশ্য, কোনো রকমে একটু আলাপ জমানো।

তিনি বললেন, ‘অদ্ভুত।’

‘কী পরিমাণ লোক মরছে?’

‘স্বাভাবিক।’

কথাটা ভালো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘স্বাভাবিক মানে কী? প্রতিবেদনটা কীভাবে

লিখছেন? যত লোক মরছে, ততটাই কি আপনি আশা করছেন?’

‘মৃত্যুর কথা কিছু লিখছি না।’

‘কেন?’

‘আমাদের দেশে ওটা খবর নয়।’

‘বলেন কি! এত মৃত্যু, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু!’

সাংবাদিক বললেন, ‘আমার চোখে এর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।’

‘আপনি অবাক করলেন আমাকে।’

‘আমি ঠিকই বলছি। খবর কাকে বলে বোধহয় জানেন না। কুকুর মানুষকে কামড়েছে এটি খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়।

বিলেতের এক কাগজের অফিসের গল্পটা

জানেন? বার্তা সম্পাদকের কক্ষে সবাই

বিচলিত, উত্তেজক কোনো খবর সেদিন

আসেনি। এদিকে রাত ১২টা বাজে, শেষ কপি

দেওয়ার সময় উপস্থিত। এমন সময় এক

সহকারী তাঁর নিজের কুকুরটি পাশের ঘর থেকে

ধরে এনে টেবিলে তুলে এর পা কামড়াতে

লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে খবর তৈরি হয়ে গেল।

সম্পাদক তাঁর সহকারীকে জড়িয়ে ধরে আদর

করতে লাগলেন।’

‘তাহলে যারা মরছে, তাদের খবর কী করে হতে পারে?’

‘হতে পারে; যারা মরছে, তারা যদি মারতে

পারত। কিন্তু যাক সে কথা, আজ গোটা দুই

খবর পেয়েছি। কিছুক্ষণ আগে দুজন কেরানি

আমার পাশ দিয়ে বলতে বলতে ছুটে গেল—

ভরপেট খেয়ে এভাবে হেঁটে অফিসে যেতে

তাদের বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ভিড়ের জন্য ট্রাম-বাসে

উঠতে পারেনি তারা।’

‘খবর হলো কোথায়, বুঝতে পারছি না।’

‘কেরানি হয়েও পেট ভরে খেতে পেয়েছে, এটি

অবশ্যই খবর। আরেকটি খবর—অবশ্য এটি

আগেই আমার জানা উচিত ছিল, এই শহরে

কোথাও ঘি পাওয়া যায় না।’

আমি বললাম, ‘এ তো পুরোনো খবর, আমরা

সবাই জানি, কারণ সব ঘি-তেই ভেজাল থাকে।’

‘ভেজাল ঘিও পাওয়া যায় না।’

‘বলেন কি! হঠাত্ কী হলো? আমি তো জানি

ভেজাল ঘিতে বাজার ছেয়ে গেছে, আপনি

অসম্ভব কথা বলছেন।’

‘অসম্ভব কথা বলছি বলেই সংবাদ হিসেবে এর

দাম খুব বেশি। আর অসম্ভব বলেই এ তথ্য আবিষ্কারে আমার দেরি হয়েছে।’

কথাটা শুনে একটু বিরক্তি বোধ করলাম।

বললাম, ‘মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোটাও সংবাদ সৃষ্টি নাকি?’

সাংবাদিক এ প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, ‘সত্য আর মিথ্যা বলে কোনো জিনিস নেই। আপনি চোখে দেখেছেন বলে ভাবছেন ঠিক দেখেছেন, এই তো? প্রতিটি জিনিস বা ঘটনার অনেক ডাইমেনশন আছে, স্থান ও কালের মধ্যে এর বিস্তার আছে, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও একই সময়ে কোনো জিনিসের সব দিক দেখতে পান না, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ তা পায়নি। অতএব, আপনার কাছে যা সত্য, তা-ই বলছেন সত্য, শুধু আমার কাছে যা সত্য, সেটি আপনি মানছেন না।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু তাই বলে কোনো জিনিস আছে এবং নেই, একই সঙ্গে সত্য হয় কী করে?’

‘তাও হয়, মশায়, একই সঙ্গে একটি জিনিস চলছে এবং চলছে না, একই সঙ্গে একটি জিনিস ছোট এবং বড়, ভালো এবং মন্দ হতে পারে। বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করেছে।

আপেক্ষিকবাদ পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, আপনি যাকে একমাত্র সত্য বলে চেপে ধরে আছেন; দেখবেন, তা আপনার মুঠোর মধ্যেই মিথ্যা হয়ে আছে।’

‘তা যদি হয়, তাহলে আপনার কথাগুলোও তো সত্য না হতে পারে।’

‘অবশ্যই না হতে পারে। আমি তো বলছি না যে আমার কথা ধ্রুব সত্য।’

‘তাহলে বাজারে ঘি-ও নেই, ভেজাল ঘি-ও নেই, এই দুটি কথাকে আপনি খবর হিসেবে চালাবেন কী করে?’

‘এটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন। আপনি যদি ক থেকে দেখে বলছেন বাজারে ভেজাল ঘি আছে, আমি সেদিক থেকে দেখছি না। আমি অন্য দিক থেকে দেখে বলছি, বাজারে ঘি-ও নেই, ভেজাল ঘি-ও নেই।’

‘তাহলে কী আছে?’

‘আছে ‘বিশুদ্ধ ঘি’ অথবা ‘খাঁটি ঘি’। ঘি নেই।

‘বিশুদ্ধ ঘি’ অথবা ‘খাঁটি ঘি’ ঘি থেকে পৃথক।

তেমনি ধরুন, বাজারে দুধ নেই, আছে শুধু

বিশুদ্ধ দুধ। হোটেল নেই, আছে পবিত্র হোটেল।”

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হচ্ছিলাম, এমন সময় সামান্য দূরেই গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় আমাদের আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একখানা বাস দারুণ শব্দ করে থেমে গেল, সবাই চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে। মুহূর্তে সেই বাস ঘিরে দুর্ভেদ্য ভিড় জমে উঠল। শোনা গেল, বাস একটি স্কুলের মেয়েকে চাপা দিয়েছে।

ভিড় ঠেলে দুর্ঘটনা দেখার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না, বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে আলাপরত সাংবাদিক বহু আগেই অদৃশ্য হয়েছিলেন সেই ভিড়ের মধ্যে।

অতিরিক্ত আরও একটি দুর্ঘটনা ওই একই সঙ্গে ঘটেছে, শোনা গেল বাইরে থেকেই। বাসের ড্রাইভারকে উপস্থিত জনতা এরই মধ্যে মেরে আধমরা করে ফেলেছে।

পরদিন খবরের কাগজে দুর্ঘটনার বিবরণ পড়তে অতি-উৎসাহে তিনখানা কাগজ কিনলাম। সত্য দৃষ্টি সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানই আমাকে এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। যাচাই করে দেখছিলাম, বিভিন্ন প্রতিবেদক একই ঘটনা কীভাবে দেখেছেন।

একখানা কাগজ লিখেছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল পথে, বাস তার ঘাড়ে এসে পড়ে। আর একখানা কাগজ লিখেছে, বাসচালকের কোনো দোষ নেই, মেয়েটি এমন অতর্কিতে চলন্ত বাসের সামনে এসে পড়ে যে, সে অবস্থায় বাস থামানোর প্রশ্নই ওঠে না। আরেক কাগজ লিখেছে, মেয়েটি কলার খোসায় পা পিছলে চলন্ত বাসের নিচে পড়ে গেছে।

কয়েক দিন পর দেখা হলো ওই সাংবাদিকের সঙ্গে। বললাম, ‘আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, একই ঘটনা নানাভাবে দেখে।’

‘কী করে বুঝলেন?’

‘দুর্ঘটনার পরদিন আমি তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম। দেখলাম, কোনোটার সঙ্গেই কোনোটা মেলে না, তিন কাগজে তিন রকম প্রতিবেদন।’

তিনখানা কাগজের নাম বললাম। সাংবাদিক মৃদু হেসে বললেন, ‘ওই তিনখানা কাগজেরই প্রতিবেদক আমি নিজে।’ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

পরিমল গোস্বামী: সাংবাদিক ও গল্পকার। জন্ম ১৮৯৭, মৃত্যু ১৯৭৬।

সূত্র: প্রথম আলো, অক্টোবর ০৫, ২০০৯

251) হাতস্নানবিদ্যাবিশেষ

চার-পাঁচ জন ছেলে মিলে যে লোকটাকে হাটুরে মার দিতে দিতে বাস থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাল, তাকে দেখে আমার কষ্টই হচ্ছিল। মাথার চুল খাবলা খাবলা করে ওপড়ানো, মুখের একটা পাশ ফুলে গেছে, জামার পেছনটা লম্বালিম্ব ভাবে ছেঁড়া। বাসস্ট্যাণ্ডে ফেলে আরও দু'চার ঘা দিয়ে লোকটাকে ফুটপাথে বসিয়ে রেখে, কী সব বলতে বলতে ছেলেগুলো ওই বাসে করেই কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লোকজন বাড়ি ফিরছে যে যার মতো। ফুটপাথে বসে ধুকতে থাকা লোকটার দিকে নজর নেই কারও। দেখে একটু খারাপ লাগল। কাছে গিয়ে বললাম, ‘ও মশাই, সুস্থ আছেন তো?’ লোকটা বসে বসে গালে হাত বোলাচ্ছিল। অতি কেঁপে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ব্যাটারা জোর মেরেছে। ওঃ!’

‘এ অবস্থায় আপনি বাড়ি ফিরবেন কী করে?’
‘সে ঠিক ফিরতে পারব। এ সব আমার অভ্যেস আছে। একটু চা খাওয়াবেন, স্যর?’
‘চা— চা— আচ্ছা। ওই যে একটা চায়ের দোকান। চলুন, ওখানে গিয়ে বসি।’ খোঁড়াতে খোঁড়াতে অতি কেঁপে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল লোকটা। দুটো চায়ের অর্ডার দিলাম। লোকটার জন্য দুটো বিস্কুট। তার পর বললাম, ‘হ্যাঁ, এ বার বলুন তো, কী হয়েছিল?’
‘আপনার বাড়ি কোথায়, স্যর?’
‘ব্যারাকপুরে।’
‘এখানে কোথায় এসেছিলেন?’
‘আমি যে এখানকার কলেজে পড়াই। ফিলজফির প্রফেসর আমি।’
‘তাই বলুন, স্যর। আপনাকে দেখেই মনে হয়, আপনি খুব দয়ালু। আজ অবধি কেউ আমাকে ডেকে এ ভাবে চা খাওয়ায়নি।’
‘আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কেন বাসে আপনাকে সবাই ও ভাবে মারল?’ লোকটা এ বার লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, ‘শুনতেই হবে স্যর?’ চা এসে গেছিল। টোস্ট বিস্কুটে কড়াং করে একটা কামড় বসিয়ে, এক চুমুক চা

খেয়ে লোকটা বলল, ‘পকেটমারি করছিলাম, স্যর।’

‘তার মানে আপ—তুম—আপনি পকেটমার?’

‘হ্যাঁ, স্যর। তবে শুধু পকেটমার নই, আমি এক জন শিক্ষক। আমার একটা স্কুল আছে।

হাতসাফাই বিদ্যানিকেতন। কিছু মনে করবেন না’, লোকটার গলায় গর্বের সুর, ‘আপনার মতো কলেজের প্রফেসর না হলেও এ লাইনে আমার নামডাক কিছু কম নয়। আমার ছাত্রের সংখ্যা এখন একশোর ওপরে। মাইনে ওদের থেকে যা নিই, তাতে আমার অবস্থা যথেষ্ট ভাল।’

এ অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি।

শুনতেও খারাপ লাগছিল না। বললাম, ‘কিন্তু, আজকে কী হল?’

‘সবই কপালের ফের। আমার বেশ কেয়ক জন ছাত্র কিছুতেই ব্যাপারটা রপ্ত করে উঠতে পারছে না। লাউয়ের ওপর রুমাল রেখে এত বার ওদের তার ওপরে েবুড চালানো শিখিয়েছি, কিন্তু আসল জায়গায় করতে গিয়ে ওরা সব গড়বড় করে ফেলছে। বেশ কেয়ক জন ধরা পেড় মারও খেয়েছে। তাই আজ আমি ওদের কেয়ক জনকে নিয়ে বাসে উঠেছিলাম। ওদের হাতেকলমে ব্যাপারটা দেখাব বলে। ভি়েড়র মধ্যে একটা লোককে বেছে নিয়ে সবাই মিলে তাকে ঘিরে ফেলে যেই না মানিব্যাগটা হাতাতে গেছি, অমনি সব গোলমাল হয়ে গেল। লোকটা টের পেয়ে আমার হাত চেপে ধরল। ব্যস, বাসের সব লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রথমটা খুব মার খাচ্ছিলাম, তার পর আমার দলের ছেলেরাই আমাকে ঘিরে ধরে বাস থেকে নামাল।’

‘কিন্তু, ওরাও আপনাকে ঠ্যাঙাচ্ছিল দেখলাম।’

‘বাসের মধ্যে তো মারার ভান করতেই হবে, স্যর। তা না হলে বাসভর্তি লোকের মারের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে কী করে?’ আচমকা লোকটার মুখ করুণ হয়ে গেল, ‘কিন্তু স্যর, বাস থেকে নামিয়ে ওরা আমাকে সত্যি সত্যিই মেরেছে। মেরেছে আর বলেছে, যে গুরু নিজেই পরীক্ষায় ফেল করে, সে আবার ছাত্রদের কী শেখাবে? আমার মান-সম্মান সব গেল, স্যর।’

লোকটা হঠাৎ বুক চাপেড় কেঁদে উঠল,

‘পকেটমারি করতে গিয়ে ধরা পেড়ছি, স্যর, এই বদনাম শুনে আমার সব ছাত্র যদি স্কুল ছেড়ে

দেয়, তবে আমার চলবে কী করে? আমি খাব কী?’ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল লোকটা। চা-ওয়ালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলাম। এ গেল্লর আর একটুখানি বাকি আছে। খানিকক্ষণ পর কান্নাটান্না সামলে লোকটা বলল, ‘চলি, স্যর। আপনার কথা কোনও দিন ভুলব না। আর, স্যর, মানিকতলা থেকে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে যদি কোনও দিন পকেটমারের পাল্লায় পেড়ন, শুধু বলবেন, আমি ছুকু ওস্তাদের চেনা লোক। দেখবেন, আর কোনও বিপদ হবে না।’ আমি চাের পয়সা মিটিয়ে দিলাম। তার পর আমাকে আর এক দফা ধন্যবাদ দিয়ে, হাতটাত মিলিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোকান থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল লোকটা। আমি বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাস ধরলাম শেয়ালদা যাব বলে। কিন্তু কণ্ঠাঙ্কুর এসে ভাড়া চাইতেই, পকেটে হাত দিয়ে, একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে বাস থেকে নেমে যেতে হল। আমার মানিব্যাগটা উধাও! চা খেয়ে বেরোনোর পর এক ফাঁকে কখন যেন পকেটটা ফাঁকা করে দিয়ে গেছে ছুকু ওস্তাদ। অমিত দেবনাথ

সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, অক্টোবর ০৪, ২০০৯

252) ভূত-পূর্ব ইতিহাস: কেমন করে এমন হলাম

মেছো ভূত

মেছো ছিল খুবই নরম প্রকৃতির। এক শাঁখচুন্নির জন্য তার মনে ছিল প্রেম, চোখে ভালোবাসা আর হৃদয়ে উজান-ভাটা। শাঁখচুন্নিও তাকে ভালোবাসত। তবে সেই সুখ বেশি দিন টেকেনি। হ্যান্ডসাম ড্যাশিং স্কন্ধকাটার প্রেমে পড়ে যায় শাঁখচুন্নি। এক সন্ধ্যায় তারা দুজন যখন কক্সবাজারের এক রেস্টোরাঁয় প্লেইন পোলাও অ্যান্ড রুপচাঁদা ফ্রাই দিয়ে ডিনার করছিল, সে সময় শাঁখচুন্নি ব্যাপারটি খুলে বলে এই ভূতকে। শাঁখচুন্নির ছাঁকা খেয়ে ভূত যখন অতীব মর্মান্বিত ও বাকরুদ্ধ, ঠিক সেই সময় পাষাণী শাঁখচুন্নি নিজের প্লেটে পোলাও বাড়তে বাড়তে তাকে বলে, ‘এঁকটুঁ মাঁছঁ দাঁওঁ তোঁ!’ সেই মুহূর্তেই প্রেমিকভূত জ্ঞান হারিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে রেস্টোরাঁর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তিন দিন পর হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর

চিকিৎসকেরা তাকে সুস্থ বললেও ঘোষণা দেন,
অতিরিক্ত মানসিক আঘাতের ফলে তার স্মৃতি
লোপ পেয়েছে। তবে নিজের নাম-পরিচয়-কর্ম
ভুলে গেলেও আজও সেই প্রেমিকভূতের
স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে অজ্ঞান হওয়ার ঠিক
আগের মুহূর্তটুকু। আর তাই এখনো তাকে
বিভিন্ন জেলেপাড়ায় মাছ ধরে বাড়ি ফেরা
জেলেদের বা মাছ রান্নারত জেলেনিদের
আশপাশে শুধুই বলতে শোনা যায়, ‘এঁকটু মাঁছ
দাঁও তোঁ!’ ছাপাখানার ভূত
ইনি ছিলেন একসময় ভূতসমাজের মহান
কবিভূত। তাঁর লেখা কবিতা ‘চন্দ্রবিন্দুহীন
কথোপকথন’ ছিল তরুণ ভূত-পেতনিদের মধ্যে
অসম্ভব প্রিয়। সে সময় তাঁর কবিতা ছাড়া
কোনো ভূত-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ভাবাই যেত
না। কিন্তু ভূতরাজ্যে মোবাইল ফোন
কোম্পানিগুলো আসার পর থেকে কবিতা তো
দূরের কথা, বিজ্ঞাপনের ঠেলায় পত্রিকায় খবর
ছাপানোরই জায়গা থাকত না। অপ্রকাশিত
থাকার যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে ডিপ্রেশনে রূপ
নেওয়ায় তিনি ভূতরাজ্য ছেড়ে ফুলটাইমের জন্য
মানবসমাজে চলে এসে ঠাই নেন বিভিন্ন
ছাপাখানায় এবং সুযোগ পেলেই বিভিন্ন বইয়ে
ছাপার মাঝেমাঝে নিজের লেখা ঢুকিয়ে দেন।
মানুষের মধ্যে ভূতভাষার তেমন প্রচলন না
থাকায় তারা প্রায় মহান সেই কবিতার
চরণগুলো ছাপার ভুল ভেবে থাকে। স্কন্ধকাটা
ভূত
স্কন্ধকাটা আগে সাধারণ ভূতই ছিল।
একদিন...থুকু, একরাতে সে কারওয়ান
বাজারের এফডিসি এলাকায় ভয় দেখাচ্ছিল।
একজন মানুষকে সে হেঁটে যেতে দেখে পেছন
থেকে যেই ভয় দেখাতে গেল, অমনি সেই
লোকটি ঘুরে দাঁড়ান এবং তাঁকে দেখে ভূত
নিজেই ভয়ে ভিরমি খেয়ে যায়। ঘটনাচক্রে সেই
লোকটি ছিলেন সদ্য এফডিসি থেকে শুটিং শেষ
করে বের হওয়া এক সুপারহিট হিরো এবং
ঘটনাচক্রে তখন তাঁর মেক-আপ ছিল না। যাই
হোক, ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই ভয় পাওয়ায়
মরমে ভূত সাহেবের ভূতসমাজে মাথা কাটা
যায়। তখন আবার ভূত মেডিকেলে ধর্মঘট
চলছিল, তাই তার মাথাও জোড়া লাগানো সম্ভব
হয়নি। তখন থেকেই সে স্কন্ধকাটা ভূত। কুনি

ভূত
কুনি ভূত একসময় সাধারণ হলেও ছিল
অসাধারণ মেধাবী। ভৌতিক স্কুল-কলেজে সে
ছিল তুখোড় ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়েও সে ভর্তি
পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ছিল। তবে সেখানে
প্রথম সেমিস্টার থেকেই সে ছাত্ররাজনীতিতে
জড়িয়ে পড়ে এবং তার পড়াশোনার বারোটা
মানে ডিজিটাল টাইমে তেরোটা বেজে যায়।
ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষার হলে সে বারবার
পাশে বসা গেছো ভূতের খাতা থেকে টুকলিফাই
করার চেষ্টা করলে ইনভিজিলেটর তাকে রুমের
কোনার এক সিটে নিয়ে বসায়। ফলে সে অনার্স
ফাইনালে লেটার মার্কসহ ফেল করে। সেই
হাতাশায় সে রাজনীতি, পড়াশোনাসহ জনসমক্ষে
ভয় দেখানোও ছেড়ে দেয়। শুধু অমাবস্যায়
তাকে বিভিন্ন বাড়িঘরের কোনায় ছোট
ছেলেপুলেকে ভয় দেখাতে দেখা যায়। অনিকেত
খান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১২,
২০০৯

253) হলুদ জিরাফ

মামার বাসায় ঢুকে দেখি, একেবারে হলুদ
কাণ্ড। উৎসব উৎসব ভাব। আমাকে দেখেই
মামি বললেন, এতক্ষণ লাগে আসতে? বাসায়
কী করিস? মাকে রান্নাবান্নায় হেল্প করিস নাকি?
আমি কিছু বললাম না। মামির চেহারা সুন্দর,
রান্না তো অসাধারণ! কিন্তু সমস্যা হলো, খোঁচা
না দিয়ে কোনো কথাই বলতে পারেন না। এত
দিন পর দেখা হলো, কোথায় ভালো ভালো
খাবার খেতে দেবেন তা না...ধ্যাত্! ভালোই
লাগে না। সোফায় বসেই আমি ঝানু গোয়েন্দার
মতো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। সামনে তিন
বছরের মামাতো বোন তানিশা। যেকোনো সময়
অ্যাটাক হতে পারি। কোনো এক বিচিত্র কারণে
আমার চেয়ে আমার চুলের প্রতি ওর খুব টান।
ওর ধারণা, চুলগুলো নকল। দেখা হলেই
‘ভাইয়া’ বলে কোলে উঠে চুল ধরে কিছুক্ষণ
টানাটানি না করলে ওর মন ভরে না। তবে
আজ ও খুব একটা সুবিধা করতে পারবে বলে
মনে হয় না। একদম আর্মি স্টাইলে চুল
কাটিয়েছি। মামিকে বললাম, এই সাতসকালে
আমাকে ডেকে আনার কারণ কী?
আমরা চিড়িয়াখানায় যাব, তুইও যাবি।

চিড়িয়াখানায় তো চক্রবৃদ্ধি হারে পশু মারা
যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে কী হবে?

তোর মামাকে জিজ্ঞেস কর। সবই তাঁর ইচ্ছা।
মামি তৈরি হতে গেলেন। মামার কাছে গিয়ে
দেখি, তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, তুই এসে ভালো
করেছিস। পায়জামার ফিতার বিকল্প কী হতে
পারে তা নিয়ে ভাবছি। কিন্তু কোনো কূলকিনারা
পাচ্ছি না।

পায়জামা না পরে প্যান্ট বা লুঙ্গি পরলেই হয়।
এটা অবশ্য ভালো বলেছিস। মাথায়ই আসেনি।
যা-ই হোক। চল, বেরিয়ে পড়ি।

বেরিয়ে পড়ব মানে? কোথায়?

তোর স্থায়ী ঠিকানায়।

মানে কী? আমার স্থায়ী ঠিকানা তো কুষ্টিয়ায়।

তুমি কি কুষ্টিয়ায় যাবে?

ব্যাটা উল্লুক! চিড়িয়াখানায় যাব। ওটাই তোর
স্থায়ী ঠিকানা। অবশ্য তোকে নিয়ে গেলে
ঝামেলা হতে পারে। যদি ওরা তোকে রেখে
দিতে চায়? তখন আপা-দুলাভাইয়ের কাছে মুখ
দেখাব কী করে?

মামা, চিড়িয়াখানায় তো সব পশুপাখি মারা
যাচ্ছে। শুনেছি, ওখানকার পরিবেশও নাকি
ভালো না, তাহলে আমরা যাচ্ছি কেন?

আমরা যাচ্ছি লড়াই দেখতে। জিরাফ কীভাবে
মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে, সেটাই পর্যবেক্ষণ করা হবে।
মৃত্যুর আগের পরিস্থিতি নিয়ে সামনের
বইমেলায় একটি গবেষণামূলক বইও বের করা
হবে। একজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হয়েছে।
চাপ ফিফটি-ফিফটি।

জিরাফের মতো সুন্দর একটা প্রাণী মারা যাচ্ছে,
আর তুমি তা নিয়ে গবেষণা করতে চাইছ? তুমি
এত নিষ্ঠুর কীভাবে হলে?

বকবক করবি না। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে,
তুই ‘জিরাফ বাঁচাও’ আন্দোলনের নেতৃত্ব
দিচ্ছিস। জিরাফ সুন্দর—এ কথা তোকে কে
বলল? কেমন হলুদ হলুদ গায়ের রং। কুঁসিত
লাগে।

জিরাফ হলুদ?

ওই একই হলো। যা-ই বলিস না কেন, হলুদ
রংটাই খারাপ। পৃথিবীর বেশ কিছু কুঁসিত
বস্তুর রং হলুদ। দু-একটা উদাহরণ দেব নাকি?
না থাক। দরকার নেই।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে থাকবে জিরাফ নিয়ে
কবিতা। যেমন—

‘ওহে ও দীর্ঘ জিরাপ

মৃত্যুর আগে পেলে না তো হয়

দু-এক ফোঁটা সিরাপ!’ কেমন?

জঘন্য। শব্দটা জিরাপ নয়, জিরাফ।

ছন্দ মেলানোর জন্য কবিরে অনেক কিছুই করে

থাকেন। তুই তো বাংলা কবিতার প্রমিত ছন্দ

এই বইটা পড়িসনি, পড়লে বুঝতি।

আমি একটা ছন্দই বুঝি— বিটিভির ছায়াছন্দ।

আর কিছু বোঝার দরকার নেই।

তা বুঝবি কেন? তুইও তো জিরাফের মতোই

লম্বা। জিরাফ পছন্দ না করার এটাও একটা

কারণ। লম্বা জিনিসের বুদ্ধি থাকে হাঁটুতে।

তুমি নিজে খাটো বলে এভাবে খোঁটা দিতে

পারো না। আমরা হাঁটুর সমান মানুষদের জন্য

হাঁটুর বুদ্ধি ব্যবহার করি।

এরই মধ্যে মামি তৈরি হয়ে এলেন। তর্ক আর

এগোল না। মামি বললেন, দেখ তো, হলুদ

শাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে?

আমি তড়িঘড়ি করে বললাম, ভালোই লাগছে।

তবে মামা বলছিলেন হলুদ নাকি অতি কুঁসিত

রং। পৃথিবীর কুঁসিত কিছু বস্তুর রং হলুদ।

মামার কাছে মনে হয় তোমাকে ভালো লাগছে

না, তাই না মামা?

মামা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মামি

বললেন, তুই একটু পাশের ঘরে যা। একটা

ফয়সালা হয়ে যাক। কত বড় সাহস! আমার

প্রিয় রংকে অপমান!

দ্রুত ওই ঘর থেকে কেটে পড়লাম। ওই ঘর

এখন রণক্ষেত্র। আমি শতভাগ নিশ্চিত, আজ

আর চিড়িয়াখানায় যাওয়া হচ্ছে না। মামির

চৈচামেচি শোনা যাচ্ছে। আমি ফ্রিজের দিকে

এগোলাম। সকালের নাশতাটা হজম হয়ে

গেছে। আরেক ডোজ দেওয়া দরকার। আদনান

মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১২,

২০০৯

254) বরাহমিহিরের গল্প লেখা

লেখক গজপতি চৌদার লেখেন বরাহমিহির

ছদ্মনামে। এ ছদ্মনাম নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর বন্ধু

বঙ্গবিহারি বাবুর একটা ভূমিকা আছে।

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগের কথা।

গজপতি সেই সবে গল্প লেখা শুরু করেছেন। নানা পত্রিকায় গল্প পাঠান। কিন্তু কিছুদিন পরেই সম্পাদকের তরফ থেকে একটি করে চিঠি আসে, ‘আপনার পাঠানো গল্প মনোনীত হয়নি। দুঃখিত।’

গজপতি চোঙদার মুষড়ে পড়েন।

গজপতিকে গল্প লেখাও ধরিয়েছেন তাঁর ব্যবসাদার বন্ধু বঙ্গবিহারি বাবু। তা না হলে তিনি আগে ছড়া লিখতেন। ব্যবসাদার বঙ্গবিহারি বাবু বলেছিলেন, দেখ গজপতি, ছড়া লিখে কোটিপতি হওয়া তো দূরের কথা, হাজারপতি হওয়াটাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। পারিস তো ছড়া-ফড়া ছেড়ে গল্প-উপন্যাস লেখ। কোনো রকমে যদি ওই স্বদেশ কিংবা বহুবাজার পত্রিকায় ঢুকে পড়তে পারিস, তা হলে আর দেখতে হবে না। শুনেছি, ভালো টাকা-পয়সা ছাড়ে ওরা।

তো সে যা-ই হোক, বঙ্গবিহারি বাবুর পরামর্শ মতোই গজপতির গল্প লেখা। কিন্তু কোথাও ছাপা না হওয়ায় বঙ্গবিহারি বললেন, দেখ, আমার মনে হয়, তোর ওই নামটার জন্য সম্পাদকেরা কেউ তোর লেখা পড়ে দেখছেন না। লেখক-মানুষের নাম বেশ মিষ্টি-মিষ্টি, নরম হওয়া দরকার। কিন্তু তোর নামটা কেমন যেন। গজপতি বলে, দেখ, এ নাম আমার বাবা খুব শখ করে রেখেছিলেন। সেটা পাল্টানো কি ঠিক হবে? একটা ছদ্মনাম বেছে নিলে কেমন হয়? বঙ্গবিহারি বাবু বললেন, দি আইডিয়া! তাই ঠিক কর।

গজপতি ভেবে-চিন্তে ছদ্মনাম নিলেন বরাহমিহির। এবার ওই আগের গল্পগুলোই নাম পাণ্টে বরাহমিহির ছদ্মনামে আবার পাঠালেন। আবার অপেক্ষা। এবার তিন মাসের মধ্যেই খবর এল। সম্পাদকদের সেই এক ভাষায় জবাব, ‘আপনার পাঠানো গল্প মনোনীত হয়নি। আমরা দুঃখিত।’

ঠিক এ সময় গজপতি ওই বহুবাজার পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখলেন। তাতে লেখা—‘নবীন-প্রবীণ লেখকের লেখায় গল্প সংকলন প্রকাশের পথে। যোগদানেছু লেখকেরা অবিলম্বে গল্প পাঠান।’ গজপতি দেরি করলেন না। পাঠিয়ে দিলেন ছদ্মনামেই একটা গল্প। কয়েক দিন পরই দপ্তর থেকে চিঠি এল, ‘আপনার গল্প মনোনীত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ এক কপি

ফোটো পাঠান। আর মানিঅর্ডারে ২০০ টাকা।’
গজপতি গৃহিণীকে কিছুটা না বলে গঞ্জে একটা
স্টুডিওতে গিয়ে হাসি হাসি মুখে ফোটো
তোলালেন। জীবনী লিখলেন। তারপর টাকাসহ
পাঠিয়ে দিলেন।

বন্ধু বঙ্গবিহারি তা শুনে বললেন, তুই সত্যিই
বরাহ। টাকা-পাঠানোর আগে আমাকে বললি
না? তোর ওই টাকা পাঠানোই সার হলো। ওই
সংকলন কোনো দিনই বের হবে না। বেচারি
গজপতি তা শুনে নেতিয়ে পড়লেন।

গজপতি গল্পের গোয়াল নামের একটি
পত্রিকাতেও লেখা পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে
সম্পাদকের চিঠি এল। তাতে লেখা—‘আপনাকে
আমাদের পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে। তা
ছাড়া কমপক্ষে ১৫ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া
দিলে প্রতি সংখ্যায় আপনার গল্প প্রকাশ করিতে
পারি।’ গজপতি চেনা-জানা আত্মীয়-স্বজনদের
নাম-ঠিকানা দিয়ে নিজের পকেট থেকে ১৫ জন
গ্রাহকের টাকা গল্পের গোয়াল পত্রিকার
সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দিলেন। বঙ্গবিহারি
বাবুকে জানালেন না।

এরপর কেটে যায় ছয় মাস। ছয় মাসে ছয়টি
গল্প পর পর ছাপা হওয়ার পর বন্ধু বঙ্গবিহারি
বাবুকে সেগুলো দেখালেন। তিনি সেগুলো দেখে
বললেন, এবার তোর কপাল খোলার মুখে। এ
সময় যদি ওই গল্পের গোয়াল পত্রিকার ১০-২০
জন পাঠক ওই বহুবাজার পত্রিকার সম্পাদককে
তোর নাম উল্লেখ করে চিঠি দেয় তো বেশ হয়।
গজপতি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারায় বঙ্গবন্ধু
বাবু বললেন, কী রে, বুঝলি না? শোন বলি।
বেশ কিছু পাঠক যদি ওই বহুবাজার পত্রিকায়
চিঠি লিখে জানায় যে গল্পের গোয়াল পত্রিকায়
মিহির ছদ্মনামের লেখক দুর্দান্ত লিখিতেছে।
আমরা তাঁহার গল্প আপনার পত্রিকাতেও পড়িতে
চাই। ব্যস, তাহলে তিনি বুঝবেন, তুই দারুণ
দারুণ সব গল্প লিখছিস। আর তখন যদি তিনি
তোর লেখা পান, তাহলে জনমতের চাপে তোর
লেখা ছাপা হতে পারে।

এমন এক স্বাস্থ্যবান পরামর্শে গজপতির ছোট
কুতকুতে চোখও বেশ বড় হয়ে উঠল।
বঙ্গবিহারি বাবুর বুদ্ধির তারিফ জানিয়ে তিনি
বললেন, সত্যি, তোর জুড়ি মেলা ভার।
গজপতি ২০ খানা পোস্টকার্ড সংগ্রহ করলেন।

একটি কাগজে লিখলেন, ‘মাননীয় সম্পাদক, বহুবাজার পত্রিকা সমীপেষু, মহাশয়, গল্পের গোয়াল পত্রিকার লেখক বরাহমিহিরের গল্পের তুলনা নেই। তাঁর লেখা গল্প আপনার পত্রিকাতেও পড়িতে চাই। আশা করি, লেখকের সহিত যোগাযোগ করিবেন।’ গজপতি লেখা কাগজ সমেত ২০ খানা পোস্টকার্ড ছেলেদের আড্ডায় দিয়ে বললেন, তোমরা এ বয়ানটা হুবহু না লিখে নিজের নিজের ভাষায় এ পোস্টকার্ডগুলোয় লিখে দাও তো ভাই। চিঠিতে যে যার নাম লিখে ঠিকানার জায়গায় বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া জেলার নাম উল্লেখ করে যা হোক একটা গ্রাম-শহরের নাম লিখে দিও। আর এই নাও বহুবাজার পত্রিকার ঠিকানা। এ ঠিকানায়ই তোমাদের চিঠিগুলো যাবে। কথা দিলাম, কাজে লাগলে একদিন ভালো করে মিষ্টি খাইয়ে দেব। মিষ্টি খাওয়ানোর কথা শুনে সেদিনই ছেলেরা উঠেপড়ে লেগে পড়ল। কী লিখতে কী লিখে ফেলবে, এ ভাবনায় ওরা আর নতুন করে কিছু না লিখে গজপতির বয়ানটাই অবিকল লিখে দিল। তারপর যে যার পোস্টকার্ডে কাল্পনিক ঠিকানা লিখে পরের দিন নিজেরাই হই-হই করে চিঠিগুলো গ্রামের ডাকবাংলো গলিয়ে দিয়ে এল। বঙ্গবিহারির কথামতো দিন ১৫ বাদে গজপতি বহুবাজার পত্রিকার সম্পাদকের ঘরে গিয়ে হাজির। বরাহমিহির নামটা শুনেই উনি বললেন, ও হো, আপনিই তো গল্পের গোয়াল পত্রিকার লেখক? আপনার গল্পের সুনাম করে অনেক চিঠি পেলাম। বিভিন্ন জেলার পাঠকেরা চিঠি লিখেছেন।

গজপতি এ ব্যাপারে কিছু না জানার ভান করে বললেন, তাই নাকি, স্যার? কী লিখেছেন ওনারা? লিখেছেন ভালো কথাই। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি, মেদিনীপুরের পত্রলেখক যে ভাষায় চিঠি লিখে আপনার গল্প ছাপার অনুরোধ জানিয়েছেন, সেই একই ভাষায় লিখেছেন হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়ার পত্রলেখকেরাও। এ কী করে সম্ভব হলো বলুন তো?

গজপতির সুন্দর জবাব। সব মানুষেরই ইচ্ছার ভাষা এক স্যার। হয়তো সেজন্য।

হ্যাঁ, তা না হয় হলো। কিন্তু বরাহমিহির বাবু, আরও আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি জানেন? একমাত্র বর্ধমান জেলার নারানপুর ছাড়া বাকি

জেলাগুলোতে কোনো ডাকঘর নেই। সবাই যে যার চিঠি ফেলে গেছে বর্ধমানের নারানপুর ডাকঘরে। সব চিঠিতেই ওই ডাকঘরের সিল-মোহর। শুধু তাই-ই নয়। সব কটা চিঠির সিল-মোহরে একই তারিখ। এটা কী করে সম্ভব বলুন দেখি?

বরাহমিহির ছদ্মনামের আড়ালে গল্পের গোয়াল পত্রিকার নিয়মিত লেখক গজপতির এবার আর কোনো জবাব এসে জোগায় না। বুঝতে পারলেন, চালাকি করতে গেলেও বুদ্ধি লাগে অনেকটা। আসল জায়গাটিতেই চালে ভুল হয়ে গেছে। তিনি আর কোনো কথা না বলে গুটি-গুটি পায়ে বহুবাজার পত্রিকার সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ধরা পড়ার লজ্জায় ‘আচ্ছা আসি, নমস্কার’ কথাটিও বলতে ভুলে গেলেন। জানি না, এরপর বন্ধু বঙ্গবিহারির সঙ্গে দেখা হতে তিনি সব শুনে ওঁকে বরাহ বলে ডেকেছিলেন কি না। সুনীতি মুখোপাধ্যায়: ভারতীয় লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১২, ২০০৯

255) বড়লোকদের ব্যপারগ্যপার

আবারও সেরা ধনী হয়েছেন বিল গেটস। তিনি নাকি সেকেন্ডে আয় করেন তিন হাজার ডলার। মানিব্যাগ থেকে এক হাজার ডলারের নোট পড়ে গেলে তিনি নাকি তা আবার পকেটস্থ করেন না। কারণ তাতে যে সময় চলে যায় সেই একই সময়ে তিনি তার চেয়ে বেশি আয় করেন। বিল গেটসের একার যে সম্পদ, বিশ্বের ১৪০টি দেশের এক বছরের আয় তার চেয়ে কম। এই অক্টোবর মাসেই সংবাদটা ছাপা হয়। তার পরই জুলমত তরফদারের মাথায় ধনী মানুষেরা মোটামুটি গেঁথে গেল।

ছোটবেলায় পড়েছিলেন, অর্থই অনর্থের মূল। এখন আর এসব কথা বিশ্বাস করেন না। এটা ঠিক যে দুনিয়ায় অর্থ ছাড়া আরও অনেক লোভনীয়, মোহনীয়, রসাল জিনিস আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেসব জিনিসও কিনতে হয় অর্থ দিয়েই।

ধনী হওয়ার নানা তরিকা আছে। টাকা ধার নিয়ে বেমালুম ভুলে যাওয়া একটা বড় তরিকা। বাংলাদেশে একসময় এটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা। তবে নিয়ম হচ্ছে, অল্প টাকা ঋণ

নিলে চলবে না। নিতে হবে বড় অঙ্কের অর্থ। কেউ যদি ১০০ টাকা ধার নেয়, তাহলে সেটা একান্তই তার সমস্যা। কিন্তু ব্যাংক থেকে ১০০ কোটি টাকা ধার নিলে সেটা তখন ব্যাংকের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা থেকে অনেক ব্যাংক এখনো বের হতে পারেনি। আর এই সমস্যাকবলিত ব্যাংকের ঘাড়ে পা দিয়ে কোটিপতি হওয়ার সংখ্যা বাংলাদেশে মোটেই কম নয়।

জুলমত তরফদারের বন্ধু সালেম মিয়া, একজন সফল ব্যক্তি। কারণ সালেম মিয়া দুই হাতে টাকা আয় করে। তবে জুলমত জানে, সালেম মিয়ার চেয়ে সফল ব্যক্তি এই দেশে আছে। এই যেমন মিসেস সালেম। সে বিয়ে করার জন্য সালেম মিয়ার খুঁজে বের করতে পেরেছিল। সালেম মিয়ার বউয়ের কথাই যখন এল, তখন জুলমত তরফদারের সেই পুরোনো গল্পটা মনে পড়ল। একজন মহিলা কি কোনো পুরুষকে লাখপতি বানাতে পারে? উত্তরটা হলো—পারে, যদি পুরুষটি কোটিপতি হয়।

পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। বরং উল্টোটা আছে। গজনফর আলী একজন কোটিপতি। সদ্য একটি চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। সাংবাদিকেরা গেছে সাক্ষাৎকার নিতে। নানা প্রশ্ন। একজন প্রশ্ন করল, ‘আমরা জেনেছি যে আপনি শূন্য হাতে একটা মফস্বল শহর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। তাহলে আপনার কোটিপতি হওয়ার রহস্য কী?’ গজনফর আলী: আমার পকেটে ছিল মাত্র ১০ টাকা। আজ থেকে ৩০ বছর আগের ঘটনা। আমি সেই ১০ টাকা দিয়ে চারটা আপেল কিনেছিলাম। সেই আপেল কলের পানি দিয়ে ধুয়ে চকচকা করে বিক্রি করি ১২ টাকায়। দুই টাকা লাভ হয়েছিল।

সাংবাদিক: তারপর?

গজনফর আলী: ১২ টাকা দিয়ে আমি আবার চারটি আপেল কিনি। সেই আপেল পরিষ্কার আর চকচকে করে বিক্রি করি ১৫ টাকায়। সেই ১৫ টাকা দিয়ে ছয়টি আপেল কিনে বিক্রি করে পাই ২০ টাকা।

সাংবাদিক: তারপর?

গজনফর আলী: এভাবে প্রথম মাস শেষে আমার লাভ হয় ৪০ টাকা।

সাংবাদিক: তারপর কী হলো? এভাবেই কোটিপতি হয়ে গেলেন?

গজনফর আলী: আরে না। এভাবে কি আর কোটিপতি হওয়া যায়! তার পরই তো আমার স্ত্রীর বাবা মানে আমার শ্বশুর মারা গেলেন। আর আমি তাঁর কয়েক কোটি টাকার পুরো সম্পত্তি পেয়ে গেলাম।

জুলমত তরফদার জানে, এই যুগে আজকাল সবাই প্রায় এই পথেই বড়লোক হয়েছে।

শ্বশুরের সম্পত্তি অবশ্য সবচেয়ে বেশি পায় সরকারি আমলারা। বেতন যা-ই পাক, ঢাকায় অনেকেই একাধিক গাড়ি-বাড়ি-ফ্ল্যাটের মালিক। ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা। যখনই কেউ ধরা পড়ে, জানা যায়, সবই শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি, বউয়ের নামে রাখা।

জুলমতের বন্ধু সোলায়মান মৃধা বাড়াবাড়ি ধরনের বড়লোক। কত টাকা আছে তা সে নিজেও জানে না। নিজের কত টাকা আছে তা যে জানে সে নাকি আর ধনীর সংজ্ঞায় পড়ে না। কিন্তু একসময় এই সোলায়মান মৃধাও ফেঁসে গেল এক মামলায়। জেল থেকে বাঁচতে গেল শহরের নামী একজন আইনজীবীর কাছে। সোলায়মান মৃধা: আমি জেলে যেতে চাই না। আইনজীবী: কেন জেলে যেতে চান না? অপরাধ করলে তো শাস্তি পেতেই হবে।

সোলায়মান মৃধা: আমার অনেক টাকা। আমি জীবনকে এখনো উপভোগ করতে চাই। তা ছাড়া আমি জানি ধনীরা কখনো জেলে যায় না। আইনজীবী: ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করছি। আসলেই ধনীরা কখনো জেলে যায় না। আপনি বাসায় যান।

কথা রেখেছিল আইনজীবী। সোলায়মান মৃধা পাঁচ বছর মামলা চলার পর যখন জেলে গেল, তখন সে আর ধনী ছিল না। এখন সেই আইনজীবী নিজেই দেশের সবচেয়ে ধনীদের একজন। শওকত হোসেন

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

256) গোলটেবিল বৈঠক

মান্যবর অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে কালো ধোঁয়া ও ট্রাফিক পুলিশমুক্ত একরাশ নির্মল পরিবেশের শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন, ঢাকার রাস্তায় আমাদের সঙ্গে দৌড়ানোর জন্য টাকা

সিটি করপোরেশনের অনুমোদন পেয়েছেন জনাব সিটি বাইক। তার সম্মানার্থে আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন। প্রথমেই সিটি বাইক আপনাদের সবার উদ্দেশে কিছু বলবেন। সিটি বাইক: ধন্যবাদ। ঢাকার রাস্তায় নেমেই আমি দেখলাম, এখানে চলাচলের কোনো জায়গা নেই। আমার মতে, প্রথমেই ঢাকার রাস্তা থেকে সব রিকশা ঝাঁটিয়ে বিদায় করা উচিত।

রিকশা: এটা কী ধরনের কথা বললেন? আসতে না আসতেই আমার সঙ্গে শত্রুতা! আপনি যা বললেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তার চেয়ে বড় কথা, শত বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল আমি ঢাকার রাস্তায় আছি, অথচ আমার সম্মানে কোনো বৈঠক হলো না। আর সেদিনকার কোন পুঁচকে ছোকরা সিটি বাইক, তার জন্য হচ্ছে কিনা গোলটেবিল বৈঠক!

সিএনজি: এটা কিন্তু ঠিক কথা বললো না, রিকশা ভাই। তুমি যে আমলে রাস্তায় নেমেছ, সে আমলে টেবিল শুধু চারকোনাই হতো। সুতরাং তোমাকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। তা ছাড়া তোমার সম্মান এমনিতেও কম না। প্রায়ই দেখি, পুলিশরা তোমাকে ট্রাক ভাইয়ের ওপর চড়িয়ে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী ট্রাক ভাই, সত্যি কি না বলো?

রিকশা: পুলিশরা আমাকে ট্রাকে উঠিয়ে ঢাকা ভ্রমণ করায় না, ট্রাকে উঠিয়ে ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যায়।

ভলভো: আমার মতো মহান দোতলা বাসেরই কোনো সম্মান নাই, আর তুমি আসছ রিকশার সম্মান নিয়ে কথা বলতে! তোমরা ভাবতে পার, এই মহান ভলভোকে রিকশা-টেম্পো-ট্যাক্সির সঙ্গে রাস্তার সিগনালে দাঁড়াতে হয়! এই মহান ভলভোর জন্য কোনো প্রাইভেট রাস্তা নাই! কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!

নসিমন: এত মহান মহান করেন কেন? আমরা কি আপনার চেয়ে কম মহান নাকি?

ভলভো: মহান! তাও আবার তোমরা! কী আছে তোমাদের? ঢাকা শহরে একমাত্র আমার জন্য কম্পিউটারাইজড টিকিট কাটিং ব্যবস্থা আছে, তোমাদের আছে? তা ছাড়া আমার চাকা আটটা, আর কার এতগুলো চাকা আছে, শুনি।

নসিমন: খালি ট্রেন ভাই যদি আজকের মিটিংয়ে

আসত তাহলে দেখতাম, চাক্কার এই অহংকার কোথায় যায়! ভালো কথা, মিটিংয়ে দেখছি ট্রাক ভাইও আছেন। আপনার তো রাত ১০টার পরে ঢাকা শহরে ঢোকার কথা, কিন্তু আমাদের এই বিকেলের মিটিংয়ে আসলেন কীভাবে?

ট্রাক: ভালো প্রশ্ন করেছ। আমার এখানে আসতে ২০০ খরচ করতে হয়েছে। এখন তোমরা চাঁদা তুলে আমাকে টাকা ২০০ ফেরত দিবা।

নসিমন: না, না, আমি কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না। আমার ইনকাম অনেক কম। তবে আমাদের হয়ে আমাদের সবার বড় ভাই সুইডিশ নাগরিক ভলভো ভাই সবার টাকা পরিশোধ করবেন।

ভলভো: শোনো নসিমন মিয়া, তোমার কিন্তু লাইসেন্স নাই, কথাবার্তা সাবধানে বলো। আমি সরকারি লোক আর তুমি কিনা আমার কাছে টাকা চাও! আমার কাছে তো ট্রাফিকও টাকা চায় না। আমি কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না।

ট্রাক: থাক, আমাকে তোমাদের টাকা-পয়সা দিতে হবে না; তোমরা ঝগড়াঝাঁটি, তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করো। এসব আমার বিশেষ পছন্দ না।

টেম্পো: হিঃ হিঃ হিঃ, শুনলেন ট্রাক ভাইয়ের কথা, তার নাকি ঝগড়াঝাঁটি, তর্ক-বিতর্ক পছন্দ না। অথচ যখনই কোনো এক্সিডেন্টের খবর শুনি, তখন খোঁজ নিলে দেখা যায়, ট্রাক-বাস নয়তো ট্রাক-টেম্পো না হলে ট্রাক-নসিমন আর তা না হলে ট্রাকের সঙ্গে অন্য কেউ আছে।

ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ হয় না, অথচ এক্সিডেন্ট করতে তোমার বিশেষ পছন্দ হয়, তাই না!

ট্রাক: না মানে, প্রথম দিনেই সিটি বাইক সাহেবকে ভয় পাইয়ে দিতে চাচ্ছিলাম না। তাই একটু ভালো ভালো কথা বলে ওনার মনে সাহস জোগাবার প্রয়াসে...

সিটি বাইক: সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে আমার মনে সাহসের কোনো অভাব নাই। সাহস না থাকলে ঢাকার মতো এমন জ্যামের শহরে দৌড়াতে আসতাম না। তবে একটু অবাক লাগছে এই ভেবে যে রাস্তার যানবাহনদের বৈঠকে নৌকা সাহেব উপস্থিত হলেন কী মনে করে?

নৌকা: আপনি ঢাকা শহরে নতুন এসেছেন তো,

তাই আপনার জানা নেই। আসলে মাঝে মাঝে ঢাকার রাস্তায় আমি নিজেও সার্ভিস দিই।

বর্ষাকালে আমি ছাড়া এখানে উপস্থিত অন্য কোনো ব্রাদার তো থাকেনই না, হিঃ হিঃ হিঃ...

সিটি বাইক: বাহ! বেশ তো, তাহলে বর্ষাকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে?

সিএনজি: নৌকা ভাই, বর্ষাকালে সিটি বাইকের সঙ্গে দেখা করো সমস্যা নাই, তবে একটু দূরে দূরে থেকো। কারণ, সিটি বাইক সাহেব ব্যাটারিতে চলে। বর্ষার পানি যদি সিটি বাইক সাহেবের ব্যাটারিতে ঢোকে, আর তখন যদি তুমি তার কাছে থাকো, তাহলে শক খাবার চান্স থাকবে কিন্তু।

টেম্পো: তুমি এই সামান্য বিষয় নিয়ে ভাবছ, সিএনজি ভাই? আমি কিন্তু ভাবছি অন্য কিছু নিয়ে। তেলের দাম বাড়লে তুমিও ভাড়া বাড়ায়, আমিও বাড়াই, আবার গ্যাসের দাম বাড়লে আমিও ভাড়া বাড়াই, তুমিও ভাড়া বাড়ায়। কিন্তু সিটি বাইক ভাই কখন ভাড়া বাড়াবে, ভেবেই পাচ্ছি না?

সিটি বাইক: কেন, আমি তো ব্যাটারিতে চলি, যখন বিদ্যুতের বিল বাড়বে, তখন আমি ভাড়া বাড়াব।

টেম্পো: ও, তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি, ভাড়া বাড়ানোর আরও একটা সুযোগ পাওয়া গেল। বিদ্যুতের দাম বাড়লে যখন সিটি বাইক ভাই ভাড়া বাড়াবে, তখন আমরাও ভাড়া বাড়াব।

রিকশা: তাহলে আমার কী হবে, আমি কখন ভাড়া বাড়াব? আমার তো পেট আছে নাকি?

ট্যাক্সি: যখন আলু-পটলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়বে, তখন তুমি ভাড়া বাড়াব।

রিকশা: তাহলে এখন তো চিনির দাম তুঙ্গে, এখনই ভাড়াটা বাড়িয়ে দিই। কী বলেন, সিটি বাইক ভাই?

সিটি বাইক: তোমাদের যার যা ইচ্ছা, করো।

আমি এতক্ষণ চার্জ দিচ্ছিলাম। আমার চার্জ ফুল হয়ে গেছে, যাই বাইরে গিয়ে ড্রিপ মেরে আসি।

মেহেদী আল মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

257) অভি-ধানাই পানাই

অংশগ্রহণ: পুরো গ্রহণ নয়। যেমন, কোনো সভায় গান গাওয়া হলো, কিন্তু পুরো শোনা (বা গ্রহণ) হয় না। কেউ মাঠে বক্তৃতা দিলেন, তিনিও সামান্য একটু গ্রহণ করলেন, কিন্তু কতটা গ্রহণ করলেন, তা জানা যায় না। এ পর্যন্ত কোনো অনুষ্ঠান পুরো গ্রহণ করেছেন, এমন ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে জোর পুলিশি তদন্ত চলছে।

অকথ্য: যা বলা যায় না। যেমন, কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলা যায় না।

অক্রীতদ্বার: যে দরজা কেনা হয়নি, চুরি করা দরজার ভদ্র রূপ।

অগ্নিকোণ: কোনো নির্দিষ্ট কোণ নয়, পৃথিবীর কাছে সবচেয়ে বড় অগ্নিগোলক সূর্য, যে বিভিন্ন অবস্থানে থাকে, তাকেই অগ্নিকোণ বলা যায়। সীমিত অর্থে গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘরের জ্বলন্ত উনুনের দিক।

অগ্রসর: (দুধের) সরের উপরিভাগ; সেরা সর।
বাক্যগঠন—ভোজনবিলাসীদের অগ্রসর দেখলেই জিভ দিয়ে লাল ঝরে।

অচানক: চান না করার প্রবণতা। এটি ঠান্ডাপ্রধান দেশের বৈশিষ্ট্য।

অজ্ঞাতবাস: বাং অজ্ঞাত+ইং বাস (Bus)। যে বাসের পরিচয় পাওয়া যায়নি। বাক্যগঠন—
জিব্রাম বলেছিল, একটি অজ্ঞাত বাস একটি লোককে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেছে। শোনা যায়, মহাভারতের পাণ্ডবেরা বহুকাল অজ্ঞাত বাসে ভ্রমণ করেছিল।

অঞ্চলপ্রধান: যে শাড়ির (বা আজকাল ধুতির ক্ষেত্রেও) বাহারি আঁচল অনেকটা বেশি থাকে, তাকে বলে অঞ্চলপ্রধান।

অণুতপ্ত: সামান্য গরম। বাক্যগঠন—শীতকালে তার অভ্যাস ছিল অণুতপ্ত জলে চান করা।

অণুবাদক: যারা ছোট বাদ্যযন্ত্র বাজায় (মাউথ অরগ্যান ইত্যাদি), যেসব বাদকের বয়স কম (শিশুবাদক)।

অতিরিক্ত: যিনি অতিমাত্রায় দারিদ্র্যপীড়িত।

বাক্যগঠন—বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক পুষ্টির অভাবে অসুস্থ।

অনাহার: হার হয়নি এমন, জিত। বাক্যগঠন—
স্পোর্টসে চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতার শেষে তিনি অনাহারি হওয়ায় চারটি পদক পেয়েছেন।

অন্তর্ধান: ধানের মধ্যে যা থাকে—চাল, তণ্ডুল।
বাক্যগঠন—সুধীর যেভাবে বেছে বেছে অন্তর্ধান
কেনে, তাতে মনে হয়, এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট
অভিজ্ঞতা আছে।

অন্তর্বাস: ইং-বাং যুক্ত শব্দ; বাস (Bus) এর
ভেতর। বাক্যগঠন—কলকাতায় কিছু নতুন বাস
এসেছে, সেগুলোর বাইরেও যেমন সুন্দর,
অন্তর্বাস তেমনই।

অন্ধ-অনুকরণ: অন্ধ ব্যক্তির দেখাদেখি কাজ করা
বা অনুসরণ করা, ব্রেইল অক্ষর ছাড়া কোনো
কিছু না পড়া, কালো কাচের চশমা পরা, লাঠি
নিয়ে চলা ইত্যাদি।

অপদস্থ: পা নেই যার, পদচ্যুত। যেমন কেঁচো।
বাক্যগঠন—কাণ্ডটা দেখো, একজন অপদস্থ পা-
হারাকে পাহারায় বসানো হয়েছে।

অবিচালিত: যে গোরু বা মোষকে বিচালি দেওয়া
হয়নি।

অবেলা: যা বেলা হয়নি। যেমন, রুটি।

অভাবী: ১। যার দাদা স্ত্রীহীন ২। যার বউদি
নেই। ৩। অভাব-এর স্ত্রীরূপ

অমৃত: যিনি জীবিত, যাঁর দেহ থেকে প্রাণ
বহির্গমন করেনি। বাক্যগঠন—বসু মহাশয়ের
অমৃতকালে তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থটির ১৬টি
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

অশালীন: বিবাহিত অথচ শালি নেই এমন
পুরুষ, প্রায় করুণার পাত্র।

অশ্রাব্য: যা শোনা যায় না এমন। উদাহরণ, ক্ষুদ্র
কম্পনের ফলে যে আওয়াজ মনুষ্য কর্ণে অনুভূত
হয় না। ইংরেজি Subsonic।

অসহযোগ: সহ্য করা যায় না এমন যোগ;
ব্যাপকার্থে যে যোগ (অঙ্ক) করা বেশ কঠিন।
বাক্যগঠন—আজকাল স্কুলে ছোটদের ক্লাসেও যে
যোগ শেখানো হয়, তাকে অসহযোগ বলতেই
হয়। হিমালীশ গোস্বামী

সংগৃহীত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯,
২০০৯

258) দ্য স্টেলা অ্যাওয়ার্ড

টিভি আর পেপার খুললেই খবর মেলে অনেক
অ্যাওয়ার্ড এবং এর নানা বাহারের। ‘দ্য স্টেলা
অ্যাওয়ার্ড’ সেসবের তুলনায় অন্য ধাঁচের একটা
পুরস্কার। আদালতে মজার বিষয় নিয়ে দায়ের
করা মামলার ওপর দেওয়া হয় এই পুরস্কার।

ওয়েবসাইট অবলম্বনে এ রকম মজার কয়েকটি মামলার বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুনাস ইকবালরয় এল পিয়ারসন, বয়স ৫৭, ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি ‘মম অ্যান্ড পপ’ নামের একটি ড্রাইক্লিনারে ধোয়ার জন্য কাপড় দিয়েছিলেন। পরে দেখা গেল, তাঁর এক জোড়া প্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আর এ দুঃখে তিনি ওই ড্রাইক্লিনারের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং আদালতের সামনে আক্ষরিক অর্থেই কান্নাকাটি করে একাকার। অবশ্য চোখের জল বৃথা যায়নি। আস্থা ভঙ্গ ও তাঁর মনের শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তিনি ওই এক জোড়া প্যান্টের জন্য ৬৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। আদালতও তাঁর পক্ষে রায় দেন। এক জোড়া প্যান্ট হারিয়েই যদি এত মেলে, একটি কমপ্লিট স্যুট হারালে তো খবরই ছিল!

(মামলাটি ২০০৭ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

মারশি ম্যাকলার, একটি শপিং মল থেকে কেনাকাটা সেরে বের হয়েই পড়লেন বিপত্তিতে। আচমকা একটি কাঠবিড়ালি আক্রমণ করে বসল। ম্যাকলার ভয়ে অস্থির হয়ে পা সজোরে ঝাঁকি দিলেন এবং পেছন দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চিতপটাং। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। ব্যস, অমনি ঠুকে দিলেন শপিং মলের বিরুদ্ধে মামলা। কারণ দেখানো হলো—মলের উচিত ছিল, তাঁকে সামনের গাছের কাঠবিড়ালি এবং সেগুলোর অশোভন আচরণ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া। আর এর জন্য ম্যাকলার ক্ষতিপূরণ পেলেন ৫০ হাজার ডলার। বাহ! চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, অন্যের বাড়িতে গিয়ে পিঁপড়ার কামড় খেলেও এ জন্য হাজার টাকার মামলা জেতা যেতে পারে।

(২০০৬ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বব ডটারি থাকেন আমেরিকার লুইসভিলেতে। একদিন এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরের টয়লেট ব্যবহার করতে গিয়ে আটকে গেলেন। কে একজন টয়লেটের প্যানে গ্লু (আঠা) লাগিয়ে রেখেছিল। যা-ই হোক, অনেক ঝঙ্কি-ঝামেলা করে মুক্ত হলেন। ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। বব বললেন, এটা তো আর স্টোরের দোষ নয়। তবু স্টোর কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুই হাজার ডলার দিতে চায়। বব তখন

রেগে ওই স্টোরের বিরুদ্ধে মামলা করেন এই মর্মে যে, ‘ওরা আমাকে যে টাকা অফার করেছে, তা খুবই অপমানজনক।’ এ অপমানের জন্য তিনি তিন মিলিয়ন ডলার দাবি করেন এবং মামলায় জিতেও যান। এই না হলে ভদ্রতার শাস্তি!

(২০০৫ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বার্নার্ড লরেন্স তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওভার ড্র করে ফেলেছেন। অর্থাৎ তাঁর যে পরিমাণ টাকা ছিল তার বেশি খরচ করে ফেলেছেন।

নিয়মমাফিক ব্যাংক এর জন্য তাঁকে ফি চার্জ করে চিঠি পাঠায়। এ চিঠি পেয়ে লরেন্সের রাতের ঘুম নষ্ট হওয়া ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার জন্য ওই ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করে দুই মিলিয়ন ডলার পান তিনি। কী ভাই, বাঘের ওপর টাঘও আছে তাহলে!

(২০০৫ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

নিউইয়র্কের তানিসা টরেন্স ‘রেডিও সেক’ নামের মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেন তাঁর মোবাইল বিলে Crimedanch (তাঁর শহরের নাম) ভুল বানানে লেখার জন্য। তিনি বানান ঠিক করতে না বলে সরাসরি মামলা করে দিলেন কোম্পানির বিরুদ্ধে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, বানান ভুল দেখে তিনি খুবই বিব্রতবোধ করেছেন এবং তাঁর সম্মানহানিও করা হয়েছে বলে দাবি করেন। এর জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। (২০০৪ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

পন পার্কিন, ওহিওর বিনোদন পার্ক প্যারামাউন্ট কিংস আইল্যান্ডের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করছিলেন। এমন সময় বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস। প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই, তাই না? ‘না’, বললেন পার্কিনের উকিল। তিনি পার্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেন ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তাঁর মামলার যুক্তি হলো, পার্ক কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল পার্কে আসা সবাইকে সাবধান করা, যাতে তাঁরা ঝড়ের সময় বাইরে অবস্থান না করেন। তাহলে রাস্তায় এ ঘটনা ঘটলে কি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা হতো!

(২০০৩ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত)যেভাবে ইতিহাসের শুরু

মেক্সিকো শহরের স্টেলা লেইবেকের একটি ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়েই দ্য স্টেলা অ্যাওয়ার্ডের যাত্রা শুরু ১৯৯২ সালে। তখন তাঁর বয়স ৮০ ছুঁই ছুঁই। তিনি নাতির গাড়িতে করে বেড়াতে বের হলেন। রাস্তায় তাঁর কফি খাওয়ার তৃষ্ণা পেল। নাতিকে বলতেই সে কাছের ম্যাকডোনাল্ড রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামাল। কফি হাতে নিয়ে ঢাকনা খুলতেই ছলকে কফি ছিটকে পড়ল স্টেলার কোলে। চামড়া পুড়ে গেল (!!!) একটু। এরপর তো তুলকালাম কাণ্ড, মামলা-মোকদ্দমা—সে এক এলাহি কাণ্ড। পরে মেক্সিকোর আদালত ২ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেন ম্যাকডোনাল্ড রেস্টুরেন্টকে। এর পর থেকেই এ রকম তিলকে তাল করার মতো ঘটনা ঘটানো এবং সেই তাল থেকে সুস্বাদু রস বের করতে পারার ঘটনাকে সম্মানিত করে রাখতে প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যক্তি ও তাঁর ঘটনাকে ‘দ্য স্টেলা অ্যাওয়ার্ড’ মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং তাঁদের মধ্যে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তিলকে তাল করার মামলা পুরস্কার দ্য স্টেলা অ্যাওয়ার্ড

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

259) একটি মর্মস্পর্শী পত্র!

প্রিয় বাবা,
এ চিঠিটা যখন তুমি পড়ছ, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে। অ...নে...ক দূরে। না, তোমাদের প্রতি কোনো রাগ বা অভিমান থেকে আমার এই চলে যাওয়া নয়। ভয় পেয়ো না, এটা কোনো সুইসাইড নোট না। আমি বেঁচে আছি এবং থাকব তত দিন, যত দিন আমার জীবনটা উপভোগ করতে পারব। অনেক ভেবে দেখলাম, আমার নিজস্ব একটা জীবনদর্শন আছে এবং সেটা বাস্তবায়ন করাই সমীচীন। আমি জেনীর সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তুমি কি জেনীকে চেনো? চেনার অবশ্য কথা নয়। কখনো দেখনি। যা-ই হোক, এটা টিনএজ আবেগের বশবর্তী হয়ে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত নয়। হ্যাঁ, ওকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সেটাই এই চলে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। ও শুধু আমার বন্ধু বা প্রেমিকা নয়, আমার কমরেড। আমরা একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। আমরা এ

দেশে একটা সামাজিক পরিবর্তন আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর জন্য হয়তো অনেক বাধা আসবে, অনেক রক্ত ঝরাতে হবে। কিন্তু আমরা আমাদের আদর্শে অটল। এ ছাড়া নেতারা খুব ভালোভাবে আমাদের প্রশিক্ষিত করছেন। আমার কোনো উপায় ছিল না, বাবা। অবশ্য আমার আয়ু আর বেশি দিন নেই, তাই আমাকে আর ফিরে পেলেও খুব বেশি দিনের জন্য পেতে না। জেনী ওর অজান্তে একটা ভয়াবহ অসুখ বয়ে বেড়াচ্ছিল শরীরে। আর সেই রোগটা এখন আমার মধ্যেও সংক্রমিত। জীবনের যে কয়টা দিন বাকি আছে, জেনীর ভালোবাসা আর আদর্শের সশস্ত্র লড়াই-ই হবে আমার সম্বল। আমার আর জেনীর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। ভয় নেই, বাসা থেকে কিছু নিয়ে যাচ্ছি না, তোমার কাছেও চাইব না কখনো। আমরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করব। আগে হেরোইন নিতাম (টের পেতে দিইনি কখনো)। এখন থেকে ওটার ব্যবসাও করব। লোকাল একজন ডিলারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কোনো সমস্যা হবে না।

ভালো থেকো, বাবা। মাকেও ভালো রেখো। বিদায়...। বি. দ্র. মাথাটা এবার একটু ঠান্ডা করো, বাবা। প্রেশার তো বেড়ে গেছে, বুঝতেই পারছি। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও। ওপরে লেখা সবকিছুই মিথ্যা— জেনী, আদর্শের সংগ্রাম—সব। কিন্তু দেখলে তো বাবা, পৃথিবীতে খারাপ কত কিছুই ঘটতে পারে! এর তুলনায় একটা সেমিস্টার পরীক্ষায় ফেল করা তো কিছুই না, তাই না? রিপোর্ট কার্ড আমার ড্রয়ারে রাখা আছে। ওটাতে সাইন করে দিও। আর মাথা পুরোপুরি ঠান্ডা হলে আমাকে জানিও, আমি চলে আসব। আমি এখন বড় মামার বাসায়। হাসান মাহবুব ওয়েবসাইট অবলম্বনে

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

260) ফার্নিচার

বড় ভাই ঠিক করেছে বিয়ে করবে। অন্য পরিবারের একটা মেয়ে আমাদের পরিবারে আসবে, এসে দেখবে বাসায় কিছু নেই; রাত হলে মশারি টানিয়ে সবাই ফ্লোরে ঘুমিয়ে যায়— বিষয়টা নিয়ে তাকে খানিকটা চিন্তিত মনে

হলো। কীভাবে কীভাবে কিছু টাকা জোগাড় করে একদিন বিকেলে আমাকে বলল, ‘চল, বাসার জন্য একটা দুইটা ফার্নিচার কিনে আনি।’ আমরা নিউমার্কেট এলাকায় গিয়েছি। খুঁজে খুঁজে ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে ফার্নিচারের দাম দেখে একেবারে আক্কেল-গুডুম। কাঠের ফার্নিচারের যে এত দাম হতে পারে সেটা আমরা কোনো দিন কল্পনাও করিনি! দাম শুনে মনে হলো এগুলো কাঠ নয়, সব ফার্নিচার বুঝি সোনা দিয়ে বানিয়েছে। কয়েকটা ফার্নিচারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করেই আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের পক্ষে ফার্নিচার কেনা দূরে থাকুক, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখারই ক্ষমতা নেই। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ একটু বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমি বললাম, ‘এক কাজ করলে কেমন হয়?’ ‘কী কাজ?’

‘চল কিছু কাঠ কিনে নিয়ে যাই। তার সঙ্গে করাত, হাতুড়ি, বাটাল এবং র্যাদ। নিজেরা ফার্নিচার বানিয়ে নেব।’

‘পারবি?’

‘না পারার কী আছে?’ ঠিক কী কারণ জানি না, কখনোই কোনো কাজ আমার কঠিন মনে হয় না। আমি জোর দিয়ে বললাম, ‘ভালো একটা ডিজাইন দেখে ফার্নিচার বানিয়ে নেব।’

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের আইডিয়াটা পছন্দ হলো। হিসাব করে দেখা গেল যত টাকা নিয়ে এসেছি সেটা দিয়ে করাত, হাতুড়ি, বাটাল, র্যাদ আর কিছু কাঠ কিনে নেওয়া সম্ভব।

কাজেই সন্কেবেলা আমরা দুই ভাই রিকশা করে কিছু কাঠের তক্তা, করাত, হাতুড়ি, বাটাল ও র্যাদ নিয়ে হাজির হলাম। বলা বাহুল্য, বাসার লোকজন ফার্নিচার কিনে না এনে ফার্নিচার তৈরির কাঁচামাল কিনে আনা দেখে এমন কিছু অবাক হলো না।

সন্কেবেলা সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হলো কী কী ফার্নিচার তৈরি করা যায়। একজন বলল, সোফা সেট, একজন বলল ডাইনিং সেট। বড় বোন বলল, তার বেশি কিছু চাই না, হারমোনিয়ামটা রাখার জন্য একটা বাক্স তৈরি করে দিলেই হবে। আমরা বললাম ‘তথাস্তু!’

রাত্রিবেলা খেয়ে ছাদে ইলেকট্রিক লাইট লাগিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। কাঠমিস্ত্রিদের কাজ করতে দেখেছি, করাত দিয়ে কী সুন্দর ঘ্যাঁচ

ঘ্যাঁচ করে কাঠ কেটে ফেলে, এই কাজটার মধ্যে কোনো পরিশ্রম আছে সেটা ধারণাও করিনি। কিন্তু কাঠগুলো কাটতে গিয়েই আমাদের কালো ঘাম ছুটে গেল, খুব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম কাঠ কাটা খুব পরিশ্রমের কাজ। কাজেই প্রথমে কোন ফার্নিচার বানানো হবে সেটা একটু পরিবর্তন করতে হলো। ঠিক করা হলো সোফা সেট কিংবা ডাইনিং টেবিল তৈরি না করে প্রথমে একটা সহজ জিনিস তৈরি করা হবে। সেটা হচ্ছে বুক শেলফ।

কাগজে ডিজাইন করে অনেক কষ্ট করে কাঠ কেটেছি। এখন র্যাদ দিয়ে সেগুলো পালিশ করার কথা। সবসময়ই দেখে এসেছি, র্যাদ চালানোর সময় কাঠের পাতলা ছিলকে বের হয়ে আসে, ভারি সুন্দর একটা দৃশ্য। মহা উৎসাহে র্যাদ চালিয়ে কাঠ পালিশ করে যাচ্ছি এবং প্রতি ঘষাতে একটা করে ছিলকে বের হয়ে আসছে, সত্যি সত্যি সুন্দর একটা দৃশ্য—তবে ভারি পরিশ্রম। তক্তার এক পাশ পালিশ করতেই কালো ঘাম বের হয়ে গেল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ তার ফার্নিচার বানানোর প্রজেক্টে ইস্তফা দিয়ে নিচে চলে গেল। আমি হাল ছেড়ে দিলাম না। আমার সমবয়সী এক মামাকে নিয়ে প্রায় সারা রাত পরিশ্রম করে কাঠের তক্তাগুলো পালিশ করে ফেললাম। পরের দিন উঠে দেখি পালিশ করা তক্তাগুলো বাঁকা হয়ে আছে। কাঠমিস্ত্রি না হওয়ার কারণে কাঠ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই, সেগুলো সম্ভবত ভেজা ছিল এবং যতই শুকাতে লাগল ততই বাঁকা হতে লাগল। প্রতিদিন আমরা পালিশ করে সোজা করে রাখি, ভোরবেলা আবিষ্কার করি সেটা বাঁকা হয়ে আছে! শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সেই বাঁকা তক্তাগুলোয় পেরেক দিয়ে পিটিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা লাগিয়ে বুক শেলফটাকে দাঁড়া করানো হলো। কী রং দেওয়া হবে সেটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে কুচকুচে কালো রং করে ফেলা হলো। রং শুকিয়ে গেলে সেটাকে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখা হলো। বই দিয়ে সাজিয়ে রাখার পর সেটাকে রীতিমতো সত্যিকার শেলফের মতো দেখাতে লাগল।

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের বিয়ের পর যখন ভাবি আমাদের বাসায় এসেছিল তখন অনেক

পরিশ্রম করে তৈরি করা এই বুক শেলফটি ছাড়া নতুন কোনো ফার্নিচার আসেনি। ভাবি খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল কিন্তু আমাদের এই নেহাত সাদামাটা অবস্থায় মানিয়ে নিতে তার কোনোই সমস্যা হয়নি। মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। জন্ম ২৩, ডিসেম্বর ১৯৫২। এ লেখাটি তাঁর রঙিন চশমা বই থেকে সংগৃহীত
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

261) টয়লেট পেপার, প্লিজ

মন্দার এই বাজারে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে গিয়ে বাবা-মায়েরা এমনিতেই গলদঘর্ম। পাঠ্যপুস্তক, খাতা-কলম, ইউনিফর্ম তো আছেই, তার ওপর নতুন উপদ্রব জুটেছে—আইরিশ একটি স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে করে টয়লেট পেপার আনতে বলে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, স্কুলের ব্যয় কমানো। এখানেই শেষ নয়। সঙ্গে করে দুপুরের খাবার আনাটাও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের এক শিক্ষকের কথা শুনুন—প্রথম দিনেই ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। অর্ধেক ছাত্রছাত্রী টয়লেট পেপার এনেছে। ভাগ্যিস, সেই খবরে আল্লাদিত হয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা বলে বসেননি, স্কুলে বসার চেয়ার-টেবিলটাও সঙ্গে করে এনো।

সূত্রঃ রয়টার্স গাধা যখন জেব্রা
গাজার মারাহল্যান্ড চিড়িয়াখানায় নতুন এক অতিথি এসেছে। প্রাণীটির গায়ে সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগ দেখে যে কেউ একে জেব্রা বলে ঠাওরাবেন। আদতে প্রাণীটি একটি গাধা।
আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলেছে, কী আর করা! গাজায় জীবজন্তু আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
সত্যিকারের জেব্রা তো আর আনা গেল না।
তাই শিশুদের দেখাতে সাদা রঙের গাধাটাকে চোরাই পথে আনা। তারপর গায়ে ঐকে দেওয়া হয়েছে কালো ডোরাকাটা দাগ। ব্যস! সাদা গাধা হয়ে গেল ডোরাকাটা জেব্রা। কিন্তু বৃষ্টি এলে জেব্রার (!) গায়ের রং ধুয়ে গেলে যে বেশ কলেঙ্কারি একটা ব্যাপার হবে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। **সূত্রঃ** অ্যানানোভা বর্জ্য দিন পুরস্কার নিন
পরিবেশসচেতন তাইওয়ানি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি জনসাধারণের উদ্দেশে একটা ঘোষণা দিয়েছে।

রাস্তার ময়লা-আবর্জনা এমনকি কুকুরের মল তুলে যারা জমা দেবে, তাদের পুরস্কৃত করা হবে। এক কেজি বা দুই পাউন্ড কুকুরের মল জমা দিলে ১০০ তাইওয়ানি ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। দেশটির পরিবেশ রক্ষা ব্যুরোর ওই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, কুকুরের মল বলে নাক সিটকানোর কিছু নেই। পরিবেশ দূষিত করে এমন প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ জমা দিলেও ওই একই পুরস্কার মিলবে। **সূত্রঃ**

এএফপি ভাষান্তর: আবুল হাসনাত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৯, ২০০৯

262) হাট! হাট!! হাট!!!

গ্রামের এক লোক তার ছেলের সঙ্গে জীবনে প্রথম এসেছে ঢাকায়। বাস থেকে গুলিস্তান নেমেই হাজার হাজার লোকের ভিড় দেখে তার ভাবাচ্যাকা খাওয়ার অবস্থা, “ও বাপ, আনলি তো আনলি হাটবারে কেন ঢাকায় আনলি?” অত্যন্ত যৌক্তিক অনুযোগ। গ্রামের খোলা জল-হাওয়ার মানুষটাকে শুধু শুধু হাটবারে ঢাকায় এনে কষ্ট দেওয়ার কোনো অধিকার নেই ছেলের। তবে সেই আমলে হাটবার ছাড়া বাবাকে ঢাকায় নিয়ে আসাও একটা মুশকিলের ব্যাপার ছিল ছেলের পক্ষে। আর এখনকার কথা তো বাদই দিলাম। ঢাকা এখন সত্যি সত্যিই হাটের শহর। যদিকে যাবেন, সেদিকেই হাট আর হাট। আর ঢাকার নাগরিকেরা সব হাটুরে। সেই হাট থেকে তারা কত কিছু কেনে!

শুক্রবার দিন কোট-টাই-শার্ট পরা লোকজন তাদের আদরের গাড়িটি ধুয়ে-মুছে রং করে নিয়ে আসে মানিক মিয়া এভিনিউতে। ক্রেতারা গাড়ি টিপেটুপে দেখে। সংসারে প্রথম গাড়ি। স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী এসেছে গাড়ির হাটে। স্ত্রী বলল স্বামীকে, ‘এম্মা, এই গাড়ির রংটা কী বিচ্ছিরি! আর এই গাড়িটাই কিনা তুমি পছন্দ করলে!’ স্বামী হয়তো বা মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, ‘রং তো কোনো ফ্যাঙ্টর না, এই গাড়ির ইঞ্জিনটা ভালো।’ স্ত্রী বলবে, ‘ইঞ্জিন কি আর বাইরে থেকে দেখা যাবে নাকি! পাশের বাসার ভাবির গাড়ির রংটা কী সুন্দর বটল গ্রিন। আমি বটল গ্রিনের চেয়েও ভালো রং না হলে গাড়ি কিনবই না।’

হাটের ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই একটু বড়লোক

কিসিমের, তাই তারা গুলিস্তান, ফার্মগেটের
হকারদের মতো ‘খালি পাঁচ, খালি পাঁচ (লাখ),
ভিভিটিআই ইঞ্জিন, আটানব্বই মডেল, সিএনজি
করা, লইয়া যান, পানির দর’ সুর তোলে না।
তারা গাড়ির একটা দাম ঝুলিয়ে একটু দূরে
দাঁড়িয়ে রানিষ্কেত রোগীর মতো ঝিমুতে
থাকেন। ক্রেতা দেখলেই একটু নড়েচড়ে
দাঁড়ান। এ রকম হাট ঢাকায় আছে বেশ কটি।
অন্যদিকে যারা চার চাকার বদলে দুই চাকায়
বিশ্বাসী, তাদের জন্য আছে আবার
মোটরসাইকেলের হাট। চালিয়ে-টালিয়ে
দেখেশুনে কেনার সুযোগ আছে সেগুলোয়।
তবে হাট বললেই ঢাকার মানুষের যে স্থানটির
কথা প্রথমেই মনে হয়, তা গাবতলী—গরুর
হাট। কোরবানি ঈদের আগে আগে মানুষ আর
শুধু গাবতলীর ওপর ভরসা করতে পারবে না
জেনে হাটকে বাড়ির কাছাকাছি নিয়ে আসে
ব্যবসায়ীরা। ঈদ এগিয়ে আসতে থাকে, আর
গরু-ছাগলের হাট পৌঁছে যায় অলিতে-গলিতে,
বাসার দোরগোড়ায়। ঢাকা তখন এক
আপাদমস্তক হাটের নগর।

আর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র তো
আর সম্মেলন কেন্দ্র না, এটা এখন হাটেরই
জায়গা। মেলা আর ফেস্টিভাল নাম দিয়ে
কিসের হাট বসে না সেখানে—ঘরবাড়ি কেনার
রিহাব ফেয়ার, মেডি এক্সপো, টেক্সটাইল
ফেয়ার, পর্যটন মেলা থেকে শুরু করে সবকিছুই
এখানে বিভিন্ন সময় জমে ওঠে।

এত সব হাটের পাশাপাশি এবার একটা নতুন
হাট বসানোর সময় বুঝি হয়েই এল। চ্যানেলের
হাট। এই মুহূর্তে দেশে চ্যানেল আছে ১১টি।
এর ভেতর কয়েকটির অবস্থা মুমূর্ষু। কয়েকটি
‘ওপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট’। একটি
আবার মরে গিয়েও জেগে উঠে আবার মরমর।
আরেকটি মৃত্যুর পর আর পুনর্জীবন পায়নি।

এর মধ্যে দেশে আসছে আরও ১০টি নতুন
টেলিভিশন চ্যানেল। চ্যানেলবহরে এগুলো যোগ
হলে দেশে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা দাঁড়াবে
২১টির মতো। এগুলোর মধ্যে লাইসেন্স পাওয়া
অনেকেরই চ্যানেল চালানোর মতো টাকা নেই।
কাজেই তারা তাদের লাইসেন্সের পসরা সাজিয়ে
বসতে পারে চ্যানেলের হাটে। প্রতি শুক্রবার
সেই হাটে চ্যানেলের মালিকেরা লাইসেন্স নিয়ে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকবে, ‘এই পানির দর, আর পাইবেন না কিন্না লন, কাগজপত্রের ঝামেলা নাই। চেক কইরা লন।’ কেউ হয়তো বা এসে বোকার মতো বলবে, ‘সবই তো ভাই স্যাটেলাইট। টেরিস্ট্রিয়াল নাই কারও কাছে?’ একজন পাশ থেকে বলবে, ‘টেরিস্ট্রিয়াল লাগবে? আসেন ভাই, আমার সঙ্গে। দাম কিন্তু একটু বেশি পড়ব।’ কেউ হয়তো বা তাকে সতর্ক করে দেবে, ‘ভাই, ওই টেরিস্ট্রিয়াল কিনেন না, ভেজাল আছে, কাগজপত্রে ঠিক নাই। চ্যানেল চালানোর কয়েক দিন পরই কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিব।’

ক্রেতারা চ্যানেল লাইসেন্সের ব্যাপারে অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়ে মেলায় আসবে, আতশ কাচ দিয়ে লাইসেন্সের কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তারপর খুশি মনে কিনে নিয়ে যাবে বাড়ি। গিয়ে হয়তো বা বউকে বলবে, ‘চোখ বন্ধ! আজ না তোমার জন্মদিন! এই দেখো তোমার জন্য কী উপহার এনেছি!’ বউ চোখ খুলে হাতে চ্যানেলের কাগজপত্র দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠবে, ‘চ্যানেল, আমার জন্য!’ সিমু নাসের

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ২৬, ২০০৯

263) শীতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে নায়ক-নায়িকারা আতঙ্কিত

আবহাওয়া অফিসের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই বাতাসের হাবভাব দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে শীতকাল প্রায় এসে গেছে। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর এ দেশের অনেকের কাছে শীতকাল যেন এক পরম আশীর্বাদ। আর তাই শীতকালকে বরণ করে নিতে অনুষ্ঠিত হয় কত উৎসব। কিন্তু কথায় আছে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। সাধারণভাবে শীতকাল পিঠাপুলির সময় হলেও কিছু মানুষের জন্য শীতকাল এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির রূপ নেয়। বিশেষ করে বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কাছে শীতকাল এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। চলচ্চিত্র বাঙালিদের প্রাণ। এই চলচ্চিত্র যেন সমাজের এক আয়না—যাতে প্রতিফলিত হয় দেশ-মাটি তথা আপামর জনতার গৌরবময় সংগ্রামী জীবন। আর এই চলচ্চিত্রের প্রাণ হচ্ছে বৃষ্টিভেজা নায়ক-নায়িকার নাচ-গান। বৃষ্টিভেজা নাচ-গান ছাড়া কোনো সিনেমার কথা কল্পনাই

করা যায় না। কিন্তু নায়ক-নায়িকারা শিডিউল মানলেও বৃষ্টি কোনো শিডিউল মানে না। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাণকেন্দ্র এফডিসির কৃত্রিম বৃষ্টিতে ভিজেই শুটিং করতে হয় দর্শকদের চোখের মণি নায়ক-নায়িকাদের। দর্শকদের বিনোদনের জন্য শীতকালের বরফ-শীতল পানির বৃষ্টিতে ভিজে মুখ বুজে তাদের শুটিং করতে হয়, যা অত্যন্ত মর্মান্তিক! তাদের মুখে থাকে হাসি আর গান, কিন্তু অন্তরের গভীরে থাকে তীব্র মর্মবেদনা। তাদের এই বেদনা দেখার কি কেউ নেই? শীতকালে এভাবে ক্রমাগত ঠান্ডা পানিতে ভেজার কারণে তারা জ্বর, টনসিল, সর্দি-কাশি এমনকি নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিবছর এই ঠান্ডাজনিত অসুস্থতার কারণে শুটিং পিছিয়ে দেয় অনেক নায়ক-নায়িকা। ফলে এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গুনতে হয় লোকসান। অথচ বরাবরের মতো কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের অপার সম্ভাবনাময় চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। আর একটি দেশের চলচ্চিত্র ধ্বংস হওয়া মানে তার গৌরবময় সংস্কৃতি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। অতএব, দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে অতি সত্বর শীতকাল উপলক্ষে এফডিসিসহ শুটিং স্পটগুলোতে সহনীয় মাত্রার গরম পানির বৃষ্টির ব্যবস্থা করে সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে রক্ষা করতে হবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০২, ২০০৯

264) পিঠ

বলতে পারেন কি এই শরীরটার সব অঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনাদরে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে কে? একটু ভাবলেই সকলে একবাক্যে জবাব দেবেন: ‘পিঠ’। আয়তনের দিক দিয়ে একক গরিষ্ঠতা যে-অংশটির, সেটিই সবচেয়ে অবহেলিত—এমনতর পরিহাস সাহারা মরুভূমি ছাড়া আর কারো ভাগ্যে দেখা যায়নি। পিঠ হল শরীরের ‘পশ্চাৎপদ দেশের’ অনুকল্প—তাই Back ward মানেই পশ্চাৎপদ। সব দিক দিয়ে শোষিত এই পিঠের পক্ষ নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ দুটো সহানুভূতির কথা বলল না।

কত সাহিত্যে, কত কাব্যে রূপ বর্ণনার কত

দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখলাম: ‘মাথার চুল থেকে
কপাল, জ্র, চোখ, নাক, গাল, ঠোঁট, দাঁত,
চিবুকের তো কথাই নেই—ওরা হচ্ছে
Priviledged section; কিন্তু বর্ণনার বৈচিত্র্যে
কমল-কর চম্পক অঙ্গুলি, মৃণাল-বাহু;
কপাটবন্ধও কম যায় না। কাউকে বাদ দেওয়া
হয়নি; কবিদের কল্যাণে পা পর্যন্ত উতরে গেছে,
অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে কালিদাসকে ঠেকানো
যায়নি শ্রোণী-শিলা বর্ণনায়; কাঁধ আর তলপেট
পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দৌড় দেখেছি।
কিন্তু এত বড় বিরাটত্বের মহিমায় মহীয়ান পিঠ
আজ পর্যন্ত যে আঁধারে, সেই আঁধারে।’
অথচ কেন? কোনো আধুনিকার বুকের উপর
যে-বেণীটি লুটিয়ে পড়েছে, তাকে নিয়ে এত
মাতামাতি করতে পারো আর পিঠের উপর
লুটোলে তোমাদের কবিতার উচ্ছ্বাসে পিঠ-
বেচারীর নামোল্লেখ পর্বটা করতেই তোমাদের
কলমের কালি আর মনের রং ফুরিয়ে যায়—এ
কেমন কথা? তোমার আগে-আগে চলা যে
মেয়েটির পেছন দিক দেখতে দেখতে তুমি
মোটর চাপা পড়ার উদ্যোগ করছ, তার পায়ের
নৃত্যভঙ্গী দেখবে, মসৃণ গলার এতটুকু ফালির
উপর সূক্ষ্মতম স্বর্ণরেখাটি তোমার চোখ এড়াবে
না, অথচ মাঝখানে অত বড় পিঠখানা তুমি
সত্যি লক্ষ্য করোনি—এ কি তাজ্জব ব্যাপার নয়?
এই পর্যন্ত পড়ে যে রুচিবাগীশ বিকৃত মস্তিষ্কের
দল লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, তাঁদের কাছে
দেহতত্ত্বের এই গূঢ় রহস্য বোঝানোর চেষ্টা
নিশ্চয় বৃথা। অতএব আমাকে পলায়ন করতে
হবে—অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হবে। এই
‘পৃষ্ঠপ্রদর্শন’ শব্দটা থেকেই বুঝবেন, পিঠের
মতো বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই। একদিন
পিঠ ছিল সন্ধিকামনার দ্যোতক, ব্যক্তিগত শ্বেত-
পতাকা; যুদ্ধ করতে গিয়ে শেষে নিতান্ত
বেকায়দায় পড়েছেন, কেবলমাত্র আপনার চির-
উপেক্ষিত পিঠখানাকে ঘুরিয়ে শত্রুর সামনে
ধরুন—ব্যস। আপনার গগ্নারচর্মের ঢাল যা
করতে পারেনি, আপনার স্বচর্ম-রচিত পিঠ
অনায়াসেই আপনাকে অজ্ঞাঘাত থেকে রক্ষা
করবে। কিন্তু মানুষই পিঠের এ মহিমা থাকতে
দিল না; বারংবার এপিঠ-ওপিঠ করতে গিয়ে
শান্তির দূত পিঠকে করে ফেলল আক্রমণের
মুখে একটা কামোফ্লেজ মাত্র। তখন থেকে শুধু

পৃষ্ঠপ্রদর্শন নয়, সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন না করে আর বাঁচোয়া নেই। তবু পিঠ আজো যতটা আঘাত সহ্য করে মানুষকে পলায়নের সুযোগ দিচ্ছে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত হয়ে নেহরুকে ততটা সুযোগ দিতে পারেনি।

অথচ, এই পিঠের নিকটতম প্রতিবেশী পেটের মতো ওর অত বড় শত্রু আর নেই। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—পেটে খেলে পিঠে সয়। এমন কথা কেউ বলে না যে পিঠ গদীয়ান থাকলে পেট উপোস সহ্য করবে; যেন পিঠের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজে উত্তম-মধ্যম হজম করে পেটকে উত্তম-মধ্যম হজম করার সুযোগ দেওয়া। সরকারি শ্রমসচিব যখন শ্রমিকদের কম মাইনে নিয়ে বেশি কাজ করতে বলেন, তখনো সেটা এত বড় পরিহাসের মতন শোনায় না। আসলে পিঠ বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে পড়ে থাকে; আমাদের নিজেদের চক্ষু কোনোদিন তার পরিচয় লাভ করতে পারে না। পিঠের এই হেনস্তার মূল হচ্ছে এই অন্তরালে বাস। যে-রত্ন উজ্জ্বলতম জ্যোতি ছড়িয়ে চিরকাল পড়ে রইল সমুদ্রের অতলে, যে-ফুল নির্জন বনভূমিকে চকিত করেই শুধু গন্ধ বিলিয়ে গেল—তাদের সঙ্গে তুলনা হয় এই অনাদৃত অঙ্গের। তাই তো আজীবনের অনুচর এই পিঠের স্থান মেলে না কোথাও, যেমন মেলে না লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক মিল্টন আর ক্রমওয়েলের।

ইংরেজি Patro☆ শব্দটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে পৃষ্ঠপোষক। এমন সুন্দর অনুবাদ বড় দেখা যায় না। Patron-দের সব কারবারই পেছনে, পিঠের দিক থেকে। কক্ষনো কোনো Patron-কে কোনো কাজের সামনে দেখা যায় না, তাঁদের যেটুকু পুষিয়ে নেওয়ার সেটুকু সবার পৃষ্ঠ থেকেই নিয়ে থাকেন। ওঁদের পেট-ro☆ না ‘পিঠ-ron’ বলাই বোধহয় উচিত হবে। অবশ্য নজর তাঁদের পেটের দিকেই: নিজের পেট মেদবহুল করবার এবং আপনার পেট ফাঁসাবার। যুগ যুগ ধরে এমনি অনাদৃত থাকার ফলে পিঠ আজ নিতান্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে। একটু পিঠ চাপড়ে কত সহজেই তাকে খুশি করা যায়, পিঠে খাইয়েও বোধহয় ততটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পিঠের অনাদরের দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। অনেকেই আজ বুঝতে পারছে পেটে খেয়ে পিঠে সওয়া আর বেশি দিন নয়। তাই

নেহরুকে দেখছি পিকিং সরকারকে তোয়াজ করতে উঠে পড়ে লাগতে, স্ট্যালিন সাহেবের মন রাখা কথা বলতে। কেন? না, পিঠ সামাল। মহাজনও যেন গতঃ স পস্থা। অতএব আমাদেরও পিঠ সামলাতে হচ্ছে। পিঠে ছুরি না পড়ে, সেদিকের সাথে আরো লক্ষ রাখতে হবে পিঠ চাপড়ানোর ফলে সহজে না গলে যাই; আমরা বাঙালিরা পিঠে লাঠিঘুষি সহিতেই এত অভ্যস্ত যে পিঠ চাপড়ানোতে বড় সহজেই বেড়ালের মতো ঘরঘর শব্দ করে চোখ বুজি; মহা-আনন্দে গেয়ে উঠি—রঘুপতি রাঘব রাজারাম। কিন্তু এবারে, ইলেকশন আসছে—পিঠ চাপড়ানোতে ভুললে অদূর ভবিষ্যতে পিঠে কুলো বেঁধেও কুলোবে না। শ্যাম-কুল দুই-ই যাবে। নারায়ণ দাশশর্মা: ভারতীয় লেখক। তাঁর এ সরস রচনাটি অচলপত্র তৃতীয় বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০২, ২০০৯

265) জিনিসপত্রের কথোপকথন

যন্ত্রপাতিও কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে। শুধু আমাদের শোনার মতো কান নেই বলে শুনতে পাই না। যন্ত্রপাতির সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক যুগ কাটিয়ে তাদের বলা কথাগুলো রস+আলোর পাঠকদের জন্য অনুবাদ করে দিচ্ছেন মহিউদ্দিন কাউসার, আঁকা সাদাতকম্পিউটার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির নাম কইরা গেমস খেলতাহেন? বড় মামু আইলে যদি বিচার না দিছি, তাইলে আমার হার্ডডিস্ক য্যান ক্র্যাশ মারে। আমার মাদারবোর্ডের কসম, না কইলে আমি বিল গেটসের বংশের না। এটিএম বুথ তুই প্রতিদিন ভেতরে ঢুকস ক্যা? তোর তো এটিএম কার্ডই নাই। মাইয়াগো কলেজ ছুটি অইলেই এই হানে দুইক্যা ভাব লস? যা বাইরা, আরেক দিন ভেতরে ঢুকলে কানসি বরাবর দুইডা থাবড় দিমু। ওয়াশিং মেশিন বস, শার্টে লিপস্টিকের দাগ নিয়া টেনশন লইয়েন না, এইটা আমি এমুন ফকফকা কইরা দিমু, ভাবিসাবে বুঝবই না। তয় গালের দাগটা কষ্ট কইরা নিজেই ধুইয়া আসেন। ওজন মেশিন মিটারে ৩০ কেজি ওজন কমছে দেইখ্যা খুশি অওনের কিছুই নাই! মিটার নষ্ট হইলেও

আপনের পাড়া খাইয়া আমি ঠিকই বুঝছি কত
মাংসে কত ওজন! নামেন মিয়া...! ক্যামেরা
মামা, উনারে মুখ বন্ধ করতে কন, দাঁত ছাড়া
তো কিছুই দেখতাই না। এইডা না হুনে
বুঝাইয়া কন, আমি ক্যামেরা, ডেন্টিস্ট নই। ফ্রিজ
চাচা, আমার ওপরের বাক্সে মাছ আর ডিম শর্ট
আছে, মনে কইরা নিয়া আইসেন। মাসের ৩০টা
দিন চাচিমায় বাজার লইয়া বগরবগর করে,
ঘটি-বাটি ছোড়াছুড়ি করে, আমার গায়েও
দুইবার পড়ছে...। এগুলান আর ভাল্লাগে না।

মোবাইল

অনেক হইছে। আর না। এবার অন্তত আমারে
কয়েক সেকেন্ড রেস্ট দেন। নইলে মনে লয়,
এর আগে কারে কারে কল মারছেন—সবই
আফারে কইতে অইব। ঘড়ি

ভাইগো, আমার গায়ের রং দেইখা খুশি হইছেন
বইলা আপনার লাইগ্যা মায়া উতলাইছে।

শোনে গো ভাই, আমি অইলাম জিজিরার মাল,
দোকানদার আসল কইয়া আপনরে ঠকাইছে।

তখন সব দেইখাও কিছু কইতে পারি নাই।

ব্যাটারি ছিল না, কেমনে কথা কই, কন। প্রিন্টার
স্যার, অফিস টাইমে রস+আলোর লাইগ্যা নকল
জোকস প্রিন্ট দিতে আইছেন? একটা অক্ষর
যদি ছাপত, তাও বুঝতাম। যান, জায়গায় গিয়া
কাম করেন, নইলে বস আইলে হাটে হটপট
ভাইঙ্গা দিমু। গ্যাসের চুলা

খালান্না, এই গরমের দিন অযথা আমারে
জ্বলাইয়া রাইখেন না। মোড়ে হাত পাইত্যা
বইয়া পড়েন, ম্যাচের কাঠি কিননের টাকাটা
জোগাড় অইয়া যাইব। পয়সা বেশি চাইলে
একটা গানও গাইয়েন, একটা টাকা দিয়া যান,
আমরা গরিব ইনসান...।

266) আরও কিছু ক্রমিক চরিত্র

ক্রমিক খুনি (সিরিয়াল কিলার) হিসেবে জনমনে
তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন রসু খাঁ। কিন্তু তাঁর
মতো আরও কিছু ক্রমিক চরিত্র সমাজে ক্রমিক
সমস্যা তৈরি করে চলেছে। তাদের নিয়ে
গবেষণা করেছেন খাদিজা ফাল্লুনী ক্রমিক কলার
শত ধমকেও এই কলারদের কিছু হয় না।
দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা ২৪ ঘণ্টায় যেকোনো
সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে এদের কল
আসতে পারে। মেয়েদের নম্বর পেলেই তারা
টুকে রাখে। তারপর ‘যা থাকে কপালে’ বলে

কল করে এবং মেয়েদের গলা শুনলেই ‘পাইছি
রে পাইছি’ বলে প্রবল উদ্যমে ন্যাকামো শুরু
করে। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তারা
দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে যে সে চাইলেই মেয়েটি
তার সঙ্গে গল্প করা শুরু করবে। কলরুক কিংবা
সিম না পাল্টানো পর্যন্ত তারা শান্ত হয়
না। ক্রমিক সিনেমা নির্মাতা
এই প্রকার চরিত্র বাংলা সিনেমা নির্মাতা জগতে
বেশি দেখা যায়। বিখ্যাত হওয়ার তীব্র আশা
এবং নিজের প্রতিভার অদম্য মানসিক চাপে
তারা সামাজিক অসংগতি রোধের তাড়নায়
সামাজিক অসংগতিপূর্ণ সিনেমা তৈরি করেন।
কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই সব অসংগতি রোধে
তারা ডায়ালগ-সর্বস্ব নর্তনকুর্দনে পারদর্শী
নায়ককে উপস্থাপন করেন। সঙ্গে থাকে
শীতকালেও নায়িকার বৃষ্টিভেজা নাচ। এই
প্রবণতায় আক্রান্ত হলে এঁদের থামানো খুব
মুশকিল হয়ে পড়ে। ক্রমিক ফেইলিয়র
‘ক্রমিক ফেইলিয়র’রা শুধু ফেলের পিলার স্থাপন
করে যান। ছাত্রজীবনে তারা বিষয়ভিত্তিক ফেল
করেন, এর মাত্রা গণিতে একটু বেশি থাকে।
তারা যেকোনো স্থানে সময়মতো পৌঁছাতে ব্যর্থ
হন, চাকরি পেতে ব্যর্থ হন, এমনকি প্রেমের
ক্ষেত্রে পছন্দের মানুষটি তাঁকে একসময় আঙ্কেল
ডেকে বসে! আজীবন তারা ব্যর্থ পুত্র, ব্যর্থ স্বামী
কিংবা ব্যর্থ পিতার খেতাব বয়ে বেড়ান। এই
ক্রমিক ব্যর্থতার স্বীকৃতিস্বরূপ তারা জীবনের
শেষ পর্যায়ে ‘এই জীবনের কোনো অর্থ নেই’
এই মহাজ্ঞান লাভ করেন। ক্রমিক ব্যর্থ প্রেমিক
ক্রমিক ব্যর্থ প্রেমিকেরা বাল্যকাল থেকেই
ক্রমিক প্রেম এবং ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা লাভ
করেন। শিশুকালেই বান্ধবীদের প্রতি তাঁদের
বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। কানামাছি
খেলায় সুন্দরী বান্ধবীদের পক্ষে তাঁদের
গলাবাজি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্কুলে বা
কলেজে সরাসরি প্রেমের ফিল্ডে প্রথম বলেই
তারা ক্লিন আউট হন। কিন্তু তারপরও তারা
‘একবার না পারিলে দেখা শতবার’ কিংবা ‘প্রেম
প্রতিবারই নতুন’ নীতি অবলম্বন করে প্রেমের
ভাঙাগড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ক্রমিক
সংগীতশিল্পী

‘সুর-যন্ত্রণা’ শব্দটি সম্ভবত তাঁদের দেখেই কেউ
আবিষ্কার করেছিলেন। অর্থহীন এবং অশ্লীল

কথার গান তাঁরা বেসুরে, বেতালে তীব্র নিষ্ঠায়
গেয়ে যান। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, নিজের
গাঁটের পয়সা খরচ করে হলেও তাঁরা সবাইকে
সেই গান শোনাতে চান। ক্যাসেট বের করেন
এবং প্রয়োজনে তা ফ্রি বিলি করেন। তাঁদের
বিচিত্র ভঙ্গিমায় এবং পোশাকে তোলা ছবি-সমৃদ্ধ
পোস্টার প্রায়ই পাবলিক টয়লেট, বাসস্ট্যান্ড
কিংবা ঝুপড়ি দোকানের বেড়ায় শোভা
পায়। ক্রমিক ভিলেন

আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি যে সিনেমা জগতে
ভিলেনরা ক্রমিকভাবে ভিলেনের চরিত্রেই
অভিনয় করে যান। বয়স কম থাকতে তাঁরা মূল
ভিলেনের ছেলের চরিত্রে জুনিয়র ভিলেনের
অভিনয় করেন। যুবক হলে রংবাজ, চাঁদাবাজ
দলের নেতা এবং বয়সকালে তাঁরা মূল
ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু
ভিলেনের ক্রমিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসার
ঘটনা খুবই দুর্লভ। যে কয়টি সিনেমায় তাঁরা
ভালো মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেন, সে
কয়টি সিনেমায় দর্শকেরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায়
থাকে, এই বুঝি একটা খারাপ কাজ করে
ফেলল! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর
০২, ২০০৯

267) রাগের চেইন রি-অ্যাকশন

গৃহকর্তার একটা সংজ্ঞা পেলাম সেদিন।
‘গৃহকর্তা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি ছোট ছোট
মুখের অন্ন জোগান আর নিয়মিত একটি বড়
মুখের ধমক খান।’ এই বড় মুখটা হচ্ছে
সংসারের আসল কর্ত্তী...অর্থাৎ গৃহিণী। এখন
কথা হচ্ছে, সেই গৃহিণীরা সব একযোগে ক্রমেই
রেগে উঠছেন...কেন রেগে উঠছেন, তার ব্যাখ্যায়
পরে যাই। তার আগে ওই রাগবিষয়ক একটি
চক্র উপস্থাপন করতে চাই। চক্রটা এ
রকম...অবশ্য চক্র উপস্থাপনের আগে একটা
বাংলা প্রবাদ জানা জরুরি, সেটা হচ্ছে ‘রাজা
চালায় রাজ্য আর রাজাকে চালায় রানি।’ তার
মানে, নেপথ্যের রানি মানে মতান্তরে ওই নারী
খুবই শক্তিশালী, বলাই বাহুল্য। এবার চক্রে
যাই...এক বিরাট অফিসের বিরাট বস। তিনি
তাঁর রানির মানে স্ত্রীর কঠিন ধমক খেলেন
একদিন। ধমক খেয়ে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে
গেল। তিনি অফিসে এসে সেই মেজাজ
ঝাড়লেন তাঁর সেক্রেটারির ওপর...‘কী কাজ

করেন ঘোড়ার ডিম, একটা লেটারে চৌদ্দটা ভুল।’ বসের ঝাড়ি খেয়ে সেক্রেটারির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে তার মেজাজ ঝাড়ল পিয়নের ওপর, ‘কী ঘোড়ার ডিমের চা দিস? এর চেয়ে বিষ খাওয়া ভালো।’ ঝাড়ি খেয়ে পিয়নেরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে তার মেজাজ ঝাড়ল অফিসের গেটের দারোয়ানের ওপর, ‘ঘোড়ার ডিমের ডিউটি করো, উল্টাপাল্টা লোক ঢোকে দেখো না?’ সামান্য পিয়নের ঝাড়ি খেয়ে দারোয়ানের মেজাজও গেল খারাপ হয়ে। সে তার পায়ের কাছে বসে থাকা নেড়ি-কুকুরটাকে দিল এক লাথি! লাথি খেয়ে নেড়ি-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পালাতে গিয়ে অফিসের দিকে আসা এক তরুণের ওপর গিয়ে পড়ল...তারপর ভাবাচ্যাকা খেয়ে ‘কুকুরের কাজ কুকুর করেছে...’ সেই থিওরিতে দিল বসিয়ে এক রাম কামড়। ঘটনাচক্রে সেই তরুণ ছিল সেই বসের ছেলে! ব্যস, হয়ে গেল...নাভির নিচে ততক্ষণাত্ চৌদ্দটা ইনজেকশন!

অর্থাৎ স্ত্রীর এক ধমকে রাগের এই চেইন রি-অ্যাকশন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, আমরা চান্ক্ষুষ দেখলাম! সে জন্যই বলছিলাম, গিন্নিরা এখন সব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন ক্রমেই...কারণ সেই ঘড়ির কাঁটা, যেটা উনিশে জুনে এক ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পেছাচ্ছে না বা পেছাবে না—এই মহান সত্য উদ্ঘাটন করে তাঁরা ক্রমেই ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠছেন...এখন যদি রাগের সেই চেইন রি-অ্যাকশন শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে? তাঁরা ফুঁসে উঠবেন না-ই বা কেন? বাচ্চাকে উঠতে হয় পাঁচটায়। কারণ স্কুলের গাড়ি আসবে ছটায়...আর এখন পাঁচটা মানে গভীর রাত। এই নিশি রাতে কে চায় নিজের বাচ্চাকে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে? অথচ ঘড়ির কাঁটা এগিয়েছিল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য...থাকবে না লোডশেডিং...আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে ঢাকা নগর...ইত্যাদি ইত্যাদি। বাকি কাহিনী সবারই জানা। এই যখন অবস্থা, তখন এক স্বামী (হয়তো স্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েই) গেল একজনের কাছে পরামর্শের জন্য!

কী করা যায় বলেন তো?

কী বিষয়ে?

এই যে শীতকাল এসে গেল, অথচ এখনো ঘড়ির কাঁটা আগের জায়গায় আনার কোনো

পরিকল্পনা কারও নেই! এই ভেজাল কীভাবে
দূর করা যায়?

মদ খান।

মানে?

মানে বলছি মদ্যপান শুরু করুন।

মদ্যপান শুরু করলে এই ভেজাল দূর হয়ে
যাবে?

অবশ্যই।

কীভাবে? মানে, বুঝলাম না!

এই যে আমাকে দেখছেন মদ খাই বলে এখন
সবকিছু দূরে চলে গেছে—স্ত্রী, সন্তান,
বাড়িঘর...সব....!

বি.দ্র.: ওপরের এই মাতালের কথায়

একেবারেই কান দেবেন না। মদ সর্বনাশ ডেকে
আনে। মাদককে না বলুন। আহসান হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০২,
২০০৯

268) বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে হাতি শক্তি দেশের চামচিকা সম্প্রদায়

হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া—এ
কথাতেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে একসময়
এদেশ ছিল হাতি-ঘোড়ায় পরিপূর্ণ। একদা
বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা এমনকি ভিক্ষাবৃত্তিতেও
ব্যবহার করা হতো বিশালাকৃতির জনপ্রিয় এই
প্রাণী। এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল জায়গাগুলো
আজও মনে করিয়ে দেয় বাংলাদেশে হাতির
গৌরবময় পদচারণের কথা। কিন্তু অত্যন্ত
দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমানে যান্ত্রিক
নগরায়ণের করাল গ্রাসে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে
পড়ায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের
হাতি। নিষ্ঠুর মানুষের হাতে জীবন দিতে হচ্ছে
তাদের। হাতির এই বিলুপ্তি দেশের চামচিকা
সম্প্রদায়ের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। হাতি
কাদায় পড়লে চামচিকা লাথি মারে—এ কথা
সবারই জানা। চামচিকা সম্প্রদায়ের এখন কী
হবে? হাতি না থাকলে তারা কাকে লাথি
মারবে? এ সম্পর্কে দেশের সুশীল সমাজের
কোনো ভাবনাই নেই। তাদের নীরব ভূমিকা
নিয়ে জনমনে আজ প্রশ্ন উঠেছে। কাদায় পড়া
হাতিদের লাথি মারার জন্য চামচিকারা গঠন
করেছে বিশেষ স্কোয়াড। অতি উন্নত প্রযুক্তির
প্রচলন করায় কোথাও কোনো হাতি কাদায়
পড়লে তারা খুব সহজেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে

অপারেশন চালায়। কিন্তু দ্রুতগতিতে হাতি কমতে থাকায় তাদের এই কার্যক্রম এখন হুমকির মুখে। পর্যাপ্তসংখ্যক হাতি না থাকায় বিশেষ স্কোয়াডের সদস্য চামচিকাদের আজকাল অলস সময় কাটাতে হয়। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করছে না। ফলে চামচিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ। তাই হাতি বাঁচাতে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও হাতি গবেষকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে অতিসত্বর হাতির বিলুপ্তি রোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিয়ে চামচিকাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০৯, ২০০৯

269) অব্যয়ামেষু

ঘুম থেকে উঠে একবার, আর স্কুল থেকে ফিরে এসে একবার, রোজই দিনে দুবার ব্যায়ামচর্চা করে হাবুল। ডন আর বৈঠক, বৈঠক আর ডন। পরেশবাবু নিজেই ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলেন—এ ছাড়া পার্কের চারদিকে অন্তত দু-চক্রর দৌড়ে আসবি হাবুল। দৌড় প্র্যাকটিস করলে শরীরে খুব উপকার হয়। দম বাড়ে, খিদেও বাড়ে; হজম হয় ভালো।

শুধু ডন আর বৈঠকের কৃপাতেই হাবুলের শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। যেমন খিদে, তেমনি হজম। গত বছরের তুলনায় এই বছরে প্রতি মাসে ১০ সের বেশি আটা আনতে হয়েছে। আগে ছোলা আনা হতো মাসে এক সের, এখন আনতে হয় ছয় সের।

হাবুলের মা বলেন—শুধু পিণ্ডি পিণ্ডি রুটি আর ছোলা খাবে, এই জন্যেই কি কসরত?

পরেশবাবু বলেন—খাক না, ছেলেটার স্বাস্থ্যটা তো দিন দিন ভালো হয়ে উঠছে।

সেই পরেশবাবুই সেদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভেতর চুপ করে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চৈঁচিয়ে উঠলেন—

বারান্দার ওদিকে ও রকম বিদ্রী ভোঁস ভোঁস করছিস কে রে?

হাবুল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমি, আমি এক্সারসাইজ করছি বাবা।

—তা এতক্ষণ ধরে কেন?

—তুমিই যে বলেছিলে বাবা। আজকাল ডন ৫০টা আর বৈঠক ১০০টা বাড়িয়েছি।

—না, না, আর বাড়াতে হবে না। বরং একটু কম কর।

—আচ্ছা বাবা।

—তা ছাড়া, পার্কে গিয়ে আর দৌড়াদৌড়ি করিস না।

হাবুলের মা শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যান। আর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন—কী হলো? আজ হঠাত্ ছেলেটার কসরত দেখে রাগ করছ যে? খেঁকিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।

—১৫ টাকা মাইনে কমেছে যে। অফিসের প্রত্যেকের মাইনে শতকরা ২০ কাট হয়েছে। হাবুলও পরেশবাবুর কথামতো ডন-বৈঠক কমিয়ে দেয় ঠিকই। সারা দিনের মধ্যে মোট ৩০টা ডন আর ৫০টা বৈঠক। পরেশবাবু বলেন—ব্যস, এই ঢের। এর চেয়ে বেশি দরকার নেই।

কিন্তু তবু দেখা যায়, হাবুলের খোরাক এক ছটাকও কমে না। রুটির স্তুপের দিকে তাকিয়ে হাবুল বলে—আরও অন্তত চার-পাঁচটা বেশি না হলে পেটে পোষাচ্ছে না মা।

পরেশবাবু বলেন—কেন রে? ডন-বৈঠক তো কমিয়ে দিয়েছিস, তবু তোর খোরাক যে বেড়েই চলেছে।

হাবুল—ডন-বৈঠক কমিয়েছি। কিন্তু মুগুর, ডাম্বেল ধরেছি যে।

—অ্যাঁ? চমকে ওঠেন পরেশবাবু। তার পরই গম্ভীর হয়ে বলেন, মুগুর আর ডাম্বেল পেলি কোথেকে?

—মানিকদা এক মাসের জন্য ধার দিয়েছেন। কিন্তু এক মাসও পার হয়নি। সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভেতর মেঝের ওপর অসাড় হয়ে শুয়ে রইলেন পরেশবাবু।

বারান্দার ওদিকে ভোঁস ভোঁস শব্দ শুনেই এক লাফ দিয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে গিয়ে হাবুলের হাত থেকে একটা মুগুর কেড়ে নিয়ে চেষ্টা করে উঠলেন—আজ তোরই দফারফা করে দেব। হাবুল আশ্চর্য হয়ে তাকায়। ভয় পেয়ে ছুটে আসেন হাবুলের মা। —কী হলো?

পরেশবাবু বলেন—ওকে তুমিই একটু বুঝিয়ে দাও।

হাবুলের মা—কী বুঝিয়ে দিতে বলছো?

পরেশবাবু—এক্সারসাইজ করতে নেই। শরীরের

হাড়-মাংসগুলোকে অসভ্য করে তুলে কোনো লাভ নেই। এক্সারসাইজ করলে মানুষ রান্ধস হয়ে যায়।

আস্তু আস্তু হেঁটে চলে গেলেন, আবার ঘরের ভেতর গিয়ে বসলেন পরেশবাবু। হাবুলের মা বলেন—এবার আসল কথাটি বলো তো কী হয়েছে?

—ছাঁটাইয়ের লিস্টে নাম চড়েছে। পরেশবাবু করুণ স্বরে বিড়বিড় করেন। সুবোধ ঘোষ: ভারতীয় লেখক।

জন্ম-১৯০৯, মৃত্যু-১৯৮০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০৯, ২০০৯

270) বাজারের নাম শেয়ারবাজার

ঘরে বসে সহজে টাকা কামানোর রাস্তা হিসেবে এখন সবাই ছুটছে শেয়ারবাজারে। গরম এই বাজারে যারা নামবেন নামবেন করছেন, তাঁদের জন্যই এবারের রস+আলোর রস মলাট শহরভর্তি বানর। বানরের যন্ত্রণায় টেকা দায়। সেই সময় শহরে এল এক আগন্তুক। এসেই ঘোষণা দিল, একেকটি বানর ধরে দেওয়ার জন্য দেওয়া হবে ১০ টাকা। কয়েক দিনের ভেতরই শহরবাসীর প্রধান কাজই হয়ে গেল বানর ধরা। বানর ধরে খাঁচায় পুরে ১০ টাকা করে নিয়ে বাড়ি ফিরল সবাই।

এরপর ঘোষণা এল, একটি বানরের জন্য এবার দেওয়া হবে ২০ টাকা। শহরবাসী আবার নেমে গেল বানর ধরতে। খুব বেশি পাওয়া গেল না, যা পাওয়া গেল তাতেও মুনাফা কম হলো না। এবার ঘোষণা এল, বানরপ্রতি ৩০ টাকা করে দেওয়া হবে। শহরবাসী আবার নামল বানর সংগ্রহে। অনেক কষ্ট করে এবার পাওয়া গেল কয়েকটা মাত্র।

ঘোষণা কিন্তু বন্ধ হলো না। আবার ঘোষণা হলো, এবার ধরে দিতে পারলে বানরপ্রতি দেওয়া হবে ৪০ টাকা। শহরের মানুষজন সবাই মিলে অনেক খুঁজেও একটার বেশি বানর পেল না। আগন্তুক তাতেও সন্তুষ্ট নয়। ঘোষণা দেওয়া হলো, এবার দেওয়া হবে ৫০ টাকা। এবার কেউ একটা বানরও ধরে দিতে পারল না। কিন্তু শহরবাসী খুঁজেই চলেছে। আর এই সুযোগে আগন্তুক কিছুদিনের জন্য তার এক সহকারীকে দায়িত্ব দিয়ে অন্য এক শহরে গেল।

আমাদের এই সহকারীর আবার কিঞ্চিৎ স্বভাবের দোষ আছে, আর শহরবাসীর আছে খানিকটা লোভ। দ্রুতই সে শহরবাসীর দলে ঢুকে গেল। প্রস্তাব দিল, খাঁচায় আটকে রাখা বানরগুলো সে ৩৫ টাকায় বিক্রি করে দিতে রাজি আছে। শহরবাসী ভাবল, ভালোই তো, ৩৫ টাকায় কিনে ৫০ টাকায় বিক্রি করা যাবে। গোপন চুক্তি অনুযায়ী, শহরবাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো সব বানর। কিন্তু সেই আগন্তুক আর ফিরে এল না, সহকারীও লাপাত্তা। শহর আবার ভরে গেল বানরে।

এটাই হচ্ছে আসলে শেয়ারবাজার। সবাইকে স্টক মার্কেটে স্বাগতম।

বাঙালি যেহেতু, এ কথা নিশ্চয়ই সবাই শুনেছেন—আজ যা বাংলা ভাবে, সারা বিশ্ব তা ভাববে আগামীকাল। কথাটা নতুন করে টের পাওয়া যায় এবারের বিশ্বমন্দার সময়।

বিশ্বমন্দায় ইন্টারনেটে ছড়িয়ে গেল একটা গল্প। যুক্তরাষ্ট্র নাকি নতুন এক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। তাতে ভবন, রাস্তাঘাট ঠিক থাকে, শুধু মানুষগুলোই উধাও হয়ে যায়। আর সেই মারণাস্ত্রের নাম শেয়ারবাজার।

বাংলাদেশ তো এই অস্ত্র আবিষ্কার করে বসে আছে সেই ১৯৯৬ সালেই। সেই যে ঘটিবাটি বিক্রি করে সবাই মতিঝিলের রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। তারপর কীভাবে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সর্বস্ব হারিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তাও নিশ্চয়ই সবার জানা। এরপর মনে হয় আর কাউকে বলে দিতে হবে না শেয়ারবাজার কী বা কাকে বলে।

এর পরও যাঁরা জানেন না, তাঁদের একটু বুঝিয়ে বলি। শেয়ারবাজার হলো এমন এক বাজার, যেখানে প্রতিদিন সকালে দুই দল মানুষ মিলিত হয়। এর মধ্যে একদলের থাকে অর্থ, আরেক দলের অভিজ্ঞতা। দিন শেষে তারা কেবল নিজেদের সম্পদ হাতবদল করে। যাদের অর্থ ছিল, তারা অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরে, আর অভিজ্ঞরা ফেরে অর্থ নিয়ে।

সুতরাং শেয়ারবাজারের প্রথম পাঠই হচ্ছে, অর্থ আয় করতে হলে অভিজ্ঞ হতে হবে। জানেন তো, শেয়ারবাজারে তিন ধরনের বিনিয়োগকারী থাকে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ বাজারের কিছুই জানে না। ১০ শতাংশ আছে, যারা কিছুটা

জানে। আর ৮০ শতাংশ জানে না যে তারা আসলে কিছুই জানে না। সুতরাং আপনাকে কিছু জানার দলে থাকতে হবে।

জানতে যাওয়ার হ্যাপাও কম নয়। এক নব্য বিনিয়োগকারী ভাবলেন তাঁকে কিছু জানতে হবে। চলে গেলেন এক ব্রোকারের বাসায়। ড্রয়িং রুমে বসে আছেন ব্রোকার ভদ্রলোকের অপেক্ষায়, রুমে ঢুকল ছয় বছরের এক ছেলে। তিনি কথা বলতে লাগলেন ছেলেটার সঙ্গে।

—তোমার বাবা কই? কী করেন তিনি?

—আমার বাবা মাছ ধরে।

একটু খাবি খেলেন তিনি। অবাক হয়ে বললেন, মাছ ধরে?

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে বলল, মাছই তো ধরে।

বাবার কাছে আপনার মতো লোকজন আসে, চলে যাওয়ার পর আমার বাবা মাকে বলে, আরও একটা বড় মাছ ধরলাম। ভালোই লাভ হবে।

সেই নব্য বিনিয়োগকারী ভদ্রলোক এই ব্রোকারের অপেক্ষায় আর ছিলেন কি না, তা অবশ্য জানা যায় না। নিউইয়র্ক শহরে একবার চরম ঠান্ডা পড়েছিল। ওয়াল স্ট্রিটের এক নামকরা ব্রোকারকে সে সময় নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একবার হাঁটতে দেখা যায়। ওই একবারই নাকি ব্রোকাররা নিজের পকেটে হাত দিয়েছিলেন, আর বাকি সময় তাঁদের হাত থাকে অন্যের পকেটে।

বাংলাদেশে অবশ্য সবাই যে হারে শেয়ারবাজারের দিকে ছুটছে, তাতে অন্যের পকেটে হাত দেওয়া ব্রোকারের ইন্ধনের প্রয়োজন হচ্ছে না। যা কিছু আছে বিক্রি করে সহজে বড়লোক হওয়ার আশায় ভিড় করছে শেয়ারবাজারে। কাজকর্মে মন নেই, চোখ সারান্ধণ স্টক মার্কেটের খবরের দিকে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট খুলে বসে থাকার লোকজন ক্রমেই বাড়ছে, তাও আবার জ্যামিতিক হারে। আর কেউ কেউ তো অফিসই করেন না।

বড় সাহেব অফিসে গিয়েই খবর দিলেন ক্যাশিয়ারকে। কিন্তু ক্যাশিয়ার সাহেব আর আসেন না। বারবার খবর দিয়েও পাওয়া গেল না। শেষে হাত কচলাতে কচলাতে অফিসের ম্যানেজার এসে জানালেন, ক্যাশিয়ার অফিসে

নেই, স্টক মার্কেটের দিকে গেছে।

—স্টক মার্কেটে কেন?

—তিনি তিন দিন ধরেই যাচ্ছেন, কিন্তু তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে আজই শেষ দিন।

—শেষ দিন কেন?

—না মানে, হিসাব মিলছে না তো, তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে শেয়ারবাজারে গেছে। আজও যদি টাকা নিয়ে এসে হিসাব মেলাতে না পারে তাহলে তো পুলিশকে খবর দিতেই হবে।

এই দেশটির মানুষের আয় কম। আয় আর ব্যয়ের হিসাব মেলে না। ফলে নানাভাবে এই হিসাব মেলাতে হয়। আর এই হিসাব মেলানোর নতুন জায়গা হয়েছে শেয়ারবাজার।

যারা নিয়মিত হিসাব মেলাতে যান এবং শত ভয় দেখালেও বাজার ছেড়ে যাবেন না, তাঁদের জন্য আরও তিনটি শিক্ষা। আমি নিজে দিলে কেউ মানবে না। তাই বিখ্যাত তিনজনের তিনটি কথা বলা যায়।

উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড নামের একজন মার্কিন ভদ্রলোক লিখেছিলেন, ‘ইনভেস্ট করার আগে ইনভেস্টিগেট করো।’

বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী বিনিয়োগগুরু ওয়ারেট বাফেট বলেছেন, ‘আমি কখনো স্টক মার্কেট থেকে অর্থ কামানোর কথা ভাবি না। আমি সব সময় ভাবি, যে শেয়ারটা কিনব সেটি পরদিনই বন্ধ হয়ে যাবে, আর পরের পাঁচ দিনেও লেনদেন হবে না।’

বার্নার্ড বারুখ নামের একজন মার্কিন বিনিয়োগকারী বলেছিলেন, ‘কখনো সর্বনিম্ন দামে শেয়ার কেনার চেষ্টা করো না, আর সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রির চেষ্টাও করো না।’ এতসব কথা কেন বললাম? অন্যকিছু ভাববেন না, জাস্ট একটু শেয়ার করলাম আর কি! শওকত হোসেন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০৯, ২০০৯

271) দাম্পত্য অভিযোগ

ওয়েবসাইট থেকে সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে সরকারের বিবাহ ও পরিবার অধিদপ্তরে পাওয়া দুটি অভিযোগপত্র সংগ্রহ করে লিখেছেন মুনাস ইকবালবরাবর, টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম

বিবাহ ও পরিবার অধিদপ্তর প্রসঙ্গ: ‘ওয়াইফ ১.০’

আন-ইনস্টল প্রসঙ্গে। জনাব,
আমি গভীর বিপদে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। অতিসম্প্রতি আমি আমার ‘গার্লফ্রেন্ড ৭.০’কে ‘ওয়াইফ ১.০’-এ আপগ্রেড করেছি। আর এর পর থেকেই আমার জীবনের সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। নতুন এ প্রোগ্রামটি অযথা ঝগড়া সৃষ্টিতে তৎপর ও প্রচুর স্পেস নিচ্ছে। কিন্তু প্রোডাক্ট ম্যানুয়ালে তো এসবের উল্লেখ ছিল না।

এ ছাড়াও ‘ওয়াইফ ১.০’ নিজে নিজে অন্য প্রোগ্রামেও ইনস্টল হয়ে সিস্টেমের অন্য কাজও মনিটর করছে। এ প্রোগ্রামটি ইনস্টলের পর আমার প্রিয় কিছু প্রোগ্রাম আর রান করছে না, যেমন, ‘আডা ২.৫’ ও ‘গলফ ৫.০’। প্রিয় এই প্রোগ্রামগুলো সিলেক্ট করলেই তা ক্র্যাশ করে। শুক্রবারের ‘খেলা ৬.৩’ অপারেট করা যাচ্ছে না কিন্তু ‘শপিং ৭.১’ দিব্যি চালু আছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে ‘ওয়াইফ ১.০’ প্রোগ্রাম রান করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি আন-ইনস্টলের চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু পারছি না।

অতএব, বিনীত আরজ এই যে, আমি আমার আগের ‘গার্লফ্রেন্ড ৭.০’ প্রোগ্রামে ফিরে যেতে চাই। এ ব্যাপারে সাহায্য কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক

অনিমেষজনার অনিমেষ

আপনি যে সমস্যার কথা বলছেন তা ‘ওয়াইফ ১.০’-এর একটি সাধারণ সমস্যা। অনেক পুরুষই ‘গার্লফ্রেন্ড ৭.০’ থেকে ‘ওয়াইফ ১.০’তে আপগ্রেড করেন এবং ভাবেন এটি একটি ইউটিলিটি ও এন্টারটেইনমেন্ট প্রোগ্রাম। কিন্তু ‘ওয়াইফ ১.০’ একটি অপারেটিং সিস্টেম।

আপনি চাইলেই ‘ওয়াইফ ১.০’ বাদ দিয়ে নতুন কোনো প্রোগ্রাম বা ‘গার্লফ্রেন্ড ৭.০’ ইনস্টল করতে পারবেন না। ‘ওয়াইফ ১.০’ বাদ দিয়ে অন্য অপারেটিং সিস্টেমও গার্লফ্রেন্ড ৭.০-এ চালাতে পারবে না। এ ছাড়াও একবারে ‘ওয়াইফ ১.০’ ইনস্টল করলে তা সম্পূর্ণভাবে আন-ইনস্টল, ডিলিট করা যায় না।

দুর্ভাগা কিছু পুরুষ চেষ্টা করেছিলেন ‘ওয়াইফ ১.০’কে ওভার রাইট করতে ও ‘গার্লফ্রেন্ড ৮.০’ বা ‘ওয়াইফ ২.০’ ইনস্টল করতে। কিন্তু তাঁরা সিস্টেমে আরও সমস্যার সৃষ্টি করছেন মাত্র। আমি নিজেও ‘ওয়াইফ ১.০’ প্রোগ্রামটি চালাই।

আমার পরামর্শ হলো, আপনি এ প্রোগ্রামটিই চালান। যখনই কোনো ভুল বা সমস্যা দেখা দেবে তখনই কিছু কমান্ড যেমন 'C:\\ আমি ক্ষমা চাচ্ছি' প্রোগ্রামটি রান করবেন। এই প্রোগ্রামটি হয়তো বেশ কিছুবার রান করতে হতে পারে। এতে হতাশ হবেন না।

'বউ ১.০' প্রোগ্রামটির মেইনটেন্যান্সও খুব ব্যয়বহুল। ভালো পারফরম্যান্স পেতে হলে আপনি কিছু বাড়তি সফটওয়্যার কেনার চিন্তা করতে পারেন। যেমন, 'ফুল ২.০', 'চকলেট ৫.০' ও 'গয়না ১১.৫'। আশা করি আমার এ পরামর্শগুলো কাজে লাগবে।

ইতি

টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম

বিবাহ ও পরিবার অধিদপ্তর। বরাবর,

টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম

বিবাহ ও পরিবার অধিদপ্তর প্রসঙ্গ: 'হাজব্যান্ড

১.০' সংক্রান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে। জনাব,

গত বছরই আমি 'প্রেমিক ৫.০' থেকে 'স্বামী

১.০'-এ আপগ্রেডেড হয়েছি। কিন্তু এখন মনে

হচ্ছে, ভুল হয়েছে। কারণ ফুল, চাইনিজ খাবার

ও গয়নার অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখন তেমন রান

করে না। কিন্তু 'প্রেমিক ৫.০' প্রোগ্রামে যা না

চাইতেই রান করত। 'স্বামী ১.০'-এর

পারফরম্যান্সে আমি হতাশ।

এ ছাড়াও 'স্বামী ১.০' বেশ কিছু প্রিয় প্রোগ্রামকে

'ডিজেল' করে ফেলেছে, যেমন, 'ভালোবাসা-

রোমান্স ৯.৯', 'গল্প ৮.০'। যেখানে নতুন কিছু

অপ্রিয় প্রোগ্রাম ইনস্টল হয়েছে, যেমন, 'আড্ডা

২.৫' ও 'খেলা ৩.০'। আমি যখনই 'ঘর পরিষ্কার

২.৬' কমান্ড দিই, তখন সিস্টেম পুরোপুরি ক্রাশ

করে।

আমি 'স্বামী ১.০' নিয়ে বেশ বিপদেই পড়েছি।

রোজ রোজ 'ঝগড়া ৫.৩' চালাতে আর ভালো

লাগে না।

অতএব, আমার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা

সাপেক্ষে অনুগ্রহ করে জানাবেন আমি কী

করতে পারি।

বিনীত নিবেদক

তানজিনা ইমতিয়াজপ্রিয় তানজিনা,

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'প্রেমিক ৫.০' ছিল

একটি বিনোদন প্যাকেজ, কিন্তু 'স্বামী ১.০' হলো

পুরোপুরি একটি অপারেটিং সিস্টেম। আপনার

Website: <http://facebook.com/tanbir.cox>

সমস্যার কথা শুনে আমাদের পরামর্শ হলো, মাঝেমধ্যেই 'C:\\\আমি মনে করেছিলাম তুমি আমাকে ভালোবাস' কমান্ডটি রান করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কান্না ৬.২' ইনস্টল করবেন। 'স্বামী ১.০' তখন নিজে থেকেই 'অনুতপ্ত ৩.৩' ও 'ভালোবাসা ২.৭' রান করবে বলে আশা করা যায়।

সাবধানতা: C:\\\ কমান্ড ও 'কান্না ৬.২' অতি ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তখন দেখা যাবে 'স্বামী ১.০' ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু প্রোগ্রাম রান করতে শুরু করেছে; যেমন- 'চুপ থাকা ২.৫', ও 'মাদক ৬.২'। মনে রাখবেন অতিরিক্ত 'মাদক ৬.২' ব্যবহারে সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সাইড ইফেক্ট হিসেবে রাতে 'উচ্চ নাক ডাকা .wav' ফাইল তৈরি হবে। কখনো 'শাশুড়ি ১.৫' বা আরেকটি প্রেমিক প্রোগ্রাম রান করার চেষ্টা করবেন না। এসব কারণে 'স্বামী ১.০' ব্যাকগ্রাউন্ডে 'প্রেমিকা ৯.২' রান করতে পারে, যা কিনা সিস্টেমে ভয়াবহ ভাইরাস সংগরণ করতে পারে।

অপারেট করতে পারলে 'স্বামী ১.০' খুবই চমৎকার একটি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স পেতে মাঝেমধ্যেই আপনি 'রূপচর্চা ৮.৩', 'মিষ্টিকথা ২.৭', 'রান্না ৬.৮' প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে পারেন। আশা করি এতে ভালো ফল পাবেন।

ইতি

টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ০৯, ২০০৯

272) গালি যখন শিল্প

ক্রিকেট নাকি ভদ্রলোকের খেলা! যে ভদ্রলোক এই অমৃতবচন জন্ম দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। কারণ হাল আমলে ক্রিকেট মাঠে হররোজ যেসব কাণ্ডকারখানার জন্ম হচ্ছে, তাতে স্বর্গে বসে ওই ভদ্রলোক নিশ্চয় মাথার চুল ছিঁড়ছেন রাগে-ক্ষোভে-হতাশায়। তবে মাঠে ব্যাট-বলের পাশাপাশি দুই পক্ষের কথার লড়াইটাও কিন্তু ক্রিকেটের ইতিহাসের মতোই শতবর্ষী পুরোনো। কেতাবি ভাষায় যেটিকে বলে 'স্লেজিং'। আর যে স্লেজিংয়ের জুতসই সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জনৈক ক্রিকেটবোদ্ধা বলেছেন, 'অস্ট্রেলীয়রা যাহা বলে

তাহাই স্লেজিং!’ তার মানে কি অস্ট্রেলীয়দের মুখে সব সময় খিস্তিখেউরের তুবড়ি ছোটো? ওই বোদ্ধার জবাব, ‘না, তা কেন। অনেক সময় তারা ভালো ভালো কথাও বলে।’ কখন? ‘যখন তাদের মুখ বন্ধ থাকে!’

তার মানে কিন্তু এই না, অস্ট্রেলীয়রাই স্লেজিংয়ের জন্মদাতা। বিশ্ব ক্রিকেটের মতো এই জায়গাতেও তারা চ্যাম্পিয়ন—এই যা। আসলে আধুনিক ক্রিকেটের জনক ডব্লিউ জি গ্রেস সেই আদিকালে ক্রিকেটের বেশ কিছু স্মরণীয় স্লেজিংয়ের জন্ম দিয়ে গেছেন। যেগুলোকে চুটকি বলাই ভালো। একবার তো ডাক্তার গ্রেস নাকি বোল্ড হওয়ার পর আম্পায়ারের দিকে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আসলে ঝোড়ো বাতাসে বেল পড়ে গেছে।’ প্রত্যুত্তরে ওই আম্পায়ার বলেছিলেন, ‘আশা করি বাতাসটি আরেকটু ঝোড়ো গতি পেয়ে ডাক্তার সাহেবকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।’ আরেকবার গ্রেস গেছেন গ্রামে খেলতে।

সেখানকার এক অখ্যাত বোলার একেবারে প্রথম বলে আউট করে দিল গ্রেসকে! কিন্তু তিনি হাল ছাড়বেন কেন? ‘ট্রায়াল বল হিসেবে প্রথম বলটা ভালোই করেছ বাছা। বেশ তবে, এবার শুরু হোক আসল খেলা’ বলে আবারও গিয়ে দাঁড়ালেন উইকেটে!

আউট হতে একেবারেই ইচ্ছে করত না গ্রেসের। আম্পায়াররাও বোধহয় তাঁর এই ইচ্ছেটাকে সম্মান করতেন। ১৮৯৮ সালের এক ম্যাচে গ্রেসের বিপক্ষে একাধিকবার এলবিডব্লিউর আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলেন ফাস্ট বোলার চার্লস কোর্টনাইট। শেষে রেগেমেগে একেবারে দুটো স্ট্যাম্পই দিলেন উপড়ে। বোল্ড! এরপর গ্রেসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘ডক্, তুমি এবারও নিশ্চয়ই মাঠ ছাড়বে না। একটা স্ট্যাম্প তো এখনো দাঁড়িয়েই আছে, নাকি?’ আউট না হতে চাওয়ার পরিষ্কার যুক্তি ছিল গ্রেসের। ‘লোকে গাঁটের টাকা খরচ করে আমার ব্যাটিং দেখতে এসেছে, তোমার বোলিং নয়’—বোলারের উদ্দেশ্যে এই ছিল তাঁর বাণী!

কিন্তু স্লেজিং এমন নির্দোষ চটুল বাক্যবিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অস্ট্রেলীয়রা সেটিকে নিয়ে গেছে শিল্পের পর্যায়ে। সেই কাহিনী বিশদ-বৃত্তান্ত

লিখতে গেলে কয়েক দিস্তা কাগজ দরকার।
তার ওপর এর অধিকাংশ ছাপার অক্ষরে
প্রকাশযোগ্য নয়। পাছে আপনারাই আমাকে মন্দ
লোক ঠাওরে বসবেন।

তার পরও ঘষেমেজে, সেন্সর করে, কয়েকটি
ভদ্রগোছের স্লেজিং পরিবেশন করার লোভ
সামলাতে পারছি না। এক অ্যাশেজের ঘটনা।
ব্যাট করতে এসেছেন ইয়ান বোথাম। রড মার্শ
এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ‘স্বাগত’ জানালেন, ‘হাই
ইয়ান, তোমার বউ আর আমার বাচ্চারা কেমন
আছে?’ বোথামের জবাব, ‘বউ ভালোই আছে।
কিন্তু বাচ্চারা সব বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে
দেখছি!’ পরের এই গল্পটাতেও বোথাম আছেন।
এখন যেমন কোনো দল পাকিস্তান সফরে রাজি
হচ্ছে না, তেমনি নিরাপত্তা শঙ্কায় আগেও
ভুগেছে দলগুলো। আশির দশকে পাকিস্তান
সফর থেকে ফেরার পর বোথাম তো ঘোষণাই
দিয়ে দিলেন, ‘পাকিস্তান এমন একটা দেশ,
যেখানে আপনি আপনার শাশুড়িকে পাঠিয়ে
দিতে পারেন।’ ইঙ্গিত পরিষ্কার, ব্রিটিশদের
জামাই-শাশুড়ির চিরায়ত দ্বন্দ্ব দিয়ে পাকিস্তানের
পরিস্থিতি বোঝানো। সেটা ভালোই বুঝেছিলেন
পাকিস্তানের আমির সোহেল। প্রতিশোধ
নিয়েছিলেন ১৯৯২ বিশ্বকাপের ফাইনালে।
প্রতিটা রানের জন্য যুঝতে থাকা বোথামকে
গিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমার বদলে তোমার
শাশুড়িকে ব্যাট করতে পাঠাও। নিশ্চয় তিনি
তোমার চেয়ে ভালো করবেন।’

পরের এই ঘটনার নায়ক গ্লেন ম্যাকগ্রা আর
জিম্বাবুয়ের ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান এডো ব্র্যাভেন্স।
ম্যাকগ্রার বল কিছুতেই ব্যাটে লাগাতে
পারছিলেন না ব্র্যাভেন্স। কিন্তু আউটও হচ্ছিলেন
না। অধৈর্য হয়ে ম্যাকগ্রা ধীর পায়ে এগিয়ে
গেলেন ব্র্যাভেন্সের দিকে, ‘এডো, তুই কেন এত
মোটা?’ ব্র্যাভেন্সের উত্তর, ‘হব না, যতবার
তোমার স্ত্রীর কাছে যাই, ততবারই ও আমাকে
যে বিস্কুট খেতে দেয়।’

শরীরের আকার-আকৃতি নিয়ে খোঁচা দেওয়ার
বেশ কয়েকটা গল্প আছে ক্রিকেটে। ১৯৯১
সালের অ্যাডিলেড টেস্টে মার্ক হিউজকে ‘মোটকু
বাস কন্ডাক্টর’ বলেছিলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ।
সম্বোধনটা হিউজের পছন্দ হয়নি। তাঁর বলেই
মিয়াঁদাদ আউট হওয়ার পর হিউজ বড়েমিয়াঁর

গতিরোধ করে দাঁড়ান। এক হাত পেতে দিয়ে বলে ওঠেন, ‘টিকিট, প্লিজ!’

ফাস্ট বোলাররা তাঁদের বলের গতির মতোই উগ্র মেজাজের হয় বলে অধিকাংশ স্লেজিংয়ের জোগান তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

আবার ফাস্ট বোলারদের খোঁচা দেওয়ার

সবচেয়ে মোক্ষম জায়গা হলো তাঁদের বলের গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা। বিশ্বের অন্যতম

দ্রুতগতির বোলার ব্রেট লিকে একবার

ইনজামাম-উল হক কী বলেছিলেন জানেন?

বলেছিলেন, ‘অফ স্পিন করা বাদ দাও।’

শুধু ফাস্ট বোলার নয়, শেন ওয়ার্নের মতো

স্পিনারকে নিয়েও প্রচুর গল্প ছড়িয়ে আছে।

সেটার রসদ এত অফুরান, এ নিয়ে পুরো

একটা কেছাই হবে রস+আলোর অন্য কোনো

সংখ্যায়। কিন্তু হঠাৎ স্লেজিং নিয়ে মগ্ন হওয়া

কেন? কারণ ব্রেট লির সাম্প্রতিক একটা মন্তব্য,

অস্ট্রেলীয়রা নাকি আর স্লেজিং করে না!

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের শ্রীমুখ থেকে নাকি

আর কোনো বিশ্রী বাক্য বের হতে শুনবে না

কেউ! কী বলবেন একে? ভূতের মুখে রাম নাম

নাকি ব্যাণ্ডের সর্দি? রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৬, ২০০৯

273) ঠকানো প্রশ্ন

গণেশ দাদা বললেন, ‘একটা গোরুর গলায় দশ

হাত লম্বা মোটা দড়ি বাঁধা। সেখান থেকে পঁচিশ

হাত দূরে এক আঁটি ঘাস আছে। কেউ ঘাস

এগিয়ে দিল না, দড়ি ছিঁড়তে হলো না, অথচ

গোরু অনায়াসে সেই ঘাস খেয়ে ফেলল। বল

তো, এটা কী করে সম্ভব হয়?’ দামু বলল,

‘বুঝেছি। খুব হাওয়া হলো আর ঘাস উড়ে এসে

পড়ল।’ গণেশদা বললেন, ‘তাহলেই তো এগিয়ে

দেওয়া হলো।’ গদাই অনেক ভেবে বলল, ‘এ

রকম হতেই পারে না।’ গণেশদা বললেন, ‘কেন

হবে না? গোরুর গলায় দড়ি বাঁধা বলেছি,

দড়িটা যে খোঁটায় বাঁধা তা তো আর বলিনি—

দড়িটা আলগাই ছিল।’ তা শুনে সকলে বলল,

‘এটা নেহাত ফাঁকি হলো।’

তখন মতিলাল বলল, ‘দুটো গাধা ছিল—তাদের

ভয়ানক জেদ। খাওয়াবার সময় একটা

পশ্চিমমুখো আরেকটা পূর্বমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল—ঠেললে সরবে না, মারলে নড়বে না।

এখন একটা বালতিতে করে দুটোকে একসঙ্গে

খড় খাওয়াতে হবে। কী করা যায়? করা যা হলো তা কিছুই কঠিন নয়, অথচ গাধা দুটো যেমন উল্টো দিকে মুখ করে ছিল ঠিক তেমনিই রইল।' দামু বলল, 'ওটা আমি জানি।' আর সবাই বলল, 'জানিস তো চুপ করে থাক না। আমাদের ভাবতে দে।' তারা ভাবছে, সেই সঙ্গে তোমরাও একটু ভেবে নেও।

যা হোক, এটাতে সকলকে ঠকানো গেল না। তখন বিপিন বলল, "আমি একটা কৌশলের ধাঁধা জানি। এক সুলতান, আট হাত লম্বা, আট হাত চওড়া একখানা শতরঞ্জি বিছিয়ে, তার ওপর ঠিক মধ্যখানে একটা হীরের কৌটা রেখে বললেন, 'ঐ শতরঞ্জি না মাড়িয়ে কিংবা তার ওপরে হাত, পা বা শরীরের কোনো রকম ভর না দিয়ে, আর লাঠি, দড়ি বা কোনো যন্ত্রের বা অন্য লোকের সাহায্য না নিয়ে, যে পারো, সে কৌটাটি নেও।' কত ওস্তাদ ডব্বীর এসে কত রকম কসরত করে নেবার চেষ্টা করল, কত ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা লোক এসে কত রকম কায়দা করে, ঝুঁকে পড়ে, সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। শেষটায় একটা বেঁটে, রোগা লোক এসে চটপট অতি সহজে কৌটাটাকে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল। বল তো কী রকম করে হলো?"

গোপাল মামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ভারি তো বললি! এই যে শরবতের গেলাস দেখছিস, এটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখ; আমি ধামায় হাত দেব না, তুলব না, অথচ শরবত খেয়ে ফেলব।' তখন সকলে ছুটোছুটি করে একটা ধামা এনে গেলাসটাকে চাপা দিয়ে তামাশা দেখতে বসল। মামা তখন মাথায় চাদর ঢেকে ধামার কাছে বসে খানিকক্ষণ ঢকঢক শব্দ করে বললেন, 'বাস! শরবতের দফা শেষ।' সবাই বলল, 'কই দেখি।' বলে যেই তারা ধামা তুলেছে, অমনি মামা খপ করে গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ করে শরবত খেয়ে বললেন, 'কেমন! ধামা ধরলাম না, ছুঁলাম না, শরবত খেয়ে ফেললাম! হলো তো?' ঠকানো প্রশ্নের উত্তর

গাধা দুইটি মুখোমুখিই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহলে একটার মুখ পূর্ব দিকে থাকিলে আর একটার মুখ তাহার উল্টা, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে থাকিবে। এখন দুই জনের মাঝখানে মুখের নিচে

খাবারের বালতি বসাইলেই দুইজনে এক সঙ্গে খাইতে পারে।

শতরঞ্জির উপর হইতে কৌটা সরাইবার কৌশলটিও খুব সহজ। শতরঞ্জির উপর ভর না দিয়া তাহার উপর হাত-পা না রাখিয়া তাহাকে গুটাইয়া ফেলা যায়; আর একদিকে খানিকটা গুটাইলেই কৌটাটি উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়। সুকুমার রায়: শিশুসাহিত্যিক। জন্ম: ১৮৮৭, মৃত্যু: ১৯২৩।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৬, ২০০৯

274) বিশেষজ্ঞ

আমি খুব খেয়াল করে দেখেছি, খাবার টেবিলের আলোচনাগুলো সব সময় খুব ফলপ্রসূ হয়। না হয়ে উপায় কী! টেবিলে কী সুন্দর সাজানো থাকে কলা, পেঁপেসহ আরও কত ফল! আর এ জন্যই পড়ার টেবিলের চেয়ে খাবার টেবিল আমার এত ভালো লাগে। এই যে এখন বাসার সবাই খাবার টেবিলে বসে ‘আসন্ন কোরবানি এবং আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা করছি, আমার ধারণা এটাও ফলপ্রসূ হবে।

প্রধান বক্তা বাবা তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, তোমরা জানো, ঈদের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। আমাদের প্রতিবেশীরা গরু-ছাগল কিনলেও আমরা এখনো কিনি নাই। কারণ, আমরা ধীরে বহে মেঘনা নীতিতে বিশ্বাসী। তাড়াহুড়া করলে কোনো কাজে কামিয়ার হওয়া যায় না। গরু কেনাটা হেলাফেলার জিনিস না। এর জন্য প্রচুর হোমওয়ার্কের প্রয়োজন। এরই মধ্যে আমাদের পর্যবেক্ষক টিম বিভিন্ন হাট দেখে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্ট দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে গরুর দাম অত্যন্ত বেশি। গরু জবাইয়ের আগে ব্যাপারিরা ক্রেতাদের একেবারে জবাই দিয়ে দিচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে আমরা বেশ সতর্ক। এখন

গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কোন রঙের গরু কিনব। এতক্ষণ কেউ কথা বলার সুযোগ পায়নি, তাই ফ্লোর পেয়েই আমি সবার আগে বলে উঠলাম, আমাদের অবশ্যই স্মার্ট-ফ্যাশনেবল একটা গরু কেনা উচিত। সে ক্ষেত্রে কালোই বেস্ট। আপা বলল, অসম্ভব। কালো রং অশুভ। কালো গরু কেনার কোনো মানেই হয় না। লাল গরু কিনতে হবে। লাল রংটা খুবই সুইট।

আপা বলল, অসম্ভব। কালো রং অশুভ। কালো গরু কেনার কোনো মানেই হয় না। লাল গরু কিনতে হবে। লাল রংটা খুবই সুইট।

আপা বলল, অসম্ভব। কালো রং অশুভ। কালো গরু কেনার কোনো মানেই হয় না। লাল গরু কিনতে হবে। লাল রংটা খুবই সুইট।

দেখ আপা, তুই কিন্তু বর্ণবৈষম্য করছিস। রং আবার সুইট হয় কী করে? তুই কি রং খেয়ে দেখেছিস নাকি? তা ছাড়া বাবার ডায়াবেটিস। তুই কোন সাহসে তার সামনে ‘সুইট’ শব্দটা উচ্চারণ করলি?

খামোশ! বাবা ধমকে উঠলেন, লাল-কালো দুটোই বাদ। সাদা গরু কেনা হবে। সাদা শান্তির প্রতীক। আমাদের পুরো দেশেই শান্তির অভাব।

রান্নাঘর থেকে কাজের ছেলে রফিক বলল, খালুজান, সাদা কালারটা তো দুই দিনেই ময়লা হইয়া যাইব।

বাবা চোখ পাকিয়ে বললেন, ছাগলটা বলে কী? ওকে হাটে নিয়ে গেলে তো ভালো দামে বিক্রি করা যাবে! তোমরা সবাই শোনো। গরু কেনার প্রস্তুতি শেষ। আমার এক বন্ধু বিশিষ্ট গবাদিপশু বিশেষজ্ঞ, ওকে সঙ্গে নিচ্ছি। আশা করছি ১৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা কাজীকৃত গরুটা কিনে বাসায় এসে চা খেতে পারব।

আমি বললাম, বাবা, আমার এক বডিবিন্ডার বন্ধু আছে, ওকেও আসতে বলি।

কেন? বডিবিন্ডার দিয়ে কী হবে?

গরুটা টেনে বাড়ি পর্যন্ত আনতে হবে না?

শক্তিশালী একজন থাকলে ভালো।

কোনো প্রয়োজন নেই। ট্রাকে করে গরু আনা হবে। ওপরে শামিয়ানা থাকবে, যাতে গরুর কোনো কষ্ট না হয়।

বাহ! চমৎকার। আমি বাসের বদলে সিএনজিতে যেতে চাইলেই তোমার প্রেশার হাই হয়, আর গরুর জন্য ট্রাক-শামিয়ানা! এক কাজ করো, এসি গাড়ির ব্যবস্থা করো। আর ‘কসাইয়ের শহর’ আমেরিকার শিকাগো থেকে চারজন কসাই নিয়ে আসো। ঈদ হোক ঝামেলামুক্ত! এক চড় দিয়ে তোর দাঁত ফেলে দেব বেয়াদব! মারব এখানে, দাঁত পড়বে বাথরুমে। আমার সঙ্গে বেয়াদবি? যা এখান থেকে।

আপা বলল, খুব ভালো হয়েছে, চড় দিলে না কেন, বাবা? ওর মতো ছেলেকে রুটিন করে চড় দেওয়া উচিত। আমি কি রুটিন করে দেব? তুইও দূর হ! পুরো বাড়িটাই গরু-ছাগলের হাট হয়ে যাচ্ছে।

সকালে আমরা গরু কিনতে হাটে প্রবেশ করলাম। নারী কোটায় আপা বাদ পড়ে যাওয়ায়

আমি খুবই আনন্দিত। কিন্তু বাবার বিশেষজ্ঞ বন্ধু বারবার আমার দিকে কেন তাকাচ্ছে তা বুঝলাম না। তার তাকানোর কথা গরুর দিকে। আমার চেহারা বোকা ভাব থাকতে পারে কিন্তু গরুর সঙ্গে কোনো মিল থাকার কথা না। তবে আমার দিকে বারবার তাকানোর কারণেই উনি গোবরে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি হাসি চেপে বললাম, চাচা আপনার গায়ে গোবর লেগেছে।

বাবা ধমকে উঠলেন, গরুর হাটে গোবর লাগবে না তো কি রসগোল্লা সারা লাগবে? রামছাগল! চাচা বললেন, এইটা কোনো ব্যাপারই না! ভাতিজা, তুমি মোবাইলে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখো। আর ১০ মিনিটের মধ্যে গরু কেনা হবে।

১০ মিনিট হয়ে গেল ২ ঘণ্টা, পুরো হাট একবার চক্কর দেওয়া শেষ, কিন্তু গরু কেনা হলো না। কোনো গরুই তার পারফরম্যান্স দিয়ে চাচাকে খুশি করতে পারে না। চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই দেশের কী যে হবে! একটা পারফেক্ট গরু পেলাম না। হাটতে হাটতে যখন বাবার ভুঁড়িটা তিন ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গেল, তখন হঠাৎ একটা গরু ভালো লাগল চাচার। তিনি গরুটার মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁত দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বাহ, কী সুন্দর শান্ত-নিরীহ গরু! মারে না তো দুসঢাস। একদম ঠান্ডা। তার কথাটা মনে হয় গরুর আত্মসম্মানে লাগল। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ধাক্কা দিল যে চাচা চলে গেলেন আমাদের সীমানার বাইরে। আমরা দ্রুত তাঁকে ধরে ওঠালাম, তিনি হাসার চেষ্টা করে বললেন, এটা কোনো ব্যাপারই না। শুধু কোমরটা বোধহয় গেছে।

বাবা বললেন, থাক। আজ আর ঘুরে কাজ নেই। পরে আবার আসব। এখনো তো চার-পাঁচ দিন সময় আছে। কী বলিস? আর তোর ওই বডিবিন্ডার বন্ধুটাকেও নিয়ে আসিস। সবাই মিলে গরু কেনার মাজেজাই অন্য রকম। পারবি না?

পারব না কেন? এটা কোনো ব্যাপারই না! আমি হাসিমুখে বললাম। আঙ্কেলের মুখটা একটু মলিন দেখাল। হয়তো কোমরের ব্যথাই এর মূল কারণ। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩,
২০০৯

275) বাসরঘরে শ্রুতিশ্রবের বিড়াল!

বাবা মৃত্যুশয্যায়। পুত্রকে ডেকে পাঠালেন।

—বাবা, ডেকেছ?

—হ্যাঁ, আমার ডাক এসে গেছে, যাওয়ার আগে
একটা শেষ উপদেশ দিতে চাই।

—বাবা, সারা জীবন তোমার উপদেশ শুনে
এসেছি। শেষ বেলায় এসে আর বিয়ে করতে
নিষেধ কোরো না। মলিকে আমি কথা দিয়ে
ফেলেছি।

—না না, আমি এতটা অবিবেচক বাবা নই।
আমি আধুনিক যুগের বাবা, তবে... তবে একটা
অনাধুনিক উপদেশ দিতে চাই...।

—কী?

—আগের যুগে সবাই বাসর রাতে বিড়াল বধ
করত... এ কাজটা আমি না করে বিরাট ভুল
করেছিলাম...।

—করোনি কেন?

—আসলে করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে
বিড়ালটি ছুটে পালিয়ে যায়। সেই জন্য
বলছিলাম, অন্তত দুইটা বিড়াল রাখবে। একটা
ছুটে গেলে আরেকটা... এটাই আমার শেষ
উপদেশ... আশা করি তাহলে বাকি জীবন সুখে
থাকতে পারবে! বলে বাবা চোখ বুজলেন। পুত্র
একবার ভাবল, পিতার শেষ নিঃশ্বাস পতনে
হাউমাউ খাউ করে কেঁদে উঠবে, তা না করে
পকেট থেকে মোবাইল বের করে মলিকে ফোন
দিল।

আমাদের গল্পের সদ্য পিতৃহারা পুত্রের নাম ধরা
যাক জগলুল, জগলুল হায়দার। সে
পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। ইচ্ছে ছিল ভালো রেজাল্ট
করে বড় বিজ্ঞানী হবে, সে সম্ভাবনার চিটাগুড়ে
কক্সবাজার সি বিচের বালি ফেলে সে এখন
একটা প্রাইভেট ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। বন্ধুরা
তাকে তার চাকরি নিয়ে ঠাট্টা করে বলে, ‘তুই
একটা অপদার্থ, নইলে পদার্থবিজ্ঞান পড়ে
ব্যাংকের ক্যাশিয়ার? এর চেয়ে বাপের হোটেলে
বেকার ম্যাসিয়ার ছিলি, সেটাই বরং ভালো
ছিল!’ বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাশায় কান না দিয়ে সদ্য
পিতৃহারা পুত্র জগলুল এবার সংসারের দিকে
মন দিল। মলিকে বিয়ে করল। তবে বাবার
শেষ উপদেশ পালনের সিদ্ধান্তও নিল। যদিও

মলির সঙ্গে তার টানা চার বছরের ক্রমিক প্রেম! বাসর রাত। দক্ষিণের জানালা হাট করে খোলা। নতুন বাড়ি বলে গিল লাগানো হয়নি এখনো। হু হু করে বাতাস ঢুকছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। খুবই রোমান্টিক পরিবেশ।

—খাটের নিচে একটা বাক্স দেখছি। নববধূ মলি বলে।

—হুঁ

—কিসের বাক্স? আবার দড়ি দিয়ে বাঁধা।

—ইয়ে মানে ও কিছু না... একটা একটা...

জগলুল ইতস্তত করে!

—একটা?

—একটা না দুটা

—দুটা কী?

—দুটা বিড়াল।

—বাক্সের ভেতর দুটা বিড়াল?

—হ্যাঁ, শ্রডিঙ্গারের বিড়াল। এই বাক্সের ভেতর একটা গাইগার আছে, আর আছে সায়ানাইড গ্যাস আর হাতুড়ি... বিড়াল তো আছেই... বাক্সটা না খোলা পর্যন্ত ওই বাক্সে আছে দুটি বিড়াল, একটি মৃত আর একটি জীবিত... (বাবা বলেছিলেন দুটি বিড়াল রাখতে) বিজ্ঞানী শ্রডিঙ্গারের বিখ্যাত সূত্রটা গভীর আবেগে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র জগলুল হায়দার... সে ভুলে যায় যে সে একটা প্রাইভেট ব্যাংকের ক্যাশিয়ার... সদ্য পিতৃহারা পুত্র এবং সদ্য স্বামী, মলির... সে এই মুহূর্তে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জনক শ্রডিঙ্গারের ভাবশিষ্য যেন! তবে খুব বেশিক্ষণ তার বক্তৃতা চালাতে হয় না। মৃদু নাসিকা গর্জনে জগলুল খেয়াল করে, নববধূ ...তার চার বছরের ক্রমিক প্রেমিকা মলি উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছে। এই সময় ঘরে বাসর রাতের ফুলের গন্ধ অতিক্রম করে কেমন একটা বোটকা গন্ধ টের পায় জগলুল। তবে কি শ্রডিঙ্গারের জীবিত ও মৃত বিড়াল প্রাকৃতিক কাজ সারল বাক্সের ভেতর? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জগলুলের চোখজোড়াও নিমীলিত হয়ে আসে... এই সময় বাইরে একটা অস্পষ্ট হাউ-কাউয়ের শব্দ শোনা গেল। কতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে ছিল বলা মুশকিল। তবে মলির ধাক্কায় ঘুম ভাঙল জগলুলের।

—এই? এই?

—কী হলো?

—খাটের নিচে তোমার বিড়াল দুটা মনে হয়
বের হয়ে গেছে... খচর-মচর শব্দ করছে।
ওদের ঘর থেকে বের করো তো... বোটকা
গন্ধও বের হয়েছে!

—বিড়াল তো একটা।

—তুমি যে বললে দুটা?

—সেটা পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায়...জগলুল খাটের
নিচে হাত ঢোকায়। হ্যাঁ, মলির কথা হয়তো
ঠিকই, বাক্স ছিঁড়ে বিড়াল বের হয়ে গেছে।

হতেই পারে, জুতার বাক্স আর কত শক্ত হবে।

কিন্তু বিড়ালটা এত বড় কেন? আন্দাজে ঘাড়ের
কাছে ধরে (বিড়ালকে ওভাবেই ধরতে হয়)

খাটের তলা থেকে বের করে আনে জগলুল।

ঘরের লাইট জ্বলাই ছিল। হঠাৎ একটা

আতঁচিকার দিতে দেখে মলিকে। তার পরই

বিছানায় পড়ে জ্ঞান হারায় মলি। এবার নিজের

হাতে ধরা বিড়ালটার দিকে তাকায়

পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র জগলুল, তার হাতে ধরা

একটা মাঝারি সাইজের রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

ঠিক এই সময় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে

কয়েকজন ঢোকে, ‘এই যে, এই যে, এই ঘরে

পেয়েছি ব্যাটাকে, খোলা জানালা দিয়ে ঢুকেছে,

ভাই শক্ত করে ধরে থাকুন, ব্যাটা চিড়িয়াখানা

থেকে পালিয়েছে ... এই জালটা। এদিকে

ধরো...।’

বাকি জীবন জগলুল হায়দার সুখে

কাটিয়েছে।আহসান হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩,

২০০৯

276) হাড় কাঁপানো শীতের গল্প

লিভিং রুমে ফুয়াদ ভাই ও ফুলা ভাইকে দেখে

আমার চোখ যে ছানাবড়া হবে, সেটাই তো

স্বাভাবিক। ফুয়াদ এবং ফুলা। আমার দুই ফুফুর

দুই ‘ফু’! এই দুই ‘ফু’-এর একটা ‘ফু’-ই যথেষ্ট

যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটাতো!

‘আরে, আয় আয়, ডায়নামিক রাইটার’, তেল

মারার ডায়নামোটা চালু করেন ফুলা ভাই। বলি,

‘কী ব্যাপার?’

‘ব্যাপার হচ্ছে’, গলা খাঁকারি দেন ফুয়াদ ভাই।

‘আমরা মিডিয়া নিয়ে ব্যবসা করব বলে ঠিক

করেছি’—বলেই জিহ্বা কামড় দেন।

‘মানে—’, শুধরে দেন ফুলা ভাই। ‘মিডিয়ায়

ব্যবসা করব আর কী।’

‘অনুষ্ঠান বানাবে?’

‘আরে না না—। সে তো তুই-ই বানাস।’

‘তাহলে?’

‘আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রী বানাব, মডেল বানাব, উপস্থাপক বানাব—’, উত্তেজনায় হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে ফুলা ভাইয়ের।

‘উপস্থাপক না হতে চাইলে উপব্যবস্থাপক বানিয়ে ছেড়ে দেব’, ফুয়াদ ভাই আধাআধি দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর ‘বেশি তেড়িবেড়ি করলে এক ধাক্কায় ব্যবস্থাপক বানিয়ে বসিয়ে দেব।’

‘আ-হ্—!’ ফুলা ভাইয়ের কমান্ডিং ভয়েসের ধাক্কায় নিজেই পড়েন ফুয়াদ ভাই। নরম সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘কল্লোল। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আমার আর ফুয়াদের পকেটকে কাপড় ছাড়া ক্যারমবোর্ডের পকেট বানিয়ে দিয়েছে, তুই তো জানিস। আর সেই মন্দার ধাক্কা তোর স্যুপের বাটিতেও পড়েছে!’ চমকে উঠি আমি। ‘মানে?’

‘মানে, আগে জগিংয়ের পর তুই তোর পছন্দের সেই গ্রিক অথবা ইতালীয় রেস্টোরাঁর স্যুপগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তি। কিন্তু ইদানীং মন্দার চোটে তুই ট্র্যাডিশনাল থাই আর চাইনিজ স্যুপে ফিরে গেছিস। তোর এই থাই এবং চাইনিজ দারিদ্র্য আমাদের যারপরনাই পীড়া দিয়েছে—! আমরা চাই তুই আবার পকেট ভারী করে থাই-চায়না ছেড়ে ইতালি-গ্রিসের দিকে দৌড় লাগা। এশিয়া ছেড়ে ইউরোপের বাটিতে চামচের ঝড় তোল।’ এদের ইউরোপিয়ান চালে আমি শর্ত সাপেক্ষে রাজি হয়ে গেলাম। দুই।

আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আমি কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করব। ‘ইয়ে’, কাগজে চোখ রেখে বলেন ফুলা ভাই, ‘দু-একজন ফেস পাউডার রাখলে ভালো হতো রে—।’

‘ফেস পাউডার না,’ শুধরে দেই আমি, ‘ফেস ভ্যালু।’

‘রা-ই-ট’, ফুলা ভাই আটলান্টিক ওশানে নুড়ি পাথরটি খুঁজে পেলেন।

‘দু-একটা ফেস ভ্যালু আমাদের সঙ্গে ইন্টারভিউতে থাকলে ভালো হতো, বুঝলি? ক্লায়েন্ট ছেলেমেয়েগুলো আস্তা পেত। তুই লিমাকে আনতে পারবি না? ওর তো বেশ ভ্যালু ইদানীং!’

‘পারব না কেন?’

‘তাহলে নিয়ে আয়। আমরা পে করব। ওর রেট জানা আছে তোর? ও কি ঘণ্টা বেসিসে পেমেন্ট নেয়, নাকি শিফট বেসিসে?’ ফুলা ভাইয়ের আঙুল ক্যালকুলেটরে।

‘আমার মনে হয় ডে বেসিসে। আজকাল বেশির ভাগ অভিনয়শিল্পী তা-ই নিচ্ছে।’

‘আর ওই যে আনস্মার্ট ফেস্ ভ্যালু ঝন্টু?’

ফুয়াদ ভাই জিজ্ঞেস করেন। ‘ওই যে জেল মেরে যে স্টার হয়েছে?’

‘জেল মেরে না’, শুধরে দিই আমি, ‘তেল মেরে। তেল মেরে ও জেলদের টপকে গেছে—! তেলের ওপর জেলাস হচ্ছে!’

‘যাই হোক, আমাদের দরকার নেই জেনে, কে তেল ভ্যালু আর কে জেল ভ্যালু—আমাদের দরকার ফেস্ ভ্যালু,’ ফুয়াদ ভাই বলেন।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অপরাধবোধ পেয়ে বসল আমাকে। মন্দা অপরাধবোধ বোধ হয়! তিন।

লিভিং রুমটাকেই আমরা ইন্টারভিউ রুম হিসেবে ব্যবহার করি। প্রচুর সাড়া এসেছে ফুয়াদ ভাইয়ের চতুর বিজ্ঞাপনে। বারান্দায় প্রার্থীদের সামাল দিচ্ছেন ফুয়াদ ভাই।

ইন্টারভিউ বোর্ডে লিমা, ফুলা ভাই এবং আমি।

‘নে-ক্স-ট—!’ ফুলা ভাইয়ের বম্ব ফাটল। একটি সুদর্শনা মেয়ে প্রবেশ করল। লিমা ফাইলের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘সাবজেঙ্ট?’

‘মডেলিং।’ মেয়েটির সোজাসাপটা উত্তর।

‘রুমের ওপাশ থেকে এপাশটায় ক্যাটওয়াক করেন তো,’ লিমার কমান্ড।

ফণা তোলা সাপের মতো হেঁটে আসে মেয়েটি। গালে হাত দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন ফুলা ভাই, ‘কী সুন্দর বেতের মতো শরীর—জিমন্যাস্টদের মতো—হাড়িগুড়ি নাই—!’

ফিসফিসিয়ে বলি, ‘প্লিজ ফুলা ভাই—ল্যাঙ্গুয়েজ! এনিওয়ে, আরেকটু TALL হলে ভালো হতো।’

‘ডোন্ট ওরি, ভাইয়া—আমি হিল পরে আরও উঁচা-লান্ফা হতে পারমু—!’

চমকে উঠে তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাই। ফুলা ভাই বলেন, ‘অসুবিধা নেই। উনি তো আর মুখে কথা বলবেন না। চুপচাপ মডেলিং করবেন।’

মেয়েটি লিমার কাছ থেকে একটা অটোগ্রাফ নিয়ে চলে যায়। ‘আসি আফা—! ওয়াচ মি।’

দেইখেন।’চার,

‘নে-ক্স-ট!’ ফুলা ভাইয়ের বম্ব।

একজন ছেলে ঢোকে হাতে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে।

লিমা ফাইলে চোখ রেখে বলে, ‘সাবজেস্ট?’
ছেলে: ক্যামেরাম্যান।

ফুলা ভাই: আগের কোনো অভিজ্ঞতা?

ছেলে: নয়টি বিয়ের ভিডিও করেছি।

লিমা: তাহলে আর এখানে এসেছেন কেন?

ক্যামেরাম্যান তো হয়েই গেছেন। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে দেন।

ফুলা ভাই: পুরো ফি দিয়েছেন তো?

ছেলে: জি।

ফুলা ভাই: তাহলে আসুন। ডিরেক্টর হতে চাইলে আরেকবার ফি দিতে হবে।

লিমার অটোগ্রাফ নিয়ে উধাও হয় ছেলেটি।

ভীষণ অপরাধবোধে ভুগতে থাকি। কেন যে দুই ‘ফু’র গ্রিক-ইতালীয় ফাঁদে পা দিতে গেলাম।

আর ফুলা ভাইয়ের প্রতিটি ‘নেক্সট’-এ আমার নেক্সট অপরাধবোধ বাড়তে থাকে। পাঁচ,

ব্রেকিং নিউজ

ফুয়াদ ভাইয়ের হঠাত্ মানসিক রোগ হয়েছে।

ঘুমের মধ্যে উনি একই স্বপ্ন বারবার দেখে

জেগে উঠছেন। স্বপ্নটি হচ্ছে—উনি দেখেন

একটি ঝুলন্ত হাড় ওনার সামনে আর হঠাত্

কোনো অদৃশ্য আঘাতে হাড়টি ভেঙে টুকরো

হচ্ছে আর উনি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছেন।

ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। একটি মেটালিক হাড়

ঝুলিয়ে দিয়েছেন ফুয়াদ ভাইয়ের বেডের

স্ট্যান্ডে। আর যখনই ঘুমন্ত ফুয়াদ ভাই দুঃস্বপ্নে

মোচড় দিয়ে উঠছেন, তখনই হাতের কাঠি দিয়ে

ধাতব হাড়ে ঘণ্টি বাজিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছেন

ফুয়াদ ভাইকে।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কারণ?’

ডাক্তার বললেন, ‘এতে করে ঘুম থেকে উঠে

উনি বুঝতে পারবেন যে, বাড়ি খেলে হাড় শব্দ

করতে পারে, কিন্তু সহজে ভাঙে না। ধীরে ধীরে

উনি হাড়-ভাঙা-ভীতি থেকে কনফিডেন্স নিয়ে

ফেরত আসবেন।’ছয়,

ফোন বেজে ওঠে। সেই মডেল মেয়েটির ফোন।

আমি: হ্যালো।

মেয়ে: হ্যালো—আমারে চিনেছেন? আচ্ছা শুনলাম
কী যেন হাড়িগুড়ি—।

আমি: তাতে কী? আপনার তো হাড়িগুড়ি
নেই।

মেয়ে: ইউ আর সো সুইট—।

আমি: থ্যাঙ্কু বোনলেস—।

মেয়ে: ইউ আর সো সুইটমিট—!

প্রশংসা ক্রমেই অশ্লীলতার দিকে এগোচ্ছে দেখে
ফোন এখানে কেটে দিলাম। শায়ের খান

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩,
২০০৯

277) ধারাভাষ্য অমৃত

ব্যাটসম্যান সজোরে ব্যাট চালালেন, ছক্কা হওয়ার
সম্ভাবনা। কিনননতু ন্নাআআ...বোল্ড!

মেঘমুক্ত মাঠ, কর্দমাক্ত আকাশ, পিচের ওপর
দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি বয়ে যেতে পারে।

মাঠ চলে গেল বলের বাইরে। দুঃখিত,
দর্শকমণ্ডলী, আমি একটু আবেগাপ্লুত হয়ে
পড়েছিলাম। আসলে বল চলে গেল সীমানার
বাইরে।

বাংলাদেশের আশার ফুল আশরাফুল কিন্তু এখন
ক্রিজে। সারা দেশের মানুষ তাঁর ব্যাটের দিকে
তাকিয়ে আছে।

বল হাতে নিয়ে ছুটে আসছেন জয়ের মূল
এনামুল, বল হাতে তাঁর মতো ভয়ানক বোলার
কিন্তু আমি খুব কমই দেখেছি। আজ কিন্তু
যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে আমরা আজ আবার
আগের মতো ফলই হয়তো দেখতে পাব।

মোহাম্মদ আশরাফুল, সুন্দর একটি শট এবং
আউট।

দৃষ্টিনন্দন মার, চোখ দিয়ে চেয়ে দেখার মতো
শট, বল চলে গেল মাটি কামড়ে সোজা
ফাইনলেগ ফিল্ডারের হাতে...একটি রান।

এনকাল্লা, তিনি নামেও কালা, দেখতেও কালা।
রফিক স্টিয়ার করলেন এবং ভেসে ভেসে চার।
দুই কমেণ্টেটর কথোপকথন: আমার মনে হয়,
সেলিম মালিকের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে ক্রিকেট মিশে
আছে।

: আমার মনে হয়, সেলিম মালিকের লোমে
লোমে ক্রিকেট মিশে আছে।

এবার কিন্তু ব্যাট আর বলে হয়েছে। (কী
হয়েছে?)

ব্যাটসম্যান অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে প্রতিটি বলের
মেধা ও গুণাগুণ বিচার করে খেলছেন।

আম্পায়ারকে অতিক্রম করে বোলার বল করলেন।

এবার কিন্তু ব্যাটসম্যান সজোরে স্টিয়ার করলেন।

সুধী দর্শকমণ্ডলী, ঢাকা বঙ্গবন্ধু এক নম্বর জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ম্যাচে মোকাবিলা করবে এশিয়ার দুই ফুটবল পরাশক্তি বাংলাদেশ ও কাজাখস্তান।

সপাটে চালিয়েছেন এবং একটি রান।

আলফাজ....ভুল পাস।

এবার কিন্তু সবুজ ঘাসে চুমু খেতে খেতে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। চারটি রান।

আজকের খেলায় পরাজিত হলে বাংলাদেশ পূর্ণ দুই পয়েন্ট অর্জন করবে।

বাংলাদেশ ৪৮ ওভার খেলে ১২৪ রানের টার্গেট অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এইবারে কিন্তু চার...না আউট হয়ে গেলেন ব্যাটসম্যান। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ ক্রিকেটের, দুর্ভাগ্য গোটা জাতির।

নাম তাঁর পানিয়াঙ্গারা হলেও বলগুলো যে তাঁর পানির মতো সহজ, সেটি কিন্তু বলা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে মাঠের উত্তর পাশে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জ।

তিনি ক্রিকেট খেলতে তাঁর নিজের দেশ থেকে উড়ে এসেছেন।

সুড়ঙ্গের শেষে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আলো দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আলোটা সম্ভবত কোনো ট্রেনের হেডলাইটের। ওই ট্রেনে এবার ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কাটা পড়বেন।

অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন! তামিম ইকবালকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এইমাত্র তিনি হাফসেঞ্চুরি করার যোগ্যতা অর্জন করলেন।

বলটা যে কত জোরে ছিল, স্লো মোশন রিপ্লের কারণে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না।

বোলার জহির খান। নতুন ওভার করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। ট্রাউজার খুলে আম্পায়ারের হাতে দিলেন...

চোখ চেয়ে দেখার মতো স্কয়ার কাট। বল লং অন দিয়ে চলে গেল সীমানার বাইরে।

বোলারস ব্যাক ড্রাইভ। ফিল্ডাররা চেয়ে চেয়ে দেখলেন। থার্ডম্যান দিয়ে বল সীমানার বাইরে

চলে গেল।

চমৎকার শট! এক্সেলেন্ট শট। লেগ গ্লাস। বল সীমানার বাইরে। কিন্তু না... বোল্ড হয়ে ফিরে আসছেন আশরাফুল। (বল লেগ স্ট্যাম্পে লেগে সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিল।)

মাআথাআ নিচু করে আআস্তে আআস্তে প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে আসছেন বুলবুল। ওখানে আলফাজ। চমৎকারভাবে দুইজনকে কাটিয়ে সুন্দরভাবে এগিয়ে গেলেন আলফাজ! বারে শট নিলেন। কিন্তু না, ভুল পাস!

উইকেটে আছেন মারমুখী, হার্ডহিটিং ওপেনার জাভেদ ওমর। যাঁর হাতে আছে বলার মতো অনেক অনেক শট।

ব্যাটসম্যান দেখে, শুনে বল ছেড়ে দিলেন। এবং বোওওল্ড!

চোখ চেয়ে দেখার মতো শঅঅট... কিন্তু...আউট আউট আউট। আউট হয়ে ফিরে এলেন তিনি। আম্পায়ার কিন্তু আঙুল উঁচু করে জানিয়ে দিলেন, ব্যাটসম্যান আকরাম, তুমি আউট। এই বলে কিন্তু রান পাবেন না।

বাউন্সার। বল এত উঁচু থেকে গেল যে ওপরে কোনো বিমান থাকলে যাত্রীরা আহত হতে পারতেন!

শুনুন, এই অজিত আগারকার যদি অলরাউন্ডার হয়, আমি তাহলে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান। শ্রীলঙ্কার স্কোর এখন মুম্বাইয়ের ট্যাক্সি মিটারের মতো এগিয়ে যাচ্ছে।

খুবই ধীর এবং নিষ্ফলা একটা সেশন কাটল, তবে বিরক্তিকর নয়। কারণ যথেষ্ট গতি আর আনন্দ ছিল।

রেফারি কিন্তু আসলে মোটেও পক্ষপাতদুষ্ট নন। এই লোকটা আসলে একটা ফালতু।

এই স্ট্রাইকার ফুটবলের কিছুই জানে না। তার ধারণা, 'ড্রিবলিং' এক ধরনের নতুন চকলেটের নাম।

এক নম্বরে থাকা গাড়িটা খেয়াল করুন।

একেবারেই অনন্য (ইউনিক)। ঠিক দুই নম্বরে থাকা গাড়িটার মতো দেখতে।

বক্সিংয়ে এ ধরনের ঘুসিতে কখনো কখনো কিছু ইনজুরি হয়। কেউ কেউ মারাও গেছেন। তবে কখনোই গুরুতর কিছু ঘটে না।

মাঠের সব জায়গায় ম্যারাডোনা। আমার ধারণা, এগারোজন ম্যারাডোনা নামিয়েছে

তারা। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩,

২০০৯

278) ফুলুয়ে-দুশ্বা ও নরেঞ্জি সাহেব

একসময় কাবুল শহরে দিনকাল খারাপ ছিল না। নানা ধাক্কায় এখানকার বসবাসকে সরসই বলা যেতে পারে। তবে হালফিল সোয়াইন ফুর উৎপাত শুরু হতে জ্বরজারিতে তনু-মন থেকে যেন কষ বহির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি, খানিক কায়ক্লেশে ওখানে এসে চেয়ারে বসে অ্যাসপিরিন খেয়ে একটু ঝিম্যানোর উদ্যোগ নিয়েছি, ঠিক তখনই দুয়ারের স্বচ্ছ কাচ দিয়ে রবার্ট রাইসকে এদিকে আসতে দেখি। রবার্ট সাহেব সপ্তা কয়েক হলো ইরাকে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে আফগানিস্তানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি র্যাক্সের দিক থেকে আমার ওপরওয়ালা। তাঁর ধরাকে সরা জ্ঞান করার একটি প্রবণতা আছে। তার ওপর তিনি চুলদাড়িতে ডাই মেখে তা কমলালেবু বর্ণে রঞ্জিত করেছেন। দারি ও উর্দু ভাষায় কমলাকে নারেঞ্জ বলা হয়। আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরে উর্দু বলতে বলতে বেড়ে উঠেছে, তারা ইতিমধ্যে তাঁকে পেছন থেকে ‘বালে নারেঞ্জ’ বলতে শুরু করেছে। সাহেব লবজটিকে বিশেষণ ভেবে খানিক আত্মহারা হয়ে আছেন।

রাইস সাহেব কাগজের সার্জিক্যাল মাস্ক পরে আমার কামরায় এসে ঢোকেন। আলামত স্পষ্ট, সোয়াইন ফু তাঁরও নাগাল পেয়েছে। তিনি আমার হাতে আরেকটি মাস্ক দিয়ে তা পরতে বলেন। আমাদের যেহেতু দুজনেরই সোয়াইন ফু হয়েছে, এ অবস্থায় আলিঙ্গন করলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, তার পরও সাহেব বলে কথা, আমি আখেরে উপকার হতে পারে ভেবে কর্তাভজা হওয়ার কোশিশ করি। মাস্ক মুখে দিয়ে আমরা মুখোমুখি হই। রাইস সাহেব জানতে চান, সোয়াইন ফু হলে আফগানরা কী করে? সোয়াইন শব্দের অর্থ হচ্ছে শূকর, দারি ভাষায় এ জানোয়ার খিজির বলে পরিচিত, এবং তা উচ্চারণ করলে দিন চল্লিশেক মুখ নাপাক থাকে বলে পরহেজগার আফগানরা এ রোগকে ফুলুয়ে-দুশ্বা বলতে শুরু করেছে। সাহেব বার কয়েক মুখখানা বেজায় রকমের তুশ্বা করে

উচ্চারণ করেন, দুম্বা দুম্বা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে তালাশ পাওয়া যায় যে, ফ্যাকাল্টির পাগড়িওয়ালা মুরব্বি এক চাপরাশি জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে যাদের ফুলুয়ে-দুম্বা হয়েছে, তাদের যথাস্থানে সমুচিত চিকিৎসার জন্য পাঠাচ্ছেন। এ বাবদ তিনি নজরানা নিচ্ছেন অতি স্বল্প। আমি তৎক্ষণাত্ তাঁকে এত্তেলা দিই। একটু পর তিনি আমার কামরায় এসে সাহেবের চুলদাড়ির নরেঞ্জি রং দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যান। তাঁর ধারণা, ফুলুয়ে-দুম্বার সাথে সাথে হয়তো সাহেবের গর্দানে জিনেরও আছর হয়েছে। মুরব্বি আয়াতুল কুরসি পড়ে সাহেবকে ফুঁক দিতে গেলে সাহেব ধড়মড় করে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে জানতে চান—আফগানরা ফুলুয়ে-দুম্বার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছে না কেন? বৃদ্ধ পশতু ভাষায় জবাব দিলে আমি তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারি না। সাহেব আমাকে তর্জমা করার হুকুম দেন। আমি চাকরি রক্ষার্থে বলি, সুইসাইড বম্বাররা হাসপাতাল আক্রমণের হুমকি দিয়েছে। তিনি বেজায় আতান্তরে পড়ে দাড়ি চুলকে আবার বলেন, ‘ওরা হাসপাতাল আক্রমণ করবে কেন?’ আমি উপায়ান্তর না দেখে বলি, সম্ভবত আত্মঘাতী বোমারুরা বিনা চিকিৎসায় মরতে চায় না! সাহেব নোটবুক বের করে আমার মন্তব্য সিরিয়াসলি টুকে নেন।

বৃদ্ধ চাপরাশি সোলেমানি খাবনামার মতো একখানা কিতাব বের করে সাহেবকে চোখ বন্ধ করে তার একটি নকশায় অঙ্গুলি নির্দেশ করতে বলেন। তারপর নকশার হিসাবকিতাব করে আমাদের একটি দাওয়াখানায় যাওয়ার দিক নির্দেশ দেন। আমরা গাড়ি নিয়ে বের হই। পথে বিস্তর ট্রাফিক জ্যাম। গোলযোগে দাওয়াখানার দিকনির্দেশনা আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে দাদখানি চাল-মসুরের পাকা তাল হয়ে গেছে। কিন্তু সাহেব দাওয়াখানায় যাবেনই। মরিয়া হয়ে আমরা আন্দাজে একটি দোকানে ঢুকতে যাই। দোকানের দোরগোড়ায় দুটি তাজাতনা দুম্বা বাঁধা। দোকানি খুব সমাজত করে আমাদের আগর লোবান আতর দেখান। তারপর বের করেন কাফনের কাপড়। আমি অনেক কষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টা করি, সাহেব যে ফুলুয়ে-দুম্বায় মারা যাবেন, এমন তো কোনো গ্যারান্টি নেই,

হায়াত থাকলে বেঁচেও তো যেতে পারেন। কিন্তু দোকানি নাছোড়—আরে, এ যাত্রা বেঁচে গেলেও পরে অন্য কিছুতে তো তাঁর মওত হবে। আমি সস্তায় দিচ্ছি, কাফন কিনে নাও, সাহেব তো আর অমর নন, পরে না হয় কাজে লাগবে। আমি সাথে করে টাকা-পয়সা আনি—এ অজুহাত দিই; বলি, সাহেব মালদার আদমি, পরে ডলার নিয়ে এসে শুধু কাফন কেন, কফিন খাটিয়া সবই কিনে নিয়ে যাবেন, বলে কোনোক্রমে দোকান থেকে বেরিয়ে আসি। গাড়িতে উঠতে উঠতে সাহেব মন্তব্য করেন, ‘আফগানস্ আর অ্যাডভান্স থিংকার! সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩, ২০০৯

279) একখানা গরুর রচনা

গরু একটি গোয়ালপালিত পশু। তবে গোয়াল না থাকলে বাইরে খুঁটিতেও বেঁধে রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুরি হওয়া কিংবা দড়ি ছিঁড়ে চম্পট দেওয়াসংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব আপনার। গরুর পা আছে ঠিক, কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ে জুতা পরার সিস্টেম চালু না থাকায় এ পর্যন্ত কোনো গরুকেই কখনো জুতা পরতে দেখা যায় না। এরা জুতা পরলে অবশ্য জুতার ক্ষেত্রে ‘জোড়া’ শব্দটি চালু না হয়ে ‘হালি’ শব্দটি চালু হতে পারত। গরুর দুটি শিং রয়েছে। এই শিং নামক দুটি অস্ত্র রাখার দায়ে কোনো গরুকে এ পর্যন্ত জেলহাজত কিংবা অন্য কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে শোনা যায়নি। গরুর বিশাল একটি মাথা রয়েছে। মাথার ওপর হালকা চুল থাকলেও বড় কোনো চুল নেই, কারণ গরুরা ইচ্ছে করেই চুল বড় করে না। আর বড় করে না এই জন্য, যেহেতু বাজারে এখনো তাদের চুলের যত্নে কোনো শ্যাম্পু কেনাবেচা হচ্ছে না। গরুর মেগা সাইজের একটা ভুঁড়ি আছে। এই ভুঁড়ি কমাতে তারা কোনো যানবাহনে না চড়ে হেঁটে যাতায়াত করে। গরু তাদের মাথায় লম্বা চুল না রাখলেও লেজের মাথায় লম্বা কতগুলো চুল রাখে, যাতে মশা-মাছি গায়ে বসামাত্র কষিয়ে বাড়ি মারতে পারে। মেয়ে গরুকে গরু সম্প্রদায়ের পরিভাষায় বলা হয় গাই। তাদের নামে বাংলাদেশের একটা জেলারও নামকরণ করা হয়েছে। গাইবান্ধা। টিসু কিংবা রুমাল না থাকায় গরুরা মন খুলে কাঁদতে পারে না। গরু সাংঘাতিক উপকারী প্রাণী। গরু আমাদের

চারপাশের ঘাস, লতাপাতা খেতে গিয়ে শাকসবজিও খেয়ে ফেলে। ফলে আমাদের বাড়িতে কেউ শাক রান্না করতে চাইলেও করতে পারেন না। এতে বিরাট বাঁচা বেঁচে যাই আমরা। শাক খেতে যা বিশ্রী লাগে! এমনিতে খালাতো বোনের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কোরবানির ঈদে গরুর মাংস দিয়ে আসার ছুতোয় আমরা সহজেই দেখাটা করে ফেলতে পারি। তবে গরুর কিছু অপকারী দিকও আছে। গরু নামে পৃথিবীতে একটা প্রাণী আছে বলেই শিক্ষকেরা আমাদের গরু বলে সম্বোধন করেন। যা অতিশয় মর্মবেদনাদায়ক। গরু খানিকটা বেয়াদব কিসিমের প্রাণী। কারণ সে কোনো রকম আদব-কায়দার ধার না ধরে মাঝেমধ্যে এমন জোরে লাথি মারে যে নিজেকে তখন মনে হয় ফুটবলজাতীয় একটা কিছু। বিষয়টা একটু লজ্জাকর বৈকি। পরিশেষে বলা যায়, গরুর ছোটখাটো অপরাধ থাকলেও প্রাণী হিসেবে গরু কিন্তু ভালোই। যে কারণে শুধু কোরবানির বাজারে নয়, কবিদের কবিতার বাজারেও গরুর ভালো একটা ডিমাল্ড আছে। তাই তো জনৈক অখ্যাত কবি তার এক জবরদস্ত কবিতায় এভাবে রশি ধরে টেনে এনেছেন গরুকে—‘তুমি সাগর, আমি মরু/ছিলাম ছাগল, হলাম গরু।’ ইকবাল খন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৩, ২০০৯

280) নানান বরন গরুর সাতকাহন

তারা এখন কোরবানির হাটের মধ্যমণি। মোটরযান বা নৌকায় করে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করছে। কপালে লাল কাপড়ের টিকলি, শিঙে রঙের প্রলেপ। গলায় জরির মালা। সন্দেহ নেই, গরুর কথাই বলা হচ্ছে। ট্রাক থেকে হাটে নেমে, সেখান থেকে বাসাবাড়িতে। আদর-আপ্যায়নে কোনো ঘাটতি নেই কোথাও। সামনেই ঈদ। তাই দাম, চেহারা ইত্যাকার নানা বিষয়ে গরু নিয়ে আলোচনা এখন সবার মুখে মুখে। পত্রিকার পাতায়, টিভির পর্দায় তাদের স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি।

গরুর দিনকাল: গরুর এখন আর কোনো খাটুনি নেই। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, শুয়ে-বসে জাবর কেটে, মাছি তাড়িয়ে দিন কাটায়। রোদবৃষ্টি

মাথায় নিয়ে জোয়াল টানা নেই। ঘানি টানার কাজ থেকে মুক্তি। গরুগুলো এখন সত্যিই বেকার।

গরুর ক্লেশমুক্তি: বাস্তবিকই গরুর ক্লেশ অনেক কমে গেছে। তাদের ক্লেশমুক্ত করেছে যন্ত্র। জমি চাষ করা হচ্ছে কলের লাঙলে। মলন দেওয়া হচ্ছে যন্ত্রে। সারা দেশে রাস্তাঘাটেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে, অস্বীকার করার জো নেই। কাদাপানিতে কদাকার গ্রামের মেঠোপথের চেহারা বদলে গেছে। পিচঢালা মসৃণ পাকা সড়ক চলে গেছে অনেক গ্রামের প্রান্তসীমায়। ওই পথে ভটভট করে চলছে ‘নছিমন-করিমন’। সাঁইসাঁই করে ছুটছে রিকশাভ্যান। অথচ এককালে গরু বেচারাদের কত না মেহনত করতে হয়েছে খানাখন্দে ভরা কাদামাটির পথে মালাবোঝাই গাড়ি টানতে!

দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে: গরু গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী—এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এর পরে যদি লেখা হয় সে গাড়ি টানে, হালচাষ করে, তাহলে এখন অবাস্তব তথ্য দেওয়ার দোষে গরুর রচনায় গোপ্লা পাওয়ার আশঙ্কা ষোলোআনা। অবস্থা বদলেছে, তাই আধুনিক কালে গরুর রচনা লিখতে গেলে দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে। ‘গরুর মতো খাটতে খাটতে জীবন বরবাদ হয়ে গেল’ বা ‘সারা জীবন কলুর বলদের মতো শুধু সংসারের ঘানিই টেনে গেলাম’—এমন আক্ষেপ যাদের, তাদেরও নতুন উপমা খুঁজতে হবে।

গরু কেন গরু: গরুর গরু না হয়ে উপায় নেই। সে দীর্ঘ সময় একটানা চলতে পারে, তাই তার নাম গরু। ‘গো’ অর্থ গতি। আবার গো-রুত মানে গরুর ধ্বনি। তার হাম্বা ডাক বহু দূর থেকে শোনা যায়, এ কারণেও চতুষ্পদটির গরু নামকরণ। এ ছাড়া আরও অনেক নামে তার পরিচিতি। গাভি, গাই, ধেনু—সবই স্ত্রীবাচক। পুরুষবাচক নামের মধ্যে আছে—ষণ্ড, ষাঁড়, দামড়া, বৃষ, বলীবর্দ, বলদ, রোমন্থক ইত্যাদি। গরুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু শব্দ মানবকুলেও ব্যবহৃত। যেমন—কন্যা অর্থে ‘দুহিতা’ শব্দটি এসেছে গাভি দোহন থেকে। আগে মেয়েরা গাভি দোহন করত বলে তাদের দুহিতা বলা হতো। একইভাবে এসেছে ‘গোয়াল’ বা ‘গোপ’ শব্দটিও। ভিন্ন অর্থেও কিছু শব্দ এসেছে গরুর সম্পর্ক থেকে। যেমন—গোধূলি, গবান্ধ, গোগ্রাস,

গোধন, গোবেচারা, গবেষণা আর পঞ্চগব্য—এর তালিকা মনে না থাকলে দেখুন কী আছে তাতে—দুধ, দই, ঘি, গোময় ও গোমূত্র; হলো তো এখন পাঁচ পদ।

পুরাণের গরু: আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজে গরু নামের এই নিরীহ চতুষ্পদের অবদান বলতে গেলে অপরিসীম। সেই সুমের সভ্যতা থেকেই গরু তার শ্রম থেকে শুরু করে ‘অস্থি-মজ্জা-মাংস-চর্ম-মল-মূত্র’ যাবতীয় মানব-কল্যাণার্থে দান করে আসছে। প্রাচীন ভারতে গরুকে সম্পদ-জ্ঞানে বলা হতো ‘গোধন’।

রাজামহাশয়রাও গরু পুষতেন। এমনকি এক রাজা অন্য রাজার গরু লুট করতে কুণ্ঠিত হতেন না। মহাভারতে আছে, দুর্যোধন বিরাট রাজার গোধন লুট করতে গিয়েছিলেন দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মকে সঙ্গে নিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গরু চুরির রেওয়াজ বহুকালের। গরু নিয়ে রাজসিক কর্মও কম হয়নি। ‘স্টারসার্চ’ বা ‘ট্যালেন্ট হান্টিং’কে যদি কেউ ভেবে থাকেন হাল আমলের উদ্ভাবন, তাহলে মহা ভুল করবেন।

সীতার পিতা ‘জনক রাজা’র কথাই ধরুন। কে শ্রেষ্ঠ ‘ব্রহ্মর্ষি’, এ নিয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন তিনি। ঋষি যাজ্ঞবল্কের সামনে প্রতিযোগীরা উড়ে গেলেন শুকনো পাতার মতো। ঋষিপ্রবর শ্রেষ্ঠ খেতাব তো পেলেনই, পুরস্কার হিসেবে পেলেন সোনা দিয়ে শিং বাঁধানো সহস্র গোধন। কালিদাসের মেঘদূত-এর সেই যে চর্মস্বতী নদীটির কথা আছে, কেমন করে সেই নদীর সৃষ্টি?

মহাভারতের কাহিনী হলো, রাজা রন্তিদেবের রান্নাঘরে প্রতিদিন দুই হাজার গরুর মাংস রান্না করা হতো অতিথি আপ্যায়নের জন্য। আর গরুর চামড়াগুলো যেখানে বুলিয়ে রাখা হতো, সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়া রক্তরস থেকে সৃষ্টি হয়েছিল একটি নদী। এই নদীটিই হলো চর্মস্বতী, বর্তমানে যাকে ডাকা হয় ‘চম্বল’ নামে।

গোবচন: কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আমরা তো ‘গরুখোঁজা’ করিই, তবে ‘গরু মেরে জুতো দান’ করতে এলে মেজাজটা বিগড়ে যেতেই পারে। গরু নিয়ে এমন আরও মোক্ষম প্রবচন, প্রবাদ, আগুবাণ্য চালু আছে আমাদের বাগ্মিধিতে। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক—‘কাজির গরু

খাতায় আছে গোয়ালে নেই’, ‘এক গোয়ালের গরু’, ‘গরু জরু ধান রাখ বিদ্যমান’, ‘ধর্মের ষাঁড়’, ‘কানাগরু বামুনকে দান’, ‘ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়’, আর ‘দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো’—এ কথা কে না জানে। আর কেউ যদি অহেতুক শাপশাপান্ত করতে চান, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, ‘শকুনের শাপে গরু মরে না’।

নানান বরন গাভি রে ভাই...

চিরাচরিত কাজকর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেলেও গরুর কদর মোটেই কমেনি। তার দুধ থেকে গোবর—সবই মূল্যবান আমাদের কাছে। শরত্বাবু মহেশ্বের প্রতি গফুরের ভালোবাসার যে কাহিনী কালজয়ী করে রেখে গেছেন, বাংলার কৃষকের কাছে তার গরুটি এখনো তেমনি প্রিয়। আর কোরবানির হাটে যে গরুই মধ্যমণি, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

অনেক রকমের গরুই এখন পোষা হয় আমাদের দেশে। এর মধ্যে আছে সিক্কি, সাহিওয়াল, হলস্টোন, হরিয়ানা, লোলা, অমৃতমহল, লালসিক্কি, মুলতানি, মন্টগোমারি, ফ্রিসিয়ানা, থরপর্কার, জার্সি, গির, কাথিয়াবারি, কান্ধরেজ, আয়ারশায়ার ইত্যাদি। গরুর জাত যাই হোক, দুধ কিন্তু সবার একই রকম। জাতিভেদের অসারতার কথা বলতে গিয়ে গরুর তুলনা দিয়ে সে কথাটিই বলেছিলেন লালন সাঁই—‘নানান বরন গাভি রে ভাই একই বরন দুধ/ জগত্ ভরমিয়া দেখলাম সব একই মায়ের পুত...।’ গরু আর মানুষ বহুকাল থেকেই এভাবে মিলেমিশে আছে একত্রে, ভবিষ্যতেও এই বন্ধন ছিন্ন হবে এমনটা মনে হয় না।

আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু যেমন সংখ্যায় বেশি তেমনি গরুর প্রতি মমত্ববোধও প্রগাঢ়। ধর্মীয় বিধানে নিজের লালিত-পালিত প্রিয় পশুটিকে কোবরানি করার উপরেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। এ কারণেও গরু কোবরানি করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন সকলে। আশীষ-উর-রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৫, ২০০৯

281) এ জার্নি বাই বাস

কিংবা ‘বাঁশ’ও বলতে পারেন। বিশেষ করে
যাঁরা ঢাকা শহরে বাস করেন। ১২ মাস লোকাল
বাসই যাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আশ মেটায়।
নয়টায় অফিসে যাওয়ার তাড়ায় যাঁরা উর্ধ্বশ্বাসে
ছোটেন। একে গুঁতিয়ে, ওকে ল্যাংচে, তাকে
পাশ কাটিয়ে বাসে উঠতে উঠতে যাঁদের উঠে
যায় নাভিশ্বাস। ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে
তরীতে ঠাই পেয়ে যান কপাল (অনেকে শরীর)
গুণে। অতঃপর ঘামের দুর্গন্ধ, অক্সিজেনের
অভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে বেরিয়ে যায়
দীর্ঘশ্বাস। পাশের দশাসই মহিলার হিলের চাপা
খেয়ে চিৎকার করে ওঠেন, ‘উরিবাস!’ আর
‘পকেট সাবধান’-এ চোখ পড়ামাত্র নির্দেশিত
জায়গায় হাত দিয়ে দেখেন—সর্বনাশ!
ঢাকাবাসীর কাছে বাসের ভিড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে
যাত্রা মানে নরকবাস না হোক, নিদেন ‘জার্নি
বাই বাঁশ’ তো বটেই।

এ লেখা বাসওয়ালাদের গালমন্দ করে নয়।
কসম খেয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন। নিন্দুকের
এক চোখ সব সময় কানা হয়। ভালোটা তারা
দেখবে কী করে! আমি নিন্দুক নই। কবিও নই।
হলে বলতাম, ‘হে পাবলিক বাস, তুমি মোরে
করেছ মহান। দানিয়াছ মোরে ঢাকাবাসী হওয়ার
সম্মান।’
আমরা যারা গাঁও-গেরাম কিংবা মফস্বল শহরের
অকৃপণ আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি এবং
একসময় অকৃতজ্ঞের মতো নাড়ির টান ভুলে
পাকস্থলী, মানে পেটের টানে (কিংবা দায়ে)
তীর্থের কাক হয়ে রাজধানী শহরে ভিড়েছি,
তাদের এই শহরে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন
যথাযথ প্রশিক্ষণের। সরকার বাহাদুর তো
বিষয়টা ভেবে দেখল না। হাজারটা মন্ত্রণালয়ের
যন্ত্রণায় এমনিতেই কাতর বলে নতুন কোনো
বিভাগও খোলা হচ্ছে না এ বিষয়ে। প্রশিক্ষণের
ভারটা তাই নিজ দায়িত্বে তুলে নিয়েছে মুড়ির
টিন মার্কা এসব বাস। কঠোর প্রশিক্ষণ মানেই
তো সহজ যুদ্ধ।

ঢাকা শহরে ছোট খুপরি ভাড়া করে আপনি
থাকতে শুরু করলেন। ওই গুমোট পরিবেশ
মানিয়ে নেবেন কী করে শুনি? সেই শিক্ষা
আপনাকে দেবে লোকাল বাস। ঘরের পাশের
নর্দমার গন্ধও তো সহিতে হবে, না কী? শূন্য

পকেটে এত বড় শহরে ঘোরাফেরারও প্রয়োজন হতে পারে আপনার। সেই প্রশিক্ষণ পাবেন পকেট-ওস্তাদদের ('মার' লিখে মার খেতে চাই না) কাছ থেকে। সব জায়গায় তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লড়াই করেই টিকে থাকতে হবে আপনাকে। সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। প্রশিক্ষণ পেতে চান? সকাল সাতটা-আটটার দিকে যেকোনো বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেলেই হবে। ধরুন, চেষ্টা-চরিত্র করে চাকরি জোগাড় হলেও বসকে বশ করতে পারছেন না। খবরদার, চাকরি ছাড়ার অলক্ষুণে কথা একদমই ভাববেন না। কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে ঝুলে থাকুন। ঝুলে থাকার প্রশিক্ষণ চান? সেও মিলবে। কিংবা ধরুন, সহকর্মীকে টপকে কী করে পদোন্নতি পেতে হয়, সেই কলাকৌশলের কথা। আপনি বাসের ভিড়ে দাঁড়িয়ে। দুই সিট সামনে বসা যাত্রীটি উঠি উঠি করছে। তার পাশে যে লোক, উত্তরাধিকার সূত্রবলে তারই সেখানে বসার কথা। কিন্তু বাহু (বাহু না থাকলে বুদ্ধি) বলে পাশের জনকে টপকে টপ করে দখল করুন সিট।

'লাইফ'টা একদম পানসে হয়ে যাচ্ছে? রিয়্যাল অ্যাকশন থ্রিলারের রোমাঞ্চ পেতে উঠে পড়ুন হামেশাই অলিখিত রেসিং নামের এমন বাসগুলোর একটায়। ওঠার সময় ঈশ্বরের নাম নিতে ভুলবেন না। কে জানে, এই ওঠা একেবারে মর্ত্যলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে ওঠায় পরিণত হয় কি না! জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে এসেছে যাঁদের, সাহসের অভাবে 'কাজ'টা করে ফেলতে পারছেন না...থাক সে কথা।

ইদানীং লোকে ফেসবুক নিয়ে কী মাতামাতি করে। অথচ এই ফেসবুকের দায়িত্ব সেই কবে থেকে পালন করে আসছে পাবলিক বাসগুলো। বাসের গায়ে-সিট কভারে কত বিচিত্র সব 'স্ট্যাটাস'। একজন হয়তো লিখেছে, 'ভুলো না আমায়'। নিচে অন্যজনের উত্তর, 'কেমনে ভুলি, টাকাটা তো ফেরত দিয়া গেলা না'। শুধু মন্তব্যই নয়, অনেক মোবাইল ফোন নম্বরও পাবেন। কিন্তু খবরদার, ভুল করেও সেই নম্বরগুলোয় আবার কলটল করে বসবেন না। আমার এক বন্ধু বাসে জনৈকা রাবেয়ার নম্বর পেয়ে, উৎসাহী হয়ে ফোন দিয়ে দেখে, সেটি র্যাবের নম্বর!

শুধু এসব বৈষয়িক বিষয়েই নয়, ‘জন্মিলে মরিতে হইবে’-জাতীয় দার্শনিক শিক্ষাও লাভ করতে পারেন আপনি। ‘জন্ম থেকে জ্বলছি’র মতো উচ্চমার্গের দর্শনচিন্তার জন্ম দিয়েছে পাবলিক বাস। আছে ‘আগে নামতে দিন’-এর মতো নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা। এমনকি ‘ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন; যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ’-এর মতো সামাজিক প্রবচন থেকে শুরু করে ‘কষ্টে আছি আইজুদ্দিন’ কিংবা ‘চাচা, ঢাকা কত দূর’ জাতীয় নাগরিক আশুবাণ্য...কী নেই? সত্যি বলতে কি, এই লেখার আইডিয়াও তো পাবলিক বাসের ঝাঁকুনি খেয়েই! রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৯, ২০০৯

282) লরেল অ্যান্ড হার্ডি

আমরা হাসি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া খুব মুশকিল। তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—আমাদের হাসতেই হয়, কেননা হাসিটা হচ্ছে গাড়ির শক্-এবজর্ভারের মতো, জীবনের অমসৃণ পথে চলাটাকে যা সাহায্য করে। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় নাকি একবার শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে এক সভায় হাসির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি; তো পরদিন বিশ্বভারতীর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ওই সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গেল।’ আর আমাদের হাসায় কারা?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একেবারেই সহজ। আমাদের হাসান কমেডিয়ান্স ও হিউমারিস্টরা। কমেডিয়ান্স আর হিউমারিস্টদের মধ্যে আবার একটুখানি তফাত আছে; হিউমার ও উইটের মধ্যে তফাত যা, কমেডিয়ান ও হিউমারিস্টের মধ্যে তফাত তা। আর আমরা জানি, হিউমারের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে এবং উইটের সম্পর্ক মস্তিষ্কের সঙ্গে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবিসংবাদিত কমেডিয়ান জুড়ি লরেল ও হার্ডি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভূমিকাস্বরূপ উপরিউক্ত কথাগুলো আমাকে বলতেই হলো। সত্যি বলতে কি, কমেডিয়ানদের জুড়িপ্রথাটা ওঁরাই জনপ্রিয় করে তুলেছেন (তৎপূর্বে চার্লি

চ্যাপলিন একা মানুষকে হাসাতেন), যে কারণে আশির দশকে বিলেতে অবস্থানকালে আমি দেখেছি, বিবিসির টিভি প্রোগ্রামে দুই রনি—রনি বার্কার ও রনি লর্বেট আর মোরকম্ব ও ওয়াইজ—হাসাতে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে দিতেন।

লরেল তথা স্ট্যান লরেলের প্রকৃত নাম আর্থার স্ট্যানলি জেফারসন আর হার্ডি তথা ওলিবার হার্ডির প্রকৃত নাম নরভেল হার্ডি (Norvel Hardy)। হার্ডির অবশ্য একটা ডাকনাম ছিল। বেইব (Babe), যেটা বেবি (Baby) শব্দেরই অপভ্রংশ। তবে কমিক ফিল্মে তাঁরা একে অন্যকে ‘স্ট্যান’ ও ‘ওলি’ বলে অভিহিত করতেন। লরেলের জন্ম ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারে আর হার্ডির জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যে। অথচ তাঁরা কেমন করে আমেরিকায় একত্র হয়ে জুটি বেঁধে সুনাম কুড়ালেন, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

অবয়বের দিক থেকেও তাঁরা দুজনে ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন—লরেল হালকা-পাতলা, ট্যাংট্যাংগা আর হার্ডি মোটাসোটা, এক কথায় স্থূল। ভুল তথা বোকামিটা করতেন লরেলই, তবে শারীরিকভাবে সেটার শাস্তি ভোগ করতেন হার্ডি। আর তেমন সময়টায় তিনি যে কথাগুলো সচরাচর বলতেন, সেটা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পায়: ওয়েল, দ্যাটস অ্যানাদার ফাইল মেস ইউ আর গাটেন মি ইনটু (বেশ, তুমি আমাকে আরেকটা গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছ)! এ রকম অবস্থায় বরাবর লরেল তাঁর শিশুসুলভ দুষ্টুমির হাসি হেসে বিশেষভাবে রপ্ত করা ভঙ্গিতে যখন হেঁটে যেতেন, তখন দর্শকদের না হেসে উপায় ছিল না।

১৯২৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত তাঁরা দুজনে জুটি বেঁধে শতাধিক কমিক ফিল্মে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে কিছু নির্বাক যুগেরও। প্রসঙ্গত, এই জুটির হাসির ফিল্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৭৮ সালে ফরাসি দেশে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে। অতঃপর ওটা এতটাই অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যে পরবর্তী সময়ে লন্ডনে অবস্থানকালে আমি গুটি কয়েক ভিডিও ক্যাসেট কিনে ফেলি। সময়ে সময়ে আমার মনকে প্রফুল্ল করতে ওগুলো ছিল মহৌষধ।

এ স্থলে দু-একটা কাহিনী উপস্থাপন করব—

লরেল ও হার্ডির ভাগে পড়েছে মাত্র এক গ্লাস শরবত, ওটাকে দুজনে ভাগ করে খেতে হবে। হার্ডি ভদ্রতা দেখিয়ে লরেলকে প্রথমে অর্ধেক পান করতে দিলে তিনি পুরোটাই সাবাড় করে ফেললেন, আর হার্ডির উম্মার উত্তরে নেহাত নিরীহভাবে বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম নিচের অর্ধেক আমার। বারান্তরে পুলিশের চাকরিতে প্রবিষ্ট হয়ে প্রথম দিনই তাঁরা টেলিফোনে পুলিশের বড় সাহেবের বাসায় রাতের বেলায় চোর প্রবেশ করেছে সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে বড় সাহেবকেই চোর মনে করে তাঁর চোখ-মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে এসে থানাদার সাহেবের কাছে যখন প্রমোশন দাবি করছিলেন, তখন বড় সাহেবের মুখ উন্মোচিত হওয়ায় দুজনেরই চাকরি চলে গেল। নাইট ওউলস-এ দেখা যায়, তাঁরা দুজনে গৃহস্থামীকে না জাগিয়ে গৃহে প্রবেশ করতে চান। তো ওলি স্ট্যানকে একটি খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করানোর জন্য নিতম্ব ধরে ধাক্কাধাক্কি করছেন, ইত্যবসরে দুজনে তর্কাতর্কি লেগে গেলে স্ট্যান জানালা অতিক্রম করেই শার্শি ওলির ওপর ফেলে দিয়ে ওর প্রবেশপথ রুদ্ধ করে দেন। ওলি অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করে ইশারায় স্ট্যানকে বলেন আস্তে দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে যেতে। স্ট্যান দরজা খোলেন ঠিকই, কিন্তু ওলিকে অভ্যর্থনা করতে বাইরে বেরিয়ে এলে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে বিবিধ হাস্যকর উপায়ে গৃহ-প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে স্ট্যান জোরে দরজার কলবেল বাজালে বাসার বাবুচি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ায় ওলি ততক্ষণে গৃহে প্রবেশে সমর্থ হলেও ভয় পেয়ে বাইরে ছুটে চলে আসেন।

তার মানে, এত সব কসরতের পর তাঁদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না—অনেকটা আমাদের দেশের সেই বোকা লোকটির মতো, যে রাতের বেলায় দূরবর্তী গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ির ঘাটে বাঁধা নৌকায় চড়ে কাছি না কাটায় সারা রাত নৌকা চালিয়েও পরদিন ভোরে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল নিজের বাড়ির দোরগোড়াতেই।

তা এগুলো বলে বোঝানোর নয়, দেখে উপভোগ

করার বিষয়। হিউমার তথা হাস্যরস

ভালোবাসেন না, এমন মানুষ আজ অদি আমি
পাইনি—কেউ একটু বেশি আর কেউ একটু কম
ভালোবাসেন, এই যা। রস+আলোর পাঠক-
পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা রস ভালোবাসেন, তাঁদের
আমি অনুরোধ করব, সম্ভব হলে ইন্টারনেটে
লরেল অ্যান্ড হার্ডি দেখে নিয়ে আমার বক্তব্যের
যথার্থতা যাচাই করে নিন।

পরম পরিতাপের বিষয় হলো, এই দুই ক্ষণজন্মা
কমেডিয়ানের হাসির কাণ্ডকারখানা প্রদর্শন করে
প্রযোজক আর পরিচালকেরা লক্ষ-কোটি ডলার
উপার্জন করেছেন এবং অদ্যাবধিও করছেন।

অথচ তাঁরা দুজন অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে
মারা গেছেন। হার্ডি মারা যান ১৯৫৭ সালে,
আর লরেল আট বছর পরে ১৯৬৫ সালে।

লরেল তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে পার্টনারের
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শরিক হননি। বলেছেন, ‘বেইব
বুঝবে।’ ব্যাপারটা আমাদের সেই গল্পটার কথা
স্মরণ করিয়ে দেয়—

জনৈক কমেডিয়ান বিষণ্ণতায় ভুগতে ভুগতে
পরামর্শের জন্য গেছেন একজন মানসিক
রোগের চিকিৎসকের কাছে। তা চিকিৎসক
তাঁকে মন চাঙা করার জন্য বললেন, ‘আপনি
অমুক কমেডিয়ানের কাছে যান, তাঁর হাসির
কথাবার্তা শুনে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে।’
কমেডিয়ান বললেন, আমিই তো সেই ব্যক্তি।’
পুনশ্চ সহৃদয় পাঠক! আপনি ভেবে বসবেন না
যেন, আমি শেষোক্ত গল্পটা একদম বানিয়ে
বলছি। বছর কয়েক আগে পত্রিকার পাতায়ই
বেরিয়েছিল, মি. বিগ খ্যাত মি. রোয়ান
এটকিনসন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন ‘ডিপ্রেশন’ হেতু
মানসিক রোগের চিকিৎসককে দেখাতে।

আতাউর রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৯,
২০০৯

283) কত খাবি খা!

আমিই হবো সেরা পেটুক

পেটুক প্রতিযোগিতা ২০০৯ জ্ঞানীজনেরা বলেন,
বাঁচার জন্য খাও, খাওয়ার জন্য বেঁচো না। কিন্তু
কিসের কী! বাঁচার জন্য খাওয়া যদি জরুরি হয়,
তাহলে পুরস্কার জেতার জন্য খাওয়াও জরুরি।
জি, পুরস্কার জেতার জন্যই ঈদের এক দিন পর
পাবনায় বসেছিল এক বিচিত্র প্রতিযোগিতার

আসর—পেটুক প্রতিযোগিতা। ঢাক-ঢোল বাদ্য বাজিয়ে এক এলাহি আয়োজন। বর্ণিল সাজে সেজেছিল পাবনা সদর উপজেলার শ্রীপুর খতিব আব্দুল জাহিদ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের মাঠ। চারদিকে হাজার হাজার দর্শক। তারা খেতে নয়, এসেছিল অন্যের খাওয়া দেখতে।

একটু পরই শুরু হবে পেটুক প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় শতানেক পেটুক এসেছেন মাংস খেয়ে নিজের পেটুকত্বের প্রমাণ দিতে। যিনি সবচেয়ে বেশি মাংস খেতে পারবেন, তিনিই হবেন সেরা পেটুক। শুরু হলো রেজিস্ট্রেশন। শুরুতেই নিয়মের ঝঙ্কি। কমপক্ষে দুই কেজি গরুর মাংস খেতে না পারলে ডিসকোয়ালিফাইড। প্রথম ধাক্কাতেই পিছু হটলেন অনেকে। রেজিস্ট্রেশন হলো ৩০ জন পেটুকের।

এবার ডাক্তারি পরীক্ষা। আয়োজকেরা পেটুকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা থেকে একজন ডাক্তার এনেছেন। সেই ডাক্তার সিরিয়াস ভঙ্গি করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পেটুকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও অন্যান্য শারীরিক জটিলতায় বাদ পড়লেন আরও ২০ জন। রইলেন বাকি ১০। তা-ই সই। এঁদের মধ্যে এবার শুরু হলো মাংস খাওয়ার প্রতিযোগিতা। উত্তেজনা তখন চরমে। সবার পেটে (মনে) একই বাসনা—আমি হব সেরা পেটুক।

এক বসায় সাড়ে তিন কেজি মাংস খেয়ে সেরা পেটুকের খ্যাতি অর্জন করলেন জেলার সদর উপজেলার ভাঁড়ারা ইউনিয়নের আওরঙ্গবাদ গ্রামের পৈলান খানের ছেলে আব্দুল কাদের খান। ৭০ বছর বয়সী এই বৃদ্ধের দাবি, তিনি আরও মাংস খেতে পারতেন। আয়োজকেরা তাঁকে খেতে দেননি।

আরও মাংস খেতে না দেওয়ার ক্ষোভ মনের মধ্যেই রেখে তিনি জানালেন, খাওয়াদাওয়া জিনিসটা তার বংশগত। তাঁর দাদা একটানা পাঁচ-সাত কেজি মাংস খেতে পারতেন। বাবাও দাদার সুনাম যথাযোগ্য মর্যাদায় ধরে রেখেছিলেন। শুধু তিনিই সুনাম ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেননি, সবার চেয়ে কম খেতে পারেন।

স্ত্রী, দুই ছেলে আর দুই মেয়ে নিয়ে তিনি যে

সংসার পেতেছেন, সেখানে সবার চাহিদা মিটিয়ে নিজের আর খুব বেশি খাওয়া হয় না। তাই প্রতিযোগিতায় এসেছিলেন। খাওয়া তো ছিলই, সেই সঙ্গে পুরস্কার জিততে পারলে মন্দ কী! কিন্তু তিনিই যে একেবারে পুরস্কার জিতে যাবেন, এটা ভাবেননি। প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ায় পুরস্কার হিসেবে একটি ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন পাওয়ায় তিনি বেজায় খুশি।

আড়াই কেজি মাংস খেয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সেরা পেটুক নির্বাচিত হয়েছেন জেলার মন্দিরপুর গ্রামের আব্দুল জব্বার। সোয়া দুই কেজি মাংস খেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন আওরঙ্গবাদ গ্রামের আব্দুল করিম।

পেটুক প্রতিযোগিতার আয়োজক গিভেন্সি গ্রুপের চেয়ারম্যান খতিব জাহিদ মুকুল জানান, একসময় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাঙালিদের মধ্যে খাদক প্রতিযোগিতা হতো। কে কত খেতে পারেন, তা নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে চলত জল্পনা-কল্পনা। গ্রামবাংলার এই হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন।

আমাদের হারানো সব ঐতিহ্য ফিরে আসুক।

কিন্তু যে দেশে টিন খাদক, গম খাদকের ছড়াছড়ি, সে দেশে আবার মাংস খেয়ে পেটুকত্বের প্রমাণ দিতে হলে তো একটু মুশকিলই বটে। সরোয়ার উল্লাস

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৯, ২০০৯

284) আমার রাশিফল

অন্যান্য যেকোনো যুক্তিবাদীর মতো হাত দেখানো, কোষ্ঠীবিচার— যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বাইরে আমি প্রভূত অনুকম্পা এবং উপেক্ষা দেখিয়ে থাকি। লক্ষ কোটি মাইল দূরে থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রেরা কোনো এক জৈব-কণিকা সুনন্দ রায়ের ভাগ্যনিয়েন্ত্রণ করে আসছে, এ রকম একটা উদ্ভট কল্পনাকে প্রশ্ন দিতে যাব এই যুগে?

তবু একেবারে উচ্চ উচ্চ শিক্ষিত—মানে, পিআরএস, পিএইচডি, ডিএসসি ইত্যাদি উপাধিওলা অতীব জ্ঞানী ব্যক্তিদের আসরেও কখনো কখনো প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে বসতে হয়। তাঁরা তুচ্ছ মাছের দর, বাংলা ফিল্ম—এসব থেকে শুরু করে বিশ্বের বিবিধ

জ্ঞানের জগতে উত্তীর্ণ হয়, আমি মুগ্ধ কাকের মতো হাঁ করে সেই আলোচনাগুলো শুনে থাকি। এরই মধ্যে হঠাত্ অঘটন ঘটে। হয়তো কোনো এক বিদেশি পিএইচডি—জগতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিচয় যাঁর নখদর্পণে—তিনিই হঠাত্ আরেকজনের হাত টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করেন। তারপরই বিশ্বজ্ঞান সাময়িকভাবে স্থগিত—ওই ভদ্রলোককে ঘিরে প্রসারিত হস্তের অরণ্য? আমিও তার ভেতরে হাতটা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করি। আর সমবেতভাবে মুখে ফুটিয়ে রাখি একটা সকৌতুক হাসির রেখা—ভাবটা: ‘সবই তো বাজে, তবু মজাটা দেখাই যাক না একবার!’

কিন্তু মনের অগোচর তো পাপ নেই। যেকোনো বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো জীবনযুদ্ধে যতই বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎটা যতই অতীতে পর্যবসিত হচ্ছে, ততই নিজের ভাগ্যফল জানার জন্য আকুল হয়ে উঠছি। আমার জন্মকালে, যেকোনো বিশ্বাসী হিন্দু- পরিবারের মতো আমারও একটি রাশিচক্র তৈরি হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু পাকিস্তানের বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেটিও অবলুপ্ত— সুতরাং গ্রহ-নক্ষত্রেরা আমার জন্য কোন ভাগ্য তৈরি করে দিয়েছিল, তা আর জানার উপায় নেই। শুনেছি, জন্মদিন থেকে রাশিচক্র তৈরি করে দেন জ্যোতিষীরা, কিন্তু আমার আর সাহসে কুলোয় না—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কোন কেউটে সাপ বেরিয়ে আসবে কে জানে।

অতএব রবিবারের বাংলা খবরের কাগজ খুলে আমার প্রথম দ্রষ্টব্য: ‘রাশিফল’।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমার কোন রাশি? মেষ, বৃষ, মিথুন থেকে কুম্ভ, মীন পর্যন্ত সবগুলো অনুধাবন করলুম। বৃষ? উহুঁহু—না মিলছে চেহারায়—না শৃঙ্গধারী পৌরুষে। মিথুন? কিসের মিথুন? গৃহিণী সপ্তাহে চার দিন করে জানাচ্ছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে অপদার্থ লোকটির পাল্লায় পড়েছে সে। ককট? আরে ছ্যা—।

বৃশ্চিক? নেভার। সিংহ? বাপরে—ও রকম শৌর্যবীর্য কোথায়? ধনু? তা ওই রকমই বেকে আছি বটে—কিন্তু তীরটির ছুঁড়তে পারি না।

কন্যা? অসম্ভব—স্ত্রীজাতি হতে চাই না। তুলা? শেষে দাঁড়িপাল্লা হব? ইমপসিবল। মকর—মানে কুমীর? না— আমি কারুর ঠ্যাং ধরে তলিয়ে

নিতে চাই না। কুস্ত? ওই রকম হয়ে বসে আছি বটে—কিন্তু কলসি হতে কে চায়—আর যখন ওতে করে নিজের চেহারার ওপরে রিফ্লেকশন আসে! মীন? আরে রাখো—মাছ হতে যাব কোন দুঃখে? বিশেষ করে ইংরেজি ‘মীন’-এর একটা বাজে অর্থ আছে যখন।

সুতরাং—বাই ল অভ এলিমেনেশন—মেসটাই পছন্দ করা যাক। বেশ নিরীহ, শান্ত একটি বগীয় মেসশাবক। লড়াইয়ে মেড়া নয়—ও-রকম দুর্ধর্ষ গোঁ আমার নেই—আমি ইংরেজি নার্সারি রাইমের ‘মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব’-এর সেই ভেড়ার শিশুটি। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্বলন্ত ধিক্কার আমাকে লজ্জা দেয় না: ‘মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।’ আমি বরং ‘আমরা’র পরের কমাটাকে ‘নহি তো’র পাশে তুলে এনে—আমার দিক থেকেই, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই: ‘মানুষ আমরা নহি তো, মেষ।’

অতএব আমার রাশি আমি আবিষ্কার করেছি। বেশ ছিলুম—প্রত্যেক রবিবারে রাশিফল দেখে যাচ্ছিলুম বাড়ির বাংলা কাগজটিতে। ‘ব্যয়াদিকো কষ্ট পাবেন, কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায় না, শত্রুতা বৃদ্ধি হতে পারে, শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি হবে—’ ইত্যাদি দেখে কখনো পুলকিত, কখনো রোমহর্ষিত, কখনো বিচলিত, কখনো বিমোহিত, কখনো ভাবিত—এইসব হওয়া যাচ্ছিল। মিলুক আর না-ই মিলুক—‘অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করবেন, শত্রুরা পরাভূত হবে, কর্মক্ষেত্রে যশোলাভ করবেন’—এ রকম কোনো মোক্ষম ঘোষণার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছি—এমন সময় আরেকটা গোলমালে ব্যাপার হয়ে গেল।

রবিবার সকালে এক ভাইপো দেখা করতে এসেছিল, তার হাতে ছিল সেদিনের কাগজ। যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গেল। আমি এ কাগজটা রাখি না—খুলে, এর ‘রাশিফল’ দেখে তো আমার চক্ষুস্থির।

ইতিপূর্বে আমার কাগজটিতে মেষ সম্পর্কে জেনেছি: স্বাস্থ্য ভালো যাবে, আয়ব্যয়ের সমতা থাকবে, ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটামুটি শুভ—কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে উল্টো গাইছে!

‘ব্যয়বৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবেন, শরীর ভালো যাইবে না—নতুন প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।’ একি ব্যাপার!

মনে একটা জটিল দুর্ভাবনার উদয় হলো। প্রতিবেশীর কাছ থেকে তৃতীয় আরও একটা কাগজ আনালুম। এবং যা দেখলুম— তা না বলাই ভালো। মোটের ওপর, সেখানেও ভাগ্যচার্য আরেকটি তৃতীয় মত পোষণ করছেন। এঁরা সবাই তো গুণীব্যক্তি—কিন্তু আমি কোন দিকে যাই? কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকা গেল। তারপর পরশুরামের ‘ভুশুণ্ডীর মাঠে’র কারিয়া পিরেতের মতো দরাজ গলায় গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করল: ‘আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগলুকে বিটিয়া/কেকরাসে সাদিয়া হো কেকরাসে হো-ও-ও—’!

মানে—আমার ‘সাদিয়া’—কোন কাগজের ‘রাশিফলে’র সঙ্গে? হঠাৎ একটা জিঘাংসা জাগল। চুলোয় যাক মেষ! আমি তো ‘ফ্রি লানস’—যদি জুৎসই একটা ভালো গণনা পেয়ে যাই—যেকোনো রাশি হতে আপত্তি নেই। বৃষ-বৃশ্চিক-কর্কশ-কন্যা-মকর-মীন—অ্যানিথিং। দেখা যাক—এঁরা তিনজন কোন রাশি সম্পর্কে একমত। সেইটেই আমার রাশি—ন্যায়তঃ ধর্মতঃ হতে বাধ্য।

এক ঘণ্টা স্কুটিনি বৃথাই গেল। আলাদা কাগজের পাঠকের আলাদা রাশিফল হয় কি না কে জানে! ঠিক আছে, আমি মরিয়া। প্রত্যেক সপ্তাহে রাশি বদলাব এরপর থেকে। যেকোনো রাশিতে বিহার করে বেড়াব আর যেটা সবচেয়ে খারাপ—সেইটেই বেছে নেব। নিজের জন্য এসপার-ওসপার হয়ে যাক একটা! নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০): কথাসাহিত্যিক। এই রচনাটি তাঁর ‘সুনন্দর জার্নাল’ থেকে সংগৃহীত।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৭, ২০০৯

285) সিএনজির ওই লোহকপাট

মানবজীবন বড়ই সমস্যাময়। সিএনজি অটোরিকশায় দরজা স্থাপন মানুষের সমস্যার তালিকায় এক নতুন সংযোজন। এর আগে চালকের আসনের দুই পাশে দরজা থাকলেও যাত্রীরা ছিলেন দরজামুক্ত। কিন্তু স্বাধীনচেতা বাঙালিদের যাত্রীস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে একটি বিশেষমহল। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক উসকানিতে সম্প্রতি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী আসনের দুই পাশে লাগানো

হয়েছে লোহার গারদের মতো দরজা।
আপাতদৃষ্টিতে এই দরজাকে মলম পার্টিসহ
ছিনতাকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে
আশীর্বাদ ভাবলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে
তা আসলে অভিশাপ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বাহিনী এদের দমন করতে পারছে না, ফলে
আমরা হয়ে পড়েছি লৌহকপাটের ভেতর
অন্তরীণ। নগরায়ণের এই যুগে একটু মুক্ত
হাওয়ার জন্য যখন মানুষ আঁকুপাঁকু করছে,
তখন সিএনজি অটোরিকশায় লোহার গারদ
লাগিয়ে মুক্ত হাওয়ার পথ রুদ্ধ করে এই
জনপ্রিয় বাহনটিকে একটি চলমান খাঁচায়
পরিণত করা হচ্ছে। অথচ যাত্রীরা কোনো
ভয়ানক প্রাণী নয় যে তাদের খাঁচায় আটকে
রাখতে হবে। তা ছাড়া রাস্তার ভিক্ষুক-
ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে যাত্রীদের যে আত্মিক
সম্পর্ক, তাতেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই
লৌহকপাট। কিছু কিনতে হলে এখন দরজা
খুলে, পরখ করে তারপর কিনতে হবে। এতে
অপচয় হবে শ্রম ও সময়ের। আর অপচয়কারী
শয়তানের কেমন আত্মীয় তা সবারই জানা।
রাস্তার বাতিগুলো বিকল থাকায় অন্ধকারে
এমনিতেই বোঝা যায় না সিএনজিতে যাত্রী
আছে কি না। আর দরজা থাকলে তো কিছুই
বোঝা যাবে না। ‘ওই সিএনজি’ বলে চিৎকার
দিয়ে বোকা বনতে হবে। সবচেয়ে ভয়ংকর
ব্যাপার হলো, এই বাহনটি অত্যন্ত হালকা।
সামান্য অসতর্কতার কারণে যেকোনো সময়
দুর্ঘটনায় এটি উল্টে গিয়ে যাত্রী-চালক একসঙ্গে
আটকা পড়তে পারে। তাই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
এই জাতীয় সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য
কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ,
একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্নাসূত্রঃ দৈনিক
প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৭, ২০০৯

286) কোচ সমাচার

‘কোচ দুই ধরনের। এক দল বরখাস্ত হয়েছে।
আরেক দল বরখাস্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।’
কথাটা নিশ্চয়ই এর মধ্যে কয়েক হাজার বার
শুনে ফেলেছেন। শুনুন বা না-ই শুনুন, কোথাও
কোনো কোচ বরখাস্ত হলে পত্রিকায় তো
পড়েছেন নিশ্চয়ই?

এই আগুবায়ে আমাদের দেশে সর্বশেষ
সংযোজন ‘সাবেক’ কোচ এডসন সিলভা

ডিডো। কিন্তু কোচরা এমন ঘন ঘন ছাঁটাই হন কেন? অন্য কোনো দলের কথা জানি না। তবে ইংল্যান্ডের নিচু সারির একটি দলের একজন পরিচালক উত্তর দিয়েছিলেন, ‘একই কোচ বেশি দিন রাখলে, তার অজুহাতগুলো সমর্থকদের মুখস্থ হয়ে যায়। হারের পক্ষে নতুন নতুন যুক্তি দেখানোর জন্য আমরা নতুন নতুন কোচ নিয়োগ দিই।’

তার মানে, কোচের কাজ শুধুই হারা! হলেও হতে পারে। হারতে হারতে একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক ইংলিশ কোচের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। কারণ, কর্মকর্তারা বলে দিয়েছেন, এবার ম্যাচ না জিতলে সোজা বের করে দেওয়া হবে এবং বেতনটেতনও পাবেন না! বেচারী কোচ দুশ্চিন্তায় নিজের ওজন কমিয়ে ফেলেছেন। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে ভালো একটা বুদ্ধি দিল, ‘তোর দলকে প্রতিদিন সকালে ১০ মাইল করে দৌড়ানোর ব্যবস্থা কর।’

কোচ তো অবাক, ‘কেন? তাতে কি আমরা ম্যাচ জিতব?’

‘আরে নাহ্। তোর পরের ম্যাচ এখনো ১০ দিন পর। প্রতিদিন ১০ মাইল করে দৌড়ালে ওরা ম্যাচের দিন ১০০ মাইল দূরে থাকবে। হারা-জেতার তো প্রশ্নই আসে না।’

সেই কোচ এই সমাধানে আস্থা রেখেছিলেন কি না, কে জানে! তবে একই অবস্থায় পড়া আরেক কোচ একটু অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক ভাবলেন, হারতে হারতে খেলোয়াড়েরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। আজ ওদের সঙ্গে বরং প্রাথমিক কিছু কথা বলা যাক। অনুশীলনে এসে সব খেলোয়াড়কে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে হাতে একটা ফুটবল নিলেন, ‘এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের ফুটবল। আমরা এটা খেলি, কারণ...।’

হঠাত্ এক খেলোয়াড় হাত উঁচু করে বলল, ‘কারণ, এটা আমাদের নিয়ে খেলতে পারে না।’

এমন অবস্থায় সব কোচ মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না। স্কটিশ লিগের একটা ফুটবল দলের কোচ মাথা গরম করে ফেলেছিলেন। বিশ দলের লিগে তার দল ঠিক ২০তম স্থানে মৌসুম শেষ করেছে। শেষ ম্যাচের পর খেলোয়াড়দের নিয়ে বসেছেন কোচ। মুখ কালো করে বললেন, ‘বিশ দলের মধ্যে ২০তম হয়েছে। তোমাদের লজ্জা

করে না?’

এক খেলোয়াড় বলল, ‘না, স্যার। লজ্জা করে না। এর চেয়ে খারাপ কিছুও তো হতে পারত।’ এবার কোচ অবাক, ‘এর চেয়ে খারাপ কিছু কীভাবে হবে!’

‘লিগে দলের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারত।’ এমন খেলোয়াড়দের হাতে পড়লে খেলা তো খেলা, জীবন সম্পর্কেও বিতৃষ্ণা ধরে যাওয়ার কথা। মার্কিন ফুটবলের একটি দল ‘নিউইয়র্ক জেট’-এর সহকারী কোচ ডগ প্লাঙ্ক একবার তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘আমার জীবনে যত খেলোয়াড় পেয়েছি, সবাই শতভাগ টেম্পারমেন্টাল। ওদের ৯০ ভাগই টেম্পার (উত্তেজনা) আর ১০ ভাগ ছিল মেন্টাল (উন্মাদ)।’

কোচদের অভিজ্ঞতা যে অভিন্ন, সেটা বুঝতে জার্মান এক কোচের উদ্ধৃতি মনে রাখতে পারেন, ‘কোচিংটা হলো, পারমাণবিক যুদ্ধের মতো ব্যাপার। এখানে কেউ জেতে না। কেবল কিছু মানুষ এর মধ্যে বেঁচে যায়।’

ভারতের এক ক্রিকেট কোচ নিজের কাজে তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, ‘কোচের কাজ হলো কর্মকর্তা, সমর্থক আর খেলোয়াড়দের সন্তুষ্ট রাখা। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এই তিন পক্ষ তিন ধরনের মনোভাব নিয়ে বসবাস করে।’ আর তিন পক্ষের মাঝে পড়ে প্রাণ (নাকি চাকরি?) যায় বেচারার কোচের। ও রকম এক কোচের চাকরি চলে গেছে।

রেলস্টেশনে তাঁকে পাকড়াও করেছেন সাংবাদিকেরা। এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, ‘খেলোয়াড়েরা কি আপনার সঙ্গে ছিল না?’

‘না। ছিল না।’

‘কর্মকর্তারা আপনাকে সমর্থন দেননি?’

‘না। দেননি।’

‘সমর্থকেরাও আপনার পেছনে ছিল না!’

‘না, না। সমর্থকেরা আমার পেছনে ছিল। এই তো এ রেলস্টেশন পর্যন্ত ওরা আমার পেছন পেছন ধাওয়া করে এসেছে।’ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪, ২০০৯

287) ত্বকের যত্ন নিন

ত্বকের যত্ন নিন। আর উপায় নেই। উদাস হয়ে থাকার দিন শেষ। এখন নিজের খানিকটা যত্ন আপনাকে নিতেই হবে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিজেকে একটু বাড়তি সময় দিতেই হবে। একটু ফিটফাট, একটু ঠিকঠাক।

একই সঙ্গে চোখেরও যত্ন-আত্তি করতে হবে আপনাকে, তবে ত্বকটা প্রাধান্য পাবে বেশি।

চোখ যদি আপনার মনের কথা বলে, তাহলে জেনে রাখুন, ত্বক কথা বলবে পুরো শরীরের পক্ষ হয়ে। সুতরাং যত্ন নিন।

দিনকাল যা পড়েছে, আর উপায় নেই। ত্বকের আর চোখের যত্ন আপনাকে নিতেই হবে। না হলে নিজেই আফসোস করবেন পরে। অন্যের কাছে হাসির পাত্রও হয়ে যেতে পারেন। কিছুই অসম্ভব নয়।

শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলতে পারে, ছি! ছি! জামাইয়ের এমন জ্ঞানবোধ! এই রুচি! এভাবে কেউ টিভির সামনে যায়! আত্মীয়স্বজন দেখলে কী বলবে! এর কোনো মানে হয়! কিংবা শাশুড়ি হয়তো মুখ বাঁকিয়ে বলবে, বৌমার আর আক্কেল। আরে, কচুপাতা কালারের শাড়ি পরে কেউ বাইরে বের হয়! এখন কী হলো! টেলিভিশনের লোকেরা ধরে বসল। কথা বলতে হলো। এখন সেই ছবি তো সবাই দেখল। আমাদের বউ পরেছে কচুপাতার রঙের শাড়ি। কেমন দেখাল ব্যাপারটা!

সুতরাং এখন থেকেই আপনি সচেতন না হলে, ত্বকের বিষয়ে যত্নবান না হলে এমন অনেক কিছুই হতে পারে।

কারণটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরতে পেরেছেন? পারারই কথা। জটিল কোনো বিষয় না।

দেশে যে আরও ১০টি নতুন টেলিভিশন চ্যানেল আসছে। নতুন এসব চ্যানেলসহ দেশের টিভি চ্যানেলের সংখ্যা দাঁড়াবে ২১টির মতো। এক লাফে ১০টি চ্যানেল বেড়ে যাওয়ায় কী পরিস্থিতি হবে বুঝতে কারোর কষ্ট হওয়ার কথা নয়! শুধু একবার ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। তবে তার আগে গালে খানিকটা ডাল বাটা আর দুই চোখে দুই টুকরো শসা দিয়ে নিন। ভাবনাচিন্তা আর ত্বকের যত্ন একসঙ্গে হয়ে যাবে।

দেশে এতগুলো চ্যানেল হলে কী লাভ আর কী ক্ষতি—এ নিয়ে ইতিমধ্যে চাপা আলোচনা

(চাপাবাজির চাপা নয়) শুরু হয়েছে। পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছেন অনেকেই। কেউ বলছেন, গেঞ্জির আবার বুক পকেট, কাশির ওপর আবার হাঁপানি।

উল্টো যুক্তিও আছে। তাঁদের বক্তব্য, মুখ দিয়েছেন যিনি, আহাৰ দেবেন তিনি। ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে চাকরির মতো ঘরে ঘরে টিভি সেন্টার দেওয়ার পক্ষে তারা। এত এত চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি অন্যভাবে দেখার সুযোগ নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ তো আর মুখের কথায় হয়ে যায় না। সে জন্য ডিজিটাল টেলিভিশন চ্যানেলও লাগে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো নির্দলীয়ও আছেন কেউ কেউ। তাঁরা বুদ্ধিমান এবং বিভিন্ন টেলিভিশনের টক শোতে অংশ নেওয়া সেমি কিংবা পুরো মাত্রার বুদ্ধিজীবী। টক আলোচনার মতো এখানেও তাঁরা কোনো পক্ষে যাচ্ছেন না। এমনভাবে কথা বলছেন যেন কেউ খালি হাতে না ফেরে। নতুন টিভির টক শোর আসন তো তাঁদেরই পূরণ করতে হবে।

লাভ-ক্ষতির হিসাবে আমরাও যেতে চাই না। তবে এতগুলো টিভি চ্যানেল হলে আমাদের সাধারণ নাগরিক জীবনে কী কী ছন্দপতন ঘটতে পারে, কিংবা কী কী ব্যতিক্রম যোগ হতে পারে, সে আলোচনা করাই যায়।

তখন একটা বিষয় ঘটতে পারে সবার আগে। যখন-তখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে টিভি ক্যামেরা এবং এর প্রতিবেদক। তাদের সঙ্গে আপনার দুটো কথা বলতে হতে পারে। হোক সেটা সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে কিংবা আজ সকালের আবহাওয়া আপনার কেমন বোধ হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে। আর টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি কী বলছেন, সেটা কোনো বিষয় না হলেও আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, সেটা কিন্তু বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। টেলিভিশন হচ্ছে দেখার মাধ্যম। সুতরাং ত্বকের যত্ন আপনাকে নিতেই হবে। দয়া করে এখন থেকেই ত্বকের যত্ন নেওয়া শুরু করুন।

আর চোখের যত্নের প্রসঙ্গ আসছে এই কারণে, এত এত টেলিভিশন যে আসছে, তা দেখতে হবে না। আর যদি দেখেন, তাহলে চোখের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। সে কারণে এখন থেকে চোখের যত্নের বিষয়টিও মাথায় রাখতে

হবে। পলাশ মাহবুব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪,
২০০৯

288) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গোলটেবিল

কোপেনহেগেনে চলছে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন। পিছিয়ে নেই দেশের পশুরাও। হুমকির সম্মুখীন সুন্দরবনের এই পশুরাও বহুল আলোচিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এক সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। তাদের আলোচনা তুলে ধরেছেন আদনান মুকিতশেয়াল: এই জঙ্গল এবং এই জঙ্গলের বাইরে যে যেখানে যে অবস্থায় আমাদের এই সম্মেলন উপভোগ করছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ। এত দিন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শুধু আমরাই ঝুঁকির মধ্যে ছিলাম। এবার মানুষেরাও এই ঝুঁকির ভেতর পড়েছে বলে তারা সম্মেলন-টস্মেলন করে অস্থির। যা হোক, এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। প্রথমেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আমাদের সবার প্রিয় জনাব রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

বাঁদর: অবজেকশন! পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে উনি আগে বলবেন, এটা তো হতে পারে না। চিড়িয়াখানায় সবার আগে আমাদের আই মিন বাঁদরদের খাঁচা। সে হিসেবে আগে বক্তব্য দেওয়া আমার মৌলিক অধিকার।

হরিণ: দেখুন মি. বাঁদর, এই স্বল্প পরিসরেও আপনি অনেক বাঁদরামি করছেন। দয়া করে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে বাঁদরামি করে আর সময় নষ্ট করবেন না। যত জ্বালা সব তো আমাদের। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ কাকে বলে, তা আমরা বুঝি। সব সময় আমাদের দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। মগডালে বসে চিনাবাদাম চিবিয়ে এই দুঃখ বুঝবেন না।

কুমির: হরিণ! মুখ সামলে কमेंট করো। আমরা এখানে বাগধারা শিখতে আসিনি। ওই মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক বাগধারাটি বলে তুমি কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের অপমান করছ। আমি সব সহ্য করি, কিন্তু কেউ অপমান করলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।

শেয়াল: এখন ঝগড়া করার সময় না! আমাদের সামনে বিরাট বিপদ। তা ছাড়া জাতীয় পশু

হিসেবে বাঘ সাহেবেরই তো বক্তব্য শুরু করা উচিত।

বাঘ: আমি আর কী বক্তব্য দেব? তোমরা তো অলরেডি কথার মেলট্রেন ছুটিয়ে দিয়েছ। আমি শুধু বলতে চাই, যারা মুরব্বিদের সম্মান করে না, যারা জাতীয় জিনিসকে মর্যাদা দিতে জানে না, তারা কোনো দিনও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। এদের জন্যই জাতি হিসেবে আমরা ব্যাকফুটে আছি।

বাঁদর: এএহ্! ক্ষমতাবানদের স্বভাবটাই এমন, চান্স পেলেই বড় বড় কথা বলে। খুব তো লেকচার দিচ্ছেন, দুর্যোগের সময় আপনি বর্ডার ক্রস করে ওপারে গিয়ে কী কী করেছেন তা জানার জন্য গুগলে সার্চ দেওয়া লাগে না। গাছের মগডাল থেকেই সব দেখেছি।

বাঘ: বাঁদর, আপনার বাঁদরামি কিন্তু দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমরা একটি মহত্ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি। আর আপনি একের পর এক বিতর্কিত ইস্যু তুলে মূল আলোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

শেয়াল: বাঘ সাহেব অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন। বাঁদর আমাদের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে। আপনারা ওর কথায় পাত্তা দেবেন না। কিছুক্ষণ লাফালাফি করে ও এমনিতেই ঝিম মেরে যাবে। আসুন, আমরা আলোচনা রিস্টার্ট করি।

খরগোশ: আমি অনেকক্ষণ ধরেই খেয়াল করছি, বাঘের প্রতি শেয়ালের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। জনাব শেয়াল, আপনি সম্মেলন পরিচালনা করুন। কোনো বিশেষ মহলের চামচামি করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

শেয়াল: ইয়ে মানে... আমরা আবারও মূল আলোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। দয়া করে আপনারা বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আসলে এই পুঁজিবাদী সমাজে...

কুমির: খামোশ! কোনো রকম চালাকির চেষ্টা করলে কিন্তু খবর আছে। আমি ব্যাকডেটেড কুমির নই যে, একই বাচ্চা সাতবার দেখানোর মতো করে ধোঁকা দেবে। খরগোশের কमेंটটি আমি লাইক করলাম। শেয়ালের সমস্যাটা কী?

বাঘ: আমি আগেই বলেছিলাম, খাল কেটে এসব

লো কোয়ালিটির কুমির নিয়ে এলে আলোচনা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না। এদের কাজ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে প্যাঁচ লাগিয়ে বসে বসে মজা দেখা। এরা জাতীয় স্বার্থ বোঝে না।

সাপ: এক্সকিউজ মি, মি. বাঘ। এতক্ষণ আলোচনায় লগইন করিনি বলে ভাববেন না, আমি পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি। কত বড় সাহস! আমার বসার স্টাইল নিয়ে কথা বলে? আমি প্যাঁচ দিয়ে বসে থাকলে আপনার কী? আমার কান থাকলে আপনার লেজ দিয়ে চুলকিয়ে নিশ্চিন্তে শীতনিদ্রায় যেতাম।

খরগোশ: দূর, কচ্ছপটা তিন দিন আগে সম্মেলনের উদ্দেশে যাত্রা করে এখনো ল্যান্ড করতে পারেনি। ও থাকলে এসব ফালতু প্যাঁচাল না শুনে একটা প্রীতি ম্যারাথন রেস দিতে পারতাম, শরীরটাও ফিট থাকত।

বাঘ: শেয়াল, তোমাকে আমি কিঞ্চিৎ স্নেহ করি, কিন্তু তোমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে আলোচনায় এসে এভাবে অপমানিত হতে হচ্ছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। আজ কিন্তু যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

হরিণ: দেখুন, বাঘ সাহেব, আমার দিকে এভাবে তাকাবেন না, আমার হার্টের প্রবলেম আছে। গত মাসে আমার বাইপাস হয়েছে। আর তা ছাড়া আমি কিন্তু আপনার স্বার্থবিরোধী কোনো মন্তব্য করিনি।

কুমির: হরিণ, তুমি নিশ্চিন্তে আমার পাশে এসে বসতে পার। আমি থাকতে ওই বাঘ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

শেয়াল: তা তো অবশ্যই। কুমির অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড়। ক্ষতি যা করার সব সে একাই করতে চায়। কিন্তু সেই সুযোগ তুমি পাবে না। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানেই এই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান, অবস্থা খুব একটা সুবিধার না।

কুমির: শেয়াল! সম্মেলন শেষ করেও পার পাবি না। আমার হাত থেকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। **সূত্র:** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪, ২০০৯

289) দ্য মোটরসাইকেল ডায়েরিজ

মোটরসাইকেল (আমি বলি বৈদ্যুতিক ঘোড়া)
জিনিসটা যে অতিশয় ভয়ংকর, সে আমি
বিলম্বিত জানতাম। তবু কোন কুক্ষণে যে এই
যন্ত্রযান বাগে আনার মহাপরিকল্পনা হাতে
নিয়েছিলাম! রাগে-দুঃখে আমার হাত-পা
কামড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন আর পিছু
ফেরার উপায় নেই। অসহায় চোখে একবার
পেছনে তাকাই। বাঙালি চিরকালই কৌতূহলী
জাতি। এই সকালবেলাতেই নিকেতনের বালুর
মাঠে অন্তত জনাদশেক লোক হাজির। ভিড়ের
মধ্যে আছেন আমার প্রশিক্ষক সদ্য নোয়াখালী
থেকে আগত মোহাম্মদ শাখাওয়াত উল্লাহও।
আজ আমি প্রথম একা হাতে মোটরসাইকেল
চালাতে যাচ্ছি। শিষ্যের এই অগ্নিপরীক্ষার ক্ষণে
তাঁর দুই পাটি দাঁতের সব কটি স্বমহিমায়
উন্মোচিত। উৎসুক জনতারও আশ্রয়ের কমতি
নেই। সকালবেলায় বিনা খরচায় এই রসময়
নাটক দেখার সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? নাটক
জমিয়ে তোলার জন্যই হয়তো তারা আমাকে
দূর থেকে ত্বরিত মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দেয়—
‘ভাইজান, এইটা কোনো ব্যাপারই না। খালি
দূরে তাকায়া থাকবেন। দেখবেন পানির মতো
সোজা।’
মনে মনে প্রমাদ গুনছি। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা
স্রোত বয়ে যাওয়াটা এতকাল মাসুদ রানায়
পড়েছি, ভালো বুঝিনি। এখন সেটা হাড়ে হাড়ে
টের পাচ্ছি। ‘গিয়ার ফালান।’ ওস্তাদের কণ্ঠ
আমার কানে যেন তপ্ত সিসার মতো ঢোকে।
শোনামাত্র আমিও আর দেরি করি না। মারি তো
গভীর, চালাই তো মোটরসাইকেল। দিলাম
ফাস্ট গিয়ার। নয়া চকচকে লাল রঙা হিরো
হোন্ডাও সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে এক লাফ।
পেছন থেকে একটা সম্মিলিত বিজয়ধ্বনি ওঠে।
কিন্তু এই ক্ষুদ্র সাফল্যের আনন্দে গা ভাসানোর
সময় আমার কই? আমার যে মাঠের ওপারে
পৌঁছানো চাই। নাক বরাবর সামনে তাকানোর
চেষ্টা করি। ওস্তাদের নির্দেশ। মাঠের ওপাশের
সীমানা দেয়ালটা আমি আগেই দেখে
রেখেছিলাম। কিন্তু একি! মাঠ কই? আমার
চোখের সামনে কেবল উন্মুক্ত আকাশ।
মোটরসাইকেল রাস্তায় চলে জানতাম। আমারটা
তো মনে হচ্ছে রীতিমতো পঞ্জিরাজ।

পরমুহূর্তেই খেয়াল হয়, আমার বৈদ্যুতিক ঘোড়াটি আসলে আর আমার সঙ্গে নেই। ডানা ছাড়াই আমি জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ডের মতো দিব্যি হাওয়ায় উড়ছি। ওপরওয়ালার কি কুদরত! আমার উড্ডয়নকাল অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সবেগে নিচে নামি। ‘ভাগ্য ভাল। বালির ওপর পইছেন।’ ওস্তাদ শাখাওয়াত উল্লাহ মাঠের পাশের ময়লা ফেলার জায়গা থেকে মোটরসাইকেলটা টেনে আনতে আনতে আমাকে বলেন। হাঁটুর কাছে ছিলে যাওয়া জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমি রণে ভঙ্গ দেওয়ার উপায় খুঁজি। আগে সাইকেল চালানো শেখা দরকার। ওটা দুম করে লাফ দেবে না।

‘মোটরসাইকেল নিছেন লাফ দেওনের জইন্য। তো লাফাইত না?’ শাখাওয়াত উল্লাহ ততক্ষণে বাহনটাকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। আবার আমাকে ওটার ওপর বসানোর পায়তারা করছেন কি না, কে জানে। অগ্নিপরীক্ষা এড়াতে আমি তড়িঘড়ি হাঁটা ধরি। আলোকচিত্রী কবির পোড় খাওয়া মোটরসাইকেলচালক। জীবনের একটা বড় অংশ নাকি সে বাইকের ওপর কাটিয়েছে। একদিন চায়ের দোকানে বসে বাহাস করতে করতে আমি তাকে মনের দুঃখটা বলেই ফেলি। ‘আরে আপনারে আমি শিখাব। আসেন কালকে কলাবাগান মাঠে।’ পরদিন সকালে কবির আর আমি জায়গামতো হাজির। ‘আপনার জন্য আলাদা সিস্টেম আছে। আপনি মোটরসাইকেল চলাইবেন স্টার্ট ছাড়া।’ নয়া ওস্তাদের নয়া তরিকা শুনে তাজ্জব লাগে। আবার দিলে আশাও জাগে একটুখানি। স্টার্ট না থাকলে বাইক লাফ দেওয়ার আশঙ্কা নেই। কবির পেছন থেকে জোরে ধাক্কা দেয়। আমি ওই ধাক্কার জোরে বাইক যতটুকু আগায়, ততটুকুতেই ডান-বাম করার চেষ্টা করি। তোফা ব্যবস্থা। কী দরকার আমার ওই সব জ্যামের রাস্তায় দাবড়ে বেড়ানোর? মোটামুটি আরামেই চলল দিনচারেক। কিন্তু কবিরের পেটে এমন বদমায়েশি কে জানত! ‘আজকে গাড়ি আপনি নিজে স্টার্ট দিবেন। আপনি নিজেই চালাবেন।’ একদিন সকালে সে জল্লাদের মতো মুখ করে বলে। আমি কবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে

বোঝার চেষ্টা করি। ব্যাটা কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে? ওর চোখেমুখে বিন্দুমাত্র ঠাট্টা-তামাশার লেশ নেই দেখে ভেতরে ভেতরে দমে যাই। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ করি না। রাখে ওপরওয়ালা মারে কে। জয় বজরং বলি। ভাঙো দুশমনের খুলি। কবিরকে দেখিয়েই সজোরে গাড়ি স্টার্ট দিই। তারপর সেই বিপজ্জনক মুহূর্ত। গাড়ি ফাস্ট গিয়ারে নেওয়ার পালা। গিয়ার পরিবর্তনকারক দণ্ডটিতে চাপ দেওয়ার আগে আমার পা মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। দুই পায়ের মাঝখানে মোটরসাইকেলটা তখন গর্জন করে যাচ্ছে। খাঁচাবন্দী বাঘ যেন। দোনামনা করছি। এরই মধ্যে আবার সেই অভাবনীয় কাণ্ড। ব্রুম ব্রুম। আপনা আপনিই গর্জন করে মোটরসাইকেল সবেগে চলে গেল ঝোপের আড়ালে। আমি স্বল্পকালীন উড্ডয়নের পর আবার যথারীতি ভূমিশয়্যায়। যা বাবা! কোন ফাঁকে যে পা পড়ে গিয়েছিল গিয়ারে! শেষ খবর এই—আমার মোটরসাইকেল চালনা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে পুরোপুরি আমার ওস্তাদদ্বয়ের কল্যাণে নয়। একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে দেখে। ভদ্রলোকের একটি হাত কবজির কাছ থেকে বাকিটা নেই। সেই কাটা হাত নিয়েই তিনি দিব্যি মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন! একদিন অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে বন্ধু শাহাদাত তুহিনের ফোন। তুহিন ডাক্তার মানুষ। যত দূর জানি, সেও আমার কাছাকাছি সময়ে মোটরসাইকেল চালনা শিক্ষায় নেমেছিল। ‘আর কইয়েন না, মোটরসাইকেল চালনা শেখা যে কী হুজ্জত! ভাবতেছি ব্যালেন্স রাখার জন্য পেছনের চাকার সঙ্গে এক্সট্রা চাক্কা লাগামু। ওই সব ট্রেনিংফ্রেনিং আমারে দিয়া হইব না।’ ফোনের ওপাশে ওর সরল স্বীকারোক্তি শুনে আমার হাসি এ কান ও কান হয়ে যায়। মনের আনন্দ বুকে চেপে আমি সন্তুসূলভ একটা ভাব নেওয়ার চেষ্টা করি। ‘আরে আমি আছি না। শিখায়া দিব তোমারে...আসো একদিন কলাবাগান মাঠে। শিখতে দুই দিন লাগে, বুঝছ? খালি বুকে সাহস রাখবা। আর কিচ্ছু না।’

না, তুহিন সাহস করতে পারেনি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সে একজন মেকানিক খুঁজছে। বাইকের পেছনে অতিরিক্ত দুটো চাক্কা লাগানোর

জন্য। ইকবাল হোসাইন চৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪,

২০০৯

290) হিন্দু মোলানা কিখার গিয়া

বেলাল বেগ পাক-টিভিতে কাজ করতেন। তাঁর পক্ষে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের নীতিনির্ধারকদের সান্নিধ্য পাওয়াটা যেমন সহজ, তেমনি তাদের গোপন মনোভাব সম্পর্কে কিছু আগাম ধারণা লাভ করাও সম্ভব ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ তিনি। প্রখর বুদ্ধির জোরে তাঁর পক্ষে অপ্রখর পাকিদের অন্তর্জগৎ সার্ফিং করাটা খুব কঠিন ছিল না। তিনি বললেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, পাকসেনারা তাদের সার্চ লাইট অপারেশনের শুরুতে নির্বিচারে বাঙালি নিধনে ব্রতী হলেও এখন কিন্তু তাদের নির্বিচার-নিধনের শিকার হবে মুখ্যত হিন্দুরা। যার প্রমাণ আপনি জিজ্ঞারায় নিজেই কিছুটা পেয়েছেন। সুতরাং দেশের বাড়িতে ফিরে গেলেও সেখানে গিয়ে খুব বেশি দিন আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন, এমনটি ভাববেন না। পাকসেনারা দ্রুতই মফস্বলের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। তাদের ছত্রছায়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ হবে। ওরা দেশটাকে হিন্দুশূন্য করার চেষ্টা করবে। নির্বিচারে হিন্দু-নিধনের পাশাপাশি চলবে বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধরে নিধন ও নির্যাতন করার কাজ। খবর পেয়েছি, ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শরণার্থীশিবির খোলা হয়েছে, যত দ্রুত পারেন সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবেন। পাকসেনাবাহিনীর পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে বেলাল বেগের আহরিত ধারণাগুলো আমার নিজের আশঙ্কার সঙ্গে মিলে গেলো। স্থির করলাম, পরদিনই আমরা ঢাকা ত্যাগ করব। বেলাল বেগ আমার সঙ্গে একমত হলেন যে, মেসে রাত না-কাটানোই ভালো। বেলাল বেগের বাসায় থাকাটাও ঠিক হবে না। তাতে আমাদের বিপদ তো কাটবেই না, বরং আমাদের মতো মুক্তিদের আশ্রয়দানের কারণে তাঁর বিপদ বাড়বে।

সন্ধ্যার পরপর আমরা যখন আমাদের মেসে

প্রবেশ করছিলাম, তখন আমার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে কাছে ডেকে চুপিচুপি জানিয়েছেন যে, পাড়ার বিহারিরা মেসের আশপাশের লোকজনের কাছে আমার অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল। ওরা আশপাশের লোকজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল, ‘হিন্দু মৌলানা কিধার গিয়া?’ কথাটা শুনে আমার খুব হাসিও পেল, আবার খুব ভয়ও পেলাম। বুঝলাম, আমাকে ‘হিন্দু মৌলানা’ বলে আমার প্রতি ঐ বিহারিরা যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তা শুধু আমাকে শনাক্ত করার সুবিধের জন্যই। আমার লম্বা চুল-দাড়ির কারণেই আমার এই উপাধিপ্রাপ্তি। দশচক্রে পড়ে আমি যে আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় দাড়ি সম্প্রতি কেটে ফেলেছি, সেই তথ্যটি তারা জানে না। আর জানে না বলে, আজিমপুরে ফিরতে দেখেও আমাকে হয়তো ওরা চিনতে পারেনি। দাড়ি কাটার সময় আমার কষ্ট হয়েছিল। রাগ হয়েছিল দাড়ি কাটায় প্ররোচনাদানকারী আমার কবিবন্ধু আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, রফিক আজাদ, শহীদ কাদরীদের প্রতি। ‘হিন্দু মৌলানা’ সন্ধানী বিহারিদের চোখে ধুলো দিতে পারার আনন্দে আমার সব রাগ, সব কষ্ট জল হয়ে গেল।

নেতাজি মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়ে আফগানিস্তান দিয়ে রাশিয়া হয়ে হিটলারের জার্মানিতে পালিয়েছিলেন। আর আমি আমার আসল দাড়ি কেটে, বিহারিদের চোখে ধুলো দিয়ে আমার মেসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে আমার মনে হতে লাগল। মনে হলো, কবি তো কিছুটা নেতাও বটে।

পাকসেনাদের চাইতে স্থানীয় বিহারিদের ভয়টাই আমাকে বেশি পেয়ে বসল। ভাবলাম, ওদের হাতে ধরা পড়লে ওরা আমাকে মৌলানার সম্মান তো দেবে না, ‘মালাউন’ হয়ে মৌলানার লেবাস ধারণের অপরাধে আমাকে কচুকাটা করে তাদের গায়ের ঝাল মিটাবে। সুতরাং মেসে থাকার ঝুঁকি না নিয়ে স্থির করলাম, মেসের সামনে শাহজাদাদের বাড়িতে রাত কাটাব। ওরা শহরের বাড়ি ছেড়ে সবাই ওদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে চলে গেছে। বাড়িটি সম্পূর্ণ খালি।

প্রতিটি ঘরেই বড় তালা ঝুলছে কিন্তু ওদের
রান্নাঘরটি খোলা পড়ে আছে। আমরা
শাহজাদাদের ওই রান্নাঘরে রাত্রি যাপনের
সিদ্ধান্ত নিলাম। নির্মলেন্দু গুণ: কবি।
এই লেখাটি তাঁর আত্মকথা ১৯৭১ গ্রন্থ থেকে
সংগৃহীত।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪,
২০০৯

291) বাঙালির প্রতিভা

বাঙালির রসবোধ এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রথম
পরিচয় পেয়েছিলাম রংপুর পাবলিক লাইব্রেরির
টয়লেটে। ইয়ার্কি হচ্ছে না মোটেও। বাঙালির
প্রতিভা নিয়ে ঠাট্টা করে পাঠকের গাটা খাওয়ার
খায়েশ হয়নি আমার। বিষয়টা তাই খোলাসাই
করা যাক।

ভেতরে বসে অতিজরুরি কাজটা করার সময়
চোখ-কান খোলা রাখলেই বাঙালি প্রতিভার
নমুনা নজরে পড়ত। যেমন এক জায়গায় লেখা:
‘হে মহাজ্ঞানী, কর্ম করিয়া ঢালিও পানি’। অতি
উত্তম উপদেশ। একদম সামনে, দরজার
ভেতরের পাশটায় লেখা ছিল: ‘ডানে তাকান’।
যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংকেত আছে ডান
দিকের দেয়ালে। মহা উৎসাহ নিয়ে ডানে
তাকালাম। সেখানে লেখা: ‘বামে তাকান’। রহস্য
আরও ঘনীভূত। তাকালাম বাঁয়ে। সেখানেও
খোলাসা হলো না কিছুই। কারণ, সেখানে লেখা:
‘ওপরে তাকান’। শার্লক হোমস থেকে শুরু
করে ফেলুদা—সব উত্তেজনা ভর করল আমার
ওপর। সাগ্রহে তাকালাম ওপরে, ছাদ বরাবর।
সেখানেই বোঝা গেল লেখকের গুপ্তসংকেতের
আসল উদ্দেশ্য: ‘এবার তাকিয়েই থাকুন’!
এই অর্থশূন্য বাক্যে চিরকালের জন্য তাকিয়ে
থাকা অর্থহীন। তবে ওই টয়লেটের দেয়ালে
এক চিত্রকর্মে আমি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম।
মুগ্ধতা নিয়ে নয়, আসলে পিকাসোর দুর্বোধ্যতায়
আঁকা সেই ছবির মাজেজা বুঝতে আমার মতো
স্লো র‍্যামওয়ালা মানুষের সময় লাগাই স্বাভাবিক।
দূর থেকে পুরো ছবিটি একনজরে তাকিয়ে
লজ্জাই পেলাম। কারণ, খানিকক্ষণ আগে যেসব
রেখাগুলোকে আমি আঁকাবাঁকা নদী, পাহাড়,
বৃক্ষ, গ্রামের পথ ঠাওরে ছিলাম; সেসবের সমষ্টি
আসলে একটা মানুষের শরীর। বলা বাহুল্য,
সেই অঙ্কিত শরীরের ওপর কাপড় চড়ানোর

মতো যথেষ্ট বিদ্যা কিংবা ইচ্ছা সেই শিল্পীর ছিল না।

একটু ভালো করে তাকাতেই বুঝলাম, শিল্পী আসলে একজন শরীর বিশেষজ্ঞ। কারণ, পুরো দেয়ালটাই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রতিভা প্রকাশে। যে চিত্রকর্মের তুলনা করা যায় পিকাসোর ‘ইয়াং লেডিজ অব অ্যাভিনিয়ন’-এর সঙ্গে। পার্থক্য কেবল, মহামতি পিকাসোর রসবোধ ছিল সূক্ষ্ম, অজানা এই শিল্পীর রসবোধ স্থূল। কারণ, শরীরের সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি ঐকেছেন বিশেষ যত্ন নিয়ে। ১০-১২ বছর বয়সী এক কিশোরের কাছে সেই ছিল সচিত্র শরীরবিদ্যার প্রথম পাঠ!

শুধু শরীরবিদ্যা নয়, জটিল সব সমীকরণ চর্চার নজিরও দেখেছিলাম ওই টয়লেটে। তবে গাণিতিক রাশির বদলে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছিল মানুষের নাম। না, শুধু বন্ধুর+বিলকিচ এই সরল সমীকরণেই শেষ হয়ে যায়নি প্রতিভার পরিচয়। এখনো একটা সমীকরণ স্পষ্ট মনে আছে:

(পার্থ+মণি)-(তোমার বাবা-আমার বাবা)= ০!
তবে একটা জিনিস তখনো বুঝতাম না।
পানপাতার ভেতর দিয়ে তীর গেলে কী হয়।
কারণ, অধিকাংশ টয়লেটে দেখি এই এক ছবি।
বোঁটাহীন একটা পানপাতা। সেটার ভেতর ছেদ করে চলে গেছে একটা তীর। শেষে কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে প্রশ্নটা আমার বাসার শিক্ষককে করেছিলাম। ব্যাখ্যা দেওয়ার বদলে তিনি আমাকে দিয়েছিলেন পাঁচ মণ ওজনের এক থাপড়! তখনো বুঝিনি তাঁর রাগের কারণ কী। প্রশ্নটা কি বেয়াদবির শামিল? নাকি, এত সহজ জিনিসও না বোঝার শাস্তি?

সেই প্রশ্নের উত্তর আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমার এক সহপাঠিনী। আমারই চোখের সামনে যখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিল আমার প্রথম সাহিত্যকর্ম—সাত পাতার আবেগে ভরা সুদীর্ঘ প্রেমপত্র। বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠতেই বুঝে গিয়েছিলাম, পানপাতাটা আসলে বুকের বাঁ পাশে থাকা হৃদপিণ্ড। আর তীরটা সেই ছলনাময়ীদের তূণে থাকা এক অব্যর্থ মারণাস্ত্র। সংকোচে জানাই, তীরবিদ্ধ হওয়ার কিছু দিন পরে এই লেখক নিজে তাঁর প্রথম অনুকাব্যটি লিখেছিল সেই টয়লেটের দেয়ালেই।

পৃথিবীর মহত্ সব সৃষ্টিকর্মের প্রাথমিক ধারণাটি নাকি গুণীজনেরা টয়লেট থেকেই পেয়ে থাকেন। বিদেশিরা সেটি আরও ভেবেচিন্তে কাজে লাগায়। আর বাঙালিরা সদ্যলব্ধ সৃষ্টিশীলতা কাজে লাগায় সঙ্গে সঙ্গে, মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় টয়লেটের দেয়াল। এ ক্ষেত্রে পাবলিক টয়লেটগুলো বেছে নেওয়ার কারণ, শিল্পী আসলে নিশ্চিত হতে চান, তাঁর সৃষ্টিকর্ম কেউ না কেউ উপভোগ করবে। শুধু তাই নয়, নিচে লিখে রেখে যাবে নিজের মন্তব্য। বাঙালি চিরকালই নিজের প্রতিভার প্রতি অবিচার করেছে। আর তাই গন্ডা গন্ডা নোবেল চলে যাচ্ছে বিদেশিদের দখলে।

তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পাবলিক টয়লেটগুলোর দেয়াল কোনোভাবে নোবেল কমিটির কাছে কুরিয়ার বা যেকোনো উপায়ে পাঠাতে পারলেই কেবলা ফতে!রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২১, ২০০৯

292) চিঠিবাজি

সুকান্ত দত্ত আজ সকালের ডাকে আমার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন: সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটনমিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। মেয়েটি সুশ্রী, খুব ফরসা, বিএসসি পাস করতে পারেনি, তবে বেশ চালাক। ফটো পাঠালুম। আশা করি তোমার পছন্দ হবে। তেইশে ফাল্গুন বিবাহ। বিবাহের অন্তত দুদিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত আমার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফটোটাও ভালো করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রং নিয়ে এক টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ-হাতের কজির ওপর কাগজখানা রেখে বারবার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল: শ্রীযুক্ত সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রং কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রং ঠিক কী রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সে

জন্য এক টুকরো কাগজে রং লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ-হাতের কজির ওপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এ রকম গাঢ় শ্যামবর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে দয়া করে একলাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সে ক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হোক। ইতি সুকান্ত।

চার দিন পরে উত্তর এল।—ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পাননি, আমার গায়ের রং আপনার চেয়ে ময়লা, কনে দেখার সময় আমাকে পেণ্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতো সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকার রং নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার ওপর একটু ব্লু ব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। ইতি সুনন্দা।

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনার রং আমার চেয়ে একপোঁচ বেশি ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল, কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ। কিন্তু পরেই মনে হলো, এ রকম ভাবা নিতান্ত মূর্থতা। রং ময়লা হলেই মানুষ কুঁসিত হয় না।

আমার একটা বদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনেরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেট-খোরদের নিঃশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চম্ফুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। আপনার আপত্তি থাকলে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব। সুকান্ত।

চার দিন পরে সুনন্দার উত্তর এল।—মুখপোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। আমি রোজ বিশ-পাঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায়

তাদের নিঃশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে।
আপত্তি না থাকলে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে
দেবেন। ইতি সুকান্ত।

সুকান্ত উত্তর লিখল—আপনি যখন সিগারেটের
দুর্গন্ধ সহিতে রাজি আছেন তখন পান-দোক্তায়ও
আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমার আর
একটি ত্রুটি জানাচ্ছি। সুরঙ্গী নামে এক মেয়ের
সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। সম্প্রতি সে বিয়ে
করেছে। সুরঙ্গীর একটা ফটো আমার কাছে
আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।
ইতি সুকান্ত।

সুনন্দার উত্তর এল।—আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ
অকপট সাধুপুরুষ। অতএব আমিও অকপটে
আমার গলদ জানাচ্ছি। পবন কুমার পোস্ট
গ্র্যাজুয়েটে পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম
হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ, সেকেলে
গোঁড়া মা-বাপ আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই
রাজি হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে,
খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো
ভুলতে পারিনি, তবে আপনার মতো মহাপ্রাণ
স্বামী পেলে একেবারে ভুলে যাব তাতে কোনো
সন্দেহ নেই।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—সুনন্দা, তোমাকে আজ
নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের
দুজনের মধ্যে এখন আর কোনো লুকোচুরি
রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। সাত দিন
পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাত
আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ
করছি। তোমার সুকান্ত।

কিছু দিন পরে সুনন্দার চিঠি এল।—যাহ্ ভেস্টে
গেল। পবন তার পরিবারের অমতেই আমাকে
বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আমার অবস্থাটা
নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ওকে হাঁকিয়ে দেওয়া
আমার সাধ্য নয়, আমি পবনের সঙ্গে পালাচ্ছি।
কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে,
আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার
বোন নন্দা আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট।
দেখতে আমারই মতো, তবে রং বেশ ফরসা।
সেও বিএসসি ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান-
দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি।
আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ
মোহিত হয়েছে, আপনাকে বিয়ে করার জন্য
মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার,

কোনো হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাউকেও কিছু বলবেন না। প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়ি আসবেন, পুরুত যে মন্ত্র পড়াবে সুবোধ বালকের মতো তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেলে নিশ্চয়ই আপনি সুখী হবেন। নন্দা খুবই চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব।—সুনন্দা।

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হলো, কিন্তু একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়। গৃহিণীই যখন দরকার তখন এক পাত্রীর বদলে আর-এক পাত্রী হলে ক্ষতি কী? যথাকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হলো। সেখানে গোলযোগের কোনো লক্ষণই তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে নিমগ্নিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোট ভাই, লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এদিকের খবর কী?

—খবর সব ভালোই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

—বিয়ের কনে কোথায় চলে যাবে?

—তোমার আর-এক দিদি নন্দা, তার খবর কী?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও!

রাত বারোটোর পরে বাসর ঘরে অন্য কেউ রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুনন্দা, না নন্দা?

—দুইই। পোশাকি নাম সুনন্দা, আটপৌরে ডাক নাম নন্দা।[সংক্ষেপিত]

পরশুরাম: লেখক। আসল নাম রাজশেখর বসু।

জন্ম ১৮৮০, মৃত্যু ১৯৬০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২১, ২০০৯

293) জুতা ছোড়ার বর্ষপূর্তি

১৪ ডিসেম্বর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের উদ্দেশে ইরাকি সাংবাদিক মুনতাজার আল জাইদির জুতা নিক্ষেপের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে লেখাটি ছাপা হলো। জুতামামার অনেক দুঃখ। সব সময় পায়ের তলায় থাকে বলে রাস্তাঘাটের ময়লা-আবর্জনা, ইট-পাথর, কাদাপানি ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। এ দুঃখ তার আর সয় না। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানাল, ‘হে ঈশ্বর, কী এমন অপরাধ করেছি যে তার জন্য আমার এই দুরবস্থা? কেন কেউ আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেয় না?’

জুতামামার আর্জি শুনে ঈশ্বর কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললেন, ‘তোমার কোনো দোষ নেই। আসলে মানুষের এত উপকার করেও তুমি তোমার উপযুক্ত সম্মান পাও না। বলো, তুমি কী প্রতিদান চাও?’

এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে জুতামামা বিধাতার কাছে আবদার করে বললেন, ‘আমাকে এমন সম্মান দান করো, যাতে আমি ইতিহাসের অংশ হতে পারি। যাতে করে সবাই আমাকে নিয়ে মাতামাতি করবে, গান গাইবে, কবিতা লিখবে, উপন্যাস রচনা করবে, খবরের কাগজের হেডলাইন তৈরি করবে।...’

বিধাতা বললেন, ‘ঠিক আছে, তোমার আবেদন আমি মঞ্জুর করলাম। তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে।’

জুতামামার ন্যায্য আবদার পূরণ করতে গিয়ে বিধাতা চিন্তায় পড়ে গেলেন—কীভাবে তাকে ইতিহাসের অংশ করা যায়। একবার ভাবলেন, আকাশ থেকে জুতাবৃষ্টি বর্ষণ করলে কেমন হয়। কিন্তু না, মানুষের যে স্বভাব, দুই দিন পরই ভুলে যাবে।

আরেকবার চিন্তা করলেন, জুতা নিয়ে একটি যুদ্ধ হলে কেমন হয়। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ নেই, কেননা এর চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ঘটনাও সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

তারপর বিধাতার ইচ্ছায় বছরের পর বছর পৃথিবীতে জুতা নিয়ে ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটলেও তেমন কোনো আলোচনা বা সমালোচনার ঝড় তুলতে পারেনি।

ইংরেজ শাসনামলে দীনবন্ধু মিত্র রচিত

নীলদর্পণ যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন ইংরেজদের অত্যাচারের মঞ্চ-অভিনয় দেখে দর্শক জুতা নিষ্ক্ষেপ করেছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল পলাশী যুদ্ধ নিয়ে রচিত সিরাজদৌলা যখন মঞ্চস্থ হয়। মীর জাফরের কার্যকলাপের অভিনয় দেখে উত্তেজিত দর্শক নিজের জুতার মায়া ত্যাগ করেছিল।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জুতা নিয়ে অনেক গল্প, কবিতা, গান, কৌতুক ইত্যাদি রচিত হয়েছে। অসংখ্য হাস্যকর ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের এই উপমহাদেশেও জুতা নিয়ে কবিতা (যেমন—একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে...), গান (যেমন—মেরা জুতা হে জাপানি...), প্রবাদ-প্রবচন (যেমন—গরু মেরে জুতা দান) ইত্যাদি আরও কত কি রচিত হয়েছে, কোনো হিসাব নেই। এত কিছু পরও জুতামামা সন্তুষ্ট হয় না। বিধাতাকে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর দেওয়া ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জুতামামার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বিধাতা সিদ্ধান্ত নিলেন যে জুতা নিয়ে বহুল আলোচিত ইতিহাস রচনা করা হবে। এরই মধ্যে দিন, তারিখ, স্থান নির্ধারণ হয়ে গেল।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৮, সব জল্পনা-কল্পনা ভঙ্গ করে কাজীকৃত ঘটনাটি পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখল। ঘটনার নায়ক ইরাকি সাংবাদিক মুনতাজার আল জাইদি। অন্যদিকে ঘটনার বলি হলেন এ সময়ের সেরা কুলাঙ্গার জর্জ ডব্লিউ বুশ। কালো, চকচকে, পলিশ করা জুতা।

দেখেই বোঝা গেছে, ব্র্যান্ডের জুতা। জুতা মারার ক্ষেত্রেও জাইদি সাহেবের রুচির তারিফ করতে হয়। মি. বুশ যেহেতু প্রেসিডেন্ট মানুষ, তাঁকে তো আর যেনতেন জুতা মারা যায় না!

অনেকে মনে করেছিলেন, কাহিনি বোধহয় এখানেই শেষ। কিন্তু না। আসল চমক কিছুদিন পর থেকেই। ঘটনার কয়েক দিনের মাথায় জুতার ব্র্যান্ড-মালিকানা নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। পরে অবশ্য প্রমাণিত হলো, জুতা দুটো তুরস্কের বাইডেন কোম্পানির তৈরি। বাইডেন কোম্পানি এই মডেলের জুতার নাম দেয় ‘বুশ মডেল’। এ মডেলের জুতা কেনার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের জুতার দোকানগুলোতে রীতিমতো ভিড় লেগে যায়। বাইডেন কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, বুশকে জুতা মারার ঘটনার পর বিশ্বের নানা দেশ

(এমনকি আমেরিকা) থেকে এই মডেলের জুতা তৈরির প্রচুর অগ্রিম অর্ডার জমা পড়ে, যা বিগত কয়েক বছরের মোট উৎপাদনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। পৃথিবীর অনেক মানুষ এই মডেলের জুতা একনজর দেখে মনের সাধ পূরণ করে। তাঁদের কেউ কেউ আবার এ মডেলের জুতা সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেখানোর জন্য।

মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো স্থানে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে এই মডেলের জুতার বিশাল ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। শুনেছি, মধ্যপ্রাচ্যের রাজপরিবারের কোনো এক ধনকুবের অনেক টাকা দিয়ে নিলামে এ জুতা দুটো কিনে নিয়েছেন।

কম্পিউটার প্রোগ্রামাররাও এ ক্ষেত্রে বসে নেই। শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁরা জুতা নিয়ে বেশ কিছু চমৎকার গেম তৈরি করেছেন।

প্রতিটি গেমের টার্গেট মোটামুটি একই রকম।

যদি আপনি বুশের গালে জুতা মারতে সমর্থ হন, তবেই আপনি পয়েন্ট পাবেন।

গুলিস্তানের মলম-বিক্রেতারাও কিছুদিনের জন্য মলম বিক্রি বন্ধ করে জুতা মারার কাহিনি নিয়ে পুস্তিকা ছাপিয়ে মাইকিং করে বিক্রি

করেছিলেন। তাঁদের বিনিয়োগ বৃথা যায়নি।

তাঁদের ক্যানভাসিংয়ের ভাষা ছিল অনেকটা এ রকম: এই বইটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

কে বুশকে জুতা মেরেছিল,

কয়টি জুতা মেরেছিল।

কত নম্বর জুতা মেরেছিল।

এই বইটি পড়লে আপনি আরও জানতে

পারবেন...। আমরা যদি এ দিনটায় জুতা

ছোড়ার বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করি, তাহলে

কেমন হয়? এ বছর তো পারা গেল না,

সামনের বছর থেকে এ উৎসব পালন করলে

কেমন হয়? এ উপলক্ষে মানুষ বুশের ছবিতে

জুতা মেরে আনন্দ-উল্লাস করবে, শোভাযাত্রা

হবে, সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হবে।

জুতামারাবিষয়ক বিশেষ মুভি বা ডকুমেন্টারি

দেখানো হবে। জুতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

নিয়ে বিশেষ টক শোসহ সম্ভাব্য সবকিছুরই

আয়োজন করা হবে। এ কথা শুনে অনেকেই

পাগল ভাবতে পারেন। তবে সেদিন বেশি দূরে

নয়! চৌধুরী শ্যামল

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৬,
২০০৯

294) ক্যালেন্ডারের পাতায় যা লেখা হলো, আমলে যা ঘটল

আমরা অনেকেই ভবিষ্যতের করণীয় হিসেবে
অনেক কিছু ক্যালেন্ডারের পাতায় লিখে রাখি।
কিন্তু সেই সব কি আমরা আদৌ করতে পারি?
কতটুকু করতে পারি তা দেখুন এক তরুণের
পরিকল্পনা আর ডায়েরিতে লিখে রাখা সেই
পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নমুনা। ভেবেছেন
মহিউদ্দিন কাউসারনভেম্বর ২০০৯

০১.১১.০৯

গত বছর জলির জন্মদিনে আমি চায়নিজের বিল
দিয়েছি। সে হিসাবে এবার আমার জন্মদিনে
জলিরই বিল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হায়!
জলি সেসব বেমালুম ভুলে গেছে। খাওয়ার পর
যথারীতি আমার পকেট থেকে টাকা ডাউনলোড
করিয়ে নিয়েছে। ভাগ্যিস, বাজারের টাকা থেকে
কিছু টাকা মেরে পকেটে আপলোড করেছিলাম,
নইলে আজ রেস্টুরেন্টের থালা-বাসনের সব
ময়লা ডিলিট করেই আসতে হতো। ০৩.১১.০৯
ইউসুফ ভাইয়ের টাকাটা আজও দিতে হয়নি।
মোবাইল বন্ধ রাখছি, সারা দিন বাসার বাইরে
কাটাইছি, এর পরও ইউসুফ ভাই আমারে
খুঁইজ্যা পাইব, এইটা কোনো কামের কথা না।
ওনার কাছে আমি চিরঋণীই থাকব মনে হচ্ছে।
দিনটা শুভ ছিল। ০৪.১১.০৯

গতকাল ইউসুফ ভাইয়ের ভয়ে মোবাইল অফ
রাইখা বাসা থেকে এক্সিট মারছিলাম। জলির
কথা মনেই ছিল না। সে নাকি সারা দিন
আমাকে মিসড কল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে
পড়েছে। আজ তাই রাগ করে সে রাজুর সঙ্গে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোলটেবিল বৈঠক করছে।
এদিকে তার মোবাইলে ফোন করলেই আমি
মোবাইল স্ক্রিনে ওয়েটিং ছাড়াও চোখে পর্যাপ্ত
সরষে ফুল দেখে চলেছি। ০৫.১১.০৯

আহ! পকেটটারে সুইস ব্যাংকের হেড অফিস
মনে অইতাকে। স্যারের বেতনের টাকায় শিঙাড়া
খাইতে ম্যাকডোনাল্ডের কাচ্ছির মতো লাগে।
এমনিতেই জলি বিরাট রাগ করেছিল, ওরে
আজ বুফে খাওয়ালাম। অবশেষে সে কमेंট
করছে, রাজুর চেয়ে আমি ভালো। আমি

কমেন্টটি লাইক করলাম। বিকেলে বন্ধুদের ডেকে দুই টাকার বাদামও খাওয়ালাম। অনেক দিন থেকেই ওরা খাওয়ানোর জন্য চাপাচাপি করছিল। ১০৮.১১.০৯

কত্ত বড় সাহস! উত্তরপাড়ার ওই রহিম আমার প্রিয়তমা জলিরে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়! অথচ ওকে আমি কী ভদ্রই না মনে করতাম! মারছি কানসি বরাবর দুই-দুইটা থাপড়। মনে থাকব। ১০৯.১১.০৯

যেহেতু আমার জন্মদিনে আমি এবার বিল দিয়েছি, তাই ভেবেছিলাম জলি নিশ্চয়ই তার জন্মদিনে আমাকে খাওয়াবে। ভুল, সবই ভুল! জলি সেসব বেমালুম ভুলে গেছে। যথারীতি খাওয়ার পর আমার পকেট থেকে টাকা ডাউনলোড করিয়ে নিয়েছে। ভাগ্যিস, বাজারের টাকা থেকে কিছু টাকা মেরে পকেটে আপলোড করেছিলাম, নইলে আজ রেস্টুরেন্টের থালা-বাটির সব ময়লা ডিলিট করেই আসতে হতো। ১১০.১১.০৯

ছুটির দিনটা ফ্রি রাখছিলাম। সারা দিন ঘুমানোর জন্য। রাত জেগে ফোন করে সকালে যখনই দুটো ঘুমের ট্যাবলেট মুখে দিয়ে বিছানায় লগইন করলাম, তখনই মা এসে ‘ইউ হ্যাভ এ মাদার রিকোয়েস্ট’ ভাব নিয়ে পিঠে থাপড় দিলেন, ‘এই ওঠ, সারাক্ষণ ঘুমালে হবে! যা, বাজারে যা...।’ যেতেই হলো। বাজার থেকে আসতেই ভাবি ডাকলেন, ‘অভিককে একটু আর্টের টিচারের বাসায় নিয়ে যাও তো।’ ফিরতেই বাবা বললেন, ‘এতক্ষণ লাগে আসতে! তাড়াতাড়ি একটু ব্যাংকে যা তো...।’ ১১১.১১.০৯

জলিদের বাড়ির পাশ দিয়ে এতবার গিয়েছি যে ভেবেছিলাম, পরীক্ষায় খুব সহজেই পাস করব। পাস করে সিনেমার মতো দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলব, ‘মা, মা, আমি পাস করেছি।’ তারপর সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব। কিন্তু ‘ফেইলুর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস’। আমি আরেকটা পিলার ইনস্টল করে ফেল মেরেছি। তবে আমার সব বন্ধু বেকুব, এরা পাস করে ফেলেছে। তাই ওদের পাসের মিষ্টিই খেলাম। ভালোই হলো, আমার আর টাকা খরচ করে মিষ্টি খাওয়াতে হলো না। ১১২.১১.০৯

ফেল মেরে এমনিতেই বাসায় থাকাটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। প্ল্যানমতো চিটাগং

ভ্রমণে চলে যেতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু
হায়! ভ্রমণ ঠিকই হয়েছে, কষ্ট করে চটুগ্রামে
যেতে হয়নি। ঘর থেকে টয়লেট, টয়লেট থেকে
ঘর, এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ করতে করতেই
আমি শেষ! বন্ধুদের পাসের মিষ্টিটা বোধ হয়
বেশিই খেয়ে ফেলেছি। ২৭.০৩.০৯

কদিন থেকেই দাঁতের ব্যথায় ভুগছিলাম।
ভেবেছিলাম, চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চাপার ৫
নম্বর দাঁতটি ডাউনলোড করব। কিন্তু সেদিন
মেজ আপুর মেকআপ পেতনির মতো হয়েছে
বলায়, আপু এমন চড় দিল যে দাঁতটা অটো
ডাউনলোড হয়ে গেল। শখ ছিল, চিকিৎসকের
কাছে যাওয়ার পথে জলির বাসার রাস্তা হয়ে
যাব। কিন্তু হায়! তা আর হলো না! **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৮, ২০০৯

295) পুরাতন বনাম নূতন

পুরুলিয়ার জনৈক ভদ্রলোক নিম্নলিখিত দুইখানি
পত্র ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত করিবার জন্য
পাঠাইয়াছেন। প্রথমখানি পিতার, দ্বিতীয়খানি
পুত্রের।

পিতা মানভূমবাসী, শুকলাল মাহাত নামক
একজন কৃষিজীবী। পুত্র শ্রীমান গরাচাঁদ মাহাত,
কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক
শ্রেণীতে পড়ে। লেখাপড়া যত না হউক,
আধুনিক তারুণ্য আয়ত্ত করিতে তাহাকে বিশেষ
বেগ পাইতে হয় নাই। পিতা ও পুত্রের মধ্যে
পত্রের আদান-প্রদান ছিল এবং এখনও আছে,
যেহেতু খরচটা পিতার কাছ হইতে যায়।

বলা বাহুল্য শুকলাল মাহাতের অবস্থা মন্দ নহে।

বার্ষিক কমপক্ষে দশ-বার হাজার টাকা আয়।

কিন্তু তাহার চালচলনে তাহা বুঝা যায় না।

মানভূমের কৃষিজীবীদের দেখিয়া তাহাদের

অবস্থা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা যায়

না। পিতার পত্র

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিতাইহরি

স্মরণং

বিড়ালখেদা,

মানভূম।

গুরুবার, আশ্বিনের এগার দিন।

আশীর্বাদং বিশেষ পরে,

হাঁমেদর গাঁয়ের রোঘনাথ মাহাত কুকুরগড়া যাঁয়ে

রঁহেন। কুকুরগড়ার জমীদারলে তুমার কুশলটী

মাঙ্গে আনিয়ৈ রঁহেন। সাঁঝেরবেলি তুমার খতটী

আল। হাঁমেদর গাঁয়ে দেবতা কৃপাবর্ষণটী নাই করেন, মেনেক কাল বেলাডুবিএ টুচ্চা বার্ষিল। শুকা, গড়াবাদি, হাজাধান ইবছরে নাই হবেক। কুকুরগড়ার জমীদার খাজনার তরে লক্ ভেঁজিয়ে রহেন। বল্লি, নাই দিতে লার্ব। কুথালে পাব? লক্ঠায় মোকদর্মা করবেক্ বলিঁএ চাঁলিয়ে গেলেছন্।

তুমার বাপের আজও খাতে নাই, আর কালও নাই। হামি টাকা কড়ি কুথায় পাব? হাঁমি গরিব, হাঁমি চণ্ডাল। তুমি দিনাক লবাব হোছ। লেখিন্ ভাল হবেক্ নাই। হাঁমেদর গাঁয়ের চাঁমুখুড়া বিদ্বান্ লক্ বঠেন। উনারেই কাছে শুনে রহি যে তুমি পড়াশুনাটী নাই কর। কেনে কর নাই? বাবুছাদের হনুকরণটী কৈরহো না। মাথার ঘামিট টস্টসাই গিরেছ, লেখিন্ তুমি বুঝ নাই।

হাঁমাদের উকীলছা কলকাতায় পড়ছেন। উনার দুকুড়ি দশ টাকায় হবেক্, আর তোমারেই কেনে নাই হবেক্? অত্না চালাকী নাই করিস। ভাল হবেক্ নাই, বলে দিছি। হামি তিন কুড়ি টাকার বেশি নাই দিতে লারব। হামার টাকা কুথায়? তুমার মায়ের হিচ্ছাতেই অথায় তুমাকে ভেজে রহি। আর বেশী নাই লিখব। হামার আর তুমার মায়ের শ্রীচরণের ধুলা লিবে। রজ একটি খত দিবে।

ইতি

শ্রীল শুকলাল মাহাত বাবু সিংমুড়া,

সাং, বিড়ালখেদা

পোঃ কুকুরগড়া

থানা পুরুলিয়া

জেলা মানভূম।পুত্রের উত্তর

Hindu Hostel

পয়লা অক্টোবর, ১৯২৯

রাত্রি এগারোটা

Governor,

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার এরকম চিঠি একেবারেই expect কর্তে পারিনি। আমায় দু'একদিনের মধ্যে টাকা পাঠিও, নতুবা আমি বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। যদি তোমার টাকাই না ছিলো, আমাকে এখানে না পাঠালেই পার্তে! তোমার 'উকীল ছা' বাধ্য হয়ে ৫০ টাকায় চালায়, কারণ সে তার বাপের মতোই সেকেলে ভূত। তোমায় warning দিছি আমায় এমন করে আর চিঠি

দিওনা। তোমার ঐ জমিদারি সেরেস্তার পচা বালি-কাগজের চিঠি যদি গীতিগন্ধ গাঙ্গুলী কিংবা মলয়হিল্লোল সেন দেখত তারা কি রকম idea পোষণ করত তা তুমি বুঝতে পারছ না বোধ হয়। বুঝবেই বা কোথা হতে? অজ পাড়াগাঁয়ে যাকে বলে।

গাঁয়ের ‘চামু খুড়াকে’ ব’লো যে সে যদি আমার সম্বন্ধে কোনও কথা বলে, আমি তাকে জেলে দেবো।

আমার ষাট টাকার এক পয়সা কমে মাস চলতে পারে না। আমার সিনেমা খরচই দশ বারো টাকা, তারপর তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মধ্যে Tea party দিতে হয়, তারও একটা খরচ আছে ত!

তুমি আধুনিক সভ্যতার কিছুই জান না।

দু’একটা cinema দেখলে কিছু শিখতে পার, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট খারাপ, চিরদিন লাঙ্গল ধরতেই গেল। Europeএ love কি রকম ভাবে করতে হয়, কোনখানে কি ভাবে কথা বলতে হয়, কোনখানে কি ভাবে দাঁড়াতে হয়, এগুলো শিখতে হ’লে তোমার ‘বিড়াল খেদায়’ শেখা হয় না। তাছাড়া, আমরা তরুণ, আমাদের সাহিত্যের খোরাকের জন্যও ওসব দরকার।

আরেক কথা, এখানকার Barrister Mr.

Talapatra. তাঁর স্ত্রী ও তাঁর কন্যা

Darjeelingএ যাচ্ছেন— তাঁদের সঙ্গে আমার চেনা না থাকলেও শুনেছি তাঁরা আমাদের মাসিক পড়েন, সুতরাং আমাকেও দার্জিলিং নিশ্চয় যেতে হবে। এজন্য কমেস কম তিনশো টাকার দরকার। পত্র পাঠমাত্র টাকা পাঠাও, নতুবা যাক্।

আর কিছু লেখবার নেই। তোমাদের শ্রীচরণের ধুলো নিয়ে মাথায় জটা বেঁদে গেল। ওসব বাজে মামুলি কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথা দুলাইন লিখলেই চলে।

ইতি

yours sinly

G. mathew

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,
ডিসেম্বর ২৮, ২০০৯

296) কেমন গেল বছরটা

২০০৯ সালটা কেমন গেল জানতে হলে যুক্তরাষ্ট্র এ বছর সবাইকে কেমন রেখেছে, সেটা জানাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করলে

যে কেউ জানতে পারবেন। প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি কৌতুক, গল্প তৈরি হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে। জর্জ ডব্লিউ বুশকে নিয়ে যত গল্প আছে, তা লিখলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। কিন্তু ২০০৯ সাল তো বারাক ওবামার সময়। কেউ বিশ্বাস করবে না, এক বছরে ওবামাকে নিয়ে মাত্র দুটি গল্প বা কৌতুক চালু হয়েছে। দুটি ঘটনাই সত্যি। তার পরও তা শুনে মানুষ হাসছে। এর মধ্যে একটি বছরের সেরা রাজনৈতিক কৌতুক—শান্তিতে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বারাক ওবামা। এটাকেই বছরের সেরা কৌতুক মানছেন অনেকেই। শান্তিতে নোবেল দিলেই তো হবে না। বারাক ওবামা সেটি নিতে নরওয়ের রাজধানী অসলোয় যেতে সময় পাবেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনা ছিল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। কারণ দুটি যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে তাঁকে। ওবামার শান্তি পুরস্কার নেওয়ার এত সময় কোথায়। যাক, শেষ পর্যন্ত খানিকটা সময় বের করতে পেরেছিলেন তিনি।

এ সুযোগে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। সেটা হলো বারাক ওবামার নোবেল জয় কিন্তু ২০০৯ সালেই শেষ নয়। ২০১০ সাল বা আরও সামনে কেমিস্ট্রি বা রসায়নে ওবামা নোবেল পেয়ে গেলে কেউ অবাক হবেন না যেন। অনেক মার্কিনই বিশ্বাস করে, তিনি সেটা পাবেন। নোবেল কর্তৃপক্ষও হয়তো মানে। জানেন তো, শান্তিতে নোবেল পাওয়ার সময় নোবেল কমিটি কী বলেছে? বলেছে, ‘হি হ্যাজ জাস্ট গট গ্রেট কেমিস্ট্রি।’ সুতরাং ভবিষ্যতে কেমিস্ট্রিতে যে ওবামাই নোবেল পাচ্ছেন, তা ধরেই নিতে পারেন।

এবার দ্বিতীয় গল্পটা বলি। বহু আগে কোনো একজন ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে একজন কালো মানুষ প্রেসিডেন্ট তখনই হবেন, যখন শূকরেরা উড়তে শুরু করবে। ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কালো মানুষ বারাক ওবামা, আর বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে সোয়াইন ফ্লু। ইংরেজিতে ফ্লু বানানটা একটু ঘুরিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে উড়ন্ত শূকরের।

টাইম সাময়িকীর হিসাবে, ২০০৯ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই আক্রান্ত হয়েছে চার কোটি ৭০ লাখ মানুষ। আতঙ্কে ছিল বাংলাদেশের মানুষও। কিন্তু

সোয়াইন ফ্লু চূড়ান্ত ফ্লুপ করেছে বাংলাদেশে এসে।

বাংলাদেশে মানুষ বেশি, সোয়াইন ফ্লু ছড়াবে দ্রুতগতিতে—এমনটি মনে করেছিল অনেকে। কিন্তু সে রকম কিছু হয়নি। ভেজাল খেয়ে খেয়ে এ দেশের মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা হয়তো অনেক বেশি বেড়ে গেছে, আর তাতেই নাকি এখানে পাত্তা পেল না সোয়াইন ফ্লু। ভেজাল খাওয়ার উপকার তো পাওয়া গেল অবশেষে। ২০০৯ সালের আরেকটি বড় ঘটনা ছিল বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা। মাটির ব্যাংকে পয়সা রাখার অভ্যাস অনেকেরই আছে। তবে ধনী দেশে তেমন দেখা যায় না। আমেরিকায় সে রকম একজনকে খুঁজে পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছিল, তাঁকেই নাকি ২০০৯ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে অর্থনীতিতে। সঞ্চয় ধরে রাখার এই একটাই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেছে ২০০৯ সালে।

তবে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা আতঙ্ক যেমন ছড়িয়েছে, আশাবাদীও করেছে অনেককে। ১৯৮০ সালে ভারতের অন্যতম বড় শিল্পপতি আশ্বানি ভাইদের ঋণ দেয়নি ভারতের আইডিবিআই ব্যাংক। সেই আশ্বানি ভাইয়ের একজন এখন ব্যাংকটি কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সুতরাং পাঠক-পাঠিকা, আপনারা আশাহত হবেন না। ব্যাংক যদি এখন ঋণ না দেয়, আরেকটা বিশ্বমন্দার জন্য অপেক্ষা করুন। একদিন হয়তো ব্যাংক কিনে নেওয়ার ক্ষমতাই আপনাদের হয়ে যাবে।

শুধু সোয়াইন ফ্লু নয়, বিশ্বে আতঙ্ক ছড়ানো আরও একটি বিষয় এবার খুব একটা পাত্তা পায়নি বাংলাদেশে। সেটি হলো বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা। বিশ্বে একে একে বন্ধ হয়েছে বড় বড় ব্যাংক। দেউলিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন সরকারকে দিতে হয়েছে কোটি কোটি ডলার। গোল্ডম্যান স্যাক্স নামের একটি বিখ্যাত বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বলেছে, বিশ্বের চারটি দেশ অর্থনীতির মন্দা মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে। আর এ চারটি দেশের মধ্যে একটি হলো বাংলাদেশ। তবে এটা নিয়ে বছরের সেরা কৌতুকটি করেছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। গত রোজার ঈদে তারা ঘোষণা

দেয়, মন্দায় তাদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে ঠিকমতো বেতন-ভাতাও দিতে পারবে না। পরে অবশ্য পোশাক ব্যবসায়ীদের কাউকেই রাস্তাঘাটে হাত পাততে দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়েছে ২০০৯ সালেই। আর বিভ্রান্ত করার কাজটি সফলতার সঙ্গে করেছে সরকার। যে অস্ত্র দিয়ে কাজটি করা হয়েছে সেটি হলো ‘ডে লাইট সেভিং’। ঘড়ির কাঁটা এগোনো হলো এক ঘণ্টা। রহিমের কথাই ধরি। প্রতিদিনের মতো ঘুমানোর সময় বিছানায় গেল, ঘুম এল না, বিছানার এ-পাশ ও-পাশ করতে হলো এক ঘণ্টা। সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হলো পুরো ঘুম হয়নি। আবার রাতের খাওয়ার সময় দেখা গেল, রহিমের আসলে ক্ষুধাই পায়নি, তার পরও খেতে হলো। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা যেন আর শেষ হতে চায় না। দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটাতে শরীরের ও ঘরের বাড়তি জ্বালানি খরচ করতে হলো রহিমকে।

তবে বছরের সেরা কৌতুকটি কিন্তু করেছে জামায়াতে ইসলামী। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে এই দলটির নেতাদের বড় অংশের বিচার করা উচিত বলে মনে করে দেশের মানুষ। তারাই এই বিজয়ের মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। তাদের আমির দাবি করেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁদেরও ভূমিকা আছে। আরেক নেতা তো আরেক ধাপ এগিয়ে। তিনি বলেছেন, রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এই কৌতুকের জবাব দেওয়া ছাড়া কি-ই বা আর করার আছে।

নিউ ইয়ার্স রেজুলেশন বা নতুন বছরের অঙ্গীকার বলে একটা কথা পশ্চিমে খুব চালু আছে। এটা বাংলাদেশেও চালু করা প্রয়োজন। হাত ধোয়া দিবস যদি হতে পারে, তাহলে এটা হতেই বা দোষ কী। আসুন, অঙ্গীকার করি—

১. দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি ফেসবুকে থাকব না (টাইম সাময়িকীর হিসাবে ২০০৯ সালে নতুন করে ২০ কোটি মানুষ ফেসবুকের সদস্য হয়েছে)।

২. অতীতের স্মৃতি রোমন্থন না করে ভবিষ্যৎ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গা করব (যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে ভাবনা)।

৩. কাজে ফাঁকি দিতে একই অজুহাত বারবার দেব না, নতুন কিছু বের করব (নতুন নিয়মে রাস্তার জ্যাম মনে হয় একটু কমেছে)।

৪. দিনে চারটার বেশি হিন্দি সিরিয়াল দেখব না (এক চ্যানেলে চারটার বেশি সিরিয়াল এক দিনে হয়)।

৫. পানির অপচয় করব না (পানির অনেক দাম। নাসা চাঁদে পানি খুঁজে পেয়েছে। এক গ্যালন পানি খুঁজে পেতে নাসার খরচ হয়েছে তিন লাখ ৩৮ হাজার ৪৬১ ডলার)।

৬. কৌতুক শুনে হাসব (মন্ত্রীদের বক্তৃতা নিয়মিত শুনলেই তো চলে)।

৭. ভালো গান শুনব, বেশি বেশি বই পড়ব (তোমার পাঞ্জাবিটা জোস/ আমার দোপাট্টাও সুন্দর/ তাই আমরা হলাম আজ/ ডিসকো বান্দর...)।

৮. জ্বালানি সাশ্রয় করার উপায়গুলো মুখস্থ রাখব (২০১০ সালেও জ্বালানি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না)।

৯. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইব (২০১০ সালে হবে?)।

১০. ২০১০ সালে একই অঙ্গীকার করব (ভদ্রলোকের এক কথা)।

সবশেষে পুরোনো একটা গল্প বলি—

প্রশ্ন: ২০০৯ সাল কেমন গেল?

উত্তর: ২০০৮-এর চেয়ে খারাপ, কিন্তু ২০১০ সালের চেয়ে ভালো। শওকত হোসেন

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৮, ২০০৯

297) হকি, না কী?

মনোবিজ্ঞানের ক্লাস চলছে। শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘একজন লোক চেয়ারে বসে দাঁত কিড়মিড় করছে। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। আবার বসে দাঁত কিড়মিড় করছে। আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। এ রকম দেখলে কী বুঝবে? এই লোকটিকে কী বলা হবে?’

ছাত্রটি অম্লান বদনে উত্তর দিল, ‘অবশ্যই হকি কোচ।’

অ্যাঁই দেখেন, আবার কোচদের নিয়ে তামাশা! নাহ্, কোচদের নিয়ে অনেক হয়েছে। এর চেয়ে বরং হকির কথাই হোক। আমাদের জাতীয় দলের সিনিয়র খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে পদত্যাগ

করে হকিকে আবার আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। মাঠে মারামারি আর মাঝেমাঝে পদত্যাগ করা আমাদের হকির নিয়মিত ব্যাপার হয়ে গেছে। পদত্যাগের খবর শুনলে বুঝবেন, জাতীয় দলের সামনে কোনো খেলা আছে। আর পল্টনে মারামারির শব্দ শুনলে বুঝবেন, হয় সামনে নির্বাচন, নয় হকি মৌসুম শুরু হয়েছে। গল্প না সত্যি, জানি না। একবার পল্টনের একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় (অনেক দলেরই কার্যালয় আছে এখানে, কেউ গায়ে টেনে নেবেন না) থেকে নাকি একবার পুলিশে টেলিফোন করা হয়েছিল, ‘অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করতে আসছে প্রতিপক্ষ।’ হতুদত্ত হয়ে পুলিশ এসে দেখল, অস্ত্রশস্ত্র ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু হামলা করতে কেউ আসেনি। একদল ছেলে হকিস্টিক বাগিয়ে মাঠে যাচ্ছিল প্র্যাকটিস করতে। অবশ্য হকির মারামারিটা শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, দুনিয়াজুড়েই হকিস্টিকটা খেলার উপকরণের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের এবং সমর্থকদের মারামারির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক স্কুলছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ডব্লিউডব্লিউএফ রেসলিং আর হকির মধ্যে পার্থক্য কী? ছেলেটি ভেবে উত্তর দিয়েছিল, ‘হকির মারামারিটা সত্যি সত্যি হয়।’ মাঠে খেলোয়াড়দের যেমন মারামারি হয়, সমর্থকদের মধ্যেও হয়। যারা এগুলো করে তাদের বলে ‘হুলিগান’। ও রকম এক হকি হুলিগানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। আদালতে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করেছিল এই লোক?’ পুলিশ কর্মকর্তা জবাব দিলেন, ‘সে গ্যালারি থেকে পটল ছুড়ে ফেলেছে।’ ‘সেটা আর এমন কী অপরাধ হলো!’ বিচারক অবাক। পুলিশ কর্মকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, ‘স্যার, পটল আসলে ওই ম্যাচের রেফারির নাম।’ অভিজ্ঞরা জানেন, এ রকম ‘আলু-পটল’ ছুড়ে মারাটা আসলেই বিচিত্র কিছু নয়। খুব ছোড়াছুড়ি হয়েছে এ রকম একটা ম্যাচের পর দুই বন্ধুতে দেখা। এক বন্ধু খোঁড়াচ্ছে। অন্য বন্ধু জিজ্ঞেস করল, ‘কিরে, খোঁড়াচ্ছিস কেন?’

‘ও কিছু না। ছোট একটা হকি ইনজুরি।’

‘সেকি! তুই হকি খেলিস নাকি?’

‘না। কাল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।’

শেষ বেলায় পুরোনো বোতলে একটু নতুন

পানীয়। আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা

চলছে। আদালতের সামনে বিবেচ্য, একমাত্র

ছেলেটি মা নাকি বাবার কাছে থাকবে। আদালত

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি বাবার

সঙ্গে থাকতে চাও?’

‘জি না। বাবা আমাকে মারে।’

‘তাহলে কি মায়ের সঙ্গে থাকতে চাও?’

‘জি না। মা-ও আমাকে মারে।’

‘তাহলে কার সঙ্গে থাকতে চাও।’

‘যেকোনো হকি দলের সঙ্গে।’

‘কেন!’

‘হকি খেলোয়াড়েরা বাইরের কাউকে মারার

সময় পায় না। শুধু নিজেরাই মারামারি করে!’

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ০৩,

২০১০

298) রসফল ২০১০

মেষ

মেষ জাতক-জাতিকা এমনিতে ঠান্ডা হলেও

অমনিতে কিন্তু ভয়ংকর গরম। আর, ত্যাঁদড়

প্রকৃতির লোককে সাইজ করতে এরা সিদ্ধহস্ত।

তবে, এটা এক মেষ জাতকের নিজেরই সাইজ

হওয়ার ঘটনা। আমার বন্ধু অনিমেষ। তারই

মেসো (খালু) উন্মেষ বাবু। রাশিতে মেষ।

ভদ্রলোক বিরলকেশ এবং দারুণ বদরাগী।

হঠাত্ ১৯টি মেষ নিয়ে একটি খামার খুলে

বসলেন। এক ভোরে খামার পরিদর্শন করতে

গিয়ে তাঁর আর ফেরার নাম নেই। দুপুরে দেখা

যায়, খামারের ভেতর তিনি অজ্ঞান অবস্থায় চিত্

হয়ে পড়ে আছেন। মাথা, হাঁটু, ঠ্যাং ফেটে

রক্তারক্তি সিঁচুয়েশন। মেষের গুঁতোই এর

কারণ। যা-ই হোক, এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর

খামারটি উঠিয়ে দেওয়া হলো। তবে মাঝখান

থেকে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা।। উন্মেষ

বাবুর উগ্র মেজাজখানা হয়ে গেল একেবারে

নিরামিষ। এতে সবচেয়ে যিনি বেশি খুশি

হলেন—তিনি হচ্ছেন উন্মেষ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী

নির্নিমেষ দেবী। ...ভাইসব, ২০১০ সালে মেষ

জাতক-জাতিকা ব্যাপক ‘গুঁতায়ন’ কর্মসূচি গ্রহণ

করতে পারেন। ককট

এক ককট রাশির জাতক গটমট করে আমার চেস্বারে এসে ঢুকলেন। কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন, ‘আমি নিজে একজন দুই নম্বর বিজনেসম্যান। কিন্তু আপনি তার চেয়েও জঘন্য। দুই বছর আগে বলেছিলেন—‘২০১০ সালে আমি কোটিপতি হব। তো, কই?’ কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম, ‘চা খান।’ ককট দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বললেন, ‘ধ্যাতেরি মিয়া, রাখেন আপনার চা! আমার অবস্থাটা কী করলেন, দেখেন। একদিকে ঋণের বোঝা, অন্যদিকে পুলিশের খোঁজাখুঁজি।’ তারপর আমার নাকের সামনে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে বললেন, ‘এক লাখ টাকার এই পাথরগুলো আমাকে গছালেন। ফর নাথিং।’ আমি বললাম—‘এ কী, এগুলো কি আমি এই ডান হাতে পরতে বলেছিলাম?’ মিস্টার ককটিয়া ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ‘তা হলে? এখন ঠিক করে নিই, বাঁ হাতে পরি?’ আমি বলি, ‘নো নো স্যার, তা হবে না। নতুন পাথর নিতে হবে।’ তিনি আমার ভারী অ্যান্ড বিগ সাইজের ম্যাগনিফায়িং গ্লাসখানা খপ করে তুলে নিলেন। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, ‘আপনার টুপিটা মাথা থেকে প্লিজ একটু খুলুন তো জইতিশি স্যার!’

২০১০: যদি হন ককট, হেসে নিন একচোট। বৃষ বৃষ বললে খুশি হন, অথচ ষাঁড়, ষণ্ড কিংবা বলদ বললে চটে ওঠেন—এ কেমন কথা গো! ওগুলোর একই তো মানে। টিভির জানোয়ার চ্যানেলে দেখেননি—কী সুন্দর সব ষাঁড় রয়েছে বিভিন্ন দেশে? রাশি-শাস্ত্রকারগণ যে ১২টির মধ্যে নয়টি রাশিই নানা বিপজ্জনক পশু ও বিষাক্ত কীটের নামে নামকরণ করেছেন—সেটা আমার দোষ নয়। এক মহিলাকে বললাম, ‘ম্যাডাম, আপনি বলদ রাশির জাতিকা। ভেরি পাওয়ার ফুল। আপনার বিউটিফুল ল্যাজখানায় যত শক্তি আছে—একজন পুরুষের দুখানা বাহুতেও তা নেই।’ মহিলা ঠিক খ্যাপা ষাঁড়ের মতোই লাল চোখ করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ‘আই থিঙ্ক ইউ আর এ ডগ রাশির জাতক। তা না হলে ও রকম একটা বাজে কথা আপনি আমাকে বলতে পারতেন না!’ এই বলে তিনি আমার দাড়ির গোছা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে সবেগে প্রস্থান করলেন। ফি বা

পারিশ্রমিক দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

২০১০ সালখানি—বৃষের শিংজুড়ে রহিবে

চুলকানি...।মিথুন

স্কুলে আমাদের এক নতুন শিক্ষক এসে যোগ দেন—শ্রী অতুলচন্দ্র রায়। দৈহিক গঠনের কারণে আমরা আড়ালে তাঁকে ‘বোতলচন্দ্র’ ডাকতাম। তিনি রাশিতে ছিলেন মিথুন এবং এ রাশিটির প্রতি ছিল তাঁর অন্ধ পক্ষপাত। কাউকে পেটানোর প্রয়োজন হলে আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন, ‘অ্যাঁই, তোর রাশি কী? খবরদার, মিথ্যা বলবি না।’ অপরাধী মিথুন রাশির জাতক হলে হালকা-পাতলার ওপর দিয়ে পার পেয়ে যেত। এভাবে বালক বয়সেই আমরা রাশিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে উঠি। তবে, আমার জানামতে, সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র আমিই শেষ পর্যন্ত পেশাদার রাশিকার হয়ে উঠেছি। এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী আমার সেই শিক্ষক। যা-ই হোক, এই স্যারটির বাতিক এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তিনি রাশিভিত্তিক ক্লাস চালু করার ঘোষণা দেন। ফাস্ট বেঞ্চার ডেস্কে ঠাস ঠাস করে দুটো বেতের বাড়ি দিয়ে বলেন, ‘বয়েজ! কাল থেকে ওনলি দ্য মিথুনস উইল সিট হিয়ার। বদ রাশির ছেলেরা বসবে পেছনের দিকে।’ প্রধান শিক্ষক অবশ্য এই বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থাটি মেনে নিতে পারেননি। জানানো প্রয়োজন, আমি তখন ধনু ছিলাম এবং অদ্যাবধি তা-ই আছি। মিথুন হওয়ার কারণে, ২০১০ সাল রহিবে স্মরণে।

সিংহ

১৯৭১ সাল। সিলেট শহরে এক দরিদ্র বৃদ্ধ রাস্তার ধারে বসে ছিলেন। তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা তাঁকে উত্ত্যক্ত করায়, তিনি তাদের খুব খারাপ একটা গালি দিয়ে বসেন। এ গালিটি উর্দু ভাষায়ও চলে। কাজেই পাকিস্তানি সেনারা রাইফেলের ডগায় লাগানো খোলা বেয়োনেট নিয়ে বৃদ্ধকে তাড়া করল। প্রাণভয়ে বৃদ্ধ বাতাসের বেগে ছুটতে ছুটতে শহরের প্রান্তে চলে গেলেন। ওখানে এক বাড়ির প্রায় ছয় ফুট উঁচু প্রাচীর টপকে ভেতরের নরম জমিতে লাফিয়ে পড়লেন এবং জ্ঞান হারালেন। ততক্ষণে পাকিস্তানি সেনারা বুড়োর এই কেরামতি দেখে হাসতে হাসতে ফিরে গেছে। যা-ই হোক, ওই বাড়ির লোকজন বৃদ্ধের মাথায়-মুখে পানিটানি দিয়ে জ্ঞান ফেরাল। তারপর জিজ্ঞেস করল,

‘আপনি থাকেন কোথায়?’ বৃদ্ধ চার-পাঁচ মাইল দূরের একটা জায়গার নাম বললেন। ওরা প্রশ্ন করল, ‘কিন্তু এত উঁচু এই দেয়াল আপনি উপকালেন কেমন করে?’ বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘কী জানি বাবা, মনে লয় জিনে আনি ফালাইছে।’ আমি প্রায় নিশ্চিত যে ওই বৃদ্ধটি ছিলেন সিংহ কিংবা আমার মতো ধনু রাশির জাতক। প্রমাণিত হবে, সিংহের গুণ রাশি রাশি। তবে সিংহীর গুণ তার চেয়ে ১২ গুণ বেশি। কন্যা

মানুষ প্রেমে পড়ে, কেউ ১০ কেউ ২০ কেউ ৫০ ফুট উঁচু থেকে। অকৃতদার মহব্বত আলী জোয়ারদার প্রেমে পড়লেন, না মেপেও বলা যায়, কমপক্ষে ৬০ ফুট উঁচু থেকে। এখন তাঁর বয়স ৭০ প্লাস। বৈবাহিক বাস্তবতার দিক থেকে এখন তাঁকে ডেট এক্সপায়ারড আইটেম বলা যায়। অর্থাৎ তাঁহার মেয়াদ এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রেমে পড়ার বয়সসীমাসংক্রান্ত কোনো আইন দুনিয়ার কোথাও নেই। মহব্বত আলী সেই সুযোগটাই গ্রহণ করলেন—বেটার লেট দ্যান নেভার। তিনি ভালোবেসে ফেললেন কন্যা রাশির তরুণী কইতরি বানুকে। বললেন, ‘তুমি আমার নাতনি না হও, মেয়ের মতো তো হবেই। ডোন্ট গিভ মাই মনে দুঃখ, মা। আমাকে বিবাহ করতে মনে মনে রাজি থাকো। বাকিটা আল্লা ভরসা।’ তারপর দশ টাকার একখানা লটারির টিকিট কইতরিকে প্রেমের উপহার হিসেবে দিয়ে চোখ মেরে হেসে বললেন, ‘জিতলে ১০ লাখ টাকা!’ কইতরি তার পরিচিতা এক মহিলা র্যাব সদস্যের টেংফং নম্বর মহব্বত আলীকে লিখে দিয়ে চোখ মেরে বলল, ‘রাতে ফোন দি়েন।’

২০১০: গোঁফওয়ালা কন্যা গো, কন্যা রাশির মেয়ে দেখে পেয়ো নাকো লজ্জা গো! তুলা দন্তচিকিৎসক হাজারিকা তুলা রাশির জাতক। বিশাল লম্বা-চওড়া আর প্রচণ্ড মুখ খারাপ। অবশ করার ইনজেকশন দেওয়ার সময় রোগী বেশি টাল্টিমাল্টি করলে ডাক্তার এক ধমক মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিতেন। বিনা খরচে পূর্ণ চেতনা নাশ! এরপর সাঁড়াশি দিয়ে ৩২ পাটি দাঁত তুলে ফেললেও রোগীর কিছুই টের পাওয়ার কথা নয়। এই ডাকু ডাক্তারটির নিজের উঠল একবার প্রচণ্ড দাঁতব্যথা। অর্ধবস্ত্রে তিনি

পাগলের মতো সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলেন। তারপর জোর করে ঢুকে পড়লেন গাইনির ডাক্তার আশ্বরি বেগমের চেম্বারে।

২০১০: প্রেমের তুলার ওজন, জানি আমরা কজন? বৃশ্চিক

কোনো কোনো বৃশ্চিক মানুষ বিপজ্জনক রকমের মন ভোলা হতে পারেন। কলাবাগানের মুর্শিদ সাহেব একটা বাসায় ১৪ বছর বসবাস করেন। এরপর বাসা বদল করে অন্যখানে যান।

একরাতে তিনি আপন খেয়ালে বাসায় ফিরলেন, তবে তাঁর ছেড়ে যাওয়া পুরোনো বাসাটায়।

দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি। সে এক কেলেঙ্কারি কারবার। শেষে পাশের বাসার একটি ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, ‘চাচা, আপনি তো এখন আর এ বাসায় থাকেন না।’

২০১০ দিক ভরে ফেলো না পানের পিক, প্রিয় বৃশ্চিক। ধনু

সুট পরা বৃদ্ধটি এসে বলেন, ‘আই অ্যাম ধনাই মিয়া ফ্রম বরইগ্রাম (বার্মিংহাম)। মাই টু ওয়াইফ। ওয়ান দেশি, ওয়ান বিদেশি। বোথ ভেরি ফেরোশাস।’ দেশে এলে দেশি ওয়াইফ বলেন—‘দাড়ি রাখো, বুড়া শয়তান!’ বিলাতে ফিরলে মেম বলেন—‘নো দাড়ি, ইউ ওল্ড হ্যাগার্ড!’ পিলিজ, অ্যাস্ট্রলজার, হোয়াট সমাধান এই সমস্যার?’

দুই হাজার দশ, আলোর মধ্যে রস। মকর এক মকরের মুখে শোনা সত্যি ঘটনা: গভীর রাতে ট্রেন এসে থেমেছে ছোট্ট একটা স্টেশনে। হয়তো এক মিনিটও থামবে না। আলোয় দেখা গেল, একদল বরযাত্রী, বর-কনেকে নিয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য ছোট্টাছুটি করছে। শেষ মুহূর্তে ঘটল এক বেদনাদায়ক ঘটনা। কনে উঠে গেলেন একটা কামরায়। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল ট্রেন। বিশাল পাগড়ি মাথায় ছোটখাটো বরটি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তাঁর মুখে তখনো চেপে ধরা গোলাপি রুমাল।

সারা বছর মকর, করবে বকর-বকর। কুম্ভ এক জ্যোতিষী তাঁর ক্লায়েন্টকে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এভাবে, ‘আপনার রাশি কুম্ভই, তবে এখন কুম্ভ থেকে ১২০ ডিগ্রি পশ্চিমে সরে গিয়ে মিথুনের পেছনের বারান্দায় গিয়ে উল্টে পড়েছে। ২০১০ সালের ৯ ডিসেম্বর আপনি

একটি লাকি লটারির টিকিট কিনবেন। ওটা হারিয়ে যাবে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে। কুড়িয়ে পাবেন এক মিথুন মহিলা। এই মহিলাটির সঙ্গে বিয়ে হবে আপনার বন্ধুর। ৪০ লাখ টাকার পুরস্কার উঠবে ওই লটারির টিকিটে।’

২০১০: কুস্তের দস্তে আসরটা জমবে! মীন মীনাক্ষী রায় ও মিনা খাতুন মীন রাশির দুই কড়া বন্ধু। জানতে চাইল, ২০১০ সালে তাদের বিয়ে হবে কি না। আমি বললাম—‘ইয়েস।

ফেব্রুয়ারিতে মিনার, নভেম্বরে মীনাক্ষীর। শুনেই মীনাক্ষী কাউকাউ করে উঠল—‘না স্যার, প্লিজ, আমার বিয়েটা একটু জানুয়ারিতে করে দিন!’ শেষে কী আর করি, দুজনের বিয়েই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে হবে বলে অফিশিয়াল ভবিষ্যদ্বাণী করলাম।

এ বছর মীন, আই মিন, ঘটাবেন নট কোনো সিন। কাওসার আহমেদ চৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ০৩, ২০১০

299) স্বামীর ডিম

পিয়েরে সবে বিয়ে করেছে। নতুন বউ নিয়ে সে খুবই খুশি। কিন্তু তার বন্ধুটি ছিল অন্য ধাঁচের। বিয়েটিয়ে সে একেবারেই পছন্দ করত না।

মেয়েরা অবিশ্বাসী—এ রকম একটা বাজে ধারণা ছিল তার।

বন্ধু একদিন পিয়েরেকে একা পেয়ে সেই কথাটা তুলল।

‘বিয়েটা যখন করেই ফেলেছ, তখন আর এ নিয়ে কিছু বলার নেই আমার। তবে ওই বিষয় গেলার আগে একটু যদি জিজ্ঞেস করতে, কিছুতেই সায় দিতাম না, বুঝলে।’

‘তাই নাকি! তা বিয়ে সম্পর্কে বন্ধুর এই ক্ষোভের কারণ দয়া করে জানতে পারি?’ পিয়েরের গলায় কৌতুক ঝরে পড়ে।

‘আমার আপত্তি হলো মেয়েদের ওই কান-পাতলা স্বভাব নিয়ে। তোমার পেটে যদি সত্যি কোনো গোপন কথা থাকে, খবরদার ভুলেও বউকে বলবে না। বলেছ কি নির্ঘাত হাতে হাঁড়ি ভেঙে তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবে।’

পিয়েরে বন্ধুর কথায় হো হো করে হেসে উঠল—‘খাসা বলেছ তো কথাটা। কিন্তু শোনো, অন্যের কথা জানি না। আমার বউয়ের কান থেকে যে কথা সরে না তা আমি হলফ করে

বলতে পারি।’

আসলে বন্ধুর ওই সন্দেহজনক কথাটা খুব লেগেছিল পিয়েরের মনে। মেয়ে মানেই যে সব পেট-আলগা, বন্ধুর এই ধারণা ভেঙে দেওয়ার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাতে পিয়েরে ঘুমাতে গেল বউকে নিয়ে। সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বউ ঘুমায়। একটু পরই নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল।

পিয়েরে চুপিচুপি খাট থেকে নেমে একটা ডিম নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ডিমটা কোলের কাছে রেখে আবার সে যথাস্থানে শুয়ে পড়ল।

একটু পরই পিয়েরে তড়িঘড়ি ধাক্কা দিল বউকে—

‘এই শুনেছ, একটা আজব কাণ্ড ঘটেছে এই মাত্র। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু মাইরি বলছি, সত্যি সত্যি আমি একটা ডিম পেড়েছি।’

‘ডিম পেড়েছ! যাও গুল দিচ্ছ।’

পিয়েরে ঘটনা প্রমাণের জন্য ডিমটা বের করে তাকে দেখাল।

‘সত্যি বলছ তো? কী অবাক কাণ্ড না?’ বউ সবিস্ময়ে মাথা নাড়ে।

‘তা তো বটেই। কিন্তু খোদার কসম এটা কিন্তু কাউকে বলবে না। প্রতিবেশীরা জানতে পারলে খুব হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। ওরা ভাববে আমি হয়তো মানুষ না, মুরগি।’

বউ স্বামীর মাথায় হাত দিয়ে কিরে কাটল। না, এ জন্মে কাউকেই সে বলবে না এ কথা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে খুব অস্থির হয়ে পড়ছিল।

তার চোখ কিছুতেই এক হচ্ছিল না উত্তেজনায়।

কখন সকাল হলে গোপন কথাটা বান্ধবীর কানে দেবে এই ভাবনায় সে মশগুল হয়ে গেল।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই সে ভোঁ দৌড়ে এল বান্ধবীর কাছে।

‘এই শোন, শোন, ভীষণ একটা গোপন কথা তোকে বলছি। খবরদার! কাউকে বলিসনে যেন। জানিস, গত রাতে না আমার স্বামী একটা ডিম পেড়েছে।’

বান্ধবী চোখ কপালে তুলে বলল, ‘বলিস কী! তোর স্বামী ডিম পেড়েছে? চালাকির আর জায়গা পাসনে।’

বান্ধবীর সন্দেহ ভাঙানোর জন্য সে ডিমটা দেখিয়ে বলল, ‘এবার বিশ্বাস হলো তো? কিন্তু

দোহাই তোর, এ কথা ঘুণান্ধরেও কাউকে বলিসনে। তাহলে ও খুব রেগে যাবে আমার ওপর। কী, কথা দিচ্ছিস তো?’

‘মাথা খারাপ। আমি কিছু বলব না।’ মুখে এ রকম আশ্বাস দিলেও কথাটা অন্য এক বান্ধবীকে বলার জন্য তার পেট ফেঁপে উঠছিল। ‘এই শুনেছিস, আমার বান্ধবীর স্বামী পিয়েরে গত রাতে দুটি ডিম পেড়েছে। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না?’ বান্ধবীর কানে কথাটা উগরে দিয়েই তার শান্তি।

‘অসম্ভব’। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল বান্ধবী। ‘সত্যি, বিশ্বাস কর, একটুও মিথ্যা বলছি না। পিয়েরের বউ আমাকে ডিম পর্যন্ত দেখিয়েছে। কিন্তু এ কথা কাউকে বলিসনে, ভাই। ও শুনতে পেলে খুব মাইন্ড করবে।’

‘না, না, প্রমিজ করছি, কাউকে বলব না।’ কিন্তু বলতে শুধু দেরি, সে দ্রুত অন্য এক বান্ধবীর কানে তুলে দিল কথাটা। সে বলল আরেকজনকে। এভাবে নানা কান ঘুরে ডিমের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শহরময় চাউর হয়ে গেল পিয়েরের ‘ডিম-প্রসবের’ কাহিনি।

তাকে নিয়ে চারদিকে এত যে আলোচনার ঝড় বইছে তার কিছুই জানত না পিয়েরে। এমনকি বিকেলে যখন বিয়েবিরুদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো তখনো সে আশ্বস্ত ছিল স্ত্রী ডিমের ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রেখেছে ভেবে। পিয়েরে গলায় একটু গর্বের টান মিশিয়ে বন্ধুকে বলল, ‘এই যে নারীবিরোধী, গত রাতে আমি একটা গোপন কথা স্ত্রীকে বলেছি। বল তো সেই কথাটা কী? না পারলে অবশ্য আমিই বলে দেব।’

বন্ধু মুচকি হেসে বলল, ‘দোস্ত, তুমি তোমার বউকে কী বলেছ না বলেছ তা আমি জানি না। কিন্তু একটু আগে শুনলাম, তুমি নাকি পাঁচ ডজন ডিম পেড়েছ, তা কি ঠিক?’ লা ফঁতৈ: ফরাসি লেখক।

অনুবাদ: জাফর তালুকদার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ০৩, ২০১০

300) বছরের শুরুতেই বই? ওহ নো!

সরকার জানুয়ারি মাসের শুরুতেই বই দিয়ে দিয়েছে। এসবের কোনো মানে হয়? আরে

সময় কি চলে যাচ্ছে নাকি? আরও তো ১২টা মাস পড়ে আছে। মাত্র কদিন আগে নতুন বছরটা এল, এখনো ঠিকমতো ক্লাস শুরু হলো না, আর এদিকে বইটাই দিয়ে একাকার। হাত বাড়ালেই আগে যেমন চিপস-চকলেট পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যাচ্ছে বই। তাও গল্প-উপন্যাসের কোনো বই নয়, একেবারে সাক্ষাত পাঠ্যবই। নাহ, এ সরকারের কোনো পরিকল্পনাই নাই। জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলগুলোতে টিলেঢালাভাবে ক্লাস হয়। বই নেই, তাই ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা, পিকনিক এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলায় গল্পের বইগুলো নিয়ে নিশ্চিন্তে সময় কেটে যায়। অথচ জানুয়ারি মাসেই বই দিয়ে সরকার আমাদের কী একটা ভেজালের মধ্যে ফেলল। গত বছর তো মার্চ মাসেও সেভাবে বই পাওয়া যাচ্ছিল না। বই থাকলেও স্যার যখন জিজ্ঞেস করতেন, মুখটা করুণ করে বলতাম, এখনো বই কেনা হয়নি। স্যারও কিছু বলতেন না। এখন কী হবে? এখনো যদি বলি, স্যার, বই কেনা হয়নি, তাহলে তো স্যারের বেতের সঙ্গে আমার পিঠের এক অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে! তা ছাড়া বই কেনার টাকাগুলো যে সিনেমার টিকিটে রূপান্তরিত হতো, সেটাই বা কীভাবে হবে? বই কিনতে এখন তো কোনো টাকাই লাগে না! অথচ এতে দেশের চলচ্চিত্রশিল্প যে কত বড় ক্ষতির মুখে পড়বে, তা কি সরকার একবারও ভেবে দেখেছে? তা ছাড়া নিচের ক্লাসের ভাইবোনদের (!) সঙ্গে যে সম্পর্কটা আগে হতো, এত সহজে বই দেওয়ায় তা আর হলো কই? বই না পাওয়ায় এক ক্লাস নিচের ছেলেমেয়েরা (ছেলেদের অবশ্য বই দিতাম না) এসে মিষ্টি করে বলত, ভাইয়া, আপনি তো নতুন ক্লাসে উঠে গেছেন, আপনার অঙ্ক বইটা দিন না, আমি এখনো বই কিনিনি। হাসিমুখে বই দিয়ে বেশ ভাব নিয়ে বলতাম, অঙ্ক না বুঝলে আমার কাছে এসো, বুঝিয়ে দেব (যদিও আমি নিজেই অঙ্ক বুঝি না, তাতে কী?)! তবে সেসব আজ কেবলই স্মৃতি! সব মিলিয়ে সরকার বছরের শুরুতেই বই দিয়ে আমাদের জীবনটা একেবারে ভাজা ভাজা করে দিল। বছরের শুরুতেই পাঠ্যবইয়ের মতো জিনিস পেয়েছি, বাকি মাসগুলো যে কত ভালো যাবে, তা না

বললেও চলবে! ওপরের লেখাটি একজন ফাঁকিবাজ ছাত্রের মনের অতল গহ্বরের কথা। তার মতো আরও অনেকের মনেই এ ধরনের আবেগপূর্ণ কথা থাকতে পারে। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। তবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বছরের একেবারে শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে রস+আলোর পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রামী লাল সালাম (রেড থিটিংস)! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১, ২০১০

301) আবিষ্কার

হাশেম ও কাশেম মিয়ার মধ্যে একেবারে দা-কুড়াল সম্পর্ক। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। তবে হাশেমের ছেলে নিউটন ও কাশেমের ছেলে সাক্ষিরের মধ্যে খুব ভাব। আজও তারা একসঙ্গে খেলছে। সাক্ষির একটা টেনিস বল আকাশে ছুড়ে মারছে আর ক্যাচ ধরছে। পাশে দাঁড়িয়ে তা দেখছে নিউটন। হঠাৎ সাক্ষিরের মনে হলো, সে তো বলটা আকাশের দিকে ছুড়ে মারছে, তাহলে বলটা নিচে নামছে কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো ব্যাপার আছে। সে নিউটনকে বলল, ওই, বল তো ওপরে মারতেছি, সেইটা আবার নিচে নামে ক্যান? নিউটন বলল, আরে ব্যাটা, নিচে না নামলে বলটা আবার ওপরে মারবি কেমনে? ওপরে উইঠা গেলে বাপে পিটাইব। আর তো খেলাই হইব না, তাই নিচে নামে। নিউটনের কথায় খুব একটা ভরসা না পেয়ে সাক্ষির বাসার দিকে হাঁটা দিল। বাসায় গিয়ে তার বাবাকে বলল, আব্বা, বল নিচে নামে ক্যান? বল নিচে নামে ক্যান মানে? মশকরা করো? থবড়ায়ে কান ফাটায় দিব। সাক্ষির আবার বলল, আব্বা, এই যে বল, এইটা ওপরের দিকে মারলে আবার নিচে নাইমা আসে। ক্যান? মনে হয়, মাটি বলরে টানে। কাশেম কয়েকবার গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে বলটা আকাশে ছুড়ে দেখল। তাই তো, বল ঠিকই মাটিতে এসে পড়ে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাশেম বলল, শাবাশ ব্যাটা! তুই তো দারুণ জিনিস বাইর করলি রে। যাই, এইটা নিয়া হাসান মাস্টারের সঙ্গে কথা বইলা আসি। হাসান মাস্টার এখানকার স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক

হলেও সে সব বিষয়ই পড়ায়। চায়ের দোকানে কাশেম মিয়ার কাছে সব শুনে সে বলল, আপনি যে আবিষ্কারের কথা বলছেন, তা অনেক আগেই নিউটন আবিষ্কার করে ফেলেছে।

কী কইলা? নিউটন এইটা আগে আবিষ্কার করেছে? হাশেমের পোলা? মাস্টার! তোমারে আমি ভালো লোক ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখলাম আমার রং হইছে। হাশেমের মেয়ের সঙ্গে তোমার কিঞ্চিৎ প্রণয় আছে বইলা তুমি তার ছোট ভাই নিউটনের সাপোর্ট নিয়া কথা কইবা, এইটা তো ঠিক না!

আপনি ভুল বুঝছেন, আসলে...

আরে রাখো ভুল! শোনো, পোলার আবিষ্কারের কথা আমি সবাইরে জানামু। টিভি-পত্রিকার লোক খবর দিমু, পত্রিকায় ছবিসহ খবরও ছাপা হবে—বিস্ময় বালক সাক্ষিরের মহা আবিষ্কার।

তখন বুঝবা, আমার নাম কাশেম মিয়া। কাশেম মিয়া চলে যেতেই হাশেম মিয়া এসে বলল, কী মাস্টার, ওই কাশেম মিয়ার সঙ্গে কী এত কথা কইলা?

আর বলবেন না, কী যে ঝামেলা! উনি বলতে চাচ্ছেন, তাঁর ছেলে একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। কিন্তু উনি জানেন না যে এটা অনেক আগেই নিউটন আবিষ্কার করে বসে আছে।

একে বলে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র।

কী কইলা? নিউটন আগে আবিষ্কার করেছে?

জি।

মাস্টার! তোমারে অনেক ধন্যবাদ! বহুদিন পর একটা ভালো খবর দিলা! আমার পোলা সূত্র আবিষ্কার করেছে! অথচ আমি জানিই না! তাই তো কই, পোলায় চুপচাপ বইসা কী এত ভাবে? এখন বুঝলাম সে এইসব নিয়া ভাবে। তুমি বসো, চা খাও। আমি আসতেছি। ওই, মাস্টাররে এক কাপ ডাবল মালাই চা দে।

নিউটনের বাবা বেরিয়ে যেতেই মাস্টার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। হায় হায়! এ দেশের হবে কী! কোন লেখক যেন বলেছিলেন পল্লি গ্রামের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সাহিত্য! ওই লেখক ভুল লিখেছিলেন। কিসের সাহিত্য? পল্লিগ্রামে ছড়িয়ে আছে বেকুব! একেবারে খাঁটি বেকুব।

এদিকে কাশেম মিয়া বাড়িতে এসেই চিৎকার করতে লাগলেন। মাস্টাররে আমি খাইছি। ব্যাটা

দালাল! ওই, তোরা সবাইরে নিউজ দে,
বিকালের মধ্যে সব টিভি-পত্রিকার লোক যাতে
আমার বাড়িতে হাজির থাকে। তাড়াতাড়ি,
কুইক!

আর মাস্টারের কাছে আবিষ্কারের কথা শুনে
হাশেম মিয়া তো মহা খুশি। কাউকে সামনে
পেলেই বলছেন, খবর শুনছ? আরে মিয়া,
আমার পোলা তো বিরাট সূত্র আবিষ্কার করছে।
ও তো নোবেল প্রাইজ পাইব। আরে, ওবামা
সাহেব যেইটা পাইছে। আমার পোলারটা দেইখা
কাশেমের পোলাও এই সূত্র শিখছে। আর
কাশেমের তো চিনই। এখন ও কয়, ওর পোলা
নাকি আগে করছে। যা-ই হোক, অনেক কাম
আছে, মাইকিং কইরা সবাইরে জানাইতে হবে।
দোয়া রাইখো।

দুপুরের মধ্যে পুরো গ্রামের লোক ঘটনা জেনে
গেল। দলে দলে লোক আসতে লাগল হাশেম
মিয়ার বাড়িতে। উঠানের ঠিক মাঝখানে পাটির
ওপর নিউটনকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তার
মাথার ওপর একজন ছাতা ধরে আছে। সবাই
এসে নিউটনকে দেখে বলে, দেখছ, কেমন
জ্ঞানী পোলা। কেউ কেউ সাহস করে জিজ্ঞেস
করে, বাবা, তুমি কী আবিষ্কার করছ? তুমি যে
আবিষ্কার করছ, তাতে কি আগামী বার ফসল
ভালো হইব? এই বছর তো ফসল ভালো হয়
নাই! নিউটন কিছু না বুঝে এদিক-ওদিক
তাকাতে থাকে।

এদিকে কাশেম মিয়া তো রেগেমেগে পুরো
আগুন। সে তার লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে হাশেম
মিয়ার বাড়ির দিকে রওনা দিল। একজন
জিজ্ঞেস করল, কাশেম, বাঁশ নিয়া যাও কই?
কাশেম মিয়া বলল, হাশেমিয়ার লাশ ফেলতে
যাই। হাতে বাঁশ, ফেলব লাশ। ডেডবডি!
কাশেম লাঠিসোটা নিয়ে আসছে, এই খবরে
হাশেম মিয়াও লোকজন নিয়ে তৈরি। গ্রামের
লোকজন যে-যার ঘরে ঢুকে গেল। টানটান
উত্তেজনা। দূর থেকে কাশেমের দল দেখেই
হাশেম আওয়াজ দিল, হুঁশিয়ার! কাশেম, আর
এক পা আগাইলে কিন্তু মাইরা নলি ভাইগা
ফেলব। কাশেমও পাল্টা হুক দিল, তুই কী নলি
ভাঙবি? তোর নিজেরই তো নলি নাই!

এই বলে দুই দল পরস্পরের ওপর যেই
আক্রমণ করতে যাবে, তখনই সিনেমার

নায়কের মতো সেখানে হাজির হলেন স্কুলের
হেডস্যার আর হাসান মাস্টার! হেডস্যার চিৎকার
করে বললেন, খামোশ! একটা সামান্য বিষয়
নিয়ে তোমরা কী শুরু করলা?

কাশেম মিয়া বলল, স্যার, এইটা সামান্য বিষয়
না, আমার পোলা সাব্বির আগে আবিষ্কার
করছে, সবাইরে খবরও দিছি, দুইটা টিভি
চ্যানেল রওনাও দিয়া দিছে। আপনি ওই হাসান
মাস্টারের কথা শুইনেন না। ওই ব্যাটা একটা
পিওর দালাল!

হাশেম মিয়া বলল, স্যার, আপনি ওই মূর্খ
কাশেমের কথা বিশ্বাস করবেন না, হাসান
মাস্টার নিজে কইছে, আমার পোলা নিউটন
আগে আবিষ্কার করছে।

খামোশ! তোমাদের আমি যত বেকুব ভাবছিলাম
তোমরা তার চেয়ে বেশি বেকুব। বেকুবদের
মাথায় গোবর থাকে, তোমাদের মাথায় তো তাও
নাই। আরে, এই নিউটন না, আরও নিউটন
আছে। সে হইল সকল নিউটনের রাজা
আইজ্যাক নিউটন। বিরাট বড় বিজ্ঞানী। বহু
বছর আগে সে এই সূত্র আবিষ্কার করছে। এই
তো কয়েক দিন আগে তার ৩৬৭তম
জন্মবার্ষিকী পালিত হইল। হাসান মাস্টার ঠিকই
কইছে। এই নিউটন তোমার পোলা না। সে
হইল সব স্যারদের স্যার। বুঝতে পারছ?
হাশেম লজ্জিত কণ্ঠে বলল, জি স্যার, বুঝছি!
আমার ভুল হইছে। কাশেম বলল, হ্যাঁ, স্যার!
আমারও মিসটেক হইয়া গেছে। আসলে আমরা
দুইজনই লেখাপড়া শিখি নাই তো, তাই এত
বড় মিসটেক হইল।

হেডস্যার হাসিমুখে বললেন, যাক, ভুল বুঝতে
পারছ, এইটাই তো অনেকে পারে না। তোমরা
তোমাদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করায় দাও।
ওরাও একদিন বিজ্ঞানী হইব। তবে হাশেম, যার
নামে তোমার ছেলের নাম রাখছ, সেই
লোকটারেই চেন না? এইটা কেমনে সম্ভব?
হাশেম মাথা নিচু করে বলল, স্যার, নামটা ওর
মামায় রাখছে। কিন্তু নামের মাজেজাটা জিজ্ঞেস
করা হয় নাই। নামের মাজেজা আইজ আবিষ্কার
করলাম। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১,
২০১০

302) যেদিন মোনালিসা দেখতে গেলাম

প্যারিসে গেলে লুভর মিউজিয়ামে যাওয়া নিয়ম। বিশেষ করে মোনালিসা দেখে না আসা অপরাধের মধ্যে পড়ে। তাতে মোনালিসাকেও অপমান করা হয়। তাই প্যারিসে গেলেই মোনালিসাকে দেখে আসতে হয়। মোনালিসার বাস লুভর মিউজিয়ামে।

ইউরোপে সহজে ফ্রি কিছু পাওয়া যায় না। সবকিছুই দাম দিয়ে কিনতে হয়। খানিকটা ব্যতিক্রম লুভর। তবে এ জন্য একটি ‘যদি’ আছে। আর তা হলো মাসের প্রথম রোববার লুভরে যেতে হবে। এদিন লুভরে প্রবেশ বিলকুল ফ্রি। ফ্রি বলেই নানা সমস্যা। পুরো প্যারিসবাসী মনে হয় এই দিনের অপেক্ষায় থাকে। লম্বা লাইন, প্রবেশ কষ্টকর।

নানাজনের নানা পরামর্শ মেনে লুভরের সামনে হাজির হলাম সকাল আটটায়। প্যারিসে সূর্যের আলো দেখা যায় নয়টার দিকে, আটটা মানে তখনো অন্ধকার। দেখলাম আমার চেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ আছে, লাইনে আমার সামনে আরও চারজন। কনকনে শীত। ‘মোনালিসা’ দেখার আনন্দে মাফলার আনতে ভুলে গেছি, সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছি ছাতা না এনে। চরম বিরক্তিকর হিসেবে ইউরোপের বৃষ্টি পৃথিবী বিখ্যাত। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল থেমে থেমে।

আমার সামনে ভিনদেশি এক জুটি, ঠিক পেছনেও তাই। কথা শুনে ভাষা চেনা গেল না। পেছনের মহিলা সুন্দরী অথচ হৃদয়হীনা নন। বৃষ্টি হতেই নিজের ছাতাটা আমাকে দিয়ে দিলেন। মমতাময়ীর মমতায় বৃষ্টির সমস্যা মিটলেও শীত থেকে সহজে বাঁচা গেল না। সামনের জুটি ইউরোপিয়ান কায়দায় শীত থেকে মুক্তির চেষ্টা করে যেতে লাগল পুরোটা সময়। আটটার সময় এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু কখন ঢুকতে দেবে কেউ জানি না। লুভরের প্রবেশপথটা পিরামিড আকারের মতো তৈরি করা। পেছন ফিরে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। সামনের খোলা চত্বরটা দীর্ঘ। লাইন লুভর ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেছে। মানুষের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম হবে না। সবই ঠিক আছে, কিন্তু দরজা আর খোলে না। এদিকে অনেক ভোরে এসেছি বলে সকালে খাওয়া হয়নি। অভিভূতদের

দেখলাম খাবার সঙ্গে নিয়েই এসেছে, কেবল আমিই অভুক্ত।

প্রতিবছর ৬০ লাখের বেশি মানুষ লুভরে যায় মোনালিসাকে দেখতে। এই ৬০ লাখের বড় অংশই যে মাসের প্রথম রোববার যায় তা বুঝতে সময় লাগল না। ১০টার মধ্যে পুরো চত্বরটা ভরে গেল। ১০টার দিকে দেখি দুইটা বোর্ড রাখা হলো আমাদের সামনে। এই প্রথম সেখানে ইংরেজি কিছু লেখা পেলাম। ফরাসি ভাষায় তো আছেই লেখা, নিচে আবার ইংরেজি করে দেওয়া। সেখানে বলা আছে, যাঁদের কাছে ব্যাগ আছে তাঁরা ঢুকবেন ডানের দরজা দিয়ে, আর ব্যাগছাড়া যাঁরা তাঁরা বাঁয়ের দরজা দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আমি বাঁয়ের দরজার এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে গেলাম। ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকল, ওই দিন লুভরে প্রথম প্রবেশ করেছিল একজন বাংলাদেশি। ঠিক সোয়া ১০টায় এই ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

একদিনে লুভর দেখা সম্ভব না। সাত দিনে দেখা সম্ভব এ কথাও বলা যায় না। আমার হাতে সময় মাত্র এক দিন। সে কারণেই সবার আগে লুভরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল মাথায়, লুভরে ঢুকলামও সবার আগে। পুরো লুভর হেঁটে হেঁটে দেখতে হলে প্রচুর প্রাণশক্তির প্রয়োজন। তাই ভাবলাম, আগে কিছু খেয়ে নিই। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে। উদরপূর্তি করে ভাবলাম, এবার তাহলে লুভর দেখা হোক। যেখানে বসে খেলাম তার ঠিক পাশে ছোট একটা সিঁড়ি। কোথা থেকে লুভর দেখা শুরু করব, মোনালিসা আগে দেখব না পরে—এসব ভাবতে ভাবতে সেই ছোট সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠলাম কিছুটা। তারপর দেখলাম আরেকটা সিঁড়ি। সেটা দিয়ে খানিকটা ওপরে উঠতেই একটু বেশি শীত করতে লাগল। ভেতরে তো এতটা শীত লাগার কথা না। ভাবলাম এখানে মনে হয় বিশেষ কোনো চিত্রকর্ম রয়েছে। সেই আগ্রহে আরেকটু এগিয়ে যেতেই খোলা এক চত্বরে চলে এলাম। আর নিজেকে আবিষ্কার করলাম লুভরের বাইরে। নিজের অজান্তে আমি আসলে লুভরের জরুরি নির্গমনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে চলে এসেছি। এর মাধ্যমে রচিত হলো আরেকটি ইতিহাস। লুভরে সবচেয়ে কম সময় থাকা দর্শনার্থীদের মধ্যে আমার অবস্থান সম্ভবত

শীর্ষে।

তারপর? আবার লাইনের শেষ খুঁজে পেলাম
লুভরের একদম বাইরের রাস্তায়। আমি যখন
দাঁড়িলাম, আমার সামনে তখন পাঁচ হাজারের
বেশি মানুষ। কে জানে দ্বিতীয়বার লাইনে
দাঁড়ানো মানুষের মধ্যেও হয়তো আমিই ছিলাম
প্রথম। শওকত হোসেন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১,
২০১০

303) ক্রিকেটে শিশিরতত্ত্ব

আগেকার দিনে কাঁটা নিয়ে যেমন কবিতা লেখা
হয়েছে, এখন থেকে সেই তালিকায় আরও দু-
চারটা কবিতা যোগ হয়ে যায় কি না খেয়াল না
রেখে উপায় নেই। তাহলে আজীবন খোঁচা মারা
অব্যাহত থাকবে। প্রিয় ক্রিকেট দল,
জীবনানন্দ দাশ সেই কত বছর আগেই শুনতে
পেয়েছিলেন শিশিরের শব্দ! উনি জানতেন,
শিশির সন্ধ্যাবেলা ঝামেলা করে। তাই তো তিনি
'বনলতা সেন' কবিতায় লিখে গেছেন, 'সমস্ত
দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা
আসে;...' কিংবা রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের 'সেই
দিন এই মাঠ' কবিতায় লিখেছেন, 'আমি চ'লে
যাব ব'লে/চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না
শিশিরের জলে...'। কবি দিনের পর দিন
পর্যবেক্ষণ করে এই চিরসত্য জানতে পেরে তা
আমাদের জানিয়েছিলেন কবিতার ছন্দে। প্রিয়
ক্রিকেট দল, আপনারা কেন কবির বর্ণিত এই
সত্যবাণীর প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি? কেন
আপনারা টসে জিতেও ব্যাটিং মুখী হলেন?
আপনারা কি জীবনানন্দের কাব্য পড়েননি?
দিনের সূর্য চলে গেলে 'মাঠের ঘাস তো
ভিজিবেই শিশিরের জলে'। তা ছাড়া, 'ডিউ
ফাস্টার' করতে করতে দেশি-বিদেশি
ধারাভাষ্যকার, সাংবাদিক আর বিশেষজ্ঞরা মুখে
একেবারে শিশির জমিয়ে ফেললেন, অথচ
আপনারা তাঁদের কথা শুনলেন না। সূর্যের
ঝলমলে আলোয় ঝলসে গেল আপনারা চোখ।
আর শিশিরের কারণে বল বোলারদের পূর্ণ
নিয়ন্ত্রণে থাকবে না—এটাও তো ধ্রুব সত্যই।
আগের সব কটি ম্যাচেও পরে ব্যাটিং করে
জিতেছে সবাই। তাহলে কেন, কেন ব্যাটিং
নিলেন আগে?

'বৃষ্টি পড়ছে—বৃষ্টি ইজ রিডিং' পাঠ্যবইয়ে বৃষ্টি

নামের মেয়ের পড়তে বসা নিয়ে এ ধরনের ট্রান্সলেশন থাকলেও শিশির পড়ার কথা কোথাও শোনা যায়নি। শিশির কখনো পড়ে না। শিশির সব সময় জমে। বর্তমানকালের কবিরাও লিখেছেন, ‘সবুজ-শ্যামল ঘাসের আগায় শিশির জমেছে ওই,/মাগো আমার কালো রং-এর ছাগল গেল কই!’ তবে ‘কুয়াশা’র সঙ্গে ‘পড়া’র একটা সম্পর্ক রয়েছে। একসময় দেশের রহস্যপ্রেমী পাঠকেরা নিয়মিত কুয়াশা (সেবা প্রকাশনীর গোয়েন্দা সিরিজ) পড়ত। কুয়াশা হলো মাটিতে নেমে আসা মেঘ। বাতাস যদি জলীয় বাষ্পে অতি সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তাহলে কুয়াশার সৃষ্টি হয়। কুয়াশার সঙ্গে তাপমাত্রার চেয়ে আর্দ্রতার সম্পর্ক বেশি। কিন্তু শিশির জমা নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠ এবং বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্যের ওপর। যখন ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাতাসের আগে কমে, এরপর যখন বাতাস ঠান্ডা হওয়া শুরু করে, তখন বাতাসে থাকা অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন শীতল বস্তু (যেমন ঘাস, গাছের পাতা, টিনের চাল, মাকড়সার জাল) ওপর বিন্দু বিন্দু (মডেল ও অভিনেত্রী বিন্দু বলে ভুল করবেন না) পানি জমে। একটা গ্লাসে ঠান্ডা পানি ঢাললে গ্লাসের বাইরের তলে বিন্দু আকারে পানি জমে—সহজভাবে বললে এটাই শিশির।

মর্নিং শোজ দ্য ডে—ইংরেজিতে এ রকম প্রবাদ থাকলেও মর্নিং শোজ দ্য ডিউ (শিশির)—এই ধরনের কোনো প্রবাদ নেই। অর্থাৎ, সকালের রোদ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে সন্ধ্যায় শিশির থাকবে কি থাকবে না। সকালের রোদ দেখে আপনারা কী করে ভাবলেন যে সন্ধ্যায় শিশির থাকবে না? তা ছাড়া শিশির ও রোদের মধ্যে কোনো দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও হয়নি যে দিনে রোদ উঠলে রাতে আর শিশির ঝরবে না। এই চিরন্তন সত্যের প্রতি আপনাদের আস্থা রাখা উচিত ছিল।

বাংলাদেশ স্পিননির্ভর দল, অথচ আপনারা ভাবলেন না স্পিনারদের কথা। রাতে বোলিং করলে শিশিরে ভেজা বল তাঁরা কীভাবে টার্ন করাবেন, সেটা নিয়ে আরও ভাবনার অবকাশ ছিল। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আগে ব্যাট করতে দিলে তাঁরা চার-পাঁচ শ রান করে ফেলবেন—এই ভয়ে আগে থেকে কাবু হয়ে

গেলেন? রান তো করারই জিনিস, করতেন তারা! পরে আপনারাও করতেন! আপনাদের রান করতে তো কেউ মানা করত না। এমন তো নয় যে, আমরা রান করতে পারি না। আমাদেরও তো ব্যাট আছে, ব্যাটসম্যানও আছে। অথচ সবকিছু বাদ দিয়ে আপনারা শুনলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার ডব্লিউ জি গ্রেসের কথা। সেই আমলে তিনি দিয়েছিলেন এই ব্যাটিং তত্ত্ব, ‘টসে জিতলে প্রথমে ব্যাটিং করো, সন্দেহ থাকলে একটু ভেবে তারপর ব্যাটিং করো। তার পরও সন্দেহ থাকলে সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাটিং করারই সিদ্ধান্ত নাও।’ কিন্তু ঢাকার মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে যখন সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ‘শিশিরতত্ত্ব’, তখন আপনারা মানলেন ‘গ্রেসতত্ত্ব’। ঠেলায় পড়ে বাঘ আর মহিষ এক ঘাটে জল খেলেও এক মাঠে যে ক্রিকেটের দুটি বিপরীতমুখী তত্ত্ব খাটে না, সে তো প্রমাণিত হয়েই গেল।

অতএব, বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)সিমু নাসের

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১, ২০১০

304) কাঁটা বিছানোর আগে ভাবুন

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর পথে কাঁটা বিছানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা এখনো ভাবুন। কোন কোন দিক নিয়ে ভাবতে হবে, তা-ই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকারকাঁটাপ্রাপ্তি সম্পর্কে

☆ শাহবাগে ফুলের মার্কেট থাকলেও শুধু শাহবাগ কেন, দেশের কোথাও কাঁটার মার্কেট নেই। মার্কেট তো দূরের কথা, খুচরো বিক্রির জন্য একটা দোকানও নেই।

☆ দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ করা হলেও এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে কাঁটার চাষ শুরু হয়নি। আসলে আগে কেউ এ ধরনের ঘোষণা দেয়নি তো।

☆ কাঁটাবন নামটা শুনলে মনে হতেই পারে, ওখানে কাঁটা আছে। আসলে সব বোগাস। খোঁজ নিলে দেখবেন, ওখানেও ফুলের দোকানই। অতএব কাঁটা যে দেবেন, এত কাঁটা পাবেন কোথায়, ভেবে নিন। একমত প্রকাশ করা হয়ে যায় কি না

☆ কাঁটা নিয়ে প্রথম কথা বলেছে সরকারি দলই। মাছের কাঁটা কিংবা ফুলের কাঁটা না হয়ে হোক সেটা ঘড়ির কাঁটা।

☆ কাঁটা এগোনো-পেছানোকে ইস্যু করে সরকারি দলের চৌদগোষ্ঠী উদ্ধার করেছে পাবলিক। সঙ্গে সুরকার হিসেবে সুর মিলিয়েছে বিরোধী দল।

☆ এখন বিরোধী দলও যদি কাঁটা নিয়েই কথা বলে, তাহলে সরকারি দলের সঙ্গে একটা জায়গায় একমত প্রকাশ হয়ে গেল না?

কোনো বিষয়ে যদি একমতই প্রকাশ করে ফেলা হলো, তাহলে বিরোধী দল হওয়ার সার্থকতা থাকল কোথায়! আপনারা কতটা সেকেলে

☆ আগেকার যুগে মানুষ জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধ বা অন্য কোনো বিরোধে একে অন্যের পথে কাঁটা দিত। এখন কি সেই যুগ আছে?

☆ সরকারি দল দেশকে ডিজিটাল করার চেষ্টা করছে আর আপনারা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন আদিম যুগে। এই ইস্যু ধরে প্রধানমন্ত্রী যদি একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েই ফেলেন?

☆ যদি সরাসরি বলেই ফেলেন, দেশ ডিজিটালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনারা সেই পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছেন বলে এই কাঁটার ভয়ে দেশ আর এগোতে পারছে না! কাঁটা বিছানোর মতো সেকেলে বিষয়আশয় নিয়ে চিন্তা করার কারণে আপনাদের ক্ষেত্রে

‘মেয়াদোত্তীর্ণ’ বিশেষণটা যোগ হয়ে যায় কি না ভেবে দেখুন। হিতে বিপরীত হয় কি না

☆ প্রধানমন্ত্রীর পায়ে না বিঁধলেও নরমাল পাবলিকের যেহেতু লোকাল বিমান নেই, এমনকি গাড়িও নেই, অতএব কাঁটাটা তাদের পায়ে বিঁধতেই পারে।

☆ পায়ে না বিঁধুক, অন্তত জুতোটা ফুটো হতেই পারে। একজোড়া জুতোর বাজার দর নিতান্ত কম নয়।

☆ পাবলিক কিন্তু কোনো কিছুই সহজে ভোলে না। হালকা-পাতলা ভুললেও নির্বাচনের সময় কীভাবে কীভাবে যেন মনে করে ফেলে।

অতএব যাদের বিছানো কাঁটায় তারা পায়ে ব্যথা পেয়েছিল কিংবা জুতো ফুটো হয়েছিল, তাদের কপালে ভোট জুটবে কি না ভেবে নেওয়া জরুরি। উদ্দেশ্য হাসিল হবে কি হবে না

☆ বিমানবন্দরের বাইরে নাকি কাঁটা বিছানো

হবে। কিন্তু যার জন্য কাঁটা বিছানো হবে, তার কী ঠেকা পড়েছে ওই পথটুকু হেঁটে যাওয়ার?

☆ তাঁর তো গাড়ি আছেই। গাড়ির টায়ার এতই শক্ত যে, উল্টো কাঁটারই ক্ষতি হবে। এমনও হতে পারে, তিনি রোলার দিয়ে পুরো রাস্তা এক দফা পিষেও নিতে পারেন।

☆ কিছুতেই কিছু না হলে প্রয়োজনবোধে লোকাল বিমান দিয়ে একেবারে গিয়ে বাড়ির ছাদে নামবেন।

অতএব তিনি জানবেনই না যে কাঁটা বিছানো হয়েছিল। পরের দিন টিভি বা পত্রপত্রিকা মারফত জানবেন হয়তো। গান-কবিতার সত্যতা প্রমাণ

☆ ‘কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।’ সরকারি দল এই কথাবার্তাকে পুঁজি করে কোনো রকম ভয়ের ধারে-কাছে নাও যেতে পারে।

☆ ‘কাঁটার আঘাত দাও গো যারে, তারে ফুলের আঘাত সয় না।’ বিরোধী দলের ওপর এই গানের মতো করে সব অপবাদ পড়ে যায় কি না, গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভাবতে হবে।

☆ ‘প্রেমের কাঁটা বিঁধল হায়রে আমার কলিজায়...।’ সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা যদি এই গান গেয়ে কাঁটা বিছানোকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, তাহলে কিছু করার নেই। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১, ২০১০

305) একটি অপবাদ

সাহিত্যের শিক্ষক সেগেই কাপিতোনিক আখিনোভের মেয়ের বিয়ে। বর ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক। নাচ-গান আর গল্পে গল্পে ভালোই জমেছিল বিয়ের আসর। সোফায় পাশাপাশি বসে একজন গণিত শিক্ষক, একজন ফরাসি শিক্ষক ও একজন ট্যাক্স অফিসার পরস্পরের বক্তব্যে বাধা দিতে দিতে গল্প করছিলেন। গল্পের বিষয়বস্তু ভয়ংকর হলেও মনোহর।

মাঝরাতে বাড়ির কর্তা রান্নাঘরে গেলেন রাতের খাবারটা হয়েছে কি না দেখতে। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বুনোহাঁস, পাতিহাঁস আর অন্যান্য খাবারের ম-ম গন্ধে সয়লাব। লালমুখো রাঁধুনি মারফা তার পিপের মতো শরীরটা নিয়ে দাপিয়ে দাপিয়ে কাজ করছিল। ‘স্টার্জানটা দাও তো মারফা, একটু চেখে দেখি,’

ঠোঁট চাটতে চাটতে বললেন আখিনোভ।

জেলি, কেইপার, জলপাই আর গাজর দিয়ে সাজানো বিশাল স্টার্জান মাছটা দেখেই চকচক করে উঠল আখিনোভের চোখ দুটো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, আঙুল কামড়ে, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করে উঠলেন, ‘চুকচুক!’

‘আহা! এ যে একেবারে আবেগময় চুমুর শব্দ। মারফা, তুমি কাকে চুমু খাচ্ছ গো? ও! সেগেই কাপিতোনিক!’ দরজায় ভাস্কিনের মুণ্ডু দেখা গেল।

আখিনোভ যেন বেকুব বনে গেলেন।

‘হাঁদারাম কোথাকার! আমি কোথায় চুমু খাচ্ছিলাম? আমি তো শুধু ঠোঁট দিয়ে চুকচুক শব্দ করেছি মাছটা দেখার আনন্দে।’

‘আষাঢ়ে গল্প’ বলে দাঁত কেলিয়ে বেরিয়ে গেল ভাস্কিন।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন আখিনোভ। পিয়ানোর পাশে দাঁড়ানো ভাস্কিন ইন্সপেক্টরের মেয়ের কানে কানে কী যেন বলতেই মেয়েটি হেসে উঠল।

‘বদমাশটা বলল আর মেয়েটা বিশ্বাস করল?

হায়, ঈশ্বর! নাহ্! এ আমি হতে দেব না। আমি সবাইকে বলে দেব। সবাই জানুক, ভাস্কিন একটা বদমাশ, চগলখোর।’ ভাবতে ভাবতে

ফরাসি ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন আখিনোভ। বললেন, ‘হয়েছে কি, আমি ডিনারটা দেখতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে। জানেনই তো, মাছ আমার খুব প্রিয়। দেড় গজ লম্বা একটা স্টার্জান রাঁধিয়েছি আজ। হা হা, যাহ্, আমি তো ভুলেই যাচ্ছিলাম, মাছটা দেখে আমি খুশিতে চুকচুক করে উঠলাম। আর তখনই ওই বদমাশ ভাস্কিন বলে কি না, “চুমু খাওয়া হচ্ছে?” হা হা! ভাবুন তো—কোথাকার কোন চাকরানি, পিপের মতো দেখতে! তাকে চুমু খাব আমি? আজব!’ ‘কে আজব?’ এগিয়ে এলেন গণিতের শিক্ষক।

‘আর কে? ওই ভাস্কিন। হয়েছে কি, আমি রান্নাঘরে গেলাম...ভূহ্! মারফাকে কেন চুমু খেতে যাব আমি? আমি চুমু খেতে চাইলে মেয়ের অভাব আছে নাকি?’

এবার যোগ দিলেন ট্যাক্স অফিসার। ‘আরে ওই হতভাগা ভাস্কিন!’ বলেই চলেছেন আখিনোভ, ‘ও রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে মারফার পাশে দেখে ফালতু সব গল্প ফাঁদতে শুরু করল। বলে কিনা,

“আপনারা চুমু খাচ্ছেন কেন?” আরে মারফার চেয়ে তো একটা টার্কিকে চুমু খাওয়াও ভালো। হেহ! হাসিয়ে মারল।’

‘কে হাসিয়ে মারল?’ এবার আলোচনায় যোগ দিলেন এক পাদ্রি।

‘কে আবার? ভাস্কিন। আমি রান্নাঘরে...ওহ!

অনেক হয়েছে। দাঁড়ান। ডাক দিই

হতচ্ছাড়াকে। ও-ই সব খুলে বলুক।’

আখিনোভ এভাবে সবাইকে ব্যাখ্যা দিতে

লাগলেন। তাঁর মনে একটাই ভয়, বদমাশ

ভাস্কিন যদি সবার কাছে এই মিথ্যা অপবাদটা

ছড়িয়ে দেয়? তাই নিজেই আগ বাড়িয়ে সব

জায়গায় আসল ঘটনাটা ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়াতে

লাগলেন।

অবশেষে অপবাদ থেকে মুক্তির আনন্দে রাতে

পাক্কা চার পেগ পান করলেন আখিনোভ।

নিষ্পাপ শিশুর মতো পরদিন ঘুম থেকে উঠে

সবকিছু ভুলে গেলেন তিনি। কিন্তু, হায়! মানুষ

ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আরেক। পরের সপ্তাহে

টিচারস রুমে আখিনোভকে এক কোনায় ডেকে

নিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন, ‘মাফ করবেন,

সেগেই কাপিতোনিক। আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে

আমার কথা বলার অধিকার নেই। কিন্তু না

বলেও পারছি না। শুনলাম, আপনার নাকি

বাড়ির রাঁধুনির সঙ্গে প্রেম চলছে? মানে,

বলছিলাম কি, দেখুন, আপনি তাকে চুমু খাবেন

খান, কিন্তু এ নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটাবেন না।

মনে রাখবেন, আপনি একজন স্কুল শিক্ষক।’

বাড়ি ফেরার পর আখিনোভকে দেখতে ঠিক

একঝাঁক মৌমাছির কামড় খাওয়া মানুষের মতো

লাগল।

‘রোজ তো গপগপ করে গেল, আজ কী হলো?’

ডিনার টেবিলে খেঁকিয়ে উঠলেন আখিনোভের

স্ত্রী, ‘বলি, কিসের এত চিন্তা? ও। মারফাকে মনে

পড়ছে বুঝি? জানি জানি। তোমার বন্ধুরা আমার

চোখ খুলে দিয়েছে। জংলি ভূত কোথাকার!’

বলেই আখিনোভের গালে ঠাস করে এক চড়

বসিয়ে দিলেন।

খাওয়া ফেলে আখিনোভ ছুটলেন ভাস্কিনের

বাড়ি। ভাস্কিন বাড়িতেই ছিল।

‘ব্যাটা বদমাশ! কেন আমার নামে এত বড়

অপবাদ দিলি?’ চোঁচিয়ে উঠলেন আখিনোভ।

‘কিসের অপবাদ?’

‘তুই গুজব ছড়াসনি যে আমি মারফাকে চুমু খেয়েছি?’

‘কী বললেন? হে ঈশ্বর! আমার চোখ কানা করে দাও। আমি যদি আপনার ব্যাপারে একটি কথাও বলে থাকি, তাহলে

আমার বাড়িঘর সব যেন ভেঙে পড়ে, আমার যেন কলেরার চেয়ে কঠিন ব্যামো হয়।’

অপবাদের রচয়িতা যে ভাস্কিন নয়, এ ব্যাপারে আখিনোভ আর কোনো সন্দেহই রইল না।

‘তাহলে কে? কে?’ বুক চাপড়ে সারা দিন নিজেকে এ প্রশ্নই করতে থাকলেন

আখিনোভ। আন্তন চেখভ: রুশ ছোটগল্পকার, নাট্যকার ও চিকিৎসক। জন্ম-১৮৬০, মৃত্যু-১৯০৪।

ভাষান্তর: আলিয়া রিফাত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১, ২০১০

306) কলম্বাস যদি বিবাহিত হতেন

কখনোই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না, কারণ, অভিযানে যাওয়ার আগে তাঁকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হতো—☆
তুমি কোথায় যাচ্ছ?

☆ কার সঙ্গে যাচ্ছ?

☆ কেন যাচ্ছ?

☆ কীভাবে যাচ্ছ?

☆ কী আবিষ্কার করতে যাচ্ছ?

☆ এত লোক থাকতে তোমাকেই কেন যেতে হবে?

☆ তুমি যখন এখানে থাকবে না, আমি কীভাবে থাকব?

☆ আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?

☆ তুমি ফিরবে কখন, তাই বলো।

☆ রাতে বাসায় ফিরে খাবে তো নাকি?

☆ আমার জন্য কী আনবে, বলো?

☆ তুমি আমাকে ছাড়া একা একা নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা করেছ।

☆ পরবর্তী সময়ে তুমি এ রকম প্রোগ্রাম আরও করতে যাচ্ছ...

☆ উত্তর দাও না কেন?

☆ আমি আমার বাপের বাড়ি চললাম।

☆ তুমি আমাকে আগে সেখানে পৌঁছে দাও।

☆ আমি আর কোনো দিন ফিরে আসব না।

☆ আচ্ছা? আচ্ছা বলতে তুমি কী বোঝাতে

চাইছ?

☆ তুমি আমাকে ঠেকাচ্ছ না...কেন?

☆ আমি বুঝতে পারছি না, এই আবিষ্কারটা আসলে কিসের আবিষ্কার।

☆ তুমি সব সময় এ রকম করো।

☆ গতবারও তুমি একই কাজ করেছিলে।

☆ এখন থেকে তুমি এ ধরনের ছন্নছাড়া কাজ করতেই থাকবে?

☆ আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এখনো এমন কী আছে যে আবিষ্কার করা

হয়নি? ওয়েবসাইট অবলম্বনে

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১,

২০১০

307) তারকা রঙ্গ

☆ ছোট পর্দার অভিনেতা জেফ মার্ডারকে চেনেন তো? ও চেনেন না! না চিনলেও অসুবিধা নেই। তার ঘটনাটা শুনে রাখুন একটু। বেশ ভালোই বিপদে পড়েছিলেন কিছুদিন আগে বেচারী। বিদেশে বিপদে পড়লে পুলিশে ফোন দেওয়া নিয়ম। ফোনও দিলেন তিনি। কিন্তু যথারীতি বিপদ কেটে যাওয়ার পরে পুলিশ উপস্থিত হওয়ায় চটে গিয়ে মন্তব্যকরলেন, ‘আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি, যখন অর্ডার দিলে পুলিশের থেকে পিৎজা আগে আসে।’ তবে ওদের দেহিতে হলেও তাও আসে সেটাই বা মন্দ কি!

☆ হানা মনটানার মিলি যে খুব মা ভক্ত সে খবর দুদিন পরপরই কিন্তু টের পাওয়া যায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বেড়ানোর সময় অবধারিতভাবে মায়ের উপদেশমালা সিরিজের একটি বাক্য থাকবেই। মাকে উদ্ধৃত করে সম্প্রতি তিনি বলেছেন, আমার মা আমাকে বলেছে প্রথম হতে হলে প্রায় সময়ই অনেক সময়লাগে, কিন্তু লাডাগুডা হতে একটুও সময় লাগে না। আহা, এটা মিলির মা না বললে যেন আমাদের এই জনমেও জানা হতো না।

☆ বলিউড তারকা রাখি সাওয়ান্তর মা জয়া সম্প্রতি একটি টিভি রিয়েলিটি শো-তে অংশ নিয়েছেন। প্রথম দিন থেকেই তাঁর অনুযোগ-অভিযোগের শেষ নেই। তাঁর প্রথম অভিযোগ, রিয়েলিটি শোর সব কটা মেয়েই তাঁর সঙ্গে ঘষেটি বেগমের মতো আচরণ করছে। কী

দুর্য্যবহার করেছে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওরা আমার সামনে ইংরেজিতে কথা বলেছে। ভাষান্তর: আবুল হাসনাত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১১, ২০১০

308) একটি খোলা চিঠি

প্রিয় দেবা,

তোমাকে সাধু ভাষায় চিঠিখানি লিখিতেছি। এতে অসাধু কোনো উদ্দেশ্য আমার নাই। শুনলাম, তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ। তুমি বিবাহ করিতেছ এতে আমি যতটা না বিস্মিত, তার চাইতেও বেশি বিস্মিত—তোমাকে কেহ বিবাহ করিতেছে!

এবং আমি খানিকটা শঙ্কিতও। বিবাহিত মানেই যে ‘অতিবাহিত’—এ তো তোমাকে অনেকবারই বুঝাইয়াছি। আমার কথায় না হয় তুমি গুরুত্ব দাও না। কিন্তু তোমারই প্রিয় গায়ক নচিকেতাও তো গানে গানে বলিয়া গেছেন, ‘পুরুষ মানুষ দুই প্রকার—জীবিত, বিবাহিত।’

দর্শনের ছাত্র ছিলে তুমি। সক্রেটিস তোমার প্রিয় দার্শনিক। নিশ্চয়ই জানো, জাঙ্সিপের মতো বউ ছিলেন বলিয়াই এত বড় দার্শনিক হইয়াছিলেন সক্রেটিস। শোনা যায়, এথেন্সের রাস্তায় জাঙ্সিপে নাকি প্রকাশ্যে ঝাড়ু হাতে তাড়া করিতেন তাঁহার ভাবুক স্বামীকে। বড় আক্ষেপ নিয়া সক্রেটিস তাই বলিয়া গিয়াছেন, ‘অবশ্যই বিবাহ করিবে। যদি একজন ভালো স্ত্রী পাও, জীবনে সুখী হইবে। আর যদি খারাপ স্ত্রী পাও, তুমি হইবে দার্শনিক!’

কিংবা রুশোর কথাই ধরো। তাঁর সেই সর্বাধিক জনপ্রিয় উক্তি—‘মেন আর বর্ন ফ্রি, বাট আর এভরিহার ইন চেইনস’। কে জানে, রুশোর এই উপলব্ধি বিয়ের পরেই হইয়াছিল কিনা! কারণ রুশোর কথা থেকে ধার করিয়া একজন এমন মন্তব্য করিয়াছেন, ‘হ্যাঁ, জন্মগতভাবে মানুষ স্বাধীনই থাকে, কিন্তু এরপর সে বিবাহ করে ফেলে।’

বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ তার ‘ব্যাচেলর’ ডিগ্রি হারাইয়া ফেলে, আর স্ত্রী অর্জন করে ‘মাস্টার্স’! কোন বিষয়ে মাস্টার্স তাহা তোমার নববধূ অচিরেই বুঝাইয়া দেবে। ইহা তাই বিশদ লিখিলাম না। তবে এ টুকু বলিয়া রাখি, বিবাহ মানেই পরাধীনতা। বিবাহ মানে টিভির

রিমোটের ওপর তোমার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়া। আর তাই গুণীজনেরাই বলেন, বিবাহের সময় কনের অনামিকায় ওঠে আংটি আর বরের হাতে পড়ে হাতকড়া! জানি, ‘আর কত রাত একা থাকব’ গানটি শোনার পর হইতেই তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। বুকের কোণে চিনচিনে ব্যথার অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে শূন্যতার হাহাকার। কিন্তু তোমার প্রিয় লেখক আন্তন চেখভ কী বলিয়া গেছেন মনে নাই? বলিয়াছেন, ‘যদি একাকিত্বে ভয় লাগে তোমার, কখনো বিয়ে করো না।’ বন্ধু অ্যালেক্সেই সুভোরিনকে লেখা এক চিঠিতে চেখভ লিখিয়াছিলেন, ‘আমি অবশ্যই বিবাহ করিব, তুমি যদি চাও। কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে... আমাকে এমন একটা বউ এনে দাও, যে হবে চাঁদের মতো, যে আমার আকাশে রোজ রোজ দেখা দেবে না।’

বিবাহের আগে বিবাহ-সংক্রান্ত একটা নাটক লিখিয়াছিলেন চেখভ—আ ম্যারেজ প্রপোজাল। হাস্যরসাত্মক প্রহসন ছিল সেটি। কেন জানি মনে হয়, বিবাহের পর সেই নাটকটি লিখিলে প্রহসনের বদলে আ ম্যারেজ প্রপোজাল হইয়া উঠিত সার্থক এক ‘ট্র্যাজেডি’!

জানি, তুমি কী ভাবিতেছ। জানি, তোমার যুক্তি। রাশিয়ার এক সময়ের এই ‘এলিজিবল ব্যাচেলর’ নিজেও এক সময় বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এও জানিবে, বিবাহের এক মাস আগেই হবু স্ত্রী ওলগা নিপারকে পাঠানো এক পত্রে চেখভ লিখিয়াছিলেন, ‘বিয়ে নিয়ে আমার একটা আতঙ্ক আছে। অভিনন্দনের পর অভিনন্দন, শ্যাম্পেন, গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তোমার অশেষ দেঁতো হাসি।’

বিবাহের দিন ওলগা এমন বিজয়ীনির হাসি হাসিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে সচরাচর শুভদিনে প্রায় পুরোটা সময় কনেরা কাঁদে। তোমার হবু স্ত্রীও কাঁদিবে। তাহাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ জানিবে, পরদিন হইতে তাঁহার ক্রন্দনের দিন শেষ, আর তোমার শুরু! বিবাহের পর ভালোবাসা তো তোমাকে খুঁজিতেই হইবে, না হইলে থাকিবে কোথায়? তবে ভালোবাসা খোঁজার বৃথা চেষ্টা করিও না। কারণ বিবাহ হইল অনেকটা টেনিস খেলার মতো। যেখানে

‘লাভ’ মানে শূন্য! আরেক অখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন, ভালোবাসা হইল ঘুমের মধ্যে দেখা সুন্দর একটা স্বপ্ন, আর বিবাহ হইল একটা অ্যালার্ম ঘড়ি।

জানি, এইসব বলিয়া আর লাভ নাই। কারণ বিবাহ হইতেছে ইঁদুর কলের মতো। যাঁরা মুক্ত থাকে, তাঁহারা সেই ফাঁদে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চায়। আর যাঁহারা সেই ফাঁদে আটকা পড়ে, তাঁরা চায় ফাঁদ হইতে মুক্তি। তোমাকে শুধু সুখী, দাম্পত্য জীবনের একটাই সূত্র বলিয়া দিতে চাই। কখনো বউয়ের অবাধ্য হইবে না।

গৃহপালিত একান্ত বাধ্যনুগত স্বামীদের কদরই এই জগতে সবচাইতে বেশি। সফল স্বামী হইল সেই, যে মুখ বন্ধ রাখে, আর খোলা রাখে চেক বই। অন্যের কথা ধার করিয়াই পত্রখানি ভরিলাম। শেষাংশে আসিয়া এস টি কোলরিজের সেই উক্তি তোমাকে স্মরণ করিয়া দেওয়ার লোভ সামলাইতে পারিতেছি না। ব্রিটিশ কবি বলিয়াছেন, ‘আমার মতে, সবচেয়ে সুখী দম্পতি হবে সেই জুটি, যেখানে স্বামী হবে বধির, আর স্ত্রী হবে অন্ধ!’

লুকাইয়া লুকাইয়া লেখা পত্রখানি শেষ করিতেই হইতেছে। কারণ আমার স্ত্রী যদি দেখে রাত্রি জাগিয়া আমি এই সব ‘অর্থহীন লেখালেখি’ করিতেছি, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই।

গুরুচণ্ডাল এবং আরও বহু দোষে দুষ্ট এই পত্রে তোমাকে মনোবেদনা দিয়া থাকিলে...ক্ষমা চাহিয়া আর কী লাভ? অন্তঃসারশূন্য জীবনে সংসার জিয়া সংসার করিতে চলিতেছ, এর চাইতে বহুগুণ কষ্ট যে তোমাকে সহিতে হইবে বাবা! রাজীব হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৮, ২০১০

309) জ্যাম ঠেকাতে এবার বাঁশ তত্ত্ব

আচ্ছা বলুন তো, ঢাকা বাংলাদেশের কী?
‘কী আর, রাজধানী!’

প্রশ্নকর্তা খুবই হতাশ হলেন। ‘আপনি তো দেখি এখনো পুরোনো যুগেই আছেন। ঢাকা যে বাংলাদেশের রাজধানী সে কি আর আমি জানি না?’

উত্তরদাতার এবার মনে হলো, আরে তাই তো! ঢাকা যে বাংলাদেশের রাজধানী এ তথ্যটি তো তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তাহলে তিনি

ঠিক কী জানতে চেয়েছেন?

প্রশ্নকর্তা এবার একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো, ঢাকা পৃথিবীর মধ্যে কেমন শহর?'

উত্তরদাতা এবার একটু বুঝে-শুনে উত্তর দিলেন, 'ঢাকা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহর।'

প্রশ্নকর্তা এবার আরও হতাশ হলেন উত্তর শুনে। 'নাহ!' তাঁর সব আশা যেন ফুরিয়ে গেল।

'এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে এ ধরনের উত্তর আমরা আশা করি নাই। ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি আরও অনেক বেশি চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হবে।'

আচ্ছা শেষ প্রশ্ন, 'বলুন তো বাংলাদেশের মানুষকে যদি প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করি তাহলে এ ভাগগুলো কী কী হবে?'

'স্যার, নারী আর পুরুষ।' উত্তরদাতার এই উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা যারপরনাই হতাশ হলেন।

ঢাকা শহরে যারা বাস করে, আসলেই তাদের আরও চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি

সবচেয়ে বেশি যেটি দরকার সেটি হলো, সহ্যশক্তি। ঢাকাকে এখন আর শুধু এ দেশের

রাজধানীতে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হবে কি না সেটা বিবেচনার বিষয়। এর চেয়ে যদি বলি,

ঢাকা এই দেশের পরীক্ষাক্ষেত্র! ইংরেজিতে বললে, এক্সপেরিমেন্টাল সিটি? প্রশ্নকর্তারা

সম্ভবত এটাই শুনতে চেয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, খুব সম্ভবত ঢাকা পৃথিবীর

রিকভিশনড গাড়ির ভাগাড়। শেষ প্রশ্নটির উত্তর সবশেষে দিচ্ছি।

হাসান ছেলেটি সেদিন প্রথম গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছে। সবার আগে সে যেটি দেখল তা হলো

মানুষ রাস্তায় বসে বসে ঝিমোচ্ছে। এত গাড়ি ঢাকা শহরে কোথেকে এল, এটা কোনোভাবেই

তার মাথায় ঢোকে না। রাস্তা বানানো হয়েছে গাড়ি চালানোর জন্য, সেই রাস্তায় যদি গাড়ির

জন্য গাড়ি না চলে, বিষয়টা কেমন না? এটা তার মাথায় ঢুকতে অনেক দিন লেগে গেছে।

আমাদের বর্তমান সরকারের আগেই ঢাকার এই করুণ অবস্থা নিরসনে এগিয়ে এসেছিলেন তার

আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কয়েকটি নতুন রাস্তা আর ট্রাফিক পুলিশের সতর্কবস্থায় রাখা

হয়েছিল। ফলাফল বলাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এরপর নির্বাচনের পর নতুন সরকার এল।

রাস্তায় জ্যাম নিয়ে পত্রপত্রিকাগুলো লেখালেখি শুরু করল। সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগমন্ত্রী পত্রিকার রিপোর্টার নিয়ে কাঁচপুর সেতুতে জ্যাম দেখতে গেলেন। সাংবাদিকদের বললেন, এসব লেখার আগে তাঁর কাছ থেকে যেন জেনে রিপোর্ট লেখা হয়। পরদিন আবার পত্রিকায় কাঁচপুর সেতুতে কয়েক কিলোমিটার লম্বা জ্যামের ছবি ছাপা হলো। মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী আর কিছু বললেন না। মন্ত্রী মহোদয় ঢাকার ভেতরের জ্যাম রেখে কেন কাঁচপুর সেতুতে গেলেন জ্যাম দেখতে? কারণ, ঢাকা শহরে কোনো মন্ত্রীর গাড়ি যাওয়ার আগে পাবলিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে বসে ক্ষমতাবানদের পথ করে দিতে হয়, এমন কি অ্যাম্বুলেন্সে বসা মৃত্যুপথযাত্রীও তা-ই করে। স্বাভাবিকভাবে সেই ক্ষমতাবানদের কাছে আমাদের অনেক আশা। সেই আশা পূরণ হয় কি না সে কথা বলা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। যা-ই হোক, বর্তমান সরকার শুরুতেই ঢাকার জ্যামের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে তাদের বিশাল পরিকল্পনা। রাস্তায় রাস্তায় প্রথমে ডিজিটাল সাইনবোর্ড বসানো হলো, যাতে গাড়ির চালকেরা পড়ে বুঝতে পারেন তাঁদেরও ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা উচিত। কিন্তু যে দেশে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের ছড়াছড়ি, সেই দেশের চালকদের ডিজিটাল সাইনের কি কোনো মানে আছে? সরকার সেটা বুঝল। এভাবে পড়িয়ে-লিখিয়ে কাজ হবে না।

এরপর নতুন বুদ্ধি এল। সময় ভাগ করে দিতে হবে। দিনের একেক সময়ে একেক শ্রেণীর লোকেরা বের হবে। যেমন সকাল সাতটায় বুঝতে হবে এরা সবাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক। সকাল ১০টার সময় সবাই চাকরিজীবী। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। কারণ, মানুষের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয় সরকারি সময় মেনে চলে না। জ্যাম কমল তো না-ই, কারও কারও মতে নাকি বেড়েই গিয়েছিল।

আবার নতুন বুদ্ধি এল—রাস্তাকে বিভিন্ন লেনে ভাগ করে দিতে হবে। করা হলো লেন। কিন্তু যে বাসের ড্রাইভার নিজের নামটাও লিখতে পারেন না, কিংবা যাঁর ড্রাইভিং জ্ঞান বলতে শুধু

ওভারটেক করে সবার সামনে থাকতে চাওয়া, তাঁর জন্য এসব কিতাবি লেন কাজ করল না। সরকার পড়ল বিপাকে। বসাল পৃথিবীর উন্নত দেশের মতো সিসি ক্যামেরা। ক্যামেরাই স্বয়ংক্রিয় ছবি তুলে সিগন্যাল অমান্যকারী গাড়ির ছবি তুলে মামলা করে দেবে। কারও কারও মামলাও হলো। কিন্তু এক ক্যামেরা আর কয়টা গাড়ির ছবি তুলবে? সুতরাং এই চেষ্টাও খুব একটা কাজে এল বলে মনে হলো না। সর্বশেষ একটি পাঁচতারা হোটেলের পাশের রাস্তায় সরকার বাঁশ ফেলে ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ট্রাফিক পুলিশেরা চেষ্টার ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা আর কী করবে? যেকোনো শহরে রাস্তা থাকা প্রয়োজন ২৫ ভাগ। আর ঢাকায় আছে মাত্র ৭ থেকে ৮ ভাগ। এই শহরের সব মানুষ যদি গাড়ি ছেড়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে চায় তবুও কি সম্ভব জ্যাম ঠেকানো?

এবার একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বাসায় টেলিফোন নষ্ট। বাসার কত্ৰী তো পড়েছেন মহাবিপদে। টেলিফোন ডেড হলে তিনি কথা বলবেন কীভাবে? টিঅ্যান্ডটিতে ফোন করা হলো। ওরা জানাল, লাইন ঠিক আছে। তাহলে নিশ্চয় সেটের সমস্যা। নতুন সেট কেনা হলো। কাজ হলো না। দিন-রাত এই টেলিফোন নিয়ে পড়ে থাকলেন সবাই। কিন্তু কিছুতেই কথা বলা গেল না। শেষতক সবাই যখন ক্ষান্ত দিলেন তখন দেখলেন বাসার ছোট ছেলেটি মূল লাইন থেকে দেয়ালের পাশ থেকে আসা টেলিফোনের তারের কিছু অংশ কেটে খেলছে। কে জানে আমাদের ট্রাফিক জ্যামের অবস্থা টেলিফোন তারের মতো কি না।

কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হতে না হতেই শোনা যাচ্ছে, সরকার নাকি চিন্তা করছে পাতালট্রেন দেবে ঢাকার নিচ দিয়ে। আমাদের একটাই প্রশ্ন—জনাব, কীভাবে? ওই ট্রেন লাইন করার আগে কি ঢাকাবাসীকে কয়েক বছর অন্য শহরে গিয়ে থাকতে হবে?

ঢাকাবাসী যেন সরকারের পরীক্ষাগারের গিনিপিগ। যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সব তাদের ওপর দিয়ে। সবশেষে সেই তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর। বাংলাদেশে সব সময় দুই ধরনের লোক বাস করে। কিংবা যাঁরা আছেন, তাঁদের

দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আশাবাদী আর নিরাশাবাদী। যাঁরা কোনো কারণে সরকারি দলের সমর্থক, তাঁরা সব সময় আশাবাদী হন। আর বিরোধী দলের লোকেরা থাকেন নিরাশাবাদী। আবার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটার পরিবর্তন হয়। তাই ঢাকায় বসবাসের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হলো গায়ে মোটা চামড়া থাকতে হবে। চামড়া একটু পাতলা হলে প্লিজ ঢাকা ছেড়ে চলে যান। দেখেন না বছরের পর বছর ধরে এ দেশের ক্ষমতাবানেরা কীভাবে ঢাকায় কৃতিত্বের সঙ্গে বসবাস করে যাচ্ছেন, তাঁদের অনুসরণ করুন। যে যত যা-ই বলুক, আর যতই খারাপ লাগুক, সব সময় সরকারি আর বিরোধী দলের মতো সহ্যক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করুন। ঢাকা আপনাকে বিমুখ করবে না। তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৮, ২০১০

310) গালিভারের সফরনামা

৪ মে ১৬৯৯। আমরা ব্রিস্টল থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করি। ৫ নভেম্বর প্রচণ্ড ঝড়ে আমাদের পুরো দলটা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আমি লিলিপুট নামক এই অদ্ভুত রাজ্যে উপস্থিত হই। এখানকার মানুষগুলো মোটামুটি ছয় ইঞ্চি লম্বা। ঘরবাড়ি, গাছপালা, পশু-পাখিগুলোও সেই অনুপাতেই ছোট ছোট। অনেকক্ষণ খেয়াল করে দেখলে সেগুলোকে কিছু একটা বলে মনে হয়। পৃথিবীতে এমন একটা রাজ্য থাকতে পারে আমার কল্পনাতেও এটা ছিল না। যাই হোক, প্রথম দিনই এরা আমার বন্দুক ও তলোয়ার বাজেয়াপ্ত করে। আর তাদের অদ্ভুত এক কায়দায় আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। তারা আকারে এতটুকুন হলে কী হবে, প্রযুক্তিগত দিক থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই। খালি সবই তাদের মতো ছোট ছোট দেখতে। আমাকে গ্রেপ্তারের পর নির্দিষ্ট কিছু শর্তে লিলিপুট রাজা আমাকে মুক্তি দেয় এবং আমি তাকে ব্লেফুস্কদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার করি।

ব্লেফুস্ক রাজ্যটা ছিল লিলিপুটের উত্তর-পূর্বে। দুই রাজ্যের মধ্যে ছিল আট শ গজ চওড়া একটি খাল। আমি সবচেয়ে অভিজ্ঞ নাবিকটিকে খালের গভীরতা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, খালটি

গড়পড়তায় ষাট-সত্তর ‘গ্লামগ্লুফস’ গভীর। যা কিনা ইউরোপীয় হিসেবে প্রায় ছয় ফুট। আমি একটা ছোট পাহাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে চশমা দিয়ে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক শত্রুপক্ষের সেনা দেখতে পেলাম। সঙ্গে প্রচুর যানবাহন। আমি কিছু শত্রু লোহার পাত আর দড়ি জোগাড় করলাম। লোহার পাতগুলো বাঁকিয়ে তৈরি করলাম গোটা পঞ্চাশেক আংটা, তারপর সেগুলো আটকে দিলাম একেকটি দড়ির প্রান্তে। এগুলো নিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পানিতে হাঁটা ও সাঁতরানোর পর শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলাম। শত্রুরা আমার বপু দেখে ভয়ে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালালো। আমি দড়িগুলো বের করে জাহাজের গলুইয়ের সঙ্গে আটকে দিলাম আংটাগুলো। শত্রুদের ছোড়া হাজার হাজার তীর এসে আমার হাতে-মুখে বিঁধতে লাগল। সবগুলো আংটা আটকানো শেষে দড়িগুলোর গিঁট বাঁধা প্রান্ত ধরে মারলাম টান। কিন্তু একটা জাহাজও একচুল সরাতে পারলাম না। এবার আমি আমার ছুরি দিয়ে জাহাজের নোঙর আটকানোর দড়িগুলো কাটতে শুরু করলাম। এরপর খুব সহজেই গোটা পঞ্চাশেক ষণ্ডামার্কী সেনাকে হিড়হিড় করে আমার পেছনে টেনে আনতে লাগলাম। পেছনে চোঁচাতে থাকা হতভম্ব ব্লেফুস্ক সেনাদের নিয়ে নিরাপদেই লিলিপুটের রাজকীয় বন্দরে পৌঁছালাম, যেখানে রাজা ও তার সাজপাঙ্গরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলেন। রাজপুত্র আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ‘নার্দাক’ উপাধিতে ভূষিত করল।

তিন সপ্তাহ পর ব্লেফুস্ক থেকে একটি দল লিলিপুটে এল শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। সভা শেষে তারা আমার বীরত্ব ও মহানুভবতার অনেক স্তুতি বন্দনা করল এবং আমাকে তাঁদের রাজ্যে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। ও হ্যাঁ, তাঁদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল দোভাষীর মাধ্যমে। সেদিন মাঝরাতেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শত শত মানুষের কান্নায়। বেরিয়ে দেখি সর্বনাশ। রানির এক বেকুব দাসী রান্নার সময় কী একটা প্রেমের উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন আগুন লেগে রানির প্রাসাদ ছারখার হওয়ার জোগাড়। আগুন নেভাতে কিছু মই আর বালতি আনা হয়েছে। কিন্তু আশপাশে

কোথাও পানি নেই। বালতিগুলো আঙুঠার মতো ছোট ছোট। বেচারি লিলিপুটরা সেগুলো নিয়েই আমার কাছে দৌড়ে আসতে লাগল। আমার কোট দিয়ে সহজেই আগুন নেভানো যেত কিন্তু সেটাও আমি ঘরে ফেলে এসেছি। ভাগ্যিস সন্ধ্যাবেলায় আমি ‘গ্লিমিগ্রিম’ নামক একরকম পানীয় খেয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশত সেই পানীয়ের একাংশও আমি ত্যাগ করিনি।

আগুনের উত্তাপ ও তা নেভানোর ক্রমাগত চেষ্টায় তলপেটে প্রবল চাপ অনুভব করলাম এবং আমার খাওয়া ‘গ্লিমিগ্রিম’ প্রাকৃতিক নিয়মে আমার পেট থেকে বেরিয়ে তিন মিনিটে আগুন নিভিয়ে দিল।

সকালবেলা রাজার অভিনন্দনের অপেক্ষা না করেই ঘরে ফিরে গেলাম। কারণ, আমি তাদের অনেক বড় একটি উপকার করলেও কীভাবে করেছি তা জানলে জাহাপনার মেজাজ কতখানি খাটা হবে তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু রাজা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, সে রাজ্যের বিচারকমণ্ডলীর কাছে আমার ক্ষমার আবেদন পৌঁছে দেবেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম রানি প্রাসাদ থেকে তাঁর তল্লিতল্লা গুটিয়েছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রাসাদ মেরামতের পরও তিনি আর কোনোদিন সেখানে থাকবেন না। জোনাথন সুইফট: আইরিশ লেখক ও কবি। জন্ম-১৬৬৭, মৃত্যু-১৭৪৫। এই রচনাটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘গালিভারস ট্রাভেলস’ এর পঞ্চম অধ্যায়ের ভাবানুবাদ।

অনুবাদ: আলিয়া রিফাত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৮, ২০১০

311) এই আমাদের রস+আলো

ইদানীং ক্যানটিনের মামুনও আমাদের খুব একটা পাত্রা দিচ্ছেন না, শনিবারে তাঁকে তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু তাঁর বিস্কুটের টিনও থাকে খালি। এর কোনো মানে হয়? চিনিবিহীন চা না খেলে আইডিয়া আসবে কী করে? শনির দশা মানেই বিপদ। রস+আলোর মিটিংও হয় শনিবারে। চারটায় এই মিটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, আজ পর্যন্ত কোনোদিন তা চারটায় শুরু হয়নি। এ সময় আমরা মিটিংয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ মামুনের ক্যান্টিনের চিনিবিহীন চা আর বিস্কুট খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত

থাকি। কথিত আছে, এই চা-বিস্কুটের লোভেই নাকি আমরা দূর থেকে ছুটে আসি। তবে ইদানীং মামুনও আমাদের খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না, শনিবারে তাঁকে তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু তাঁর বিস্কুটের টিনও থাকে খালি। এর কোনো মানে হয়? চিনিবিহীন চা না খেলে আইডিয়া আসবে কী করে?

রস+আলো কার্যালয়ে এসে আমরা কাজের চেয়ে আড্ডায় এত মনোযোগী হয়ে উঠি যে আশপাশের কিছুই আমাদের খেয়াল থাকে না। একবার ফুল ভলিউমে আড্ডা দিচ্ছি। এদিকে পুরো অফিসে বেজে উঠেছে ফায়ার অ্যালার্ম। সবাই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের কোনো খবর নেই।

দরজা বন্ধ করে আমরা কথা বলতে থাকি (মতান্তরে চেষ্টাতে থাকি), হঠাৎ দরজা খুলে কেউ ঢুকলেই আমরা চুপ! তবে সিঁমু ভাইয়ের আগমন টের পেলেই আমরা আইনস্টাইনের মতো গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে যাই। কদিন আগেও আমরা সকালে আসতাম, সারা দিন বসে থেকেও কোনো আইডিয়া পেতাম না। কিন্তু পাঁচটা বাজলেই কীভাবে যেন সবার মাথায় আইডিয়া অটো চলে আসত। অবস্থা এমন যে কাগজ-কলম নিয়ে আমরা সবাই অপেক্ষা করতাম পাঁচটা বাজার জন্য। আর পাঁচটা বাজলেই কেব্লাফতে!। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর কী যে হলো! এখন পাঁচটা বাজলেই ঘুম আসে।

রস+আলো বাহিনীর প্রায় সবাই ফাঁকিবাজ টাইপের ছাত্র। এই তালিকায় সবার আগে আমার স্থান। এর পরেই আছে মহিতুল আলম। মিরপুরের বাংলা কলেজে ইংরেজিতে পড়ে সে। কিন্তু কলেজে সে তার ক্লাসরুমটা চেনে কি না তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। কামরুল হাসান আগে নিয়মিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তার মনে কী যে দোলা লাগল (বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হয় আর কি), তাকে আর দেখাই যায় না। এদিকে রাকিব কিশোর চার ঘণ্টার পরীক্ষা, দুই ঘণ্টা পর খাতা জমা দিয়ে বাইরে থেকে পরোটা-ডিম খেয়ে আবার হলে যান! কার্টুনিস্ট ও আইডিয়াবাজ মহিউদ্দিন কাউসার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র। কলম পেলেই আঁকা শুরু করেন (বিশিষ্ট বলপয়েন্ট কার্টুনিস্ট)।

আমরা নিশ্চিত, তিনি ডাক্তার হলে প্রেসক্রিপশন দেবেন কার্টুনের মাধ্যমে। বলা যায় না, অপারেশন করতে গিয়ে রোগীর পেটের ওপর দুই-একটা কার্টুনও ঐকে ফেলতে পারেন! একমাত্র ব্যতিক্রম মেহেদী মাহমুদ আকন্দ। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতেই তিনি তেমন আগ্রহী নন। কোনো পরীক্ষার দুই-তিন মাস আগে থেকেই তিনি বাসায় বন্দী হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। পরীক্ষার আগে তাঁকে কেউ রস+আলো কার্যালয়ে দেখেছে এ কথা শোনা যায়নি। এমনকি ভূমিকম্পের সময়ও আন্টি যখন তাঁকে বললেন, ‘মেহেদী, ভূমিকম্প হচ্ছে রে! বের হ!’ তখনো তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা যাও, আমার পড়া আছে। ম্যাক্রো ইকোনমিকসটা পড়ে ভাজা ভাজা করে ফেলতে হবে!’ তবে ছাত্র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে একেবারে শিক্ষক হয়ে বেরিয়েছেন শাত শামীম। সারা জীবন স্যারদের চোদগুষ্টি উদ্ধার করে তিনি নিজেই এখন স্যার হয়ে বসে আছেন। দুনিয়া বড়ই রহস্যময়! যেকোনো স্থানে যেকোনো অবস্থায় ঘুমাতে পারার গুণ নিয়ে জন্মেছেন তাওহিদ মিলটন। জানালা বন্ধ থাকলেও আমাদের মৃদু চিৎকারেই কাকপক্ষী ভয়ে পালায়, কিন্তু তিনি চেয়ারে বসেই নাক ডাকতে থাকেন। মহিউদ্দিন কাউসার আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিটিভি দেখলেও তাঁর ঘুম আসে না।

যেকোনো কাজে সবচেয়ে উৎসাহী ছিল সৈয়দ রাকিব (ব্যানার রাকিব। এখন ব্যাংকার)। রস+আলো টিম কোথাও ঘুরতে যাবে, রাকিবের প্রথম এবং একমাত্র প্রস্তাব, চলেন তার আগে একটা ব্যানার বানাই। ট্রাকের সামনে সেই ব্যানার লাগিয়ে ট্রাকে করে কোথাও ঘুরতে যাই। মিটিংয়ে না এসে বুধবার সন্ধ্যার দিকে হেলতে দুলতে দেবদাস মার্কী একটা লুক নিয়ে আসেন কার্টুনিস্ট সাদাত ভাই। এসেই সিঁমু ভাইয়ের সঙ্গে গোপনে কী জানি মিটিং করেন তারপর চলে যান।

মিটিংয়ে মহিতুল আলম আগে আমাদের আইডিয়াগুলো লিপিবদ্ধ করত (এ জন্যই বোধ হয় সে এখন বিজ্ঞাপনী সংস্থার কপিরাইটার)। কিন্তু হঠাৎ সে বিদ্রোহী হয়ে লেখা ছেড়ে হাতে তুলে নিল কিবোর্ড আর মাউস। এখন সে

ফেসবুকের স্ট্যাটাস আর কमेंট ছাড়া তেমন কিছু লেখে না। আর পুণ্যভূমি সিলেটে গিয়ে মাসুদুল হকের কী হলো কে জানে, সে এখন ব্লগের উচ্চমার্গীয় বিতর্কে এত ব্যস্ত যে ফান আর তাকে টানে না। আরও আছেন বিশ্বের সবচেয়ে মিতব্যয়ী কার্টুনিস্ট সাদিয়া আহমেদ। এক ঘর বা দুই ঘরের বেশি কার্টুন তিনি কখনোই আঁকেন না। আরেক কার্টুনিস্ট মাহফুজ রনী বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো কীভাবে যেন আগেই টের পেয়ে যান এবং অন্তিম মুহূর্তে মোবাইল বন্ধ রাখাটাকে কর্তব্য বলে মনে করেন। ঘটনার দু দিন পর বলেন, ‘মোবাইল অফ রাখার জন্য আমি দুঃখিত। আর হবে না, প্রমিজ!’

এবার বলি সিমু নাসেরের কথা। তাঁর মতো ভালো মানুষই হয় না। তিনি নিজে না লিখে আমাদের লেখার যে সুযোগ করে দিয়েছেন, তা ইতিহাসে বিরল! তিনি বি.স মানুষ। চাইলে তো পুরো ২৪ পৃষ্ঠা একাই লিখতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতার দাপট তিনি দেখান না (হেহেহেহে)। তিনি আধুনিক, সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে, তাঁর ১০ মিনিট মানে আমাদের ৩০ মিনিট! তাই তো মিটিংগুলো চারটার বদলে আধাঘণ্টা করে পেছাতে পেছাতে ছয়টায় গিয়ে ঠেকে। প্রথম আলো অফিসের দোতলার গ্রাফিক্স রুম থেকে রস+আলো প্রিন্টের জন্য ছাড়তে ছাড়তে সিমু ভাই খালি বলেন, এই তো আর ১০ মিনিট। তবে একটা জিনিস ছাড়া তাঁর আর সব কিছুই ভালো। আমাদের আড্ডা যখন দারুণ পর্যায়ে, তখনই তিনি এসে বলেন, ‘খালি আড্ডা দিলে হবে? আজকে বুধবার, কখন লিখবেন আর কখন কার্টুনিস্ট আঁকবে? কালকে বৃহস্পতিবার তো পাতার মেকআপ! দ্রুত শেষ করেন।’ কী আর করা! লেখা না শেষ হোক, আড্ডা তো শেষ করতেই হয়। তবে আপনাকেও এই আড্ডায় আমন্ত্রণ। যোগ দিতে চাইলে চলে আসুন শনিবার দিন সিএ ভবনের ছয় তলায় রস+আলো কারখানায়। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ২৫, ২০১০

312) ৯৯-এর ধাক্কা পাব

রস+আলো নাকি সেধুরি মেরে দিল!
‘নাকি’-টা ইচ্ছা করেই বললাম। ইদানীং আবার

সেধুরিতেও ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে কিনা। এই তো গত প্রিমিয়ার লিগেই তামিম ইকবাল স্কোরবোর্ডে দেখলেন সেধুরি হয়ে গেছে। দিব্যি ব্যাট-ট্যাট তুলে দর্শকের অভিনন্দনের জবাব দিলেন।

পরের বলেই তামিম আউট। ও হরি! প্যাভিলিয়নে ফিরে অফিশিয়াল স্কোরকার্ড দেখে তামিম জানলেন, মোটেও সেধুরি হয়নি তাঁর। ৯৮ রানে আউট বেচারার!

ও রকম কিছু হলে রস+আলোকেও কিন্তু ‘বেচারার’ বলা ছাড়া উপায় থাকবে না। তাই বলছিলাম, একটু হিসাব-টিসাব করে দেখেন। নম্বরে কোথাও ভেজাল লেগে গেল কি না! বিভাগীয় সম্পাদকের হিসাবের ভরসায় থাকবেন না।

ও রকম ভরসায় থেকেই কপাল পুড়েছিল এক ইংলিশ ব্যাটসম্যানের। ভদ্রলোকের শাশুড়ি এসেছেন সেদিন কাউন্টি ক্রিকেটে জামাতার খেলা দেখতে। জামাতা ব্যাটসম্যান হিসেবে তেমন সুবিধের নন। কিন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানেন, ভদ্রলোক বিরাট ব্যাটসম্যান; ম্যাচে ম্যাচে সেধুরি করেন।

এখন উপায়? শেষমেশ বিপক্ষের ক্যাপ্টেনকে কাছে ডেকে বললেন, ‘প্লিজ, একটা ব্যবস্থা করে দাও। ওই যে আমার শাশুড়ি ভিআইপি বক্সে বসে।’ প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মুখ কালো করে বললেন, ‘যতই ব্যবস্থা করি। কাজের কাজ হবে না।’

‘কেন!’

‘কারণ, যতই হাফভলি বল করা হোক, এখান থেকে শট করে তোমার শাশুড়ির গায়ে বল লাগানো সম্ভব নয়। ফলে তিনি বেঁচেই যাবেন।’

উল্টো বুঝলি রাম! ভদ্রলোক চেয়েছিলেন সেধুরি মারতে। আর প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ধরে নিলেন, ব্যাটসম্যানটি শাশুড়ি মারতে চান!

ক্রিকেট এ রকমই। করতে যাবেন একটা, হয়ে যাবে আরেকটা। একবার ৯০-এর ঘরে ঢুকে পড়লে, সবাই চান তিন অঙ্কে পৌঁছাতে।

অনেকের বেলায়ই তা আর হয়ে ওঠে না।

‘নার্ভাস নাইনটিজে’ আউট হয়ে ফিরতে হয়।

এমন ভয় পাচ্ছিলেন রস+আলো সম্পাদকও (এর মধ্যে নিজেই এক চিঠির জবাবে বলেছেন)।

রস+আলো '৯৯'-এর ধাক্কা পার হলেও টেস্ট, ওয়ানডেতে সে ধাক্কা অনেক ব্যাটসম্যানের কপালে লেগেছে। শচীন টেডুলকার সারা জীবন এই ধাক্কা থেকে দূরে দূরে থেকেছেন। কিন্তু বছর কয়েক হলো, বেচারার একটা গেরো লেগে গেছে। ওয়ানডে ক্রিকেটের সর্বশেষ টানা তিনটি ৯৯ রানে আউটের পাশেই শচীন টেডুলকারের নাম লেখা। ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশিবার 'নড়বড়ে নব্বই'-তে আউটও (১৮ বার) হয়েছেন টেডুলকার। সেখুরির মূল্য কীভাবে দিতে হচ্ছে দেখুন!

টেস্টে অবশ্য মাঝেমধ্যে ৯৯ রানে আউট হওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড করাচি টেস্টে পাকিস্তানের মাজিদ খান, মুশতাক মোহাম্মদ ও ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস ৯৯ রানে আউট হয়েছিলেন। ওই টেস্টেই পাকিস্তানি ওপেনার সাদিক মোহাম্মদও চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর গেরো ছিল ৮৯ রানে!

১৯৯২ সালের ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের দীপক প্যাটেল ও জন রাইট ৯৯ রান করে আউট হয়েছিলেন।

টেস্টে ৯৯ তো বটেই, ১৯৯, ২৯৯ রানেও আউট হওয়ার নজির আছে। এর মধ্যে ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের কথাটা বিশেষ করে মাথায় রাখুন। ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ রানই তার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে করা কানপুর টেস্টের সেই ১৯৯।

এবার বলুন, রস+আলো তার ১০০তম সংখ্যায় পৌঁছানোয় বিভাগীয় সম্পাদক গদ গদ ভাব নেবেন না কেন, মানুষ সেখুরির প্রতি কেন একটা তীব্র টান অনুভব করবে না? এই টান থেকে ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা নাকি পুরো ৯০-এর দশকটা দিন গুনে পার করেছেন। কারণ কী? ব্রিটিশ একটা পত্রিকা লিখেছিল, কোনোক্রমে ২০০০ সালটা পার করতে পারলেই ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা সবাই বলতে পারবেন, আমরা একটা সেখুরি পার করতে পেরেছি! মানে কী? ব্রিটিশরা রানের সেখুরি কি করতেই পারে না! আরে দূর! এসব পত্রিকার কথা বিশ্বাস করবেন না। সবাই বাড়িয়ে লেখে। কতটা বাড়িয়ে লেখে সেটা অজিত আগারকার টের পেয়েছেন।

অজিত আগারকারকে ভারতের কোচ-

ম্যানেজমেন্ট তখন ‘অলরাউন্ডার’ বলা শুরু করেছে। ম্যানেজমেন্টের কথার জবাব হিসেবে ভারতের মাঝারি সারির এক ব্যাটসম্যান, হ্যাঁ এক ব্যাটসম্যান বললেন, ‘আগারকার অলরাউন্ডার হলে আমি বিশ্বের সেরা বোলার।’ একই আক্রোশ থেকে পশ্চিম বাংলার একটা বাংলা পত্রিকা লিখল, ‘অজিত আগারকারের নামের পাশে ১০০ লেখা দেখলে কী বুঝবেন?’ নিজেরাই উত্তর লিখে দিল, ‘বুঝবেন, অজিত আগারকার বল করছিলেন। ১০০ রান দিয়ে ফিরেছেন।’ পরে অবশ্য টেস্ট সেঞ্চুরি করে আগারকার এ কথার জবাব দিয়েছেন।

সেঞ্চুরি নিয়ে হতাশা-প্রশ্ন-জবাব অনেক হলো। আবার সেই ভুলের কথায় ফিরে যাই। সেঞ্চুরি হওয়া, না-হওয়া নিয়ে স্কোরকার্ডের ভুল। তামিম ইকবাল ভুলের আগুনে পুড়েছিলেন। আর এবারের লিগে ভুলের ‘আগুন’ জ্বলায় রীতিমতো উৎসব করতে পেরেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। স্কোরবোর্ডে দেখেছিলেন আউট হওয়ার সময় তাঁর রান ৯৮। মনে দুঃখ নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন। পরে অফিশিয়াল স্কোরার জানালেন, আশরাফুল আসলে ঠিক ১০০ রানে আউট হয়েছেন। ভুল অনেক সময় ফুলও ফোঁটায়।

কে জানে, রস+আলোর ১০০ হয়তো আগেই হয়ে গেছে! আমরা টের পাইনি। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ২৫, ২০১০

313) বর্ষীয়ান সেঞ্চুরিয়ান

সালটা ‘উনিশ শ ছোটবেলা’। সিলেটে একদিন আমাদের বাড়ির গেটে আমারই নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, পাশের শত্রুপাড়া ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে আমরা একটি প্রীতি ম্যাচ খেলব। কিন্তু আমাদের লজিসটিকসের বিপজ্জনক ঘাটতি আছে। একখানা মাত্র জীর্ণ পুরাতন ব্যাট। হার্ড দু-চার ঘা খেলে ম্যাচের দিনই হয়তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কাঠের বলটা ভিজে পচে গেছে। শট মারলে ফচ করে শব্দ হয়। বিপক্ষ দলের মালপত্রেরও ওই প্রায় একই অবস্থা। এদিকে আমাদের তহবিলে রয়েছে পরিষ্কার একটি গোলা। অগত্যা আমরা গেলাম পাড়ার

সোহবত আলী মিরশাদার চাচার কাছে। চল্লিশ বছর ওমানে ছিলেন। টাকা কামিয়ে ক্লান্ত। শুনেছিলাম অল্পবয়সে তিনি ক্রিকেট খেলতেন। তাই ভাবলাম আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই তাঁর কিছু দয়ামায়া থাকবে। আমাদের ব্যাট-বল দেখে সোহবত চাচা কিছুক্ষণ খ্যাক-খ্যাক করে হাসলেও নতুন সরঞ্জাম কিনে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, ‘আমার উম্মর এখন ষাইট। তোদের বয়সে ক্রিকেট আমিও খুড়া-বহুত খেলাইছি। আইচ্ছা, যা, তোদের খেলায় আমিও থাকমুনে।’ শুনে আমরা উৎসাহিত বোধ করলাম। তবে চাচার কথার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হলো পরে।

অবশেষে ম্যাচের দিন এল। দুইপক্ষই মাঠে হাজির। পাড়ার শিক্ষিত বেকার রোগা-পটকা সল্লু ভাই ইস্তিরিবিহীন কালো একটা কোট পরে মাথায় শোলার হ্যাট চাপিয়ে আম্পায়ার সেজেছেন। এমন সময়, মাঠের কাছেই বাসা, অথচ গাড়ি দিয়ে এসে নামলেন সোহবত চাচা। কিন্তু এ কী! চাচার পরনে গোলাপি কোর্তা, সাদা সালোয়ার। পায়ে সাদা কেডস, চোখে সবুজ সানগ্লাস। চাচা এসেই বললেন—‘কই, ব্যাটখান দেখি। শক্ত দেইখা কিনছস তো?’ পরক্ষণেই বিপক্ষ দলের উদ্দেশে হাঁক ছেড়ে বললেন—‘অই ছ্যামড়ারা, যা তোরা ফিল্ডিং-এ নাম গা। টস-মস আর করার দরকার নাই। আমরা ব্যাটিং আগে। আমি ওপেনার। একটা সেঞ্চুরি মাইরা যামুগা।’ আমাকে ডেকে বললেন—‘তুই আয়, আমার রানার। তোর ঠ্যাং দুইটা লাম্বা আছে।’ এভাবেই ক্রিকেটের যাবতীয় আইন-কানুন-কালচারকে কাঁচকলা দেখিয়ে শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রীতি ম্যাচ। বিপক্ষের হায়ার করা জোয়ান বোলার চাচাকে প্রচণ্ড একটা বাউন্সার ছুড়ল প্রথমেই। চাচা ‘হেঁইয়ো’ বলে বেপরোয়া ব্যাট হাঁকড়ালেন। ব্যাটে-বলে হলো তো না-ই, উপরন্তু চাচার হাত ফসকে ব্যাট উড়ে গেল একদিকে। ব্যালাস হারিয়ে চাচা নিজেও উল্টে পড়লেন পিচের ওপর।

পরের বলটা চাচার অফ স্টাম্পখানাই উড়িয়ে নিয়ে গেল। জোর আপিল হলো। আম্পায়ার ওপরে আঙুল তুলে আউটের রায় দিলেন। চাচা খেপে উঠে বললেন—‘নো নো! নট আউট! ওইটা নো বল আছিল। আমি নিজের চউখে

দেখছি। চোর কোনখানের!’

বোলারকে বললেন, ‘অই মিয়া, খাড়াইয়া দাঁত বার কইরা হাসো কেনে? যাও, আপনা কাম করো!’ জেদি বুড়োর কাছে সবাই হার মানল।

কিন্তু তৃতীয় বলে চাচা হিট উইকেট হয়ে গেলেন। অর্থাৎ নিজেই ব্যাট চালিয়ে নিজের উইকেট ভেঙে দিলেন। অবশ্য এবারে চাচা খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখিয়ে বললেন, ‘ব্যাড লাক।’

ফিরে এলেন তিনি মাঠ থেকে। যাওয়ার সময় নিজ দলের সদস্যদের বলে গেলেন, ‘তোরা ব্যাট-বল সব পিটাইয়া ভাইংগা ফালা। আমি নতুন কিইন্যা দিমুনে। জিতন চাই।’ তারপর বললেন, ‘তোরা শোন। এই খেলার খবর আমি সাপ্তাহিক নীরস বার্তায় ছাপানোর বন্দোবস্ত করতাছি। হেই পত্রিকার সম্পাদক ব্যাটা আমার বেয়াই লাগইন। নো ফ্রবলেম।’ না বলাই ভালো, খেলায় আমরা হারলাম।

তার চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল দুই দিন পর যখন আমাদের খেলার খবর ওই পত্রিকায় বের হলো। খবরটির উল্লেখযোগ্য অংশটি হচ্ছে এ রকম, ‘ওমান প্রত্যাগত সিলেটের ক্রীড়া-শাদুল বর্ষীয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড় সোহবত আলী মিরশাদারের অপরাজিত ১০০ রান সত্ত্বেও...’ কাওসার আহমেদ চৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ২৫, ২০১০

314) রস+আলোতে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বাণী

- ☆ রস+আলোকে হ্যাঁ বলুন, মাদককে না বলুন।
- ☆ ইহা গুরুতর পাঠকের জন্য, হালকা পাঠকের (৬০ কেজির নিচে) জন্য নহে।
- ☆ দুঃসময়ে কেবল ভালো বন্ধুরাই আপনার পাশে দাঁড়ায়, বিশ্বাস না হলে বিয়ের ছবির অ্যালবাম খুলুন, দেখুন সব ভালো বন্ধু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে।
- ☆ চিঠি লেখার প্রতিভা সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয় প্রেমে পড়লে।
- ☆ একই সঙ্গে প্রেমিক আর জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়।
- ☆ পৃথিবীতে খুব ক্ষুদ্র জিনিসও কখনো আপনার ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? তাহলে...তাহলে... হাতে

সময় নিয়ে কোনো একদিন একটি আলপিনের
ওপর বসার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

☆ কেউ ভুল করেছে এটা বুঝতে পেরেও
আপনি কখন তাকে অভিনন্দন জানান? উত্তর:
কারও বিয়ের খবর শোনার পর।

☆ অলিম্পিকে কেউ আর চীনের নাগাল পায়
না, সকাল থেকে সন্ধ্যা, মেড ইন চায় না।

☆ টারজান যখন একটি মৃত চিতাবাঘ পড়ে
থাকতে দেখে, তখন কী ভাবে? —যাক কয়েকটা
নতুন আন্ডারওয়্যার পাওয়া গেল।

☆ ‘রসাল’ মানে আমগাছ। ‘রস+আলো’ মানে?
...সোমবারের সরস ক্রোড়পত্রের নাম।

☆ বেশি করে গাছ লাগান, রস+আলোর
নিউজপ্রিন্টের জোগান অব্যাহত রাখুন।

☆ রস+আলোর বিকল্প পাওয়া গেছে। প্রতিবছর
অর্থ বাজেট পড়ুন। এতে রস ও আলো দুই-ই
আছে।

☆ আপনার সন্তানকে রস+আলো দিন। ভুলে
ভরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে ভুল শেখার চেয়ে
রস+আলো পড়ে কিছু না শেখাই ভালো।

☆ মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে
বদলায়...আসুন, নিজেকে বদলে প্রমাণ করি,
এখনো বেঁচে আছি।

☆ বাংলা মায়ের ভাষা, কারণ বাবারা খুব কমই
কথা বলার সুযোগ পায়।

☆ এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে
‘রস+আলো’র লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও
শুভানুধ্যায়ী কেউই ‘রং হেডেড’ নন।

☆ গরু কিনলে খাসি ফ্রি, রস+আলো কিনলে
হাসি ফ্রি।

☆ নতুন বছর, যদি ভালো কিছু বয়ে আন পাবে
ফুল, নইলে পথে দেব কাঁটা। **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, জানুয়ারী ২৫, ২০১০

315) আহ! ভালোবাসা

কদিন পরই ভালোবাসা দিবস। আহা!

ভালোবাসা, প্রেম—এ শব্দগুলো শুনলেই কেমন
কেমন যেন লাগে। ভালোবাসা না থাকলে তো
কোনো কিছুই হতো না। এই ভালোবাসা নিয়ে
কবিতা লিখতে লিখতে কত কবির ঝাঁকড়া
চুলভর্তি মাথা যে স্টেডিয়ামে পরিণত হয়েছে
তার কোনো হিসাবই নেই। সারা জীবন প্রেমের
গল্প লিখে নিজের জন্য একটা প্রেমও জোগাড়
করতে পারেনি, এমন লেখকের সংখ্যাও খুব

একটা কম নয়। ভালোবাসার তীব্র টানে
নিজেদের ভালো বাসা ছেড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা
আশ্রয় নেয় পরিবেশবন্ধু গাছতলায়। দারুণ ব্যস্ত
শিক্ষক সিলেবাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও
ছাত্রীকে তিন-চার ঘণ্টা পড়ান, সেটার কারণও
ভালোবাসা! অথচ ভালোবাসা দিবস নিয়ে
সরকারের কোনো পরিকল্পনাই নেই। কত
দিবসেই তো সরকার ছুটি দেয়, অথচ
ভালোবাসা দিবসের মতো ‘গুরুত্বপূর্ণ’ একটা
দিবসে কোনো ছুটি দেওয়া হয় না। ‘স্যার,
আমার পেটে ট্রাবল’—এই টাইপের অজুহাত
দিয়ে কোনোমতে ছুটি নিতে হয়। কিন্তু এভাবে
আর কত দিন? তবে কি আমরা ধরে নেব
সরকার সাধারণ মানুষকে ভালোবাসে না?
তাহলে কি বিরোধী দলের কথাই ঠিক? অথচ,
পুরো ব্যাপারটা কত সুন্দর হতে পারত।
ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা
করা হতো, ১২টা এক মিনিটে সর্বস্তরের
প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের হাত ধরে ‘প্রেমের
মড়া জলে ডোবে না...’ টাইপের গান গেয়ে
দিবসটি উদ্‌যাপন করত। দৈনিক পত্রিকাগুলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করত, যার সব পাতা
থাকত বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ! টিভি সংবাদে বলা
হতো, ‘আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বিশ্বের
কোটি কোটি প্রেমিক-প্রেমিকার সবচেয়ে বড়
উৎসব। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
পৃথক বাণী দিয়েছেন এবং সর্বস্তরের প্রেমিক-
প্রেমিকার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাদের
সুখী জীবন কামনা করেছেন।’ টক শোগুলোতে
সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেতাদের আমন্ত্রণ
জানানো হতো, তাঁরা চা খেতে খেতে কার
আমলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য কেমন সুবিধা
ছিল তা নিয়ে তুমুল তর্কে লিপ্ত হতেন...ইস!
ভাবতেই কত ভালো লাগছে। অথচ, বাস্তবে
এসবের কিছুই হয় না! সবার ভাব দেখে মনে
হয়, প্রেম-ভালোবাসা বিরাট অপরাধমূলক কর্ম।
প্রেম করলেই একেবারে ক্রসফায়ার! আসলে
কেউ ভালোবাসার মূল্য বোঝে না। এ জন্যই
দেশে এত সমস্যা! ধুর, ভালোই লাগে না। তবু
সবাইকে ভ্যালেন্টাইনস দিবসের অনেক অনেক
ভালোবাসা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

316) ভালোবাসা - আহসান হাবীব

মামুনের প্রেমে পড়াটা এ মুহূর্তে খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কী করা যায় বল তো? সে তার ছোট ভাই আবু হেনার কাছে পরামর্শ চায়। তারা পিঠেপিঠি দুই ভাই বলে বেশ বন্ধুর মতোই।

এত তাড়াহড়োর কী আছে!

বাহ, ১৪ ফেব্রুয়ারি চলে এল...বন্ধুরা সবাই বান্ধবী নিয়ে ঘুরবে আর আমি...।

হুম! ছোট ভাইকেও চিন্তিত মনে হয়।

এক কাজ কর...। কী? মলিকেই তো তোর টার্গেট...নাকি? হু।

ওকে পাঁচটা গোলাপ ফুল দে...আজই দে...দিয়ে রি-অ্যাকশন দেখ।

পাঁচটা কেন?

মলির মুখটা অনেকটা বাংলা পাঁচের মতো না? ফাজিল! গেলি...!!

ফাজিল আবু হেনা হে হে করে হাসতে হাসতে উঠে যায়। উঠে না গিয়ে উপায় নেই, মোবাইল ফোনে তার গার্লফ্রেন্ডের কল চলে এসেছে। বড় ভাইয়ের সঙ্গে ফ্রি হলেও এ ব্যাপারটা সে গোপন রেখেছে।

তবে মামুন বিষয়টা নিয়ে ভাবে। গোলাপ ফুল সত্যিই দেবে? দিয়ে দেখাই যাক না। তবে পাঁচটা না, সাতটা দেবে, লাকি সেভেন। তা ছাড়া তার জন্ম ১৬ তারিখ। ৬ যোগ ১ সাত...লাকি নাম্বার।

মামুন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সাতটা গোলাপ। একটু টেনশন লাগছে। এই পথ দিয়েই কলেজের বাসে উঠবে মলি। আবু হেনা অবশ্য শেষে একটা কথা বলেছে, ফুল দেওয়ার পর যদি মলি মুখের ওপর ফুলগুলো ছুড়ে মারে তবে বুঝতে হবে কেস পজিটিভ। আর ফুলগুলো মাটিতে ফেলে পায়ে পিশে ফেললে বুঝতে হবে কেস পুরোই খারাপ। ছোট ভাই আবু হেনা একটু ফাজিল টাইপের হলেও মাঝেমধ্যে ভালো পরামর্শই দেয়। মামুনের সন্দেহ, আবু হেনা প্রেমট্রেম করে, নইলে এত কিছু জানে কীভাবে!

এই সময় রঙ্গমঞ্চে মলিকে দেখা গেল।

আসছে...বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠল মামুনের। গলা শুকিয়ে আসছে, একটু পানি খেলে ভালো হতো। আশপাশে মিনারেল ওয়াটার...।

আরে মামুন ভাই? হাতে এত গোলাপ নিয়ে কার জন্য? আমাকে দেবেন?

তু-তুমি নেবে? নাও...

ওহ, সো সুইট! ফুলগুলো একরকম ছিনিয়ে নিয়ে মলি এগিয়ে গেল। তার কলেজের মাইক্রোবাস হর্ন দিচ্ছে।

একেই বোধহয় বলে মেঘ না চাইতেই ছাতিসহ জল। মলিকে আসল কথাটা বলা হলো না।

তবে প্রাথমিক বিজয় তো হয়েছে! ফুল তার হাতে পৌঁছানো গেছে। দেখি, আবু হেনার সঙ্গে একটা সিটিং দিতে হবে বিষয়টা নিয়ে, পরবর্তী সময়ে করণীয় কী?

ভাই, খবর তো খারাপ।

মানে? মামুনকে উদ্বিগ্ন মনে হয়।

খবর পেয়েছি, তোর গোলাপ শিল-পাটায় বেটে মলি মুখে লাগিয়ে শুয়ে আছে। মানে

রূপচর্চা...গোলাপ বেটে মুখে প্রলেপ দিলে

চামড়ায় উজ্জ্বলতা আসে!

তুই জানলি কীভাবে?

বাহ্, জানব না? আমাদের ঠিকা ঝি মনোয়ারার মা ওদের বাসায়ও ঠিকা ঝির কাজ করে না?

ও-ই বলেছে। সে-ই তো বেটে দিয়েছে তোর সাত গোলাপ!

উফ! বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ে মামুন।

না, ঘাবড়ানোর কারণ নেই। তুই আবার ফুল দে। আবু হেনা আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে। এবার এমন ফুল দিবি যেন বাটতে না পারে।

প্লাস্টিকের ফুল।

আমার সঙ্গে ফাজলামো করিস? রেগে ওঠে মামুন।

আরে না, সত্যি বলছি। বাণিজ্য মেলায়

মালয়েশিয়ান স্টলে নতুন এক ধরনের ফুল এসেছে...প্লাস্টিকের, ব্লেডারে ফেললেও ওই ফুলের কিছু হবে না।

তাই? তুই বলছিস?

সত্যি সত্যিই আবার একদিন মামুনকে দেখা যায়। সেই বিশেষ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে। আজ একটা কিছু বলতেই হবে, ১৪ তারিখ চলে এসেছে। ঘড়ি দেখে মামুন। মলির আসার সময় হয়ে গেছে...এবং মলি আসছে! বুকের ভেতর গুড় গুড় করে ওঠে মামুনের...

আরে মামুন ভাই, আজও ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে কার জন্য?

তো-তোমার জন্যই।

ওহ্, কী সুইট! কী ফুল এটা?

তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।

বলুন। ফুলটা হাতে নিয়ে বলে মলি।

পরশু ভ্যালেন্টাইনস ডেতে কি তোমার একটু সময় হবে?

উ...হবে, কেন?

ওই দিন রমনা পার্কের ফাস্ট গেটে একটু আসতে পারবে?

কেন পারব না?

তাহলে ফাস্ট গেটের ফাস্ট বেঞ্চটায় বিকেল পাঁচটায় আমি অপেক্ষা করব।

নো প্রবলেম! বাই...। বাস এসে গেছে। এগিয়ে যায় মলি।

ভ্যালেন্টাইনস ডে। রমনা পার্কের ফাস্ট গেটের ফাস্ট বেঞ্চে বসে আছে মামুন। সাড়ে চারটায় এসেছে। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। মলি আসবে তো? অবশ্য ঢাকায় আজ খুব জ্যাম। বসে থাকতে থাকতে মামুন যে কখন ঘুমিয়ে পড়ে, টের পায় না। অবশ্য চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখে...তার সঙ্গে মলির বিয়ে হচ্ছে। মলির হাত ধরে নিজের বাড়ি থেকে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি...ঠিক তখন পুলিশের লাঠির গুঁতায় তার ঘুম ভাঙে। এই, ওঠ। ওই মাইয়া, ওঠ! মামুন অবাক হয়ে দেখে তার পাশে অতিরিক্ত সাজগোজ করা একটা মেয়ে। এ মেয়েটা কে? এখানে কেন? সন্ধ্যা রাইতে পার্কে বাজে মাইয়া লইয়া মৌজ কর? চল, শ্বশুরবাড়ি...

ভাই, আপনারা ভুল করছেন।

আবার কথা কয়। ঘোরের মধ্যে পুলিশের গাড়িতে ওঠে মামুন। মেয়েটাকেও ওঠানো হয়। মেয়েটার চেহারা ভাবলেশহীন। তার দিকে ফিরে হঠাত্ ফিসফিস করে বলে, ‘তোমার কোনো দোষ নাই। তোমার বেঞ্চে আইসা বসায় তুমি ধরা খাইছ আমার লগে।’

পুলিশের ওয়াকিটকি বেজে ওঠে—

—হ্যালো? কী? ১০০ জন হয় গেছে? তাইলে এদের ছাইড়া দিই...ধুত্! খালি ঝামেলা! এই, গাড়ি থামাও।

গাড়ি থামল। অফিসার মামুনের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘এই, তোমরা নামো... যাও, বাড়ি যাও... জলদি।’

মামুন নেমে আসে। কী মনে করে মেয়েটার

হাত ধরে নামায়। মেয়েটাকে হঠাত্ মলির চেয়েও সুন্দর লাগে মামুনের। মেয়েটা হাসে। মুক্তির হাসি! মামুন কী মনে করে পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে মেয়েটাকে দেয়।

এইটা কী?

একটা গিফট। তোমার জন্য...তুমিই রাখো। বাক্সটা খোলে মেয়েটি। একটা টকটকে লাল কাচের হার্ট। হার্ট তো আসলে কাচেরই হয়! আর তখন অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কিউপিড। কী মনে করে ছুড়ে দিল তার শেষ তীরটা ওদের দিকে। ওরা টেরই পেল না! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

317) এক্সট্রা - বিশ্বজিত্ চৌধুরী

মাহতাব ভাই আমার চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের বড়। কিন্তু দেখতে যেমন দশাসই, তেমনি অসুরের মতো শক্তি গায়ে। আমাদের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। লুজ বল পেলে চোখ বুজে ছক্কা মারেন। পোর্ট ক্লাবের মাঠটা তো ছোট, মাহতাব ভাইয়ের ছক্কার মারে সীমানা দেয়াল পেরিয়ে বল গিয়ে পড়ে সানিয়া মির্জাদের বাগানে। সানিয়া মির্জা কে? সে কথা পরে বলছি।

শুক্রবার ছুটির দিনে আমাদের ম্যাচ ঠিক হলো ‘তরুণ শক্তি’র সঙ্গে। মনে মনে খুব উত্তেজনা নিয়ে হাজির হয়েছি মাঠে। কিন্তু আমার সব উত্তেজনার মুখে পানি ঢেলে দিয়ে মাহতাব ভাই বললেন, ‘তুমি এক্সট্রা।’

‘মানে?’

‘মানে আবার কী, তুমি দ্বাদশ ব্যক্তি, দলের কেউ আহত হলে তোমাকে নামানো হবে।’

আমি এক্সট্রা? দ্বাদশ ব্যক্তি? পানির বোতল নিয়ে মাঠে নামা, কারও প্যাড বা গ্লাভস জুতসই না হলে বদলে দেওয়ার জন্য ছুটে যাওয়া—এসবই আমার কাজ? অপমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় আমার। কিন্তু খেলার মাঠ বলে কথা, এখানে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ নিষিদ্ধ, তাই অনেক কষ্টে চোখের জল সংবরণ করি আমি।

মাহতাব ভাই বললেন, ‘এক্সট্রা মানে খারাপ কিছু নয়, শচীন টেন্ডুলকারের মতো ক্রিকেটার কতবার এক্সট্রা ছিলেন...।’

তাই নাকি, শচীন টেন্ডুলকারও ছিলেন? আমি

শচীনের বর্তমান ক্যারিয়ার দেখে সান্ত্বনা খুঁজি। খেলায় টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে আমাদের ‘পোর্ট জুনিয়র ক্লাব’। মাত্র তৃতীয় ওভারেই আসল চেহারায় আবির্ভূত হলেন মাহতাব ভাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও শেষ বলে তিনটি ছক্কা। একটি তো দেয়াল পেরিয়ে সোজা সানিয়া মির্জাদের বাগানে। বরুণ বলল, ‘শুক্রবার ম্যাচ হলে মাহতাব ভাইকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।’ কথাটা ঠিক। কেন, শুক্রবার কেন? কারণ ছুটির দিন সানিয়া মির্জা এসে দাঁড়ায় ওদের দোতলা বাড়িটার ছাদে। মাহতাব ভাই বলেন, ‘সানিয়া আমার প্রেরণা।’ প্রতিটি ছক্কাই নাকি সানিয়া সবার অলক্ষ্যে ফ্লাইং কিস পাঠায় মাহতাব ভাইয়ের দিকে। খেলা শেষে ছোট ভাইকে দিয়ে নিজের বাগানের একটি গোলাপ পাঠিয়ে দেয়। এসব শুনে শচীনের বদলে জীবনে মাহতাব ভাই হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখি আমি।

ওর আসল নামটা আমরা কেউ জানি না। মাহতাব ভাই জানেন, কাউকে বলেন না। সব সময় টপ আর স্কাট পরে থাকা এ মেয়েটিকে ভারতীয় টেনিস-তারকা সানিয়া মির্জার মতো দেখায় বলে ও সানিয়া মির্জা। নামটা কে দিয়েছিল কে জানে। শেষ বলে ছয় মেরে ইনিংস শেষ করেছিলেন অপরাজিত ৮০ রান করা মাহতাব ভাই। আমি সেই বল আনতে দেয়াল টপকে ঢুকেছি সানিয়াদের বাগানে। শিউলি-বেলি-জবা-লেবুগাছের ঝোপে-ঝাড়ে উবু হয়ে বল খুঁজছি। হঠাৎ মিষ্টি একটা গলা শুনতে পেলাম, ‘এই যে, বল এখানে।’

ঘুরে তাকিয়ে দেখি জুঁই ফুলের মতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সানিয়া মির্জা। লাল স্কাট আর বল প্রিন্টের টপ পরা মেয়েটাকে কখনো এত কাছ থেকে দেখিনি। এ তো দেখি সত্যিকার সানিয়ার চেয়েও সুন্দরী। চোখে চোখ পড়তে বলল, ‘আসিফ ভাই, কেমন আছেন?’ ‘আমাকে...মানে আমাকে আপনি চেনেন?’ ‘চিনব না কেন? আপনি মুন্নির ভাই, সিটি কলেজে পড়েন, মুন্নি আমার বন্ধু তো, ক্লাসমেট, আপনাদের বাসায় কত গেছি, আপনি গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছেন এসএসসিতে, তখন খালাম্মা মিষ্টি খাইয়েছিলেন...।’

‘আপনি মুন্নির বন্ধু?’

‘আপনি বলছেন কেন, আসিফ ভাই, আমি ছোট না?’

‘হ্যাঁ, তাই তো...তোমার কথাও আমি অনেক শুনেছি...তুমি তো সানিয়া মির্জা, আমাদের মাহতাব ভাইয়ের ইয়ে...।’

‘সানিয়া মির্জা কে? আমি তো তানিয়া, সবাই ডাকে তানি।’

‘সরি, সানিয়া না, মানে তুমি সানিয়ার মতো, টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার নাম শোননি?’

ঠোঁট উল্টে তানিয়া বলল, ‘না।’ শুনে অবাক হইনি। সুন্দরীরা গাধা হয়—এটা আমি জানি।

তানিয়া আবার বলল, ‘কিন্তু মাহতাব ভাইয়ের ইয়ে মানে কী?’

আমি সসংকোচে বলি, ‘মানে যাঁর জন্য তুমি ছাদে এসে দাঁড়াও,...খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে থাক...।’

ভ্রু কুঁচকে তানি বলল, ‘আমি ছাদে দাঁড়াই মাহতাব ভাইয়ের জন্য? মাহতাব ভাইটা আবার কে?’

আমি সিঁড়ির দু-তিন ধাপ উঠে দূর থেকে মাহতাব ভাইকে দেখাই। তানিয়ার মুখটা শক্ত হয়ে আসে, বলে, ‘ও, ওই গাড়লটা? স্কুলে যাওয়ার সময় আমাদের গেটের পাশে ঘুরঘুর করে যে স্টুপিডটা?’

ওর রাগী মুখ দেখে আমার ভয় হয়। আমি বলতে পারি না, তুমি ওকে ফ্লাইং

কিস...বাগানের গোলাপ...।

ওর হাত থেকে বলটা নিয়ে কোনোমতে দেয়াল টপকাতে যাব, তখনই সানিয়া বলল, ‘আসিফ ভাই, আমি তো ছাদে যাই তোমাকে দেখব বলে...।’

কী! আমি কি ঠিক শুনলাম? ঘুরে তাকাতেই দেখি, অদ্ভুত একটা চাহনি দিয়ে ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। আশ্চর্য! আমি তো ছক্কা মারতে পারি না, আমাকে কেন?

মাঠে যখন ফিরলাম তখন নতুন বলে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়েছে। পটাপট উইকেট পড়ছে, জয় আমাদের নিশ্চিত। কিন্তু এসব তখন আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি তো মাঠে না নেমেই ম্যান অব দ্য ম্যাচ। মাথার ভেতর সানিয়া মির্জার শেষ কথাটা, চোখ বুজলেই অদ্ভুত সেই চাহনি। পরদিন থেকে মাঠে এসে প্রথমেই বলে ফেলি, ‘শরীর ভালো লাগছে না, আমি এক্সট্রা।’

মাহতাব ভাই একের পর এক ছক্কা মারেন, আমি বল কুড়োতে দেয়াল টপকাই। কুড়োতে হয় না, আগেভাগেই বল হাতে একগাল জুঁই ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সানিয়া, মানে তানিয়া। একদিন বলল, ‘কাল স্কুলের আগে রেইনবোর সামনে এসো, আসিফ ভাই, আইসক্রিম খাওয়াব। আসবে?’

আসব না মানে!

পরদিন সকালে ফিটফাট হয়ে যাত্রা করেছি রেইনবোর উদ্দেশে। রিকশায় ওঠার মুখে মাহতাব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বলল, ‘কোথায় যাচ্ছিস?’

‘ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি, মাহতাব ভাই।’

‘ম্যাচ কোথায়?’ মহাবিস্ময় মাহতাব ভাইয়ের কণ্ঠে, ‘আমাকে নিবি না?’

‘নিতে পারি, কিন্তু এই ম্যাচে তো তুমি এক্সট্রা।’ রিকশা তখন চলতে শুরু করেছে। মাহতাব ভাইয়ের মুখটা দেখতে কেমন হয়েছে দেখার সুযোগ পেলাম না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

318) সু-দিনে বে-দিনে ড্যা-দিন - সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ভ্যালেন্টাইনস ডে নিয়ে একটা রসাল লেখা লিখতে বলেছেন বিভাগীয় সম্পাদক। কাজটা কঠিন। আমি বলেছিলাম, ভ্যালেন্টাইন-সফল কাউকে বললেই তো ভালো; বিশেষ করে যার জীবনে কোনো ভ্যা-দিবস রসের রসদ জুগিয়েছে। সম্পাদক জানালেন, এক বছর আগের কোনো সফল ভ্যালেন্টাইনকেও দেখা গেছে বছর ঘুরতেই স্ত্রী/প্রেমিকার কাছে ভিলেন্টাইনে পরিণত হতে। প্রধানত, তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। প্রেমিকপ্রবর হয়তো খেয়াল করেনি, প্রেম ও বিয়ে একটা বোঝাপড়ার নাম। এই বোঝাপড়ায় ছেলেটি সব সময় স্বীকার করে নেবে সে ভুল করেছে—কোনো ভুল না করলেও—এবং মেয়েটি সব সময় তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হবে। দুজন যদি একটা ব্যাপারে মতৈক্য পৌঁছাতে না পারে, তাহলে কিসের রসময় জীবন?

সম্পাদক যখন ধরে বসেছেন লেখা চাই, তখন তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, ভ্যালেন্টাইন-দিবস নিয়ে তাঁর কোনো রসের কথা মনে পড়ে কি না; যদি পড়ে, তা দিয়েই চালিয়ে দেব, মাছের

তেলে মাছ ভাজার মতো। সম্পাদক আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, ‘কোন দিবসের কথা বললেন, স্যার? শোক দিবস?’ আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমি দেখেছি, ভ্যা-দিবসটি শোক দিবসও কারও কারও কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ভ্যা-দিবসের প্রধান ভেন্যু। ক্রিকেটের যেমন মিরপুর, ফুটবলের বঙ্গবন্ধু, তেমনি ভ্যা দিবসের ঢাবি। দু-একজন ছেলেকে এখানে ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদতেও দেখেছি। এ রকম একটি ছেলেকে দেখলাম সান্ত্বনা দিচ্ছেন আমার এক সহকর্মী। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, ছেলেটির প্রেমিকা আগের রাতে স্বপ্নে দেখেছে যে ছেলেটি তাকে একটা সোনার আংটি দিয়েছে। সকালে এই স্বপ্নের মানে কী হতে পারে, মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি বলেছে, ‘তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি নিউমার্কেট থেকে আসছি।’ কিছুক্ষণ পর ছেলেটি একটি প্যাকেট নিয়ে ফিরলে মেয়েটি হেসে চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটিও প্যাকেট খুলে তার হাতে কিছু একটা তুলে দেয়। মেয়েটি চোখ খুলে দেখে, খাবনামা। ছেলেটি বলেছে মেয়েটিকে, ‘স্বপ্নটার কী মানে, চলো দুজন মিলে খাবনামাটিতে দেখি।’ তার পরই অবশ্য ভ্যা!

বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইনস দিবস উদ্‌যাপনের ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক। আমার এক মার্কিন বন্ধু এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ‘তোমরা কি তাহলে এত দিন প্রেমহীন জীবন কাটিয়েছ?’ আমি বললাম, ‘এ দিনটি আমাদের দেশে পালিত হয় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস হিসেবে। তুমি হয়তো খেয়াল করোনি, আমেরিকা কীভাবে অপ্রেম ছড়াচ্ছে সারা বিশ্বে। যত না ভ্যা-দিবস কার্ড, তার চেয়ে বেশি বোমা, তার চেয়ে বেশি বুলেট তোমরা পাঠাচ্ছ বিশ্বে। এখন বাংলাদেশ দায়িত্ব নিয়েছে, আমেরিকার অপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তর করার। প্রেমহীন জীবন কাটিয়েছি আমরা? ছোঃ। আমাদের সাহিত্যের এগারো বছরের নায়িকারা (শরচ্চন্দ-রবীন্দ্র দ্রষ্টব্য) যে প্রেমময় কথা বলেছে এক শ বছর আগে, তোমাদের পঁচিশ বছরের নায়িকারাও এখনো তা শেখেনি।’

অবশ্যই। এগারো বছরের মলিনা বলছে চল্লিশ

বছরের সরোজবাবুকে, জ্যোছনা রাতে জানালার পাশে বসে, ‘ও গো, দেখো, আজ চাঁদটা শুধুই তোমার আর আমার। ওই চাঁদের ভেলায় ভেসে কি আমরা দুজন অনন্তের পথে চলে যেতে পারি না?’ সরোজবাবু অবশ্য বলেছে মলিনাকে, ‘জানালাটা বন্ধ করো। বড় ম্যালেরিয়া হচ্ছে দেশে। আর শোনো, এক ছিলিম তামাক সেজে আনো’... ইত্যাদি, কিন্তু তাতে কি! মলিনার এগারো বছরের মনে ভ্যা-দিবস তো সেই বহু আগেই সিল-ছাপ্পর মেরে দিয়েছে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নিয়ে এক গল্প শোনাল আমার এক বন্ধু। পুরান ঢাকার একটা লক্কড়-ঝক্কড় বাড়ির মালিক সে। তার এক ভাড়াটের ছেলে বিশ্ব ভালো বাসা দিবসের পোস্টার ঝুঁকেছে, কলেজে প্রদর্শনী হবে। ছেলেটির বাবা রক্ষণশীল মানুষ; তিনি পোস্টার দেখে ছেলেকে মারতে গেছেন। ছেলে বাবাকে থামিয়ে বলল, ‘রাগছ কেন, বাবা, আজ বসতি পরিষদের উদ্যোগে ‘বিশ্ব ভালো বাসা দিবস’। যে বাসায় আমরা থাকি, সেটা কোনো বাসা, নাকি কাকের বাসা? তুমি ভালো বাসা চাও না?’ আমার আরেক সহকর্মী বিশ্বজিত-এর স্ত্রী দিনটি অন্যভাবে উদ্যাপন করে। তার কাছে এটি ‘বিশ্ব ভালোবাসা দিবস’। বিশ্বজিতকে সংক্ষেপে অনেকে ‘বিশ্ব’ বলে ডাকে।

২. রস+আলোর সম্পাদকের কাছে সাহায্য না পেয়ে আমি মন্টু মামার দ্বারস্থ হলাম। অকৃতদার মানুষ, সত্তরে পা দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেন, তিনি অকৃতদার নন, অক্ৰীতদাস। বিবাহিত পুরুষদের তিনি ক্রীতদাস বলেই ভাবেন। আমার ফোন পেয়ে তিনি বললেন, এসব নিয়ে ভাবেন না। কারণ প্রেম ও বিয়ে—দুটিই জটিল রসায়ন। রসায়ন না হলে বিয়ের পাঁচ বছর পর স্বামীকে রাসায়নিক বর্জ্য বিবেচনা করে ফেলে দিতে উদ্যত হয় কেন মেয়েরা? তিনি তার এক বন্ধুর গল্প শোনালেন। ‘ওর কোনো কথায় স্ত্রী কান দেয় না বলে আমাকে অভিযোগ করার পর বলেছিলাম, “স্ত্রীদের কিছু শোনাতে হলে ঘুমের মধ্যে কথা বলার ভান করো। সেটি তারা কান খুলে শোনে।” তো, মূর্খটা সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে কিছু একটা বলেছিল। তারপর তো গলাধাক্কা।’ বলে হা হা করে হাসলেন। মন্টু মামার বিবাহবিরোধী কথাবার্তা থামাতে আমি এবার

প্রশ্ন করলাম, ‘মামা, বিয়ের সবটাই কেন নেতির দৃষ্টিতে দেখছেন, কোনো ইতি নেই?’ ‘ইতিই তো প্রধান হে,’ মামা আবারও জোরে হেসে বললেন, ‘ইতি ৮০! মনে নেই?’ ফোন রাখার আগে মামা বললেন, ‘শোনো, ইতির কথা যখন তুললে: বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী যখন কথা বলে, স্ত্রী শোনে—এটি ইতিবাচক। দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী কথা বলে স্বামী শোনে—এটি আরও ইতিবাচক। তৃতীয় বছরে দুজনই কথা বলতে থাকে আর প্রতিবেশীরা শোনে। সেখানেই আসল ইতি। হা হা।’

৩. ভ্যা-দিবসের রসের একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার চোখের সামনে, দুই বছর আগে। টিউটোরিয়াল ক্লাস ছিল। দেখি, খুব সেজেগুজে ছেলেমেয়েরা এসেছে। এদিন সকালে মুঠোফোনে মেসেজ এলে সবাই সচকিত হয়। একটি মেয়ের ফোনে মেসেজ এল। সবাই কৌতূহল নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটিও আড়চোখে তার ফোনের দিকে তাকাল। ভ্যা-দিবসের ফোন-মেসেজ বলে কথা, স্যার সামনে বসা থাকুন আর না-ই থাকুন, দেখতে তো হবেই! হঠাৎ মেয়েটি জোরে হেসে উঠল। ‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলে সলাজ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, ‘স্যার, বাবার ভ্যালেন্টাইন মেসেজ, মায়ের জন্য। ভুলে আমার ফোনে পাঠিয়েছে।’

মেয়েটিকে বললাম, ‘তোমার বাবা দীর্ঘজীবী হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

319) স্ক্রিপ্টে ডুল ছিল - আনিসুল হক

পাড়ায় একটা নতুন মেয়ে এসেছে। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে চিত্তচাক্ষুণ্য দেখা দিল। আশফাক আমাদের মধ্যে যোগ্যতম প্রেমিকপুরুষ, কারণ সে পাড়ার নাটকে হিরোর রোল করেছে। আর তা ছাড়া সে মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। তার একটা প্রেম হলো না, এটা ওর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন, আমাদের জন্য প্রেস্টিজের ব্যাপার। পাড়ার নতুন মেয়েটার নাম বিউটি। সে দেখতেও যাকে বলে চলন্ত সৌন্দর্য। সে নাকি একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

আশফাক ওকে টার্গেট করল, ‘দোস্তো, এই পাখিটা আমার, তোরা কেউ অর দিকে তাকাইস

না।' আমরা মেনে নিলাম।

এখন মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কী করে? কী করে তার বাড়ির অন্তঃপুরে আমাদের প্রবেশাধিকার তৈরি করা যায়? আমাদের মধ্যে নয়ন প্যাকেজ নাটক লেখার চেষ্টা করছে।

পাড়ার নাটকটার সে-ই রচয়িতা। বিদেশি গল্প অবলম্বনে ওই নাটক রচনায় সে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছিল। আমরা তাকেই দায়িত্ব দিলাম, 'দোস্তো, তুই একটা স্ক্রিপ্ট লেখ, বিউটির সঙ্গে আশফাকেরে কেমনে ভাঁজ খাওয়াইয়া দেওয়া যায়।'

স্ক্রিপ্ট রচিত হলো। বিউটি যখন ক্লাসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠবে, তখন শামীম, সাহান, বিমল তাকে ঘিরে ধরবে। বলবে, 'কোথায় যাচ্ছ সুন্দরী। আমাদের ট্যাক্স দিয়ে যাও।' তারা বিউটির মোবাইলটা কেড়ে নেবে।

মেয়েটি তখন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করবে। অবধারিত। করতেই হবে। নায়ক আশফাক সেই সময় একটা শোলা দিয়ে বানানো ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে হাজির হবে। সে আক্রমণকারীদের বেদম প্রহার করবে। তারা তিনজনই আশফাকের পা ধরে মাফ চাইবে। 'আশফাক ভাই, আপনি আমগো মাফ কইরা দেন।' আশফাক ওদের লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবে।

বিউটি বলবে, 'আমার মোবাইল?'

আশফাক পরের দিন মোবাইল ফোন নিয়ে বিউটির বাসায় যাবে।

চমৎকার গল্প। আমরা সবাই উত্তেজিত। শোলা দিয়ে ব্যাটটা বানানো হয়েছে, যাকে বলে, জোশ।

মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে সুন্দরী বেরোল। সে রিকশা খুঁজছে তার বাসার সামনে। পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটু এগোল সে।

শামীম, সাহান, বিমল তাকে ঘিরে ধরল।

'সুন্দরী, যা আছে দিয়ে দাও চটপট...'(ওরা সংলাপ ইম্প্রোভাইজ করেছে। বানাচ্ছে)

বিউটি মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। জিন্স আর ফতুয়ায় তাকে মানিয়েছেও বেশ। হঠাত্ করে মেয়েটা কুংফুর মতো করে দুই হাত ভাঁজ করে ইয়া বলে চিৎকার করে উঠল। তার পা গিয়ে আঘাত করল শামীমের মুখে। শামীম ধপাস করে পড়ে

গেল। দুই পা তুলে জোড়া লাগি বসিয়ে দিল
বিউটি সাহানের বুকে। সেও কুপোকাত। বিমল
দৌড় ধরল। মেয়েটি তাকে ল্যাং মারতেই সে
ছয় ফুট গভীর খোলা নর্দমায় জরুরি অবতরণে
বাধ্য হলো।

এই সময় নায়ক আশফাকের আবির্ভাব। সে
বলল, ‘এত বড় সাহস, আমার পাড়ায় আইসা
আমার ডারলিংয়ের গায়ে হাত তোলোস।’ বলে
সে ব্যাট তুলে শামীম আর সাহানকে মারতে
গেল। অমনি তন্বী তাকে ধরে পাঁজাকোলা করে
নর্দমার পানিতে ছুড়ে মারল।

এরই মধ্যে পথচারীরা ঘিরে ধরেছে চারজনকে।
তারা চার ছিনতাইকারীকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া
শুরু করল।

আশফাক বলল, ‘আমারে মারেন ক্যান। আমি
তো অরে বাঁচাইতে গেছি।’

বিউটি বলল, ‘ওই, তুই আমারে ডারলিং কইছস
কেন? আমি তোর ডারলিং হই?’

চারজনই পঙ্গু হাসপাতালে। স্ক্রিপ্ট রাইটার
নয়নকে গালি দিলাম আমরা। ‘তোর জন্য এই
রকম হইল।’ সে বলল, ‘আসলেই।’

ক্যারেঙ্টারাইজেশন ঠিক হয় নাই। নায়িকা যে
কুংফু-কারাতের ব্ল্যাক বেল্ট, সেটা তো আমাকে
আগেই জানাতে হতো।’

ড্রেনের পানিতে ভাসমান দুজনের ছবি পত্রিকায়
ছাপা হয়েছিল। তাতে ছবি-পরিচিতি হিসেবে
লেখা হয়েছিল, ‘প্রেমের মড়া জলে ডোবে
না’। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮,
২০১০

320) আম ছালা দুটোই যখন যায় - ইমদাদুল হক মিলন

মমর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই মামুনের গলাটা
কাদার মতো হয়ে যায়। একেবারে থকথকে
কাদা। অতি মোলায়েম, অতি গদগদ ভাব।
এখনো সেই কাদা গলায় বিরাজ করছে। কিছুটা
কাদা সে উগরে দিল এভাবে—তোমার দুটো
নামই আমার খুব পছন্দ।

ফ্রাইড চিকেনের মোটকা, হাফ সাইজের একটা
রানের মাথা টিস্যুপেপার দিয়ে ধরে আলতো
করে কামড় দিল মম। আমার তো দুটো নাম।
একটা হচ্ছে রেহনুমা তাবাসসুম, আরেকটা মম।
কোনটা তোমার পছন্দ?

ওই তাবাসসুম মাবাসসুমটা না, আমার পছন্দ

মম। মম অর্থ হচ্ছে অমর। নাম শুনেই বোঝা যায় তুমি অমর।

মুরগির ঠ্যাংয়ের কিছুটা গোশত দাঁত দিয়ে এমনভাবে ছাড়াল মম, যেন ঠোঁটের গাঢ় লিপস্টিকে মাখামাখি না হয়ে যায়। সেই অবস্থায়ই বলল, আমি তো তোমারই। আমি কি আর কারও?

না না, তুমি আর কারও হবে কেন? আমার বয়স একটু বেশি। তোমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান অনেক...

মামুনের কথা শেষ হওয়ার আগেই মম বলল, এমন কিছু বয়স তোমার না। মাত্র তেতাল্লিশ। আমার হচ্ছে তেইশ। ব্যবধান বিশ বছর। এটা কোনো ব্যাপার না। আজকালকার আমার বয়সী মেয়েরা তোমাদের বয়সী পুরুষদেরই পছন্দ করে। কেন পছন্দ করে জানো, যাতে বরও ডাকা যায়, বাপও ডাকা যায়। আমেরিকায় তো টিনএজ মেয়েগুলো বুড়ো হাবড়াদের সঙ্গে প্রেম করে আর সারাক্ষণ তাদের ড্যাড ডাকে। হাবড়াগুলোর বেশির ভাগই বিবাহিত। এ ক্ষেত্রে তোমার একটা সুবিধা আছে। তুমি এখনো বিয়েই করোনি। তুমি অবিবাহিত।

অবিবাহিত কথাটা শুনে বুকটা ধক করে উঠল মামুনের। সেটা বুঝতে দিল না মমকে। মুখে কেলানো একটা হাসি ফুটিয়ে খানিক হে হে করল। তা তো বটেই, তা তো বটেই।

অবিবাহিত, হে হে।

মুরগির ঠ্যাংয়ে আরেকটা কামড় দিল মম। এবারও ঠোঁট এবং লিপস্টিক বাঁচিয়ে। এই তোমাকে একটা তথ্য দিচ্ছি, শোনো। মেয়েরা লিপস্টিক ব্যবহার করে ঠিকই কিন্তু অপচয় করে কম। এই পৃথিবীতে বছরে সাড়ে ২৭ লাখ মেট্রিক টন লিপস্টিক উৎপাদিত হয়, তার মধ্যে ১৮ লাখ মেট্রিক টন লিপস্টিক পুরুষেরা খেয়ে ফেলে।

শুনে মামুন মুগ্ধচোখে মমর দিকে তাকিয়ে সেই বেকুব হাসিটা হাসল। হে হে। বাহ্, অসাধারণ তথ্য। তোমাকে যত দেখি ততই ভালো লাগে আমার। তুমি এত সুন্দর। তোমার মতো সুন্দরী এই জীবনে আমি আর দেখিইনি। তোমার সামনে কিসের ঐশ্বরীয়া, কিসের প্রিয়াংকা। মুখে কপট একটা ভঙ্গি করে মামুনের দিকে তাকাল মম। যাহ্, ওরা কত সুন্দরী! তবে তুমি

কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম। যেকোনো মেয়ে তোমাকে দেখলেই ‘তবে রে’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার ওপর অত্ত বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে অত্ত বড় জব করো। তুমি একদম ‘জোছ’। বিবিএতে আমার লাস্ট সেমিস্টার চলছে। তার পরই তোমাকে আমি বিয়ে করে ফেলব। বরও ডাকব, বাপও ডাকব।

শুনে মামুনের কলিজাটা এবার মাত্র জবাই করা হয়েছে এমন মুরগির মতো একটা লাফ দিল। তবু মুখে সেই হে হে হাসিটা সে বজায় রাখল। হে হে।

মম বলল, কী, বিয়ে করবে না আমাকে? ওই দেখো মেয়ে কী বলে? তোমাকে ছাড়া আর কাকে আমি বিয়ে করব বলো? তুমি হচ্ছেছো আমার ঐশ্বরীয়া, তুমি হচ্ছেছো আমার প্রিয়াংকা। তাহলে আজ আমাকে ওই পান্নার সেটটা কিনে দাও না। মাত্র ৮৯ হাজার টাকা দাম। ওটা আমার খুবই পছন্দ। এক অ্যাস্ট্রোলেজার আমার হাত দেখে বলেছে, আঙুলে পান্নার আংটি আর গলায় মাঝেমধ্যে পান্নার নেকলেস পরলে, আমি যা চাইব তা-ই হবে। আমি তোমাকে চাই। ওই সেট মাঝেমধ্যে পরলে তোমাকে আমি পেয়ে যাব। আংটি তো সব সময়ই আমার আঙুলে থাকবে। আমি তোমার প্রেমে পড়লাম চার মাস হয়েছে। এই চার মাস তুমি আমাকে লাখখানেক টাকার জিনিস দিয়েছ। আর মাত্র ৮৯ হাজার টাকা! আজই কিনে দাও না, সোনা।

মামুনের ভেতরটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুখে ওই হে হে হাসি। এমন করে বলার দরকার নেই। চলো এম্ফুনি কিনে দিচ্ছি।

কেএফসি থেকে বেরিয়ে সোজা গুলশান মার্কেট। ক্রেডিটকার্ড চার্জ করে পান্নার সেটটা মমকে কিনে দিল মামুন। কলিজাটা যদিও তার পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। প্রেমিকার চাহিদা বলে কথা।

পরদিন সকালে ঘটল আসল ঘটনা। আজ ছুটির দিন। মামুন একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। ঘুম ভেঙে দেখে স্ত্রী রেখা ব্যাগ-সুটকেস গোছাচ্ছে। পাশে পুতুলের মতো সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে মামুনের সাত বছরের মেয়ে মিষ্টি। ঘটনা কী?

মিষ্টি বলল, বাবা, আমরা নানুর বাড়ি চলে যাচ্ছি। মা, বলেছে এই বাড়িতে আর ফিরবে

না।

মামুন রেখার দিকে তাকাল। রেখা একবারও তার দিকে তাকাচ্ছে না। মুখটা থমথমে।

মামুন কোনো রকমে বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ককটেল ফাটার মতো এবার ফাটল রেখা।

তোমার মতো লুচার সংসার আমি করব না।

সাত বছরের বাচ্চা থাকার পরও, আমার মতো বউ থাকার পরও তুমি একটা বাচ্চামেয়ের সঙ্গে লুচামি করছ। তাকে বিয়ে করার কথা বলেছ। কাল তাকে ৮৯ হাজার টাকা দিয়ে পান্নার সেট কিনে দিয়েছ। এই যে দেখ, সেই মেয়ে আমাকে সব লিখে এসএমএস করেছে। আর এ পর্যন্ত তুমি তাকে যা যা দিয়েছ, সব একটা লোক দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে।

নিজের মোবাইল অন করে এসএমএসটা

মামুনের চোখের সামনে মেলে ধরল রেখা।

পড়ো, পড়ো তুমি। আর এই যে মমকে যা যা দিয়েছ, সব এই প্যাকেটে আছে।

মামুন তখন জিন্দালাশ হয়ে গেছে। মম, মম এমন একটা কাজ করল! হায় হায়, এখন কী হবে?

এ সময় মামুনের মোবাইল বাজল। আনমনা ভঙ্গিতে ফোন ধরল সে। ওপাশ থেকে মমর গলা ভেসে এল। আপনার বউকে আমি সব জানিয়ে দিয়েছি, আপনার দেওয়া জিনিসগুলোও ফেরত পাঠিয়েছি। আপনার মতো লোকদের এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়।

রেখা তার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার ১০ দিন পর ডিভোর্স লেটার পেল মামুন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

321) নিছক সাক্ষাৎকার ও

ভালোবাসার গল্প - খসরু চৌধুরী

১৯৯০ সালে তীব্র গণ-আন্দোলন চলছে। দেশের সব পত্রপত্রিকা বন্ধ। এমনই সময়ে ভ্রমণ আয়োজক এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো, তাদের অতিথি হয়ে জাপান থেকে বিখ্যাত এক অভিনেত্রী আসছেন, আমি চাইলে তার একটি সাক্ষাৎকার নিতে পারি। জাপানি তরুণদের বুক-ধড়াস এ অভিনেত্রীর বয়স মাত্র উনিশ—কিন্তু এরই মধ্যে তিনি হলিউডের তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

নাম ইয়োকি কুদোহ। ইউনেস্কো তাকে শুভেচ্ছা দূত নির্বাচন করেছে। টোপ গিললাম।

কিন্তু আগে কখনো কোনো অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নিইনি। কী জিজ্ঞেস করা উচিত, সেটা জানার জন্য আমার প্রিয়ভাজন অভিনেত্রী তারানা হালিম ও নৃত্যশিল্পী তামান্না রহমানের কাছ থেকে কিছু টিপস নিলাম।

সাক্ষাৎকারের সময় এবং স্থান নির্বাচন করা হলো সন্ধ্যা সাতটায় শেরাটন হোটেলের লবিতে।

নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মতিউর রহমান ও জাপানি ভাষা জানা বন্ধু যিশু তরফদারকে নিয়ে শেরাটনে উপস্থিত হলাম। শুনলাম কুদোহ সারাদিন কয়েকটি স্কুল ঘুরে খানিকক্ষণ আগে হোটеле ফিরেছেন। তাঁর সেক্রেটারি মহিলা জানালেন, সাক্ষাৎকারে যদি তাঁর ছবি তুলি তাহলে আধাঘণ্টা লাগবে। ছবি না তুললে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসবেন। আর সাক্ষাৎকার অবশ্যই আধাঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

জানালাম, ছবি তুলব, আধাঘণ্টা পরেই আসুন। আধাঘণ্টা পর সেক্রেটারি, দুজন মহিলা বডিগার্ডসহ কুদোহ এলেন। সাধারণ জাপানি মেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা দীর্ঘছন্দের একহারা চেহারার প্রায় আয়ত চোখের অধিকারিণী ঈষৎ উন্নত নাকের অভিনেত্রীকে ঠিক জাপানি মনে হচ্ছিল না। কিন্তু সৌজন্যে পুরোপুরি জাপানি কেতা বজায় রাখলেন। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি আমেরিকান টানের ইংরেজিতে কথাবার্তা শুরু করলেন।

অভিনয়ে কী করে এলে—জিজ্ঞেস করলাম। অভিনয় করব কখনো ভাবিনি। বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে থাকতাম। টমবয় টাইপের ছিলাম। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করতাম।

ভালোবাসতাম সাইকেল চালাতে আর সাঁতার কাটতে। স্কুলে ভালো ছাত্রী ছিলাম না—

রূপকথার বই পেলে খুব পড়তাম। একদিন মাঠে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে খেলছি, হঠাৎ একজন টেকোমাথার লোক আমাকে ডেকে বললেন, তুমি মডেল হবে? তাহলে এই ঠিকানায় আমাদের এজেন্সিতে চলে এসো।

ব্যাপারটি উড়িয়ে দিলাম। দিনকয় পর মনে

হলো, একবার গিয়েই দেখি না কী হয়! গেলাম সেখানে। আমাকে হালকা মেকাপ দিয়ে একজন ক্যামেরাম্যান আমার প্রচুর ছবি তুলে কিছু ইয়েন ধরিয়ে দিলেন।

দিন তিনেক পর সেই টেকো বাড়িতে হাজির। আমাকে নাকি একটি বিজ্ঞাপনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে আবার অনেক ছবি তোলা হলো। টাকাও পেলাম। পত্রপত্রিকায়, বিলবোর্ডে নিজেকে দেখে অবাক লাগল। এরপর একের পর এক বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন করলাম। তারপর ছবির সুযোগ পেলাম। দুটি ছবি হিট করার পরই হলিউডে অফার পেলাম। কষ্ট করে ইংরেজিও শিখে নিলাম।

—এ জীবন কেমন উপভোগ করছ?

আমি হাঁফিয়ে উঠেছি, দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার কোনো প্রাইভেসি নেই। হয় শুটিং, নয় পার্টি। যেখানেই যাই, ক্যামেরা পেছনে তাড়িয়ে বেড়ায়।

—বয়ফ্রেন্ডকে সময় দিতে পার?

আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। আমার মনে হয়, আমি কাউকে বুঝি না, নয়তো আমাকে কেউ বোঝে না।

—কী ধরনের ছবিতে অভিনয় করতে পছন্দ কর?

রোমান্টিক কমেডি, নয়তো সিরিওকমিক। অথচ জাপানের সাতটি টেলিভিশন চ্যানেলেই তুমি সেক্স, ভায়োলেন্সের প্রদর্শনী দেখতে পাবে। আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। অথচ করতে হয়...।

—এটা তো তোমার প্রফেশনাল অ্যাটিচুড হলো না।

আমি ভীষণ ক্লান্ত। তারপর সে যে কথাগুলো বলল সেগুলো খুব মন খারাপ করা। আমি বললাম, তোমার কি প্রায়ই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে, চিরতরে?

হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি কী করে জানলে?

এ সময়ে কুদোহর সেক্রেটারি জানালেন, আধাঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কুদোহ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করে বলল, আমাকে একটু একা কথা বলতে দাও। তারপর অধৈর্যের

মতো বলল—বলো, বলো, কী করে বুঝলে?
বললাম, পারফরমিং আর্টে যাঁরাই জনপ্রিয়তা
পান, তাঁদের মনের মধ্যে একটা শূন্যতা কাজ
করে। এত অল্প বয়সে আর স্পর্শকাতর মনে
সেটা আরও চেপে বসে। আর তোমার অসামান্য
জনপ্রিয়তা সেই শূন্যতাকে আরও বড় করে
দিয়েছে। তার ওপর তোমাকে তোমার মনের
বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করতে হচ্ছে...।

সে কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে
মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে ঝরঝর
করে চোখের জল ছেড়ে দিল। বলল, তোমাকে
চিঠি লিখলে জবাব দেবে?

—ঠিকানা জানি না।

সেক্রেটারি কার্ড এগিয়ে দিলে কুদোহ ঝটকায়
তাকে সরিয়ে দিয়ে আমার হাত থেকে কাগজ-
কলম ছিনিয়ে নিয়ে খসখস করে তার ঠিকানা
লিখে দিল। কাতর কণ্ঠে বলল, কেন দেবে না?
নিশ্চয়ই দেবে।

এরই মধ্যে কুদোহর বডিগার্ড কুদোহকে
একরকম টেনে তুলে লিফটের দিকে এগিয়ে
গেল। আমরাও এগিয়ে গেলাম। কুদোহ বোতাম
টিপে লিফট আটকে রেখে ভেজা কণ্ঠে বলল,
বলতে পার আমি কীভাবে বাঁচব? বললাম, তুমি
যতটা পরিশ্রম করেছ, পেয়েছ তার লক্ষ গুণ।
পরিশ্রমটা যদি বাড়াতে পার, তবে প্রাপ্তির
কাছাকাছি এলে মনে শান্তি আসবে। তুমি বলেছ
তোমার লেখার অভ্যাস আছে, চালিয়ে যাও, এটা
তোমার বাঁচার সহায় হবে।

—কাল কি সন্ধ্যায় তোমার আর একবার সময়
হবে?

আমি হাসলাম। লিফট চলতে শুরু করেছে।
শেষ কথা শুনলাম, আমি বুঝে গেছি, তোমার
সময় হবে না। তুমি আমাকে লিখবেও না।
লিফট উঠে গেলে মতি ভাই, যিশু আমার দুই
ডানা ধরে সিঁড়ির পথে এগিয়ে নিলেন। মতি
ভাই পিঠ চাপড়ে বললেন, আরে তোমরা তো
আর এক রোমান হলিডে তৈরি করতে
যাচ্ছিলে।

অনেককাল পরে সুন্দরবনে একদল জাপানি
পর্যটকের কাছে কুদোহর কথা জানতে
চাচ্ছিলাম। তারা বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিল না
কুদোহর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। একজন
জানালেন, কুদোহর মা টোকিওতে বিরাট এক

রেস্তোরাঁ দিয়েছেন, সেখানে পাখির মাংস পাওয়া যায়। আমারও মাঝেমধ্যে মনে হয়, সত্যিই কি কুদোহর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

322) ভ্যালেন্টাইনে বিবাহ - মঈনুস মুলতান

কাবুল থেকে ওয়াশিংটনে এসেছিলাম।
ভ্যালেন্টাইন দিবসের সকালবেলা পলের কাছ থেকে টেলিফোন পাই। ইরাক যুদ্ধের এ সাবেক সেনা কাবুলে আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। পলও ওয়াশিংটন এসেছে সিকিউরিটিবিষয়ক ব্রিফিংয়ের কাজে। টেলিফোনে সে আমাকে তৎক্ষণাত্ শহরতলির জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে হৃদের পাড়ে আসতে বলে। এসে দেখি সদ্য পরিচয় হওয়া একটি মেয়েকে পল এখনই বিয়ে করতে যাচ্ছে। প্রস্তুতি চলছে, বেশ কজন মাথা চাঁছা ইরাক যুদ্ধের সাবেক সেনা মস্ত মস্ত সব পাথর নিয়ে টানাহেঁচড়া করে তৈরি করছে বিবাহের বেদি—হৃদের নকশা। একজন পাদ্রিকেও ডেকে আনা হয়েছে বিয়ে পড়ানোর জন্য। তাঁর চুলের ঝুঁটি থেকে লকলক করছে তাজা গোলাপ। গঞ্জিকা বৈধকরণ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাঁকে গির্জা থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। হৃদের নকশার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপুলকায় পল মাথা কামানো ঘটোৎকচের মতো মচমচ করে পটেটো চিপস চিবোচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে আঙুল দিয়ে গলা কেটে হারিকিরির প্রতীক দেখিয়ে বলে, কনে এসে পৌঁছায়নি, সে মোবাইল ফোনও বন্ধ করে রেখেছে। পাদ্রি দ্রুত বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য তাড়া দেন। তাঁর হাতে সময় স্বল্প, একটু পর তিনি খোদ হোয়াইট হাউসের সামনে যাবেন। মারিজুয়ানা মেডিক্যালি জায়েজ করার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে দাঁড়াতে হবে তো। আমাকে কিছু করতে হয়, তাই পলকে হিম্মত জুগিয়ে বলি—চল, সম্ভাব্য শ্যালিকাকে তার বাড়ি থেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসি। কিন্তু পল তার গাড়ির চাবি খুঁজে পায় না। ঠিক তখনই এসে থামে বেজায় রকমের দীর্ঘ চেসিসের জমকালো একটি লিমোজিন। না, লিমোজিনে চড়ে কনে আসেনি, তবে তার এক সাবেক স্বামী লিমোজিনজাতীয় মস্ত গাড়িখানা পাঠিয়েছে তার পুনর্বীর বিবাহে আমোদদানের উদ্দেশে। আমরা

তাতে চাপতে চাপতে ভাবি, মেয়েটির বিবাহজাতীয় কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং সে হয়তো পলকে এবার একবারে ডোবারে না।

কনের অ্যাপার্টমেন্টের ডোরবেল টিপতেই বেরিয়ে আসে মিনি স্কার্টের সঙ্গে মুখোশ পরা একটি মেয়ে। মনে হয়, মেয়েটির শরীর অ্যায়সা আকর্ষণীয় যে সে অজানা আগন্তুকদের মুখ দেখানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না। মুখোশিকা আমাদের জানায়, আরে, অধৈর্য হওয়ার তো কিছু নেই, তার বান্ধবী আগেও একাধিকবার বিয়ে করেছে। কথা যখন দিয়েছে, এবারও করবে। তবে কি না সে গেছে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে তেসরা স্বামীর কাছে রেখে আসতে। আজ সকালে বেবিসিটার না আসায় যত গোল বেধেছে।

ফিরে এসে দেখি বোল্ডার সাজিয়ে তৈরি হৃদয়ের নকশার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝক ব্রাইডাল গাউন পরা কনে। তার সঙ্গে এসেছে সাবেক দুজন স্বামী ও পাঁচ বছরের মেয়েটি। সে পলকে অজুহাত দিতে গিয়ে বলে, তৃতীয়বার যখন বিয়ে করি তখন অনেক খরচ করে এ গাউনটি তৈরি করেছিলাম। এখন তো রিসাইকেলের যুগ, তাই এ গাউনটি আবার ব্যবহার করছি; কিন্তু এটি এক্স হাজব্যান্ডের ওয়ার্ডরোবে খোঁজাখুঁজিতে অনেক সময় লেগে গেল, সরি। পাদ্রি তাড়া দেন। ঠিক তখনই বানরের মতো বাচ্চা মেয়েটি লাফ দিয়ে ঝুলে পড়ে পলের কাঁধে। নতুন বাবা পাওয়ার সম্ভাবনায় মেয়েটি স্পষ্টত খুশিতে বাগবাগ। পল ঝুলন্ত মেয়েকে নিয়ে কনের সামনে দাঁড়িয়ে সহসা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলে, তুমি কি সত্যি আমাকে বিয়ে করবে? আরে, কী মুশকিল! বিয়ে করতে জানি না নাকি? কাম ডাউন, হানি, শান্ত হও—বলে কনে পলের চাঁছা তালুতে হাত বুলিয়ে দিলে তার বন্ধুবান্ধব সাবেক সেনাদের অনেকের চোখেই অশ্রু দেখা যায়। মনে হয়, পকেটে করে ক্লিনেক্স নিয়ে এলে এদের খানিক হেল্প করা যেত। পাদ্রি তাঁর ঝুঁটি থেকে গোলাপ খুলে বিয়ে পড়ানোর উদ্যোগ নেন। কনে পলকে জড়িয়ে ধরে বলে, এ বিবাহে বাইবেলের ব্যবহার না করলে ভালো হয়, অতীতে বাইবেল পড়ে আমি অনেকবার বিয়ে করেছি, কোনোটাই

জুতসই হয়নি। পাদ্রি জানান, এতে কোনো সমস্যা নেই, বিয়েটা দয়া করে দ্রুত করো, আমার তাড়া আছে, তারপর আমি না হয় ম্যাকব্যথ থেকেই পড়ে শুনিয়ে দেব।

বিয়ের পর বর-কনের সঙ্গে বাচ্চা মেয়ে ও সাবেক দুজন স্বামীও এসে লিমোজিনে ওঠে। আমরা খানিক অস্বস্তি নিয়ে মুখোমুখি বসি। সদ্য স্বামী হওয়া পল আগেকার স্বামীদের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করে। সবার গম্ভীর মুখ দেখে শ্যাম্পেনের ট্রে হাতে ড্রাইভার জানতে চায়, ইজ দিস অ্যা স্যাড অকেশন? আরে, দুঃখজনক ঘটনা হবে কেন?—বলে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত স্বামী কোনো বুটঝামেলা ছাড়া ডিভোর্স দেওয়ার জন্য কনেকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলাস উঠিয়ে টোস্টের প্রস্তাব দেয়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

323) ড্যালেটোইন মিক্স - শায়ের খান

ভালোবাসা দিবসেই ওয়েলকাম টিউনে প্রেমের গান লাগাতে হবে—সুমীর এই খ্যাতনেসটা আমার অসহনীয় হলেও শুনতে লাগলাম। ককট রাশির মেয়ে। একবার বেকে বসলে সমস্যা। ‘হ্যালো।’ গম্ভীর গলা ওর। তুলি খালার মেয়ে ও।

‘সরি, আসছি, এন্ফুনি আসছি।’ চোর প্রেমিকের বড় গলা।

‘সবাই ভোর থেকেই ভালোবাসা স্টার্ট করে দিয়েছে, আর তুমি কিনা, এখন প্রায় একটা বাজে—।’

‘তাতে কী? ভালোবাসা কি মাছ না দুধ যে দুপুর গড়ালেই নষ্ট হয়ে যাবে?’

‘তোমারটা হতেও পারে—কোনো গ্যারান্টি নেই।’

‘ডেন্ট ওরি। কামিং। আর শোনো, ওই আমেরিকান বার্গার বা অ্যারাবিয়ান শোয়ার্মা-ফোয়ার্মা না—সরাসরি শেরাটনে আসো। ওখানে টার্কিশ বুফে ট্রিট পাচ্ছ শর্তসাপেক্ষে। ওই নাকফুলটার সঙ্গে পিংক জর্জেটটা পরে আসতে হবে কিন্তু। ডান?’

‘ও-কে, ডান!’ রাগীস্বর এখন আহ্লাদে পরিণত হয়েছে। দুই.

লবিতে পিংক জর্জেটে পেছন ফিরে বসায় সুমীকে সারপ্রাইজ দেওয়ার একটা সুযোগ হলো। আস্তে করে পেছনে গিয়ে চোখ চেপে

ধরলাম ওর।

‘ছাড়ো, লোকে দেখলে কী ভাববে—এই বুড়ো বয়সে!’

‘অ্যাঁ! সৰ্বনাশ!’—এ তো দেখি তুলি খালা পিংক জর্জেটে।

সম্মোহিতের মতো বসে পড়ি সামনাসামনি। বড় বড় চোখে দুজন চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। অতঃপর মাথা নিচু।

‘তুই?’ নিচুস্বরে বলেন খালা।

‘ইয়ে, খালা, এখানে তো সুমীর আসার কথা।’

‘বলিস কি? সুমী কী করে আসবে? ওর তো জ্বর, গলায় ইনফেকশন। শুয়ে আছে!’

‘কিন্তু আমি যে ফোন করলাম, কথা বললাম?’

‘অ্যাঁ আল্লাহ!’ চমকে ওঠেন খালা। ‘ওই ফোনটা তুই করেছিলি? আমি তো ভাবলাম তোর খালু!’ বলেই ফোন সেটে নম্বর দেখেন। আমিও দেখি আমারটায়। আর দুজনই চমকে উঠি।

তোতলানো স্বরে বলি, ‘ভুলে তোমার নম্বরে চাপ পড়ে গিয়েছিল!’ মাথা নিচু করি। খালাও। তবে

খালা মাথা নিচু করার সঙ্গে অবচেতনভাবে

নাকফুলটায়ও টোকা দিতে থাকেন। মৃদুস্বরে

বলি, ‘তোমাকেও নাকফুলে খারাপ লাগছে না

খালা! আর!’ ‘আর?’ মাথা তোলেন খালা।

‘আর ভালোবাসা মানেই কি শুধু প্রেমিক-

প্রেমিকের মধ্যে ভালোবাসা? ভালোবাসা হবে

বাবা-মেয়ের মধ্যে, ভালোবাসা হবে শিক্ষক-

ছাত্রের মধ্যে, ভালোবাসা হবে বাস ড্রাইভার-

পুলিশের মধ্যে—আরে এসব কি?’

খালাও চার্জড হয়ে যান আমার কথায়। আরও

উচ্চস্বরে বলেন, ‘ভালোবাসা মানে কি শুধু

আমির-কারিনার বৃষ্টিভেজা জুবি ডুবি জুবি ডুবি

ড্যান্স? দাঁড়া, তোর খালুকে ফোন দিয়ে ডেকে

আনি। তিনজন মিলেই আজ ফ্যামিলি লাভ তৈরি করব!’

খালুর ফোন বন্ধ পেয়ে খালার মন কিছুটা ভারী

হয়ে যায়। বলেন, ‘মরুক গে। চল। তুই হচ্ছিস

আমার ভাগ্নে-কাম-হবু জামাই। আমি তোকে

আদর করব না তো কি, অন্য মহিলা এসে

আদর করবে? আয় কাছে আয়!’ আমি ফেসটা

বাড়িয়ে দিই। খালা আমার কপালে সশব্দে

একটা স্নেহের চুমু দেন।

‘এক্সকিউজ মি’, বলে ওঠে হোটেলের একজন,

‘এটা ওপেন স্পেস, ম্যাডাম। একটু দেখেগুনো!’

‘হ্যালো!’ খেপে ওঠেন খালা। ‘হি ইজ মাই সান।
প্লিজ, অয়েল ইওর ওন মেশিন!’
ব্যাচারা কেটে পড়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের
দোলাচলে! ‘চল’, বলেন খালা। ‘রেস্টুরেন্টে
যাওয়া যাক টার্কিশ বুফের জন্য। তখন থেকেই
খিদেটা চাগিয়ে দিয়েছিস তুরস্কের টোপ দিয়ে।
তোর কিপটা খালুর জ্বালায় গত তিন বছর
কোনো ফাইভ স্টারের মুখ পর্যন্ত দেখতে
পারিনি।’

তিন.

লাঞ্চ শেষে আমরা গাড়ি পার্কিং লটে রেখেই
রিকশায় ঘুরে বেড়াই ভালোবাসার ঐতিহ্যের
সন্ধানে। কোনো কোনো রিকশা থেকে আমাদের
অসম জুটি দেখে ফিক ফিকে হাসি আসতে
থাকে। আমরা তাতে খোড়াই কেয়ার করি।
হঠাত্ ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠি
আমি!

‘কী হলো রে?’ তটস্থ খালা বলে ওঠেন। কাঁদতে
কাঁদতে বলি, ‘তুমি না বললে, সুমীর জ্বর?’
‘হ্যাঁ। গলায়ও ইনফেকশন! কেন?’ ‘ওই তো
দেখি সুমী! রাস্তার ওপারে রিকশার হুড তুলে
কার সঙ্গে যেন বসে আইসক্রিম খাচ্ছে!’ ‘রাখ
রাখ’, সান্ত্বনার কণ্ঠ খালার। ‘দেখি তো ফোন
করে! নাহ, ফোন বন্ধ! তাহলে ওটা ভুতুম!’
ভুতুম সুমীর চাচাতো ভাই।

হঠাত্ আবারও ভূত দেখার মতো চিৎকার করে
উঠি।

‘আবার কী হলো রে?’ খালার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।
‘সুমীর হাত থেকে আইসক্রিম ও খেল যে!’
‘তাহলে ভুতুমই হবে’, নিশ্চিত হন খালা। ‘ভুতুম
আইসক্রিম খুব পছন্দ করে। আর বোন ভাইয়ের
থেকে খাবে না তো কী অন্যেরটা লুটপাট করে
খাবে? তোর প্রবলেম কী? তোর সুমী তো
তোরই থাকছে, বোকা!’

শান্ত হই আমি। চোখ মুছতে মুছতে বলি,
‘তাই?’

চার.

ধানমন্ডি লেকের পাড়ের বেঞ্চিতে খালার সঙ্গে
চোখ চেপে ধরা খেলার এক ঘন্টা পর লেকে
যখন খালা আর আমি নৌকায় প্যাডেল মারছি,
তখন হঠাত্ খলাই চিৎকার করে আমার কাঁধে
মাথা রাখলেন। কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন,
‘কল্লোল, এ আমাকে কী দেখতে হলো রে? এর

চেয়ে যে মরে যাওয়াও ভালো ছিল।’ ‘কী হয়েছে, খালা?’

‘ওই যে ওই বোটে দেখ, তোর খালু ওর এক্স গার্লফ্রেন্ড তুতলীকে নিয়ে ভালোবাসার প্যাডেল মারছে।’

চুপ করে থাকি তিন সেকেন্ড। শান্ত স্বরে বলি, ‘খালা! খালু আর তুতলী আন্টি ইকোনমিকসে পড়ত না?’

‘হ্যাঁ, কেন রে?’

‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময় দুই ইকোনমিস্ট বসে বসে হয়তো অর্থনৈতিক আলোচনা করছেন প্যাডেলের ওপর!’

‘তুই বলছিস?’ চোখ মোছেন খালা, আধা বিশ্বাসী চোখে।

‘হ্যাঁ, ভালোবাসা দিবসে দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই হয়তো ওনাদের এই ভ্যালেটোইনমিকস!’

‘ইকোনমিকস হোক আর হোম ইকোনমিকস হোক—বোট ঘোরা। সহ্য করতে পারছি না আমি!’

বোটটি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দ্রুত প্যাডেলে পা চালাই। খালাও ভাল মেলাতে থাকেন—লেফট রাইট, লেফট রাইট! সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

324) নম্বরের প্রেম - তানিম হুমায়ুন

‘প্রেম’ শব্দটা সম্ভবত খুব স্পর্শকাতর। মানুষ মুখে আনতে চায় না। ধরা যাক, রাশেদ আর মিতি নামে দুজনের মধ্যে প্রেম আছে। কিন্তু এটা নিয়ে যখন কথা হবে, তখন কেউ বলবে না তাদের মধ্যে প্রেম। বলবে, তাদের ‘অ্যাফেয়ার’ আছে, ‘রিলেশন’ আছে কিংবা ‘সম্পর্ক’ আছে। ছোটবেলায় আমাদের মফস্বলে প্রেমের আরেকটা বিকল্প শব্দ প্রচলিত ছিল। লাইন। মিতির সঙ্গে রাশেদের ‘লাইন’ আছে। বেহায়া গোছের কেউ হলে বলবে, রাশেদ ও মিতি লাইন মারতেসে।

প্রেমের প্রতীকী গাণিতিক চিহ্ন ‘+’। খাগড়াছড়ির আলুটিলার গুহায়, ঢাকা চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার বিপজ্জনক রেলিংয়ে, শিশুপার্কের নাগরদোলার দুরূহ উচ্চতায় ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লেখা নামের যোগফল দেখেছি—

‘মজনু+বিলকিস’। শৈশবে প্রেম আমার মনে যে ইমেজ তৈরি করত তা অবশ্য সিনেমায় দেখা কলেজ ক্যাম্পাসের। সেখানে ইন্টারমিডিয়েট

ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র জসিম বুকের বোতাম খুলে দিয়ে একটা পাঠ্যবই হাতে সিরিয়াস ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেন। ওই একই সময়ে কলেজগার্ল শাবানা সিঁড়ি বেয়ে নামতেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় তাঁদের সংঘর্ষ হতো। দুজনের হাত থেকে বই পড়ে যেত। বই তুলতে তুলতে চোখে চোখ পড়ত। তারপর নায়িকার সিরিয়াস ধমক, ‘দেখে চলতে পারেন না? হাঁটার সময় চোখ কোথায় থাকে?’ চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই নায়কের অ্যাপলজি, ‘দেখেই তো চলছিলাম!’ এই দৃশ্যের দু দৃশ্য পরেই মাকে কদমবুসি করতে করতে ‘মা, আমি ফাস্টক্লাস ফাস্ট হয়েছি’, ‘আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত’, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং একটুও সময় নষ্ট না করে একই সঙ্গে এফডিসির বাগান ও কক্সবাজারের সৈকতে নায়ক-নায়িকার যুগল নৃত্য (যার ক্যাপশন হতে পারত ‘সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড’)। এই নৃত্যটাকেই ভাবতাম প্রেম। ‘লাইন’।

আর প্রেমের মাধ্যম ছিল চিঠি। প্রেমে চিকিচক্ক করতে থাকা একটা চিঠি আমিও পেয়েছিলাম। সারা জীবনে ওই একটাই। ক্লাস টেনে পড়ি তখন। স্কুলের কেরানি একদিন ডেকে পাঠালেন। ‘তোমার নামে চিঠি আছে।’ দেখি খামের ওপর গোটা গোটা করে আমার নাম, সেকশন আর রোল নম্বর লেখা। বাসায় ফেরার পথে সে চিঠি খুলে প্রথমবারের মতো বুঝলাম, প্রেমের কত গভীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব! নাইন-টেনের রসায়ন বইয়ে শেখা অসংখ্য রাসায়নিক মৌল ও তাদের নানা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানব-মানবীর হৃদয়বৃত্তিক অভিব্যক্তির অভাবনীয় সব প্রতীকায়ন। ‘তুমি যদি সোডিয়াম আয়ন হও, আমি ক্লোরাইড আয়ন। আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে আমরা কবে সোডিয়াম ক্লোরাইড হব, তানিম?’

চিঠি এখন আর কেউ লেখে না। মোবাইল ফোন চিঠির শিল্পকলাকে খুন করেছে অনেক দিন হলো। তার পরও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আমার এক বন্ধুকে তেঁতুলিয়া থেকে এক মেয়ের লেখা চিঠির কথা মনে পড়ছে। বন্ধুটির ‘সৌজন্যে’ সে চিঠিগুলো পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। মেয়ের বাক্যগঠনে একটু দুর্বলতা ছিল। মাঝে মাঝে বাক্যে নানা বিপর্যয় ঘটত। যেমন, একটা

চিঠিতে সেই মেয়ে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে নিচে লিখে দিয়েছিল, ‘এই নম্বরে যদি কল না করেন, তাহলে বুঝব আপনি আমাকে ভালোবাসেন’!

না, চিঠি এখন আর কেউ লেখে না। ‘+’ চিহ্নের ব্যবহারও মনে হয় আর নেই। তরুণ-তরুণীর ‘অ্যাফেয়ারে’ একটা বিপ্লবই ঘটিয়ে দিয়েছে প্রযুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন তৃতীয় বর্ষে পড়ি, তখন রাতভর বিনা পয়সায় কথা বলার নানা প্যাকেজ চালু হলো। প্রতিটি রাতেই এক হল থেকে আরেক হলে যাওয়ার সময় প্রেমের নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রবাহ আমি যেন অনুভব করতে পারতাম। হলের প্রতিটি কোণাকৃতি অঞ্চলে, লোকচলতি ভাষায় ‘চিপায়’, কেউ না কেউ মোবাইল কানে পায়চারি করছে। শীতে কথা বলাটা ঝামেলার। সারা রাত কানে ফোন ধরে থাকলে হাত ব্যথা হয়ে যায়, কানেও ঠান্ডা লাগে। তাই আমার এক রুমমেট দুর্দান্ত একটা স্ট্র্যাটেজি বের করেছিলেন। তিনি কানে মোবাইল রেখে তার ওপর দিয়ে মাফলার পেঁচিয়ে দিতেন! (মোবাইলের সঙ্গে হেডফোন লাগিয়ে কথা বলার ফ্যাশন তখনও শুরু হয়নি) আমার আরেক বন্ধু প্রেমের এমন সুলভ বাজারেও প্রেমে পড়তে ব্যর্থ হয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল। বন্ধুদের আড্ডায় নিজের দুঃখের গল্প বলতে বলতে একদিন সে হঠাত্ ফেপে উঠল। ‘দাঁড়া, এখনি প্রেম করে দেখাচ্ছি!’ মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু নম্বর টিপে সে ডায়াল করল। ও প্রান্তে কল রিসিভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, ‘আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনাকে আমি ভালোবাসি!’ ও প্রান্ত থেকে একটা বিশুদ্ধ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, ‘ভাই, আপনে কেঠা? এইটা কোন্ জায়গার নাম্বার, ভাই? এইটা কি ঢাকা?’

আমার আরেক বন্ধুর এক দুর্লভ গুণ ছিল। সে মেয়েদের গলা ছবছ নকল করতে পারত। মেয়েদের গলায় সে তার পাশের রুমে থাকা এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে সুদীর্ঘ তিন মাস প্রেম চালিয়ে গেছে। প্রতি রাতেই ১০টা-১১টার দিকে এক মনোহর দৃশ্যের অবতারণা হতো। আমার বন্ধুটি তার রুমে শুয়ে শুয়ে কথা বলত, আর বড় ভাইটি পাশের বারান্দায় অস্থির হয়ে

পায়চারি করতে করতে কথা বলতেন।

মোবাইলের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে গিয়ে হলের গার্ডদের কাছ থেকে কার্ড কিনতেন। বড় ভাইয়ের সে দৌড় দেখার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম! আর বন্ধুটির কার্ডের খরচ জোগাতাম আমরাই, যাদের জন্য তামাশা দেখাটা খুব প্রয়োজনীয় একটা বিষয় ছিল।

মোবাইল প্রযুক্তি বোধ হয় এভাবেই মধ্যবিত্তের প্রেমকে একই সঙ্গে সুলভ এবং দুর্লভ করে তুলেছে। ধূর্তও কি করে তোলেনি? বাঘের খাঁচার রেলিংয়ে কিংবা নাগরদোলার চূড়ান্ত উচ্চতায় প্রেমের স্মারক রেখে আসার মধ্যেই বরং এক ধরনের সরল সৌন্দর্য আর সাহস দেখি আমি। ওই আবেগের মধ্যে কপটতা ব্যাপারটি নেই। এই আবেগগুলো মনে হয় দিন ঠিক করে উদ্যাপনও করতে হয় না।

আবেগগুলো প্রতিদিনের, কিংবা বাংলা ছবির ভাষায়—চিরদিনের।

ও, আরেকটা কথা। আর্বিট্রারি নম্বরে ডায়াল করে প্রেম নিবেদন করা আমার বন্ধুটিকে এখনো কিন্তু সেই লোক মাঝে মধ্যেই কল করে জিজ্ঞেস করে, ‘ভাই, এইটা কোথাকার নাম্বার ভাই!’
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

325) ভালোবাসার রকমফের - শওকত হোসেন

সামনে ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা। তখন এ জন্য চোখ-কান বুজে কোচিং করতে হতো না। হাতে অফুরন্ত অবসর। দুম করে একদিন ভর্তি হয়ে গেলাম ড্রাইভিং স্কুলে। সম্পর্কে তিনি পাড়াতো চাচা। নিজের একটা ভক্সওয়াগন গাড়ি দিয়ে নিজেই ড্রাইভিং শেখাতেন।

কিছুদিনের মধ্যে আমার ওপর প্রেম পড়া শুরু হলো। আর সেই প্রেম উদয় হয় জানালায়। আমি সাড়ে ছয়টায় হাজির হই। একটু পরেই বাড়ির একটা জানালা খুলে যায়। একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখি, যতক্ষণ গাড়ি নিয়ে বের না হই, ততক্ষণ বালিকাটি জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের ঘুম বাদ দিয়ে ড্রাইভিং শেখা অতিক্রান্ত আমার কাছে ব্যাপক প্রিয় হওয়া শুরু করল।

দিন যায়, আমি বালিকাকে দেখি, বালিকা

আমাকে দেখে। তার পরই রচিত হলো আসল নাটক। একদিন বালিকার বাবা আমাকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসালেন। চা খেতে খেতে যখন খাবি খেলাম, তখন দেখি সেই বালিকাও হাজির। আমার পাড়াতো চাচা আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সঙ্গে তাঁর মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, উনি তোমার আঙ্কেল হন, সালাম দাও। সেই বয়সে আঙ্কেল হয়ে আমার ভালোবাসাবাসি সেখানেই ইতি ঘটেছিল। কে যেন বলছিল, ভালোবাসা একটা বাজারের মতো। এখানে যেতে কোনো প্রবেশমূল্য লাগে না, কিন্তু বের হতে গেলে কিছু না কিছু মূল্য দিতেই হয়। আমি সেই বয়সে আঙ্কেল হয়ে এর মূল্য দিয়েছিলাম।

আমার মতো এত সহজে সবার নিষ্কৃতি কিন্তু হয় না। শেফালী রানির কথাই বলি। প্রেমকুমারের সঙ্গে দেড় বছরের সম্পর্ক তার ভেঙে গেল। সম্পর্ক ভাঙার পর প্রেমকুমার শেফালী রানিকে একটি চিঠি লিখল। জ্ঞানপিপাসু পাঠক-পাঠিকার জন্য সেই চিঠিটাই বরং এখানে তুলে দিই। এক সময়ের প্রিয় শেফালী রানি, আমার সঙ্গে দেড় বছরের সম্পর্কের জন্য ধন্যবাদ। যখন তুমি এই চিঠি পাবে, তখন তুমিও নিশ্চয়ই আরেকজনকে খুঁজে নিয়েছ। শেফালী, তোমার অভাব পূরণ করতে আমি আরেকটি মেয়েকে খুঁজে নিয়েছি। ফেসবুকে ফ্রেন্ডলিস্টে তোমার পরেই ছিল তার নাম। আমি তোমাকে একসময় প্রচুর ভালোবাসার চিঠি লিখেছিলাম। এ রকম আবেগঘন চিঠি লেখা যে সহজ নয় তা তুমি নিশ্চয়ই মানবে। আর আগের মতো এখন এত সময় কই। চিঠি লেখার সময় বাঁচাতে তোমাকে লেখা আমার সব চিঠি আমি ফেরত চাই। সেসব চিঠিতে হোয়াইটেনার ব্যবহার করে তোমার নামটা মুছে দিয়ে তার নাম লিখে দেব। আগে বুঝতে পারলে সবগুলো চিঠির ফটোকপি করে রাখতাম।

শেফালী, আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে সুন্দর ছবিটা দিয়েছিলাম। সেটাও কি ফেরত দিতে পারবে? তুমি জান যে এটাই একমাত্র ছবি, যেখানে আমাকে যথেষ্ট হ্যান্ডসাম লাগে। তোমার নিশ্চই মনে আছে, ফেসবুকে এ ছবি দেখেই তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে। এই ছবিটা

ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলেই ফেরত চাইছি।
শেফালী, আমরা একসঙ্গে অনেকটা সময়
কাটিয়েছিলাম। কফিশপে গেছি, সাইবার ক্যাফে
যেতে হয়েছে, অনেক উপহারও দিয়েছিলাম।
কেবল তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া আর কি।
আমি তোমার পেছনে যত খরচ করেছি তার
একটা তালিকা করেছি। দুপুর ও রাতের খাওয়া
ও স্ন্যাকস—আট হাজার ৪৫০ টাকা, সিনেপ্লেক্সে
সিনেমা দেখা—৯০০ টাকা, মোবাইল ফোনের
বিল—সাত হাজার ৫০০ টাকা, গাড়ির তেল—
তিন হাজার টাকা, অন্যান্য গিফট—এক হাজার
৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে ২১ হাজার ৩৫০
টাকা। দয়া করে দ্রুত বিলটা মিটিয়ে দিলে
আমি আমার নতুন প্রেমিকার পেছনে খরচ
করতে পারি। তোমার কাছে আমার দেওয়া
কোনো উপহার থাকলে তাও ফেরত দিতে পার।
সে ক্ষেত্রে বিল কিছুটা সমন্বয় করা যেতে
পারে। তোমারও কিছু পাওনা থাকলে আমাকে
বিল পাঠাতে পার। যদিও যত দূর মনে পড়ে,
ডেটিংয়ের সময় তুমি সর্বদাই পার্স আনতে ভুলে
যেতে। তোমার নতুন জীবনের শুভ কামনায়—
তোমার সাবেক প্রেমিক।
পাঠক, ভালোবাসা দিবসের লেখায় প্রথমে ব্যর্থ
ও পরে হিসাবি প্রেমিকের কাহিনির পর এবার
ভালোবাসা সফল করার মূল সূত্রটা বলি—তাতে
যদি আপনারা খুশি হন। যারা মনে করেন,
কাজ্জিকত ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়াই সফল
ভালোবাসার উদাহরণ, তাঁরা ভুল জানেন। বরং
আপনাদের শিখতে হবে কীভাবে বিবাহিত
জীবনটা সফল করা যায়।

আমার জীবন থেকেই উদাহরণটা দিই। আমি
আমার বউয়ের সঙ্গে কখনো ঝগড়া করি না।
আমরা বিয়ের প্রথম দিনই দ্বিপক্ষীয় সংলাপের
মাধ্যমে সংসারজীবনের সনদ বা সমঝোতা
তৈরি করে নিয়েছি। যেমন, আমরা ঠিক করে
নিয়েছিলাম, আমি বড়, তাই বড় বিষয়গুলো
নিয়ে আমিই মাথা ঘামাব। সেই হিসাবে ওবামা
নির্বাচিত হতে পারবে কি না, প্যালেস্টাইনে
শান্তি ফিরে আসবে কি না, মার্কিন অর্থনীতির
মন্দা কত দিন থাকবে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে
হিলারি কতটা ভালো করবেন, আইএমএফের
ঋণ নেওয়া ঠিক হবে কি না—এসব বড় বড়
বিষয়ে আমিই সিদ্ধান্ত নেব। এসব ব্যাপারে

আমার স্ত্রী নাক গলাবে না। আর রান্না কী হবে, শ্যালিকার ছেলের জন্মদিনে কী উপহার কেনা হবে, মেয়ে কোন স্কুলে যাবে, ডিপ ফ্রিজ না ওয়াশিং মেশিন কেনা হবে, শ্যালকের বিয়েতে কত টাকা দামের গয়না কিনব—এসব ছোটখাটো বিষয়ে আমার বউই সিদ্ধান্ত নেবে। আমি টাকা দেওয়া ছাড়া একেবারেই নাক গলাব না।

ভালোবাসা দিবসের আগে আগে এর চেয়ে ভালো ও কার্যকর উপদেশ আর কেউ দেবে না। তাও আবার মুফতে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

326) বুদ্ধি - আদনান মুকিত

আগে মানুষ পড়ালেখার পাশাপাশি প্রেম করত, এখন প্রেম করার পাশাপাশি পড়ালেখা করে। অনেকে আবার প্রেমের ব্যস্ততার কারণে পড়ালেখাই ছেড়ে দিয়েছে। ‘তুমি কিসে পড়?’ জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘আমি প্রেমে পড়ি।’ আমার অনেক বন্ধুর আবার বাসার সদস্যসংখ্যার চেয়ে প্রেমিকার সংখ্যা বেশি। এত প্রেমিকের মধ্যে প্রেম না করে নিশ্চিন্তে যে বসে থাকব, তারও উপায় নেই। সবাই আমার কাছে বুদ্ধি চায়, ‘একই দিনে দুজনের জন্মদিন, দুজনই বলেছে, আজকে দেখা না করলে ডিলিট! কী করব?’ যেন আমার কাজই বুদ্ধি দেওয়া। আজও রিয়াদের ডাকে সাড়া দিয়ে ওর সঙ্গে যেতে হচ্ছে। প্রকৃতির ডাক চেপে রাখা যায়, কিন্তু রিয়াদের ডাকে সাড়া না দিলে ২০ কেজি ওজনের ঘুষি খেতে হবে। রিকশায় উঠেই রিয়াদ এমনভাবে ওর প্রেমিকাকে ফোন দিল, যেন রিকশায় উঠলেই প্রেমিকাকে ফোন দিতে হবে। আর কথা বলার সে কী কায়দা! ‘হ্যালো জানু, কী কর? ভাত খাও? কী দিয়ে খাও? আরে গরুর মাংস তো আমারও খুব প্রিয়, কী রঙের গরু? সেকি! রং তো জানতেই হবে। আমি আবার লাল গরুর মাংস খাই না, আমাকে লাল গরু গুঁতো দিয়েছিল তো, কোথায় গুঁতো দিয়েছিল? ইয়ে... জানু, আমি রাস্তায় আছি তো, অনেক শব্দ, কথা শুনতে পাচ্ছি না।’ আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘জানু জানু করছিস কেন? জানুয়ারি মাস তো চলে গেছে, তুই ফেব্রু ফেব্রু বলে ডাক।’

ফেব্রুয়ারি মাসে জানু ডাকলে তোর কোনো অসুবিধা আছে?

আমাদের বুয়ার নাম জানুর মা। জানু শুনলেই বুয়ার কথা মনে হয় আর বলতে ইচ্ছা করে, জানুর মা, এক কাপ চা...

মুখ সামলে কথা বল! আর পারলে আমাকে বুদ্ধি দে। ও জানতে চেয়েছে, গরু কোথায় গুঁতো দিয়েছিল। এখন ওকে কী করে বলি? তোরই তো গার্লফ্রেন্ড। সাহস করে সত্য কথাটা বলে দে। পুলিশ, ডাক্তার আর প্রেমিকা, এদের কাছে মিথ্যা বললে ধরা খাবি।

আমার জায়গায় তুই থাকলে কি গার্লফ্রেন্ডকে এই কথা বলতে পারতি?

তোর জায়গায় থাকলে আমি গরুর গুঁতোই খেতাম না।

প্লিজ দোস্ত, আমাকে বাঁচা।

ফোনটা দে, আমি বলে দিচ্ছি কোথায় গুঁতো দিয়েছিল।

আরে পাগল নাকি! ওটা তো আমিই বলতে পারি। কীভাবে ঘটনাটা এড়ানো যায় সেটা বল, আমার মাথায় কোনো কিছু আসছে না।

আরে দূর, বাদ দে। এটার কথা ও ভুলেই যাবে।

তিথিকে আমি খুব ভালো করে চিনি। ওর স্মৃতিশক্তি মারাত্মক। স্কুল-কলেজে স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার খেলায় ও সব সময় ফাস্ট প্রাইজ হিসেবে ডিকশনারি পেয়েছে। ওর বাসা ভর্তি ডিকশনারি।

এত কথা বলছিস কেন? চান্স পেলেই প্রেমিকার প্রশংসা—এই কন্ডিশন তো ভালো না। চুপচাপ বসে থাক। তিথি আসুক, তারপর দেখা যাবে কত ভুটায় কত পপকর্ন। ওই যে, এসে গেছে। তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তুই বসে আছিস কেন? যা ভাগ!

আমি উঠে যাওয়ার আগেই তিথি এসে বলল, কেমন আছ? আজকের ওয়েদারটা সুইট না? কোথায় যাচ্ছেন?

আমার একটু কাজ আছে।

একদিন কাজ না করলে কী হয়, ভাইয়া?

আপনি বসেন তো। বসে একটা বুদ্ধি দেন।

সামনে ভ্যালেন্টাইনস ডে, এই দিনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। দিনটাকে কীভাবে পালন করা যায়? আপনার বন্ধুর মাথা তো বুদ্ধিশূন্য।

ফকিরকে খিচুড়ি খাওয়াতে পারেন। তারা খাস দিলে দোয়া করবে!

রিয়াদ গর্জে উঠল, তোর কি মাথা খারাপ, না কি তুই মাথা খারাপের ভান করছিস? ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে ফকির খাওয়াব কেন? তুই খাওয়া! আমি নিজে ফকির জোগাড় করে দেব। দেখি কত খাওয়াতে পারিস।

তিথি অবাক হয়ে বলল, আশ্চর্য! তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আমার কাছে তো ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। লাইন দিয়ে ফকিররা বসে আছে। তুমি পাতিল নিয়ে আসছ আর আমি সবার প্লেটে খিচুড়ি বেড়ে দিচ্ছি। সবাই তৃপ্তি করে খেয়ে আমাদের জন্য দোয়া করছে। সুইট একটা ব্যাপার। কি, সুইট না?

অবশ্যই সুইট! একেবারে বিক্রমপুরের খাঁটি সুইট। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ফকির খাওয়ানো, পত্রিকার হেডিংয়ে চলে আসার মতো ঘটনা!

রিয়াদ ওর মোটা কনুই দিয়ে আমাকে গুঁতো মেরে কানে কানে বলল, ফকির খাওয়ানোর বুদ্ধি দাও! তোর খবর আছে। আর যদি তিথির সামনে আসিস, একেবারে হাঁটু ভেঙে দেব!

তিথি আবার বলল, ওনার মাথায় কত বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধি নেই কেন? তুমি ওনার সঙ্গে বেশি করে মিশবে।

রিয়াদ হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই মিশব।

কিন্তু আমাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, বুদ্ধি দাও, না! বুদ্ধিজীবী হয়েছ? চাইলেই বুদ্ধি দিতে হবে? খবরদার, আর কোনো বুদ্ধি দিবি না। একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলব। বলেই

আবার তিথির দিকে তাকিয়ে মধুস্বরে বলল, তিথি, তোমাকে আজ খুব সুইট লাগছে।

এই, তুমি বারবার কনুই দিয়ে ওনাকে গুঁতো মারছ কেন? কী হয়েছে?

আরে ও ভালো বুদ্ধি দিয়েছে তো, তাই গুঁতো মেরে ওকে বাহবা দিচ্ছি।

ও, তাই বলো। আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি না বলেছিলে তোমাকে গরু গুঁতো দিয়েছিল?

ঘটনাটা বলো তো, কোথায় গুঁতো দিয়েছিল?... কী হলো, বলছ না কেন?

রিয়াদ করুণ চোখে তিথির দিকে তাকিয়ে কনুই দিয়ে বারবার আমাকে গুঁতো দিতে লাগল। ইস, বেচারি রিয়াদ! রানওয়েতে এসে প্লেন ক্র্যাশ।

এখন আমার কাছে বুদ্ধি চেয়ে কী লাভ? তুই তো বুদ্ধি দিতে মানা করেছিস। বন্ধুর কথা মেনে না চললে খারাপ দেখায়। তাই আমি মুখ বন্ধ রেখে কনুইয়ের গুঁতো খাচ্ছি, ভালোই লাগছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১০

327) বইয়ের ফ্ল্যাপ

বইয়ের ফ্ল্যাপগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কথা লেখা থাকে। সেগুলো এরকম হলে কেমন হয়? বই না লিখেও বইয়ের ফ্ল্যাপগুলো লিখেছেন আদনান মুকিতলেখক বোতল চৌধুরীর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীতে বৈশাখ মাসে হাঁটুজলও থাকে না। তবে বর্ষাকালে এ নদীর মাছ ধরেই জেলেদের জীবন কাটে। এ নদীতে রুই, কাতল, বোয়াল, পুঁটি, টাটকিনি, টাকিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাছ পাওয়া যায়। তিনি মাছ খেতে ভালোবাসেন। আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল তাঁর সবচেয়ে পছন্দের। তবে এর সঙ্গে পুঁটি মাছ ভাজা থাকলে তাঁর আর কিছুই লাগে না। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর তিনি নির্মল সুখ ও আনন্দে উত্তরার একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। জসিম মজুমদার দুই হাতে লিখে চলেছেন। দেশের সব টিভি চ্যানেলেই তাঁর লেখা নাটক প্রচারিত হচ্ছে। তবে নাটকের মধ্যে অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করায় দর্শক তা উপভোগ করতে পারছে না। আসলে আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের কোনো মা-বাপ নেই। যে যার ইচ্ছেমতো বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। বিজ্ঞাপনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে অথচ সাহিত্যের মান বজায় থাকছে কি না, তা নিয়ে কেউই ভাবছে না। এ বিষয়গুলো জসিম মজুমদারকে খুবই নাড়া দেয়। আর এগুলোই তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে। বর্তমানে তিনি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কর্মরত। খুব অস্থির সময়ে বাস করছি আমরা। আবুল মোখলেসকে এই সময় আমাদের চেয়েও বেশি অস্থির করে তোলে। তাই সে হাতে তুলে নেয় কলম। আমাদের ভাবনাগুলো কীভাবে যেন ওর লেখায় পরিণত হয়। আবুল আমাদের হতবাক করে। ওর লেখা দেখে আমরা চমকে উঠি। বুকের ভেতর একটা চিনচিনে ব্যথা হয়। মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিয়ে ওঠে। বলি, আরে,

এটা তো আমার আইডিয়া ছিল! আবুল মুচকি হাসে। ও এ রকমই। বিভিন্ন মানুষের আইডিয়া নিয়ে লেখাই ওর কাজ। আবুলের লেখা পড়লেই আপনার মনে হবে, ‘লেখাটা আগেও কোথায় যেন পড়েছি।’ কিন্তু কোথায় পড়েছেন তা মনে করতে পারবেন না। এখানেই আবুলের সার্থকতা। এভাবেই চলছে ওর এগিয়ে চলা। আবুলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

—কাছের বন্ধুরা। মোতালেব শিকদার একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে এ দেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা। লেখালেখির দীর্ঘ জীবনে তিনি শ্রমজীবী মানুষকে একেবারে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বনানীর একটি নিরিবিলি ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন।

ফ্ল্যাটের বারান্দা দক্ষিণমুখী। মোতালেব শিকদার এসি ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারেন না। তাঁর বাসায় এসির তাপমাত্রা সব সময় ২৬-২৭ ডিগ্রিতে ওঠানামা করে। তবে তিনি প্রায়ই তাঁর এসির রিমোট কন্ট্রোলটি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর গাড়িতেও এসি রয়েছে। তবে গাড়ি তিনি নিজে ড্রাইভ করেন না। চিকন চালের ভাত আর মুরগির মাংস ছাড়া তাঁর খাওয়া হয় না। মুরগির মধ্যে দেশি মুরগিই তাঁর বেশি প্রিয়। তাঁর লেখাতেও সে প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক মোক্তার আলী উত্তরার একটি অভিজাত বাড়িতে বসবাসরত। বাড়িওয়ালা মাইডিয়ার টাইপের লোক। ভাড়া নিয়ে কোনো ক্যাচাল করেন না। ভাড়া বাকি পড়লেও খাটের নিচে লুকিয়ে বলতে হয় না, কুমিল্লায় আছি। মোক্তারের কাজে সাহায্য করার জন্য কাসেম নামের একজন কাজের লোক রয়েছে। সে সব সময় চায়ে চিনি কম দেয়। তবে তার গানের গলা ভালো।

প্রতিভা অশ্বেষণে গাইলে নিশ্চিত সেরা গায়ক হবে। সব ধরনের গানই ও গাইতে পারে, তবে কিশোর কুমারের চিরসবুজ গানগুলো ওর গলায় বেশি মানায়। বড় আবেগ দিয়ে গান গায় ছেলেটা। আমরা কাসেমের দীর্ঘায়ু কামনা করি। বেলাল বখতিয়ার একজন সাহসী লেখক। রবীন্দ্রনাথের লেখাও নিজের নামে চালিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা করেন না। দুঃসাহসী এই লেখক শৈশবে খুবই ডানপিটে ছিলেন। অন্যের গাছের আম-কাঁঠাল, বন্ধুদের খাতা-পেনসিল নিজের

বলে দাবি করতেন। এভাবেই একদিন চেয়ারম্যানের মেয়ের মনটাকেও দখল করে নিলেন। এর পর থেকেই লেখালেখির জগতে পদার্পণ করে একেবারে হইচই ফেলে দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর একমাত্র সন্তান ঢাকার একটি নামকরা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে। ছাত্র হিসেবে সে খুবই ভালো। সব সময় বেশি বেশি নম্বর পায়। স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই প্রাইভেট পড়ে। তাই শিক্ষকেরা তাকে খুব পছন্দ করে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১০

328) বই ম্যালা

বইমেলায় ঢুকতেই কিছু দিশেহারা মানুষ দেখা যায়। কেউ সঙ্গে আসা প্রিয়জনকে খুঁজে পান না, কেউ মোবাইলের নেটওয়ার্ক পান না। কেউ পান না কাক্ষিত কোনো স্টল। এক ভদ্রলোক হস্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
—আচ্ছা ভাই, ৪১৩ নম্বর স্টলটা কোথায় বলতে পারেন? পুরো মেলা চারবার চক্কর দিয়েছি। কোথাও নেই।
—তথ্যকেন্দ্রে খোঁজ করুন।
—ভালো বলেছেন তো; আচ্ছা, তথ্যকেন্দ্রটা কোথায়?
পুরো মেলা চারবার চক্কর দিয়েও তথ্যকেন্দ্র দেখেননি, আর ৪১৩ নম্বর স্টল দেখে ফেলবেন, তা কীভাবে হয়? তবে এমন নিবেদিতপ্রাণ পাঠকের সংখ্যা খুব কম নয়। বইমেলায় এসেছি, শুধু বই-ই দেখব—তাঁরা এ নীতিতে বিশ্বাসী। অন্য কোনো কিছুর দিকে তাঁদের খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। তবে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বই কেনার চেয়ে ঘোরাঘুরি, ছবি তোলা আর ভুটা-বাদাম চিবানোতেই বেশি সময় ব্যয় করেন। মেলার ক্যান্টিনে খাবারের দাম বেশি—তাতেই যে ভিড় থাকে, অনেক স্টলে তার অর্ধেক ভিড়ও থাকে না। এতেই প্রমাণ হয়, সবার ওপরে খাওয়া সত্য! আর ছবি তোলা নিয়ে তো রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। মেলায় এসে অমর একুশে ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ভাব নিয়ে কয়েকটা ছবি না তুললে মেলায় আসাটাই বৃথা। আর কোনো লেখক দেখলে তো কথাই নেই। ভক্তরা দৌড়ে গিয়ে ছবি তুলতে চান। লেখকও ভক্তের পাশে দাঁড়িয়ে মুখে একটা রেডিমেড হাসি এনে ছবি

তোলেন। প্রিয় লেখকের ছবি তোলার উত্তেজনায় অনেকে ক্যামেরা অন না করেই গোটা পাঁচেক ছবি তুলে হাসিমুখে ধন্যবাদ দেন লেখককে। তবে ঘটনা টের পাওয়ার পর সেই হাসি কান্নায় পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগে না। মেলার নজরুল মঞ্চে কবি নজরুলের একটা মূর্তি রয়েছে। লোকজন মূর্তিটার পাশে দাঁড়িয়ে, কাঁধে হাত রেখে, জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ছবি তোলেন, দেখে মনে হয় কবি নজরুল তাঁদের ইয়ার-দোস্ত, ছোটবেলায় তাঁরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতেন, অনেক দিন পর দেখা হয়েছে! এই নজরুল মঞ্চেই মেলায় আসা নতুন বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এমনিতে মোড়ক উন্মোচনের ব্যাপারে সাধারণ দর্শকদের তেমন আগ্রহ না থাকলেও, আশপাশে মিষ্টির প্যাকেট থাকলে তাঁদের আগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। তখন তাঁদের আগ্রহ দেখলে যে কারও মনে হবে—বই নয়, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন দেখতেই তাঁরা মেলায় এসেছেন। মোড়ক উন্মোচনের পর মিষ্টির প্যাকেট উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। যাঁদের জন্য মিষ্টি আনা হয়েছে, তাঁরা কেউই পাননি—এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তবে অনেকে প্রতিটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং লেখক বা মোড়ক উন্মোচনকারীর পাশে বেশ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতেও অনেক সুবিধা। টিভিতে নিজের চেহারাটা দেখানো যায়, আর মোড়ক উন্মোচনের পর একটা বইও পাওয়া যেতে পারে। তবে এ জন্য দীর্ঘদিনের সাধনা প্রয়োজন।

বইমেলায় সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি অনেকেই আছেন, যাঁরা মার্ক টোয়েনের অনুসারী। মার্ক টোয়েন নাকি বই নিয়ে আর ফেরত দিতেন না। মেলায়ও তাঁর শিষ্যরা ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা বিভিন্ন স্টলে গিয়ে পছন্দের বইটি নিয়ে সুযোগ বুঝে নিশ্চিন্তে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান। স্টলের বিক্রেতারা হঠাত্ টের পান,

— আরে! এখানে গাধা বইটা ছিল, গেল কই?

— হায় হায়! বল কী? গাধা নাই? ভালোমতো খুঁজে দেখ।

— নাহ্, গাধাটা নিয়ে গেছে।

— মিয়া, স্টলে বইসা কি মুড়ি খাও নাকি?
চোখের সামনে থেকে বই লইয়া যায় কেমনে?
তোমার চোখ কোন দিকে থাকে তা কি বুঝি না
ভাবছো?

— আমি কি সিসি ক্যামেরা নাকি? আপনি
খেয়াল করলেন না কেন? আপনি তো বামপন্থী,
বাঁ দিকটা তো আপনার খেয়াল করার কথা
ছিল।

— কী কইলা? সব যদি আমি খেয়াল করি,
তাইলে তোমারে রাখছি ক্যান? তুমি কি নবাব
আলীবর্দি খাঁর নাতি নাকি? কাজে ফাঁকি দাও!...
এভাবে ঝগড়া চলতেই থাকে। আর ওদিকে
বইচোর চুরি করা বইটা নিয়ে লেখকের কাছে
গিয়ে বলেন,

—স্যার, আমি আপনার বিশাল ভক্ত। আপনার
সব বই আমি সংগ্রহ করি। প্লিজ, একটা
অটোগ্রাফ দিন।

লেখক বইটা হাতে নিয়ে বড় হও, মানুষ হও—
এই টাইপের কথা লিখে খুশিমনে অটোগ্রাফ
দেন। বইটা কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে তা
জানলে হয়তো কলম দিয়ে অটোগ্রাফ দিতেন
না। তখন ওই ব্যক্তির শরীরে কিল-ঘুষির
মাধ্যমে অটোগ্রাফ দেওয়ার আশঙ্কাই বেশি
থাকত।

আড্ডার মাধ্যমে নাকি ফ্রান্সের স্বাধীনতা
এসেছিল। আর তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই হয়তো
মেলায়ও লেখক-শিল্পীদের আড্ডা দেওয়ার জন্য
আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছে। তবে লেখকেরা
বিভিন্ন স্টলে অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত থাকায়
এখানে তাঁদের খুব কমই দেখা যায়। মাঝেমধ্যে
কিছু উঠতি লেখক এখানে বসেন এবং বইমেলা
বাংলা একাডেমী থেকে সরানো উচিত কি না,
কিংবা মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে বইয়ের
বিজ্ঞাপন দেওয়া সাহিত্যের বাণিজ্যিকীকরণের
শামিল কি না, তা নিয়ে তুমুল বিতর্কে
অংশগ্রহণ করেন। মনোযোগ দিয়ে টক-শোর
মতো এই বিতর্ক উপভোগও করেন অনেকে।
এই বিতর্ক দেখারও একটা আলাদা মজা।

পুরো মেলাতেই এমন অনেক মজা আছে। তার
মধ্যে সবচেয়ে নতুন হলো, ‘বই কিনলে জুস
ফ্রি’ অফার! নির্দিষ্ট ওই বইটা কিনে পড়ার পর
লেখকের প্রতি রাগে-ক্ষোভে যদি আপনার মাথা
গরম হয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, তখন ওই ফ্রি

পাওয়া জুস আপনাকে কিছুটা শান্তি দেবে—এই আশাতেই হয়তো ‘বই কিনলে জুস ফ্রি’ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। আহা! বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রকাশনী শিল্প কতটা এগিয়ে যাচ্ছে! ভাবতে ভালোই লাগে। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১০

329) বই কেনা

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমনকি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, ‘বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেল্ফ যোগাড় করছ না কেন?’

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, ‘ভাই, বলেছি ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্ফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারি নে। শেল্ফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।’ শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরত না দিয়ে। যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলায় সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি? এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, ‘ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষু-গোচর করতে চাই। ধনীর মেহনতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদেব চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে।

পক্ষান্তরে, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে
পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদেব হাতে গায়ে
পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে
জানে না।—বই পড়তে পারে না।’

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ,
ই, ডি দিয়ে, ‘অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন
ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।’

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড়
করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র
বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে আমার
জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-
বিহারীণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের
জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়,
সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু
গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত
হয় না। সবকিছুই তার স্বামীর ভাগুরে রয়েছে।
শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, ‘তবে
একখানা ভাল বই দিলে হয় না?’

গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, ‘সেও
তো ওঁর একখানা রয়েছে।’

যেমন স্ত্রী তেমন স্বামী। একখানা বই-ই তাদের
পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে
জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান
করতে হলেও তারা ওই জিনিস দিয়েই করে।

মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা
দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা
বেইজ্জত করতে চায়, তবে সে অপমান করবে
আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত
মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু
দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন
ধরে। আঁদ্রে জিদে’র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—

অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া
থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে
একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের
স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদে’র পেছনে—

গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদে’র প্রাণ অতিষ্ঠ
করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদে’র লেখক
বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সবকিছু শুনে
গেলেন, জিদে’র হয়ে লড়লেন না। জিদে’র
জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন,
এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর
লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির
করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্ছা
গেল, কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকণ্ঠ হয়ে
ছুটল নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।
যে-সব লেখক জিদে'র হয়ে লড়েন নি, তাঁদের
যে-সব বই তাঁরা জিদ'কে স্বাক্ষরসহ উপহার
দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে
চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জাল বেচে ফেলছেন।
প্যারিসের লোক তখন যে অউহাস্য ছেড়েছিল,
সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যখানে জাহাজে
বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব
বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে
ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা এক শ
লাইন দৈনিক কাগজে সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ
করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে
আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি
কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে
কেনাকাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল।
(বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি
হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা
করেন নি।

* * *

আর কত বলব? বাঙালীর কি চেতনা হবে?
তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না
থাকত। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি
হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম
অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখি
নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার
বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম
বলে, ‘বাঙালীর পয়সার অভাব।’ বটে? কোথায়
দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের
সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার
‘কিউ’ থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির
দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম।
তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই
জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে
পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই

কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে। রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সৈয়দ মুজতবা আলী: প্রখ্যাত লেখক। জন্ম: ১৯০৪, মৃত্যু: ১৯৭৪।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১০

330) যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই

পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। নানা ভাষায় রয়েছে কিছু বাংলা ভাষার শব্দ। একটু উড়াইয়া তাই দেখিতে পাইলেন মহিউদ্দিন কাউসারজাপানে ‘কাকু’ বলে ডাক দিলে আপনার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, বরং লিখতে বসে যাবে। কারণ, ওদের ভাষায় ‘কাকু’ মানে হলো লেখা।

এই যে ‘শোনে’ বলে জাপানিজ কোনো বালিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে দুটো থাপ্পড়ও জুটতে পারে কপালে। জাপানিজ ‘শোনে’ মানে যে বালক।

আরও মজা হবে আপনার সঙ্গে থাকা বাঙালি মেয়ে ‘মিনা’ যদি একটু এগিয়ে যায়। ওকে ‘মিনা’ বলে ডাকা মাত্রই দেখবেন, সবাই আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। কারণ, জাপানি শব্দ ‘মিনা’ অর্থ সবাই।

সূর্যোদয়ের দেশটিতে কেউ খুবই জঘন্য ধরনের অপরাধ করছে দেখে আপনি হয়তো বলে উঠলেন ‘ছি ছি’। তার কিছুক্ষণ পরই নিজেকে আবিষ্কার করবেন জেলখানায়। জাপানে ছি ছি

শব্দের মানে যে সমর্থন করা।

‘মাছি’ উড়তে দেখলেই ‘মাছি উড়ছে’ বলবেন? জাপানিরা আপনাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতে পারে, কেননা মাছি মানে শহর। ‘শহর উড়ছে’ বলাটা তো পাগলামিই বটে।

প্রিয় বাঙুরাদেজিন (বাংলাদেশি), দয়া করে জাপানে কেউ প্রেমে ব্যর্থ হলেই ‘ছাঁক’ খেয়েছে বলবেন না। জাপানি ‘ছাঁক’ শব্দটির অর্থ হলো ‘চালের মদ’। প্রেমে ব্যর্থ হলে ওরা তো চালের মদ না খেয়ে রেড ওয়াইনও খেতে পারে। তাই না?

কখনো ‘ছেঁড়া’ বললে ইতালিয়ান দর্জির কর্মচারী কাপড় ছিঁড়েছে ভেবে একটুও দুঃখ পাবে না, সে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। কারণ, ওই ভাষায় ‘ছেঁড়া’ মানে যে সন্ধ্যা। তার তো এখনই ছুটি! বোঝেন অবস্থা, ইতালিয়ান ‘ওরা’ মানে নাকি ঘণ্টা (ছবির নাম—ঘণ্টা এগারোজন) আর মেঝে মানে নাকি মাস।

ইতালিতে অবশ্য ‘নান্নার বিরিয়ানি’ চেয়ে পার পেয়ে যেতে পারেন। যদিও ওখানে পুরান ঢাকার বিখ্যাত ‘নান্নার বিরিয়ানির’ শাখা নেই। তার পরও নান্না মানে যে দাদা। তারা অন্তত কারও দাদার কাছ থেকে বিরিয়ানি এনে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ওখানে ‘জিয়ার অনুসারী’ বললে মুজিবের অনুসারীরা মারতে যাবে না। ইতালিয়ান ‘জিয়া’ অর্থ—মামি বা চাচি। যে কেউ তার মামি-চাচির অনুসারী হতেই পারে, তাই না?

পানিতে নেমে কলাগাছের ‘ভেলা’ খুঁজলে ইতালিয়ানরা আপনার হাতে নৌকার বাদাম তুলে দেবে। ইতালিয়ান ‘ভেলা’র বাংলা যে বাদাম।

দয়া করে ইতালিতে গিয়ে কেউ মেলায় যাবেন না। কেননা, ওরা মেলায় যায় না, ওরা মেলা খায়। ওদের মেলার বাংলা অর্থ হলো আপেল। ইতালিয়ান কাউকে রেগেমেগে যদি ‘মরো’ বলেন। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর হয়ে যাবে। ইতালিয়ানদের চোখে তো আমরাই কুচকুচে মরো। বুঝতেই পারছেন, মরো মানে হলো কালো।

সবচেয়ে মজা হবে মুখে প্রচণ্ড ঝাল লাগায়, মিষ্টি কিছু খাওয়ার আশায় আপনি যদি কারও কাছে ‘পেঁপে’ চান তাহলে। সে তখন আপনাকে

একগাদা মরিচ ধরিয়ে দেবে। বোকা ইতালিয়ানরা (!) যে মরিচকেই ‘পেঁপে’ বলে ডাকে। সিঙ্গাপুরে বাজার করতে গিয়ে ‘কপি’ চাইলে ওরা কিন্তু ফুলকপি বা বাঁধাকপি দেবে না, ওরা আপনাকে এক কাপ কফি ধরিয়ে দেবে।

যে জাতি বাপকে বাবা বলেও ডাকে না, পাপা বলেও ডাকে না, বাপা ডাকে, সে জাতির পরিচিত কেউ আপনার বাড়িতে অনেক দিন আসে না বলে তাকে ‘আজকাল তো ছায়াও মাড়ান না’ বলতে যাবেন না। কারণ সে হয়তো ‘আজকাল তো আমাকেও মাড়ান না’ মনে করে আপনাকে মাড়াতে পা তুলবে। কারণ, ওদের ডিকশনারিতে ‘ছায়া’-এর মানে হলো আমাকে। আপনি কাউকে ‘অ... নে...ক লামু’ বললে ওরা ভাববে, বেশ খাটো। কারণ, সিঙ্গাপুরে এ শব্দটির মানে হলো ঠিক ‘অর্ধেক’।

পানিকে যারা অ্যায়ার (বানান হলো air) বলে এমন বোকা জাতিটির কাউকে এখনই কিছু করতে ‘ইচ্ছুক’ বললেও সে নড়বে-চড়বে না। কেননা, সিঙ্গাপুরিয়ান ‘ইচ্ছুক’-এর মানে যে আগামীকাল। সুতরাং আজই ব্যস্ত হওয়ার কী আছে!

‘তাকানো’ শব্দটির সিঙ্গাপুরিয়ান মানে হলো ‘মেলিহাত’। এরা চোখ মেলে দেখে না, দেখে হাত মেলে। হাস্যকর!

ওদের কাছে ‘জাম্বুরা’ চাইলে আপনি পাবেন ‘কাঁঠাল’। হ্যাঁ, খুবই সত্য কথা। কারণ, ‘কাঁঠালের’ সিঙ্গাপুরিয়ান নাম ‘জাম্বুরা’।

তীব্র জ্যামে আটকে আছেন সিঙ্গাপুরে। আপনি ট্যাক্সিড্রাইভারকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে গেলেন, ‘জ্যাম’! সে বলবে, নেই। আপনি অবাক হলেও সে ঠিকই বলেছে। কারণ, ওর ভাষায় জ্যাম শব্দের মানে হলো ‘ঘড়ি’। ওর কাছে ঘড়ি না থাকলে জ্যাম নেই বলবে না তো বলবেটা কী? কোরিয়ায় ‘ডেথ’ বলে চিৎকার করলেও কেউ দুঃখ পাবে না। কেননা, ডেথ মানে হলো ‘চার’। মনে রাখবেন, কোরিয়ায় বাদামিকে বাদামি বলবেন না। বলবেন, কালো। ভাবছেন মিথ্যা বলবেন কেন? মিথ্যে নয়, বাদামির কোরিয়ান অনুবাদ হলো কালো।

কোরিয়ায় বেগুনি মানে হলো বড়া। বুঝতেই পারছেন, আলুর বড়া খেতে গিয়ে ‘বড়া’ চাইলে

যা পাবেন, তা হলো ‘বেগুনি’।

‘সকাল’কে কোরিয়ানরা ‘ওজন’ আর ‘মাথা’কে বলে ‘মরি’। মাথার ওপর ওদের চুলগুলো খাড়া হয়ে থাকে বলেই কি না কে জানে—চুলকে বলে ‘মরি খাড়া’। ‘ই...মা...’ বলে আমাদের দেশের লোকেরা কপালে হাত দেয় বলেই হয়তো কোরিয়ান ‘ইমা’ মানে হলো ‘কপাল’।

কোনো কোরিয়ানের বাড়িতে দাওয়াত। বলে দিলেন, আপনার কচুর তরকারি খুবই পছন্দ। সেদিনের দাওয়াতটা কতখানি সুখপ্রদ হবে, বুঝতে পারবেন তখনই, যখন জানতে পারবেন, কোরিয়ায় কচু মানে হলো মরিচ।

সেই মরিচের তরকারি খেয়ে আপনি যদি বলেন, ঝাল। তাহলে ওরা আপনাকে সেটা আরও বেশি দেবে। কারণ, কোরিয়ান ভাষায় ‘ঝাল’-এর মানে হলো ভালো।

এদের বোকামির শেষ নেই। ‘সাবধান’কে এরা ‘জসিম’ বলে, ‘চাঁদ’কে বলে ‘তাল’ আর ‘একশ’কে বলে ‘ব্যাগ’। কোরিয়ানরা ‘গরু’কে বলে ‘সু’। ‘গরু মেরে জুতা দান’ প্রবাদটা তাহলে এরাও জানে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

331) বাঁচতে হলে ভাবতে হবে

লেখাটা কি অশিষ্টতা, অশ্লীলতার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করব? জানি, অনেকের লোভ হচ্ছে! তাঁদের জন্য পরামর্শ—সংসদ অধিবেশনে কান রাখুন। খিস্তিখেউডসহ পাবেন এক চ্যানেলে! আরেকটি সুখবর, শুধু সংসদ অধিবেশন প্রচার করতে বিটিভির শাখা চ্যানেল করার পরিকল্পনা আছে সরকারের। আশা করি, ভরপুর বিনোদন পাওয়া যাবে।

কিন্তু যাঁরা এসব দেখতে-শুনতে চান না, তাঁদের কী হবে? কান বন্ধ করে তো আর চলা যাবে না। চোখ বন্ধ করেও থাকা যাবে না। তাই ‘বাঁচতে হলে ভাবতে হবে’। অশ্লীলতার সংক্রমণ তো এইডসের চেয়ে কম হওয়ার কথা নয়। কী করা যায়! বাংলা ভাষায় সহজলভ্য সব অশ্রাব্য কথা তো আমরা ছোটবেলায়ই শিখে ফেলি। আর নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককেই তো আমরা সংসদে পাঠাই। ফলে সাংসদদের ওসব ভালোই জানা এবং প্রায়ই তাঁরা তার অনুশীলন করেন। নিজের ভাষায় বলেন বলে তাঁরা বকাবাদ্যে বাড়তি জোশও

পান। এ জোশটা কমাতে পারলেই রোষ কমতে শুরু করবে। কিন্তু ভাষার মাস বলে প্রস্তাবটা দিতে সংকোচ হচ্ছে। তবু সাহস করে বলি, সারা বছর তো আর ফেব্রুয়ারি মাস থাকবে না! আইডিয়াটা পরিকার করি। আচ্ছা!

রাজনীতিবিদদের কথা বলার ভাষাটা যদি বদলে দেওয়া যায়! তাহলে কি ফল লাভ হবে?

বক্তৃতার ভাষা হিন্দি হলে কেমন হয়? প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলে প্রথমে হিন্দির কথা বলা। পেটের ভেতর দলা পাকিয়ে থাকা ভারতীয় ডাল, চিনি, পেঁয়াজের কথা না হয় না তুললাম। তো, ভারতপ্রীতির অভিযোগ থাকলেও আওয়ামী লীগের সাংসদেরা এ ভাষায় এক খালেদা জিয়ার সঙ্গেই পারবেন না। কারণ, তাঁর প্রথম মাতৃভাষা তো হিন্দি। **সূত্রঃ** সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন, ‘ওনার (খালেদা জিয়া) জন্ম তো ভারতে।’ তার মানে, বক্তৃতার ভাষা হিন্দি হলে সরকারি দল আওয়ামী লীগের জন্য মঞ্চটা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ থাকবে না। অবশ্য আশার খবরও আছে। খালেদা জিয়া সংসদে প্রায় আসেনই না।

অবশ্য ভাষা হিন্দি হলে পুরো কর্তৃত্ব নারী সাংসদদের হাতে চলে যাওয়ার ভয় আছে। কারণ, বাংলার আকাশ ভরা হিন্দি সিরিয়াল। নারী দর্শকেরা হিন্দি সিরিয়ালের বেগুনার ভক্ত হওয়ায় হিন্দির প্রভাব তাঁদের জীবনে ব্যাপক। আর পুরুষেরা, নিশ্চয় এত দিনে তাঁরাও কিছুটা সংক্রমিত। তবে তা জানা-বোঝার পর্যায়ে হয়তো। এ দক্ষতা দিয়ে মন ভরে গালমন্দ করা যাবে বলে মনে হয় না।

বক্তৃতার ভাষাটা উর্দু হলে কেমন হয়? জামায়াতের পোয়াবারো। সুসংবাদ, তাঁরা সংখ্যায় কম। আবার বিএনপির দেখাদেখি সংসদেও কম আসে। তবে নিশ্চিত বলা যায়, একবার হয়ে গেলে ‘ভাষার টানে’ তাঁদের উপস্থিতি বাড়বে। বিএনপিকে ছেড়ে একা একাও চলে আসতে পারে। কিন্তু বাকিদের কী হবে?

সাত-পাঁচ না ভেবে ভাষাটা ইংরেজি করে ফেলাই ভালো। প্রভুদের ভাষা। কূটনৈতিক কারণে এখানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত—সব এক। এ প্রস্তাবটি নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মত এসেছে,

ভাষা ইংরেজি হলে সর্বোচ্চ গালি শুনতে হতে পারে ‘স্টুপিড’। বাংলায় যা ছিল ‘চুপ, বেয়াদব’! শুনতে বড্ড লাগত।

বক্তৃতার ভাষা ইংরেজি হলে কিছু নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগও আশা করা যাবে। রাজনীতিবিদদের ইংরেজি শেখানোর জন্য কোচিং সেন্টার, শুধু রাজনীতিকদের জন্য বিশেষ আইইএলটিএসের মতো ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে।

নিকট অতীতের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, এ ব্যবসায় সবচেয়ে ভালো করবেন আমাদের প্রিয় বাবর। একে তো তিনি রাজনীতিবিদ; দ্বিতীয়ত, দেশি ইংরেজি বলায় পারদর্শী। শুধু নিজের নামে প্রতিষ্ঠান করেই তিনি এই ব্যবসায় জমিয়ে দিতে পারেন। ধরুন, তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম হবে—বাবর একাডেমি। প্রতিষ্ঠানের স্লোগান হবে ‘লুকিং ফর ছাত্রজ’। বাবর একাডেমিতে ভর্তি হলে ঢাকায় আপনি অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে ক্লাস করার সুযোগ পাবেন। টিএফআই সেল ও সিআইডির দপ্তরে। ক্লাস শুরুর সময় রিমান্ডের ফাঁকে। আনফিট ছাত্ররা ক্লাস করতে পারবেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে, একাডেমির অধ্যক্ষ বাবর এখানে প্রায়ই যান। এর বাইরে আদালত এলাকায় হতে পারে মোবাইল ক্লাস, প্রিজন ভ্যানের ফাঁক গলে।

ঢাকার বাইরে থেকে বাবর একাডেমিতে ইংরেজি শিখতে চাইলে আপাতত সুযোগ আছে কাশিমপুরে। এটা হবে মূলত অনুশীলন ক্লাস—অবসরে জাবর কাটা। এ ছাড়া হবিগঞ্জ আদালত প্রাঙ্গণে (কিবরিয়া হত্যা মামলায় হাজিরার ফাঁকে) পাবেন ভ্রাম্যমাণ ইংরেজি শেখার সুযোগ।

এ উদ্যোগ কার্যকর হলে যে গালাগাল হারিয়ে যাবে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। যে কেউ আগামী ফেব্রুয়ারিতেই একটা বই প্রকাশ করতে পারেন। বইয়ের নাম হতে পারে বাংলার খিস্তিখেউড়: সংসদের এক্সপাঞ্জ করা সব বক্তৃতার সংকলন। শাহেদ মুহাম্মদ আলী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

332) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বইয়ে আঞ্চলিক ভাষার নমুনা দিয়েছেন
এভাবে: সাধু ভাষা: এক লোকের দুইটি ছেলে ছিল।
কলকাতা-নদীয়া: অ্যাকজন লোকের দুটো ছেলে ছিল।
খুলনা-যশোর: অ্যাকজন মাঙ্গির দুটো ছাওয়াল ছিল।
মানভূম: এক লোকের দুটো বেটা ছিল।
মেদিনীপুর: এল লোক্কার দুই পো থাইল।
মালদহ: য্যাক ঝোন ম্যানশের দুটো ব্যাটা আছলো।
বগুড়া: য্যাক ঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল।
রংপুর: একজন ম্যানশের দুইক্কা ব্যাটা আছিল।
ঢাকা: একজন মানসের দুইডা পোলা আছিলো।
ময়মনসিংহ: য্যক জনের দুই পুত্ আছিল।
সিলেট: এক মানুষর দুই পোয়া আছিল।
চট্টগ্রাম: এগুয়া মানশের দুয়া পোয়া আছিল।
নোয়াখালী: একজনের দুই ছুত আছিল।

333) ভাষারস

নোয়াখালীর ভাষায় একটা বাক্য
হানিতে হল আছে, হল দেইখ্যা হোলা হানে
হানিতে হড়ি গেছে।
বুঝলেন কিছু? মনে হয় না। ওনারা 'প' ও
'ফ'কে 'হ' বলে
হানিতে—পানিতে, হল—ফুল, দেইখ্যা—দেখে,
হোলা হানে—পোলাপান বা ছেলেপুলে, হানিতে—
পানিতে, হড়ি—পড়ে। তাহলে ঘটনা দাঁড়াল—
পানিতে ফুল আছে, ফুল দেখে ছেলেপুলে
পানিতে পড়ে গেছে। শিক্ষক ও ছাত্রী
প্রথম দিন পড়াতে গিয়ে স্বভাবতই জিজ্ঞেস
করলাম, 'তোমার নাম কী?' লাজুক হেসে
মেয়েটি বলল, 'জি, মিচোনিয়া!'
ঠিক বুঝলাম না। ফের জিজ্ঞেস করলাম, 'কী
নাম বললে?'
'মিচ চোনিয়া চার। চো-নি-য়া। চাবরিনা চিদ্দিকা
চোনিয়া।'
'ও সোনিয়া! তা সোনিয়া, তোমার দেশের বাড়ি
কোথায়?'
উত্তর শুনে ঘটনা পরিষ্কার হলো। পড়াতে শুরু
করলাম সোনিয়াকে।

আমি যখন খাতা দেখতাম, সে সময় সে গল্প জুড়ে দিত।

একদিন এমন মনোযোগ দিয়ে বাড়ির কাজ দেখাচ্ছি, সে গল্প শুরু করল, ‘চার, আপনি ভেন্ডের গান লাইক করেন?’

‘ভেন্ডের আবার কী? বলো ব্যাভের। হ্যাঁ, করি তো।’

‘চার, কোন ভেন্ড আপনার পেবারিট?’

‘নির্দিষ্ট কেউ না। সব ব্যাভেরই কিছু কিছু গান ভালো লাগে।’

‘চার, আমার পেবারিট চার, চোলচ। চোলচের পরেস্ট হিলে গানটা চুপার লাগে, চার, প্যানটাচটিক লাগে।’

আরেক দিনের কথা। খাতা দেখছি, কিছুটা উশখুশ করে ছাত্রী বলল, ‘চার, আপনার কোনো অ্যাপেয়ার আছে, চার?’

ওর দিকে শীতল দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম খাতায়।

সে নাছোড়বান্দা, ‘বলেন না, চার, আছে?’

ধমকের সুরে বললাম, ‘হ্যাঁ, আছে!’

‘হি.হি..হি...! তা বাবির নাম কী, চার?’

রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাটাকাটাভাবে বললাম, ‘মাধুরী দীক্ষিত।’

‘ই.হি..হি....! আপনি চার একদম চিরিয়াচ না, শুধু পান করেন। হি.হি..হি...। ওহ চার, বালা কতা, আপনাকে তো একটা কবর দিতে হবে।’

‘কী বললে? আমাকে কবর দিতে হবে? মানে কী?’

‘জি, চার, জরুরি কবর, আগামী ২০ তারিকে আমার ভোনের বিয়ে।’

‘ভোনের নয়, বলো বোনের।’

‘জি চার। চার, কাওয়াদাওয়া কিন্তু কোনো কমিন্টি চেন্টারে হবে না, চাদে হবে।’

‘কী? চাঁদে হবে?’

‘জি, চার, আমাদের চাদে। চার, আপনাকে খাট দেব?’

‘খাট! আমাকে খাট দেবে মানে?’

‘মানে চার, বিয়ের খাট।’

‘হোয়াট? বিয়ের খাট!’

‘জি, চার, দাওয়াত খাট।’

‘ও আচ্ছা! ইনভাইটেশন কার্ডের কথা বলছ তুমি?’

‘জি, চার। চার, জানেন, আমার দুলাভাই না

দেখতে টিক ভোম্বের হিরুদের মতন।’

‘ভোম্বে নয়, বোম্বে। আর হিরু নয়, হিরো। তা, উনি দেখতে কোন হিরোর মতন?’

‘হিহিহি...। দেকতে? উনি দেকতে টিক ভোম্বের চালমান কান, চার।’ বগুড়ার ভাষা খুব দুর্বোধ্য নয়, তবে বিচ্ছিন্ন কিছু দুরধিগম্য শব্দসহযোগে রচিত এই বক্তব্যহীন ছড়া।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

334) জগৎপারাবারের তীরে

আমাদের সাবেকি কালীঘাট পাড়ার চুলকাটার সেলুনের বাইরের দরজায় লেখা ছিল, ‘চুল—১, (এক টাকা)

শিশু—\ (আট আনা)’

তখন আমাদের বাড়িতে কোনো শিশু ছিল না।

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা চুলকাটার দোকানের ওই বিজ্ঞপ্তি দেখে এবং সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে দেখে

ওই সেলুন থেকে এক টাকা দিয়ে দুটো শিশু কেনার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়

ক্ষৌরকার মহোদয় শিশু সরবরাহ করতে

পারেননি, পারার কথাও নয়। কিন্তু তিনি আমার

দাদাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে ওই শিশু

মানে হলো শিশুদের চুলকাটা। ফলে পথে-ঘাটে,

সময়-অসময়ে যখনই ওই সেলুনওয়ালার সঙ্গে

দাদার দেখা হতো, দাদা তাঁকে তাগিদ দিতেন,

‘ও মশায়, শিশু এল। আমাদের যে দুটো শিশু

বড় দরকার।’

কবি বলেছেন, ‘জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা

করে খেলা’। শিশুরা যদি শুধু জগৎপারাবারের

তীরেই খেলত তাহলে হয়তো তেমন আপত্তির

কিছু ছিল না, কিন্তু তারা যে কোথায় খেলে আর

কোথায় খেলে না, কেউই বলতে পারবে না,

তারা নিজেরাও নয়। গাছের ডালে, পুকুরের

জলে, বাবার লেখার টেবিলে, মায়ের রান্নাঘরে,

ঠাকুমার পুজোর জায়গায় স্কুলের ক্লাসে,

সিঁড়িতে, বারান্দায়, গাড়িতে এবং আরও এক

হাজার এক জায়গায় তারা খেলে। খেতে খেতে

খেলে, ঘুমোতে ঘুমোতে খেলে; কাঁদতে কাঁদতে,

হাসতে হাসতে, পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে

এমন কি খেলতে খেলতে খেলে।

তা খেলুক, যত খুশি খেলুক, সরল শিশুদের

সরল খেলাধুলোয় বাদ সেধে লাভ নেই। তা

ছাড়া আমরা সবাই তো বিলিতি ছড়ায় সেই

সাহেব খোকা জিলের কথা পড়েছি; খেলা না করে শুধু কাজ করে যার খুব ক্ষতি হয়েছিল। জিলের ছড়া যে-দেশের, সে-দেশের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ নামক এক প্রবীণ কবির ভালো ভালো উক্তির দিকে খুব ঝোঁক ছিল, তিনিই বলেছিলেন, শিশুরাই হলো মানুষের বাবা। এর চেয়ে সুন্দর হলো একটি ফরাসি প্রবাদ, শিশুরা হলো দেবদূত, তারা যত বড় হতে থাকে তাদের পাখা তত ছোট হতে থাকে।

দেবদূত, কবিতা এবং প্রবাদবাক্য থেকে মর্ত্য-পৃথিবীর শিশুদের কাছে ফিরে আসা যাক। এক বড় রেস্টোরাঁয় একদা দেখেছিলাম এক দম্পতি তাদের শিশু কন্যাটিকে নিয়ে নৈশাহার করছেন। তাঁরা একটা আস্ত সেদ্ধ মাছ নিয়েছেন যার অর্ধেকও তাঁরা তিনজনে খেয়ে উঠতে পারেননি। বিল মেটানোর আগে কর্তা বেয়ারাকে বললেন, ‘মাছ যেটুকু আছে, একটা প্যাকেট করে দাও তো আমাদের বেড়ালটার জন্যে।’ শিশুকন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বলে ফেলল, ‘বাবা, তা হলে আমরা আজ থেকে একটা বেড়াল পুষব। কি ভালো, কি ভালো।’ পিতৃদেবের কর্ণমূল আরক্ত করে মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

অন্য একটি বাচ্চা মেয়ের কথা বলি। কয়েক দিন আগে তার একটি ভাই হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘খুকু, ভাই কেমন হয়েছে?’ সে ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, ‘মন্দ না।’ আমি তার মুখভাব দেখে অবাক হলাম, বললাম, ‘সেকি, ভাই পেয়ে তুমি খুশি হওনি।’ খুকু জানাল, ‘ভাই না হয়ে বোন হলে অনেক ভালো হতো। আমি অনেক খুশি হতাম। বড় হলে তার সঙ্গে পুতুল খেলতে পারতাম।’ আমি রহস্য করে বললাম, ‘যাও না, যে হাসপাতাল থেকে মা ভাইকে নিয়ে এসেছে সেখানে গিয়ে ভাইকে বদলিয়ে মনের মতো একটা বোন নিয়ে এসো।’ খুকু বিজ্ঞের মতো গম্ভীর মুখে বলল, ‘সে তো প্রথমে হলে হতো। এখন সাত দিন ব্যবহার করা হয়ে গেছে, এখন কি আর ফেরত নেবে।’ শিশুনারী বড় পাকা হয়, শিশুনার সে তুলনায় সরল কিন্তু গোঁয়ার ও ডানপিটে। দুই ভাই মারামারি করছে। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বড়টিকে নিয়ে পড়লেন, ‘তুমি ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করলে ফের, তোমাকে

বারণ করিনি?’ বড় ছেলে বলল, ‘ভাই আমাকে আগে মেরেছে।’ মা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, ‘তোমাকে বলিনি কখনো ভাইয়ের ওপর রাগ হলে এক থেকে ১৫ পর্যন্ত গুনবে। দেখবে গুনতে গুনতে রাগ পড়ে যাবে।’ এবার বড় ছেলে উত্তেজিত হয়ে গেল, সে চোঁচিয়ে বলল, ‘তুমি তো আমাকে ১৫ পর্যন্ত গুনতে বলেছ আর ওকে বলেছ রাগ হলে ১০ পর্যন্ত গুনতে। আমি যখন ১১-১২ গুনছি, তখনই তো ১০ গোনা শেষ করে ও আমার পেটে ঘুষি মারল।’

আরেকবার এক দাঁতের ডাক্তারের ওখানে দেখেছিলাম, শিশুপুত্র সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ডেন্টিস্টের সঙ্গে বাদানুবাদ করছেন, ‘আপনি বলেছিলেন খোকার পোকাখাওয়া দাঁতটা তুলে ফেলতে ১০ টাকা নেবেন আর এখন বলছেন ৪০ টাকা।’ ডেন্টিস্ট বললেন, ‘দেখুন ১০ টাকাই নিই, সেটাই নেওয়ার কথা। কিন্তু আপনার ছেলে দাঁত তুলতে গিয়ে এমন মারাত্মক চোঁচাল যে আমার বাকি তিনজন রোগী, যারা চেম্বারে বসে ছিল ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। সে জন্য ওই তিনজনের ৩০ আর আপনার ছেলের ১০—সব মিলিয়ে মোট ৪০ টাকা চাইছি।’

শুধু দাঁত তোলা নয়, এমন শিশুকে জানি যার চুল কাটাও প্রাণান্তকর ব্যাপার। এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, সেলুনের দরজায় দরজায় ছেলের হাত ধরে ঘুরছেন। সব ক্ষৌরকার সেই শিশুটিকে চেনেন। তাঁরা তাকে দেখেই আঁতকে উঠছেন, ‘সর্বনাশ! না, ওর চুল আমি কাটতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন, দাদা।’

শিশুদের নিয়ে আমার সুদূর অতীতের শিক্ষক-জীবনের দুই-একটা তুচ্ছ ঘটনা আজও মনে আছে। একটি বাচ্চা ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘স্যার, কারোকে কি সে যা করেনি তার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত!’ আমি বললাম, ‘নিশ্চয়ই না।’ সে এবার খাপ খুলল, ‘তা হলে স্যার, অঙ্কের দিদিমণি আমি অঙ্ক করিনি বলে সাজা দিলেন কেন?’

আরেকবার আরেকটি ছাত্রকে বলেছিলাম, ‘রেফের নিচে দ্বিত্ব দেওয়ার দরকার নেই, পূর্ব বানানে রেফের নিচে একটা ব কেটে দাও।’ ছেলেটি অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল,

‘স্যার, কোন ব কেটে দেব? ওপরের ব না নিচের ব?’

সবচেয়ে জব্দ হয়েছি এই সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে তার ক্ষুদ্র পৌত্রীটিকে মুখে মুখে যোগ অঙ্ক শেখাতে গিয়ে। আমি তাকে বললাম, ‘আমি যদি আজ তোমাকে তিনটে বল দিই, কাল তোমাকে দুটো বল দিই আর পরশুদিন একটা বল দিই তাহলে তোমার সবসুদ্ধ কটা বল হবে?’

মেয়েটি একটু মনে মনে চিন্তা করল, তারপর বলল, ‘আটটা।’ আমি বললাম, ‘সেকি, আটটা কেন?’ সে বলল, ‘আমি আপনার কাছ থেকে পেলাম তিন দিনে সবসুদ্ধ ছয়টা। আর আমার তো নিজেরও দুটো আছে, তাই আটটা।’

পুনশ্চ: শিশু কাহিনিতে এ গল্পটা না লেখাই ভালো। তাই মূল অংশে গল্পটা এড়িয়ে গেছি। তবু মনে যখন এসেছে, পুনশ্চের পর্দার আড়ালে বলেই ফেলি।

বাড়ির ছোট শিশুটির জন্য কয়েক দিন হলো একজন নতুন দিদিমণি নিযুক্ত হয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় যখন দিদিমণি পড়িয়ে ফিরছেন, শিশুটির মা পড়ার ঘরে এলেন। এসে শিশুটিকে বললেন, ‘সানি, দিদিমণি যাওয়ার আগে দিদিমণিকে একটু আদর করে দাও।’ সানি নামক শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, ‘না, দিদিমণিকে আদর করব না।’ মা বললেন, ‘কেন?’ ‘আদর করলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।’ সরল শিশুটি জানাল। মা অবাক হলেন, ‘সে কি, তা কেন?’ সানি বলল, ‘কাল দিদিমণিকে বাবা আদর করতে গিয়েছিল, বাবাকে দিদিমণি চড় মেরেছে।’ তারাপদ রায়: জন্ম ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। বিখ্যাত এই লেখকের উল্লেখযোগ্য বই: তোমার প্রতিমা, নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু, রস ও রমণী ইত্যাদি। তিনি ২০০৭ সালের মৃত্যুবরণ করেন। এই লেখাটি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

335) অভি-ধানাই পানাই

কাঁচকলা: কাচের ওপর শিল্পকর্ম, কারুকাচ।
কাণ্ডকারখানা: যে কারখানায় কাণ্ড প্রস্তুত হয়।
এ রকম কারখানার পরিচালককে কাভারি বলা

হয়।

কাবুলি: ১. কাবু বা দুর্বল করে এমন; ২.

কাকের ডাক (কা+বুলি)।

কারাগার: ইং কার (car)+আগার, গাড়ি রাখার
গ্যারেজ।

কুমেরু: পৃথিবী নামক গোলকের দুটি মেরু;
একটি উত্তর এবং অন্যটি দক্ষিণ। এঁদের মধ্যে
দক্ষিণ মেরু বালক বয়সে কী একটি পাপ
করার পর পণ্ডিতেরা এই মেরুকে 'কু' আখ্যা
প্রদান করেন। এদিকে উত্তর মেরু জীবনে
কোনো সৎকর্ম না করেও তাকে (কথিত আছে
কিছু অর্থের বিনিময়ে) 'সু' আখ্যা দেওয়া হয়।

ক্রীড়াপদ: খেলার উপযুক্ত পা, সাধারণত ফুটবল
খেলোয়াড়দের পা-কে ক্রীড়াপদ বলা হয়।

ক্রোড়পতি: কোলে নেওয়া যায় বা কোলে চড়েন
এমন স্বামী, বেঁটে বামন বর। প্রাচীনকালে শিশু
বিবাহের সময় এমনটা প্রায়ই দেখা যেত।

খবরদার: যিনি খবর দেন, সাংবাদিক, পত্নীর
সংবাদ।

গরিবের কথা: বাসি হলে ফলে, ধনীর কথা
ফলে তৎক্ষণাত্।

গলদা: গলদপূর্ণ; ত্রুটিপূর্ণ। গলদ থাকলে গলদা
বলা হয়। উদাহরণ, গলদা চিংড়ি অর্থাৎ যে
চিংড়িতে ত্রুটি রয়েছে। এমনও হতে পারে, যে
চিংড়ি চরিত্রহীন বা অসৎ তাকে গলদা চিংড়ি
বলা হয়।

গোছল: গরুর চালাকি; গরুর চাতুরি।

গোধূলি: ধুলোর মধ্য দিয়ে একাধিক কিংবা
পাঁচাধিক গরু চলার সময় যে ধূলি বাতাসে
উড়তে থাকে, তাকে বলে গোধূলি। তুলনীয়
অশ্বধূলি বা কুত্তাধূলি। বৃষ্টির পর গোধূলি অবশ্য
গোকর্দমে পরিণত হয়।

গোবর: গোস্বামী, যাঁড়, go বর = স্বামীকে ত্যাগ
করার আদেশ, পত্নী কর্তৃক স্বামীকে
বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ।

গোবেচারা: গরু বেচে যারা। গোরু ব্যবসায়ী।

বাক্যগঠন—আমাদের পাড়ার তিন ভাই গোবেচা
শুরু করার পর যথেষ্ট পয়সা করেছে। ওদের
এখন বলা হয় গোবেচারা।

ঘুষি: ঘুষ-এর স্ত্রীরূপ, স্ত্রীরা যখন ডেকাচ গ্রহণ
করেন।

চটিবই: রাগ করবই, অসন্তুষ্ট হবই।

চাকর: চা প্রস্তুতকারী, চায়ে আরোপিত শুদ্ধ।

চাদর: চায়ের মূল্য বা দাম।

চারিধার: চতুর্ধার; ঋণ প্রধানত চার রকম: ক, ব্যাংক ঋণ, খ. আত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ, গ. সরকারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ, ঘ. যে ঋণ শোধ করতেই হয়।

চিড়িয়াখানা: পাখির খাদ্য; সামান্য পরিমাণ খাদ্য। বাক্যগঠন—চিত্রাবুর খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা কমে গেল, চিড়িয়াখানার মতো খাদ্যও তিনি হজম করতে পারতেন না।

চ্যালেঞ্জ: চ্যালেঞ্জ কথাটির অর্থ জানা আছে, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এটি প্রায় সর্বদাই ছুড়তে হয়। উল্লেখ্য, এ কথাটির ইংরেজি নেই।

ছায়াছবি: যে ছবি স্পষ্ট নয়; সামনে সাদা পর্দার পেছনে আলো প্রক্ষেপ করে মাঝে নাচ বা নানা ভঙ্গি কেবল ছায়ামূর্তি রূপে দর্শকেরা দেখেন।

ছোটখাটো: দৌড়াও, পরিশ্রম করো। বাক্যগঠন—আজকাল ডাক্তারেরা বলছেন ছোট আর খাটো। জটায়ু: আয়ু যখন জট পাকিয়ে যায় তখন, প্রাণ সংশয়। যখন ডাক্তার নিজের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, সাড়ে চুয়াত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।

জন্মদাতা: জন্মাবার পর থেকেই যিনি দান করতে শুরু করেন।

জ্যামিতি: ইং-বাং শব্দ jam-এর ইতি, জ্যাম-এর শেষ। বাক্য গঠন—খাবারের টেবিলে রাখা জ্যামের পরিপূর্ণ পাত্র ছিল, গোটা এক বেলার মধ্যে জ্যামিতি করে দিল।

জ্যৈষ্ঠ মধু: গুল্ম পুরাণে কথিত আছে, পৃথিবীর একশ চুয়ান্ন রকম মধুর মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগৃহীত মধুই শ্রেষ্ঠ মধু। হিমালীশ গোস্বামী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

336) আ-মরি বাংলা ভাষা

গতকাল ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। সবাই কী সুন্দর বাংলায় কথা বলল। কোনো চমৎকার দৃশ্য দেখে ‘ওফ, কি অসাম’ না বলে বলেছে, ‘আহা, কী হৃদয়গ্রাহী!’ অথচ ভাষা দিবস চলে যেতে না যেতেই সব আগের মতো হয়ে গেছে। সবাই নিশ্চিন্তে বাংলার সঙ্গে হিন্দি, ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছে। এ রকমই হয়। দাঁত থাকতে বাঙালি দাঁতের মর্যাদা বুঝবে না এটাই স্বাভাবিক। অথচ বাংলা যে কত মধুর একটা ভাষা তা আর কেউ না বুঝলেও বারাক ওবামা

ঠিকই বুঝেছেন। আর তাই তো তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন বাংলা দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, ‘আই বারাক ওবামা...।’ এটা আমাদের নোয়াখালী অঞ্চলের ভাষা। তবে আসল ভাষাটা হবে ‘আঁই বারাক ওবামা।’ মানে আমি বারাক ওবামা। নতুন বলে ওবামা চন্দ্রবিন্দু দিতে ভুলে গেছেন। তবে চন্দ্রবিন্দুর ভুল তেমন কোনো বড় ভুল না। আমরা বাঙালিরাই চন্দ্রবিন্দু দিতে ভুলে যাই, আর উনি তো আমেরিকান। তাও যেনতেন আমেরিকান না, কেনিয়ার বংশোদ্ভূত আমেরিকান। তাঁর এই ভুল ক্ষমা করে দেওয়া যায়। সুদূর আমেরিকায় বসে ওবামা সাহেব বাংলা চর্চা করছেন অথচ এই ভাষার বদলে চাপ্স পেলেই আমরা বাংলার মধ্যে ইংরেজি, হিন্দি এসব ঢুকিয়ে দিই। এটা তো ঠিক না। বাংলা ভাষায় এত সুন্দর সুন্দর শব্দ থাকার পরও আমরা অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করব কেন? হোয়াই? আমরা নানাভাবে আমেরিকাকে অনুসরণ করি, আর ওবামার বাংলাচর্চাকে অনুসরণ করব না—তা কি হয়? তাই আসুন, আমরা বাংলার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ বলা ত্যাগ করি। তা না হলে বাংলা ভাষা কোনো দিনই সঠিক মর্যাদা পাবে না, কাভি নেহি, নেভার এভার। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০১০

337) ক্ষমা প্রার্থনা - মানবেন্দ্র পাল

মফস্বল শহরে একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছে ম্যাজিক দেখাতে আর সেই ম্যাজিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে হবে একজন সাহিত্যিককে। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্য। আর তা সেদিন ঘটে গেল আমারই জীবনে।

কী করব? ‘মায়া ও মায়াবী’ কোম্পানির স্বয়ং ম্যাজিশিয়ান বাড়ি এসে অনুরোধ করে গেলেন। তাই কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। তিনি আবার নিজে থেকেই আমার উদ্বোধনী বক্তৃতার বিষয়বস্তুও বলে দিয়ে গেলেন। না, জাদুবিদ্যাটিদ্যা নিয়ে না, শ্রেফ ম্যাজিক নিয়ে আমার ছেলেবেলার কোনো স্মরণীয় ঘটনা। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। এটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। ম্যাজিক নিয়ে ছোটবেলার একটা ঘটনার খেই ধরে টান দিলেই বক্তৃতা জমে উঠবে।

হলে দর্শক গিজগিজ করছে। মাইকের সামনে

মাল্যভূষিত আমি দাঁড়িয়ে। কী বলব, মোটামুটি তাও ঠিক করে ফেলেছি। নির্দেশ পাওয়া মাত্র বলতে শুরু করলাম, ছোটবেলায় একবার ম্যাজিশিয়ান হওয়ার শখ হয়েছিল। ছোটদের পত্রিকায় তখন ছবিটবি দিয়ে ম্যাজিক শেখানো হতো। সেগুলো গোথাসে গিলতাম, বাড়িতেও প্র্যাকটিস করতাম। তখন বয়স তেরো-চৌদ্দ। পত্রিকা আর ম্যাজিকের বই পড়ে বেশ কয়েক রকম ম্যাজিক শিখে ফেলেছিলাম, বিশেষ করে তাসের ম্যাজিক। আমার সঙ্গী ছিল আমার প্রায় সমবয়সী বোন গীতা। বিদ্যে যখন বেশ কিছুটা আয়ত্ত্ব হয়েছে তখন একদিন গীতার পরামর্শে বাড়ির বৈঠকখানায় ম্যাজিক দেখানোর ঘোষণা হলো। গীতা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাড়ার যত ছোট ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করে এল। নেমন্তন্ন পর্ব শেষে গীতা বলল, সবাইকে নেমন্তন্ন করা হলো, শুধু মন্টিকেই বলা হলো না। মন্টির নাম শুনেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। বললাম, ওকে বলতে হবে না। গীতা ইতস্তত করে বলল, তবু, পাড়ার মেয়ে তো। বললাম, তা হোক। ও এলে সব ভেসে দেবে। মন্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। বয়েস তার বছর এগারো। পাতলা, রোগা। ঘাড় পর্যন্ত কাটা চুল। গোল মুখ। দু চোখে সব সময় দুষ্টুমি বুদ্ধি ছটফট করছে। আর আমার কোনো ভালো কাজ যেন সহ্য করতে পারত না। ভালো কাজ মানে, হয়তো সেবার ক্লাসে ফাস্ট হয়ে উঠেছি। ও এসে আমাকে গুনিয়েই বলল, এবার কোশ্চেন এত সোজা পড়েছিল যে গাধাগুলোকে পরীক্ষা দেওয়ালে তারাও ফাস্ট হতে পারত।

একদিন শুয়ে শুয়ে একমনে শিশু-সাহী থেকে ম্যাজিকের ফর্মুলা টুকে নিচ্ছি, হঠাৎ ও ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে ছোঁ মেরে পত্রিকাটা কেড়ে নিল।

ও, ম্যাজিক শেখা হচ্ছে? ম্যাজিশিয়ান হবেন! কচু—কচু হবে। বলে বুড়ো আঙুল দুটো দেখিয়ে পত্রিকাটা নিয়ে ছুটে পালাল! অনেক চেষ্টা করে পত্রিকাটি উদ্ধার করলাম। কিন্তু হায়, ম্যাজিকের পাতা কটাই নেই। কাজেই এমন মেয়েকে আমার ম্যাজিক প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করতে এতটুকু ইচ্ছে হয়নি। এই পর্যন্ত বলে আমি যখন একটু হেসেছিলাম, দর্শকমণ্ডলী তখন সম্মিলিত হর্ষধ্বনি দিয়ে

আমায় উৎসাহিত করলেন, তারপর?

সন্ধ্যায় ম্যাজিক। সারা দুপুর আমরা ভাইবোনে প্রস্তুতি নিলাম। মাঝের ছোট ঘরটিকে গ্রিনরুম বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো কালো পর্দা।

সন্ধে হতেই ছেলেমেয়ের ভিড়ে বৈঠকখানা ভরে গেল। হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা শার্ট পরে তো ম্যাজিক দেখানো যায় না। কিন্তু সে পোশাক কোথায় পাব? শেষে গীতাই এনে দিল দাদুর সাদা ঢোলা প্যান্ট। সেটাই পরলাম কোমরে কষে দাঁড়ি এঁটে। দাদু ছিলেন উকিল। গায়ে চড়ালাম তাঁর চোগা-চাপকান। সে এক অদ্ভুত ড্রেস। একটা কালো টুপি না হলে ম্যাজিশিয়ান বলে মানাবে না। টুপিও জুটে গেল। আমাদের পাড়ার এক খ্রিষ্টান ডাক্তারের একটা হ্যাট চেয়ে আনা হলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম ফাস্ট ক্লাস মানিয়েছে। একটাই শুধু অসুবিধে, প্যান্টটা বড়ই ঢিলে আর বড়। তাসের ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে যদি বারে বারে প্যান্ট সামলাতে হয়, তাহলেই চিত্তির!

যা-ই হোক, যথাসময়ে ঘণ্টার অভাবে কাঁসার থালা বাজিয়ে ম্যাজিক শুরু করা হলো। আমি একটার পর একটা তাসের খেলা দেখিয়ে গেলাম। হাত তালি পড়ছে চটপট চটপট। এবার থট রিডিংয়ের খেলা। বোর্ডে একজন খড়ি দিয়ে কয়েকটা অঙ্ক লিখবে, আমি চোখ বাঁধা অবস্থায় তা বলে যাব। কথাটা ঘোষণা মাত্র দর্শকেরা মেরুদণ্ড টান টান করে বসল। একজন এসে রুমাল দিয়ে আমার চোখ এমন কষে বেঁধে দিল যে মনে হলো মণি দুটো বুঝি গলেই গেল। যা হোক, ওই কষ্টটুকু ম্যাজিশিয়ানকে সহ্য করতেই হয়। আমিও করলাম।

এদিকে একজন খড়ি হাতে উঠে গিয়েছে অঙ্ক লিখতে। ব্ল্যাকবোর্ড নেই। না থাক, জানালার চওড়া কপাট তো আছে। সেখানে খড়ি দিয়ে একটা ছোটখাটো অঙ্ক লেখা হলো। আমি তো অঙ্ক। বুক ধুকধুক করছে। সবটাই নির্ভর করছে গীতার ওপর। প্যান্টের নিচে পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বাঁধা। আমি সেই অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে। গীতা পর্দার আড়ালে গ্রিনরুমে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে দড়ি ধরে আছে। পর্দা সরিয়ে একবার করে একটা অঙ্ক দেখছে আর গুনে গুনে পায়ে দড়ির টান দিচ্ছে। আমিও কটা টান হিসাব করে

হাঁকছি—চার, সাত, নয়।

একবার খেলার মধ্যেই পর্দার আড়াল থেকে গীতার চাপা গর্জন শোনা গেল, এই ফুলি, বোস! প্রথমটা বুঝিনি, পরে বুঝলাম ফুলি বলে মেয়েটি হঠাত্ উঠে দাঁড়ানোয় গীতা অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছিল না।

যা-ই হোক, খেলাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাত্ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে চাঞ্চল্য। কে একজন বাইরে থেকে মত্ত মাতঙ্গিনীর মতো ভেতরে ঢুকে একে মাড়িয়ে, ওকে ডিঙিয়ে গ্রিনরুমের দিকে ধেয়ে আসছে...

—দাদা রে, মন্টি! গীতা প্রায় আত্ননাদ করে উঠল।

আমার চোখ বাঁধা। কিছুই বুঝতে পারছি না। শেষে চোখের বাঁধন খুলে ফেললাম। দেখলাম মন্টি গ্রিনরুমে ঢুকেছে। রাগে দিশেহারা হয়ে মন্টির কান ধরে টেনে বের করে দিলাম। কিন্তু মন্টি ততক্ষণে আমার যা সর্বনাশ করার করে দিয়েছে। গীতার হাত থেকে দড়িটা টেনে নিয়ে দর্শককে সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। দড়ির অন্য প্রান্ত তখনো আমার পায়ে বাঁধা।

খুদে দর্শকমণ্ডলী তখনই হাসতে হাসতে হই হই করে উঠে চলে গেল।

এই লজ্জাকর ঘটনার পর আর কোনো দিন ম্যাজিক দেখাইনি। মন্টিরও খোঁজ রাখিনি, রাখতে প্রবৃত্তি হয়নি। তারপর একদিন মন্টির কেন বাইরে চলে গেল তাও জানি না।

ভাষণ শেষ হতেই হলঘর হাততালিতে ভরে গেল।

পর্দার অন্তরাল থেকে অ্যানাউন্স করা হলো, এবার আজকের ম্যাজিশিয়ানের পত্নী সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই লালপাড় গরদের শাড়ি, লাল ব্লাউজ গায়ে ম্যাজিশিয়ানের স্ত্রী হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম পরস্ত্রী, শুধু পরস্ত্রী কেন, কোনো মহিলার দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে থাকাটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

ম্যাজিশিয়ানের স্ত্রী গদগদ ভাষায় সভাপতিকে তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা আর শ্রদ্ধা উপহার দিয়ে বললেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁর বাল্যজীবনে একদিন ম্যাজিশিয়ান হওয়ার শখের কথা বিস্তৃতভাবে শোনালেন।

মন্টি নামের যে মেয়েটা সেদিন তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল, তিনি যে তাকে আজও ভোলেননি এটা বিশেষ করে আমার পরম সৌভাগ্য। আজ বহুকাল পরে পার্টি নিয়ে দেশে এসেছি শুধু ঐকে দেখাতে। তিনি দয়া করে সেই মন্টিকে ক্ষমা করুন।

বলে ম্যাজিশিয়ানের অভিজাত স্ত্রী-রত্নটি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করল।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মাইকে ঘোষণা করা হলো—‘মায়া ও মায়াবী কোম্পানির জাদু প্রদর্শনীর প্রথম দিনের খেলার প্রথম আইটেম “ক্ষমা প্রার্থনা” দেখানো হলো।

এবার দ্বিতীয় আইটেম—‘মানবেন্দ্র পাল:

ভারতীয় লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

338) নামে কী-বা আসে যায়? -

আদনান মুকিত

স্কুল-কলেজে গল্প-উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা পড়ানো হয়। প্রশ্নও আসে—পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটির নামকরণ কতটুকু সার্থক হয়েছে, আদৌ সার্থক হয়েছে কি না...এসব হাবিজাবি। আরে ভাই, লেখক বহুকষ্টে একটা উপন্যাস লিখে কোনোমতে একটা নাম দিয়েছে, সেই নাম নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? উপন্যাস ভালো লাগলে ভালো, হাততালি দেন। আর না লাগলে নাই। নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না তা নিয়ে পেরেশান হয়ে লাভ আছে? চাইলেও তো এফিডেবিট করে নাম বদলানো যাবে না।

আসলে আমাদের দেশের শিক্ষকেরা এ রকমই।

যে জিনিস কখনোই পারবেন না তা নিয়ে লাফালাফি। এ ধরনের শিক্ষকদের দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী কত ভালো। কী সুন্দরভাবে বিমানবন্দর, সম্মেলনকেন্দ্র, সড়ক, গলি-উপগলি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের নাম বদলে নামকরণের সার্থকতা বিষয়টা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু তাঁর শিক্ষাটা না নিয়ে সবাই উল্টাপাল্টা কথা বলছে। এটা তো ঠিক না। দেশের প্রধান বিমানবন্দরের নাম বদলে ফেলা হয়েছে, তাতে হয়েছেটা কী? নাম তো বদলাতেই হবে। একটা দেশের বিমানবন্দর সারা জীবন এক নামে থাকবে, এটা কেমন কথা? সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, ইংল্যান্ডের বিমানবন্দরের

নাম হিথরো। এত বছর হয়ে গেল, কেউ ওই নামটা পরিবর্তন করল না। এটা কোনো কথা হলো? আমাদের সরকারের মতো ক্রিয়েটিভ হলে অনেক আগেই নাম বদলে দিত। নতুনত্ব বলে একটা কথা আছে না? যেখানে কবি নিজের মুখে নতুনের জয়গান গাইতে বলেছেন, সেখানে পুরোনো জিনিস নিয়ে পড়ে থাকার মানে হলো স্বয়ং কবির কথা অবজ্ঞা করা। কবিরা দারুণ ইমোশনাল। তাদের অবজ্ঞা করলে তারা মাইন্ড করতে পারে। আর যে দেশে কবির কদর হয় না সে দেশ কোনো দিন উন্নতি করবে না, এটা তো জানা কথা।

আমাদের সরকার এটা খুব ভালো করে জানে। তা ছাড়া, আমাদের দেশে কি নাম কম আছে? বাংলাভাষায় বর্ণ বেশি, নামও বেশি। দরকার হলে প্রতি মাসে নাম বদলানো হবে। তাতে কার কী? অন্য সময় তো ঠিকই বলে, নামে কী-বা আসে যায়? নাম দিয়া কাম কী? তাহলে এখন নাম নিয়ে এত ঘটনা কেন? আমাদের সরকারগুলো সাধারণ মানুষকে নিয়ে কতটা চিন্তাভাবনা করে তা তো এই নামকরণ দেখলেই বোঝা যায়। প্রতিটি দেশের নাগরিকদের জন্য ‘সাধারণ জ্ঞান’ খুবই জরুরি। চাকরির ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে বিয়ে—সব জায়গাতেই সাধারণ জ্ঞানের দরকার আছে। নেপোলিয়ন কে ছিলেন? গান্ধী প্যান্ট পরতেন নাকি ধুতি? অমুক দেশের রাজধানী, মুদ্রা, বিমানবন্দরের নাম কী—এগুলো সবারই জানা দরকার এবং এসব তথ্য প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করা উচিত। আমাদের সরকারও সেটাই করছে। তাই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জিনিসের নাম পরিবর্তন করে সবাইকে রাখছে একেবারে দৌড়ের ওপর। এখন সবাইকে মনে রাখতে হচ্ছে, বাংলাদেশে বিমানবন্দরের বর্তমান নাম কী? আগের নাম কী ছিল? কবে পরিবর্তন করা হলো?...আরও কত কিছু! এতে দেশের মানুষের তথ্য ধারণক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে, বাড়বে সাধারণ জ্ঞান। ছাত্ররা সব বিষয়ে ফেল করলেও সাধারণ জ্ঞানে এ প্লাস পেয়ে বলবে,

—মা, মা, বড় হয়ে আমি জেনারেল হব।

—সব বিষয়ে ফেল মেরে বসে আছিস, তুই তো আর্মিতেই চাপ পাবি না, জেনারেল হবি কীভাবে?

—কী যে বলো, আমি জেনারেল নলেজে এ প্লাস পেয়েছি তো!

তাই, সঠিক তথ্য জানা খুবই দরকার। তা না হলে ভেজাল হতে পারে। কদিন আগে পৃথিবীর বাইরে ভিনগ্রহের এক এলিয়েনও এই ভেজালে পড়েছে। তাকে বিভিন্ন তথ্য নিতে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে। সে তো মহা খুশি, ছোট্ট একটা দেশ, এর আর কী তথ্য? সে হেসেখেলে তথ্য সংগ্রহ করে ওপরমহলের কাছে রিপোর্ট জমা দিল। ভিনগ্রহের ওপরমহল তো আর আমাদের ওপরমহলের মতো না যে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে! তারা রিপোর্ট নিয়ে আরও গবেষণার জন্য আরেকজন এলিয়েনকে পাঠাল। সেই এলিয়েন এসে দেখে, যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার সবই ভুল। যার ফলে আগের নিরীহ এলিয়েনটাকে জেলে যেতে হলো। এখন সে আক্ষেপ করে পাশের কয়েদি এলিয়েনকে বলে, ‘বুঝলেন ভাই, পৃথিবীতে দেশও আছে একটা, বাংলাদেশ নাম। মারাত্মক অ্যাডভান্স। কীভাবে যেন টের পেয়েছে যে আমি ওদের দেশের তথ্য নিয়েছি, ব্যস! একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দর, নভোথিয়েটার, সম্মেলন কেন্দ্র, রাস্তা সবকিছুর নাম বদলে ফেলেছে। এদের কাছে আমাদের গ্রহ তো কিছুই না। জানতে পারলে এরা আমাদের গ্রহের নামও দুই মিনিটে বদলে ফেলতে পারে। এদের অনেক ক্ষমতা।’ ভিনগ্রহের এলিয়েন এই ক্ষমতা বুঝলেও আমরা বুঝতে পারছি না। অথচ ছোটবেলায় সবাই পড়েছি, বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়! মানে হলো, নাম কোনো ব্যাপারই না।

ছোটবেলার সেই পড়াই যদি মনে না রাখি তাহলে পড়ালেখা করে কী লাভ হলো? আমাদের উচিত ছোটবেলার সেই পড়া মনে রাখা। বিমানবন্দরের নাম যাই হোক, প্লেন ওঠানামা করলেই হলো। তবে যেহেতু সবকিছু বদলে যাচ্ছে, তাই প্রশ্নটাও একটু বদলে দিলে ভালো হয়। এখন সবার বলা উচিত—

বিমানবন্দর তোমার নাম কী? ...পরিচয়
(বুদ্ধিমানেরা বুঝে নিন)! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

339) একটা ভদ্রলোকের গল্প বলি - শওকত হোসেন

একটা গল্প বলি। ভালো গল্প। ভদ্রলোকের গল্প। আমি যে আপনাদের গল্প বলছি সেটা কিন্তু সবাইকে জানানো চলবে না। আমার পরিচিতজনেরা রে রে করে তেড়ে আসতে পারে। তাদের তেড়ে আসাটা দোষের কিছু না। বিশেষ করে যারা আমাকে চেনে। তা ছাড়া রস+আলো পরিবারের ছোট-বড় সবাই পড়ে। সম্পাদকও বলে দিয়েছেন, একটা ভালো গল্প এখানে বলতে হবে, ভদ্রলোকদের গল্প। খারাপ কিছু চলবে না।

আমি নিশ্চিত, আমার পরিচিত যে কেউই থাকলে বলত, তুমি মিয়া লিখবা ভদ্রলোকের গল্প। শুরু করলেও পরে ঠিকই অন্য লাইনে চলে যাবা।

এ ধারণা কিন্তু ঠিক না। আমি মোটেই সে রকম না। প্রমাণ আজই হয়ে যাবে। এই লেখাটা ছাপা হলে আমি নিশ্চিত যে আমার সম্বন্ধে পরিচিতজনদের ধারণা পুরোটাই পাল্টে যাবে। বড়দের গল্প বলিয়ে হিসেবে আমার বদনাম কেটে যাবে।

গল্পটাই না হয় শুরু করি। এটা আসলে একটা বিয়ের গল্প। বিয়ের গল্প মানে সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর গল্প। এক লোক বিয়ে করছে। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বউকে নিয়ে আসছে বাসায়। রাত বাড়ল। সবাই তাকে ঠেলেঠুলে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিল।

এটুকু শুনেই যাদের চোখ চকচক করে উঠছে তাদের বলি, এটা কিন্তু ভদ্রলোকের গল্প। এখানে লাইনমতোই গল্প থাকবে। অন্য কিছু ভাবার কোনো সুযোগই নেই।

গল্পটা শেষ করি তাহলে। বাসরঘরে নতুন বউ বসে আছে। ঘরময় ফুল, আর তার মধ্যে পার্লার-ফেরত ফুলের মতো বউ। ছেলেটা শুরুতেই জরুরি কাজটা করল, মানে দরজাটা বন্ধ করল আরকি। মাথার পাগড়িটা খুলল। তারপর এগিয়ে গেল নতুন বউয়ের দিকে। পরিচিত বা বন্ধুবান্ধব কেউ পাশে থাকলে আমাকে এখানেই থামিয়ে দিয়ে বলত, ভাই রে আর আগাইয়ো না। এইবার থামো। তোমাকে আমরা চিনি। তুমি এইবার অন্য লাইনে যাইবা। এখানে কিন্তু ছোট-বড় নানা ধরনের পাঠক

থাকে। রস+আলো একটা পারিবারিক ফান ম্যাগাজিন।

—আরে না। এইটা তো ভালো গল্প, ভদ্রলোকের গল্প। এখানে খারাপ কিছু নাই। শোনেন আগে। তারপর ছেলেটা গেল নববধূর কাছে। ঘোমটা খুলে নতুন বউকে মন ভরে খানিকক্ষণ দেখল। বউয়ের হাতটাও একবার ধরল। তারপর...। কারও কি মনে হচ্ছে, এবার আমার থামা দরকার? গল্প অন্যদিকে চলে যাচ্ছে? চিন্তার কোনো কারণ নেই। এটা ভদ্রলোকের গল্প। আমি তো আগেই বলেছি। সবটা শোনেন সবাই আগে।

তারপর ছেলেটা তার নতুন বউকে হাত ধরে ওঠাল। বাইরে উথালপাথাল জোছনা। চাঁদের আলোয় ভরে আছে চারদিক। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট একটা বারান্দা। ছেলেটা কিন্তু নতুন বউকে নিয়ে সেদিকে গেল না। তাহলে কই গেল? ছেলেটা নতুন বউকে নিয়ে গেল বাথরুমে।

আরে দূর, চিন্তা করবেন না। উসখুস করার কিছু নেই। অন্য কিছু না। বলছি না এটা ভদ্রলোকের গল্প?

তারপর তারা বাথরুমে গিয়ে অজু করল। ঘরে ফিরে দুজনই পড়ল দুই রাকাত নফল নামাজ। অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে তারা অবশেষে বিয়ে করতে পেরেছে। নফল নামাজ তো পড়াই উচিত। আবার মুরব্বিরাত্তাও তো বলে দিয়েছে। তারপর আবার তারা গেল বিছানার দিকে। আমাদের গল্পের ছেলেটা হয় অতি সাবধানী না হয় খানিকটা কৃপণ। আবার কেউ কেউ তাকে বুদ্ধিমানও বলতে পারেন। কেননা সে বলল, শেরওয়ানি পরে থাকতে তার আর ভালো লাগছে না, আর নতুন বউয়েরও উচিত শাড়িটা খুলে রাখা। তা না হলে দামি শাড়িটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, শেরওয়ানিটা ভাড়ায় আনা। নষ্ট হলে ফেরত না-ও নিতে পারে।

আরে আরে, এটুকু পড়েই চলে যাবেন না যেন। শাড়ি খুলছে তো কী হয়েছে। বলছি না এটা ভদ্রলোকের গল্প? এখানে খারাপ কিছু নেই। তারপর?

তারপর আর কী? দুই দিন ধরে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। তারপর সারা দিনের বিয়ের ধকল।

দুজনই পরিশ্রান্ত। কাপড় পাণ্টে তারা শুয়ে পড়ল। দুজনেরই ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না।

তারপর?

তারপর সকালে উঠল, নাশতা করল, আত্মীয়স্বজন তো ছিলই। বন্ধুরাও এল আড্ডা দিতে। এই তো।

পাঠক-পাঠিকার কেউ পাশে থাকলে ধমক দিয়ে বলত, দূর মিয়া, এটা কোনো গল্প হলো? কিছুই তো নেই!

তাহলে শোনে সবাই, ভদ্রলোকের গল্প এ রকমই হয়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

340) মাথায় কত প্রশ্ন আসে

u প্রকাশিত বই না চললে কী করা উচিত?

—বইয়ে পা বা চাকা লাগিয়ে নিন।

u জীবনবিমা কী?

—সারা জীবন দরিদ্র থেকে মৃত্যুর পরে ধনী হওয়ার পদ্ধতি।

u নিঃসঙ্গতা অসহনীয় কেন?

—কারণ নিজেকে বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয়।

u প্রতিশব্দ কাকে বলে?

—কোনো শব্দের বানান জানা না থাকলে বিকল্প যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

u খালি পেটে কবিতা লেখা কি উচিত?

—না, কবিতা লিখুন কাগজে।

u সংসারজীবন কী?

—দুই বা ততোধিক নার্ভাস সিস্টেমের সহাবস্থান।

u স্মৃতিকথা কী?

—উত্তমরূপে ধোলাইকৃত আত্মজীবনী। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

341) প্রীড়াভক্ত পদুশকিন - আন্তোন চাখুনি

পদুশকিনের খুব শখ ছিল পুত্রসন্তানের। কিন্তু জন্ম নিল মেয়ে।

কিকটা জুতসই হয়নি বলেই মনে হচ্ছে, নিজের ওপরই বিরক্তি বোধ করল পদুশকিন।

বছর পেরোতেই তার ঘরে এল আরেক কন্যাসন্তান।

বারের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মনটা খারাপ

হলো পদুশকিনের।

পরের বছর জন্মলাভ করল আরও এক সন্তান।

সেটিও মেয়ে।

এবার বল চলে গেল মাঠের বাইরে, মানে

আউট। দীর্ঘশ্বাস ফেলল পদুশকিন।

এক বছর বাদে স্ত্রী জন্ম দিল যমজ দুই

কন্যাসন্তানের।

দুই চালেই মাত! হতাশ হলো দাবাভক্ত

পদুশকিন।

কিছু দিন যেতেই একসঙ্গে তিন কন্যাসন্তানের

পিতা হলো সে।

ট্রিপল জাম্পটাও ঠিকমতো দিতে পারলাম না!

আক্ষেপের সীমা রইল না পদুশকিনের।

পরবর্তী বছরে স্ত্রী আরও এক কন্যাসন্তানের

জন্ম দিতেই শাশুড়ি গজগজ করে বললেন, স্ত্রীর

প্রতি পদুশকিনের কোনো মায়া-দয়া নেই।

রেফারিকে বের করে দাও মাঠ থেকে! মেজাজ

খিঁচড়ে গেল পদুশকিনের।

পরের পাঁচ বছরে পদুশকিনের গোপন

প্রেমিকাদের গর্ভে জন্ম নিল আরও পাঁচ সন্তান।

সব কটিই মেয়ে!

হোমগ্রাউন্ড আর অ্যাওয়ে-গ্রাউন্ডে কোনো

তফাতই যে নেই দেখছি! চূড়ান্ত হতাশায় ডুবল

পদুশকিন।

পরের বছর পদুশকিনের বড় মেয়ে জন্ম দিল

নাতনির!

যুবদলেরও একই অবস্থা! বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল

পদুশকিন।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল পদুশকিন, নিজেই নামবে

বদলি খেলোয়াড় হিসেবে।

অপারেশন করিয়ে পদুশকিন হয়ে গেল

পদুশকিনা।

বছর ঘুরতেই পদুশকিনা জন্ম দিল ফুটফুটে এক

কন্যাসন্তানের। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ

০১, ২০১০

342) ইয়ে... দেবার বিয়ে -

রাজীব হাসান

বাসররাতেই নাকি বেড়াল মারতে হয়। কিন্তু

আমাদের দেবা তার জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে

মেরেছিল মশা!

তখন মাঝরাত। কবিগোত্রের কাছে অতি প্রিয়

সময়। এ সময়ই নাকি কাব্যদেবীর আরাধনা

● <http://facebook.com/tanbir.cox>

করতে হয়। আমাদের দেবা, এককালের
স্বঘোষিত দেবদাসও করেছে। সেই দেবার
কাছেই আজ কাব্যদেবীটেবি কেউ কল্কে পাচ্ছে
না। আজ তার আরাধনা কেবল একজন দেবীর
উদ্দেশেই। শুভলগ্নে ‘যদি দং হৃদয়ং মম’ বলে
যার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছে সে।
সাড়ম্বরে গলায় গামছা বেঁধে ব্যাচেলর ডিগ্রির
বিসর্জন।

ভাবলাম, বন্ধুবর (পরে অবশ্য বুঝেছি, বর
কখনো বন্ধু হয় না। সে কাহিনি খানিক পরে
হবে) কী করছে একটু খতিয়ে দেখা দরকার।
দেবা কি আহত? নাকি মর্মান্বিত? ‘কাছে থাকুন’
স্লোগানে উদ্দীপিত আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন
দিলাম দেবার মোবাইল ফোনে। দেবাকে রসিক
বলতেই হবে। ওয়েলকাম টিউনে বাজছে, ‘এই
রাত তোমার আমার, শুধু দুজনে...!’

শুধু দুজনে মানে? আমরা বাকিরা তাহলে ফেউ!
ইচ্ছে করছিল দেবাকে কষে একটা চড় লাগাই।
অদৃষ্টের কী পরিহাস দেখুন, দেবা ফোন রিসিভ
করতেই ওই প্রান্ত থেকে ঠাস করে একটা শব্দ
এল। খানিক পরেই দেবার চাপা আত্ননাদ!
সেকি! বিয়ের আসরে কাতান শাড়ি কিংবা
লজ্জার ভারে অবনত দেখে এসেছি যে
কিশোরীবধূকে, সে-ই কি তবে বিয়ের প্রথম
দিনেই (মানে রাতে আরকি) স্বরূপে আবির্ভূত!
হতেও পারে। ‘ছলনাময়ী’ শব্দটা এত দিন
ছাপার অক্ষরে পড়ে এসেছে দেবা। আজ বুঝি
চলছে তার হাতে-কলমে শিক্ষা। খোদ গুরুদেব
পর্যন্ত ঠাওরে যেতে পারেননি নারীর অপার
রহস্য। ছলনার শিকার হয়ে নির্দিধায় স্বীকার
করেছেন, ‘যত পাই তোমায় আরও তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে!’

ভাবনায় ছেদ ঘটল আরেকটি ঠাস এবং দেবার
মৃদু আত্ননাদে। ‘কী হলো, কী হলো?’ ‘আর
বলিস না, ঘরভর্তি মশা! মশারি টানানোর ব্যবস্থা
নেই। কয়েলও দিয়ে যায়নি। মশার যন্ত্রণায় আর
টিকতে পারতেছি না রে দোস্ত!’ দেবার করুণ
আর্তিতে বিচলিত হওয়ার চেয়ে আমরা বরং
খুশিই হই। উচিত শিক্ষা হয়েছে! ব্যাটা ফাজিল।
বিয়ের আসরে আমাদের তো পাত্তাই দিলি না।
তোর জন্য কত কষ্ট করে সেই সুদূর ঢাকা
থেকে ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলাম
আমরা। পথে পথে সেতুর টোল দিতে দিতে

আমাদের ফতুর হওয়ার দশা। কেউ একজন তো হিসাব কষে বের করল, যতবার টোল দিয়েছি, সেই টাকায় নাকি প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর বাজেট উঠে যাওয়ার কথা। একবার তো এমনও হলো, টোল দিলাম ঠিকই, কিন্তু সেতুর ‘স’ও চোখে পড়ল না। কেন টোল নিল কে জানে! সেই আমরা ভ্রমণক্লান্তি হাসিমুখে ভুলে ঢুকেছিলাম বিয়েবাড়িতে। গিয়ে দেখি মাথায় ইয়া বড় একটা টোপর পরে বরের মঞ্চে বসে দেবা দাঁত কেলিয়ে হাসছে। হাতে চকচকে সোনালি ঘড়ি! আমাদের লোলুপ ও সন্দিগ্ধ চাহনি দেখে স্বীকারোক্তির ঢঙে দেবাই বলে উঠল, ‘কসম, শ্বশুরবাড়ি থেকে শুধু এই ঘড়িটাই নিছি, আর কিছু না। বিশ্বাস কর।’ চোরের মন পুলিশ পুলিশ!

প্রথম দিকে ঠিকই ছিল। কিন্তু যেই বিয়ের মণ্ডপে নববধূকে পাশে পেল, বন্ধুদের কথা যেন বেমালুম ভুলে গেল বন্ধুবর! সে যা-ই হোক, পুরুতঠাকুর মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছেন। সংস্কৃত বড় খটমটে। কিছু কিছু শব্দ অবশ্য পরিচিতই। বিশেষ করে কানে খট করে লাগল ‘ভক্ষণং’ শব্দটা। চট করে মনে পড়ে গেল, ঢাকার এক লোকাল বাসের গায়ে লেখা দেখেছি সামনের তিনটা সিট ‘মহিলা ও পতিবন্দীদের জন্য সংরক্ষিত’। ‘পতি’ মাত্রই যে ‘বন্দী’, এই তথ্য দেখি সমাজের সব স্তরেই!

পুরুতঠাকুরকে দেখে মনে পড়ে গেল ধন্য মেয়ে-এর রবি ঘোষের কথা। গাঁয়ের ঠাকুর রবি ঘোষ বড় তোতলান। সংস্কৃত তো দূরের কথা, সোজা বাংলা বলতেই জিভে ঠোকাঠুকি। কেউ একজন বুদ্ধি করে শহর থেকে গ্রামোফোনের রেকর্ড করা মন্ত্র নিয়ে এসেছিল। শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে বিয়ে, অন্নপ্রাসনের হরেক রেকর্ড। তারই একটা বাজছে। রবি ঘোষ কেবল ঠোঁট মিলিয়ে যাচ্ছেন। বিয়ের মাঝপথে হইহই করে উঠলেন কেউ একজন, ‘সেকি! এ যে বিয়ের বদলে বাজছে শ্রাদ্ধের রেকর্ড!’ এত দিন পর বুঝলাম, ওই ছবির পরিচালক কী বোঝাতে চেয়েছেন। বিয়ে তো এক ধরনের শ্রাদ্ধই! ওই যে, পুরুষ মানুষ দুই প্রকার—জীবিত ও বিবাহিত!

দেবার বিয়ে চলার সময় অবশ্য তেমন অঘটন ঘটেনি। ঘটেছিল শুরুতে। পাত্রীকে মণ্ডপে

বসানো হয়েছে। দেবাকেও কেউ একজন ডাক দিল। অমনি হনহন করে হাঁটা দিল সে। যেন বিয়ে করতে তর সইছে না তার! গুরুজনদের একজন ধমকেই দিলেন, ‘অভিভাবক কারও অনুমতি নিলে না যে!’ অতঃপর দেবা অনুমতি নিল তার কাকার কাছ থেকে, ‘কাকা, যাচ্ছি।’ হাত তুলে কাকা আশীর্বাদ করলেন, ‘যাও, বাবা।’ যেন বিয়ে নয়, দেবা যাচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা দিতে!

দেবা আসলেই সত্যিকারের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল বাসররাতে। বাকি আত্মীয়স্বজন দরজায় খিল এঁটে দিয়ে চলে গেছে ঘরের বাইরে। কিন্তু মশককুলকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না, এই দুই মানব-মানবীর আজ একা থাকা খুবই প্রয়োজন। মশারা তো বড্ড বেরসিক। দৃশ্যটা কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হয়নি: মাথায় ঘোমটা টেনে ফুলশয্যায় বসে আছে নববধূ। আর দেবা ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটছে মশার পেছনে। দেবার বাসরঘরে বঙ্গবন্ধুর তর্জনী উঁচিয়ে থাকা একটা পোস্টারও দেখে এসেছিলাম। সেই পোস্টারে বড় হরফে লেখা বাক্যটা বড় সার্থক মনে হলো: রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব! সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

343) হায় হায়! বইমেলা শেষ। এখন কী হবে?

বইমেলা শেষ হয়ে গেছে। শেষ মানে শেষ। একেবারে লগ-আউট। আগামী বছরের আগে আর বইমেলা হবে না। খুবই আফসোসের ব্যাপার। প্রতিবছর বাণিজ্য মেলা নির্ধারিত সময়ের পর আরও সাত দিন বাড়ানো হয়। অথচ বইমেলার মতো মেলার মেয়াদ আজ পর্যন্ত বাড়ানো হয়নি। এর কোনো মানে আছে? এমনিতেই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফেব্রুয়ারি মাসে দু-একটা দিন কম থাকে। তার পরও মেলা না বাড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। ভাবটা এমন যে যত ঝড়-ঝাপটা আসুক, ফেব্রুয়ারিতেই মেলা শেষ করতে হবে! তবে মেলা শেষ হয়ে গেলেও রয়ে গেছে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। ভক্তদের অটোগ্রাফ দিতে দিতে কোনো কোনো লেখকের এমন অবস্থা হয়েছে যে তাঁরা এখন ঘুমের মধ্যেও অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। শুধু কি ঘুম, অনেকে তো ভুল করে ব্যাংকের ফাঁকা চেকেও অটোগ্রাফ

দিয়ে বসে আছেন। পদার্থবিজ্ঞানের গতিজড়তার সূত্রের প্রভাবে তারা বাসায় বসে সাদা কাগজে অটোগ্রাফ দিয়েই যাচ্ছেন। কবে থামবে বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই বইমেলায় এসেছেন এমন কিছু ভুলোমনা কবি বিকেলের দিকে মেলায় এসে তাঁদের বইয়ের স্টল না পেয়ে প্রকাশ করছেন তীব্র ক্ষোভ; স্টলের জায়গায় এখন বিরাজ করছে সীমাহীন শূন্যতা। এই শূন্যতা দেখে অনেকে আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছেন কবিতা লিখতে। এখন তাঁরা এই বিকেলের সময়টা কোথায় কাটাবেন?

প্রকাশকদের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। বিক্রি না হওয়া বই নিয়ে তাঁরা এখন কী করবেন তা-ই ভেবে পাচ্ছেন না। বসে বসে মাছি মারার জন্য অনেকে ইলেকট্রিক ব্যাট কিনে ফেলেছেন। মেলার বাইরে ঘুরঘুর করা ফেরিওয়ালা সমপ্রদায়ও একেবারে বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের এত দিনের নিশ্চিত কাস্টমার হারিয়ে টিএসসি এলাকায় ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়। তারা হাওয়া খাওয়ার জায়গা হিসেবে এত দিন বইমেলাকে ব্যবহার করলেও এখন তারা কোথায় যাবে? আর মেলার নিরাপত্তারক্ষীদের তো পুরো মাথায় হাত। মেলা শেষ—এই চরম সত্যটা তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। সব মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা। অথচ মেলা কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কিছুই ভাবছে না। কোন প্রকাশনী কত টাকার বই আর কত টাকার ক্যাটালগ শেষ করেছে, তা নিয়েই তাদের মাথাব্যথা। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? বইমেলা সূত্রে এত দিন যে মানুষগুলো ব্যস্ত ছিল তাদের কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা কি করছে বাংলা একাডেমী? তাই বই-ক্যাটালগের হিসাব বাদ। কর্তৃপক্ষকে এখন থেকেই এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০১, ২০১০

344) নারী দি-বস

সম-অধিকার, সমান সুযোগ: সকলের উন্নতি নারী দি-বসদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রধান হলেন দুজন মহীয়সী নারী। তাঁরা পালাক্রমে সরকারি ও বিরোধী দলে অবস্থান করেন। ভাবতে ভালোই লাগে। বর্তমানে দেশের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নারী। অনেকে বলতে পারেন তাহলে এ দেশে নারী দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা কী? আছে, জনাব আছে। কারণ আমাদের চারপাশে এমন অনেক আধুনিক পুরুষ আছেন যারা নিজেদেরই নারী ভেবে নিশ্চিন্তে বাসের মহিলা সিটে গিয়ে বসে থাকেন। প্রকৃত নারীরা এলেও তারা সিট ছেড়ে উঠতে চায় না। (প্রথম আলোর বদলে যাও, বদলে দাও বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য) ভাবটা এমন, তাঁরাই প্রকৃত নারী, তাঁদের ‘আপা’ বা ‘ম্যাডাম’ সম্বোধন না করলে তাঁরা ভীষণ মাইন্ড করবেন! মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাঁদের সিটের সঙ্গে এমনভাবে আটকে রাখে যে তাঁরা উঠতেই পারেন না! নারীদের এমন মর্যাদা আর কোথাও দেয় কি না কে জানে। দেশের মানুষ আজ এসিডকে বিজ্ঞানচর্চার উপকরণ হিসেবে না নিয়ে ছুড়ছে নারীদের ওপর। অথচ এই পুরুষকেই স্নেহ, মায়া মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছে নারী। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা শিকার হচ্ছে কেবল নারী। সারা দিন নারী দিবসের সভা-সেমিনার করে বাসায় গিয়ে তরকারিতে লবণ কম কেন এই অজুহাতে স্ত্রীকে প্রহার করা পুরুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় এ দেশে। মননে আর মানসিকতায় এমন লোকেই আজ ভরে উঠছে দেশ। যত দ্রুত পুরুষদের এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে তত দ্রুতই আমরা একে অপরকে সহায়তা করে এগিয়ে যাব উন্নতির দিকে। ‘পিটিয়ে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।’ কূটতর্ক করতে গিয়ে অনেকে এ নিয়ে যুক্তি দেখায়, আরে দেশে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হইব, তাইলে শুধু বাপের নাম ভোলালে হবে? মায়েরও তো নাম আছে। ওটাও তো ভোলাতে হবে, নাকি!

আমরা যাতে এমন বাজে তর্কে মেতে না উঠি। আজ যে আপনি নিজেকে ‘মানুষ’ বলে দাবি করছেন তার পেছনের অবদানকে স্বীকার করতে চাইলে আমাদের সবাইকে বলতেই হবে, নারী দি—বস!

345) ক্যাডেট কলেজ রঙ্গ - মার্চ ০৮, ২০১০

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী মানে দীর্ঘ ছয় বছর একেকজন ক্যাডেটকে কাটাতে হয় তাদের কলেজ ক্যাম্পাসে। এ সময় ঘটে নানা মজার

ঘটনা। তার কিছু এখানে শেয়ার করেছেন
কয়েকজন সাবেক ক্যাডেট। লেখাগুলো ক্যাডেট
কলেজ ব্লগের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সেবার আমাদের
ক্যাডেট কলেজের খোলা জায়গায় বাঁধাকপি
লাগানো হলো। হয়েছিল বাম্পার ফলন।

যেদিকে তাকাই খালি বাঁধাকপি আর বাঁধাকপি।
দেখলে চম্ফু জুড়ায় না, আতঙ্কে বুক কাঁপে। কে
খাইব এত বাঁধাকপি।

আতঙ্ক যে সঠিক, দ্রুতই তার প্রমাণ পাওয়া
গেল। সকালে আমাদের দেওয়া হতো তিন দিন
পাউরুটি আর তিন দিন পরোটা। আমরা
দেখলাম, পরোটার সঙ্গে বাঁধাকপি ভাজি। আর
যেদিন পাউরুটি সেদিন বাঁধাকপি সেদ্ধ, ওপরে
গোলমরিচ দেওয়া। ১০টায় ছিল টিফিন ব্রেক।
মানে হলো এক কাপ দুধ আর সঙ্গে শিঙাড়া,
গজা বা এ জাতীয় কিছু। নতুন যুক্ত হলো
বাঁধাকপি সেদ্ধ। দুপুরে ভাতের সঙ্গে বাঁধাকপি
ভাজি, মাংস থাকলে সেটাও বাঁধাকপি দিয়ে
রান্না করা। এমনকি একদিন অবাক-বিস্ময়ে
দেখলাম, ডালের মধ্যেও বাঁধাকপি। রাতের
খাবারেও একই মেন্যু। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে
হয়েছে খেতে যত দিন বাঁধাকপি ছিল, তত
দিন।

সেই যে আমি বাঁধাকপি খাওয়া ছেড়েছি আজ
পর্যন্ত আর খাইনি। এখনো বাঁধাকপি দেখলে
আমার অসহ্য লাগে। আমি খাই না।

শওকত হোসেন, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ
[১৯৭৯-৮৫] একদিন হঠাত্ ক্লাস টাইমের
নৈঃশব্দ খান খান করে ভেঙে পড়ল করিডোরে
পদার্থ স্যারের চিৎকার আর হ্যান্ডস ডাউনরত
কারও একজনের পশ্চাদ্দেশে ঠাশ ঠাশ করে
ডাস্টারের বাড়ির শব্দে। কী হলো? কী হলো?
ঘটনা আর কিছুই নয়, অপরাধী আইনস্টাইনের
সূত্র ভুল প্রমাণ করার মতো বিশাল কাজ করে
পান্থিক পরীক্ষার মতো একটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে
ফেল করেছে। ক্যাডেটদের ওপর মাঝেমধ্যে
ইংরেজিতে কথা বলার বাধ্যবাধকতা খুব করে
চেপে বসত। আর ছোট ক্লাসের ক্যাডেটদের
জন্য সব বাংলা শব্দের ইংরেজি খুঁজে পাওয়াও
এক মহাকষ্টকর ব্যাপার। কেন মারামারি
করেছে, ক্লাস সেভেনের দুজনকে এই প্রশ্ন
জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর এল এ রকম, ‘স্যার,
অ্যাট ফাস্ট হি কিলড (পিঠের ওপর কিল) মি

দেন আই কিলড হিম।’ আমাদের একজন
অপ্রাসঙ্গিক স্টাফ ছিলেন। তার অপ্রাসঙ্গিকতার
নমুনা শুনুন,
ম্যাট্রিক পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আমাদের
এক বন্ধু তার কাছে—
: স্টাফ, দোয়া কইরেন।

: আরে, ভয়ের কী আছে? গতকাল যে চিটাগাং
থেকে বরিশাল আসলাম, আমি কি ভয় পাইছি?
আহমেদ রায়হান

বরিশাল ক্যাডেট কলেজ [১৯৯৯-

২০০৫] ইংরেজির এক স্যার একদিন খুব রেগে
গেলেন। আমার ক্লাসমেট শাহরিয়ার গান
গাইতে গাইতে গোসল করছিল, হাউস অফিসের
সবচেয়ে কাছের বাথরুমটিতে। স্যার ছিলেন
ডিউটি মাস্টার। হঠাত্‌ শুনলেন, বাথরুমে কে
যেন জোরে জোরে গান গাইছে। ‘পিয়া তু আব
তো আ যা... মনিকা ও মাই ডারলিং... মনিকা ও
মাই ডারলিং।’ স্যার দাঁড়িয়ে থাকলেন, বাথরুম
থেকে কে বের হয় দেখার জন্য। শাহরিয়ার
বের হলো। তোয়ালে পরা অবস্থায় হাউস
অফিসের সামনে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে
রাখলেন অনেকক্ষণ।

স্যারের কী দোষ, স্যার তো আর জানতেন না
সিনেমায় নায়িকার নামই মনিকা।

শাহরিয়ারেরই বা কী দোষ। ও তো আর জানত
না স্যারের মেয়ের নাম মনিকা।

কামরুল হাসান, সিলেট ক্যাডেট কলেজ

[১৯৯৪-২০০০] চারুকলার স্যার যখন প্রথম

আমাদের কলেজে জয়েন করেন, তখন তিনি

বেশ গাড়াগোড়া, ছোটখাটো টাইপের মানুষ।

হঠাত্‌ দেখলে তাঁকে স্যার বলে মনে হতো না।

কেমন ক্লাস টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভ মনে হতো।

স্যার ছিলেন তিতুমীর হাউসের সঙ্গে এটাচড

এবং গণহারে সবাইকে তুই করে বলতেন।

সেবার ইন্টার হাউস ফুটবলের আগে আমাদের

অন্টারনেটিভ জুনিয়র ব্যাচের একজন (ওরা

তখন মাত্র কলেজে এসেছে, ক্লাস সেভেন) তার

গাইডকে জিজ্ঞেস করল,

—ভাইয়া, আমি যদি হাউস টিমে ফুটবল খেলতে
চাই, তাইলে কী করতে হবে?

—ওই যে কোনায় হাউস প্রিফেক্টের রুম আছে।

তার কাছে গিয়া বলবা, ভাইয়া, আমি ফুটবল

ভালো খেলি, হাউস টিমে খেলতে চাই।

—ভাইয়া, আমি তো হাউস প্রিফেক্টকে চিনি না।

—আরে, দেখবা একটু ছোটখাটো, মোটাসোটা একজন ভাইয়া আছেন। তিনিই হাউস প্রিফেক্ট। তাঁকে বললেই হবে।

সে জুনিয়র হাউস প্রিফেক্টের রুমের সামনে গেল। ঘটনাক্রমে ওইখানে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন চারুকলার স্যার। সাইজ দেখে সে ভাবল, এটাই হাউস প্রিফেক্ট।

—স্লামালিকুম, ভাইয়া।

—কী? স্যার আঁতকে উঠলেন, তাঁকে কেউ ভাইয়া বলছে এটা শুনে।

—ভাইয়া, আমি খুব ভালো ফুটবল খেলি। হাউস টিমে জুনিয়র গ্রুপে খেলতে চাই।

—এই, তুই হ্যান্ডস ডাউন হ। ব্যান্ড হ। ব্যান্ড হ বলতেছি। স্যারের রাগ তখন দেখে কে।

আচমকা এ রকম আক্রমণে ওই জুনিয়রও দিশেহারা হয়ে গেল। সে হ্যান্ডস ডাউন হলো এবং কিছু না বুঝে বলল,

—সরি, ভাইয়া।

—আবার ভাইয়া বলে...

এবার ওই জুনিয়র ভাবল, হাউস প্রিফেক্টদের বোধ হয় ভাইয়া বলার নিয়ম নেই। সে অন্যভাবে ট্রাই করল।

—সরি, প্রিফেক্ট। আমার ভুল হয়ে গেছে প্রিফেক্ট। আমি আসলে হাউস টিমে খেলতে চাই, এটা বলতে এসেছিলাম।

—কী কইলি তুই? আমি প্রিফেক্ট। দাঁড়া... এই বাবুলাল বেত বের কর।

বাবুলাল আমাদের হাউস বেয়ারার নাম।

এরপর ওই বেচারার কী হয়েছিল আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। হাউস টিমে খেলার শখ তার সেই দিনই চলে গিয়েছিল।

কামরুল হাসান

সিলেট ক্যাডেট কলেজ [১৯৯৪-২০০০] সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৮, ২০১০

346) বাজার

মাসের প্রথম শুক্রবার ভয়ের মধ্যে থাকি। এদিন বাজারে যেতে হয়। ১৫ দিনের কেনাকাটা করি। বলাবাহুল্য পুরো কেনাকাটাই হয় অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। পরবর্তী দুই সপ্তাহ সেসব ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা শুনি। স্ত্রী অভিযোগ করে, যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ছুটা বুয়া দারোয়ানদের সঙ্গে ঠাটা করে। বলে, বেকুব

সাহেব। আমি অধিকাংশ সময় নীরব থাকি। মনে মনে শুধু বলি, আমি নির্দোষ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে দোষী কে? আমি জানি, আসলে দোষী কে? কিন্তু বিপদ হলো, জানা সত্ত্বেও এই দোষীদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। কেউ কিছু করতে পারে না। এরা যখন-তখন পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। ওজনে কম দেয়। ভেজাল জিনিস দিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। সরকারও এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

কিন্তু আমাকে পারতে হবে। এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। সে প্রশ্নের সমাধানের জন্য শুক্রবার আমি বাজারে এলাম।

কিছুদিন আগেও গরুর মাংসের কেজি ছিল ১৬০ টাকা। এখন তা ২৪০ টাকা। এক কেজি গরুর মাংসের টুকরা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ করলে ১৬ পিস করা যায়। অর্থাৎ প্রতি পিসের দাম পড়ে পনের টাকা। কসাইরা ওজনে সব সময়ই ঘাপলা করে। দুই পিস পরিমাণ মাংস কম দিলে ৩০ টাকা গচ্ছা। উপরন্তু ভালো মাংসের সঙ্গে কৌশলে গলার মাংস, পর্দা এবং হাড়ি মিশিয়ে দেয়।

মাংসের দোকানদার কম বয়সী। সম্প্রতি বিয়ে করেছে। আমার বিশেষ পরিচিত। পরিচিতির কারণে অতি মহব্বত করে আমার সঙ্গে এই অপকর্মটি করে। একাধিকবার বাইরে ওজন দিয়ে আমাদের বুয়া সেই প্রমাণ পেয়েছে। দোকানিকে বললে সে কিরা-কসম কাটে, অস্বীকার করে। আজ জিজ্ঞাসা করলাম তোমার পালা—পাথর ঠিক আছে?

বলল, এক কাচ্চা কম-ব্যাশ নেই। থাকলে জুতার বাড়ি। নিজে ওজন দিয়া নেবেন। সে এক কেজি মাংস দিল। ১৭ পিস।

আরেকজন মাংস নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল। বলল, ওজন ঠিক নেই। কম আছে। মাংসে চর্বি ভর্তি। আমি মাংসের দাম দিয়েছি। যাওয়ার আগে সবার সামনে হাত তুলে কসাইয়ের জন্য দোয়া করলাম। আল্লাহ, এই দিলু কসাই সম্প্রতি বিয়ে করেছে। সে যদি আমাকে ওজনে কম না দিয়ে থাকে, ঠিক জিনিস দিয়ে থাকে, তুমি তাদের সংসারকে সুখের সংসার করে দিয়ো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম বাড়িয়ে দিয়ো। আর যদি বাটপারি করে, ওজনে কম দিয়ে থাকে, খারাপ মাংস মিশিয়ে দিয়ে থাকে, তুমি তাকে নতুন

বউয়ের হাতে মার খাওয়ার ব্যবস্থা করো। তুমি সব বিষয় জানো, মাবুদ! আমিন।

লোকজন আমার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। দিলু কসাই বলল, স্যার খাড়ান। সে গরুর ঝুলন্ত রান থেকে এক চাকা মাংস কেটে আমার ব্যাগে ভরে দিল। ১০০ গ্রামের কম হবে না।

তুমি না বললে ওজন ঠিক আছে? আবার মাংস দিচ্ছ কেন?

ঠিকই আছে। কিন্তু সকালে তো মাংসের মধ্যে পানি থাকে, আপনে যেই দোয়া করছেন, যদি ওজনে আবার কম হয়! নতুন বউয়ের মার খাব।

আমার হাতিয়ার প্রথম ধাক্কায় সফল।

চলে এলাম কাঁচাবাজারে। মাছ কিনব। তার আগে সবজির খোঁজ নিলাম। সবাইকে বললাম, মাছটা কিনে তারপর সবজি নেব। বাজারের কয়েক মাছওয়ালা আমার পরিচিত। দেখলে সম্মান করে। কিন্তু মাছ দিয়ে সেই ইজ্জতটা নাশ করে দেয়।

নদীর পাঙাশের দাম রেখে চাষের পাঙাশ গছিয়ে দেয়। পদ্মার ইলিশ বলে বরিশাল-চিটাগাংয়ের ইলিশ দিয়েছে বহুদিন। নিজেরাই আবার স্বীকার করে। বলে অমুক দিন নষ্ট মাছ দিলাম বোঝেনও নাই, আজকে ভালো মাছ দিতাছি— বিশ্বাস করেন না। এরেই বলে বাঙালি।

মোটামুটি সব মাছের মধ্যেই ভেজাল। দাগি মাছের অভাব নেই। ফরমালিন মেশানো।

কয়েক দিনেও মাছ পচবে না। বাংলাদেশে মাছের বাজার বড় কর্দমাক্ত, নোংরা। ইউরোপের অন্যতম বড় মাছের বাজার স্পেনের বিলবাওতে। সেটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিশাল বাজার। হাজার হাজার কেজি টাটকা মাছ সারাক্ষণ আসছে, বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বাজারে কোনো কাদা নেই, ময়লা নেই।

মাছের দোকানিরা আমাকে ডাকাডাকি করছে, স্যার আসেন। ভালো মাছ আছে, বড় মাছ আছে। আসেন। আমি মাঝের সুলেমানের দোকানে দাঁড়িলাম। বড় দোকান। থালায় রুই-কাতল-বোয়াল এবং আইডু মাছ সাজানো।

আমি রুই মাছ নেব। দোকানি বলল, নিয়া যান। ২৬০ টাকা কেজি। খাইলে সারা বছর মনে থাকবে। আমি বললাম, দাম তো অনেক বেশি

চাচ্ছেন। এখন তো বড় মাছের দাম কম। ছোট মাছের দাম বেশি। বার্মিজ আর চাইনিজ মাছের দাম কম। ১৫০ টাকা কেজি। ওগুলো খাইলে মাটির মতো স্বাদ পাইবেন। হাই ফরমালিন দেওয়া, বিষাক্ত। ১৫০ টাকা মাছের লগে বোনাস পাইবেন আলসার আর ক্যানসার। আপনার মাছ কোথাকার? অরজিনাল ভৈরবের মাছ, চাষও না। গাঙ্গের থিকা ধরা মাছ। মাছের কানকা দেইখা দাম দিবেন। খারাপ হইলে খাইয়া আইসা পরের দিন ট্যাকা ফেরত নিয়া যাবেন। সে মাছের কানকো দেখাচ্ছে। কানকো লাল।

আপনারা তো বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু কথা আর কাজে মিল নেই।

মিছকুরের কারবার (মিথ্যা কথার) সুলেমান করে না। যা বলব সলিড বলব। কথা সলিড! মাল সলিড! আমার বার্গেনিং এবং কথোপকথনে আশপাশে কাস্টমার জমে গেছে, কথা শুনছে। সবাই কমবেশি দোকানদারদের ঠকবাজি কিংবা ছলনার শিকার। কিন্তু প্রতিবাদের কোনো উপায় নেই। কেউ পাত্তা দেয় না। ২৪০ টাকা দরে চার কেজি ওজনের একটা রুই নিলাম। ফলাফল খাওয়ার পরে কাল বুঝব। মাছওয়ালা মধ্যবয়সী। টাকা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কয়জন? দুই ছেলে। মজা করে বলল, স্ত্রী একজন। জানাল, তার দুই ছেলেই কলেজে পড়ে।

আমি প্রকাশ্যে ভরা বাজারে হাত তুলে তার জন্য দোয়া শুরু করলাম, হায় আল্লাহ—এই মাছওয়ালা সত্য কথা বলে আমাকে ভালো মাছ দিয়ে থাকলে তুমি তার ছেলেদের উচ্চশিক্ষিত করো। ভালো মানুষ বানিয়ে দিয়ো। আর যদি কোনো মিথ্যা বলে থাকে, আমাকে ঠকিয়ে থাকে, খারাপ জিনিস দিয়ে থাকে বা ওজনে কম দিয়ে থাকে, তুমি তার ছেলেদের সন্ত্রাসী-নেশাখোর-খারাপ সন্তান বানিয়ে দিয়ো, যেন বাবার হারাম টাকা উড়িয়ে ফেলে। বরবাদ করে। সুম্মা আমিন।

দোয়া করে আমি সবজির দোকানে চলে এলাম। মাথার দিকে আঘাত করলে নিচের দিক এমনিই ঠিক হয়ে যায়। সারা বাজারে শোরগোল পড়ে গেছে। মাছের দোকানের ঘটনা অন্যদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সুফল পেলাম সবজি কিনতে গিয়ে। সবাই বাছাই করে ভালো

জিনিসটা আমাকে দিচ্ছে। ওজনে বাড়তি দিচ্ছে।
যেন কম না হয়, কোনো ঝগড়াঝাটি কলহ-
বিবাদ ছাড়া দোয়া-থেরাপি ভালো কাজ করছে।
আমি বাজার কম্পাউন্ড ছেড়ে নিচে নেমে
এলাম। রিকশায় উঠব। হঠাৎ ইগল পাখির
মতো ছোঁ মেরে একজন আমার মাছের ব্যাগটা
নিয়ে নিল। তাকিয়ে দেখি, মাছওয়ালা স্বয়ং। সে
কোনো কথা না বলে আমার হাতের মুঠোয়
টাকা গুঁজে দিল। বলল, স্যার আরেক দিন
ভালো মাছ নিয়েন। মাছটা ভৈরবের না। সে
দ্রুত চলে গেল। সত্যি সত্যি বাংলাদেশে দোয়াই
এখন মুমিনের হাতিয়ার। আবু সুফিয়ান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৮, ২০১০

347) একটি পুরুষ দিবসের আকাল ইতিহাসের আলোকে

নারীর সঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়েরই জন্মসূত্রে
নাড়ির যোগ। নাড়ির টানে বিশ্ব মা দিবস, বিশ্ব
নারী দিবসে দুনিয়া জোড়া কত শত ঘটার
বাহার। মাতৃদুগ্ধ দিবস, শিশু দিবস, টিকা দিবস
এগুলোও ঘুরেফিরে নারীর কোলঘেঁষা। সব
মিলিয়ে গোণায় ধরলে নারীর জন্য বছরজুড়ে
নামে-বেনামে হাজারে-বিজারে দিবসের
ছড়াছড়ি। অথচ দুনিয়ার ওপর একটি পুরুষ
দিবসের বড্ড আকাল। গত শতকের ষাটের
দশক থেকে একটি পুরুষ দিবস বরাদ্দের দাবি
‘আর কটা দিন সবুর কর’ ছুতায় আজও ঝুলে
আছে। হাজারটা দেন-দরবার মিছিল-মিটিং
শেষে বছরের ৩৬৫ দিন থেকে পুরুষ একটা
মাত্র দিবস তাদের কপালে এখনো জোটাতে
পারল না। পুরুষের এমন ব্যর্থতার গ্লানির কথা
মুখ বুজে হজম করা এখন সত্যি কঠিন। আবার
কার্যকারণ খতিয়ে না দেখে একটি দিবস
আদায়ের ব্যর্থতার দায় পুরুষের ওপর
একতরফা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক সততার পরিচয়
নয়। বরং সততার সঙ্গে ইতিহাসের পরতে
পরতে এ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করাই
ন্যায়সংগত।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী পুরুষ দিবস আদায়ের
ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সৃষ্টির
গোড়ায় এক গুরুতর গলদ। সৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত
দেবতাদের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনাসৃষ্টির শেষ
নেই। বিশ্বে একটি পুরুষ দিবসের অনুপস্থিতির
জন্য আসলে পাশ্চাত্যের দেবতা জিউস দায়ী।

দেবতা জিউস একসময় স্বর্গের জীবনে
বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে ভুগছিল। একঘেয়েমি
কাটানোর জন্য একদিন সে মাটির ঢেলা নিয়ে
খেলতে খেলতে দেবীদের খুব কাছাকাছি
গড়নের একটি প্রাণী সৃষ্টি করে তার নাম দিল
মানবী। মাথা ভরা বুদ্ধি আর গা ভরা রূপ ঢেলে
দিয়ে জিউস মানবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্বর্গের
বাগানে ছেড়ে দিয়ে নিজের রাজ্যপাট নিয়ে
আবার মেতে উঠল। মহাবিশ্বের হাজারো
ঝামেলায় জিউস একসময় মানবীর কথা ভুলেও
গেল। মানবীও রইল স্বর্গের বাগানে দিব্যি
নিজের মনে একা একা।

এর মধ্যে মিলিয়ন বছর পেরিয়ে গেছে। স্বর্গের
বাগানে এমন নিঃসীম নির্জনতায় মানবীর সময়
আর কাটে না। দিনভর অলস বেলায় হাই তুলে
তুলে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে মানবী ক্লান্ত-বিষণ্ন।
একদিন বাগানের নিঃসঙ্গ নিরালা কোণে বসে
মানবী ক্লান্ত গলায় জিউসকে ডেকে বলে, ওগো
জিউস, চারপাশের নিঃশব্দ নির্জনতায় আমার
বড় একা লাগে। এখন আমার দিন কাটে তো
রাত কাটে না। তুমি একটা কিছু বিহিত করো
গো জিউস।

সৃষ্টির হরেক ঝকমারিতে ব্যস্ত জিউস মানবীর
ডাক শুনেও না শোনার ভান করে। কিন্তু নারী
নাছোড়বান্দা। দিনে দিনে সেও গলা চড়ায়।
ক্ষণে-বিক্ষণে সে জিউসকে হেঁকে ডেকে জানান
দিয়ে বলে, এত নির্জনতার ভার আর তো সয়
না। বড় বেশি একা একা লাগে। একটা কিছু
উপায় করো জিউস।

নারীর ডাকাডাকিতে ত্যক্ত অকুলান জিউস
হাতের হাজারটা কাজ ফেলে স্বর্গের বাগানে
এসে বলে, নারী, তোমার সমস্যা কী? স্বর্গের
বাগানে এত অটেল থাকতে দিনভর এমন
হাপিত্যেণ করে মরছ কেন?

জবাবে নারীর সেই পুরোনো গঁত,—বড্ড একা
লাগে। এত একাকিত্ব কাঁহাতক জানে সয়!

খানিক চুপচাপ থেকে জিউস নারীর সমস্যা হৃদয়
দিয়ে বোঝে। বলে, শোনো হে নারী। আমার
বড় তাড়া। আমি তোমাকে বেশি সময় দিতে
পারব না। বরং তোমার আদলে তোমার
কাছাকাছি গড়নের একটি প্রাণী গড়ে তোমাকে
দোকলা করে দিচ্ছি। তার সঙ্গে তুমি হেসে-
কেঁদে খুনসুটি করবে—দেখবে সারাজীবন সে

তোমার পায়ে পায়ে ফিরবে।

সুখের কথা শেষ না করেই জিউস তড়িঘড়ি খানিক কাদামাটি ছানতে নেমে পড়ে। বিগব্যাঙ হয়ে মহাবিশ্বের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় জিউসের হাতে আগের মতো অটেল সময় নেই। হাতের হাজারটা কাজ ফেলে নারীর শখ মেটাতে জিউসের সাত-তাড়াতাড়ি এই বাগানে আসা। নারীর সঙ্গে হাসি-মশকরার ফাঁকে খানিক যত্ন, খানিক রগড় মিশিয়ে জিউস বড়সড় গড়নের একটা দোপেয়ে প্রাণী দাঁড় করিয়ে ফেলে।

হাতের কাজ শেষে নারীকে ডেকে বলে, শোনো গো নারী, নতুন গড়া এই দোপেয়ে মূর্তির নাম দিলাম ‘পুরুষ’। ওর মধ্যে প্রাণ ঢেলে জ্যান্ত করে তোলার আগে তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে রাখি। তুমি বুদ্ধিমতী। বিষয়টি তুমি বুঝবে ও জন্ম-জন্মান্তরে মনে রাখবে। তোমাকে সযত্নে গড়তে গিয়ে আমার বুদ্ধির ভাণ্ডে এখন ছুঁচোর কেতন। পাত্রে এক ফোঁটা বুদ্ধি আর অবশিষ্ট নেই। অথচ এমন বড়সড় গড়নের প্রাণীটার মাথা একেবারে ফাঁপা শূন্য রাখা ঠিক হবে না। মাথাটা ফাঁপা, হালকা থাকলেও যখন-তখন ঢলে গড়িয়ে তোমার গায়ের ওপর পড়ে যাবে। কাজেই ওর মাথাটা আমি বেশ খানিক নিরেট হামবড়ামি ঠেসে ভরে দিলাম। প্রাণ পাওয়ার পরে ও যখন পিটপিট করে চোখ মেলবে, তখন তুমি ওকে বুদ্ধি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলবে, জিউস পুরুষকে আগে সৃষ্টি করেছে। পরে পুরুষের আদলে সৃষ্টি করেছে নারী। ও তোমার কথা শুনবে। দেখবে এই এককথায় কেব্লাফতে। এই ফাঁপা মাথার দোপেয়েটা ওর মেল শোভেনিজম অর্থাৎ সরল বাংলায় যাকে বলে ‘ব্যাটাগিরি’ সেটা নিয়ে ও মত্ত থাক। তুমি তোমার চিকনবুদ্ধি দিয়ে দুনিয়াদারির কলকাঠি চিরকাল ইচ্ছেমতো নাড়তে থাক।

পরের ঘটনা দিনের আলোর মতো একেবারে স্পষ্ট—সবারই জানা। মিলিয়ন বছর ধরে হাপিত্যেশ করে পুরুষ আজও একটি পুরুষ দিবস বাগাতে পারল না। ব্যর্থতার দায় পুরুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নাহক-অন্যায়। আহা রে! বেচারার মাথায় যে বুদ্ধি নেই। তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৮, ২০১০

348) বেগম রোকেয়া - বাছাইকৃত কৌতুক-কণা

প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে হিপোপটেমাস জন্তুর বিষয় বুঝাইবার সময় বলিলেন, ‘হিপোপটেমাস কেমন কুৎসিত জন্তু তাহা যদি ভালো মতো বুঝিতে চাও, তবে আমার মুখের দিকে তাকাও।’ এক আফিংচি ছেলে কোলে লইয়া মেলায় গিয়াছিল; অনেকক্ষণ নানা দৃশ্য দেখার পর তাহার মনে হইল ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বেচারী ছেলে খুঁজিয়া হয়রান। শেষে থানায় সংবাদ দিয়া বাড়ি ফিরিল। ঘরে প্রবেশের সময় কপাটের আঘাত লাগায় তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ছেলের গালে চড় মারিয়া বলিল—‘কমবখত! আগে কাঁদিসনি কেন? তাহলে আমার এত হয়রান হয়ে থানায় খবর দিতে হতো না।’ হরিশবাবু চাকরের হাতে একটা চিঠি আর পাঁচটা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, সে যেন টিকিট কিনিয়া চিঠিতে আঁটিয়া চিঠিখানা ডাকে দেয়। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাসিমুখে পয়সা ফেরত দিয়া বলিল,—‘নিম্ন আপনার পয়সা। যেই দেখলুম ডাকবাবু মাথা নিচু করে লেখাপড়া করছেন, আমি অমনি চুপি চুপি চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলেই, দিয়েছি দৌড়। দেখুন তো কী বুদ্ধি করে বিনি পয়সায় আপনার চিঠি ডাকে দিয়ে এলুম, তবু আপনি আমায় বোকা বলেন!’ পাদ্রী সাহেব মিশন স্কুলের ছাত্রদিগকে পাঠ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভবিষ্যতে তোমরা কে কী হতে চাও?’ জনৈক ছাত্র বলিল, ‘আমি কৃষক হব।’ পাদ্রী সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ‘বেশ ভালো কথা। তুমি মানবের ক্ষুধা নিবারণের উপায় করবে। লোকের পরম উপকার করবে।’

অপর একজন বলিল,—‘আমি শিক্ষক হব।’ পাদ্রী সাহেব পূর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, —‘এ তো আরও ভালো, তুমি মানবের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করবে। শারীরিক খাদ্যের চেয়ে মানসিক খাদ্যের মূল্য বেশি।’

তৃতীয় ছাত্র বলিল,—‘আমি পাদ্রী হব।’ এবার পাদ্রী সাহেব আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—‘বেশ বেশ, তুমি মানবের পরিত্রাণের কারণ হবে। শারীরিক ও মানসিক খাদ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক খাদ্য আরও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা বাপু! বলো তো তুমি কেন পাদ্রী

হতে চাও?’।

ছাত্র বলিল,—‘আমরা গরিব বলে মাংস খেতে পাই না! কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি যে দিন যান, সে দিনই আমার মা মুরগি রেঁধে আপনাকে খাওয়ান।’ একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভূগোল পড়াইবার সময় দিক নির্ণয় বুঝাইতেছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ‘দেখো, তোমার বাম হাত দক্ষিণ দিকে, ডান হাত উত্তরে, মুখ পশ্চিম দিকে, এখন বলো তো তোমার পশ্চাতে কী আছে?’ সে উত্তর দিল, — ‘স্কুলে আসবার সময় মা আমার ছেঁড়া পাতুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই আছে।’ দুইটি ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। তাহাদের একজন বরের মা এবং একজন কনের মা সাজিয়াছিল। বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার সময় মোল্লাজি বরের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বরের মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইল যে, বলো উহার মায়ের এখনো বিবাহ হয় নাই। বেগম রোকেয়া: বেগম রোকেয়া বা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নামে তিনি বহুল পরিচিত হলেও লিখতেন ‘মিসেস আর এস হোসেন’ নামে, এই নামে তাঁর বইগুলোও বেরিয়েছিল। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃত। তাঁর জন্ম ১৮৮০, মৃত্যু: ১৯৩২। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মতিচূর, পদ্মরাগ, সুলতানাস ড্রিম। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৮, ২০১০

349) তারকা রস - মার্চ ০৮, ২০১০

☆ জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান ‘রিয়েল হাউসওয়াইভস’-এ কিম জোলকিয়াকের অভিনয় দেখে দর্শক ধরে নিয়েছিল, বাস্তবেও তিনি সমঝদার একজন গৃহিণী। কিন্তু সম্প্রতি কিমকে তাঁর জীবনসঙ্গীর বাহুডোরে দেখে দর্শক তো যারপরনাই হতাশ। কারণ, কিম যাঁর বাহুডোরে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি কোনো পুরুষ নন, একজন তরুণী।

☆ মাত্রাতিরিক্ত ধূমপানের কারণে অনেকে তাঁকে অপছন্দ করত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেই রবি উইলিয়ামসের হাতে সিগারেট নেই, চুইংগাম চিবোচ্ছেন। কারণ কী জানতে চাইলে মুচকি হেসে বললেন, ‘হবু বউয়ের কাছে এমন ধাতানি খেয়েছি...।’ এটুকু বলেই চুপটি মেরে গেলেন রবি। পরে জানা গেল, দিনকয়েক

আগে সিগারেটের আগুনে বান্ধবীর চুল পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

☆ গায়িকা লেডি গাগার ছন্নছাড়া জীবন ও প্রেম নিয়ে বহু কাহিনি চালু আছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে ভোল পাণ্টে একেবারে সাচ্চা আদমি বনে গেলেন গাগা। তরুণীরা, তোমরা উন্মাতাল প্রেমে গা ভাসিয়ো না, সংযত হও। যার সঙ্গে প্রেম করো, ওই মানুষটাকে আগে ভালো করে জানতে শেখো। দর্শক একটু নড়েচড়ে বসল। এ তো দেখছি ভূতের মুখে রামনাম! পরে জানা গেল, এক প্রতিষ্ঠানের হয়ে এইডসবিরোধী প্রচারণায় নেমেছেন

তিনি। ভাষান্তর: আবুল হাসনাত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৮, ২০১০

350) জার্নি বাই সিএনজি ২০১০

মহাখালী যাব। কোনো সিএনজি যেতে চাইছে না। আগে সিএনজির দুই পাশ খোলা ছিল। লাফ দিয়ে উঠে পড়তাম। এরপর চালকের সঙ্গে বাতচিৎ হতো। এখন সেটা সম্ভব না। গাড়ির দুই দিকেই দরজা আটকানো। তাঁরা ‘যাবে না’ বলেই গাড়ি নিয়ে টান দেয়। খানিকক্ষণ পেছনে ছোট্টা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। অথচ ট্রাফিক পুলিশের একটা আইন আছে—সিএনজি, ক্যাব যেকোনো জায়গায় যাত্রীদের নিয়ে যেতে বাধ্য। বাংলাদেশে আইন মানাতে হয়, মানে না কেউ সহজে। আমি নিরুপায় হয়ে এই মানানোর কাজটা মাঝেমধ্যেই করি! সিএনজিওয়ালাদের জিজ্ঞেস করি, আইন আছে, যাবে না কেন? প্রায় সব সিএনজিওয়ালা একই রকম উত্তর দেয়। বলে, গ্যাস নাই। গ্যাস নিতে যাব! কেউ বলে, গাড়ির কাজ করাইতে হইব। কিংবা কেলাসের (ক্লাচের) তার ছিঁইড়া গেছে! দেখেন না, হাতে কালি। কেউ কেউ হাতে কালিও মাখিয়ে রাখে। বলে, বেরেক ডিস্টার! রিস্ক নিয়া উঠবেন?

আমি বলি, উঠব। রিস্ক নিয়েই উঠব এবং সত্যি সত্যি উঠি! সিএনজিওয়ালা তখন বিপদে পড়ে যায়। ভয় দেখানোর জন্য রাস্তার মধ্যে গাড়িকে ঝাঁকঝাঁকি করে। তীব্র রাগে মাঝেমধ্যে হার্ডব্রেক করে কড়া ধাক্কা খাওয়ায়! আমি খুশি কণ্ঠে বলি, তুমি তো খুবই ভালো চালক! গাড়ি নিয়ে রাস্তায় কী সুন্দর নাচানাচি করো। শিল্পী-চালক! নাটক-সিনেমা করতে পারবে। ভালো

আর্টিস্ট! এগুলো শুনে চালকের গা জ্বলে। কিন্তু শয়তানিটা তৎক্ষণাত্ কমে। ২.

আরেক দল চালক আছে, যারা ইচ্ছামতো ভাড়া চায়। আগে বলত, মিটারের চেয়ে দশ-বিশ টাকা বাড়িয়ে দি়েন। এখন বলে, গাড়িতে মিটার রেখেছে শুধু সরকারের আইন মানতে। মিটার চলবে। কিন্তু ভাড়া নেবে চুক্তিতে। ধানমন্ডি থেকে গুলশান যাব। ভাড়া দুই শ টাকা।

দুই শ টাকায় তো এসি ক্যাবেই যাওয়া যায়! সিএনজিতে যাব কেন?

এসি ক্যাব অহন ঘণ্টা হিসেবে প্যাসিঞ্জার নেয়। ঘণ্টা আড়াই শ ট্যাকা। জ্যাম পার হয়্যা গুলশানে যাইতে লাগব কমপক্ষে এক থিকা দেড় ঘণ্টা! ভাড়া উঠব আরাই শ থিকা সাড়ে তিন শ...! ট্যাকার গুলানি থাকলে যান।

কৌশলের সঙ্গে কৌশল করতে হয়। বললাম, চলো। উঠে ড্রাইভারের সঙ্গে খুবই টক-মিষ্টি কথা বলি। মিটারে ভাড়া এসেছে এক শ দশ টাকা। নেমে এক শ দশ টাকাই দিলাম।

সিএনজিঅলা বলল, দুই শ টাকা কয়া আসছেন। দুই শ ট্যাকা দিবেন! এইডা কী দিলেন? বললাম, আইন দিলাম! তুমি যেমন আইন মানার জন্য কৌশল হিসেবে মিটার রেখেছ, আমিও কৌশল হিসেবে তোমার ভাড়ায় রাজি হয়েছি। মিঠা কথা বলেছি। কিন্তু ভাড়া দিলাম আইন মেনে, মিটারে। পছন্দ না হলে তুমি পুলিশ ডাকো।

চালক ত্রুদ্ধ হয়েছে। বলল, সরকারে আইন করছে, মালিকেরা গাড়ির জমা নিব চাইর শ ট্যাকা। কিন্তু মালিকেরা নিতাছে আট শ ট্যাকা! আমরা কই পাব? চুরি করব?

ড্রাইভারের কথার যুক্তি ঠিক আছে। কোথায় যেন একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ভালো লাগে না! এর একটা সুস্থ সমাধান দরকার। ৩.

বাংলাদেশে পুলিশের ইমেজ খুব একটা উজ্জ্বল না। ট্রাফিক বিভাগের ভাবমূর্তি দুর্বল, তবে কিছুকাল যাবত্ তারা একটি প্রশংসনীয় কাজ করছে। চব্বিশ ঘণ্টার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। এখন মাঝেমধ্যেই সেই নম্বরে ফোন করি। তাতে সিএনজি ক্যাবওয়ালাদের যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হয়।

ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের ০১১৯৯৮০৬১১১ ও

০১১৯৯৮০৬২২২—এই দুটা নম্বরে রাস্তার
যেকোনো সমস্যা ফোন করে জানালে সঙ্গে সঙ্গে
তারা নিকটস্থ পুলিশ সার্জেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা
করে। কখনো কন্ট্রোল রুম থেকেই ড্রাইভারদের
সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে। আমি
একাধিকবার উপকার পেয়েছি। আবার
সাংঘাতিক লজ্জার মধ্যেও পড়েছি একবার!
সন্ধ্যার পরে সিএনজিওয়ালারা ছেলে যাত্রীদের
তুলতে গড়িমসি করে। আবার শুধু মেয়ে
প্যাসেঞ্জার হলে সহজেই রাজি হয়ে যায়। আমার
নাটকের এক কিশোরী শিল্পী আছে। ইউনিটের
সহকারী পরিচালক তাকে সিএনজিতে নিয়ে
আসে এবং শুটিং শেষে পৌঁছে দেয়। প্রতিদিনই
সন্ধ্যায় তারা বিপদে পড়ে। কোনো গাড়ি যেতে
চায় না। বুদ্ধি বের করা হলো, আমার স্ত্রী
কিশোরী শিল্পীকে নিয়ে সিএনজি ঠিক করবে।
সহকারীদের নিয়ে আমি বিগাতলার জাপান-
বাংলাদেশ হাসপাতালের কাছে দাঁড়ালাম।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুহূর্তেই তারা রামপুরা
যাওয়ার সিএনজি পেয়ে গেল। ড্রাইভারের বয়স
হবে ৩০-৩২। ওরা হাসপাতালের সামনে এসে
দাঁড়াল। দুই সহকারী সিএনজিতে উঠবে, তখন
ড্রাইভার বলল, তার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে
গেছে। যাবে না।
তাকে পাকড়াও করলাম। এ কোন ধরনের
শয়তানি! অনেকের কাছে শুনেছি, সিএনজিতে
মেয়েরা একা থাকলে ড্রাইভার তাদের ভয়
দেখায়। ফাজলামি করে। তাই ছেলেরা সঙ্গে
যাচ্ছে দেখে, এখন সে যেতে চাইছে না। সন্ধ্যা
সোয়া সাতটা। ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে ফোন
করলাম। কন্ট্রোল রুম থেকে বলল, অপেক্ষা
করেন, সার্জেন্ট পাঠাচ্ছি। ড্রাইভারকে আজ
উচিত শিক্ষা দিব। এর মধ্যে ড্রাইভারও দেখি
নানা জায়গায় ফোন করছে। এখানে দাঁড়িয়ে
থাকা ক্যাবের দু-তিনজন ড্রাইভারও তার সঙ্গে
যোগ দিয়েছে। আমি আবার কন্ট্রোল রুমে ফোন
করলাম। বলল, সার্জেন্ট আসছে। ফাজিল
ড্রাইভার দল ভারী করে প্রস্তাব করল, তার
গাড়িটা এখন পেছন থেকে ধাক্কা দিলে স্টার্ট
নেবে। আমি কোনো জবাব দিলাম না।
প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। বারবার কন্ট্রোল
রুমে ফোন করছি, এত সময় কখনোই লাগে
না। সার্জেন্ট চলে আসে। আমি আবার ফোন

করলাম। ঘটনাটা আবার বললাম। তখন কন্ট্রোল রুম থেকে বলল, সরি! রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের এই সার্ভিসটা চালু থাকে। আটটা বেজে গেছে। এখন আর সার্ভিসটা দেওয়া যাবে না! সেই সন্ধ্যায় আমি ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম!৪.

আজও ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের সাহায্যে সিএনজি নিয়েছি। ড্রাইভার বাধ্য হয়ে আমাকে মহাখালী নিয়ে যাচ্ছে। মাঝবয়সী লোক। যেতে যেতে সারা পথই অনবরত গালিগালাজ করছে। খুবই বিচ্ছিরি গালি। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গালি হচ্ছে কুত্তার ছাও (বাচ্চা) এবং শুয়োরের ছাও! গালি দিয়ে আবার ভেতরের আয়নায় চোরা চোখে তাকাচ্ছে, যেটাতে পেছনের যাত্রীকে দেখা যায়। সে আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছে। বললাম, আপনি এত গালিগালাজ করছেন কেন?

সে রাগকণ্ঠে উত্তর দিল, আমার মুখ, আমি গালি দিতাছি। বাংলাদেশ সরকারের তো কোনো আইন নাই যে গালি দিলেও আপনে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করবেন! নাকি আইন আছে? থাকলে ফোন করেন পুলিশেরে। না। এ রকম কোনো আইন নাই। আপনি যত ইচ্ছা গালি দেন।

এবার সে আরও কঠিন এবং কুঁসিত ধরনের গালাগাল শুরু করল। মহাখালী এসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মা-বাবা আপনার সঙ্গে এমন কী অন্যায় করেছে যে আপনি তাদের ওপর এত বিরক্ত?

সে ছ্যাঁত করে উঠল, মা-বাপের উপর বিরক্ত হমু ক্যান? বিরক্ত প্যাসিঞ্জা খা...র বাচ্চাগো উপরে! সে আরেকটা গালি দিল! মা-বাপ নিয়া কথা কইবেন না।

আমি বললাম, কেউ যদি কাউকে অমুকের বাচ্চা, তমুকের বাচ্চা বলে গালি দেয়, সেই গালি গালিদাতার মা-বাবার উপরেই বর্তায়। অর্থাৎ নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়ার পাপ হয়। সারা রাস্তায় আপনি ম্যালাগুলো পাপ করেছেন। নিজের মা-বাবাকে গালি দিয়েছেন। কিতাবের কথা বললাম। ভাড়াটা নেন।

টাকা দিয়ে চলে আসছি, ড্রাইভার নমিত কণ্ঠে স্যার স্যার বলে ডাকছে। আমি ঘুরে দেখে আরও জোরে হাঁটা শুরু করলাম। সেও দ্রুত

পায়ে ছুটে আসছে!

রাস্তায় সব সময় সিএনজিওয়ালাদের পেছনে ছুটি। আজ প্রথম সিএনজিচালক আমার পেছনে ছুটছে! আবু সুফিয়ান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০১০

351) গালাগালি দিয়ে যদি ভালো কিছু হয়, তবে গালাগালিই ভালো

কেস স্টাডি - এক

কাদের সাহেব (আসল নাম নয়) ব্যাগ নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার পাশের পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের নিচে পাবলিকের ভিড় দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। কাদের সাহেবও ওপরের দিকে তাকালেন। ছাদের কার্নিশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একটু এদিক-সেদিক হলেই পাঁচতলা থেকে সোজা নিচে পড়ার প্রবল আশঙ্কা। কাদের সাহেব উপস্থিত একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাই সাহেব, বিষয় কী?’ ভদ্রলোক বললেন, ‘তিনি ছাঁকা খেয়েছেন, তাই আত্মহত্যা করার জন্য ছাদে উঠেছেন।’ কাদের সাহেব বললেন, ‘আপনারা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন না?’ ভদ্রলোক বললেন, ‘সবাই তাকে নেমে আসার জন্য বলছে, কিন্তু সে নামতেই চাইছে না।’ কাদের সাহেবের মনটা খুব খারাপ হলো। এমন তরতাজা নওজোয়ানেরা তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে দেখে তাঁর মন ব্যথায় ভরে গেল। ব্যথার জন্য পাশের ফার্মেসি থেকে একটা পেইনকিলার খেয়ে ছেলেটাকে কীভাবে বাঁচানো যায় সে চিন্তা শুরু করলেন। আইডিয়া পেতে দেরি হলো না। কাদের সাহেব ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কোন গাধার বাচ্চা ছাদে উঠেছে রে?’ ওপর থেকে জবাব এল, ‘গালাগালি করে কে রে?’ কাদের সাহেব আবার বললেন, ‘আমি গালাগালি করি। গালাগালি করলে তুই কী করবি হারামজা...?’ ‘দেখেন, ভদ্রলোক মানুষ, মুখ খারাপ করবেন না। আমি নেমে আসলে কিন্তু অবস্থা খারাপ করে ফেলব’! জবাব এল আত্মহননকারীর কাছ থেকে। কাদের সাহেব এবার আসল বোমাটা ছাড়লেন, ‘তোর এত বড় সাহস, আমাকে হুমকি দিস! কু... ...চ্চা, সাহস থাকলে সামনে এসে দেখ।’ ব্যস, এতেই কাজ হলো। আত্মহননকারী

আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে কাদের সাহেবকে ধরতে সিঁড়ি দিয়ে হড়হড় করে নামতে শুরু করল। এই ফাঁকে কাদের সাহেব দিলেন দৌড়। সেই আত্মহননকারী আজও বেঁচে আছে। কাদের সাহেবকে শিক্ষা না দিয়ে সে মরবে না বলে পণ করেছে। কেস স্টাডি – দুই

আতর আলী (ছদ্ম নাম) পেশায় ভিক্ষুক। কাজীপাড়া বাসস্ট্যাণ্ডে তিনি বসেন। এ ছাড়া তাঁর তিনটা বেয়ারিংয়ের চাকার ঠেলাগাড়ি আছে। রোজ ৩০ টাকা রেটে গাড়িগুলো অন্য ভিক্ষুকদের তিনি ভাড়া দেন। পাঁচ ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে বড় ছেলের বয়স আট বছর। আতর আলী যেখানে বসেন, তাঁর পেছনে মতিন মিয়ার (এটাও ছদ্ম নাম) ফলের দোকান। কাছাকাছি কর্মস্থল হওয়ায় আতর আলী ও মতিন মিয়ার প্রতিদিনই দেখা হয়। মতিন মিয়া খেয়াল করলেন, আজ আতর আলীর সঙ্গে ভিক্ষা করতে সাত-আট বছরের একটি বালকও এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী আতর আলী, পোলাডা কে?’ আতর আলী বললেন, ‘আমার বড় ছেলে। আজ থেকে অরেও কামে লাগাইয়া দিলাম।’ মতিন মিয়া অবাক, ‘কী বল আতর আলী, তাহলে ওর লেখাপড়া?’ আতর আলী বললেন, ‘লেখাপড়া কইরা কী হইব? লেখাপড়া ছাড়াই আমাগো ইনকাম খারাপ না। খালি খালি ইস্কুলের বেতন দিতে যামু ক্যা?’ মতিন মিয়ার মনটা খারাপ হলো। একটা বাচ্চা লেখাপড়া ছেড়ে ভিক্ষা করবে, সেটা তাঁর ভালো লাগল না। ছেলেটাকে কীভাবে স্কুলে পাঠানো যায়, সে বিষয়ে তিনি মনে মনে ফন্দি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বুদ্ধিও চলে এল। তিনি ছেলেটাকে ডাক দিলেন, ‘এই ফকিরের বাচ্চা ফকির, তোর নাম কী?’ এভাবে ডাকতে দেখে ছেলেটার ভ্রু কুঁচকে গেল। সে তার বাবাকে বলল, ‘বাবা, ওই লোকটা আমাকে গালি দিয়ে ডাকল কেন?’ বাবা বললেন, ‘এটা তো গালি না, এটাই আমাদের পদবি। যাও, কাকু কী বলে শুনে আসো।’ ছেলে বলল, ‘যে কাজের পদবি একটা গালি, সে কাজ আমি করব না। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। আমি লেখাপড়া করে ভালো কাজ করব, যেন কেউ আমাকে ফকিরের বাচ্চা ফকির বলতে না পারে।’

সেই ছেলেটি আজ একটি প্রাইভেট ব্যাংকের উচ্চপদে কাজ করছে। বিশেষজ্ঞের মতামত গালি আমাদের জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে জানতে আমরা শরণাপন্ন হয়েছিলাম এ খাতের বিশেষজ্ঞ জনাব লোকমান মোল্লার কাছে। তিন বলেন, গালি আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের উন্নতির পেছনে গালির অবদান অপরিসীম। আমার কথাই বলি, একসময় আমি কোনো কাজ করতাম না। বাসায় বসে বিটিভিতে জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠানে সাংসদদের গালাগালি ও বকাঝকা দেখে সময় কাটাতাম। কোনো কাজ না পেয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, তখন আমার স্ত্রীর পরামর্শে গালাগালি-বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রেরণা পাই। সেই থেকে আর আমি বেকার নই। এই দেখুন, এ খাতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে আপনি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছেন। একইভাবে নতুন সাংসদ, যাঁরা গালাগালিতে এক্সপার্ট নন, তাঁরাও আমার কাছে আসেন। সংসদে কীভাবে গালাগালি মিশিয়ে বক্তব্য দিতে হবে তার পরামর্শ চান। সে কারণে আজ আমার ইনকাম ভালো। গালাগালি আমার বেকারত্ব দূর করেছে। সুতরাং, আমি মনে করি, গালাগালি দিয়ে যদি ভালো কিছু হয়, তবে গালাগালি, ভালো। মেহেদী আল মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০১০

352) অভিনয় - জেমস প্যাটিনসন

আমি জাহাজের ‘পার্সার’। সব রকম খরচাপত্র আমার হাত দিয়ে হয়। জাহাজে থাকাকালীন যাবতীয় লোকের ব্যাংকার আমি।

এই জাহাজে এবার যাচ্ছেন তরুণ আল ম্যাকলাউড। ইনি কোটিপতি হেনরি ম্যাকলাউডের একমাত্র সন্তান।

হঠাত্ দেখি, এই জাহাজেই চলেছে সেই সুযোগসন্ধানী রবিনসন পরিবার। বড় লোকের গন্ধে গন্ধে গোড়া থেকেই হাজির। মি. ও মিসেস রবিনসন ও তাঁদের মেয়ে প্যাটসি। সে এখন বেশ সুন্দরী তরুণী হয়েছে। ছোটবেলায় হাত সাফাইয়ের কাজে দু-একবার ধরাও পড়েছিল। বুঝলাম, বেচারী ম্যাকলাউড অনতিবিলম্বে হবেন এই প্যাটসির শিকার। অনুমান আমার নির্ভুল হলো। দেড় দিন কাটতে না কাটতেই দেখি, তরুণ আলের কণ্ঠলগ্না হয়েছে বিড়ালান্ধী

পেলবাসি প্লাটিনাম-চুলি প্যাটসি।

না বলে আর পারলাম না। বড়শিবিদ্ধ তরুণ
ম্যাকলাউডকে আড়ালে ডেকে বললাম,
'ইয়ংম্যান, ওই প্যাটসি রবিনসন সম্পর্কে একটু
সাবধানে থেকো।'

আমার কথা শুনে বললেন, 'তুমি দেখছি ঠিক
আমার বুড়ো বাপটার মতো। তুমি কি ভাবো,
এখনো আমার নিজের ভালো-মন্দ বোঝার বয়স
হয়নি? আমার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না
তোমার।'

ক্রমে জাহাজ এসে পৌঁছাল সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুর থেকে তরুণ ম্যাকলাউড জাহাজে
এবার প্রেমে পড়লেন গ্লোরিয়া রাইটের। সে
কন্যাও উপযুক্ত। বাপ-মায়ের লাইনেরই। বরং
আরও বেশি মারাত্মক। তার রূপ ফেটে পড়ছে।
নিখুঁত ফিগার।

ম্যাকলাউড শেষে প্যাটসিকে ছেড়ে গ্লোরিয়ার
দিকে ঢলে পড়লেন। আমি আরেকবার চেষ্টা
করলাম তাঁর জ্ঞান ফেরাতে। কিন্তু তিনি আবার
আমাকে শাসিয়ে বললেন, 'খারাপ হয়ে যাবে
বুড়ো, আমার ব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

কয়েক দিন পর হঠাৎ একদিন সকালে মি.
রাইট শুকনো মুখে আমার কেবিনে এসে
হাজির। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে বললেন,
'এখনই আমাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে
হবে।'

বললাম, 'এখনই দিচ্ছি, স্যার, কারণ জিজ্ঞেস
করাটা অশোভন, তবু যদি সাহায্য করত
পারি...।'

'ওই স্কাউন্ড্রেল রবিনসনরা ডার্ট ক্রিমিনাল সব।
যুবক ম্যাকলাউডকে সহজ-সরল ভালো মানুষ
পেয়ে ফাঁদ পেতে ব্ল্যাকমেল করছে! তাঁদের
মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়ে সুবিধেমতো কয়েকটা
স্ল্যাপ নিয়ে এখন টাকা চাইছে। ছি-ছি-
ছি।...আচ্ছা চলি, থ্যাঙ্ক ইউ।'

হাসি পেল আমার। খেলা তাহলে বেশ জমেছে।
হবু জামাইয়ের হয়ে টাকা দিচ্ছেন মি. রাইট।
গত রাতে রবিনসনও গোপনে এসেছিলেন
আমার কাছে। ঠিক রাইটের মতোই পাঁচ হাজার
পাউন্ড নিয়ে গেছেন। আমি চোখের ইশারায়
জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপার কী? উনি ত্রুদ্ব
চাহনিতে বুঝিয়েছিলেন, সেটা আমার জানার
দরকার নেই। কিন্তু বুঝতে আমার কিছুই বাকি

রইল না। গ্লোরিয়ার সঙ্গে আপত্তিকর ছবি তুলে রাইটরাও আলকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। তাই ভাবী জামাই আলকে বাঁচানোর চেষ্টা।

ডারহাম আসতেই তরুণ আল ম্যাকলাউড দুটি বিরাট ব্যাগ নিয়ে বাজার করতে নামলেন।

প্যাটসি ও গ্লোরিয়া দুজনকে বললেন, ‘ঘুরে আসছি, প্রিয়ে।’

জাহাজ ছাড়ার পর কিন্তু আল ম্যাকলাউডকে আর দেখা গেল না। উৎকণ্ঠিত হয়ে রাইট আর রবিনসনরা বললেন, ‘লোকটা জালিয়াত নয় তো?’

আমি বললাম, ‘তা কী করে জানব?’

আল ম্যাকলাউড, তুমি খাসা অভিনয় করেছ।

যদিও তুমি আমার নিজের ছেলে, হাড়ে হাড়ে

চিনি, তবু রূপসীদের পাল্লায় পড়নি ভাগ্যিস!

জেমস প্যাটিনসন: বিখ্যাত এই রহস্যোপন্যাস লেখক জাতে ব্রিটিশ। লিখেছেন প্রায় ১০০-এর মতো থ্রিলার। জন্ম-১৯১৫; মৃত্যু-২০০৯।

জেমস প্যাটিনসন অনুবাদ: অরুণোদয় ভট্টাচার্য

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০১০

353) দুয়ারে এসেছে লোডশেডিং - মোম-হারিকেন জ্বালো

আরে দূর! আবার লোডশেডিং শুরু হয়েছে।

অথচ গ্রীষ্মকাল আসতে এখনো অনেক দিন

বাকি। এরই মধ্যে সংবাদপত্রে বড় বড় হেডিং—

গ্রীষ্মকাল আসার আগেই ভয়াবহ লোডশেডিং।

মনে হচ্ছে লোডশেডিং গ্রীষ্ম-বর্ষা বোঝে না।

লোডশেডিংকে সবাই ভালোবেসে বলে ‘কারেন্ট যাওয়া’। আর এই কারেন্ট যাওয়াটা

বাংলাদেশের ব্যাটম্যানদের মতো না, যে ক্রিকে

গিয়েই কিছুক্ষণের মধ্যে আউট হয়ে ফিরে

আসবে। কারেন্ট একবার গিয়ে কমপক্ষে এক

ঘণ্টা না থেকেই চলে এসেছে এমন ঘটনা

ইতিহাসে বিরল। সুন্দরবনের বাঘের মতো এই

ঘটনাও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। লোডশেডিংয়ের

कारणे অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকে

সন্ধ্যা হলেই ঘরের বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে

মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকে। তবে আমাদের

সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। কোনো

এলাকায় কখন লোডশেডিং হবে, সে সময়সূচি

তারা একটি ওয়েবসাইটে দিয়ে রেখেছে। যাতে

আগে থেকেই সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে সেই

রুটিনটাই কেউ দেখতে পারে না। এই দুঃখের কথা কাউকে বলা যায়? লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদের দুঃখের কোনো শেষ নেই। আর একপক্ষের দুঃখে অন্য পক্ষ দাঁত কেলিয়ে হাসবে এটাই জগতের কঠিন সত্য। সে জন্যই লোডশেডিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতি-হারিকেন বিক্রেতার মুখের হাসিও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। বড়ই আফসোস। তবে এই মোমবাতি-হারিকেন ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। কারণ গ্রীষ্মকাল এলে লোডশেডিং আরও বাড়বে। অতএব এখনই মোমবাতি সংগ্রহ করা শুরু করুন। ডাকটিকিটফিকিট না জমিয়ে মোমবাতি জমান। লোডশেডিংয়ে ডাকটিকিট কোনোই কাজে আসবে না, কাজে আসবে এই মোমবাতি। তাই, আপনাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন, কারেন্ট যখন যাচ্ছে, কারেন্ট আরও যাবে। এ দেশের মোমবাতি ব্যবসায়ীদের ধনী করে ছাড়বে ইনশাল্লাহ...।

(আরও কিছু জ্বালাময়ী বক্তব্য লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উনি চলে গেছেন, মানে কারেন্ট চলে গেছে। লোডশেডিং। দেশের হবেটা কী? শান্তিমতো একটা বক্তব্য দেব, তারও উপায় নেই। ধ্যাৎ! ভালোই লাগে না!) সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৫, ২০১০

354) আজীবন স্বাধীনতা - আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম?

কদিন পরই স্বাধীনতা দিবস। ভাবতেই ভালো লাগছে। কারণ আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন জাতি। আমরা যেখানে-সেখানে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারি। ইচ্ছা হলেই পিচিক করে থুতু, পানের পিক ফেলতে পারি। কেউ আমাদের বাধা দেওয়ার কথা চিন্তাও করে না। অথচ এই পৃথিবীতেই কিছু দেশে যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা যায় না। কেউ ফেললেও তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় বা জরিমানা করে। কী ভয়ংকর ব্যাপার! নিজের দেশে যদি শান্তিমতো থুতু ফেলতে না পারি, পানের লাল পিক ফেলে দেয়ালটাকে শৈল্পিক রূপই দিতে না পারি, তাহলে তো পরাধীনই রয়ে গেলাম। অথচ আমাদের দেশে চালক ভাইয়েরাও একেবারে স্বাধীনভাবে গাড়ি চালায়। কোনো রকম সিগন্যাল বা বিধিনিষেধ তাদের আটকাতে পারে

না। সবাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এ দেশ তোমার-আমার। আর তাই যে যেভাবে পারছে দেশের জায়গা-জমি, নদী-নালা, রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে। কবির ভাষায় যাকে বলে, যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা....! আহা। অন্য দেশে কারও হাতে-পায়ে ধরলেও এসব করতে পারবেন না। সেখানে পয়সা দিয়ে গাড়ি কিনে ট্রাফিকের কথামতো চলতে হয়। আরে, আমার গাড়ি আমি চালাব, যেভাবে খুশি সেভাবে চালাব, তাতে ট্রাফিকের কী? এ জন্যই তো ওই সব দেশের চেয়ে আমাদের দেশের মানুষ বেশি সুখী। অধিক সুখের চোটে ইচ্ছা হলেই কিছু ছাত্রসংগঠন নিজেরা নিজেরা মারামারি করে। মাঝেমধ্যে বৈচিত্র্য আনতে শিক্ষকদেরও পেটায় আর বলে, স্যার, আমরাও আপনাকে খুব ভালোবাসি! অথচ, অন্য দেশগুলোতে এমপি-মন্ত্রীদেরও কোনো স্বাধীনতা নেই। নিজের শত্রুর সঙ্গেও সব সময় হাসি হাসি মুখ করে তোতাপাখির মতো ভালো ভালো কথা বলতে হয়, এমনকি হাতও মেলাতে হয়। তবে আমাদের এমপি-মন্ত্রীরা এসবের ধার ধারে না। তারা একদম স্বাধীন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে তারা যেকোনো জায়গায় স্বাধীনভাবে কথা বলে। গালাগাল, ঝগড়া কোনোটাই তারা বাদ দেয় না। দেবেই বা কেন? এটা তো কোনো ব্যাপারই না। তাদের আছে আজীবন স্বাধীনতা। মেয়াদ নিয়ে কোনো ঝামেলাই নেই। অতএব, ভেবে দেখুন, আমরা কত স্বাধীন। তবে তার পরও মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? হু গিভ? সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২২, ২০১০

355) তারকা রঙ্গ - মার্চ ২২, ২০১০

☆ প্রিয় তারকার বাড়ি ঘিরে ভক্তদের ব্যাপক আগ্রহ থাকে। কিন্তু অভিনেত্রী ব্রুক শিল্ডের বেলায় ঘটনা ঘটছে উল্টো। লোকজন তাঁর বাড়িটিকে এড়িয়ে চলছে। সম্প্রতি বাড়িটিতে সংস্কারকাজ শুরু করেছেন ব্রুক শিল্ড। ভোর থেকে যন্ত্রপাতির শব্দ, লোকজনের হাঁকডাকে এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। এহেন অবস্থায় প্রতিবেশীদের অনেকে এলাকা ছেড়ে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন ব্রুক শিল্ডকে। ☆ বয়স হয়েছে, কিন্তু মোহ তার কাটেনি আজও। মুখের

বলিরেখা লুকাতে তাই কসমেটিক সার্জারি
করাতে চাচ্ছেন কিম ক্যাটরাল (৫৩)। আবার
সার্জনের ছুরির নিচে মুখ পেতে দিতে মন
সায়ও দিচ্ছে না। পাছে তাঁর চেহারা যদি পাল্টে
যায়—মনে মনে এমনই শঙ্কা সেক্স অ্যান্ড দ্য
সিটিখ্যাত এই তারকার। তাঁর ভাষ্য, আয়নায়
নিজেকে দেখে যদি নিজেই চিনতে না পারি,
তাহলে ওই কাজের দরকার কী?☆ নিতান্ত
জরুরি না হলে ৯১১ তে কেউ ফোন করে না।
জুডি হেইম নামের এক বৃদ্ধা জরুরি সেবার ওই
নম্বরে ফোন করে বিলাপ জুড়ে দিলেন, মনে হয়
আমার ছেলে কোরি হেইম মরে গেছে। তিন
মিনিটের মাথায় অভিনেতা কোরি হেইমের
বাড়িতে চিকিৎসক ও ফায়ার সার্ভিসের একগাদা
লোক এসে হাজির। কড়া নাড়তেই খোদ কোরি
এসে দরজা খুললেন। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললেন,
আসলে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। মা ভেবেছেন
উল্টো। ডাক্তারমশাই কটমট করে চাইলেন
বৃদ্ধার দিকে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বৃদ্ধা
বললেন, ঘুমোলে বাছা আমার নাক ডাকে।
অমন কোনো শব্দ তখন শুনি নি তো...। ভাষান্তর:
আবুল হাসনাত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২২, ২০১০

356) কুইজ টাইম

১. কী লিখে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক টাকা
পাওয়া যায়?
২. কোন সংখ্যাকে অর্ধেক করলে শূন্য পাওয়া
যায়?
৩. না ছুঁয়েও কোন জিনিসটি ধরে রাখা যায়?
৪. কোন জিনিসটি সব সময় ওড়ে, কিন্তু
কোথাও যায় না?
৫. কোন জিনিস ছোটো কিন্তু হাঁটতে পারে না?
৬. কোন জিনিস ফেলে বা আঘাত না করেও
ভাঙা যায়?
৭. গডফাদার হওয়ার সহজ উপায় কী?
৮. প্রথম টেলিফোন আবিষ্কারের আগে কোনটি
বেশি জরুরি ছিল?
৯. কোন রিং চার কোনা?
১০. কোন ধরনের পড়া অজ্ঞান করে, কিন্তু
ক্ষতি করে না?
১১. কী পানির ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিন্তু
ভিজে যায় না।

১২. পৃথিবীটা কী দিয়ে তৈরি? গ্রন্থনা: তাপস রায়

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২২, ২০১০

357) জয়জয়জয়জয়জয়... বাংলা - নির্মলেন্দু গুণ

একদিন দুপুরের দিকে আমার কবিবন্ধু হুমায়ুন কবির আমার অফিসে আসে। ঘাটের দশকের কবিদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরকেই আমি ঢাকার রাজপথের জঙ্গি মিছিলগুলোতে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম।

হুমায়ুন এসেই বলল, ‘তোরা ডান্ডি কার্ড আছে?’ আমি বললাম, ‘আছে।’

‘তাহলে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, ভুট্টো শালাকে “জয় বাংলা” স্লোগানটা শুনিয়ে আসি। ব্যাটা এখনই হোটেলে ফিরবে। তাড়াতাড়ি কর।’

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সিকিউরিটির লোকজন আমাকে পিপল পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে জানতেন। আশপাশ দিয়ে যাতায়াত তো ছিলই। আনোয়ার জাহিদের কৃপায় গভীর রাতে পত্রিকার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা মাঝেমধ্যে ওই হোটেলে চা বা কফি খেতে যেতাম। জাহিদ ভাই তখন আমাদের বস ছিলেন। গভীর রাতে দেখা মানুষকে মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। ফলে ওই হোটেলের লোকজন আমাকে বেশ সমীহই করতেন।

হুমায়ুন বলল, ‘ওই সুযোগে তুই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি। আমরা লিফটের গোড়ায় ভুট্টো

শালার জন্য অপেক্ষা করব। ব্যাটা যখন লিফটের কাছাকাছি আসবে, তখন ওর কানের পর্দা ফাটিয়ে আমরা একসঙ্গে স্লোগান দেব।’

এরূপ স্থির করে হোটেলের গেটে জমা হওয়া

শত শত মানুষের ভিড় ঠেলে, সিকিউরিটির

লোকদের আমার আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে

হোটেলের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো

আমাদের। আমরা লিফটের কাছে গিয়ে অবস্থান

নিলাম। লিফটের কাছে আমাদের খুব বেশি

অপেক্ষা করতে হলো না। বেশিক্ষণ অপেক্ষা

করলে আমাদের ওপর নিরাপত্তার কাজে

নিয়োজিত লোকদের সন্দেহ হতো। ওখানে

যেতে বিলম্ব হওয়ায় ভালোই হলো।

আমরাও ঢুকেছি আর সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টোকে

বহনকারী মোটরবহরটি বাঁশি বাজাতে বাজাতে

এসে প্রবেশ করল হোটেলের গেটে। চারদিক থেকে শ্লোগান উঠল। চারপাশের মানুষের চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল নিরাপত্তার লোকজনের মধ্যেও। ভুট্টো আমাদের খুব কাছে এসে একটি গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁকে ঘিরে ধরল পাঁচ-ছয়জন সৈনিক। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই মারাত্মক অস্ত্র। কোনোটির নল ভুট্টোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে, কোনোটির নল ভুট্টোর বগলের নিচ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, ভুট্টোকে বুঝি আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে কতগুলো সাপ। ভুট্টো ঘামছেন। তাঁর মুখ ঘামে, রাগে, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ। লিফটের দিকে এগোনোর সময় আড়চোখে তাকাতেই আমাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হলো। আমরা এ রকম একটি মোক্ষম সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এটাই যে ঘটনা ঘটানোর সুবর্ণ সময় সে কথা আমরা দুজন বুঝে ফেললাম একই সঙ্গে। ফলে একই সঙ্গে আমাদের আইয়ুববিরোধী গণ-

অভ্যুত্থানকারী আন্দোলনের শ্লোগান-অভিজ্ঞ হাত আকাশে উত্থিত হলো এবং একই সঙ্গে আমাদের দুজনের কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো বাঙালির উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ শ্লোগান ‘জয়জয়জয়...বাংলা’।

চরাচরে প্রতিধ্বনি তুলে ওই শ্লোগানের কম্পন ছড়িয়ে পড়ল হোটেলের চারপাশে। হোটেলের ভেতর ভুট্টোর জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত ওই শ্লোগানটি ভুট্টোর নাকের ডগায় উচ্চারিত হতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারেননি। না ভুট্টো, না সিকিউরিটির লোকজন—না হোটেলের চারপাশে ভিড় করা জনতা।

আমাদের কণ্ঠে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান শুনে প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল হোটেলের চারপাশে ভিড় করা জনতা। পরের পদক্ষেপটি বাংলার মাটিতে ফেলতে গিয়ে ভুট্টোর পা স্থির হয়ে থাকল মুহূর্তের জন্য। আর সেই সঙ্গে আমাদের দুজনের বুকের ওপর চেপে বসল বেশ কটি আগ্নেয়াস্ত্রের চকচকে নল।

আমাদের শ্লোগান-উত্থিত হাত একটি ফ্রিজ শটে স্থির হয়ে রইল। একজন সৈনিক আমাদের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল, ‘আওর এক শ্লোগান দেয়গা তো গুলি কর দেয়গা।’

ভুট্টো আমাদের দিকে ভীতব্রস্ত এবং একই সঙ্গে

লাল চোখে তাকালেন। আমরাও ভুটোর চোখের দিকে তাকালাম। তিনি লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। খাঁচার ভেতরে সার্কাসের বাঘকে যেভাবে ঢোকানো হয়, সৈনিকেরা ভুটোকে ঠেলতে ঠেলতে ঠিক সেভাবেই লিফটের ভেতর ঢোকাল। ভুটো লিফটের ভেতরে প্রবেশ করেন। যতক্ষণ লিফটের দরজাটি বন্ধ না হয়, ততক্ষণ ভুটোর চোখ আমাদের দুজনের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। লিফটের দরজাটি বন্ধ হয়ে যেতেই সৈনিকেরা আমাদের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ঠেলতে ঠেলতে হোটেলের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হতে বাধ্য করে।

আমরা যখন হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসি, উপস্থিত জনতা আমাদের ঘিরে আনন্দে নাচতে শুরু করে। আমাদের দুজনকে তারা বরণ করে বীরের মতো। শতকণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে তারা স্লোগান তোলে ‘জয়জয়জয়জয়...বাংলা’। নির্মলেন্দু গুণ: কবি ও লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২২, ২০১০

358) নূরনগন্দ : সমবেত সংগীত - ডালেরি শামবারোড

বিশাল এক কোরাস দল, এক শ জন গায়ক তাতে, সমবেত কণ্ঠে গাইছিল মনোহর এক গান।: কোনো কলি ভুলে গেলেই সর্বনাশ!—
ভাবছিল প্রথম জন।

: কনসার্টটা আজ শেষই হতে চাচ্ছে না! বাড়ি যেতে নির্ঘাত দেরি হবে আর বউ শুরু করে দেবে ক্যাচাল।—ভাবছিল দ্বিতীয়জন।

: কনসার্ট শেষে দোকান খোলা পাওয়া যাবে তো? রুটি, মাংস, আলু কিনতে হবে।—ভাবছিল তৃতীয়জন।

: গতকাল আসলেই বেশি হয়েছিল মদ গেলা!—
ভাবছিল চতুর্থজন।

: এই রদ্দিমার্কী গান শুনতে দর্শকদের ভালো লাগছে!—ভাবছিল পঞ্চমজন।

: উইংসের ঠিক ওপাশেই চমৎকার একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখেছি। আমার আগেই কেউ মেরে না দিলেই হয়!—ভাবছিল ষষ্ঠজন।

: যে যা-ই বলুক, হারামজাদাটাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না করলেই নয়!—ভাবছিল সপ্তমজন।

: কী অসাধারণ পদযুগল মেয়েটির! বসেছেও প্রথম সারিতে। কখন যে পায়ের ওপর পা তুলে

বসবে!—ভাবছিল অষ্টমজন।

: বাসায় গিয়েই বাথটাব! নীরবতা! ঠান্ডা

বিয়ার!—ভাবছিল নবমজন।

: শয়তান ডিরেক্টরটা আবার আমাদের ঠকাল!—

ভাবছিল দশমজন।

: বাসার অতিথিরা যে করে যাবে! মাথা খারাপ

করে দিল একেবারে!—ভাবছিল কুড়িতম জন।

: আমার বাগানে এসে তোমার ছাগল গাছ খেয়ে

যাবে? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!—ভাবছিল

তিরিশতম জন।

: দাঁতের ব্যথা শুরু হলো আবার!—ভাবছিল

চল্লিশতম জন।

: নতুন প্যান্ট কিনতে হবে অচিরেই। এই

প্যান্টে আর কত দিন?—ভাবছিল পঞ্চাশতম

জন।

: কী ভ্যাপসা! বাপ রে বাপ! কার পোশাক

থেকে আবার ন্যাপথলিনের গন্ধও আসছে!—

ভাবছিল ষাটতম জন।

: তালে ভুল করলে কলঙ্কের সীমা থাকবে না!—

ভাবছিল সত্তরতম জন।

: মিউজিক কন্ডাকটরটা আস্ত এক গবেট!—

ভাবছিল আশিতম জন।

: কার কাছে যে দশটা রুবল ধার চাই!—

ভাবছিল নব্বইতম জন।

: বিরক্তির শেষ নেই!—ভাবছিল শততম

জন। বিশাল এক কোরাস দল, এক শ জন

গায়ক তাতে, সমবেত কণ্ঠে গাইছিল মনোহর

এক দেশাত্মবোধক গান। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম

আলো, মার্চ ২২, ২০১০

359) মুক্তিযুদ্ধের ৮টি কাহিনি

মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই সবার আগে মনে পড়ে

কতগুলো শব্দ—যেমন: হত্যা, খুন, ধর্ষণ,

গোলাগুলি, অত্যাচার। তবে এত কিছুর পরও

সে সময় ঘটেছিল উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু

মজার ঘটনা। আর সেগুলোরই কয়েকটি

রস+আলোকে বলেছেন বীরবিক্রম মেজর

জেনারেল (অব.) আমীন আহাম্মদ চৌধুরী☆ যুদ্ধ

চলাকালীন পাঠানদের নিয়ে একটা কৌতুক

খুবই প্রচলিত ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে।

পাকিস্তানি সেনাদের হর্তাকর্তারা একত্রিত হলে

প্রায়ই নাকি এ কৌতুকটি নিয়ে হাসাহাসি

করতেন। কৌতুকটি ছিল এ রকম—ভেতরে

মিটিং চলছে, বাইরে পাহারায় রয়েছেন দুই

পাঠান। তো পাঠানদের প্রতি নির্দেশ ছিল, কেউ যদি ঢুকতে চায়, তাহলে ঢুকতে দিয়ো না। কিন্তু হঠাৎই কোথা থেকে দুজন এসে সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ল। প্রথম দুজনকে দেখে এরপর অন্য আরেকজন এসে পাঠানদের বলল, ‘আমরা ভেতরে যাব।’

পাঠান: না, ভেতরে ঢোকা নিষেধ।

‘তাহলে সামনের দুজনকে ঢুকতে দেখলাম যে?’

পাঠান: ওরা তো আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তুমি জিজ্ঞেস করেছ, তাই মানা করলাম।

☆ রাত দুটোর সময় এক বাঙালি অফিসারকে ঘুম থেকে ডেকে এক পাকিস্তানি মেজর বলছেন, ‘তোমরা তো Independent হয়ে গেছ।’ বাঙালি অফিসার লাফ দিয়ে উঠে বসে বললেন, ‘কেন, কেন, কী হয়েছে?’

মেজর: ভাসানী বলেছেন, ওয়ালাইকুমআসসালাম।’

ওই মেজর ওয়ালাইকুম আসসালামের মানে মনে করেছিলেন স্বাধীনতা।

☆ এক পাকিস্তানি সেনা আরেক সেনাকে জিজ্ঞেস করছে—

‘তুমি কি জানো Democracy কী?’

আগে বলো, তুমি কি লাহোর থেকে মুলতান যেতে পারবে?’

‘হ্যাঁ, পারব, অবশ্যই পারব।’

‘এটাই হচ্ছে Democracy.’

☆ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জেনারেল ওসমানী একবার তাঁর গোল্ফ কেটে ফেলেছিলেন। গোল্ফ কাটতে যতক্ষণ, ঝামেলা লাগতে একটুও দেরি হয়নি। তাঁকে সবাই বলতে পাগল, আপনি যে ওসমানী এর প্রমাণ কী? আপনার গোল্ফটাই তো আসল জিনিস, আপনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কেউ! শেষতক ওসমানীর অধীন এক অফিসার এসে তাঁকে শনাক্ত করেছিলেন বলে ঘটনাটা আর বেশি দূর এগোয়নি।

☆ এক ইন্ডিয়ান আর্মির (মিত্র বাহিনী) বাসায় পার্টি হচ্ছে। সে সময় একজন কর্নেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্যান্স পার্টি দেখছেন। এমন সময় অবিবাহিত এক অফিসার এসে মহিলাকে বলছেন—

‘ইউ আর সো মাচ বিউটিফুল!’

এরপর তিনি কর্নেলকে বলছেন—

‘এসো, আমরা ড্রিংক করি আর তোমার বউকে ছেড়ে দাও, সবার সঙ্গে নাচুক। সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

কর্নেল: তুমি আগে বিয়ে করো, তারপর তোমার বউকে সবার সঙ্গে নাচতে দিয়ো। দেখব তখন কেমন পার তুমি। আমি গেলাম।

☆ জেনারেল ওসমানীর কড়া নির্দেশ ছিল, রাত ১০টার পর ক্যাম্পে ঢুকতে পাসওয়ার্ড লাগবে (ভয়েস পাসওয়ার্ড)। সে সময় একদিন ওসমানীর বেশ কয়েকজন অধীনস্থ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট লুকিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখতে। স্বভাবতই ফিরতে রাত হয়েছিল। এত রাতে গার্ড তাঁদের ক্যাম্পে ঢুকতে দিচ্ছিল না। গার্ড তাঁদের যা-ই জিজ্ঞেস করে, তাঁরা কোনো উত্তর দিতে পারছিলেন না। কারণ এরই মধ্যে সিনেমার আনন্দে সবাই পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন। শেষমেশ পাসওয়ার্ড মনে করে তাঁদের ক্যাম্পে ঢুকতে ঢুকতে রাত তখন আড়াইটা।

☆ মিত্র বাহিনীর যৌথ ট্রেনিং চলছে। ট্রেনিংয়ের সময় বাঙালিরা পাথরওয়ালা ভাত খেতে পারত না। এটা দেখে এক ইন্ডিয়ান সেনা বলছিলেন—
—‘তোমরা তাহলে কী খাও?’

মুক্তিযোদ্ধা : আমরা আমাদের দেশে বাসমতি চালের ভাত খাই।

‘আয় হায়! তাহলে তোমরা যুদ্ধ করছ কেন? আমরা তো এই পাথরওয়ালা ভাত খেয়েও চুপচাপ আছি।’

☆ এবার শোনার এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা। ছেলেটার বয়স ছিল ১৩ কি ১৪ বছর। তো সেই ছেলেটা যুদ্ধের ময়দানে একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল। তুমুল যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানি বাহিনী পরাস্ত। বেঁচে আছে মাত্র দুজন মিলিটারি। তাদের মধ্যে একজন ভয়াবহ গুলিবিদ্ধ, বড়জোড় আর আধঘণ্টা বাঁচতে পারে। অন্যজনের এক পা গুলিতে ঝাঁজরা। এমন সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে দাঁড়ানো সেই ১৩-১৪ বছরের ছেলেটি। কী অদ্ভুত, সে গুলি করছে না। ট্রিগারে তার আঙুল শক্ত করে চেপে ধরা, কিন্তু সে গুলি করছে না। সবাই বিস্মিত, কোথায় গেল ছেলেটার রাগ। এটা সেই ছেলে তো, যে কি না তার পুরো পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। যে কিনা সব পাকিস্তানিকে একাই মেরে ফেলবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কিনা

আজকেও সবার সামনে থেকেই ফাইট করছিল।
নাহ, কিছুই মিলছে না। এদিকে পায়ে গুলি
লাগা আর্মিটি ধীরে ধীরে ক্রল করে এগিয়ে যায়
মুমূর্ষু আর্মিটির কাছে। রীতিমতো আরেকটা যুদ্ধ
করে বহু কষ্ট করে কাঁধে তুলে নেয় তাকে।

তার মনেও ঝড় চলছে। যেকোনো মুহূর্তে গুলি
করে দিতে পারে এ বাচ্চা ছেলেটা। কিন্তু কিছুই
করার নেই। যদি বাচ্চাটার মনে একটু দয়া হয়,
যদি সে গুলি না করে, তাহলে হয়তো এ যাত্রায়
সে বেঁচে যাবে। সবাইকে হতবাক করে, যতক্ষণ
না পাকিস্তানি আর্মিটি তার সহযোদ্ধাকে কাঁধে
করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চোখের আড়াল হলো,
ততক্ষণ ছেলেটা রাইফেল তাক করে রাখল,
কিন্তু কোনো নড়াচড়া বা গুলি করল না।

স্বভাবতই এমন ঘটনার পর সবাই তাকে গুলি
না ছোড়ার কারণ জানতে চাইল।

উত্তর এল, ‘কইতারি না কেন গুলি করি নাই।’
যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিপক্ষে লড়াই করা এক
অকুতোভয় যোদ্ধার মুখ থেকে কথাটা শুনতে
সবার সেদিন কষ্টই হয়েছিল।

অনুলিখন:
কামরুল হাসান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২২, ২০১০

360) পার্টস ব্যবসায়ী

ভুঁইগড়ে এক অনুষ্ঠানে গেছি। মঞ্চের পাশে
ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছি। ফজল ভাইয়ের
সঙ্গে দেখা (কবি ফজল মাহমুদ)। দাঁড়িয়ে
হ্যান্ডশেক করলাম। হাত ধরে উনি আমার
মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁটের
হাসি হারিয়ে গেল। চোখে উদ্বেগ! মায়াভরা
বিস্ময়! জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কী?

উনি বললেন, আপনি শিগগিরই চিকিৎসক
দেখান। আপনার চোখ এত লাল কেন? স্ট্রোক
হয়ে যাবে! কী সর্বনাশ! লিপিড প্রোফাইল
করিয়েছেন?

ভদ্রলোক চিকিৎসক। তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া
যায় না। ভয়ে আমি সেখানেই বসতে গিয়ে
মাটিতে পড়ে গেলাম। পেছনের চেয়ার কে যেন
সরিয়ে ফেলেছে, দেখিনি। ভারি লজ্জার বিষয়!
লিপিড প্রোফাইলের প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের
কোলেস্টেরল পরিমাপ করা। করলাম।

চিকিৎসক রিপোর্ট দেখে বললেন, বিপজ্জনক!
শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমে গেছে। এই চর্বি হার্ট
অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, কিডনি-সংকটসহ নানাবিধ

বড় ঝামেলার কারণ হতে পারে।

চিকিৎসক অনেক নিয়মকানুনের সঙ্গে প্রধান চিকিৎসা দিলেন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে হাঁটা! হাঁটতে হবে। দুষ্ট কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইডি বার্ন করতে হবে।

ঢাকায় নরমাল ওয়ার্কিং লাইফে হাঁটার উপায় নেই। পত্রিকার রিপোর্ট বলছে, ১৬৩ কিলোমিটার ফুটপাথের ১৫০ কিলোমিটার দখল করে রেখেছে হকাররা। পর্যাপ্ত পার্ক নেই। আমার বাসার নিকটতম হাঁটার জায়গা হচ্ছে ধানমন্ডি লেক। চিকিৎসা হিসেবে সকালে ধানমন্ডি লেকে চলে আসি। এখানেও শত-সহস্র মানুষ। নারী-পুরুষ-তরুণ-বৃদ্ধ, অধিকাংশই অসুস্থ। গিজগিজ করে। লেকের পাশেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। নিরাপত্তাব্যবস্থা ভালো। হাঁটার পথগুলো চওড়া করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ বেড়েছে অনেক। গায়ে-গায়ে লাগার অবস্থা। এক গতিতে হাঁটা মুশকিল!

ভিড় এড়ানোর জন্য রোড ৫/এ-র উত্তর দিকের রাস্তা ধরে মেইন রোডে চলে এসেছি। লেকের পাশেই বসার জায়গা আছে। চা নিয়ে একজন বসে আছে। তার সামনে কালো জোব্বা পরা এক লোক কয়েকটা ৫০০ টাকার নোট গুনছে। গোনা ঠিক না, টাকাকে হাতাপাতা করছে। এক হাত থেকে আরেক হাতে নিচ্ছে। এটা যে দেখানোর জন্য করছে, সেটা বোঝা যায়। কোনো ছিনতাইকারী কি না কে জানে! তার পরনের পোশাক বলে দেয়, এটা হাঁটতে আসার ড্রেস নয়। আমার পকেটে তেমন কিছুই নেই। খোয়ানোর ভয়ও নেই। চা খাওয়ার ছলে বেঞ্চের কাছে এসেছি। চাওয়ালা গভীর দৃষ্টিতে ওই লোকের টাকা গোনা দেখছে। ফ্লাস্কের সামনে বিস্কুট, মোয়া আর চকলেটের বয়াম বাঁধা। জোব্বাওয়ালা একটা বিস্কুট নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, বড় টাকার নোট দেইখা কি লোভ হয়? ছেলেটা কম বয়সী। ২২/২৩ হবে। পরনে নীল রঙের গেঞ্জি। বুকের মধ্যে সাদা রঙে লেখা Love। পায়ে স্যান্ডেল আছে। চেহারা ভরা মায়া। লোকটি বলল, তুমি জোয়ান পোলা, তোমার ফেলাস্কের ফ্যাকটারি দেওয়ার কথা, ভালো কারবার করার কথা, তুমি ফেলাস্কে চা নিয়া ঘুরো ক্যান? এডি তো সব হাসপাতালের চুরি করা পাতার চা! চোরে দেশ ভইরা গেছে!

কী করব স্যার? গরিব মানুষ! পুনর্জি পাব কই?
ঢাকা শহরে চা বেচা ছাড়া উপায় নেই।
এই দেখো, বাঙালির আয়-উন্নতি হয় না ক্যান
জানো? বাঙালি পয়লাই খাইতে চায় জিলাপি।
আরে মিয়া, পয়লা টার্গেট করবা সন্দেশ।
সন্দেশ চাইলে রসগোল্লা পাইবা। রসগোল্লা
চাইলে পাইবা আমিতি। আমিতি চাইলে
জিলাপি। আর পয়লাই যদি জিলাপি টার্গেট
করো, তাইলে তো জিলাপিও পাইবা না। পাইবা
জিলাপির সিরি...পিঁপড়ার ভাগ মারবা। সিরি
খাইব পিঁপড়ায়। আহা, বাংলাদেশের মানুষ কী
রান্ধস! পিঁপড়ার খানাও ছাড়ে না! একদল বেশি
খায়া চর্বি জমায়া সেগুলো ঝাড়তাছে। আরেক
দল পীপিলিকার খাওন নিয়াও কাড়াকাড়ি
করতাছে।

লোকটির কথা বলার মধ্যে দারুণ আকর্ষণ
আছে। ভালো অভিনেতা হতে পারবে। চাওয়ালা
বলল, আমি ট্যাকা পাব কই, স্যার। কারবার
করতে কত ট্যাকা লাগে না?

আরে কয় কী! দুই লাখ ট্যাকা ক্যাশ নিয়া
ঘুরতাছ আর কও ট্যাকা পাইবা কই,
ওপরওয়ালা তো বেজার হইব মিয়া!

জোব্বাওয়ালা বলে কী! চমকানোর কথা! আমি
এগিয়ে উত্তর দিকের বেঞ্চে বসলাম। চা দিতে
বলে হাতের পেপারে নজর দিলাম। মন আর
কান জোব্বাওয়ালার দিকে।

ছেলেটা এদিকে চা দিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা
করল, আমার কাছে নগদ ট্যাকা দেখলেন কই?
আমি ট্যাকা কই পাব?

লোকটা একের পর এক বয়াম খুলে বিস্কুট
খেয়ে যাচ্ছে। বলল, শোনো, ওপরওয়ালা সব
মানুষেরই কাজকারবার করার জইন্য পুনর্জি
দিয়া দিছে। ডবল ডবল পার্টস দিয়া দিছে।
যেমন ধরো তোমার চোখ! চোখ কয়টা? দুইটা!
কিন্তু কাজে লাগে একটা। একটা চোখ দিয়াই
কিন্তু সব দেখা যায়। তবু একটা বেশি দিছে।
কারণ উনি দয়ালু। আবার কিডনি কয়টা দিছে?
দুইটা। একটা কাজে লাগে, আরেকটা স্প্যার
পার্টস। এই একটা পার্টস বেইচা ফালাও। নগদ
দুই লাখ ট্যাকা পাইবা। সেই ট্যাকা দিয়া কারবার
করো। মালামাল দিয়া দোকান সয়লাব কইরা
ফালাও! এই যে আমার হাতে সাতসকালে বড়
বড় ৫০০ ট্যাকার নোট দেখলা, গতকাইল

একটা পার্টস বেচছি, সেই টাকা। চাইলে আমার কাছে একটা পার্টস বেচতে পারো!

এতক্ষণ চোরা চোখে দৃষ্টি দেওয়ায় তার মুখ ভালো করে দেখিনি। এবার তাকালাম। অসম্ভব ধূর্ত চোখ! চেহারায় বসন্তের দাগ। পেপার সরিয়ে জিঞ্জেস করলাম, আপনি কী করেন, ভাই?

আপনে তো আমার কথা শুনছেন। জোরেই বলছি, পার্টসের ব্যবসা করি।

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিঞ্জেস করলাম, পার্টসের ব্যবসা করেন মানে, কিসের পার্টস? বডি পার্টস। বর্তমানে মানুষের বডি পার্টসের কারবার করি। আর মৌসুম বুইঝা ঢাকায় ফকির ইমপোর্ট করি।

সে নিজেই অবলীলায় বলে যাচ্ছে, রমজান মাসে সারা দেশ থিকা ঢাকায় ফকির আসে পাঁচ লাখ। ট্রেন-লঞ্চ-বাস-ট্রাকে কইরা তাগো বিনা ভাড়ায় আনতে হয়। জনপ্রতি পাই মাত্র দুই টাকা। প্রথম আলোতেই কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, ঢাকায় এখন এক কোটি ৩০ লাখ লোক বাস করে। প্রতিদিন আরও আসছে দুই হাজার ১৩৬ জন করে। এত বাড়তি মানুষ ঢাকায় এসে কী করছে? কী কাজ করবে? এই দিশেহারা মানুষগুলোই আশা দেখে এ রকম লোকের পাল্লায় পড়ে। লোকজন আগে শুধু টাকাপয়সা খোঁয়াত। এখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও খোঁয়াচ্ছে। এই চিত্র ভয়াবহ।

লোকটিকে জিঞ্জেস করলাম, আপনার নাম কী? শোনে স্যার, আমি কোনো বেআইনি কাজ করি না যে পুলিশে ধরতে পারব বা র‍্যাবের ক্রসফায়ার খাব। থানায় আমার নাম নাই। আমি মানুষেরে বুঝাই, তাতে উপকার ছাড়া কারও অপকার হয় না। দেশে কাজকর্ম চাকরিবাকরি নাই। মানুষ কী কইরা খাবে? বডি পার্টসডি ফালাই রাইখা নষ্ট কইরা তো লাভ নাই। নিজে বাঁচি, অন্যরেও বাঁচাই!

লোকটি কথা বলে চমৎকার। তার নিজের এক ধরনের যুক্তিও আছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে না। যাওয়ার জন্য উশখুশ করছে। তাকে আটকানোর জন্য কায়দা করে প্রসঙ্গ বদলে জিঞ্জেস করলাম, নাটক করবেন? সে হাসল—জীবনের চেয়ে বড় নাটক আর কিছু আছে? সারাক্ষণই তো সঙ্কলে নাটক করতছি!

বলেই উঠে চলে গেল! আবু সুফিয়ান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০১০

361) আপনি আমি জনগণ, আমাদের দুই পাশে এরা কারা?

সৃষ্টির শুরু থেকেই দুর্বলেরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে। সবলেরা দাঁত কেলিয়ে হাসবে, আর দুর্বলের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়নের মেল ট্রেন ছোটাবে, এটাই এই নিষ্ঠুর জগতের নিয়ম। এই ছবিটাই দেখুন। গত সপ্তাহে ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ছবিটি। দুটো বাস দুই দিক থেকে চাপ দিয়ে বেবিট্যাক্সিটাকে একেবারে চ্যাপ্টা করে ফেলছে। কী ভয়ংকর ব্যাপার! অথচ ট্যাক্সিটার পেছনেই বড় করে লেখা আছে, ‘আমি ছোট, আমাকে মারবেন না’। এই দেশে লেখাপড়ার অবস্থা যে কত খারাপ, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। দুনিয়ার পাঠ্যবই মুখস্থ করে মানুষ মুখে ফেনা তুলে ফেলছে, আর ট্যাক্সিটার এই লেখাটা কেউ পড়লই না। এত করুণভাবে, আবেগ দিয়ে অনুরোধ লিখেও সাম্রাজ্যবাদী বাস দুটোর নিদারুণ আগ্রাসন থেকে রেহাই পেল না এই নিরীহ গাড়িটি। এ কথা কাউকে বলা যায়? আর ছবিটা দেখলেই মনে পড়ে বার্গারের ভেতরে অবস্থিত কাবাবের কথা। আহা রে, সারাটা জীবন কাবাবটাকে দুটো বনরুটির চাপ মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। ট্যাক্সিটার অবস্থাও একই রকম। কিন্তু বাস দুটোর কি কোনো মায়াদয়া নেই? এতটুকু একটা ট্যাক্সিকে তারা এভাবে চাপ দিতে পারল? আ রে ভাই, তোমরা বাস হয়েছ বলে তো আর সবার মাথা কিনে নাওনি। ছোটদের একটু জায়গা করে না দিলে তারা তো বড় হওয়ার সুযোগই পাবে না। শুধু সাইজে বড় হলেই হয় না, মনটাকেও একটু বড় করতে শেখো। আর বেবিট্যাক্সিটাও এত বেয়াদব হয়েছে যে কী আর বলব। তুই ব্যাটা ছোট, তুই বড়দের মাঝখানে যাস কেন? ছোট গাড়ি, ছোটদের সঙ্গে খেলবি, তা না! উনি গেছেন বড়দের সঙ্গে লাগতে। আ রে বেকুব, এতটুকু শরীর নিয়ে তুই ওই বড় বড় বাসের সঙ্গে পারবি? সামান্য একটা সিএনজিচালিত বেবিট্যাক্সি হয়ে কেন ডিজেলচালিত বাসের মাঝখানে যাস? বাসের পেছনেই তো বড় করে লেখা আছে ‘১০০ হাত দূরে থাকুন’। ওটা তো

পড়িসনি। পড়াশোনার দিকে তো একদম মন নেই। খালি বড়দের পিছে পিছে ঘুরঘুর করে! কতবার বলেছি, বড়দের মাঝখানে যাবি না, ওরা বড়, ওদের রাগ বেশি। কখন কী করে তার ঠিক নেই। তা তো শুনলি না, এখন চ্যাপ্টা হতে কেমন লাগে? এ জন্যই মুরব্বিদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। মুরব্বিরা যা বলে, বুদ্ধিমানেরা সে-মতোই চলে। শাহরীয়ার শরীফ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০১০

362) দীর্ঘ জীবনের গোপন রহস্য

শততম জন্মবার্ষিকীতে এক লোককে জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের গোপন রহস্য কী?

লোকটি বললেন, এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। একটা ভিটামিন কোম্পানি, একটা আয়ুর্বেদ কোম্পানি আর একটা ফুট জুস কোম্পানির সঙ্গে দরদাম চলছে।

363) যেমন খশুর তেমন জামাই

হোটেলমালিক রামলগন হাঁ করে একবার গণেশের মুখের দিকে আরেকবার থালার দিকে তাকাচ্ছিল। গণেশের খাওয়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল, ‘সাহেব, পেট ভরেছে?’ ‘ভরেছে,’ আঙুল দিয়ে থালা চাটতে চাটতে বলল গণেশ।

‘আমি বুঝি, সাহেব। বাবা মারা যাওয়ার পর আপনার তো আর আপন কেউ রইল না। একা একা অনেক কষ্ট হয় আপনার।’ বলেই চলেছে রামলগন, ‘সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে কাজ করে খাচ্ছি। একা। আপনার মতো শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়তো বা দোকানদারি অনেক ছোট পেশা, কিন্তু আমার কি কম আছে? পেনালে ১০ একর জমি, সাইপেরিয়ায় তিনটে, ফুয়েন্ট গ্রোভে একটা বাড়ি। সব মিলে মোটামুটি ১২ হাজার ডলারের সম্পত্তি।’ কিছুক্ষণ চুপ করে রামলগন আবার বলল, ‘সাহেব, আপনার তো এখন দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমার মেয়ে লীলাকে আপনি বিয়ে করবেন?’ ‘করব,’ এককথায় রাজি হয়ে গেল গণেশ।

২

‘চিন্তা করবেন না। আমার তেমন কোনো দাবিদাওয়া নেই।’ রামলগনকে আশ্বস্ত করল গণেশ।

‘সাহেব, এই হিন্দুসমাজের যতসব প্রথা নিয়েই তো আমার ভয়। বিয়ের পরদিন দুপুরে বরকে পুরো এক থাল খিচুড়ি খেতে দিতে হয়। জামাই যতক্ষণ না খাওয়া শেষ করে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্বশুরকে টাকা ঢালতে হয়।’

‘চিন্তা করবেন না। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। কিন্তু আবার এত দ্রুতও না, যাতে লোকে আপনাকে ফকির ভাবে।’

‘আমি এমনটাই আশা করেছিলাম, সাহেব। আপনিই পারেন এতটা উদার হতে। এটা আমার বিয়ে হলে আমি বলতাম, “চুলোয় যাক খিচুড়ি, আমি যৌতুক নেব না”।’

৩
বিয়ের কার্ড ছাপানো শেষ হতে না হতেই অতিথিরা পাল ধরে এসে পড়ল গণেশের বাড়ি। অতিথিদের কর্তৃত্বে ছিলেন গণেশের এক পিসি, যিনি কিনা গণেশের বাবার শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। গণেশ সেসব টাকা ফেরত দেওয়ার কথা তুলতেই কষে একটা ধমক খায় পিসির কাছে।

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে থাকছে ভাবতেই গণেশের অবাক লাগে। আরও অবাক কাণ্ড হলো, এদের বেশির ভাগকেই গণেশ চেনে না। মাঝেমধ্যে দু-একটা মুখ চেনা চেনা ঠেকে এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে, তার যেসব দূরসম্পর্কের বোন কদিন আগে নিজেরাই ছিল খুকি, তারা আজ এক গন্ডা ছানাপোনার মা। লম্বামতো, চটপটে একটি মেয়েকে গণেশ কিছুতেই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘পিসি, এই মেয়েটি কে?’

‘ও ফুলকুমারীর জ্যাঠাতুতো বোন।’

‘ফুলকুমারীটা আবার কে?’

‘ফুলকুমারী তোর দূরসম্পর্কের খুড়তুতো বোন।’ সম্পর্কের ফিরিস্তি শুনে গণেশের বিষম খাওয়ার জোগাড়। বিয়ের আগের দিন বাড়ির সব মেয়ে হিন্দি গান গেয়ে গণেশকে জাফরান দিয়ে স্নান করাতে লাগল। তখনই প্রথমবারের মতো প্রশ্নটা করল গণেশ, ‘আচ্ছা পিসি, প্রতিদিন এতগুলো লোকের খাবার আসছে কোথা থেকে?’

‘কেন? রামলগন বাবুর হোটেল থেকে!’

‘খরচাপাতি কে দেবে?’

‘তুমি। রামলগন বাবু বলেছেন, নানা ঝামেলায়

তোমার মাথাটা এমনিতেই গরম। বিলের
ব্যাপারে বিয়ের পরই তিনি তোমার সাথে কথা
বলবেন।’

‘হায় ভগবান! এখনো বিয়ে হলো না, এরই
মধ্যে বুড়ো আমার ঘাড় মটকাতে শুরু করেছে!’
মনে মনে ভাবল গণেশ।

৪

অবশেষে বিয়েটা হয়েই গেল। পরদিন যথারীতি
উঠোনের ওপর কম্বল পেতে গণেশকে বসতে
দেওয়া হলো। সামনে রাখা হলো সাদাটে,
অখাদ্য খিচুড়ি। রামলগন খিচুড়ির পাশে কাঁসার
থালায় ১০০ ডলার রাখল, কিন্তু গণেশ খিচুড়ির
দিকে তাকাল না পর্যন্ত। অতিথিদের মধ্যে কেউ
কেউ অল্প কিছু টাকা দিল। কিন্তু গণেশ চুপচাপ
বসেই রইল। রামলগন আরও ১০০ ডলার
রেখে বলল, ‘বাবা, এবার খাও।’

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল, ‘রামু, আরও
পয়সা ঢালো।’

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে রামলগন বলল, ‘ও
যেন ভুলেও না ভাবে যে আমি আরও টাকা
দেব। ব্যাটা উপোস করে মরুক না। আমার
কী?’ গজগজ করতে করতে চলে গেল
রামলগন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আরও ২০০
ডলার ফেলে ফিসফিস করে বলল, ‘বাবা
সাহেব, আমাকে দেওয়া কথা ভুলো না। খাও।’
‘খাবে না, খাবে না।’ ভিড়ের মধ্য থেকে চৈঁচিয়ে
বলল কে যেন।

‘দূর হ, ব্যাটা।’ খেঁকিয়ে উঠল রামলগন। আবার
ফিসফিসিয়ে গণেশকে বলল, ‘সাহেব, আর
লজ্জা দেবেন না। দয়া করে খেয়ে নিন।’ গণেশ
নড়ল না। শেষমেশ রামলগনের কাছ থেকে
একটি গরু, একটি বাছুর, নগদ ১৫ হাজার
ডলার আর ফুয়েন্ট গ্রোভের বাড়িটা লিখে
নেওয়ার পর গণেশ খায়। গণেশের বাড়ির এত
দিনের খাবারের বিলও বাতিল করতে হলো
রামলগনকে।

‘আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম। ও আগে থেকেই
জানত, আমি ওকে এগুলো দিয়ে দেব।’ দরদর
করে ঘামতে ঘামতে বলল রামলগন। ভি এস
নাইপল: ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে
জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল ও
বুকারজয়ী ব্রিটিশ লেখক। জন্ম ১৭ আগস্ট,
১৯৩২।

অনুবাদ: আলিয়া রিফাত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৯, ২০১০

364) কে বেশি জানে

আমি কিছুই জানি না—আমি এটা নিশ্চিত জানি।

কিন্তু যেহেতু আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না, তার মানে আমি একটা কিছু জানি।

আমার বস জানেন যে আমি কিছুই জানি না।

তাঁর ধারণা, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।

তবে তিনিও জানেন যে আমি কিছুই জানি না

এবং আমিও জানি যে আমি কিছুই জানি না।

অর্থাৎ আমরা জানি সমপরিমাণ।

যদিও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমি

জানি যে, আমার বস জানেন যে আমি কিছুই

জানি না এবং তিনি তা জানেন না, সুতরাং

আমি জানি তাঁর চেয়ে দুই গুণ বেশি।

আবার দেখুন, আমার বস জানেন না যে, আমি

জানি যে তিনি জানেন যে আমি কিছুই জানি

না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, তিনি আমার তুলনায়

অধিক জানেন।

যেহেতু আমি জানি যে, আমি জানি যে আমার

বস জানেন না যে আমি জানি যে তিনি জানেন

না। অর্থাৎ আমি অনেক কিছুই জানি এবং

আমার বস অনেক কিছুই জানেন না।

এখন উপসংহার টানা যাক: আমি জানি যে,

আমি কিছুই জানি না; আমি জানি যে, আমার

বস জানেন যে আমি কিছুই জানি না; আমি

জানি যে, আমার বস জানেন না যে আমি জানি

যে আমি কিছুই জানি না। এর অর্থ আমি সব

জানি।

পক্ষান্তরে আমার বস কেবল জানেন যে, আমি

কিছুই জানি না এবং জানেন না যে, আমি জানি

যে আমি কিছুই জানি না; আরও জানেন না যে,

আমি জানি যে তিনি জানেন যে আমি কিছুই

জানি না। অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তিনি কিছুই জানেন

না। আর আমি তো জানিই যে, তিনি কিছুই

জানেন না।

তাহলে আমাদের মধ্যে কে বেশি জানে? আমি,

যে কিছুই জানে না? নাকি আমার বস, যিনি

জানেন যে আমি কিছুই জানি না, তবে জানেন

না যে, আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না

এবং এও জানি যে, তিনি জানেন যে আমি

কিছুই জানি না? আর তিনি কিন্তু জানেন না যে,

আমি এটা জানি... মালখাজ সোতাদজে

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

365) 'মানুষ' বিষয়ে গরুদিগের রচনা লিখন

আমরা অর্থাৎ মানুষেরা পুরো ছাত্রজীবন ধরেই গরু নিয়ে রচনা লিখেছি। যেহেতু এখন দিন বদলেছে, অতএব এই দিনবদলের হাওয়া গরুর গায়ে লাগতেই পারে। তাই গরুও উল্টো রচনা লিখতে পারে মানুষকে নিয়ে। লিখতে পারে মানে? আরে লিখেই তো ফেলেছে। নানা গরুর খাতা থেকে সেই সব রচনা সংগ্রহ করে তুলে ধরেছেন ইকবাল খন্দকারবকনা বাছুরের লেখা রচনা

মানুষ একটা স্বার্থপর প্রজাতির জীব। কারণ সে সব সময় তক্কে তক্কে থাকে, কখন আমার মায়ের দুধ দুইয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে। নিজেরা তো দুধ খায়ই, বাকিটা বিক্রি করে দেয় মোড়ের চায়ের দোকানদারের কাছে। মানুষের কান, নাক, গলা—সবই আছে। শুধু গলায় আমার মতো দড়ি থাকে না। তবে কেউ কেউ যে গলায় দড়ি পরে না, তা কিন্তু নয়। এই দড়িকে অবশ্য চেইন বা মালা বলা হয়। তবে এই দড়ি দিয়ে তাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় না। মানুষের মাথায় কালো কালো লোম থাকে। তারা সেই লোম ছোট করার জন্য মাসে একবার সেলুনে যায়। মানুষ কানে আমাদের চেয়ে অনেক খাটো। তবে সেই কানে তারটার লাগিয়ে তাদের গান শুনতে দেখা যায়। মানুষ এমনিতে কথা বলতে পারলেও ঘুমালে আর কথা বলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একটা জাত আছে, যাদের বলা হয় পশু ডাক্তার। তারা আমাদের কোনো অসুখবিসুখ হলেই সাইকেল নিয়ে দৌড়ে আসে। উপকারী প্রাণী হিসেবেও মানুষ মন্দ নয়। কারণ তারা প্রতিদিন সকালে আমাদের থাকার ঘর পরিষ্কার করে দেয়। এর জন্য কোনো প্রকার চাদা দাবি করে না। গাভির লেখা রচনা

মানুষ একটা দুশ্চলোভী প্রাণী। আমার দুধ দোহানোর জন্য তাদের সে কী তাড়না! তবে তারা বেশ রোমান্টিক জীবকুল। আমার গর্ভে বাচ্চা আসার আগে যখন রোমান্টিক ষাঁড়ের সংস্পর্শ পেতে ইচ্ছা করছিল, তখন তারা আমার জন্য অভিসারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

মানুষ খুবই ভোজনরসিক। বিশেষ করে যখন সস্তায় এবং ফ্রিতে কোনো কিছু পায়। ফ্রিতে পেলে নাকি তারা আলকাতরাও খেয়ে ফেলতে পারে। তবে আমাদের খইল-কুঁড়া খেতে পারে কি না, সেটা অবশ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তারা ভোজনরসিক হওয়ার কারণে তাদের কারও কারও পেট আকার-আকৃতিতে আমাদের পেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যায়। মানুষ পানি খাওয়ার জন্য আমাদের মতো গামলা ব্যবহার না করে গ্লাস বা বোতল ব্যবহার করে থাকে। পা থাকা সত্ত্বেও তারা গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। তারা এমনিতে সব সময় দোপায়া সেজে থাকলেও হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে যাওয়ার সময় চারপায়া সাজে। মানুষকে নিয়ে আরও লেখার ছিল। কিন্তু বাচ্চাটা বড্ড ডিস্টার্ব করছে। ষাঁড়ের লেখা রচনা

মানুষ গৃহপালিত কঠিন দিলবিশিষ্ট প্রাণী। কারণ এমন কঠিন কাজ নেই, যা তারা আমাকে দিয়ে করায় না। তারপর আবার যখন-তখন ফট করে বাড়ি বসিয়ে দেয় বেত দিয়ে। যা-ই হোক, মানুষের নাক, কান, মুখ— সবই আছে, শুধু আমাদের মতো ডাগর ডাগর চোখ নেই।

যেগুলো আছে, তাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মানুষ গান গাওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে তাদের মধ্যকার কারও কারও গান এতটাই আপত্তিকর যে আমরা সেই গান শুনে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা রিস্ক নিয়ে ফেলি। মানুষ তাদের কথাবার্তায় রেফারেন্স হিসেবে গরুর কথা টেনে আনে। যেমন—এই, এমন ষাঁড়ের মতো চোঁচাচ্ছিস কেন, বলদের মতো কথা বলবি না তো ইত্যাদি। মানুষের কাছে টিভি নামের একটা যন্ত্র আছে, যা দেখতে দেখতে তারা ঘুমায়। আর তারা ঘুমানোর সময় খুবই সাবধানে ঘুমায়। যে কারণে এক মশারিতেই তাদের চলে যায় ম্যালা দিন। অথচ আমাদের মশারি রাতে টানিয়ে দিলে সকালেই শেষ। তাই আমাদের উচিত মানুষের যত্ন নেওয়া। অন্তত শিশুর আগায় ঝোলানোর অপচেষ্টা না করা। গাড়িয়াল ভাইয়ের গরুর লেখা রচনা

মানুষ অত্যন্ত বিবাহপ্রবণ প্রাণী। আমাদের দিয়ে গাড়ি বানিয়ে সেই গাড়িতে করে শুধু নতুন বউ আনত। এখন অবশ্য একটু কমেছে। না না, বিবাহ কমেনি, কমেছে আমাদের ব্যবহার। তবে

সমস্যা হলো, তারা আমাদের ভাষা বোঝে না। ভাষা শেখার জন্য তারা এত এত কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়, কিন্তু আমাদের মানে গরুর ভাষাটা কেন যে শিখে নেয় না! মানুষ কানকথা বলতে খুব পছন্দ করে। যে কারণে তারা যখন বউ নিয়ে আমার গাড়িতে যায়, তখন খালি কী সব কথা জানি বলত আর আন্তেধীরে হাসত। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বাঁশের ফুটায় ঠোঁট লাগিয়ে ফুঁ দেয়। এই জিনিসটাকে অবশ্য বাঁশি বলা হয়। আর যারা ফুঁক দেয়, তাদের বলা হয় রাখাল। ‘রাখাল’ শব্দটা শুনে খালের মতো মনে হলেও এটা কোনো খাল নয়। এ ছাড়া খুশি মনে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করা যায় না। কারণ আমাদের বুক আর মানুষের বুক কেমন যেন খাপ খেতে চায় না। গঠনটাই কেমন যেন। বেখাপ্পা। সদ্য জন্ম নেওয়া একটা বাছুরের লেখা রচনা

মানুষ অত্যন্ত ভালো জাতের প্রাণী। তার আমার মতো একটা শিংবিহীন মাথা রয়েছে। হাত-পা তো রয়েছেই। তবে সেগুলো আমার মতো নয়। কারণ সে পায়ে জুতা পরে। হাতে ঘড়ি লাগায়। মোবাইল ফোনও রাখে মাঝেমধ্যে। তার দুটি চোখ রয়েছে। এই চোখের ওপর কেউ কেউ ঢাকনা লাগায়। এই ঢাকনার নাম চশমা। সে আমাকে খুবই খাতির-যত্ন করে। তবে যতই খাতির-যত্ন করুক না কেন, রাতের বেলা আমাকে তার মতো বালিশে শুতে দেয় না। মানুষেরও আমাদের মতো একটা একটা করে বাচ্চা হয়। তবে তারা থাকে জন্মের অলস। আমরা হাঁটি এক ঘণ্টায়, আর তারা এক বছরেও হাঁটতে পারে না। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, মানুষের বাচ্চাদের জন্মের সময় তো লেজ থাকেই না, এমনকি পরবর্তী সময়েও আর গজায় না বলে জানা যায়। মানুষ আমাদের নিয়ে মাঠে গেলেও আমাদের সঙ্গে ঘাস খায় না। তবে কিছু কিছু ঘাস বাড়িতে এনে রান্না করে খায়, যাকে তারা শাক বলে। তাদের গায়ে জামা থাকায় তারা আমাদের মতো যেখানে-সেখানে হিসুটিসু করতে পারে না। এখন পর্যন্ত মানুষকে ভালো জীব বলেই ধারণা হচ্ছে। তবে মায়ের কাছ থেকে পুরো বায়োডাটা নিতে হবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

366) শিশু অধিকার

নতুন কিছু একটা করতে হবে। এ কথাটা মাঝেমধ্যেই কানের পর্দায় এসে বাড়ি মেরে যায়। পুরোনো যা কিছু, সব বদলে ফেলে নতুন করে গড়তে হবে। এই বাক্য এখন বাজারের পচা কুমড়োর মতো এখানে-সেখানে পড়ে থাকে। তার পরও এসব কথা কেউ কেউ বলেই খালাস, আবার কেউ কেউ করে দেখায়। তো সেই করে দেখানোর নমুনা কেমন, তার একটা ঘটনা বলি।

কী এক সেবাপ্রতিষ্ঠানের দুই কর্মীকে তাদের বস হুকুম দিয়েছেন, সামনে ‘শিশু অধিকার’ দিবস, কিছু একটা করতে হবে। শুধু করলেই হবে না, সবাই যেন চমকে যায়, এমন কিছু। দুজনের মাথা ঘুরছে, কী করা যায় তা ভেবে ভেবে। মানুষকে চমকাবে কি, নিজেরাই ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে। বস আসার আগে ভেবে কিছু বের করতে না পারলে খবর আছে। দুম করে টেবিলে একটা কিল বসিয়ে একজন বলে, ‘ভাই, একটা কিছু বলেন, তা না হলে বস দুজনেরই চাকরি খেয়ে ফেলবে।’

অপরজন ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলেন, ‘আমি কেন, আপনিই বলেন।’

‘কী জানি, আমার মাথায় কিছু আসছে না!’

‘আচ্ছা, একটা শোভাযাত্রা করলে কেমন হয়, ছোটদের নিয়ে?’

‘ঠিক বলেছেন, শোভাযাত্রা হলেই তার সঙ্গে নানা রকম প্রোগ্রাম জুড়ে দেওয়া যাবে।’

‘আর ধরেন, বিষয়টা হবে পরিবেশ।’

‘আরে, এটা তো পরিবেশ দিবস না, শিশু অধিকার দিবস।’

‘তাতে কি! শিশুদের নানা রকম অধিকারের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ থাকতে পারে না?’

‘তা তো পারে, কিন্তু কীভাবে কী করা যায়, বলেন তো?’

‘কেন, আমরা এখন নানা রকম দূষণের মধ্যে বাস করছি। সেটা থেকে মুক্তি চাইতে পারি। কী বলেন!’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।’

‘অতএব “দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই” স্লোগানে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে ফেলতে হবে।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো হবে। আর সেই সঙ্গে, ধরেন, আমাদের মহিলা কর্মীরা থাকবেন।’

তাদের পরনে থাকবে সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ি।’

পুরো প্লানটা ছকে ফেলতে ফেলতে বস চলে এলেন। একজন তখন শোভাযাত্রার সঙ্গে আর কী কী করা যায় তার একটা তালিকা বানাচ্ছিল। অন্যজন সেই ফাঁকে বসের ঘরে গিয়ে ঢোকে, স্যার, শিশুদের একটা শোভাযাত্রার আইডিয়া ঠিক করেছি। স্লোগান হবে, ‘দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই’।

বস মুগ্ধ চোখে তাকান, ‘ওহ! তারিক, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা যে কীভাবে করব, বুঝতে পারছি না।’

‘না, না, স্যার, এ আর এমন কী। কী কী লাগবে তার একটা তালিকা বানাতে লাগিয়ে দিয়েছি মহসিনকে।’

‘গুড, ভেরি গুড। ওটা হয়ে গেলেই একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল করে ফেলতে হবে।’

‘সেটাও করে ফেলব, স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না।’

‘হ্যাঁ, দেখো খুব অ্যাট্রাকটিভ যেন হয়।’

ডোনারদের ফাঁসাতে হলে জাঁকজমক দরকার।’

তালিকা হয়ে গেলে বস এসে ঢোকে তাদের ঘরে। তারিকের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘তাহলে তারিক, প্রজেক্ট প্রোফাইলটা করে ফেলো।’

ততক্ষণে আমি কয়েকটা খোঁজখবর লাগাই, যেন ভালো কিছু ডোনার ধরা যায়।’

তারিক উত্তর দেয়, ‘আপনি চিন্তা করবেন না, স্যার, সব হয়ে যাবে।’ ‘দেখবে ভুলটুল হয় না যেন।’ তার পরই বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারিক মহসিনকে বলে, ‘তাহলে প্রজেক্ট প্রোফাইলটা তৈরি করে ফেলেন।’

মহসিন কিছুটা শুকনো গলায় বলে, ‘আপনাকে করতে বললেন যখন, তখন আপনিই করেন।’

তারিক অবাক হওয়ার সুরে বলে, ‘কী যে বলেন না আপনি, আমাকে একা বলেছে নাকি! স্যার তো জানেন আপনিই সব করবেন। ভদ্রতা করে আমাকে বলে গেলেন।’

পরদিন প্রোজেক্ট প্রোফাইলের ফাইলটা হাতে নিয়ে মহসিন দ্বিধায় দাঁড়িয়ে থাকে বসের ঘর থেকে খানিকটা দূরে। তারিক বলেন, ‘কী, ভয় পাচ্ছেন? আমাকে দিন, যদি টুকটাক ভুল থাকে, তা আমি সামলে নেব।’

এরপর তারিক বসের প্রশংসায় সিক্ত হয়ে বের

হয়ে আসেন। তিনি নিশ্চিত এবার তাঁর ফ্ল্যাট বুকিংয়ের টাকাটা বোনাস হিসেবে পেয়ে যাবেন। মহসিনকে এসে অবশ্য বলেন, ‘বসরা যা হয়, বোঝেন তো। শুধু বললেন, ভালো হয়েছে, আর কিছু না।’

কয়েক দিন পর সকাল আটটায় দেখা গেল বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়েছে। শ দেড়েক বাচ্চা ঘোড়ার গাড়ি আর রিকশা-ভ্যানে করে স্লোগানে স্লোগানে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে আছেন তারিক তাঁর দলবল নিয়ে। হলুদ শার্ট পরে বাচ্চাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। গতকাল বস তাঁর নতুন কেনা গাড়িতে করে লিফ্ট দিয়েছেন। যেতে যেতে বলেছেন, বিদেশি মেহমানরা আসবে তো, তাই পুরোনো গাড়িটা পাল্টে ফেলতে হলো। তারিকও আভাসে-ইঙ্গিতে ফ্ল্যাট বুকিংয়ের কথাটা জানিয়েছে। মনে হয়, হয়ে যাবে। আজকের কাজটা সেই জন্য একেবারে নিখুঁতভাবে করতে হবে। একটা বাচ্চা ভ্যানের ওপর ঘুমিয়ে পড়ছিল। তাকে এক ধমক দিয়ে জাগিয়ে তুলল। চারদিকে অফিসযাত্রীর ভিড়, একেবারে জ্যাম লেগে গেছে। তাদের শোভাযাত্রার জন্য গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। বিশাল লাইন হয়েছে গাড়ি, রিকশা আর বাসের। ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেছে, নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটা বাচ্চাদের বলে, ‘সবাই জোরে বলো, দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই।’

বাচ্চারা কাশতে কাশতে বলে, ‘দূষণমুক্ত খক্ খক্ পরিবেশ খক্ খক্-চাই, খক্ খক্ খক্...।’ সাজ্জাদ কবীর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

367) বিস্তারিত উত্তর

পরীক্ষার খাতায় আমরা সংক্ষিপ্ত উত্তরের পাশাপাশি বিস্তারিত উত্তর দিয়ে অভ্যস্ত হলেও এমনিতে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর সব সময়ই সংক্ষিপ্ত আকারে দিই। এই উত্তরগুলো যদি সংক্ষিপ্ত আকারে না দিয়ে বিস্তারিত দেওয়া হয়, তাহলে কেমন হতে পারে, আসুন, দেখি।
জানাচ্ছেন লরা খন্দকারপ্রশ্ন: আসতে পারি?
(যখন কেউ ঘরে ঢোকার অনুমতি চায়)
সংক্ষিপ্ত উত্তর: আসুন।

বিস্তারিত উত্তর: দেখুন, মানুষ পারে না, পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই। আপনি যে

একজন মানুষ, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অতএব আপনিও যেকোনো কাজ করতে পারবেন, এটাই স্বাভাবিক। অথচ আপনি জানতে চাইছেন আসতে পারেন কি না।

অবশ্যই আসতে পারেন। আপনাকে পারতেই হবে। এই সামান্য একটা কাজ যদি না পারেন তাহলে কঠিন কাজগুলো কীভাবে পারবেন, বলুন। আসুন, আসুন।

প্রশ্ন: কেমন আছেন? (কুশলবিনিময়ের ক্ষেত্রে)
সংক্ষিপ্ত উত্তর: ভালো।

বিস্তারিত উত্তর: আপনার আমার বেঁচে থাকার জন্য শরীর যেমন দরকারি, মনও তেমন দরকারি। ভালো থাকতে হলে শরীর-মন দুটোই ভালো রাখতে হবে। আমার মন ভালো আছে কি না সেটা বলতে পারবে মনোরোগ চিকিৎসক, শরীর ভালো আছে কি না সেটা বলতে পারবে ডাক্তার। আমি যেহেতু দুটোর একটাও নই, অতএব আমার পক্ষে বলা সম্ভব না, আমি কেমন আছি। তবু আপনি যেহেতু জিজ্ঞেস করেছেন, অতএব অনুমানেই বলে দিচ্ছি, ভালো আছি। প্রশ্ন: আপনি এখন কই? (ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই করা হয় এই প্রশ্নটা)

সংক্ষিপ্ত উত্তর: আমি এখন শাহবাগ। (বা অন্য যেকোনো জায়গায়)

বিস্তারিত উত্তর: দেখো মিয়া, দুনিয়ায় যেই পরিমাণ মিথ্যা কথা হয়, তার সাড়ে নিরানব্বই ভাগই হয়ে থাকে মোবাইল ফোনে। পাওনাদার ফোন করলে কয়, সে এখন কক্সবাজারে আছে। অথচ আছে কিন্তু কারওয়ান বাজারে। তবে এই ক্যাটাগরির মিথ্যাবাদী আমি না। তুমি জানতে চাইছো আমি কই। আমি চুল পরিমাণ মিথ্যা না বইলা খাঁটি সত্য কথাটা বলতেছি। জি, আমি এখন শাহবাগ ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়ানো। প্রশ্ন: একটা প্রশ্ন করতে পারি? (বিশেষ কিছু জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে)

সংক্ষিপ্ত উত্তর: করুন।

বিস্তারিত উত্তর: প্রশ্ন সাধারণত শিক্ষকেরা করে থাকেন। আর সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় পরীক্ষার হলে গেলে। আহ্, এক একটা প্রশ্নপত্রে কতগুলো প্রশ্ন। ন্যূনতম ১০টা। সব সময় শিক্ষকেরা প্রশ্ন করেন বলে যে আপনি করতে পারবেন না, তা কিন্তু নয়। এ ছাড়া এ ধরনের কোনো আইনও হয়নি। আপনি শিক্ষক

না হয়েও অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারবেন। এবং সেই অনুমতি এখন এই মুহূর্তে আমি আপনাকে দিচ্ছি। জি, প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন: মামা, কই যাইবেন? (পথচারীর প্রতি রিকশাওয়ালায় প্রশ্ন) সংক্ষিপ্ত উত্তর: নয়াপল্টন বা অন্য যেকোনো জায়গায়।

বিস্তারিত উত্তর: রিকশাওয়ালাদের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। তারা ইচ্ছে করলেই সব যাত্রীর কাজক্ষিত স্থানে নিয়ে যেতে পারে না। যেমন ধরো, আমি যদি এখন বলি আমি নয়াদিল্লি যাব, তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। অতএব ফটাস করে কাউকে ‘কই যাইবেন’ প্রশ্ন করে বসা ঠিক না। তবু যেহেতু করেই ফেলেছ, আর আমিও যেহেতু আপাতত নয়াদিল্লি যাচ্ছি না, তাই বলেই ফেলি, আমি নয়াপল্টন যাব। প্রশ্ন: আপনি কী করেন? (কেউ কারও পেশা সম্পর্কে জানতে চায় এভাবে)

সংক্ষিপ্ত উত্তর: চাকরি বা অন্য কিছু।

বিস্তারিত উত্তর: একজন মানুষকে যে কত রকমের কাজ করতে হয়, কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করার পর থেকে সেই যে শুরু হয় কাজ, একেবারে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

আমাকেও নানা ধরনের কাজ করতে হয়। আমি নির্দিষ্ট কোনো কাজ করি না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি আমার পেশা সম্পর্কে জানতে চেয়ে থাকেন তাহলে বলব, আমি একটা চাকরি করছি।

প্রাইভেট কোম্পানিতে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

368) আগামীকাল থাকছে...

রস+আলো প্রকাশের আগের দিন মূল পত্রিকায় ঘোষণা দেওয়া হয়, আগামীকাল থাকছে রস+আলো। সঙ্গে অমুক-তমুক। আরও অনেক কিছু মজার কিছু। এই ‘আগামীকাল থাকছে’র স্টাইলটা যদি আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করি তাহলে কেমন হয়, আসুন, দেখা যাক। দেখাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার আগামীকাল...

যারা প্রায় প্রতিদিনই শপিংয়ে যায়, দোকানদারেরা তাদের খুব ভালো করেই চেনে। তারাও ধান্ধায় থাকে তাদের এমনভাবে পটাতে, যাতে তারা আগামীকালের শপিংটাও এই

দোকান থেকেই করে। তাই তারা আগামীকালের জন্য দিয়ে রাখতে পারে টুকটাক অফার।

আগামীকাল থাকছে—৪ আপনার জন্য পুরো হাফ লিটার ঠান্ডা পানীয়। আজ অবশ্য হাফ লিটারের চেয়ে একটু কম ছিল।

৪ এসির ভলিউম কাল আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

৪ আজ যদিও স্টিলের চেয়ারে বসেছেন, কাল বসতে দেওয়া হবে ফোমের চেয়ারে। ইজি চেয়ার দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

৪ আজ ভুল করে একবার আন্টি বলে ফেললেও কাল আর এই ভুল হবে না। কারণ আপা ডাকতে ডাকতে আমরা দরকার হলে টায়ার্ড হয়ে যাব।

৪ আপনার যাবতীয় ব্যাগ আমাদের মালিক নিজে গিয়ে আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

ব্যাপক সাধাসাধিসহ আরও থাকছে অনেক কিছু, ছাড়সংক্রান্ত কিছু। আগামীকাল...

আজকের মতো আগামীকালও প্রেমিকাকে ডেটিংয়ে আনতে চাইছে প্রেমিক। কিন্তু প্রেমিকা আসতে রাজি না। সে এটা-ওটা অজুহাত দেখাচ্ছে। তাই প্রেমিক তার প্রেমিকাকে জানাতেই পারে, আগামীকাল যদি সে আসে তাহলে তার জন্য কী কী বিশেষ আকর্ষণ থাকছে।

আগামীকাল থাকছে—

৪ ঘণ্টাখানেক তোমার রূপের বিস্তারিত প্রশংসা।

৪ আমার মোবাইল ফোন থেকে যেখানে-সেখানে কল করার সুযোগ।

৪ চরম গরমে আরাম দিতে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে তালপাতার পাখার সুবাতাস।

৪ তোমাকে নিয়ে লেখা মেগা-কাব্যের পাঠ।

৪ চাহিবামাত্র যেকোনো ক্যাটাগরির খানা হাজির করার প্রক্রিয়া।

সদ্য মুখস্থ করা প্রেমের নানাবিধ ডায়ালগসহ আরও অনেক কিছু, রোমান্টিক কিছু। আগামীকাল...

বাচ্চাদের ভুলিয়েভালিয়ে পড়াতে হয়। নইলে

আজ স্কুলে এসেছে তো কাল আসবে না। কাল যাতে আসে সে জন্যই আগের দিন জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে পরের দিনের আয়োজনের

কথা।

আগামীকাল থাকছে—

৪ দুইটা চকলেট আর তিনটা চকলেট মিলে
কয়টা চকলেট হয়—চকলেট নিয়ে এই জাতীয়
অঙ্ক।

৪ অঙ্ক ভালো না লাগলে গোপালভাঁড়ের ঘটনা
বলে বলে দারুণ হাসাহাসি।

৪ তাও ভালো না লাগলে ‘টম অ্যান্ড জেরি’ নিয়ে
আলোচনা।

৪ কে কত বড় মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছে,
এ নিয়ে কথাবার্তা।

৪ যারা ক্লাসে ঘুমিয়ে যেতে চাইবে তাদের জন্য
ঘুমানোর সুব্যবস্থা।

কিলাকিলি, চিমটাচিমটি, হইহল্লা—এসব নিয়মিত
কর্মকাণ্ড ছাড়া আরও অনেক কিছু, বিরাট
কিছু। আগামীকাল...

মনে করুন, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি
কোনো এলাকায় যান নিয়মিত। সে এলাকার
ছেলেপেলে আপনার উদ্দেশ্য ঠাহর করতে পেরে
আপনাকে আলটিমেটাম দিয়েছে, কাল থেকে
যেন আপনাকে আর এই এলাকায় না দেখে।
দেখলে...

আগামীকাল থাকছে—

৪ যথারীতি দাবড়ানি। তবে আজকের দাবড়ানির
চেয়ে সেটা হবে আরও বেশি পাওয়ারফুল।

৪ হালকা চটকানি। পরিস্থিতি সাপেক্ষে
চটকানিটা হালকার চেয়ে ঘনত্বের অধিকারী
হতে পারে।

৪ পকেটে বড় কোনো নোট পাওয়া গেলে সেটা
হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

৪ কান ধরে অত্যন্ত দ্রুত উঠ-বসকরণ প্রক্রিয়া।

৪ শনির আখড়ার দৌড়ের চেয়ে আরও
জমজমাট দৌড়ানির সুব্যবস্থা।

চৌদ্দ-পনেরো গোষ্ঠী উদ্ধার করে গালিগালাজসহ
আরও অনেক কিছু, জঘন্য কিছু। **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

369) সাঁতার শেখা

পেতিকন খুব অদ্ভুত ধরনের। আমি ওকে
অনেক দিন থেকেই চিনি। বিয়ে করেনি। আর
আমাদের ১৭এ নম্বর বাড়িতেই থাকে সে। খুব
চাপা আর চুপচাপ। কখনো গান গাওয়া বা
গিটার বাজানো—এসব কিছুই করে না সে। খুব
গম্ভীর আর ভদ্রও। পেতিকন একটা কারখানার

পরীক্ষাগারে কাজ করে।

আমি এখন একটা ঘটনার কথা বলব, যাতে পেতিকন আর আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। আর আমি ভয়ে মরো মরো হয়ে গিয়েছিলাম। এত ভয় পেয়েছিলাম যে সেই থেকে ঠিক করেছিলাম, আর কাউকে কখনো সাঁতার শেখাতে যাব না। আমিও একটু ভীতু ধরনের। কাউকে ডুবে যেতে দেখতে পারি না।

ব্যাপারটা হলো, এ বছর ছুটিতে আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথম দিনেই আমি সমুদ্রের তীরে পেটকিনের দেখা পেলাম।

বদমাশটা তার গায়ের রং বাদামি করার জন্য শক্ত একটা পাথরের ওপর শুয়ে ছিল। লক্ষ করলাম, সমুদ্রের দিকে যাওয়ার তার কোনো ইচ্ছা নেই।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্নান করতে সমুদ্রে যাবে না?’

‘—না, পরফিরি নিকোলায়েভিচ।’ বলল সে লাল হয়ে। ‘ছোটবেলা থেকেই পানিতে আমার বড় ভয়। সমুদ্র তো দূরের কথা, নদীকেও আমি ভয় করি। পানির ভেতরে কী আছে, কিছু বোঝা যায় না। আর অগাধ পানিতে পড়লে তো কথাই নেই।’

অদ্ভুত এই পেতিকন। তার কথায় আমার হাসি পেল। বয়সে যুবক, অথচ পানিতে এত ভয়! তা ছাড়া নানা রকমের খেলাধুলায় এখানে সবাই মত্ত। মেয়েরাও।

কাজেই পেতিকনকে বললাম, এটা খুব খারাপ। মেয়েরাও তোমাকে দেখে হাসবে। কমরেড পেতিকন, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। তোমার অভ্যাস বদলানো দরকার।

ছোটদের মতো লজ্জা পেয়ে সে বলল, কী করব, এটাই আমার স্বভাব! কথায় আছে, স্বভাব যায় না মলে।

জোর গলায় বললাম, ইচ্ছে করলে সবই হয়। তুমি সাঁতার শেখো। আমি তোমাকে শেখাব। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।

শুনে সে ভয় পেয়ে বলে উঠল, না, না। তা হয় না। আমি পারব না। আগে শিখলে হতো। বললাম, ভয় নেই। দায়িত্ব নিচ্ছি আমি। কাল থেকেই শুরু করা যাক।

সে কিছু বলল না। কী আর বলবে? আমি অনেক করেই তার মনে সাহস এনেছিলাম।

পরের দিন আমি পেতিকনকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এলাম। বেচারি আমার সঙ্গে যেন ফাঁসির মঞ্চে এল। আমরা আগেই সাঁতারের পোশাক পরে নিয়েছিলাম।

‘নাও, এসো পানিতে!’ বেশ জোর গলায় বললাম।

সে চোখ বন্ধ করে পানিতে নামল। আর তখন থেকেই মজা শুরু হলো। কোনোরকমে হাঁটুপানি পর্যন্ত এগিয়েই ভয়ে পালিয়ে আসতে লাগল সে। আমি তাকে তাড়া করলাম। সে অন্যদিকে দৌড়ে চলে গেল। শয়তানটা কেবল ডাঙায় চলে আসতে চায়। এভাবে চলল ঘণ্টাখানেক। আর আমিও তাকে তাড়াতে-তাড়াতে হাঁফিয়ে উঠলাম।

শেষ পর্যন্ত সে সমুদ্রের তীরে এসেই বালিতে শুয়ে পড়ল। বলল, প্লিজ, পরফিরি নিকোলায়েভিচ, আমার দ্বারা সাঁতার শেখা হবে না। মাফ করো।

‘উহু।’ আমি বললাম, ‘কাল আবার হবে।’

একবার যখন ধরা হয়েছে, ছাড়া যাবে না কিছুতেই। সাঁতার তোমাকে শেখাবই—এ আমার শেষ কথা।’

পেতিকন পরের দিন এল। যেন সে একজন হত্যাকারী আর আমি তাকে দণ্ডদেশ দেব। আজ থাক না?

না, না। এসো, পানিতে এসো।

আমি তাকে নিয়ে পানিতে নামলাম। তাকে সাঁতারে হাত-টানার কায়দা দেখাতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পেতিকন হাত-টানার কায়দাটা শিখে নিল। তবে পা চালানো ঠিক হলো না। পানির নিচের মাটি থেকে পা তুলতে সাহস পাচ্ছিল না সে। শেষে চেষ্টা করে তার একটা করে পা উঠাতে পারলাম মাটি থেকে। কিন্তু দুটো পা একসঙ্গে কিছুতেই ওঠাতে পারল না সে। আমিও আর পারলাম না ওর সঙ্গে।

সেদিনকার মতো বাদ দিলাম।

পরের দিন পেতিকনকে নিয়ে এসে দেখি, সমুদ্রে খুব ঢেউ। পেতিকনকে বললাম, আজ আর হবে না দেখছি। খুব ঢেউ। যাক, বেঁচে গেলে আজ।

কিন্তু পেতিকন বেশ অদ্ভুত রকমের, আগেই বলেছি। সে সাঁতারের পোশাক পরে নিয়ে বলল, তোমার চেষ্টায় এতটা শিখে আমি যদি প্র্যাকটিস

না করি, আবার তাহলে ভুলে যাব। পানির ধারেই একটু হাত-পা ছুড়ি, কী বলো? বলেই শয়তানটা কী করল জানো? সোজা পানিতে গিয়ে ঝাঁপ দিল। দেখেই আমি ছুটে গেলাম, আরে, কী করছ? বড় বড় ঢেউ আসছে। তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যে! সর্বনাশ! দেখি প্রচণ্ড ঝড় উঠল। পেতিকনকেও আর দেখা যাচ্ছে না। আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম, কমরেড পেতিকন, কমরেড পেতিকন!

১০ গজ দূরে সমুদ্রের পানিতে হঠাৎ দেখি, কী যেন ঢেউয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার পোশাক-আশাক ছেড়ে পানিতে লাফিয়ে পড়লাম। ঢেউ আমার ওপর দিয়ে গিয়ে আমাকে ঠেলে পেছিয়ে নিয়ে এল। আমি তীরে এসেই লাফিয়ে উঠে চোঁচাতে আরম্ভ করলাম, ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, শিগগির এসো, একটা লোক ডুবে যাচ্ছে! শুনে লোকজন ছুটে এল। তাদের মধ্যে যাদের সাহস আছে, তারা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানির পুলিশেরাও ছুটে এল তাড়াতাড়ি। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো নিজের মনে কী যেন বকতে লাগলাম।

হঠাৎ দেখি, প্রায় ৫০ গজ দূরে একটা লোক উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতার কাটছে। আর কী চমৎকার সাঁতার কাটছে। ভয়ংকর ঢেউগুলো তার কাছে যেন কিছুই না। সমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো একজন নাবিক তার বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ভালো করে দেখে বলল, না, না, ভাবনার কিছু নেই। ওই লোকটা তো দেখছি বিখ্যাত সাঁতারু পেতিকন। বহু পুরস্কার বিজয়ী। নাম শোনোনি ওর, পেতিকনের?

পেতিকন! এবার সবাই আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, হে ধরণী দ্বিধা হও! ওই পেতিকন, শয়তান, কদিন ধরে আমাকে নিয়ে মজা করল। সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো কাউকে সাঁতার শেখাতে যাব না। জি রিকলিন: রুশ লেখক।

অনুবাদ: কুমারেশ ঘোষ

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৫, ২০১০

370) উপন্যাস রচনারহস্য

‘আমাকে এখন যেতে হবে।’ বলল লেখক
পেত্রোভের পরিচিত এক মেয়ে। একসঙ্গে
সিনেমা দেখার পর সে এসেছে লেখকের ঘরে।

‘কফির জন্য ধন্যবাদ।’

‘নাকি থেকে যাবে?’

‘এটা কি ভূমিকা?’

‘ভূমিকা নয়, আস্ত এক উপন্যাস।’ চালাকি
করার চেষ্টা করলেন পেত্রোভ।

‘লেখকদের পরিভাষা বড় একটা বুঝি না
আমি।’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল নিনা, ‘তারচেয়ে
সোজাসুজি বলো, কবে আমরা বিয়ে রেজিস্ট্রি
অফিসে যাব?’

‘শোনো, নিনা,’ কী উত্তর দেবেন লেখক
পেত্রোভ, ঠিক বুঝে উঠে পারছিলেন না, তবু
বুদ্ধি করে বললেন, ‘পাঠকের দরবারে উপন্যাস
পেশ করার আগে রাফ কপি লিখতে হয়।’

‘ঠিক আছে, রাফ কপিই* লেখা হবে।’ সম্মতি
জানিয়ে মাথা নাড়ল নিনা, ‘কাল থেকেই কোনো
আফ্রিকানের সঙ্গে প্রেম শুরু করে দেব।’

টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে সে হাঁটা
ধরল দরজার দিকে।

‘দাঁড়াও!’ প্রায় চিৎকার করে বললেন লেখক,
‘শুরুতেই আমাকে সূচিপত্র দেখাচ্ছ কেন?’

দরজার পাশে দাঁড়াল নিনা। পেত্রোভ তার কাছে
গিয়ে মানভঙ্গনের চেষ্টা করলেন।

‘তুমি নিশ্চয়ই জানো, বই কেনার আগে দেখে
নিতে হয় প্রচ্ছদের নিচে কী আছে।’

তাঁর হাত ‘পৃষ্ঠা ওল্টানোর’ চেষ্টা করল।

শোনা গেল চড়ের শব্দ। হাত সরিয়ে নিলেন
পেত্রোভ।

‘প্রচ্ছদের নিচে কী আছে, তা দেখার মানেই
বইটা ভালো করে পড়ে ফেলা নয়!’ মর্মভেদী
দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল নিনা, ‘তার চেয়ে বড়
কথা, কথা হচ্ছিল রাফ কপি বিষয়ে।’

হাত রাখল সে দরজার হাতলে, ‘আমি চললাম
আফ্রিকান ছেলে খুঁজতে।’

‘একটু দাঁড়াও,’ তিক্তস্বরে বললেন পেত্রোভ,
‘আমি বলেছি শুধু রাফ কপির কথা, আর অমনি
তুমি নিজেকে কার্বন পেপারের নিচে ফেলতে
ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।’

‘তুমি অমন করে কথা বললে ব্যস্ত হয়ে তো
পড়বই।’ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নিনা, ‘আমার

আর কিছু বলার নেই।’ কান্নাভেজা চোখে সে তাকাল পেত্রোভের দিকে।

‘কালই যাব বিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে।’ হার মেনে নিলেন পেত্রোভ, ‘শুধু কেঁদো না এখন।’

নিনা আশ্বস্ত হলো।

‘এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।’ পেত্রোভ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, ‘এখন কি দেখতে পারি, কী আছে প্রচ্ছদের নিচে?’

‘কী আছে, তা তো সবাই জানে,’ মুচকি হেসে বলল নিনা, ‘আছে শিরোনাম লেখা পৃষ্ঠা।’ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিনা বলল, ‘এখন বুঝলাম, কী করে উপন্যাস লেখা হয়।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লেখক পেত্রোভ, ‘আর আমি বুঝলাম, বই কী করে বাঁধাই হয়।’ * রুশ ভাষায় ‘রাফ কপি’ বর্ণিত হয় ‘কালো কপি’

হিসেবে। ভাসিলি দেনিসভ-মেলনিকভ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১২, ২০১০

371) বৈশাখের পয়লা কড়চা

পয়লা বৈশাখের সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘড়িতে স্ট্যান্ডার্ড টাইম ১০টা ১০ বেজে ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা আমার দিকে হাসির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। ঘড়ির এ রসিকতায় আমি মর্মাহত হই। ঘড়ির ক্ষীণ অ্যালার্ম কখনোই আমার ঘুমকে ভঙ্গুর বস্তুতে পরিণত করতে পারেনি, সেখানে না হয় ঘড়ির ব্যর্থতার চেয়ে আমার ঘুমের সফলতাই বেশি দায়ী, কিন্তু সময়ের এ রসিকতায় আমি রীতিমতো বিরক্ত হই। বছরের প্রথম দিনটিতেই আমাকে দেরি করিয়ে দেওয়ার মতো সময়ের এ হেন অসৎ উদ্দেশ্যকে নাস্তানাবুদ করতে নাশতা না করেই তাই বেরিয়ে পড়ি তড়িঘড়ি করে, ঘরের ঘড়িকে ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত রেখে। অবশ্য তার আগে দিনটা যাতে দীনভাবে না শুরু হয় সে জন্য পিতার পকেটে অভিযানপূর্বক নিজ মানিব্যাগের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ভুলি না। রাস্তায় নেমেই কবিবন্ধু রকিবুলকে ফোন লাগাই—

‘কীরে, আমাকে রাইখা নিশ্চয়ই পান্তা-ইলিশ গিলতেছিস?’ আমার তরফ থেকে প্রশ্নসহযোগে আক্ষেপ।

জবাবে ওপাশ থেকে অস্ফুট স্বর শোনা যায়, ‘ধুত, ফাও প্যাঁচাল রাখ, রুমে আয়।’

খানিকটা স্বস্তি পাই, যাক রকিবুলটা এখনো

আছে। গিয়ে দেখি কোথায় আমার তাড়াহুড়ো, নাসিকা গর্জন সহযোগে তখনো ও বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সূর্য উদয়ের পরও কীভাবে মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে বিষয়ে হাঁকডাক সহযোগে অত্যন্ত রুঢ় ভাষায় ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করি। তাতে আধা ঘণ্টা পর একটা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরে ও রেডি হয়। ওর মতে, পয়লা বৈশাখে লুঙ্গি পরাই বাঙালিপনার পরিচায়ক। ‘তুইও একটা লুঙ্গি পরে নে না!’ ওর বিনীত অনুরোধ আমার প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও দুর্বিনীত নাকচ ঘোষণা।

বাইরে বেরোতেই বলল, ‘চল, বাংলাবাজারে যাই।’

শুনে আমি একেবারে মহাকাশ থেকে পড়ি। অতঃপর এ আকস্মিক পতন সামলে বলি— ‘ক্যান, রমনায় প্রবলেম কী?’

‘দ্যাখ, গডডলিকা প্রবাহে গা ভাসানোর অভ্যাস তোর গেল না। ক্যান রমনাতে কী এমন দেখবার-শুনবার আছে?’

‘আর কিছু না-ই থাকল, রমনায় অন্তত রমণীরা তো আছে।’ আমি মিনমিন করি।

ও আমার কথায় কান দেয় না। বাংলাবাজারের উদ্দেশেই রওনা দিতে হয় ওর সঙ্গে। ওখানে কোনো এক বিরাট কবি নাকি বসে আছেন, পয়লা বৈশাখ নিয়ে এক জরুরি আলোচনা সভায় তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে হবে।

চুল-দাড়ির বাহারি ঢঙের অনেক কবিরই দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছি ইতিমধ্যে, কিন্তু চুল, দাড়ি, গোঁফবিহীন এমন নির্লোম কোনো কবিকে বোধহয় আগে দেখিনি।

নিখুঁতভাবে চাঁছা মাথায় রোদ পড়ে চকচক করছে কবি গুলগেলাস ঠাকুরের। রকিবুল গিয়েই কদমবুসি করে। আমিও অগ্রবর্তী হব কি না ভাবছিলাম, এমন সময় কবি গলা খাকারি দিলেন—

‘ইহাকে নূতন বোধ হইতেছে?’

‘জি গুরু, আমার ইয়ার দোস্ত, লেখালেখি করার বদঅভ্যাস আছে, তবে বড় বেশি নীরস, কবিতা লেখে না।’

শুনে কবি চকচকে মাথায় হাত বুলান, নাকি মাথায় হাত দেন বোঝা যায় না।

‘আসলে ইহার জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের শুদ্ধি,

মননকে ঋদ্ধতা দান। ওর পামর মন এখনো
কাব্যের উপযোগী বিচরণভূম হয়ে ওঠেনি,
যেখানে কবিতার চরণেরা ঘটকীদের মতো ঘট-
ঘট করে দৌড়ে বেড়াবে আর তৃপ্তির চোয়া
টেঁকুর তুলবে’, কবি বাতলে দিলেন আমার
কবিতাহীনতার শানেনজুল। ‘গুরু, তবে কীভাবে
ও করবে গুরু?’ রকিবুলের বিগলিত প্রশ্ন।

শুনে আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কোথায়
পান্তা-সহযোগে ইলিশ দিয়ে ভূরিভোজন করব
তা না আমার কাব্য প্রতিভার অন্বেষণে
রীতিমতো ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব।

‘এর জন্য প্রয়োজন কবিতা শোনা ও হৃদয়ঙ্গম
করা’, কবি সমাধান বাতলান, ‘তবে গুরু
হোক—’ কবি গুলগেলাস তাঁর ঝুলব্যাগ থেকে
কবিতার বই বের করে পাঠ শুরু করলেন।

তারপর যা শুরু হলো তা কহতব্য নয়,
শ্রুতিযোগ্যও কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ
বিদ্যমান। সভায় অন্য যারা ছিল (অধিকাংশই
নবীন কবি) তারা চোখ বুজে এমনভাবে শুনতে
লাগল যেন কবি গুলগেলাস তাদের রসগোল্লা
গেলাচ্ছেন। কবি পাঠ করে যাচ্ছেন—

বৈশাখের কাব্যিক ডানায়

হারানো কবিত্ব রূপ

অকাল এ অবিমৃষ্যতাভেদী

টম অ্যান্ড জেরি শৈশব জলকেলী মগ্নকবির হাত
থেকে ছাড়া পাই ঘণ্টা তিনেক পর। এরই মধ্যে
হাজারখানেক কবিতা শোনার ভারে আমার মাথা
ঝিমঝিম করার টারশিয়ারি পর্যায়ে চলে গেছে।
রকিবুলকে সুশ্রাব্য কিছু বলার প্রচণ্ড ইচ্ছাটাকে
অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখি।

দেরি করে হলেও পান্তা-ইলিশ পাওয়া যায়।

সারা দিনের অভুক্ত আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু
খেতে গিয়ে মাথায় বেজে ওঠে কবি

গুলগেলাসের অমীয় বাণী—

‘তোমাদের ইলিশ সভ্যতা

আর পান্তার প্রাতিস্বিক মালসা,

চেয়ে থাকা কর্বুর চোখে

অলম্বুষের অতলান্তিক লালসা...

তখন দেখি পান্তা আর গলা দিয়ে নামছে না,
অভুক্ত অবস্থাতেই বাড়ি ফিরতে হয়।

এর পর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, পয়লা বৈশাখ
ঘরে বসেই উদ্যাপন করব, অ্যালার্ম আর
মুঠোফোন বন্ধ করে উপর্যুপরি নাসিকা গর্জন

সহযোগে...অন্তত সূর্য পশ্চিমে মোড় নেওয়ার
আগ পর্যন্ত। মাসুদুল হক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১২, ২০১০

372) তাঁরা যদি হালখাতার দাওয়াতপত্র লেখেন

মুদি দোকানদারসহ অন্য দোকানিরা আমাদের
কাছে টাকা পান বলে হালখাতার দাওয়াতপত্র
পাঠান। তবে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা
আমাদের কাছে টাকা পান বটে, কিন্তু কখনোই
হালখাতার দাওয়াতপত্র পাঠান না। তাঁরা যদি
দাওয়াতপত্র পাঠাতেন তাহলে সেটা কেমন
হতো, তা-ই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকারগ্যাস
অফিসের দাওয়াতপত্র

প্রিয় সুধী,

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানুন। আমাদের গ্যাসের
রান্না খেয়ে ভালো ও তরতাজা আছেন আশা
করি। এবার একটা সুসংবাদ দিই। আপনার
জন্য এটা দুঃসংবাদ হবে কি না জানি না। যা-ই
হোক, সংবাদটা হচ্ছে: আসছে পয়লা বৈশাখে
আমাদের নিজস্ব কার্যালয়ে শুভ হালখাতা
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আর
হালখাতা মানে তো বোঝেনই, মানে লেনদেনের
বিষয়। আপনি সবাক্বব আমন্ত্রিত। আর সবাক্বব
আমন্ত্রিত এই জন্য যে, আপনার কাছে আমাদের
ম্যালা পাওনা। এত টাকা নিয়ে একা একা এলে
ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়তে পারেন। তাহলে
এই কথাই থাকল। যথাসময়ে হাজির থাকবেন।
সময় নিয়ে ঘাপলা কাম্য নয়।

শুভেচ্ছান্তে

গ্যাস খানআয়কর অফিসের দাওয়াতপত্র
জনাব,

দিন বদলালেও বদলায়নি নববর্ষ আগমনের
সিস্টেম, যথারীতি আগামী ১৪ এপ্রিল পালিত
হতে যাচ্ছে বাংলা নববর্ষ। এই দিনে অন্য সবার
মতো আমরাও আনন্দ করতে চাই। আমাদের
এই আনন্দ পরিপূর্ণতা পাবে আপনি যদি
পুরোনো ট্যাক্সগুলো পাই পাই পরিশোধ করেন।
ওই দিন সরকারি ছুটি থাকলেও আপনার
সৌজন্যে আমরা কিছু বিভাগ খোলা রাখব।
আপনি আসবেন আর টাকা দিয়ে চলে যাবেন।
টাকা দেওয়ার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে
না, এই নিশ্চয়তা দিয়ে রাখছি অগ্রিম। আপনার
জন্য থাকবে বসার সুব্যবস্থা। যেখানে বসে

আপনি টাকা গুনবেন আর দেবেন। তাহলে আমরা আপনার আশায় থাকলাম। আর না এলে সমস্যা নেই, পুলিশ আপনার বাড়ি চেনে।

শুভেচ্ছান্তে

ট্যাক্স মিয়াডিশ অফিসের দাওয়াতপত্র
মহোদয়,

আমাদের লাইনের কল্যাণে বিনোদন পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই অনেক মৌজ-মাস্তিতে আছেন। কিন্তু মৌজ-মাস্তি তো একতরফাভাবে হলে চলবে না। আমাদের দিকটাও একটু দেখতে হবে। আমাদের লোকজন মাসে দু-একবার আপনার বাড়িতে যায়, আপনাকে সালাম-আদাব দেওয়ার জন্য। কিন্তু আপনি কোনো দিনই বাড়িতে থাকেন না, আর থাকবেন বলেও মনে হয় না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আগামী পয়লা বৈশাখে আপনাকে দাওয়াত করছি। দাওয়াতের কথা শুনে আপনি যে দু-এক বেলা উপোস থেকে পেট খালি করে খেতে আসবেন, তা কিন্তু নয়। বরং যে কয় মাসের বিল বাকি সব পরিশোধ করবেন। নইলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা খুব দ্রুতই নিয়ে ফেলব।

শুভেচ্ছান্তে

ডিশ আখতারটিঅ্যান্ডটি অফিসের দাওয়াতপত্র
হ্যালো,
নববর্ষ সব সময় শুভই হয়, এবারেরটাও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। তাই ‘শুভ নববর্ষ’ বলেই ফেললাম। অনেক দিন আপনার সঙ্গে আমাদের সরাসরি মোলাকাত হচ্ছে না, যা অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে আমাদের। না, এভাবে আর চলে না, চলতে দেওয়া যায় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করব। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, আপনার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাত করব। কিন্তু তাতে আপনার চা-বিস্কুট, মিষ্টি বাবদ ম্যালা টাকা খরচ হতে পারে। আমরা তা চাই না, তাই আগামী পয়লা বৈশাখ আপনি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আর এই দিন থেকে যেহেতু নতুন বছর শুরু, তাই পুরোনো সব হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলা উচিত নয় কি? তবু আপনি যদি উচিত মনে না করেন, তাহলে অলৌকিকভাবে লাইন কাটার ঘটনা ঘটতে পারে।

শুভেচ্ছান্তে

টিঅ্যান্ডটি চৌধুরীবিদ্যুৎ অফিসের দাওয়াতপত্র

প্রিয় গ্রাহক,

লোডশেডিংয়ের কারণে সামান্য ঘামলেও ভালো
আছেন নিশ্চয়। শুভ অগ্রিম নববর্ষ। এবারও
যথারীতি ১৪ এপ্রিলেই নববর্ষ শুরু হচ্ছে।

এদিন আমরা আপনার জন্য মেহমানদারির
ব্যবস্থা করেছি। ডায়াবেটিসের কথা ভেবে মিষ্টি
হয়তো খাওয়াব না, তবে চা অবশ্যই খাওয়াব।
তাই আপনি নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসবেন।

আসার সময় দয়া করে পুরোনো বিলের
কাগজগুলোতে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে আসবেন।
দৃষ্টি বুলালেই অনুমান করতে পারবেন আসার
জন্য আপনাকে কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে।
আপনাকে পত্র মারফত দাওয়াত দেওয়ার জন্য
দুঃখিত। কী করব, লোডশেডিংয়ের কারণে
পাবলিক খ্যাপা। আমাদের লোকজনকে দেখলেই
দৌড়ানি দেয়।

শুভেচ্ছান্তে, বিদ্যুৎ বাবুসূত্রঃ দৈনিক প্রথম
আলো, এপ্রিল ১২, ২০১০

373) ধরা

রিংটোন বাজতেই লাফ দিয়ে উঠলাম। নিতুর
ফোন। গলার স্বর যতটা সম্ভব নরম করে
বললাম, জান, কেমন আছো?

—সারা দিন কোনো খোঁজ নেই, এখন বলো
কেমন আছো! শোনো, পয়লা বৈশাখে তুমি কিন্তু
আমার সঙ্গে ঘুরবে।

—অবশ্যই। একেবারে শেন ওয়ার্নের বলের
মতো ঘুরব।

—খবরদার, শার্ট-প্যান্ট পরে আসবে না।

—আরে বলে কি! শার্ট-প্যান্ট ছাড়া আসব
কীভাবে? শরমের ব্যাপার।

—ধ্যাত! বিশ্বে এত কিছু হচ্ছে, অথচ তোমার
মাথায় বুদ্ধি হচ্ছে না, পাঞ্জাবি-পায়জামা পরবে।
আমিও শাড়ি পরব। এই দিনে ট্র্যাডিশনাল ড্রেস
না পরলে স্ট্যাটাস থাকবে না।

—ঠিক, সূর্যি মামা জাগার আগেই উঠব আমি
জেগে। উঠে তোমার বাসার সামনে গিয়ে খান্সার
মতো দাঁড়িয়ে থাকব।

—মনে থাকবে তো?

‘কী যে বলো, জান’...বলতেই ঘরে মা ঢুকে
পড়ল। সর্বনাশ! আমি যে ‘জান’ ‘জান’ বলেছি,
মা কি শুনে ফেলল? আমি তাড়াতাড়ি বললাম,
ভাইজান, একটু সামনে যান, আরে যান না,
যান...

নিতু অবাক হয়ে বলল, কী বলছ এসব?

কোথায় যাব? ভাইজানটা কে?

পেছনে মা দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম,

‘আচ্ছা, ভাইজান, রাখি। স্লামালেকুম।’

মা বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

—এক বড় ভাইজানের সঙ্গে। কিছু বলবে?

—পয়লা বৈশাখে আমি আর তোর বাবা

ভোরবেলা বেরিয়ে যাব, রাতুলের পরীক্ষা। তুই

বাসায় থাকবি। নইলে ও পড়ায় ফাঁকি দিয়ে

গেমটেম খেলবে।

—অসম্ভব। আমার অন্য প্ল্যান আছে। আমি

বাসায় থাকতে পারব না।

—আশ্চর্য! ছোট ভাইয়ের পরীক্ষা, তোর একটা

দায়িত্ব আছে না! এইচএসসি কোনো যেনতেন

পরীক্ষা না, ভয়ংকর পরীক্ষা।

—তাতে আমার কী? ওর পড়া ও পড়বে।

একজনের ডায়েরিয়া হলে সবাইকে স্যালাইন

খেতে হবে, এটা কেমন কথা?

—ডায়েরিয়ার কথা এল কেন! বেয়াদব। চড়

দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। আর এই দিনে তুই তো

কখনোই বাইরে যাস না, হঠাৎ কী?

—ঘুঘু বারবার ধান খায় না, বারবার খায় চড়ুই

পাখি। আমি চড়ুই পাখি না। আগে যাইনি তো

কী হয়েছে? এবার যাব। বন্ধুদের সঙ্গে রমনার

বটমূলে গিয়ে গান শুনব। এসো হে

বৈশাখ...এসো এসো...!

—ওখানে গিয়ে গান শুনবি? সারা বছর ‘ইয়ো

ইয়ো’ টাইপ গান শুনে কান পচিয়ে ফেলে এখন

বলছিস রমনায় গান শুনতে যাবি! বল তো, এ

গানটা কে লিখেছে?

—কে আবার? একজন গীতিকার লিখেছে।

—সেই গীতিকারের নামটা কী?

—আরে আজব! আমি নাম-ঠিকানা মুখস্থ করে

রেখেছি নাকি? বাবার নামটাই তো মাঝে মাঝে

ভুলে যাই।

—মুরগির ছোট মাথায় যত বুদ্ধি আছে, তোর

এত বড় মাথায়ও তা নেই। যা, তোকে বাসায়

থাকতে হবে না। আমরাই বাসায় থাকব। তুই

থাকলে তোর ভাইটাও তোর মতো বেকুব হবে।

আহ্! বাঁচলাম। কী সুন্দরভাবে দ্বিপক্ষীয়

আলোচনার মাধ্যমে একটা জটিল সমস্যার

সমাধান হয়ে গেল। অথচ আমাদের

রাজনীতিবিদেরা আলোচনাই করতে চায় না।

এই জন্যই দেশটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

পয়লা বৈশাখে ভোরবেলা নিতুর বাসার সামনে চলে এলাম। নিতু একেবারে রেডি হয়ে ছিল, ফোন দিতেই বেরিয়ে এল। মোবাইল ফোনটা অফ করে দিলাম আমি। এবার নিশ্চিন্তে বেড়ানো যাবে। নিতু বিরক্ত হয়ে বলল,
—সেকি! এটা কী কালারের পাঞ্জাবি পরেছ? ক্যাট ক্যাট করছে। আর সঙ্গে জিনস পরলে কেন? পায়জামা কোথায়?

—বাসায়। পায়জামার ফিতা খুঁজে পাইনি, তাই জিনস পরলাম। চলো, যাওয়া যাক। রমনায় গিয়ে দেখি ব্যাপক ভিড়। সবাই বসে গান শুনছে। নিতুও মাথা দুলিয়ে গান শুনতে লাগল। যে মেয়ে হিন্দি গান ছাড়া অন্য কোনো গান শোনে না, সে রবীন্দ্রসংগীত শুনছে দেখে দারুণ অবাক হলাম। আমার হাতে ক্যামেরা দিয়ে ও বলল,
‘আমি ঐতিহ্যবাহী গান শুনছি, এটার ছবি তোলো। ফেসবুকে আপলোড করব।’ আমি বিভিন্ন কায়দায় ছবি তুললাম। এবার সে ঠিক করল, পান্তা-ইলিশ খাবে। ‘এখানকার খাওয়া অস্বাস্থ্যকর, পান্তা-ইলিশ আমাদের ঐতিহ্য না’—এসব বলেও তাকে দমিয়ে রাখা গেল না। সে একটা দোকানে ঢুকে কপ কপ করে পান্তা খেতে লাগল। আমাকে বলল, তুমি খাবে না? আমি বেশ ভাব নিয়ে বললাম, ‘পান্তা আমি খাই না।’ আমার কাজ ছবি তোলা। আমি সেটাই করতে লাগলাম। নিতুকে বললাম, তুমি তো ফ্রাইড রাইস-ফাস্টফুড ছাড়া অন্য কিছু খাও না, আজকে পান্তা খাচ্ছ যে?

—আজকে ফ্রাইড রাইস খেলে মানুষ কী বলবে? আর রাতে তো ফ্রাইড রাইসই খাব।

বাহ্! একেবারে খাঁটি বাঙালি। পান্তার বিলে অনেকগুলো টাকা চলে গেল। কোনো ব্যাপার না। টাকা-পয়সা হাতের ময়লা। হঠাৎ শুনি কে যেন রাগত স্বরে আমাকে ডাকছে। ডানে-বাঁয়ে কাউকে দেখলাম না। নিতু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই টাকলা লোকটা তোমাকে ডাকছে।

—সর্বনাশ!

—কী হয়েছে? উনি কি তোমার কাছে টাকা পান?

—আরে রাখো! উনি আমার বাবা, ওনার সাথে যে মহিলাকে দেখছ, উনি আমার মা। এখন কী করব? ঘুরে দৌড় দেব?

—দেখো, আমি দৌড়-টৌড় দিতে পারব না।

শাড়ি পরে ঠিকমতো হাঁটতেই পারি না, দৌড়াব কী করে? তা ছাড়া হাইহিল পরেছি তো। নইলে দৌড়ে আমার সঙ্গে পারতে না, কলেজে ১০০ মিটারে আমি প্রথম হয়েছিলাম।

—ওহ্! এত কথা বলছ কেন? অফ যাও!

বাবার সামনে আসতেই বাবা বিকট গলায় ধমক দিয়ে বসলেন, এই তোমার গান শোনা? এই তোমার বন্ধু-বান্ধব? টাংকি মারা শিখে গেছ? আজকে বাসায় আসো, তোমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। লালগালিচা সংবর্ধনা।

বাবা-মা হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। কিন্তু ওরা এখানে, তাহলে বাসায় কে? দূর্। দিনটাই মাটি। নিতুকে পৌঁছে দিয়ে বাসায় এসে দেখি সোফার ওপর আমার বন্ধু রবিন বসে আছে।

—তুই এখানে ক্যান?

—তোকে ভোর থেকে ফোন দিচ্ছি, ফোন বন্ধ।

বাসায় এসে শুনি তুই নেই। আমি একা একা কী করব? আন্টিকে বললাম, ‘আমি বাসায় আছি, আপনারা ঘুরে আসেন।’ ভালো কথা, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ইশ! কোন দুঃখে যে ফোনটা বন্ধ রেখেছিলাম। ফোন অন থাকলে আর এইভাবে ধরা খেতে হতো না। মাথার মধ্যে বিজ্ঞাপন ঘুরতে লাগল...ও এন অন... ও এন অন! আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১২, ২০১০

374) কুগেলমাস পর্ব

দুর্ভাগ্যবশত প্রফেসর কুগেলমাসের দ্বিতীয় বিয়েটাও সুখের হলো না। ‘আমি নতুন কাউকে চাই, আমার চাই প্রেম, রোমান্স।’ ব্যক্তিগত মনোরোগ চিকিৎসককে বললেন কুগেলমাস। ‘দেখুন, এতে আপনার সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। আমি তো আর জাদুকর নই, চিকিৎসক। আপনার সমস্যাগুলো খুলে বলুন। তারপর দেখি দুজন মিলে কোনো সমাধান বের করতে পারি কি না।’

‘তাহলে জাদুকরই খুঁজে বের করি গে।’ বলে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন কুগেলমাস।

কয়েক দিন পরেই প্রফেসরের বাড়িতে ফোন এলেন। ‘হ্যালো, কুগেলমাস! আমি পার্সকি দ্য গ্রেট।’

‘কে?’

‘আপনি নাকি জীবনে রোমান্স আনতে একজন জাদুকরকে খুঁজছেন?’

‘হুঁশ্শ! আস্তে।’

পরদিনই কুগেলমাস ব্রুকলিনের একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বেঁটে, চিকনমতো একটা লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

‘আসুন, কুগেলমাস, আমিই পার্সকি। বসুন। চা খাবেন?’

‘না। আমার চাই ভালোবাসা।’

একটু পরেই পার্সকি একটা সস্তা কাঠের আলমারি নিয়ে এল। ‘তুকে পড়ুন।’

‘মানে?’

‘আমি যদি এই আলমারির ভেতর একটি উপন্যাসসহ আপনাকে আটকে আলমারিতে তিনটে টাকা দিই, আপনি বইটির মধ্যে তুকে যাবেন।’

‘পাগল নাকি?’ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন কুগেলমাস।

‘সত্যি বলছি। কাকে চাই আপনার? ওফেলিয়া? টেম্পল ড্রেক নাকি ওয়ার অ্যান্ড পিস-এর নাতালিয়া?’

‘এমা বোভারি। ফ্লবেরের উপন্যাসের নায়িকা।’

‘ওকে!’

কিছুক্ষণ পরেই কুগেলমাস পৌঁছে গেলেন এমা বোভারির বাড়ি। সামনে দাঁড়ানো অনিন্দ্যসুন্দরী এমা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

‘তুমি কে?’

‘আমি সিডনি কুগেলমাস। সিটি কলেজের প্রফেসর।’

এমা ও কুগেলমাস ওয়াইন পান করলেন।

তারপর দুজন ঘুরতে বেরোলেন ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে। ‘আমি জানতাম কেউ আসবে, এই অজ গঁয়ো জীবন থেকে উদ্ধার করবে আমাকে।’ কুগেলমাসের হাত ধরে বলল এমা। বাড়ি ফিরে এমাকে গভীরভাবে চুমু খেলেন কুগেলমাস। তারপর এমার গাল দুটো ধরে হঠাৎ চোঁচিয়ে বললেন, ‘পার্সকি, আমাকে সাড়ে তিনটেয় বাড়ি ফিরতে হবে।’

পরক্ষণেই কুগেলমাস ফিরে এলেন ব্রুকলিনে।

‘কি, বলেছিলাম না?’ বিজয়ীর হাসি হেসে বলল পার্সকি।

এরপর প্রায় প্রতিদিনই পার্সকির জাদুর আলমারিতে ঢুকে এমার সঙ্গে সময় কাটাতে লাগলেন কুগেলমাস।

‘আচ্ছা, পার্সকি, এমাকে বাইরে নিয়ে আসা যায় না?’

‘ভেবে দেখি।’

তারপর একদিন কুগেলমাস তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘বস্টনে আমার একটা সেমিনার আছে। সোমবার ফিরব।’

পার্সকির কথামতো এমা ও কুগেলমাস একে অন্যকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ১০ পর্যন্ত গুনলেন। চোখ খুলেই তাঁরা নিজেদের আবিষ্কার করলেন একটি হোটেলের সামনে, যেখানে কুগেলমাস আগেই রুম ভাড়া করে রেখেছিলেন।

খুশিতে চকচক করে উঠল এমার দুচোখ। ‘কী সুন্দর! ঠিক যেমনটি আমি স্বপ্নে দেখতাম। অ্যাঁই, চলো না, আমাকে শহরটা ঘুরে দেখাও।’ সারাটা উইকএন্ড দুজন একসঙ্গে ঘুরলেন, শপিং করলেন, দামি রেস্টোরাঁয় ডিনার খেলেন।

নতুন জামা-জুতোর বাক্সপেটরা নিয়ে, কুগেলমাসকে চুমু খেয়ে এমা ঢুকল জাদুর আলমারিতে। কিন্তু পার্সকি তিনবার টোকা দেওয়ার পরও এমা দাঁড়িয়ে রইল। পার্সকি আরও জোরে টোকা দিল, কিন্তু এমা উধাও হলো না।

‘বুঝতে পারছি না কোথায় গলদ হচ্ছে।’ মাথা চুলকে বলল পার্সকি, ‘তুমি আপাতত ওকে নিয়ে যাও। আমি পরে ভেবে বের করছি।’

কুগেলমাস এমাকে হোটেলে রেখে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের শুক্রবার স্ত্রীকে আরেকটি সেমিনারের কথা বলে কুগেলমাস গেলেন এমার কাছে। তাঁকে দেখেই কেঁদে উঠল এমা। ‘হয় আমাকে বিয়ে করো নয়তো বইয়ের ভেতর ফেরত পাঠাও। সারাদিন বসে টিভি দেখতে ভাল্লাগে না। সিনেমার এক পরিচালকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সে বলেছে, তার পরের ছবিতে আমাকে নেবে।’

দুপুরেই কুগেলমাস ছুটলেন পার্সকির কাছে। ‘কিছু একটা করো, জলদি। হোটেলের বিল তো মনে হচ্ছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাজেট। এভাবে আর কত দিন চলব বউয়ের কাছ থেকে পালিয়ে? তার ওপর সাহিত্যের এক শিক্ষক

ক্লাসে পড়াতে গিয়ে উপন্যাসে আমার আসা-
যাওয়া টের পেয়ে গেছে। আমাকে হুমকি দিচ্ছে,
আমার বউকে বলে দেবে।’ ডুকরে কেঁদে
উঠলেন কুগেলমাস।

কয়েক দিন বাদে পার্সকি ফোন করল
কুগেলমাসের কাছে। ‘এমাকে নিয়ে এসো।
আলমারি ঠিক হয়ে গেছে।’

কোনো ঝামেলা ছাড়াই এমা বিদায় নিল।
কোনো চুম্বন ছাড়াই। কিন্তু কুগেলমাসের দেওয়া
উপহারগুলো নিতে ভুলল না।

‘কান মলেছি। আর কোনো দিন বউকে ঠকাব
না।’ জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কুগেলমাস।
তিন সপ্তাহ পরেই কুগেলমাস আবার হাজির
পার্সকির বাড়ি।

‘দোস্ত, আর একবার। পোর্টনয়স কমপ্লেন বইটা
তো তুমি পড়েছ, তাই না?’

‘২৫ ডলার লাগবে। আরও বেশি নিতাম। কিন্তু
গতবারের হয়রানির কারণে কিছু কম রাখছি।
আমার কিন্তু অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই।’

‘তুমি অনেক ভালো।’ বলে আলমারিতে ঢুকলেন
কুগেলমাস।

অলমারিটা বন্ধ করে পোর্টনয়স কমপ্লেন-এর
একটা কপি ওপরে ছুড়ে মারল পার্সকি। সঙ্গে
সঙ্গে অলমারিটা বিকট শব্দে ফেটে পড়ল এবং
পার্সকি সেখানেই অক্লান্ত পেল। কুগেলমাস
জানতেই পারলেন না কী ঘটেছে। অনেকক্ষণ
পর তিনি বুঝলেন, তিনি আসলে পোর্টনয়স
কমপ্লেন বা অন্য কোনো উপন্যাসে নয়, বরং
স্প্যানিশ ব্যাকরণের একটি বইয়ের ভেতরে
আটকা পড়েছেন। উডি অ্যালেন

অনুবাদ: আলিয়া রিফাত উডি অ্যালেন: ১৯৩৫
সালের ১ ডিসেম্বরে জন্ম। মার্কিন এই লেখক
একাধারে চিত্রনাট্যকার, চিত্রপরিচালক, সঙ্গীতজ্ঞ,
অভিনেতা, নাট্যকার ও কমেডিয়ান। ‘দ্য
কুগেলমাস এপিসোড’ ছোট গল্পটির জন্য তিনি
১৯৭৮ সালে ও’ হেনরি পুরস্কার লাভ
করেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১২,
২০১০

**375) প্রচণ্ড গরম মানুষ বিরক্ত কেন?
কেন?**

দুনিয়ার বিভিন্ন কঠিন বিষয় বোঝা গেলেও
মানুষের মনের কথা বোঝা বিরাট ঝামেলার
কাজ। কোনোভাবেই তাদের সন্তুষ্ট করা যায়

না। দেশে সামান্য একটু গরম পড়েছে, আর তাতেই সবার একেবারে মাথা গরম হয়ে গেছে। ‘গরমে মারা যাচ্ছি, ভাই! উফ! এত গরম কেন? দূর, ভালোই লাগে না’—ইদানীং এই ধরনের কথা ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে। আরে ভাই, গরমকালে গরম লাগবে এটাই তো স্বাভাবিক। গরমকালে আকাশ থেকে বরফের টুকরা খসে খসে পড়ছে আর মানুষ নিশ্চিন্তে ক্যাচ ধরছে, এটা কোনো দিন সম্ভব? ভাব দেখে মনে হচ্ছে, দেশের মানুষ গরম সহ্যই করতে পারে না। অথচ মোড়ের দোকানের ডালপুরি, কিংবা টং দোকানের চা একটু গরম না হলেই সবাই গলার রগটগ ফুলিয়ে চিৎকার শুরু করে দেয়। গরম যদি ভালো না-ই লাগে তাহলে ডালপুরি, চা এগুলো গরম না হলে মানুষ কেন যে খেপে যায় তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। তবে গরমকাল যে কত উপকারী তা নিয়ে নতুন করে গবেষণার কোনোই প্রয়োজন নেই। গরমে লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ায় দেশের মোমবাতি শিল্পের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। সবাই হাতপাখা দিয়ে নিজেদের ক্রমাগত বাতাস করতে থাকে। এতে হাতের ব্যায়াম হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গ্রীষ্মকালে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে করে জিমে না গিয়েই অনেকের মাসল হলিউডের নায়কদের মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়া হাতপাখা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যও বটে। এর মাধ্যমে মানুষ কম খরচায় ঐতিহ্যের চর্চাটা ধরে রেখেছে। তা ছাড়া, প্রচণ্ড গরমে বারবার গোসল করায় সবাই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে। রোগ-জীবাণু শরীরের বর্ডারের ধারে-কাছেও আসতে পারছে না। গরমের কারণে ব্যাপকভাবে বিক্রি হচ্ছে বেল, তরমুজ, ডাব, আইসক্রিম, জুস ইত্যাদি; যা দেশের অর্থনৈতিক খাতে নীরব বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। এত এত উপকার করার পরও মানুষ কেন গরম সহ্য করতে পারছে না তা বোঝা সত্যিই কঠিন। তবে এ কঠিন কাজটাই সরকারকে করতে হবে। মানুষের মনের এই দুমুখো চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করতে না পারলে তো জাতির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে। আশা করি, সরকার শিগগিরই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। ব্যবস্থা নেওয়াটাই সরকারের অন্যতম

কাজ। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৯, ২০১০

376) মিউজিক ভিডিও সমাচার

‘মিউজিক ভিডিও’ কথাটা শুনলেই মনে হয় গানের একটা জীবন্ত ছবি। ঢাকাসহ সারা দেশেই এখন সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে মিউজিক ভিডিও! কিন্তু এই মিউজিক ভিডিওর সঙ্গে সংগীতের কোনো সম্পর্ক নেই। নাটকের কারণে আমি নানা জায়গায় শুটিং করতে যাই। সবখানেই মিউজিক ভিডিওওয়ালাদের উপস্থিতি। কিছু তরুণ-তরুণী ক্যামেরার সামনে দাপাদাপি করে, নাচানাচি করে, কুশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে।

এগুলোই নাকি মিউজিক ভিডিও। এসব মিউজিক ভিডিওর আবার দুই রকম ক্যাটাগরি আছে—ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল!

আমি প্রায়ই চিন্তা করি, খোঁজখবর করি এই মিউজিক ভিডিওগুলো কেন করা হয়, এর উদ্দেশ্য কী, কার্যকারিতাই বা কী?

এর অনেক রকম উত্তর শুনি। তবে সব বিশ্বাস করা কঠিন। আবার ভদ্রসমাজে অনেক কথা বলাও যাবে না। বরং মিউজিক ভিডিও-সংক্রান্ত একটি অভিজ্ঞতার গল্প বলি।

ভদ্রলোক আমার পরিচিত। নাম মিনহাজউদ্দিন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্ত্রী নেই। রাতে তাঁর নিদ্রায় সমস্যা হয়। প্রায় রাতেই তিনি ঘুম থেকে চিৎকার করে ওঠেন। ভয় পান। ঘুমের মধ্যে তাঁকে একাধিক বেড়াল আক্রমণ করে। ডাক্তার দেখালেন। দোয়া-তাবিজ আনলেন। ফলাফল শূন্য। বেড়ালের আক্রমণ বন্ধ হয় না। ঘটনা শুনে তাঁর এক আত্মীয় এলেন। সম্পর্কে সাবেক শ্যালক। তিনি রোগ ধরে ফেললেন। বললেন, ‘ঘুমের মধ্যে যে বিলাইগুলো (বেড়ালগুলো) আপনারে অ্যাটাক দেয় (আক্রমণ করে), সেগুলো সব বেডি বিলাই।’ মানে মহিলা বেড়াল!

স্ত্রীবিহীন থাকাতে মহিলা বেড়ালের রূপ ধরে ‘খারাপ জিনিস’ তাকে ডিস্টার্ব করছে! বিয়ে করলে সেরে যাবে।

মিনহাজউদ্দিনের সমাধান পছন্দ হলো। কিন্তু এই বয়সে উপযুক্ত পাত্রী পাবেন কোথায়? শ্যালক বলল, ‘পাত্রী সঙ্গে নিয়ে এসেছি।’ বলেই সে একটা মিউজিক ভিডিওর সিডি বের করল, ‘সিডিটা দেখেন। এইখানে অডিও-ভিডিওসহ সব অ্যাঙ্গেলের শট আছে! এক ঝলকে পাত্রী

সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন।’

বছর কয় আগেও বিয়েশাদির মতো বিষয়ে
বায়োডাটা দিয়ে কাজ শুরু হতো। তারপর স্টিল
ছবি দেখাদেখি। সেই দিন শেষ। এখন
ডিজিটাল বাংলাদেশ। ঘটনা শুরুই হয় মিউজিক
ভিডিওর মাধ্যমে।

পাত্রী রূপবতী! অবিবাহিতা অর্থাৎ কুমারী।
চাকরানি ফিগার! অতি আকর্ষণীয়। ‘চাকরানি
ফিগার’ শুনে অনেকেই ঘাবড়াতে পারেন।

তাদের জন্য তথ্য হলো, তিন ধরনের ফিগারের
মধ্যে চাকরানি ফিগার পুরুষের প্রথম পছন্দ।
চাকরানি ফিগারের উল্লেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব
হচ্ছেন ভারতের বিখ্যাত নায়িকা শিল্পা শেঠি।
উনি চাকরানি ফিগারের অধিকারী। শিল্পা শেঠির
মতো চৌকস ফিগার বানানোর সবচেয়ে
সহজতম উপায় হলো প্রতিদিন আধাঘণ্টা করে
কাপড় কাচা এবং নিয়মিতভাবে ঘর মোছার
কাজ করা! আমাদের দেশে ঘরের এই
গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটি যেহেতু চাকরেরা করে,
তাই এই ফিগারকে বলা হয় চাকরানি ফিগার।
পৃথিবীর বেশ কিছু নায়িকা-মডেল এবং বিখ্যাত
ব্যক্তির নিজেকে আকর্ষণীয় ফিগারের অধিকারী
রাখার জন্য নিজেরাই কাপড় কাচার কাজ
করেন, ঘর ঝাড়ু দেন এবং ঘর মোছেন। এই
বিষয়ে বিস্তারিত আমার অন্য একটি লেখায়
বলব।

মিনহাজউদ্দিন মিউজিক ভিডিওর সিডি দেখে
পাগল হয়ে গেলেন। এই কন্যাকেই তিনি বিয়ে
করবেন। তাঁর অনুভূতিতে কন্যা রূপের রানি,
চোরের রাজা। ভিডিওতেই তাঁর মন চুরি করে
ফেলেছে।

এবার আত্মীয় বললেন, আপনে জানেন কি না
জানি না, কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে হলে
বর্তমানে চারটা সার্টিফিকেট লাগে। এক. বডি
ফিটনেস সার্টিফিকেট, দুই. এইডস ফ্রি
সার্টিফিকেট, তিন. মাদকমুক্ত সার্টিফিকেট,
অর্থাৎ পাত্র ফেনসিডিল বা গাঁজা ইত্যাদি
নেশামুক্ত কি না এবং চার. দাঁতের
সার্টিফিকেট...!

মিনহাজউদ্দিনের চুল সাদা হতে শুরু করেছে।
তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। বাংলাদেশে যে এত
দ্রুত সব বদল হয়ে যাচ্ছে, টের পাননি। শ্যালক
জানালেন, চারটা সার্টিফিকেটই তিনি ব্যবস্থা

করে দিতে পারবেন। সে জন্য আট হাজার টাকা লাগবে। টাকা দিয়ে হায়াত ছাড়া এই দেশে সব পাওয়া যায়।

যেই, কথা সেই কাজ। সব আয়োজন হলো। এর মধ্যে পাত্রীর সঙ্গে তিনবার টেলিফোনে কথাও বললেন।

পাত্রী যে নৃত্যকলায় পারদর্শী, সেটা মিউজিক ভিডিওতে দেখেছেন। এবার জানলেন, পাত্রী অরিজিনাল সুরে ১১০টি গানও মুখস্থ গাইতে পারেন! মিনহাজউদ্দিনের আনন্দের সীমা নেই! সোনাদানা-নজরানা দিয়ে তিনি এই পাত্রী বিয়ে করবেন। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

শ্যালক জানালেন, ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বিয়ের আসরেই পাত্রীর দেনমোহরের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিতে হবে।

এই দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জায়গাটিতে বউকে বধিওত করা হয়। অথচ এটা তাঁর প্রাপ্য।

মোহরানার অঙ্ক পরিশোধ ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করা অন্যায়। নিষিদ্ধ। পাপ।

পারিবারিকভাবে ছোট আয়োজনে বিয়ের আসর বসল। কাজি আনুষ্ঠানিকতা শুরু করলেন।

পাত্রীর সম্মতি চাইলেন, আপনি কি এই বিয়েতে রাজি?

পাত্রী নীরব।

উপস্থিত একজন বললেন, পাত্রীর নীরবতা মানেই সম্মতি। অর্থাৎ রাজি!

কাজি বললেন, না! পাত্রীকে মুখে সম্মতি জানাতে হবে। কারণ পাত্রীর যদি ইতিপূর্বে বিয়ে না হয়ে থাকে, পাত্রী কুমারী হয়, তবেই ওই পাত্রীর নীরবতা মানে সম্মতি বোঝায়। এটা কিতাবের কথা।

মিনহাজউদ্দিন এই প্রথম ধাক্কা খেলেন। পাত্রী কি তাহলে কুমারী না? শ্যালকের দিকে কঠিন চোখে তাকালেন।

শ্যালক অবস্থা বুঝে জানালেন, আপনার সার্টিফিকেট চাইরটাই কিন্তু ভুয়া! মাড়ির দাঁতসহ আপনার নয়টা দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত। ডিফেক্ট।

এফডিসি থেকে বারো শ টাকা দিয়ে দুই শিফটের জন্য মেকআপম্যান এনে মেকআপ দিয়ে চুল কালি করা হয়েছে। এখন উচ্চবাচ্য করলে মহা বিপদ হতে পারে।

মিনহাজউদ্দিন উচ্চবাচ্য করলেন না। বিয়ে হয়ে গেল। একটা কম বয়সী সুন্দরী বউ পাশে

থাকবে—এই বয়সে এটাই বা কম কী!
কিন্তু অনুষ্ঠান করে বউ ঘরে তুলে নেওয়ার
আগেই মিনহাজউদ্দিন স্ত্রীর কাছ থেকে
তালাকনামা পেলেন। স্বাস্থ্যগতভাবে তিনি
আনফিট। স্বামীর সঙ্গে ঘর করবেন না নতুন
স্ত্রী। এর মধ্যে সব লেনদেন সম্পন্ন হয়ে গেছে।
মহা ফাঁসে পড়ে গেলেন মিনহাজউদ্দিন। পরে
ঘটনা জানা গেল। এই মেয়েটিকে বছরে দুই
থেকে তিনবার বিয়ে দেওয়া হয়। এটি তাঁর
পঞ্চম বিয়ে। বিয়েতে মোহরানা বাবদ অর্জিত
অর্থ ভাগ করে নেয় চক্রের সবাই। তারপর
আবার তাঁকে নিয়ে তৈরি হয় নতুন কোনো
মিউজিক ভিডিও! আবু সুফিয়ান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৯, ২০১০

377) সাল ৩০০০

২০১০ সালে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। একবারও
কি ভেবেছেন আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা?
কেমন হবে তারা, দৈনন্দিন জীবনে কী কী
পরিবর্তন আসবে সে সময়ের দুনিয়ায়? থাক,
আর কষ্ট করে কাজ নেই। রস+আলো যথেষ্ট
পরিশ্রম করে (ওয়েবসাইট ঘেঁটে) ৩০০০ সালটা
দেখেছে। এবার আপনি দেখুন। প্রতিদিন
সাতসকালে শেভিং ক্রিম, ব্রাশ আর রেজর নিয়ে
টানাটানির দিন শেষ হয়ে যাবে। এসে যাবে
অটো শেভিং পদ্ধতি। দেয়ালে লাগানো অটো
শেভার আপনার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেবে পরম
যত্নে। নিজের ওজন থেকে দ্বিগুণ ওজনের ব্যাগ
বহন করে করে পিচ্চিরা আর মাথা নত করবে
না। ৩০০০ সালে পিচ্চি সোনামণিদের পিঠের
ব্যাগের একজোড়া পা থাকবে, আর সেই পা
তাকে হেঁটে হেঁটে নিয়ে যাবে স্কুলে-বাসায়, যখন
যেখানে দরকার। (চাইলে স্কুল পালানোও
যাবে!) ঠান্ডা লেগে যখন নাকে বুড়িগঙ্গার স্রোতের
মতো সর্দি বেরোতে শুরু করে, যন্ত্রণার শেষ
নেই আর! তাই ৩০০০ সালে অটোমেটিক টিস্যু
পদ্ধতিতে নিমিষেই মুশকিল আসান। ঘণ্টার পর
ঘণ্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে নানা
কেমিক্যালসমৃদ্ধ মেকআপ-সামগ্রী মুখে মাখার
সময় কোথায়! আর আপনার ত্বকই বা আর
কত দিন সহ্য করবে সেসব! তাই এসে যাবে
‘ছাপ মেকআপ’। ছাপ মেকআপ এক মুহূর্তেই
আপনার মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে সাজিয়ে দেবে
আপনাকে, যেমনটা আপনি চান! অনেকটা সিল-

ছাপ্পর মারার মতোই! কাজ, কাজ আর কাজ!
ঘুমানোরই সময় নেই! ব্যায়াম তো দূরের কথা।
কিন্তু সুস্থ থাকতে হলে ব্যায়াম অতি জরুরি।
তাই রোবট ব্যায়ামবিদ আপনার ঘুমের মধ্যে
আপনাকে ডান বাম ডান, মানে শারীরিক
কসরতের কাজটা করে দেবে। সার্বিংয়ের বেজায়
শখ। কিন্তু উত্তাল সমুদ্র তো আর হাত বাড়ালেই
পাচ্ছেন না। তাই ৩০০০ সালে আপনার
কমোডেই সার্বিংয়ের সাধ মেটাতে পারবেন
অনায়াসে। ৩০০০ সাল এলে ঢাকার জ্যামও
৩০০০ গুণ বাড়বে—এটা নিশ্চিত। তাই বিকল্প
যান অতি জরুরি। হেলিকপ্টার ক্যাপ এ যন্ত্রণার
হাত থেকে রেহাই দেবে আপনাকে। যখন
যেখানে ইচ্ছে, হেলিকপ্টার ক্যাপ পরেই ছুটে
যাবেন এক পলকে। কম্পিউটারে উল্টাপাল্টা
কিছু লিখবেন? উপায় নেই। কম্পিউটার
এতটাই সেয়ানা হয়ে যাবে যে খারাপ কিছু
করলেই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে সঙ্গে
সঙ্গে। (প্রথম প্রথম হয়তো আপনাকে
সংশোধনের ব্যবস্থাও নিতে পারে আপনার
কম্পিউটারটি।) ৩০০০ সালে একেকজন
খেলোয়াড় একেকটা ঢাকার কুমির বনে যাবেন।
তাই কষ্ট করে রোদের মধ্যে আর দৌড়াদৌড়ি
কেন! লোক ভাড়া করে নিজের খেলাটা খেলে
নেবেন তাঁরা। তাতে করে ডায়াবেটিক
রোগীদেরও একটা বিশাল উপকার হবে। জ্বালানি
ঘাটতির কারণে স্কুলের বাচ্চাদের আনা-নেওয়ার
জন্য বাসের বদলে সার্কাসের লোকদের ডেকে
আনা হবে। এক ঢাকার সাইকেলে খেলা
দেখাতে দেখাতে বাচ্চারা স্কুলে যাবে, সঙ্গে ফাও
বিনোদন। সার্কাসের ভবিষ্যৎও ট্রাকের
হেডলাইটের মতো উজ্জ্বল! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম
আলো, এপ্রিল ১৯, ২০১০

378) দ্য পেস্ট

৮ নভেম্বর ছিল আমার জন্মদিন। এই দিনটা
ভালোভাবে উদ্যাপন করার ইচ্ছা ছিল, যাতে
এটা স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই সম্পূর্ণ
অপরিচিত কারও সঙ্গে আলাপ করার কথা
ভাবলাম আমি। দিনটা উদ্যাপনের এটাই
সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে হলো।
তখন ঘড়িতে সম্ভবত ১০টার মতো বাজে।
ফ্লোরিডা অ্যান্ড কর্ডোবা হোটেলের এক কোনায়,
পরিপাটি পোশাক পরা এক বুড়ো ভদ্রলোককে

থামালাম। তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর। তাঁর ডান হাতে একটা ব্রিফকেস আর চোখেমুখে আইনজীবী এবং নোটারিদের মতো একটা হামবড়া ভাব।

আমি কণ্ঠে মধু ঢেলে বললাম, ‘শুনছেন, স্যার। বলতে পারবেন, পাজা ডি মায়াতে কীভাবে যেতে হবে?’

বুড়ো লোকটি আমাকে ভালোমতো নিরীক্ষণ করলেন একবার। তারপর বললেন, ‘আপনি কি পাজা ডি মায়ার দিকে যেতে চান, নাকি অ্যাভেনিডো ডি মায়ার দিকে?’

‘আসলে...যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমি পাজা ডি মায়ার দিকে যেতে চাইছিলাম।’

আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করে বললেন, ‘আচ্ছা, তাহলে এই পথে যান। ভিয়ামন্ট পার হয়ে টুকুমান, লাভালি...।’

বুঝতে পারলাম, পাজা ডি মায়াতে যেতে যে রাস্তাগুলো পার হতে হবে সেগুলোর নাম তিনি একে একে বলতে যাচ্ছেন। তাই তাঁকে থামানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। বললাম, ‘আপনি ঠিক ঠিক বলছেন তো?’

‘অবশ্যই!’

‘আপনার কথায় সন্দেহ করার জন্য মাফ করবেন।’ এবার পাজা সান মার্টিনের দিকে দেখিয়ে বললাম, ‘কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এক বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার লোক বললেন, পাজা ডি মায়া নাকি উল্টো দিকে।’

বুড়ো বেচারা বললেন, ‘ওই লোকটি তাহলে এ শহর চেনে না।’

‘হতেই পারে না। বললামই তো, তার চেহারা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। আর সত্যি বলতে কি, আপনার চেয়ে তাকেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল।’

‘আপনি কি বলতে চাইছেন, আমার চেহারা একটা গাধার মতো?’

আমি বললাম, ‘ছিঃ ছিঃ! না না! আমি এ কথা কখন বললাম!’

‘ওই লোকটার চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত—এ কথাটা যখন থেকে বলা শুরু করেছেন, তখন থেকে...।’

‘ও আচ্ছা। কিন্তু সত্যিই বলছি, ওই লোকটাকে দেখতে খুবই বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছিল।’

এবার বুড়ো অধৈর্য হয়ে বললেন, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আর সময় নষ্ট না করে আমি বরং যাই।’

ঠিক আছে, যান। কিন্তু আমি পাজা সান মার্টিনে কীভাবে যাব, বলে গেলেন না তো?’

এবার তাঁর সারা মুখে বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ল।

‘কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আপনি তো জানতে চাইছিলেন পাজা ডি মায়েতে যাওয়ার পথ?’

‘কই, না তো! আমি তো পাজা সান মার্টিনে যাওয়ার পথ জানতে চাইলাম। পাজা ডি মায়ে নিয়ে তো একটা কথাও বলিনি।’

এবার উল্টো দিকে নির্দেশ করে তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, সে ক্ষেত্রে এই দিকে যান।’

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ‘আপনি দেখছি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বেন! কিছুক্ষণ আগে দক্ষিণ দিকে যেতে বললেন, এখন আবার উল্টো দিকে যেতে বলছেন?’

‘কারণ, আপনিই তো প্রথমে পাজা ডি মায়েতে যাওয়ার পথ কোনটা জানতে চাইলেন।’

‘অসম্ভব! আমি কখনোই পাজা ডি মায়ে নিয়ে কোনো কথা বলিনি! এ কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না। আপনি হয়তো আমার কথা ঠিকমতো বোঝেননি, নইলে আপনি এখনো ঘুমিয়েই আছেন।’

এবার বুড়ো রেগে লাল হয়ে গেলেন। খেয়াল করলাম, তিনি ডান হাতে ব্রিফকেসটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলেন। আর একটা কথাও না বলে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তিনি নিজের পথে হাঁটতে শুরু করলেন। মনে হলো, এবার বুড়োর মেজাজ বেশ ভালোমতোই বিগড়েছে। ফার্নান্দো সোরেনতিনো

অনুবাদ: আবুল বাসার ফার্নান্দো সোরেনতিনো:

১৯৪২ সালের ৬ নভেম্বর আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেস জন্মগ্রহণ করেন সোরেনতিনো।

আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ছোটগল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক তিনি। তাঁর অধিকাংশ লেখা বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে লা রিগ্রেসন জুলোজিকা, এন ডিফেন্সা প্রোপিয়া, পার কোল্লা ডেল ডটোর মুর এড আল্টি রাকোন্টি ফ্যান্টাসি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৯, ২০১০

379) রহিমুদ্দীর ডাইর বোট

চাচা আর ভাজতে সন্ধ্যাবেলায় দুজনে আলাপ-সালাপ করিতেছে।

ভাজতে: চাচা! আজ বাজারে গিয়াছিলাম।

চাচা: যাবি না! তবে বাড়িতে বসিয়া থাকবি নাকি?

ভাজতে: একটা কুমড়া লইয়া গিয়াছিলাম।

চাচা: নিবি না? খালি হাতে বাজারে যাবি নাকি?

ভাজতে: একটা লোক আসিয়া কুমড়াটার দাম জিজ্ঞাসা করিল।

চাচা: দাম জিজ্ঞাসা করিবে না, তবে কি বিনা পয়সায় কুমড়াটা লইবে?

ভাজতে: আমি আট আনা চাইছিলাম।

চাচা: আট আনা চাবি না তবে কি মাঙনা দিবি অত বড় কুমড়াটা?

ভাজতে: সে লোকটা দুই আনা বলিল।

চাচা: বলিবে না? অতটুকু কুমড়া তুমি আট আনা চাহিলেই সে নিবে কেন?

ভাজতে: আমি বলিলাম, বাপের পুষ্য কুমড়া খাইছ কোনো দিন?

চাচা: বেশ বলিয়াছিস। এত বড় কুমড়াটা বেটা দুই আনা মাত্র দর করিল!

ভাজতে: এমন সময় এক পুলিশ আসিল।

চাচা: আসিবে না? তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে বলিয়াছ, বাপের পুষ্য কোনো দিন কুমড়া খাইয়াছ? দেখ না কী হয়!

ভাজতে: পুলিশ আসিয়া কুমড়াটার দাম জিজ্ঞাসা করিল।

চাচা: দাম জিজ্ঞাসা করিবে না? পুলিশ বলিয়া কুমড়াটা মাঙনা লইবে নাকি?

ভাজতে: আমি কুমড়ার দাম আট আনা চাইলাম।

চাচা: বেশ! বেশ! আমার ভাজতে! দাম চাহিবি না! পুলিশ দেখিয়া ডরাইবি নাকি?

ভাজতে: পুলিশ দুই আনা দাম করিল।

চাচা: করিবে না? পুলিশ দেখিয়া তাহারা জিনিসের দামদস্তুর জানে না? এতটুকু কুমড়া, তার দাম দুই আনার বেশি আর কত হইবে?

ভাজতে: আমি বলিলাম, বাপের পুষ্য কুমড়া খাইয়াছ কোনো দিন?

চাচা: বেশ বলিয়াছিস! পুলিশ বলিয়া ডরাইবি কেন? বেটা আট আনার কুমড়াটা দুই আনায় লইতে চায়?

ভাজতে: তখন পুলিশ আমাকে ধরিয়া খুব মার দিল।

চাচা: দিবে না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? পুলিশের সঙ্গে বাহাদুরি!

ভাজতে: মারিতে মারিতে আমাকে থানায় লইয়া গেল।

চাচা: থানায় লইয়া যাইবে না? পুলিশকে তুমি অপমান করিয়াছ।

ভাজতে: সেখানে গেলে বড় দারোগা আসিল।

চাচা: আসিবে না? দেখ তোমার ওপর আরও কী দুর্গতি হয়।

ভাজতে: বড় দারোগা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল।

চাচা: দিবে না? তুমি যে রহিমুদ্দীর ভাইর বেটা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৪, ২০১০

380) শ্বশুর-জামাই

অনেক দিন জামাই শ্বশুরবাড়ি আসে না। সেই জন্য শ্বশুরের বড় নিন্দা। গাঁয়ের লোকেরা বলে, তোমাদের বাড়ি জামাই আসে না কেন? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে একটা গোপন কারণ আছে।

কারণ যাহা আছে, শ্বশুর তো তাহা ভালোই জানেন। শ্বশুরবাড়িতে জামাইর শালা নাই, শালি নাই। ইয়ারকি-ঠাটা করিবার কেহ নাই। সেই জন্যই তো জামাই শ্বশুরবাড়িতে আসে না।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্বশুর ঠিক করিলেন, এবার যেমন করিয়াই হোক, জামাইকে আনিতে হইবে। না হয় শ্বশুর হইয়াই জামাইর সঙ্গে একটু ঠাটা-ইয়ারকি করিবেন। বাড়িতে অন্য লোক নাই। কেহ তো দেখিতে আসিবে না।

হাটের মধ্যে জামাইর সঙ্গে শ্বশুরের দেখা হইল। শ্বশুর জামাইকে বলিলেন, ‘তা বাবাজি, আমাদের ওমুখো যে হন-ই না, আজ চলুন আমাদের ওখানে।’ জামাই উত্তর করিল, ‘আপনাদের ওখানে কি আর যাইব! শালা নাই, শালী নাই, কাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিব?’

শ্বশুর মিথ্যা করিয়া বলিলেন, ‘তা এবার ঢাকা হইতে আমার এক ভাইজি আসিয়াছে। কলেজে পড়ে। সম্পর্কে তোমার শালী, তাহার সঙ্গে অনেক হাসি-তামাশা করিতে পারিবে।’

জামাই রাজি হইয়া শ্বশুরবাড়িতে আসিল।

আসিয়া দেখে, ঢাকা হইতে কেহই আসে নাই। শ্বশুর তাহাকে ফাঁকি দিয়াছেন। জামাই ভাবিল, আজকের দিনটি মাটি হইল।

শ্বশুর যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা তো তাহার মনেই আছে!

আহারের সময় হইল। শ্বশুরবাড়ি আসিয়া জামাইরা শালা-শালী লইয়া এক থালায় ভাত

থায়। শ্বশুর তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, ‘দেখো, বড় থালাখানায় আজ আমাদের ভাত দাও। আমি আর জামাই এক থালায় ভাত খাইব।’

শ্বশুর আর জামাই একসঙ্গে এক থালায় ভাত খাইতে বসিলেন। নানা রকম তরকারি দিয়া খাওয়া চলিতে লাগিল। শ্বশুর ভাবিলেন, চালাকি করিয়া জামাইকে ক্ষীর খাইতে দিব না।

তিনি জামাইকে বলিলেন, ‘জামাই খাওয়া তো হইয়াছে, এবার হাত ধোও।’

জামাই দেখিল, শ্বশুর তাহাকে ক্ষীর না খাওয়াইয়া ঠকাইবার মতলব করিয়াছেন। জামাই তখন এক গল্প ফাঁদিয়া বলিল, ‘হাত আর ধুইব কি? আপনাদের বাড়িতে আসিবার সময় সামনে পড়িল এক প্রকাণ্ড সাপ। কহিলে বিশ্বাস করিবেন না, আমাকে না দেখিয়া, ওই যে শিকার ওপরে ক্ষীরের হাঁড়িটা ঝুলিতেছে না? ওই অত উঁচু একটা ফণা মেলিয়া ধরিল সাপটা আমার দিকে।’

শ্বশুর দেখিলেন, ধরা পড়িয়াছেন। জামাই ক্ষীরের কথা টের পাইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, ‘তাই তো! ক্ষীরের কথা তো একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে। আন আন, ক্ষীর আন।’

শাশুড়ি একটু মুচকি হাসিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষীর আনিয়া দিলেন। ক্ষীরের সঙ্গে মাখিয়া খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ ভাতও দিলেন।

জামাই ভাবিল, ‘শ্বশুর আমাকে ক্ষীর খাওয়া হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন, এবার আমি তাঁহাকে ক্ষীরই খাইতে দিব না।’ জামাই শ্বশুরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল, ‘এখনকার কলিকালের কথা আর কি বলিব? বউরা স্বামীকে মানিতে চাহে না। এই আপনাদের মেয়ে, যাহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি; আমি যদি তাহাকে বলি এদিক থাকো, সে চলিয়া যায় ওদিকে।’ বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দেখাইয়া দিবার অজুহাতে জামাই পাতের ক্ষীরটুকু নিজের দিকে টানিয়া লইয়া ভাতগুলি শ্বশুরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

শ্বশুর দেখিলেন, ‘ঠকাইবার মতলবে জামাই আমাকে ক্ষীর খাইতে দিবে না। আচ্ছা দেখাইতেছি।’

উপদেশের ছলে শ্বশুর জামাইকে বলিলেন, ‘তা বাবাজি! তোমরা ছেলেছোকরা মানুষ। মিলমিশ

হইয়া থাকো, মিলমিশ হইয়া থাকো।’

বলিতে বলিতে তাহা দেখাইয়া দিবার অজুহাতে
ক্ষীর ও ভাত একসঙ্গে মাখিয়া ফেলিলেন। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৪, ২০১০

381) তুমডি কাঁঠাল খায়া

এক কাবুলিওয়ালা বাংলাদেশে নতুন আসিয়াছে
বাজারে যাইয়া দেখে বড় বড় কাঁঠাল বিক্রি
হইতেছে। পাকা কাঁঠালের কেমন সুবাস!
নাজানি খাইতে কত মিষ্টি! তাহার দেশে তো
এত বড় ফল পাওয়া যায় না। মাত্র আট আনা
দিয়া মস্ত বড় একটা কাঁঠাল সে কিনিয়া
ফেলিল। কাঁঠালটি লইয়া সে একবার ঘ্রাণ
শুঁকিয়া দেখে, আবার কাঁধে লইয়া দেখে।
তারপর খুশিতে নাচিতে নাচিতে কাঁঠালটি বাসায়
লইয়া গেল।

আমরা জানি, কাঁঠাল খাইতে হইলে হাতে তেল
মাখাইয়া লইতে হয়, ঠোঁটে তেল লাগাইয়া
লইতে হয়। তাহা না করিলে কাঁঠালের আঠা
হাতে মুখে লাগিয়া যায়। সাবান পানি দিয়া
কিছুতেই তোলা যায় না।

কাবুলিওয়ালা নতুন লোক। এসব কিছুই জানে
না। সে দুই হাতে কাঁঠালটি ধরিয়া কামড়াইতে
লাগিল। কাঁঠালের আঠা তাহার হাতে লাগিল,
দাড়িতে লাগিয়াই দাড়ি জট পাকাইয়া গেল;
কিন্তু সেদিকে কে খেয়াল করে! এমন মিষ্টি
কাঁঠাল আর এমন তার খোশবু! সে

ছোবড়াসমেত সমস্ত কাঁঠালটি খাইয়া ফেলিল।
তারপর হাতমুখ ধুইতে যাইয়া বড়ই বিপদে
পড়িল। সাবান ঘষিয়া, সোডার পানি গোলাইয়া
সে হাত আর দাড়ি যতই পরিষ্কার করিতে যায়,
ততই হাতে-মুখে, দাড়িতে কাঁঠালের আঠা আরো
চটচট করে। সারারাত সে ঘুমাইতে পারিল না।
মাছের দোকানে মাছ তার দাড়িতে আটকাইয়া
আসে। দোকানিরা দাড়ি হইতে সেগুলি ছাড়াইয়া
লইতে দাড়ি চটচট করিয়া ছেঁড়ে। বেচারি কি
আর করে! মনের দুঃখে কিছু না কিনিয়াই
বাসায় ফিরিয়া আসিতে চায়।

মনের দুঃখে বেচারী এক যুবকের কাছে যাইয়া
জিজ্ঞাসা করে, ‘হাঁ বাবুজি! হামি তো কাঁঠাল
খাইছে। কাঁঠালের আঠা হামার দাড়িতে আর
গোঁফমে লাগ গিয়া। কিছিছে ছেড়তা নেহি। আব
ক্যা করেংগা সাব?’

যুবকটি দেখিল বেশ মজা হইয়াছে! সে আরও

মজা দেখিবার জন্য বলিল, ‘আপনি দাড়িতে কিছু ছাই লইয়া মাখান, আঠা ছাড়িয়া যাইবে।’ কাবুলিওয়ালা বাসায় যাইয়া তাহাই করিল। ছাই মাখানোর ফলে তাহার দাড়িতে কাঁঠালের আঠা আরও জট পাকাইয়া গেল।

মুখের চেহারা বদ হইয়া পড়িল। কাবুলিওয়ালা কি আর করে— খাইতে গেলে হাত দাড়িতে লাগিয়া আটকাইয়া যায়, শুইতে গেলে বিছানা-বালিশের সঙ্গে দাড়ি জড়াইয়া যায়। এপাশ ওপাশ হইতে দাড়ি চটচট করিয়া ছেঁড়ে।

অবশেষে সে একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে যাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল।

‘য়্যা বাবুজি। হামি তো কাঁঠাল খাইছে। আওর কাঁঠাল কা আঠা হামার দাড়িমে গোঁফমে লাগ গিয়া! এক যোয়ান কা পরামর্শমে উছকা পর হাম ছাই লাগায়ে দিয়া। এসিসে এ দাড়িমে জট পাকায়া, আভি হাম ক্যা করেংগা?’

সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ লোকটি বলিলেন, ‘সাহেব! একে তো কাঁঠালের আঠা তোমার দাড়িতে লাগিয়াছে, তার ওপরে মাখাইয়াছ ঘুঁটের ছাই। এর ওপরে আর কোনো মেরামতিই খাটিবে না। তুমি এক কাজ কর, নাপিতের কাছে যাইয়া গোঁফদাড়ি কামাইয়া ফেল।’

কতকাল ধরিয়া কাবুলিওয়ালা তাহার মুখের এই দাড়ি জন্মাইয়াছে। গাড়িতে ইষ্টিমারে এই দাড়ি দেখিয়া লোকে তাহাকে কত খাতির করে।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে এই দাড়ি দেখিয়া লোকে তাহার পাতে আরও দুইটা বেশি করিয়া রসগোল্লা-সন্দেশ আনিয়া দেয়। আজ সেই দাড়ি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। মনের দুঃখে কাবুলিওয়ালা অনেকক্ষণ কাঁদিল। কিন্তু কাঁদিয়া কি হইবে? নিরুপায় হইয়া সে এক নাপিতের কাছে যাইয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ফেলিল। তার দুঃখের ভাগী আর কে হইবে। হাটে-পথে, মাঠে-ঘাটে সে যখন যাহাকে দাড়ি কামানো দেখে, তারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, ‘ভায়া হে! তুমিভি কাঁঠাল খায়া?’

সে মনে করে, যাহাদের দাড়ি নাই, তাহারও বুঝি কাঁঠাল খাইতে কাঁঠালের আঠা দাড়িতে লাগাইয়া তাহারই মতো দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছে। জসীম উদ্দীনের বাঙ্গালীর হাসির গল্প থেকে সংগৃহীত

প্রকাশক: পলাশ প্রকাশনী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৪, ২০১০

382) প্রস্তাব - লেড করসুনস্কি

প্রেমে পড়ে গেলাম প্রথম দর্শনেই। পরবর্তী
টানা দুই মাস পরখ করলাম নিজের
অনুভূতি। ‘আমাকে তোমার কেমন লাগে?’ দেখা
হলে প্রশ্ন করলাম তাকে।

‘তোমার কেমন লাগে আমাকে?’ সলজ্জ প্রশ্ন
তার।

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি,’ বলে ফেললাম
সাহস করে।

‘আমিও তোমাকে ভালোবাসি,’ তার ক্ষীণকণ্ঠ
শোনা গেল।

‘বহুদিন ধরেই ভাবছি, তোমাকে একটা প্রস্তাব
দেব,’ বললাম আমি।

‘কী সেটা?’ রক্তিম হলো তার মুখমণ্ডল।

‘আমার জামা-কাপড় ধুয়ে দেবে?’ আড়ষ্টভাবে
বলতে পারলাম।

‘কী বললে!’ চিৎকার করে উঠল সে, ‘তুমি
ফাজলামি করছ আমার সঙ্গে?’

‘একেবারেই না!’ আমি বললাম, ‘আমার
ঘরদোর পরিষ্কারের কথাও বলতে চাচ্ছিলাম।

কাজটা আমি একদমই পারি না।’

‘তুমি কেন আমাকে অপমান করছ?’ বলল সে
চোখভরা জল নিয়ে।

‘তুমি কী করে ভাবতে পারলে এমন কথা!’

আমার একটু রাগই হলো, ‘আমি তো তোমাকে
ভালোবাসি। এবং আমার ধারণা ছিল, তুমিও
আমাকে খুব পছন্দ কর।’

‘আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই খুব পছন্দ করি,’
বিষণ্ণভাবে হাসল সে।

‘তার মানে, তুমি আমার রান্নাবান্নাও করে
দেবে?’ উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম আমি।

কেঁদে ফেলল সে ঝরঝর করে। তারপর চলে
গেল। আর কখনো দেখা হয়নি তার সঙ্গে। অথচ
আমার মনে হয়েছিল, আমার সঙ্গে বিয়েতে তার
সানন্দ সম্মতি থাকবে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম
আলো, মে ০৩, ২০১০

383) বনবাসী বাঘের মনবাসী হওয়ার পুরোনো কাহিনি

বাঘ চিরকাল নির্জন বনবাসী। দিব্যি ছিল বনের
এক কোণে নিজের মনে নিরিবিলি। মানুষের

মনগড়া বন্যেরা বনে সুন্দর সবককে তারা
বসবাসের জন্য মডেল হিসেবে অন্তর থেকে
মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এক গাঁয়ের এক চাষার
হাড়হাভাতে অলস ছেলের রাজনৈতিক
উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে বাঘের গহিন
বনের নিশ্চিত্ত আবাস এক লহমায় তছনছ হয়ে
গেল। বনবাসী বাঘ উদ্ভাস্ত হয়ে এখন স্থায়ীভাবে
মনবাসী। বনের বাঘ আবাস বদল করে হয়ে
গেল মনের বাঘ। মনের বাঘের গল্পটা আজ
বেশ ঘট করে পুরোনো ঢংয়েই বলে ফেলি।
অনেক অনেক দিন আগের কথা। একদা এক
গাঁয়ে এক ছিল চাষা। চাষা মানুষটা দিনরাত
হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মাঠে ফসল ফলায়।
এদিকে তার বেহদ আলসে ছেলেটা গায়ে খাটার
কথা শুনলেই হাত-পা ছেড়ে আঁতকে উঠে বলে,
‘অসম্ভব! গতর খাটিয়ে পেটের ভাত জোটানো!
কভি নেহি।’

বুক ফুলিয়ে তাতে টক করে টোকা দিয়ে বলে,
‘আমি হবু পলিটিশিয়ান। বিনা খাটুনিতে স-ব-
কি-ছু তুড়ন্ত তৈরি সামনে হাজির না হলে
পলিটিকসের তেলসমাতির আর রইল কী?
গতর খাটিয়ে ভাগ্য গড়া সে তো আমজনতার
ছোটলোকি কায় কারবার। আলাদিনের আশ্চর্য
প্রদীপ মনের কোণে জ্বালিয়ে নিয়েই
পলিটিশিয়ান দুনিয়ার বুক পা রাখে। মুখ ফুটে
নয়, ‘আমি মনে মনে যা চাইব, তা-ই পাব।’
এমন দুর্দান্ত পলিটিশিয়ানের বাপ মানুষটা গতর
খাটা গৈয়ো চাষা। বিটকেলে ছেলের
ভাবনাচিন্তার এমন ভীষণ গতিকে বাপ মানুষটা
সারাক্ষণ ভয়ে খাবি খায়। বোকাসোকা মানুষটা
ইতিউতি হরেক ভাবনায় মনে মনে ছেলের
নিদানের উপায় খোঁজে। উপায়ান্তর না পেয়ে
একদিন ছেলের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে
টানতে সাধু বাবার থানে গিয়ে ধরনা দিয়ে
পড়ে। ডুকরে কেঁদে আকুল হয়ে বলে, ‘বাবাগো,
রক্ষা করো।’ বহুদর্শী সাধু বাবা পলিটিশিয়ান
ছেলের মন খোলা বইয়ের মতো পড়ে ফেলে,
মুখে মারফতি হাসি ফুটিয়ে ঝটিতি নিদান
বাতলে দেয়। বলে, ‘শোনো হে ছোকড়া।
নারকেল জিজিরা থেকে তেঁতুলিয়া, তামাম
দেশের স্থাবর-অস্থাবর তাবত সম্পত্তি আমার
আমার বলে নিজ দখলে কবজা করতে চাইলে
তোমার মনঃসিদ্ধি সাধনা দরকার। বনের গহিনে

নির্জনে পাঁচ বছর কঠিন তপস্যা করো। তোমার কঠোর তপস্যার তেজে গণদেবতার আসন একদিন তেতেপুড়ে জ্বলে উঠবে। সেই বেলা গণদেবতা হাত তুলে বলবে তথাস্তু। তখন তোমার মনঃসিদ্ধি সাধন পূর্ণ হবে। সেদিন থেকে তুমি মনে মনে যা ভাববে তা-ই হবে। যাও বাছা, এবার তুমি বনের পথ ধরো।' দিন-মাস-বছর গড়িয়ে পাঁচ বছর একদিন পার হয়ে যায়। সাধন মগ্ন চাষার ছেলের জান ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন যায় যায়, তখন গণদেবতার চৈতন্যোদয় ঘটে। হাতখানা কিঞ্চিৎ উঁচিয়ে গণদেবতা আলগোছে বলে, 'তথাস্তু। আজ থেকে তুমি মনে মনে যা ভাববে তা-ই হবে।'

আহ্। শান্তি! কঠোর সাধনার গাছে আজ টাটকা তাজা ফল! পাঁচ বছরের কঠোর সাধনায় পলিটিশিয়ান ছেলের গায়ে কখানা জিরজিরে হাড়, ক্ষুধায় পেট পিঠের সঙ্গে। ওর গাও-গতর, মন-মগজজুড়ে শুধু খাই খাই রব। সাধনসিদ্ধ ছেলে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মেলে বলে, 'এক নম্বর খাস খতিয়ানের এই বন আজ থেকে আমার হোক। বনের কোণে ভারি খাসা আমিঁরি চালের একখানা বাগানবাড়ি হোক।' সে বাড়ির মেঝেতে কলোনিয়াল আসবাব-জানালায় ভিক্টোরিয়ান পর্দা-টেবিলে মোগলাই খানার ছড়াছড়ি। পাঁচ বছরের হারানো সুখ এক লহমায় তার হাতের মুঠোয়। চাষার ছেলে হরেক পদের খানাখাদ্যে ভরপুর পেটে পালকের বিছানায় খানিক গড়ান কেটে ভাবে, এত সুখ জীবনে সহবে তো? এমন নির্জন গহিন বনে আমি একলা একটি প্রাণী। বন থেকে কোনো বাঘ আচানক ঘরে ঢুকে আমাকে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে না তো?

পলিটিশিয়ানের পোড়া কপাল। সিদ্ধি লাভ করে বেচারী ভুলে গেল সে সাধনসিদ্ধ। মনে মনে যা ভাববে, তা-ই হবে। এক লহমায় মন ফুঁড়ে ভয়ংকর হিংস্র বাঘ নখ-দাঁত মেলে তার সামনে হাজির। চোখের পলকে বাঘ সাধনসিদ্ধ পলিটিশিয়ানকে হাড়গোড়সুদ্ধ কমমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

তারপর থাবায় লেগে থাকা রক্ত-মাংস চেটেপুটে খেতে খেতে বাঘ ভাবল, বসবাসের জন্য বাদাবনের ঝুট-ঝামেলায় ফিরে গিয়ে লাভ কী! মানুষের মনের ঘর একটু নোংরা হলেও

খানাখাদ্য হাতের কাছে মজুদ পাওয়া যায়।
বাদাবনে দিনভর হাপুস দৌড় শেষে একটা
চারপেয়ে মেরে খাওয়ার চেয়ে মানুষের মনের
ঘরে বসবাস শেষে নির্বোধ দোপেয়েটাকে টক্
করে ধরে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম
দেওয়া মেলা সোজা কাজ। যে কথা, সেই কাজ।
সেদিন থেকে বাঘ বনের বাস ভুলে গিয়ে
মানুষের মনের ঘরে স্থায়ী আবাস গড়ে
নিয়েছে। তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

384) অজ্ঞান পার্টি

বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়ংকর পার্টি কোনটি—
আওয়ামী লীগ, বিএনপি, না জাতীয় পার্টি?
উত্তর কোনোটিই না। সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে
এখন অজ্ঞান পার্টি। এর সঙ্গে মলম পার্টি,
মরিচগুঁড়া পার্টি এবং বগুড়ায় সুঁই পার্টি!
মলম পার্টি ও মরিচগুঁড়া পার্টি মানুষের
চোখেমুখে মলম মেখে দেয়, মরিচ ডলে দেয়।
আর সুঁই পার্টি আকস্মিকভাবে কোমরের নিচে
পেছন দিকে বড় সুঁই দিয়ে গুঁতো মারে।
আক্রান্ত ব্যক্তি ‘উহ-আহ’ বলে সেদিকে
মনোযোগী হয়। হাত ব্লক হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাত্
সুঁই পার্টি পকেটের পার্স বা মোবাইল ফোন
ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দেয়। সম্পদ খোয়া গেলেও
এতে মৃত্যুর ঝুঁকি কম!
আগে ঈদ-পূজাজাতীয় উৎসবগুলোর আগে
অজ্ঞান পার্টির আক্রমণ হতো। এখন সারা
বছরই এই উৎপাত চলে।
অজ্ঞান পার্টি নামে একটি নাটক করতে গিয়ে
এই দলের সদস্যদের খুঁজছিলাম অনেক দিন।
উচ্চপর্যায়ে বলে রেখেছিলাম। অবশেষে একদিন
সেই সোর্সের ফোন এল। আমি অজ্ঞান পার্টির
সর্দারের সাক্ষাত্ পেলাম। তাঁর নাম চান মিয়া
পণ্ডিত। বয়স ৫২-৫৩। ‘পণ্ডিত’ তাঁর উপাধি।
চান মিয়া পণ্ডিতকে দেখে হতাশ হলাম। হ্যাংলা-
পাতলা গায়ের গড়ন। চাপা ভাঙা। ঠোঁটের ওপর
চিকন গোঁফ। পাক ধরেছে। শুকনো স্বাস্থ্য। অতি
নিরীহ চেহারা। পরনে সাদা ময়লা লুঙি। ঘিয়ে
রঙের ফুলশার্ট। বুকের বোতাম ছেঁড়া। পায়ে
স্যান্ডেল নেই। এই লোক মানুষ অজ্ঞান করার
ওস্তাদ—কেউ কল্লানাও করতে পারবে না।
উপস্থিত একজন জানালেন, ইনি শুধু ওস্তাদ না,
মানুষকে অজ্ঞান করার নিত্যনতুন ফাঁদ অবিষ্কার

করেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে ‘পণ্ডিত’ উপাধি যুক্ত হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলাম। চান মিয়া পণ্ডিত ছিলেন রিকশার মিস্ত্রি। ঢাকাতে যারাই আসে, সবারই প্রধান টার্গেট বড়লোক হওয়া, বড়লোকদের সঙ্গে থাকা। একটি বাড়ি করা, না হলে অন্তত একটা প্লট কেনা বা দু-চার কাঠা জায়গা করা। চান মিয়ার সঙ্গে মুনতুর মিয়া নামের এক ব্যক্তির সখ্য ছিল। তাঁরও টার্গেট ঢাকায় একটা বাড়ি বা জায়গা করা। শেষে বুঝলেন, সেটা সম্ভব না। তবু তাঁর ঢাকায় থাকতে হবে। তিনি ভিন্কা করে বনানীতে একটা কবর কিনে ফেললেন। মরার পরে অন্তত বড়লোকদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকা যাবে—এ আশায়। তবু ঢাকায় থাকা! বিভিন্ন হাউজিং ও ডেভেলপার কোম্পানিগুলোও মানুষের এই কষ্টগুলোর কথা চিন্তা করে। তাই তারা নদী-নালা, খাল-বিল যেখানে যেভাবে পারছে দখল করে নিচ্ছে। দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা কিস্তিতে প্লট দেওয়ার লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। অনেকে সেসব কিনে গোলও খেয়েছে। চান মিয়া পণ্ডিতের আকাঙ্ক্ষাও উচ্চ। কিন্তু রিকশামিস্ত্রির আয়ে তাঁর পোষাত না। সঙ্গে বউয়ের চাপ! আয় বাড়ানোর কৌশল হিসেবে তিনি রিকশা চুরি শুরু করলেন। চুরির আগে রিকশাওয়ালাদের চা-বিস্কুট খাইয়ে অজ্ঞান করা শুরু করেন।

জিজ্ঞেস করলাম, চা-বিস্কুটে কী মেশান? বিষ? ‘নাহ! দামি ওষুধ দেই। ইয়েত এটিভেন। মেড ইন পাকিস্তান। ঘুমের অষুধ। গুঁড়া কইরা মিশায়া দেই। খাওয়ার একটু পরেই বেহুঁশ! জন্মের ঘুম দেয়। ছয়-সাত ঘণ্টায়ও ঘুম ভাঙ্গে না।’

অজ্ঞান পার্টির খাবার খেয়ে অনেকেই মারা গেছেন। পত্রিকায় পড়েছি।

চান মিয়া পণ্ডিত বললেন, ‘কাহিনি সত্য। ডোজের পরিমাণ বেশি হইলে মওত ঘটে। আসলে হায়াত শ্যাষ হয় গলে তো কারোর কিছু করার থাকে না। সিদ্ধান্ত আল্লাহপাকের! আমগো অষইধ হইল উছিলা! দোষ পড়ে অজ্ঞান পার্টির!’

প্রধানত চা, ক্রিমঅলা বিস্কুট, খোসা ছিলে ধুয়ে দেওয়া শসা-আমড়া ইত্যাদি, ঝালমুড়ি, আখের

রস, ফালি করে কাটা তরমুজের সঙ্গে অজ্ঞান করার ওষুধ মেশানো থাকে। ছোটখাটো এসব দোকানির অনেকেই অজ্ঞান পার্টির সদস্য। পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর যন্ত্রণায় অজ্ঞান পার্টি তাদের কৌশলেও নিত্যনতুন বদল ঘটচ্ছে। আগে শুধু বড়লোকদের টার্গেট করা হতো। তাতে পত্রিকায় রিপোর্ট হতো। টেলিভিশনের খবরে ছবি দেখাত। ঝামেলা সৃষ্টি হতো। গত দুই রমজান আগে থেকে অজ্ঞান পার্টি ভিক্ষুক এবং গ্রাম থেকে আসা গরিব মানুষদের টার্গেট করছে। গরিব মানুষের মধ্যে গ্লামার নেই। ফলে মিডিয়ারও আগ্রহ নেই। ঝামেলা কম।

আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর নাম শাহজাদা। সে একটি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। স্মার্ট, সতর্ক ও সাহসী। অফিস থেকে বাসে করে মতিঝিল আসছিল। বাইরে প্রচণ্ড গরম। পিপাসায় সে কাতর। ফার্মগেটে গাড়ি থেমেছে। আনন্দ সিনেমার কাছে ডাব নিয়ে এক বৃদ্ধ দাঁড়ানো। সব ডাবের মুখ কাটা। কিছু মিশিয়ে রাখতে পারে এই আশঙ্কায় শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, ফ্রেশ ডাব কেটে দেওয়া যাবে কি না। বৃদ্ধ বললেন, অবশ্যই যাবে। দ্রুত ডাব কেটে দিলেন। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড গরমে চলন্ত গাড়িতে খুব আরাম করে শাহজাদা ডাব খেল। তারপর তার আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ফিরল তিন দিন পরে। তখন সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুয়ে আছে। জান ছাড়া তার সব খোয়া গেছে।

এটি অজ্ঞান পার্টির নতুন উদ্ভাবন। অক্ষত ডাবের ভেতর বিশেষভাবে ওষুধ মেশানো! চলন্ত গাড়ি বা ফেরির যাত্রীদের টার্গেট করা। ডাব বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান পার্টির মোবাইল টিমের দুই-তিন সদস্য ওই গাড়িতে উঠে যায়। সুবিধামতো জায়গায় অপারেশন চালায়। কিছু গাড়ির হেলপার-ড্রাইভারও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত!

চান মিয়া পণ্ডিত বললেন, তাঁর একটা নাটক গ্রুপও আছে। সেইখানে ভালো পোশাক পরা ছেলেমেয়েরা কাজ করে। রাস্তার মধ্যে নাটক করে মানুষকে ফাঁদে ফেলে!

চিরকাল শুনে এসেছি, নাটক সমাজ বদলের হাতিয়ার। বাংলাদেশে নাটকও এখন অজ্ঞান

পার্টির হাতিয়ার!

নাটক পার্টির মেয়েরা প্রেমের অভিনয় করে
প্রধানত রিকশাচালক, সিএনজিঅলা এবং
ক্যাবচালকদের ফাঁদে ফেলে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুলিশ যে আপনাকে
ধরে, আপনার বিচার হয় না?

চান মিয়া খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ‘এই
নিয়া সাতাইশবার ধরল। ছাব্বিশবার ছাড়া
পাইছি! আইন দিয়া আমারে আটকাইতে পারে
নাই। দোষী করতে পারে নাই!’

কিন্তু আসলে তো আপনি নির্দোষ না।

‘পাবলিক আর পুলিশ আমারে দোষী বললে তো
হবে না। বাংলাদেশের আদালত বলছে, আমি
নির্দোষ! আমারে কেউ দোষী বললে আদালত
অবমাননার মামলা হওয়া দরকার।’

প্রসঙ্গ বদল করে বললাম, কত নিরীহ মানুষকে
আপনি বিপদে ফেলেছেন! আপনার কখনো
খারাপ লাগে না? আপনার বউ-ছেলেমেয়েরা কি
জানে আপনি এই কাজ করেন?

চান মিয়া বেশ খানিক চুপ করে রইলেন।

বললেন, ‘এত কিছু করছি বউরে খুশি করতে।
বউয়ের মন পাইতে কামাই কইরা পয়সা ঘরে
নিয়া গেছি। কিন্তু কেমনে কেমনে জানি বউয়ের
লগে ঝগড়া হয়্যা যায়। মারামারি লাইগা যায়।
শ্যাষে বউ বদল করলাম। তিনবার বিবাহ
করলাম। তবু সংসার টিকল না। বড় অশান্তি।
তাই ঠিক করছি, আমিই যুুদি অশান্তিতে থাকি,
মাইনষেরে শান্তিতে থাকতে দিব ক্যান?’

পুনশ্চ: সর্বশেষ তথ্য হলো, চান মিয়া পণ্ডিত
ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। আবারও
আদালতে গিয়ে ছাড়া পেয়েছেন কি না জানি
না। আবু সুফিয়ান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

385) সিএনজি-বৃগ্গান্ত!

পুরানা পল্টন থেকে কারওয়ান বাজার। চালক
ধুম করে চেয়ে বসলেন ১০০ টাকা। গাড়ি চালু
করে সার্জেন্টের ভয়ে নিজেই মিটার ছাড়লেন।

ভরদুপুরে ফাঁকা রাস্তা। তার ওপর

এলাকাভিত্তিক বন্ধের নিয়মানুযায়ী সেদিন

পল্টন-মগবাজার-মালিবাগ এলাকা বন্ধ।

মগবাজার দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে মিটারে উঠল

৩৩ টাকা। চালককে বলা হলো, দুটো উপায়

আছে: এক. ৫০ টাকা নিয়ে বিদায় হন, আর

দুই. নামেন, চা খান, গল্প করেন। যতক্ষণে মিটারে ১০০ টাকা উঠবে তখন নেবেন। তিনি কোনোটিই করতে রাজি না হওয়ায় সামনের চা-দোকানিকে ১০০ টাকা দিয়ে বলা হলো, ‘উনি বসে থাকুক, মিটারে ১০০ টাকা উঠলে দেবেন। আর ৫০ টাকা নিয়েই চলে যেতে চাইলে দিয়ে দেবেন।’ পরে জানতে পারি, চালক ৫০ টাকা নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। বসন্তের প্রথম দিন। শেরাটন থেকে কারওয়ান বাজার। রাস্তায় অনেক ভিড়। সিএনজিচালিত অটোরিকশাগুলোও হাঁকছে সেই রকম। একটি গাড়িতে ওঠার পর চালক বললেন, ‘ভাড়া কিন্তু বাড়ায়ে দি য়েন।’ যাত্রী বললেন, ‘তাহলে মিটার দেন।’ চার-পাঁচবার বলার পরও তিনি মিটার দিলেন না। তারপর বললেন, মিটার নষ্ট। চলে না।

যাত্রী: তাহলে কী করে বাড়ায়ে দিব?

চালক: আপনি যান না ওখানে?

গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে যাত্রী সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজি অটোরিকশার দিকে এগিয়ে গেলেন।

যাত্রী: ভাই, আমার সিএনজিটার মিটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। দেখে দেন না।

দ্বিতীয় চালক এসে মিটার দেখতে চাইলে প্রথম জন বাধা দেন। তারপর মিটার দেখতে দিলে দ্বিতীয় চালক পরীক্ষা করে দেখেন সব ঠিকঠাক আছে। তারপর তাকে ৩০ টাকা দিয়ে রওনা দিলেন যাত্রী। গন্তব্য কারওয়ান বাজার থেকে টিএসসি। ভাড়া ১০০ টাকা। শুক্রবার।

যাত্রী: কেন, বাবা? রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-শীত-জ্যাম কিছুই নাই, তাইলে ১০০ টাকা ক্যান?

চালক: আজ রাস্তায় সিএনজি কম নামসে।

যাত্রী: কম নামসে তাতে আপনার কী?

চালক: যে ভাড়া চাইব সেটাতে গেলে যান নাইলে খাড়ায়ে থাহেন, চাচি।

তাড়া ছিল বলে উঠে বসেন যাত্রী। টিএসসি পৌঁছাতে ভাড়া উঠল ২২ টাকা। মেজাজ খারাপ করে ১০০ টাকার নোট বের করে নেমে পড়তেই

চালক: চাচি, টাকা ফেরত নেবেন না?

যাত্রী: দিবা নাকি?

চালক ১০ টাকার নোট দিয়ে বলে, এহানে আসলকার ভাড়া ১০০ হয় না।

এবার তাঁকে কী করা উচিত? জরুরি কাজ ভুলে যাত্রী এর একটা হেস্টনেস্ট করবেন বলে ঠিক করলেন। পাশের এক মিশুকচালককে ডেকে বললেন, ভাই, কারওয়ান বাজার থেকে আসছি। ৫০০ টাকা দিসি। ১০ টাকা ফেরত দেয়। এ কেমন হিসাব?

মিশুকচালক: ক্যা রে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এগোলান কর্যা পার পাইবি? দে, টাকা দিয়া দে।

সিএনজিচালক: আরে উনি ১০০ দিসেন, আমি ১০ টাকা ফেরত দিলাম।

এই বলে একটু আগে পাওয়া ১০০ টাকার নোটটা দেখালেন।

মিশুকচালক: কারওয়ান বাজার থন ১০০ টাকা ভাড়ানি? তোগো লাইগা আমরা গালিগেলাজ শুনি। (গালি দিয়ে) ৫০ টাকা দিয়া বিদায় হ।

উদিসা ইসলাম

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

386) দাম্পত্য জীবন - মৈয়দ মুজতবা আলী

কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা।

সায়ের বললে, ‘লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড়ি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ’ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরত দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, “তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না।

চলো বাড়ি।” সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।’

আমার চীনা বন্ধুটি আদব-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়ের খুশী হয়ে চলে গেল। গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের ওপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, ‘কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।’ তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন—

‘চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামী-কুলকে তাঁদের খাণ্ডার খাণ্ডার

গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?
‘সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল
সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওলা অধ্যাপক
মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল
গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচারে ভুগেছেন সেকথা
সকলেরই জানা ছিল।

‘ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার
পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন
অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের
অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল,
সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত
হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে।
ধন-প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে।
এস ভাই, এক জোট হয়ে—

‘এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হত্তদন্ত হয়ে ছুটে
এসে বলল, “হুজুররা এবার আসুন।
আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর
পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি
যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া
করে আসছে।”

‘যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা
দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত
ফুটো করে, দেয়াল কানা করে দে ছুট, দে ছুট!
তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

‘কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত
গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন
নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার
প্রণাম করে বলল, “হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন
তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন,
কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার
শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনে সঙ্কলের পয়লা
রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে।
আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।”
সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে
ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল
করে মারা গিয়েছেন।’

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে ‘সাধু
সাধু’, ‘শাবাশ’, ‘শাবাশ’ বললুম। করতালি দিয়ে
নিবেদন করলুম, ‘এ একটা গল্পের মত গল্প
বটে।’ আচার্য উ বললেন, ‘এ বিষয়ে ভারতীয়
আপ্তবাক্য কি?’

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুকলকে স্মরণ করলুম,
পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না।

শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে
ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ
কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার
কোণে। খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে শুধালেন
মহারাজের কুশল তো? মহারাজ নড়েন না। মন্ত্রী
বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে
উঠলেন, ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার!
বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম
হয়ে আসে।’

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল।
বললেন, ‘ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে
অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে
তো সবাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো
আর কেউ এ রকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে
না।’

রাজা বললেন, ‘ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল
ছাড়লে।’ মন্ত্রী বললেন, ‘আমি প্রমাণ করতে
পারি।’ রাজা বললেন, ‘ধর বাজি।’ ‘কত
মহারাজ?’ ‘দশ লাখ?’ ‘দশ লাখ।’

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল
পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষুত্ত্বার
বেলা পাঁচটায় শহরের তাবত বিবাহিত পুরুষ
যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েত হয়;
মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয়
জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যখানে মাচাঙ—তার
উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চোঁচিয়ে
বললেন, ‘মহারাজ জানতে চান তোমরা
তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে
আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা
পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না
তারা যাও নদীর দিকে।’

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে
পড়লে গোরুর পালের মতো, কালবৈশাখীর
সামনে শুকনো পলাশ পাতার মতো সবাই
ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে
পিষে, দলে, খেঁতলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর
পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল
বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই
বিরাত মধ্যখানে লিকলিক করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এ-রকম
দাঁড়াবে তিনি আর কল্পনাও করতে পারেননি।
মন্ত্রীকে বললেন, ‘তুমি বাজি জিতলে। এই নাও
দশ লখা হার।’ মন্ত্রী বললেন, ‘দাঁড়ান মহারাজ।
ওই যে একটা লোক রয়ে গেছে।’ মন্ত্রী তাকে
হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন,
‘তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না
বুঝি?’

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে
বললে, “অতশত বুঝি নে, হুজুর। এখানে
আসার সময় বউ আমাকে ধমকে দিয়ে
বলেছিল, ‘যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।’
তাই আমি ওদিকে যাই নি।”

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন,
‘ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী
বউ। আমার গল্প ভয়ে পালাল।’

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক
পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন গল্পটাকে
শিরোপা দি। সৈয়দ মুজতবা আলী: আধুনিক
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রম্যরচয়িতা। তাঁর
বিখ্যাত রম্যগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র ও ময়ূরকণ্ঠী। এ ছাড়া
দেশে বিদেশে, শবনম, চাচা কাহিনীও
পাঠকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়। জন্ম-১৯০৪, মৃত্যু-
১৯৭৪। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩,
২০১০

387) ফেসবুক আছে তাই...

বাহ! বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে
যাচ্ছে। ভাবতে ভালোই লাগে। ভেবে দেখুন,
দেশে মশা-মাছির মতো ফেসবুকের জনপ্রিয়তাও
চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে। দেশের
শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট নেই, কিন্তু
ফেসবুকে বেশ কয়েকটা অ্যাকাউন্ট আছে
(নকল আইডিসহ) এমন লোকের সংখ্যাও খুব
একটা কম নয়। আর ফেসবুকের যে ব্যাপক
উপকারিতা, তাতে জনপ্রিয়তা না বেড়ে উপায়
কী? এমনিতে আপনার পাঁচ পয়সাও দাম নেই।
সমাজে নেই কোনো মানমর্যাদা। কিন্তু এ নিষ্ঠুর
সমাজ না বুঝলেও ফেসবুক আপনাকে ঠিকই
বুঝবে। কারণ ফেসবুকে আর কিছু থাক বা না
থাক, আপনার একটা ‘স্ট্যাটাস’ আছে। শুধু
তাই না, একটা বাড়ির জন্য মানুষ কত কষ্ট
করে, অথচ ফেসবুকে বাড়ি অর্থাৎ হোম আছে।
লগইন করলেই দেখতে পাবেন হোম পেইজ।

বিয়ে কিংবা চাকরি যেটাই করতে চান, কাজি না লাগতে পারে, অফিস না লাগতে পারে, কিন্তু সব জায়গাতেই আপনার একটা প্রোফাইল লাগবে। সেটাও ফেসবুকে আছে। আর মানুষ সামাজিক জীব, সে একা বাস করতে পারে না, তার বন্ধু প্রয়োজন—এসব তো সবাই জানে। কিন্তু বন্ধু পাবেন কোথায়? কোথায় আর, এই ফেসবুকে। আহা, কী দুনিয়া আইল রে ভাই! এক ফেসবুকে বন্ধু, প্রোফাইল, হোম, স্ট্যাটাস—সবই পাচ্ছেন, জনপ্রিয়তা তো বাড়বেই। তবে কয়েকটি বিশেষ মহল ফেসবুকের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো শুরু করেছে। তাদের ধারণা, ফেসবুকের কারণে টেক্সটবুকের ব্যবহার কমে আসছে। এহ! ফেসবুক আসার আগে সবাই মনে হয় টেক্সটবুক পড়ে একেবারে আইনস্টাইন হয়ে গিয়েছিল। এ দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বটা কেমন, তা কি আমরা জানি না ভেবেছেন? আসলে ভালো জিনিস নিয়ে অপপ্রচার হবেই। এটাই নিয়ম। অতএব যে যা-ই বলুক, ফেসবুক একটা ভালো জিনিস।
ডানপক্ষ = বামপক্ষ (প্রমাণিত) সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

388) □□□□□□□□. কাব্য - দণ্ড্য রওশন

অনেক কথা
আছে বুকে
খুঁজে দেখো
ফেসবুকে!
☆
দূরকে করলে
নিকট, পরকে করলে ভাই
ফেসবুকে
সে কথা বলিয়া যাই!
☆
নাওয়া খাওয়া
বাদ দিয়া বসি
দিন নাই রাত নাই
ফেসবুক চষি!
☆
আমাদের যুগে, আমরা যখন
খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সে

ফেসবুকে বস মেলা!

☆

সার্চ দিলেই

দাও হে দেখা

কে বলেছে

আমি একা!

☆

ফেসবুকে বসে

নয়টা পাঁচটা ডিউটি

ক্লান্ত, বাসায় ফিরি

কিছুই জানে না বিউটি!

☆

চ্যাট করেছ

শাহানা ভাইবা

শাহাদত সে যে

কোথায় যাইবা! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে

০৩, ২০১০

389) বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

বিখ্যাত ব্যক্তির অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু খুবই আফসোসের ব্যাপার যে তাঁরা কেউ ফেসবুক ব্যবহার করেননি। ফলে তাঁদের স্ট্যাটাসও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু সেই আমলে ফেসবুক থাকলে তাঁরা কেমন স্ট্যাটাস দিতেন, তা ভেবে বের করার চেষ্টা করেছেন আদনান মুকিতরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার স্ট্যাটাসখানি, কৌতূহল ভরে?

15 seconds ago . Comment . Likeকাজী নজরুল ইসলাম স্ট্যাটাসের যে কमेंটগুলো চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিবে নারী, অর্ধেক তার নর।

20 seconds ago . Comment .

Likeমাইকেল কলিন্স আমাকে একা বসিয়ে রেখে ওরা দুজন কী সুন্দর চাঁদে নেমে গেল! সব বিরোধীদলীয় ষড়যন্ত্র।

35 seconds ago . Comment . Likenবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার-ওড়িশ্যার মহান অধিপতির কमेंট আমি ভুলিনি। তুমি বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রশ্রয় দিয়ো না, সুযোগ পেলেই ওরা অ্যাকাউন্ট কেড়ে নেবে।

55 seconds ago . Comment . Likesুকান্ত ভট্টাচার্য খুবই চিন্তিত, পূর্ণিমার চাঁদ যদি

ঝলসানো রুটি হয়, তাহলে ডিমভাজি/শিক-কাবাব কোনটা?

15 minutes ago . Comment .

Likeনেপোলিয়ন বোনাপার্ট ‘অসম্ভব’ বলে কোনো শব্দ আমার অভিধানে নেই। কারণ, অভিধানের ওই পাতাটা উইপোকা অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছে।

35 minutes ago . Comment .

Likeএডিসন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করলাম। তবে সুদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এটা কোনো কাজেই আসবে না। নাহ্, আমাকে আরও ভালো কিছু আবিষ্কার করতে হবে।

47 minutes ago . Comment .

Likeজগদীশ চন্দ্র বসু রেডিও আবিষ্কার করলাম আমি, আর নাম হলো মার্কনির? কে আছিস? মার্কনিরে মার কনি।

49 minutes ago . Comment .

Likeহিটলার হে হে হে, সব ফ্রেন্ডের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখন আমার দখলে।

59 minutes ago . Comment . Likeলেনিন বিপ্লবী সাথি ও বন্ধুগণ, মাথায় টাক পড়ে গেছে। এটাকে আমার নতুন হেয়ার স্টাইল ভাববেন না। কোনো তাক লাগানো সমাধান থাকলে আওয়াজ দিন।

5 hours ago . Comment . Likeপ্রমথ চৌধুরী প্রাঞ্জলতা হচ্ছে স্ট্যাটাসের সবচেয়ে বড় গুণ। সহজ কথায় স্ট্যাটাস রচনা করা গেলে কঠিন কথার প্রয়োজন কী?

15 hours ago . Comment . Likeমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ কুবের! স্ট্যাটাস কিবা?

22 hours ago . Comment . Likeমহাত্মা গান্ধী আমার নামে নাকি একটা পোকার নামকরণ করা হয়েছে? ব্যাপারটা কি সত্যি?

25 hours ago . Comment . Likeসুকুমার রায় কमेंট আছে ‘খ’मेंट নেই, सिमेंट আছে ‘ডি’मेंट নেই, সব হ-য-ব-র-ল।

31 hours ago . Comment . Likeড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেকেই মর্যাদা (স্ট্যাটাস) এবং মন্তব্য (কमेंট) লিখিতে গিয়া সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ করিয়া থাকেন। ইহা অন্যায়, খুবই অন্যায়। অ্যাম রিয়েলি শকড!

42 hours ago . Comment . Likeলিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই মাত্র ‘মোনালিসা’ নামের একটা

ছবি ঐকে শেষ করলাম। এই যা! চোখের ভ্রু
আঁকতে ভুলে গেছি।

47 hours ago . Comment . Likeশরৎচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া
সাইবার ক্যাফেতে ফেসবুক ব্যবহার করিতে
আসি। তোমরা আমার স্ট্যাটাসে একটি হইলেও
কমেন্ট ফেলিয়ো।

55 hours ago . Comment . Likeসূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

390) যে স্ট্যাটাস কেউ লেখে না

এইমাত্র হাই তুললাম কিংবা এখন টয়লেটে
যাচ্ছি—এই জাতীয় কথাও আজকাল স্ট্যাটাস
হিসেবে লেখা হচ্ছে। তবে কিছু কথা কেউ
কখনো স্ট্যাটাস হিসেবে লেখবেন না। তেমনই
কিছু কথা শোনাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার। আবির
শাহরিয়ার আজ স্যার আমাকে সবার সামনে
কান ধরে উঠ-বস করালেন।

15 seconds ago . Comment .
Likeইকবাল আখতার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়
একসঙ্গে দুই সিঁড়ি ডিঙাতে গিয়ে আজ নতুন
প্যান্টটা ফাটিয়ে ফেললাম।

20 seconds ago . Comment . Likeচৌধুরী
আবুল হোসেন ভিড়ের মধ্যে একজনের ওড়না
ধরে মৃদু টান দেওয়ার অপরাধে গণধোলাই
খেলাম।

35 seconds ago . Comment . Likeআমিন
খন্দকার আজকের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার
মাথার পরচুলা উড়ে গিয়েছিল।

55 seconds ago . Comment .
Likeআওরঙ্গজেব আজ আমার এক বন্ধুর
বিয়েতে যাচ্ছি। যে শার্ট-প্যান্ট পরে যাচ্ছি,
সেগুলো আমার আরেক বন্ধুর। বেন্টটাও...।

15 minutes ago . Comment .
Likeসোহেল খান আমার বউ আগামীকাল
বাপের বাড়ি যাবে। আমি তখন পারভীনের সঙ্গে
সিনেমা দেখতে যাব।

35 minutes ago . Comment .
Likeজয়দেব পলাশ পাবলিক বাসে ভাড়া না
দিয়েও বলেছিলাম দিয়েছি। শেষে ধরা পড়তে
হলো এবং বাস থেকে আমাকে মাঝ রাস্তায়
নামিয়ে দেওয়া হলো।

47 minutes ago . Comment .
Likeসোহাগ রহমান গতকাল এক দোকান

থেকে বেশ দামি একজোড়া জুতা চুরি করেছিলাম। কিন্তু সেই দৃশ্য সিসি টিভিতে ধরা পড়ায় এখন নাকি আমাকে খোঁজা হচ্ছে।

49 minutes ago . Comment . Likeসুনীল
রায় আজ আমার প্রেমিকার বিয়ে ছিল। বিয়েতে খুব মজা করলাম।

59 minutes ago . Comment . Likeরবিউল ইসলাম
আজ আবার আলমারি খুলে টাকা নেওয়ার সময় ধরা খেয়েছি এবং আমাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

5 hours ago . Comment . Likeরুবেল
আরমান উল্টাপাল্টা কमेंট করার অপরাধে বেশ কজন আমাকে তাদের ফ্রেন্ড-লিস্ট থেকে বের করে দিয়েছে।

15 hours ago . Comment . Likeপল্লব
বণিক আজ আমার পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে। আমি ছাড়া সবাই পাস করেছে।

22 hours ago . Comment . Likeআশুতোষ
কর্মকার গত মেলায় প্রকাশিত আমার বইটি মোট চার কপি বিক্রি হয়েছিল। শুনেছি প্রকাশক নাকি তার মোবাইল ফোন থেকে আমার নম্বর ডিলিট করে দিয়েছে।

25 hours ago . Comment . Likeরতন
চৌধুরী স্টলে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেই আজকের পত্রিকার হেড লাইনগুলো পড়ে চলে এসেছি।

31 hours ago . Comment . Likeআমির
হোসেন রোদে আমার গায়ের রং আরও কালো হয়ে গেছে। গতকাল পাশের বাড়ির দুটো বাচ্চা আমাকে দেখে ভূত ভূত বলে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

42 hours ago . Comment . Likeশামসুল
হক সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ফাস্ট ক্লাসে বসার অপরাধে শো শেষ হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগেই আমাকে হল থেকে বের করে দিয়েছে।

47 hours ago . Comment . Likeশহীদুল
হক আমি আজকাল ইন করে জামা পরছি। কারণ আমার শার্টের নিচের দিকের বোতাম নেই।

55 hours ago . Comment . Like সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৩, ২০১০

391) এক বসন্তে জিভস

লাল সার্টির টাইতে বিংগোকে একেবারে
কিন্তুতকিমাকার দেখাছিল।

‘হ্যালো, বার্টি!’

‘হাই, বিংগো। টাই পরে, ফুলবাবুটি সেজে! কী
ব্যপার?’

‘এটা গিফট পেয়েছি।’ লাজুক হেসে বলল
বিংগো।

দুজন কিছুক্ষণ বাগানে হাঁটলাম। তারপর একটা
চেয়ারে বসতে বসতে বিংগো বলল, ‘আচ্ছা,
ম্যাবেল নামটা কেমন?’

‘ভালো না।’

উত্তরে বিংগো একটু কষ্ট পেল যেন।

‘কে সে?’ নরম সুরে বললাম আমি।

‘কালকে আমার সাথে লাঞ্চে চল। পরিচয়
করিয়ে দেব।’

পরদিন একটা চায়ের দোকানে বিংগো
ম্যাবেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমাকে।

‘ওর মতো সুন্দর মেয়ে তুই আর একটিও
দেখেছিস?’ ম্যাবেল চলে যাওয়ার পর বিংগো
প্রশ্ন করল আমাকে।

‘আলবৎ না। আচ্ছা, ওর সঙ্গে তোর পরিচয়
হলো কী করে?’

‘ক্যামবারওয়েলের নাচের পার্টিতে। জিভস নিয়ে
গিয়েছিল।’

‘জিভস? ও আবার পার্টিতেও যায় নাকি?’

‘যা-ই হোক, বার্টি, আমাকে একটু সাহায্য কর।

আমার ইচ্ছে করছে জিভসকে আমার সমস্যাটা
খুলে বলতে। তুই তো বলিস ওর অনেক বুদ্ধি।

ও নাকি তোর অনেক বন্ধুকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য
করেছে।’

‘আগে সমস্যাটা তো শুনি।’

‘আরে, সমস্যাটা হলো আমার বুড়ো চাচা।

আমার তো আর কেউ নেই। চাচাও বিয়েথা
করেনি। উনি যদি জানতে পারেন যে ম্যাবেল
একজন চায়ের দোকানদার, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমাকে টাকা-পয়সা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে
দেবেন। তুই, প্লিজ, জিভসকে বল একটা বুদ্ধি

বের করতে, যাতে চাচা ম্যাবেলের সঙ্গে আমার
বিয়েতে রাজি হয়।’

সেই রাতে ডিনারের পর কথাটা পাড়লাম

জিভসের কাছে, ‘জিভস, একটা সমস্যা হয়েছে।’

‘কী সমস্যা, স্যার?’

‘সমস্যাটা বিংগো আর তার চাচাকে নিয়ে।

বিংগো এক চায়ের দোকানের কর্মচারীকে ভালোবাসে, কিন্তু ওর চাচাকে বলতে পারছে না।’

‘ও। মানে ওনার যে চাচা পাউন্সবি গার্ডেনে থাকেন, মিস্টার লিটল?’

‘তুমি এত সব জানো কী করে?’

‘আসলে, স্যার, মিস্টার লিটলের রাঁধুনির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সেদিন শুনলাম লিটলের এক কর্মচারী নাকি ওনাকে প্রতি রাতে সাহিত্য পড়ে শোনায়ে। আমার মনে হয় বিংগোর নিজেরই উচিত ওনার চাচাকে পড়ে শোনানো। এমন বই, যেগুলোতে দুজন অসম সামাজিক অবস্থানের মানুষের বিয়ে হয়। যেমন, আ রেড, রেড সামার রোজ। আমি জোগাড় করে দেব। দেখবেন, স্যার, এগুলো শুনলে লিটল একেবারে গলে যাবেন। চায়ের দোকানদারের সঙ্গে নিজের ভাতিজার বিয়েতে আর কোনো আপত্তিই করবেন না।’

কাজেই জিভসের পরামর্শমতো বিংগো প্রতি সন্ধ্যায় তার চাচাকে বই পড়ে শোনাতে লাগল। একপর্যায়ে বেচারি গলা গেল ভেঙে। বেচারি গলা!

কদিন পরই বিংগো এসে হাজির।

‘দোস্ত, আমার চাচা তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।’

‘আমার সঙ্গে? উনি তো আমাকে চেনেনই না।’

‘আরে, আমি বলেছি তো, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু।

‘তোর মতলব কী রে?’

‘মানে, চাচাকে আমি ম্যাবেলের কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছি। তুই যদি...।’

‘আমি? মাথা খারাপ?’

‘দেখ, আমি কিন্তু একবার তোর জীবন বাঁচিয়েছিলাম।’

‘কবে রে?’

‘অ্যা...অ্যা...নাহ্! তাহলে মনে হয় অন্য কারো।

অত সব বুঝি না। কালকে চলে আসবি।’

অগত্যা পরদিন গেলাম মি. লিটলের বাড়ি।

‘আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য আমার!’ আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন মি.

লিটল, ‘অল্প বয়সেই কত উন্নতি করে

ফেলেছেন। বেশ বেশ।’

আমি ভাবলাম, লিটল হয়তো আমাকে অন্য কারও সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছেন। এমন সময় একটা কাজের মেয়ে এসে বলল, আমার একটা ফোন এসেছে। ওপাশ থেকে বিংগোর গলা শোনা গেল।

‘হ্যালো, চাচা তোকে দেখে খুশি তো?’

‘একটু বেশিই খুশি মনে হলো।’

‘দোস্ত, তোকে একটা কথা বলা হয়নি। চাচাকে বলেছি, তুই ওই বইটির লেখক।’

‘কী?’

ফাজিলটা খট করে ফোন রেখে দিল।

লিটলের সঙ্গে আমার লাঞ্চ যেন আর শেষই হতে চায় না।

‘এত সুন্দর লেখেন আপনি, পড়লেই চোখে পানি চলে আসে। আমিও একসময় শ্রেণীবৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আপনার বই পড়ার পর...।’

অবশেষে আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, ‘বিংগো চায়ের দোকানের একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।’

‘খুব ভালো।’

‘আপনি রাজি?’

‘অবশ্যই।’

একটু দম নিয়ে বললাম, ‘মানে, আপনি যা হাতখরচ দেন তাতে ওর নিজের চলে যাচ্ছে। কিন্তু...।’

‘আমি দুঃখিত। আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমার স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হবে।’ মাথা নেড়ে জানালেন মি. লিটল।

‘কিন্তু, আপনি তো বিয়েই করেননি।’

‘করব। যে মহান নারী আমাকে এত দিন রেঁধে খাইয়েছে, আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।’ ‘মি. বিংগো আজ অনেকবার ফোন করেছেন।’ আমি বাড়ি ফেরার পর জিভস বলল।

‘তোমার জন্য খারাপ খবর আছে, জিভস।

তোমার বাগদত্তা তার মনিবকে বিয়ে করছে।’

‘সত্যি, স্যার?’ ‘তুমি কষ্ট পাচ্ছ না?’

‘স্যার, আমি জানতাম এমনই হবে।’

‘তাহলে কেন এই বুদ্ধি আঁটতে গেলে?’

‘আসলে, স্যার, আমার মনে হচ্ছিল আমি অন্য আরেকজনের দিকে ঝুঁকে পড়েছি।’

‘মানে? কত দিন ধরে চলছে এসব?’

‘কয়েক সপ্তাহ। যেদিন ওকে প্রথম

ক্যামবারওয়েলের পার্টিতে দেখলাম...।’

‘হায়! হায়! বলে কী!’

‘ঠিকই ধরেছেন, স্যার। কাকতালীয়ভাবে সেই মেয়েটিই, যে আপনার বন্ধু। স্যার, আপনার সিগারেটগুলো ছোট টেবিলে রেখেছি। শুভ রাত্রি।’ পি জি ওডহাউজ

অনুবাদ: আলিয়া রিফাত

পি জি ওডহাউজ: ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গীতিকার। জাতে ব্রিটিশ। তার বিখ্যাত সৃষ্টি মজার চরিত্র জিভস। জন্ম ১৫ অক্টোবর, ১৮৮১; মৃত্যু ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১০, ২০১০

392) ছাত্রলীগ কেন সেরা

u মডেল, অভিনেত্রী যখন স্লিম থাকেন, তখন তাঁদের ছবি ছাপা হলে পুরুষেরা বেশি দেখে। তাঁরা যখন মুটিয়ে যান, তখন ছবি ছাপা হলে নারীরা বেশি দেখে। কারণ, শাড়ির ডিসপ্লেটা তখন ভালো হয়। আর ছাত্রলীগের ছবি ছাপা হলে পুরো জাতি একসঙ্গে দেখে।

u এক-এগারোর তোপে রাজনীতি কিছুটা সুশীল হয়ে পড়েছিল। একে আগের মারামারি-কাটাকাটির অবস্থায় নিয়ে যেতে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্রলীগ। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট মারামারি দিয়ে শুরু করে তারা রাজনীতির কোষ্ঠকাঠিন্য পরিবেশকে ফ্রি-স্টাইল ডায়রিয়া অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। জয় ছাত্রলীগ!

u অবশ্য এ করতে গিয়ে তারাও মনে হয় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসএমসির ওরস্যালাইনের গাড়ি আটকে তারা সম্প্রতি স্যালাইন দাবি করেছে।

u তিন বছরেই বিএনপির কর্মীদের দম ফুরিয়ে যেতে শুরু করেছে। ঢাকায় নির্বাচন কমিশনমুখী পদযাত্রায় তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। আর ছাত্রলীগ?

প্রতিদিন কী অসীম শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! মারছে, ধরছে, কোপাচ্ছে। এই অশ্বশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে বিএনপিও। নিজেদের কর্মসূচিতে এদের ভাড়া করতে পারে তারা। এ ব্যাপারে রাজশাহীর মেয়রের সহায়তা নিতে পারে বিএনপি। পত্রিকার খবর, তিনি নাকি এখন খালেদা জিয়ার সমাবেশেও বিনিয়োগ করছেন।

u দরপত্রের দীর্ঘসূত্রতা দেশের উন্নয়নের বড় সমস্যা। দরপত্রের দরাদরি শেষ করে কোনো কাজ শুরু করতে করতেই আর দেশে সেই সমস্যার অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পড়ালেখা ছেড়ে এগিয়ে এসেছে ছাত্রলীগ। দরপত্র ছিনতাই বা সমঝোতা করে বাছাইজনিত সময়ের অপচয় বন্ধ করছে তারা। কারণ, টাইম ইজ মানি। ঝিনাইদহে তো তাদের যুব সহযোগীরা দরপত্র ডাকার আগেই রাস্তার কাজ করে রেখে দিয়েছে।

u এত কিছুর পরও দাতা সংস্থাগুলো দরপত্র নিয়ে ছাত্রলীগের দাপাদাপি পছন্দ করছে না। তারা শর্ত জুড়ে জুড়ে সরকারকে গর্তে ফেলছে। বাধ্য হয়ে সরকার ই-মেইলে দরপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করছে। তো, এই কৃতিত্ব কার? ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তেও সহায়তা করছে ছাত্রলীগ।

u ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ। দিন বদলায়।
অমিতাভ বচন বদলায়। বচন বদলাবে না!
ছাত্রলীগনং টেন্ডারনং তপঃ!

u আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভ্রাতাসুলভ আচরণে ছাত্রদল সুশীল হয়ে পড়ায় পরীক্ষার মুখে পড়েছে ছাত্রলীগ। মারামারির পারফরম্যান্স ধরে রাখার জন্য তারা ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে প্রতিদিন প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে।

u আধুনিকায়নের ফলে দেশের কর্মকার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। ছাত্রলীগ সেই কর্মকারদের পূর্বপুরুষদের পেশাকে সমৃদ্ধ করছে। তারা সারা দেশে দরপত্র ছাড়া ‘কুইক অ্যান্ড ডাইরেক্ট পদ্ধতি’তে দা, রামদা তৈরির কার্যাদেশ দিয়ে গোটা লৌহশিল্পে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে এনেছে।

u বৈশ্বিক মন্দার ফলে দেশের তৈরি পোশাকশিল্প কিছুটা চাপের মুখে আছে। ছাত্রলীগ এই শিল্পের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারে। কর্মীদের জন্য রামদা রাখার মতো পকেটওয়ালা কয়েক লাখ প্যান্ট অর্ডার দিতে পারে তারা। এতে তাদের আর চোরের মতো রামদা পেছনে লুকিয়ে ঘুরতে হবে না। আসছে বাজেটে এর জন্য থোক বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। তবে একে তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য বিশেষ ইনসেন্টিভ হিসেবে দেখালে ভালো হবে।

u দা, রামদা ধার দেওয়ার জন্য বালু অন্যতম উপাদান। সংগঠনের জুনিয়র কর্মীরা বড় ভাইদের দা ধার দেওয়ার বালু সরবরাহ করে ব্যবসায় হাতে খড়ি নিতে পারে। ভবিষ্যতে এই জুনিয়ররা সংগঠিত হয়ে বালু লীগ নামে সংগঠনের জন্ম দিতে পারে। তবে তাদের সংগঠন রামদা রেজিমেন্টের অধীনে থাকতে হবে।

u জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম ও বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদ বলেছেন, তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ছাত্রলীগের জন্য সুযোগ পাচ্ছেন না। ছাত্রলীগ যা শুরু করেছে, তাতে ওনারা প্রস্তুতি নিতে নিতেই সরকারের পতন ঘটে যাবে। তাহলে সরকারবিরোধী আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখার কৃতিত্ব কার? ছাত্রলীগের! (জোর করতালি)শাহেদ মুহাম্মদ আলী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১০, ২০১০

393) মানুষের খোঁজে!—আহসান হাবীব

বুঝলি, ঢাকা শহর এখন ‘ডেড সিটি’
তাকে কে বলল?
রীতিমতো পড়াশোনা করে বের করেছি...।
কী রকম?
মেগাসিটির পরের স্টেজটাই হচ্ছে ডেড সিটি।
কিছুদিন আগেও ঢাকা ছিল মেগাসিটি, এখন
এটা ডেড সিটি!
তাই নাকি?
হু...আর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কী জানিস?
কী? ডেড সিটিতে কারা বাস করে?
কারা?
ভূতেরা...ভূত...আমি তুই সবাই এখন ভূত!
ঠিকই বলেছিস, এই ঢাকা শহরের মানুষ আর
মানুষ নাই...পেপার খুললেই দেখা যায় এ ওকে
প্রকাশ্যে কোপাচ্ছে...এসিড মারছে ...আগে ছিল
বখাটে ছাত্র, এখন বখাটে শিক্ষকও পাওয়া
যাচ্ছে কোথাও কোথাও...পুলিশকে খুন করছে
সন্ত্রাসীরা...দখল-চুরি-ছিনতাই-খুন এসব তো
মামুলি...উফ, মানুষ আর মানুষ নেই...সব পশু
হয়ে গেছে!
ওই তো আরেকটা ভুল করলি?

কী ভুল করলাম?

মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করলি, পশুদের একটা এথিকস আছে, মানুষের তাও নেই...বরং বল, মানুষ ভূত হয়ে গেছে...শ্রেফ ভূত...ভূত যেমন উল্টো পায়ে চলে, সে রকম ঢাকার মানুষজন মানে ভূতেরা...

এখন আমাদের কী করণীয়?

আমাদের এখন সত্যিকারের একটা মানুষ খুঁজে বের করতে হবে এই ঢাকা শহর থেকে...

তারপর?

তারপর তাকে সংবর্ধনা দিয়ে মানুষের আসল পরিচয় তুলে ধরতে হবে সবার সামনে। তাকে কেন্দ্র করে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে...নিউ স্টার্ট!

ওহ্ দারুণ বলেছিস...তাহলে খোঁজা শুরু করে দিই, কী বলিস? একজন সত্যিকারের মানুষ... ঠিক তাই, সত্যিকারের মানুষ, ভূত না কিন্তু...তুই লেগে পড়, আর আমি এদিকে স্পনসর জোগাড়ের ব্যবস্থা করি।

স্পনসর কেন?

বাহ, লোকটাকে সংবর্ধনা দিতে গেলে খরচাপাতি আছে না? তার ওপর মিডিয়া কাভারেজ, প্রেস কনফারেন্স—একটা হুলুস্থুল ফেলে দিতে হবে চারদিকে।

কাজে লেগে পড়ল দুই বন্ধু। ‘ঢাকা শহর উদ্ধার কমিটির’ (রেজিস্ট্রিকৃত) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আবদুল মোতালেব আর রহিম সিদ্দিকী (কাল্পনিক নাম, প্রকৃত নাম প্রকাশে তারা এই মুহূর্তে অনিচ্ছুক)।

সাত দিনের মাথায় আবার জরুরি মিটিং...।

ভালো খবর আছে।

পাওয়া গেছে?

হুম...একদম পারফেক্ট মানুষ, জীবনে মিথ্যা কথা বলেনি, ঘুষ খায় না, মাছ-মাংস কিছু খায় না...। ঘুষ খায় না ঠিক আছে, তার সঙ্গে মাছ-মাংস খায় না...মানে?

আরে, মাছ-মাংস খায় না, কারণ ওগুলো খেলেই তো প্রাণী হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। খিদে পেলে লোকটা গাছতলায় বসে থাকে। গাছ থেকে ফলমূল আপসে নিচে এসে পড়লে খায়...নইলে না খেয়ে থাকে।

বলিস কী? এ তো অসাধারণ মানুষ রে! ঢাকা শহরে এ রকম মানুষ আছে! ...ব্র্যাভো

ব্যাভো...দারুণ কাজ করেছিস। লোকটার ওপর
নজর রাখ, এদিকে আমি স্পনসর বোধহয়
একটা পেয়েই যাব...ব্যাটারা অবশ্য একটু
ঝামেলা করছে। বলছে, সেলিব্রিটি কে কে
আসবে...সেলিব্রিটি না থাকলে...

যা হোক। ডেড সিটির দুই মানুষ, থুড়ি, দুই ভূত
যথাক্রমে আবদুল মোতালেব আর রহিম সিদ্দিকী
জান দিয়ে খাটতে লাগল। কয়েক দিন পর ফের
একটা মিটিং ডাকল তারা।

দারুণ খবর আছে।

কী রকম?

লোকটার গা থেকে আজ দেখলাম জ্যোতি বের
হচ্ছে, মানে জ্যোতি বিচ্ছুরণ!

মানে?

আরে, আগেকার সাধুসন্তদের গা থেকে পবিত্র
আলো বের হতো না? সেই রকম!

বলিস কী, এটা কী করে সম্ভব?

এটা মনে হয় ঈশ্বরের খেলা...ঈশ্বর দেখলেন এ
রকম একজন ‘মানুষ’, তাই তাকে ওইভাবে
পুরস্কৃত করলেন...প্রকৃতির দান!

তাহলে তো আর দেরি করা যায় না। তুই এক
কাজ কর...কালই লোকটাকে নিয়ে আয়,
দুপুরের পর সংবর্ধনা।

আমি এদিক সামলাচ্ছি...।

ঠিক আছে।

পরদিন বিষণ্ণ বদনে একা ফিরে এল সাধারণ
সম্পাদক রহিম সিদ্দিকী!

কী হলো, একা এলি যে?

খবর খুবই খারাপ

কী?

লোকটা বেঁচে নেই!

মানে?

মানে ওর গা থেকে জ্যোতি বের হচ্ছিল দেখে
এলাকার লোকজন ওকে ভূত মনে করে পিটিয়ে
মেরে ফেলেছে! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে
১০, ২০১০

394) ভিক্ষা দিলে জ্ঞান ফি - আবু সুফিয়ান

মানুষকে এখন সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে যে
শব্দটি তার নাম ‘ফি’। সরল বাংলায় অনুবাদ
করলে ‘ফি’ মানে দাঁড়ায় ‘ফাও’! ফাও পাওয়াতে
বড় আনন্দ! মানুষ এই আনন্দ পেতে পছন্দ
করে। আমিও ব্যতিক্রম নই।

চারদিকে প্রতিদিন অসংখ্য ফ্রি-এর অফার দেখি! মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর বন্ধ সিম চালু করলে টক টাইম ফ্রি। চোখে পড়ে না এমনভাবে শুধু ছোট করে লেখা থাকে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই। বিদেশি জুসের প্যাকেটে অফার থাকে একটা কিনলে একটা ফ্রি! বাসায় আনার পর দেখা যায় পণ্যের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে। খেলে বিসক্রিয়া হবে। প্রায়ই কলকাতা যাওয়ার প্লেনের টিকিটের অফার থাকে, একটা টিকিট কিনলে একটা টিকিট ফ্রি! টিকিট আনতে গেলে দেখা যায়, ট্রাভেল ট্যাক্স টিকিটের দামের সমান। নির্দিষ্ট ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পাঁচতারা হোটেলে একজন লাঞ্চ বা ডিনার করলে সঙ্গে একজনের খাবার ফ্রি! অথচ চিঠি দিয়ে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়, কোন কোন দিন খাওয়া যাবে না। সুতরাং অচল দিনে ফ্রি খাও। টেলিভিশনে নাটক দেখায়, মুড়ি কিনলে ঠোঙা ফ্রি। এই ঠোঙার মর্ম কী জানি না। এ রকম আরও অসংখ্য ফ্রি-এর ঘটনা আছে। সবগুলোর ক্ষেত্রেই এক ধরনের কৌশলী ফ্রি। স্বার্থ আছে। ব্যবসা আছে! ফ্রি বিষয়টা হচ্ছে লোভ ধরানোর জন্য।

ধানমন্ডি বিভিন্ন রাস্তায় প্রায়ই আমার চলাচল হয়! নাটকের কাজ করি! এর মধ্যে এক ফকিরকে দেখি ভিক্ষা করছেন! ফকিরেরা আল্লাহ-রাসুলের নাম নিয়ে ভিক্ষা করে। কাকুতি-মিনতি করে! এই ফকির বৃদ্ধ। বয়স ৫৫-৬০-এর কম হবে না। চুল বেশির ভাগ পাকা। স্বাস্থ্য ভালো। গায়ে সাদা রঙের পাঞ্জাবি। ধুলোবালি লেগে কালচে হয়ে আছে। একটা ছালার ওপর বসে ভিক্ষা করছেন! দুই রঙের ফিতার দুটো স্পঞ্জ পাশে রাখা। মুখে আল্লাহ-খোদার নাম নেই। মাঝেমধ্যেই জিকিরের মতো বলছেন, ‘পাঁচ টাকা ভিক্ষা দিলে জ্ঞান ফিরি।’ ভিক্ষুকেরাও যে কিছু দিতে পারে, ফ্রি দিতে পারে এই প্রথম জানলাম। সেটাও আবার ‘জ্ঞান’।

ধানমন্ডিতে এখন অনেক কলেজ ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। ইদানীং বহু ছেলেপেলে আড্ডা দেয় এখানে। এদের অধিকাংশই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন এই ভিক্ষুক বুড়ো। পাঁচ টাকা ভিক্ষার বদলে একটা জ্ঞান উনি ফ্রি দেন। এই জ্ঞান

হচ্ছে গাঁজা দিয়ে বানানো সিগারেট!

ভিক্ষুকের নাম খৈয়ম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই কাজটা কি ঠিক করছেন?’

‘অবশ্যই ঠিক। ভিক্ষা দিয়া তারা সোয়াব কামাই করে। সঙ্গে জ্ঞান ফি দিতাছি। এই সিকারেট উচ্চ জ্ঞান বিদ্বি (বুদ্ধি) করে, ভাবনা বাড়ায়। বুদ্ধি খোলে। যার ইচ্ছা ভিক্ষা দিয়া সোয়াব কামাবে। অসুবিধা আছে?’

নতুন যারা খেতে এসেছে এরা ক্যামেরা দেখলে একটু ভয় পায়। খানিকটা লজ্জাশীল। অভ্যস্ত গাঁজাখোরেরা হয় বেশরম। নির্লজ্জ ও বেহায়া। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেপেলেতে লেকের সুস্থ পরিবেশ নোংরা হচ্ছে—এই অভিযোগ স্থানীয়বাসিন্দাদের। তরুণদের মধ্যে গাঁজা বা এজাতীয় নেশার প্রতি আকর্ষণ আগেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এটা ঘটছে, সেটা চিন্তার ব্যাপার!

‘ভিক্ষা দিলে জ্ঞান ফি’ তত্ত্বটা নিয়ে একটি দৃশ্য তুলে ধরছি! দৃশ্যের চরিত্রগুলো কাল্পনিক! করম আলী ও রুস্তম খান বসে আছেন। ভিক্ষুক ফোন করেছে। করম আলীর সঙ্গে কথা বলছে। ভিক্ষুক: সালামালাইকুম, স্যার!

করম আলী: অলাইকুম আসসালাম। কেমন আছ?

ভিক্ষুক: ভালো আছি, স্যার!

করম আলী: তোমার ভিক্ষা-জ্ঞান বিতরণের কাজ কেমন চলতাকে?

ভিক্ষুক: আপনার দোয়ায় ভালো, স্যার!

করম আলী: শোনো, সব সময় একই ইউনিভার্সিটির কাছে বসবা না। এখন অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি! মেডিকেল কলেজ... একেক দিন একেক জায়গায় বসবা!

ভিক্ষুক: আমার একটা ভাইগ্লা আছে স্যার, কোনো কাজ করতে পারে না! তারও যদি একটা ব্যবস্থা নিতেন...।

করম আলী: ভাইগ্লা ভাইস্তা আত্মীয়স্বজন কানা ল্যাংড়া যা আছে নিয়া আসো। কাজের ব্যবস্থা কইরা দিব।

ভিক্ষুক: শুকরিয়া, স্যার। শুকরিয়া। [খুশি মনে রাখবে]

রুস্তম খান জিজ্ঞেস করল, কে স্যার?

করম আলী: এক ভিক্ষুক! তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি।

রুস্তম খান: আমি, স্যার। বড় ভয়ের মধ্যে
আছি। এইবার আমাদের যুদ্ধাপরাধের বিচার
মনে হয় হয়েই যাবে, স্যার!

করম আলী: তুমি যে রকম ভয় পাচ্ছ তাতে তো
আমারই এখন শরম লাগছে এটা চিন্তা করে যে
তুমি ১৯৭১ সালে আল-বদর বাহিনীতে ছিলে।

রুস্তম খান: চারদিকের অবস্থা দেখছেন, স্যার...।

করম আলী: দেখছি, কী হয়েছে?

রুস্তম খান: তরুণ প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি,
তারা আমাদের বিচার চায়, স্যার...।

করম আলী: আরে বেওকুফ, যুদ্ধাপরাধের বিচার
হবে, সেই ভয়ে চিকার পিছছাবে আছাড় খাব?

রুস্তম খান: সেই সময় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা না
করলেই হতো, স্যার। এত বছর পরে আজ...।

করম আলী: শোনো, ওই সময় বুদ্ধিজীবীদের
যদি হত্যা না করা হতো তাহলে স্বাধীনতার
পরপরই যুদ্ধাপরাধের জন্য আমাদের বিচারের
দাবি উঠত। বুদ্ধিজীবীদের খতম করায় আমরা
এত দিন বিপদমুক্ত ছিলাম। এখন তোমাকে
চিন্তা করতে হবে এত দিন পর যুদ্ধাপরাধের
বিচারটা কারা বেশি চাইছে?

রুস্তম খান: কারা আবার, আওয়ামী লীগ।

করম আলী: দূর পাগল! আওয়ামী লীগ তো
বিষয় না। আওয়ামী লীগ তখনো ছিল। ১৯৯৬-
এও ছিল। তাতে কী হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার করতে তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে ছাত্ররা
লাফালাফি করছে বেশি। বুদ্ধিজীবীদের মতো
এদের লাফালাফি খতম করে দিলেই আমরা
নিরাপদ!

রুস্তম খান: কিন্তু এখন এসব খুনোখুনি করা.....

করম আলী: রক্তের খুনোখুনি তো ছাত্রলীগ
নিজেরাই করছে। পেপার দেখো না! ওই সব
রক্তারক্তি কাণ্ড করার দরকার আমাদের নেই।
আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো
শিক্ষিত তরুণ ছেলেমেয়েগুলোর জ্ঞানকে খুন
করতে হবে, মেধাকে হত্যা করতে হবে!

তাহলেই আমরা নিরাপদ হতে থাকব!

রুস্তম খান: কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব, স্যার?

করম আলী: বাংলাদেশে এখন কলেজ-

ইউনিভার্সিটির অভাব নেই। একটা ছোট

উদাহরণ দিই। আমি অলরেডি ভিক্ষুকদের

মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ‘পাঁচ টাকা ভিক্ষা
দিলে জ্ঞান ফ্রি’ প্রজেক্ট চালু করেছি! এটা চালু

করে খুব ভালো ফল পাচ্ছি!

রুস্তম খান: মানে, স্যার?

জ্ঞান ফ্রি... বিষয়টা বুঝলাম

না!

করম আলী: এটা হচ্ছে একের ভেতর দুই।

ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থান করছি। এতে সরকারের

ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের নির্বাচনী অঙ্গীকার

পূরণে সাহায্য করছি! দুই. তরুণদের মেধা খুন

করছি। গাঁজার নেশায় তারা চিন্তাশূন্য হবে।

তাতে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে থাকবে।

গিভ অ্যান্ড টেক! 'ভিক্ষা দিলে জ্ঞান ফ্রি' আলো

চারদিকে ছড়িয়ে দাও! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম

আলো, মে ১০, ২০১০

395) দেশ বিক্রি- আনাতোলি

ফ্রশকিন

বাজারে এক লোক আমার কাছে এসে বলল,

‘আমি জানি, অনেক গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য

আপনার জানা আছে। ভালো টাকার বিনিময়ে

আপনি কি দেশ বিক্রি করে দিতে রাজি?’

তার কথা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস

করলাম, ‘দেশ বিক্রি?’

সে বলল, ‘হ্যাঁ, ভালো টাকার বিনিময়ে।’

আমি অবহেলার সুরে জানতে চাইলাম, ‘ভালো

টাকা মানে?’

সে বলল, ‘এক হাজার ডলার।’

আমি বললাম, ‘ভীষণ বদলোক তো আপনি!’

সে বলল, ‘বারো শ।’

আমি বললাম, ‘আমি? দেশ বেচে দেব? বারো শ

ডলারে?’

সে বলল, ‘তেরো শ।’

অবজ্ঞার হাসি হেসে বললাম, ‘তেরো শ কি

সাপ্তাহিক বেতন, আপনাদের দেশে যেমন

প্রচলিত?’

সে বলল, ‘না, মাসিক। আপনাদের এখানে

যেমন প্রচলিত।’

আমি বললাম, ‘আপনি একটা বদমায়েশ!’

কৌতূহলী লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করল

আমাদের চারপাশে। অনেকেই প্রস্তাব দিল,

‘আমরা দেশ বেচে দেব।’

আমাকে দেখিয়ে লোকটি গোঁয়ারের মতো বলল,

‘না, শুধু সে বেচবে।’

দেখলাম, চারপাশে ধুমসে বেচাকেনা চলছে।

কেউ বিক্রি করছে ট্রেনের সময়সূচি, কেউ

গোপন সামরিক প্রকল্প, মেয়েদের স্নানাগারের সময়সূচি, ঘরে ভোদকা বানানোর রেসিপি...

তবে আমি...অটল, অবিচল।

লোকটা তখন বলল, 'উনিশ শ! দৈনিক।'

চারপাশের সবাই চিৎকার করে বলল, 'রাজি হয়ে যান। রাজি হয়ে যান।'

চেহারা কী একেকজনের! একেবারে লম্পটের মতো। আমি ভাবলাম, ওদের চটানোর জন্যই আরও দরদাম করব। বললাম, 'দৈনিক দুই হাজার!'

লোকটি রাজি হয়ে গেল, বলল, 'তা-ই সই।'

দুই হাজার ডলার গুনে আমার হাতে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এত বেশি দাম নিলেন কেন, বলবেন কি?'

আমি উত্তর দিলাম তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে, 'শুনুন, বিদেশি সাহেব, আমার যা কিছু আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো আমার দেশ।' **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১০, ২০১০

396) ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী - ক্রিকেটের কী হবে?

প্রবাদে আছে, সময় ও নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না (তবে বুড়িগঙ্গা নদীর কথা আলাদা, বুড়িগঙ্গার স্রোত দূষিত বর্জ্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে)। আর তাই মানুষ দিনরাত ভাবে, কম সময়ে কীভাবে বেশি কাজ করা যায়। সময় বাঁচাতে গিয়ে এই যুগে মোবাইল ফোনসেট থেকে শুরু করে মানুষের মন—সবকিছুই ছোট হয়ে আসছে। আগে কী সুন্দর বড় বড় মোবাইল ফোনসেট পাওয়া যেত! দেখতেই কত ভালো লাগত। আর এখন ছোট ছোট মোবাইল ফোনসেটে বাজার ভরে গেছে। কারও মোবাইল ফোনসেট একটু বড়সড় হলেই সবাই দাঁত কেলিয়ে হাসা শুরু করে। অথচ প্রবাদে আছে, বড় জিনিস দেখলে মন বড় হয়। আজকাল মানুষের সময় এতই কম যে প্রবাদ-প্রবচনও সব ভুলেটুলে বসে আছে। সব দোষ ওই সময়ের। সময় কমাতে গিয়েই তো এত সব ভেজালের সৃষ্টি। পাঁচ দিনের টেস্ট থেকে ৫০ ওভারের ম্যাচ। সময়ের কারণে সেই ৫০ ওভারের ম্যাচও ছোট করে ২০ ওভারের টি-টোয়েন্টি। সেই টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপও হচ্ছে এবং বাংলাদেশ হেরে বিদায়ও নিয়ে নিয়েছে।

ভয়াবহ অবস্থা! শুধু কি ওভার? অনেকের কাছে টি-টোয়েন্টির অন্যতম আকর্ষণ যে চিয়ারলিডার, তাদের পোশাকও ছোট হয়ে গেছে। অথচ প্রথম দুই আসরেও তাঁদের পোশাক মোটামুটি বড়ই ছিল। কিন্তু এরপর কী হবে? পোশাকের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু ওভার? এভাবে ওভার কমতে থাকলে তো একসময় এক ওভারের খেলা খেলতে হবে। তখনো মানুষ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলবে, ‘এক ওভারের খেলা? আরে, এক ওভারের খেলা দেখার সময় আছে নাকি! কত কাজ...’ কী আর করা, খেলা আরও ছোট করা হবে। টসেই হয়ে যাবে খেলার মীমাংসা। যে দল টস জিতবে, ওই ম্যাচে সেই দলই জয়ী। দর্শকও খুশিমনে টস দেখে বাড়ি চলে যাবে। পছন্দের দল জিতলে হাততালি। আর হারলে গালি দিয়ে বলবে, ‘ইস্, মামা, জেতা খেলা, এই ম্যাচ কেউ হারে? আরে ব্যাটা, আমার কাছে আসিস, টস কীভাবে জিততে হয় শিখিয়ে দেব।’ নাহ, ক্রিকেটের কী যে হবে, কিছুই বোঝা যায় না। যা-ই হোক, সবকিছু যখন ছোট হয়ে আসছে, তখন এই লেখাটা শুধু শুধু বড় করে আর কী হবে। লেখা বাদ। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

397) বুটজুতো

আইভান আইভানোভিচ ত্রুতিলকিন পোস্ট অফিসে গিয়ে ঢুকল। সেখানে যে জানালা দিয়ে ডেকে ডেকে চিঠি দেওয়া হয়, তারই সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াল সে। একটু পরেই জাফরি দেওয়া জানালাটার সামনে এসে দেখল বাদামি চুলের সুন্দরী একটি মেয়ে ওদিকে বসে।

‘পরিচয়পত্রটা চাই।’ মেয়েটি বলল।

শুনেই আইভান হকচকিয়ে গেল, ‘মানে, আমি এখানে মে-ডে-র মেলায় এসেছি। আমার দেশ থেকে চিঠি আসার কথা আছে। আমি—’

‘বলছি, পরিচয়পত্র আছে?’

‘আছে।’

‘সেটা দাও কমরেড, দেখি।’

‘এখনই তো সেটা দেখানো যাবে না।’ আইভান জানালার কাছে মুখ নিয়ে নিচুগলায় বলল মেয়েটিকে। ‘কার্ডটা বুটজুতোর তলায় লুকোনো আছে।’

‘তাহলে কোনো উপায় নেই। ওই কার্ড ছাড়া চিঠি দেওয়া নিষেধ।’

‘কিন্তু দেখো, একবার যদি পারো।’

‘না, উপায় নেই।’

‘তার মানে, এখন আমাকে জুতো খুলতে হবে।’

আইভান জানালা থেকে সরে এসে বড় হলটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল, বসার কোনো খালি জায়গা নেই। সে তখন কোটটা খুলে মেঝের খানিকটা ঝেড়ে নিয়ে ব্যাগটা পাশে রেখে নিজের ডান পায়ের জুতোটা ধরে টানতে লাগল।

ক্রমেই তার চারপাশে ভিড় জমতে লাগল আর শুরু হলো প্রশ্নবাণ। কী ব্যাপার? জুতো খুলছ কেন?

‘বোধহয় পা-টা মচকে গেছে।’ একজন মন্তব্য করল।

‘কিংবা পায়ে কড়া পড়েছে।’ লোকটা সে জন্য দুঃখিতও।

‘না, না। কড়া নয়। আমার মনে হয় জুতোর মধ্যে কোনো কিছু ঢুকে গেছে।’

ওদিকে জানালার ভেতর দিয়ে সেই বাদামি চুলের মেয়েটিও ইভানের জুতো খোলা দেখছে আর মনে মনে হাসছে। বেচারার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে জুতো খুলতে। কিন্তু খুলছে না। শেষে আইভান তার বাঁ পা-টা ডান পায়ের জুতোর গোড়ালিতে লাগিয়ে ঠেলা দিতে লাগল। এবার যেন একটু সরল জুতোটা। কিন্তু গোড়ালির কাছে গিয়ে আবার গেল আটকে।

‘না, হলো না।’ ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলল।

‘জুতোর মুখটা চেপে ধরো।’ টুপি মাথায় একজন উপদেশ দিল।

‘জুতোর মুখ চাপলে কী হবে? আমার গোড়ালি গেছে আটকে।’ উত্তর দিল আইভান।

একটি মেয়ে বলল, ‘বুটের ফিতেও তো খোলা যাবে না দেখছি।’

এক ভদ্রলোক, চোখে চশমা, হাতে ছড়ি।

আইভানের কাছে এসে তার জুতো ধরে টানতে লাগলেন। অনেকবার হ্যাঁচকা টান মেরেও কিছুই হলো না, মাঝখান থেকে তাঁর চশমাটাই ছিটকে পড়ে গেল। কাজেই ছাড়ান দিয়ে চলে গেলেন তিনি। আর একজন এগিয়ে এল আইভানকে সাহায্য করতে। সেও ব্যর্থ হলো। শেষে একজন লম্বা-চওড়া লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। তার হাত দুটো কোদালের মতো চওড়া, আঙুলগুলো

বেশ মোটা। সে বুটটা দুই হাতে কায়দা করে ধরল। লোকেরা ভিড় করে দেখতে লাগল। মুখে তাদের কথা নেই। লোকটা এবার হয়তো আইভানের জুতো পা থেকে ছাড়িয়ে আনবে, নয়তো আইভানের পা-টাই কিংবা দুটোই। ভয়ে আইভান চোখ বুজে ফেলল। জোয়ান লোকটা আইভানের জুতোটা টানতে গিয়ে আইভানকেই মেঝেতে ছেঁচড়ে টানতে লাগল। যতবার টানতে লাগল, ততবারই আইভান মেঝে ঘষটে এগিয়ে এল।

জোয়ান লোকটা বলল, ‘একটা সাঁড়াশি আনো কেউ।’ বলেই আইভানকে টেনে দাঁড় করাল একবার। সে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল কিন্তু আবার তাকে ঠেলে বসিয়ে দিল লোকটা। বলল, ‘কই, একটা সাঁড়াশি পাওয়া গেল? আর এক টুকরো কাঠ। একে ধরে আটকে রাখা দরকার।’ কিন্তু পোস্ট অফিসে সে রকম কিছুই পাওয়া গেল না। কাজেই জোয়ান লোকটা প্রায় ১০ মিনিট ধরে আইভানের জুতোসমেত পা-টা ধরে ঘরময় ছেঁচড়ে ঘোরাতে লাগল। সারা ঘরটায় দুবার আইভানকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে জোয়ান লোকটা হাঁপিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

কপালের ঘাম মুছে লোকটা বলল, ‘না, সাঁড়াশি ছাড়া কোনো উপায় নেই।’

এবার জনা পাঁচেক লোক এগিয়ে এল। তাদের একজন আইভানের জুতোটা ধরল আর বাকি চারজন পর পর একজন এক-একজনের কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর শুরু হলো টান। দেখে জোয়ান লোকটা খুশি হলো, ‘হ্যাঁ, এভাবে হতে পারে। দাঁড়াও দেখছি।’ বলে উঠে সে পেছন থেকে আইভানের কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। বলল, ‘দইদিকে টানো। না, আরও দুজন লোক আমার দিকে দরকার।’ জোয়ান বলল।

তা-ই হলো। জুতো তবু খোলে না।

‘কিরে বাবা। আশ্চর্য তো।’ শেষে ‘হে-ইও’ বলে একটা টান দিতেই জুতো গেল খুলে।

লোকগুলো চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আইভান সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে যার হাতে জুতোটা তখনো ধরা ছিল, তাড়াতাড়ি নিয়ে তার মধ্যে হাত ঢোকাল। কিন্তু কই পরিচয়পত্রটা? একবার সে উঁকি মেরে দেখল জুতোর ভেতরটা। না, নেই। জুতোটা সে তখন

উপুড় করে ঝাড়ল। কই? নেই তো!

‘মনে হচ্ছে এই জুতোটার মধ্যে নেই।’

আইভানের স্বর অস্ফুট।

‘কী নেই?’ জোয়ানটা জিজ্ঞেস করল।

‘ভুল জুতোটা খোলা হয়েছে।’

‘তার মানে?’ জোয়ানটার চোখে-মুখে হতাশা।

‘তার মানে বাঁ পায়ের জুতোটাও খুলতে হবে।’

‘বাঁ পায়েরটাও?’ আর কোনো কথা না বলে

জোয়ানটা তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল সেখান

থেকে। আইভান আবার মেঝেতে বসে পড়ল।

সে রীতিমতোই ক্লান্ত। আর যেন নড়তে পারছে না।

বাদামি চুলের মেয়েটি এবার চোঁচিয়ে বলল,

‘আপনারা দেখছেন কী? ওকে একটু সাহায্য করুন।’

এবার ভিড় থেকে বেরিয়ে এল একটা

বেঁটেখাটো লোক। এসে আস্তিন গুটিয়ে

আইভানের বাঁ পায়ের জুতোটা ধরল। লোকেরা

আবার ভিড় করে দেখতে লাগল। আর আশ্চর্য,

ছোটখাটো

লোকটি একবার টান দিতেই ফস করে জুতো

খুলে এল আইভানের পা থেকে। ভিড়ের

লোকগুলো অবাক হয়ে গেল, আর ছোট লোকটি

কোনো কথা না বলে সগর্বে বাইরে যাওয়ার

দরজার দিকে চলে গেল।

‘গায়ে কী জোর লোকটির!’ একজন এগিয়ে

এসে আইভানকে বলল, ‘আমি ভাবছি ডান

পায়ের জুতোটা খুলতে এত মারামারি হলো আর

বাঁ পায়ের জুতোর বেলায় এক-দুই-তিন, ব্যস

খুলে এল।’

‘কারণটা হচ্ছে, ডান পায়ের জুতোর নম্বরটা ৩৯

আর বাঁ পায়েরটার নম্বর ৪১।’ বলল আইভান।

‘কেন? কেন?’

‘দোকানে কিনতেই আমার ভুল হয়েছিল।’

আইভান বুটজুতো জোড়া বগলে নিয়ে খালি

পায়ে আগেকার জানালার কাছে গিয়ে সেখানে

মেলে ধরল পরিচয়পত্র, ‘এবার আমার চিঠি

দাও।’

মেয়েটি পরিচয়পত্রটা পরীক্ষা করে দেখল,

তারপর ডাকের চিঠিগুলো

দেখল খোঁজ করে। পরে উদাস হয়েই বলল,

‘না। ত্রুতিলকিনের নামে কোনো চিঠি নেই।’ এফ

কুজনেৎসভ: রুশ লেখক।

অনুবাদ: কুমারেশ ঘোষ

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

398) আসছে লং মার্চ?

গরম যখন চরমে

বিদ্যুৎ যখন মিসডকল, তখন গরমে অবস্থা চরম হবে—এ বিষয় স্বীকার করতে কারও কোনো শরম লাগার কথা না। সুতরাং মরমের যত ব্যথা তা ঝেড়ে ফেলতে কারও কোনো রাখঢাক নেই। তাই হয়তো সরকারের কর্তাব্যক্তির বলেই চলেছেন, এসব জঞ্জাল জোট সরকারের দুর্নীতির ফল, তারা খাম্বা-টাম্বা বানিয়ে দেশের বিদ্যুৎব্যবস্থার চৌদ্দটা বাজিয়ে ছেড়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিপরীতে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর দল ও সহচরেরা এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, বিদ্যুতের এই মিসডকল ব্যবস্থাপনা মহাজোট সরকারের দুষ্টি পরিকল্পনারই অংশ। এ দেশের জনগণকে বিদ্যুতের অভাবে রেখে দুই নম্বরী সব প্রকল্প পাস করিয়ে ঘুষের অঙ্কে জোশ করার জন্যই তারা দিবারাত্রি লোডশেডিংয়ের তমসা ডেকে জনগণের সঙ্গে তামাশা করছে। যারা রাজনীতির সাথে কিংবা পাঁচেও নেই, সেই জনগণ কিন্তু এসব কথার মারপ্যাঁচে ঘুরপাক খেতে বাধ্য। সরল বিশ্বাসে দুই দলের কথাই সত্য মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু গরমকালে এমন মিসডকল বিদ্যুৎ দেখে পাবলিকের মেজাজ গরম হতে বাধ্য। অতীতে কানসাট থেকে শনির আখড়ার দৌড় সালাহ্ উদ্দিন পর্যন্ত ঘটনায় অনুপ্রেরণার ইতিহাস আছে। আর গরমে যখন আম-কাঁঠাল পাকতে শুরু করেছে, তখন রাজনীতির মাঠে উত্তাপে কমতি থাকার কি কোনো জো আছে? সুতরাং এবারের গরম কাজে লাগিয়ে আন্দোলনের ফল পাকাতে চাইছেন বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু আবহাওয়ার গরমের সঙ্গে আন্দোলনের গরম ক্রসম্যাচ হবে তো? এই সন্দেহও তাঁর মনে জাগছে। অকালে পাকা আম গাছ থেকে পড়ে যায়। মুক্তাঙ্গন থেকে মাত্র বাংলামোটরে এসে অকালেই পেকে গেছে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি। এখন ঝরে পড়া আমগুলো নিয়ে খালেদা জিয়া যাবেন লংমার্চে। গরমের বিরুদ্ধে বৃষ্টিকে কাছে না পেলে লংমার্চ কতটা লং হয়, সেটাই দেখার বিষয়। ধাক্কা কখন

খালেদা জিয়া আরও একবার বিরোধীদলীয় নেত্রী ছিলেন। তখন তিনি সেই সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ তখন তাঁর শক্তিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। নিজের হাঁটুতে ভর করতে না পারলে ধাক্কা দেওয়া যে অসম্ভব, সে কথাও তখন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার তাই ধাক্কার ঘোষণা এখনো আসেনি। তবে রাজশাহীর জনসভা থেকে হরতালের দাবি উঠেছে। খালেদা জিয়া হয়তো খুশিই হয়েছেন। কিন্তু ঝড়ের দিনে আমার দেশে মানুষের আম কুড়াতেই বেশি ব্যস্ত থাকার সম্ভাবনা; হরতালের মতো রোদে পুড়ে ছারখার আন্দোলনে পুলিশের ডান্ডার মুখোমুখি কে হবে? এ সন্দেহ সবার মতোই খালেদা জিয়ার মনেও উঁকি দিয়েছে। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, হরতাল দিলে সফল করতে পারবেন তো? তা ছাড়া এইচ বি এম ইকবালের মতো নেতারাও হরতাল সফল করতে শান্তি মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসবেন কি? এ অবস্থায় হরতালের ধাক্কাটায় বল থাকার কথা নয়। বল তত্ত্ব

ধাক্কা দেওয়ার আগেই দল ও বল সংহত করতে চাইছেন বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু তাঁর অরুণ প্রাতের তরুণ দল (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল) বার্ষিকের ভারে ন্যূজ। দলীয় সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক্যজনিত ক্লান্তিকর পরিস্থিতি ইউটিউব, ফেসবুক আর ব্লু-টুথে হাস্যরসের উপাদান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আন্দোলন চাঙা করতে চাই বল। বল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর স্মর্তব্য, ‘বল-দীর্ঘচ্ছদ বাক্য-মুখ চক্ষুর আরক্তভাব-ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী. ইংরাজী, এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্ক্‌ তিপ্পান প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোনো প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে’। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু বল অর্থে যেসব উপাদানের প্রয়োগ উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সবই এখন বিএনপিতে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। সাম্প্রতিক কালের এসব শক্তিমত্তা নিজেদের মধ্যে নর্তন-কুর্দন ছাড়া কিছুই নয়। সিলেটে সাইফুরপন্থী আর ইলিয়াসপন্থীদের মল্লযুদ্ধই বলুন আর ছাত্রদলের

সভাপতির রক্তত্যাগই বলুন, সব ক্ষেত্রেই বলের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ কেবল আত্মঘাতী।

বিপরীত পক্ষের অবশ্য উদ্যমের কোনো অভাব নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে খালেদা জিয়া যদি সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করেন, তবে সরকারপক্ষের অকালে পলায়নের সম্ভাবনা কতটুকু, সেটা বলার আগে ভাবতে হবে, বাংলামোটরের মতো প্রতিপক্ষের কোনো উদ্যম ছাড়াই বিএনপির অকালে পলায়নের কথাটাও চাই ফরমালিন

অকালে পেকে যাওয়া ফলকে কেবল ফরমালিনই বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বিএনপি কি পারবে ফরমালিন দিয়ে হলেও নেতা-কর্মীদের রাজপথে ধরে রাখতে? বহুদিন তো আর পুলিশের জলকামান ব্যবহৃত হচ্ছে না। ছাত্রলীগ-যুবলীগাররাও প্রতিপক্ষকে মাঠে না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে কী সব বিতর্কিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে! আর সেখানেই রয়েছে সাফল্যের সোনার পাথর বাটি। অনেকেই বলছেন, সরকার পতনের আন্দোলন সফল করতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট।

জাতি এখন তাকিয়ে আছে ১৯ তারিখের মহাসমাবেশের দিকে। খালেদা জিয়া নেতা-কর্মীদের জ্বালাময়ী হরতাল দেবেন, নাকি চলমান ‘মোটিভেশন প্রোগ্রাম’-এর অংশ হিসেবে লংমার্চকেই বেছে নেবেন? বিবৃতি আর প্রেস কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে এখন বিএনপি লংমার্চ নিয়ে ভাবছে। কিন্তু মার্চ, এপ্রিল পার করে মে মাসে এসেও লংমার্চ পাবলিকে কতটা খায়, সে ভাবনার কারণ আছে। লংমার্চে গরম বেশি, নাকি এলাচি মার্চে, সে বিতর্ক কেবল রাঁধুনির নয়। রান্নায় যেমন গরম মসলা, আন্দোলনেও চাই তার এক পশলা। তবে সেই মসলার ঝাঁজ সহিতে না পেরে সাদেক হোসেন খোকা বাবুরা মোটরসাইকেলে মাঠ ছেড়ে অকালে পলায়ন করলেও চিন্তা নেই। সোনার ছেলেরা আছে না? কাজী মাহমুদুর রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

399) রসায়ন বিজ্ঞানী

ওয়াখা আর স্যাস দুই বন্ধু একই ডিপার্টমেন্টে পড়ে, রসায়নে। তারা থাকে বুড়িগঙ্গার ধারে। বুড়িগঙ্গার বয়স হয়েছে। একসময় প্রায় পটলই তুলেছিল নদীটা। কিন্তু কিছু লোকের সভা-

সেমিনার অবশেষে জানে বাঁচিয়েছে।

যে হারে পুরান ঢাকাটা ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছিল, কেই বা এ নদীর খোঁজ করত! শ-খানেক বছর আগে ভূমিকম্পটা হওয়ায় পুরান ঢাকা একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো। সরকার পুরো কাতলা মাছের মতো হাঁ-করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। বিদেশি কয়েকটা সংস্থা এসে নিজেদের খরচে উদ্ধারকাজ করে দেয়। এমনকি এখানকার বাসিন্দাদের জন্য ঢাকার উত্তরে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে অনেক দূর আবাসন গড়ে দিয়েছে।

পুরান ঢাকার ইট-সুরকি সরিয়ে সেখানে একসময় গড়ে তোলা হয় আধুনিক এক নগর। আর তখনই সেখানে অনেকের সঙ্গে বাড়ি কেনে ওয়াখা আর স্যাসের পরিবার। লেখাপড়া শেষ করে ওয়াখা জানায়, ক্যারিয়ার গড়তে সে বিদেশ যাবে। কিন্তু স্যাসের এক কথা, যা করার দেশে বসেই করবে।

অনেক দিন স্যাসের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ওয়াখার। সে বিদেশে বেশ কয়েকটা দেশ পালটিয়ে এখন মেক্সিকোয় আছে। সেখানে বড় এক চাকরি বাগিয়েছে। বেতন পায় যা, তা হাতে গোনা কয়েকজনেরই ভাগ্যে জোটে। কিন্তু তার পরও যখন স্যাসের সংবাদ পায়, তার অবাক লাগে। তার চেয়ে কয়েক গুণ পয়সাওয়ালা এখন স্যাস। নিজের একটা মহাকাশ যান পর্যন্ত আছে তার। ছুটিছাটায় আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে চাঁদে যায়। ওয়াখা তাই এবার ছুটি নিয়ে ফেরে দেশে। স্যাসের বাড়িতে গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, ‘বিষয় কী বল তো? এত পয়সা তুই বানালি কীভাবে?’ ছোটবেলার বন্ধুকে সব খুলে বলতে বাধা নেই। স্যাস বলে, ‘দেখছিস তো কেমিক্যাল সাপ্লাই করে এই পয়সা বানিয়েছি।’

‘শুধু কেমিক্যাল সাপ্লাই দিয়ে এত পয়সা হয় কী করে?’

‘আরে হয় হয়, যদি ‘র’ ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় বিনা পয়সায়।’

‘সেটা আবার কীভাবে?’

‘আরে তুই যাওয়ার পর আমি একটা তরল নিয়ে পরীক্ষা চালালাম। তাতে পেয়ে গেলাম হরেক রকম কেমিক্যাল। তারপর কয়েকটা মাথামোটা কেমিস্ট জোগাড় করলাম...।’

স্যাসকে থামিয়ে ওয়াখা জিজ্ঞেস করে,

‘মাথামোটা মানে!’

“আরে মানে তাদের পড়াশোনা ঠিক আছে, কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধি গোলা। তো তাদের দিয়ে বের করলাম কী করে সহজ উপায়ে ওই সব কেমিক্যাল আলাদা করা যায়। নতুন ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলাম সবাই মিলে। তারপর আর কী, ‘র’ ম্যাটেরিয়াল আনি, কেমিক্যাল আলাদা করি আর বিক্রি করি।”

“তা তো বুঝলাম, কিন্তু ‘র’ ম্যাটেরিয়ালটা আসে কোথা থেকে?”

‘বুড়িগঙ্গার পানি।’ সাজ্জাদ কবীর

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

400) কারেন্ট আপা-যাওয়ার বিবর্তন

দাদু বললেন, ‘আমাদের যুগে ইলেকট্রিসিটি যেত কি না, আমার খুব একটা মনে পড়ে না।’

আমি বলি, ‘তার মানে তোমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে। তুমি মনে করতে পারছ না।’

সুমন এসে বলে, ‘তুমি দেখি রূপকথার গল্প বলছ। যেমন গোয়াল ভরা মাছ, পুকুর ভরা...।’

দাদু হেসে বললেন, ‘বুঝেছি, বুঝেছি। আর ভাবতে হবে না।’

দাদু কথা বলতে বলতেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। পুরো পাড়ার লোকজনও আমাদের মতো আনন্দে জেগে উঠল।

মা এসে বললেন, ‘অ্যাঁই, তাড়াতাড়ি ক্লাসের পড়া শেষ করো। আবার কিন্তু কারেন্ট চলে যাবে।’

মা কথাটা বলেই রান্নাঘরে চলে গেলেন। সুমন দাদুকে বলে, ‘সত্যি তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন কারেন্ট যেত না?’

দাদু বলল, ‘যেত। তবে দু-এক মিনিটের জন্য। যেতে যেতেই আবার এসে পড়ত।’

সুমন বলে, ‘তাহলে এখন এমন হয় কেন?’

দাদু বিজ্ঞের মতো বলে, ‘ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা জানিস তো।’ আমি হাত তুলে বললাম, ‘জানি, জানি।’

দাদু বলেন, ‘কারেন্টের যাওয়া ও আসার বিবর্তনবাদ চলছে। ধর, আমাদের যুগে কারেন্ট গেলে দু-এক মিনিট পরেই আবার এসে যেত। আর তাদের বাবা যখন ছোট ছিল তখন কারেন্ট গেলে ১০-১৫ মিনিট পরেই আবার চলে

আসত।’

বাবা আমাদের ঘরে ঢুকলেন। দাদুকে বললেন, ‘বাবা, সুমন-দীপনের কিন্তু সামনে পরীক্ষা।’ দাদু বলেন, ‘আরে একটু বস। তোর ছোটবেলার গল্প শোনাচ্ছি ওদের।’

‘তুমি শোনাও। আমি আতঙ্কে আছি। আবার কখন কারেন্ট চলে যায়। আইপিএসও তো নষ্ট হয়ে গেল।’ এ কথা বলে বাবা ঘরে গেলেন। মা বাবাকে দেখেই বললেন, ‘তুমি ঘুরঘুর করছ কেন। বসে বসে আমাকে বাতাস দাও।’

সুমন বলল, ‘দাদু, দাদি বেঁচে থাকলে তোমাকে বাতাস দিতে পারতেন।’ এ কথা শুনে বাবা পাশের ঘর থেকে বলেন, ‘সুমন, বেশি কথা বলো না। পড়া শেষ করো।’

দাদির প্রসঙ্গ তোলায় দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

তারপর বললেন, ‘বিবর্তনের কথা যা বলছিলাম। তোদের

সময় কারেন্ট দুই ঘণ্টা করে থাকছে না।

একবার গেলে দুই ঘণ্টা পর আবার আসছে।

আমাদের সময় এক মিনিট বা দুই মিনিট করে লোডশেডিং। তোর বাবার সময় ১০-১৫ মিনিট করে লোডশেডিং। আর তোদের সময় দুই ঘণ্টা করে। এই হচ্ছে কারেন্টের বিবর্তনবাদ।’

সুমন খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, ‘আমরা তো বিয়ে করব। আমাদের যখন বাচ্চা হবে তখন?’ পাশের ঘর থেকে মা-বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

সম্ভবত সুমনের কথা শুনে ফেলেছেন।

দাদু বললেন, ‘তোর যখন ছেলে হবে তখন এক দিন কারেন্ট থাকবে, আরেক দিন থাকবে না। ধর, শনিবার কারেন্ট থাকলে রোববার থাকবে না। আবার সোমবার থাকলে মঙ্গলবার থাকবে না। এ রকম...।’

আমি দাদুকে বলি, ‘সুমনের বাচ্চার যখন বাচ্চা হবে তখন?’

দাদু বলেন, ‘তখন কারেন্ট এক বছর থাকলে পরের বছর থাকবে না। এক বছর পর পর কারেন্ট আসবে।’

পাশের ঘরে মা-বাবার হাসির শব্দ। দাদুর কথা শুনে

হাসছেন মনে হয়। কিন্তু আমি ও সুমন কল্পনার চোখে

আগামী দিনের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে
আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

সুমন দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘দাদু,
তাহলে আমি বিয়েই করব না।’

সুমনের কথা শুনে দাদু সুমনকে বুকে জড়িয়ে
নিলেন।

বললেন, ‘ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুমি
চিরকুমার থেকে।’ দন্ত্যস রওশন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

401) মিষ্টি

শনিবার এসএসসির রেজাল্ট পাওয়ার পর
খুশিতে কী করব, বুঝতে পারছিলাম না।

আব্বাকে বাংলা সিনেমার নায়কের মতো এসে
বললাম, ‘আব্বা, আব্বা, আমি এ প্লাস পেয়েছি।’
: কী পেয়েছ?

: এ প্লাস। এ প্লাস পেয়েছি।

আব্বা পকেট থেকে ১০ টাকার দুটি নোট বের
করে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমার
মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আব্বা কৃপণ তা
জানি। তাই বলে এ প্লাস পাওয়ার পুরস্কার মাত্র
২০ টাকা? আমি বললাম, ‘মাত্র ২০ টাকা? এই
টাকা দিয়ে কী হবে?’

: আরেকবার স্কুলে গিয়ে ভালোমতো তোর
রোলটা দেখে আয়। তোর মতো ছাত্র এ প্লাস
পায় কী করে? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে।
২০ টাকা হলো স্কুলে যাওয়া-আসার ভাড়া। যা।

আশ্চর্য! আব্বা কি আমার সঙ্গে রসিকতা
করছেন? তা তো করার কথা না। তিনি
রসিকতা একেবারেই পছন্দ করেন না। টিভিতে
টম অ্যান্ড জেরি দেখে গম্ভীর মুখে বলেন, ‘এটা
কোনো দিন সম্ভব? হুঁদুর কীভাবে একটা
বেড়ালকে লাথি মারে? কী সব দেখায়!’ আমি
আব্বার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ছোট চাচার
ঘর পার হতেই তিনি ডাকলেন, ‘এই আবির,
তোর রেজাল্টের কী খবর?’

: চাচা, আমি এ প্লাস পেয়েছি।

: কী বললি? এ প্লাস পেয়েছিস? এই কথাটাই
ইংরেজিতে বল তো।

: ইংরেজিতে বলতে পারব না।

: এই সামান্য কথাটা ইংরেজিতে বলতে পারবি
না? তুই এ প্লাস পেলি কীভাবে? নাহ, দেশের
শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা এমনিতেই কম
ছিল, তোর এই অবস্থা দেখে সেটা আরও কমে

গেছে। আমি তো জাতির কোনো ভবিষ্যৎই দেখছি না। নো ফিউচার। আচ্ছা, ফিউচার বানান পারিস?

আমি কিছু না বলে চলে এলাম। একটা বাসায় সাধারণত একটা অদ্ভুত মানুষ থাকে। অথচ আমাদের বাসার প্রতিটা মানুষই অদ্ভুত। তা না হলে এ রকম কথা কেউ বলে?

রেজাল্ট দিয়েছে শনিবার। আজ সোমবার।

অথচ আমি যে এ প্লাস পেয়েছি, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথাই নেই। বাসার সবার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এ প্লাস পাওয়া কোনো ঘটনাই না। সবাই পায়। ছেলে এ প্লাস পেয়েছে, কোথায় আরও বাসায় বাসায় মিষ্টি বিতরণ করে বলবে, ‘আপা, আমার ছেলেটা এ প্লাস পেয়েছে, দোয়া করবেন’ তা না, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সামনের বাড়ির বাড়িওয়ালার মেয়ে জিপিএ ৪.০০ পেয়েই প্রায় এক কেজি মিষ্টি দিয়ে গেছে, আর আমি জিপিএ ৫ মানে এ প্লাস পেয়েও ঝিম মেরে বসে আছি। মানসম্মানের ব্যাপার। বাইরে বের হলেই বন্ধুরা খোঁচা দিয়ে বলে, ‘দোস্ত, এ প্লাস পাইলা, মিষ্টি তো খাওয়াইলা না।’ আমি কিছু বলি না। আজকেও আম্মাকে বললাম, ‘আম্মা, বন্ধুরা মিষ্টি খেতে চাইছে।’

: মিষ্টি খাওয়ার কী আছে? পুষ্টিকর কিছু খাওয়া। তোদের এখন বাড়ন্ত শরীর। ভালো খাবার না খেলে হবে? তা ছাড়া এখনকার মিষ্টিতে কী না কী দেয়, ওসব খেলে অনেক সমস্যা হতে পারে। ওদের একদিন বাসায় আসতে বল, আমি সবজি দিয়ে খিচুড়ি রঁধে দিই।’

হায় খোদা! শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যসচেতন মা হিসেবে আম্মার জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত। বন্ধুদের সবজি খিচুড়ির কথা বললে ওরা কী ভাববে কে জানে। নাহ, কিছু একটা করতে হবে। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে বন্ধুরা কেউ কিছু বলার আগেই আমি ওদের সব বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় সবাই বেশ গম্ভীর হয়ে চিন্তা করতে লাগল কী করা যায়। হঠাৎ সৌরভের দিকে তাকিয়ে দেখি ব্যাটা দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

: শালা, হাসছ, না? এমন চড় দেব যে মুখের ঢাকনা বদলে যাবে।

: আরে, রাগ করছিস কেন? শোন,

পাঞ্জাটাস্টিক বুদ্ধি পাইসি।

: পাঞ্জাটাস্টিক মানে কী?

: আরে, পাঞ্জা মানে ফ্যান, মানে ফ্যানটাস্টিক।
সবাই শোন।

আমরা সবাই শুনলাম এবং বুঝলাম সৌরভের
মাথায় গোবর আছে বলে আমাদের মধ্যে যে
ধারণাটা ছিল, তা ঠিক নয়। ওর মাথায়
অল্লবিস্তর বুদ্ধিও আছে। যেনতেন বুদ্ধি না,
দারুণ বুদ্ধি। প্ল্যান অনুযায়ী সৌরভ কাজটা শুরু
করল, আমি বাসার দিকে হাঁটা দিলাম। বাসায়
চুকতেই আম্মা চিন্তিত মুখে বললেন, ‘আবির,
তোর বাবা-চাচা কেউই তো বাসায় নেই। তুই
এই টাকাগুলো দিয়ে মিষ্টি কিনে আন। এ প্লাস
পেয়েছিস, সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে না?’

: মিষ্টি খাওয়ানোর কী আছে? পুষ্টিকর কিছু
খাওয়ানো উচিত। সবজি দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে
হয় না?

ফাজলামো করছিস? যা বলছি তাই কর। আর
শোন, আসার সময় ১০ কেজি মিষ্টি ছাত্রলীগের
অফিসে দিয়ে আসবি। আর ওদের সঙ্গে সালাম
দিয়ে কথা বলবি। ছেলেগুলো খুবই ভালো।
দেশের জন্য একেবারে জান দিয়ে দিচ্ছে।
আহারে!

আমি বন্ধুদের নিয়ে মিষ্টি কিনতে বের হলাম।

একটু হাঁটি আর সবাই একসঙ্গে হেসে উঠি।

সৌরভকে বললাম, ‘দোস্তু, আম্মাকে ফোনে যা
বলেছিস, তা আরেকবার বল না।’

সৌরভ গম্ভীর কণ্ঠে বলা শুরু করল,

‘স্লামালেকুম আন্টি, আমি এই এলাকারই ছেলে।

আপনার ছেলে এ প্লাস পাইল, আমাদের তো

একটু মিষ্টিমুখ করানো উচিত ছিল, তাই না?

আমরাও তো ওর জন্য দোয়া করছি। আমাকে

চিনতে পারছেন না? চিনবেন না, আমি বরকত।

ছাত্রলীগের একজন সাধারণ কর্মী। আমাদের

দিকে একটু দৃষ্টি দিয়েন। নাইলে তো

আমাদেরই দৃষ্টি দিতে হবে। একটা দায়িত্ব আছে

না? আচ্ছা আন্টি, রাখি। স্লামালেকুম।’

আমরা আবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম। সবাই

মিলে মিষ্টি খাব ভাবতেই মজা লাগছে। এই

প্রথম মনে হলো ছাত্রলীগ আসলে অনেক

উপকারী। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

402) আমার প্রতিবেশী

নতুন প্রতিবেশী বেড়াতে এল আমার বাসায়।

‘কী করছেন?’ আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে জিজ্ঞেস করল।

‘প্যান্ট ইস্তিরি করছি।’

‘ওভাবে কেউ প্যান্ট ইস্তিরি করে? এভাবে করুন।’

আমার প্যান্টটা হয়ে গেল চমৎকারভাবে ইস্তিরি করা শর্টসের মতো। ফুটবলাররা যেমন পরে।

কয়েক মিনিট বাদেই আবার এল সে। জিজ্ঞেস করল, ‘কী করছেন?’

‘ফ্রিজ মেরামত করছি।’

‘ওভাবে কেউ ফ্রিজ মেরামত করে? এভাবে করুন।’

আমার ফ্রিজের ভেতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা

গিয়ে দাঁড়াল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ভালিয়া

এল। ওকে নিয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করল

না। তাই বাসাতেই বসে রইলাম আমরা।

‘কী করছেন?’ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল প্রতিবেশী।

‘বান্ধবীকে চুমু খাচ্ছি।’

‘ওভাবে কেউ চুমু খায়?’

জীবনটা অসহনীয় হয়ে উঠল। আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

‘কী করছেন?’ আমি টুলের ওপর দাঁড়াতেই ঘরে ঢুকে সে প্রশ্ন করল।

‘গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছি।’

‘ওভাবে কেউ গলায় দড়ি দেয়? দেখুন, কীভাবে তা করতে হয়।’

বেঁচে থাকা সহজতর হয়ে উঠল। এদুওয়ার্দ

উম্পেনস্কি

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৭, ২০১০

403) ফল খান, ফল পাবেন ফলের

গুরুত্ব অপরিণীম

বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়—এই

প্রবাদটি শুনলেই তো বোঝা যায়, ফল কত

গুরুত্বপূর্ণ। যে গাছে ফল হয় না, সে গাছের

কথা কে মনে রাখে? আসলে, ফলের গাছের

ভাবই আলাদা। পাতাবাহার গাছ থেকে একটা

পাতা ছিঁড়ুন, কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু

অনুমতি না নিয়ে ফলের গাছ থেকে একটা ফল

পেড়েই দেখুন না, আপনার পিঠের সঙ্গে

অবধারিতভাবে গাছের মালিকের হাতের একটা সশব্দ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। সহজ ভাষায় বললে, ফলটাকে আস্ত রাখলেও আপনাকে আস্ত রাখার সম্ভাবনা কম। অতএব আপনি বুদ্ধিমান হলে নিশ্চয়ই ফলের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন। শুধু আমরা নই, বিদেশিরাও জানে, ফল কী জিনিস। এ জন্যই হয়তো টিভিতে দ্য ফলগাই নামে একটা বিদেশি সিরিয়ালও দেখাত একসময়। প্রতিটি পয়েন্টে পয়েন্টে জয়েন্টে জয়েন্টে ফল কথাটা থাকবেই। রসাল ফলের এই মাসে সবাইকে রসাল শুভেচ্ছা। আপনার ব্যবসায় লাভ হচ্ছে? সেটা ফলের ব্যবসা না হলেও সবাই বলবে ‘আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী’। আবার লস হলেও ফল আছে, তবে সফলের জায়গায় হবে বিফল। আপনি সংগীত সাধনা করে বিশ্বে ঝড় তুলবেন? আপনাকে অবশ্যই তাল সম্পর্কে ভালো জানতে হবে। তাল হচ্ছে ভাদ্র মাসের একটা উৎকৃষ্ট ফল। চোখের ভ্রু নাচিয়ে মানুষকে খুব তো বলেন, ‘ব্যাটা, তোর তো বেল নাই, দূরে গিয়া মর।’ এই বেলও কিন্তু একটা অতি সুস্বাদু ফল। বেল মানে ‘ঘণ্টা’র শরবত খেলে অনেক কিছুই একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফলের গুরুত্বটাও ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারছেন। এই ফলের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফল সেমিস্টার নামে আস্ত একটা সেমিস্টারই চালু করে ফেলেছে। তার পরও কিছু আক্ষেপ থেকেই যায়। এই যে কদিন আগে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো, প্রধানমন্ত্রীর ছবি পাশ কাটিয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উল্লাসের ছবি পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপাও হলো, কিন্তু ফল তো দেওয়া হলো না। অভিভাবকেরা বাসায় বাসায় মিষ্টি দিল, কিন্তু ফল দিল না। এর কোনো মানে হয়? তাহলে কেন এই মিছে আশ্বাস? আরে ভাই, না দিলে বলেন, কেন ফল দেবেন? যা-ই হোক, আসছে এইচএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময় যাতে এ ভুল না হয়, সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। আশা করি, এর পর থেকে সরকার এ বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে। আর যদি না করে, তবে এর ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। সাবধান! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৪, ২০১০

404) ভদ্রতার কায়দা-কানুন

সবে বসেছি খাওয়ার টেবিলে, বাবা জিজ্ঞেস করল—

খেতে বসার আগে তোমরা হাত ধুয়েছ তো?

‘হ্যাঁ’, আমরা জানালাম।

‘ঠিক আছে, গুড অ্যাপেটাইট।’ যেই আমি স্যুপের চামচ ধরেছি মুখের সামনে, বাবা আমাকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলল—

‘খবরদার! জেট বিমানের ইঞ্জিনের মতো শব্দ করে চামচ থেকে স্যুপ টানবে না!’

‘কিন্তু স্যুপ তো গরম, বাবা!’ তার কথায় আপত্তি জানানোর চেষ্টা করলাম।

‘গরম হোক বা না হোক, ভদ্রলোকেরা সব সময় নিঃশব্দে খায়।... আর তুমি শোনো,’ আমার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বাবা বলল, ‘চামচ ভর্তি করে স্যুপ নিয়ো না। নিলে ফোঁটা ফোঁটা স্যুপ পড়বে প্লেটে আর টেবিলের চাদরে। এটা অভদ্রতা।’

নিঃশব্দে খাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেলাম আমি। আর ছোট ভাই আধা চামচ করে স্যুপ নিয়ে খেতে থাকল। মনে হলো, এখন আমরা ভদ্রতার যাবতীয় কায়দা-কানুন মেনে চলছি। কিন্তু হঠাৎ বাবা আবার বলল আমাদের উদ্দেশে, ‘সোজা হয়ে বসো! অত কুঁজো হয়ে বসলে তোমাদের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের কুঁজ হোক, তা তোমরা নিশ্চয়ই চাও না।’ কুঁজ হোক, তা চাই না বলে আমরা চেষ্টা করলাম সোজা হয়ে বসে থাকার। কিন্তু অচিরেই লক্ষ করলাম, সোজা হয়ে বসে থাকা অবস্থায় স্যুপভর্তি চামচ মুখের কাছে নিয়ে আসাটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। সেটা লক্ষ করল বাবাও, কিন্তু স্ববিরোধিতা এড়াতে চুপ করে রইল। দ্বিতীয় কোর্স খাবার শুরু করার সময় আবার অসন্তোষ প্রকাশ করল বাবা, ‘শূকরছানার মতো শব্দ করে চিবাচ্ছ কেন?’

ছোট ভাই খিকখিক করে হেসে উঠল, কিন্তু গলার স্বরে পূর্বতন কাঠিন্য বজায় রেখে বাবা বলল, ‘আনন্দ করার কোনো কারণ তো আমি দেখছি না।’

‘তুমি ওদের পেছনে লেগেছ কেন?’ মা নাক গলাল অবশেষে, ‘বাচ্চারা এমনিতেই যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করছে।’

‘ভদ্র আচরণ? এটাকে তুমি ভদ্র আচরণ বলতে

‘ভদ্র আচরণ? এটাকে তুমি ভদ্র আচরণ বলতে

চাও?’ বিদ্রপাত্মক স্বরে কথাটা বলেই কাটলেটের অর্ধেকটা মুখের ভেতরে চালান করে দিল বাবা, ‘ওদের বয়সে আমি...’ ঠিক সেই সময় কাশি শুরু হওয়ায় বাবা তার কথা শেষ করতে পারল না। কাশি ঠেকাতে ন্যাপকিন ধরল মুখের কাছে এবং একটু পরেই সেদ্ধ করা গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে উঠল তার মুখ। চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল টপটপ করে। বাবা বাথরুমের দিকে দৌড় লাগালে আমি আর আমার ছোট ভাই দম ফাটিয়ে হাসতে শুরু করলাম। কিন্তু মা তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরস্ত করল আমাদের।

অবশেষে বাবা ফিরে এসে বসল টেবিলে, বলল, ‘কাশি এমন ভয়ংকরও হতে পারে!’

ছোট ভাই আবার হেসে উঠল থিকথিক করে, কিন্তু বাবার কঠোর দৃষ্টি লক্ষ্য করে নিশ্চুপ হয়ে গেল। টেবিল থেকে প্লেটগুলো সরিয়ে মিষ্টি পিঠার প্লেট এনে রাখল মা।

‘পিঠা খেয়ে মাকে প্লেট ধুতে সাহায্য করবে,’ আঙুল উঁচিয়ে ধরে উপদেশমাখা স্বরে বাবা বলল, ‘ভদ্রলোকেরা তা-ই করে।’

খাওয়া শেষে বাবা উঠে চলে গেল শোবার ঘরে। একটু পরেই সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল নাক ডাকার গুরুগম্ভীর শব্দ।

প্লেট ধোয়ামোছা শেষ করে ছোট ভাই সাবধানে জিজ্ঞেস করল মাকে, ‘মা, বাবা কি ভদ্রলোক?’ মা প্রথমে ভান করল, যেন কথাটা শুনতে পায়নি, কিন্তু পরে মুচকি হেসে বলল, ‘অবশ্যই। তবে ও ভীষণ ক্লান্ত এখন।’ স্তেফান বিংমান: চেক লেখক।

অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৪, ২০১০

405) ফল নিয়ে যত কান্ড

একসময় মধুমিতা আর অভিসার হলে বিখ্যাত সব সিনেমা আসত হঠাৎ হঠাৎ। আমরা তখন ছাত্র, দল বেঁধে ছুটতাম ছবি দেখতে। সেই সব হলে তখন ছবি দেখার মজাই আলাদা। একবার এল ফল অব রোমান এম্পায়ার, সম্ভবত মধুমিতা হলে। আমরা পাড়ার বন্ধুরা ছুটলাম দেখতে। গিয়ে দেখি সব টিকিট চলে গেছে কালোবাজারিদের হাতে। প্রতিটি টিকিট প্রচুর দাম হাঁকছে কালোবাজারিরা! অত দাম দিয়ে

টিকিট কেনার কোনো যুক্তি নেই। কী আর করা, অচিরেই আমরা আবিষ্কার করলাম, এই ভুয়া ছবি দেখে সময় নষ্ট করে লাভ নেই...অনেকটা ‘আঙুর ফল টক’ আরকি। মধুমিতার সামনে থেকে গোটা কতক ফল (পেয়ারা) কিনে চিবাতে চিবাতে বাড়ি ফিরলাম আমরা!

পরবর্তী সময়ে এক দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কর্মশালায় গেলাম। কর্মশালার পরে খাওয়া-দাওয়া, তারপর ছবি দেখাবে। খাওয়া-দাওয়ার সময় দেখলাম ফলের বিরাট আয়োজন।

ইচ্ছেমতো ফল খেলাম আমরা, তারপর ছবি দেখতে গিয়ে দেখি সেই ছাত্রজীবনের না দেখা বিখ্যাত ছবি ফল অব রোমান এম্পায়ার। ছবি দেখে আমরা বেরিয়ে আলোচনা করলাম—এই কর্মশালা আক্ষরিক অর্থেই ‘ফলপ্রসূ’ হয়েছে বলাই বাহুল্য।

আমার এক পরিচিত আছেন, যিনি সারা জীবন পরীক্ষার ফলে শুধু ফেলই করেছেন, সাফল্য আর আসেনি। কিন্তু পরিণত বয়সে ফলের ব্যবসা করে প্রায় কোটিপতি। তাঁর কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম (হয়তো তাঁর ফলের ব্যবসায় নামার সেটাই কোনো সূত্র)। ঘটনাটা ওই ফল নিয়েই, সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়তো। তিনি তখন থাকতেন বুলগেরিয়ায়। একটা মজার টিভি অনুষ্ঠানে তিনি চাঙ্গ পেয়ে গেলেন। বিভিন্ন দেশের মানুষকে নিয়ে অনুষ্ঠান, যাঁরা নানান বৈরী সব প্রতিযোগিতা ফেস করে করে ৫০ জন থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন টিকলেন। এর মধ্যে আমার সেই পরিচিতজনও ছিলেন। আর দুজন ছিলেন বুলগেরীয়, একজন মালয়েশীয় আর একজন চীনা। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক বললেন, ‘এবার আপনারা পাশের রুমে চলে যান, ওখানে পৃথিবীর সব ফলই আছে। ওখানে আপনাদের জন্য পাঁচটা বাক্সও রাখা আছে। আপনারা আপনাদের প্রিয় ফল প্রতিটি পাঁচটি করে বেছে বাক্সে করে নিয়ে আসবেন। এখানে ফল হতে হবে এক আইটেম...সময় মাত্র...।’

প্রতিযোগীরা সব হুড়মুড় করে ছুটলেন পাশের রুমে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঁচজন পাঁচটি বাক্স নিয়ে মঞ্চে চলে এলেন।

‘তাহলে আপনারা প্রত্যেকেই ওই বাক্সে করে

আপনাদের প্রিয় পাঁচটি ফল বেছে এনেছেন?’
উপস্থাপক জানতে চাইলেন
‘হ্যাঁ, আমরা এনেছি।’ সমস্বরে বললেন সবাই।
‘মনে রাখবেন, এটাই কিন্তু শেষ রাউন্ড। এই
রাউন্ড থেকে দুজন বাদ হয়ে যাবেন, আর
ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড নির্বাচিত হবেন...আপনারা
রেডি?’

‘আমরা রেডি।’ সমস্বরে বললেন প্রতিযোগীরা।
‘এবার পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে
আপনাদের...ঘোষণা দেওয়ামাত্র আপনারা
আপনাদের নিজ নিজ বাক্স থেকে ওই ফল বের
করে খেয়ে শেষ করবেন...তবে খেতে হবে
খোসাসহ...আর সময় মাত্র পাঁচ মিনিট...স্টার্ট
ওয়ান ...টু...থ্রি-ই-ই-ই-ই...!’

থ্রি বলামাত্র দুজন প্রতিযোগী মঞ্চের অজ্ঞান হয়ে
পড়ে গেলেন। এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশিও
ছিলেন। অজ্ঞান না হয়ে উপায়ও ছিল না।

কারণ, আমাদের বাংলাদেশি প্রতিযোগী তাঁর
প্রিয় ফল বেছেছিলেন যথারীতি কাঁঠাল! আর
মালয়েশীয় বেছেছিলেন নারকেল!

সবশেষে এবার এসএসসিতে যারা ভালো ফল
করেছে, তাদের অভিনন্দন আর যারা ভালো
করতে পারেনি, তাদের অগ্রিম অভিনন্দন।

কারণ, তারা নিশ্চয়ই আগামী দিনে আরও
ভালো করবে। আর আমাদের ভুললে চলবে না,
থমাস জেফারসনের সেই মহান বাক্যটি, ‘খারাপ
করার পূর্বশর্তই হচ্ছে অতি অবশ্যই আরও
ভালো করা...!’ আহসান হাবীব

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৪, ২০১০

406) ভালোবাসা নিয়ে আরও একটি গল্প

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, স্নেতা,’ বলল
মিশকিন।

‘না!’ স্নেতলানা বলল অনমনীয় স্বরে। ‘কেউ
যখন ভালোবাসে, সে তখন ঠিক যেন উড়তে
থাকে, ভেসে বেড়ায় বাতাসে।’ মিশকিন দুই বাহু
ঝাপটাতে শুরু করল দুই পাশে। ভেসে রইল
ছাদের ঠিক নিচে। ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি,
স্নেতা,’ আবার বলল মিশকিন।

‘এটা সত্যিকারের ভালোবাসা নয়,’ জেদি সুরে
ঠোঁট ফুলিয়ে বলল স্নেতলানা। ‘কেউ যখন
ভালোবাসে, সে তখন ঠিক যেন গলতে থাকে।
বরফের মতো।’ মিশকিন নেমে এল স্নেতলানার

পায়ের কাছে। সংকুচিত হতে শুরু করল তার শরীর। ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, স্বেতা,’ আকারে ক্ষুদ্রতর হতে হতে ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করল সে।

‘এটা কোনো প্রমাণ নয়!’ দুই পায়ে মেঝেতে আঘাত করতে করতে বলল স্বেতলানা। ‘কেউ যখন ভালোবাসে, সে তখন ঠিক যেন জ্বলতে থাকে আগুনে।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিশকিন। শরীরের চারপাশে ধোঁয়া উঠল কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে উঁকি দিতে লাগল আগুনের লকলকে জিভ। ‘এভাবে কেউ জ্বলে!’ স্পষ্ট অতৃপ্তির স্বরে স্বেতলানা বলল। ‘এই আগুনে তো স্যুপও গরম হবে না।’

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, স্বেতা,’ কোনোমতে বলতে পারল মিশকিন। তারপর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের তীব্র দহনে ভস্ম হয়ে গেল তার শরীর। ‘যত সব ঝামেলা এই পুরুষদের নিয়ে!’ ময়লা ফেলার বালতিতে ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বিরক্তির সুরে বলল স্বেতলানা। ভ. কাপিয়ানিদজে

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৪, ২০১০

407) এভারেস্টের চূড়ায় পতাকা

কর্তৃপক্ষকে নজর পরে দিলেও চলবে

ইয়াহু! মুসা ইব্রাহীম প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টে পা রেখেছেন। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে! কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও একটা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন জেগেছে। মুসা ইব্রাহীম এভারেস্টে পা রেখেছেন তা তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু প্রথমে কোন পাটা রেখেছেন? ডান পা, নাকি বাম পা? অনেকে বলবেন, ‘ধুর, এটা কোনো প্রশ্ন হলো? ডান আর বাম কী? একটা পা রাখলেই হয়।’ কিন্তু না। মুসা ইব্রাহীম এভারেস্টে প্রথমে ডান পা রেখেছেন না বাম পা রেখেছেন এটা নিয়ে আমাদের ডানপন্থী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে যেকোনো সময় তুমুল তর্ক লেগে যাতে পারে। একদল বলবে মুসা ডান পা আগে রেখেছেন, অতএব তিনি ডানপন্থী দলের সমর্থক। আরেক দল বলবে, ‘অসম্ভব। মুসাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি, ডান পা আগে দেওয়ার মতো লোকই সে না। সে অবশ্যই বাম পা আগে ফেলেছে। অতএব, মুসা বামপন্থী দলের সমর্থক।’ তবে আমরা সাধারণ মানুষ। জিলাপির

প্যাঁচ ভালো লাগলেও রাজনীতির কঠিন প্যাঁচ আমাদের ভালো লাগে না। আমরা ডানপন্থী-বামপন্থী বুঝি না। মুসা ইব্রাহীম এভারেস্টে পা রেখেছেন, বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছেন, এতেই আমরা মহা খুশি। কী প্রতিভা! এত কিছুর পরও তিনি দেশের পতাকাটা নিতে ভুলেননি। তবে সবাই তাঁর মতো নাও হতে পারে। এভারেস্টে ওঠার মারাত্মক টেনশনে কেউ যদি নিজের দেশের ছোট পতাকাটা নিতে ভুলে যায়, তাহলে কী হবে? হাজার হাজার ফুট পথ অতিক্রম করে এভারেস্টে উঠে দেখা গেল, হয় হয়, দেশের পতাকাই আনা হয়নি! এভারেস্টের ওপরে তো দর্জি নাই যে অর্ডার দিলেই পতাকা বানিয়ে দেবে। তখন আবার নিচে নেমে পতাকা নিয়ে আবার ওপরে উঠতে হবে। কী একটা কষ্টকর ব্যাপার! তাই এভারেস্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখা উচিত। এভারেস্টের চূড়ায় সব দেশের পতাকা রেখে দেওয়া যেতে পারে। তাহলে কেউ পতাকা নিতে ভুলে গেলেও কোনো সমস্যা হবে না। তবে সেটা নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে। অন্য কেউ ভুল করলে করুক, তাতে আমাদের কী? মুসা ইব্রাহীম তো আর ভুল করেননি। সেই জন্য রস+আলোর পক্ষ থেকে বিরতিহীন হাততালি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

408) দুর্ঘটনা - গজেন্দ্রকুমার মিশ্র

সেভন্ আপ দিল্লী এক্সপ্রেস—ডাকনাম যাহার তুফান মেল—তাহারই একখানা থার্ডক্লাস কামরায় আমাদের নাটকের আরম্ভ এবং সেইখানেই যবনিকা।

গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও শেষ মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকলকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ ছিল না, একটি স্যুটকেস মাত্র হাতে করিয়া তিনি উঠিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সহসা তাঁহার নজরে পড়িল ওধারে একটি ভদ্রলোক জানালার ওপর হাত রাখিয়া কনুইটি বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, ও মশাই! শুনছেন, ও দাদা—দয়া করে কনুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি!

কনুই-এর মালিক হাত ভিতরে টানিয়া লইলেন বটে কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রায় সেই অবস্থা। তিনি অতঃপর ধীরে-সুস্থে আমাদের দিকে চাহিয়া কারণটা বিবৃত করিলেন, এখনও পাঁচটি দিন হয়নি মশাই, ওয়ালটেয়ার থেকে আসছিলুম মাদ্রাজ মেলে, এক ভদ্রলোক অমনি কনুই বার ক’রে বসে ছিলেন। দেখতে দেখতে মশাই—হাতখানি তিন টুকরো!

চারদিক হইতে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠিল। যিনি কনুই বাহির করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহারও রীতিমত মুখ শুকাইয়া গেল। ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি মাড়োয়ারী যুবক বলিয়া উঠিল, লেकिन ক্যায়সে কাটা বাবুজী? ভদ্রলোক একটু যেন উষ্মভাবেই কহিলেন, পাথর! পাথর! পাহাড়কা উপরসে পাথর গিরা! ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, বলেন কি মশাই! যাবে না? সে কি যা তা পাথর? অন্তত আট-ন’ মন ওজন হবে!

একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ট্রেনে জার্নি করা প্রাণ হাতে ক’রে।

—যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।... এই ত মাস-খানেকের কথা, দানাপুর স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, আমাদের হরেনবাবু স্টলে গেছেন চা খেতে; ফিরে আসতে আসতেই গাড়িটা দিয়েছে ছেড়ে। সামান্য স্পীড, কিন্তু ভদ্রলোক একটুখানি পা পিছলে যেমন গ’লে পড়ে গেলেন আর অমনি দু’টুকরো।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার যুবক সঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাতরাস থেকে মথুরার ট্রেন ধরে কাজ নেই, বরং বাসে গেলেই হবে।

আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটি আরও যেন তাতিয়া উঠিলেন, বাস? ও আরও ডেঞ্জারাস। আমার এক মাস্টারমশাই আসছিলেন তমলুক থেকে বাসে ক’রে। হঠাৎ মোড় ঘুরেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর গোটাতিনেক ছাগল-ছানা। তাদের বাঁচাবার জন্য ড্রাইভার যেমন পাশ কাটাতে গেছে, একেবারে উঁচু রাস্তার ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে বাসসুদ্ধ চলে গেল নিচের জমিতে। সতেরো জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে তিনজন তখনই মারা গেল, আর দু’জন হাসপাতালে পৌঁছে গেল।

শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই এই বর্ণনায় গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ প'রে প্রথম ভয়ের ব্যাপারটা কাটিতে আমাদের বিরাজবাবু সেই মথুরাযাত্রী বৃদ্ধাটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও বাসে-ফাসে কখনও চড়তে নেই মশাই, ভারি বিপজ্জনক! যদি নিজের মোটর থাকে, কিংবা ট্যাক্সি—

—তাতেই বা কি সুবিধে মশাই? সেদিন কাগজে পড়েন নি, বড়বাজারের এক মহাজনের কি দুর্গতি? নিজে মোটর চালিয়ে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে গেল আর ফিরল না। অনেক খুঁজে দেখা গেল যে, গড়ের হাটের কাছে এক বিরাট বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে প'ড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে মোটরের মালিকও। ... নিজের মোটরের ত ঐ হাল, আর ট্যাক্সির ত কথাই নেই, রোজ অন্তত চারটে করে অ্যাকসিডেন্ট।

বিরাজবাবু নিজে অনেকখানি সরিয়া বসিয়া নবাগত ভদ্রলোককে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

প্রায় সমস্ত গাড়ি জুড়িয়া শুরু হইল বিবিধ, বিচিত্র দুর্ঘটনার আলোচনা। নিজের জীবনে যিনি যত রকম দুর্ঘটনা দেখিয়াছেন, তাহাই মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে বসিলেন। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা শোনা কথাকে অলঙ্কার দিয়া বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং খবরের কাগজের আদ্যশ্রদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আমাদের নবাগত ভদ্রলোক তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর সকলের কথা ডুবাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কোন্ যানবাহনটা নিরাপদ? সাইকেল? শহরে সাইকেল চালানো ত প্রাণ হাতে ক'রে, এই বুঝি চাপা পড়লুম, সর্বদা এই ভয়। ঘোড়ার গাড়ির ত কথাই নেই, ঘোড়া ক্ষেপে উঠলেই চোখে অন্ধকার।

এক অর্বাচীন বালক বলিয়া ফেলিল, আগেকার হেঁটে যাওয়াই ছিল ভাল।

—ওরে বাবা! পদচারীদের ত স্থানই নেই। ট্রাম-বাস-মোটর-ঘোড়া এসব ত আছেই আর যেখানে গাড়ি-ঘোড়া নেই সেখানে সাপ-খোপ আছে। সম্মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাইরে বেরোলেই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভাল।

—কিছু না, কিছু না, দেখলেন ত বিহারের ভূমিকম্পের সময়? যারা বাইরে টাইরে ছিল তারা বরং এক রকম ক’রে বেঁচেছে, যারা ঘরের মধ্য ছিল, তাদের ত আর চিহ্ন রইল না। মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকটি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ভ্যাঙ্ক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, মশাই, তা’হলে কি আর কোন উপায় নেই?

নবাগত ভদ্রলোকটি চিন্তিত মুখে কহিলেন, নাঃ—অ্যাকসিডেন্টের হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। তবে যদি অল্প স্বল্প কিছু হয় কিংবা পরিবারদের কোনও ব্যবস্থা করতে চান তা’হলে উপায় আছে বটে।

চারিদিক হইতে ব্যাগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন আসিতে লাগিল, কি রকম, কি রকম? কি বললেন মশাই? ইত্যাদি।

ভদ্রলোক কহিলেন, আজকাল সব বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানিই অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্সে করছে, সেগুলো মন্দ নয়। যদি হাত-পা ভাঙে কিংবা একেবারে মারা যান তা’হলে মোটা টাকা দেবে, আর যদি অসুখ-বিসুখ করে তা’হলেও মাসোহারা দেবে—ভারি চমৎকার পলিসি। আমার কাছেও আছে একটা প্রসপেকটাস, দেখবেন?

ভয়ের পরিবর্তে অনেকেরই মুখে-চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। একজন ত স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, ও; আপনি এজেন্ট বুঝি? তাইতে অত ভয় দেখাচ্ছিলেন?

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধীরে-সুস্থে স্যুটকেস খুলিয়া কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া কহিলেন, আঙো ভয় ত আর আমি মিথ্যে ক’রে দেখাইনি। কোন্ কথাটা ওর মধ্যে বাজে?... হাত পা ভেঙে যখন বাড়িতে এসে বসবেন, তখন যদি টাকাটা পান সেটা ভাল, না ভিক্ষে করা ভাল? নাকি আপনি টাকাটা পেলে আমায় দেবেন?

তারপর প্রশান্তভাবে মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকের হাতে একখানা প্রসপেকটাস দিয়া কহিলেন, ভাল ক’রে প’ড়ে দেখুন।

যে ভদ্রলোক কনুই টানিয়া লইয়া ছিলেন, তিনি পুনরায় জানালায় হাত বাহির করিয়া বসিলেন।

[সংক্ষেপিত] গজেন্দ্রকুমার মিত্র: বিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চ

কথা সাহিত্যিক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

409) তাঁহার নাম এভারেস্ট মুসা - অনিক খান

মুসা ইব্রাহীমকে আমি বেশ আগে থেকেই এক চোখে দেখতে পারি না। সমপ্রতি তাঁর এভারেস্ট বিজয়ের কারণে দুই চোখেই দেখা ছেড়ে দিয়েছি।

তবে তাঁর হৃদয়ে পর্বতের প্রতি একটা গভীর টান আছে বলেই হয়তো তিনি আমাকে বেশ ভালোই দেখতে পেতেন। বছর পাঁচেক আগের কথা, তিনি আর আমি দুজনই তখন দৈনিক যায়যায়দিন-এ কাজ করি। প্রায়ই অফিস শেষে তিনি তাঁর বাইকে করে আমাকে বাসায় নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতেন। আমি সাধারণত বাইকে চড়তে ভয় পাই, তার ওপর সেটা চালাবে মুসা ভাই। মূলত দ্বিতীয় কারণেই আমি কখনো রাজি হই না।

কাজ শেষ হতে একবার বেশ রাত হয়ে গেল। তেজগাঁও থেকে মিরপুরের সিএনজিচালিত অটোরিকশা পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামা তখন এভারেস্ট না হলেও অল্পপূর্ণা পর্বতশৃঙ্গ বিজয়ের কাছাকাছি একটা বিষয়। কাজেই সেদিন রাজি হয়ে গেলাম। গভীর রাত, অন্ধকার গলিঘুপচি, ভাঙা রাস্তা, সাপের মতো আঁকাবাঁকা, অথচ হাওয়ার বেগে মুসা ভাই বাইক ছোটাচ্ছেন। পাঁচ মিনিট পর চলন্ত অবস্থাতেই পেছনে ঘুরে জানতে চাইলেন ভয় পাচ্ছি কি না। তখন ভয় না পেয়ে থাকলেও ওনাকে পেছনে তাকিয়ে সামনে ছুটতে দেখে আমি কোনোমতে ‘কুঁই’ ধরনের একটা আওয়াজ করলাম। এই ‘কুঁই’-এর অর্থ তিনটি হতে পারত। এক. জি, আমি ভয় পাচ্ছি। দুই, জি না, আতঙ্কিত হচ্ছি না। তিন. ভয় তো পাচ্ছিই, আপনি এখনই সামনে না তাকালে সর্বোচ্চ ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতর অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারি। তবে তিনি সম্ভবত নিজের মতো করে এর চতুর্থ একটি অর্থ করে নিলেন, ‘জলদি চলেন, সময় নাই।’ এতক্ষণ বাইক হাওয়ার বেগে ছুটছিল, কুঁইয়ের পরে সেটা পেল ডাবল হাওয়ার বেগ। সাত রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে এসে এফডিসির দিকে মোড় ঘুরতেই দেখি রেলক্রসিং পড়ি পড়ি করছে। বাইকের গতি আরও বাড়ল। আমি নিশ্চিত

হলাম, পরবর্তী দৃশ্য হবে—বাইক একাই চলে গেছে সার্ক ফোয়ারার কাছাকাছি, রেলক্রসিংয়ের রেলিংয়ে আমরা দুজন লটকে আছি আর ট্রেনের যাত্রীরা বগির ভেতর থেকে গলা বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হাসছে। তবে না, নামতে থাকা রেলক্রসিংয়ের দণ্ডটি মাথার আনুমানিক দুই সুতা ওপরে থাকা অবস্থায় আমরা পার হয়ে গেলাম। আমি বজ্রাহত হয়ে বাইকের পেছনটা আঁকড়ে ধরে বসে আছি। এফডিসি, সোনারগাঁও, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, বিজয় সরণি পার হয়ে রোকেয়া সরণিতে ওঠার পর হঠাৎ মুসা ভাই জানতে চাইলেন, ‘অনিক, এখনো আছেন তো?’ আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উল্টো প্রশ্ন করলাম, ‘মুসা ভাই, এতক্ষণে?’ সেদিন থেকে আমি মুসা ইব্রাহীমকে এক চোখে দেখা ছেড়ে দিই। ইতিমধ্যে এটিএন নিউজে মুসা ইব্রাহীমের মায়ের একটা ইন্টারভিউ দেখলাম। তিনি জানালেন, মুসা নাকি ছোটবেলা থেকেই বেশ ভীতু প্রকৃতির ছিলেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাইকে একাধিকবার চড়ার ‘দুর্ভাগ্য’ হয়েছে, কাজেই আমি খালাম্মার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করলাম এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ওনার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি।

যা-ই হোক, মুসা ইব্রাহীমকে দুই চোখে দেখা ছেড়ে দিই এই তো গত ২৩ মে সকাল আটটার দিকে, যখন তাঁর এভারেস্ট জয়ের কথা কানে এল। সেই দিন আমি ঘটনার পাকচক্রে নেপালের কাঠমান্ডুতে। ব্যাপারটা এমন—

এভারেস্টশৃঙ্গে মুসা ইব্রাহীম, বঙ্গোপসাগরের তীরে দেশের সব সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম; আর বেচারা আমি দুই টান টান উত্তেজনার মাঝামাঝি কাঠমান্ডুর ভয়ংকর উপত্যকায়। সারা দিন কেটে গেল খবর নিশ্চিত করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে (তখন অবশ্য একবার মনে হয়েছে, সঙ্গে মুসাচালিত বাইকটি থাকলে ভালোই হতো)। এর পাশাপাশি আরও বলতে হয়, মুসা ইব্রাহীমের বন্ধু নির্বাচনেও যথেষ্ট গলদ রয়েছে। আমার এই চরম দৌড়ঝাঁপের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিফোন করে জ্বালাতন করেছে যে বন্ধুরা, তাদের অধিকাংশই সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের যন্ত্রণা তাও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু আরেক বন্ধু

লেখক ফখরুল আবেদীনের নিতান্ত অকারণেই অন্তত চার হাজারবার ফোন করে আকুল-ব্যাকুল কণ্ঠে ‘অই মিয়া, লেটেস্ট খবর কী?’ জানতে চাওয়ার অর্থ কী? এই প্রশ্নের জবাব কি রাষ্ট্রযন্ত্র আমাকে দেবে?

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, মুসা ইব্রাহীম এভারেস্ট জয় করেছেন তাতে কী হয়েছে? এর চেয়ে অনেক বড় বড় বিজয় আমরা প্রতিনিয়ত করছি। মুসা ভাই নিজেও করেছেন। এভারেস্টে বিদ্যুৎ যায় না, পানির (বরফ আকারে) অভাব নেই, হরতাল নেই, সিএনজিওয়ালারা দশ টাকা বাড়িয়ে চায় না...নানান সুযোগ-সুবিধা। আবার দেখুন, তিনি এভারেস্ট জয় করলেন মাত্র একবার, অথচ এই যে প্রতি সপ্তাহে, মাসে প্রায় চারবার করে রস+আলো বের হচ্ছে, তার মূল্যায়ন কোথায়? শুধু তা-ই নয়, দেশের নানান পথেসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায়, যেমন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার যে সুউচ্চ স্পিড ব্রেকারগুলো আছে, গাড়ি বা রিকশা চালিয়ে সেগুলোর কোনোটাই পার হওয়া এভারেস্ট জয় করার চেয়ে কম কিছু নয়। জাতির ক্ষয়িষ্ণু বিবেকের কাছে এটা আমার প্রাইভেট প্রশ্ন, আমাদের এই সব চালক ভাইদেরই মূল্যায়নই কোথায়?

কত মানুষ ভুটান, নেপাল, তিব্বত, ব্যাংকক যায়; বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। পুরো ঘুরে বা মাঝপথ থেকে আবার দেশে ফিরে আসে। মুসা সেটা না করে কেন এভারেস্ট জয় করতে গেলেন? এ জন্যই তো এত এত প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে। যে প্রশ্নগুলো আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, সেগুলোই আবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন মুসা। এই অপরাধের জন্য আমি মুসার আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার দাবি করছি। তবে এই বিচারের প্রক্রিয়াটি কোনো উন্নত ও গরম দেশে হলে ভালো হয়। বেচারা দীর্ঘদিন ঠান্ডার মধ্যে ছিলেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

410) হিমালয়ে ওঠা কণ্ড সহজ!

আমাদের সবার প্রিয় মুসা ইব্রাহীম প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে জয় করেছেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট। কত কষ্টই না তিনি করেছেন এই হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে। আহা! অথচ আরও কত সহজভাবেই না পৃথিবীর

সর্বোচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গে ওঠা সম্ভব হতো। সেই সহজ পথগুলো সম্পূর্ণ বিনা মূল্যেই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছেন রাকিব কিশোর☆ কথায় আছে, ‘ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবেন না’। এর মানে কাউকে ধন্যবাদ দিলে সে ছোট হয়। হিমালয়ের সামনে গিয়ে টানা এক বছর প্রতিদিন নিয়ম করে তাকে ধন্যবাদ দিতে থাকুন। যখন সাইজমতো ছোট হবে, তখনই টিলাটক্কর পার হয়ে উঠে পড়ুন।

☆ জাপানিরা যেমন নতুন কারও সঙ্গে দেখা হলে ‘বাউ’ করে, ঠিক তেমনি প্রথমবার হিমালয়ের সামনে গেলেই তাকে ‘বাউ’ করবেন। জবাবে হিমালয়ও যখন ‘বাউ’ করবে, তখন টুক করে তার মাথায় উঠে যাবেন।

☆ হিমালয়ের আশপাশের কোনো পাগলকে কষ্টটষ্ট করে একবার শুধু খেপিয়ে তুলুন। তারপর দেখবেন দুনিয়া বড়ই বিচিত্র! সে নিজ দায়িত্বে লাঠি হাতে আপনাকে ওপরে উঠিয়ে ছাড়বে।

☆ অনেকগুলো গ্যাসবেলুন ফুলিয়ে সেগুলোর রশি ধরে ঝুলে পড়ুন। একদিন না একদিন আপনি এভারেস্টের মাথায় পৌঁছেই যাবেন।

☆ এভারেস্টের নিচে ৪০০-৫০০ টেবিল ফ্যান ছেড়ে দিয়ে সামনে দাঁড়ালেই উড়ে গিয়ে এভারেস্টে পড়বেন। মাথায় অবশ্যই হেলমেট পরে নেবেন।

☆ বিশাল এই হিমালয়ের বরফের সঙ্গে কোনোভাবে যদি দুধ ও চিনি মিশিয়ে একে লোভনীয় আইসক্রিমে পরিণত করা যায়, তাহলে তা আরাম করে খেতে খেতে ধীরেসুস্থে ওপরে উঠে যাওয়া যাবে। এতে একটা লাভও হবে; হিমালয় খেয়ে ফেলার কারণে আপনার পরে আর কেউ হিমালয়ে উঠতে পারবে না। আপনি হবেন সর্বশেষ এভারেস্ট বিজয়ী।

☆ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আতশবাজি ফোটানো হয়। সেগুলোর কোনো একটা থেকে আতশবাজি নিয়ে তার মাথায় বসে পড়ুন, এরপর খালি একটা ম্যাচের কাঠি। আর কিছু লাগবে না।

☆ আপনি পোলভল্ট খেলায় পারদর্শী হলে তো নো চিন্তা। বিশাল এক বাঁশ নিয়ে দিন লাফ, দখিনা হাওয়ায় উত্তুরে বাতাসে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাবেন কাজিফত লক্ষ্যে।

☆ হিমালয়ের শরীরে জুম চাষের ব্যবস্থা চালু

করুন। জমি চাষ করতে করতে একসময়
নিজেই আবিষ্কার করবেন যে আপনি
এভারেস্টের মাথায় বসে এক কাপ গরম ধোঁয়া
ওঠা কফি খাচ্ছেন। শুধু তাই না, পরিবার নিয়ে
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সাপ্তাহিক বন্ধের
দিনগুলোতে বেড়াতেও যেতে পারবেন। মনের
মতো পিকনিক করবেন, তুষার গোল গোল করে
একে-অপরের গায়ে ছুড়ে মারবেন। আহা! কী
আনন্দ!

☆ আশপাশে কোনো উঁচু টিলা থাকলে সেটার
নিচে ‘এভারেস্ট’ লেখা নামফলক বাঁধাই করুন।
এরপর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিয়ে
সেটার উদ্বোধন করুন। জায়গাটা সবাই চিনে
গেলেই সেই টিলার ওপরে উঠে পড়ুন। ব্যস,
জয় হয়ে গেল আপনার এভারেস্ট।

☆ আলোর গতিবেগ নাকি সেকেন্ডে এক লাখ
৮৬ হাজার মাইল! কথাটার সত্যতা প্রমাণ
করার এই সুযোগ। ভালো দেখে একটা
টর্চলাইট কিনে নতুন ব্যাটারি ভরে টর্চলাইটের
সামনে বসে সুইচ টিপে দিন, মুহূর্তেই আলোর
বেগে আপনি এভারেস্টের দিকে ছুটে যাবেন।

☆ বাদশাহি আমলে যুদ্ধের সময় কামান ব্যবহৃত
হতো; খুঁজে খুঁজে তার একটার মুখে বসে
সলতেয় আগুন লাগিয়ে দিতে পারলেই
কেল্লাফতে! আপনাকে খুঁজে বের করতে চাইলে
তাদের হিমালয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি
নেই।

☆ বিপুল পরিমাণ কাঠ কেটে হিমালয়ের
চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিন। তারপর অপেক্ষা
করুন। বরফ গলে গলে এভারেস্ট ছোট হয়ে
যাবে, তখন দুই লাফ দিয়ে টুক করে হিমালয়ের
চূড়ায় উঠে পড়বেন। ☆ কয়টা দিন অপেক্ষা
করুন, যখন পৃথিবীর সব বরফ গলে যাবে
তখন সাঁতার দিয়ে এভারেস্টের মাথায় উঠে
যাওয়া কোনো ঘটনাই না। পানি বেশি ঠান্ডা
মনে হলে সাঁতারের সময় গায়ে একটা লেপ
জড়িয়ে নেবেন।

☆ হিমালয়কে কোনোমতে একবার খালি কাত
করে শুইয়ে ফেলুন। এরপর এভারেস্টের মাথায়
গিয়ে এভারেস্টকে জড়িয়ে ধরুন। তারপর
জাতীয় সংগীত বাজান, জাতীয় সংগীতের প্রতি
সম্মান জানিয়ে হিমালয় ধীরে ধীরে সোজা হয়ে
উঠে দাঁড়াবে, ততক্ষণে আপনার কার্যসিদ্ধি।

☆ হিমালয়কে একটু বোঝান, যে বাবা, তুমি তো অনেক দিন ধরে দাঁড়িয়ে আছ, নিশ্চই পা ব্যথা করছে। এই নাও একটা চেয়ার, বসে একটু বিশ্রাম নাও। হিমালয় আপনার আতিথেয় মুগ্ধ হয়ে বসতে যাবে, এই ফাঁকে আপনি লাফ দিয়ে এভারেস্টে উঠে পড়বেন।☆ বড়সড় একটা গাধা কিনে তার সামনে সতেজ একটা মুলা ঝুলিয়ে দিন; তারপর গাধার পিঠে চড়ে বসুন। মুলার টানে টানে গাধা হেলে-দুলে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে যাবে।

☆ রাজনৈতিক নেতাদের শুধু যদি একবার বোঝানো যায় যে, ক্ষমতার গদিটা ওই হিমালয়ের ওপরে আছে; যে সেখানে পৌঁছাতে পারবে, ক্ষমতা তার। ব্যস, তাহলেই হবে, আর কোনো দেশের লোকজনই চাঙ্গ পাবে না।

☆ টাকা-পয়সা বেশি থাকলে একটা সুপারম্যান ভাড়া করে ফেলতে পারেন। তবে সঙ্গে বেশি মালামাল নেবেন না, সুপারম্যান ৭৫ কেজির ওপরে ভার বহন করতে পারে না।

☆ হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালাকে দাওয়াত করে খাওয়ান। সে একবার ফুঁ দিলেই পাহাড়-পর্বত সব আপনার বাসায় চলে আসবে, তখন আপনি নিজেই চয়েজ করবেন রকি পর্বতে যাবেন, আল্পসে যাবেন নাকি এভারেস্টে রেস্ট নেবেন। ইটস্ ইউর চয়েজ!

☆ আপনার কোনো বন্ধুকে বলুন এনার্জি ড্রিংক খেয়ে আপনাকে ফুটবলের ওপরে বসিয়ে একটা কিক মারতে। হাওয়ায় দুলতে দুলতে আপনি পৌঁছে যাবেন স্বপ্নের এভারেস্টে।**সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

411) 'মেদ ভুঁড়ি কী করি' সেন্টারে না গিয়ে পাহাড়ে উঠুন

দীর্ঘকাল থেকে হিমালয়ের এভারেস্ট নামক চূড়াটা একা একা দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গায়। এত দিন এটা নিয়ে কারও কোনো ভ্রক্ষেপ ছিল না। থাক না বাবা, দাঁড়িয়ে আছে থাক, কাউকে তো বিরক্ত করছে না। কিন্তু এই উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা পছন্দ হলো না মুসা ইব্রাহীমের। পদানত করলেন তিনি এভারেস্টকে। পৃথিবীর এই কঠিন কর্মের পর এবার তিনি করেছেন কঠিনতম কর্মটি। দিচ্ছেন রস+আলোয় সাক্ষাৎকার। নেপাল থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সিমু নাসের

☆ গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে হিমালয়ের নাকি বরফ গলছে। কত ঘনফুট বরফ গলেছে বলে আপনার মনে হয়? আপনি কি বিষয়টা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে এসেছেন? হ্যাঁ। তদন্ত করেছি। আসলে বিষয়টা তদন্ত করতেই তো আমার এভারেস্টে যাওয়া। তবে আমার এই তদন্ত রিপোর্ট বাংলাদেশের আর সব তদন্ত রিপোর্টের মতোই কখনো আলোর মুখ দেখবে না। হা হা হা।

☆ এভারেস্টে কোন সুবিধা থাকলে আপনি সহজেই সেখানে উঠতে পারতেন? এভারেস্টের গোড়ায় যদি একটা লিফট থাকত, তাহলে খুব সুবিধা হতো। বোতাম চাপলেই উঠে পড়তে পারতাম। এ ছাড়া এত পথ হাঁটতে অনেক কষ্ট, পায়ের সঙ্গে গাড়ির চাকার মতো এমনি এমনি চলবে, ব্রেক করা যাবে (মোটরাইজড) এমন চাকার ব্যবস্থা থাকলে খুব ভালো হতো।

☆ এভারেস্টে ওঠার সহজ উপায় কী বলে আপনার মনে হয়? এফিডেভিট করে কোনো বন্ধুর নাম ‘এভারেস্ট’ রেখে তার মাথায় চড়ে বসা ছাড়া তো আর কোনো সহজ রাস্তা দেখি না। এ ছাড়া মানচিত্রের যেখানে এভারেস্ট লেখা, সেখানে দাঁড়িয়েও বলা যায় ‘আমি এভারেস্টে উঠেছি’। আরও একটা উপায় মনে পড়ল, কোথাও গিয়ে ‘এভারেস্ট’ নামক হোটেল থাকলে সেটায় উঠে বন্ধুকে বলতে পারেন ‘আমি এভারেস্টে উঠেছি’।

☆ লিফট না সিঁড়ি? কোনটি আপনার পছন্দ? আমার পছন্দ, লিফটও নেই সিঁড়িও নেই এমন বিল্ডিং। এই সুবিধাসম্পন্ন ১৫ তলা বাড়ির মালিকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। টপ ফ্লোর ভাড়া নেব।

☆ এভারেস্ট অভিযানের এই কষ্টকর পথে আপনার কোন জিনিসটা প্রায়ই মনে হয়েছে? আহা, কেউ যদি এখন মলা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত দিত।

☆ এভারেস্টের আশপাশে তো অনেক পতিত জমি। ওখানে কি হাউজিং ব্যবসার কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

আছে মানে! অলরেডি ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। আমি তো এভারেস্টের গোড়াতেই দেখে এসেছি

একটা বড় সাইনবোর্ড, সেখানে বড় করে লেখা, 'এভারেস্ট ভিউ হাউজিং প্রকল্প'। তার নিচে লেখা, 'এভারেস্ট মানে এভারেস্ট, মাকালু বা অন্তর্পূর্ণ না। এখানে সুলভ মূল্যে এখনই বাড়ি করার উপযোগী প্রতি কাঠা মাত্র ৩০ হাজার টাকা ডাউন পেমেন্টে বুকিং চলছে। বাকি টাকা ৫২টি কিস্তিতে দেওয়ার অপূর্ব সুযোগ। ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা আছে। রিহ্যাব অনুমোদিত।'।

☆ আপনি তো পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়াটায় উঠেছেন। আমি চাইলে কি এরও ওপরে উঠতে পারব? সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। আপনি যদি এভারেস্টে যাওয়ার সময় বগলে করে দুটো থান ইট নিয়ে যান, তারপর চূড়ার ওপর ইট রেখে তার ওপর উঠে দাঁড়ালেই এভারেস্টের চেয়ে বেশি উচ্চতায় উঠতে পারবেন। হা হা হা।

☆ এভারেস্টে তো পুরোটাই বরফ। তাই খুব ঠান্ডাও। তার পরও কোনো রেফ্রিজারেটর কোম্পানি যদি সেখানে গিয়ে অভিযাত্রীদের মধ্যে রেফ্রিজারেটর বিক্রির চেষ্টা করে, তাহলে কেমন চলবে?

খুবই ভালো চলবে। একটু উষ্ণতার আশায় সবাই ফ্রিজের ভেতর ঢুকে বসে থাকার জন্য কিনবে। বাইরের আবহাওয়া থেকে ফ্রিজের ভেতর অনেক গুণ বেশি গরম। রেফ্রিজারেটর কোম্পানিগুলো ব্যবসা করে লালে লাল হয়ে যাবে।

☆ যারা জীবনেও ওখানে যেতে পারবে না, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন এভারেস্ট ও এর আশপাশের জায়গাটা দেখতে কেমন?

জায়গাটা দেখতে ভালোই হওয়ার কথা, কিন্তু চারপাশে এত পাহাড় যে আর কিছু দেখা যায় না। আমিও দেখতে পারিনি।

☆ বেসক্যাম্প বা যাত্রাপথে কি কোনো মজার কিছু ঘটেছে?

আমার গ্রুপটা ছিল একটা আন্তর্জাতিক গ্রুপ। নানান দেশের লোক ছিল সেখানে। বেসক্যাম্পে একদিন এক বিদেশি অভিযাত্রী খেতে বসে খাবার তদারককারীর কাছে চিলি মানে মরিচ চাইলেন। একটু পর তিনি চিলির বদলে নিয়ে এলেন চিনি। সেটা তখন আমাদের বেশ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। এটা ঘটেছিল আসলে হাই অ্যালটিটিউড প্রবলেমের কারণে। এই অবস্থায়

অনেকেই ভুলভাল শোনে। অন্য রকম আচরণ করে।

☆ রস+আলোর পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

যাদের ভুঁড়ি আছে তারা ‘মেদ ভুঁড়ি কী করি’ সেন্টারে না গিয়ে এখনই পাহাড়ে উঠুন।

পাহাড়ে উঠলে ভুঁড়ি কমে। এভারেস্টে অভিযানে যাওয়ার আগে আগে আমার হালকা একটা ভুঁড়ি উঁকি মারছিল; এভারেস্টে ওঠার পর সেটা গ্লেসিয়ারের মতো গলে গেছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

412) এভারেস্ট! এভারেস্ট!! -

আদনান মুকিত

কদিন আগে মুসা ইব্রাহীম প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টে পা রেখে একেবারে হইচই ফেলে দিয়েছেন। তার পর থেকে সবার মুখে এই একই কথা। বাংলাদেশের সব জায়গায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে এভারেস্ট বিজয়। বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে, বাজারে আম-কাঁঠাল-লিচু উঠে গেছে, সেগুলো পাকানোর জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে—এসব খবর কারও মাথাতেই নেই। পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় করে এভারেস্ট-জয়ের খবর।

প্রধানমন্ত্রীর ছবির জায়গায় মুসা ইব্রাহীমের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে ‘জয়’ শব্দটা তো তেমন শোনা যায় না। সব সময় জয়ের আগে একটা ‘পরা’ থাকে। অনেক দিন পর মুসা ইব্রাহীম পুরো জাতিকে একটা ‘পরা’বিহীন জয় উপহার দিলেন। আহা, ভাবলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আর জয় হলে যা হয় আর কি, সবাই একেবারে বিশেষজ্ঞের মতো আচরণ করা শুরু করে। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বিভিন্নভাবে এভারেস্ট জয়ের ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করছেন। কেউ কেউ ভাবছেন, এত কষ্ট করে এভারেস্টে ওঠার কোনো দরকারই ছিল না। বাঙালির ধৈর্য যে কম তা এমনিতেই বোঝা যায়। বাচ্চা ছেলেও জানে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করেছে। এভাবে গলতে গলতে এভারেস্ট একদম ছোট হয়ে এলে তিন লাফ দিয়েই এভারেস্ট জয় করা যেত। কিন্তু আফসোস! ধৈর্য নাই! তাই এখনই তড়তড় করে হিমালয়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ

ভাবছেন, কেন শুধু শুধু এত কষ্ট করে, জীবনের
ঝুঁকি নিয়ে এভারেস্টে পা রাখতে হবে?
হিমালয়ের পাশে একটা উঁচু দালান বানালেই
তো ঝামেলা মিটে যায়। প্রথমে লিফটে করে
সেই দালানের ছাদে উঠতে হবে, ছাদ থেকে
এভারেস্ট পর্যন্ত একটা সেতু, সেটা দিয়ে হেঁটে
গেলেই হেসেখেলে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছানো
যাবে। আহ, কী সহজ সমাধান! অনেকে অবশ্য
এর চেয়েও সহজ সমাধান খুঁজে পান। তাঁদের
মতে, আরে ভাই, এত বড় দালানের চিন্তা
ফালান। এর চেয়েও সহজ কায়দা আছে।
একটা অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার থেকে সরাসরি
এভারেস্টে নামলেই তো হয়। কাহিনি শেষ।
কিন্তু কাহিনি আরও আছে। আমার এক বন্ধু
তো বেশ ভাব নিয়ে বলা শুরু করেছে,
'চাইলে আমিও এভারেস্টে পা রাখতে পারতাম।
তোরা তো জানিস আমার অনেক সাহস। বাঘ-
সিংহ, গরু-ছাগল কাউরে আমি ভয় পাই না।'
'তাহলে বসে আছিস কেন? যা ওঠা শুরু কর।'
'না মানে...আমার হাইট ফোবিয়া আছে তো।'
আরেক বন্ধু তো এভারেস্ট জয়কে কেন্দ্র করে
নতুন ব্যবসার পরিকল্পনাই করে ফেলেছে। সে
বলে, 'দোস্তু, আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে
পড়ি। পাবলিক কেমন তা আমার চেয়ে ভালো
কে জানে? ভাবছি এভারেস্টে ওঠার জন্য একটা
কোচিং সেন্টার খুলব। কয়েক দিন প্রচার
করলেই দেখবি পিঁপড়ার মতো পাবলিক এসে
ভর্তি হবে।' বন্ধুর কথা শুনে তো আমি অবাক,
এই ছেলে বলে কী? এদিকে এভারেস্ট বিজয়ের
খবর শোনার পর থেকেই আমার এক ছোট
ভাই এভারেস্টে ওঠার বায়না ধরেছে। আমরা
সবাই মিলে তাকে বোঝাই, 'দেখ, এভারেস্টে
ওঠা অনেক কঠিন, তুই পারবি না।' সে চোখ
পাকিয়ে উত্তর দেয়, 'পারব না মানে! আমি
মানুষের ভিড় ঠেলে গুলিস্তান থেকে লোকাল
বাসে উঠতে পারি, আর এভারেস্টে উঠতে
পারব না? ওখানে তো ভিড় নাই, তাইলে
কোনটা কঠিন?' এই উত্তর শুনে আমিও একটু
অফ হয়ে যাই। অবশ্য একদিক থেকে চিন্তা
করলে দুটো ব্যাপার একই। আমি এভারেস্টেও
উঠতে পারব না, আবার গুলিস্তান থেকে ভিড়
ঠেলে লোকাল বাসেও উঠতে পারব না। সমানে
সমান। তবে এভারেস্টে উঠে মুসা ইব্রাহীম যে

একটা দারুণ কাজ করেছেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত। অনেকেই নিজ দেশের পতাকা ভুলে গিয়ে বাসার ছাদে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকা লাগাচ্ছে। আর আমাদের মুসা ইব্রাহীম একেবারে এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে লাগিয়েছেন বাংলাদেশের পতাকা। মেসি না কাকা—কে সেরা এই তর্কের সঙ্গে চায়ের দোকানে এখন এভারেস্ট জয় নিয়ে আলোচনা চলে। চায়ের দোকানে যে ছেলেটা কাজ করে, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, খবর শুনেছিস? বাংলাদেশের একজন তো এভারেস্ট জয় করে ফেলেছে।

হ, হুঁচি।

তুই এভারেস্টে উঠলে কী করতি?

ওইখানে তো অনেক ঠান্ডা, আগে দোকান থেইকা দুধ-চিনি বেশি দিয়া এক কাপ চা খাইতাম।

আরে গাধা! এভারেস্টের চূড়ায় চায়ের দোকান পাৰি কোথায়?

কী যে কন, মামা! চায়ের দোকান ছাড়া কোন দ্যাশ আছে নি?

শোন, এভারেস্ট কোনো দেশ না। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ।

কী কন, মামা? এভারেস্ট একটা বড় দ্যাশ।

আমাগো গ্রামের এক লোক ওইখানে থাকত।

রাজধানীর নাম হিমালয়।

ওর কথা শুনে হাসতে হাসতে কাপ থেকে চা ছিটকে পড়ে আমার প্যাণ্টে। পড়লে পড়ুক।

আনন্দের সময় এত কিছু খেয়াল করলে চলে

না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১, ২০১০

413) টেলিভিশন - গিওর্গি দারিন

এক লোকের টেলিভিশন গেল নষ্ট হয়ে। ছবির বদলে দেখা যায় অবিরাম তুষারপাত। আর এমন শব্দ হয় যেন সব ঘোষক-ঘোষিকা, উপস্থাপক-উপস্থাপিকা এবং অভিনেতা-

অভিনেত্রী আজন্ম তোতলা। মেরামতখানায় নিয়ে যাওয়ার পর মেরামতকারী টেলিভিশনটা এদিক থেকে দেখল, ওদিক থেকে দেখল, খুলে গুঁতোগুঁতি করল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বলল, 'টিভির অবস্থা শেষ।...শুনুন,

টেলিভিশনের প্রয়োজনটা কী আপনার, বলুন তো? বেশিক্ষণ টিভি দেখলে মাথাব্যথা করে, চোখ কটকট করে। তার চেয়ে বরং এই টিভি থেকে আপনাকে ক্যাসেট-রেকর্ডার বানিয়ে দিই।

ইচ্ছে করল, অন করে গান শুনলেন। খরচাও বেশি হবে না। টিভি সারাতে যত লাগত, তত দিলেই চলবে। ভেবে দেখুন, অনেক বেশি লাভজনক।'লোকটি ক্যাসেট-রেকর্ডার নিয়ে ফিরল বাসায়। অন করল। কিন্তু কাজ করছে না। মানে, কাজ অবশ্য করছে একভাবে— ভেতরে কী যেন ঘুরছে, গোঁ গোঁ শব্দ করছে, আর্তিচিংকারের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে, কিন্তু গান বাজছে না।

গেল আবার মেরামতখানায়। মেরামতকারী এভাবে শুনল, ওভাবে শুনল, তারপর বলল, 'যন্ত্রের আয়ু শেষ।...শুনুন, ক্যাসেট-রেকর্ডারের প্রয়োজনটা কী আপনার, বলুন তো? সারাক্ষণ ঘুরেফিরে একই গান! শুনতে শুনতে ঠসা হওয়ার অবস্থা। তার চেয়ে বরং এই ক্যাসেট-রেকর্ডার থেকে রেডিও বানিয়ে দিই। ইচ্ছে করল আমেরিকা শুনলেন, বিরক্তি ধরে গেল ফ্রান্স শুনলেন। খরচাও বেশি হবে না। ক্যাসেট-রেকর্ডার সারাতে যত লাগত, তত দিলেই চলবে। ভেবে দেখুন, অনেক বেশি লাভজনক।'লোকটি রেডিও নিয়ে ফিরল বাসায়। অন করল। কিন্তু চীন আর পাপুয়া নিউগিনির গানের সেন্টার বেজে উঠল একসঙ্গে এবং পুরো এক ওয়েভ জুড়ে। আলাদা করে শোনাও অসম্ভব।...মেরামতকারী বলল, 'শুনুন, রেডিওর প্রয়োজনটা কী আপনার, বলুন তো? রেডিও থেকে যে বিকিরণ হয়, তা শরীরের ভেতরে এক ধরনের দহন ঘটায়। তারচেয়ে বরং এই রেডিও থেকে গ্যাস-লাইটার বানিয়ে দিই।

খরচাও বেশি হবে না। ভেবে দেখুন, অনেক বেশি লাভজনক।'লোকটি গ্যাস-লাইটার নিয়ে ফিরল বাসায়। কিন্তু আগুন তাতে জ্বলে না। গ্যাস ভরলেও জ্বলে না, জ্বলে না রকেটের জ্বালানি ভরলেও। তবে আগুনের ফুলকি ওঠে প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ, বহুশাখী। এখন তার পরিবারের সবাই প্রতি সন্ধ্যায় বসে টেলিভিশন রাখার টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপর রাখা হয় গ্যাস-লাইটারটি। পরিবারের কর্তা ওটি জ্বালানোর চেষ্টা করে। পটপট শব্দে বিদ্যুতের মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে ঘরজুড়ে। যেন আতশবাজি। মনোহর দৃশ্য। ঠিক উৎসবে যেমন।...ঘরের কোনো কিছু এখনো পোড়েনি বটে, তবে পরিবারের সবার পরনে থাকে

বিশেষ চশমা আর গ্যাস-মুখোশ। মেরামতকারী
ওসব বানিয়ে দিয়েছে ফ্রিজ আর ওয়াশিং মেশিন
থেকে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩১,
২০১০

414) বিদেশি নিশান উড়ছে ওই বাংলার ঘরে ঘরে...

বাংলাদেশে পতাকা বিক্রির ব্যবসা খুব একটা
সুবিধার কিছু না। ফ্লেক্সিলোডের চাহিদা সব
সময় থাকলেও স্বাধীনতা বা বিজয় দিবস ছাড়া
বছরের অন্য সময়ে পতাকার চাহিদা থাকে না
বললেই চলে। আর ফোন নম্বর বা বাসার
ঠিকানা না জানলে পতাকা বিক্রেতাকেও খুঁজে
পাওয়া কঠিন। বিক্রেতার আর কী দোষ?
বাংলাদেশের পতাকা কেউ একবার কিনলে বেশ
যত্ন করে রেখে দেয়, ফলে নতুন করে আর
কেনাও হয় না, তাই বিক্রিও হয় না। তবে
বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় পতাকা বিক্রেতার
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এবারও তার
ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলার আকাশে আজ
দুর্যোগের ঘনঘটার পাশাপাশি বিদেশি পতাকাও
পতপত করে উড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা
বিক্রেতাদের সমারোহ। তবে এই বিদেশি
পতাকা লাগানো নিয়ে নানা রকম মতভেদ
আছে। কারও মতে, ‘বুঝলাম, তুই অমুক
দেশের বিরাট সাপোর্টার, তুই খেলা দেখ, ভালো
লাগলে তালি, না লাগলে গালি দে, লাথি মেরে
টিভি ভেঙে ফেল; কিন্তু পতাকা লাগাবি কেন?’
এই বক্তব্যের বিপক্ষে অবস্থানকারীদের যুক্তি
হলো, ‘আমি অমুক দেশের সাপোর্ট করি।
আমার বাপের টাকা দিয়ে আমি ওই দেশের
পতাকা লাগাব, একটা কেন দরকার হলে ১০০
পতাকা লাগাব, তাতে কার কী?’ যা-ই হোক,
অটোরিকশাচালক যেভাবে সিগন্যাল কাটিয়ে
যায়, সেভাবে আমরাও বিতর্ক কাটিয়ে অন্য
কথায় আসি। ভেবে দেখুন, এই বিদেশি
পতাকাগুলো কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে
দারুণ ভূমিকা রাখছে। পতাকা বিক্রির মাধ্যমে
কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। বাচ্চাদের জামা আর
হাফপ্যান্ট বানানোর পাশাপাশি দর্জিরা তৈরি
করছেন বিভিন্ন দেশের পতাকা। বৃদ্ধি পাচ্ছে
ভৌগোলিক জ্ঞান। পতাকা লাগানোর জন্য
ব্যবহৃত হচ্ছে বাঁশ ও পাটের রশি, যা আমাদের

মৃতপ্রায় পাট ও বাঁশশিল্পকে আবার জাগিয়ে তুলছে। কী চমৎকার ব্যাপার! তবে সমস্যা একটাই। কদিন আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় কাউকে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে অনেকে উত্তর দেয়, ‘আরে, বলে কী! বাংলাদেশের পতাকা তো আমাদের বুকে।’ এ কথা সত্যি হলে তো খুবই ভালো। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। আমরা এ কথাই বিশ্বাস করতে চাই। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

415) ঈশপের অপ্রচলিত গল্প - একটি উইল

Aesop (বা Aisopos) পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিস্টাব্দে তাঁর গল্পের জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, তিনি মিসরের ফারাও আমাসিসের সময়কার লোক। সামস দ্বীপে বাস। ওখানেই ইয়াডমন নামে এক নাগরিকের ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। তবে অনেকের মতে, ঈশপ ছিলেন ওই ইয়াডমনের আত্মীয়। জন্মসূত্রে ঈশপ ছিলেন থ্রেসিয়ান বা ফ্রাইজিয়ান। শোনা যায়, ডেলফিয়ার এক মন্দির থেকে একটি বাটি চুরির অপরাধে ডেলফিয়ারাসী তাঁকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে হত্যা করে। এরিস্টোফেনেসের মতে, মন্দিরের বাটিটি ঈশপের ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চোর অপবাদে তাঁকে হত্যা করা হয়। ঈশপ দেখতে ছিলেন কদাকার কিন্তু বুদ্ধিতে ছিলেন অপরাজেয়, রঙ্গরসে অদ্বিতীয়। তিনি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আর তোতলামি করে শোনাতে তাঁর শিক্ষাপ্রদ অমর কাহিনিগুলো। একদঙ্গল লোকের চেয়ে একটি লোকের দাম অনেক। সেই কথাটা জানানোর জন্যই এই গল্প—

এক ভদ্রলোক তাঁর তিন মেয়ে রেখে মারা গেলেন। তাদের মধ্যে এক মেয়ে বেপরোয়া, তবে সুন্দরী। সে কটাক্ষপাতে অনেক পুরুষকেই ঘায়েল করে থাকে। দ্বিতীয় মেয়েটি খুব হিসাবি, চরকায় উল বুনতে জানে। তৃতীয়টি একটি মদের পিপে, আর দেখতেও ভালো নয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে উইলের অছি বা ট্রাস্টি নিযুক্ত করে গেছেন। তাতে নির্দেশ দেওয়া আছে, তাঁর সম্পত্তি এমন সমানভাবে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে তারা তাদের ভাগের সম্পত্তি নষ্ট না করতে

পারে। আর একটি শর্ত, যদি মেয়েরা সম্পত্তি না রাখতে চায়, তবে তারা প্রত্যেকে তাদের মাকে হাজার টাকা করে দেবে।

এই উইলের খবরটা সারা এথেন্সে ছড়িয়ে পড়ল। মা তো মুশকিলে পড়লেন।

আইনজীবীদের বাড়িতে ঘুরতে লাগলেন তাঁর স্বামীর উইলের বিষয়ে বোঝার জন্য। কিন্তু কেউ কোনো হদিস দিতে পারলেন না। সত্যিই তো, মেয়েরা যদি সম্পত্তি না চায় বা সেই সম্পত্তি ভোগ না করতে পারে, সে ক্ষেত্রে এমন কোনো নগদ টাকার ব্যবস্থা নেই, যা দিয়ে তারা মায়ের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারবে।

অনেক দিন অনেক রকম চিন্তাভাবনা করেও যখন ওই উইলের মর্মার্থ বোঝা গেল না, তখন মা ঠিক করলেন, তাঁর ইচ্ছামতোই তিনি এই সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

তিনি সম্পত্তির হিসাব করতে বসলেন।

মা তাঁর বেপরোয়া সুন্দরী মেয়েটাকে দিলেন ভালো ভালো পোশাক, দামি অলংকার আর সেই সঙ্গে কাজের জন্য খোজা আর বালক ভৃত্যদের। তাঁর খাটিয়ে আর হিসাবি মেয়েকে দিলেন জমিজমা, গরু-ভেড়া, খামার বাড়িটা, লাঙল-বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, চাষি ইত্যাদি।

আর মাতাল, দেখতে ভালো নয় মেয়েকে দিলেন মদের ভাঁড়ার, পিপেভর্তি আঙুরের মদ, একখানা বড় বাড়ি বাগানসমেত।

মা যখন পাড়াপড়শি ও আত্মীয়স্বজনের মতামত নিয়ে এভাবে মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, সে সময় সেই লোকজনের মধ্যে দেখা গেল ঈশপকে।

ঈশপ সব শুনে বললেন, ‘এ তোমরা কী করছ? ভদ্রলোকের উইলের মর্ম তোমরা কেউ বুঝতে পারনি। হয়তো ভদ্রলোক এই কাণ্ড দেখে তাঁর কবরের মধ্যে নড়েচড়ে দুঃখ প্রকাশ করছেন।’ ‘তাহলে কী করা হবে?’ সবারই প্রশ্ন। সবাই অবাক।

‘এ তো অতি সোজা কাজ।’ ঈশপ বললেন, ‘বাগানসমেত ওই বড় বাড়িখানা, মদের ভাঁড়ার ওই হিসাবি খাটিয়ে মেয়েটিকে দেওয়া হোক। সাজ-পোশাক, হীরা-মুক্তা-অলংকার, দাসদাসী সব দেওয়া হোক দেখতে ভালো না মাতাল মেয়েটিকে। আর জমিজমা, পশুর পাল, লাঙল ইত্যাদি দেওয়া হোক ওই সুন্দরী বেপরোয়া

মেয়েটিকে। তাহলে এতে তিন মেয়ে তাদের স্বভাব অনুযায়ী ওই রকম সম্পত্তি পাওয়া পছন্দ করবে না। দেখতে ভালো নয় মাতাল মেয়েটি সাজপোশাক সব বিক্রি করে দেবে মদ কেনার জন্য। সুন্দরী মেয়েটি জমিজমা বিক্রি করবে সাজপোশাকের জন্য। আর হিসাবি খাটিয়ে মেয়েটি বড় বাড়ি, বাগান সব বিক্রি করে চাষবাসের জমি কিনবে।

অতএব, যে মেয়ে যা পেয়েছিল কিছুই রাখবে না। যার যার জিনিস বিক্রি করে নগদ টাকা জোগাড় করবে, আর তা থেকে তাদের মাকে তাঁর প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবে। সারমর্ম: বুদ্ধিমানই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ভাষান্তর: কুশ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

416) বাজেট আসে, বাজেট যায় - শওকত হোসেন

ছোট ছেলেটা বিধাতার কাছে রোজ প্রার্থনা করে, ‘বিধাতা, আমাকে মাত্র ৫০০টা টাকা দাও। আমার আর কিছু চাই না।’ কিন্তু টাকা আর আসে না। তারপর বুদ্ধি করে একদিন সে বিধাতাকে একটা চিঠি লিখল। সেই চিঠি ডাকঘরে পড়ে রইল কিছুদিন। তারপর একদিন সহৃদয় কোনো একজন পড়ে থাকা চিঠিটা খুলে পড়লেন এবং পাঠিয়ে দিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ে। অতি আশ্চর্য ঘটনা হলো, চিঠিটা শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীর হাতেই পড়ল। তিনিও মজা করে ২০০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর একটা স্বাক্ষর। ২০০ টাকা পেয়ে খুশি হলো ছেলেটি। হাত তুলে মোনাজাত ধরে অভিযোগ করল, ‘বিধাতা, টাকাটা অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন পাঠালে, তিনি তো ৩০০ টাকা টাক্স কেটে রেখেছেন।’

সেই অর্থমন্ত্রী টাকা নিয়ে আসছেন। আর মাত্র দুই দিন পরেই বাজেট। তাও আবার ডিজিটাল বাজেট। এবার অর্থমন্ত্রী এক লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে আসছেন। অবশ্য যাঁরা পত্রপত্রিকা পড়েন, একটু খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা মনে করতে পারেন, এটা কোনো টাকা হলো? একা বিল গেটসের সম্পদই তো আছে ৫৩ বিলিয়ন ডলার। এর মানে হলো তিন লাখ ৬৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ পুরো বাংলাদেশের এক বছরের সব খরচ মিটিয়েও হাতে থাকে দ্বিগুণের বেশি টাকা।

থাক, আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে লাভ নেই। বরং নিজের দেশের মানুষের কথাই বলি। দেশের ১৬ কোটি মানুষকে তিনি বাজেট বরাদ্দের এই টাকা ভাগ করে দেবেন। আর অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হয় বলেই হয়তো সেই ছোট ছেলেটির মতো পুরো টাকা কেউ পাবেন না। সেই যে একটা ছড়া আছে—
বাজেট বাজেট মরার বাজেট

বাজেট আলুর দম

বড়র পাতে পড়ল বেশি

ছোটর পাতে কম।

এই ছড়া মেনে অর্থমন্ত্রী একটা কাজ করতে পারেন। কে বেশি পেল আর কে কম পেল সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। বাজেট যদি হয় এক লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকার, আর দেশের লোকসংখ্যা যদি হয় ১৬ কোটি, তাহলে একেকজনের ভাগে পড়ে আট হাজার ২৫০ টাকা। তবে পুরো বাজেট তো আর খালি উন্নয়নের জন্য না, এর বড় অংশই হচ্ছে অনুন্নয়ন বাজেট। উন্নয়ন বাজেটের অংশ মাত্র ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এই হিসাবে একজন মানুষের পাওয়ার কথা দুই হাজার ৪০৬ টাকা।

প্রতিবছরই এখন দেখা যায়, ধনী আরও ধনী হচ্ছে, আর গরিব আরও গরিব। কারণ, বাজেটে যে অর্থ খরচ হয়, তাতে আসলেই গরিবের পাতে পড়ে কম। এ থেকে বাঁচতে হলে এভাবে মাথা গুনে গুনে অর্থ দিলে হয়তো গরিব মানুষ বাজেট থেকে কিছু পেতে পারত। কিন্তু নানা কারণে অর্থমন্ত্রী এ ধরনের মহামূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। আর এর কারণ হিসেবে অন্য এক দেশের গল্প এখানে চালিয়ে দেওয়া যায়। গল্পটা আফ্রিকার কোনো একটি দেশের হতে পারে। আবার আমাদের আশপাশের কোনো দেশও হতে পারে। এটা আসলে যেকোনো দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের গল্প বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। একবার কোনো এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেখা হয়ে গেল দুই দেশের দুই অর্থমন্ত্রীর। এক মন্ত্রী একটা ব্রিজের ছবি দেখিয়ে বললেন, এটার বাজেট ছিল ২০ কোটি টাকা। কিন্তু এটা ১২ কোটি টাকায় বানিয়ে আট কোটি টাকা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছি। এরপর আমাদের আশপাশের কোনো এক

দেশের সেই মন্ত্রী একটি নদীর ছবি দেখিয়ে বললেন, এই ব্রিজটি বানাতে খরচ হয়েছে ২০ কোটি টাকা। অন্য মন্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, কোথায় ব্রিজ, কিছুই তো দেখছি না। এবার আমাদের মন্ত্রী মুচকি হেসে বললেন, ব্রিজ থেকে পুরো আয়ই আমার পকেটে।

গল্পটা হয়তো কাল্পনিক এবং বহু ব্যবহৃত। কিন্তু কেউ যদি সত্যের কাছাকাছি ধরে নেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। এ তো গেল অর্থমন্ত্রীর গল্প। বাজেটের টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার পরামর্শে আঁতকে উঠবেন ধনীরাও।

গল্পটা বলি। বাজেটে একবার রুগ্ম শিল্প পুনর্বাসনে বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ দিলেন অর্থমন্ত্রী। এর কিছুদিন পর ব্যাংককের সমুদ্রসৈকতে দেখা হয়ে গেল দুই ব্যবসায়ী বন্ধুর। এক বন্ধু জানতে চাইলেন, ‘কিরে কীভাবে হলো? কেমনে পারলি?’ আরেক বন্ধু তখন বলল, ‘আসলে মিলটা চালাতে পারছিলাম না, তারপর একদিন আগুন লেগে পুড়ে গেল। বিমা করা ছিল, আবার রুগ্ম শিল্প পুনর্বাসন বরাদ্দ থেকেও কিছু পেলাম। তখন ভাবলাম, যাই, কিছুদিন ঘুরে আসি।’ এবার এই বন্ধু জানতে চাইল, ‘তোর কী অবস্থা?’। বন্ধুটা বলল, ‘খুব বন্যা হলো, আমার পুরো মিলই পানিতে ডুবে গেছিল।’ এবার এই বন্ধু চুপিচুপি জানতে চাইল, ‘বন্ধু, বন্যা লাগাও কেমনে?’

বাজেট আসে আর বাজেট যায়। প্রতিবারই মনে হয় এবার ভালো কিছু হবেই হবে। যাঁরা আশাবাদী, তাঁরা আশায় থাকেন। আর বাকিদের বলি, ‘গরিবদের আর যতই কষ্ট থাক না কেন, একটা বড় সুবিধা আছে। গরিব থাকার জন্য কোনো খরচা লাগে না।’ স্কটল্যান্ডের এই প্রবাদটা মানলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। বাজেট এল কি গেল, কী যায় আসে! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

417) আজেন্টিনা-ব্রাজিল দম্পতি - আসিফ মেহদী

সেকালের যেমন রোমিও-জুলিয়েট, একালে তেমনি আমাদের পাড়ার রোমান-জুলি। যথাসময়ে জুলিদের বাসায় রোমানের বাবা-মা গেলেন। কিন্তু মুরব্বিদের আলোচনা লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলতে থাকল। উর্ধ্বমুখী-নিম্নমুখী-নানামুখী আলোচনার একপর্যায়ে এল

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রসঙ্গ। রোমানের বাবা
ব্রাজিলের সাপোর্টার আর জুলির বাবা
আর্জেন্টিনা। ব্যস্, আর ঠেকায় কে? কোলাকুলি
দিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা বলতে গেলে
একদম গোলাগুলির পর্যায়ে শেষ হলো। বেচারি
রোমান আর জুলির তো একেবারে মাথায় হাত!
বাসায় ফিরেই রোমানের বাবার ঘোষণা,
'প্রয়োজন হলে ছেলের বিয়ে আমি ব্রাজিলের
কোনো মেয়ের সাথে দেব, কিন্তু ওই বাড়িতে
না। বিশ্বকাপের মাঠে পর্যন্ত হাত দিয়ে গোল
দেয়, আবার বড় গলায় কথা বলে! দেখে নিয়ো,
এমন বউমা আনব যে হেসে-খেলে সাম্রাজ্য নাচ
নেচে আমাদের বাসাটাকে মাতিয়ে রাখবে।'
অন্যদিকে জুলির বাবাও কম যান না। 'ছেলের
নাম শুনে আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম।
রোনালদো, রোনালদিনহোর নামের সঙ্গে মিল
রেখে ছেলের নামও রেখেছে রো দিয়ে! কোথায়
মহারাজ ম্যারাডোনা আর কোথায় রোনালদো!
আমিও দেখে নেব, মেয়ের বিয়ে দেব ম দিয়ে
শুরু এমন নামের কোনো ছেলের সঙ্গে। মতের
মিল না হলে সংসার কখনো সুখের হয় না—
স্বয়ং ম্যারাডোনা পর্যন্ত এই কথা স্বীকার করতে
বাধ্য।'

বেকায়দায় পড়ল আমাদের রোমান আর জুলি,
একেবারে লেজেগোবরে অবস্থা। কী করবে বুঝে
উঠতে পারছে না। ঠিক এমন সময় জুলির
মাথায় একটা আইডিয়া এল! একদম
ফেসপাউডারের মতো সরল আইডিয়া।
পরদিন রোমান আর্জেন্টিনার জার্সি পরে গেল
জুলিদের বাসায়। ছেলের এই দশা দেখে জুলির
বাবা তো মহা খুশি! শুরু হলো নানা বিষয়ে
তুমুল আলোচনা; এই যেমন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়
ম্যারাডোনা, ফুটবল এবং ফ্যাসিজম, খেলাধুলায়
ডোপিং-বিষয়ক জটিলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।
'আসলে বুঝলে, জুলির মা, সংসার তো করবে
ছেলে আর মেয়ে। তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই
হলো আর্জেন্ট ব্যাপার।' মনে হয় 'আর্জেন্টিনার'
সাপোর্টার বলেই জুলির বাবা প্রায়ই 'আর্জেন্ট'
শব্দটা ব্যবহার করেন।

রোমান বাসায় ফিরলে ছেলের গায়ে
আর্জেন্টিনার জার্সি দেখে রোমানের বাবা তো
রেগেই কয়লা, 'তোর গায়ে হঠাৎ জেরা ক্রসিং
ক্যান...।' পেছনে তাকিয়ে তার তো চম্ফু

চড়কগাছ, সঙ্গে জুলিও রয়েছে। কিন্তু এ কী! জুলি মা-মণির হাতে যে ব্রাজিলের পতাকা। ‘ছেলেটা গোপ্লায় গেলেও মা আমার বুদ্ধিমতী; ঠিক দলটাই বেছে নিয়েছে।’ শুরু হয়ে যায় ব্রাজিল-বন্দনা। রোমানের বাবার প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে মাথা ঝাঁকাতে থাকে জুলি। নাশতা খেয়ে মুখ মোছার জন্য ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে জুলি যে রুমাল বের করল তাতেও ব্রাজিলের পতাকা! বিয়ে আর ঠেকায় কে!

রোমান-জুলি এখন সুখেই আছে। পাড়ার সবাই এ দম্পতিকে ‘এ-বি ফ্যামিলি’ বলে। ‘এ’ ফর আর্জেন্টিনা আর ‘বি’ ফর ব্রাজিল। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

418) প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন - আবু সুফিয়ান

ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে সবচেয়ে অপরিহার্য মানুষ কে?

নিঃসন্দেহে এর উত্তর হচ্ছে ‘বুয়া’ বা কাজের মানুষ। বেশ কিছুদিন আগ থেকেই দেশে বুয়া-সংকট চলছে। ছুঁড়ি-বুড়ি সবাই তৈরি

পোশাকশিল্পে কাজ করতে চান। ‘বুয়া’ পেশায় সম্মান কম। পোশাকশিল্পে কাজ করলে

অবিবাহিত মেয়েরা সহজে স্বামী জোগাড় করতে পারেন। এটা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ইদানীং

এই সংকট আরও প্রকট হয়েছে ‘খাদামা’

ভিসার কারণে। খাদামা ভিসায় বাংলাদেশের

মেয়েদের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চাকরি

দেওয়া হচ্ছে। পোশাকশিল্পের চাকরির চেয়ে

এখন লোভনীয় হচ্ছে খাদামা ভিসায় বিদেশে

যাওয়া। যদিও এই শ্রেণীর নারীদের অনেকেই

জানেন না, খাদামা ভিসা মানেই হচ্ছে গৃহকর্মী

বা বুয়ার চাকরির ভিসা। সেখানকার পরিস্থিতি

আরও ভয়াবহ। অন্য কোনো লেখায় সেটি

জানাব।

যা-ই হোক, নগরজীবনে বুয়া বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

সকালের নাশতা থেকে রাতের খাবার পর্যন্ত

তাঁরা আমাদের জীবনে অনেক সুবিধা করে

দেন। কিন্তু ইদানীং বুয়ারা সুবিধার বদলে

অসুবিধা করছেন বেশি। একটা ছোট উদাহরণ

দিই।

আমাদের বুয়ার সকাল আটটায় আসার কথা।

এসে নাশতা তৈরি করবেন। ঘর পরিষ্কার,

কাপড় ধোয়াসহ তাঁর কাজ তিন ঘণ্টা। কিন্তু নিয়ম করেই তিনি এখন আধ থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি করে আসছেন।

দেরির কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারে জিজ্ঞাসা করেন! আমার কোনো দোষ নাই।’

আমার স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে নিত্য কলহ শুরু হয়।

বুয়ার বিলম্ব অনেকগুলো কাজের শিডিউল ভেঙে দেয়। ঠিক সময়ে নাশতা খাওয়া যায় না। বেরিয়ে পড়ি। অন্য সব কাজের শিডিউলও পিছিয়ে যায়। তার ওপর সকালে একটা হাউকাউ বাধে। কলহ-বিবাদ ভালো লাগে না। অন্য অনেকেই বুয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশনে যান। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন। আমরা সেটা করতে পারি না। কারণ, কিতাবে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, কাজের মানুষের ত্রুটিগুলো প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা করার পরই কাজের মানুষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

যাঁরা কাজের মানুষকে শাস্তি দেন ও নির্যাতন করেন, তাঁদের জন্য বড় দুঃসংবাদ আছে। আমাদের বুয়ার সমস্যাটা কী, সেটা জানতে আমি খুবই আগ্রহী। তাঁকে পুরো বিষয়টি বোঝালাম। সমস্যার কথা বললাম। তাঁর জন্য পুরো সিস্টেমে কী ব্যাঘাত ঘটছে, জানালাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, এবার সত্যি করে বলেন, এত দেরি করে আসেন কেন?

বুয়া একই উত্তর দিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারে জিজ্ঞাসা করেন! আমার দোষ নাই।’ আমাদের বুয়া শেখ হাসিনার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৪০ টাকা কেজির চাল ২০ টাকায় নেমে এসেছিল। তখন থেকে শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও অন্ধ হয়েছে। এ রকম একজন অন্ধ হাসিনাপ্রেমী কী কারণে অনায়াসে তাঁর বিলম্ব আসার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করছেন? তাঁর সব কাজ ও ক্ষতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করছেন?

আমি বললাম, ‘প্রধানমন্ত্রীকে পরে জিজ্ঞেস করা যাবে। যেহেতু আপনি দেরি করে আসছেন, আপনার কারণটা দয়া করে বলেন।’

বুয়া বললেন, ‘রাতে ঘুমাতে পারি না।’

‘রাতে ঘুমাতে পারেন না, ডাক্তার দেখান। ওষুধ খান।’

‘এই চিকিৎসা ডাক্তার-কবিরাজের না। তাঁরা কিছু করতে পারবেন না।’

‘যে করতে পারবেন, তাহলে তাঁর কাছে যান।’

‘সে জন্যেই তো বললাম, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারে জিজ্ঞাসা করেন। দোষ আমার না!’

আমি খুবই কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, ‘রাতে আপনার ঘুম আসে না কেন, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ?’

‘না।’

‘ছেলে দুষ্ট, চুরি-ছিনতাই এসব কাজ করে?’

‘না!’

‘অন্য কোনো দুশ্চিন্তা আছে?’

‘না!’

‘তাহলে রাতে ঘুম আসে না কেন?’

‘ঘুম আসব ক্যামনে? দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কারেন্ট যায়। সারা রাইত কারেন্ট থাকে না।

সারা রাইত বড় লোকেরা জেনারেটর চালায়।

জেনারেটরের আওয়াজ মানে কি আওয়াজ।

মনে হয় যেন সারা রাইত কানের কাছে

কেয়ামত নাইমা আসছে। কারেন্ট আসে

ভোররাত্রে। তখন জেনারেটর বন্ধ হয়। তখন

ইটটু ঘুমাই। উঠতে উঠতে দেরি হয়। যায়।

কাজে আসতেও দেরি হয়। সরকার আমগো

কারেন্ট দেয় না, এই দোষ তাইলে কার?

সরকারের কি না বলেন?’

দেশে তীব্র বিদ্যুৎ-সংকট চলছে। এই সংকটের

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বহুমুখী, সূক্ষ্ম ও ভয়াবহ। খুবই

তুচ্ছ একটি ঘটনা এটি। যেখানে মিত্র আর মিত্র থাকছে না।

লোডশেডিংয়ের কারণে অনেক গৃহেই সকালটা

এভাবে শুরু হয়। নিম্ন থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত

প্রায় সব মানুষ এর শিকার হন। এতে বিশৃঙ্খলা

তৈরি হচ্ছে। কলহ-বিবাদ হচ্ছে। শান্তি বিঘ্নিত

হচ্ছে।

কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যাঁরা এ জন্য দায়ী,

লক্ষ-কোটি মানুষকে যাঁরা কষ্ট দিচ্ছেন,

অশান্তিতে ফেলছেন, তাঁরা কি শান্তিতে থাকতে

পারবেন? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭,

২০১০

419) এক জোড়া হাইবুটের ডায়রি থেকে

সোমবার

চমৎকার রোদ বাইরে। মোলায়েম আবহাওয়া।

চারদিক শুকনো খটখটে। অথচ আমরা স্নেহ

ঘরে বসা। কোনো মানে হয়! বুধবার

দেয়ালের বাইরে মনোহর গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা।

মস্তুর বাতাস আদরের স্পর্শ দিচ্ছে শরীরে।

অথচ আমরা সারাটা দিন এই বন্ধ

আলমারিতে। শুক্রবার

এই সপ্তাহজুড়েই অসাধারণ আবহাওয়া। আর

আমরা, দুই গর্দভ, ভাপসা ঘরে বসে আছি

বেকার। রোববার

এ কী অবিচার! একটা দিন মাত্র বেরিয়েছি ঘর

ছেড়ে, অমনি বৃষ্টি, কাদা! অসহ্য! সূত্রঃ দৈনিক

প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

420) নৈরাশ্যবাদী

একদা এক নৈরাশ্যবাদীর ভাগ্য অপ্রসন্ন হলো।

কলমের কালি লেপ্টে গেল তার সদ্য-কেনা দামি

সুটে। দাগ দূর করার যাবতীয় অধ্যবসায় তার

পরিণত হলো পণ্ড্রমে। দাগটি আরও

প্রসারিতই হলো শুধু। মাথায় হাত দিয়ে বসল

নৈরাশ্যবাদী। ‘আমি আগেই জানতাম, কাপড়ের

জাতই না এটা! কালি শুষে নেয় স্পঞ্জের মতো!’

প্রতিবেশীরা তাকে আশ্বস্ত করতে বলল, ‘এ তো

নেহাতই মামুলি ব্যাপার! সুটেটা নিয়ে যান ড্রাই

ক্লিনার্সে। ওরা দাগটি দ্রুত তুলে ফেলবে।’

‘ড্রাই ক্লিনার্সের দৌড় আমার জানা আছে’, স্পষ্ট

বিরক্তি প্রকাশ পেল নৈরাশ্যবাদীর কণ্ঠে,

‘কাজের কাজ করতে পারে না কিছুই; শুধু

খামখা কাপড়চোপড় আটকে রাখে মাসের পর

মাস...’ তবে উপায়ান্তর না দেখে প্রতিবেশীদের

উপদেশে কর্ণপাত করবে স্থির করল সে। এক

ঘণ্টা বাদেই বগলের তলায় সুটেটি চেপে ধরে

ড্রাই ক্লিনার্স থেকে নৈরাশ্যবাদী ফিরে এল। ‘কী,

দাগ দূর হয়েছে?’ প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করল

সহানুভূতির সুরে।

‘হয়েছে’, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বিরস বদনে

বলল নৈরাশ্যবাদী, ‘আমাদের এই পোড়া দেশে

কালিও ঠিকমতো বানাতে পারে না!’ সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৭, ২০১০

421) মহাসমারোহে চলছে বিশ্বকাপ ঘরে ঘরে তীব্র লড়াই

হ্যাঁ, ভাই! এ এক চরম ক্লাইমেক্স। বাড়িতে বাড়িতে আজ বিদেশি পতাকা। কিন্তু একি! সব মানুষের মধ্যে কেন এত উৎকণ্ঠা? কেন সবার চোখ আটকে আছে টিভির পর্দায়? হ্যাঁ ভাই, সগৌরবে চলিতেছে ফিফা আয়োজিত ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর

বিশ্বকাপ...বিশ্বকাপ...বিশ্বকাপ। একটি কাপের জন্য ৩২টি দেশের মহা লড়াই...লড়াই...লড়াই।

কিন্তু এ লড়াই শেষ নয়। লড়াই আরও আছে।

অধিকার আদায়ের লড়াই। রিমোট কন্ট্রলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। ঘটনা হলো,

বিশ্বকাপ শুরু হয়ে যাওয়ায় টিভি দেখা এবং

রিমোট কন্ট্রলের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে

কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে।

একদল বিশ্বকাপের খেলা দেখতে চায়।

সাধারণত বাড়ির পুরুষ ও ক্রীড়াপ্রেমীরা এই

দলের সক্রিয় সদস্য। এদের মতে, ‘এত দিন

সব অত্যাচার সহ্য করেছি। কিন্তু আর না। চার

বছর পর বিশ্বকাপ হচ্ছে, বিশ্বকাপের প্রতিটি

খেলা আমরা দেখবই। কোনো অশুভ শক্তি

আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।’ অন্য দলে

রয়েছে বাড়ির গৃহকর্ত্রী, তরুণী কন্যা, বুয়া

প্রমুখ। তাঁরা চায়, টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল

দেখতে। তাঁদের মতে, ‘আমরা এত দিন ধরে

এই সিরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখে আসছি।

ভূমিকম্প হলেও আমরা সিরিয়াল দেখা মিস

করি না। আর সামান্য বিশ্বকাপ দেখার জন্য

সিরিয়াল দেখব না, এটা তো হতেই পারে না।’

ভয়ংকর সংঘাতময় অবস্থা। বিশ্বকাপ শুরু

হওয়ার পর থেকেই এই দুটি গ্রুপ পরস্পরের

বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। এখনই

এদের মধ্যে হস্তক্ষেপ না করলে যেকোনো সময়

যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই

কর্তৃপক্ষের উচিত, এখনই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী রুটিন তৈরি

করে বাড়িতে বাড়িতে বুলিয়ে দেওয়া যেতে

পারে। এতে করে দুই দলই রুটিন অনুযায়ী

টিভি ও রিমোটের সমান দখল পাবে। তা ছাড়া

বিশ্বকাপ সরাসরি দেখানো হচ্ছে, অতএব খেলা

চলাকালে অনুষ্ঠিত সিরিয়ালগুলো বিশেষ

পদ্ধতিতে রেকর্ড করে রাখা যেতে পারে। খেলা

শেষ হলেই রেকর্ড করা সিরিয়াল বিপক্ষ দলের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। এতে দুই দলই শান্ত হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারটি ভেবে দেখবে। **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৪, ২০১০

422) ইভানৎসভের গল্প

দোকানে

‘আপনাদের দোকানে জিনিসপত্রের সর্বশেষ সাপ্লাই কবে এসেছে?’ ইভানৎসভ প্রশ্ন করল বিক্রেতা মহিলাকে।

‘গত পরশু,’ বলল সে।

‘তার মানে, টাটকা নয়,’ মনে মনে সিদ্ধান্ত টানল ইভানৎসভ। ‘না, কিছু কিনব না!’

ইভানৎসভ বেরিয়ে এল আসবাবের দোকান থেকে। ঈর্ষা

সি-বিচে এক লোকের পেটে বড় এক কাটা দাগ চোখে পড়ল ইভানৎসভের।

‘কী দারুণ সুখী এক লোক!’ ঈর্ষাভরে ভাবল ইভানৎসভ। ‘ওর অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আর আমারটা এখনো ব্যথা করতে শুরুই করেনি...’ টিকিট

‘আমাকে থিয়েটারের টিকিট দিন, ব্যালকনিতে,’ ইভানৎসভ সবিনয়ে অনুরোধ করল টিকিট বিক্রেতা মেয়েটিকে।

‘প্লিজ, আমার কাজে বিরক্ত করবেন না,’ মেয়েটি উত্তর দিল মাথা না তুলেই।

‘ব্যালকনির একটা টিকিট,’ এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল ইভানৎসভ।

‘বললাম তো, বিরক্ত করবেন না!’ মেয়েটির গলার স্বর উঁচু হলো।

কিন্তু ইভানৎসভ একই অনুরোধ করতে থাকল বারংবার। অবশেষে সিকিউরিটি গার্ডরা এসে তাকে ধরে বের করে দিল অ্যারোফ্লটের অফিস থেকে। মোটরসাইকেল

একটা মোটরসাইকেলের স্বপ্ন ছিল ইভানৎসভের। বন্ধুরা একটা মোটরসাইকেল উপহার দিল তাকে। এরপর বহুদিন হা-হুতাশ করল ইভানৎসভ। কাউকে কাছে পেলেই অভিযোগের সুরে বলত, ‘আমাকে আমার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে!’ এদোয়ার্দ ড্রোর্কিন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৪, ২০১০

423) পতাকা-দ্য ফ্ল্যাগ - আদনান মুকিত

বিশ্বকাপের খেলা দেখার জন্য বাবা ব্যাপক আয়োজন করেছেন। এত উঁচু যে এভারেস্ট, তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু বাবার উৎসাহের কোনো সীমা নেই। এই উৎসাহ নিজের মধ্যে রাখলেও একটা কথা ছিল, উনি তা রাখছেন না। চেষ্টামেচি করে সবার কানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন। টিভিতে ম্যারাডোনাকে দেখলেই তিনি চিৎকার করে ওঠেন, ‘আরে, ম্যারাডোনা! অ্যাঁই, শুনছ, ম্যারাডোনাকে দেখাচ্ছে। আরে, ওই তো মেসি। দেখেছ, দেখেছ, বলটা কী করে কাটাল? শাবাশ ব্যাটা! সবগুলোকে দেখিয়ে দে, ফুটবল কী জিনিস!’ আমাদের বাসার আশপাশে কোনো কানের ডাক্তার নেই। থাকলে এই কয়েক দিনে চেম্বারে রোগীদের জায়গা দিতে পারত না। বাবার কারণে পাশের বাসার পিচ্চিও আমার সঙ্গে মশকারা করার সাহস পায়। আমাকে দেখলেই বলে, ‘ভাইয়া, আংকেলের টিভি দেখার টাইমটা বলবা, আমি তুলা কিনে রেখেছি, সময় হলেই কানে লাগাব।’

বাবা নিজে আর্জেন্টিনার বিরাট সমর্থক। তাঁর আচার-আচরণ দেখলে যে কেউ ভাববে, ম্যারাডোনা তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। তাঁরা একই সঙ্গে বড় হয়েছেন, ফুটবল খেলেছেন। একসময় ম্যারাডোনা জীবিকার জন্য আর্জেন্টিনায় চলে যান, তারপর তো ইতিহাস। বাড়ির পেছনে ছাদ থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার বিশাল পতাকা। সেই পতাকার কারণে আমার ঘরের জানালা দিয়ে আলো-বাতাস দূরে থাক, মশা-মাছিও আসতে পারছে না। আলো-বাতাস না আসার চেয়ে বড় একটা সমস্যা আছে।

একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা। কিন্তু সেটা কাউকে বোঝাতেও পারছি না। বাবাকে গিয়ে বললাম,

‘বাবা, তোমার পতাকার কারণে আমার জানালা দিয়ে আলো-বাতাস আসছে না।’

‘তোর ঘরে লাইট-ফ্যান নেই? ওগুলো অন করে রাখ।’

‘বাসায় তো বিদ্যুৎই থাকে না। লাইট-ফ্যান দিয়ে কী হবে?’

‘বিদ্যুৎ না থাকলে আমার ঘরে চলে আসবি। ৪-

৪-২ নাকি ৪-৩-৩—কোনটা বেস্ট ফরমেশন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। গরমের মধ্যে একা একা বসে না থেকে মুক্ত আলোচনা করা ভালো না?’

বাবা আছেন তাঁর টিমের ফরমেশন নিয়ে। আর এই দিকে আমার অবস্থা খারাপ। এই পতাকাটা যে আমার কত ক্ষতি করেছে, তা আমি কীভাবে বোঝাব? তার ওপর আবার মামা এসে হাজির। মামা ব্রাজিলের সাপোর্টার। বিশ্বকাপ এলে শুধু বাবার সঙ্গে ঝগড়া করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। মামাকে গিয়ে বললাম, ‘মামা, এই ফালতু পতাকার জন্য ঘরে বাতাস আসে না। গরমে ঘুমাতে পারবে?’

‘ফালতু পতাকা মানে? তুই আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করিস না? পতাকা তুই লাগাসনি?’

‘আরে না, আমি তো ব্রাজিলের সাপোর্টার।

গতবার রোনালদোকে দেখে মাথা ন্যাড়া করে ফেললাম, (কিসের ব্রাজিল, কিসের রোনালদো? মাথায় ফোঁড়া হয়েছিল, তাই ন্যাড়া হয়েছি) ভুলে গেছ? এবার তো রোনালদো নেই, তাই আর ন্যাড়া হলাম না।’

‘ও, তাই তো তাহলে এই ফকির পতাকা ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন? ছিঁড়ে আপনার কাছে দিয়ে দে, আপা ঘর মোছার জন্য ন্যাকড়া খুঁজছিল।’

‘বাবা তাহলে আমাকেই ন্যাকড়া বানিয়ে ফেলবে। তুমি পারলে এটা সরাও। না হলে দুজন মিলে গরমে কষ্ট পেতে হবে।’

‘অফকোর্স। আমি এমনিতেই গরম সহ্য করতে পারি না। এখনই একটা কিছু করতে হবে। নো লং প্রসেস। আমার থিওরি হচ্ছে, কবি নজরুলের মতো, লাথি মার, ভাঙরে তালা, যত সব বন্দীশালা, আগুন জ্বালা...টাইপ। চল, চল চল।’

আমি মামার সঙ্গে হাঁটা দিলাম। কেমন যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব অনুভূত হচ্ছে। মামা হাসিমুখে বাবাকে বলল, ‘দুলাভাই, বরাবরের মতো আপনি কি এবারও আর্জেন্টিনার পক্ষে?’ ‘অবশ্যই। আমি সব সময় আর্জেন্টিনার সমর্থক ছিলাম, আছি, থাকব।’

‘আপনার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে, এবারও আপনার দল কাপ জিততে পারবে না।’

‘তোমাকে কে বলেছে? নাকি তোমরা আগেই

ফিফার সঙ্গে টাকা-পয়সা দিয়ে সব ঠিক করে রেখেছ?’

‘ছি, দুলাভাই! মনটাকে এত ছোট করবেন না। অবশ্য আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা এমনই হয়। আপনি কানটা একটু পরিষ্কার করুন। শুনুন, প্রকৃতি কী বলে। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে, এবার ব্রাজিল জিতবে। প্রমাণ চান?’

‘হেহ! প্রকৃতির আর খেয়ে কাজ নেই। বলো কী প্রমাণ?’

‘ওই শুনুন, কাক ডাকছে। কাক বলছে কা-কা, কা-কা! মানে হলো, সামান্য কাকও জানে, এবারের সেরা খেলোয়াড় হবে কাকা, তার মানে ব্রাজিলই জিতবে। বুঝেছেন?’

আমি দেখলাম বাবা কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

তাই বললাম, ‘মামা, প্রকৃতি আর্জেন্টিনার কথাও বলছে। শুনে দেখেন, ছাগল ডাকে মেএএএ, মেএএএ! ছাগল আসলে মেসির কথা বলতে চাইছে।’

‘রাইট! খাঁটি কথা বলেছিস।’ বাবা লাফিয়ে উঠলেন।

মামা হেসে বললেন, ‘দুলাভাই, অত জোরে চেষ্টাবেন না, হাটে সমস্যা হতে পারে। শোনেন, ছাগলরাই আর্জেন্টিনার কথা বলে। ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনার কথা বলছি না, আমার ভাগ্নের কথা বলছি। আর সেই ছাগল মেসি নামটাও পুরো বলতে পারে না।

মেএএ...বলে আটকে যায়। মানে সে দ্বিধাগ্রস্ত। আপনিও কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত।’

‘আমি?...আমার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।’

‘আছে। আপনি বাড়ির পেছনে আর্জেন্টিনার বিরাট এক পতাকা লাগিয়ে বসে আছেন। আর্জেন্টিনাই জিতবে, এই বিশ্বাস থাকলে আপনি বাড়ির পেছন দিকে পতাকা লাগাতেন না, অন্যদের মতো ছাদে লাগিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন, এবার আর্জেন্টিনাই জিতবে। বুঝেছেন?’

বাবা কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে এখনই বিস্ফোরণ ঘটবে। মামাও মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছে। হঠাৎ বাবা বললেন, ‘আবির, পতাকাটা খুলে ছাদে গিয়ে লাগা। এমনভাবে লাগাবি যাতে মঙ্গল গ্রহ থেকেও দেখা যায়। আমি জানি, আর্জেন্টিনাই জিতবে।’

আমি মহাখুশি হয়ে পতাকা খুলতে লাগলাম।
মামা এসে বলল, ‘দেখলি, কীভাবে কাটিয়ে
গোল দিলাম? একেবারে ব্রাজিলের মতো। শোন,
বুদ্ধিমানরাই ব্রাজিল সাপোর্ট করে। তোকে তো
গাধা ভাবতাম, এখন দেখছি তুইও বেশ
বুদ্ধিমান। ঠিক বলেছি না?’

‘অবশ্যই। ব-তে ব্রাজিল, ব-তে বুদ্ধিমান (হেহ,
ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সব এক, বুদ্ধিমান না ছাই)।
মামা আমার পিঠ চাপড়ে বাইরে গেলেন। আমি
সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা হাতে নিয়েই নাদিয়াকে
ফোন দিলাম, ‘হ্যালো, জান, তাড়াতাড়ি জানালায়
আসো। পতাকা সরিয়ে ফেলেছি।’

‘সত্যি? ইয়াহু! কীভাবে? ইস্, কী যে খুশি
লাগছে! কত দিন পর আবার তোমাকে দেখতে
পাচ্ছি। অ্যাঁই, তুমি এখনো স্পেনের দলে আছ
তো? অন্য দলে গেলে কিন্তু খবর আছে।’

‘আরে, আছি আছি। এবার স্পেনই জিতবে।
তুমি আর আমি দুজনই স্পেনের সাপোর্টার
তো। ভাবছি, জানালায় ছোট একটা স্পেনের
পতাকা লাগাব।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন
১৪, ২০১০

424) ভবিষ্যতের আগে - কাওসার আহমেদ চৌধুরী

সকালবেলা কাঁচি দিয়ে দাড়ি ছাঁটতে বসেছি,
আর অমনি আমার ল্যান্ডফোনটা ভ-র্-র্-র্ করে
বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে ফোন তুলতেই শুনি
ম্যারার খসখসে গলা। ম্যারা হচ্ছে, আপনারা
যাকে ডিয়েগো ম্যারাডোনা বলে জানেন, সে-ই।
ভেরি ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড। তাই ‘ম্যারা’ বলেই ডাকি। ও
আমাকে ডাকে সংক্ষেপে জাস্ট ‘কাউয়া’ বলে।
যা-ই হোক, ম্যারার কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। বলে,
‘দোস্তু, ফেঁসে গেছি! কাপটা বুঝি গেল!’ আমি
এক হাতে রিসিভারটা সামলে অন্য হাতে কাঁচি
চালাতে চালাতে বললাম, ‘দ্যাখ ম্যারা, এই
সাতসকালে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী-ফানি আমি
করতে পারব না। আই অ্যাম ভেরি ব্যস্ত। দাড়ি
ট্রিম করছি। প্লিজ, ফোন রেখে দে।’ আপনারা
জানেন, ম্যারাডোনার কান্না বিশ্ববিখ্যাত। খুব
সুন্দর করে কাঁদতে জানে ও। ডুকরে কেঁদে
উঠে বলল, ‘কাউয়া ডিয়ার, আমার বেস্ট শ্যুটার
লিওনেল মেসির মাথায় হঠাৎ, মানে সামথিং
টেরিবলি রং...প্র্যাকটিসে নেমে একটির জায়গায়
তিনটি করে বল দেখছে চোখে, আর

এলোপাতাড়ি ঠ্যাং চালাচ্ছে। ও গড, আমি শেষ!’
শুনে আমার হাত কেঁপে এক খাবলা বেশি দাড়ি
কেটে গেল। তবু কোনোমতে বললাম, ‘তোদের
আর্জেন্টিনায় ভালো ডাক্তার নেই?’ ম্যারা বিলাপ
করে বলল, ‘সব ট্রাই করা হয়ে গেছে, দোস্তু।
এখন তুই এসে বাঁচা। আমার দলের সব
ছোকরার সাহস ভেঙে পড়েছে।’ আমি বললাম,
‘ছিঃ, এসব কী হচ্ছে ম্যারা! তোর কান্নাকাটি
শুনে আমার দাড়ি কাটা উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।
এর ক্ষতিপূরণ তুই দিতে পারবি?’ ম্যারা বলে,
‘তোকে অনার করার জন্যই তো তোর
দেখাদেখি আমিও একমুঠো দাড়ি রেখেছি। প্লিজ,
তুই এসে আমার গেম প্ল্যানটা নতুন করে
সাজিয়ে দিয়ে যা।’ এসব শুনে ওর জন্য আমার
খুব মায়া হলো, যদিও আমি আর্জেন্টিনার
বিপক্ষে। ব্রাজিলের সাপোর্টার। হাউএভার,
বললাম, ‘অক্কে, আমার বাসায় প্লেন পাঠিয়ে দে।
ততক্ষণে আমি রেডি হয়ে নিই।’ ম্যারা বলল,
‘পাঠাচ্ছি। কিন্তু তোদের ঘিঞ্জি কলাবাগানে প্লেন
ল্যান্ড করবে কোথায়?’ আমি একটু চটে
গেলাম। বললাম, ‘কেন, কলাবাগান ক্লাবের মাঠে
নামবে প্লেন। আমার বাসা থেকে পাঁচ টাকা
রিকশা ভাড়া। তুই তো চিনিস, শালা। ইয়াং
বয়সে একবার তোর টিম নিয়ে প্রীতি ম্যাচ
খেলতে এসে কলাবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে
২-২ গোলে ড্র করে গেলি, মনে নেই? না, এক
কাজ কর, তুইও আয়। পাইলটকে পথ দেখিয়ে
আনবি। তা না হলে আবার কলাবাগান ছেড়ে
কাঁঠালবাগান-টাগানে প্লেন নামিয়ে শেষে কোনো
কেলেক্সারি ঘটাবে।’ খুশির চোটে ম্যারা হাউমাউ
করে কেঁদে উঠল। আমি ধমক দিয়ে বললাম,
‘অ্যাই, চোপ! ফোন রাখা!’
মহা ঝামেলা, ভাই। রিকশা নিয়ে আপনাদের
ম্যারাডোনা একেবারে আমার বাসায় চলে
এসেছে। চেম্বারে ক্লায়েন্টদের হাত-পা-মুখ
দেখার কাজ আমার মাথায় উঠল। একেবারে
পেটে লাথি। কলাবাগান মাঠে পৌঁছে দেখি
কালো কালো ফুটবলের মতো কেবল মানুষের
মাথা। প্লেন, ম্যারাডোনা অ্যান্ড মি—মিডিয়ার
তৎপরতায় পাবলিক সব খবর পেয়ে গেছে।
চারদিক মুখরিত শুধু স্লোগানে—‘ম্যারা-কাউয়া
জিন্দাবাদ!’ ভিড় ঠেলে প্লেনে উঠলাম দুজনে।
প্লেনটা ম্যারার মতোই ছোটখাটো, মজবুত আর

ফাস্ট। পাইলটকে বললাম, ‘অই মিয়া, একটু টাইনা চালান। ঢাকায় আমার বহুত কাম। জলদি ফিইরা আইতে হইব।’

আর্জেন্টিনায় পৌঁছেই ওদের জাতীয় টিমকে তলব করে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলালাম। শোচনীয় অবস্থা। মেসি বারবার তার নিজ দলেরই গোলকিপারকে কড়া শটে পরাস্ত করছে। হুঁশ বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে ওর। কোচ ম্যারাডোনাকে চোখ পাকিয়ে বলছে, ‘গেট লস্ট!’

বোর্ডরুমে আমি বললাম, ‘হবে না। কাপ জিততে চাইলে বাংলাদেশ থেকে ক্রিকেটার সাকিব ও তামিমকে ‘হায়ার’ করতে হবে। ওরা মহা বিশ্বকাপ মানের ফুটবল অনুশীলন করে। রিটায়ার্ড একজন মুরব্বি ফুটবলারকেও নিতে হবে। আর নিতে হবে সদ্য এভারেস্টের চূড়া থেকে হেঁটে আসা পর্বতারোহী মুসা ইব্রাহীমকে। ২৯ হাজার ৩৫ ফুট ওপরে ছিল, মাইনাস ২৫ ডিগ্রি ঠান্ডায়। বিশ্বকাপের খেলা তো হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র আড়াই হাজার মিটার উচ্চতায়। কাজেই মুসার দমের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। ওর অক্সিজেন-বোতল, মাস্ক—কিছুই লাগবে না। তবে হ্যাঁ, পিঠে থান ইট-ভরা ব্যাকস্যাকটা লাগবে। ওটা ছাড়া মুসা দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না, দৌড়ানো তো বহু দূর।’

বোর্ড অফিশিয়ালদের বললাম, ‘আই অ্যাম এ গ্রেট জ্যোতিষী। কাজেই এই বিশ্বকাপে বিদেশি খেলোয়াড় ‘হায়ার’ করার বিশেষ অনুমোদন ফিফার মাথায় ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আমিই আদায় করে নেব। ডোন্ট ওয়ারি।’ ম্যারা ট্যারা চোখে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ঠিক এই সময়ে আমার আড়াই সের ওজনের ১৯৮২ মডেলের মোবাইল ফোনখানা ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার মতো ঢং ঢং করে বেজে উঠল। ফোন তুলে বললাম, ‘হ্যালো, কে?’ ভাঙা গলায় একজন কেঁদে উঠে বলল, ‘মুই ব্রাজিলের দুঙ্গা, স্যার....!’

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৪, ২০১০

425) খেলোয়াড়গণ কহেন

খেলোয়াড়দের কাজ পা দিয়ে খেলা। তাই বলে মুখ কিন্তু বন্ধ থাকে না তাঁদের। অদ্ভুত সব কথাবার্তা ও বেফাঁস মন্তব্য করে মাঠের বাইরেও জমিয়ে রাখেন তাঁরা, হন পত্রিকার শিরোনাম। খেলোয়াড়দের তেমনি মজার মজার কথা

ওয়েবসাইট থেকে আতিপাতি করে খুঁজে বের করেছেন আলিয়া রিফাত.☆ আমরা হেরেছি, কারণ আমরা জিতিনি।—রোনালদো, ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার।

☆ ফুটবলে প্রথম ৯০ মিনিটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।—স্যার ববি রবসন, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার এবং কোচ।

☆ যতটা সুখী হওয়া সম্ভব আমি ততটাই সুখী, কিন্তু আমি আগে আরও সুখী ছিলাম।—উগো ওহিওগু, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ হয় ভালো, না হয় মন্দ। এর মাঝামাঝি কিছু না। আজকে আমরা মাঝামাঝি ছিলাম।—গ্যারি লিনেকার, সাবেক ইংলিশ স্ট্রাইকার।

☆ লিগ জেতার আগ পর্যন্ত প্রতিটা খেলাতেই যদি আমাদের হারতে হতো, তাতেও অবাক হতাম না।—মার্ক ভিদুকা, অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার।

☆ আমি সত্যিই অবাক হয়েছি কিন্তু আমি সব সময়ই বলি, ফুটবলে কোনো কিছুই আমাকে অবাক করে না।—লা ফার্ডিনান্ড, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ ইতালিতে আমার ভালো লাগছিল না, মনে হচ্ছিল বিদেশে আছি।—ইয়ান রাশ, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ আমি সব সময় ডান পায়ে বুটটা আগে পরতাম। তারপর ডান পায়ে মোজা।—ব্যারি ভেনিসন, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা দারুণ ছিল, যদিও আমি সেখানে যাইনি।—গ্রায়েম লি, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ অ্যালেক্স ফার্গুসন আমার দেখা এই পর্যায়ের সেরা ম্যানেজার। এই পর্যায়ে আমি একজন ম্যানেজারকেই পেয়েছি এবং তিনিই সেরা।—ডেভিড বেকহাম, ইংলিশ মিডফিল্ডার।

☆ আমি কোনো ইতালিয়ান ক্লাবের হয়ে খেলতে চাই। যেমন, বার্সেলোনা।—মার্ক ড্রাপার, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ ফুটবলে মাঝে মাঝে আপনাকে গোল দিতে হয়।—থিয়েরি অঁরি, ফ্রেঞ্চ ফুটবলার।

☆ আমি কখনোই যেতে চাইনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। আশা করি তার পরেও।—অ্যালান শিয়েরার, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার, নিউক্যাসল; ইউনাইটেড ক্লাব

সম্পর্কে।

☆ আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আপনি জিতবেনই। আমরা বিশ্বাস করি, আমরাই জিতব, যতক্ষণ না শেষ বাঁশি বেজে ওঠে আর আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিই।—পিটার শিলটন, সাবেক ইংলিশ গোলকিপার।

☆ আমার বাবা-মা সব সময়ই আমার পাশে ছিলেন। যখন আমার বয়স সাত তখন থেকে।—ডেভিড বেকহাম, ইংলিশ মিডফিল্ডার

☆ জেতা আসলে কোনো ব্যাপারই না, যতক্ষণ আপনি জিতবেন।—ভিনি জোন্স, ব্রিটিশ ফুটবলার।

☆ মনে হচ্ছিল যেন রেফারির হাতে একটা নতুন হলুদ কার্ড ছিল এবং তিনি তা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলেন।—রিচার্ড রুফুস, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার।

☆ আমি আমার বাঁ গোড়ালিতে সেক নিচ্ছিলাম। তখন পাশ থেকে একজন বলে উঠল ওটা নাকি আমার ডান গোড়ালি।—লি হেনড্রি, ইংলিশ মিডফিল্ডার।

☆ ইতালিয়ানরা আপনাদের বিপক্ষে জিততে পারবে না কিন্তু আপনি তাদের বিপক্ষে খেলে হারতে পারবেন।—ইয়োহান ক্রুইফ, ডাচ ফুটবলার।

☆ যে ব্যক্তি বলে, জয়লাভই সবকিছু নয়, সে আসলে কোনো দিন জয়লাভ করেনি।—মিয়া হাম, আমেরিকান মহিলা ফুটবলার।

☆ লাতিন আমেরিকায় ফুটবল ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই পর্যন্ত অনেক সরকারেরই পতন ঘটেছে জাতীয় ফুটবল দলের পরাজয়ের কারণে।—লুইস সুয়ারেজ, স্প্যানিশ ফুটবলার।

☆ যদি প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হও, তাহলে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হও।—রয় কিন, আইরিশ ফুটবলার ও ম্যানেজার

☆ খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগেই আমরা বিজয়ীকে পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষমেশ দুই দলই সমান হয়ে গেল।—ইয়ান ম্যাকনেইল।

☆ যদি তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলে কেবল একদিকেই যেতে পারবে। সেটা হলো পেছনের দিক।—পিটার শিলটন, ইংলিশ গোলকিপার।

☆ রেফারি দাঁড়িয়ে ছিল উল্লম্বভাবে, ঠিক ১৫

গজ দূরে। —কেভিন কিগান, ফুটবলার।

☆ আমি একবার বলেছিলাম, গাজ্জার আইকিউ তাঁর শার্টের নম্বরের চেয়ে কম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আইকিউ কী?—সাবেক আইরিশ ফুটবলার জর্জ বেস্ট, পল গ্যাসকোয়েন সম্পর্কে।

☆ সে বাঁ পায়ে ফুটবলে লাথি মারতে পারে না, বল হেড করতে পারে না, গোল করতেও পারে না। তা ছাড়া তার আর সবই ঠিক আছে।—জর্জ বেস্ট, ইংলিশ মিডফিল্ডার; ডেভিড বেকহাম সম্পর্কে।

☆ আমার জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত শেষবারের মতো এমন হলো। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। একই ম্যাচে কখনো আমি তিনটে গোল দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। এমনকি যখন ছোট ছিলাম তখনো না।—জিনেদিন জিদান, সাবেক ফ্রেঞ্চ ফুটবলার।

☆ আমি আমার সেরা পারফরম্যান্সটিই দেখিয়েছি, এমন অপবাদ আমাকে কখনোই দিতে পারবেন না।—অ্যালান শিয়ারার।

☆ ফাঁকা মাঠের চেয়ে লোকভর্তি বাড়ির সামনে খেলা ভালো।—জনি জাইলস।

☆ যদি বিশ্বাস না করো যে তুমি জিতবে, তাহলে ঘুম থেকে ওঠারই কোনো মানে হয় না।—নেভিল সাউথহল, সাবেক ব্রিটিশ ফুটবলার। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৪, ২০১০

426) হেলে পড়েছে ভবন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করো

বিশ্বকাপ ফুটবল পুরোদমে জমে উঠেছে। প্রায় সব বাড়ির ছাদেই বাঁশের আগায় বিভিন্ন দেশের পতাকা লাগানো। পতাকার ভারে কোনো কোনো বাঁশ একেবারে হেলে পড়েছে। দেখতে ভালোই লাগে। শুধু কি বাঁশ? আরও অনেক কিছুই হেলে পড়ছে।

নিচের ছবিটি দেখুন। জলজ্যান্ত একটা ভবন কী সুন্দর হেলে পড়েছে! তবে এ দেশের মানুষ খুবই বেরসিক। একটা ভবন হেলে পড়েছে, কোথায় আরও ভবনটার সামনে গিয়ে ভাব নিয়ে ছবি তুলবে, তা না, ভবন কেন হেলে পড়ল, কোন কোম্পানির রড-সিমেন্ট দিয়ে এই ভবন তৈরি হয়েছে—এসব নিয়ে লাফালাফি করছে। অনেকের মতে, বাংলাদেশের মানুষ সারা দিন

যেভাবে ‘হ্যালো হ্যালো’ বলে, ভবন তো হেলে পড়বেই। কানের কাছে সারা দিন ‘হ্যালো হ্যালো’ বললে কত দিন আর না হেলে বসে থাকা যায়? ভবনেরও তো সহ্যের একটা সীমা আছে, নাকি। অনেকে আবার এই সূত্রের ধারেকাছেও যাচ্ছে না। তাদের মতে, আর্জেন্টিনার পতাকাই ভবন হেলে পড়ার একমাত্র কারণ। আর্জেন্টিনা দলের শক্তি, সামর্থ্য, প্রত্যাশার চাপ মিশে ছিল ওই পতাকায়। সেই অসীম চাপ এই ভবনটি নিতে পারেনি, ধপ করে হেলে পড়েছে। কিন্তু ভবন কেন হেলে পড়ল, সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। আমাদের বোঝা উচিত, ভবন হেলে পড়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যেখানে-সেখানে এই ঘটনা ঘটে না। অনেক আগে একবার ঘটেছিল ইতালির পিসা শহরে। একটা টাওয়ার ঠিক এই ভবনটির মতো হেলে পড়েছিল। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ সেই টাওয়ার দেখতে আসত। গ্যালিলিও সাহেব তো এই টাওয়ারের ছাদের ওপর দাঁড়িয়েই নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিলেন। সেই টাওয়ার অনেক আগে থেকেই বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শনের তালিকায় স্থান পেয়ে বসে আছে। আর আমাদের দেশে যে ভবনগুলো হেলে পড়ছে, আমরা তার ঐতিহাসিক মর্ম না বুঝে ভেঙে ফেলছি। কিন্তু এভাবে আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের উচিত হেলে পড়া ভবনগুলোকে অবিলম্বে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ঘোষণা করা। এতে দেশের পর্যটনশিল্প ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। তা ছাড়া গ্যালিলিওর মতো কোনো বিজ্ঞানী থাকলে হেলানো ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে গবেষণাও করতে পারবেন। আশা করছি, কর্তৃপক্ষ হেলাফেলা না করে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২১, ২০১০

427) প্রতীক্ষা -আ. সিঙৎস্কি ও যু. তিমিয়ানস্কি

অনন্তকাল বসে আছি গাছের ওপরে।
ও এখনো এল না।নেমে এলাম গাছ থেকে।
ছড়ি নিলাম হাতে। নিজেকে মানুষ বলে মনে
হতে লাগল।

ও এখনো এল না।সময়কে যুগে ভাগ করার
সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রস্তর যুগ, তুষার যুগ...শীত

পড়ল ভয়ানক। জমতে শুরু করল চারপাশের সবকিছু।

ও এখনো এল না। বরফ গলে গেল। তৈরি করলাম জলঘড়ি। আরও চার বালতি সময় অপেক্ষা করব। তারপর চলে যাব। সময় বয়ে যাচ্ছে তরতর করে।

অথচ ও এখনো এল না। সরে গেল বরফগলা পানি। বেরিয়ে পড়ল বালুময় তলদেশ। অপেক্ষা করতে শুরু করলাম বালুঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে। পাঁচ কোদাল বালুর বেশি দেরি করলে চলে যাব। গোত্রের লোকজন ফিরে এল শিকার শেষে।

ও এখনো এল না। ঘোড়া, গরু, ভেড়া এখন গৃহপালিত জন্তু।

ও এখনো এল না। মন-মেজাজ বিশেষ ভালো নেই। যুগটা সুবিধার নয়। মধ্যযুগ। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীরা চলে গেল পাশ দিয়ে। টাওয়ারের ঘড়িটায় বেজে উঠল মধ্যরাতের ঘণ্টা। টাকা বদলিয়ে ফুল পাওয়া গেল বহু কষ্টে। তাকিয়ে আছি বৈদ্যুতিক ঘড়িটার দিকে। অপেক্ষা আর খুব দীর্ঘ হবে না। কয়েক কিলোওয়াট-ঘণ্টা। সময়সূচি দেখানোর জন্য আবিষ্কৃত হলো ইলিউমিনেটেড ইনডিকেটর বোর্ড। সেরপুকভগামী ট্রেনটা ছাড়ল ১২ মিনিট দেরিতে।

ও এখনো এল না। পরিশ্রান্ত মহাকাশ-ট্যাক্সিগুলো ফিরে যেতে শুরু করেছে মকরক্রান্তি-ডেপোর দিকে। 'ইস্! আমার একটু দেরি হয়ে গেল!' মুখে হাসি টাঙিয়ে বলল ও। 'কিছুতেই স্থির করতে পারছিলাম না, কোন পোশাক পরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।' **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২১, ২০১০

428) বিশ্বকাপ হজুগ - সৈয়দ

মনজুরুল ইসলাম

১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হারল ইতালি। যে রাতে ওই খেলাটা হলো, তার পরদিন সকালে লন্ডন যাওয়ার পথে রোমে থামল আকাশে শ্যান্টি-নীড় আমাদের বিমান। নামার সময় ভেবেছিলাম, রোমের নিসর্গ ছেয়ে থাকবে ইতালির পতাকায়, হয়তো তার কিছু অর্ধনমিত। কিন্তু কোথায় কী! এ তো আর বাংলাদেশ নয় যে লোকজন গাঁটের পয়সায় পতাকা কিনে ছাদে ওড়াবে আর পতাকা ওড়াতে

গিয়ে বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে প্রাণটাও দেবে।
বিমান থেকে নামার অনুমতি নেই। তাই জানালা
থেকেই দেখলাম, পুরো বিমানবন্দর যেন এক
বিরানবন্দর। জ্যান্ত কবর। যেসব
পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিমানে উঠল, তাদের মুখ
বেদনায় আচ্ছন্ন। তাদের একজনকে বাংলাদেশি
এক যাত্রী ডেকে সমবেদনা জানালেন। কিন্তু সে
সান্ত্বনা পাওয়ার বদলে অশান্ত হয়ে গেল। ‘তুমি
সমবেদনা জানাবার কে?’ এ রকম কিছু একটা
সে বলল। তার হাত-পা চালানো দেখে মনে
হলো, যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়েছে,
হয়তো দুইটা লাগিয়েই বসবে।

ইতালির মর্মবেদনাটা বোঝা যায়। ১৯৮২ সালে
চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দেশটি। কিন্তু এরপর দুবার
আর ফাইনালেই উঠতে পারেনি। ১৯৯০ সালের
বিশ্বকাপটি হয়েছিল তাদের মাটিতেই, কিন্তু সে
বছর তাদের মাটিতেই শুইয়ে দিয়েছিল অন্য
দলগুলো। তা ছাড়া ১৯৯৪ সালের ওই
ফাইনালে ইতালিকে হারিয়েছিল ব্রাজিল। ঘা-টা
একটু বেশিই হয়েছিল এ কারণে। তবে রোম
বিমানবন্দরের কর্মীদের দেখে মনে হয়েছিল,
তারা প্রকৃতই ফুটবলপ্রেমী। কেন হবে না,
বলুন? সারা দেশটিতে আছে কত শত ক্লাব,
অসংখ্য খেলোয়াড়, অতি-অসংখ্য দর্শক।
যেকোনো খেলায় দর্শক উপচে পড়ে মাঠে, তা
সে সিরিয়াস খেলা হোক, অথবা ছোট ক্লাবের
ফ্রি ম্যাচই হোক। ইউরোপের সব দেশেই এ
অবস্থা। একবার ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলি
স্টেডিয়ামের পাশের রাস্তায় এক খেলা শেষে
বের হওয়া দর্শক-স্রোতের নিচে চাপা পড়ে
প্রাণটাই যেতে বসেছিল। একই দৃশ্য নিশ্চয়
দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতেও। আমার মনে
হয়েছে, ওই সব দেশের মানুষ ফুটবল
ভালোবাসে, আর আমরা ভালোবাসি ফুটবল-
ফুটবল ভুজুগ। একসময় আমাদেরও
ভালোবাসাটা ছিল, যখন আমার মতো ফুটবল-
নিরপেক্ষ মানুষও স্টেডিয়ামে গিয়ে ওয়ারী-
ফরাশগঞ্জের খেলা দেখত। দৈনিক আজাদ
পত্রিকায় ওয়ারী সম্পর্কে প্রায়ই লেখা হতো,
‘ওয়ারী ভালো খেলিয়াও হারিয়া গেল।’ ষাটের
দশকে আবাহনী ছিল না, ছিল মোহামেডান।
যেদিন মোহামেডানের খেলা থাকত,
ইপিআইডিসি অথবা এ রকম বড় কোনো দলের

সঙ্গে, তিন ঘণ্টা আগে না গেলে জায়গা মিলত না স্টেডিয়ামে। তখনো বিশ্বকাপ হতো, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোনো কাঁপাকাঁপি ছিল না। যা ছিল, তা মোহামেডানকে নিয়ে, এমনকি ওয়ারীকে নিয়েও, ভালো খেলে বারবার হেরে যাওয়ার পরও।

এখন আবাহনী-মোহামেডানের খেলাতেই কত দর্শক হয়? পাঁচ হাজার? নাকি আরও কম? আর ছোট দলগুলোর খেলায়? কত দর্শক টানে ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাব? মাঠের এই ফকিরি অবস্থা কী প্রমাণ করে না, ফুটবলের প্রতি আমাদের প্রকৃত কোনো আগ্রহ নেই? আগ্রহ আছে শুধু হুজুগের প্রতি। যেমন এই বিশ্বকাপ হুজুগ। এই হুজুগের যুগ শুরু ১৯৮৬ সালে, আর্জেন্টিনা যেবার চ্যাম্পিয়ন হলো, সেবার থেকেই। সে বছর অনেকেই রঙিন টিভিতে বিশ্বকাপের খেলা দেখেছেন বিটিভির ভদ্রতায়। কিন্তু খেলা দেখা, তালি দেওয়া, চিৎকার করা এক জিনিস, আর দলগুলোর পতাকা দিয়ে নিজেদের আকাশ ঢেকে ফেলা আরেক জিনিস। এই পতাকা হুজুগ চলছে গত দু-তিন বিশ্বকাপ থেকে। কিছুদিন আগে রংপুর ও সিলেট গিয়েছিলাম বাসে চড়ে। অবাক হয়ে দেখলাম, হাটিকুমরুলের আকাশে ব্রাজিলের প্রাধান্য, তো ভুলতার মাথাজুড়ে আছে আর্জেন্টিনা। পাঁচদোনা বাজারের আবুল মিয়া কোনো একসময় তাঁর প্রিয় নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তাঁর ছবি টানিয়ে। এখন নেত্রীকে আড়াল করে কেউ তুলে দিয়েছে ব্রাজিলের সবুজ পাঁচিল। পতাকার আগ্রাসন থেকে মুক্তি পায়নি থানা অথবা ইবাদতখানাও। আর কী যে টাউস এক একটা পতাকা! সঙ্গে ব্যানার। এবার দেখলাম, বিরাট বিরাট পতাকা-ব্যানারের এ-মাথা ও-মাথাজুড়ে সমর্থকেরা নিজেদের নামও লিখে দিয়েছেন, সঙ্গে দু-এক লাইন মন্তব্য। সিলেটে আর্জেন্টিনা-সমর্থকেরা ব্যানারে নিজেদের নাম খোদাই করে পাশে লিখেছেন, ‘পারলে ঠেকাও।’ একটু দূরের ব্রাজিলভক্তরা তার জবাব দিয়েছেন, ‘কাকা, ম্যাজিক দেখাও’, বাহুবলে এক ব্রাজিল সমর্থক (কিন্তু পর্তুগাল-বিরোধী) লিখেছেন, ‘কাকা আছে, নানি নাই।’ বিশ্বকাপে তাহলে আত্মীয়রাও খেলছেন। কাকা, নানি ছাড়াও মামা, জ্যাঠারাও নিশ্চয় আছেন।

ম্যারাডোনাকে এখন অবশ্য মামুই ডাকা যায়।
বয়স বেড়েছে, মুটিয়েও গেছেন, এমনকি সেই
ঈশ্বরের হাতটিও ফুলে কয়েক সাইজ বড় হয়ে
গেছে। মামু বলা যায় ইতালির গোটা
দলটাকেই। কাগজে লিখেছে, আজ্জুরিদের দলটা
এবার ‘বুড়োদের দল’।

প্রিয় দলের পতাকা কেন ওড়াতে হবে, এর
কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাও যদি ফুটবল-পতাকা
হতো! কিন্তু উড়ছে জাতীয় পতাকা। এটি শুধু
বাংলাদেশেই সম্ভব। বড় দুই দলের সঙ্গে অন্য
দলও আছে। টাঙ্গাইলে যেমন পর্তুগাল, স্পেন
এবং ইতালি আছে, মৌলভীবাজারে আছে
ইংল্যান্ড-জার্মানিও। বাংলাদেশে সারা বছরই
তিন কোনা ইসলামি পতাকার ছদ্মবেশে
পাকিস্তানি পতাকা ওড়ে, কিন্তু এবার দেখলাম,
পাকিস্তানপ্রেমীরা চোরাগুপ্তা আস্ত চান-তারাই
উড়িয়ে দিয়েছে। তাও কোনো খানকা-দরগায়
নয়, চানখাঁরপুলে এক ক্লিনিকের মাথায়। তবে
পাকিস্তানপ্রেমীদের জ্ঞাতার্থে বলি, বিশ্বকাপে
পাকিস্তানের আগে বাংলাদেশই যাবে, যদি যায়
২১১২ সালে হলেও। বাংলাদেশ সব সম্ভবের
দেশ।

সারা বিশ্বে বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি চলছে।
ইংরেজিতে একে বলে ‘হাইপ’, বাংলায় ‘হুজুগ’।
কিন্তু সারা বিশ্বে ফুটবল নিয়ে আছে প্রকৃত
ভালোবাসাও। সে জন্য বিশ্বকাপ এলে পড়াশোনা
বাদ দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ফুটবলের আরাধনা আর
কাকা-মেসি-রোনালদোর নাম জপতে বসে না
কেউই। ফুটবল দেখাটা আনন্দের, কিন্তু এই
আনন্দকে সবকিছুর ওপরে তুলে সব কাজকর্ম
ভুলে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। সেই
অকাজটা আমরাই করি। পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে
গোল্লায় গেলে গোল-মালিক কাকা-মেসিরা
চাকরি জোগাড় করে দেবে না। হুজুগটা
থাকুক, সেটি খারাপ না, তবে সেটাকে চাই
হুজুগ-ট্যাকলিংয়ের ক্ষমতাও। আর এই হুজুগটা
প্রকৃত ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে সারা বছর
ফুটবলের সমর্থন দিয়ে যাওয়া। দলে দলে
ওয়ারীর পতাকা হাতে স্টেডিয়ামে
যাওয়া, তারা ভালো খেলে হেরে যাওয়ার পরও।
হুজুগের সঙ্গে হ্যাঁ যোগ করুন—প্রকৃত
ফুটবলপ্রেমকে ‘হ্যাঁ’ বলুন। তাহলে
২১১২ সালের আগেই বাংলাদেশ বিশ্বকাপে

খেলতে যাবে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২১, ২০১০

429) কেন আমি সমর্থক হলাম - পাড়দিকো

আমি কেন ফুটবলের সমর্থক? এ কেমন গাথাটে প্রশ্ন! আমি সমর্থক এবং এর পেছনে রয়েছে চারটি মূল ও বেশ কয়েকটি গৌণ কারণ। প্রথমত, কোথাও চিৎকার করার সুযোগ আমার নেই, কিন্তু চিৎকার করা আমার যে খুব দরকার! বুঝলেন, থেকে থেকেই চিৎকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আমার ভেতরে। না, কেউ আমার ওপরে চিৎকার করুক, সেটা নয়; দরকার আমার চিৎকার করা। এই কাজের জন্য ফুটবল মাঠের চেয়ে পোক্ত জায়গা আর নেই। আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করুন: এক অফিসের কর্মচারী আমি, বিয়ে করেছি বিশাল বপু, জগদল (শরীর ও চরিত্র দুই-ই বুঝিয়েছি) এক রমণীকে। সুন্দরী বলা যাবে না তাঁকে। এই কারণে অথবা হয়তো অন্য কোনো কারণে আমাদের ছয়-ছয়টা ছেলেমেয়ে। সারাটা দিন আমি কাজ করি সুনসান পরিবেশে। সেখানে বসকে তো ‘কুঁড়ের হৃদ’ বলতে পারি না! বলতে পারি না যে, যেকোনো কাজ তার চেয়ে ঢের ভালো করতে পারি! আর এটা তো স্রেফ ভয়াবহ অবিচার: অফিসে আমি সাদামাটা চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করি, আর সে আরাম করে কেবিনে বসে! আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে নয়, স্রেফ ভাগ্যের ফেরে। এবং বুঝতেই পারছেন, সে আমার ওপরে চিৎকার করতে পারে, আমি তার ওপরে পারি না। চিৎকার করতে পারি না বাসাতেও। স্ত্রী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আপনারা তাকে দেখলে বুঝতেন, কেন তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এবং আমি সমর্থক হলাম কেন, সে প্রশ্নও করতেন না।

প্রতি রোববার আমি স্টেডিয়ামে যাই। ওখানে গেলেই কেবল নিজেকে মানুষ বলে মনে হয়। গেট থেকেই আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে দিই এবং ক্ষান্ত দিই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর। রেফারিকে ‘গর্দভ’ ডাকার ভেতরে কী যে তৃপ্তি! আমার জন্য সেই মুহূর্তে রেফারি যে স্ত্রী, বস ও ছয় সন্তান! এমনকি যাত্রী-গিজগিজ ট্রামও। আবার দেখুন, ফুটবল ছাড়া

আর কোন বিষয় নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা যায়? আমরা সবাই ফুটবল দেখতে যাই বলেই কথা বলার বিষয় একটি আছে আমাদের। বহু বছর আগে আমাদের জীবনে ফুটবল ছিল না। তারপর টনকে-টন কালি খরচ করে পত্রিকাগুলোয় ছাপা হতে শুরু করল ফুটবলারদের চুলের রঙের বিবরণ, তাঁদের অভ্যাস, মামা-চাচা-খালা-ফুফুর কথা, তাঁদের গাড়ির বর্ণনা। পত্রিকাগুলোই তো আমাদের সংক্রমিত করল! এখন আর কোনো বিষয়েই আমরা কথা বলতে পারি না। এ কারণেই আমি সমর্থক হয়েছি। রোববার বিকেলে আর কোথায় যাওয়ার আছে, বলুন, যেখানে স্বল্পমূল্যে এমন মানসম্মত প্রদর্শনী দেখা সম্ভব? সিনেমা হলে লাইন, ক্যাফেতে একঘেয়ে, বিরক্তিকর। ষাঁড়ের লড়াই? বেজায় খরচের ধাক্কা। থিয়েটারগুলোতে রাবিশ। জানেন, হেমন্তকালে ঠাণ্ডা পড়ে এলেও স্টেডিয়ামে গেলে আমি কখনো জমে যাই না শীতে। তাই তো আমি ফুটবলের সমর্থক। যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা দিয়ে সমর্থক গোষ্ঠীর সদস্য হয়েছি। এখানে আমার কথার মূল্য দেয়। আর তাই বলি, ফুটবল দেখতে যাই এবং গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি বলে আমাদের সমালোচনা করবেন না। আমাদের নিয়তিই অমন...।

পাউপিকো: স্পেনের লেখক।

ভাষান্তর: মাসুদ মাহমুদ

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২১, ২০১০

430) নো দাইসেন্স

ফুটবলের শিক্ষা আপনার জীবনে কতটা কাজে লাগাতে পারছেন? ১। আপনার স্ত্রী যখন রেগে হাঁড়িপাতিল ছুড়ে মারেন তখন আপনি—

ক) হাঁড়িপাতিল নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাক করেন
খ) বেডের নিচে লুকিয়ে পড়েন গ) শক্ত ডিফেন্ডারের মতো রক্ত দিয়েও কেবলই ডিফেন্স করেন

২। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ওপর দিক থেকে বল এলে—

ক) হাত দিয়ে ক্যাচ না ধরে মাথা দিয়ে হেড করেন খ) প্রতিপক্ষকে আউট করার আশায় ক্যাচ ধরেন গ) বল মাঠের বাইরে যাওয়ার পর কুড়িয়ে এনে থ্রো ইন করেন।

৩। আদালত থেকে ফাঁসির রায় দিলে আপনি বলেন—

ক) হয় হয়, এটা ভুল রায়, আমি আপিল করব
খ) আমি রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম গ) এর
আগে একটা হলুদ কার্ড অন্তত দেওয়া যেত।

৪। গণিতে ১০০ নম্বরে মাত্র ১০ পেয়েও আপনি
খুশি, কারণ—

ক) ফেইলিউর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস খ)
ম্যারাডোনা, পেলে, জিদানরা ১০ নম্বর জার্সি
পরে খেলতেন গ) ১০ই তো আশাতীত বেশি,
প্রিপারেশন তো আরও খারাপ ছিল।

৫। অফিসের বসকে দেখলেই আপনি যা
করেন—

ক) পাম্প দিতে শুরু করেন খ) পাত্তা না দিয়ে
চলে যান গ) হাতের ফাইলগুলো দ্রুত তাকে
পাস করে দেন। স্কোর কার্ড

১। ক-৬ খ-৮ গ-১০ ২। ক-১০ খ-৬ গ-৮

৩। ক-৬ খ-১০ গ-৮ ৪। ক-৮ খ-১০ গ-৬

৫। ক-১০ খ-৮ গ-৬৪০-এর বেশি হলে—

একেবারেই কাজে লাগাতে পারছেন না।

৪০-এর কম হলে—মোটামুটি কাজে লাগাতে
পারছেন।

৩০-এর কম হলে—ব্যাপক কাজে

লাগছে। মহিউদ্দিন কাউসার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২১, ২০১০

431) রেফারিরাই সকল ক্ষমতার উৎস

লাল-হলুদ ছাড়াও অন্য রঙের কার্ড চাই
খেলার মাঠে আমিই সকল ক্ষমতার উৎস, এই
কথা সত্য প্রমাণ করতে রেফারিরা ইদানীং
যাকে-তাকে ইচ্ছামতো লাল-হলুদ কার্ড
দেখাচ্ছেন। রেফারি বেচারাদেরই বা কী দোষ?
ফুটবলারদের সঙ্গে পুরো ৯০ মিনিট তাঁদের
দৌড়ের ওপর থাকতে হয়, অথচ সুন্দর গোল
বলটাতে কষে একটা লাথি মারার সুযোগ তাঁরা
পান না। পত্রিকার সঙ্গে খেলোয়াড়দের রঙিন
পোস্টার, স্টিকার দেওয়া হয়, কিন্তু রেফারিদের
একটা ছবিও কেউ ছাপে না। রেফারিদের রাগ
হতেই পারে। সেই রাগ থেকে যদি তাঁরা তাঁদের
ইচ্ছামতো কার্ড দেখিয়ে একটু আলোচনায়
আসতে চান, তাতে অসুবিধাটা কী? কিন্তু কার্ড
দেখালে ফুটবলাররা আবার মন খারাপ করে।
আরে সবাইকে কি কার্ড দেখান? কার্ড দেখতে
যোগ্যতার প্রয়োজন। আর লাল কার্ড তো খুবই
ভালো জিনিস, এটা দেখলে কষ্ট করে পুরো
ম্যাচ খেলতে হয় না। আগে আগে বাসায় গিয়ে

নিশ্চিন্তে টিভি দেখা যায়। তবে রেফারিরা কার্ড দেখাবেন ভালো কথা, শুধু লাল আর হলুদ কার্ড দেখাবেন কেন? বাকি রংগুলোর কী দোষ? এগুলোর কোনো দাম নেই নাকি? এগুলো তো আর বুড়িগঙ্গার বর্জ্যের মতো ভেসে আসেনি। তা ছাড়া ফুটবলাররাও এই দুই রঙের কার্ড দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। অতএব, ফিফার উচিত বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন রঙের ব্যবস্থা করা। যেমন, মাথায় মারলে কালো কার্ড, হাঁটুতে মারলে নীল কার্ড ইত্যাদি। এতে প্রতিটি রং তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। বাচ্চারা ইদানীং লাল-হলুদ ছাড়া অন্য রংগুলো চেনেই না। এই প্রক্রিয়ায় ওরা সব রং চিনবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০১০

432) আপনি কেমন রেফারি?

নো দাইসেঙ্ক^১। ‘রোম যখন জ্বলছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল’, ঠিক তেমনি, ফুটবল যখন খেলা হচ্ছিল, আপনি তখন—

ক) হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন খ) ট্রাফিক পুলিশের মতো বাঁশি বাজাচ্ছিলেন গ) ডিভি ভিসার ফরম পূরণ করছিলেন।

২। আপনার বন্ধু মহলে আপনি যে কারণে বিখ্যাত—

ক) দ্রুততম সময়ে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য
খ) আপনার মোহনীয় ভুঁড়িটির জন্য
গ) বাজখাঁই গলায় বাথরুম কাঁপানো গানের জন্য।

৩। কিছু মানুষকে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করতে দেখলেই আপনি—

ক) তাদের কাজটি ভণ্ডুল করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন
খ) তাদের সহযোগিতা করার মহান দায়িত্বটি পালন করেন গ) কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের ফাঁকে ফাঁকে ছোট্টাছুটি করতে থাকেন।

৪। ছোটবেলা থেকেই আপনাকে ফুটবল মাঠে নামিয়ে দেওয়া হলে, আপনি—

ক) আর সবার মতোই বলে পা ছোঁয়ানোর সাধনায় লিপ্ত হন খ) ভয়ে ফুটবল থেকে গা বাঁচিয়ে জগিং করতে থাকেন গ) নিজের নির্বুদ্ধিতা খরচ করে দুই দলেরই শত্রুতে পরিণত হন।

৫। আপনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন—

ক) ফুলপ্যান্ট নয়, হাফপ্যান্টকে খ) নাটক নয়, গোলটেবিল বৈঠককে গ) ৫২টি নয়, মাত্র দুটি কার্ডকে।

স্কোরকার্ড

১। ক-৮ খ-১০ গ-৬, ২। ক-১০ খ-৮ গ-৬

৩। ক-১০ খ-৬ গ-৮, ৪। ক-৬ খ-৮ গ-১০

৫। ক-১০ খ-৬ গ-৮ ফলাফল

৪০-এর বেশি পেলে: আপনি অত্যন্ত উঁচুমানের একজন রেফারি।

৩০-৪০ পেলে: আপনি রেফারি হিসেবে মন্দ না।

৩০ বা এর কম পেলে: দয়া করে গ্রামে গিয়ে হালচাষ করেন, কাজে দেবে। মহিউদ্দিন কাউসার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০১০

433) ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের গোলকিপার পাঁচুগোপাল সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোখে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তার পরে আরকি—একসঙ্গে তিন দিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল। তাতে করে একটা সেমসাইড! এখন হলো কি, ছটা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কী রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাকিরা কেবল লাফাতে লাগল। সেই ফাঁকে ছয়টা বল ফেরত গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফুর্তির চোট লাগল থান্ডার ক্লাবে। আর কে যে কোন দলে খেলছে, খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্লা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিল আর ন্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকানোর জন্য মরিয়া। থান্ডার ক্লাবের দুজন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিলেন। আর কোথেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগলেন, ‘ড্র—ড্র—ড্রন গেম—এস্কুনি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে পুলিশ ডাকব—হুঁ!’

সেদিন সন্দের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে। হঠাৎ টেনিদা বলল, ‘ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি?’

একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।’

‘অ্যাঁ!’ চুইংগাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেল।

‘খেলাটি কোথায় হয়েছিল?’

‘ঘুঁটেপাড়ায়। কি পেলো, ইউসেবিও, মুলার নিয়ে লাফালাফি করিস! জীবনে একটা ম্যাচে কখনো বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ার জিনেহা? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে!’

‘বুঝলি!’ ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল, ‘ছ দিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসির বাড়িতে। ভরা শ্রাবণ, থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। সেদিন সকালে মাসিমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি। এমন সময় কটা ছেলে এসে হাজির।

‘অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সবাই আমায় চেনে। বললে, “টেনিবাবু, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রামের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছ জন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছজন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হলো, আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে, দাদা।”

‘জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটা কায়দা করে বললুম, “সব হায়ার করা ভালো ভালো প্লেয়ার, ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব? তা ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।” ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির। “কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙ্গার টেনিরাম শর্মা—আপনার ফর্ম তো সব কাজে সব সময়েই থাকে। অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল তো তুচ্ছ—আপনি ইচ্ছা করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন।”

‘ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজি করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হলো রে। কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের, পটলডাঙ্গার সব প্রেস্টিজ বিপন্ন।

‘বিকলে আকাশজুড়ে কালো মেঘ। মনে হলো,

দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি, বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। একদল হাঁকছে, “বিচালিগ্রাম—হিপ হুররে—আর একদল সমানে উত্তর চড়াচ্ছে, ‘ঘুঁটেপাড়া—হ্যাপ-হ্যাপ-হাররে। ওরা হিপ হিপ বলছে কি না, তাই পাল্টা জবাব। ওরাও যদি হিপ হিপ করে, তাহলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে? ওরা যদি বলত বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ। নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো, বুঝলি না?’

‘বিলক্ষণ! আচ্ছা, বলে যাও।’

‘এতেই বুঝতে পারছিস দুটো গ্রামে রেষারেষি কী করম। দারুণ চিৎকারের মধ্যে তো খেলা শুরু হলো। দু মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। ওরা ছ জনেই এ ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে—খেলায় ওদের আগুন ছোট। আর ওদের গোলকিপার! সে একবারে ছ হাত লাফিয়ে ওঠে, বল তো বল, বন্দুকের গুলি অর্ধি পাকড়ে নিতে পারে।

‘খেলা শুরু হতে না হতেই বল এসে একেবারে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ-মাঠও আর পেরোয় না। আর ওদের গোলকিপার শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল, “একটা বালিশ আর শতরঞ্চি দাও হে—একটু ঘুমিয়ে নেব।”

‘এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝামঝাম বৃষ্টি। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আর কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ—খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে—ধপাধপ আছাড়—এই ফাঁকেও পরপর দুখানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া। ভাবলুম, যাঃ, হয়ে গেল!

‘বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এ দিকের লাইন্সম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, “শিবতলার পুকুর ভেসেছে রে—মাঠভর্তি মাছ!”।’

‘অ্যাঁ—মাছ!’

‘দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন—তিন শ লোক আর একুশ জন খেলোয়াড়, দুজন লাইন্সম্যান—সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের—

“এই রে, মস্ত একটা শোলমাছ পাকড়েছি!”
“আরে—একটা বাটামাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে!”
“ইস! কী বড় বড় কই, মাইরি! ধর—ধর—!”
‘সে যে একখানা কী কাণ্ড, তোদের আর কী বলব! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দুজন। আমি আর রেফারি। রেফারি ওখানকার স্কুলের ড্রিল মাস্টার। বেজায় মারকুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, “হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন প্লেয়িং!” ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, “আমি একাই খেলব?” “ইয়েস! একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করিনি।” ধমক দিয়ে রেফারি বললেন, “খেলো। প্লেয়াররা মাছ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়ালে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারিগিরির বইতে এমন কোনো আইন নেই।” তখন শুরু হলো আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিয়ে আসি, আর রেফারি ফুর্ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেন্টারে নিয়ে আসে। এ-ই চলতে লাগল। এরই মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়েছি—মানে গুনে গুনে বত্রিশটি। আমি গুনছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করছে, আর ওই ভারী ভেজা বল বারবার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাডিডখানা কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, “অনেক তো গোল দিয়েছি, স্যার, আর পারছি না—পা ব্যথা করছে!” রেফারি আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখ ভেংচে বললেন, “ইয়ু গো অন গোলিং—আই সে।” আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুনেই যাচ্ছেন, “থার্ট—থার্টওয়ান—থার্ট টু—।” তখন “ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি!” বলে ওদের সেই গোলকিপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না—বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারি তক্ষুনি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, “খেলা ফিনিশ!” তারপর আমাকে বললেন, “এখন যাও, কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।” কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিশের সঙ্গে তাও ফিনিশ।’
টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ‘তখন প্রাণের

আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লাতে লাগল, “থ্রি চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম!” আর ঘুঁটেপাড়া চোঁচাতে লাগল, “থ্রি টিয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া”।’

‘টিয়ার্স? মানে চোখের জল?’ ক্যাবলা আবার বিস্মিত হলো।

‘হ্যাঁ, টিয়ার্স। পালটা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিও-রিভেরা-চার্লটন সব কাত করে দিলুম। কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে!’ (সংক্ষেপিত)নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের একজন কিংবদন্তি লেখক। জন্ম: ১৯১৮, মৃত্যু: ১৯৭০।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০১০

434) ধারাভাষ্যকারগণ কহেন

খেলোয়াড়েরা মাঠে খেলেন আর ধারাভাষ্যকারেরা সেই খেলার বর্ণনা দেন। বর্ণনা দিতে দিতে তাঁরা মাঝেমধ্যে এমন সব কথা বলেন, সেসব শুনলে হাসি আটকে রাখা সত্যিই মুশকিল হয়ে পড়ে। ধারাভাষ্যকারদের তেমনই কিছু ভাষ্য ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে বের করেছেন আলিয়া রিফাত☆ তাঁর বয়স এখন ৩১। গত বছর ছিল ৩০।—ডেভিড কোলম্যান।

☆ ইতালিয়ানরা ইতালিয়ান জয়ের আশা করছে।—ডেভিড কোলম্যান।

☆ যদি বলটি গোলপোস্টের ভেতরে গিয়ে থাকে তবে একটি গোল হয়েছে।—ডেভিড কোলম্যান।

☆ ইয়ান রাশ সত্যিই একেবারে দশে দশ। কিন্তু তিনি দশের মধ্যেই নেই।—পিটার জোস।

☆ রিখটার স্কেলে পরাজয়টির মান ছিল ৮।—বিবিসি।

☆ মাত্র চার মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে স্কোর শূন্য-শূন্য।—ইয়ান ডার্ক।

☆ যুক্তরাষ্ট্র এক গোলে পিছিয়ে আছে এবং কোনো গোল না পেলে তারা হারবে।—জন হেলম।

☆ ফরেস্ট কোনো জয় ছাড়া ছয়টি ম্যাচ হেরেছে।—ডেভিড কোলম্যান।

☆ সবুজ আর সাদা পোশাকে স্পোর্টিং লিসবন দলকে দেখাচ্ছে একদল জেব্রার মতো।—পিটার জোস।

☆ কী অদ্ভুত! স্লো মোশন রিপ্লেতে বলটাকে

আরও বেশি সময় যাবৎ শূন্যে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।—ডেভিড অ্যাকফিল্ড।

☆ মাথা দিয়ে বলটি হেড করলেন জন ক্লার্ক।—ডেরেক রে।

☆ গোল করার সামর্থ্য না থাকলে কেউ ৮৬ ম্যাচে ৬৪ গোল করতে পারে না।—আলান গ্রিন।

☆ খেলার স্কোর ১-১। গতকালের ঠিক উল্টো।—রেডিও ফাইভ লাইভ।

☆ ১-০ জেতার মতো কোনো স্কোর নয়। কোনো অবস্থাতেই না।—ইয়ান হল।

☆ গোল করা আর পাস করা ছাড়া গিগস আর কিছুই করেনি।—টম টাইরেল।

☆ তিনি যদি জর্জ বেস্ট না হন তাহলে কেউই না।—ক্লিভ টাইলডেসলি।

☆ ব্রাজিল ২, স্কটল্যান্ড ১। যেখান থেকে খেলা শুরু করেছিল, সেখানেই আবার ফিরে গেল স্কটল্যান্ড।—ব্যারি ডেভিস।

☆ প্রথমার্ধে ৪ গোল দিয়ে হাফ টাইমে ব্রিস্টল রোভার্সের স্কোর ছিল ৪-০।—টনি অ্যাডামসন।

☆ ডেনমার্কের ভক্তদের দেখাচ্ছে বড় এক বোতল জেলির মতো।—ব্যারি ডেভিস।

☆ ১৯ বছর বয়সের তুলনায় অনেক ভালো খেলছেন এই তরুণ। কারণ, তাঁর বয়স এখন ২১।—ডেভিড বেগ।

☆ আর্সেনালের হাতে প্রচুর সময় আছে শেষ কয়েক সেকেন্ডে চিৎকার করার জন্য।—পিটার জোস।

☆ ভিলার দুজন গোলদাতারই জন্ম লিভারপুলে। ঠিক তাঁদের ম্যানেজারের মতো। ম্যানেজারের জন্ম বার্কেনহেডে।—ডেভিড কোলম্যান।

☆ এই সহস্রাব্দে আমার দেখা সেরা গোলগুলোর মধ্যে এটি একটি।—টনি গুবা।

☆ এবং টুর্নামেন্ট থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে তারা হতে চলেছে উড়োজাহাজে ফ্রান্সের সঙ্গী।—ক্লিভ টাইলডেসলি।

☆ সবাই বলে, ফুটবল হলো একটি স্ক্রিপ্টবিহীন নাটক। নিঃসন্দেহে আজকের ম্যাচ সেই স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করেনি।—কনর ম্যাকনামারা।

☆ ডেনমার্ক ৩, ডেনমার্ক শূন্য।—ইয়ান ব্রাউন।

☆ মার্টিন ও'নিল কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন আর দুই গালে আঁচড়

কাটছেন।—মাইক ইংহ্যাম। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০১০

435) আষাঢ় মাসের বিশ্বকাপ

কার্লোস বোকানেগ্রা বুঝতেই পারছেন না মাঠে নেমে কেন কষ্ট করতে হবে। এমনিতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এবার হাড়কাঁপানো শীত। এই শীতে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করার চেয়ে হোটেল রুমে বিয়ার খেতেই যত মজা। কিন্তু উপায় নেই। মাঠে নামতেই হবে। হোটেল লবিতে দেখা হয়ে গেল লেভন ডোনাভানের সঙ্গে। তাঁরও নাকি মাঠে নামতে ইচ্ছা করছে না। লেভন তো বলেই খালাস, কিছু করতে চাইলে তাঁকেই করতে হবে। কারণ, কার্লোসই দলের ক্যাপ্টেন। প্রেসিডেন্টকে সরাসরি ফোন করা ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছেন না কার্লোস। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই ফোন করলেন তিনি। পরিচয় দিতেই হোয়াইট হাউসের এইড কনিকা লিউনস্কি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কানে ফোনটা দিলেন। কার্লোস তীব্র ঠান্ডায় ৯০ মিনিট ধরে খেলা যে উচিত না, সে কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বোঝালেন খানিকক্ষণ। প্রেসিডেন্ট এমনিতেও বেশি কথা বলেন না। এবারও কিছু না বলে পুরোটা ধৈর্য ধরে শুনলেন। ফোন রাখার আগে কেবল বললেন, ‘দেখি কী করা যায়।’ ফোন রেখে কার্লোসও খানিকটা হতাশ হলেন। প্রেসিডেন্ট কিছু করবেন বলে মনে হলো না। এখন যদি বুশ প্রেসিডেন্ট থাকতেন, কোনো কথাই ছিল না। এক আদেশে কাজ হয়ে যেত। এমনকি চাইলে না খেলেই হতে পারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। মন খারাপ করে ফিরে এলেন হোটেলে। তাঁদের প্রথম খেলাই আবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে হারতে হবে ভাবতেই মনটা খারাপ হলো কার্লোসের।

২.

নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় প্রেসিডেন্টকে। আফগানিস্তান ও ইরাক তো আছেই। প্রতিদিন রুটিন করে ইরান পরিস্থিতি জানতে হয়। আরও আছে উত্তর কোরিয়া। এসব কারণে কার্লোসের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিলেন কনিকা লিউনস্কি। আর তখনই খবর নেওয়া শুরু করলেন তিনি। ডেকে পাঠালেন নিজের উপদেষ্টা ও সহকারীদের। জানতে চাইলেন বিশ্বকাপ ফুটবলের সর্বশেষ

পরিস্থিতি। কিন্তু ততক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেছে আর ইংল্যান্ডের কাছে গোলও খেয়ে গেছে একটা। বারাক ওবামা হটলাইনে ধরতে বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে।
কথাবার্তা হলো এ রকম—

ওবামা: আমরা সব কাজে একসঙ্গে থাকি। একসঙ্গে যুদ্ধ করি, সব সিদ্ধান্ত একযোগে নিই। আর খেলার মাঠে কিনা আমরা হেরে যাব?
ক্যামেরন: ৪৪ বছর পর আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে মাঠে নেমেছি। তা ছাড়া গোলও করেছি। এখন যদি হেরে যাই, তাহলে মানুষ কী বলবে!
ওবামা: হারার দরকার নেই। সব কাজে আমরা একসঙ্গে থাকি, এখানেও তা-ই হোক। আর যুক্তরাষ্ট্র তো সর্বদা সব কাজে ইংল্যান্ডকে সহায়তা দেবেই।

ক্যামেরন: ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।
ফোন রেখে ওবামা বললেন টেলিভিশনটা খুলতে, খেলা দেখবেন। দেখতে দেখতে কনিকা লিউনস্কিকে বললেন কীভাবে ফুটবল খেলা হয়, বুঝিয়ে দিতে। রবার্ট গ্রিনের হাত থেকে বলটা গড়িয়ে যেতেই ওবামা আবারও হটলাইনে ডেভিড ক্যামেরনকে ধরতে বললেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদটা নগদ নগদই দিয়ে দিতে চান। ৩.

এবার সবাইকে নিয়ে বসেছেন বারাক ওবামা। এর মধ্যে ফুটবল খেলাটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছেন। বৈঠকটা হলো এ রকম—
বারাক ওবামা: বলতে দ্বিধা নেই যে, ফুটবলটা আমি ভালো বুঝতাম না। কিন্তু এখন মোটামুটি জানি। তার পরও কিছু তথ্য আগে আমার জানা প্রয়োজন। সবার আগে বলেন, আমরা কবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

সহকারী: একবারও না, মি. প্রেসিডেন্ট। প্রথম আসরে আমরা তৃতীয় হয়েছিলাম, তাও ১৯৩০ সালে। আর ২০০২ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে।
ওবামা চিৎকার করে উঠলেন: হোয়াট!
আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতামানব দেশ। আমরা যা বলি, সেভাবে সব চলে।
আমরা চালাই বিশ্ব। আর আমরা চ্যাম্পিয়ন না এই সামান্য ফুটবল খেলায়? সোভিয়েত ইউনিয়ন কবার হয়েছিল?

: একবারও না।

: ইরাক আর ইরান?

: একবারও না।

এবার একটু শান্ত হলেন ওবামা। বললেন,
'তাহলে কারা কারা চ্যাম্পিয়ন হয় এই খেলায়।'

: মি. প্রেসিডেন্ট, ব্রাজিল পাঁচবার।

ওবামা: এখানেও ব্রাজিল? ডব্লিউটিওতে ব্রাজিল,
ইন্ডিয়া, চীন আর দক্ষিণ আফ্রিকা বড়ই যন্ত্রণা
করে। এখানেও কি ওরা একজোট?

: না, মি. প্রেসিডেন্ট। ইন্ডিয়া আর চীন ভালো
ফুটবল খেলে না। আর দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাগতিক
দেশ। ওদের নিয়ে চিন্তা নেই।

ওবামা: তাহলে ব্রাজিল ছাড়া আর কে কে
আছে?

মি. প্রেসিডেন্ট, ইতালি চারবার চ্যাম্পিয়ন। ওরা
এবার প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছে। জার্মানি
প্রথম খেলায় খুব ভালো খেললেও পরের খেলায়
হেরেছে। আর ফ্রান্স তো বাতিলের তালিকায়
চলে গেছে। আর আছে আর্জেন্টিনা ও স্পেন।
বাকিদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

সব শুনে বারাক ওবামা আপাতত বৈঠক
মুলতবি করলেন। ৪.

অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন কনিকা
লিউনস্কি। তিন দিন ধরে ভাবছিলেন কথাটা
বলা দরকার। কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না। আজ
সুযোগ পেয়ে তিনি বলেই ফেললেন কথাটা, 'মি.
প্রেসিডেন্ট, যতই যা করেন, আমাদের
প্লেয়ারদের তো মাঠে নামতে হবে। মাঠে
নামলেই তো আর পারবে না। এভাবে হবে না।
অন্য কিছু করুন।'

বারাক ওবামা চিন্তিত হলেন। তাহলে কি তাঁর
সময়ে নিজের দেশ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না?
না পারলে কিসের প্রেসিডেন্ট তিনি?

বুদ্ধিটা দিলেন কনিকা লিউনস্কি। ৫.

ঘোষণাটা তৈরি করল ফিফাই। ড্রাফটটা এখন
ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্ল্যাটারের টেবিলে।

সেখানে লেখা আছে, 'এখন থেকে নতুন নিয়মে
বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। পাঁচবার
চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ব্রাজিলকে আর খেলতে হবে
না। অন্য দলগুলো খেলবে। যারা চ্যাম্পিয়ন
হবে, তাদের খেলতে হবে ব্রাজিলের সঙ্গে।

তখন যে দল জিতবে, সে-ই হবে বিশ্ব
চ্যাম্পিয়ন। আর সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে
ইরাকে। ইরাকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা উদ্যাপন
এবং ইরাক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে ইরাকে

খেলাটা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ড্রাফটটার দিকে ঝুঁকুঁকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। স্বস্তি পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে আরও কিছু ঘটবে। অস্থিরতা কমিয়ে ঘটনার অপেক্ষায় বসে রইলেন তিনি।

ফোনটা এল আরও এক ঘণ্টা পর। ফোনটা রেখে সেপ ব্ল্যাটার ড্রাফটটা হাতে নিলেন। ব্রাজিল কেটে সেখানে লিখলেন যুক্তরাষ্ট্র।

অস্থিরতা কমল তাঁর। শওকত হোসেন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০১০

436) সামনে আসছে শুভদিন রিমোট-টিভির দখল নিন

কদিন পরই শেষ হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল। আহা! পুরো একটা মাস পিচ্চি থেকে বুড়ো—সবার আলোচনার প্রধান বিষয় হিসেবে ছিল এই বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাচ্ছে; এটা ভেবে মানুষের মন খারাপ হতেই পারে। মনের মধ্যে তো আর ফরমালিন দেওয়া নেই যে দিনের পর দিন ভালো থাকবে। তবে সবার মন কিন্তু খারাপ হচ্ছে না। বিশ্বকাপ শেষ—এটা ভেবে অনেকেই ব্যাপক আনন্দিত। বিশেষ করে দেশের আপামর গৃহিণী, তরুণী এবং বুয়া সমপ্রদায়। দীর্ঘ এক মাস টিভি রিমোটের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্বই ছিল না। বাড়ির ক্রীড়াপ্রেমী সদস্যদের হুমকির মুখে ফুটবলের মতো বাজে একটা খেলা বসে বসে দেখতে হয়েছে। একগাদা লোক দৌড়াদৌড়ি করে বলটা জালে ঢোকাতে চায়। একবার কেউ জালে ঢোকালে আরেকজন আবার সেটাকে বের করে আনে। এটা কোনো খেলা হলো? অথচ টিভির হিন্দি সিরিয়াল না দেখে ফুটবলপ্রেমী সদস্যদের এই অন্যায়-অত্যাচার তারা মুখ বুজে সহ্য করেছেন। সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকার পোশাক না দেখে ফুটবলারদের জার্সি দেখেছেন।

আবেগঘন সংলাপের বদলে শুনেছেন ভুভুজেলার পোঁ পোঁ শব্দ। কিন্তু আর না। মাসের বেতনের মতো বিশ্বকাপও শেষ হয়ে আসছে। তাই এখনই টিভি রিমোটের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এসব জিনিস দ্রুত করতে হয়। সরকার বিভিন্ন শক্তিশালী বাহিনী থাকার পরেও বুড়িগঙ্গা দখলমুক্ত করতে পারছে না। আর তাদের তো কোনো বাহিনীই নেই। দখল করা জিনিস উদ্ধার করা যে কত

কঠিন, তা তাদের অজানা নয়। হোক না সেটা সামান্য টিভির রিমোট, তাতে কী, কোনো কিছুই ছোট করে দেখা ঠিক নয়। প্রস্তুতি নিন যার যা আছে তাই নিয়ে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৫, ২০১০

437) অভিনয়শিক্ষা

আমার আদ্যিকালের বন্ধু কমোরা অভিনয় বিভাগের শিক্ষক। নিজের পেশার প্রতি তার অবিচল ও সনিষ্ঠ মনোযোগ। যখন সে কাজে মগ্ন, পৃথিবীর সবকিছু সে ভুলে যায় এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে মধ্যরাত অবধি। দিন কয়েক আগে টুঁ দিলাম ওর ওখানে রাত নয়টার দিকে। ভেবেছিলাম বিয়ারপানের দাওয়াত দেব। গিয়ে দেখি, বরাবরের মতোই এক রিহার্সেল স্টেজের পাশে ঘর্মান্ত অবস্থায় প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে নানাবিধ ইশারা করে ১২-১৪ জন যুবক প্রতিভাকে ট্রাজিক দৃশ্যে অভিনয়ের শিক্ষা দিচ্ছে। এই ছেলেগুলোকে দেখো—ফিসফিস করে ও বলল আমাকে, এমন অপদার্থ গ্রুপের সঙ্গে আগে আর কখনো আমাকে কাজ করতে হয়নি। দেখলাম, সত্যিই তাই। সুঠামদেহী যুবকেরা, যাদের প্রত্যেকে চাইলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করতে পারে। অমানুষিক ব্যথা-বেদনা আর কষ্টের অভিব্যক্তি চেহারায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকেই আনাড়ির মতো পড়ে যাচ্ছে স্টেজের ওপরে। ঠিক যেন বজ্রাহত, কোঁকাচ্ছে আড়ষ্টের মতো। স্বাভাবিকতার লেশমাত্র নেই তাতে। মৃগী রোগীর মতো খিঁচুনি দিয়ে কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায় এবং মারা যাচ্ছে সুনিপুণ অদক্ষতার সঙ্গে। অমন দেখতেও লজ্জা লাগে। না, না, না—চিৎকার করে বলল কমোরা। চলবে না! বেজায় কাঁচা কাজ। দর্শকেরা বুঝে ফেলবে। তারা সব ঠিকঠাক বুঝতে পারে। তারা সব সময় সন্দেহপ্রবণ। তাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে, এটা অভিনয় নয়। খিঁচুনি দিতে হবে আরও আবেগসহকারে। মন দিয়ে কাতরাও, যন্ত্রণায় চিৎকার করো। কেমন ট্রাজিক পরিবেশে তোমাদের এই অভিনয় দেখাতে হবে, তা কি তোমরা কল্পনা করতে পারছ? তোমাদের ভয়ংকর প্রতিপক্ষ আঘাত করল নির্দয়ভাবে, আর তোমরা শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছ অসহনীয় যন্ত্রণায়। তোমরা

এখনো সবাই যুবক, তোমাদের মৃত্যুর সময় এখনো ঘনিয়ে আসেনি বটে, কিন্তু অভিনয়ে দেখাতে হবে, মৃত্যুর দেরি নেই আর। যুবকেরা ঘর্মান্ত অবস্থায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হয়তো ভাবতেও পারেনি, খ্যাতিমান হওয়ার পথটি এত বন্ধুর। কমোরার ইঙ্গিতে আবার শুরু হলো রিহার্সেল। যথেষ্ট হয়েছে— একসময়ে বলে উঠল সে। বাড়িতে গিয়ে আয়নার সামনে অনুশীলন করবে সবাই। তোমার ধারণা, এদের দিয়ে কিছু হবে?—রিহার্সেলের পর বাইরে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম কমোরাকে।

স্টেজে অবশ্যই কিছু হবে না ওদের দিয়ে— সম্মতির সুরে কমোরা বলল। হবে ফুটবল মাঠে। ‘ভিষ্টোরিয়া’ ক্লাবের ফুটবলারদের জন্য এটা বিশেষ কোর্স। এর্নস্ট রিল: জার্মানির লেখক ভাষান্তর: মাসুদ মাহমুদ সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৫, ২০১০

438) জাবুলানি - আবু সুফিয়ান

এত দিন জানতাম, ফুটবলের নম্বর থাকে। বলের সাইজ অনুযায়ী নম্বর হয় ২ নম্বর, ৩ নম্বর, ৪ নম্বর, ৫ নম্বর! এবারই প্রথম জানলাম, এখন ফুটবলেরও নাম থাকে। যেমন, এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের একটা আলাদা নাম রাখা হয়েছে—জাবুলানি। জাবুলানি মানে কী? বিশ্বকাপ ফুটবল যাঁরা খেলছেন, তাঁদের জাবুলানির অর্থ নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু সব দলের গোলরক্ষকেরই সব দুশ্চিন্তা এই জাবুলানি নিয়ে। কারণ, অনেকেই অভিযোগ করেছেন, জাবুলানি তৈরিতে কোনো একটি কারিগরি ত্রুটি আছে। গোলরক্ষকেরা সহজে এটাকে গ্রিপে ধরে রাখতে পারছেন না! ছুটে যায়।

আমার কথা হলো, না পারলে নেই। এতে যদি দর্শক বেশিসংখ্যক গোল দেখতে পারে, সেটাই বরং ভালো।

২.

আমি বিশ্বকাপ ফুটবল দেখি ১৯৮২ সাল থেকে। সেই হিসাবে এটা আমার অষ্টম বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে আমাদের উৎসাহ আর আয়োজন ছিল ব্যাপক। খেলা দেখতাম দলবেঁধে। আমাদের সেই দলের সবচেয়ে উৎসাহী দর্শক ছিলেন আমার মামাতো ভাই, যিনি পেশায় স্কুলের সহকারী শিক্ষক। ব্রাজিলের

একনিষ্ঠ সমর্থক। সেবার ব্রাজিলের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের প্রথম খেলা। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের দেখেই তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। বললেন, ‘সব বাচ্চা প্লেয়ার। একজনেরও মুখে দাড়িগোঁফ উঠে নাই। এরা পারবে?’ ব্রাজিলের তখনকার গোলকিপারের নাম ছিল তাফারেল। সেটি ছিল তাঁর তৃতীয় বিশ্বকাপ। সিনিয়র প্লেয়ার। মাথার চুলটুল পড়ে একটা ছোলা ভাব চলে এসেছে। তাফারেলকে দেখিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, ‘এই যে একজন সিনিয়র প্লেয়ার।’

তিনি আরও হতাশ হলেন। বললেন, ‘ইনি তো কুইচ্যা মুরগির মতো ঝোঁগা হয়ে গেছে। আমার ভয়ই লাগে, কখন পট করে গোল খেয়ে যায়। বুড়া মানুষে ভরসা কম!’

ভাগ্য ভালো, তখন জাবুলানি ছিল না। বুড়া গোলকিপারের জন্য এই বল ধরা তাহলে আরও কঠিন হতো। ব্রাজিলিয়ানদের চেয়ে স্কটিশরা অনেক হেভি। বয়সী। সেটা মাস্টার সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বাড়াল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, খেলা শুরুর চতুর্থ মিনিটেই ব্রাজিল গোল করে ফেলল। মামাতো ভাই উত্তেজনায় সোফায় লাফ দিলেন। সোফার পায়া ভেঙে গেল। তিনি পা মচকে ফেললেন। ব্যথা ভুলে গিয়ে বললেন, ‘সব ধাননা (ধানি) মরিচ। বারুদ ভরা। জিল-জিল-ব্রাজিল!’

বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলাগুলোতে তাঁকে খুব মিস করি।

এবার ব্রাজিল-আইভরিকোস্ট খেলার আগে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘খেলা দেখবেন না?’

উত্তরে জানালেন, তিনি দল বদল করেছেন। ব্রাজিল এখন আর তাঁর ফেবারিট না। বর্তমানে তাঁর প্রিয় দল হচ্ছে আর্জেন্টিনা। আমি অবাক হলাম। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলেও যে দলবদল ঘটতে পারে, আমার ধারণায় ছিল না।

৩.
বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে আগে অনেক মাতামাতি হতো। খেলা নিয়ে আলোচনা হতো। ঘরের মধ্যে পিতামাতা-ভাইবোন-আত্মীয়দের মধ্যে দলাদলি হতো। বাজি হতো। খাওয়াখাওয়ি হতো। পাড়া-মহল্লায় খেলাকে কেন্দ্র করে জটলা

হতো। আড্ডা হতো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, রাতে চুরি-ছিনতাই প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। সবাই মেতে থাকত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার উৎসবে। সেসব খবর পত্রিকায় আসত। এবার পত্রপত্রিকায় প্রচুর পতাকার ছবি ছাপা হয়েছে। প্রিয় দলের পতাকা কে কত বড় করে বানিয়েছে, সেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। পত্রিকার ছবি বা খবর দেখে তার চেয়ে বড় পতাকা বানানোর প্রতিযোগিতাও হয়েছে। সেই খবরও সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। আবার কিছু পেছনের খবর আসেনি। আমার এক ছোট ভাই পুরান ঢাকার ভজহরি সাহা স্ট্রিটে থাকে। নাম আকাশ। চিনিকলের পার্টসের ব্যবসা করে। পতাকাওয়ালারা তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। সে নিরুপায় হয়ে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা দিতে সম্মত হয়েছে। তার কথা হলো, ‘খেলা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সে জন্য বাংলাদেশে বসে আমি পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দেব কেন? টাকা তো গাছের পাতা না যে, ঝাঁকি দিলে পড়বে।’ তারা ৫০০ টাকা নেয়নি। ভ্রমকি দিয়েছে। চাঁদাবাজদের ভয়ে গত শুক্রবার রাতে সে এলাকায় আর ফিরে যায়নি। কাফরুলে আরেক লোক ৫০ টাকা চাঁদা দিয়ে বেইজ্জতি হয়েছেন। এলাকায় অনেকেই তাঁকে ‘কণ্ডুস মাখখি চুষ’ বলে আড়ালে নিন্দা করে। কৃপণতার কারণে তাঁর কাছে ‘চান্দা পাড়ি’র সর্বনিম্ন রেট ছিল ৫০০ টাকা। ৫০ টাকা দেওয়া মানে তাদের অপমান করা। সে জন্য তারাই চাঁদাদাতাকে গালিগালাজ করে মানহানি করেছে। এ রকম আরও কিছু ঘটনা শুনেছি। জেনেছি। এই চাঁদাবাজির ব্যাখ্যা কী হতে পারে? ফুটবল জাবুলানি নিয়ে যেমন বিশ্বকাপের গোলকিপাররা বিপদে আছেন, তেমনি বড় দলগুলো ফাইনালে উঠলে চাঁদাবাজদের এই বিপদ আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। দেখা যাক কী হয়!

অনেক পাঠকই হয়তো কৌতূহলী হবেন, এত কিছু থাকতে ফুটবলের নাম জাবুলানি রাখা হলো কেন?

‘জাবুলানি, সাউথ আফ্রিকান শব্দ, যার অর্থ উদ্যাপন।

অনেক এলোমেলো কথা বলে ফেলেছি। আসুন,
আমরা সবাই বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০ উদ্যাপন
করি! আনন্দ করি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
জুলাই ০৫, ২০১০

439) বলাবলি - জাউর বলকোয়াদজে

এক তরুণ লেখকের সঙ্গে দেখা হলো
আমার। ‘আমার নতুন গল্পটি তোমাকে পড়ে
শোনাই?’ বলল সে।
‘অবশ্যই,’ বললাম আমি।
‘কেমন লাগল?’ বলল সে পড়া শেষ করে।
‘আমি তোমাকে সত্যি কথাটাই বলব,’ বললাম
আমি।
‘বলো,’ বলল সে।
‘প্রথমত, তোমার লেখার প্রতিটি লাইনেই “বলল
সে” আর “বললাম আমি”,’ বললাম আমি।
‘কোনো ক্ষতি তো নেই যদি লিখি “বললাম
আমি” আর “বলল সে”,’ বলল সে।
‘গল্পের কাহিনিও তেমন কিছুই বলে না,’
বললাম আমি।
‘আমার যা বলার, গল্পেই বলেছি,’ বলল সে।
‘অমন কিছু বলার চেয়ে কিছু না বলাই ভালো,’
বললাম আমি।
‘তোমার মতো রুচির লোকের সম্পর্কে কী আর
বলব!’ বলল সে।
‘যা মাথায় এসেছে, তা-ই বলেছি,’ বললাম
আমি।
‘তুমি যে একটা আহাম্মক, লোকজন ঠিকই
বলে!’ বলল সে।
‘কী বললে? আবার বলো!’ বললাম আমি।
‘যা বলেছি, তা-ই বলেছি,’ বলল সে।
‘আর একটা শব্দও যদি বলেছ!’ বললাম আমি।
‘একটা কেন, অনেকগুলো বলব,’ বলল সে।
‘এমন ইডিয়টকে কী আর বলব!’ বললাম আমি
মনে মনে। এখন আপনারাই বলুন, আমি কি
ওকে মিথ্যে বলেছি? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
জুলাই ১২, ২০১০

440) রাতকানা

এক বিধবা বুড়ির ছিল মোটে একটাই ছেলে।
ভাগ্যের লিখনে সেও ছিল রাতকানা। তবে তার
বিয়েভাগ্য ছিল খুব ভালো। ভালো ঘরের সুন্দরী
দেখে একটা মেয়েকে সে বিয়ে করে।
তো, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্ন এসেছে।
তিন দিন দুই রাত থাকতে হবে। মা মহা

ভাবনায় পড়ে। ছেলেকে বলে, দিন ফুরোলেই কিন্তু তুমি বাছা চোখে দেখো না। তাই রাতে বেরোবে না।

শ্বশুরবাড়ি তার দিন থাকতেই পৌঁছানোর কথা। কিন্তু ফেরিঘাটে এসে দেখে ফেরি নষ্ট। তা ঠিক করতে দেরি হয়ে যায়। তাই শ্বশুরের গ্রামে পৌঁছাতে সাঁঝ পেরিয়ে যায়। চোখে তখন সে ঝাপসা দেখছে। মা যে সাবধান করে দিয়েছে সে কথা মনে করে, কী করা যায় তা-ই ভাবতে বসল। কিন্তু চোখে তো দেখে না। তাই বসবি তো বস একেবারে শ্বশুরবাড়ির ময়লা ফেলার আস্তাকুঁড়ে। এমন সময় শাশুড়ি এক ঝাঁকা ময়লা নিয়ে এসে ফেলেছে জামাইয়ের মাথার ওপরে। শাশুড়ি তো জানে না যে নতুন জামাই এসে তাদের ছাই আর জঞ্জালের গাদার ওপর বসে আছে। জামাই হায় হায় করে উঠতেই শাশুড়ি বুঝে ফেলেছে: সর্বোনাশ, এ তো জামাই। নতুন জামাইকে ঠাকুরপুজো করতে হয়—কিন্তু এ কী হলো? শাশুড়ি লজ্জায় মুখ ঢেকে বাড়ির দিকে ছুটল।

পথে ছেলের সঙ্গে দেখা। সে মোষ চরিয়ে বাড়ি ফিরছিল। মা ছেলেকে বলে, বাছা! মোষ আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোর জামাইবাবু এসেছে। কেন জানি আমাদের ময়লার টিবিতে বসে আছে। পেছাপটেছাপ করতে বসেছিল বোধহয়। আমি না দেখে সব ময়লা জামাইয়ের মাথায় ঢেলে দিয়েছি। নিশ্চয়ই রাগ করেছে খুব। জলদি যা, বুঝিয়ে-ভাজিয়ে নিয়ে আয়। ছেলে গিয়ে দেখে, জামাইবাবু তখনো গাদার ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

ছেলে: জামাইবাবু, ওখানে কী করছেন? বাড়িতে আসুন। রাগটাগ নাকি?

জামাইবাবু: আরে না। একটা হিসাব কষলাম। অনেকখানি জঞ্জাল। এ দিয়ে কয় মণ সার হবে! জামাইবাবু শ্যালকের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির দিকে যাচ্ছে। সামনেই কালো কালো মোষ দেখে বলে: ইস্ কী ঘন অন্ধকার যে ওই দিকে!

ছেলে: না, জামাইবাবু। ওগুলো আমাদের মোষ।

জামাই: বেড়ে মোষ তো। যত্ন-আত্তিতে অন্ধকারের মতো কালো কুচকুচে হয়েছে। জামাই ভাবে, একটা মোষের লেজ ধরি, তাহলেই মোষের পেছনে পেছনে বাড়িতে পৌঁছাব।

মোষটা ছিল তেজি। জামাইকে এক ঝটকায় মাটি কাটা খাদায় ফেলে দেয়।

ছেলে: কী হলো জামাইবাবু, চোখে কম দেখেন নাকি?

জামাই: আরে না। খাদের গভীরতা দেখছিলাম।

বাড়িতে ওই রকম একটা খাদ বানাব কিনা।

তো আমার হাতটা ধর তো, ওপরে উঠি।

ওপরে উঠে সীমানা-দেয়াল ধরে এগোয় জামাই।

শালা বলে, অমন করছেন কেন? কিছুই যেন ঠাহর করতে পারছেন না। চোখ তো আপনার যাচ্ছেতাই খারাপ মনে হচ্ছে।

আরে বোকা, এ কথা তোর বুদ্ধিতে এল।

তাদের সদরের পাঁচিলটা কতখানি লম্বা তা-ই মেপে দেখছিলাম।

সদর দরজার কাছে গিয়ে একটা শিংওয়ালা ভেড়ার ওপর পড়ল জামাইবাবু। ভেড়াটা এক গুঁতোয় জামাইবাবুকে পপাত ধরগিতল করে ছাড়ল। জামাইবাবুকে হাসতে হাসতে টেনে তুলে শালাবাবু বলে, ও ঠিকই চিনেছে আপনাকে, তাই একটু ঠাটা করল।

জামাইবাবু: ভেড়াটাকে একটু আদর করতে চাইলাম। ও কিনা আমাকে মারল গুঁতো। ভালোই শিখিয়েছিস দেখছি।

রাতে খাবার আয়োজন। শাশুড়ি বেশ সেজেগুজে পরিবেশন করতে আসছে। তার হাতের চুড়ি আর কোমরের বিছা ঝুমঝুম করে বাজছিল।

জামাই ভাবে: ভেড়াটাই বুঝি আসছে। আবার না গুঁতোয়। হাতের কাছে একটা ধামা পড়েছিল। তাই দিয়ে এক বাড়ি মারে শাশুড়ির গায়ে।

শাশুড়ি ভাবে, ছাইয়ের গাদায় জামাইয়ের মাথায় জঞ্জাল ঢেলেছিলাম—তার জন্যই বুঝি জামাই এ কাণ্ড করল। শাশুড়ি পালায়। বউ এসে খাওয়ায়। আর বলে: ছি! ছি! কী কাণ্ড! এত রাগ!

জামাই মনে করে আদরের ভেড়াকে মারার জন্যই এই ভর্ৎসনা। তাই বলে, ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়। যেমন গুঁতিয়েছে, তেমনি প্রতিশোধ নিলাম। বউ ব্যাপার না বুঝে হাঁ হয়ে থাকে।

জামাইবাবু মাঝরাতে উঠেছে প্রকৃতির ডাকে। হাতড়ে হাতড়ে কাজ সেরে পথ গুলিয়ে ফেলে শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাত দিয়ে বউ কোথায় শুয়েছে খুঁজছে। হাত গিয়ে পড়েছে

শাশুড়ির পায়ে। সে ধড়ফড় করে উঠে বসে বলে, কে? কে?

জামাই: আমি। আমি।

তুমি এ ঘরে! এত রাতে!

জামাই রাতকানা হলেও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে সরস। নিজেকে সামলে নিয়ে তাই বলে, খাবার আগে আপনাকে ধামা ছুড়ে মেরেছিলাম। এখন হুঁশ ফিরে এসেছে। তাই আপনার পা ধরে মাপ চাইতে এসেছি। আমায় মাপ করুন।

সকালে উঠেই জামাই বলে, আমার বাড়িতে ভীষণ কাজ। এখনই না গেলে সর্বনাশ।

এভাবেই রাতকানা জামাই বুদ্ধির জোরে ধরা খেয়েও বেঁচে যায়। শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত গ্রামবাংলার রঙ্গগল্প থেকে সংগৃহীত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১২, ২০১০

441) বৃষ্টি এসেছে কারও আষাঢ় (পৌষ) মাস, কারও সর্বনাশ

কোনো এক রহস্যময় কারণে মানুষ বৃষ্টি খুব পছন্দ করে। অনেককেই বেশ আয়োজন করে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখা যায়। বৃষ্টির পানি এমন বিশেষ কিছু নয় যে গায়ে লাগলে মাত্র ছয় সপ্তাহে রং ফরসা হয়ে যাবে। পানির স্বাদও লেবুর শরবত নয়, সাধারণ পানির মতোই। ওয়াসার পানির সঙ্গে বৃষ্টির পানির বেশ মিলও আছে। কোনোটাই সময়মতো পাওয়া যায় না। আর পার্থক্য হলো, ওয়াসার পানিতে ময়লা পাওয়া যায়, বৃষ্টির পানিতে পাওয়া যায় না। এ জন্যই বোধহয় মানুষ বৃষ্টির পানি এত পছন্দ করে। পছন্দ তো করবেই; কারণ অনেকের জন্যই বৃষ্টি বেশ লাভজনক। বৃষ্টির মৌসুম এলেই দেশের ছাতা, রেইনকোট ব্যবসায়ীদের মুখে সুন্দর একটা হাসি দেখা যায়। বৃষ্টিতে ভিজে অনেকেরই জ্বর চলে আসে। আর তাই চিকিৎসকদের মুখে আসে মুচকি হাসি। দেশের কর্তৃপক্ষ কেন যেন বৃষ্টির মৌসুমেই রাস্তা কাটা শুরু করে। ফলে ঠিকাদারদের আনন্দের কোনো সীমা থাকে না। কিন্তু এই বৃষ্টিই অনেকের সর্বনাশের কারণ। বৃষ্টির সঙ্গে জ্যামের কেমন যেন একটা সম্পর্ক আছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি জমে জ্যাম-ট্যাম লেগে বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়। মানুষ পড়ে দুর্ভোগে। বৃষ্টি হলে রিকশাচালকেরা যাত্রীদের পাত্তাই দিতে চায় না। পায়ের ওপর পা তুলে বলে, ‘যামু না!’

আর যেতে রাজি হলেও ভাড়া বাড়িয়ে দেয়। আরও কত সমস্যা। এত কিছু পরও মানুষ কেন বৃষ্টি পছন্দ করে, তা নিয়ে এখন পর্যন্ত উচ্চপর্যায়ের কোনো গবেষণাই হয়নি। দেশের গবেষক সমাজ করছেটা কী? দেশে মাছির সংখ্যা কমলেও বোঝা যেত, তারা বসে বসে মাছি মেরেছে। তাও তো কমেনি। এতেই বোঝা যায়, দেশে কোনো গবেষণাই হচ্ছে না। মানুষ কেন বৃষ্টি পছন্দ করে, কেন বৃষ্টির মৌসুমেই রাস্তা কাটা হয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন সত্য হয় না—এগুলো নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। অতএব, কর্তৃপক্ষের উচিত বৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে জনগণের সামনে এর প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৯, ২০১০

442) পথ চেয়ে থাকা - এজি বিলেভিচ

রাত বাজছে একটা! অথচ এল না এখনো। হয়তো জরুরি মিটিং। হয়তো আবার ফার্নেস চুল্লি নিয়ে যাচ্ছে কোথাও। অথবা চুল্লির উনুন মেরামত করছে। কী যে ফালতু সব কাজ! যেন সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যায় না! সোয়া একটা। হায় ঈশ্বর! আমি কি দুর্বলচিত্ত, বোকা মেয়ে বনে যাচ্ছি? মনটা শক্ত করতে হবে। আসুক আগে! ওর পরনের কাপড়চোপড় শুঁকে অন্য মেয়ের পারফিউমের গন্ধ খুঁজব না, পকেট হাতড়াব না, দেখব না মানিব্যাগ খুলেও। একটা পঁচিশ। এই বদমায়েশটাকে আমি কী জন্য ভালোবাসি? মিথ্যুক! অসভ্য! নির্লজ্জ! শেভ করা না থাকলে শজারুর মতো কাঁটা-কাঁটা গাল! আর শেভ করলে ব্রণ! দেড়টা। স্বাভাবিক থাকতে হবে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হলে চলবে না। প্লেট-গ্লাস ভেঙে স্ক্যান্ডাল না করাই ভালো—বড্ড বেশি খরচ পড়ে যায়। পৌনে দুটো। লম্পট! এখন যদি সে আসে এবং বরাবরের মতো সম্ভাষণ জানিয়ে বলে, ‘হ্যালো, ইরিনা!...’ আমি হাই তুলে নিরাসক্তের মতো বলব, ‘ও, তুমি...!’ কাছে ভিড়তেও দেব না। রাত দুটো। ও এখনো এল না। বোঝা গেছে—গত বৃহস্পতিবারের মতো আজও নিশ্চয়ই রাত কাটাচ্ছে বউয়ের সঙ্গে! ভাষান্তর: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৯, ২০১০

443) বৃষ্টি - আদনান মুকিত

মানুষের মন বোঝা বিরাট ঝামেলার কাজ।
কখন যে কী ভালো লাগে, কিছুই বোঝা যায় না। এই যেমন বৃষ্টি। মানুষ সব সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। আকাশ থেকে টপাটপ বিমান নামছে, অথচ একফোঁটা বৃষ্টি নামছে না—মানুষ এটা মেনে নিতে চায় না। অনেকে তো ‘আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে...’ গান গেয়ে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করে। অথচ বৃষ্টি নামলে তারা আবার বিরক্তও হয়। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, একটু বৃষ্টি নামল, ব্যস, পাবলিকের মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। দূর, খেলার ক্রিটিক্যাল সময় বৃষ্টি নামার কী দরকার ছিল? বৃষ্টিকে নামতে কে বলেছিল? (ভাব দেখে মনে হয় বৃষ্টি তাদের চারতলায় থাকা একটা বাচ্চা মেয়ে, বড়দের কথা না শুনে হঠাৎ নিচে নেমে এসেছে)
বাথরুমের পানির কল বন্ধ করা গেলেও পাবলিকের মুখ সহজে বন্ধ করা যায় না। কিন্তু খেলায় প্রিয় দল বিপদে পড়েছে, একমাত্র বৃষ্টিই পারে দলকে বাঁচাতে—এমন অবস্থা হলে সবাই আবার বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। এই যুগে কেন তানসেনের মতো শিল্পী নেই তা নিয়ে অনেকের আফসোসের শেষ থাকে না। তানসেন ছিলেন ঐতিহাসিক প্রতিভা! তিনি নাকি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারতেন। তবে বর্তমান যুগের শিল্পীরা আরও বড় প্রতিভা। তাঁদের উদ্ভট সব গান শুনে রাগে-দুঃখে মানুষের চোখ দিয়ে যে পানি পড়ে, তাকে বৃষ্টি বললে এখনকার শিল্পীরাও বৃষ্টি নামাতে পারেন। পার্থক্য একটাই—তানসেন আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতেন, এখনকার শিল্পীরা নামান চোখ থেকে।

এ তো গেল খেলার কথা। এমনিতে বৃষ্টি খুব চমৎকার একটা অজুহাত। বৃষ্টিতে ঢাকার রাস্তা যেমন পানিতে ভরে যায়, স্কুলে যাওয়ার ঠিক আগে ঝুমবৃষ্টি হলে ছেলেমেয়েদের মনও সেই রকম খুশিতে ভরে যায়। কী মজা, স্কুলে যেতে হবে না! পরদিন ভয়ে ভয়ে স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, বৃষ্টির কারণে গতকাল স্যারই আসেননি। একটু বৃষ্টি হলেই ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা জলাশয়ে পরিণত হয়। ‘স্যার, বাসার সামনে গলার টনসিলসমান পানি, আজকে অফিসে আসতে পারছি না’—এই কথা বলে বাড়ির কর্তা নিশ্চিন্তে অফিস ফাঁকি দিয়ে ইলিশ-খিচুড়ি খান। কেউ

কেউ আবার বাচ্চাকে কাঁধে তুলে রাস্তার পানি দেখাতে নিয়ে যান। সেই পানি দেখে বাচ্চারা বুঝতে পারে পাঠ্যবইয়ে কেন লেখা ‘নদীমাতৃক বাংলাদেশ’। ‘ভাই, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে?’ ‘বৃষ্টি তো বাইরেই হয়, আপনাদের ওখানে ঘরের ভেতর বৃষ্টি হয় নাকি?’ বেশ প্রচলিত রসিকতা। তবে সবচেয়ে বড় রসিকতাটা করে আমাদের আবহাওয়া অফিস। এমনতেই রসিক হিসেবে বাঙালি জাতির সুনাম আছে। সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে রসিক আবহাওয়া অফিসটাও আমাদের দেশে। তারা যদি বলে আগামীকাল দেশে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে আগামীকাল কোনো বৃষ্টিই হবে না; ছাতা বা রেইনকোট সঙ্গে না নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন। যাত্রা শুভ। আর রোদের কথা বললে অবশ্যই ছাতা-রেইনকোট নিতে ভুলবেন না। বৃষ্টি আসবেই। মানুষ সব সময় দুই রকম কথা বলে। ব্যাটসম্যান ছক্কা না মারলে বলে, ‘গাধাটা মারে না কেন! আরে ব্যাটা, সামনে এগিয়ে পাগলা বাড়ি দে।’ কথা শুনে ব্যাটসম্যান পাগলা বাড়ি দিতে গিয়ে আউট হলে বলে, ‘গাধা, ছক্কা মারতে কে বলেছে? এই বলটা ঠেকাতে পারলি না!’ বৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রচণ্ড গরমে বাসের ভেতর ভিড়ের মধ্যে মানুষ বলে, ‘ইশ, একটু বৃষ্টি হলে গরমটা কমত!’ আসলে দেশ থেকে সব ভালো জিনিস ধমাদম উঠে যাচ্ছে। এসব কথা শুনে যদি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, তাহলেই হয়েছে। বাসের যাত্রীরা সবাই একযোগে জানালা বন্ধ করার প্রতিযোগিতা শুরু করবে। কেউ জানালা খুললেই রাগী ভঙ্গিতে বলবে, ‘জানালাটা বন্ধ করেন তো ভাই! আপনি ভিজতে চাইলে বাস থেকে নেমে গিয়ে ভেজেন, যান! মরার বৃষ্টি একেবারে ভিজিয়ে দিল।’ কোনো জানালা একটু ভাঙা হলে, কিংবা জানালা না থাকলে বাসের হেলপারকে গালি দেওয়া হবে: ‘ব্যাটা গর্দভ, জানালা যে ভাঙা সেটা আগে দেখবি না? ১৮ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন কিনেছি, বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজব নাকি?’ ‘আপনি কাকে কী বলছেন? ওই ব্যাটা হেলপারই তো জানালা খুলে বিক্রি করে দিয়েছে। ডান পাশ থেকে ব্যাটার চেহারাটা দেখেন, পুরা চোর চোর ভাব।’

‘নাহ, আগে দেশটা ধান-পাটে ভরা ছিল, এখন চোর-বাটপারে ভরে গেছে। পয়েন্টে পয়েন্টে চোর-বাটপার।’ বাংলা সিনেমার একটা অপরিহার্য উপাদান হলো বৃষ্টি। বাংলা সিনেমা হবে, আর বৃষ্টিতে ভিজে নায়ক-নায়িকা নাচ-গান করবে না, তা হয় না। খাঁ খাঁ রোদে নায়ক-নায়িকা নাচ-গান করছে, হঠাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে বজ্রপাতের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। যেনতেন বৃষ্টি নয়, একেবারে কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। বৃষ্টির দৃশ্য আরও আছে। গভীর রাতে ‘বেরিয়ে যাও’ বলে নায়কের গরিব মা-বাবাকে (সাধারণত সিনেমার সবচেয়ে ভালো চরিত্রটিকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়) বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ মা-বাবা রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রয়োগের মতো বৃষ্টি নামবেই। নায়িকা ভুল বুঝেছে (মতান্তরে ছাঁকা দিয়েছে) নায়ককে। বুকুর জ্বালা দূর করতে নায়ক মদের বোতল হাতে যদি কোনোভাবে রাস্তায় বের হয়, তাহলে অবশ্যই বৃষ্টি নামবে। নামতেই হবে। এগুলো হচ্ছে সূত্র। এই সূত্র ছাড়া পিথাগোরাসের উপপাদ্য হতে পারে, কিন্তু বাংলা সিনেমা হয় না। চৈত্র মাসের খরায় যখন বৃষ্টির অভাবে মাটি ফেটে যায়, তখন এই সূত্রগুলো কাজে লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না, তখন এলাকার সবচেয়ে ভালো মানুষকে গভীর রাতে ‘বেরিয়ে যাও’ বলে ঘর থেকে বের করে দিলে যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? বৃষ্টির প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে। আসলে, আমরা শুধু সিনেমা দেখি, আর সমালোচনা করি; বাংলা সিনেমা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে কত কিছু শেখানোর চেষ্টা করছে, আমরা কোনো পাত্তাই দিচ্ছি না। এ রকমই হয়। ভালো জিনিসের মর্ম কেউ বুঝতে চায় না। উন্নত দেশগুলোতে এই জিনিস একবার দেখালে তারা সব ভালো লোককে বৃষ্টি নামানোর কাজে নিয়োগ দিয়ে দিত। সম্ভবত আমাদের দেশে ভালো লোক নেই। থাকলে তো কখনো বৃষ্টির জন্য প্রার্থনাই করতে হতো না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৯, ২০১০

444) আষাড়ে স্বপ্ন - তুষার কণা

খন্দকার

এই তো, মাত্র কদিন আগে ইউরোপের আকাশ ছাই-মেঘে সয়লাব হয়ে গেল। আকাশে ওড়াউড়ি বন্ধ হয়ে বিমানগুলো তখন ঠায় মাটিতে বসা। বিমানের যাত্রী হিসেবে আমিও বার্মিংহামে বন্ধুর বাড়িতে গৃহবন্দী। ইংল্যান্ডে তখন নির্বাচনের নিঃশব্দ তোলপাড়। বন্ধুর বাড়িতে অলস বেলায় মন-প্রাণ ঢেলে নির্বাচনের লিফলেট পড়ি। এক সকালে একগাদা লিফলেট থেকে এক অদ্ভুত লিফলেট আবিষ্কার করলাম। সাদা-কালো অতিসাধারণ এক লিফলেটে প্রার্থীর হাসিমুখের ছবির পাশে উৎকীর্ণ বাণী—‘আমি আদি অকৃত্রিম কনজারভেটিভ। পার্লামেন্টে পাঠালে আমি ধন্বন্তরি আইন বানিয়ে দেশের অর্থনীতিতে তরতর বেগে প্রাণের বন্যা বইয়ে দেব। হে আমার প্রাণপ্রিয় ভোটারগণ, তোমরা লেবারদের বিশ্বাস করো না। ওরা এই দেশের অর্থনীতির বুকে শক্তিশেল মেরে দেশটাকে মাটির সঙ্গে বিছিয়ে দিয়েছে। তবে আমাদের আরডিংটন এলাকায় লোকাল কাউন্সিলর হিসেবে এই লেবার ব্যাটাকে ভোট দিয়ো। এই লেবার ব্যাটা নিজেও যোগ্য আর আরডিংটনের পার্কগুলোকে কুকুরের বর্জ্যমুক্ত রাখার কাজে ওর বুড়ি বউটা খুব নিরলস।’ হয় খোদা! এ কোন নির্বোধ নির্বাচন। নির্বাচন মানে মানুষে মানুষে সয়লাব, মিছিলের গা-ফুঁড়ে ছন্দোময় স্লোগানের ধ্বনি—‘অমুকের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে।’ আহা। অমন মিছিল চোখে দেখেও সুখ—অমন স্লোগান কানে শুনেও সুখ। ওদের নির্বাচনে এক দলের এমপি প্রার্থী কর্তৃক আরেক দলের কাউন্সিলর প্রার্থীর ভোট চাওয়ার বেতলা নির্বুদ্ধিতা দেখে ছিঃছিষ্কার ভরা মনে সে রাতে ঘুমোতে গেলাম।

ঘুমের ঘোরে এক জমজমাট আষাড়ে স্বপ্ন আমার দুই চোখের পাতায় ঘনিয়ে এল। স্বপ্নে দেখলাম, আমার নিজের দেশে নির্বাচন হচ্ছে। সেই নির্বাচনে রাস্তা খুঁড়ে বাঁশ পুঁতে তোরণ বানানো হয়নি। গমগমে আওয়াজ, ঠাসা গা ছমছম করা মিছিল নেই। চারদিকে সবকিছু ছিমছাম, স্বাভাবিক। এমন পরিপাটি শান্ত পরিবেশে গুলিস্তানের মোড়ে দাঁড়িয়ে এক নেত্রী বলছেন, ‘আপনারা আমাকে ভোট দিন। আমি আপনাদের

অনেক বিদ্যুৎ বানিয়ে দেব।’ মনোহর হাসি দিয়ে উজ্জ্বল মুখে আরেক নেত্রী বলছেন, ‘উনার পাশাপাশি আমাকেও ভোট দেবেন। আমি দেশজুড়ে সার সার বিদ্যুতের পিলার পুঁতে দেব। আমার আপার বানানো বিদ্যুৎ চোখের নিমেষে আপনাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে দিতেই হবে।’

তাঁদের দুজনের মুখের অনাবিল হাসি আমার স্বপ্নের রাজ্যে হানা দিতেই হাসতে হাসতে আমার সুখের ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, ঈশ্বর আমাকে আষাঢ়ে গল্প লেখার পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে আষাঢ়ে স্বপ্ন দিয়ে আমার ঘুমের রাজ্য সয়লাব করে দিয়েছেন। মনে মনে ডয়েস বন্ধুদের দোয়া ও স্মরণ করলাম, ‘জি স্লাফেন গুট উন্ট জি ট্রাউমেন জুস।’ অর্থাৎ সুখস্বপ্নে মজে থেকে আরামে ঘুমাও। দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তেই কড়াইল বস্তিতে ফের নেতাদের দেখা পেলাম। নেত্রীরা ওখানে নির্বাচনী গণসংযোগে ব্যস্ত। একজন বলছেন, ‘আপা, এই ভোটারগুলো আকাট মূর্খ। এদের ভালো কিছু বোঝাতে আমাদের একটু কৌশলী হতে হবে। সামান্য হাসপাতাল চেনাতে ওদের সূর্যের হাসির নিচে আবার সবুজ ছাতা মেলে ধরতে হয়। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের তথ্য-উপাত্ত পানি দিয়ে নরম করে গিলিয়ে দিলেও এরা গলায় আটকে পট করে মরে যাবে। তার চেয়ে বরং মূর্খগুলোকে গল্পের ছলে দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টা হালকাভাবে বুঝিয়ে বলি।’ একজন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে আরেকজন গল্প শুরু করলেন।

এক দেশে এক ছিল বুড়ো সিংহ। বয়সের ভারে বেচারার দাঁতগুলো একেবারে নড়বড়ে।

কোনোমতে গতর নাড়িয়ে কচি-ক্যাচড়া একটা হরিণের ছানা ধরে আঁচড়ে-কামড়ে খেতে পেলে অর্ধেকটা তার পেটে যায়, বাকি অর্ধেক নড়বড়ে দাঁতের ফাঁকে বেমক্কা লটকে থাকে। রাত নামলে সিংহের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতেই বনের তাবৎ হাঁদুর বেচারার দাঁতের ফাঁকে লটকে থাকা মাংসের ওপর হামলে পড়ে।

হাঁদুরের অত্যাচারে বেচারা বুড়ো সিংহ সারা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। বুড়ো বয়সে এমন নির্ঘুম রাত কাঁহাতক জানে কুলায়। অনেক ভেবে সিংহ খুঁজে পেতে এক বিড়ালকে

ডেকে ইঁদুর তাড়ানোর চাকরি দিয়ে এবার
খানিক নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যায়। বিড়াল
কর্তব্যপরায়ণ। নিঘুম জেগে থেকে মিউ মিউ
করে রাতভর সে ইঁদুর তাড়ায়। চাকরির
আনন্দে বিড়াল সুখী, ঘুমানোর আনন্দে সিংহও
সুখী।

এর মধ্যে একদিন শালির বিয়ের দাওয়াত পেয়ে
বিড়াল সাত দিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি
বেড়াতে গেল। যাওয়ার আগে নিজের উঠতি
জওয়ান ছেলেটাকে রাত জেগে ইঁদুর তাড়ানোর
কাজ বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। ছুটি শেষে
বিড়াল তার কাজে যোগ দিতে গিয়ে ভারি একটু
ধন্ধে পড়ে যায়। তার বিগ বস অনন্যদাতা সিংহের
কথায় বিনয়ের নির্ঝর, তবে ঠোঁটের কোণে
বিটকেলে পিছলা হাসি। বিড়ালকে ডেকে পাশে
বসিয়ে মাখো মাখো স্বরে সিংহ বলে, ‘বাবা
বিড়াল, ইঁদুর তাড়ানোর কাজে তোমার তরুণ
ছেলেটির অনন্য অবদান আমি সারা জীবন
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। আর ইয়ে হে হে।
কাল থেকে তোমাকে আর কাজে আসতে হবে
না।’

আচমকা বেকারত্বের ঘায়ে বিড়াল বেসামাল।
ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে ছেলের কাছে তার সাত
দিনের ইঁদুর তাড়ানোর বৃত্তান্ত জানতে চায়।
দায়িত্ব পালনের গর্বে গর্বিত ছেলের ঝটপট
জবাব, ‘বনের তাবৎ ইঁদুর দুই দিনে মেরে সাফ
করে আমি সিংহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুমিয়ে
কাটিয়েছি।’ হতাশাক্লান্ত বেকার বিড়াল বিলাপ
করে কপাল চাপড়ে বলে, ‘ওরে চপলমতী মূর্থ
বালক, ইঁদুরের ঘরে-সংসারে কিংবা বনে-
বাদাড়ে জ্বালাতনই আমাদের রুটি-রুজির উৎস।
ইঁদুর না বাঁচলে বিড়ালের চাকরি বাঁচে না।’ এ
পর্যন্ত গল্প বলে এক নেত্রী হাঁপিয়ে উঠলে
আরেক নেত্রী আগ বাড়িয়ে গল্প ব্যাখ্যা করার
দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কপালের ঘাম
মুছে রুমাল দিয়ে বাতাস কেটে হেসে হেসে
বলেন, ‘বুড়ো সিংহটা আমাদের প্রাণপ্রিয়
মাতৃভূমি। ওর দাঁতের ফাঁকে লটকে থাকা
মাংসগুলো আপনারা মানে হতদরিদ্র জনগণ।
আর ইঁদুরগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য—দিনরাত
আপনাদের কুরে কুরে খায়। হে হে, আমরা
কারা সেটাও কি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে

হবে? নিশ্চয়ই না।'সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,
জুলাই ১৯, ২০১০

445) কার্যকারণ - মিখাইল তারাসভ

আপনারাই বলুন, কিছু না জেনে এবং না বুঝে
কী করে বেঁচে থাকা সম্ভব?সে অনেক আগের
কথা। আমি তখন যুবক এবং আমার হবু স্ত্রীর
মন পাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিতে সাহসে কুলোচ্ছিল না।
সেই সময় একদিন ছোট্ট এই ঘটনাটি
ঘটেছিল।পার্ক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ
শুরু হলো বজ্রপাত। লক্ষ করলাম, মাশা ভয়
পাচ্ছে। তার চোখে জল। যতবার বজ্রপাতের
শব্দ হচ্ছে, ততবার আতঁচৎকার দিয়ে উঠছে সে
এবং প্রতিবারই প্রায় জ্ঞান হারানোর দশা
তার।কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলাম ওকে। কী
বলেছিলাম ওই সময়, এখন আর মনে পড়ে না।
পরে যখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঁকি
দিল, জিজ্ঞেস করলাম, 'বজ্রপাতের শব্দকে এত
ভয় পাও কেন?'

‘বজ্রের গর্জনে মানুষ মারা যেতে পারে।’ বলল
সে।

‘তুমি স্কুলে পড়াশোনা করেছ তো?’ প্রশ্ন
করলাম।

‘করেছি।’

‘ফিজিকসে কত পেয়েছিলে?’

‘চার’ (পাঁচে চার।—অনুবাদক)।

‘তবে তো তোমার জানার কথা যে বিদ্যুৎটাই
শুধু বিপজ্জনক। বিদ্যুৎ চমকে গেলে বজ্রের
গর্জনটা হলো ফাঁপা আওয়াজ—বায়ুমণ্ডলের
কম্পন।’মাশার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে
গেলাম, আমার কথাগুলো কাজ করেছে বজ্রের
গর্জনের মতো, অর্থাৎ ফাঁপা আওয়াজের মতো।
তক্ষুনি একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়,
আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আকাশ নীল কেন,
বলো দেখি?’

‘জানি না। হয়তো বায়ুমণ্ডল নীল বলে।’

তার উত্তর আমাকে তৃপ্ত করল না। তাই প্রশ্ন
করলাম, ‘আর বায়ুমণ্ডল নীল কেন?’

‘যে কারণে গাছের পাতা সবুজ। রংটাই অমন।’

‘আচ্ছা, বলো তো, কাঠ পোড়ার সময় মটমট
শব্দ হয় কেন?’

‘ফেটে ফেটে যায় বলে।’

‘কেন ফাটে?’

‘গরমে।’

‘তবে আমরা কেন গরমে ফেটে যাই না?’ ভারি রাগ হলো আমার!

‘কেন, গরমে তো এমন অবস্থাও হয় আমাদের, যখন মনে হয়, এই বুঝি মাথা ফেটে যাবে।’

‘তোমার বিদ্যের দৌড় যা দেখছি, তাতে টিভির ভলিউম কমানোর প্রয়োজন হলে তুমি

প্লাগপয়েন্ট থেকে প্লাগ খানিকটা টেনে বের করবে’, বললাম তাকে। কেঁদে ফেলল সে।

আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলাম তক্ষুনি। বিয়ের পরে বছবার তাকে

অনেক কিছুই কার্যকারণ বোঝানোর চেষ্টা করে প্রতিবারই হতাশ হতে হয়েছে। দেখেছি, ওসবে

উৎসাহ তার একেবারেই নেই। একটা কিছু বিশ্লেষণ করতে মুখ খুললেই সে বলে, ‘তুমি

আমাকে ভালোবাস?’

‘বাসি।’

‘আর তুমি?’ জিজ্ঞেস করি অভ্যাসবশে।

‘না বাসলে তোমার আঁতলামি শুনতাম না

বছরের পর বছর ধরে!’ বলে সে চলে যায় আলু ভাজতে, অথচ ভাজা আলুর ওপরে শক্ত আবরণ

পড়ে কোথেকে, সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই তার।

নিশ্চিত জানি, জিজ্ঞেস করলেই বলবে, তেল থেকে।

আলুর মাড় বেশি তাপমাত্রায় শক্ত হয়ে যায়—

এই সরল সত্যটিও যদি সে জানত! **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১৯, ২০১০

446) একটি গৃহ একটি হরিণ প্রকল্প চালু করতে হবে

আমাদের হরিণ আমরা খাব, যেভাবে খুশি সেভাবে খাব

একটি গৃহ একটি হরিণ প্রকল্প চালু করতে

হবেএবার গৃহপালিত প্রাণীর মতো হরিণও ঘরে-খামারে পালন এবং জবাই করে মাংস খাওয়া

যাবে। অসাধারণ এক সিদ্ধান্ত। বাহ সরকার বাহ!

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাজারে গরু, খাসি ও

মুরগির মাংসের কাছে জিম্মি ছিলাম। ফলে

দোকানদারেরাও এই সুযোগে ইচ্ছেমতো দাম

হাঁকত। এখন হরিণকে গৃহপালিত করার

অনুমতি দেওয়ায় গরু, খাসি ও মুরগির মাংসের

ওপর চাপ একটু হলেও কমবে। দেশের বিরাট

একটা জনগোষ্ঠী প্রাণিজ প্রোটিনের ঘাটতি থেকে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে হরিণের চামড়ার চাহিদা বিশ্বজুড়ে, যার প্রমাণস্বরূপ চোরাকারবারীদের হরিণ শিকার করে চামড়া বিক্রির খবর প্রায়ই পত্রিকায় পেতাম। খবর পেতাম, সুন্দরবন-সংলগ্ন গ্রামে বসেছে হরিণের মাংসের হাট। এই হাট এবার দেশের আনাচে-কানাচে বসবে। এ ছাড়া এতে নতুন করে দেশের বেকার যুবকদের বিশাল একটা অংশ কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে। হরিণের মাংস ও চামড়া রপ্তানি করে দেশে আসবে অনেক বিদেশি মুদ্রা। সেই সঙ্গে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারহীন জীবনেও আসতে পারে নতুন কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনা। বনের বাঘের প্রিয় খাদ্য হরিণের মাংস। হরিণ যখন মানুষের বাড়ির গোয়ালে ও খামারে অনেক পাওয়া যাবে, তখন বনের বাঘকে আর কষ্ট করে হরিণ শিকার করতে হবে না। তারা চুপি চুপি লোকালয়ে এসে টুপটাপ দু-একটা হরিণ খেয়ে চলে যাবে। এতে হরিণের পেছনে ছুটে ছুটে বাঘের যে পরিমাণ ক্যালরি ক্ষয় হতো, সেটা আর হবে না। বাঘগুলোও শুয়ে-বসে আড্ডা মেরে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। একপর্যায়ে সুন্দরবন যখন হরিণশূন্য হয়ে যাবে, তখন বাঘগুলো না খেয়ে মরবে। তাতে আমাদের কী! আমাদের বাঁচামরা আগে। প্রয়োজনে তখন আমরা আবার বাঘ আর হরিণ বাঁচানোর প্রকল্পে টাকা ঢালব। এখন যত হরিণ আছে সেগুলো তো খেয়ে সাফ করি, নাকি! এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই দেশের হোটেল ও রেস্টোরাঁগুলোয় তেহারি, কাচ্চি ও চিকেন বিরিয়ানি খেতে খেতে আমাদেরও অন্যসব খাবারের ওপর বিরক্তি ধরে গেছে। নতুন খাদ্য হরিণের মাংসের বিরিয়ানি আমাদের খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা হলেও নতুনত্ব আনবে। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় আনবে নতুন সম্ভাবনা। সব চেয়ে বড় কথা, বাড়ির আঙিনায় রংবেরঙের হরিণ ছোট্টাছুটি করছে, বিষয়টা দেখতেও নান্দনিক হবে। এত দিন যেটা কেবল আমাদের দেশের শিল্পপতি-নেতা-সাংসদদের বাসা আর বাগানবাড়ির আঙিনায় দেখা যেত, সেই হরিণ এখন দেখা যাবে সবার বাড়ির আঙিনায়। ফলে দৃষ্টিকটু শ্রেণীবৈষম্য কিছুটা হলেও লাঘব হবে। এ ছাড়া বাড়ির আঙিনায় কালো ছাগল দেখতে

দেখতে আমাদের মনও কালো হয়ে গেছে।
এবার রঙিন হরিণ নিশ্চয় আমাদের জীবনেও
নতুন রং যোগ করবে। আমরা আমাদের
প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করে সবাই হয়ে উঠব
সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী। ধন্য সরকারি
সিদ্ধান্ত! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০২,
২০১০

447) সো অ্যাজ ইউ লাইফ - প্রশান্ত সরদার

ছোট মামাকে একটু আগে 'নিউ লাইফ নার্সিং
হোম' থেকে আনা হয়েছে। সারা শরীরে
কমবেশি ২৫-৩০টি সেলাই পড়েছে। বরাত
ভালো, বেঁচে গেছেন। ঘটনা যedিকে মোড়
নিয়েছিল, যেকোনো অঘটন ঘটে যেতে পারত।
হয়েছে কী, প্রতিবছরের মতো এবারও চণ্ডীপুর
গ্রামে নবাবুগং সংঘের পরিচালনায় প্রাইমারি স্কুল
মাঠে গ্রাম্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছে।
প্রতিবছর সরস্বতী পূজার পরের দিন এই আসর
বসে। মাঠ ছোট। ক্লাবকর্তাদের ইচ্ছা থাকলেও
ভালো কিছু করার সুযোগ নেই। লজেন্স-দৌড়,
অঙ্ক-দৌড়, সুচে সুতা পরানো, চামচ মার্বেল
দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, হাঁড়িভাঙা, রূপসজ্জার
মধ্যেই কর্মকর্তাদের থেমে থাকতে হয়।

আসলে নবাবুগং সংঘের এটা একটা বার্ষিক
মিলনোৎসব। এখানকার জনপ্রিয় ইভেন্ট হলো
রূপসজ্জা। এ ইভেন্টের আকর্ষণে দুপুরের পর
স্কুলমাঠ সব বয়সের মানুষের ভিড়ে কানায়
কানায় ভরে ওঠে।

নান্টু মামা ভীষণ একরোখা, ডানপিটে। হুটহাট
এটা-ওটা করে বসেন। মাঠে পৌঁছেই মামা
বললেন, 'নোটোন, রূপসজ্জায় নাম দেব।'।
বলেই হনহন করে যেখানে নাম নেওয়া হচ্ছে
সেখানে গিয়ে হাজির। অন্যান্য ইভেন্টের নাম
নেওয়া অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও
হাঁড়িভাঙা এবং রূপসজ্জার নাম তখনো নেওয়া
চলছে। নাম এন্ট্রি করে চেস্ট নম্বর পেলেন
৪২০। নম্বরটা হাতে পেয়ে মামা আপন মনে
একটু নাড়াচাড়া করলেন। তারপর ঠিক আছে
এমন ভাব করে কাগজটাকে চার ভাঁজ করে
বুকপকেটে রেখে নির্বিকার চিত্তে মাঠের এক
কোণে এসে দাঁড়ালেন।

এখান থেকে স্লো-সাইকেল রেস বেশ ভালো
দেখা যাচ্ছে। দাঁড়াতেই মামাকে বললাম, 'কী

গো, নাম দেবে, তা তো আগে বলোনি। আর নাম তো দিলে, কিন্তু কী সাজবে, কখন সাজবে, তা তো কিছু বলছ না।’

মামা যেন শুনতেই পেলেন না আমার কথা। আমার উৎকণ্ঠার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে যেমন তাকিয়ে ছিলেন, তেমনিই রইলেন। প্রাইজ পাওয়া না-পাওয়া অন্য কথা। কিন্তু একটা পরিকল্পনা তো থাকবে। একটা আয়োজন তো থাকেই। নিদেনপক্ষে কী সাজাবে আমাকে তো বলবে। কিন্তু আমি ছটফট করলেও মামা কিছু বলছেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন। মিউজিক্যাল চেয়ার যখন শেষের দিকে, তখন ছয়টা চেনা মুখ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এদের সবার নাম না জানলেও মুখ চিনি। মামাদের গ্রামে থাকে। সবাই আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। একজন অনিবার্ণ ক্লাবের সেক্রেটারি। সুনির্মল মামা। সুনির্মল মামা মামাকে বলল, কী রে, নাম দিয়েছিস তো? আমরা কিন্তু রেডি।’

মামা ঝলমল করে উঠলেন। ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে। এসেই নাম এন্ট্রি করেছি। এই যে চেস্ট নম্বর।’ বলেই বুকপকেট থেকে আলতা দিয়ে লেখা সাদা আয়তাকার কাগজ বের করে সবার সামনে ধরল।

নম্বর দেখে, সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বাদল মামা মন্তব্য করল, ‘বাহ, তোর ইভেন্টের সঙ্গে নম্বরটাও মানানসই হয়েছে দেখছি।’ রূপসজ্জার নাম দিয়েছে, তাতে ফোরটোয়েন্টির সঙ্গে কী সম্পর্ক বুঝতে না পেরে বোকার মতো এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলাম না।

মামা বললেন, ‘সাবধানে ব্যাপারটা করো কিন্তু দেখো। হিতে বিপরীত যেন না হয়ে যায়।’ শ্যামল মামা বলল, ‘না, না, সে তোকে ভাবতে হবে না। আমরা মিছিমিছিই হাত চালাব।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘আমরা তাহলে মাঝপথেই ঢুকব, কী বলিস?’

‘হ্যাঁ, বিচারকেরা মাঠে ঢুকে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ পর।’ মামা বেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন। যাক, বাঁচা গেল। ব্যাপারটা তাহলে হঠাৎই নয়। একটা পরিকল্পনা যে আছে, এখন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মিউজিক্যাল চেয়ার শেষ হতেই মাঠ বড় করে

দেওয়ার জন্য ভলেন্টিয়ারসদের কাছে নির্দেশ এল। রূপসজ্জা হবে। বলতে বলতেই মাইকে ঘোষণা, ‘যারা রূপসজ্জায় নাম দিয়েছেন, তাঁরা অবিলম্বে মাঠে নেমে পড়ুন।’

চোখের পলকে প্রতিযোগীর দল স্কুলমাঠের অনেক অংশ ভরিয়ে ফেলল। হ্যাঁ, তা জনা চল্লিশেক হবে। কিন্তু মন দিয়ে যে একটু দেখব, তা আর পারছি কই। মামাদের চিন্তা আমাকে পেয়ে বসছে। মনে মনে ভাবলাম, দূর ছাই, অন্য কারও সঙ্গে যদি আসতাম, তো ভালোভাবে দেখতে পারতাম।

কজন বেশ সুন্দর সেজেছেও। গায়ে কাদা লেপে একজন সরস্বতীর ভঙ্গিমায় হাতে বীণা নিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের ওপর। সত্যি, ছেলেটা সেজেছে বটে। পটে আঁকা ছবির মতো তীরের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে। না, একটুও নড়চড় নেই।

কাগজ-কলম নিয়ে বিচারকেরাও মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দেখছি আর তাজ্জব বনে যাচ্ছি বিটকেল ছোট মামার বুদ্ধি দেখে। দেখি তখনো দাঁড়িয়ে। ভেবে তো কূলকিনারাই পাচ্ছি না। সাজবেটা কখন, আর নামবেই বা কখন।

এসব ভাবছি, ঠিক তখনই শ্যামল মামাদের গলা। মামারা চোর চোর বলে চিৎকার করতেই ছোট মামা ছুটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

আর শ্যামল মামারা ছোট মামার পিছু পিছু মাঠের মধ্যে ঢুকে হিন্দি সিনেমার কায়দায় কিল, লাথি, ছুড়তে লাগল মামাকে তাক করে।

তারপর? তারপর সে এক কেলেক্কারি কাণ্ড। শত শত লোক কিল, ঘুষি, চড় উঁচিয়ে মামার দিকে ধেয়ে গেল। কেউ কেউ আবার মাঠের আশপাশে পড়ে থাকা ছোটখাটো বাঁশের লাঠি নিতেও ছাড়ল না। ভয়ে তো আমার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। কী করব, কী করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো মামাকেই আর দেখা যাচ্ছে না। জটলার মধ্যে থেকে শুধুই হুঙ্কার আসছে। ‘মার, মেরে শেষ করে ফেল... এই দিনদুপুরে এত লোকের মাঝেও...।’

কী করি বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। না হলে মামাকে বাঁচানো যাবে না। ঝাঁ করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ছুটে গেলাম স্টেজের কাছে। সেখান থেকে

মাইকে ঘোষণা হচ্ছিল। আঁকুপাঁকু করতে করতে বললাম, ‘এই যে শুনছেন। যাকে চোর বলে এত লোক মারতে উদ্যত হয়েছে, সে আসলে চোর নয়। আমার মামা। রূপসজ্জায় নাম নিয়ে চোর ভূমিকায় মাঠের মধ্যে নেমেছেন। প্রথমে যারা মামার দিকে তেড়ে গেল, সে ব্যাপারটাও আগে থেকে সাজানো। দোহাই আপনাদের, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। নইলে মামাকে ওরা...’ আর কিছু বলতে পারলাম না। ভাঁ করে কেঁদে ফেললাম। কথা শুনে ক্লাবকর্তারা তো থ। হোমরাচোমরা গোছের একজন আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ব্যাপারটা ঘোষণা করলেন। কিন্তু না, তাতেও কোনো কাজ হলো না। শেষমেশ ক্লাব সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় ছোট মামাকে পাবলিকের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা গেলেও মাঠে রাখা গেল না। ভ্যানগাড়িতে করে মাঠ থেকে সোজা নার্সিং হোমে। বাদল মামা, শ্যামল মামাদের অবস্থা অতটা খারাপ না হলেও নেহাত মন্দ নয়। মামাকে বাঁচাতে পাবলিকের কিল, ঘুষি, লাঠি ওদেরও হজম করতে হয়েছে। তবে কিনা সান্ত্বনা একটাই—এত লোককে বোকা বানানোর জন্য প্রথম পুরস্কার দিয়ে বিচারকেরা মামাকে সম্মান জানিয়েছেন। যদিও পুরস্কার নেওয়ার জন্য মামা সশরীরে স্টেজে হাজির হতে পারেননি। প্রশান্ত সরদার: ভারতীয় লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০২, ২০১০

448) হরিণনামা ২৪১০ - শাহেদ

মুহাম্মদ আলী

হরিণনামা ২৪১০

২ আগস্ট ২৪১০, হরিণনগর (ঢাকা)হরিণ আমাদের প্রধান গৃহপালিত পশু। এর চারটি পা, ছোট্ট একখানা লেজ ও দুটি কান আছে। মাথার ওপর আছে ডালপালা মেলে দেওয়া শিং। মাথার দুই পাশে কানের ঠিক নিচে আছে দুটি পটোলচেরা চোখ। তবে হরিণ যখন বন্য প্রাণী ছিল, তখন তাদের চোখ আরও সুন্দর ছিল। তখনকার কবি-সাহিত্যিকেরা সৌন্দর্য বর্ণনায় মানবীর চোখের তুলনা করতেন এই হরিণের চোখের সঙ্গে। হয়তো তখন পুরুষেরা নিজেদের বাঘ মনে করতেন এবং নারীদের তাঁরা নিরীহ-আতঙ্কিত-সলজ্জ দেখতে পছন্দ করতেন।

হরিণের চোখের মধ্যে তাঁরা এসব কিছু
সংশ্লিষ্ট খুঁজে পেতেন। হরিণ যেভাবে আমাদের
হলো

৪০০ বছর আগের কথা। হরিণ তখন বনে বাস
করত। ২০১০ সালে মনুষ্য প্রজাতির এক
সরকার বনের হরিণ ঘরে পালনের মহান আইন
করে। হরিণ পালন নিয়ে তখন অনেক মজার
মজার ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমে সংখ্যায় ১০টি
পর্যন্ত নিয়ে ব্যক্তি এবং দশের বেশি নিয়ে খামার
পর্যায় হরিণ পালন শুরু হয়। এখন যে কেউ
সামর্থ্য অনুযায়ী যত খুশি হরিণ পালন করতে
পারে। তবে শুরুতে আইন অনুযায়ী বন বিভাগ
ও চিড়িয়াখানা থেকে অনুমতি নিয়ে হরিণ পালন
করতে হতো। হরিণ পশু হলেও বনে থাকত
বলে তারা বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল।

তখনকার বন মন্ত্রণালয় এখন ঐতিহ্য সংরক্ষণ
মন্ত্রণালয়। বর্তমানে বন না থাকায় তাদের এই
রূপান্তর।

এরও এক মজার ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিক
তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, বন থেকে হরিণ
ঘরে চলে আসার পর বাঘের খাদ্যসংকট দেখা
দেয়। বাঘেরা খাদ্যের খোঁজে বনের গভীর থেকে
গভীরে চলে যেতে থাকে। এই সুযোগে মানুষ
নির্বিঘ্নে বনের গাছ কাটা শুরু করে। গাছ
কাটতে কাটতে একসময় বন উজাড় হয়ে যায়
এবং বেঁচে থাকা দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বল্পসংখ্যক বাঘ
লোকালয়ে এসে মানুষ শিকার করতে শুরু
করে। এতে আরেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে।

বাঘের এই তৎপরতা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে
কাকতালীয়ভাবে বিরাট ভূমিকা রেখে ফেলে। এ
জন্য ২০০ বছর আগে প্রথা ভেঙে তখনকার বন
মন্ত্রণালয়কে জনসংখ্যা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কারণ তারা একটিমাত্র আইন করে বনের বাঘ
থেকে শুরু করে বন্য প্রাণী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি
দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেয়। তখনকার জামানার
খাদ্যসংকট বিবেচনায় (বন্য প্রাণী ও মানুষ
দুটোরই) ওটা ছিল এক ঐতিহাসিক কাজ।

অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঐতিহাসিক বলে
বিবেচিত না হলে কোনো কাজই করতেন না।

এ জন্য এক হাজার বছর আগেই বাঙালি অলস
জাতির তকমা পায়।

আজ ৪০০ বছর পর এসে তখনকার তীব্র
সমালোচিত বন আইন এখন ঐতিহাসিক

ঠেকে। কী দূরদর্শী ছিলেন আমাদের
পূর্বপুরুষেরা! হরিণ আমাদের যেসব কাজে লাগে
হরিণ আমাদের অনেক কাজে লাগে। আমরা
হরিণ দিয়ে হাল চাষ করি। হরিণ থেকে আমরা
মাংস ও দুধ পাই। হরিণকে ছাগলের সঙ্গে
ক্রসব্রিডিং করে আমরা ছারিণ এবং গরুর সঙ্গে
ক্রসব্রিডিং করে গরিণ নামে দুটি নতুন প্রজাতি
উদ্ভাবন করেছি। তবে বৈজ্ঞানিক ত্রুটির কারণে
ছারিণ ও গরিণের দুধ ও মাংস খাওয়া যায় না।
এরা হাল চাষেরও উপযোগী নয়। প্রায় ১০০
বছর আগে গরু এবং ছাগল বিলুপ্ত হওয়ায়
এখন আমাদের শুধু হরিণের মাংসই খেতে হয়।
হরিণের শিং আমরা আলনা হিসেবে ব্যবহার
করি। এটা আমাদের বাসস্থানের ইনটেরিয়র
ডিজাইনে অন্য রকম পরিবর্তন এনেছে।
হরিণের চামড়া আমরা মূল্যবান লুঙ্গি ও স্কার্ট
হিসেবে ব্যবহার করি। হরিণের শিং দিয়ে
আমরা কান চুলকাই। এতে আমাদের কানের
ছাঁদা বড় হয় এবং আমরা ফিসফিস করে বলা
কথাও সহজে শুনতে পাই। শ্রবণবিজ্ঞানে
হরিণের শিংয়ের অবদান অপরিসীম। আলোর
পেছনে কালো সময়
সব মহৎ কাজের পেছনেই কারও না কারও
চরম ত্যাগ থাকে। সে যুগে হরিণ পালন অবৈধ
ছিল। কিন্তু কিছু অগ্রসর চিন্তার লোক সবকিছু
তুচ্ছ করে গোচরে-অগোচরে হরিণ পালন
করেছেন। তবে এর জন্য তাঁদের জেল-জরিমানা
ভোগ করতে হয়েছে। সে এক অবর্ণনীয় কষ্টের
সময় ছিল। তখন আইন প্রয়োগকারীরা ছিল
বর্বর।

তখনকার দিনের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার
রাজনৈতিক সচিব (বর্তমান জামানায় এমন পদ
নেই) হারিছ চৌধুরী, তাঁর আরেক রাজনৈতিক
সচিব ও সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালু, খুলনার
মনিরুল হক টুটুল, ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা
বিএনপির সভাপতি ও ডিক্রিরচর ইউনিয়নের
চেয়ারম্যান সাদেকুজ্জামান মিলন পাল ও
কোতোয়ালি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি
খলিফা কামাল, বরিশাল সিটি করপোরেশনের
মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার, চাঁদপুরের
ব্যবসায়ী শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক,
জামালপুরের সরিষাবাড়ীর ফয়েজুল কবীর
তালুকদার শাহীন, রংপুরে রহিম উদ্দিন ভরসা

হরিণ পালন করার অভিযোগে মামলা খেয়েছেন, জেল খেটেছেন। অবশ্য তিন বছর পরই সেই হরিণাঙ্ককার সময়ের অবসান ঘটিয়েছে পরবর্তী সরকার। তারা বছরে মাত্র ১০০ টাকা (বর্তমানের এক পাই) পজেশন ফি নিয়ে হরিণ পালনকে বৈধতা দেয়। মারহাবা, মারহাবা! একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব

আজ এই লেখায় আমি মহামান্য সরকারকে সাবেক বন ও বর্তমানের ঐতিহ্য সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়কে ‘বনসংখ্যা’ পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করছি। কারণ তারা একটিমাত্র আইন করে বন, জন ও প্রাণসংখ্যা চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। ৪০০ বছর আগের এক অন্ধকার যুগে তারা এমন আলোকিত সিদ্ধান্ত কীভাবে নিল, তা নিয়েও গবেষণা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি নতুন আইন করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে আমাদের পরম সাংসারিক সঙ্গী হরিণদের কোনো নাম নেই। অথচ তারা আমাদের নানা কাজে আসছে। তাদেরকে আর এই গণনামে ডাকা ঠিক হবে না। প্রস্তাব করছি, এখন থেকে হরিণের জন্মনিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতিটি হরিণের নাম রাখতে হবে। নাম রাখার ক্ষেত্রেও একটা নিয়ম মানতে হবে। প্রথমে এর জন্য একটা গবেষণা সেল করতে হবে। ৪০০ বছর আগে কারা এই আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল, কারা কারা এই আইন তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কারা এই আইন সমর্থন করেছে, আইনের পক্ষে ভোট দিয়েছে—শুরুতে তাদের নামে হরিণদের নামকরণ করতে হবে। বাকি ওপরওয়ালার মর্জি! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০২, ২০১০

449) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন করে এখন আলোচনার শীর্ষে। শীর্ষে থাকতে থাকতেই চলুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিই। অহেতুক কৌতূহলবশেই এই লেখার অবতারণা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাই করা বা পরিচিতি তুলে ধরা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কথায় আছে, নামে কী-বা আসে যায়! কথাটি যে সত্য

তা আমরা সবাই জানি। তাই যে যেখানেই পড়ুক না কেন, সকলের সাফল্য কামনা করি। দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে এই জিজ্ঞাসামূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন আহমেদ শামসুল আরেফীন প্রথমে চলুন, একটু লক্ষ্য করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কীভাবে করা হয়? সাধারণত যে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাস থাকে, সেখানকার নাম অনুসারে হতে পারে। যেমন অক্সফোর্ড শহরের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া রাজ্যের ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (UBC)। রাজ্যের নামানুসারে ও দেশের নামানুসারেও নামকরণ হতে পারে।

কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নামে হতে পারে। যেমন স্যার জন মন্যশের নামানুসারে অস্ট্রেলিয়ার মন্যশ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

এবার বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণগুলো দেখি—☆ World University of Bangladesh: বাংলাদেশের বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়। (এর মানে কী?) ☆ City University: শহর বিশ্ববিদ্যালয়? (কোন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়? এ রকম নামের বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আছে Londo ☆ Metropolita ☆ University অথবা City University of New York) ☆ Stamford University, Bangladesh: আমেরিকার কানেকটিকাট নামের রাজ্যের শহর স্টামফোর্ড। সেই শহরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে! এ ছাড়া Nebraska, New York, Texas, Vermont-এ এই নামের জায়গা আছে। এমনকি যুক্তরাজ্যেও লিংকনশায়ার ও লন্ডনে এই নামে স্থান আছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্টামফোর্ড বলে কোনো শহর, গ্রাম বা কিছু নেই। উল্লেখ্য, আর্ল অব স্টামফোর্ড একটি অতি পুরোনো ইংরেজ উপাধি ও স্যার স্টামফোর্ড সিঙ্গাপুর শহরের গোড়াপত্তন করেন। যদি এ কারণে তাঁদের নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এমনটি রাখা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে কি মহান কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায়নি? ☆ State University of Bangladesh: বাংলাদেশের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়।

(কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়? বাংলাদেশ
রাজ্যময় হলো কবে থেকে? এ রকম নামের
বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আছে State University
of California, কিন্তু সেটি তো যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য
আছে বলেই। তা ছাড়া সাধারণত স্টেট
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার পরিচালিতই হয়ে
থাকে।)☆ Victoria University of
Bangladesh: এই ভিক্টোরিয়া একজনই হতে
পারেন এবং তিনি হলেন ইংল্যান্ডের রানি।
ব্রিটিশ শাসন তো কবেই শেষ। আমরা কানাডা
কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডের কাছে
দায়বদ্ধ নই (Victoria University, Canada
ও Australia খুব নামকরা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়)।
তাহলে তাঁর নামে বাংলাদেশে কেন
বিশ্ববিদ্যালয়?☆ Norther☆ University
Bangladesh: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয়
বিশ্ববিদ্যালয়। (আসলে কি তাই? এর মূল
ক্যাম্পাস কারওরান বাজারের কাজী নজরুল
ইসলাম রোডে এবং আগে ছিল মোহাম্মদপুরের
ইকবাল রোডে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ
রাজশাহীতে নয়। তবে রাজশাহীতে এদের
একটি শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। মনে হয় না সেই
মহান ক্যাম্পাসটির কারণে এর নাম রাখা
হয়েছে।)☆ Easter☆ University: পূর্বালী
বিশ্ববিদ্যালয়। অবস্থান ধানমন্ডিতে।
বাংলাদেশের পূর্বে নয়। তবে বাংলাদেশ বিশ্বের
পূর্বে—এই চিন্তা করলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।☆
Gree☆ University of Bangladesh:
বাংলাদেশের সবুজ বিশ্ববিদ্যালয়। ফার্মগেটের
ওভারব্রিজের পাশে বাসস্টপেজের সঙ্গে এই
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে (পুরোনো) বাংলাদেশের
সবুজের যদি কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত, তাহলে
এই নামটি আসলেই সুন্দর হতে পারত। তবে
কাফরুলে প্রস্তাবিত নতুন ক্যাম্পাসের দেয়ালের
রং অবশ্য সবুজ!☆ North South
University: উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর
ছবি আছে। অবস্থান বসুন্ধরা আবাসিকে,
মেরুতে নয়। তবে জ্ঞানের উত্তর-দক্ষিণ
বোঝালে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।☆ East West
University: পূর্ব-পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়। এই
বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামেও কোনো একটি
মেরুর ছবি আছে। অবস্থান আপাতত

মহাখালীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য অনুসারে, এখানে ইস্টার্ন কালচারে ওয়েস্টার্ন শিক্ষা দেওয়া হয়—তাই এই নাম। তবে কৌতূহলী জনতা সন্দেহ করতেই পারেন যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখে নামটি রাখা হয়েছিল কি না?☆ Southeast University: দক্ষিণ-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু মূল ক্যাম্পাস বাংলাদেশের দক্ষিণেও নয়, পূর্বেও নয়। তবে মনে হয় নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্টের পর আর দিক কম্বিনেশন এটিই হতে পারে!☆

America☆ International University Bangladesh: আমেরিকীয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। এর মালিকানা আমেরিকান সরকারের না কি?☆ Daffodil International University: ড্যাফোডিল শীতপ্রধান দেশের ফুল। বাংলাদেশে এটি ফোটে না। বাংলাদেশের বাংলা ফুলের (যেমন-শাপলা, পদ্ম, রজনীগন্ধা, গোলাপ) নামে রাখলে চলতো না বলেই বোধহয় এই নাম। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০২, ২০১০

450) পাথর - ড. আনোয়ারুদ্দীন

অফিসে কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না কর্মচারী হিসেবে। গণ্য করে না মানুষ হিসেবেও। অবস্থা বরং ঠিক উল্টো। কর্মচারী বলে গণ্য করে না, মানুষ হিসেবেও পাত্তা দেয় না। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! স্থির করে ফেললাম, ডুবে মরব। ব্রিজের ওপর উঠে দেখি, ছোটখাটো একটা লাইন। জনা সাতকের।—সবাই ডুবে মরতে এসেছে?

—হ্যাঁ, সবাই। অপেক্ষা করতে শুরু করলাম লাইনে দাঁড়িয়ে। বিরক্তি ধরে গেল একসময়। জিজ্ঞেস করলাম:

—লাইন এগোচ্ছে না কেন? সামনের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!

—না। আসলে একটা মোটে পাথর। একদম সামনের লোকটা এখন গলায় পাথর ঝুলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে পানিতে। কিছুক্ষণ বাদে লাইনের পরের জন পানিতে ডুব দিয়ে পাথরটির বাঁধন খুলে তুলে নিয়ে এসে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তৈরি হবে।

এই তাহলে ঘটনা পাথর নিয়ে!

আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে, হিসাব করলাম। নিচে নেমে পানিতে হাত দিয়ে

দেখি, বেশ ঠাণ্ডা! ডুব দিয়ে পাথর তুলে আনতে আনতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে ফেলার অবস্থা হবে!লাইনে ফিরে এসে বললাম:

—না রে, ভাই, লাইনে আর দাঁড়াব না। ব্রিজ থেকে নেমে আমি চললাম বিয়ার গিলতে। **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০২, ২০১০

451) **স্কুপ - আলেখান্ডার ফ্যাটার**

অসংখ্য গাড়ির চাকার দাগ বসে যাওয়া, ধূলিময় পথে ছুটছিল একটা চকচকে মার্সিডিজ। গাড়ির মেঝেতে সৃষ্টি হওয়া ফুটোটার ভেতর দিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে বাঁ পা ঝোলাতে ঝোলাতে দাঁত কেলিয়ে গাড়িটা চালাচ্ছিল ড্রাইভার। এত সুন্দর গাড়িটাতে এমন একটা ফুটো কীভাবে হলো সে রীতিমতো এক রহস্য। উইন্ডস্ক্রিনটাও গত রাতে চুরি গেছে। তবে এ নিয়ে তার তেমন মাথাব্যথা নেই। শুধু কোনো এক নির্জন পার্কিংয়ে গিয়ে মোটামুটি ওই মাপের একটা কিছু খুঁজে বের করতে পারলেই হলো, ব্যস।

মরা একটা নদী পার হতে গিয়ে গাড়িটা বেশ একটা ঝাঁকি খেল আর সেই সঙ্গে গাড়ির এগজস্টটা টুং করে খুলে পড়ল। ভাগ্যক্রমে গাড়ির মালিক ওয়াগা তখন জ্যানেট ও জন এর লেখা সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুন নামের বইটিতে ডুবে ছিলেন। তাই শব্দের দিকে খেয়াল করলেন না।

আরও কিছুক্ষণ ঝাঁকি খাওয়ার পর গাড়ি থামল একটি অফিসের সামনে। ওয়াগা গাড়ি থেকে নেমেই ড্রাইভারকে ‘তোমার চাকরি শেষ’ বলে অফিসে ঢুকে পড়লেন।

সম্পাদক সাহেব চলে এসেছিলেন ইতিমধ্যে।

জিঙ্গেস করলেন, নতুন খবর কী কী?

‘দারুণ খবর বস। এক লোক একটি সিংহকে কামড়েছে।’ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন রিপোর্টার ওয়াগা।

এ রকম একটা খবর সম্পাদক আগেই পড়েছিলেন। তাই তিনি বললেন, ‘আরও বলো।’ ‘সিংহটাকে মমি বানিয়ে রাখা হয়েছে।’

‘তোমার কি মনে হয় এসব ফালতু খবরে আমার কাগজের কাটতি বাড়বে?’ চেষ্টা করে উঠলেন সম্পাদক। ‘আমি চাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর। আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস এসবের খবর, পাহাড়ে প্লেন আছড়ে পড়ছে, তীর্থযাত্রীসহ ট্রেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে,

আকাশছোঁয়া দালানের ছাদে আটকে পড়ে মানুষ চিৎকার করছে এমন খবর। জোড়া যমজ, তিন মাথাওয়ালা ছাগল জন্ম নিচ্ছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে ঝরছে টিকটিকি—এসব। আমার চাই মহামারি। দুর্নীতি। যুদ্ধ। খুন। আমার চাই স্কুপ।’

নিউজ ডেস্কের আশপাশের পরিবেশ রীতিমতো থমথমে। হঠাৎই কে যেন বাইরে থেকে জোরে জোরে দরজায় আঘাত করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে দরজা খুললেন ওয়াগা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল তার ড্রাইভার, পুরো শরীর ঘামে ভেজা। ‘বস, গরম খবর আছে।’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ড্রাইভার।

‘হুহ! তুই আবার কী খবর দিবি?’ অবজ্ঞার সুরে বললেন ওয়াগা।

এক নিঃশ্বাসে বলতে শুরু করল ড্রাইভার, ‘আমি পার্লামেন্টের পার্কিং লটের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের গাড়িটার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি হাতানো যায় কি না। হঠাৎ দেখলাম বড়, সবুজ একটা গাড়ি। আমার স্কু ড্রাইভার আর রেতি নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। উইন্ডস্ক্রিনটা খুলতেই ভেতরে কিছু একটা দেখতে পেলাম।’

সম্পাদকের চোখেমুখে আগ্রহ ফুটে উঠল।

‘বলতে থাকো’—উত্তেজিত সম্পাদক বললেন।

‘সামনের সিটে ছিল বিশাল কাগজপত্রের স্তূপ।

যা দেখলাম! নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিছু নিয়ে এসেছি।’

বলতে বলতে বাদামি রঙের একটা ফাইল

সম্পাদকের দিকে এগিয়ে দিল ড্রাইভার।

‘কী এটা?’

‘জিম্বাবুয়ে টোব্যাকো গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন

লন্ডন টাইমস পত্রিকা কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা

করছে। ইয়ান স্মিথ হবেন সম্পাদক, বিশপ

আবেল মুজোরেওয়া থাকবেন স্পোর্টস ডেস্কের

দায়িত্বে আর টেরোরিস্ট পেজটা দেখবেন রেভ

সিথল। পুরো পত্রিকায় থাকবে খবর, গসিপ

আর গেরিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় টিপস। এই

যেমন ধরুন, মুখে গ্রেনেড নিয়ে ধরা না পড়ে

কীভাবে পুলিশ চেক পয়েন্ট পার হওয়া যায়—

এসব। আরও একজন রিপোর্টার থাকবেন।

তিনি সপ্তাহে তিন দিন জিম্বাবুয়ে টোব্যাকোর

গুণাগুণ সম্পর্কে ধারালো সব প্রতিবেদন

লিখবেন।’

‘স্যার, ভালো হয়েছে? আমাকে কি আবার রাখবেন স্যার?’ আমতা আমতা করে বলল ড্রাইভার।

‘অনেক ভালো কাজ করেছ তুমি। এ রকম সাহসী লোকই তো আমার চাই। তোমাকে আবার আমি রাখব। কিন্তু নতুন চাকরিতে। আজ থেকে তুমি নিউজ ডেস্কের দায়িত্বে থাকবে।’ বললেন সম্পাদক।

‘আমার কী হবে স্যার?’ বলে উঠলেন রিপোর্টার ওয়াঙ্গা।

তার দিকে সরু চোখে তাকালেন সম্পাদক। বললেন, ‘আপনি ড্রাইভিং জানেন মি. ওয়াঙ্গা?’ ‘অবশ্যই স্যার। বিশ বছর ধরে আমার গাড়িটা তো আমিই চালাচ্ছি।’

‘তাহলে আজ থেকে আপনি আমার নতুন ড্রাইভার। আমার সঙ্গে আসুন। পার্লামেন্টে যেতে হবে।’

দুজন বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে। অফিসের ভেতর থেকে হতবাক রিপোর্টাররা শুনতে পেলেন বাইরে একটা মার্সিডিজ চালু হলো, তারপর যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ নড়াচড়া করল, তারপর রীতিমতো তাল হারিয়ে, গুলি ছোড়ার মতো ভটভট আওয়াজ করতে করতে চলে গেল। অনুবাদ: আলিয়া রিফাত
আলেক্সান্ডার ফ্যাটার: ব্রিটিশ সংবাদিক ও লেখক। মূলত ভ্রমণ লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৭, ২০১০

452) লাঠি - তওহিদ মিলটন

মানুষ সব সময়ই শক্তির ভক্ত, নরমের ঘম। তাই তো বাঁশ দেখে যেখানে আমাদের জিব শুকিয়ে যায়, সেখানে বাঁশের মতোই দেখতে আখ দেখে জিবে জল চলে আসে।

জীবনের শুরুতেই যেমন লাঠির ওপর ভর করতে হয়, তেমনি জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে নির্ভর করতে হয় আবার সেই লাঠির ওপর। তাই হয়তো বলা যেতে পারে, লাঠি ছাড়া আমাদের জীবন তো বলতে গেলে অচল। লাঠির সাহায্যে জীবন যেমন সচল হয়, আবার তেমনি এই লাঠির কারণেই জীবন অচল হয়ে যেতে পারে।

লাঠি শব্দটা শুনলেই শারীরিক কতগুলো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন। প্রথমত, আপনার

শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যাবে।
এরপর ধরুন, কারও কারও হাতের তালু
চুলকাবে, কেউ মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলবে। কারও
শরীরের রক্ত ছলাৎ করে উঠবে। কারও মাথায়
চিনচিন করতে পারে। কারও চোখ উজ্জ্বল হয়ে
চকচক করবে। কেউ কেউ নড়েচড়ে বসবে।
কারও বুকে সাহস সঞ্চার হবে। ইত্যাদি।
লাঠির সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের সম্পর্কটাই
এমন—বলা চলে—লাঠির সঙ্গে আমাদের রক্তের
সম্পর্ক।

লাঠির উৎস যেমন বিচিত্র, তেমনি এর
ব্যবহারও বৈচিত্র্যময়।

একটা গান আছে বাংলার লাঠিয়াল নামে।
লাঠিয়াল বাহিনী বাংলার প্রাচীন
প্রতিরক্ষাব্যবস্থার একটা বড় অংশ। যখন
বর্তমান সময়ের মতো এত অত্যাধুনিক অস্ত্রের
ঝনঝনানি ছিল না, তখন আমরা পুরোপুরি
নির্ভর ছিলাম এই লাঠির ওপর। তাই হয়তো
এই গান।

চোর-বদমাশদের লাঠিপেঠা করা একধরনের
সংস্কৃতিরই অংশ। আবার সেটাকে আমরা
অনেক সময় গর্ব করে বলি, ওর পিঠে আমি
লাঠি যদি না ভাঙছি। একটা সময় ছিল, যখন
স্কুলের শিক্ষকদের ছাত্ররা যমের মতো ভয়
পেত। বলা হতো, অমুক টিচারের ভয়ে ছাত্ররা
কাপড়ে ইয়ে করে দিত। এই ভয় আর কিছু না,
শিক্ষক মশায়ের চেয়ে আতঙ্কের বিষয় ছিল তাঁর
হাতের দণ্ড মশায়। তাঁরা তখন নাকি গরু-ছাগল
পিটিয়ে মানুষ বানাতেন। বোধ করি, তাঁদের
সেই প্রক্রিয়াটা দেশের জন্য অমঙ্গলই বয়ে
এনেছে। এমনিতেই এ দেশে মানুষে গাদাগাদি,
সেখানে গরু-ছাগল পিটিয়ে আরও মানুষ
বাড়ানোর দরকারটা কী ছিল? গরু-ছাগল কিছু
বেশি থাকলে কি এমন ক্ষতি হতো? যা-ই
হোক, তাঁরা হয়তো এত দূর ভাবেননি।

সবচেয়ে ভালো হতো, যদি কিছু অমানুষ পিটিয়ে
গরু-ছাগল বানাতেন। দেশে এখন এদের
সংখ্যাটা কম নয়।

লাঠির এসব ছোটখাটো ব্যক্তিগত পর্যায়ে
ব্যবহার থেকে ধীরে ধীরে লাঠি চলে এল
আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে। এর মধ্যে লগি-
বৈঠা মিছিল তো বিশ্বস্বীকৃত, যেখানে লগি ও
বৈঠা দুটি বস্তুকেই আমরা লাঠীগোত্রীয় ধরে

নিতে পারি। রাজনৈতিক মিছিলগুলো যদিও এখন অনেক বেশি প্রযুক্তিগত পিস্তল-রিভলবার-শটগাননির্ভর, কিন্তু পত্রিকায় ছবি ছাপা হলে সবার আগে চোখে পড়ে মিছিলের লাঠি-বাঁশের ছবি। আর লাঠি হচ্ছে এমনই এক অস্ত্র, যা ব্যবহারে কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন পড়ে না। বিরোধী দলের মিছিলকে ধাওয়া করা কিংবা দাবড়ানি দেওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হচ্ছে মুলিবাঁশ। সঙ্গে যদি একটু তেল মেখে নেওয়া যায় তাহলে আরও ভালো।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হাতে কোন জিনিসটা এখন সবচেয়ে বেশি শোভা পায়? উত্তর একটাই— লাঠি। কারণ, ছাত্রদের দাবি-অধিকার আদায়ের সবচেয়ে ভালো হাতিয়ার এটি। ছাত্ররাজনীতির একটা অংশ যদিও এখন ঐতিহ্য ভুলে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে অটোমেটিক মেশিনের ওপর, কিন্তু এখনো বিশাল একটা অংশ ধরে রেখেছে দেশীয় ঐতিহ্য যথা লাঠি যথা বাঁশ। জয়তু-ছাত্রনং বাঁশনং তপঃ।

বলুন তো, পুলিশের পরে কোন শব্দটি সবচেয়ে বেশি মানায়?

ঘুষ? নাহ্! হয়রানি? তাও না।

পুলিশের পরে লাঠিচার্জ কিংবা লাঠিপেটা শব্দটা সমার্থক। এর কারণও আছে, আমাদের দেশের পুলিশকে দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যবহারই বোধ হয় হয়ে থাকে লাঠি হিসেবে।

পোশাককর্মীরাও ইদানীং লাঠির শরণাপন্ন হয়েছেন। আর শ্রমিক রাস্তায় নামবে কিন্তু পুলিশ সেখানে থাকবে না এটা কি মানায়? রাস্তায় লাঠির সবচেয়ে নান্দনিক দৃশ্য হচ্ছে গাড়ি ভাঙা। যত দামি গাড়ি, ভাঙার আনন্দ ততই বেশি।

ভাবুন তো, লাঠিছাড়া একটা পৃথিবী যেখানে মানুষের হাতে থাকবে না কোনো লাঠি। শিশু বয়সে উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনো লাঠি থাকবে না, ছাত্ররা হাতে বই নিয়ে মিছিল করবে, কলম নিয়ে বিরোধী দলের ছাত্রদের ধাওয়া করবে, পোশাকশ্রমিকেরাও খালি হাতে, সরকারি ও বিরোধী দল রাজপথে নামবে লাঠি ছাড়া, পুলিশ তাড়া করবে লাঠি ছাড়া! এমনকি বৃদ্ধার হাতেও থাকবেনা কোনো লাঠি। ওহ্! নো!

লাঠিকে আমাদের জাতীয় অবলম্বন ঘোষণার দাবিতে সংসদে একটা বিল উত্থাপন করা উচিত। সংসদে তো সব সময় নিন্দা প্রস্তাব, শোক প্রস্তাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় চলে যায়, একদিন যদি এই অগুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি কেউ করতেন!

ধরুন, প্রস্তাবটি সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলো, যে লাঠিই আমাদের জাতীয় অবলম্বন। এরপর বিভিন্ন চৌরাস্তার মোড়ে শোভা পাবে লাঠির নয়নাভিরাম স্ট্যাচু। কোনো কোনোটাতে ছাত্রলীগ ছাত্রদলকে লাঠি হাতে তাড়াচ্ছে, কিংবা উল্টো; কোনোটাতে পুলিশ শ্রমিকের ওপর লাঠিচার্জ করছে, কিংবা উল্টো; কোনোটাতে শিক্ষক ছাত্রকে বেত্রাঘাত করছেন, ব্যাস এবার থামুন; এখানে আর উল্টো কিছু ভাবতে যাবেন না। উল্টা-পাল্টা বিষয়টা সবসময় সবকিছুর সঙ্গে যায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের সবকিছুতেই লাঠি কেন? কিছু হলেই পুলিশের হাতে উঠে আসে লাঠি। ছাত্রদের দমন করতে লাঠি, শ্রমিক দমনে লাঠি, বিরোধী দলের বিরুদ্ধেও লাঠি। সকল সমস্যারই অন্য একটা সমাধান আছে। সরকার সেই সমাধানে না গিয়েশটকার্ট হিসেবে পুলিশের লাঠিকেই বেছে নিয়েছে। তাঁরা অভিযুক্ত হচ্ছে ‘বাংলার লাঠিয়াল’ হিসেবে। পুলিশের কপালে আর কত বিশেষণ জুটবে! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৭, ২০১০

453) চুল দেখে কার কী প্রতিক্রিয়া

অনেক ছেলেই ইদানীং চুল বড় করে, লম্বা রেখে ফ্যাশন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই চুল দেখে আশপাশের অন্যদের কী প্রতিক্রিয়া, সেটা সম্পর্কে তারা হয়তো অবগত নয়। লম্বা চুলের ছেলে দেখে আশপাশের মানুষের কী প্রতিক্রিয়া, সেটাই বরং দেখা যাক।
লিখেছেন রাকিব কিশোরউকুন: আহা, নতুন একটা বাসা পাইলাম।

নাপিত: যাক একটা কাস্টমার পাইলাম।

মুরব্বি: পোলাডা নির্ঘাত বখাটে

তরুণী: নিশ্চয়ই কবি!

টাক মাথাওয়ালা একজন: আমারও একদিন এই রকমই ছিল।

তেল ব্যবসায়ী: চুলের মডেল হিসেবে খারাপ

না।

চিরুনি ব্যবসায়ী: এই রকম যদি সবার চুল থাকত!

তরুণ: স্টাইলটা নির্ঘাত বলিউড থেকে মারিং করা।

বন্ধু: চাইলে এমন চুল আমিও রাখতে পারি।

বান্ধবী: খুবই কনফিউজিং। আরেকটু হলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেত!!

ছেলের বাবা: ছেলেটা গোল্লায় গেল।

ছেলের মা: ঠিক আমার চুল পাইছে, মেয়ে হইলে ভালোই মানাইত।

বখাটে ছেলে (পেছন থেকে দেখে): মেয়েটা কী লম্বা, উফ কী স্লিম!

রাস্তার পাগল: ভাইজানের কী আরাম! মাথায় রোইদই লাগে না।

কাজের বুয়া: ঘরে এতো চুল উড়লে আমি আর রান্ধুম না।

চিত্রপরিচালক: মেয়ে চরিত্রে কাস্ট করলে

কেউই টের পাবে না। **সূত্র:** দৈনিক প্রথম

আলো, আগস্ট ০৭, ২০১০

454) প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ফাঁস - শামস্ বিশ্বাস

আমাদের স্কুলের ১৮২ বছরের ইতিহাসে

অন্যতম কুলাঙ্গার ছিলাম আমরা। এমন কোনো ক্লাস ছিল না যে ক্লাসে আমরা ফেল করিনি।

আমাদের শিক্ষক আর অভিভাবকদের কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে

পুরোনো ও স্বনামধন্য এ স্কুলে আমরা কীভাবে চান্স পেলাম! আমরা নিজেরাও ১৮ বছর ধরে

তাই ভাবছি কীভাবে চান্স পেলাম!

ক্লাস এইটে আমাদের সহপাঠী হয় আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের শিক্ষকের ছেলে। আমরা

ফেল করে-করে আবিষ্কার করেছিলাম, আমাদের স্কুলের নিয়ম হলো, চার শাখার যেকোনো এক

শিক্ষক প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। আমাদের হিসাবে সেই সহপাঠীর শিক্ষক-বাবার বাংলা দ্বিতীয়

পত্রের প্রশ্নপত্র তৈরির কথা। আমরা তার কাছে গেলাম তার শিক্ষক-বাবা তাকে বাংলা দ্বিতীয়

পত্রে কী কী বেশি পড়াচ্ছেন, তা জানার জন্য। বুকের ভেতর আশা, শিক্ষাজীবনে প্রথমবারের মতো যদি ৮০ নম্বর পাই!

দেখতে দেখতে পরীক্ষা সামনে চলে এল।

আমরা চেয়েছিলাম সাজেশন আর আমাদের

● <http://facebook.com/tanbir.cox>

সেই সহপাঠী তার শিক্ষক-বাবার আলমারি থেকে চুরি করে এনে দিল প্রশ্নপত্র!

কিন্তু আমাদের প্রশ্নপত্র পাওয়ার গোপন কথা গোপন থাকে না। আমাদের স্কুলের মতো নামকরা স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, কথাটা স্কুলের বাইরে গেলে চারদিকে রি রি ধ্বনি উঠবে বলে গোপনে অনেক তদন্ত হলো। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রমাণিত না হলেও স্যাররা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, যদি আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রে বেশি নম্বর পাই, তাহলে তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এ জন্য প্রশ্নপত্র অপরিবর্তিত থাকে।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিতে গিয়ে বুকটা ফেটে গেল—শিক্ষাজীবনে প্রথমবারের মতো প্রশ্নপত্রের সব উত্তর মুখস্থ কিন্তু বন্ধু আর বন্ধুর বাবার জন্য আমরা খারাপ পরীক্ষা দিলাম এবং ফেল করলাম। এর পর থেকে আমাদের নিয়ে একটা কথা চালু হয়ে গেল: প্রশ্নপত্র পেলেও আমরা পাস করতে পারব না।

২০০৪ সালে আমার স্বপ্নের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি-পরীক্ষা দিতে গেলাম। পরিচিত পাতিনেতা আর স্থানীয় বন্ধুরা প্রস্তাব দেয় মাত্র ২০-৩০ হাজার টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনে কাক্ষিত বিষয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। বাড়িতে এ কথা জানাতে গিয়ে ঝাড়ি খাই। পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় প্রস্তাব আসে ১০ হাজার টাকা দিলে প্রশ্নপত্র পাওয়া যাবে। মাঝরাতে খবর এল পাঁচ হাজার টাকায়। শেষরাতে বলল দুই হাজার টাকা দিলে উত্তরসহ প্রশ্নপত্র। সকালে পরীক্ষা দিতে গেছি, এ সময় একজন বলে মাত্র ৫০০ টাকা দিলে প্রশ্নপত্র দেবে!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যর্থ হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী কলেজে ভর্তি হলাম। এখানে ভর্তি হয়ে জানলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ মাসে এক বছর হয়।

২০০৬ সালের দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০০৮ সালে দিতে বসলাম। প্রথম পরীক্ষা ইংরেজি (আবশ্যিক)। আমাদের সিলেবাসে ১১.(ক)-তে আন্ডার লাইন দিয়ে লেখা আছে ‘ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষার পাস নম্বর হবে ৩৩%, ইংরেজি বিষয়ে পাস না করলে পরীক্ষার্থী অনার্স বা পাস ডিগ্রির জন্য বিবেচিত হবে না।’ আবার ৭.(খ)-তে লেখা

আছে ‘ইংরেজিতে ৩৩ নম্বরের অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর থেকে সর্বাধিক ১০ নম্বর পরীক্ষার্থীর অনার্স বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে। অনার্স বিষয়ে পাস নম্বর (গড় ৩৬%) না পেলে ইংরেজি বিষয়ে অতিরিক্ত নম্বরের সুবিধা প্রদান করা হবে না।’ মানেটা যেটা বুঝলাম, ইংরেজিতে ৩৩ না পেলে অনার্স হবে না। আর ৫০-৬০ নম্বর পেলেও যা, ৩৩ পেলেও তা। পরীক্ষার হলে বসেছি, পাশের সিটের মেয়েটা যে কলেজ হোস্টেলে থাকে, সে জিজ্ঞেস করে আমি ইংরেজি প্রশ্নপত্র পেয়েছি কি না? আমি আকাশ থেকে পড়ি—‘কেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে নাকি?’

এবার সহপাঠীর হা হওয়ার পালা—‘কি গো, আমি হোস্টেলে থেকে পেয়ে গেলাম, আর তুমি শহরের ছেলে হয়ে কশ্চেন পাওনি!’

আমি ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। ৩৩ পেলেই তো হবে! রাতে টিভিতে ব্রেকিং নিউজে দেখলাম প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য ইংরেজি পরীক্ষাটা বাতিল! আবার ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষার তারিখ দিল। এবার পরীক্ষার আগের দিন রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পেয়ে ৫০০ টাকা নিয়ে এক ফটোকপির দোকান থেকে প্রশ্নপত্র কিনে বাসায় ঢুকে শুনলাম টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দিয়েছে—প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য আগামীকালের অনুষ্ঠেয় ইংরেজি পরীক্ষা বাতিল! এরপর আবার পরীক্ষার তারিখ হলো, আবার পরীক্ষা দিলাম। সাত মাস পর রেজাল্ট, ২৫ পেয়ে ফেল করেছি।

পরের বছর ২০০৯ সালে আবার ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা দিতে হলো। এবার আর প্রশ্নপত্র পেলাম না, তবে পরীক্ষার আগের রাতে জানতে পারলাম অপ্রচলিত একটা গাইড বই থেকে কম্প্রিহ্যানশন আসবে। সেই শীতের রাত ১২টায় সে গাইড বই খুঁজে সারা রাত পড়লাম। সকালে ঢুলুঢুলু চোখে পরীক্ষার হলে দেখি ওই কম্প্রিহ্যানশনটা আসেনি। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে কী লিখলাম জানি না, আট মাস পর রেজাল্ট দিল, ২৮ পেয়ে আবার ফেল।

পরের বার আবার ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা দিলাম, তবে এবার আর প্রশ্নপত্র খুঁজতে গেলাম না, যতটুকু সামর্থ্যে কুলালো পড়াশোনা করে দিলাম। আট মাস পর রেজাল্ট, ৩৪ পেয়ে পাস!

অভিজ্ঞদের পরামর্শ, এ সাধারণ মানের ডিগ্রি দিয়ে চাকরি হবে না। প্রয়োজন কম্পিউটারের সনদ। সরকারি এক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, কিন্তু মেয়র কিংবা সাংসদের সুপারিশ না হলে ভর্তির সিরিয়াল পাওয়া যাবে না। শেষে এক সহপাঠী বন্ধু বলে, সে যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার শিখছে, সেটায় স্কলারশিপ দিয়েছে। স্কলারশিপ পরীক্ষায় ভালো করতে পারলে ৫০ হাজার টাকার কোর্স বিনা পয়সায় করা যাবে। তার কাছ থেকে ২০ টাকা দিয়ে হলটিকিট নিলাম। স্কলারশিপ পরীক্ষার আগের রাতে ওই সহপাঠীর ফোন। গিয়ে দেখা করলাম। সে প্রস্তাব দেয়, আগামীকালের স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আমাকে দেবে, যদি আমি ৫০০ টাকা দিই। নাচতে নাচতে রাজি হয়ে যাই। ৫০০ টাকায় ৫০ হাজার টাকা বেঁচে যাবে! সারা রাত জি-মেট আর স্যাটের বই ঘেঁটে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করলাম। খুব ভালো লিখিত আর মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে ৩২ হাজার টাকার কোর্সে ৪৫% ছাড় পেলাম। প্রবল উৎসাহে ভর্তি হয়ে গেলাম, শুরু করলাম কম্পিউটার শেখা। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল, আবার স্কলারশিপ দিল ওই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আমাদের বলা হলো, আমরা যদি একজন নতুন ছাত্র ভর্তি করতে পারি, এক হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এক হাজার টাকার উৎসাহে হলটিকিট বিক্রি শুরু করলাম। স্কলারশিপ পরীক্ষার আগের দিন বিকেলে আমাদের হাতে কর্তৃপক্ষ স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধরিয়ে দিল আমাদের ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য!

কিছুদিন হলো আমাদের বন্ধু মামুনের সঙ্গে ঢাকার বৃষ্টি নামের এক মেয়ের প্রেম শুরু হয়েছে। আমরা মামুনকে চোখের মণি করে নিয়েছি। আড্ডায় মামুনকে চা-সিগারেটের বিল দিতে হয় না—কোনো কিছুতে মামুনকে ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। কারণ, বৃষ্টির এক নিকটাত্মীয় বিজি প্রেসে চাকরি করেন! একমাত্র তারাই তো পারে আমাদের মতো মেধাশূন্যদের একটা সম্মানজনক সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৭, ২০১০

455) বাংলার বাজ-এ বংশধরেরা

বংশপরিচয় নিয়ে সবাই গর্বিত। সবাই নামের শেষে বংশের টাইটেল লাগাতে পছন্দ করেন। এই রকম অনেক বংশের সঙ্গেই আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। কেউ হক, কেউ মীর, কেউ সৈয়দ, কেউ চৌধুরী ইত্যাদি। কিন্তু সবার চোখের সামনে দিয়ে একটা বংশের লোকেরা কিন্তু তরতর করে বেড়েই চলেছেন এই দেশে।

এঁরা হলেন বাজবংশীয় লোক। এই বাজবংশের কিছু সদস্যের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাওহিদ মিলটন। দুর্নীতিবাজ মনে করা হয়, পুরো বাজবংশের মধ্যে ওনারাই সবচেয়ে শক্তিশালী। এঁরা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই একরকম শপথ করেছেন জীবনে কখনো নীতির ধারও ধারবেন না। এঁরা বেশ অবস্থাপন্ন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে উপস্থিতি বেশ সরব। ফাঁকিবাজ বাজবংশের কুলাঙ্গার এঁরা। সারা জীবন সবকিছুতেই এঁরা ফাঁকি দিয়ে চলেন। সংখ্যায় অনেক। পাওয়া যায় সমগ্র দেশজুড়ে। এঁরা ঘরের বাবা-মা স্ত্রী-পুত্র সবাইকে ফাঁকি দিতে ভালোবাসেন। এঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান দাবি করেন। পাওয়া যায় দেশের সর্বত্রই। ধান্ধাবাজ এঁদের বলা হয় বাজবংশের সবচেয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন সদস্য। কিন্তু এঁরা নিজেদের এই বুদ্ধি দুর্নীতিবাজ, দখলবাজদের মতো কাজে লাগাতে পারেননি। এঁদের মাথায় সব সময় নিত্যনতুন ধান্ধার বুদ্ধি দৌড়াদৌড়ি করে। এঁরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, এঁরা মাঝে মাঝে দুর্নীতিবাজ, দখলবাজ, চাঁদাবাজদের সঙ্গেও ধান্ধা করে ফেলেন। টেন্ডারবাজ ধারণা করা হয়, বাজবংশের সবচেয়ে আধুনিক সদস্য এঁরা। এঁরা খুব মারমুখী হয়ে থাকেন। কাজ করেন কম কিন্তু ইনকাম করেন অনেক বেশি। এঁরা একটু পানাসক্ত হন। এঁরা সাধারণত প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক হন। দেশের ক্ষমতাসীন দলের পরোক্ষ একটা দোয়া এঁরা সব সময় পেয়ে থাকেন। ঠগবাজ বাজবংশের সদস্যসংখ্যায় সবচেয়ে কম বোধ হয় এঁরা। এঁদের কাজই হচ্ছে মানুষ ঠকানো। এঁরা মানুষ ঠকিয়ে ব্যাপক মজা পান। তবে এঁরা খুব একটা দলবদ্ধভাবে থাকেন না। একটু

বোহেমিয়ান জীবন পছন্দ করেন। এঁরা
মেট্রোসিটিতে একটু বেশি ঘোরাঘুরি করেন।
কোনোমতে এঁদের দিন চলে যায়। রংবাজ
এঁরা বাজবংশের কলঙ্ক বলা চলে। বাজবংশের
গৌরব মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন এঁরা। হেন
কোনো ছেঁচড়ামি নেই এঁরা করেন না, এঁরা
রিকশাওয়ালাসহ সঙ্গেও রংবাজি করেন। এ ছাড়া
ইভ টিজিং এঁদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।
এসব রংবাজি করেই এঁরা মূলত জীবিকা নির্বাহ
করেন। এঁদের বর্তমানে মফস্বলের অন্ধকার
গলিতে বেশি দেখা যায়। এঁরা অবশ্য ভাড়াও
খাটেন ইদানীং। চাঁদাবাজ
বাজবংশের সবচেয়ে সুখী সদস্য বলা চলে
এঁদের। এঁরা কাজকর্ম করতে একদমই পছন্দ
করেন না। এঁরা অন্যের বাড়ি ভাড়া ছাই না
দিয়ে প্লেটটাই নিজের কাছে নিয়ে নেন।
সরকারি দল সব সময় এঁদের শেল্টার দিয়ে
থাকে। এঁরা মনে করেন, অন্যের পকেটের
সত্যিকারের মালিক তাঁরাই। এটা তাঁদের
বংশগত অধিকার। ধড়িবাজ
এঁদের কাজ সম্পর্কে আসলে কেউ নিশ্চিত নয়।
কারণ এঁদের ঠিক ধরা যায় না। এঁরা কী
করেন, কোথায় থাকেন—সবকিছুই রহস্য। তবে
ধারণা করা হয়, এঁদের কেউ কেউ
দুর্নীতিবাজদের গুটিও চালেন কিন্তু সমাজে
সবার সঙ্গে এমনভাবে মেশেন যে কেউ কিছু
আঁচ করতে পারে না। এও ধারণা করা হয়,
টেলিভিশন চ্যানেল এঁদের বেশ প্রিয় একটি
বিচরণের জায়গা। চাপাবাজ
বাজবংশের এই সদস্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন
সারা দেশে। এঁদের চাপা ব্যাপক শক্তি হওয়ার
কারণে এঁরা সাধারণত অসম্ভব বিষয় নিয়েই
কথা বলেন। এঁরা কাজে নয়, চাপায় বিশ্বাসী।
রাজনৈতিক দলগুলোতে রয়েছে এঁদের অগাধ
বিচরণ। ধারণা করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর
ভাষণ এঁরাই লিখে থাকেন। ধোঁকাবাজ
বাজবংশের এই সদস্যরা বিশ্বাসই করেন,
জীবনে উন্নতির একমাত্র সিঁড়িই হচ্ছে অন্যকে
ধোঁকা দেওয়া। একই মানুষকে এঁরা বারবার
ধোঁকা দেওয়ার নিপুণ কৌশল জানেন। তবে
এঁরা মাঝে মাঝে ভুল করে নিজের আত্মীয়দেরও
ধোঁকা দিয়ে ফেলেন। এঁদের মূল পেশা দালালি
ঘরানার। তবে রাজনীতিতেও এঁরা কম যান

না। আইডিয়াবাজ

বাজপরিবারের সবচেয়ে অবহেলিত সদস্য এঁরা।

কারণ, এঁরা অন্যদের মতো মূল স্রোতের সঙ্গে

গা না ভাসিয়ে একটু উল্টো স্রোতে গা ভাসান।

অনেকেই বলেন, এঁরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তবে

বাজবংশের অন্য সদস্যরা মনে করেন এঁরাই

সবচেয়ে বোকা। তবে এঁরা বাজবংশের অন্য

সদস্যদের কর্মকাণ্ডের কারণে নিজেদের

বাজবংশীয় পরিচয় দিতে একটু লজ্জা বোধ

করেন। দখলবাজ

যদিও এই সদস্যদের আমরা দুর্নীতিবাজই

বলতে পারতাম কিন্তু এদের কর্মকাণ্ডের কারণে

এঁরা একটু ভিন্ন। এদের জীবনের লক্ষ্য

একটাই—দখল। সরকারি-বেসরকারি জায়গা-

জমি থেকে শুরু করে এঁরা সবই দখল করতে

পছন্দ করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর

এঁদের প্রভাবটা একটু ভিন্ন। এঁরা সব সময়

ক্ষমতাসীন দলকে ডোনেশন দিয়ে দখলপ্রক্রিয়া

অব্যাহত রাখার অসাধারণ গুণসম্পন্ন। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৭, ২০১০

456) আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

আহা, কী সময়টাই না ছিল তখন! মেয়েরা

হাতপাখা তৈরি করে রঙিন সুতা দিয়ে ‘ভুলো না

আমায়’ বা ‘যাও পাখি বলো তারে, সে যেন

ভোলে না মোরে’—এই টাইপের কথা লিখত।

সন্ধ্যাবেলায় কুপি বা হারিকেনের আলোয়

বাচ্চারা মাথা দুলিয়ে পড়ত, ‘রাখাল গরুর পাল

লয়ে যায় মাঠে...।’ পড়তে পড়তে গলা শুকিয়ে

গেলে মাটির কলস থেকে পান করত ঠান্ডা

পানি। বাড়ির উঠোনে বসত গল্প বা পুঁথিপাঠের

আসর। লাইলি-মজনুর দুঃখে দুঃখিত হয়ে

গ্লিসারিন ছাড়াই সবার চোখে চলে আসত পানি।

আহ! কী আবেগ, কী তীব্র ভালোবাসা! কিন্তু

হায়, সেই দিন কি আর আছে? আমরা আমাদের

ঐতিহ্য, শেকড়ের টান উপেক্ষা করেছি। পদ্মা-

মেঘনার উত্তাল স্রোতে গা না ভাসিয়ে গা

ভাসিয়েছি বিদেশি সংস্কৃতির ভয়াল স্রোতে।

কোথাকার কোন এডিসনের কথামতো ঘরে

নিয়ে এসেছি বিদ্যুৎ নামের অভিশাপ। এই

বিদ্যুৎ আমাদের সব ঐতিহ্য শেষ করে দিচ্ছে।

সেই স্নেহ (চর্বি নয়) মাথা হাতপাখা,

হারিকেনের জায়গা কেড়ে নিয়েছে বৈদ্যুতিক

বাতি, ফ্যান। ফলে দিন দিন আমরা আরও

অলস হয়ে যাচ্ছি। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করলে ব্যায়াম হতো, হারিকেনের তেল শেষ হয়ে গেলে বাজার থেকে তেল আনতে গিয়ে আরও ভালো ব্যায়াম হতো। এখন কিছুই হয় না। সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলে, মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে। ফলে আমাদের কায়িক পরিশ্রমও হচ্ছে না। কী ভয়ংকর সমস্যা! এত বড় সমস্যা হবে আর আমাদের সরকার কিম্বা মেরে বসে থাকবে, তা তো হয় না। জনগণের দুঃখ লাথি মেরে সরিয়ে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। আর তাই এই সব হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তারা লোডশেডিংয়ের মতো চমৎকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরপর ওই অভিশপ্ত বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে সরকার সবাইকে হাতপাখা, হারিকেন, মোমবাতির যুগে ফিরিয়ে নিচ্ছে। চমৎকার উদ্যোগ। কিন্তু একটি চক্রান্তকারী মহল সরকারের এই কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে বাধা দিচ্ছে। তবে এসব কোনো ব্যাপার নয়, ভালো কাজে বাধা আসবেই। আশা করি, সরকার সব বাধা ডিঙিয়ে আমাদের সেই কাক্ষিত সময়টি ফিরিয়ে দেবে। সেই দিন বেশি দূরে নয়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

457) আমার ছেলেমেয়ে ও স্কুল - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

যারা আমাকে পছন্দ করে তারা অনেকেই দেখি ‘দেশপ্রেম’ ‘দেশের জন্য ভালোবাসা’—এ রকম বড় বড় জিনিস দিয়ে আমার দেশে ফিরে আসার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আসলে ব্যাপারটা মোটেও সে রকম নয়। যত দিন বিদেশে ছিলাম তখন—আকাশ কালো করে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ঘ্যাঁঘো ঘ্যাঁঘো করে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে—এ রকম একটা দৃশ্যের জন্য আমার সমস্ত শরীর আকুলি-বিকুলি করত। মাঝে মাঝে মনে হতো এই মুহূর্তে যদি দেশে ফিরে গিয়ে সেই আকাশ কালো করা মেঘ, ঝমঝম বৃষ্টি আর ব্যাঙের ডাক না শুনি তাহলে বুঝি আমার শরীরে খিঁচুনি গুরু হয়ে যাবে, আমি দম বন্ধ হয়ে মরেই যাব। কাজেই একদিন বাক্সপেটরা বেঁধে দেশে চলে এসেছি। অবশ্য আমি আসতে পেরেছি কারণ আমার স্ত্রীও আসতে চেয়েছে। আমাদের দেশে মেয়েদের নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, কাজেই

একজন মেয়ে যখন ইউরোপ কিংবা আমেরিকার মতো দেশে যায়, হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করে সেখানে তারা স্বাধীন একটা মানুষের মতো থাকতে পারে, তখন তারা আর দেশে ফিরে আসতে চায় না। কিন্তু আমার স্ত্রী আসতে আপত্তি করেনি। তাই একদিন আমরা বাক্সপেটরা বেঁধে দেশে চলে আসতে পেরেছি। আমার মতো আরও অনেকেই আসতে চায়, কিন্তু সবাই আসতে পারে না।

আমার স্ত্রী আর আমি নিজের দেশে ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু আমার ছেলে আর মেয়ে কিন্তু এসেছিল বিদেশে। তাদের জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়, বড় হয়েছে সেখানে, বন্ধুবান্ধব সেখানে; কাজেই বাংলাদেশটি তাদের জন্য ছিল বিদেশ। প্রথম প্রথম অভ্যস্ত হতে তাদের খুব কষ্ট করতে হয়েছে; সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল স্কুলগুলো। তারা আমেরিকাতে যেসব স্কুলে পড়ে এসেছে সেখানে বাচ্চারা যেন আনন্দে থাকতে পারে তার জন্য স্কুলের শিক্ষক-কর্মকর্তা সবাই জান দিয়ে চেষ্টা করেন। এখানে এসে তারা আবিষ্কার করল, স্কুলে শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বেত দিয়ে মারে—নিজের চোখে দেখেও তাদের বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়েছে। আমার খুব ভয় ছিল যে কোনো দিন শিক্ষকেরা আমার ছেলে কিংবা মেয়েকে মেরে বসবে—সে জন্য দুজনকেই আমি একটা চিঠি লিখে খামে ভরে দিয়েছিলাম। তাদের বলে দিয়েছিলাম, যদি কখনো কোনো শিক্ষক তাদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের হাতে এই চিঠিটা দিয়ে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে স্কুলের গেটের বাইরে চলে আসবে। চিঠিতে আমি লিখে দিয়েছিলাম, ‘আপনারা যেহেতু আমার সন্তানের গায়ে হাত দিতে উদ্যত হয়েছেন, সে জন্য এই মুহূর্তে আমি তাকে আপনাদের স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সে আর আপনাদের স্কুলের ছাত্র না। তার গায়ে আপনারা আর হাত দিতে পারবেন না।’

আমার ছেলে আর মেয়ে অনেক দিন পর আমাদের জানিয়েছিল যে তারা যত দিন ওই ভয়ংকর স্কুলগুলোতে ছিল, তত দিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছে শিক্ষকদের কোনো না কোনোভাবে রাগিয়ে দিতে, যেন তারা গায়ে হাত তোলার

চেপ্টা করে, তাহলেই তারা শিক্ষকদের হাতে ওই চিঠিগুলো দিয়ে বের হয়ে আসতে পারবে। আর কোনো দিন তাহলে স্কুলে যেতে হবে না। কী মজা হবে তখন!

শিক্ষকেরা ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনুমান করেছিলেন, তাঁরা অন্য ছাত্রদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিলেও কোনো দিন আমার ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তোলার চেপ্টা করেননি। [লেখাটি লেখকের তোমাদের প্রশ্ন আমার উত্তর বই থেকে সংগৃহীত]

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

458) কর্মসূচির বার্তা

লাউড স্পিকার ব্যবহারে অনুমতি না পাওয়ায় সম্প্রতি নেতাদের দেখা গেছে কর্মসূচির কথা জানাতে তাঁরা লিফলেট বিলি করছেন জনগণের মাঝে। লিফলেট বিলি ছাড়া আরও যেসব মাধ্যমে তাঁরা কর্মসূচির বার্তা পৌঁছাতে পারতেন তা-ই জানাচ্ছেন আইনুন নাহিনডিশ ব্যবসায়ী মাধ্যম

ডিশ সংযোগ নেই, এমন বাসা ঢাকা শহরে খুব কমই পাওয়া যাবে। তাই নেতারা টিভির মাধ্যমে তাঁদের কর্মসূচির কথা জানাতে পারতেন। তবে এতে ডিশ ব্যবসায়ীর সরকারপক্ষের সাপোর্টারদের কাছ থেকে কিল-ঘুষি খাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। না হয় নেতাদের জন্য কিল-ঘুষি খেত, তাতে কী, কর্মসূচির প্রচার তো হতো। ভিক্ষুক মাধ্যম

নেতারা ভিক্ষুকদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারতেন। এতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষুকেরা নেতাদের কর্মসূচির কথা জানিয়ে দিত আমজনতাকে।

তবে সে জন্য ভিক্ষুকদের আগে প্রশিক্ষণ দিতে হতো, যে বাড়িতে যাবে কৌশলে বুঝতে হবে সে বাড়ির লোক বিরোধী পক্ষের কি না। যদি সরকারপক্ষের হয় তবে ভিক্ষুকেরও মার খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নায়িকা মাধ্যম

সিনেমার নায়িকারা দেখবেন, বাঁচাও বলে চিৎকার দিলে নায়ক বাবাজি মাটির নিচে থাকলেও হঠাৎ এসে গুন্ডাদের হাত-পা ভেঙে তারপর ছাড়ে। এতে পরিষ্কার, নায়িকাদের গলার আওয়াজ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। তাই নেতারা নায়িকাদের ভাড়া করে বিল্ডিংয়ের ছাদে তুলে দিলে তারা কর্মসূচির কথা চিৎকার দিয়ে জানিয়ে দিতে

পারত। পাখি মাধ্যম

মনপুরা সিনেমার মতো কিংবা টিয়া পাখি অথবা কবুতর দিয়ে নেতারা তাদের কর্মসূচির কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারতেন। তবে অতীতে কবুতরের পাখনায় বেঁধে প্রেমের বার্তা পৌঁছালেও বর্তমানে কবুতর পাঠানোটা রিস্ক। কারণ, যে কেউই কবুতর জবাই করে খাবে। টিয়া পাখিটাই নিরাপদ। বারান্দায় বসে কর্মসূচির কথা জানিয়ে দেবে। মুঠোফোন মাধ্যম নেতারা মোবাইলফোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে পারতেন। তাঁদের কর্মসূচির কথা এসএমএস আকারে লিখে সবার মুঠোফোনে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। এতে কষ্ট করে তাঁদের লিফলেট বিলি করতে হতো না। সবজি ব্যবসায়ী মাধ্যম

ঢাকার অলিগলিতে প্রতিদিন সকালে দেখা যায় ভ্যানগাড়ি নিয়ে অনেকে শাকসবজি বিক্রি করে। তাদের মাধ্যমেও নেতারা কর্মসূচির কথা পৌঁছাতে পারতেন। তাদের ভ্যানগাড়িতে কয়েকটা লিফলেট লাগিয়ে দিলেই প্রতিটি মহল্লায় প্রচার হয়ে যেত। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

459) একটি সমস্যায় নানা জনের নানা সমাধান

খোলা জানালা বা এই জাতীয় কোনো শিরোনামের কলামে আমরা অনেক সময় আমাদের সমস্যা লিখে সমাধান জানতে চাই। কিন্তু কোনো কারণে ভুল করে যদি সমস্যাটি অন্য কারও কাছে চলে যায়, তখন তার কাছ থেকে কী কী সমাধান আসবে? ভেবেছেন মহিউদ্দিন কাউসার সমস্যা:

আমার বয়স ৩০, ব্যক্তিগত জীবনে আমি এক সন্তানের মা। একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করি। স্বামী- সন্তান নিয়ে সুখেই দিন যাচ্ছিল। সেদিন ছিল সোমবার। সকালে ঘুম থেকে সাইন আউট করে দেখি, বাইরে রীতিমতো ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। শেষ রাতে যে কারেন্ট গিয়েছিল সেটা তখনো আসেনি। ঘুম থেকে উঠে নাশতা তৈরি করতে গেলাম, গ্যাস নেই। মেজাজ প্রচণ্ড হট হয়ে গেল। স্বামী-সন্তানকে জাগালাম। বাইরে থেকে নাশতা আনিয়ে সবাই মিলে আধা অন্ধকারেই উদরস্থ করলাম। তারপর রেডি হয়ে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালাম। স্বামীকে তাড়াতাড়ি

অফিসে যেতে বলে আমিও গাড়ি নিয়ে অফিসের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় পানি জমে একাকার। ঘেমে গিয়ে আমারও ঠান্ডা লেগেছে। কিছুক্ষণ পর গাড়ির ইঞ্জিনে পানি ঢুকে পড়ায় সেও আমার মতো কাশতে কাশতে থেমে গেল। মেজাজ বিগড়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ আর অফিসে যাব না। হেঁটে বাসায় রওনা হলাম। ফিরে যা দেখলাম তাতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি যার সঙ্গে এত দিন বিশ্বাস করে সংসার করলাম, যার সঙ্গে প্রতিদিনই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার অভিনয় করলাম, সে-ই কিনা আমার বিশ্বাস ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল? এখন আমি কী করব?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ভাঙ্গারহাট, সাটুরিয়া।সমাধান

বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

ঘটনার দিন রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না, এটা নতুন কোনো কথা না যে লিখে পাঠাতে হবে। লোডশেডিংয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিন, দেখবেন জীবনে সুখ ব্যাপারটা সহজলভ্য হয়ে পড়বে।

গাড়ি মেকানিকের কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

সম্ভবত আপনার গাড়ির ইঞ্জিনে পানি অবৈধভাবে এন্টার করে ফেলেছে। রাস্তার পানিতে জীবাণুও বেশি ছিল, কে জানে ইঞ্জিনের নজেলে ভাইরাস অ্যাটাক করেছে কি না! যা-ই হোক, আজই কোনো ভালো দেখে একজন গাড়ি মেকানিককে দেখিয়ে গাড়িটির চিকিৎসা করান। না হয় ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।

সিনেমার নায়িকার কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

চিত্রনাট্যটি পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আমার চরিত্র কোনটি সেটা তো বলেননি। তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু চরিত্রের প্রয়োজনে খোলামেলা হতে রাজি আছি। ভালো থাকবেন।

চিকিৎসকের কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

বলেন কি, ঠান্ডা লেগে আপনার কাশি হয়েছে? আজই আপনি তিনটা মাথার আর দুইটা পেটের এক্স-রে, তিনটা ব্লাড টেস্ট আর চারটা ইউরিন টেস্ট করান। এম্ফুনি ‘রসালো চিকিৎসা’ কেন্দ্রে এক ছালা টাকা নিয়ে চলে যান। তবেই আপনার সমস্যার সব সমাধান হয়ে যাবে। বসে আছেন কেন? যান যান!

আবহাওয়া অফিসে চিঠিটি পৌঁছালে—

আমাদের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী অবশ্য সেদিন কড়া রোদ থাকার কথা ছিল। কিন্তু কেন যে বজ্রসহ ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়ে গেল সেটি আমাদের বোধগম্য হয়নি। যা-ই হোক, আপনি বলেছেন আপনার স্বামীকে যখন অন্য মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করতে দেখলেন তখন নাকি আপনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু স্যাটেলাইটে ধারণকৃত চিত্র পর্যবেক্ষণ করে আমরা দেশের কোথাও আকাশ ভেঙে পড়ার প্রমাণ পাইনি। আমাদের মনে হচ্ছে আপনার হ্যালুসিনেশন হয়েছে। আপনার উচিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানো।

আইনজীবীর কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

আপনার জন্য আছে অনেকগুলো মামলার সুযোগ। তবে তার আগে বাথ সার্টিফিকেট দেখে আপনার বয়সের সত্যতাটা যাচাই করতে হবে। আপনি চাইলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার অবহেলা আইনে মামলা করতে পারেন। মামলা করতে পারেন আবহাওয়া অফিসের বিরুদ্ধে ভুল পূর্বাভাসের জন্য, আরও অনেক মামলার সুযোগ আমি তৈরি করে দেব, আগে নিচের ঠিকানায় অগ্রিম ফিটা পাঠিয়ে দিন।

অফিসের বসের কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

সামান্য ঝড়-বৃষ্টি, জ্বর, কাশি, গাড়ি নষ্ট, রাস্তায় পানি জমা—এসব কারণেও তাহলে আপনি অফিস ফাঁকি দেন। এই সব ঠিক না। আর কখনো যেন এমনটি না হয়। অফিসে এলে কি আপনি আপনার স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করতে দেখতেন? অফিস ফাঁকি দিলে তো এভাবেই সংসারে আগুন লাগবে, তাই না? রস+আলোর সম্পাদকের কাছে চিঠিটি পৌঁছালে—

দিনটি সোমবার ছিল, ঘুম থেকে উঠে হাবিজাবি কত কিছুই না করলেন, অথচ ‘রস+আলো’টাই পড়লেন না। ঠিকমতো রস+আলো পড়লে হয়তো এই সমস্যাটা অঙ্কুরেই ডিলিট হয়ে যেত। সে যত কথাই হোক না কেন, সোমবার সকালটা রস+আলো দিয়েই শুরু করুন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

460) চুক্তিপত্রের রকমফের

সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাকে বিরোধীদলীয় নেত্রী ‘গোলামি চুক্তি’ হিসেবে নামকরণ করেছেন।

এমন আরও অনেক প্রকার চুক্তি তো হতেই পারে। আসুন, দেখা যাক সেই চুক্তিপত্রগুলো কেমন হতে পারে। ভেবেছেন মহিউদ্দিন

কাউসারগোলামি চুক্তি

বিষয়: কোটি টাকার ঋণচুক্তি

স্বাক্ষরকারী: বাংলাদেশ ও ভারত

মতৈক্য: চুক্তিতে যা-ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত ভারত যা চাইবে তা-ই হবে। টেক্কা চুক্তি

বিষয়: টেন্ডার আর দখলে অন্য গ্রুপকে টেক্কা দেওয়ার চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ

মতৈক্য: তাদের মধ্যে মতের মিল অসম্ভব ও অলীক কল্পনা মাত্র। রাজকীয় চুক্তি

বিষয়: রাজার যা খুশি তা-ই করার অধিকার

স্বাক্ষরকারী: রাজা এবং তাদের সভাসদ

মতৈক্য: প্রজাকে শোষণের ক্ষেত্রে সবাই

ঐক্যবদ্ধ থাকবে। হরতনীয় চুক্তি

বিষয়: হরতাল নিয়ে ছিনিমিনি চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: সব রাজনৈতিক দল

মতৈক্য: ক্ষমতায় গেলে হরতালের বিরোধিতা এবং ক্ষমতা হারালে হরতালে লগ-ইন করার

ব্যাপারে মতের মিল থাকবেই। বিবি চুক্তি

বিষয়: বি গ্রেডধারীর সংবর্ধনা আদায় চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: দুজন বি গ্রেডধারী

মতৈক্য: গোল্ডেন এ+ এর জোয়ারের যুগে ‘বি’

পাওয়াটা বিশাল অর্জন এবং তারাও বিশেষ

সংবর্ধনার দাবিদার। এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জোকারীয় চুক্তি

বিষয়: রস করার চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: রস+আলোর বি.স. ও আইডিয়াবাজ

মতৈক্য: যা-ই হোক, পাঠককে কাঁদিয়ে বুকে

সুনামি চাইতে হবে। রুইতনীয় চুক্তি

বিষয়: রুই মাছ ব্যবহার করা চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: রুই ও কাতলা শ্রেণীর মানুষ

মতৈক্য: ঘুষ হিসেবে রুই মাছ বিনিময়ে কারও

মধ্যে মতের অনৈক্য থাকবে না। সাহেবি চুক্তি

বিষয়: সাহেবিত্ব সংরক্ষণ চুক্তি

স্বাক্ষরকারী: গার্মেন্টসের মালিক ও কর্মচারী

মতৈক্য: বেতন যতই কম দেওয়া হোক কিংবা

না-ই দেওয়া হোক, কর্মচারীরা সব সময়ই মালিককে মানবে এবং 'সাহেব' 'সাহেব' বলে সম্বোধন করবে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

461) বিরোধী দলে গেলে যা যা বলবেনই

শুধু টিয়া পাখি নয়, আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও কিছু বুলি আছে। যখন যার যেখানে অবস্থান, সেই অবস্থান থেকে কিছু মুখস্থ বুলি আওড়ান তাঁরা। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেত্রী গোলামি সংশ্লিষ্ট একটি বাণী দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আরও যা বলতে পারতেন তা কোনো ধরনের গবেষণা ছাড়াই বের করেছে রস+আলোসরকার আবার গোলামি চুক্তি করেছে ভারতের সঙ্গে।

☆ জনগণের কথা মাথায় রেখেই হরতাল দিচ্ছি। জনগণ এখন এই হরতাল চায়।

☆ সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি ব্যর্থ। ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎব্যবস্থা আগের চেয়ে এক বিন্দুও উন্নত করতে পারেনি সরকার।

☆ দেশের জনগণ আজ অতিষ্ঠ। তারা মধ্যবর্তী নির্বাচন চায়। ☆ পাঁচ বছর অনেক লম্বা সময়, পাঁচ বছর জনগণকে এভাবে দুঃশাসকের হাতে তুলে দিতে পারি না। এ দেশের জনগণের ভাগ্যটা আসলেই খারাপ, দুঃশাসন কখনো তাদের পিছু ছাড়ে না।

☆ সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, না খেয়ে মারা যাচ্ছে দেশের মানুষ।

☆ সংসদে কেন যাব, সংসদে যাওয়ার কোনো পরিবেশ আছে? সংসদে কি জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলা যায়? জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলতে হবে রাজপথে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। গত পাঁচ বছর তো ওরা তা-ই করল।

☆ সরকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ২০ বছর ধরে এ দেশের আইনশৃঙ্খলা সব সময় খারাপের দিকেই গেছে।

☆ বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উচিত। এ দুটো প্রতিষ্ঠান জন্মের পর থেকেই শুধু সরকারের চামচামি করে আসছে।

☆ উন্নয়নের নামে সরকার শুধু নিজেদের উন্নয়নই করেছে। এটা নতুন নয়, অতীতেও তা-ই হয়েছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

462) স্কুল-কলেজে আরও যা যা নিষিদ্ধ করা যেত

সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি আর কী কী নিষিদ্ধ করলে আমরা উপকৃত হতাম? চলুন দেখা যাক। লিখেছেন আলিয়া রিফাত প্রাইভেট পড়া
উফ! এরই নাম গোদের ওপর বিষফোঁড়া। অনেক শিক্ষকই ক্লাসে হাতটি নেড়ে চকটি না তুললেও প্রাইভেট পড়িয়ে হয়ে ওঠেন দেশসেরা সুপারস্টার। পোলাপান ক্লাস শেষে কোথায় বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমোবে, তা না, সবাই ছুটছে প্রাইভেট পড়তে। স্কুলে ক্লাসটিচারের কাছে, কলেজে প্র্যাকটিক্যাল স্যারের কাছে, কখনো কখনো ভার্টিসিটিতে উঠেও ক্লাস ধরতে না পেরে সিনিয়র ভাইয়া বা আপুদের কাছে প্রাইভেট পড়ো। এখন অবস্থা এমন যে নিজেরা শিক্ষক হওয়ার পরও প্রাইভেট পড়লে আমাদের ভালো হয়। তাই শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে ‘প্রাইভেট’ নামক এই ভাইরাসটিকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যেত। সংবর্ধনা

এটি গত এক দশকের অন্যতম ট্রেন্ড। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে আসছেন ডিগ্রি নিয়ে। ইচ্ছিপচ্ছি স্কুলছাত্ররা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল পতাকা হাতে। বোকা পিচ্চিটা ভাবে, প্রধানমন্ত্রী আসবেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলবেন, বাবু, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তোমার খিদে পায়নি? এই নাও চিকেন বার্গার। খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও। কিন্তু একি! উনি যে পুটুস করে কোন সময় গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন কেউ তো ভালোমতো দেখতেই পেল না! শুধু কি প্রধানমন্ত্রী? মন্ত্রী, সাংসদ যার পদধূলিই এলাকায় পড়ুক না কেন, ক্লাস ফেলে সব স্কুলের সবাই নামল পথে। ফলাফল: কেউ মাথা ঘুরে চিৎপটাং, কারও ক্রনিক হাঁটুতে ব্যথা, কারও ডিহাইড্রেশন। মাননীয় হর্তাকর্তাগণ, দয়া করে আমাদের স্কুলের এলাকায় আপনাদের আর আসার দরকার নেই। আমরা আমাদের হালহকিকত আপনাদের ই-মেইল করব। কেউ কোনো পুরস্কার পেলেও ই-কার্ড পাঠিয়ে অভিনন্দন জানাব। প্রমিজ! গাইড বই বিজ্ঞান বইতে আমরা পড়েছি, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে অভিযোজন বলে। গাইড বই নামক প্রজাতির

অভিযোজনক্ষমতা অসাধারণ! তাই তো সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাজারে বেরিয়েছে ‘সৃজনশীল পদ্ধতির গাইড’। অনেক শিক্ষকই প্রশ্ন বানিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতার অপচয় না করে বেছে নিচ্ছেন এসব গাইড। কে নিজের গাইডটি সবার আগে স্যারকে এগিয়ে দেবে এ নিয়ে চলে ছাত্রছাত্রীদের চুলোচুলি। তাই সরকার নিজ উদ্যোগে দেশের সব গাইড বই উইপোকাদের খাইয়ে দিতে পারত। বইয়ের বোঝা শিক্ষাই নাকি জাতির মেরুদণ্ড। অথচ ডায়াপার ছাড়তে না-ছাড়তেই চার-পাঁচ কিলো বইয়ের বোঝা বইতে বইতে আমাদের পিঠ কুঁজো হওয়ার দশা। তাই বেটার হতো আমাদের স্কুলের বইগুলো যদি আমরা স্কুলেই সব সময় রেখে দিতে পারতাম। আমাদের পিঠের স্বাস্থ্যও ভালো থাকত, প্লাস আমরা আরামসে বাড়িতে বসে ফেসবুকিং, ব্রাউজিং, চ্যাটিং ইত্যাদি করতে পারতাম। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

463) বেত-বাতেন স্যার - আহমান হাবীব

স্যারের নাম আবদুল বাতেন। তবে সবাই আড়ালে ডাকে ‘বেত-বাতেন’। কারণ স্যারের হাতে সব সময় একটা বেত থাকে। বেত মারায় তাঁর জুড়ি নেই। ছাত্ররা যমের মতো ভয় পায় এই বেত-বাতেন স্যারকে। সেই যমদূতের মতো বাতেন স্যার আজ সকালে বাসায় পেপারটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন! এর মানে কী? সরকার আইন করেছে, এখন থেকে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে মারলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কোনো মানে আছে? আরে একটা সময় ছিল ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ...! সেই যুগ আর নেই। এখন হচ্ছে ছাত্রনং মারনং তপঃ...! এটা অবশ্য বেত-বাতেন স্যারের নিজস্ব দর্শন। কিন্তু তাই বলে আইন করে তাঁর বেত মারা বন্ধ? তাহলে বেয়াড়া ছাত্ররা শিখবে কীভাবে? বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বেত-বাতেন স্যারের রক্তচাপ বেড়ে যায় যেন। তার পরও তিনি বহু বছরের অভ্যাসের কারণেই হাতে বেত নিয়ে স্কুলের দিকে রওনা হলেন। আরে কত রকমের আইনই তো হয় এই দেশে...! এই তো, প্রকাশ্যে ধূমপানের ওপর আইন হয়েছে... কে মানে? রাস্তাঘাটে সমানে সবাই সিগারেট টানে!

বেত নিয়েই সরাসরি ক্লাসে ঢুকলেন বেত-
বাতেন স্যার। তিনি ক্লাস টেনের শ্রেণীশিক্ষক,
বিজ্ঞান পড়ান। আজ এনেছেন বড় বেতটা। বড়
ক্লাসে সাধারণত বড় বেতটাই নিয়ে আসেন।
সাধারণ বেত না, সিলেট থেকে আনানো ‘মুতরা
বেত’! সিলেটের বিয়ানীবাজার এলাকায় কোথাও
কোথাও পুকুরের আশপাশে এই বেত হয়।
চিকন বলে এর শীতলপাটি দেশবিখ্যাত। বেত-
বাতেন স্যার তাঁর এক ভায়রাকে দিয়ে বছরে
দুইবার এই বেত আনান সিলেট থেকে। প্রতি
শুক্রবারে তিনি নিজ হাতে এই বেতে সরষের
তেল দিয়ে রোদে দেন।
‘স্যার, হেড স্যার সালাম দিচ্ছে।’ পিয়ন বলে।
ক্লাসে ঢুকতে যাবেন এ সময় বাধা। ভেতরে
ভেতরে বিরক্ত হলেন বেত-বাতেন স্যার। তিনি
এই স্কুলের সবচেয়ে প্রবীণ শিক্ষক। তার ওপর
স্কুলের সেক্রেটারি তাঁর আপন ভাগ্নে! আর
তাঁকেই যখন-তখন এই তরুণ হেড মাস্টার
সালাম দেন! এটা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি কড়া
গলায় বললেন, ‘যেয়ে বলো, ক্লাসের পরে যাব।’
ক্লাসে ঢুকে একটা ধাক্কা খেলেন বেত-বাতেন
স্যার! তাঁর টেবিলের ওপর সেই পেপারটা,
যেখানে বক্স নিউজ— ‘শিক্ষার্থীদের মারলে
কঠিন সাজা’—খবরটা কেউ আবার লাল
কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছে। তিনি বসতে
বসতে ছাত্রদের দিকে তাকালেন কঠিন দৃষ্টিতে।
কিন্তু তাঁর মনে হলো, সবার মুখে যেন মিটিমিটি
হাসি, আগের সেই ভয় মাখানো চেহারাগুলো
নেই! তিনি পেপারটা সরিয়ে বেতটা রাখলেন।
রোল-কলের খাতা বের করে খুলতে যাবেন,
টের পেলেন, ছেলেরা সব ফিসফাস কথাবার্তা
শুরু করেছে। কেউ কেউ চাপাস্বরে হাসছে! কত
বড় সাহস! তাঁর ক্লাসে হাসি? তিনি বেত দিয়ে
টেবিলের ওপর চটাস করে বাড়ি দিয়ে হুংকার
ছাড়লেন, ‘একদম চুপ! টু শব্দটি করা যাবে না!’
সবাই চুপ করে গেল, কিন্তু হঠাৎ কে যেন
চৈঁচিয়ে উঠল, ‘থ্রি...!’
‘এই, কে? কে চৈঁচাল?’
‘স্যার, ওই যে আপনি বললেন, টু শব্দ করা
যাবে না...তাই থ্রি বললাম।’
বেত-বাতেন স্যার হতভম্ব হয়ে দেখেন, সবচেয়ে
বেশি মেরে যাকে সুখ পেতেন তিনি, সেই
মোটাসোটা গোলগাল মুকিত দাঁড়িয়ে! সে-ই

বলেছে। মুখটা হাসি-হাসি! এত সাহস! তিনি ডান হাতে শক্ত করে বেতটা নিয়ে উঠতে যাবেন মুকিতকে শায়েস্তা করতে, এ সময় আবার হেড সারের পিয়ন দরজায়, ‘স্যার, হেড স্যার বলছে জরুরি!’

বেত-বাতেন স্যারের ইচ্ছে হলো বেতটা উঠিয়ে আগে ঘা কতক পিয়নটাকে মারেন। কত বড় সাহস! বলেছেন, ক্লাসের পর যাচ্ছেন। তার পরও...!

কী মনে করে বেত-বাতেন স্যার রোল কল না করেই বেতটা ক্লাসে রেখে গেলেন হেড স্যারের রুমে।

হেড স্যার গম্ভীর মুখে বসে আছেন। বয়সে তরুণ হলেও ব্যক্তিত্ব আছে লোকটার। তাই বলে বেত-বাতেন স্যারের সঙ্গে...!

‘স্যার, বসেন।’ গম্ভীর গলায় বললেন হেড স্যার।

‘কী ব্যাপার?’

‘ব্যাপার সামান্যই। আজকের পেপার দেখেছেন বোধ হয়?’

‘দেখেছি।’

‘তার পরও ক্লাসে বেত নিয়ে ঢোকাটা আপনার ঠিক হয়নি। অনেক গার্জেন বিষয়টা আমার নজরে এনেছেন।’

মাথায় রক্ত উঠে যায় বেত-বাতেন স্যারের।

‘কোন কোন গার্জেন, নাম বলুন তো দেখি?’

‘মানে? আপনি তাদেরও শাসন করবেন নাকি?’

ভ্রু কুঁচকে গেছে হেড স্যারের, ‘দেখুন, বাতেন-স্যার, আপনি স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক বলে এত দিন কিছু বলিনি। কিন্তু আপনার আচার-আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়। এই স্কুলে আপনার হাতে আমি আর কখনো বেত দেখতে চাই না... যান, ক্লাসে যান।’

ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলেন বেত-বাতেন স্যার।

অনেকটা টলতে টলতে ক্লাসে ফিরে এলেন বেত-বাতেন স্যার। চেয়ারে বসে দেখেন, পেপারের ওপর রেখে যাওয়া বেতটা কেউ ভেঙে রেখেছে। অনেকটা ভি অক্ষরের মতো হয়ে আছে বেতটা। ভিক্টোরি? ছাত্রদের বিজয়? ছাত্রা অবশ্য সব চুপ। হঠাৎ ভেতরে ভেতরে দুর্বল বোধ করেন বেত-বাতেন স্যার। রক্তচাপটা বাড়ল নাকি? আজ ক্লাসে বায়ুচাপ পড়ানোর

কথা ছিল, কিন্তু চারদিকে অন্যান্য চাপ
যেভাবে... আর ভাবতে পারেন না। কোনোমতে
রোল কলটা করে ক্লাস না নিয়ে ভাঙা বেত আর
খাতাপত্র রেখেই বের হয়ে গেলেন তিনি। বের
হওয়া মাত্র ক্লাসের ভেতর একটা হুল্লোড় উঠল।
কে একজন চৈঁচিয়ে উঠল, ‘বেশ! বেশ! বেত-
বাতেনের দিন শেষ!’

গেটের কাছে এক গার্জেনের সঙ্গে দেখা হলো।
এই গার্জেন বেত-বাতেন স্যারকে দেখলেই
বলতেন, ‘স্যার, হাড়ি আমার, চামড়া আপনার!
পোলাডারে মানুষ কইরা দিয়েন।’ আজ অবশ্য
তঁাকে সালাম তো দূরে কথা, মনে হলো
চিনতেই পারলেন না! সত্যি, কত গরু-গাধা
পিটিয়ে মানুষ করেছেন বেত-বাতেন স্যার! আর
এখন! ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই মানুষ না
হওয়া তাঁর এক ছাত্রের বেমক্লা ধাক্কায় আছড়ে
পড়লেন ফুটপাথে। বেওয়ারিশ গরুটা আরও দু-
একজনকে ধাক্কা-গুঁতো দিয়ে এগিয়ে গেল
সামনের দিকে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
আগস্ট ১৬, ২০১০

464) পুস্তকপাঠ - ন. স্থানিস্বাস্তিক

মেট্রোয় বসে বই পড়ছে পরিচিত এক
লেখক। থেকে থেকেই কপাল কোঁচকাচ্ছে, হেসে
উঠছে হো হো করে, কপাল চাপড়াচ্ছে,
কপালের পাশে তর্জনী ঠেকিয়ে এদিক-ওদিক
ঘুরিয়ে ‘পাগল নাকি’-র সংকেত দিচ্ছে, মাথা
দোলাচ্ছে দু পাশে, চোখ কপালে তুলছে,
গজগজ করে বলছে কী সব, তারপর কী যেন
ভাবছে অনেক সময় ধরে... পড়তে পড়তে সে
এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ল যে স্থান-কাল ভুলে
মাঝেমধ্যে জোরেশোরেই প্রকাশ করতে লাগল
পাঠ-প্রতিক্রিয়া:

—বললেই হলো!

—তাই নাকি!

—দারুণ তো!

—হতেই পারে না!

—পারেও বটে!

—বোঝো ঠালা!

—কক্ষনো মাথায় আসত না!

—অবাক কাণ্ড তো! ভারি কৌতূহল হলো আমার।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম বইয়ের
নাম দেখার জন্য।

বইটা ছিল ‘বানান অভিধান’। সূত্রঃ দৈনিক
প্রথম আলো, আগস্ট ১৬, ২০১০

465) কোথায় গেল গ্যাস?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েক দিন আগে
প্রশ্নের সুরে বলেছেন, আগে শুনতাম দেশ
গ্যাসের ওপর ভাসছে, সেই গ্যাস গেল কোথায়?
আসলেই তো। গ্যাস কোথায় গেল। গ্যাসের এই
চলে যাওয়ায় সিএনজি স্টেশনগুলোও নির্দিষ্ট
সময়ের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।
বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত রিপোর্ট পেশ
করছেন আইনুন নাহিন, আঁকা রকিবুল
হাসানরিপোর্ট-১

৪ আগস্ট স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই হয়তো
ছাত্রছাত্রীদের তালে তালে গ্যাসও তার মামার
বাড়ি বেড়াতে চলে গেছে। এমন হলে কিন্তু
ঈদের পর ছাড়া আমাদের আবার গ্যাস পাওয়ার
সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া গ্যাসের মামার
বাড়ি কোথায়, সেটাও যেহেতু আমরা জানি না,
তাই মামার বাড়ি খোঁজার জন্যও একটি তদন্ত
কমিটি গঠন করা লাগতে পারে। রিপোর্ট-২
বর্তমানে ইফতারিতে প্রচুর ভোজ্যতেল ভোজন
করা হচ্ছে, এতে কারও কোনো সন্দেহ নেই।
তাই হয়তো তেলের সঙ্গে দেশের যাবতীয় গ্যাস
মানুষের পেটে জমে যাচ্ছে। এমন হয়ে থাকলে
সবাইকে জরুরি ভিত্তিতে গ্যাসট্রিকের ট্যাবলেট
খেতে হবে প্রতিদিন। তা না হলে আমাদের
জাতীয় সম্পদ গ্যাসকে ফিরে পাওয়া কঠিন হয়ে
পড়বে। তাই আসুন, আমরা পেটে যাওয়া গ্যাস
ফিরিয়ে আনি। রিপোর্ট-৩

কখনো চুলায়, কখনো সিএনজি স্টেশনে
থাকতে থাকতে গ্যাসের জীবনটা হাঁপিয়ে
উঠেছে, তাই গ্যাস ভ্রমণ করতে সিঙ্গাপুর কিংবা
থাইল্যান্ডে অবস্থান করছে। কুখ্যাত তালিকাভুক্ত
সন্ত্রাসীদের বিদেশ যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা
রয়েছে, কিন্তু গ্যাসের ওপর যেহেতু কোনো
নিষেধাজ্ঞা নেই, সেহেতু গ্যাসরা যেতেই পারে।
তবে তারা কোন দেশে অবস্থান করছে, সেটা
নিশ্চিত হলেই তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার
উদ্যোগ নেওয়া হবে। রিপোর্ট-৪

লোভ-লালসা সবারই থাকতে পারে। তাই গ্যাস
হয়তো বড়লোকের কোনো সুন্দরী ললনাকে
বিয়ে করে সেখানে ঘরজামাই হয়ে থাকছে।

আমরা ছোট থেকে লালন-পালন করলেও গ্যাস এখন আমাদের ভুলে গেছে, সে এখন বড়লোকের ঘরজামাই। অতএব, গ্যাস এখন বড়লোকদের জন্য, মধ্যবিত্ত কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। গ্যাসের এ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আমাদের দুঃখই দেবে, কিন্তু গ্যাস ফিরে আসবে কি না সন্দেহ আছে। রিপোর্ট-৫

দেশে অহরহ অপহরণের ঘটনা ঘটছে। তাই গ্যাসকে হয়তো কেউ অপহরণ করেছে।

সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য হয়তো কেউ গ্যাসকে অপহরণ করেছে। তা না হলে হঠাৎ গ্যাস লাপাত্তা হবে কেন? সবচেয়ে বড় কথা হলো, গ্যাসকে যদি গুম করে ফেলা হয়, তবে আমাদের কপালে কিন্তু শনির দশা আছে। তাই গ্যাস কোথায় আছে পুলিশকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। রিপোর্ট-৬

আসলে আমরা ওঝা মারফত জানতে পারলাম, গ্যাসকে ভূতে ধরেছে। ভূত হঠাৎ গ্যাসকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সিএনজি স্টেশনে যে ছয় ঘণ্টা গ্যাস থাকে না, ওই ছয় ঘণ্টা কিন্তু গ্যাস ভূতের বাড়িতেই থাকে। ওই ভূত তাড়াতে ওঝার কত দিন সময় লাগবে, জানতে চাইলে ওঝা নির্দিষ্ট সময় জানাতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি ঝাড়ফুক দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৩, ২০১০

466) ইন্টেগ্রিটি

বৃশ্চিক

এত দিনে একখানা কথার মতো কথা শুনলাম। ইন্টেগ্রিটি রাখিতে হইবে। রাখিতেই হইবে, তাহার জন্য মাছি হইতে হাতি যাহা মারিতে হয় মারিব। কিন্তু ইন্টেগ্রিটি নষ্ট হইতে দেওয়া যাইবে না। ‘কাবো’র উড়োজাহাজকে গত সরকারের ইন্টেগ্রিটির ‘উদাহরণ’ হিসেবে উড়িতে হইবে। ইহার সঙ্গে দুর্জনেরা কিসব কমিশন-বাণিজ্য টমিশন-বাণিজ্য বলে! তাহাও ইন্টেগ্রিটির মধ্যেই তো পড়ে। আমাদের পত্রিকাগুলো একবার সরকারগুলোকে পুরাতন সরকারের ‘ইন্টেগ্রিটি’ না মানিবার জন্য দোষারোপ করে আবার ইন্টেগ্রিটি রাখিলেও গালমন্দ করে। যাইব কোথায়?

জিএম কাদের একখানা অপদার্থ। বড়ো ভ্রাতার টাকা-খাইবার পারিবারিক ইন্টেগ্রিটি না মানিয়া

সাধু সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। সে কি জানে না, কত টাকা-পয়সা খরচ করিয়া একজন এমপি হয়। তাহার পর সেই খরচ উঠাইবার সুযোগ না দিলে তো দেশের রাজনৈতিক ইন্টেলিজেন্স নষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের পুরাতন গাড়ি, বাস, ট্রাক চালাইবার ‘ইন্টেলিজেন্স’ হইতে বিমান আলাদা হয় কী করিয়া? কতবার ঢাকায় পুরান গাড়ি সরাইবার চেষ্টা করিয়া সরকার ফেল মারিল। পুরাতন বাস ট্রাক কখনো নতুন রঙে সাজিয়া, কখনো ঘাপটি মারিয়া আবারও মানুষ লইতে থাকে। ...উড়োজাহাজখানাও তো তা-ই। পুরান বলিয়াই কি উহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে? চালাইলেই উহা চলিবে, যেমন বাংলাদেশ চলিতেছে। বাসমালিকের আন্দোলনে সরকারি বিআরটিসির বাসের রুট বন্ধ হইয়া যাইতেছে। বিমানও তাহার নিজের বিমান বসাইয়া রাখিয়া কারো উড়োজাহাজ চালাইয়াছে। ইহাই তো আমাদের সরকারি সম্পদ ব্যবহারের ইন্টেলিজেন্স। আচ্ছা পুরাতন বিমান ব্যবহারে কী ক্ষতি? লাভই তো সব। দেশের বহু গুণী মানুষ কমিশন বড়লোক হইতেছে, ইহাতে তো খুশি হওয়া উচিত। তা না করিয়া সব হিংসায় জ্বলিতেছে। কী হইতে পারে পুরাতন বিমানের? বড় জোর ভাঙিয়া পড়িতে পারে? তাহাতে সমস্যা কী? লঞ্চ ডুবিয়া তো কত মানুষ মারা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় পুরো পরিবার শেষ হইয়া যায়। তাহাতে কী ক্ষতি হয়? কিছুই না। বরং জনসংখ্যা কমে। বিমান ভাঙিলেও তো তাই। কিছু জনসংখ্যা কমিবে। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তের পরিবার কিছু ক্ষতিপূরণ পাইলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইবে।

বিমান বহু পুরান প্রতিষ্ঠান। জন্মাবধি উহা কখনো লাভ করিতে পারে নাই। কর্তাদের জন্য পুরাতন বিমান ক্রয়, লাভজনক রুটে চলাচল ইত্যাকার বহুবিধ কারণে ইহা অন্যান্য সরকারি উদ্যোগের মতোই লোকসানি প্রতিষ্ঠান। ইহা আমাদের সরকারি ‘ইন্টেলিজেন্স’। জিএম কাদের ও পত্রিকাগুলি উহা যত তাড়াতাড়ি বুঝিবে ততই মঙ্গল। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৩, ২০১০

467) টেলিফোন - তারাপদ রায়

স্বর্গত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অসামান্য কৌতুকনকশা ছিলো, যেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তি জীবনে প্রথমবার টেলিফোন ধরেছে। যিনি ফোন করছেন, তিনি যথারীতি বলেছেন, ‘হ্যালো।’ গ্রাম্য ব্যক্তিটি ভেবেছে তাকে হেলতে বলা হয়েছে। সুতরাং সে একটু কাত হয়েছে। আবার ও প্রান্ত থেকে ‘হ্যালো’ বলেছে আর এই ব্যক্তিটি আরো একটু কাত হয়েছে। যত ‘হ্যালো’ শুনছে, তত কাত হয়ে যাচ্ছে, মুখে কিছু বলছে না, ফলে ও-প্রান্ত থেকে ক্রমাগত ‘হ্যালো, হ্যালো...’ হয়ে যাচ্ছে, এ লোকটিও কাত হতে হতে একদম মেজেতে শুয়ে পড়েছে এবং তখন বলছে, ‘আর হেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হেলতে হেলতে আমি চিত হয়ে গেছি।’ আমার বর্ণনার ক্রটির জন্য হয়তো এই নকশাটিকে কারো কারো একটু মোটা দাগের মনে হতে পারে, কিন্তু ভানুবাবুর অননুকরণীয় প্রসাদগুণে অসম্ভব কৌতুকের সৃষ্টি হতো এই উপস্থাপনায়।

টেলিফোন প্রসঙ্গে আমার অবস্থা ঐ কৌতুকনকশার গ্রাম্য ব্যক্তিটির চেয়েও খারাপ। আমি টেলিফোনে কোনো কথা বুঝতে পারি না, বলতেও পারি না। বলতে পারি না তার কারণ আমার অস্বাভাবিক ভারি গলা, যা টেলিফোন যন্ত্রের মাধ্যমে আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আমার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে, আমি কিছুতেই আস্তে কথা বলতে পারি না। এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তারপর চাঁচিয়ে, তারপর ফোনে, ওদিকে যিনি থাকেন তাঁর অবস্থা অকল্পনীয়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলছিলাম। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ডালহৌসি স্কয়ার থেকে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, নীরেন্দ্রনাথ আমার চাঁচানি শুনে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘শুধু শুধু টেলিফোন কোম্পানিকে পয়সা দিয়ে লাভ কি ? তার চেয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখে কথা বলো, আমি বেশ শুনতে পাবো।’

বাড়িতে বা অফিসে আমি কখনোই পারতপক্ষে ফোন ধরি না, বিশেষ নিরুপায় না হলে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিটির মতো ফোনের ক্রিং ক্রিং এড়িয়ে চলি। অবশ্য আমাদের বাড়িতে ফোন ধরার সুযোগও খুব কম। যেদিন প্রথম আমাদের সংসারে ওই

যন্ত্রটি এলো সেদিন থেকে ফোন বাজা মাত্র আমার ছোট ভাই এবং ছেলে দুজনে পাগলের মতো ছুটে যায় ফোন ধরতে। ফোন বেজে চলে, এদিকে দুজনের মধ্যে যাকে বলে ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি। ইতিমধ্যে আমাদের কাজের লোকটিও এই ফোন ধরার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। এদের মারামারি ও গোলমালে কত দরকারি ফোন যে চাপা পড়েছে, ধরাই হয় নি। আবার হয়তো ধরা হলো, কিন্তু যিনি ফোন করেছেন, তিনি আমাদের দিক থেকে গোলমাল, চেষ্টামেচির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে নিঃশব্দে ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম এটা সাময়িক উত্তেজনা। কালক্রমে ধীরেসুস্থে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হতে চলেছে টেলিফোন লড়াই এখনো পূর্ণগতিতে চলেছে। আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম, ওরা এরকম কেন করে? আমার ভাই বলেছে, রং নম্বর হলে মনের সুখে গালাগাল দেবে সেই জন্য। আমার ছেলে বলেছে, বিশেষ কোনো কারণে নয়, তবে কেন যেন টেলিফোন বেজে উঠলেই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়, সে দিশেহারা বোধ করে। আর পরিচারকটি বলেছে, দাদাবাবু আর কাকাবাবু ওরকম করে বলে সেও ওরকম করে।

নিজের বাড়ির ফোনের কথা থাক। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি বন্ধুপত্নী প্রায় ঘণ্টাখানেক ফোনে কথাবার্তা বলার পর অবশেষে ক্লান্ত হলেন। অপর পক্ষকে জানালেন, ‘ভাই একটু ধরো। কানটা বদলিয়ে নিই।’ বলে ফোনটি ডান কান থেকে বাঁ কানে ঘুরিয়ে নিলেন। আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর আলাপ শেষ হলো। ভদ্রমহিলা টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সবে উঠেছেন, ইতিমধ্যে আরেকটি ফোন এলো।

তিনি আবার গিয়ে ফোন ধরলেন। ঘরের অপর প্রান্তে আমরা বসে গল্প করছিলাম, ভদ্রমহিলার স্বামী মানে আমার বন্ধুটি, চাপাগলায় বললেন, ‘আবার এক ঘণ্টা।’ কিন্তু পতিদেবতার ভবিষ্যৎ-বাণী নস্যাত্ন করে দিয়ে এবারের আলাপ মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সঙ্গ করলেন। বন্ধুপত্নী ফোন রেখে উঠে আসতে আমি রঙ্গ করে বললাম, ‘এতো তাড়াতাড়ি কথা ফুরোলো?’ ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘কি আর কথা বলবো? এটা যে রং নম্বর ছিলো।’

রং নম্বর কোনো এক যুগে বেশ রোমান্টিক ব্যাপার ছিলো। তখন রং নম্বরের সুযোগ কম ছিলো, টেলিফোন তখনো স্বয়ংক্রিয় হয় নি, নম্বরের জন্য এক্সচেঞ্জ টেলিফোন সহায়িকার উপর নির্ভর করতে হতো। তিরিশের, চল্লিশের দশকে বাঙালী টেলিফোন-মহিলা আধুনিকতার প্রতীক। তাঁদের নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, সিনেমা। পাড়ায় একজন মহিলা টেলিফোন অপারেটর থাকলে সমস্ত লোক অবাক হয়ে তাঁর যাতায়াত, কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করতো।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘দূরভাষিণী’ এখনো অনেকেরই হয়তো মনে আছে।

অটোমেটিক হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের সেই রোমান্টিক যুগ শেষ হয়েছে। এখন দূরভাষণ একটি প্রয়োজনীয় বিরক্তি। রং নম্বরে রং নম্বরে গ্রাহক সদা অতিষ্ঠ। অবশ্য যদি যন্ত্রটি চালু থাকে। যন্ত্রটি চালু না থাকলে, যা প্রায়ই হয়, অবশ্য রং নম্বরের ভয় নেই। আর এই ভুল নম্বর যখন হতে থাকে ক্রমাগতই হতে থাকে।

একই লোক একই ভুল নম্বর বারবার পেতে থাকে। একবার এইরকম একটি লোক ক্লান্ত হয়ে আমাকে আমার ফোন নম্বর জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করেছিলো, ‘দাদা, এটা কি রং নম্বর?’ আমি কিছু না বুঝতে পেরে বলেছিলাম, ‘হ্যাঁ।’ সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ফোন নামিয়ে রাখলো। একটু পরে আবার ক্রিং, ক্রিং, আবার সেই প্রশ্ন, ‘দাদা, এটা কি রং নম্বর?’ ক্রমাগত চলতে লাগলো। আমি মরিয়া হয়ে গেলাম, ওদিকের লোকটিও তাই।’ কিন্তু শেষে সে আর পারলো না, উনত্রিশ বারের মাথায় যখন আমি আবার জানালাম, ‘হ্যাঁ, এটা রং নম্বর’, তখন ও প্রান্তে স্পষ্ট একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই হাত থেকে রিসিভার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। বোধ হয় লোকটা এত চেষ্টা করেও সঠিক নম্বর না পাওয়ায় হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করলো।

নবনীতা দেবসেনের বাড়িতে একবার গভীর রাতে একটা খুব গোলমেলে রং নম্বর এসেছিলো। গলার স্বর এবং ইংরেজি উচ্চারণ শুনে নবনীতা বুঝতে পারে এটা একটা মাদ্রাজি মাতাল। আমরা জানতে চাই, ‘মাতাল বোঝা গেলো কি করে? আর মাদ্রাজিই বা কেন?’ নবনীতা বললো, ‘ব্যাপারটা খুবই সোজা।

লোকটা পাঁচ সংখ্যার নম্বর চাইছিলো ;
কলকাতা, বোম্বে, দিল্লি সব ছয় সংখ্যার নম্বর ।
আর তাছাড়া মাতাল ছাড়া আর কে মধ্যরাতে
অন্য শহরের রং নম্বর চাইবে ?’

ফোনের গল্প অনেক । ব্যাপারটা সেই জন্য
সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি । কয়েকদিন
আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখেছি
ফোনে ক্রিং ক্রিং বাজা মাত্র বাড়িসুদ্ধ সবাই,
এমনকি শক্তির মতো দুঃসাহসী লোক পর্যন্ত
চমকে চমকে উঠছে । কি ব্যাপার, এতো ভয়
কিসের ? কোনো দুঃসংবাদ আসার আশঙ্কা
করছে নাকি অথবা কোনো দুর্দান্ত লোকের
শাসানি ? শুনলাম তা নয়, টেলিফোনটা ধরতে
গেলেই সাংঘাতিক শক দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক শকের
চেয়েও তীব্র । ফোন বাজলে ধরতে হবে, ধরলেই
শক । এই ভয়ে সবাই অতিষ্ঠ । এর আগে কিংবা
পরে, আর কোথাও এমন শকিং ফোনের কথা
শুনি নি, শিবরাম চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে হয়তো
বলতেন শক থেকেই শক্তি ।

এই শক তবু সহ্য করা যায় । কিন্তু একধরনের
টেলিফোন কিন্তু প্রচণ্ড বিরক্তিকর । কিছুতেই
আত্মপ্রকাশ করবে না, নাম বলবে না । ভাঙা
ন্যাকা গলায়, ‘বল তো, আমি কে বলছি ?
চিনতে পারছো না তো ? কি করে চিনবে বলো
? কতদিন পরে, কত রোগা হয়ে গেছি, মাথায়
এতবড় টাক পড়েছে, সত্যি চিনতে পারছো না
?’ এসব লোকের টেলিফোন নামিয়ে রাখা ছাড়া
উপায় নেই ।

পুনশ্চ: টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন থেকে দ্রুত
অব্যাহতি পাওয়ার পর আমার একটি ফর্মুলা
আছে । পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । শতকরা
নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যাবে ।
ফোন তুলে ডায়াল টোন পেয়েই শুনলেন লাইনে
কারা কথা বলছে কিংবা আপনি কথা বলতে
বলতে লাইনে কাদের বাক্যালাপ চলে এলো ।
এদের লাইন ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে কোনো
লাভ নেই । বরং সঙ্গে সঙ্গে চাপাগলায় বলুন,
‘ট্রান্স কল, দিল্লী, ট্রান্স ।’ দেখবেন অপর পক্ষদ্বয়
ফোন নামিয়ে দিয়েছে, তারা ভাবছে তাদের বুঝি
দিল্লী থেকে ট্রান্স কল এসেছে । সেটা ধরার জন্য
তারা ফোন নামাতেই আপনার জট আপাতত
খুলে যাবে । তারাপদ রায়: প্রখ্যাত রম্য রচয়িতা,
কবি ও ছোটগল্পকার । বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে

জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালে। বসবাস করেছেন ভারতে। মৃত্যু ২০০৭ সালের আগস্টে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৩, ২০১০

468) যাত্রীদের রাগ করার কোনো অধিকার নেই

যাত্রীদের রাগ করার কোনো অধিকার নেই প্রত্যেক সিএনজিচালকেরই আছে না যাওয়ার অধিকারনা, যাত্রীদের অভিযোগের কোনো শেষ নেই। তাঁদের অভিযোগ, সিএনজিচালক ভাড়া বেশি নেন, কোথাও যেতে চান না। কিন্তু কেন যেতে চাইবেন? এই দেশ সিএনজিচালকদের কী দিয়েছে? দেশে সিএনজিচালকদের কোনো অধিকারই নেই। বেচারারা সারা দিন কত কষ্ট করে সিএনজি চালান। অথচ তাঁদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। প্লেনের চালককে কত সম্মান দিয়ে পাইলট বলা হয়। মেয়ের বাবা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘বাহ, ছেলে পাইলট।’ অথচ সিএনজিচালককে কেউ পাত্তাই দেন না। পাইলট বলা তো বহু দূরের কথা, ড্রাইভার বলে যে ন্যূনতম একটা ব্যাপার আছে, তাও ভুলে যান। মুখে অবজ্ঞার একটা ভাব এনে বলেন, ‘ও, ছেলে সিএনজিচালক, বুঝছি।’ অথচ দুজনের কাজ কিন্তু একই, চালানো। পার্থক্য হলো একজন প্লেন চালান, আরেকজন চালান সিএনজি অটোরিকশা। তাই বলে এত ভেদাভেদ? মানুষের ভাব দেখে মনে হয়, সিএনজি চালানো কোনো ঘটনাই না! কী ভয়ানক অপমান! এত অপমানের পরেও যাত্রীর কথায় তাঁরা কেন যেতে চাইবেন? এখানেই শেষ নয়। যাত্রীরা বলেন, ‘এই সিএনজি, নাখালপাড়া যাবে?’ এই কথায়ও সিএনজিচালককে অপমান করা হয়। স্বয়ং চালক পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন, অথচ যাত্রীরা তাঁকে কিছু না বলে তাঁরই সিএনজির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন? নাহ, ভদ্রতা জিনিসটা আমাদের মধ্যে নেই। কেন রে ভাই? ‘ড্রাইভার সাহেব, আমি নাখালপাড়া যাব, আপনার এই ছোট গাড়িতে আমাকে নেবেন?’ সুন্দর করে এই কথাটা বললে কী এমন ক্ষতি হয়? আরও ঘটনা আছে। যাত্রী নাখালপাড়ায় যাবেন। ওখানে তাঁর খালার বাসা। কিন্তু সিএনজিচালকের তো খালার বাসা নেই। তিনি কোন দুঃখে এই জ্যামের মধ্যে

নাখালপাড়া যাবেন? নাখালপাড়া তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকাও না যে গেলে ভালো লাগবে। এসব কারণেই চালক ভাইয়েরা পায়ে ওপর পা তুলে মুখে বেশ ভাব নিয়ে বলেন, ‘যামু না’। যাঁদের মায়াদয়া একটু বেশি, তাঁরা কষ্ট করে যেতে রাজি হন। তবে তাঁদের ১০-২০ টাকা বেশি দিতে হয়। তা তো দিতেই হবে। এটা তাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের অধিকার। কিন্তু তাই বলে তাঁদের ওপর রাগ করার অধিকার কোনো যাত্রীর নেই। তাঁর নিজের সিএনজি অটোরিকশা, যেতে ইচ্ছা হলে যাবেন, নইলে যাবেন না। তাতে কার কী? অতএব, হয় সরকার সিএনজিচালকদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করুক, নতুবা যাত্রীদের এই ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ নিষিদ্ধ করুক। তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে না। শাস্ত্রে আছে— একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৩, ২০১০

469) লাভ স্টোরি - ম. লিন্কেব্রড

নারী: আমি তোমাকে...

পুরুষ: আমিও তোমাকে...

নারী: আমি বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছি, এই দিনটির...

পুরুষ: এই জীবনে এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছু চাইনি আমি...

নারী: তোমার সবাই রাজি হবে তো?

পুরুষ: আমার পক্ষের কাউকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তোমার দিক থেকে কেউ বিরোধিতা না করলেই হলো...

নারী: আমার পক্ষের সবাই বহু আগে থেকেই রাজি...

পুরুষ: চমৎকার...

নারী: অবশেষে তুমি আর আমি...

পুরুষ: হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক...

নারী: চলো...

তারা দুজন চলল ডিভোর্সের কাগজপত্র জমা দিতে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৩, ২০১০

470) মুহম্মদ জাফর ইকবালের

অসম্পূর্ণ উপন্যাস - আদনান মুকিত

বাংলাদেশের আবহাওয়ার মতো ইদানীং বাবার মতিগতিও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। প্রায়ই দেখি

জ্যামে পড়া বাসের মতো ঝিম মেরে বসে থাকেন। আজ আবার খাতায় কী যেন লিখছেন। আমি শিওর, বাবা কেনাকাটার লিস্ট করছেন। এই সুযোগে আমার জন্য কত বরাদ্দ তা দেখা উচিত। প্রয়োজনে বাড়িওয়ালাদের মতো বিনা নোটিশে আমার বরাদ্দ টাকা বাড়ানোর দাবি তুলতে হবে। মনে একটা সংগ্রামী চেতনা নিয়ে বাবাকে বললাম, বাবা, কী করছো? একটা উপন্যাস লিখছি।

সর্বনাশ! সর্বনাশ নয় গাধা, উপন্যাস। উপন্যাস কথাটা শুনিসনি আগে? তা শুনবি কেন? পড়ালেখার সঙ্গে তোর যে দূরত্ব, ঢাকা-কলকাতার দূরত্ব তার কাছে কিছুই না।

ঘটনা কিছুই বুঝলাম না। বাবা এত কথা বলছেন কেন? নিশ্চয়ই মন-মেজাজ ভালো। মন ভালো থাকলে বাবা বেশি কথা বলেন। আমি সাহস করে মনের কথাটা বলেই ফেললাম, বাবা, আমাকে টাকা দেবে না?

এ্যা? কিসের টাকা বল তো? আমি কি তোর কাছ থেকে কোনো টাকা ধার করেছিলাম? আরে ধার করবে কেন? জামা-কাপড় কেনার জন্য টাকা লাগবে। তা ছাড়া ঠিক করেছি বন্ধুরা মিলে বান্দরবান যাব।

তোর জামা কাপড় নেই? ঈদে নতুন জামা কিনব না? যা, তোর আপুকে ডেকে আন।

এর মধ্যে আবার আপু কেন? ও এলে আমার আর টাকা পাওয়া হবে না। ও ঠিকই বাবার সাইকোলজিটা বুঝে অ্যাকশন নেবে।

সাইকোলজির ছাত্রী তো। তার পরও বাবার আদেশ বলে কথা। আপু এসেই নেতাদের মতো আবেগঘন গলায় বলল, ‘বাবা! চোখের নিচে কালি কেন? নিশ্চয়ই রাত জেগেছ। তোমাকে ডাক্তার রাত জাগতে নিষেধ করেছে না?’

বাবা বললেন, ‘বস, কথা আছে।’ আমি বাবার সামনের চেয়ারটায় বসলাম। আরও একটা চেয়ার খালি ছিল, আপু তাতে না বসে বাবার চেয়ারের হাতলে হেলান দিয়ে বসল। কী চালাক! আপু বলল, ‘বাবা, তুমি কেন ডেকেছ আমি জানি। ঈদে কী নেব তা জানার জন্য তো? আমার কিছু লাগবে না।’

আমি ভয়ানক অবাক হলাম। আপুর মুখে এই কথা শোভা পায় না। নিশ্চয়ই অন্য মতলব আছে। আমি বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। আগ বাড়িয়ে বললাম, তোর টাকা না লাগলেও আমার লাগবে। বান্দরবান যাব।

বান্দর দেখতে ওখানে যাওয়ার কী দরকার? আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখ না। বাসায় ভালো আয়না আছে। চায়নিজ জিনিস। তাতেও কাজ না হলে চিড়িয়াখানায় যা। প্রথম খাঁচাটাই বাঁদরের।

প্রচণ্ড রাগ লাগল। আমি ছাত্রলীগের কর্মী হলে এতক্ষণে আপুকে ধরে দোতলার ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিতাম। কত বড় সাহস, আমাকে বাঁদর বলে! একটা উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাবা বললেন, ‘ওরে, তোরা থাম। আমি আমার উপন্যাসটা তোদের পড়ে শোনানোর জন্য ডেকেছি। শুনে বল কেমন হলো।’

আপু আবেগের ডোজ আরেকটু বাড়িয়ে বলল, ‘বাবা, কাল আমার ভয়ংকর একটা পরীক্ষা আছে, আমি পরে শুনব, এখন যাই।’

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোরাও কি পরীক্ষা আছে?’ আমি হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লাম।

বাবা হতাশ হয়ে বললেন, ‘কী যুগ এল। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও পরীক্ষা হয়। আচ্ছা, যা তোরা। গিয়ে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দে।’

ড্রাইভার আসতেই বাবা তাকে উপন্যাস পড়ে শোনাতে লাগলেন। আমি আড়াল থেকে দেখছি।

বাবা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। ড্রাইভার চাচার মনোযোগ আরও বেশি। গালে হাত দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে শুনছেন। শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন ঝিমুনি এসে পড়েছিল, হঠাৎ ইঞ্জিনের আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ পেলাম। ভালোমত শুনে বুঝলাম চাচা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছেন। আমি সামনে এসে বাবার পড়া থামিয়ে বললাম, ‘বাবা, চাচা ঘুমাচ্ছেন।’

বাবা গর্জে উঠে বললেন, বরকত! ঘুমাচ্ছ নাকি?

না স্যার, আমি কাহিনির গভীরে চইল্যা গেছিলাম। চক্ষু না বুজলে কাহিনির গভীরে যাওন যায় না। বাপ রে। কী কাহিনি শুনাইলেন, স্যার! চোখে পানি আসার মতো। কলিজায় গিয়া

লাগে।

গাধাটা বলে কী? একটা হাসির উপন্যাস পড়ছি, চোখে পানি আসবে কেন?

অ। না, মানে হেইটাই তো কইলাম। হাসতে হাসতে চোখে পানি চইল্যা আইবে।

তুমি যাও। আর শোন, এত জোরে নাক ডাকবে না। বাড়ির সামনের গাছটায় আগে অনেক পাখি ছিল। আমার ধারণা, তোমার নাক ডাকার শব্দে এরা বাসা ছেড়ে পালিয়েছে।

বাবা আমার দিকে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পাশের বাসার জহিরকে এটা দিয়ে বলবি আমার সঙ্গে দেখা করতে। তোরা তো আমার প্রতিভার দামটা দিলি না। জহিরের পত্রিকায় এটা ছাপালে তখন সবাইকে দেখিয়ে বলবি, আমার বাপের উপন্যাস।

জহির ভাইকে জিনিসটা দিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মানুষের বাবারা ছেলেদের চেক লিখে দেয়, জায়গা-জমি-বাড়ি লিখে দেয়। আর আমার বাবা লিখেছে উপন্যাস। তাও আবার নাম ছাড়া উপন্যাস।

বিকেলে জহির ভাই এসে হাজির। হত্তদন্ত হয়ে বাবাকে গিয়ে বললেন, আংকেল! সামাজিক অসংগতি নিয়ে আপনি যা লিখেছেন তা পড়ে আমি মুগ্ধ। সত্যি, এমন ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ আমি কখনোই পড়িনি। আমি শিওর, প্রমথ চৌধুরী চাইলেও এমন প্রবন্ধ লিখতে পারত না। কিন্তু আংকেল, আমার পত্রিকায় শুধু গল্প-উপন্যাস আর কবিতা ছাপি, প্রবন্ধ তো ছাপি না।’

—জহির, এটা প্রবন্ধ নয়, এটা একটা সামাজিক উপন্যাস।

জহির ভাই কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘সরি আংকেল। আসলে উপরে নাম লেখা নেই তো তাই বুঝতে পারিনি। তবে ভালো, বেশ ভালো। হয়েছে কি, আমাদের টানা ছয় সংখ্যার ম্যাটার একেবারে রেডি তো, তাই আপাতত ছাপতে পারছি না। যাই, আংকেল।’ রান্নাঘর থেকে মা এসে বললেন, ‘তুমি ভেবেছ কী? তোমার নাম মুহম্মদ জাফর ইকবাল হয়েছে বলেই তুমি উপন্যাস লিখতে পারবে? এত সহজ? শোনো, নামে মিল থাকলেই উপন্যাস লেখা যায় না। এক কাজ করো, তুমি সাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপন্যাসগুলো

ভালোমতো পড়ো। তারপর লেখার চেষ্টা
কোরো। না পড়ে লিখলে এমনই হবে। লিখবে
উপন্যাস, হবে প্রবন্ধ। বুঝেছ?’
মায়ের কথা বাবা বুঝেছেন কি না জানি না,
তবে তিনি আমার কাছ থেকে মুহম্মদ জাফর
ইকবালের সব উপন্যাস নিয়ে বারান্দায়
বসেছেন। কী অদ্ভুত! আমার বাবা মুহম্মদ
জাফর ইকবাল পড়ছেন সাহিত্যিক মুহম্মদ
জাফর ইকবালের উপন্যাস। দুজনের নামই
এক। একজন লেখক, আরেকজন পাঠক। তবে
পাঠক হিসেবে বাবা বেশ ভালো। একটু পড়েন,
আর গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন। তার হাসি শুনে
আমরাও হাসি। ভালোই লাগে। **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, আগস্ট ৩০, ২০১০

471) বোনাস গিফট বোনাস

রাকিব কিশোর এর ভাবনার দূরবর্তী ছায়া
অবলম্বনে লিখেছেন মহিউদ্দিন কাউসারস্যার
ক্লাসে ঢুকে LOL মার্কী একটা বিরাট হাসি দিয়ে
বললেন, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত
নিয়েছে, এবার শিক্ষকদের পাশাপাশি
ছাত্রছাত্রীদেরও ঈদ বোনাস দেওয়া হবে।
পুরো ক্লাস হইহই করে উঠল। স্যারের
কমেন্টটাকে আমরা ১০০ ‘লাইক’ দিলাম। আমি
এমনিতে কখনো স্যারদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে
কথাটথা বলি না। এবার বললাম।

—স্যার, দয়া করে যদি বলতেন ‘বোনাস’
হিসেবে আমাদের ঠিক কী দেওয়া হবে।
স্যার বললেন, আগে বললে তো মজাটাই নষ্ট
হয়ে যাবে, তার পরও বলি, ১০টা অতিরিক্ত
ক্লাস।

মাথায় রীতিমতো হালকা বজ্রপাতসহ আকাশটাই
ভেঙে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটাও ভেঙে গেল। স্বপ্ন এর চেয়ে
আর কতই বা খারাপ হতে পারে! কষ্টেসৃষ্টে
তাই আবারও ঘুমোতে গেলাম...।

চোখ লাগতেই এবার মধুর একটা স্বপ্নের শুরু
হচ্ছে বলে মনে হলো। দেখলাম, আমি
ছাত্রলীগের একটা গ্রুপে জয়েন করেছি। আহ,
এবার আমাকে পায় কে! পুরো বিশ্ববিদ্যালয়
এখন আমার দুই আঙুলের চিমটিতে। ক্ষমতা,
চাঁদা, টেন্ডার...। তখনি আবার আমার মাথার
পেছনে ভালোবাসার একটি উষ্ণ স্পর্শ পেলাম
সুইট স্বপ্নটি যেন ধারাবাহিক সাবান নাটকের

(সোপ অপেরা) মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আমি আবেগে আগ্রুত হয়ে ধীরে ধীরে পেছন ফিরে চাইলাম। আমার চোখ পুরাই ছানবড়া, বেগুনবড়া, আলুর চপ হয়ে গেল। এ তো দেখছি ছাত্রলীগের অন্য গ্রুপের কর্মী। উষ্ণ স্পর্শ নয়, সে আমাকে থাপ্পড় দিয়েছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘ভাই, আমার কাছে কী চান?’ সে আমার স্ট্যাটাসে কোনো কमेंট না দিয়ে তার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল—

‘কী করমু, বস? দুই তলা থেকে উড়াইয়া ফালাইয়া দিমু?’

একজন পাতি নেতা বলল, ‘না না, ঈদ সামনে, ওরে একটা বোনাস দেওয়া যাক... ।’ আমি আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, এই ঈদে বোধহয় আমি আমার পিতৃপ্রদত্ত জীবনটাই বোনাস পাচ্ছি। কর্মীটি বলল, ‘কী কন, বস? বোনাস?’

—h m m m...দুই তলা না, ওরে বোনাস হিসেবে চাইর তলা থেকে ফালাবি।

আবারও ঘুম ভেঙে গেল। না বাপ, আমি আর ঈদ বোনাস চাই না। আমার অফ ডেতে আমি যে অফিসে পার্টটাইম জব করার পার্ট নিই, সেখানে গিয়েও আজ মেন্দা মেরে পড়ে থাকি। দুপুরের দিকে অফিসে ছোটখাটো একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও

নোটিফিকেশন পেলাম, অফিসে আজ ঈদ বোনাস দেওয়া হচ্ছে ‘ ’। বোনাসের কথা শুনেই আমি আঁতকে উঠলাম। গায়ে যে চিমটি কেটে দেখব স্বপ্ন কি না, তারও উপায় নেই। সকালেই নখ কেটে ফেলেছি। অগত্যা জায়গাতেই বসে রইলাম। বোনাস নিতে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না। অফিসে বসে কিছু একটা না করলে বেতনটা হালাল হবে কীভাবে? তাই কম্পিউটারের সামনে বসে ফেসবুকটা ওপেন করলাম। কী আকাশে-পাতালে। একটা নতুন মেসেজ এসেছে। সস্তা চায়নিজ মোবাইলেও মেসেজ এলে বিকট রিংটোন বাজতে থাকে।

অথচ আধুনিক ফেসবুকে মেসেজ এলে কিনা কোনো রিংটোন বাজে না! হায় সেলুকাস! অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে ফেসবুক।

মিসেস জুকারবার্গকে বলতে হবে, তিনি যেন ফেসবুক মেসেজে রিংটোন দেওয়ার জন্য মি. জুকারবার্গকে দিনরাত জ্বালাতে থাকেন। যা-ই হোক, মেসেজটা খুললাম। বাল্যকালের বন্ধু

ফাহাদের মেসেজ: ‘বন্ধু, তোর জন্য ঈদ গিফট পাঠাচ্ছি, রিসিভ করিস।’ আমার আনন্দ দেখে কে ? কী পাঠাতে পারে? অ্যাপলের ম্যাকবুক, আইফেস, আইপ্যাড, রোল্যান্ডের ঘড়ি, গেইম স্টেশন নয়তো? আনন্দটা চেপে ধরে, কম্পিউটারটা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি। অফিসের লোকজন একে একে বোনাস নিয়ে যার যার সিটে ফিরে আসছে। আমি স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠি। অফিস সত্যিই বোনাস দিচ্ছে, ইহা বাস্তব! এক দৌড় দিলাম অ্যাকাউন্ট সেকশনে। ঢুকতেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলল— ‘অ্যাকাউন্টে ক্যাশমানি শেষ, বাকিদের বোনাস দেওয়া হবে ঈদের পর, ধন্যবাদ।’ আমি দুঃখ পাইনি। দুঃখ পাওয়ার সময় কই? আমার গিফট তো আসছে গ্রেট ব্রিটেন থেকে। আমি দুই টাকার গিফটের খ্যাতা পুড়ি। বিকেলে বাসায় ফিরেই মাকে জিজ্ঞেস করি, ‘আমার নামে কোনো কুরিয়ার এসেছে?’ মা বললেন, ‘কই, না তো।’ আমি আবার ফেসবুক ওপেন করি। মেসেজ লিখি, ‘বন্ধু, তোর গিফট তো এখনো পাইনি।’ বাল্যকালের বন্ধু বলে কথা। জবাব দিতে একটুও দেরি করে না। ‘কেন? আমি তো দুপুরেই তোর ফেসবুক ওয়ালে গিফটগুলো পোস্ট করে দিয়েছি। না পেলে বল, আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।’ মেজাজটাই খিঁচড়ে ওঠে। ইস! এই মেসেজটা যদি দুঃস্বপ্ন হতো। গায়ে চিমটি কেটে যে দেখব দুঃস্বপ্ন কি না, তারও উপায় নেই, সকালেই নখ কেটে ফেলেছি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩০, ২০১০

472) মেয়েলি যুক্তি

‘তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো?’ একদিন সে জিজ্ঞেস করল স্বামীকে। ‘এ ধরনের প্রশ্ন করে তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছ।’ আহত স্বরে বলল স্বামী, ‘এত দিন একসঙ্গে ঘর করার পর...।’ ‘তাহলে তুমি কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করে দেখাও। ... না, চুমু খাওয়া শুরু করতে হবে না। পুরুষেরা এ কাজ খুব পারে। তারচেয়ে বলো, আমার মনমেজাজ সব সময় ভালো থাক, তা কি তুমি চাও?’ ‘অবশ্যই চাই।’

‘মুখের চামড়ার সুন্দর রং?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘কাজ থেকে ফিরে এসে যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি?’

‘অবশ্যই।’

‘তুমি কি চাও, আমার পরনে সব সময় লেটেস্ট ফ্যাশনের পোশাক থাক?’

‘চাই।’

‘আমার স্বামীর কারণে আমাকে যেন লজ্জা পেতে না হয়, বরং তাকে নিয়ে যেন গর্ব করতে পারি?’

‘খু-উ-ব চাই।’

‘যেন সে আমাকে নিজের মার্সিডিজের চড়িয়ে থিয়েটারে নিয়ে যায়?’

‘চাই, কিন্তু শুধু আমার ভালোবাসা দিয়ে কি এত কিছু সম্ভব হবে?’

‘আমি কিন্তু তোমার কাছে অসম্ভব কিছু দাবি করছি না। তবে এই শুভকামনাগুলো তোমার যদি আমার জন্য সত্যিই থেকে থাকে এবং তুমি যে রকম বলছ, যদি সে রকম আমাকে ভালোবাসে...।’

‘অবশ্যই বাসি।’

‘তাহলে এন্ফুনি আমাকে ডিভোর্স দাও।’———

———

অলেগ লেবেদেভ

473) হাতব্যাগ

ছেলে: তোমার কাছে খুচরো পয়সা আছে?

মেয়ে: থাকার কথা। (ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে থাকে) এই হাতব্যাগে কক্ষনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।... পেয়েছি।

ছেলে: এটা কী দিলে? বাসের ব্যবহৃত টিকিট?

মেয়ে: অসম্ভব!... আরে, তাই তো! কেন যে এটাকে ব্যাগে বয়ে বেড়াচ্ছি! দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমাকে কুড়ি জেলাতি। (ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় আবার)

ছেলে: এটা আবার কী দিলে?

মেয়ে: দেখাও তো! ওহ্, একটা ঠিকানা। তবে যে কার! ধারণাও করতে পারি না! কেন যে বয়ে বেড়াচ্ছি!

ছেলে: আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, তোমার কাছে কুড়ি জেলাতি আছে? নাকি নেই?

মেয়ে: আছে বাবা, আছে। একটু আগেই তো দেখেছিলাম। দাঁড়াও, পার্সটা বের করি আগে।

(আবার হাত ঢুকিয়ে দেয় ব্যাগে) এই হাতব্যাগগুলো একেবারে অসহ্য! কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যায় না! ... এই যে, পার্সটা পেয়েছি। ওহ, না, এটা গত বছরের ক্যালেন্ডার। কী কাজে এটা আমার ব্যাগে? শুধু শুধু জায়গা দখল করে রাখে! (হাতড়াতে থাকে) উফ! ব্যাগ বটে একখানা!

ছেলে: কী, আছে কুড়ি জেলাতি?

মেয়ে: অ্যান্ড গোলমেলো এই ব্যাগটা! দাঁড়াও, আচ্ছা, এই কাপড়ের টুকরোটা এল কোথেকে!

ওহ, মনে পড়েছে! ব্লাউজ বানানোর জন্য এ রকম কাপড় খুঁজছিলাম দুই বছর আগে। কেন যে এখনো জমিয়ে রেখেছি, কে জানে!

ছেলে: ট্রামের টিকিটের জন্য কুড়ি জেলাতি চেয়েছিলাম তোমার কাছে...

মেয়ে: কুড়ি জেলাতি? আগে বলবে তো! এম্ফুনি খুঁজে দেখছি হাতব্যাগে। একটু আগেই তো চোখের সামনে ছিল...

স্টেফানিয়া গ্রোদজেনসকা

474) মানুষ হিসেবে আমার অপমানসমূহ

প্রতিটা ঘটনা ও চরিত্র সত্য

মানুষ হিসেবে মানুষের এই পৃথিবীতে আমাকে মাঝেমধ্যে বেশ অপমানের শিকার হতে হয়েছে। হাতিরপুল বাজারে ফুটপাথে একজন ফলবিক্রেতা বসে আছেন। সকালবেলা। আমি একটা পাকা পেঁপে কিনব। আমি বিক্রেতাকে বললাম, আপনার কাছে কি ওষুধ ছাড়া পেঁপে হবে?

উনি বললেন, 'না, আমার কাছে ওষুধ ছাড়া কোনো পেঁপে নাই। সব পেঁপেতেই ওষুধ দেওয়া।'

কিন্তু পেঁপেগুলো দেখতে বড় ভালো ছিল। আমি একটা পেঁপে হাতে নিয়ে বললাম, 'এটার দাম কত?'

তিনি বললেন, '১০০ টাকা।'

আমি বললাম, '৮০ টাকায় দেবেন।'

তিনি বললেন, '৯০।'

আমি বললাম, 'না, ৯০ না। ৮০ টাকা।'

তিনি বললেন, 'আপনি একটা কাজ করেন।

কেজি হিসেবে কেনেন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা কেজি হিসেবে কিনব।

কত করে কেজি?’

উনি বললেন, ‘১২০।’

আমি বললাম, ‘১০০।’

শেষে ১১০ টাকা কেজি রফা হলো। আগের পেন্সিটাই পাল্লায় তোলা হলো। দেখা গেল এটা দেড় কেজি হয়েছে। উনি বললেন, ‘১৬৫ টাকা দেন।’

আমি হেসে বললাম, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। যান ৯০ টাকাতেই নিচ্ছি। আপনার কথাই রইল।’

উনি বললেন, ‘না, আমি আপনাকে ৯০ টাকায় দিতে চাইছি। আপনি তো সেইটাতে রাজি হন নাই। এখন নিতে হইলে আপনার ১৬৫ টাকাই দিতে হইব।’

আমি বললাম, ‘সে কী করে হয়।’

তিনি বললেন, ‘আপনার কাছে আমি পেন্সিট বেচুম না। আপনি যান।’

আমি কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম। সকালবেলা এই অপমান হজম করে পেন্সিট না কিনেই আমাকে চলে আসতে হলো।

এলিফ্যান্ট রোডের একটা বিখ্যাত ফটো স্টুডিও। আমি এক বিকেলবেলা সেখানে গেছি দুটো পেনসিল ব্যাটারি কিনতে। দাম ছিল ৩৫ টাকা। আমার মনে হলো, আমি ১০০ টাকার একটা নোট দিলাম। খুব অন্যমনস্ক ছিলাম। ওরা আমাকে ফেরত দিল ১৫ টাকা। আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে আমি ১০০ টাকা দিয়েছি। আপনি কি দয়া করে ড্রয়ারটা খুলে দেখবেন ১০০ টাকা দিয়েছি, নাকি ৫০ টাকা? উনি ভীষণ তেড়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওই স্টুডিওর সব দোকানিও একযোগে তেড়ে উঠলেন, যেন আমি একজন ভীষণ সন্ত্রাসী। ‘মিয়া, লোক ঠকায়া টাকা লইতে চান। যান, বাইরান।’

আমি মাথা নিচু করে বাইরে চলে এলাম।

ওই দোকানে আমি এখনো যাই। ছবি তুলি।

টাকা আদান-প্রদান করি। এত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মন খারাপ করে থাকলে চলে না।

আমাকে একবার ছিনতাইকারী ধরেছিল।

নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের সময়। সাপ্তাহিক পূর্বাভাস অফিসে কাজ করি তখন। স্টেডিয়ামে অফিস। সেখান থেকে রাত ১২টার পরে রিকশা করে বকশীবাজারের দিকে আসছি। শহীদ মিনারের সামনে দেখি একটা রিকশায় এক

মহিলা। তাকে ঘিরে আছে দুই-তিনজন লুঙ্গি পরা লোক। ব্যাপার কী ভাবছি। এমন সময় লুঙ্গি পরা লোকগুলো আমার রিকশার দিকে তেড়ে এল। তাদের হাতে ভোঁতা দা। তারা বলল, ‘এই, যা আছে দিয়া দে।’ আমার পকেটে ছিল মাত্র ১০০ টাকা আর একটা ঘড়ি। সেটার দামও ২০০ টাকার বেশি না। তারা বলল, ‘আর কিছু নাই?’

আমি বললাম, ‘জি না।’

তারা বলল, ‘টাকা শহর দেখি ছোটলোক দিয়া ভইরা গেছে। এই রকম ছোটলোকের লগে কারবার করলে তো না খায়া মরতে হইব। ভাগ হারামজাদা। খবরদার পিছনের দিকে তাকাবি না।’

আমি কম্পবক্ষে ওই রিকশায় চড়েই সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনের দিকে তাকানোর সাহস ছিল না।

রিকশার ভাড়া কোথেকে দিয়েছিলাম মনে নাই। তবে মনে আছে, বহুদিন রাস্তায় চলাচলের সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর কী হয়েছিল জানেন, খুব অপমানিত বোধ করেছিলাম। কটা টাকা পকেটে না রাখার অপরাধে লোকগুলো আমাকে ছোটলোক বলল। টাকাই কি সব? আমার পকেটে হাজার টাকা থাকলে তোরা খুশি হতি? এরপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা পকেটে না থাকলে আমি কোনো ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ব না। বারবার অপমানিত হওয়া ঠিক নয়।

আমাকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে পুলিশ ডেকেছিলেন মতিঝিলের এক স্কুলের শিক্ষক। এই ঘটনাটা বলে এই লেখা শেষ করব। বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে গেছি। কম্পিউটারের মাধ্যমে এই উত্তরপত্র দেখা হবে। তাই উত্তরপত্রে পেনসিল দিয়ে গোল ঘর পূরণ করে উত্তর দিতে হয়। পরীক্ষা এখনো শুরু হয়নি। সবে আমরা রোল নম্বর লিখছি। সেটাও করতে হয় পেনসিলে ঘর ভর্তি করে। ওই উত্তরপত্রে একটা ঘর আছে, পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর। আমি স্বাক্ষর করলাম। একটু পরে ওই শিক্ষক এলেন, সবার খাতার ওপরে তিনি সই করবেন। আমার খাতা দেখে বললেন, ‘এই খাতা কম্পিউটারে দেখবে। কম্পিউটার বাংলা সাইন বোঝে না। আপনি বাংলায় সাইন করছেন

কেন?’

আমি বললাম, সাইন মানে তো সাইন। এটা কোনো ভাষা নয়। আর কম্পিউটার এই সাইন রিড করবে না। কম্পিউটার যেটা রিড করবে, সেটা এই গোলা দেওয়া ঘরগুলো।

উনি বললেন, ‘আপনি ইংরেজিতে সাইন করেন।’

আমি বললাম, শোনে, আমি বুয়েট থেকে পাস করেছি। কম্পিউটারের কোম্পানিতেও চাকরি করেছি। আপনাদের এই খাতাগুলো বুয়েটেই যাবে। আর ব্যাপার হলো, খাতা যদি বাতিল হয় আমার হবে। আপনার তো হবে না। আপনি নিজের কাজ করেন।

উনি বললেন, ‘না, আপনি বাংলায় সাইন করবেন কেন, কম্পিউটারে খাতা দেখবে, এটা অবশ্যই ইংরেজিতে করতে হবে।’

আমি বললাম, আমার একটাই সাইন। সেটা বাংলায়। আমি বিদেশে গেছি এই সাইন দিয়ে। সাইনের কোনো বাংলা ইংরাজি হয় না। আপনি দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনি যান।

তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, ‘আমি বলতেছি আপনে ইংরাজিতে সাইন করেন।’

আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, আমি আপনাকে বলতেছি আপনি এখান থেকে সরেন। যান।

উনি আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন।

আমি ততোধিক জোরে চিৎকার করলাম।

উনি বলতে লাগলেন, ‘পুলিশ ডাকো, পুলিশ ডাকো। পরীক্ষার হলে বড় সম্ভ্রাসী ঢুকে পড়েছে।’

ওই স্কুলের হেডমাস্টার চলে এলেন। পেছনে তিনজন রাইফেলধারী পুলিশ। তাঁরা এসেছেন সম্ভ্রাস দমন করতে।

তাঁরা বললেন, ‘ইংরাজিতে সাইন করেন।’

আমি বললাম, করব না।

প্রধান শিক্ষক বললেন, ‘কেন ভাই এই রকম করছেন। একটা সাইনই তো। ইংরাজিতে করলে কী হয়।’

তিনজন বন্দুকধারী বন্দুক বাগিয়ে বললেন, ‘ইংরাজিতে সাইন করেন। কম্পিউটার বাংলা সাইন বোঝে নাকি। করেন।’

আমি বললাম, আমার ইংরাজি সাইন নাই। আমি কী করব?

বন্দুক তিনটা একেবারে আমার মাথা বরাবর এগিয়ে আসছে।

তঁরা জোর করে আমাকে দিয়ে ইংরাজিতে নাম লিখিয়ে নিয়ে গেলেন।

জানি না, কম্পিউটারবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং মোহাম্মদ কায়কোবাদ এই লেখা পড়ছেন কি না। পড়লে অন্তত তঁরা যে প্রাণভরে হাসছেন এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনিও হাসছেন? কী আর করা, আমিও হাসি তাহলে। আনিসুল হক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৫, ২০১০

475) ট্রেনের সহযাত্রীরা

দুজন পুরুষ নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। বৃষ্টির ছাঁট পড়া ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একঘেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য। তৃতীয়জন এক বুড়ো, চোখে-মুখে স্পষ্ট কৌতূহলের ছাপ, সানন্দ চোখে থেকে থেকেই তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ঘেমে ওঠা জানালার কাচের দিক থেকে বিরক্তিতে উপচে পড়া মুখ ফেরালো একজন।

—আমি বউয়ের কাছ থেকে চলে এসেছি, কেন জানি বললো সে।

—আর আমার বউ নিজেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, দ্বিতীয়জন বললো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—আর আমি সবেমাত্র বিয়ে করেছি, বুড়ো বললো নীরবতায় কাটল কিছুক্ষণ।

—কিছুদিন আগে আমার ২০০ রুবল হারিয়েছে, বললো প্রথমজন।

—আর আমার ৩০০, দ্বিতীয়জন বললো সখেদে।

—আর আমি এই তো ক’দিন হলো একটা মোটরসাইকেল জিতেছি লটারিতে, বুড়ো জানালো। হিংসাপরায়ণ দৃষ্টিতে তঁর দিকে তাকিয়ে কাশল প্রথমজন, বললো,

—আমার ব্রঙ্কাইটিস।

—আর আমার গ্যাস্ট্রিক,—দ্বিতীয়জন জানালো।—একবারে স্থায়ী ও পাকাপোক্ত।

—আর আমি জীবনে কখনো অসুখেই ভুগিনি, বুড়ো বললো। কারুরই ঘুম আসছিল না।

—আমার ছেলেটা খুব খারাপ ছাত্র, প্রথমজন বললো।

—আর আমারটা তো একই ক্লাসে আটকে আছে কয়েক বছর ধরে।

—আর আমার সব নাতি-নাতনি তাদের ক্লাসের

সেরা ছাত্র, বুড়ো জানালো। প্রথমজন উঠে
দাঁড়িয়ে রুষ্টস্বরে বললো:

—মাত্র গতকাল নতুন জুতো কিনেছি, অথচ
আজ সোল খুলে পড়েছে।

—জানেন, আমিও গতকাল নতুন জুতো
কিনেছি,—ভারি অবাক হল দ্বিতীয়জন।—তবে
দোকান থেকে ফেরার পথে আমি তা ভুল করে
ট্রামে রেখে নেমে পড়েছি।

নিজের বহু ব্যবহৃত স্যান্ডেল জোড়ার দিকে
আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুড়ো বললো:

—আর আমি এই স্যান্ডেল জোড়া পরছি ১৫
বছর ধরে। ঠিক আছে, বন্ধুরা, হয়তো পরে
আবার কখনো দেখা হবে। আমার স্টেশন
তিন্দারেভো এসে পড়েছে।

—সর্বোনাশ! তিন্দারেভো?—প্রথমজন মাথা
চাপড়ে বিলাপ করলো।—তার মানে, আমি এক
স্টেশন বেশি চলে এসেছি!

—আর আমি দুই স্টেশন, জানালো
দ্বিতীয়জন। ইলিয়া বুতমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২২, ২০১০

476) এমন ভাষা কোথাও

খুঁজে পাবে না...

কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই—
জব্বার মাস্টার রিটারার করিয়া প্রমাণ করিল
সে মাস্টারি পেশা ছাড়ে নাই। যত দিন চাকরি
ছিল তত দিন তবুও মানুষটা স্কুলের চার
দেয়ালের ভেতরে গোনাগুনতি ছাত্রদের
সিলেবাসের বাঁধাধরা জ্ঞান দেওয়ার মধ্যে বাঁধা
ছিল। এখন রিটারার করে যেন ঘরের বিড়ম্বনা
দশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। জব্বার মাস্টার
রিটারার করে সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই স্বেচ্ছা
গৃহবন্দী জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে এসে
কিশোরগঞ্জ শহরের গৌরাঙ্গ বাজারে তিন রাস্তার
মাথায় চায়ের দোকানে বসে। সকাল নয়টা
বাজতে এ-পাড়া ও-পাড়ার ছেলেমেয়েরা এই
পথ ধরে স্কুল যেতে শুরু করতেই জব্বার
মাস্টারের পুরোনো মাস্টারি রোগ মাথার মধ্যে
চাড়া দিয়ে ওঠে।

আধ-খাওয়া চায়ের কাপ টেবিলে হেলায় নামিয়ে
রেখে সে রাস্তার মোড়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, ‘ওই
ছ্যাড়া, বিষয়টা কী? ছালাম দিলি না।’ সালামের
আশায় সময় নষ্ট না করে জব্বার মাস্টার দ্রুত

প্রশ্নোত্তর পর্বে ঢুকে গিয়ে বলে—

—বল, নৌকার ইংরেজি কী?

ছেলেটার ঝটিতি জবাব,

—নৌকার ইংরেজি ‘বুট’।

তারপর প্রশ্নের বাণ একটার পর একটা

ছেলেটার দিকে ছুটে আসতে থাকে, এবার

হালের ইংরেজি বল। বল দেখি পালের ইংরেজি কী? গলুইয়ের ইংরেজি জানিস? আচ্ছা যা।

তোর স্কুলের ইংরেজি মাস্টাররে জিগাইয়া

গলুইয়ের ইংরেজি শিইখা আইসা কাল আমারে

এইখানে এই সময় রিপোর্ট করবি। ছেলেটি

অতি ধুরন্ধর। পরদিন সে নিজে এই পথ

এড়িয়ে ঘুরপথে স্কুলে গেছে, সেই সঙ্গে গৌরাজ

বাজারে জব্বার মাস্টারের উপস্থিতির বৃত্তান্ত

বন্ধুদের ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেয়। ছাত্রের

জীবন মাস্টার বিনে আটকে থাকে না কিন্তু ছাত্র

বিনে মাস্টারের জীবন চলে না। জব্বার মাস্টার

এই শহরের ছাত্রদের নখরামী ধরতে পেরে তার

কৌশলগত অবস্থান বদলায়। পরদিন সকাল

সকাল রথখোলার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইতিউতি

চাইতেই স্কুলগামী এক ছাত্র সোজা তার হাতের

মুঠোয়।

এ ছেলেও যথারীতি ‘নৌকা মানে বুট’ পর্যন্ত

বলেই একেবারে উধাও। স্কুলের বেলা বয়ে

যাওয়ার দোহাই দিয়ে সেদিন মাস্টারের হাত

থেকে ছাড়া পেয়ে ভুলেও সে আর এ-পথ

মাড়ায় না। তার চেয়ে বড় কথা, সে ধড়িবাজ

ছেলে মাস্টারের অবস্থান ফাঁস করে দেওয়ায়

বাকিরাও সাবধান হয়ে গেল।

জব্বার মাস্টার দমে যাওয়ার পাত্র নয়। জায়গা

বদল করে সে এবার কাছারি বাজারে ঝুড়ি-

টুকরির দোকানের কোনায় জানু ভিড়িয়ে বসে।

খুদে বদমাশগুলো ধরা না দিয়ে যাবে কোথায়?

সে নিয়ত করে রেখেছে, আজ তার প্রশ্নের বাণ

নৌকা ছেড়ে নদীতে নামবে। বদমাশগুলো নদীর

স্রোতের ইংরেজি বলতে পারলেও নদীর পাড়ের

ইংরেজি বলতে পারবে না—পাড়ের ইংরেজি

বলতে পারলেও নদীর তলায় গিয়ে ঠিকই

আটকাবে।

সকালবেলা স্কুলযাত্রী ছেলেগুলো যথারীতি

কাছারি বাজারের পথ ধরে এগিয়ে আসে।

ওদের সঙ্গে অতিশয় ত্যাঁদড় চেহারার কয়েকটা

মেয়েও আছে। মাস্টারের দিক থেকে কোনো

প্রশ্ন শুরু হওয়ার আগেই একটা মেয়ে ঠোঁটের কোণে পিছলা হাসি ঝুলিয়ে রেখে মিহি গলায় আবদারের সুরে বলে—

—স্যার, ইভ টিজিংয়ের ইংরেজি কী?

—আরে, এইটা কী আজব প্রশ্ন! ইভ মানে ইভ আর টিজিং মানে ত্যক্ত করা। ইভরে কে ত্যক্ত করবে?

অ্যাডাম? কেন? ইভরে অ্যাডাম কোথায় ত্যক্ত করল? ইডেনের বাগানে নাকি দুনিয়ায়? কী সর্বনাশ। এ অতি আশ্চর্য কথা।

বেমক্লা ধন্দে পড়ে আজ মাস্টারের মেজাজ খারাপ। ইভ টিজিং শব্দটি তাকে ভাবিয়ে তোলে। এমন শব্দ সে ডিকশনারিতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তড়িঘড়ি ঘরে ফিরে সে তন্ন তন্ন করে ডিকশনারির পাতা ওল্টায়। কিন্তু কোথাও সে এমন শব্দের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। দিনভর খোঁজাখুঁজি শেষে পাদটীকায় শব্দটির পরিচয় মেলে। ইভ টিজিং শব্দটি একান্ত বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত ঘরানার। ইভ টিজিং একবারে একান্ত প্রাচ্য সংস্কৃতি। মাস্টারের মনে চিন্তা, ইংরেজের দেশে ইভ টিজিং ব্যাপারটি থাকলে ইভ টিজিং শব্দটি নিশ্চয়ই ডিকশনারিতে থাকত।

জব্বার মাস্টার লজ্জায় আর কোনো দিন ডিকশনারি খোলে না। তুষার কণা খোন্দকার

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২২, ২০১০

477) আমার বন্ধু ফটিক

আমার বন্ধু ফটিকের মাথায় হাজার হাজার পরিকল্পনা ঘুরে বেড়ায়। শুধু ঘুরেই বেড়ায় না, এই পরিকল্পনাগুলো ওর মাথায় রীতিমতো ল্যাং মারতে থাকে।

তবে ফটিকের পরিকল্পনাগুলো নিছক পরিকল্পনা থাকে না, শেষ পর্যন্ত ওগুলো একেকটি প্রজেক্ট হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, বছর দুয়েক আগে একটি মুঠোফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে আহ্বান জানাল, সবাই যেন তাদের স্বপ্নগুলোর কথা লিখে জানায়। ফটিক সেই স্বপ্নপূরণের ফরম সংগ্রহ করল এবং পায়ের ঘাম মাথায় তুলে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল যে সে সংগীতজগতের একটি নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। কেননা, এর কিছুদিন আগে থেকেই সে সংগীতের প্রতি তুমুল আবেগ অনুভব করছিল। তারপর দ্রুত বেগেই সে পরিকল্পনা করে ফেলল

যে সে গানের সুর করবে, সংগীতায়োজন করবে এবং চট্টগ্রামেই একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করবে। যেখানে কাজ করার জন্য ঢাকার নামীদামি শিল্পীরা তো বটেই, ভারত থেকে এ আর রহমানও ট্রেনে চেপে চট্টগ্রামে চলে আসবেন। আমরা ফটিকের এই পরিকল্পনায় সাংঘাতিক আগ্রহ হলাম এবং ওর স্টুডিওতে একটি চাকরি যেন পাই, তার জন্য খুব তদবির করলাম। ফটিক অবশ্য তার ব্যস্ততার জন্য সেই স্বপ্নপূরণের ফরম পাঠাতে পারল না। তবে তার পরিকল্পনায় সে পিছপা হয়নি। আমাকে বলল, ‘তুই আমাকে একটি গান লিখে দে, আমি প্রথমে তোর গান দিয়েই কাজ শুরু করে দিই।’

ফটিককে গান লিখে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ইহজন্মে ছিল না। কিন্তু ও মাঝেমধ্যে ওর নিজের সম্মানার্থে আমাদের বিরিয়ানি, কাবাব—এসব উদরস্থ করায় বলে না করতে পারলাম না।

ফটিক হারমোনিয়াম নিয়ে তার স্বপ্নপূরণের প্রথম কয়েক দিন পার করল। কয়েক দিন পর সে আমাদের ডেকে তার সুর করা গানটি শোনাল। সুর শুনে আমার কেন জানি মনে হলো, কেউ একজন হোটেলের ওয়েটারকে ডেকে এক কাপ চা আর দুটি পরোটা দিতে বলছে। মনে হয় অন্যদেরও একই রকম অনুভূতি হয়েছিল, তাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও সবাই ওকে তিরস্কার করায় ও তখনই রণে ভঙ্গ দিল। তারপর অনেক দিন তার কোনো খোঁজ নেই। অনেক দিন পর একদিন আমার কাছে ফোন করল, ‘দোস্তু, নতুন একটা বিজনেস করতেছি, দোয়া করিস।’

আমি অবাক হলাম, ‘কিসের বিজনেস করিস?’ ‘লাইভ দেখা হলে সবকিছু বিস্তারিত বলব’ বলে ফোন কেটে দিল।

ওর নতুন বিজনেসের কথা শুনতে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করলাম। ও বলল, ‘দোস্তু, একটা এনজিওর ডিরেক্টর হইছি। আগে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা নিই, তার পরে বিপ্লব ঘটামু। তোদের কোনো কাজ নাই, তোরা শুধু দোয়া করবি।’

ফটিক এনজিওর ডিরেক্টর হয়েছে শুনে আমার কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দশা হলো। অবশ্য

ওকে যে এনজিওর ডিরেক্টর বানিয়েছে, সেই এনজিও আর কত দিন জীবিত আছে, তা জানতেও ইচ্ছে হচ্ছিল। সামলে নিয়ে বললাম, ‘কিসের বিপ্লব ঘটাবি?’

ফটিক বলল, ‘মাইক্রো ক্রেডিটের জগতে বিপ্লব ঘটামু। এমন পরিকল্পনা করছি, ক্ষুদ্রঋণের জগতে নতুন পরিকল্পনা নিয়া আসমু। ড. ইউনুস তো নোবেল পাইছে, আমি অস্কার পাওয়ার চিন্তা করতেছি।’ ওর কথা শুনে আমাদের হাট অ্যাটাক হবে হবে করছে দেখে ও বলল, ‘ফাজলামি না দোস্তু, সিরিয়াস। ক্ষুদ্রঋণের জগতে নতুনত্ব আনমু। আর কিছুদিন পরেই দেখবি, আমার নাম পুরা বিশ্ব জাইনা যাইব। একদিন আমার অফিসে আসিস।’

আমরা একদিন ওর অফিসে গেলাম। ওকে বসার জন্য একটি ডেস্ক দেওয়া হয়েছে। অফিসে আর কোনো লোকই নেই। ফটিক একলা বসে বসে নিচে চাকা লাগানো চেয়ার চড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরাও কিছুক্ষণ ওই চেয়ারে পালাক্রমে চড়লাম।

তারপর কিছুদিন পরে শুনি, ওই এনজিও (ওইটি নাকি আদৌ কোনো এনজিও ছিল না) ফটিকের মতো আরও কয়েকজন ডিরেক্টর এবং বিপুলসংখ্যক গ্রাহককে মর্তমান কলা দেখিয়ে সটকে পড়েছে। ফটিক এখনো ওই এলাকায় যায় না, গ্রাহকেরা পেলে ওকে বেশ জামাই আদর করবে এই আশঙ্কায়।

তারপর ফটিক আবারও ডুব দিল। অনেক দিন ওর কোনো খবর পাই না। হঠাৎ করে গত বছর রমজান মাস শুরু হওয়ার সময় সে একদিন ফোন করল। সন্ধ্যার সময় ফোন করে বলল, ‘যত তাড়াতাড়ি পারিস, কাজীর দেউড়ী মোড়ে চলে আয়।’

গিয়ে দেখি, ফটিক রাস্তার পাশে বসে বিরাট এক ডেকচি নিয়ে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। আমাদের দেখে অমায়িক হেসে বলল, ‘ফুল প্লেট ২৫ টাকা, হাফ প্লেট ১৫ টাকা। তবে তাদের মাগনা খাওয়াব, প্রতিদিন এসে খেয়ে যাস।’ জুয়েল দেব

আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২২, ২০১০

478) পুষ্প ধনু - সৈয়দ মুজতবা আলী

রস কি? অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিংবা সরেস সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিংবা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্টি হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমনকি—শোনা কথা—বার্ট্রান্ড রাস্স নাকি বলেছেন গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতই। কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কি সে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তা হলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক’টি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্ততঃ দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকষহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্নে’ হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চারণ করে সে তো

জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো
আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভারত থেকে
আরম্ভ করে দণ্ডিন মন্মট ভামহ হেমচন্দ্র,
অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট
বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্তা প্রশ্ন
শোধান, রস কি—হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি
এঁদের স্মরণে রাস্তেক প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান।
অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্তা রীতিমত
হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জার্মান কবি
হাইনরিখ হাইনের নাম কেউ বড়ো একটা করে
না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা
করেন নি। জার্মান কবিদের নিয়ে আলোচনা
করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে
তিনি চিন্তা করেছেন এবং রস কি তার সংজ্ঞা
না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পছলে সব কিছু
অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর
রামকৃষ্ণ যে-রকম কোনো কিছু বলতে গেলে
সংজ্ঞা নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি না করে গল্প বলে
জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা
সেইরকম।

বাগদাদের শাহুইন-শাহু দীনদুনিয়ার মালিক
খলিফা হারুণ-অর্-রশীদে হারেমে সর্বশ্রেষ্ঠ
সুন্দরী, খলিফার জিগরের টুকরো, চোখের
রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন ‘স্বপ্নচারিণী’, অর্থাৎ
ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন!
গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু
পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন। প্রাসাদ উদ্যানে।
সখীরা গেছেন পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে
গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ
মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ
করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব
সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর
সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন
বাণী, নতুন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী
তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে
পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া
যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদুমৃদু হাসছে। সখীরা
বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর
বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে

যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তা হলে কাকে দেওয়া যায়? যাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। খলিফা হারুণ-অর্-রশীদ।

খোজাকে ডেকে বললেন, ‘বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলিফাকে) দিয়ে এসো।’

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, ‘ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ। কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ। হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।’

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারল না সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলিফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। এতখানি গল্প বলার পর কবি হইনরিষ হইনে বলছেন, ‘হায় আমি বাগদাদের খলিফা নই, আমি মহাপুরুষের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙুটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।’

এ স্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী = কবি ; ফুলের তোড়া = কবিতা ; ফুলের রঙ পাতার বাহার = তুলনা অনুপ্রাস ; খোজা = প্রকাশ-সম্পাদক-ফিলিমডিস্ট্রিবিউটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু বাণীটি বোঝেন না) ; এবং খলিফা = সহৃদয় পাঠক।-----

সৈয়দ মুজতবা আলী: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রম্যরচয়িতা। পঞ্চতন্ত্র ও ময়ূরকণ্ঠী তাঁর অন্যতম রম্যরচনা। জন্ম ১৯০৪ সালে ও মৃত্যু ১৯৭৪ সালে।

479) মনের দরজা

বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠকেরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে চিঠি লেখেন।

বিশেষজ্ঞরা সেসব সমস্যার সমাধান দেন। কিন্তু পশুপাখি নিয়ে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

পশুপাখিও যদি তাদের সমস্যার কথা বলত, তাহলে কেমন হতো? সেটাই কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন পশুপাখির বন্ধু

আদনান মুকিত* আমি এবারের কোরবানির হাটে একজন প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে ক্রয় করেনি। এই নিয়ে টানা তিন মৌসুম মালিক আমাকে হাটে এনেছে, কিন্তু কারও কাছে বিক্রি করতে পারিনি। আমার সব বন্ধু ভালো ভালো দামে বিক্রি হয়ে গেছে। এমনকি আমার চেয়ে বয়সে ছোটরাও বিক্রি হয়ে গেছে। আমিই শুধু দাম পেলাম না। বিশ্বাস করুন, আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি খাঁটি ঘাস খাওয়া গরু। তবু কেন কেউ আমাকে পছন্দ করছে না, সেটা এক রহস্য। এদিকে বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। জুনিয়র গরুরা আমাকে দেখলে কটু কথা বলে, হাসাহাসি করে। এভাবে চললে মালিক হয়তো কোনো এক কসাইয়ের কাছে আমাকে বিক্রি করে দেবে, যা আমি চাই না। এসব ভেবে খুব চিন্তার মধ্যে আছি। মাঝে মাঝে গলার দড়িটায় বুলে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।

লালু

লালমনিরহাট@ আচ্ছা, আমাকে বলো তো, তুমি কি কখনো বিক্রি না হওয়ার কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছিলে? তোমার বন্ধুরা বিক্রি হয়ে গেছে, অথচ কেন তোমাকে কেউ কিনছে না এ নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভেবে কারণগুলো বের করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে তোমার মালিকের সঙ্গে কথা বলো। আর যারা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করো। তাদের বন্ধু হয়ে যাও। দেখবে, ওরা আর এমনটি করবে না। আর এত হতাশ হলে চলবে? আমাকে কথা দাও, ভবিষ্যতে কখনো আত্মহত্যার কথা ভাববে না। তোমার আরও ভালো কিছু করার সুযোগ রয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম করো, ঠিকমতো ঘাস খাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।* আমি একজন জিরাফ। বর্তমানে একটি চিড়িয়াখানায় কর্মরত আছি।

সমস্যা হলো, আমার উচ্চতা অন্যান্য জিরাফের তুলনায় খুবই কম। ফলে আমি তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। এ নিয়ে সারাক্ষণ হীনম্মন্যতায় ভুগি। একা একা থাকি। আমার ধারণা, লম্বা লম্বা জিরাফের ভিড়ে পাবলিক আমাকে দেখতেই পায় না। আর পেলেও আমার উচ্চতা নিয়ে হাসাহাসি করে। অনেকে ভাবে আমি শিশু। গত মাসে একটি মেয়ে জিরাফকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, আমি খাটো। লম্বা হওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি, ব্যায়াম করেছি। কিন্তু কোনো উন্নতি হয়নি। আমি কী করব?

গিটু মিয়া

ঢাকা চিড়িয়াখানা@ উচ্চতা কম হতেই পারে। এতে আপসেট হওয়ার কিছু নেই। সব সময় মনে রাখবে, তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় তুমি একজন জিরাফ। একা একা না ঘুরে সবার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করো। দেখবে, এসব উচ্চতার কথা মাথায়ই আসবে না। আর যে মেয়ে জিরাফটি উচ্চতার কারণে তোমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে, তাকে ভুলে যাও। সে তোমাকে ভালোবাসেনি। সে শুধু তোমার উচ্চতাই দেখেছে। তোমারও যে একটা সুন্দর মন আছে তা দেখেনি। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না। তবে লম্বা হওয়ার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলে দেখতে পার। বাজারে আজকাল হাই হিলের জুতা পাওয়া যায়। সেগুলোও পরে দেখতে পার। ভালো থেকো।* আমার নাম মুরগি। কদিন থেকেই আমি ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে দেখি, দুজন মিলে ধারালো ছুরি দিয়ে আমাকে জবাই করছে। কখনো দেখি, আমাকে প্রচণ্ড তাপে গ্রিল করা হচ্ছে। এ রকম আরও ভয়ংকর টাইপের স্বপ্ন দেখি। দুঃস্বপ্নের পর আর ঘুমাতে পারি না। চুপচাপ বসে থাকি। আর ছুরি দেখলেই ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে। দুশ্চিন্তায় অনেক দিন ঠিকমতো ডিমও দিতে পারছি না। আমি কী করব? ও, আরেকটা কথা, আমি হরর মুভি দেখতে খুব পছন্দ করি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক@ দুঃস্বপ্ন ঘুমের মধ্যে দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। না ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখবে কী করে? যাই হোক, আমার মনে হয়

বেশি বেশি হরর মুভি দেখার কারণেই তোমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। মুভির দৃশ্য আর পরিবেশগুলো তোমার মাথায় ঢুকে গেছে। তাই বারবার দুঃস্বপ্ন দেখছ। হরর ছাড়াও অনেক রকম মুভি আছে। আমাদের বাংলা সিনেমাগুলো খুব ফানি হয়, সেগুলো দেখো। ভালো লাগবে। আর চুপচাপ বসে না থেকে পরিশ্রম করো। ঠিকমতো খাও, ডিম দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।* সাপ হওয়ায় আমি গর্ত থেকে খুব একটা বের হই না। সেদিন বের হয়েছিলাম। আমার গর্তের পাশ দিয়ে একটা বেজি হেঁটে যাচ্ছিল। প্রথম দেখাতেই আমি বেজিটার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। আমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসি। ওকে না দেখলে আমার ভালোই লাগে না। আমি জানি, আমাদের পরিবার এই ভালোবাসা কোনো দিন মেনে নেবে না। কিন্তু মন থেকে ওকে সরাতে পারছি না। এদিকে বাসা থেকে বিয়ের জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছে। আমি কী করব? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক@ তুমি খুব গুছিয়ে তোমার সমস্যার কথাটা লিখেছ বলে ধন্যবাদ। তোমার লেখাও চমৎকার। তবে তুমি কিন্তু বলোনি তোমার বয়স কত, বেজিটার বয়স কত, তার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে কি না— এসবও লেখোনি। এসব না জেনে কিছু বলাটা কঠিন। তবু বলছি, তুমি আগে বেজিটার সঙ্গে কথা বলো। সেও তোমাকে ভালোবাসে কি না, সেটাও দেখতে হবে। তারপর তুমি বাসার সবার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করো। তাদের বোঝাও। আশা করি, তারা তোমার সমস্যাটা বুঝবে।* ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই অযত্ন আর অবহেলা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। বহু কষ্টে আমি বড় হয়েছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমার মনে হয়, সবাই আমাকে অবহেলা করছে। মনে হয়, কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারি না। তাই অন্যদের তুলনায় আমি অনেক পিছিয়ে আছি। এ কারণে মনে হয় আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব, পরে মনে হলো, ওটাও আমাকে দিয়ে হবে না। এখন আপনি বলুন, আমি কী করব?

পুটু
ছাগলনাইয়া।@ প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত সব

সন্তানের প্রতি সমান নজর দেওয়া। তুমি তিন নম্বর বলে হয়তো তোমার প্রতি তেমন নজর দিতে পারেনি। তবে তুমি কিন্তু ঠিকই বড় হয়েছ। ঘাস খাচ্ছ। আর কদিন পর হাটে উঠবে। অতএব, অতীতের কথা ভুলে যাও। কে বলেছে কিছু পার না? ম্যা ম্যা করে ডাকতে তো পার, সেটাই বা কম কি? তোমার যতটুকু মেধা আছে, তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। আর প্রচুর পরিমাণে সবুজ ঘাস খাবে। আজকাল গবাদি পশু মোটাতাজাকরণের জন্য অনেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ওগুলো খেয়ে দেখতে পার। এগুলো তোমার দুর্বলতা দূর করবে। ভালো থাকো। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৯, ২০১০

480) ফরাসি রঙ্গ - সারপ্রাইজ

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাল থেকে ঘাম মুছল সের্জ। বেজায় গরম পড়েছে। তার ওপরে আছে দুশ্চিন্তা। দু'দিন বাদে তার বস ডক্টর আহিল বোঁফুয়ার কর্মজীবনের কুড়ি বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষে বসকে দামি কোনো উপহার দেওয়া কর্তব্য বলে সের্জ মনে করে। কিন্তু পরম বিষাদের ব্যাপার এই যে, সের্জ খুব অবস্থাপন্ন নয়। সে তার সমস্ত নগদ টাকা গুনে দেখল। হায়! সব পকেট হাতড়ে জড়ো করতে পারল মাত্র ৫০ ফ্রাঁ। এই কটা টাকা দিয়ে কী কেনা সম্ভব? তবু হাল ছাড়ল না সের্জ। নিষ্ঠীকভাবে ঢুকে পড়ল এক অ্যান্টিকের দোকানে। দোকানের মালিক সে সময় উঁচু গলায় কথা বলছিল এক ক্রেতার সঙ্গে: 'শোনো, দ্যুরান, তুমি যদি তিন দিক দিয়েও আমার আত্মীয় হতে, তোমার অনুরোধ তবু আমি রাখতে পারতাম না। আমি কাউকে কোনো কিছু বাকিতে বিক্রি করি না।' সের্জ মন দিয়ে শপউইন্ডো এবং দোকানের ভেতরে রাখা জিনিসগুলোর গায়ে সাঁটা দামের ট্যাগ দেখতে শুরু করল। জিনিসগুলো বড়ই মনোহর, তবে দাম তার পকেটে কুলানোর মতো নয় একেবারেই। সে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল দোকান থেকে, হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক কোণে স্তূপ করে রাখা চিনেমাটির বেশ কিছু টুকরো। 'এটা কী?' জানতে চাইল সে দোকানের মালিকের কাছে। 'ওহ্! এটা ছিল এক অনন্য জিনিস।' কাতর

কণ্ঠে বলল দোকানি। ‘নবযুগের সূচনাকারী মিনা ডাইন্যাস্টির আমলের মহামূল্য ফুলদানিটা আমার বজ্জাত বিড়াল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।’

‘জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেননি কেন?’

‘সময় নেই। আর তার চেয়ে বড় কথা, এটা এখন একেবারেই মূল্যহীন।’

‘আমি যদি কিনি, কততে বেচবেন?’

‘পাঁচ ফ্রাঁ দিন, আমি আপনাকে সব প্যাকেট করে দিচ্ছি।’

‘আপনাকে ধন্যবাদ। এই নিন ১০ ফ্রাঁ। সবগুলো টুকরো বাক্সে ভরে আজই এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন: ডক্টর আহিল বোঁফুয়া, গ্রেনেল স্ট্রিট ১১১/৪, প্যারিস।’

‘চিন্তা করবেন না, সব ঠিকমতো করে দেব।’

প্রফুল্ল চিত্তে সার্জ বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বস ভাবুক, সে তাঁর জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়

করেছে, আর বহনের সময় ফুলদানিটা ভেঙে

গেলে তাতে তার কোনো দোষ তো

নেই! সোমবার সার্জ যখন কাজে এল, খুব

ফুরফুরে মেজাজে ছিল সে। পাঁচ মিনিট পরে

এসে পৌঁছালেন ডক্টর আহিল বোঁফুয়া। নিজের

কেবিনে ঢোকান আগে এগিয়ে এলেন সার্জের

কাছে।

‘আপনার পাঠানো উপহার পেয়ে আমি স্রেফ

স্তম্ভিত হয়ে গেছি।’

‘আমি সত্যিই খুব খুশি,’ সার্জের চোখমুখ

আলোকিত হয়ে উঠল। ‘ফুলদানিটি আসলেই

অভিজাত...।’

‘কিন্তু আমাকে বলুন তো, প্রতিটি টুকরো আপনি

কাগজ দিয়ে মুড়িয়েছিলেন কেন?’ পিয়ের

দানিনোস

সংকলন ও অনুবাদ মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৯, ২০১০

481) বিল - আলফোঁস আলো

(১৮৫৪-১৯০৫)

জীর্ণ এক হোটেলে দু’দিন বাস করে ৫০০ ফ্রাঁর

বিল পেয়ে হোটেলমালিকের সঙ্গে কথা বলার

সিদ্ধান্ত নিলাম।

‘মাফ করবেন, মসিয়ে,’ আমি শুরু করলাম,

‘এই অস্বাভাবিক বিলের কারণটা কী? বিল

দিয়েছেন চার দিনের, যদিও আমরা তিন দিনও

থাকিনি। সোমবার রাতে এসে আজ সকালে

হোটেল ছেড়ে যাচ্ছি।’

‘সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার—চার দিন!’ হিসাব বুঝিয়ে দিতে চাইলেন হোটেলমালিক।

‘সোমবারকে হিসাবে আনা উচিত নয় কোনোমতেই! আমরা এসে পৌঁছেছিলাম তো প্রায় মাঝরাতে! আর এখন বৃহস্পতিবার সবে শুরু হচ্ছে!’

‘তেমনই নিয়ম, মসিয়ে। দিন শুরু হয়ে গেলে সেটিও বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’

‘আচ্ছা, সেটা না হয় মানলাম, কিন্তু প্রতিদিন ইলেকট্রিসিটির জন্য দুই ফ্রাঁ করে ধরেছেন কেন, দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন? যে দুই দিন আপনার এখানে ছিলাম, ইলেকট্রিসিটি তো একদমই ছিল না!’

‘হ্যাঁ, ইলেকট্রিসিটি ছিল না বটে, তবে সে কারণে আপনাদের কিন্তু একেবারেই ভুগতে হয়নি। আপনাদের মোমবাতি দেওয়া হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, মোমবাতি ছিল, কিন্তু সেগুলোর দামও তো বিবেকের দংশন ছাড়াই ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিলে!’

‘তা-ই তো দেওয়ার কথা! মোমবাতি পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না?’

‘তাহলে ইলেকট্রিসিটি হিসেবের বাইরে রাখুন।’

‘তা তো সম্ভব নয়, মসিয়ে। ইলেকট্রিসিটি হলো দৈনন্দিন ব্যয়, আর মোমবাতি উপরি।’

‘কিন্তু আপনি কাগজ আর কালির বিল দিয়েছেন কেন? আমরা তো কিছুই লিখিনি।’

‘আপনারা লেখেননি বটে, তবে আপনাদের জন্য তো লেখা হয়েছে।’

‘কে লিখেছে?’ রাগ চড়ে গেল আমার।

‘আমরা। বুঝিয়ে বলি। আপনারা যখন এসে পৌঁছালেন, আমরা আপনাদের নাম-পদবি লিখেছি। তারপর প্রতিদিন লাঞ্চার সময় আপনাদের যে মেন্যু দেওয়া হতো, লক্ষ করে থাকবেন, সেটিও কাগজে। এবং এই যে বিল আপনাদের দেওয়া হয়েছে, সেটিও কাগজের ওপরই লেখা!’

আমাকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করল এই যুক্তি এবং আমি পরাজয় মেনে নিলাম।

482) নবজীবন-স্রোত - বনফুল

শ্রীযুক্ত রামবৃহৎ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন।

পরিচয় বেশী দিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প

কিছুদিন পূর্বে চাকুরি ব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেল। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মিলিত না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃহের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে একই ক্লাসে ভরতি হইয়াছিল তাহারা। অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেজ্জ্ব বলতে পারে না, বলে—সেভুন। কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, ছবিলাল কে?

পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃহ—

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, ও, বুঝেছি। রামবৃহ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি?

হ্যাঁ।

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, ওঁর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোন মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তাও নেই—

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃহবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃহবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃহবাবুও সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃত-নিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মত একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনা-ইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহাসমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা-ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃহৎ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃহৎ তখন রহরকা দাল ও নিমকি সহযোগে মোটা আটার রোটি চর্বণে ব্যাপ্ত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাহার ভ্রু কুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ঘর মে কোই জানবর মরল বা?

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন বহু মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃহৎ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে, ছি ছি ছি! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই থে, গিধ্ বা। অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয় শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, ও বেটা ছাতুখোর মাছের মর্ম কি বুঝবে?

এ খবরটিও রামবৃহৎ অবিদিত রহিল না।

উভয় পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল যখন রামবৃহৎ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে. কে. নামক পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃহৎ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ

নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন।

তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোন ক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন।

কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা।

রামবৃহৎ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃহৎ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, শালা মছলিখোর!

দোলের দিনে রামবৃহৎ পরিবারবর্গ কাদায় রঙে কিস্তৃতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় ‘হোলি’ গাহিতে লাগিল।

কমলকুমার কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্যাটা বেহারী ভূত!

এই ভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃহৎ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃহৎ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কেন?

সে উত্তর দিল, বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক ‘নবজীবন’-এর নাম শুনেছেন?

খুব।

তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।

‘নবজীবন’ কি এখানে এসেছেন?

আরে, তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ।

এখানকার এ. এস. এম.।

রামবৃহৎ আর বাক্যস্ফুর্তি হইল না, মুখটা একটু

ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সম্বর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃহৎ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়ে—

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃহৎ করজোড়ে বলিলেন, পহলেই ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি নবজীবন হুঁয়। ম্যায় আপকা ভকত হুঁ।

কমলকুমারও হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃহৎ বলিলেন যে, তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। ‘নবজীবন’-লিখিত অনেক গল্প তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন।

কমলকুমার বলিলেন, তাই নাকি? ‘স্রোত’ নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি।

রামবৃহৎ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, ম্যায় স্রোত হুঁ।

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। বনফুল: প্রখ্যাত সাহিত্যিক। আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

483) ফাঁদ – আ. তেদেস্কি

রোমের প্রথিতযশা আইনজীবীর রিসেপশন রুমে উদ্বিগ্ন মুখে কয়েকজন মক্কেল বসে ছিল ডাক পাওয়ার আশায়: ‘নেক্সট, প্লিজ।’ সেই সময় সেখানে ঢোকান অন্য দরজাটি খুলে গেল, লাইনের তোয়াক্কা না করে ঝড়ের বেগে রিসেপশন রুম পার হয়ে আইনজীবীর ঘরে ঢুকে পড়ল তব্বী, অপরূপা এবং স্পষ্টতই শক্তিত চোহারার এক মেয়ে।

‘কী প্রয়োজন আপনার, সেনিওরা?’ আইনজীবী উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

‘আমি এখনো সেনিওরিটা’, শুধরিয়ে দিল মেয়েটি। ‘আমার নাম সান্দ্রা। একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে, বান্ধবীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও কোনো ছেলে তা ফিরিয়ে নিতে পারে?’

‘শান্ত হোন, বসুন’, আইনজীবী বললেন।

হাতের তালু দিয়ে নিজের রূপালি হয়ে যাওয়া চুলের ওপরে হাত বুলিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘মেয়েটি, খুব সম্ভব, আপনি?’

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল সে।

‘হুমম...আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার হবু বর এমন করার অধিকার রাখেন না...যদি আপনার প্রতি তার প্রেম উবে গিয়ে না থাকে।

কিন্তু আমার ধারণা, এটা অসম্ভব ব্যাপার!’

‘না, ও আমাকে আগের মতোই ভালোবাসে।

একমাত্র প্রতিবন্ধক হচ্ছে তার বাবা!’

মুচকি হাসলেন আইনজীবী।

‘এ কেমন হবু বর আপনার! তার জায়গায় আমি

হলে কোনো বাবাই সক্ষম হতো না আপনাকে

বিয়ে করা থেকে আমাকে বিরত রাখতে।’

‘কিন্তু আমি তো দরিদ্র ঘরের মেয়ে...।’

‘আর সে ধনী পরিবারের? চিরন্তন ইতিহাস!

কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য।’

‘কিন্তু তার বাবা সর্বাত্মকভাবে বিরোধী হলে সে

আমাকে বিয়ে করবে কীভাবে?’

‘আপনার হবু বর প্রাপ্তবয়স্ক তো? তাহলে বাবার

অনুমতির প্রয়োজন একদম নেই।’

‘কিন্তু তার বাবা তো তাকে উত্তরাধিকার থেকে

বঞ্চিত করতে পারে।’

‘ননসেন্স!’ বললেন আইনজীবী। ‘যে কোনো

অবস্থাতেই সম্পত্তির নির্দিষ্ট একটি অংশ ছেলে

পাবেই।’

‘দুঃখের কথা এই, আমার হবু বর তার বাবাকে

এতটাই ভয় পায় যে ওই জন্তুটাকে চটানোর

চেয়ে সে বরং তার সুখ বিসর্জন

দেবে।’ মেয়েটির চোখের পাতায় ঝুলন্ত অশ্রু

আইনজীবীর মন স্পর্শ করল। তিনি হাত

রাখলেন মেয়েটির কাঁধে।

‘মন খারাপ করবেন না। আমরা তার বাবাকে

হারিয়ে দেব। আপনার কাছে তো প্রমাণ আছে

যে ছেলেটি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে,

তাই না? চিঠিপত্র আছে না? সাক্ষী? চমৎকার!

তার বাবার পালানোর পথ নেই। সে আমাদের

হাতের মুঠোয়। আমরা প্রমাণ করে দেব, বিয়ের

আশায় আপনি চাকরি খুইয়েছেন।’

‘কিন্তু আমি তো...।’

‘সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়’, মেয়ের কথা

কানেই তুললেন না আইনজীবী। ‘চাকরি তো

আপনি হারাতেও পারতেন! আরও আছে:

আপনার হবু বরের প্রত্যাখ্যানের কারণে

আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে...।’

‘কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণই সুস্থ!’

‘ব্যাপার না! এটা আপনার ধারণামাত্র। শুধু আমি না, যে কোনো গড়পড়তা উকিল আদালতে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে আপনার নার্ভাস সিস্টেম একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এরপর আপনার হবু বর, আর সঠিকভাবে বলতে গেলে তার বাবা বিরাট অঙ্কের জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই তথাকথিত পিতাকে—কঞ্জুস, স্বার্থপর, অহংকারী, ঠক খাওয়া চেহারার অভিব্যক্তি সারাক্ষণ মুখে!’

‘না, না, তাঁর চেহারা তাঁর ছেলের বর্ণনার চাইতে সুন্দর।’

‘হুমম...তাই বলে করুণা দেখানো উচিত হবে না। চেহারা অনেক সময়ই ভ্রান্তিকর হয়ে থাকে। আপনার নৈতিক ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা দাবি করে বসব দুই মিলিয়ন লিরা। পাব হয়তো দেড় মিলিয়ন। তবে আপনার দ্বিধাগ্রস্ত হবু বরের সঙ্গে বিয়ের খরচ এতেই পুষিয়ে যাবে, কী বলেন?’

‘দেড় মিলিয়ন লিরা—সে তো অনেক টাকা! শুরুর দিকে আধা মিলিয়ন পেলেই আমাদের চলে যাবে...।’

‘দেড় মিলিয়নের কমে সম্মতি দেওয়ার কথা মাথাতেও আনবেন না। আর মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারটাও তো মাথায় রাখতে হবে। আমার কথা শুনুন। আর আপনাদের বিয়েতে অপরূপা কনের উদ্দেশে আমিই প্রথম পানপাত্র তুলে ধরব!’

‘না, না, আধা মিলিয়নেই চলে যাবে আমাদের। ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেন্টটা দিতে পারব, কিছু আসবাবপত্রও কেনা যাবে। সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে, এই টাকাটা আপনি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!’

‘কিন্তু টাকা আমাকে দিতে হবে কেন?’

আইনজীবীর গালে চুমু খেলো সান্দ্রা, তারপর বলল, ‘ওহ! বলতে ভুলে গেছি, আমার হবু বর আপনার পুত্র।... সেনিওর, কী হলো আপনার?...’

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০১০

484) রসের রসায়নে রসাতল

বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে খুরো লাগানো কাঁসার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন ইয়াকুব আলী। গ্লাসটির বয়স অন্তত তাঁর বয়সের দ্বিগুণ। পিতৃপুরুষের স্মৃতিস্পর্শ অনুভব করেন তিনি

গ্লাসটি হাতে নিলে। পুরো আধা লিটার পানি ধরে। তবে এখন তাতে পানি নেই। যে তরলটির ওপরে তিনি খানিক পর পর মুঠি মুঠি মুড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন, তা খেজুরের রস। পিঠের ওপর রোদ। ভেতরে যে সুখদ অনুভূতি হচ্ছে তা খুলে বলার মতো কোনো ভাষা এই মুহূর্তে তাঁর মনে ও মাথায় আসছে না।

সকালে এই দক্ষিণদুয়ারি ঘরের বারান্দায় বসে রস খাওয়ার জন্য তিনি বাড়িতে এসেছেন সুদূর রাজধানী থেকে। প্রতিবছরই আসেন শীত পড়লে সুবিধামতো সময়ে। ‘পান’ শব্দটি তাঁর পছন্দ নয়। দুটো কারণে। প্রথমত, পান বললে ইদানীং লোকে ‘সুরা পান’ বুঝে থাকে। কারণ, বারিতে তাঁর ঘোরতর অরুচি এর জঘন্য স্বাদের জন্য। প্রতিক্রিয়া তো পরের বিষয়, স্বাদই তাঁর পছন্দ নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি কেবল রস নেন না গ্লাসে, তার ওপরে মুড়ি ছড়িয়ে দেওয়া চাই চাই। তারপর চুমুক দিয়ে মুড়িসমেত গলাধঃকরণ ও চর্বণ একত্রে যুগলকর্ম সম্পাদন। অতএব শুধু একতরফা ‘পান’ নামের ক্রিয়াটিকে কৃতিত্ব দিতে যাওয়া কেন? উপরন্তু রসের প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা থেকে আবার ওই ‘পানাসক্তি’ বা ‘পানাসক্ত’ কথাটিও উঠতে পারে। অন্যের ফুটো খোঁজার লোকের তো অভাব নেই দুনিয়ায়।

অতএব, সব দিক থেকে রস খাওয়াই দস্তুর মনে হয় তাঁর কাছে। ব্যাকরণের তোয়াক্কা না করে শৈশব থেকে এভাবেই অতি আনন্দের সঙ্গে খেজুরের রস খেয়ে আসছেন তিনি।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ভাবছিলেন, শব্দটি আসলে সঠিক কী হবে, ‘রসগ্রাহী’, ‘রসানুরাগী’, ‘রসপ্রেমী’ নাকি ‘রসিক’। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে, খেজুরের রসের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই ঠিক লাগসই হচ্ছে না। খেজুরের রসের ভক্তদের—

এটুকু ভাবতেই তাঁর মনে হলো ‘রসভক্ত’ শব্দটি কি চলবে? না এটিও ‘গুরুভক্তি’ বা ‘পতিভক্তি’র ক্ষেত্রে যেমন খাপে খাপে লেগে যায়, খেজুরের রসের ক্ষেত্রে ঠিক তেমন লাগে না। আবার আগের ভাবনায় ফিরলেন তিনি। নাহ্, যাকে ছাড়া বাংলার শীতকালই বৃথা, সেই খেজুরের রসের জন্য কোনো শব্দ থাকবে না—কোনো মানে হয়! দেশে নাকি এত এত খ্যাতিমান কবি, কথাশিল্পী, ব্যাকরণবিদ তবে এতকাল ধরে তাঁরা করলেনটা কী? অথচ এ খেজুরগাছটি। কী

বদখতই না চেহারা। কোনো লালিত্য নেই, কোমলতা নেই, খটখটে চেহারা অথচ তার বুকেই কিনা বহমান এমন সুমিষ্ট সুধাসম রসধারা। আরে, এটি যদি ফল্গুধারা না হয়, অমৃতধারা না হয়, তবে কে এসব খেতাব পাওয়ার যোগ্য?

ভাবনার গভীরতর স্তরে উপনীত হয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, আমাদের এখানে এই এক সমস্যা। সব অযোগ্যরা খেতাব পদক বাগিয়ে নিচ্ছে একের পর এক, আর যোগ্যরা পড়ে আছে অবহেলা-উপেক্ষায়। খেজুরগাছের কোনো খেতাব নেই। রসের কোনো উপাধি নেই। এমনকি এই রসের যাঁরা প্রকৃতই গুণগ্রাহী, তাঁদের পরিচয় দেওয়ার মতো পর্যন্ত একটি শব্দ নেই বাংলার শব্দভান্ডারে! ভাবা যায়! ভাবনা যতই গভীর স্তরে যাচ্ছিল, ততই উত্তাপ বোধ করছিলেন তিনি ভেতরে ভেতরে। এটি ভাবনার প্রতিক্রিয়া না রোদের প্রভাব ঠিক অনুমান করতে না পেরে গা থেকে চাদর নামিয়ে গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলেন এবং মিষ্টি স্রোতের সঙ্গে সুড়সুড় করে কতিপয় মুড়ি প্রবেশ করল তাঁর মুখবিবরে।

এ কথা ঠিক যে, রসে আর সেই আগের মতো স্বাদ তিনি পাচ্ছিলেন না। চুন্নু মিয়া বলে গেল বটে যে, ‘পহেলা কাট রস’। তবে তাঁর সন্দেহ আছে। পয়লা কাট কি না কে তা পরীক্ষা করতে যাবে? আগের দিনের লোকের ঈমান ছিল, জবান ছিল। এখন ওসব সেকেলে বিষয় বিবেচনায় পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। রসের মধ্যে কী না কী মিশিয়ে দিচ্ছে, কে জানে! দেশের সবাই যে হারে রসায়নবিদ হয়ে উঠছে, তাতে হয়তো খাদ্যে ফরমালিন মেশানোর মতো যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য চুন্নু মিয়ার মতো কেউ একজন নোবেলও পেয়ে যাবে কোনো একদিন। বিরক্তিতে মন তেতো হয়ে এল তাঁর—সব রসাতলে যাবে!

‘রসাতল’ শব্দটি তাঁর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি শিহরিত বোধ করেন। না, একেবারে যে কিছুই নেই, তা নয়। রসাতলের মতো এমন একটি লাগসই শব্দ কে উদ্ভাবন করেছিলেন? একেবারে আধুনিক শুধু নয়, যাকে বলে ‘লেটেস্ট’। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে জামানার সঙ্গে। রসাতলে যাচ্ছে সব।

তাঁর ভেতরে প্রবল অস্থিরতা কাজ করতে থাকে। মনে হচ্ছিল যিনি এই কালজয়ী শব্দের স্রষ্টা সেই মহামানবকে এখন কাছে পেলে নির্ঘাত চুমো খেতেন তার গালে। উত্তেজনা প্রশমন করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মনে নেই রসের পাত্র অর্ধপূর্ণ রয়ে গেছে। কতিপয় মুড়ি রসসিক্ত হয়ে ডুবে গেছে তলায়। আশীষ-উর-রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০১০

485) সিনেমার ভুলভাল: হাতির পাল যেথায় আকাশে ওড়ে!

ঢাকাই ছবির এক দৃশ্যে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন চরিত্রাভিনেত্রী খালেদা আক্তার কল্লনা। এমন সময় আতঙ্কমাখা মুখে তাঁর তরুণী কন্যা ঢুকল কক্ষে। খালেদা আক্তার এবার বিছানা ছাড়লেন। অতি করুণ মুখ নিয়ে মেয়েকে শুধালেন, ‘তোকে নাকি গুন্ডারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল?’ বুঝুন অবস্থা! মেয়ে অপহৃত হয়েছে, আর সেই খবর জেনে শুনে আপন মাতা এফডিসির বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন! আমাদের ঐতিহ্যবাহী এফডিসির সিনেমায় গরুরা আকাশে ওড়ে, মৎস্যকুল ঘাস খায়—এ কোনো নতুন খবর নয়। পাশের বলিউডেও এই চর্চা বিরল নয়। তবে হলিউডও দেখা যাচ্ছে এই ধারা থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই।

এমনিতে সব পরিচালকই চান তাঁর সিনেমায় কোনো খুঁত না থাকুক। এর পরও অনেক কিছুই চোখ এড়িয়ে যায় তাঁদের। কনটিনিউটির (ধারাবাহিকতা) ভুলই সবচেয়ে বেশি। সিনেমায় সব দৃশ্য একবারে ধারণ করা যায় না।

সন্ধ্যাবেলায় নেওয়া একটি দৃশ্য পরদিন সকালেও

ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে। সে জন্য দৃশ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা খুবই জরুরি। এই যেমন, ম্যাক্স পেইন-এর দুটি দৃশ্য পাশাপাশি দেখুন—প্রথম দৃশ্যে মৃতদেহ এক ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, চুলগুলো ঝুলছে বিছানার বাইরে। পরের দৃশ্যেই আবার ভঙ্গি অন্য রকম—চুলসহ পুরো শরীর বিছানায় উঠে পড়েছে। মৃতদেহের নিশ্চয়ই নড়াচড়ার সুযোগ নেই! সুতরাং শুটিং চলাকালে দৃশ্যের

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ঘরের দেয়াল, আসবাব থেকে শুরু করে নড়াচড়া—সবই অবিকল রাখতে হয়। এটাই কনটিনিউটি।

ভুলভালের মধ্যে অনেক সময় আবার ছবির দৃশ্যে শুটিং দলের ত্রুদের মুখ, শব্দ ধারণ করার মাইক্রোফোন—এসবও এসে যায়। এমনই কিছু ভুল নিয়ে এবারের আয়োজন। রোমান যুগে গ্যাস-সিলিন্ডার

খ্রিষ্টপূর্বকালের রোমান যুগের কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছিল গ্ল্যাডিয়েটর। সেই পুরোনো যুগের আবহ আনার জন্য ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল সর্বাধুনিক কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি, স্পেশাল ইফেক্ট, বাস্তবানুগ অ্যাকশন দৃশ্য। মোটামুটি সবই ঠিক ছিল। গোলমালটা বাধে কার্থেজের যুদ্ধের সময়ে—একটি রথ উল্টে গিয়ে দেয়ালে আঘাত হানে, উল্টে যাওয়ার সময় কন্সলের ভেতরে লুকানো একটি গ্যাস-সিলিন্ডার ছবির পরিচালকের দৃষ্টি এড়ালেও দর্শকের চোখে ধুলো দিতে পারেনি। রোমান যুগে আর যা-ই হোক, গ্যাস অন্তত আবিষ্কৃত হয়নি!

গ্ল্যাডিয়েটর ছবিতে সব মিলিয়ে পাওয়া গেছে ১৭৬টি ভুল। টাইম মেশিন কাভি খুশি কাভি গাম ছবির একটি ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য, সময়কাল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল। দেখা যায়, অমিতাভ বচ্চন একটি এলসিডি প্লাজমা টেলিভিশন দেখছেন। কিন্তু ওই সময় এলসিডি প্লাজমা আবিষ্কার তো দূরের কথা, নামই শোনেনি কেউ। অন্য একটি দৃশ্যে (১৯৯১ সালের ফ্ল্যাশব্যাক) অমিতাভকে একটি নকিয়া ৯০০০ কমিউনিকের ব্যবহার করতে দেখা যায়, যদিও নকিয়ার ওই মডেলের ফোন রিলিজ হয়েছিল তারও পাঁচ বছর পর, ১৯৯৬ সালে। অলৌকিক গর্ভ

স্ত্রীর গর্ভধারণের খবর শুনে কৃশ ছবির একটি দৃশ্যে রোহিত নিজের অবস্থার বিবরণ দিচ্ছিলেন এই বলে—দুই বছর ধরে তিনি টানা অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন এবং পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ শেষে তবেই বাড়ি ফিরবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, রোহিত যদি দুই বছর বাড়ি থেকে দূরেই থাকেন, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন কীভাবে? জাদু নাকি! জ্যাক স্পারোর জিন্স

পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান ছবির একটি দৃশ্যে ক্যাপ্টেন জ্যাক স্পারো যখন তাঁর

অধীনদের কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন সাগরে শুটিং দলের একজন সদস্যকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, যাঁর পরনে ছিল টি-শার্ট, কাউবয় টুপি আর সানগ্লাস! ভাবুন, সেই সময়কার জ্যাক স্পারোরদের পোশাক-আশাক কেমন ছিল।

ছবিটায় সব মিলিয়ে ভুল শনাক্ত করা গেছে ২৪১টি। আকাশে বিমানের মডেল বদল ১৯৯৫ সালের থ্রিলার ছবি দি ইউজুয়াল সাসপেন্সেস-এর একটি দৃশ্যে দেখা যায়, একটি বিমান মাটির দিকে নেমে আসছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, বিমানটি চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট। কিন্তু সেটা যখন মাটিতে নেমে এল, তখন সেই বিমানে দেখা গেল মাত্র দুটো ইঞ্জিন, বাইরে দৃশ্যমান যন্ত্রপাতিও কেন যেন কমে এসেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওঠা আর নামায় দুটি ভিন্ন মডেলের বিমানের সচল চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। পরেরটি সম্ভবত বোয়িং ৭৬৭ ছিল।

এই একই কাণ্ড আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের টার্মিনেটর ৩: রাইজ অব দ্য মেশিনস ছবিতেও ঘটেছিল। জন আর ক্যাথেরিন যখন তাঁদের ছোট্ট সেসনা বিমান নিয়ে রানওয়েতে, তখন ওই বিমানের মডেল নম্বর দেখা যাচ্ছিল এন৩০৩৫সি। কিন্তু বিমানটি যখনই আকাশপানে উড়ল, মডেল নম্বর বদলে হয়ে গেল এন ৩৯৭৩এফ। তবে বিমানটি যখন গন্তব্যে পৌঁছাল, তখন আবার পুরোনো মডেলেই (এন৩০৩৫সি) ফিরে আসে।

২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া এই অ্যাকশনধর্মী ছবিতে ৩৬টি ভুল এযাবৎ পাওয়া গেছে। অলৌকিক ইস্তিরি ফরেস্ট গাম ছবিতে একই দৃশ্যের কয়েক সেকেন্ড আগে-পরে দেখা যাচ্ছে ইস্তিরি নিজে নিজেই খাড়া অবস্থা থেকে শুয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সড়কে মার্কিন সেনার জগিং স্ট্যানলি কুবরিক তাঁর যুদ্ধবিরোধী ছবি ফুল মেটাল জ্যাকেট-এর চিত্রধারণ কাজ করেছিলেন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন লোকেশনে। ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায়, মার্কিন মেরিন সেনারা জগিং করছেন ট্রেনিং ক্যাম্পে। যে সড়কে তাঁরা জগিং করছিলেন, সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ব্রিটিশ রোড মার্কিং, যা কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভুলে ভরা হ্যারি পটার আলোচনায় যেমন, ভুলভালেও হ্যারি পটারের

ছবিগুলো এগিয়ে আছে বেশ। এই যেমন হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফারস স্টোন ছবিটায় ভুল পাওয়া গেছে মোট ২১৭টি। ভাবা যায়! এই ছবিতে ভোজ-উৎসবে হ্যারিকে দেখা গেল টেবিলের ডান পাশে বসা অবস্থায়। সেই ভোজ চলতে চলতেই হ্যারিকে পাওয়া গেল টেবিলের অপর প্রান্তে, সতীর্থ তরুণীর পাশে।

ওদিকে হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস-এ স্নেইপ যখন ম্যালফয়কে নিয়ে টানা হেঁচড়া করছিলেন, তখন স্ক্রিনের বাম কোণায় একজন ক্যামেরাম্যানকে দেখা যাচ্ছিল, যিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে দৃশ্যটি ক্যামেরায় ধারণে ব্যস্ত। ২০০২ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে এরই মধ্যে ৩৭টি ভুল পাওয়া গেছে। আরও হয়তো পাওয়া যাবে সামনে। হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স-এ আবার আরেক কাণ্ড। ছবির একটি দৃশ্যে হ্যারিকে পাওয়া গেল গভীর ঘুমে মগ্ন অবস্থায়। পরনে বোতামহীন ‘গোল গলা’ গেঞ্জি। কিন্তু তিনি ঘুম থেকে যখন উঠলেন, গেঞ্জিতে দেখা গেল বেশ কয়েকটি বোতাম চেপে বসেছে, গেঞ্জির রংও বদলে গেছে। এই ছবিতে সাকল্যে ভুল মিলেছে ১০০টি। সাদা হলো নীল

এক্স-ম্যান ২ ছবিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন এক্স-ম্যান। ঠিক সেই সময় প্রেসিডেন্টের টেবিলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, কিছু সাদা কাগজ ছড়িয়ে আছে ওপরে বাম কোনার দিকে স্ট্যাপল করা। পরবর্তী দৃশ্যেই আবার দেখা গেল, প্রেসিডেন্টের সামনে সাদা কাগজগুলো আর নেই, নীলরঙা প্রচ্ছদে বাঁধাই করা একটি খাতা ছবির পরিচালকের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে! এটাই একমাত্র নয়, আরও ১৯টি ভুল আছে অ্যাকশনধর্মী ছবিটায়। থ্রি ইডিয়টিক কাণ্ড বহুল আলোচিত থ্রি ইডিয়টস ছবিতে সন্তান জন্মের সময় পিয়া (কারিনা কাপুর) একটি দৃশ্যে ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলেন। দৃশ্যটি ছিল তারও ছয় বছর আগের একটি ঘটনা নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে তখন তো ইউটিউব সাইটটা চালুই হয়নি! আরেকটি দৃশ্যে আমির খান ও মাধবন এয়ারটেলের ইন্টারনেট ডেটা কার্ড ব্যবহার করছেন, শর্মণ জোশী তখন হাসপাতালে। দৃশ্যটি ১০ বছর আগের একটি ফ্ল্যাশব্যাক। প্রশ্ন

হচ্ছে, ১০ বছর আগে এয়ারটেল ওয়্যারলেস ইন্টারনেট কোথেকে বাজারে ছাড়ল? তারপর দেখুন, ছবির শুরুর দিকে অভিনেত্রী মোনা সিংয়ের নাম ছিল পুনম, ছবির মাঝামাঝিতে বিনা নোটিশে তাঁর নাম দাঁড়ায় ‘মোনা’। সবশেষে তাঁকে ডাকা হতে থাকে ‘মোনা পুশ’ নামে। ক্ষতচিহ্নের নড়াচড়া যেকোনো অ্যাকশন দৃশ্যে কৃত্রিমভাবে আহত হওয়া একেবারেই মামুলি ব্যাপার। ছবির শুটিং চলাকালে দৃশ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে পাত্র-পাত্রীর আহত হওয়ার স্থানটি মনে রাখাও আবার খুবই জরুরি। লর্ড অব দ্য রিংস: দ্য রিটার্ন অব দ্য কিং ছবির একটি দৃশ্যে ফ্রোডোর মুখে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যেই লক্ষ করা যায়, সেই ক্ষতচিহ্নের অবস্থান ও আকার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ক্ষতচিহ্ন আকারে বড় তো হয়েছেই, সেটা আবার মুখের ডান দিক থেকে বাম দিকে চলে এসেছে। ধরে নেওয়া যায়, ব্যাপারটা হয় অলৌকিক, নয়তো মেকআপ বিভাগের কারিশমা! সব মিলিয়ে এই ছবিতে খুব বেশি নয়, মাত্র ২২৫টি ভুল আবিষ্কার করা গেছে।

দি ইউজুয়াল সাসপেক্টস ছবিতেও এ রকম একটি কাণ্ড দেখা যায়। পুলিশের গাড়ি হাইজ্যাক করার পর ভিলেন নিজের হাতে সেটার সামনের কাচ ভেঙে চুরমার করে, একেবারে ঠিক কাচের মাঝ বরাবর। তবে ওই অবস্থাতেই গাড়িটি যখন চলতে শুরু করে, তখন ভেতর থেকে দেখা যায় ভাঙচুর নিজে থেকে সরে নিচের দিকে বাম কোণায় চলে এসেছে! গাড়ির মেরামতি কোর্স দুর্ঘটনায় পড়া গাড়ি নিজে থেকেই মেরামত হয়ে যাওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগার অভিনীত ছবি কমান্ডোতে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। ছবির একটি দৃশ্যে আমরা দেখলাম, ভিলেনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় শোয়ার্জেনেগারের গাড়ি ইয়েলো পোর্শের বাম পাশটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু সামান্য পথ যেতে না যেতেই গাড়ির বাম পাশ তো বটেই, পুরো গাড়ি হয়ে গেল ঝকঝকে, নিখুঁত। গাড়িটা আগে কখনো মেরামতি কোর্স সম্পন্ন করেছিল কি না, সে বিষয়ে অবশ্য পরিচালক কিছু জানাননি।

অ্যাকশনধর্মী ছবি কমান্ডোতে মিলেছে মাত্র
৫৬টি ভুল। ফিউশন রহমান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬,
২০১০

486) ভাইভা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার মতো
পাবলিক আমি নই। অতএব, প্রাইভেটই ভরসা।
জিপিএ ভালো হওয়ায় ভাইভা নামক
আনুষ্ঠানিকতার পরই ভর্তি হয়ে যাব। পরীক্ষা
দিতে হবে না। আমি মহা আনন্দে ভাইভা দিতে
এসেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে
চায়। এ জন্য বিভিন্ন স্থানে তাদের ক্যাম্পাস
রয়েছে। ফরম কেনার সময় আমাকে বলা
হয়েছিল, ‘কোন ক্যাম্পাসে ভর্তি হবেন? ধানমন্ডি
নাকি সিদ্ধেশ্বরী?’ আমি বলেছিলাম, ‘দেখুন,
আমরা ১০-১২ জন মিরপুরবাসী আছি। খুঁজলে
আরও কয়েকজন পাওয়া যাবে। মিরপুরে একটা
ক্যাম্পাস করা যায় না?’ ভদ্রলোক বললেন, ‘ফান
করছেন?’

—ফান করব কেন? ফান করার জন্য ফান
ম্যাগাজিন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ফান করার
জায়গা না।

ভেবেছিলাম প্রাইভেট জিনিস, নিয়মকানুন খুব
কড়া। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। ১০টায়
পরীক্ষা, এখন বাজছে ১০টা ৩৩। কয়েকজন
সাধারণ জ্ঞানের বই ভাঁজছে। এক ছেলে
প্রবেশপত্রের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখছে ছবিটা
আসলেই তার নিজের কি না। আমি চুপচাপ
বসে আছি। পাশের মেয়েটি হঠাৎ জিজ্ঞেস
করল, ‘আচ্ছা, আমাকে দেখে কি খুব নার্ভাস
মনে হচ্ছে?’ তাকিয়ে দেখলাম ভাইভা উপলক্ষে
তিনি বিশেষ মেকআপ নিয়েছেন। তাকে দেখতে
অদ্ভুত লাগলেও নার্ভাস মনে হচ্ছে না। আমি
বেশ ভাব নিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই। আপনাকে
দেখে যে কেউ ভাববে একটু পরই আপনার
ফাঁসি! কোন সাবজেঞ্চে পরীক্ষা দেবেন?’ মেয়েটা
আমার কথা শুনেই নার্ভাস হয়ে বলল, ‘ল।’

—ল-এর প্রশ্ন কিন্তু খুব কঠিন হয়। সংবিধান,
বিচার বিভাগ এসব নিয়ে টান দিতে পারে।

—সংবিধান তো পড়িনি।

—প্রধান বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, এঁদের
নাম জানেন?

—না, একজন জেনারেলের নাম জানি, আতাউল

গনি ওসমানী।

—তাহলে তো নার্ভাস না হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।

—আমি কী করব?

—জীবনে যত দোয়া শিখেছেন টানা পড়া শুরু করেন।

এই সময় দরজা ঠেলে এক মহিলা রুমে ঢুকেই মোটা গলায় বললেন, ‘প্রবেশপত্র, মার্কশিটসহ অন্যান্য কাগজপত্র সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক।

আর ভাইভা বোর্ডে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে ভদ্রভাবে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবেন, সালাম দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন, বসতে না বললে বসবেন না।’

বাহ! ভাইভায় কেমন আচরণ করতে হবে তাও বলে দিচ্ছে। আশা করি, এরপর প্রশ্নও বলে দেবে। আমি নড়েচড়ে বসলাম। মহিলা বললেন, ‘আপনাদের ইংরেজিতে উত্তর দিতে হবে।

অবশ্যই ফরমাল ড্রেসে ভেতরে ঢুকবেন।

স্মার্টনেস একটা বড় ব্যাপার। স্মার্টলি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।’ তাঁর কথা শেষ হতেই কয়েকজন শার্ট ইন করা শুরু করল। কাণ্ড দেখে আমি হেসে ফেললাম। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি এই ড্রেসে কেন?’

আমি সাধারণ শার্ট-প্যান্ট পরে আছি। সমস্যাটা বুঝেও না বোঝার ভান করে বললাম,

—এই ড্রেসে সমস্যা কোথায়?

—আপনি শার্ট ইন না করে ভাইভা দিতে এসেছেন? আমাদের ইউনিভার্সিটির রুলস জানেন না?

—এখনো তো ভর্তি হইনি। রুলস জানব কী করে? তা ছাড়া ফরমের সঙ্গে দেওয়া নির্দেশাবলি আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। শার্ট ইন না করে ভাইভা দেওয়া যাবে না—এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

—সব জায়গায় ভাইভা দিতে গেলে ফরমাল ড্রেস পরে যেতে হয়। এই নরমাল রুলসটা জানেন না? বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না।

—আপনিই বললেন স্মার্টলি উত্তর দিতে। এখন বলছেন স্মার্ট হওয়া যাবে না। আমি যাব কই?

—আপাতত ওয়াশরুমে যান। শার্ট ইন করে আসুন।

—ম্যাডাম, ইন করা যাবে না। ভুলে ছোট
ভাইয়ের শার্ট পরে এসেছি। সাইজে ছোট।

—আপনি ইন করে আসুন।

—দেখেন, আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি, ফ্যাশন
শো করতে আসিনি। পরীক্ষার সঙ্গে পোশাকের
কোনো সম্পর্ক থাকার কথা না। আপনি সাদি
সাহেবের গল্পটা জানেন না?

—সাদি সাহেবটা কে?

—শেখ সাদি। বিশিষ্ট দার্শনিক। উনি বলেছেন,
পোশাক বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে যোগ্যতা।
গল্পটা হলো, একদিন সাদি সাহেব...

—স্টপ। ওয়াশরুমে যান।

আমি সুন্দর করে হেসে বললাম, ম্যাডাম, ইন
করব না।

তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে
গেলেন। মহিলার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করায় আমি
বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেলাম। পেছন থেকে এক
ছেলে বলল, ‘শাবাশ। ভালো টাইট দিয়েছ। কিন্তু
যদি তোমার ভাইভা না নেয়?’

—দূর। ভাইভা নেওয়ার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তির
আছেন। তাঁরা পোশাক নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করবেন
না।

—শুক্রবার দেখে পাঞ্জাবি পরে এসেছি।

পাঞ্জাবিও কি ইন করতে হবে? জিজ্ঞেস করলে
কী বলব?

—বলবা, জাতীয় পোশাক পরে এসেছি। জাতীয়
জিনিসের ভাবই আলাদা।

একটু পর ভাইভা বোর্ডে আমার ডাক পড়ল।

আমি সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায় নিলাম।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের দিনের কক্ষে ভাইভা
হবে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মধুমাখা কণ্ঠে

বললাম, ‘স্যার, আসব?’ পরিচিত একটা কণ্ঠ

বলে উঠল, ‘আসুন।’ ভেতরে ঢুকে দেখি আমার
তর্কযুদ্ধের সহযোদ্ধা, সেই মহিলা দিনের পাশের

চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দিন

বললেন, ‘এই সেই ছেলে?’ মহিলা মাথা নেড়ে

সায় দিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললেন।

দিন আমাকে বসতে বললেন। এরপর শুরু

হলো পোশাকসংক্রান্ত প্রশ্ন। মনে হলো আমি

ফ্যাশন ডিজাইনিং সাবজেক্টে ভর্তি হচ্ছি।

সার্টিফিকেট, মার্কশিট কোনো কাজেই এল না।

আমি ভাইভায় বাদ পড়ে গেলাম। বের হয়ে

মনে মনে বললাম, শেখ সাদি সাহেব, দেখে

যান। যোগ্যতা কোনো ব্যাপারই না, পোশাকই আসল জিনিস। আদনান মুকিত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০১০

487) কী দেখলেন স্যার - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিদেশে কী দেখে এলেন স্যার? কত কী। না দেখলে তোমার বিশ্বাসই হবে না যে স্বদেশ কোনো দিন বিদেশ হবে। এই চওড়া চওড়া রাস্তা। মসৃণ, তকতকে, ঝকঝকে। তার ওপর দিয়ে আশি, নব্বই, এক শ কিলোমিটার বেগে রংবেরঙের গাড়ি ছুটছে। রাস্তা এত মসৃণ যে তুমি গাড়ির আসনে বসে, স্বদেশে ফেলে রেখে যাওয়া, টেপী কিংবা বুঁটীকে প্রেম-পত্র লিখতে পারো। গাড়ি লাফাবে না, ঝাঁপাবে না, ডাইনে বামে কাত মারবে না। যেন আঠার মতো রাস্তার সঙ্গে লেগে আছে।

গর্ত নেই স্যার? ছোট, বড়, মাঝারি মাপের গাড়াসমূহ?

না, গাড়াসমূহ নেই।

কেন নেই স্যার?

যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো কেন নেই! ও বিষয়ে কোনো সিটি মেয়রের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়নি।

সুন্দরী রমণীর গালে টোল নেই, মাইলের পর মাইল রাস্তার গর্ত নেই, এ তো পরিকল্পনার এক ধরনের ত্রুটি। মানুষ কত বিশ্রীভাবে সৎ হলে তবেই না অমন কাণ্ড হয়। জঞ্জাল আছে স্যার? দুই হাত অন্তর অন্তর আবর্জনার স্তুপ?

পাগল হয়েছে? রাস্তার ধারে আবর্জনা! এ কি তোমার স্বদেশ, এর নাম বিদেশ।

কী দুঃখের দেশ স্যার! মানুষ ভালোভাবে খেতে পায় না। পেলো রাস্তার ধারে, মাঠেঘাটে সর্বত্র জঞ্জাল পড়ে থাকত।

তোমার মুণ্ড। ও দেশের মানুষ দিন-রাতে চার থেকে পাঁচবার খায়। ঘুরছে ফিরছে কুপ কুপ খাচ্ছে। ফুট জুস, হটডগস, হ্যামবার্গার, চিকেন লেগস, পেটিস, প্যাসট্রিজ, ব্রেড, বাটার, ওমলেট, রোলস। সে খাওয়া যে কী খাওয়া, তুমি ইমাজিন করতে পারবে না।

হৃদয়হীনের দেশ স্যার। এত বড় স্বার্থপর, অন্যের কথা ভেবে আঁস্টাকুড় তৈরি করে না, আর পাঁচজন কী খাবে একবারও ভাবে না।

তার মানে?

স্যার যারা আবর্জনা খুঁটে খাবার সংগ্রহ করে,
তাদের কী হবে! এর নাম খ্রিস্টান!

তুমি একটি অজমূর্খ। ও দেশে কাউকে জঞ্জাল
খুঁটে খাবার বের করতে হয় না। সবাই
মোটামুটি বড় লোক।

কী বিশ্রী দেশ স্যার! যে দেশে অভাব নেই, সে
দেশের আর রইল কী! সবাই এক বউ নিয়ে ঘর
করছে।

তার মানে?

মানুষের তো দুই বউ স্যার। স্বভাব আর অভাব।
ওদের অভাব নেই, স্বভাবটাই কেবল আছে।

অমন দেশে যান কেন? রেশনের দোকান আছে?
রেপসিড তেল ঠিকমতো পাওয়া যায়?

তোমার অসীম অজ্ঞতায় আমার রাগে শরীর
জ্বলছে।

রেশনে কী চাল দেয় স্যার? ভাঙা আতপ না
বোগড়া সেদ্ধ!

গর্দভ! ও দেশে রেশন নেই।

সে কী, পুরোটাই কালোবাজার! একটাই মাত্র
মার্কেট। হোয়াইটের দেশে ব্ল্যাক মার্কেট!

ভবিষ্যতে ও দেশে আর যাবেন না, চরিত্র
বিগড়ে যাবে।

এ অর্বাচীনের সঙ্গে কথা বলে কী হবে। নেহাত
ওই বিপ্লবের দিনে শিখেছিলুম—দেশের কুকুর
ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। তা না হলে
তোমাকে আমি ঘাড় ধরে দূর করে দিতুম।

রাগ করছেন কেন স্যার? আমরা তো কোনো
দিন বিদেশে যেতে পারব না, তাই তো জানার
বাসনা। ওখানে সকালে দুধের ডিপোর সামনে
লাঠালাঠি হয় স্যার! ট্যাঁফোঁ, ভোঁ।

ন, ও দেশের মানুষের অত সময় নেই। সাত
সকালে উঠেই ট্যালাপিয়া মাছের মতো বাজারে,
ডিপোর সামনে ইজিরবিজির করবে, সে দেশ এ
দেশ নয়। দরজায়, দরজায় ভোরবেলা দুধের
বোতল, সংবাদপত্র, ফুল এসব রেখে যায়। ঘুম
থেকে উঠে ও দেশের বউমারা টুক করে দরজা
খুলে পুটপুট করে সব ভেতরে টেনে নেয়।

কে রেখে যায় স্যার? বউমার পূর্বপ্রেমিক?

প্রেমিক আসছে কোথা থেকে গবেট! অপ-

উপন্যাস পড়ে পড়ে মগজ ধোলাই হয়ে গেছে।

ওই যে ফুলের কথা বললেন স্যার। ফুল, বোতল
আর সংবাদপত্র।

ওহে ইডিয়েট! ওরা ওমর খৈয়ামের নীতিতে বিশ্বাসী। রোজগারের সবটাই ওরা পেটায় নমঃ করে না, ফুলের জন্য কিছু রাখে। ফুল আর ফল, যেমন আমাদের কান আর মাথা।

ফল? কোন ফলের কথা বলছেন স্যার, কর্মফল? আঙুর না, গীতার ফল নয়, গাছের ফল।

কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙুর, আখরোট, খেজুর ও কাজু। খাবার টেবিলে থরে থরে সাজানো। ফুলদানিতে ফুল। ছবিটবি দ্যাখোনি কোনো দিন। ওল্ড মাস্টারসদের আঁকা স্টিল-লাইফ জীবনে দ্যাখোনি।

ছি! ছি! কী দুর্নীতিপরায়ণ ওরা।

কেন?

ঘুষের পয়সা ছাড়া এসব হচ্ছে কী করে? এ দেশে দুই বেলা দুই মুঠো জোটাতেই আমাদের আধ হাত জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ফুল, ফল! শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

আরে, না রে বাবা, ওদের রোজগারও তেমনি। তার মানে ওয়াগন ভাঙে, স্মাগল করে, ব্যাংক ডাকাতি করে।

তোমার মাথা। ওখানে বড় বড় কলকারখানা, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য। টাকার বন্যা বইছে। স্যার, ধর্মঘট নেই? মিছিল নেই? রোজ বিকেলে, চলবে না চলবে না?

না, ওসব চোখে পড়েনি।

বাজে জায়গা।

ঠিক বলেছ, থার্ড ক্লাস জায়গা। যেখানে-সেখানে, যত্রতত্র, যা তা করা যায় না। ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব। এখানে দ্যাখো, দেয়াল দেখলেই তুমিও পা তুলছ, কুকুরও পা তুলছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়: বিখ্যাত রম্যলেখক। তিনি ১৯৮১ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। বেশ আছি রসে বসে, একে একে, দুটি চেয়ার, রাখিস মা রসে বসে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

488) একটি অন্য রকম কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ

জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ এবার মুখোমুখি হয়েছেন রস+আলোর প্রশ্নের। বাংলা সাহিত্যের এই গ্র্যান্ডমাস্টার রস+আলোর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন বইয়ের নামের মাধ্যমে। প্রতিভা! কাল্পনিক এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন হুমায়ূন আহমেদের বিশিষ্ট ভক্ত আদনান

মুকিতআপনার কাছে ‘সাক্ষাৎকার’ শব্দটার মানে
কী?

☆ বিপদ।

পরীক্ষায় সব সময় যা পেয়েছেন—

☆ শূন্য।

প্রচণ্ড রোদে আজকাল যা খুঁজে পান না—

☆ শ্যামল ছায়া।

আজ আপনার একদিন কি...

☆ অনিল বাগচীর একদিন।

হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং, ১, ২, ৩...

হ্যালো...

☆ মিসির আলি, আপনি কোথায়?

ঘুম থেকে উঠে প্রকৃতির তীব্র ডাকে সাড়া দিতে

গিয়ে দেখলেন, কেউ একজন টয়লেট দখল

করে বসে আছে। কী করবেন?

☆ অপেক্ষা।

ঘরে ভূত এলে কোথায় গিয়ে লুকান?

☆ দরজার ওপাশে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডাকপিয়ন সম্পর্কে

কী বলবেন?

☆ সে আসে ধীরে।

কোথায় থাকতে সবচেয়ে ভালো লাগে?

☆ তোমাদের এই নগরে।

ছোটবেলায় কী হতে চেয়েছিলেন?

☆ কবি।

হলজীবনে ডাইনিংয়ে তরকারির সঙ্গে বোনাস

হিসেবে কী পেতেন?

☆ পোকা।

রাস্তার জ্যামে আটকে থাকলে কী হতে ইচ্ছা

করে?

☆ উড়ালপঙ্খী।

দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বেশ লম্বা। আর লম্বা

মানুষের বুদ্ধি থাকে হাঁটুতে। আচ্ছা, বলুন তো,

হাঁটুর ইংরেজি কী?

☆ নি।

আপনি কী দিয়ে লেখেন?

☆ বল পয়েন্ট।

স্ত্রী শপিংয়ে যেতে চাইলে প্রায়ই বলেন—

☆ আজ আমি কোথাও যাব না।

আপনার চোখে এটা কী?

☆ মিসির আলীর চশমা।

ছোটবেলায় চুরি করে আচার খাওয়ার সময়

ভাবতেন—

☆ কোথাও কেউ নেই।

এ দেশের জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর
হাতের—

☆ পুতুল।

বিড়াল এবং স্বামী-স্ত্রীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত
কোনটি?

☆ বাসর।

লোডশেডিংয়ের সময় শুনতে ইচ্ছা করে—

☆ অন্ধকারের গান।

ঠিক এই মুহূর্তে একেবারেই সহ্য করতে
পারছেন না কাকে?

☆ তোমাকে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন তো শেষ হয়নি, বাকি
প্রশ্নগুলো কবে করব?

☆ অন্যদিন।

পাঠকদের উদ্দেশে কী বলবেন?

☆ তোমাদের জন্য ভালোবাসা। **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৬, ২০১০

489) চরমপত্র - এম আর আখতার মুকুল

মেজিক কারবার। ঢাকায় এখন মেজিক কারবার
চলতাছে। চাইরো মুড়ার খনে গাবুর বাড়ি আর
কেচ্কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের
মছুয়া সোলজারগুলো তেজগাঁ-কুর্মিটোলায়
আইস্যা—আ-আ-আ দম ফালাইতাছে। আর
সমানে হিসাবপত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা
কেডা? ও-অ-অ টাঙ্গাইল থাইক্যা আইছো বুঝি?
কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন।

কেতাবের মাইদে তো দেখতাছি লেখা রইছে
টাঙ্গাইলে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যস,
ব্যস, আর কইতে হইব না—বুইজ্যা ফালাইছি।
কাদেরিয়া বাহিনী বুঝি বাকিগুলার হেই কারবার
কইর্যা ফালাইছে। এইডা কী? তোমরা মাত্র ১১০
জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছলা?
খাড়াও খাড়াও—এই যে পাইছি। ভৈরব—১২৫০
জন। তা হইলে ১১৪০ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট
ডট ডট রাজিউন হইয়া গেছে। হউক, কোনো
খেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই
এইগুলারে বঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিল। রংপুর-
দিনাজপুর, বগড়া-পাবনা মানে কি না বড়
গাংয়ের উত্তর মুড়ার মছুয়া মহারাজগো কোনো
খবর নাইক্যা। হেই সব এলাকায় এক শতে
এক শর কারবার হইছে। আজরাইল ফেরেশতা

খালি কোম্পানির হিসাবে নাম লিখা থুইছে।
আরে, এইগুলো কারা? যশুরা কই মাছের মতো
চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা? ও-অ-তোমরা বুঝি
যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট
হওনের গতিকে এই রকম লেড়-লেড়া হইয়া
গেছো।

আহ্ হাঃ! তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর
লাইগ্যা? কী কইল্যা? তুমি বুঝি মীরকাদিমের
মাল? ও-অ-অ-অ বাকি হগ্নলগুলারে বুঝি
বিছুরা মেরামত করছে? গাংয়ের পাড়ে আলাদা
না পাইয়া, আরামসে বুঝি চুবানি মারছে।
কেইসডা কী? আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু
মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু!
কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস না! কইছিলাম না,
বঙ্গাল মুলুকের কোদো আর প্যাঁকের মাইদে
মছুয়াগো ‘মউত তেরা পুকর তা হয়।’
নাঃ—তখন কী চোম্পাট! হ্যান করেংগা, ত্যান
করেংগা। আর অহন? অহন তো মওলবি সাবরা
কপিকলের মাইদে পড়ছে। সামনে বিছু, পিছনে
বিছু, ডাইনে বিছু, বাঁয়ে বিছু। অহন খালি
মছুয়ারা চিল্লাইতাছে, ‘ইডা হামি কী করছুনুরে!
হামি ক্যা নানির বাড়িত আছিঁনু রে! হামি ইয়া
কী করনু রে!’

আংকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইল, ভাইসাব
আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে।
ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলো কী
খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা
অ্যাঙ্গেল কইরা তেরছি নজর মারতে দেহি কি,
শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ—মানে
কি না দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে।
ব্রিগেডিয়া বশীর জিগাইলো, ‘তুম লোগেকা
কাপড়া কিধার গিয়া?’ জবাব আইলো—যশোরে
সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জি, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর
আরিচায় আভারওয়ার থুইয়া বাকি রাস্তা খালি
চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি, ‘হায়, ইয়াহিয়া, ইয়ে
তুমনে কেয়া কিয়া?—হামলোগ তো আভি নাংগা
মছুয়া বন গিয়া।’

আংকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইলো।
ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল
রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাৰ্ভাইতে
শুরু করছে। ‘পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা
মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানি মরেছে—
গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।’ ব্যস,

মওলবি রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের
সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে খবর
পাডাইল, ‘হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো
লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বত থাইক্যা থাকে, তা
হইলে তুরন্দ আমাগো কইয়া দাও; কীভাবে বিচ্ছু
আর হিন্দুস্তানি ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে
আমার লেডুলেড়া আর ধ্বজভঙ্গ মার্কি বাকি
সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইব।’
এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল
পিঁয়াজি আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী
রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের
কাছে টেলিগ্রাম করাল, ‘ভাই উথান্ট,
ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই
রকম কারবার করছে। হের টেলিগ্রামটা চাপিশ
কইর্যা ফালাও।’ এইদিকে আমি ছ্যার শাহ
নেওয়াজ ভুট্টোর ‘ডাউটফুল’ পোলা, পোংটা
সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা
কওনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করনের লাইগ্যা
জাতিসংঘে পাডাইতাছি। পোলডারে একটুক
নজরে রাখা। বেডার আবার সাদা চামড়ার
কসবিগো লগে এথি-ওথি কারবার করনের খুবই
খায়েশ রইছে।
সাবে কইছে, কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা
নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন
মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ
লওনের টাইম হয় নাইক্যা—ব্র্যাকেট শেষ।
জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে বেশ
কায়দা কইর্যা লুকোচুরি খেলতে শুরু করল।
তারপর। জাতিসংঘের ডায়াসে আতকা কয়েক
দফায় কান ধইর্যা ‘উঠ-বস’, ‘উঠ-বস’ কইর্যা
ভুট্টো সাবে ছিল্লাইয়া কইল, ‘আর লাইফের এই
রকম কাম করুম না। বঙ্গাল মুলুকে আমরা
গেনজাম কইর্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ
চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা
খাইতাছি। আমাগো এইবারের মতো খেমা
কইর্যা দেন।’
কিন্তু ভুট্টো সাব। বহুত লেইট কইর্যা
ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ কাথাবার্তায় আর
কাম হইব না। আতকা ঠাস ঠাস কইর্যা
আওয়াজ হইল। কী হইল? কী হইল?
জাতিসংঘে ভেটো মাইর্যা সোবিয়েত রাশিয়া
হগ্লল মিচ্কি শয়তানরে চিত কইর্যা ফালাইছে।
কইছে, ফাইজলামির আর জায়গা পাও না?

বাঙালি পোলাপান বিচ্ছুরা যহন লাড়াইতে ধনা-
ধন জিতাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধু করনের
নানা কিসিমের ট্রিকস হইতাছে—না?

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের
পরান জানের জান চাচা নিক্সন, কড়া কিসিমের
ট্রিক্স করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহররে
সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে ক্রেমলিন থাইক্যা
হোয়াইট হাউসরে অ্যাডভাইসিং করছে—একটুক
হিসাব কইর্যা কাজ কারবার কইরেন।

প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি কইছে, ভারত
উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই
ভালো হয়। ব্যা-স-স, আমেরিকার সপ্তম
নৌবহর সিঙ্গাপুরে আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া
রইল।

আঁ, আঁঃ! এই দিককার কারবার হনছেননি?
হারাধনের একটা ছেলে কান্দে ভেউ ভেউ,
হেইডা গেল গাধার মাইদে রইল না আর কেউ।
জেনারেল পিয়াজি সাবে সরাবন তহুরা দিয়া
গোসল কইর্যা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল
হোটেলের মাইদে হান্দাইয়া এখনো চ্যাঁ চ্যাঁ
করতাছে, ‘আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কী
হইব, আমি পাইট করুম—আমি পাইট করুম।’
আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া
উঠল। এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল
পিয়াজি সাবের ফুল প্যাণ্টের দুই রকম রং
দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে থাকি
রং, পেছনের মুড়া বাসন্তী রং—কেইসডা কী?
অনেক দেমাক লাগাইলে এর মাজমাডা বোঝান
যায়।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। মেজিক কারবার।
ঢাকায় অহন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো
মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্কা মাইর
খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া
সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আঁ-
আঁ-আঁ, দম ফাইলাইতাছে। এম আর আখতার
মুকুল: সাংবাদিক ও লেখক। মুক্তিযুদ্ধ
চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত
সাড়া জাগানো ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের পরিচালক,
লেখক ও কথক ছিলেন।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৩,
২০১০

490) ধর্মঘট - ইলিয়া বুতমান

ভালেন্তিন আলেক্সান্দ্রভিচ পুজিকভের ঘুম ভাঙল। হাই তুললেন তিনি। অনুভব করলেন প্রচণ্ড হ্যাংওভার এবং বুঝে গেলেন, আজ তাঁর কাজে যাওয়া হবে না।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে পুজিকভ ডায়াল করলেন তাঁর বসকে। বললেন, ‘ইয়ে...মানে...পুজিকভ বলছি।

আমি...কী যেন বলে...আজ কাজে আসব না।’

‘বেশ,’ খুশি মনে বললেন বস। ‘তোমাকে ছাঁটাই করে দেব চাকরি থেকে।

‘না, না,’ ভীত হয়ে পড়লেন পুজিকভ। ‘আমাকে ছাঁটাই করা উচিত হবে না।’

‘অবশ্যই হবে!’

‘শুনুন, আমার...কী যেন বলে...যথাসংগত কারণ আছে।’

‘মেডিকেল সার্টিফিকেট নাকি?’

‘না, ঠিক তা নয়,’ ধাতস্থ হয়ে পুজিকভ বললেন, ‘আমি কাজে যাচ্ছি না রাজনৈতিক কারণে।’

‘রাজনৈতিক কারণ মানে?’

‘আমি জোরগলায় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করছি।’

‘কোন প্রেসিডেন্টের?’

‘আমেরিকার।’

‘বাসায় বসে থাকো। আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করে তোমাকে ফোন করছি।’

দশ মিনিট পরে তিনি ফোন করলেন পুজিকভকে।

বললেন, ‘শাবাশ! চালিয়ে যাও! তোমার রাজনৈতিক ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছেন ডিরেক্টর সাহেব।’ পুজিকভের ধর্মঘটের খবর পরদিন ছাপা হলো পত্রপত্রিকায়, প্রচার করা হলো রেডিও-টেলিভিশনে।

ধর্মঘটকারী পুজিকভের সমর্থনে দেশজুড়ে অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ শুরু হলো। প্রথম কয়েক দিনেই তিনি পেলেন আট শ তিরিশ হাজার রুবল এবং বারো হাজার টন

খাদ্যদ্রব্য। আমেরিকার প্রশাসনমহলও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল এ ব্যাপারে। পার্লামেন্টের অনির্ধারিত জরুরি অধিবেশনে অবিলম্বে পুজিকভের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পুজিকভের দাবির বিকল্প হিসেবে রাশিয়াকে অনতিবিলম্বে আলাস্কা ফেরত

দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো তাঁকে। প্রস্তাবটি যথেষ্ট মনে না হওয়ায় সঙ্গে এক বোতল ভোদকাও দাবি করে বসলেন তিনি। আমেরিকার পার্লামেন্টের পরবর্তী জরুরি অধিবেশনে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে গেল। সারা পৃথিবী রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করতে লাগল ঘটনার বিকাশ। আমেরিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাও ছিল না, তারা পর্যন্ত এই সময় জানল আমেরিকার নাম। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পুজিকভকে আমেরিকার বাজেট থেকে নিঃশর্তে এক বোতল হুইস্কি কিনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাস হয়ে গেল। পরদিন প্রায় এক কেজি খাদ্য সহযোগে বোতলটির পানীয় গলাধঃকরণ করে পুজিকভ অনুভব করলেন, কাজে যাওয়ার অবস্থা তাঁর নেই। বহু কষ্টে টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনি ডায়াল করলেন বসকে। বললেন, ‘ইয়ে... মানে... পুজিকভ বলছি। আমি... কী যেন বলে... ইয়ে... মানে... আজ কাজে আসব না।’

‘কেন?’

‘জাপানের প্রেসিডেন্টকে আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।’

491) তার-তাহার-বেতার - আশীষ-উর-রহমান

একবার তাকে আদর-যত্নে তোলা হয়েছিল মাথার ওপরে। এখন টেনেহিঁচড়ে নামানো হচ্ছে পদতলে। কেউ যেন অযথাই তাৎপর্যপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টায় শীতের দিনে মাথা গরম করতে যাবেন না। এই বস্তুটির নাম ‘তার’। ঢাকা শহরের পথে যেমন দুই চাকা থেকে ১০ চাকাওয়ালা হরেক কিসিমের বেগুয়ার যানবাহনের নিরন্তর জটলা, তেমনি পথের ওপরে জটলা তারের। টানা, কুণ্ডলী পাকানো, গুচ্ছ গুচ্ছ তার। এর সঙ্গে দোসর লক্ষ্মণের মতো আছে নানা মাপের চোঙ, বাক্স প্রভৃতির সাহচর্য। তারের প্রবাহ সটান চলে গেছে টেলিগ্রাফ বা বিদ্যুতের খুঁটি বাহিত হয়ে পথের দুই পাশ দিয়ে।

কোথাও কোথাও এদের আঁটি বেঁধে পথের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পার করা হয়েছে। তাতে দিব্যি তৈরি হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ ঝুলন্ত সেতু। কী অসাধারণ উদ্ভাবনা! সেই সেতুর ওপর বসে

বসে দোল খায় কাক-শালিকের ঝাঁক। তাদের
পায়ের তলা দিয়ে অকল্পনীয় গতিতে প্রবাহিত
হতে থাকে বিচিত্র তথ্য, চিত্র, গুপ্তসংবাদ ও
প্রেম-ভালোবাসার আবেগ-আকুতিভরা বার্তা।
এই তারগুলো মূলত অন্তর্জাল মানে ইন্টারনেট
সংযোগের।

সরকার সম্প্রতি নয়ন মেলে দেখেছে, মসিবর্ণ
তারের জঞ্জাল যত্রতত্র জটিল বাঁধন বেঁধেছে।
জারি হয়েছে সেই বন্ধন থেকে উর্ধ্বলোককে
অবমুক্ত করার ফরমান। কাজ চলছে।

আকাশচারী তার এখন পাতালগামী। মাটিচাপা
দেওয়ার আগে আপাতত এদের কাটা গুচ্ছ
লুটিয়ে আছে পথে পথে। দুর্বলের ওপর
অত্যাচার সমাজের কালজয়ী ঐতিহ্য। লিকলিকে
তারগুলো মাটিচাপা দেওয়া হলেও স্বাস্থ্যবান
বিদ্যুৎ বাহকেরা ভূ-উপরিস্থই থাকবে
বহালতবিস্তারে। রোদে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে,
দোল খাবে দুনিয়ার আলো-হাওয়ায়।

কায়দামতো পেলে বেকায়দায় ফেলবে ধারক-
বাহকদের। বিদ্যুতায়িত করে প্রাণ কেড়ে
নিতেও কসুর করবে না। তারকে একেবারে
তাড়িয়ে দেওয়া সহজ কন্ম নয়।

তারের তাৎপর্য সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন
আমাদের ঘরের ছেলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।
তারের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির নিদান হিসেবে
তিনি উদ্ভাবন করলেন বেতারযন্ত্র। বাঙালির মন্দ
কপাল। ফেরারির পিছে লেগে থাকা গুপ্তচরের
মতো বাঙালির পিছে লেগে আছে ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা
ও দুরভিসন্ধির অলাতচক্র। আচার্য বঞ্চিত হলেন
তাঁর কীর্তির স্বীকৃতি থেকে। আলোকচিত্র
সাংবাদিকেরা রাজপথে মিছিলের ছবি তোলার
সময় নেতাখ্যাতির প্রার্থীরা যেমন কনুই ব্যবহার
করে কর্মীদের হটিয়ে সম্মুখে উদ্ভাসিত হওয়ার
প্রয়াস পান, তেমনি বাঙালি আচার্যকে কনুই
মেরে সাহেব মার্কনি এসে বাগিয়ে নিলেন
খ্যাতির মুকুট। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
বাঙালি আচার্যকে বঞ্চিত করার প্রায়শ্চিত্ত
করতেই কি না কে জানে, বেতারযন্ত্র পেলেও
যান্ত্রিক সভ্যতা তারের নাগপাশ থেকে মুক্তি
পেল না!

বস্তুত তার কখনো তারকাটা হয়ে বিদ্বদ করছে,
কখনো সংযোগের সূত্রধর হয়ে অক্টোপাসের
(পলের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক) মতো

জড়িয়ে ধরছে আষ্টেপৃষ্ঠে। আমাদের চেয়ে বরং সাহেব-সুবোদেরই এ নিয়ে মুসিবত ঢের বেশি। তারকে তাঁরা চুলের চেয়েও সরু, ক্ষুরের চেয়েও শাণিত করে ফেলেছেন। তদুপরি ‘বিদায়’ বলতে পারছেন না তাকে। কখনো সেটি তুলছেন খুঁটির মাথায়, কখনো নামাচ্ছেন মাটিতে; এমনকি সাগরতলে তার মহাশয়ের সলিলসমাধি রচনা করেও নিশ্চিত হতে পারছেন কোথায়? কেন জানি মনে হচ্ছে, এ হলো তাঁদের বাঙালিকে বঞ্চনা করার অভিশাপ। সেই বঞ্চনার খেদে বাঙালিরা তো উদ্ভাবনের পথ মাড়ানোই বন্ধ করে দিল! তা না হলে কবেই তারকে পুরোপুরি তাড়িয়ে দেওয়ার কায়দা ঠিক ঠিক বের করে ফেলত বঙ্গসন্তানেরা!

সে যা-ই হোক, এই তার ‘তাহার’ নয়। তবু পথের ধুলায় এমন হেলায় ছড়ানো, খুঁটি থেকে ঝুলন্ত বেওয়ারিশ তার দেখে সেই তাহার কথাই মনে পড়ছে। সুরঞ্জনাকে যার সঙ্গে কথা না বলতে অনুরোধ করে জীবনানন্দের সন্দেহপ্রবণ জিজ্ঞাসা ছিল—‘কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!’ সুরঞ্জনারা কি কারও কথা শোনে? একবার চলে গেলে ফিরে আর আসে কি তারা নক্ষত্রের রূপালি আগুনভরা রাতে?

বেতার তো ঢের আগেই পাওয়া গিয়েছিল। হাতে হাতে তারবিহীন টেলিফোনও উঠে এল। কতই না সুবিধে হলো তাতে। ডায়াল ঘোরাতে হচ্ছে না, ট্রাংকল বুক করে তীর্থের কাকের মতো হন্যে দিয়ে থাকতে হচ্ছে না, আরও কত কী! তা সত্ত্বেও তারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কোনো তারতম্য ঘটেনি; তাকে আমরা মাথার ওপরে কিংবা পায়ের নিচে যেখানেই রাখি না কেন। তার শুধু বাহকই নয়, সংযোজকও। তবে তারের সংযোগ কেটে যায় কখনো কখনো। আবার সেই কাটা তার জোড়া দিয়ে, জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নিয়েই চলছে জগৎসংসার। কিন্তু হায়! সুরঞ্জনাদের সঙ্গে সম্পর্কের তার কেটে গেলে সেই তার আর ‘লাগে না, লাগে না জোড়া...’। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২০, ২০১০

492) উইকিলিক্সের জুলিয়ান

অ্যাসাঞ্জ যদি বাংলাদেশে ধরা পড়তেন
বিভিন্ন দেশের সরকারের বিরতকর তথ্য ফাঁসের জন্য আলোচিত ওয়েবসাইট উইকিলিক্স

সম্প্রতি আড়াই লাখেরও বেশি মার্কিন গোপন কেবুবর্তা প্রকাশ করে। এই ঘটনার পর যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন সুইডেনের একটি আদালত। ব্রিটেনে আত্মগোপনে থাকা অ্যাসাঞ্জ এই অভিযোগকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ অভিহিত করে কয়েক দিন আগে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে ধরা দেন। এরপর ১৬ ডিসেম্বর জামিনে মুক্তিও পেয়েছেন তিনি। এখন পর্যন্ত ঘটনা এই। তবে এমন ঘটনা যদি বাংলাদেশে ঘটত, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ যদি বাংলাদেশে আত্মগোপন করতেন, তাহলে কী কী ঘটত তারই খানিকটা বিবরণ দিয়েছেন—

ফিউশন রহমান ইন্টারপোলের পরোয়ানা ইন্টারপোলের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, সুইডেনের আদালতে অভিযুক্ত জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ নামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। জরুরি বার্তা, পিডিবি’র মামলা

ঢাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের পরমাণু শাখার অফিস সহকারীর পাঠানো জরুরি তারবার্তা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তোলপাড়। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক আহ্বান। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে অবিলম্বে গোপনীয় কেবু চুরি ও পাচারের অভিযোগে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের নির্দেশ। রাতভর তল্লাশি, মনিটর জব্দ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চুরি যাওয়া কেবলের খোঁজে নারিন্দা ও বাডা এলাকায় রাতভর তল্লাশি। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে—এ সন্দেহে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ১৩টি কম্পিউটারের কালার মনিটর জব্দ। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ সন্দেহে ছয় পথচারী ও তিন মহিলা আটক। অ্যামনেস্টি’র অভিযোগ

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে জানায়, ১১ দিন আগে র্যাব মাদারীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে জুলিয়ানকে ধরে নিয়ে গেলেও তাঁর হৃদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে র্যাব জানায়, অ্যামনেস্টি’র অভিযোগ ঠিক নয়। তারা জুলিয়ান নামের কাউকে আটক করেনি। ইয়াবা-সম্রাজ্ঞীর

মুখোমুখি

অবশেষে গ্রেপ্তারের ২২ দিন পর জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে ২০০৩ সালের টেকনাফ থানার ইয়াবা চোরাচালান মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। কমপক্ষে চার মাসের রিমান্ড চেয়ে সিআইডি'র আবেদন। যুক্তিতর্ক শেষে দুই মাসের রিমান্ড মঞ্জুর। 'ইয়াবা-সম্রাজ্ঞী' হিসেবে পরিচিত পাখি বেগম (৪৩) ও জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে মুখোমুখি করে টিএফআই সেলে গোয়েন্দাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায়, প্রথম দফা রিমান্ডের জিজ্ঞাসাবাদে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার এবং ১৯৭৬ সালের আলোচিত ককটেল হামলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে কেবল চোরাচালান সম্পর্কে তিনি এখনো মুখ খোলেননি। পুলিশ জানায়, সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে 'বাংলার মণি' জাহাজ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সম্পৃক্ততা আছে কি না সেটাও তারা গভীরভাবে খতিয়ে দেখছে। বিরোধীদলীয় উপনেতার অভিযোগ

অ্যাসাঞ্জের গ্রেপ্তারের তীব্র বিরোধিতা করে বিরোধীদলীয় উপনেতার অভিযোগ—জনগণ সরকারের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সরকার জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর দমনপীড়ন চালাচ্ছে। তিনি বলেন, বিরোধী দল এই ইস্যুতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকার চিন্তাভাবনা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত 'গ্রীষ্মকালীন সবজি ঢ্যাঁড়সের পুষ্টিগুণ' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যেই বিরোধী দল জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দমনপীড়নে কোনো ধরনের শৈথিল্য সহ্য করা হবে না। প্যারামেডিকেল সংঘর্ষ

অ্যাসাঞ্জ বিএনপি'র, নাকি আওয়ামী লীগের— চায়ের দোকানে সৃষ্ট এই বিতর্কের জের ধরে খুলনা প্যারামেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-

শিবির সংঘর্ষ। এ ঘটনায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং পুলিশের লাঠিপেটায় কমপক্ষে ১৫ জন আহত। পুলিশি অভিযানে ছয়টি রামদা উদ্ধার। ক্রসফায়ার অবশেষে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো র্যাবের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে, ভাসানটেক বস্তিতে মার্কিন গোপনীয় কেবেলর কয়েকটি চালান বিদেশে পাচারের অপেক্ষায় রয়েছে। এ খবর পেয়ে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে সঙ্গে নিয়ে র্যাবের একটি দল আট ভাগে বিভক্ত হয়ে বস্তিতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করে। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে জুলিয়ানের সহযোগীরা র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আত্মরক্ষার্থে র্যাবও পাল্টা গুলি ছোড়ে। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থল থেকে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। আহত অ্যাসাঞ্জকে দ্রুত ঢাকা মেডিকলে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় বিশ্বপ্রতিক্রিয়া ক্রসফায়ারের ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভ। সুইডেনের বিস্ময়। ব্রিটিশ সরকারের ভৎসনা। আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জাতিসংঘের। এদিকে ক্রসফায়ারের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন দূত বলেন, মানবাধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ।

দিনব্যাপী কর্মশালা

মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে পুলিশ ও র্যাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে ‘বৈদ্যুতিক কেবুল এবং মার্কিন কেবেলর মধ্যে পার্থক্য’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২০, ২০১০

493) মিমির খালা - বিশ্বজিৎ চৌধুরী

তরুণী সোজা এসে আমার গাড়ির জানালায় মুখ নামিয়ে বললেন, ‘এটা বাবলুদের গাড়ি না?’ বললাম, ‘হ্যাঁ’।

‘আমি মিমির খালা, আমাকে মোমিন রোডে ব্র্যাক ব্যাংকের সামনে একটু নামিয়ে দিন তো।’ আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই উঠে বসলেন গাড়িতে। শীতাতপযন্ত্র চালু ছিল, পারফিউমের একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল গাড়িটা। বুঝলাম মিমি নামের একজন সহপাঠিনী আছে আমার ক্লাস ফাইভ পড়ুয়া ভাইপোর। কিন্তু মিমির খালা

আমাকে কী ভেবেছেন?

সকালে শেভ করব কি, নাশতা করার সময়ও পাইনি। সকালের দিককার চিনিঘুমটা খুব তারিয়ে উপভোগ করছিলাম। কিন্তু বাংলা সিনেমার নায়িকা সচরাচর যেমন বলে, ‘এত সুখ কী আমার কপালে সহিবে?’—আমার বেলায়ও তা-ই ঘটল, সুখনিদ্রায় পানি ঢেলে দিয়ে রুণু ভাবি বললেন, ‘শিহাব ভাই, ড্রাইভার তো আসেনি...।’

চোখ না খুলেই বললাম, ‘বাবলু আজ স্কুলে না যাক, এক দিন না গেলে অশিক্ষিত হয়ে যাবে না।’

‘কিন্তু আজ যে ওর পরীক্ষা, না হলে কি এই সকালে তোমাকে কষ্ট দিতাম, শিহাব ভাই।’ আমার এই ভাবটা যেমন ন্যাকা, তেমনি কর্মোদ্ধার-পটিয়সী। ঘুমের বারোটা বাজল। পরনে ছিল টিলেঢালা একটা পাজামা আর দুমড়ানো-মুচড়ানো টিশার্ট। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলটা গলিয়ে কোনো রকমে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসেছি। মিমির খালা মেয়েটি অসম্ভব সুন্দরী। কাঁধ পর্যন্ত শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের মতো চুল, গাঢ় সবুজ সালোয়ারের সঙ্গে হালকা সবুজ কামিজ আর গলা পেঁচিয়ে পেছন দিকে ফেলে দেওয়া মুঠো-প্রস্তের ওড়না। এক জোড়া ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরেও দশটি বাঙালি মেয়ের চেয়ে লম্বা। আমার পেছনে তো আর মাছির মতো চোখ নেই, তবু এত বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি কী করে ভাবছেন? কোনো ব্যাপার না, এ রকম সুন্দরীদের একবার দেখলে যে কেউই এ রকম বর্ণনা দিতে পারে; আপনিও পারবেন।

মিমির খালা গাড়িতে উঠে বসেছেন তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শুধু সানগ্লাসটা চোখ থেকে কপালে তুলে ‘একটু নামিয়ে দেবেন’ বলার মধ্যে একটা উদ্ধত ভঙ্গি কিংবা অবজ্ঞা ফুটে ওঠে। কী আর করা! সুন্দরীরা ভাবেন, তাঁরা যে ধরার ধুলায় পা রাখছেন, তাতেই ধরিত্রী ধন্য।

পুরো রাস্তা একটি কথাও বলেননি, বরং সেলফোনটার বোতাম টেপাটেপি করে ব্যস্ততার ভান করেছেন। তাতেও আমার মনে করার কিছু ছিল না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কী-ই বা কথা বলবেন, আর কতটুকুই বা পথ। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটল ব্র্যাক ব্যাংকের

পাশে নামিয়ে দেওয়ার পর। ধন্যবাদ-টাদ কিছু নয়, সোজা আমার জানালার পাশে এসে কাচটা নামাতে বললেন ইশারায়, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতব্যাগ থেকে একটা বিশ টাকার নোট বের করে ধরিয়ে দিলেন হাতে। ‘চা খাবেন’ বলে গট্গট করে সরে পড়লেন দৃষ্টিসীমা থেকে। বিশ টাকার নোট এত দর্শনীয় মনে হয়নি কোনোদিন। কিন্তু এই নোটটার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে কখন গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছি খেয়াল ছিল না নিজেরই।

সব রাগ আমার গিয়ে পড়ল রুনা ভাবির ওপর। এই মহিলা আমাকে আজ সাতসকালে এই চেহারা-পোশাকে বাবলুর স্কুলে না পাঠালে এই অপমানটা হজম করতে হতো না। নিজের মুখে কী বলব, আমি দেখতে শুনতে ভালো, ফর্মাল প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে ব্লেজার আর মানানসই টাই, ক্লিন শেভড মুখ থেকে লোশনের ভুরভুর গন্ধ ছড়ালে কার বাপের সাধ্য আমাকে ড্রাইভার ভাবে!

রুনা ভাবিকে এসব কিছুই জানালাম না। শুধু নাশতা করার সময় বললাম, ‘ভাবি, এত কিসিমের মেয়ে দেখাও আর বিয়ে করো বিয়ে করো বলে কান ঝালাপালা করে দাও, মিমির খালার মতো একটা মেয়ে তো দেখালে না আজ পর্যন্ত।’

ভাবি চোখ কপালে তুলে বললেন, ‘মিমির খালা! মানে তানিয়া? কোথায় দেখলে? ওই মেয়ের তো খুব নাক উঁচা...।’

‘সুন্দরীদের নাক এ রকমই হয়, বিয়ের আগে তোমারও ছিল, তুমি খবর নাও, পারিবারিকভাবে একটা প্রস্তাব দাও।’

কয়েক দিন পর রুনা ভাবি বললেন, ‘তানিয়ার মাকে বলেছিলাম, উনি বললেন, ছেলে তো ভালো, বিদেশে পড়াশোনা করেছে, ভালো চাকরি করে, কিন্তু মা, আমার মেয়ের মতামত ছাড়া তো হবে না, খুব জেদি মেয়ে।’

‘তাহলে মেয়েকে বলো।’

‘বলেছি, তানিয়া বলল সে আগে নিজে ছেলে দেখবে, কথা বলবে, তারপর ডিসিশন।’

আশ্চর্য কী জমানা এলো, মেয়ে আসবে ছেলে দেখতে! ব্যাপারটা একটু অপমানজনক। তবে নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমার; বললাম, ‘আমি রাজি।’

শুক্রবার ছুটির দিন তানিয়া এল ছেলে দেখতে। সরাসরি বাসায়। এই জীবনে আরও কত কী দেখতে হবে! একটু নার্ভাস লাগছিল। তানিয়া বলল, ‘আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে...।’

‘দেখে থাকবেন, একই শহরে থাকি।’ আমার সপ্রতিভ উত্তর। গাড়িতে লিফ্ট দেওয়ার ব্যাপারটির ধারে-কাছে গেলাম না। এরপর নানা প্রশ্ন—বিদেশে কোথায় পড়াশোনা করেছি, এখন কত বেতন পাই (রীতিমতো অভদ্র কৌতূহল), গান শুনি কি না, কী ধরনের গান পছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি।

চা-নাশতা খেয়ে, ভাবিকে নিচু স্বরে ‘পরে জানাব’ বলে চলে গেল তানিয়া। আমি একটু চুপেস গেলাম।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, আর ধৈর্য ধরতে না পেয়ে মাস যাওয়ার আগেই ভাবিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘খবর কী, ভাবি?’

ভাবি একটু বিব্রত, বললেন, ‘বলেছি না মেয়েটার একটু নাক উঁচা...।’

‘কী বলেছে সেটা বলো।’

আমাকে প্রায় অতল জলের ঘূর্ণিস্রোতে ফেলে দিয়ে ভাবি বললেন, ‘পছন্দ হয়নি।’

ধরণী কেন দ্বিধা হয় না! রাগে-দুঃখে-অপমানে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তানিয়া সুন্দরী, স্মার্ট সন্দেহ নেই, তাই বলে আমি কি ফেলনা? কত মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমাকে পেলে। পরদিন সকালে একটা বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সকালে মিমিকে স্কুলে দিতে আসে ওর খালা। সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম তার সামনে।

হাসিমুখে তানিয়া বললেন, ‘কেমন আছেন?’ উত্তর না দিয়ে সোজাসুজি বললাম, ‘আমাকে পছন্দ না করার কারণটা জানতে পারি?’

একটুও অপ্রস্তুত হলো না তানিয়া, বরং একটা বাউন্সার ছুড়ল যেন আমার কাঁধ ও মুখ বরাবর, ‘শুনেছি এর আগে তিনটা মেয়েকে পাত্রী হিসেবে আপনি বাতিল করেছেন, তারা কি কেউ এসে আপনার কাছে এসে জানতে চেয়েছে কারণটা কী?’

আমার মুখে কথা জোগাল না কয়েক মুহূর্ত, তারপর একটু কাঁচুমাঁচু হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি সিদ্ধান্তে অটল?’

এবার এক অসাধারণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে
তানিয়া বলল, 'সিদ্ধান্ত পালাতে পারি এক
শর্তে।'

‘কী শর্ত?’

‘আর কোনোদিন পাত্রী দেখে বেড়ানো আর
বাতিল করা—এসব করতে পারবেন না।’

‘কেন করব? একবার পছন্দ হলে আর দেখার
কী আছে?’

‘ঠিক আছে যান আমি রাজি...।’

যেন দয়া করলেন আমাকে। আমি প্রাথমিক
সাফল্য নিয়ে ফিরে আসছিলাম। পেছন থেকে
ডাক দিলেন, ‘শুনুন।’

কাছে যেতেই বললেন, ‘তোমাকে কোট-টাই
এসবে একদম ভালো লাগে না, বরং প্রথম
যেদিন দেখেছিলাম উস্কুখুস্কু চুল, খোঁচা খোঁচা
দাঁড়ি... সেটাই ভালো। প্রথম দেখাতেই প্রেমে
পড়ে গিয়েছিলাম।’

‘কী বলছো! ড্রাইভার ভাব নি? তাহলে বিশ
টাকার নোটটা?’

‘সেটা ছিল বুকিং মানি, বুক করে রেখেছিলাম
তোমাকে।’

আমি কী গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেব? না,
সেটা এখানে শোভন হবে না। তবে একটা
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এখন থেকে শেভ করব
দশ দিনে একবার। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
ডিসেম্বর ২০, ২০১০

494) দুটি বিলেতি গল্প - তারাপদ রায়

প্যারিস শহরের এক রেস্টোরাঁয় বসে সকালে
দুই বন্ধু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা
খাচ্ছে। হঠাৎ এক বন্ধুর চোখ খবরের কাগজের
এক জায়গায় পড়তে সে আঁতকিয়ে উঠল, সে
অন্য বন্ধুকে দেখাল তারপর পড়ে শোনাল।
ঘটনাটি সামান্য নয়, মাদাম দুভালের স্বামী
মঁশিয়ে দুভাল গতকাল রাতে অতর্কিতে বাড়ি
ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে এক
অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখতে পান। মঁশিয়ে
দুভাল কয়েকদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন।
কিছুদিন পরে ফেরার কথা ছিল, তাই হয়তো
দুভাল-পত্নীর এই অসতর্কতা।

সে যা হোক, দুভাল সাহেব বাড়ি ফিরে সেই
হতভাগ্য প্রেমিককে দড়ি দিয়ে জানালার
গরাদের সঙ্গে বাঁধেন। তারপর নির্মমভাবে এক

ঘণ্টা চাবুক মারেন এবং অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্যারিস শহরের শীতের বরফজমা, কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় লাথি মেরে বাড়ির মধ্য থেকে বের করে দেন। পুলিশের গাড়ি দুর্ভাগাকে উদ্ধার করে রাস্তা থেকে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যে বন্ধুটি খবরের কাগজটি অন্য বন্ধুকে পড়ে শোনাচ্ছিল সে বলল, ‘কী সাংঘাতিক! সামান্য অবৈধ প্রেমের জন্য এত লাঞ্ছনা! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!’ যে শুনছিল সেই দ্বিতীয় বন্ধুটি খবর শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, ‘এর চেয়ে আরও সাংঘাতিক হতে পারত।’

প্রথম বন্ধু বিস্মিত, ‘এর থেকে আর কী সাংঘাতিক হবে!’ দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল, ‘কাল না হয়ে পরশু দিন হলেই আরও সাংঘাতিক হতো। পরশু দিন রাতে যে আমি ছিলাম দুভালমেমের বাড়িতে, সেদিন যদি দুভাল ফিরত!’

দ্বিতীয় কথিকাটি বিপরীতমুখী। আগের গল্পের স্বামী মারমুখী। আর এ গল্পে ভীরা, ভালো মানুষ স্বামী তাদের একজন যারা বউকে দখলে রাখতে পারে না, সাহেবরা যাদের শিং গজিয়েছে বলে উপহাস করে।

এক ব্যক্তির অফিসে খুব ক্লান্ত লাগছে। অথচ অফিস ছুটি হতে এখনো তিন-চার ঘণ্টা বাকি। এখন ভরদুপুর। তার সাহসের অভাব, অফিস থেকে পালাতে ভরসা করছে না। তার সহকর্মী তাকে বলল, ‘আরে, ভয়ের কী আছে, আজ তো বড়সাহেব অফিসে নেই। খুব সাজগোজ করে, ভুরভুরে আতর মেখে বেরিয়েছে। কোথাও ফুর্তি করতে গেছে, সহজে ফিরবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, কেউ তোমাকে ধরবে না।’

ক্লান্ত কর্মচারীটি সংশয়াকুল চিন্তে গৃহপানে রওনা হলো। তার বাড়ি কাছেই। ১৫ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল সে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে অফিসে ফিরে আসছে। সে ফিরে এসে হাঁপাতে লাগল। একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর তার পূর্ব পরামর্শদাতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি এমন ভয় পেয়ে ফিরে এলে কেন?’

কর্মচারীটি বলল, ‘তোমার পরামর্শ শুনে আজ আমি ঘোর বিপদে পড়েছিলাম।’

‘কী বিপদ?’ কিছুই বুঝতে পারছে না পূর্ব পরামর্শদাতা।

‘কী বিপদ?’ অফিস কেটে চলে যাওয়া বন্ধুটি

ব্যাখ্যা করে বলল, ‘চাকরি যেতে বসেছিল।
আজ চাকরি খোয়াতাম। বড় সাহেবের কাছে
অল্পের জন্য ধরা পড়িনি যে অফিস
পালিয়েছিলাম।’
পরামর্শদাতা পুনরায় প্রশ্ন করল, ‘তার মানে?’
বন্ধুটি বলল, ‘তার মানে? বাড়ি ফিরে শোয়ার
ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ গুনি বউ কার সঙ্গে
খুব হেসে হেসে কথা বলছে। জানালার ফাঁক
দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি, বড় সাহেব
আমার বিছানায় শুয়ে। ভাগ্যিস হুড়মুড় করে
ঘরের মধ্যে ঢুকে যাইনি। তাহলেই ধরা পড়ে
যেতাম। অফিস পালানো ধরতে পারলে সাহেব
নিশ্চয়ই আমাকে বরখাস্ত করত। সেই ভয়েই
তো একছুটে ফিরে এলাম অফিসে।’
বায়রন সাহেবের বেশ কিছুকাল আগে উইলিয়াম
শেক্সপিয়ার নামে এক নাট্যকার অত্যন্ত
অনাসক্তভাবে পরকীয়া সম্পর্কে দু-চার হাজার
কথা লিখেছিলেন। শেক্সপিয়ারের মতো
হৃদয়সন্ধানী মানুষকে অনাসক্ত বলছি এ কারণে
যে তিনি নিজের সঙ্গে নিজেরই বিরোধ
ঘটিয়েছেন। তারাপদ রায়: সাহিত্যিক, রম্য
লেখক হিসেবে খ্যাত। জন্ম ১৯৩৬, মৃত্যু
২০০৭।

495) প্রতিবেশী - মিখাইল প্রিমস্কি, নিনা প্রিমস্কায়া

নতুন বাসায় উঠলাম আমরা। আমার ধারের
অন্ত নেই, স্ত্রীর খুশির অন্ত নেই।
সন্কেবেলায় দরজায় কলিং বেল। খুলে দেখি,
অপরিচিত এক লোক দাঁড়িয়ে। হাতে ধরে আছে
পা। গরুর। জানলাম, প্রতিবেশী। সে বলল,
‘আমার ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনাদের
সাহায্য প্রয়োজন।’
প্রতিবেশী যখন বলছে, সাহায্য অবশ্যই করা
উচিত। তার ফ্রিজের সমস্ত জিনিসপত্র ঢোকানো
হলো আমাদের ফ্রিজে। তবে ফ্রিজে রাখা
আমাদের খাবারদাবার বের করে খেয়ে ফেলতে
হলো, যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। প্রতিবেশীকে
ধন্যবাদ, সে সাহায্য না করলে আমরা খেয়ে
শেষ করতে পারতাম না। আরেক দিন কলিং
বেল। আবার প্রতিবেশী। হাতে কিছু নেই বটে,
তবে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।
সে বলল, ‘আমরা কয়েকজন ফুটবল দেখব ঠিক
করেছিলাম। কিন্তু আমার টিভিটা নষ্ট হয়ে

গেছে। আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।’

প্রতিবেশী যখন বলছে, সাহায্য অবশ্যই করা উচিত। আমাদের ফ্রিজ থেকে তার খাবারদাবার বের করে সে বন্ধুদের নিয়ে বসে পড়ল আমাদের টিভির সামনে।

তবে সত্যি বলতে কি, আমি আর আমার স্ত্রী টিভিতে সিনেমা দেখব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমাদের ফুটবল দল যখন খেলছে আরেক দলের সঙ্গে এবং প্রায় জিততে চলেছে, তখন কিসের সিনেমা! আর ঠিক সেই সময় আমাদের দলকে নিশ্চিত একটা পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করল রেফারি। প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ; সে এক ঘা বসিয়ে দিল রেফারিকে। বোতল দিয়ে। একেবারে টিভির পর্দায়।

দিন পনেরো পর আবার কলিং বেল।

প্রতিবেশী। একা। হাতে কুঁচকে যাওয়া প্যান্ট। বলল, ‘বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।’

প্রতিবেশী যখন বলছে, সাহায্য অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু করতে পারছি না। কিছুতেই না। এমনকি আমাকে মেরে ফেললেও না। এর কারণ এই নয়, আমার এই প্রতিবেশীকে আমি খারাপ চোখে দেখতে শুরু করেছি। কারণটা আসলে খুব সহজ—আমার স্ত্রীও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

496) সারপ্রাইজ - আদনান মুকিত

শীতের সকালে কম্বলের ওম থেকে বের হওয়া সহজ কোনো কাজ না। অথচ আমাকে সেই কঠিন কাজটাই করতে হলো। সব দোষ এই ফোনের। কড়া ঝাড়ি দেওয়ার বাসনা নিয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি, মাসুদ কল করেছে। কদিন থেকেই টাকা-পয়সা আসার পূর্বাভাস হিসেবে হাতের তালু চুলকাচ্ছিল। মাসুদের ফোন দেখে নিশ্চিত হলাম। যাক, টাকাটা তাহলে পাচ্ছি। কিন্তু কম্বলের নিচ থেকে কি অত সহজে বের হওয়া যায়? ধরতে ধরতেই খাঁটি কলটা মিসড কলে পরিণত হলো। টাকা পাওয়া নিয়ে কথা! আমি কলব্যাক করলাম। রিং হচ্ছে, ওয়েলকাম টিউনে বাজছে বিখ্যাত গান, ‘নিঃস্ব করেছ আমায়, কী নিষ্ঠুর ছলনায়...’ ব্যাটা, তুই-ই তো আমাকে নিঃস্ব করেছিস। এ জীবনে তোকে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছি, তার সুদ নিলে গুলশানে আমার একটা বাড়ি থাকত। শয়তানটা

ফোন ধরেই আমার তোতলামি নিয়ে খোঁচা দিয়ে বলল,

জা-জা-জামাল? কেমন আছিস?

ভা-ভালো।

তোর ঘাড়ের ব্যথাটা কমেছে?

আ-আমার আবার কবে ঘাড়ব্যথা ছিল? ব্রেনটা কোরবানির গরুর ব্রেনের সঙ্গে ভেজে খেয়ে ফেলেছিস নাকি?

কী করে খাব, আমার তো ব্রেনই নেই। হা হা হা। শোন, আমার কিছু টাকা লাগবে।

কে-কেন? ব্রেন কিনবি?

আরে নাহ্। এই দেশে থাকার জন্য ব্রেন লাগে নাকি? আমি আসছি। তুই জিনিস রেডি কর।

আমার কাছে কোনো টাকা নাই।

মাই ফ্রেন্ড, আমি জানি, তোর কাছে টাকা আছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা শেষ হতে পারে, কিন্তু তোর টাকা শেষ হবে না।

তুই তো আগের টাকাই শোধ করিসনি। আমি দিতে পারব না।

তুই কি কবির কথা ভুলে গেলি? কবি বলেছেন, ‘পারিব না এ কথাটি বলিও না আর’...বেশি না, মাত্র পাঁচ হাজার দিলেই চলবে। আগামী বছর একসঙ্গে সব শোধ করে দেব।

আ-গা-মী বছর? অসম্ভব!

আরও দেরিতে চাস নাকি? ওরে অবুঝ, আগামী বছর আসতে আর দুই-তিন দিন বাকি।

জানুয়ারির ১ তারিখেই সব দিয়ে দেব। নতুন বছরে তোদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

এত টাকা দিয়ে কী করবি?

আরে, বছর শেষ হচ্ছে, আবার নতুন বছর আসছে। এ উপলক্ষে দুজনই গিফট দাবি করেছে। কী বিপদ। শেষে বুদ্ধি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। একজনকে বছর শেষের গিফট দেব, আরেকজনকে দেব গুরুরটা। বুদ্ধি কেমন?

দু-দুটো জলজ্যান্ত গার্লফ্রেন্ড থাকলে এ রকমই হয়। আমি তো নিজেকেই ম্যানেজ করতে পারি না। তুই দুজনকে ম্যানেজ করিস কীভাবে?

কেন? তোদের কাছ থেকে ধার নিয়ে! দিবি না ধার?

আচ্ছা, আয়। ১ তারিখেই দিয়ে দিস। ক্রাইসিসে আছি।

এই জন্যই তোকে এত ভালোবাসি। গোস্তর

পরিচয় গন্ধে, আর দোস্তর পরিচয় বিপদে। ও
শোন, আমি কিন্তু এসে নাশতা খাব। বাই।
পুরোই অস্থির! আজকালকার ছেলেগুলো সব এ
রকম। হঠাৎ ফোনের ব্যালেন্স চেক করে দেখি
০.৩৩ পয়সা আছে। ধুর! কল যে আমি
করেছিলাম মনেই ছিল না। ইশ্! মনটাই খারাপ
হয়ে গেল। আমি আবার কম্বলের নিচে অবস্থান
নিলাম। এতে যদি মনটা শান্ত হয়।
মাসুদ এসে মজা করে নাশতা খেল। জিজ্ঞেস
করলাম,
থার্টি ফাস্ট নাইটে কী করবি?
কী আর? তোর ধার শোধ করব।
সত্যি?
অবশ্যই। নতুন বছরের প্রথম প্রহরেই আমি
ঋণমুক্ত হতে চাই। বছরটা একেবারে নতুন
করে শুরু করব। মাঠে চলে আসিস। ব্যাডমিন্টন
খেলা হবে। খেলা শেষে ধার শোধ। কিন্তু এর
আগে ফোন দিয়ে 'টাকা দে' টাইপের ঘ্যান ঘ্যান
করবি না।
ভদ্রলোকের জবান এক।
থার্টি ফাস্ট নাইটে বের হওয়ার আগে মোটা
জ্যাকেটটা পরে নিলাম। অনেকগুলো টাকা
আনতে হবে তো। এটার পকেট নিরাপদ। হঠাৎ
বাবার বাধা, কই যাস?
থার্টি ফাস্ট নাইট তো, বন্ধুরা মিলে সেলিব্রেট
করব।
খামোশ! জীবন থেকে একটা বছর চলে যাচ্ছে,
আর তুই সেলিব্রেট করবি? মৃত্যুর দিকে যে এক
ধাপ এগিয়ে যাচ্ছিস, সে খেয়াল আছে? বের
হওয়া নিষেধ। কারফিউ!
এ ধরনের বাবাদের কারণেই আমাদের জীবন
বিভীষিকাময়। এ জন্যই মাঝেমধ্যে মনের দুঃখে
সুন্দরবনে চলে যেতে ইচ্ছা করে। কী আর
করা, বাবার আদেশ। মাসুদকে ফোন দিয়ে
বলতে হবে আজ আসতে পারব না। নইলে ও
আবার টাকা নিয়ে অপেক্ষা করবে। কিন্তু একি!
ওর ফোন বন্ধ কেন? কয়েকবার চেষ্টা করেও
পেলাম না। শালা ভাগল নাকি! তা-ই তো মনে
হচ্ছে। চান্দু, পালিয়ে যাবি কোথায়! তোর দুটো
গার্লফ্রেন্ডের নাম্বারই আমার কাছে আছে। আমি
সঙ্গে সঙ্গে ওর ক্লোজ গার্লফ্রেন্ড টুশিকে ফোন
দিলাম। ওপাশ থেকে ভেসে এল রাগী কণ্ঠ,
হ্যালো, কে?

টু-টু টুশি?

জি না, শুধু টুশি, আপনি কে?

জা-জা-জামাল

আপনি! আপনার খবর আছে। আপনার বন্ধু আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল, আজকে গিফটসহ ফেরত দেওয়ার কথা। ওদিকে গতকাল থেকে ফোন অফ। খোঁজ নিয়ে দেখি, উনি জীবিকার তাগিদে সাইপ্রাসে চলে গেছেন। ভাবতে পারেন? আমি আর কাউকে চিনিও না। এখন আপনি আমার টাকা জোগাড় করে দেবেন।

টা-টা...

কিসের টাটা? টাকা জোগাড় করে দেন, নইলে আপনার টাউট বন্ধুর ঠিকানা দেন। সাইপ্রাস হোক, আর মাদাগাস্কার হোক, ওর খবর আছে! আমার সঙ্গে বিটলামি!...

টুশির কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছে না। নতুন বছরে মাসুদ সারপ্রাইজ দেবে বলেছিল। কিন্তু সেটা যে এত ভয়াবহ হবে, এটা জীবনেও ভাবিনি। আমি ফোন কেটে দিলাম। এক গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। আরেকজনকে ফোন দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি আবারও কন্সলের নিচে অবস্থান নিলাম। কানে বাজছে মাসুদের সেই ওয়েলকাম টিউন, 'নিঃস্ব করেছ আমায়, কী নিষ্ঠুর ছলনায়...' **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৭, ২০১০

497) সবজাত্য সমীপেষু

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য কী?

মো. মাইন উদ্দিন

হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

খুব সিম্পল পার্থক্য, একজনের ডেবিট হয়, অন্যজনের হয় ক্রেডিট। সারা রাত একটি চুলায় যে গ্যাস পোড়ে, তার দাম বেশি, না একটি ম্যাচের কাঠির?

মোস্তুফা কামাল

পশ্চিমপাড়া, চাঁচড়া, যশোর।

অবশ্যই একটি ম্যাচের কাঠির! কারণ একটি ম্যাচের কাঠি দিয়ে আরও বেশি ক্ষতি করা সম্ভব। আচ্ছা, ইদানিং আমাদের রাজনীতি এত বাড়িকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে কেনো?

কামরুন নাহার

আমিন জুটমিল, চট্টগ্রাম

কারণ পলিটিক্স বিগিন ফ্রম হোম। হাতের লেখা
কীভাবে ভালো করব?

আল-আমিন

ইছামতী, তেরখাদা, খুলনা।

কম্পিউটারের কি-বোর্ড দিয়ে ট্রাই করতে
পারেন। জ্ঞানই আলো হলে বাতির দরকার কী?
শাকিলা

কানাইপুর, ফরিদপুর।

জ্ঞানটা আগে লোড করতে হবে না! ছেলেরাই
শুধু বখাটে উপাধি পায় কেন?

রিয়াদ

স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল।

জগৎটা এখনো পুরুষশাসিত কিনা! সংসদে
সংরক্ষিত নারী আসন আছে, কিন্তু সংরক্ষিত
পুরুষ আসন নেই কেন?

রিয়াদ

স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল।

সংরক্ষণটা তাহলে কার ভয়ে করা হবে? চোর
পালালে বুদ্ধি বাড়ে আর বউ পালালে?

মো. শাহদাত হোসেন

চরহরিশপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পুরোনো বুদ্ধি আবার ফিরে আসতে শুরু
করে। ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া বাংলাদেশে হিন্দি
সিরিয়াল দেখা বন্ধ করতে হলে কী করতে
হবে?

মো. ইলিয়াস আহমেদ

খালিশপুর, খুলনা।

এবার হিন্দি সিরিয়ালের জন্য প্রাণ দিতে
হবে। মানুষ দুঃখে কাঁদে কেন?

শিকদার

মিরের কোদলা, খুলনা।

পানীয় জল দিয়ে সেলিব্রেট করতে। কোনটি
জাতির মেরুদণ্ড—শিক্ষা, নাকি সুশিক্ষা?

খুশি

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সাংসদদের দেখুন, ওনারাই তো জাতিকে
চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! আমাকে ভালোবাসার
একটা জম্পেশ টিপস দিন।

আদিত্য পাল

মহৎপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

কাউকে বলবেন না কিন্তু, ভালোবাসা কখনো
শিখে হয় না, এমনি এমনি আসে। অমাবস্যার
আকাশে চাঁদমামা দেখা দেন না কেন?

এ এস এম সায়েম
রোকন উদ্দিন সড়ক, মিস্ত্রিপাড়া, খুলনা।
অন্ধকারে উনার ভূতের ভয় করে। শিক্ষিত
লোকেরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আগ্রহ বোধ
করে না কেন?
শাহীন আল আনসারী
তালাইমারী, কাজলা, রাজশাহী।
শিক্ষিত লোকেরা ভুলটুল একটু কম করে
কিনা! মানুষ মরে গেলে আর পৃথিবীতে ফিরে
আসে না কেন?
শাহীন আলী
তালাইমারী, কাজলা, রাজশাহী।
আবার পৃথিবীতে! একবার এসে শখ মিটে
যায়। সেরা প্রশ্ন করলেই কি প্রাইজবন্ড পাওয়া
যায়?
মো. খালেদ সরকার
জিয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সব সময় না। এই যে আজ আপনি পেলেন
না। আক্কেল দাঁত থাকলেই কি সবার আক্কেল
থাকে?
মমতাজ বেগম
দেওয়ানপাড়া, জামালপুর।
না, কই সবজান্তার আক্কেল দাঁত অনেক দিন
ধরেই আছে। অ্যাকাউন্টিং শিখতে কী করতে
হবে?
সয়মা হক
আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
হিসাব ও বিজ্ঞান খুব ভালো জানতে হবে। টাকায়
টাকা আনে আর রাজনীতি?
ফজল তাহসান
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
টাকা গৌনে। আমরা ভোট দেব কিসের আশায়?
রণজিৎ মল্লিক সরকার
সরাইদহ, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
নিজেদের নয়, নেতা-নেত্রীদের আশায়। আমার
বয়স আট বছর। আমি কি একাধারে এক বছর
দিনে না খেয়ে থাকতে পারব?
সিরাজুল ইসলাম
বেড়া, পাবনা।
অবশ্যই, কেন নয়। সে ক্ষেত্রে আপনি সব সময়
রাতে খাওয়ার অভ্যাসটা করে নেবেন। যিনি সৎ
তিনি কি যোগ্য?
সুজন মাজু

সদর বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সব সময় না, নির্বাচনের জন্য হলে তো না-

ই। পেটে খেলে পিঠে সয় আর মুখে খেলে?

আয়শা বিনতে আজিজ

আড়ানী মনোমোহিনী উচ্চবিদ্যালয়, বাঘা,
রাজশাহী।

কমোড সয়। গাছে যদি বেল পাকে তাতে

কাকের কী—এই কথার মানে কী?

বিপ্লব অধিকারী

নলধা, ফকিরহাট, বাগেরহাট।

এই কথার মানে হচ্ছে বেল কাকের ফেবারিট

ফুট হইলেও হইতে পারে। সরকার কোথাও

আটকে গেলে আইনের ব্যবস্থা নেয় আর

জনগণ?

জগন্নাথ চন্দ্র দাস

তজুমদ্দিন, ভোলা।

বাংলা সিনেমার ভাষ্যমতে সব সময় আইন

নিজের হাতে তুলে নেয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা

হলো জ্ঞানীর কাজ আর বাস্তবায়ন করা?

আনিসুর রহমান

পশ্চিম ব্রাহ্মদী, নরসিংদী।

শ্রমিকের। নায়ক হলে লাগে আত্মবিশ্বাস আর

নেতা হতে লাগে?

ফয়সাল মাহমুদ

রিংরোড, শ্যামলী।

কোনো রকম বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে

কোন জিনিস সবচেয়ে দ্রুত পাঁটে যায়?

রিফাত খান

পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, মনিরামপুর, যশোর।

রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতি। প্রধানমন্ত্রীর পদ

নিয়ে কাড়াকাড়ি হয় কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে

হয় না কেন?

সালমা আক্তার

সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

ওই পদটাও যে প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে,

তাই। অভাবে পড়লে স্বভাব নষ্ট হয় আর ধনী

হলে?

সাইফুজ্জামান সুমন

বিলচলন, বোথর, চাটমোহর, পাবনা।

কখনো কখনো নষ্ট স্বভাবটাই স্থায়ী হয়ে যায়,

কারো চোখে পড়ে না। কেন আমি সবজাত্তার

কাছে প্রশ্ন পাঠাব?

সায়মা সুলতানা

রায়নগর গ্যাস কোয়ার্টার, সিলেট।

অন্য কাউকে পাঠালে যদি সঠিক উত্তর দিয়ে
দেয়! বন্ধু সিমের বোনাস দেওয়া হয় কিন্তু চালু
সিমের দেওয়া হয় না কেন?

মো. আলী আহমেদ

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, মিরপুর, ঢাকা।

তেলভর্তি গাড়িতে কখনো তেল ভরতে

দেখেছেন? ডিম পাড়ার পর মুরগি এত

ডাকাডাকি করে কেন?

শেখ মিজানুর রহমান

মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

ডেকে ডেকে ডিমের দামটা সবাইকে জানিয়ে

দেয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী কে?

মো. জহির রায়হান

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

জিরাফ। বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা দ্বারা যদি মিসাইল

নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করা

যায় কী দিয়ে?

খোন্দকার জাকারিয়া ইসলাম

মধ্যপাড়া, ঝিনাইদহ।

টাকা পয়সা, লোভ—এসব দিয়ে ট্রাই করতে

পারেন। আমাদের দেশে বেশ কাজ

করে। ধূমপান করলে স্ট্রোক হয়, আর না

করলে?

শাহাদাত হোসেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

না করলেও হয়, ফোর স্ট্রোক সিএনজি ট্যাক্সি

নিশ্চয়ই ধূমপান করে না। যদি জীবন=পানি=মরণ

হয়, তাহলে জীবন=মরণ হবে, কিন্তু কীভাবে?

সুমাইয়া সাদিক

কলেজ রোড, জামালপুর।

পানির অভাবে। দেশের প্রতিটি ঘরের একজন

সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে—কোথায়

সেই প্রতিশ্রুতি?

গাজী বেলাল আহমেদ

পিটিআই, মুন্সিগঞ্জ।

ঘরেই আছে, ভালোমতো খুঁজে দেখুন। লেখকেরা

ছদ্মনাম ব্যবহার করেন কেন?

মো. রফিকুল ইসলাম

চাটখিল, নোয়াখালী।

বউ জানলে বাসায় নাও ঢুকতে দিতে

পারে। হাতি আর বউয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

সোহাগ

রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

হাতিকে বউ বললে কিছুই হবে না। কিন্তু বউকে একবার হাতি বলে দেখুন, পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারবেন। মোবাইল এবং বউ, দুটোই ঘুমের জন্য ক্ষতিকর কেন?

এম ইয়াছিন আরাফাত

পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সাইলেন্ট মোডে রাখতে পারলে ঘুমের জন্য কোনোটাই ক্ষতিকর নয়। এক কথায় উত্তর দিন, দেশের এখন কী অবস্থা?

ফারহিন ইসলাম

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

সরকারি দলের হয়ে বলব, না বিরোধী দলের হয়ে? সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাগে, কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাগে না কেন?

শামীম

ফরিদপুর কলেজ, ফরিদপুর।

কে বলল লাগে না। দ্বিতীয় বিয়ের সময় লাগে তো! গাছের ফল আর পরীক্ষার ফলের মধ্যে পার্থক্য কী?

মো. তারিকুল ইসলাম

আমবাগ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

গাছের ফল আজকাল ওষুধ দিয়ে পাকানো যায়। প্রেমের আগুন কেন জ্বলে দ্বিগুণ?

অন্ত

হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী।

দুজনকে উষ্ণ রাখতে হয় কিনা! মেয়েরা কঠিন আর ছেলেরা সহজ কেন?

শ্রী ঝন্টুচন্দ্র শীল

সিংধা, চৌরাস্তা বাজার, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

যাতে ছেলেদের দিয়ে কঠিন কাজ করিয়ে

নেওয়া যায়, আর সহজে মেয়েদের মন পাওয়া যায়। বালিকা বিদ্যালয়ে কি ছাত্র থাকে?

সুবর্ণ পাথার

বলচুগ্রী, সুম্যপুর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

থাকে, তবে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার আগে ও

পরে। আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে আমাদের সবার কী শেখা উচিত?

আবুল বাসার

খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

মার্শাল আর্ট, কুংফু-কারাতে, বক্সিং, তাইকুন্ডু-নাইকুন্ডু ইত্যাদি। বিনা কষ্টে অধ্যবসায়ীর ১০০

টাকা পাওয়ার উপায় কী?

আরিফুল হাসান

পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

নিউমার্কেটের মোড়ে ঘণ্টা খানেক চোখ বন্ধ করে ডান হাত বাড়িয়ে রাখুন, ১০০-র বেশিও পেয়ে যেতে পারেন। এইডস-আক্রান্ত রোগীর রক্ত খাওয়ার পরও মশাদের কেন এইডস হয় না?

পুতুল

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

হয়, কিন্তু এইডসে মারা যাওয়ার আগেই ওদের আয়ু ফুরিয়ে যায় বলে বোঝা যায় না। সিগারেট ধীরে ধীরে মৃত্যু ডেকে আনে জেনেও মানুষ সিগারেট খায় কেন?

রাফিউল হক

উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

কারণ, তারা ধীরে ধীরে না মরে হঠাৎ করে একদিন মরে যেতে চায়। ফুটবলে রেফারি, ক্রিকেটে আম্পায়ার আর রাজনীতিতে?

শামীম

সাহাজান বুক স্টোর, মাইজদী, নোয়াখালী।

জনগণ। কিন্তু পাঁচ বছর পর একবার কার্ড দেখানো কিংবা আউট দেওয়ার সুযোগ পায়। কে বেশি আশার বাণী শোনায়ে?

সুপ্ত

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

আশা নামের মেয়েরা যখন বাণী

দেয়। সবজাতাকে আমার প্রশ্ন, আমি বিয়ে করব কাকে?

আতিকুর রহমান

খাশিপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।

আমার তো মনে হয় একটি মেয়েকে; আপনার অন্য কোনো পছন্দ থাকলে বলতে পারেন। নীল আকাশ, সবুজ মাঠ কিসের লক্ষণ?

রাইভী কস্তা

দাগনভূঞা, ফেনী।

কাক ও...এর সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষণ। নৌকা ও ধানের শীষ দ্বারা মানুষ কী পায়?

আল হেলাল

রশিদপুর, হবিগঞ্জ।

কত কিছু পায়! এই যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আষাঢ়ে গল্প শুনতে পায়। প্রেমের বিয়ে টেকে না কেন?

নীলাঞ্জনা

তেজগাঁও, ঢাকা।

নতুন প্রেমের কারণে। মানুষ অভ্যাসের দাস
কেন?

আসমা আহসান

তেজগাঁও, ঢাকা।

অভ্যাসের মালিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই
যে। মানুষ বিয়ে করে কিসের আশায়?

মোশারেফা কামাল

মির্জাপুর, সুইহারী, দিনাজপুর।

হত+আশায়। গরিবের এত দুঃখ-কষ্ট কেন?

মো. আ. হানিফ

চাঁদপুর কলেজ, রূপসা, খুলনা।

এসব দেখে বড়লোকেরা সুখের অনুভূতি লাভ
করতে পারে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর
জনগণের কী লাভ হলো?

মো. বজলুর রহমান

হেতেম খান, রাজশাহী।

যারা তাদের ভোট দিয়েছিল, তাদের ভোট নষ্ট
হয়নি, এই লাভটা তো হয়েছেই। বিরোধী দল
সব সময় জনগণের জন্য এত দরদ দেখায়
কেন?

শাহ্ মো. সজীব

জিয়াউর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারি দলে গেলে তো আর দরদ দেখাবে না,
তাই। আমি সবার কাজকে বড় করে দেখতে
চাই, কী করব?

নুজহাত চন্দ্রিমা

লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রজেক্টর লাগিয়ে বড় স্ক্রিনে দেখার চেষ্টা
করুন। বাংলাদেশকে জনবহুল দেশ না বলে
উন্নয়নশীল দেশ বলা হয় কেন?

সাহেব বাদশা

সংগলশী কাজির হাট, নীলফামারী।

কোনো কিছু বেশি আছে শুনলে দাতাগোষ্ঠী যদি
আবার ঋণ না দেয়! বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়,
কিন্তু বিশ্বকুৎসিত প্রতিযোগিতা হয় না কেন?

সুশীল মজুমদার

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

তখন বিচারক পাবেন কোথায়? কৃপণের ধন
পিঁপড়ায় খায়, আর পিঁপড়ার ধন?

তিতির

উৎরাইল লজ, নিলটুলী, ফরিদপুর।

তার আত্মীয়স্বজন খায়। যাঁরা রাজনীতি করেন

তাঁরা চোর, না ডাকাত?

মো. সোহাগ

সন্তাহার নিউ কলোনি, সান্তাহার সরকারি
কলেজ, বগুড়া।

ছি ছি, কী যে বলেন! তাঁরা চোর-ডাকাত হতে
যাবেন কেন? তারা তো সর্দার। একদিকে শুনি
বাম্পার ফলন হচ্ছে, আবার দেখি চালের বাজার
গরম—কেন?

মো. সালাউদ্দিন

ছাগলনাইয়া, ফেনী।

বাম্পার ফলনে কৃষকদের উৎসাহ দেওয়ার
জন্য। সবজান্তার ইংরেজি হচ্ছে ‘জ্যাক অব অল
ট্রেডস’, তো আপনি ব্যবসার কী জানেন?

মো. কিরিকিমটিং

নওমহল, ময়মনসিংহ।

কোন ব্যবসা? চলে যাওয়া সময় ফিরে আসে না
কেন?

শাহ পরান মজুমদার

ইপিজেড রোড, টমছম ব্রীজ, কুমিল্লা।

ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরে না যে। বলুন
তো, আমার সমস্যাটা কী?

মো. উস্তার আলী

জনতা স্টোর, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

নিজের সমস্যা বুঝতে না পারা। আশা ছিল
অনেক বড়মাপের একজন মানুষ হব, কিন্তু
হায়...!

মাসুদ রানা

সান্তাহার ইয়ার্ড কলোনি, বগুড়া।

মাত্র সোয়া ৫ ফুট আর ৬০ কেজিতে এসে
ইনিংস গুটিয়ে গেল। পরীক্ষার আগে মাথা গরম
থাকে কেন?

পিন্টু কুমার পবিত্র

আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বগুড়া।

ইঞ্জিন চালানোর আগে একটু গরম করে নিতে
হয় না! কীভাবে স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ
সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়?

মো. সাজ্জাদ মাহমুদ

পশ্চিম গৌরীপাড়া, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

পূর্বপুরুষদের মালিকানা থেকে হটিয়ে। গাড়ি
নিজে চলে না, তার পরও মানুষ কিছু হলে কেন
গাড়ি পেটায়?

মো. রাকিব

মির্জাপুর, রাজবাড়ি, দিনাজপুর।

এটা আর কিছু না, পরকারকাতরতা নাচতে না
জানলে উঠান বাঁকা আর খাইতে না জানলে?

মো. ফিরোজ আহমেদ

সরকারপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

ডায়েট কন্ট্রোল। জীবনের পথটা এত আঁকাবাঁকা
হয় কেন?

শাহিনজ আক্তার

সানকিপাড়া, ময়মনসিংহ।

যাতে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোটা বিলম্বিত
হয়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা এত শর্ট
কাপড়চোপড় পরে কেন?

নাজমুল হক

কুতুকুড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস
ম্যানেজমেন্ট কলেজ।

কাপড় ধোয়ার পানির অভাবে।

সেই কবে থেকে আমরা উন্নয়নের জোয়ারে
ভাসছি কিন্তু তার পরও আমাদের অবনতি হচ্ছে
কেন?

সুমিত বড়ুয়া

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

জোয়ারের পানি এখনো নামেনি তো, তাই সেই
পানিতে তলিয়ে যাচ্ছি। পরীক্ষার সময়
লোডশেডিং এত বেশি হয় কেন?

মেহেদি হাসান

পশ্চিম মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর
জন্য। মা বড় না বউ বড়?

সৌরভ মাহমুদ

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উচ্চতায়, না বয়সে? সবজাত্তা আসলে কিছু
জানেন, এর প্রমাণ কী?

এফ এম জুবায়ের

হোসেনিগঞ্জ, রাজশাহী।

এই যে আপনারা সবাই জানতে চাচ্ছেন। দেশ
চালাবে রাজনীতি, তাহলে রাজনীতি চালাবে
কে?

আকতার হোসেন

শ্রীরামপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

কেন, গণতন্ত্রের অনেক সেবক আছেন না
আমাদের দেশে, তারা। জামিনের পূর্বশর্ত কী?

জুয়েল দাশ

কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

গ্রেপ্তার। সবাই ধনী হতে চায় কেন?

ফারুক আহমেদ

রায়নগর, সোনারপাড়া, সিলেট।

গরিবদের সাহায্য করার জন্য (সবার মুখের
কথাটাই বললাম) হরিণের চামড়া অজিন,
বাঘের চামড়া কৃতি, বিড়ালের চামড়া?

রাফি আহমেদ

ছোটরা, কুমিল্লা।

গায়ে থাকা অবস্থায়, না গা থেকে সরানোর
পর? আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগ কম
কেন?

মো. মনিরুজ্জামান

হরিপুর আলিম মাদ্রাসা, হরিপুর, চাটমোহর,
পাবনা।

প্রয়োগের সুযোগ কই, আইন সবকিছুর ঊর্ধ্বে
থাকে যে নেতারা কী খান?

বর্ষণ সেন

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

সবই খান, পাঁচ বছর খান আর পাঁচ বছর
জাবর কাটেন। বাঁচতে হলে জানতে হবে আর
জানতে হলে কী করতে হবে?

আয়েশা আক্তার

কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।

বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। অপার
সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সম্ভাবনা কী ধরনের?

শোভন শর্মা

গলাচিপা, পটুয়াখালী।

বর্তমানে আর কোনো পারই দেখা যায়

না। পায়ের পাতা দিয়ে হাঁটতে হয়, আর হাতের
তালু দিয়ে?

পুষ্প

খিলক্ষেত, ঢাকা।

বসের সামনে দুই তালুতে ঘষতে পারলে

ভবিষ্যতে আর হাঁটতে হবে না। কার সঙ্গে প্রেম
করলে লাভ বেশি, ভাবি না ভাবির বোনের
সঙ্গে?

রানা

চাঁচুড়ীবাজার, কালিয়া, নড়াইল।

দুজনের সঙ্গে। পাখি তো অনেক রকমের ফল
খায়, তাহলে সবাই পাকা পেঁপের কথা বলে
কেন?

মিথিলা হাবিব

নূরনগর, খুলনা।

যত দোষ পেঁপে ঘোষ। সকালবেলা ঘুম থেকে

উঠে আপনি দেখলেন, আপনি মেয়ে হয়ে
গেছেন, তখন কী করবেন?

মুর্তজা আহমেদ

দশমিনা, পটুয়াখালী।

টেনশনের কিছু নেই। তখনো সবজাত্তার উত্তর
আমিই দেব। ডিজিটাল বাংলাদেশ ও টালমাটাল
বাংলাদেশ—কোনটি সত্যি বলুন তো?

মো. বজলুর রহমান

শারমীন ভিলা, রাজশাহী।

সত্যি-মিথ্যায় কিছু যায়-আসে না, স্বপ্ন তো
স্বপ্নই, তাই না? পৃথিবীতে কোন ধরনের পুরুষ
সুখী?

মো. মারুফ হোসেন

পুরাতন কসবা, যশোর।

যে পুরুষ এখনো জানে না যে সে
পুরুষ। টিভিতে টকশো হয়, কিন্তু ঝাল-মিষ্টি শো
হয় না কেন?

রুমানা আফরিন

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

মরিচ আর চিনির কেজি কত খবর
রাখেন! বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
কী?

আসাদুজ্জামান সোহাগ

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।

আগের মতোই আছে, গণতন্ত্র সব সময়
সরকারের পক্ষে। বাংলাদেশ আর কত দিন
উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে থাকবে?

হোসাইন মোহাম্মদ

আমলা, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

যত দিন এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত
থাকবে। মেঘের রং সাদা কেন?

নাহার

রসুলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

যাতে নীল আকাশে ভালোভাবে দেখা
যায়। নেতারা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
নির্বাচিত হওয়ার পর পালন করেন না কেন?

সাজু

কবরস্থান মোড়, নীলফামারী।

পালন করে ফেললে পরেরবার নির্বাচনের আগে
কী প্রতিশ্রুতি দেবেন? ডাক ও হাঁকডাক—এই
দুইয়ের মধ্যে তফাতটা কী?

অনি

সদর হাসপাতাল মোড়, ফেনী।

হাঁকডাক সবাই দিতে পারে না, শুধু সরকারি
দলে যাদের পরিচিত আছে, তারাই দিতে
পারে। নাইন-ইলেভেন আর ওয়ান-ইলেভেনের
মধ্যে পার্থক্য কত?

মির্জা ফখরুল ইসলাম
আটোয়ারী, পঞ্চগড়।

এটা তো ক্লাস টুর ছেলেরাও বলতে পারবে!
বিয়োগ করে দেখেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ কাকে
বলে?

শহিদুল ইসলাম
রামনগর, দিনাজপুর।

২০২১ সালের লোকজন যে বাংলাদেশ দেখতে
পাবে বলে স্বপ্ন দেখে, তাকে ডিজিটাল
বাংলাদেশ বলে। স্বাধীন দেশে আমরা কোন
কাজগুলো স্বাধীনভাবে করতে পারব?

সাগর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

আপনি সরকারি দলের সমর্থক হলে যেকোনো
কাজ! সবাই ভালোবাসা পেতে চায়; কিন্তু
ভালোবাসা দিতে চায় কারা?

বিপুল দে
সরকারি এমএম কলেজ, যশোর।

ডেভেলপার কোম্পানিগুলো। বলুন তো,
আরজেদের মূল ভাষা কোনটি?

শুভংকর দত্ত
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

মুখের ভাষা। আচ্ছা, আপনি কেমন করে
সবজান্তা হলেন?

সাবিয়া আক্তার
দুলহাপুর, পতিপাড়া, মিঠাপুকুর, রংপুর।

আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে। মানুষ মরে
গেলে পচে, কিন্তু বেঁচে থাকলে কী হয়?

মুর্তজা আহমেদ
দশমিনা, পটুয়াখালী।

একদিন মরে যায়, তারপর পচে। মাছের কাঁটা
মাঝেমধ্যে গলায় বেঁধে, কিন্তু পেটে বেঁধে না
কেন?

মো. সাজ্জাদ হোসেন
গোবিন্দপুর, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

পেটের মধ্যে যে ক্ষুধার বিড়াল থাকে, ওটা
বেঁধার আগেই খেয়ে ফেলে। ইউরিয়া দিয়ে চাল
সাদা করা হয় কেন?

আইনুন নাহার

রসুলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

রং ফরসাকারী ক্রিম দিয়ে করলে চালের দাম

আরও বেড়ে যেত যে! সময়ের বিকল্প কী?

এফ এম জুবায়ের

হোসেনিগঞ্জ, রাজশাহী।

স্টপ ওয়াচ। অতি চালাকের গলায় দড়ি আর

অতি বোকার?

রাসেল বাবু

শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

অতি বোকার দড়িটা অতি চালাকের গলায়। আমি

১০০ টাকার প্রাইজবন্ড চাই।

ফৌজিয়া তাবাস্সুম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

টাকার মতো চাহিবা মাত্র ইহার দাবিদারকে

প্রাইজবন্ড দিতে বাধ্য থাকার কোনো আইন

কিন্তু নেই। ভাবলাম, রাজনীতি করে জনপ্রিয়

হব, কিন্তু কীভাবে?

মো. শামীম আজাদ

সানকিপাড়া, ময়মনসিংহ।

আপাতত একটা দলে ঢুকে পড়ুন, ভবিষ্যতে তো

পাল্টানোর চান্স আছেই। একসময় আট মণ চাল

পাওয়া যেত এক টাকায়, এখন কী পাওয়া যায়?

এ এইচ এম মুসাননা

চাটখিল, নোয়াখালী।

এখনো আপনি চাইলে আট মণ চালই পাবেন,

তবে এক টাকায় না। সাফল্য যেখানে নিহিত

থাকে সেখানে—

আনোয়ার হোসেন

দিনাজপুর অ বি কলেজ, দিনাজপুর।

খুব বেশি মানুষের যাতায়াত হয় না। বর্তমানে

দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা?

রাজু আহমেদ

ধানমন্ডি, ঢাকা।

এটাই—এত সমস্যার ভিড়ে সবচেয়ে বড়

সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। বাসরঘর

আর তাসের ঘরের মধ্যে মিল কোথায়?

শানুর আলী

দশঘর, বিশ্বনাথ, সিলেট।

দুটোই ক্ষণস্থায়ী। ও প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি কোথায়?

এ এইচ এম মুসাননা

চাটখিল, নোয়াখালী।

বেশি জোরে চিৎকার করবেন না, ওর বাবুর

সামনে পরীক্ষা। কই মাছ আর রাজনীতিবিদদের

মধ্যে মিল কী?

ফাহিমদা ইসলাম

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

দুটোর প্রাণ একই রকম। পৃথিবী এত মায়া-

মমতা আর ভালোবাসাহীন হয়ে যাচ্ছে কেন?

যুবরাজ খান

ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

একদিন সকল মায়া ত্যাগ করতে হবে তো,

তাই। কেউ বাঁচতে চায়; আবার কেউ মরতে চায়

কেন?

মো. রমজান উল্লাহ

বাতাকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা।

একই জিনিস সবাই চাইলে সবাইকে তো

দেওয়া যাবে না। সূর্যের আলোয় তাপ থাকলেও

চন্দ্ৰের আলোয় তাপ নেই কেন?

জাহাঙ্গীর আলম

আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

চন্দ্র একটু কুল তো, তাই। কখনো জানতে চেয়ো
না...

সাইফ উল ইসলাম

ফরেস্ট রোড, চট্টগ্রাম।

কেন আমি জানাতে চাই না। রাত দুপুরে যদি
দুদক ধরে?

ফাতিহ মোহাম্মদ আবতাহী

খিলগাঁও, ঢাকা।

রাত দুপুরেই জেলে যেতে হবে। আমরা ভোট
দিয়ে সরকার নির্বাচন করি কেন?

আবু বক্কর সিদ্দিক সামি

পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

যাতে পরবর্তী পাঁচ বছর সমালোচনা করার

মতো একটা কাজ থাকে হাতে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস

আর দুর্নীতিবাজ নেতাদের সঙ্গে কোথায় বাস?

ওয়াহেদুল ইসলাম লিখন

বানিয়াগাতি, মহিশূরা, চান্দাইকোনা, ধুনট,
বগুড়া।

ক্ষমতায় থাকলে স্বর্গে বাস আর ক্ষমতায়না

থাকলে বুঝে নিন। হাতের মাঝের আঙুলটি বড়
কেন?

ডা. মো. আইয়ুব আলী

পূর্ব কোদালা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

যাতে অন্য আঙুলগুলোকে দেখে শুনে রাখতে

পারে। নারী আর গাড়ির মধ্যে পার্থক্য কী?

লিংকন শীল

বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

গাড়ির তাও একটা ব্রেক আছে। অনেকের চোখে
সমস্যা নেই, তবু চশমা ব্যবহার করে কেন?

মো. শামীম আজাদ

আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ।

যাদের চোখে সমস্যা আছে তাদের সমবেদনা
জানানোর জন্য। দুর্নীতি ও কূটনীতির মধ্যে মিল
কোথায়?

জগন্নাথ চন্দ্র দাস

গোলকপুর, খাসের হাট, তজুমদ্দিন, ভোলা।

দুটো শব্দেরই প্রথম অংশটা ভালো করে খেয়াল
করুন। ধূমপান বর্জনীয় আর ধূমপায়ী?

মো. আলী খোন্দকার

দক্ষিণ সুজাপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উদাহরণীয়। বিভিন্ন পোস্টারের নিচে লেখা থাকে
'সচেতন নাগরিক'। এই সচেতন নাগরিক
কারা?

স্বাধীন

স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

যেসব সচেতন নাগরিক দিনের বেলা বাসা
থেকে পারতপক্ষে বের হন না। প্রেম মানে যদি
জ্বালা হয়, তা হলে বিয়ে মানে কী?

ক্লিনটন দেব রিগ্যান

হাবড়াবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রেমছাড়া যেমন ছিলেন সেটা। প্রেম মানুষকে
এত কষ্ট দেয় কেন?

রোকসানা শেখ

বারাহীপুর, ফেনী।

খাঁটি মানুষ বানানোর জন্য। খাঁটি বাঙালি হতে
হলে কী করতে হবে?

মালিহা

পশ্চিম আরজতপাড়া, ঢাকা।

কিছু করা থেকে বিরত থাকুন। আমি তাকে
ভালোবাসি, কিন্তু বিয়ে করতে ভয় পাই কেন?
নিলয় হাসান

ইটখোলা, শিবপুর, নরসিংদী।

সত্যিকারের প্রেম তো, তাই হারাতে ভয়
পাচ্ছেন। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা জ্ঞানীর কাজ
আর অতীতের ভাবনা ভাবা?

সেতু

কুখাপাড়া, নীলফামারী।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর
কাজ। আচ্ছা, আমি আমার বউকে এত ভয় পাই

কেন?

রিয়াজ উদ্দিন রকি

চাটখিল, নোয়াখালী।

কোনো না কোনোভাবে তো তাকে সন্তুষ্ট রাখা

উচিত, তাই না? সম্মানিত লোকের মান গেলে

আর কী থাকে?

মো. শফিউল আলম

শান্তিবাগ, মালিবাগ, ঢাকা।

শুধু ব্যক্তিটি থাকেন। দেশে এখন কোন

পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হচ্ছে?

আনোয়ার হোসেন

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে। নদী ভাঙে কিন্তু সাগর

সহজে ভাঙে না কেন?

সাহদিয়ার সিফাত

আমতলী পৌরসভা, আমতলী, বরগুনা।

নদী মেয়ে তো, মনটা একটু বেশিই

নরম। যানজট ও সেশনজটের মধ্যে পার্থক্য কী?

এফ এম তাজুল

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

যানজটে বর্তমান প্রজন্ম পিছিয়ে যাচ্ছে আর

সেশনজটে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কয়লা আর কালো

টাকার মধ্যে পার্থক্য কী?

মোহাম্মদ আলী খন্দকার

পুকুরী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

কয়লা পাওয়া যায় ফুলবাড়ীতে আর কালো টাকা

নেতাদের বাড়িতে। যে দেয়, সে পায়; তবুও

নেতারা দেয় না কেন?

কমল বড়ুয়া

রাইখালী বাজার, চন্দ্রঘোনা।

না দিয়েও যদি পাওয়া যায়, শুধু শুধু দিয়ে কী

লাভ? গাধা ও আমার মধ্যে পার্থক্য কী?

এস মুহম্মদ আই হোসেন

চকবাজার, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

গাধা বিষয়টা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে,

কিন্তু আপনি এখনো বুঝতে পারেননি। আমাদের

দেশের নেতারা নির্বাচনে হারলে ফলাফল

মানতে চান না কেন?

মো. শফিকুল ইসলাম

লালমোহন সাহা স্ট্রিট, নারিন্দা, ঢাকা।

ওনারা অনেক বেশি পজিটিভ তো, তাই

নেগেটিভ রেজাল্ট নিতে পারেন না। আমি

এখনো বিয়ে করিনি, মোটামুটি আছি। আমার

কি বিয়ে করা উচিত?

পল্টন বল

বাহাদুরপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

মোটামুটি থাকতে না চাইলে করতে পারেন।যে বেশি জানে তাকে জানোয়ার না বলে সবজান্তা বলে কেন?

মো. শফিউল আলম

বি এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।

যাতে আপনাদেরও জানাতে পারে।কান টানলে মাথা আসে, কিন্তু পেট টানলে—

মো. রাব্বি

চরডাঙ্গা, চাঁদপুর।

লজ্জা আর সেই সঙ্গে হাসি।মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, না প্রকৃতি মানুষের ওপর নির্ভরশীল?

মুহম্মদ রায়হান শাহ

রাজাপুর, জাহেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর।

প্রকৃতির ডাকের ওপর নির্ভরশীল তো বটেই।আমি কি আট মণের মতো খাবার আর ছয় মণের মতো পানি পান করতে পারব?

সুরভী দে

বিয়ানীবাজার, সিলেট।

কেন পারবেন না, আপনি তো সারা জীবনে এর চেয়ে অনেক বেশিই খাবেন।চাল নিয়ে চালবাজি কীভাবে বন্ধ করা যায়?

ইমরান মাহমুদ

বালিয়াকান্দি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

অন্য কিছু বাজানো শুরু করতে হবে। যেমন তৈলবাজি।নেতা ও অভিনেতার মধ্যে পার্থক্য কী?

রিগ্যান বৈদ্য

পিকে পাল সুজন, বন্দর মেডিকো, বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম।

অভিনেতার অভিনয় বোঝা যায়, কিন্তু নেতারটা বোঝা যায় না।জাতিসংঘ এখনো বিশ্ব বোমা হামলা দিবস পালন করছে না কেন?

আশফিকুর রহমান

ঢোলদিয়া, সালেহা মার্কেট, ময়মনসিংহ।

ব্যাপারটা কি জঙ্গিদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেবে না?বাবা ও দাবার মধ্যে পার্থক্য কী?

ইয়াছিন খন্দকার

খন্দকারবাড়ি, উত্তর জয়লস্কর, ফেনী।সব বাবা

বাবা নয়, কিছু ভণ্ড বাবাও আছে। পুলিশ
মারামারির পরে আসে কেন?
মোবারক হোসেন
সাগরদিঘি, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
আগে আসলেও একই ব্যাপার হতো।। একটা
মানুষ সারা জীবন কোন জিনিসটা লালন করে?
উম্মে কুলসুম
নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।
মৃত্যুর আশঙ্কা। কোনটা ভালো, তালা না চাবি?
কেশব চক্রবর্তী
করেরপাড়া, সিলেট।
আপনার জন্য, না ভদ্রলোকের জন্য? গাধার কি
কোনো দুঃখ আছে?
আলী আজম
বুড়িশ্চর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
আছে, তাদের সারা জীবন গাধার মতো খাটতে
হয়। যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের
বাতি...?
কাজী মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ
নাজির রোড, ফেনী।
কোনো সমস্যা নেই, এমনিতেও লোডশেডিং
অমনিতেও লোডশেডিং। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে
পার্থক্যটা কোথায়?
প্রদীপ চক্রবর্তী
সেনবাগ, নোয়াখালী।
এ ধরনের প্রশ্নকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা সব
সময় আব্বাকে বাজে বকেন কেন?
বায়জীদ হোসাইন
মাদার বখশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
এ এমন কিছু না, গৃহকর্তার একধরনের
ফিটনেস টেস্ট। ডিকশনারি না হয়ে ডিকশপুরুষ
হলো না কেন?
শেখ জাকারিয়া আমিন
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
ছেলেরা কি আর এত কিছু মনে রাখতে
পারে? দিন যায় আর আমারও আশা বেড়ে যায়,
কেন?
কামরুল হাসান
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
কোথাও হয়তো শুনেছেন, মানুষ তার আশার
মতো বড়, তাই। মন্ত্রীরা বেশি টাকা আয় করেন
কেন?
সামিন ইয়াসির হাসান

নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনা।

ক্ষমতা হারানোর পর পাঁচ বছর নিশ্চিন্ত থাকার
জন্য। চোখ বন্ধ করে কী দেখা যায়?

মো. গোলাম আযম

কাহালু, বগুড়া।

চোখ খুলে যা দেখা যায় না। বিশ্ব ভালোবাসা
দিবস বছরে একবার আসে কেন?

মো. ফারুক মিয়া

নয়াপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

বাকি দিনগুলোয় যাতে ভালোবাসার ক্ষেত্র
তৈরিতে ব্যস্ত থাকতে হয়। শিক্ষা জাতির
মেরুদণ্ড, আর অর্থ—

এস এম হেদায়েত হোসেন

আজাদীবাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সেই মেরুদণ্ড সোজা বা কার্যকর রাখে। সব রোগ
সারে, কিন্তু প্রেমরোগ সারে না কেন?

মো. জাহিদ হাসান

ব্রি আবাসিক এলাকা, গাজীপুর।

কেন সারবে না, বিয়ে করিয়ে দিলে কত
কঠিনতম প্রেমও সেরে গেছে সমূলে। সবাই
ক্ষমতায় এলে আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে
যায় কেন?

সোলায়মান হায়দার

হাটিকুমরুল, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।

তখন পারিবারিক ও দলীয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্যস্ত
থাকতে হয়। কেউ ধনী হয়, কেউ গরিব হয়;
আবার কেউ ভিক্ষা করে কেন?

মো. এলাহী মিয়া

যাতাকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা।

যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে বা সবাই ব্যস্ত
থাকার জন্য। রাজনীতি শব্দের অর্থ কী?

বেলাল আহমেদ

পিটিআই, মুন্সিগঞ্জ।

অনেক অর্থই আছে, তবে সুবিধাবাদীদের
কর্মস্থল হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। পুলিশ চোর-
ডাকাত ধরতে গেলে বাঁশি বাজায় কেন?

মো. সজীব আকন্দ

ভাবলা, বেলাব, নরসিংদী।

যাতে পুলিশের হাতে পড়ার আগেই চোর
নিরাপদে চলে যেতে পারে। ডাক্তার আর
ডাকাতের মধ্যে মিল কোথায়?

মফিজুর রহমান

রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর, সমাজবিজ্ঞান

বিভাগ।

দুজনই মুখোশ পরে অপারেশনে নামে। বিয়ের সময় ছেলেরা নেয় যৌতুক, আর মেয়েরা নেয় কী?

মাইনউদ্দিন সোহাগ

দিনাজপুর সদর, কোতোয়ালি, দিনাজপুর।

যৌতুকের মালিককে। মেয়েরা ছেলেদের দিকে না তাকালেও ছেলেরা বারবার ঘুরে তাকায় কেন?

আলিয়া সাকিনা

নিউ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

মেয়েরা তাকায় কি না দেখার জন্য। অন্যান্য দেশের রাজনীতিবিদেরা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা পান না কেন?

রিগ্যান বৈদ্য

বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম।

আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা পুরস্কারের আশায় রাজনীতি করেন? নিজের বউয়ের রান্না আর কাজের বুয়ার রান্নার মধ্যে পার্থক্য কী?

আকাশ

দক্ষিণ শাহজাহানপুর, বাগানবাড়ি, ঢাকা।

একটা খেয়ে চুপ থাকতে হয়, আরেকটা চুপ করে খেতে হয়। দিন তো নিজেই বদলে রাত হয়, তবুও কাজবদলের কথা না বলে দিনবদলের কথা বলা হয় কেন?

সাদিয়া আফরোজ

সাভার ক্যান্টনমেন্ট, সাভার।

কাজ বদল করলে তো চাকরি চলে যাবে, আর দিনবদল হলে তো বেতন আসবে। গার্লস স্কুলে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ছেলেরা পড়তে পারে, এরপর পারে না কেন?

সামা হাসান

কল্যাণপুর, ঢাকা।

তাহলে গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? পৃথিবীর সব ঘড়ি নষ্ট হলে কী হতো?

শাহাদাত হোসেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার নতুন করে ঘড়ি আবিষ্কার করতে

হতো। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, আইনের গতি কতটুকু?

জহীর উদ্দিন লস্কর

লোকপ্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেটাও তার নিজের মজির ওপর নির্ভর করে। আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর—কেন?

মো. আব্বাস উদ্দিন

সরকারী এমএম কলেজ, যশোর।

দুজনেরই ঘর ভাঙ্গা হলে কীভাবে হবে, একটা ঘর হলে দুজনেই সেখানে থাকতে পারবেন, তাই। দুঃখ আমার সঙ্গী-সাথি, দুঃখের রং কী দিয়ে আঁকি?

মো. নাজিম উদ্দিন

লাঠির বাড়ি, মধ্যম কধুর খাল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ওয়াটার কালার দিয়ে। মোবাইল ফোন কোম্পানি ঘন ঘন কলরেট পরিবর্তন করে কেন?

শেখ সাদী

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

নিজেদের ওপর আস্থা নেই তো, তাই। বাংলাদেশের মানুষ এত বোঝে, তার পরও তাদের কোনো অগ্রগতি নেই কেন?

জাবেদুর রহমান

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বেশি বোঝে তো, তাই কাজে লাগানোর সময় পায় না। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—

দুজনের মধ্যে কে সুন্দর?

নিপা

কামাল হাজারী রোড, ফেনী।

ছেলেটা সুন্দর। মেয়েটা সুন্দরী। কোন প্রশ্ন করলে প্রশ্নটি সেরা প্রশ্ন হবে?

প্রীতম বড়ুয়া

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

যা-ই করেন, তবে এটা না নিশ্চিত। কুকুরের লেজ কোনো দিন সোজা হয় না কেন?

মাইশা নূর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কে বলল সোজা হয় না, লেজে রশি বেঁধে কুকুরকে ঝুলিয়ে দিন। মোবাইল ফোন কোম্পানি রাতে কম রেট দেয় কেন?

মো. শহীদুল ইসলাম

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

অন্ধকারে টাকা-পয়সার হিসাব করতে ঝামেলা হয় তো। হেডফোনকে সোজা করে পকেটে রাখলেও সর্বদা তাতে প্যাঁচ লেগে যায় কেন?

সাম্ম শারায়ী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সোজা করে পকেটে রাখলেন মানে? আপনার
পকেট কত লম্বা? শেখ হাসিনা নির্বাচনে জেতার
পর তাঁকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ দেওয়া হলো না
কেন?

আল-আমিন

পশু হাসপাতালের ভেতরে, ঝিনাইদহ।

পুরো দেশটাই হাতে তুলে দেওয়া হলো, আবার
ম্যান অব দ্য ম্যাচ! সরকারের কাজটা কি?

তানজিলা জাহান

পশ্চিম মাদার বাড়ি, চট্টগ্রাম।

বিরোধীদল যাতে খুব বেশি বিরোধীতা করতে
না পারে সেটা দেখা। মানুষের পাখির মতো ডানা
থাকলে কী হতো?

সৈকত চৌধুরী

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

কন্ডাক্টরদের উড়ে উড়ে ভাড়া কাটতে

হতো। উত্তর যেন পাই ব্যাটা, নইলে—

শাহবাজ রহমান

ধানমন্ডি, ঢাকা।

বন্যার মতো প্রশ্ন পাঠাতে থাকব। কোনো কিছু
লেখার জন্য কালি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় কেন?

আইনুন তাহমিয়া

কাঁটাবন, ঢাকা।

এখন কিন্তু শুধু কালি নয়, কি-বোর্ড আর

প্রিন্টারও অনেক ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজনীতি ও

দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য কী?

রিপন মাহমুদ

বাঘা, রাজশাহী।

রাজনীতি দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু দুর্নীতি

রাজনীতির ওপর নয়। নাই মামার চেয়ে কানা

মামা থাকা ভালো কেন?

সঞ্জয় কুমার মুখার্জি

পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কানা মামার পকেট মারলেও মামা দেখতে পারে

না যে! আমাদের দেশে নদী ও খাল

দখলকারীদের কখনো কারাগারে ভরা হয় না

কেন?

তাহমিয়া

কাঁটাবন, ঢাকা।

ভয়ে, পরে যদি কারাগারও দখল করে

ফেলে! মানুষ কোন সময়টা বেশি ভালো কাটায়?

হুমায়ূন কবির

ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

ফেলে আসা সময়।পানি না পান করলে কী হবে?

পাপিয়া

আদালত রোড, কুমিল্লা।

কী আর হবে, জল অন্যদিকে গড়াতে শুরু করবে।আমাদের দেশে চোর-ডাকাত ও ছিনতাইকারী এত বেশি কেন?

নুজহাত চন্দ্রিমা

লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনার দেশ যে।সবুরে মেওয়া ফলে কখন?

ইয়াছির আরাফাত

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সবুর করেন, মেওয়া ফলতে শুরু করেছে।

বিরোধী দল সরকারের যেকোনো কাজের বিরোধিতা করে কেন?

এ এইচ এম সোহেল

সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নামের প্রতি সুবিচার করার জন্য।ফ্যাশন শো আর রোড শোর মধ্যে পার্থক্য কী?

হিজল

মিরপুর, বিষ্ণুপুর, গাইবান্ধা।

ফ্যাশন শো অন্তত রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি করে না।মন্ত্র ও মন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য কী?

মো. ফারুক হোসেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

বিপদে পড়লে মন্ত্রীও মন্ত্রের শরণাপন্ন

হন।ডাক্তার এলে রোগী কেন অর্ধেক ভালো হয়ে যায়?

খন্দকার জাকারিয়া ইসলাম

কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়া, হামদহ, ঝিনাইদহ।

ফি ও ওষুধের খরচ কমানোর জন্য।শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য কী?

জাহিদুল ইসলাম রুমন

ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

শিক্ষক সবকিছু জানা সত্ত্বেও সব সময়

ছাত্রছাত্রীর কাছেই ভালো ফলটা আশা

করেন।কোন বৃত্তি কেউ চায় না?

সন্ধ্যা

হিসাবরক্ষক, নট্রামস, বগুড়া।

পশুবৃত্তি।ব্যাকরণের কারকের বাইরে কি আর কোনো কারক আছে?

তামজিদুল আজম

বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

অবশ্যই আছে; বলকারক, আবিষ্কারক

ইত্যাদি। কোষের ভেতরে ‘জিন’ থাকে, তাহলে

ভূত থাকে কোথায়?

সাইমুম সাদিক

টিকিয়া পাড়া, ঠাকুরগাঁও।

কোষের বাইরে। অন্য পাখির তুলনায় কাক

মানুষের মাথায় বেশি ইয়ে করে কেন?

ইয়াকুব

সরকাপুর, গৌরীপুর, কুমিল্লা।

কাকসমাজে মানুষের মাথাকে জাতীয় টয়লেট

ঘোষণা দেওয়া আছে বলে। ছেলেরা বিয়ের জন্য

পাগল হয় কেন?

মুখলেছুর রহমান চৌধুরী

চান্দুরাবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

অন্য সমস্যাগুলো যাতে ঢাকা পড়ে। আমরা তো

দেখি এক দলের পর অন্য দল ক্ষমতায় আসে;

তাহলে নির্বাচনের দরকার কী?

শামীমা আফরোজ

পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও।

আগের দলকে মেয়াদ শেষের বিষয়টি জানানোর

জন্য। মানুষ ‘বিষ’ খায়। উনিশ বা একুশ খায় না

কেন?

জয় সাহা

উপশহর, রাজশাহী।

বিষ খেয়েও মরে না আবার উনিশ-

একুশ। আমরা চোখ থাকার পরও কী দেখি না?

আশরাফুল আলম

আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

লোডশেডিংয়ের সময় লাইটের

আলো। ‘জন্মনিয়ন্ত্রণ’ পদ্ধতি আছে, কিন্তু

‘মৃত্যুনিয়ন্ত্রণ’ পদ্ধতি নেই কেন?

মোহাম্মদ আলী খন্দকার

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

নামকরণ জিনিসটা তাহলে কী? কোকিল কাকের

বাসায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে কেন?

পূজা দত্ত

কুমিরা, চট্টগ্রাম।

কাক কষ্ট করে বাসা বানায় তো, তার

পুরস্কার। যদি শান্তিতে থাকতে চাও, তবে—

সায়েক অনু

টালিপাড়া, কুষ্টিয়া।

শান্তিতে রাখো। মশা মানুষের রক্ত খায়, বাঘও
মানুষের রক্ত খায়। তাহলে কে বেশি হিংস্র?

মিজানুর রশীদ খান
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

মশা, কারণ মশা বাঘের রক্তও খায়। পিতা-
পুত্রের বয়স নিয়ে অঙ্ক দেখা যায়, কিন্তু মাতা-
কন্যার বয়স নিয়ে অঙ্ক নেই কেন?

ছোবায়েল আরাফি
খিলগাঁও, ঢাকা।

ছিঃ মেয়েদের বয়স নিয়ে কথা বলতে হয় না,
খোকা। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কেন?

ফারজানা ইসলাম
ফরিদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর।
ধন-সম্পত্তির দুশ্চিন্তা একটু কমে তো,
বুদ্ধিবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ডাক্তার আর
রোগীর মধ্যে পার্থক্য কী?

আরিফ
হাতিরপুল, ঢাকা।

ডাক্তার আসার আগে মাঝে মাঝে রোগীকে মারা
যেতে শুনলেও রোগী আসার আগে ডাক্তারকে
সাধারণত মরতে শোনা যায় না। ‘অতি ভক্তি
চোরের লক্ষণ’—অতি ডাক্তারের লক্ষণ কী?

রেজওয়ানা আফরিন
এমএম কলেজ, যশোর।

অতি চুরি। খেজুরে আলাপ হয়, কিন্তু নারকেলে
আলাপ হয় না কেন?

সুস্মিতা হাসান
মহিন্দ্রা, মাহিগঞ্জ, রংপুর।

খেজুর এত ছোট তাও আলাপ শেষ হয় না,
নারকেলে আলাপ হলে বোঝেন কী হবে! বিয়ের
সময় বর মুখে রুমাল দেয় কেন?

পুষ্প
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯।

কাজ একটু এগিয়েরাখে। দুদিন পরেই তো
চোখের কাছে নিতে হবে। ছেলেরা মেয়েদের
দিকে তাকালে দোষ, আর মেয়েরা ছেলেদের
দিকে তাকালে?

মোজাক্কের আহমেদ ইয়াছিন
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ছেলেদের গুণ। বিয়ের পর আমি চিরকালের তরে
কী মিস করছি, বলুন তো?

মিসেস শিখা দেবী
চিড়াকান্দি আ/এ, হবিগঞ্জ।

আপনি ‘মিস’ শব্দটাকে চিরকালের তরে মিস
করছেন। রাস্তায় সিগন্যাল বাতির কাজ কী?

মাহমুদ শাওন

কোতোয়ালি, যশোর।

ট্রাফিক পুলিশ যাতে সময়মতো বাঁশি বাজিয়ে,
হাত নেড়ে গাড়ি থামাতে পারে। সবজাত্তা
বিভাগটি এত জনপ্রিয় কেন?

তিতুন সেন

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

অনেক কিছু জানা যায় তো, তাই। মানুষ জিবে
কামড় দেয় কেন?

জাকিয়া সুলতানা

পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

জিব আছে কি না, মাঝেমধ্যে পরীক্ষা করে
দেখে। সবার সন্তান যেন থাকে দুধে—

মাহাবুবা শারমিন

কালকিনি, মাদারীপুর।

ভাতের অভাবে। টাকার কুমির হতে চাইলে কী
করতে হবে?

আজম খান

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।

খাল কেটে কুমির আনতে হবে। বিরোধী দল
সংসদে যায় না কেন?

মো. শাহাদাত হোসেন

কালিয়াপাড়া, সখীপুর, টাঙ্গাইল

তাহলে রাজপথে বিরোধিতা করবে কে? জল

আর তেল কখনো মেশে না—এই কথাটা আমরা
কখন উপলব্ধি করি?

মো. হাসানুজ্জামান

মৌবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

বাংলা ছায়াছবির মাঝামাঝিতে। বাস পানিতে,
ট্রেনে-ফ্যাক্টরিতে আগুন, তারপর কী?

আহমেদ হোসাইন

নয়াবাড়ি, সাভার, ঢাকা

তারপর আর কী, কিছুদিন গরম গরম নিউজ,
এরপর সব ঠান্ডা। সরকারি দল ও বিরোধী
দলের এই কাদা-ছোড়াছুড়ি কবে নাগাদ বন্ধ
হবে?

গাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম

চকবাজার, চট্টগ্রাম।

যত দিন তাদের হাতে কাদা থাকবে, তত দিন
শেষ হবে না। সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ কোনটি?
এম আতাউর

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, রাঙামাটি।

অপরাধী জেনেও ভোট দেওয়া। এত প্রশ্নের
উত্তর কি মন থেকে আসে, না মাথা থেকে? এস
হোসাইন

সূত্রাপুর, ঢাকা।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আবার মাথা লাগে?

এগুলো তো চারপাশ থেকেই আসে। দুর্নীতি
থেকে বাঁচার উপায় কী?

মাসুদুর রহমান

দত্তপাড়া, সদর, লক্ষ্মীপুর।

এই প্রশ্নের উত্তর এমনি এমনি দেওয়া যাবে
না। চা-পানের পয়সা নিয়ে আসেন। ঘুমের ঘোরে
বাচ্চা শিশুরা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে কেন?
রবি রফিক

ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

স্বপ্নে নিজের ভবিষ্যৎ দেখে। তালগাছ এক পায়ে
দাঁড়ানো, তাহলে অন্য পা-টি কোথায়?

ইরানী রিতু

মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

বিশ্রাম নিচ্ছে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা
ভালো, আবার দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল
ভালো—কোনটা বেছে নেব?

অমিত কুমার ভদ্র

কুঠিবাড়ি, কোতোয়ালি।

যখন যেটা কাজে লাগে, সেটাই বেছে
নেবেন। বলুন তো সরকারকে কী বলে প্রশংসা
করি?

মিল্টন দাশ

আযমখান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা।

যথেষ্ট প্রশংসা কিন্তু করে ফেলেছেন দাদা। সবার
রোল এক হয় না কেন?

শাকিলা

কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কানাইপুর, ফরিদপুর
এক-এ সবাই সন্তুষ্ট হতে পারে না যে। প্রেমে
পড়লে ছেলেরা বোকা হয় আর মেয়েরা?

মাসুদ রানা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বোকাদের সামাল দেয়। মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক
ডাকে কেন?

মো. ইকবাল হোসেন

চৌমুহনী, নোয়াখালী

দিনের বেলায় ব্যস্ততার কারণে পারে না। শুধু
মেয়েরাই কেন পরি হয়?

ছালেম মৌলা

গুরুদয়াল কলেজ রোড, কিশোরগঞ্জ।

ছেলেরা হলে পর হয়ে যায় তো, তাই। চাঁদকে
সবাই মামা ডাকে কেন?

সুবীর চাকী

কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

এত উপরে একজন মামা থাকলে যদি কিছু হয়,
এই ভেবে। দেশ আগে, না বাড়ি আগে?

উত্তম কুমার বিশ্বাস

মাগুরা সদর, মাগুরা।

ঠিকানায় লিখতে গেলে অবশ্যই বাড়ি আগে
লিখতে হয়। রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ—এই
দুইয়ের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী?

তানভীর মাহমুদ খান

চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর।

অসিতে না মসিতে? ‘স্ট্যাচু অব লিবার্টি’র হাতে
আলো ও বই কেন?

বর্ষণ হোসেন

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

লিবার্টি যাতে স্ট্যাচু হয়ে না থাকে। ঠেলার নাম
যদি বাবাজি হয়, তাহলে দাদাজি কিসের নাম?
সিদু সিকদার

মণিপুর, মিরপুর।

ঠেলার বাবার নাম। সব সময় বিরোধী দল দেশ
ও জনগণের চিন্তা করে কেন?

খালিদ হোসেন খান

টেংরা রোড, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

সরকারি দল সময় পায় না যে! সমুদ্রের পানি ও
চোখের পানি—দুটিই লবণাক্ত, তাহলে পার্থক্য
কোথায়?

মো. সাইফুল ইসলাম

নীলফামারী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নীলফামারী।

লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ চলাচলে। দ্রব্যমূল্য দ্রুতই
বাড়ছে, কিন্তু জনগণের মূল্য যাচ্ছে কোথায়?

উর্মি

আমলাপাড়া, জামালপুর।

জনগণের মূল্য, কী বলছেন আপা? মানুষ দুনিয়ার
জন্য পাগল কেন?

হাসান

বারুর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

যথেষ্ট পরিমাণ পাগলাগারদ থাকার

কারণে। মানুষের জীবনে কোনটা বেশি

প্রয়োজন—টাকা, না সম্মান?

সোনিয়া আলম

শান্তিনগ

498) ভালোবাসার শতকরা হিসাব - লিওনিদ সোমনিন

আমাদের পরিচয় হয়েছিল লাইব্রেরিতে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে আমার ভারি মনে লেগে যায়। চেহারায়ে একটু কঠোর ভাব, আত্মসংযমের অভিব্যক্তি তাতে স্পষ্ট। ঠিক আমার যেমন পছন্দ।

বই জমা দিতে মেয়েটি যখন দাঁড়িয়েছিল লাইনে, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার পেছনে। তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়ার কোনো ছুতো আমার তৈরি করা ছিল না আগে থেকে। আমি সরলভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বইটা কেমন লেগেছে আপনার?’

‘এটা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ,’ মেয়েটি উত্তর দিল। ‘পাঠকদের মধ্যে করা জরিপ অনুযায়ী জনপ্রিয়তার নিরিখে বইটির স্থান চতুর্থ। এই বইয়ের পাঠকদের মধ্যে কর্মজীবী নারীর সংখ্যাই বেশি, যাঁদের অধিকাংশেরই উচ্চশিক্ষা নেই।’

‘মজার ব্যাপার তো! আপনি এত সব খবর কোথেকে জানেন?’

‘আমি তো সমাজবিজ্ঞানী।’ এরপর আমাদের বারকয়েক দেখা হয়েছে লাইব্রেরিতে ও লাইব্রেরির বাইরে; এবং প্রতিবারই আমি সামাজিক জীবনসংক্রান্ত সংখ্যাবহুল নানাবিধ তথ্য জেনেছি। একদিন আমরা গেলাম সিনেমা দেখতে।

‘ছবিটা তোমার পছন্দ হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

‘আমার ধারণা, ছবিটা মাঝারি গোছের ব্যবসা করবে।’

‘তা বুঝলাম, কিন্তু ছবিটা তোমার পছন্দ হয়েছে কি না, বলো।’

‘ছবিটা দেখবে বড়জোর ১০-১২ মিলিয়ন দর্শক।’

‘কিন্তু তোমার নিজের...’

‘সাধারণ দর্শকদের চাহিদা মেটাতে ছবিটা তৈরি করা হয়নি বলে অনেকেই দ্বিতীয়বার দেখতে উৎসাহ বোধ করবে না।’

‘তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?’

‘কারণ, আমি একজন সমাজবিজ্ঞানী।’ এরপর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো অনেক দিন বাদে। একেবারেই হঠাৎ করে।

‘আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তোমার হুট করে উবে গেল কেন?’ সে জানতে চাইল।

‘অথচ তুমিই না বলেছিলে, আমি তোমার পছন্দের মেয়ে...’

‘কারণ গত বছর বিয়ের তুলনায় ডিভোর্সের সংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশ।’

‘আর এ বছর?’

‘সাড়ে ২৮ শতাংশ।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ’, সম্মতি জানিয়ে বলল সে।

‘আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ চরিত্রের বৈসাদৃশ্য।’

তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। তা

যা-ই হোক না কেন, সে কিন্তু ছিল খাঁটি

সমাজবিজ্ঞানী। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,

জানুয়ারী ১০, ২০১০

499) লাইনবাজি

লাখো বঙ্গজনতাকে বিশ্বকাপ টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে দেখার পর লিখেছেন রাজীব হাসানপুলিশ লাইন হাসপাতালে জন্ম হয়েছিল তাঁর। নবজাতককে দেখতে লাইন ধরে ভিড় করেছিলেন মামা-খালা-ফুফুরা। মনে আছে, তিনি প্রথম হাঁটতে শিখেছিলেন রেলিংয়ের লাইন ধরে। স্কুলে ভর্তি নামের এক মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল লাইনে। অবশেষে শত-সহস্র প্রতিযোগীকে টপকে তিনি সুযোগ পেয়ে যান পুলিশ লাইন স্কুলে।

একটু বড় হলে পরে ‘লাইন’ শব্দটির মাহাত্ম্য অন্যভাবে ধরা দেয় তাঁর কাছে। অ্যানালগ টেলিফোনের সেই যুগে লাইনে ক্রস কানেকশনে এক সন্ধ্যায় অপরিচিতা এক সম্মোহনী কণ্ঠস্বরের সামনে মুখোমুখি করে দেয় তাঁকে। পাশের বাড়ির রুকসানার বদলে তিনি লাইন মারতে শুরু করেন সেই অপরিচিতার সঙ্গেই। বিদঘুটে হস্তাক্ষরে লাইনটানা খাতায় আঁকাবাঁকা লাইনে লেখেন প্রেমের কাঁচা কাব্য। কখনো নির্জন রেললাইনে হাতে হাত রেখে হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বোনা।

কিন্তু স্বপ্ন নামের লাইনটার শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে

থাকে বাস্তবতা। অচিরেই সেই প্রেমময়
সম্পর্কের লাইন কাটা পড়ে অপটিক্যাল
ফাইবারের মতো। সেই অপরিচিতার বাবা বিদ্যুৎ
অফিসের লাইনম্যান হলেও দুই নম্বর লাইনে
প্রচুর টাকা কামিয়ে ধনবান হয়েছেন। বাংলা
সিনেমার সেই চিরায়ত ‘স্টোরি-লাইন’ খেটে
গেল তাঁর জীবনেও। মুখে কদিনের না-কামানো
দাড়ি আর রুখু রুখু চেহারা নিয়ে সেই
অপরিচিতার বাড়ির সামনে গিয়ে একদিন তিনি
গাইলেন, ‘আজ দুজনার দুটি লাইন ওগো দুটি
দিকে গেছে বেঁকে।’

জীবনের লাইন যে কখনোই সরল রেখা মেনে
এগিয়ে যায় না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলেন, তাঁর জীবনের
অভিধানে শুধু একটাই শব্দ বড় করে লেখা: ল-
এ আকার, হুস্বই আর দন্ত্য-ন—লাইন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দৌড়ে লাইন, হল জীবনে
খাবারের ক্যানটিনে লাইন, বেতন জমা দিতে
ব্যাংকে লাইন, গোসলের জন্য বাথরুমে লাইন,
ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকের অনুকম্পা পেতে তাঁর
অফিস রুমের সামনে লাইন...বিশ্ববিদ্যালয়
জীবন শেষে সনদ তুলতেও লাইন।

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে লাইন। বসের
মন জোগাতেও লাইন। প্রমোশনে লাইন,
ডিমোশনেও লাইন। চাকরি জীবনে বেতন
তোলার জন্য আবারও সেই লাইন। লাইনে
লাইনময়।

এরপর একদিন সমাজের বেঁধে দেওয়া লাইন
অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে যেতে সিঙ্গুলার
থেকে প্লুরাল নাম্বার হয়ে যাওয়া, ব্যাচেলর ডিগ্রি
বিসর্জন দিয়ে গলায় গামছা বেঁধে দাঁড়ানো
ছাদনাতলায়। যেখানে সাতপাকের এক চক্রাকার
লাইনে ঘুরপাক খেয়ে শুরু করা সংসার জীবন।
সেখানেও লাইনের সংকট। গ্যাস লাইনে গ্যাস
নেই। পানির লাইনে কেবল বাতাস। কারেন্টের
লাইনের কথা না তোলাই ভালো।

লাইনের ধাক্কায় লাইনচ্যুত হয়ে আবারও ট্রাকে
ফেরার অদম্য বাসনায় জীবনের আয়ু ক্ষয় করে
ফেলা। এরপর একদিন লাইন দেওয়া
চিকিৎসকের চেম্বারে, পিজি হাসপাতাল কিংবা
বারডেমে। এবং অবশেষে একদিন লাইন ধরে
শুয়ে থাকা আজিমপুরে...চির শান্তির নিদ্রায়!
এই ‘তিনি’টা কে, কে তিনি, যাঁর জীবনের

পরতে পরতে এভাবে মিশে আছে তিন অক্ষরের
একটা শব্দ—লাইন! একটু ভেবে দেখুন, ভালো
করে ভেবে দেখুন। এই তিনিটা কি আপনি
নিজেও নন? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
জানুয়ারী ১০, ২০১০

500) হয় রে টিকিট!

সারা জীবন বেলাইনে চলে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের
টিকিটের দেখা পেতে কয়েক দিনের জন্য
একেবারে লাইনে চলে এসেছিল আমাদের
তরুণ প্রজন্ম। এদেরই একজন আদনান
মুকিত। টিকিটের জন্য তিনি এক রাত ঠায়
দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যাংকের সামনে। কিন্তু দেখা
মেলেনি টিকিটের ভাউচারের। তার বয়ানে শুনুন
সেই হিমরাত্রির কথা—বাংলাদেশে এই
প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হবে, আর আমি
ঘরে বসে মুড়ি খেতে খেতে খেলা দেখব, তা
কিছুতেই হতে পারে না। যেভাবেই হোক,
আমাকে মাঠে যেতেই হবে। ২ তারিখ থেকে
টিকিট বিক্রি শুরু হবে, তাই ঠিক করলাম ১
তারিখ রাত থেকেই ব্যাংকের সামনে খাম্বার
মতো দাঁড়িয়ে থাকব। কিন্তু দুপুর থেকেই লাইন
শুরু হয়ে গেল। তা-ও যেনতেন লাইন নয়,
একেবারে বিশাল লাইন। আমাদের মাথা খারাপ
হওয়ার মতো অবস্থা। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে শেষ
পর্যন্ত ধানমন্ডি শাখার লাইনে দাঁড়ানোর
নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলাম। রিকশা থেকে ব্যাংকের
সামনে নামতেই বিশাল এক জনগোষ্ঠী চিৎকার
করে উঠল, ‘দৌড়া, বাঘ আইল।’ আমি চমকে
উঠলাম। বাঘের ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দেব, নাকি
রিকশার ভাড়া দেব, তা ভাবতে ভাবতেই আসল
ঘটনা বোঝা গেল। ‘দৌড়া, বাঘ আইল’ নামের
একটি দল বিশ্বকাপের টিকিট কিনতে এসেছে।
তাদের স্লোগানই ‘দৌড়া, বাঘ আইল’। দৌড়ের
চিন্তা বাদ দিয়ে আমি রিকশার ভাড়া দিলাম।
ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, বাঙালি আর
ডিসিপ্লিন, দুটো বিপরীত শব্দ। এখানে এসে
দেখলাম, ঘটনা তা নয়। এ-বি-সি-ডি গ্রুপ করে
শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ।
প্রত্যেকের হাতে নাম আর সিরিয়াল নম্বর লেখা
টোকেন। টিকিট কিনতে আসা কিছু তরুণ এই
টোকেনের উদ্যোক্তা। আমিও টোকেন নিয়ে
লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সিরিয়াল ২৩৫। হিসাব
করে দেখলাম, একজনকে দুটো করে দিলেও

আমি টিকিট পাব। টোকেন পেয়ে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে হলো। একজন তো বিশ্বকাপের টিকিটের ভাউচারের টোকেন পেয়েছি—এই বলে ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিয়ে দিল। ভালোই লাগল। আরও ভালো লাগল খবরের কাগজের ব্যবহার দেখে। খবরের কাগজ যে কত উপকারী, তা লাইনে না দাঁড়ালে বুঝতামই না। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে যখন সবার হাঁটুর বাটি ব্যথা হয়ে গেল, তখন সবাই খবরের কাগজ বিছিয়ে ফুটপাতে বসে পড়ল। আমি ভাবতাম রস+আলো কোনো কাজেই আসে না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আরামে বসার জন্য রস+আলোকেই বেছে নিল অনেকে। বাঙালিকে বসতে দিলে শুতে চায়। এখানেও তা-ই হলো। বসার একটু পরই সবাই চিৎ-কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর গাড়ির হর্নের সঙ্গে আরও একটি আওয়াজ পেলাম; পাবলিকের নাক ডাকার সুমধুর আওয়াজ। চমৎকার পরিবেশ। কেউ কেউ কার্ড খেলছে। মশাদের গানে উদ্ভুদ্ধ হয়ে অনেকে গানের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। কয়েকজন রাস্তায় ফুটবল খেলা শুরু করল। হঠাৎ জনগণের বন্ধু পুলিশের গাড়ি আসায় আমরা ভাবলাম, তারাও বুঝি ফুটবল খেলবে। কিন্তু পুলিশ ফুটবল বোঝে না। গাড়ি থেকে নেমেই অফিসার বললেন, ‘এই কাজটা করা যাবে না। আপনারা বসেন, কার্ড খেলেন, চা-পানি খান, কিন্তু রাস্তায় ফুটবল খেলা যাবে না।’ কী আর করা, ফুটবলাররা খেলা বন্ধ করে দিল। পুলিশের গাড়ি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হলো খেলা। রাত যত দীর্ঘ হয়, ঠান্ডা বাতাস তত কাছে আসে। কোনোভাবেই ঠান্ডা বাতাসকে দাবিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, বাতাসকে কেউ টাকা-পয়সা দিয়েছে, যাতে আমরা লাইন ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আমরাও কঠিন চিজ। কষ্ট যখন করেছি, কষ্ট আরও করব, কিন্তু টিকিট না নিয়ে বাসায় ফিরব না। আবারও বন্ধ হয়ে এগিয়ে এল খবরের কাগজ। কাগজ জ্বালিয়ে শীত থেকে বাঁচার আশ্রয় চেষ্টা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে অনেক খবরের কাগজ ‘জ্বালাও-পোড়াও’ করা হয়েছে। এই সুযোগে আমরাও বেশ কিছু খবরের কাগজকে ছাইয়ে পরিণত করলাম। দি অ্যাশেজ!

গভীর রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি

স্বল্পদৈর্ঘ্য মারামারি অনুষ্ঠিত হলো। সাধারণত কোথাও ভালো কাজ হলে একটি বিশেষ মহল কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। প্যাঁচ লাগানোর চেষ্টা করে। এখানেও একটি বিশেষ মহল (যারা পরে এসেছে) প্যাঁচ লাগানোর চেষ্টা করল। তাদের এক দাবি, এই লাইন মানি না। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। এরকম অবুঝ সবুজদের জন্য ইকবিগুরু লিখেছেন, ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা...। অবুঝের দল ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পারলে ঠেকা! সেই কখন থেকে এতগুলো লোক লাইন দিয়েছে, আর তারা এসে সামনে দাঁড়াবে! কেউই এটা মেনে নিতে পারল না। শুরু হলো হাতাহাতি। তারপর সিরিয়ালে থাকা সবাই মিলে বিশেষ মহলকে ধাওয়া দিল। জয় হলো ডিসিপ্লিনের! আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা একটা শিক্ষা হতে পারে যে পাবলিক খেপলে খবর আছে।

সকালবেলা লাইন আরও বিশাল আকার ধারণ করল। অনেকে টাকা-পয়সা খরচ করেও মানববন্ধনের জন্য মানব জোগাড় করতে পারে না, আর এখানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কী সুন্দর মানববন্ধন হয়ে গেছে! সবার অপেক্ষা, কখন ব্যাংক খুলবে। ব্যাংকগুলো কেন আরও আগে খোলে না, এ নিয়ে সবার মধ্যেই প্রকাশ পেল তীব্র ক্ষোভ। সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকায় এমনিতেই সবাই একটু উত্তেজিত, তার ওপর মানুষের অদ্ভুত প্রশ্ন মেজাজ আরও খারাপ করে দিল। একজন লাইন দেখে প্রশ্ন করল—
ভাই, এটা কিসের লাইন?

এটা মানুষের লাইন (উত্তরদাতা বিরক্ত)।
আপনারা লাইনে দাঁড়িয়েছেন কেন?
সিনেমা দেখতে লাইনে দাঁড়িয়েছি। নাম মনের মানুষ। মারাত্মক অ্যাকশন মুভি। পয়েন্টে পয়েন্টে মারামারি। আপনি দেখবেন (প্রচণ্ড বিরক্ত)?

একটু পরপর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের লোক আসছে। ফাঁকিবাজ ছাত্ররা যেভাবে দুই-তিনটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে যায়, তারাও দুই-তিনটা প্রশ্ন মুখস্থ করে এসেছে।

—আপনি এখানে কেন এসেছেন?

—কখন থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছেন?

—আপনার কেমন লাগছে?

রস+আলোতে দুই প্রশ্নের একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হতো। চ্যানেলের লোকগুলো হয়তো ওটা দেখে খুবই অনুপ্রাণিত। তা না হলে ওই তিনটি প্রশ্ন ছাড়া তাদের মাথায় আর কোনো প্রশ্ন এল না কেন? তা-ও সবাই একই প্রশ্ন করে।

চ্যানেলের লোগোটাই একমাত্র ভিন্নতা।

১০টা বাজতেই ব্যাংক খুলে গেল। সবাই নড়েচড়ে দাঁড়াল। সাড়ে ১০টার দিকে লাইনের প্রথম তিন-চারজন ব্যাংকে প্রবেশ করল। সময় চলে যায়, রাস্তার জ্যাম ছুটে যায়, কিন্তু তারা আর বের হয় না। আমরা ভাবলাম, বিশ্বকাপের টিকিট বলে কথা, ব্যাংকে নিশ্চয়ই চা-নাশতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়।

ব্যাংকের সার্ভার কচ্ছপগতির। তার ওপর ফরম হাতে লিখে পূরণ করতে হয়। সব মিলিয়ে একজনের জন্যই আধঘণ্টা। অবশেষে একজন ভাউচার নিয়ে বেরিয়ে এল। দেখে মনে হলো, এভারেস্ট নয়, সে সেভেন সামিট জয় করেছে। জাফরউল্লাহ শরাফতের ভাষায় বলতে গেলে, এ এক চরম ঐতিহাসিক মুহূর্ত, জাতির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সে ভাউচার ক্রয়ের খ্যাতি অর্জন করল। তাকে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন...!

কিন্তু ওই একজনই। সকালের নাশতা হজম হয়ে গেল, কিন্তু আর কেউ বের হয় না।

অনেকক্ষণ পরপর একজন করে বের হয় আর চ্যানেলের লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরে। তারপর সেই এক প্রশ্ন—

টিকিট পেয়ে আপনার কেমন লাগছে?

এটা টিকিট নয়, ভাউচার। ভালো লাগছে। আমি খুবই আনন্দিত...আমার খুবই ভালো লাগছে...

বেলা দুইটা পর্যন্ত টিকিট পেয়েছে মাত্র চার-পাঁচজন। আমার সিরিয়াল ২৩৫। কোনো আশা নেই। তা-ও ঝিম ধরে রইলাম। আমাদের এক বন্ধু তলপেটের ব্যথায় আহত—অবসর নিয়ে বাসায় কস্মলের নিচে অবস্থান নিয়েছে।

কয়েকজনের আবার পরদিন চূড়ান্ত পরীক্ষা।

একজনের বিষয় ‘মানসিংহ ভবানন্দ’।

আরেকজনের বিষয় ‘এডিটিং’। সবকিছু মিলিয়ে আমরা ইনিংস ঘোষণা করলাম। মানে এই লাইন ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার বাসের লাইন

ধরলাম। বিশ্বকাপের টিকিট পাইনি তো কী হয়েছে, সিটিং বাসের টিকিট তো পেয়েছি। শুধু তা-ই নয়, পেছনের দিকে ভাঙাচুরা একটা সিটও পেলাম। বেশ ভালো লাগল। সারা রাত ঘুমাইনি। সিটে বসে ঝিমাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম সিটি ব্যাংকের ভেতরে। সোফায় আরামে বসে আছি। ব্যাংকের কর্মীরা ব্যস্ত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একজন বললেন, ‘মামা, টিকিট!’ আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। টিকিট পাওয়া গেছে! খুশি হতে গিয়ে তাকিয়ে দেখি বাসের চেকার দাঁড়িয়ে আছে। ‘মামা, টিকিটটা দেখান।’ আমি টিকিট দেখালাম। দূর!

মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় ভয়ানক জ্যাম। আবার ঝিমুনি আসতেই বন্ধুর ফোন। কোনোমতে বললাম, হ্যালো।

দোস্তু, টিকিট পেয়েছি।

আমি বাসের ভেতরেই চিৎকার করে উঠলাম।

ইয়েস! কয়টা পেয়েছিস?

২২টা।

কোন কোন খেলার?

আরে, খেলার টিকিট না তো, কনসার্টের টিকিট। বিকেলে কনসার্টে যাবি না?

মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কোথায় বিশ্বকাপ আর কোথায় কনসার্ট! একটা মিরপুর স্টেডিয়াম, আরেকটা আর্মি স্টেডিয়াম।

দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় এলাম। টিকিট পাইনি—কোথায় সবাই সান্ত্বনা দেবে, তা না, উল্টো বকাঝকা শুরু করল।

আগেই বলেছিলাম পাবি না, পরীক্ষার পড়া ফেলে শুধু শুধু গেলি কেন? রেজাল্ট খারাপ হলে হাড়ি গুঁড়া করে দেব।

এত লোক টিকিট পেল, তুই পেলি না কেন? তুই ভাত খাস না?

তা-ও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু কেউ যখন ফোন করে বলে, কিরে, তুই টিকিট পাসনি?

হেঃ হেঃ হেঃ, আরে আমি তো পেয়েছি। আট ম্যাচের ১৬টা—এটা কি সহ্য করা যায়? আরে ব্যাটা, পেয়েছিস ভালো, আমাকে বলার দরকার কী? ভেবেছিলাম, দুঃখ ভুলতে সাগরপাড়ে ঝিম মেরে বসে থাকব। কিন্তু আমি নিশ্চিত, সেখানে যাওয়ার টিকিটও পাব না। দূর। লেখা এখানেই শেষ। তবে শেষ করার আগে বলছি, একজন

মুমূর্ষু ক্রিকেটপ্রেমীকে বাঁচাতে বিশ্বকাপের
টিকিট প্রয়োজন। আগ্রহীরা অতিদ্রুত যোগাযোগ
করুন। আত্মমানবতার সেবায় এগিয়ে
আসুন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী
১০, ২০১০

501) হাসির গল্প - বনফুল

খুব ছোট ছোট করিয়া মাথায় চুল ছাঁটা, স্থানে
স্থানে মাংস বাহির করা। উহার উপর মাথা ও
কপাল বেষ্টন করিয়া কয়েক ফেরত
টোয়াইনজাতীয় সুতা বেশ জোরে বাঁধা থাকাতে
রগের শিরাগুলি স্ফীত এবং চক্ষু দুইটি লাল।
এইখানেই বিসদৃশতার শেষ হয় নাই। রোমশ
নাসারন্ধ্রে কফ ও নস্য মিলিয়া দৃষ্টিকটুতার সৃষ্টি
করিয়াছে, এবং তাহা কয়েক দিনের না-কামানো
দাড়িগোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি সৃজন
করিয়াছে, তাহা মাধুর্যময় নহে।
বারান্দায় একটি শিশু তারস্বরে চিৎকার
করিতেছে। ঘরের ভিতর আর একটি মেয়ে
রোগশয্যায় শায়িত।
কৃত্তিবাস, ওরে কিতে—
রক্তচক্ষু তুলিয়া ভদ্রলোক ঘরের দিকে
চাহিলেন।
কিতে—
কৃত্তিবাসের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।
উচ্চতর কণ্ঠে পুনরায় ডাকিলেন, কিতে—
কেহ আসিল না।
সগর্জনে, ওরে শালা কিতে—
গর্জনে রোগশয্যায় শায়িত মেয়েটির নিদ্রাভঙ্গ
হইল এবং সেও কাঁদিতে লাগিল। ক্ষীণ স্বরে
একটানা ধরনের কান্না। বারান্দার শিশুটি আগে
হইতেই কাঁদিতেছিল। এ ক্ষীণ কণ্ঠে নয়,
জোরেই। দুই প্রকার ক্রন্দনের প্রভাবে ভদ্রলোক
আরও চটিয়া গেলেন। কণ্ঠস্বর অসম্ভব রকম
চড়াইয়া ক্ষেপিয়া তিনি চিৎকার করিতে
লাগিলেন, কিতে, কিতে, কিতে—ওরে শালা!
ফলোদয় হইল।
কিতে আসিল না বটে, আসিলেন
হরিদ্রালাঙ্ঘিতবসনা স্থূলাঙ্গিনী একটি মহিলা।
তাহাতেই ফল ফলিল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ
অত্যন্ত নরম হইয়া গেলেন এবং অপ্রতিভভাবে
মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। মহিলাটি কিন্তু
কিছুমাত্র নরম এবং কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া
রোষকষায়িত লোচনে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিলেন।

তাহার পর একটি হাত কোমরে দিয়া অপর হস্তটি আঙ্গালন করতঃ সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারখানা কি, পাড়া যে মাথায় তুলেছ! আমতা-আমতা করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, গরম জলটা—

গরম জলটা! আমার কি দশখানা হাত! তোমাকে তো বলিনি। কিতে কোথা গেল? কিতে গেছে বাজারে।

সকালে তাকে একবার বাজারে পাঠিয়েছিলে না? আবার পাঠিয়েছি।

ও।

ইহার বেশি আর কিছু বলিতে ভদ্রলোক ভরসা করিলেন না। এমন সময় স্বয়ং কৃতিবাস আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল এবং বলিল, পাঁচ-ফোড়ন এনেছি মা।

ভদ্রলোক আরক্ত নয়ন দুইটি কৃতিবাসের কুণ্ঠিত-নয়নে স্থাপিত করিতেই কৃতিবাস বলিল, জল এখুনি করে আনছি বাবু, হয়ে গেছে বোধ হয়, চড়িয়ে দিয়ে এসেছি।

কৃতিবাস চলিয়া গেল। মহিলাটি বাহির হইয়া গেলেন ও যাইবার সময় বারান্দায় ক্রন্দন-নিরত শিশুটির পৃষ্ঠে দুমদুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিলেন, খালি বায়না, খালি বায়না, খালি বায়না! পোড়ারমুখী মেয়ে হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে আমার!

ক্রন্দন ঘোরতর হইয়া উঠিল। রুগ্ন মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, বড্ড মাথা ব্যথা করছে বাবা।

স্ত্রীর যে রণচণ্ডী মূর্তি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এখন কিছু বলা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নিজেই উঠিয়া গিয়া টেম্পারেচারটা লইলেন। দেখিলেন জ্বর বাড়িয়া ১০৫০ হইয়াছে।

খানিকক্ষণ থার্মোমিটারটার পানে নিবন্ধদৃষ্টি থাকিয়া হরিহরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন।

পাশ ফিরে শো, চেষ্টাসনি।

পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুয়ারে কড়কড় শব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল।

হরিহরবাবু কপাট খুলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই দেখিলেন— মুদি বিল আনিয়াছে।

বলিলেন, পরশু দেব, আজ হাতে কিছু নেই।

কটুভক্তি করিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

জল এনেছি বাবু।

পিছন ফিরিয়া হরিহরবাবু দেখিলেন, কেৎলিহস্তে কুণ্ঠিত কৃতিবাস দাঁড়াইয়া আছে। গামলা-টামলা আন।

কেৎলি নামাইয়া কৃতিবাস চলিয়া গেল এবং বড়-গোছের গামলা ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। হরিহরবাবু নিজেই ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ মনোমত হইয়াছে কি না। দেখিলেন, হয় নাই। পুনরায় খানিকটা গরম জল ঢালিতে যাইতেছিলেন এমন সময় অসুস্থ মেয়েটি বমি করিতে শুরু করিল।

ওরে কিতে— দেখ তুই ওকে—

কৃতিবাস মেয়েটিকে সামলাইতে লাগিল।

হরিহরবাবু ঠাণ্ডা জল গরম জল ঠিকমত মিশাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন, ওকে শুইয়ে দে। একবার তুই আমার ছোট টেবিলটা আর কাগজ কলম দিয়ে যা তো।

হরিহরবাবু একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া গরম জলে পা দুইটি ডুবাইয়া ফুটবাত লইতে লাগিলেন। কৃতিবাস কাগজ কলম দোয়াত ও টেবিল দিয়া গেল।

চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে, বারান্দায় ঝন্ডনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিহরবাবু বাম হস্তে রগ দুইটি টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়াছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। অকুণ্ঠিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম। বনফুল: কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি, যাঁর আসল নাম বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মণিহারীতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। কৈশোরে যখন লেখালেখি শুরু করেন তখন শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের নাম লুকাতে তিনি বনফুল ছদ্মনাম ধারণ করেন। ব্যক্তিজীবনে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে ও মৃত্যু ১৯৭৯ সালে।

502) একটি টেলিফোন - সিমু নামের

টেলিফোনের দোকানটি রাস্তার পাশেই।

দোকানে যিনি বসে আছেন তিনি মধ্যবয়স্ক। যত্ন করে কলপ করলেও জুলফির দিকে বেশ কিছু পাকা চুল কাশফুলের মতো ঝুলে আছে। মূলত দোকানটি চালায় তাঁর ভাইপো ফয়সাল। চার দিন হয় সে টাইফয়েডে বিছানায় পড়ে আছে। তাই ভাইপোর অনুরোধে সকালে দোকানে এসে বসেছেন তিনি। মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় দোকানে এখন আর কেউ তেমন ফোন করতে আসে না। আসে সবাই মোবাইলে টাকা ভরতে।

কয়েকজন কাস্টমার বিদেয় করে দিয়ে তিনি সবে পত্রিকাটি মুখের সামনে ঝুলিয়ে উপসম্পাদকীয় পাতায় ছাপা হওয়া ‘সামষ্টিক অর্থনীতি ও আমাদের বোরো ধানের ভবিষ্যৎ’ শিরোনামের নিবন্ধটি পড়তে শুরু করেছেন, তখনই দোকানের স্লাইডিং ডোরটা আন্তে করে খুলে গেল। উঁকি দিল গোলগাল সুন্দর এক কিশোরীর মুখ। দরজায় দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞেস করল, ‘টিঅ্যান্ডটি ফোন আছে?’

‘আছে’ বলে ফোনটি একটু এগিয়ে দিলেন ফয়সালের চাচা। মেয়েটির ওপর এক নজর চোখ বোলালেন। বয়স ১৮ কি ১৯। জামাকাপড় দেখে মনে হচ্ছে গার্মেন্টসে কাজ করে। তবে হাতে একটা বেশ সুন্দর ঘড়ি। গার্মেন্টসের মেয়েদের হাতে এমন ঘড়ি খুবই বেমানান। মেয়েটি ডায়াল করা শুরু করেছে। ‘হ্যালো’ বলতেই ফয়সালের চাচা কান খাড়া রেখে পত্রিকাটি আবার চোখের সামনে ঝুলিয়ে দিলেন।

মেয়ে: হ্যালো, এটা কি লোপা ম্যাডামের বাসা?

মহিলা: (অপর প্রান্তে) হ্যাঁ। বলছি।

মেয়ে: ম্যাডাম, স্লামালিকুম। আমি শুনলাম আপনার নাকি একজন কাজের মেয়ে লাগবে, যে আপনার বাচ্চার দেখাশোনা করবে।

আমাদের বস্তির একজন আপনার নম্বরটা আমাকে দিল।

মহিলা: না, আসলে দরকার ছিল। কিন্তু আমি তো একজন মেয়েকে পেয়ে গেছি।

মেয়ে: ম্যাডাম, প্লিজ, আমার একটা কাজ খুব দরকার। ওই মেয়েকে যে টাকা দেন আমাকে তার অর্ধেক দিলেও হবে।

মহিলা: না, আমি যাকে পেয়েছি সে তো খুব ভালো। আমি অফিসে চলে গেলেও কোনো টেনশন করতে হয় না বাচ্চাকে নিয়ে। সে তো খুবই ভালো মেয়ে। তাকে ছাড়াই কীভাবে?

মেয়ে: (আরও করুণ কণ্ঠে) ম্যাডাম, আমাকে কাজটা দিলে ওই বেতনেই আপনার বাচ্চা দেখার পাশাপাশি আমি ঘরটাও মুছে দেব, সিঁড়িগুলো ঝাড়ু দিয়ে দেব, ফুলের টবে পানি দিয়ে দেব। আপনি যা যা বলবেন, তাই তাই করে দেব।

মহিলা: না, আমার লাগবে না। ওই মেয়েকে আমি ছাড়াব না। তুমি অন্য কোথাও দেখো। বলে খট করে ফোন নামিয়ে রাখলেন তিনি। এদিকে সুন্দর একটা হাসি দিয়ে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল মেয়েটি। ফয়সালের চাচা মুখের সামনে থেকে পত্রিকাটি নামিয়ে মেয়েটির দিকে করুণ চোখে তাকালেন। তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে আছে। আহা রে, এত সুন্দর ঝকঝকে একটা মেয়ে। এই বয়সে কোথায় তার স্কুল-কলেজে যাওয়ার কথা, কিন্তু কাজের জন্য কী কাকুতি-মিনতিটাই না করল! মহিলা তাকে নিলই না। ফয়সালের চাচা: এই মেয়ে, তোমার নাম কী?

মেয়ে: রাহেলা।

চাচা: খুব সুন্দর নাম। তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না যে তুমি মানুষের বাসায় কাজ করো। পড়াশোনা করেছ?

মেয়ে: ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি। পরে আর পড়তে পারি নাই।

চাচা: তোমার জন্য খুবই খারাপ লাগছে। আচ্ছা, আমার বড় বোনের বাসায় একজন বাচ্চা দেখার জন্য মেয়ে খুঁজছিল। তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার বড় বোনের বাসায় কাজ দিতে পারি। আমাকে কয়েক দিন আগে বলছিল। ফোন নম্বর আছে। তুমি নিজেই কথা বলতে পারো।

মেয়ে: না, থ্যাংক ইউ, চাচা; লাগবে না আমার।

চাচা: কিন্তু একটু আগেই না বললা যে তোমার খুব দরকার! তুমি তো আর একটু হইলে ওই কাজের জন্য কেঁদেই দিতে।

মেয়ে: না, চাচা, আমার আসলে কাজের দরকার নাই। আমি আমার পারফরম্যান্স দেখতেছিলাম। আমি লোপা ম্যাডামের বাসাতেই কাজে ঢুকছি

এক সপ্তাহ হয়। উনি আমার কাজে খুশি কি না সেটা যাচাই করলাম খালি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ৩১, ২০১০

503) উল্টো জন্ম

গ্রামের এক বড়সড় বাজার। মানুষজনের আগমন, বেচাকেনার ধুমধাম; আর পকেটমার, চাপাবাজ, টাউট-বাটপারের আনাগোনাও কম নয়। সেই বাজারের এক কোণায় একটু নিরিবিলিতে দুই-তিনটি হোটেল। সেই হোটেলগুলোর একটার ভেতরে বসে হোটেলমালিক ও তাঁর এক বন্ধু গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিলো। তখন একটা লোক বড় একখানা ধামা হাতে করে হোটেলের সামনের রাস্তায় দাঁড়াল। তার থুতনিতে ছাগলা দাড়ি, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ কোটরগত, মাথা ভর্তি টাক। দেখতে অনেকটা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া পেশাদার সাক্ষীর মতো। লোকটি ইতি-উতি তাকাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সে কাউকে খুঁজছে। হোটেলমালিকের বন্ধু বললেন, ‘লোকটা চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মতলব সুবিধার নয়।’ হোটেলমালিক বললেন, ‘না, কারও জন্য অপেক্ষা করছে। তাই আগন্তকের পথের দিকে বারবার উদগ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে।’ হোটেলমালিকের বন্ধু বলল, যেভাবে তাকাতাকি করছে, তাতে একে একটু প্যাঁচে ফেলা যায় না? একটু রগড় তো হবে! হোটেলওয়ালা: ‘চেহারা দেখে মনে হয় সহজ মাল নয়। তবে যেভাবে বে-আক্কেলের মতো হাবভাব করছেন, তাতে ভালোমতো বিপদে ফেলা যায়। তবে তা না করে রগড়ের ঢঙে একটু চিকনে মাইর দিয়া কিছু আদায় করা যায়।’ বন্ধু: চাঁদাবাজির যুগে বুদ্ধিটা মন্দ নয়। হোটেলওয়ালা বন্ধুকে নিয়ে বাইরে আসেন। বাইরে আসার আগে বাবুর্চিকে ডেকে গোশতে খুশবুদার মসলা দিয়ে বাগার দিতে বলেন। ফলে অল্প সময়েই রান্না করা গোশতের গন্ধে চারদিক ম-ম করতে থাকে। হোটেলমালিক ছাগলদাড়ি টাকমাথার কাছে গিয়ে বললেন, ‘ওই মিয়া, ক্ষিদে লাগছে? হইটালের ভিতরে আইসা অর্ডার দেন, যা খুশি খান। তারপর বিল মিটাইয়া চইল্যা যান। তা না কইরা রাস্তায় খাড়াইয়া অর্ধেক খাওন খাইতেছেন।

এইডা কী কারবার!’

লোকটি: অর্ধেক খাওন খাইতেছি মানে? আমি একজন মানুষের জন্য খাড়াইয়া আছি।

হোটেলমালিক: মিয়া, ফাঁকতালে অর্ধেক ভূরিভোজনের তালে আছেন তা বুঝি না মনে করছেন? জানেন না ঘ্রাণ শুকলে অর্ধভোজন হয়ে যায়! দাম ফ্যালান।

লোকটা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে যায়। দৃষ্টি কঠোর, চোয়াল শক্ত এবং চেহারা প্রচণ্ড আস্থা। ফিচকে হাসি হাসে। তারপর বলল, ‘ও ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন’-এর সেই গল্প? রান্নায় জিহ্বায় পানি আনা গন্ধ তো ঠিকই পাচ্ছি। নাক সুখ পাচ্ছে, কিন্তু উদার তো চোঁ চোঁ করেও পাচ্ছে না কিছু!’ এই বলে সে কুঁচকানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে আটআনা পয়সা বের করে হোটেলওয়ালার কানের কাছে কয়েকবার টং-টং করে বাজিয়ে বলল, ‘আমার নাকের সুখানুভূতিতে অর্ধেক ভোজন যদি হয়ে থাকে, তাহলে পয়সার টং-টং শব্দ কানে শুনে তোমারও অর্ধেক দাম পাওয়া হয়ে গেছে। ইবার ফুট। গিরিজি কইরো মানুষ চিনা।’ গ্রামবাংলার রঙ্গরসের গল্প থেকে সংগৃহীত শামসুজ্জামান খান

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ৩১, ২০১০

504) বিড়ালের দিনপঞ্জি

দিন ৭৫২

আমার অত্যাচারীরা আমাকে বরাবরের মতোই উত্ত্যক্ত করে চলেছে। দড়ি বা সুতোর ডগায় একটা কিছু বেঁধে আমার নাকের সামনে দোলাতে থাকে! আমার সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে! তারা নিজেরা গপগপ করে মাংস গেলে আর আমার বরাতে জোটে ট্যাবলেটের মতো শুকনো কী সব! খিদের ঠ্যালায় ওসবই খেতে হয়। তবে কোনো একদিন নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতে পারব—এই স্বপ্ন দেখি আর সহ্য করে যাই এসব অনাচার। তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার অবশ্য একটা আছে। বাড়ির কোনো আসবাবের একটা অংশ খামচে বা কামড়ে নষ্ট করে ফেলতে পারলে প্রভূত আনন্দ লাভ করা যায়। আগামীকাল টবের একটা গাছ খেয়ে ফেলব। যত বিশ্বাসই হোক! দিন ৭৬১

উদ্যোগটা ব্যর্থ হয়ে গেল। অত্যাচারীদের

একজন হাঁটছিল যখন, তার দুই পায়ে
মাঝখানে ঢুকে পড়ছিলাম বারবার। একবার
পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়েছে। সে যখন
সিঁড়ি বেয়ে নামবে, তখন আরেকবার প্রয়োগ
করে দেখব এই পদ্ধতি। অত্যাচারীদের বিবমিষা
জাগাতে নিজেই বমি করে দিলাম আর্ম চেয়ারের
ওপর। প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল না। কাল
তাদের বিছানার ওপর বমি করব। দেখি, লাভ
হয় কি না। দিন ৭৬৩

সারাটা দিন ঘুমোলাম রাতে তাদের ঘুমের
চোদ্দটা বাজাতে। সারা রাত ম্যাও ম্যাও করব,
খাবার চাইব। দিন ৭৬৫

ইঁদুর ধরে ফেললাম একটা। ধরে ধড় থেকে
মাথা আলাদা করে নিলাম। তারপর ইঁদুরের
মাথাহীন শরীরটা টেনে নিয়ে গেলাম

অত্যাচারীদের দেখাতে: ‘দেখো! আমি কতটা
ভয়ংকর হতে পারি।’ ভেবেছিলাম, ভয়ে আতঙ্কে
শিউরে উঠবে তারা। কিসের কী! বরং আমাকে
কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলতে থাকল,
‘কী দারুণ বিড়াল আমাদের!’... হুমম! জলে
গেল সমস্ত পরিকল্পনা। দিন ৭৬৮

আমার অত্যাচারীদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র নগ্নভাবে
প্রকাশিত হলো আরও একবার। স্পষ্ট কোনো
কারণ ছাড়াই আমাকে ‘গোসল’ নামের এক
ভয়াবহ শাস্তি-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হলো
(নাৎসিদের ক্যাম্পে কি এভাবে অত্যাচার করা
হতো?)। আর শুধুই কি গোসল, ‘শ্যাম্পু’ নামের
কী এক রাসায়নিক তরল পদার্থও প্রয়োগ করা
হলো তাতে! কেবল বিকৃত রুচি ও অসুস্থ
মস্তিষ্কের কারও পক্ষেই এমন তরল পদার্থ
আবিষ্কার করা সম্ভব। একমাত্র সান্ত্বনা—এক
অত্যাচারীর বুড়ো আঙুলের এক টুকরো মাংস,
যা এখনো আমার দাঁতের ফাঁকে আটকে
আছে। দিন ৭৭১

আজ আমাকে একাকী এক ঘরে আটক রেখে
পাশের ঘরে কী সব হইচই চলল। বাইরের
লোকও ছিল জনা কয়েক। এখান থেকেই আমি
বিদঘুটে গন্ধ পেলাম। নিশ্চয়ই তারা গিলছে
একধরনের পানীয়, যাকে তারা বিয়ার বলে!
কান পেতে আমি তাদের কথাবার্তাও শুনলাম
এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এল আমার
কানে: আমাকে এখানে বন্দী করে রাখার
কারণ—উপস্থিত এক অতিথির ‘অ্যালার্জি’ আছে

বিড়ালে। অ্যালার্জি ব্যাপারটা কী, জানতে হবে
এবং সুযোগ বুঝে সেটার প্রয়োগ করতে
হবে। দিন ৭৭৪

এই অত্যাচারীদের কিছু কার্যকলাপ দেখলে
পিত্তি জ্বলে যায়! এই যেমন, আমার ভাষার ভ-
ও জানে না, তবু আমার সঙ্গে কথা বলার কী
আকুল চেষ্টা! কী সব শব্দ করে মুখ দিয়ে এবং
নিশ্চয়ই ভাবতে থাকে, আমি তাদের কথা
পরিষ্কার বুঝতে পারছি! গর্দভের দল! মাঝে-
মাঝে অবশ্য আমার ভাষায় ম্যাও-ম্যাও করার
চেষ্টাও করে। তবে উচ্চারণের যা ছিри! হাসি
চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ওদের এতই যখন
শখ, তাই ভাবছি, ওদের জন্যই বিড়ালীয়
ভাষাশিক্ষা কোর্স খুলব। প্রচুর পরিমাণে মাছ,
মাংস আর দুধের বিনিময়ে পড়াব। তবে এই
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব কীভাবে, তা নিয়ে
পরে ভাবা যাবে। দিন ৭৭৮

আমি ছাড়া এই বাড়িতে আরও দুটো বন্দী
আছে। দুটোই বোকার হৃদ এবং চাটুকার।
কুকুরটার কথাই ধরা যাক। তাকে মাঝেমধ্যেই
ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় এবং সবচেয়ে
অবাক কাণ্ড এই যে সে নিজে খুশিমনে বাসায়
ফিরে আসে, অত্যাচারীদের হাত-পা চেটে
আনন্দ প্রকাশ করে! দেখে ঘেন্না ধরে যায়। এত
গবেট কেউ হয়! আর ওই যে পাখিটা, ওটা তো
পুরোদস্তুর স্পাই! সে অত্যাচারীদের কদাকার
ভাষা শিখে নিয়েছে এবং প্রায়ই দেখি আলাপ
করে তাদের সঙ্গে! আমি নিশ্চিত, আমার সমস্ত
গতিবিধি ও কাজকর্মের বিশদ রিপোর্ট সে দেয়
আমার শত্রুদের কাছে। চালিয়ে যাক সে! সময়
আমারও আসবে। এই মুহূর্তে সে খাঁচার ভেতরে
বলে নিরাপদে আছে। ব্যাপার না। আমি
অপেক্ষায় থাকব। ভাষান্তর: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ৩১,
২০১০

505) নৈরাশ্যবাদী

একদা এক নৈরাশ্যবাদীর ভাগ্য অপ্রসন্ন হলো।
কলমের কালি লেপ্টে গেল তার সদ্য কেনা দামি
সুটে। দাগ দূর করার যাবতীয় অধ্যবসায়
পরিণত হলো পণ্ড্রমে। দাগ আরও প্রসারিতই
হলো শুধু। মাথায় হাত দিয়ে বসল নৈরাশ্যবাদী।
‘আমি আগেই জানতাম, কাপড়ের জাতই না
এটা! কালি শুষে নেয় স্পঞ্জের মতো!’

প্রতিবেশীরা তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল,
'এ তো নেহাতই মামুলি ব্যাপার! সুযুটটা নিয়ে
যান ড্রাই ক্লিনার্সে। ওরা দাগ দ্রুত তুলে
ফেলবে।'

'ড্রাই ক্লিনার্সের দৌড় আমার জানা আছে!' স্পষ্ট
বিরক্তি প্রকাশ পেল নৈরাশ্যবাদীর কণ্ঠে।

'কাজের কাজ তো কিছুই করতে পারে না,
খামোখা কাপড়চোপড় আটকে রাখে মাসের পর
মাস...'

তবে উপায়ান্তর না দেখে প্রতিবেশীদের
উপদেশে কর্ণপাত করবে বলে মনস্থির করল
সে।

তারপর এক ঘণ্টা বাদেই বগলের তলায় সুটটি
চেপে ধরে ড্রাই ক্লিনার্স থেকে ফিরে এল।

'কী, দাগ দূর হয়েছে?' প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস
করল সহানুভূতির সুরে।

'হয়েছে!' কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বিরসবদনে
বলল নৈরাশ্যবাদী। 'আমাদের এই পোড়া দেশে
কালিও ঠিকমতো বানাতে পারে না!'¹ লেখকের
নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারী ৩১,
২০১০

506) বই পরিচিতি - আদনান মুকিত

প্রচ্ছদ

এ অংশে সুন্দর একটা ছবির ওপর বড় করে
বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম লেখা থাকে।

সহজ বাংলায় একে বলা হয় 'প্রচ্ছদ'। প্রচ্ছদটা
দিয়ে বোঝানো হয় যে এটা বইয়ের শুরু, এদিক
থেকেই পাতা ওল্টাতে হবে। তা না হলে

অনেকেই পেছন দিক থেকে বই শুরু

করত। প্রিন্টার্স লাইন

ভালো-খারাপ যা-ই হোক, প্রচ্ছদ দেখেই সবার

মনে হয়, 'প্রচ্ছদটা কে করেছে?' এ প্রশ্নের

উত্তর থাকে এই পাতায়। যে প্রকাশক বইটি

প্রকাশ করেছেন, তাঁর নাম-ঠিকানাও লেখা

থাকে এ পাতায়। আর পুরো বইয়ের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি এখানে লেখা থাকে। সেটি

হচ্ছে বইয়ের দাম। উৎসর্গ

সাধারণত এ পাতায় কিছু ব্যক্তির নাম লেখা

থাকে, যাঁদের আমরা চিনি না। অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এ পাতার মাধ্যমে লেখকের

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পছন্দের মানুষের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভূমিকা

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। পুরো বইটি না পড়েই কেউ একজন বই সম্পর্কে ভালো ভালো কিছু কথা লেখেন এই অংশে। একে ভূমিকা বলা হয়। পাতা গাছের পাতা নয়, এটি বইয়ের পাতা। তবে গাছের পাতায় যেমন অসংখ্য শিরা থাকে, বইয়ের পাতায়ও থাকে অসংখ্য কালো কালো অক্ষর। গাছের পাতার মতো বইয়ের পাতায়ও পোকা বাসা বাঁধে। দেশের ঝালমুড়ি সম্প্রদায়ের কাছে বইয়ের পাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃষ্ঠা নম্বর পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি পাতায় নম্বর দেওয়া থাকে। নম্বর থাকায় বইটি মোট কত পৃষ্ঠার, তা আর কষ্ট করে গুনতে হয় না। ফিতা বইয়ের মাঝখানে একটি চিকন ফিতা থাকে।

ভাব নেওয়ার জন্য এই ফিতার গুরুত্ব অপারিসীম। বইয়ের পাতার ফাঁকে ফিতাটি রেখে সহজেই বোঝানো যায় যে বইটা পড়া হচ্ছে। পুট আলমারিতে কায়দা করে রাখার জন্য এ অংশটি ব্যবহৃত হয়। এ অংশে বই ও লেখকের নাম লম্বালম্বিভাবে লেখা থাকে। ফলে পড়ার জন্য বইটি বের করা ঠিক হবে কি না, তা বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়। ফ্ল্যাপ

বইয়ের এ অংশটিকে আদর করে ‘ফ্ল্যাপ’ নামে ডাকা হয়। সাধারণত এ অংশে লেখক দূরদিগন্তে বেশ ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছেন—এ টাইপের একটি ছবি থাকে। ছবির নিচে ফটোগ্রাফারের নামও থাকে, যাতে ছবি খারাপ হলে লেখক তাঁর ওপর দোষ চাপাতে পারেন। লেখক সম্পর্কে যত ভালো ভালো কথা বলা সম্ভব, তার সবই ফ্ল্যাপে উল্লেখ করা হয়।

লেখক কী কী লিখেছেন, কয়টি পুরস্কার পেয়েছেন, বাংলা সাহিত্যকে তিনি কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন—এসব ফ্ল্যাপে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। অতিচালাক লেখকেরা ফ্ল্যাপের লেখাগুলো নিজে লিখে ‘কাছের বন্ধুরা’ নাম দিয়ে বোঝাতে চান, লেখাটি তিনি লেখেননি। বর্তমানে এ স্টাইলটি বেশ জনপ্রিয়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৭, ২০১০

507) বইরঙ্গ - শওকত হোসেন

এক বালিকার সঙ্গে অনেক দূর যাওয়ার কথা ছিল। চাণক্য সেনের পুত্র পিতাকে বইটি পড়তে দিয়েছিলাম। সেই বই পড়ে বালিকার পিতাই মুগ্ধ হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে কত বই যে

পড়তে নিয়েছিলেন! সেই বই একটাও আর ফেরত পাইনি, মেয়েটাকেও দেননি।

লেখাটা আসলে এতটুকুই। এই গল্পে বালিকা আছে, ভিলেন আছে, প্রেম আছে, বিরহও আছে। কিন্তু এইটুকু গল্পে তো পৃষ্ঠা ভরবে না। আরও বড় গল্প লাগবে। তাহলে আরেকটা গল্প বলি। স্মৃতিকথা ধরনের গল্প।

পাঠক হিসেবে আমি সর্বগ্রাসী। চোখ খোলার পর থেকেই আমার সঙ্গে বইয়ের বসবাস। আমার মায়ের ছিল বইয়ের একটা সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালায় বেশির ভাগই ছিল নিমাই, নিহাররঞ্জন, ফাল্গুনী আর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আমার ফুফাতো ভাই তখন আমাদের সঙ্গে থাকে। তার থাকার মেয়াদ যত বাড়তে লাগল, মায়ের বইয়ের সংগ্রহ তত ছোট হতে লাগল। আর পাশের বাসার মিলি আপার বই পড়ার নেশা তত বাড়তে লাগল। সেই যুগে প্রেমে পতন ঘটতে বইয়ের বড় ভূমিকা ছিল। মায়ের বই বেহাত হওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম আরও প্রায় ১০ বছর পর। চাচা মারা যাওয়ায় চাচাতো ভাই পান্না ভাই তখন গ্রাম থেকে শহরে, আমাদের বাসায়। সেই যুগে গ্রাম থেকে এলেও মেয়েরা প্রেমে পড়ত। এই নিয়ম মেনে পান্না ভাইয়ের প্রেমে পড়ল পাশের বাসার লিপি আপা। লিপি আপাদের বই সংগ্রহশালাটি বিশাল। আমি সুযোগের অপচয় করলাম না। বই আনা ও ফেরত দেওয়ার মধ্যে অসংখ্যবার সিস্টেম লস হতে লাগল। আশাপূর্ণার প্রথম প্রতিশ্রুতি এখনো আমার শেলফে শোভা পায়। এটা আসলে একটা বিরহের গল্প। পান্না ভাইয়ের বউয়ের নাম লিপি না। এই বিশাল বিরহপূর্ণ প্রেমকাহিনির মধ্যে কেবল আমারই লাভ (মুনাফা অর্থে) হয়েছিল।

এবার একটা ঐতিহাসিক প্রেম-বিরহের গল্প। নাতি নানাকে বই পড়তে দেখে জানতে চাইল, নানা, তুমি কী বই পড়ছো? নানা বলল, ইতিহাসের বই। নাতি বলল, মিথ্যে কথা। তুমি একটা বড়দের প্রেমের উপন্যাস পড়ছো।

এবার নানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওটা তো আমার জন্য ইতিহাসই, নানাভাই। ২.

এবার বই লেখার গল্প। কেউ বই যদি না-ই লিখবে, তাহলে পড়ব কী? বড়রা আফসোস

করে বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বই পড়ে না। কিন্তু বইমেলায় যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় এবং বিক্রি হয়, তাতে কথাটি ধোপে টেকে না। সুতরাং নতুন নতুন লেখক তৈরি হচ্ছে। এখন তো নতুন লেখক তৈরির নানা সুযোগ। একজন নতুন লেখকের গল্প বলি।

তাঁর সঙ্গে দেখা এক সেমিনারে। পরিচয় হতেই জানালেন তিনিও লেখক। জানতে চাইলাম, কোথায় লেখেন।

—ফিল্মাস।

—কোন কোন পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে লেখেন।

—ইন ফ্যাক্ট ইন্টারনেটে।

এখন তো ইন্টারনেট ব্লগের মতো লেখালেখির নানা মাধ্যম হয়েছে। খুশি হয়ে জানতে চাইলাম, সেখানে কোথায়?

—অ্যাজ অ্যা ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, আমি বাংলায় লিখি না, ইংলিশে।

—তা কোন সাইটে বা ফোরামে বা ব্লগে লিখছেন?

মেয়েটি উত্তর দেয়—ফেসবুকে।

তোমাকে খুঁজছে বাংলাদেশ-টাইপ আয়োজকেরা এসব লেখকদের দিকে এবার একটু তাকাতে পারেন। তবে তার আগে মার্ক টোয়েনের সেই পুরোনো গল্পটা আবার বলা যেতে পারে।

একদিন একজন এসে মার্ক টোয়েনকে এক লেখকের নতুন বই বের হওয়ার খবর দিয়ে জানতে চাইল, বইটা পড়েছেন?

মার্ক টোয়েন বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি।

সেই একজন এবার আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, বইটা কেমন?

মার্ক টোয়েন বললেন, সত্যি বলতে কি, বইটা বন্ধ করলে আর খোলা যায় না। ৩.

বই পড়ার গল্প অনেক হলো। এবার বই পাওয়ার গল্প। বই পড়তে এসে ফেরত না দেওয়া পুরোনো তরিকা। সেই মার্ক টোয়েনের আমল থেকেই। তবে বই মেরে বইয়ের শেলফ ভরা যায় না। বই কিনতে হয়। আর বই কেনার সবচেয়ে ভালো জায়গা বইমেলা। আরও কম বয়সে আমার যখন বুদ্ধি বেশি ছিল, তখন বই পাওয়ার একটা উপায় বের করেছিলাম।

কপিরাইটের এই যুগেও সেই আইডিয়াটি এখন ফ্রি বলা যেতে পারে।

আমার বাসায় একটা নোটিশ বোর্ড ছিল। সেই

নোটিশ বোর্ডে প্রতিদিন জনগুরুত্বপূর্ণ নানা ধরনের নোটিশ টাঙাতাম। যেমন, একদিন হয়তো নোটিশ বোর্ডে ঝুলল, ‘আজকের রান্না ভালো হয়নি, ভাত ছিল ভর্তা’, আরেক দিন হয়তো বিরিয়ানি খাওয়ার অনুরোধের নোটিশ। এক ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নোটিশ বোর্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলাম। সামনেই ছিল জন্মদিন। তাই বইমেলা ঘুরে ঘুরে পছন্দের বইগুলোর একটি তালিকা করে ঝুলিয়ে দিলাম নোটিশ বোর্ডে। নিচে লিখলাম, ‘এই বইগুলো আমার নেই। আমার জন্মদিনে এগুলো দিলেই বেশি খুশি হব।’ টার্গেট ছিল মামা, খালু, চাচা ধরনের মানুষেরা। এমন নয় যে আগের জন্মদিনে তারা আমাকে কিছু দিয়েছিল। কিন্তু এইবার পড়ল ফাঁপরে। চম্ফুলজ্জা বলে একটা ব্যাপার আছে। সেবার আমি অনেক বই পেয়েছিলাম। সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ। সুতরাং, সাবধান! যে কেউ বই না দিয়ে ইন্টারনেটের একটা লিংক বা ওয়েবসাইটের ঠিকানা ধরিয়ে দিতে পারে। আজকাল সবকিছুই নেটে পাওয়া যায়। ভাইব্রাদার ভাষা, এফএম ভাষার পর নতুন এসেছে ব্লগের ভাষা। সেই ভাষায় বললে বলতে হয়, নেটে বই পড়ে মাইনসে! **সূত্র:** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৭, ২০১০

508) পুতা লইয়া যাও - জসীমউদ্দীন

হাটে একটি প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ উঠিয়াছে। এক ফকীর ভাবিল, এই বোয়াল মাছটার পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম! সে মাছের দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন চাষী আসিয়া মাছটি কিনিয়া লইল। মুসাফির তাহার পিছে পিছে যাইতে লাগিল। লোকটি যখন বাড়ির ধারে আসিয়াছে তখন মুসাফির তাহার নিকটে যাইয়া বলিল, ‘সাহেব! আমি মুসাফির লোক। ভিক্ষা করিয়া খাই। কোনোদিন ভালো খাওয়া হয় না। আজ হাটে যাইয়া যখন ঐ বড় মাছটি দেখিলাম, মনে বড় ইচ্ছা হইল এই মাছটির পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম! তাই আপনার পিছে পিছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া যদি আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন বড়ই সুখী হইব।’

লোকটি বড়ই দয়ালু। সে খুব আদর করিয়া মুসাফিরকে আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইল।

তারপর মাছটি ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার বউকে মুসাফিরের সমস্ত ঘটনা বলিয়া হুকুম করিল, ‘এই মাছটির পেটি বেশ পুরু করিয়া কাটিবে। পেটিখানা মুসাফিরকে দিতে হইবে।’ এমন সময় লোকটির একটি গরু ছুটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গরুর পিছে পিছে দৌড়াইল। মাছ কুটিতে কুটিতে চাষীর বউ ভাবিল, ‘বাড়িতে ভালো কিছু খাবার পাক করিলে আমার স্বামী এমনি করিয়া মুসাফির লইয়া আসে। মুরগীর রানটা, মাছের পেটিটা সব সময়ই মুসাফিরদের দিয়া খাওয়ায়। এই বড় মাছের পেটিখানাও মুসাফিরকে খাওয়াইবে। যেমন করিয়াই হোক মুসাফিরকে আজ তাড়াইব।’

এই কথা ভাবিয়া বউটি খালি পাটার উপর পুতাখানা ঘষিতে আরম্ভ করিল আর সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কালো শুনিয়া মুসাফির ভাবিল, না জানি বউটির কি হইয়াছে। সে বাড়ির ভিতর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা জননী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?’

বউটি বলিল, ‘বাবারে! সে কথা তোমাকে বলিবার নয়। আমার স্বামী মানা করিয়াছেন।’ মুসাফির বলিল, ‘মা! আমি তোমার ছেলে।

আমার কাছে কোনো কথা গোপন করিও না।’

বউটি তখন আধেক কাঁদিয়া আধেক কাঁদিবার ভান করিয়া বলিল, ‘আমার স্বামী বাড়ির ভিতরে আসিয়া আমাকে বলিল, এই মুসাফির বড়ই লোভী। আমাদের পুতাখানা পাটায় ধার দিয়া চোখা করিয়া রাখ। মুসাফিরের গলার ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া দিব। যাহাতে সে আর কাহারও মাছ দেখিয়া লোভ করিতে না পারে। তাই আমি কাঁদিতেছি। হায়! হায়! আমার স্বামী এই মোটা পুতা তোমার গলার ভিতরে ঢুকাইলে নিশ্চয় তুমি মরিয়া যাইবে, তাই আমি কাঁদিতেছি। কিন্তু স্বামীর হুকুম তো আমাকে মানিতেই হইবে।’

শুনিয়া মুসাফিরের তো চক্ষুস্থির। সে বলিল, ‘মা জননী! তুমি একটু আস্তে আস্তে পুতা ঘষ। আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।’

এই বলিয়া মুসাফির তাড়াতাড়ি লাঠি-বোঁচকা লইয়া দে চম্পট। এমন সময় বাড়ির কর্তা ফিরিয়া আসিয়া দেখে কাছারি ঘরে মুসাফির নাই। বউকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মুসাফির চলিয়া গেল কেন?’

বউ নথ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ‘তুমি বাড়ি হইতে চলিয়া গেলে মুসাফির বলে কি, ‘তোমাদের পুতাটা আমাকে দাও।’ দেখ তো, আমাদের একটা মাত্র পুতা। তা মুসাফিরকে দেই কেমন করিয়া? পুতা দেই নাই বলিয়া মুসাফির রাগিয়া চলিয়া গেল।’

স্বামী বলিল, ‘সামান্য পুতাটা দিলেই পারিতে। আমি না হয় বাজার হইতে আর একটি পুতা কিনিয়া আনিতাম। শিল্পীর পুতাটা আমাকে দাও, আর মুসাফির কোন্ দিকে গিয়াছে বল!’

বউ পুতাটি স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, ‘মুসাফির এই দিক দিয়া গিয়াছে।’

পুতাটি হাতে লইয়া সে সেই দিকে দৌড়াইয়া চলিল। খানিক যাইয়া দেখিল, মুসাফির অনেক দূর হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। সে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, ‘ও মুসাফির, দাঁড়াও—দাঁড়াও—পুতা লইয়া যাও।’

শুনিয়া মুসাফির উঠিয়া পড়িয়া দৌড়। চাষী যতই জোরে জোরে বলে, ‘ও মুসাফির! পুতা লইয়া যাও!—পুতা লইয়া যাও! মুসাফির আরও জোরে জোরে দৌড়ায়। সে ভাবে সত্যই চাষী তাহার গলায় পুতা ঢুকাইতে আসিতেছে। বোঁচকা-বুঁচকি বগলে ফেলিয়া সে মরিয়া হইয়া দৌড়ায়। বাঙ্গালীর হাসির গল্প থেকে সংগৃহীত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী ০৭, ২০১০

509) ভালোবাসার অর্থ কী? - সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এক তরুণ সহকর্মী আমাকে আচমকা জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার, ভালো বাসা বলতে আপনি কী বোঝেন? এর অর্থ কী?’

‘কেন, এত বোঝাবুঝির কী আছে?’ আমার না-চমকা উত্তর। ‘ভালো বাসা হচ্ছে কম ভাড়ার ভদ্রপাড়ার উত্তম বাসা, আলো-বাতাস ঠাসা; যার শোবার ঘর থেকে উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের জানালায় ঝোলানো কালিঝুলি ন্যাকড়া আর রন্ধনরত বুয়া অথবা তার ক্রন্দনরত পুয়াকে দেখতে হয় না।’

‘আহ-হা, স্যার’, অধৈর্য স্বরে সে বলল, ‘এ ভালো বাসা সে ভালোবাসা না, আমার জিজ্ঞাসা প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে। ওই ভালোবাসার অর্থ কী, স্যার?’

আমি বুঝলাম, প্রেম যদি মানুষকে অধৈর্য করে,

প্রেম বিষয়ে জ্ঞান বিনিময়েও তাকে সমান
ধৈর্যহারা করে। আমি স্থৈর্য বজায় রেখে বললাম,
‘অর্থটা তো তুমিই বলে দিলে।’

এবার তার কপালে কুণ্ডল দেখা দিল। অর্থাৎ
ব্যাপারটা তার মগজ-গোচর হয়নি।

‘ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে অর্থ’, আমি বললাম,
‘অর্থাৎ টাকা-কড়ি, মানি অ্যান্ড প্রোপার্টি।’

‘সেকি কথা, স্যার?’ সে অবিশ্বাসের সুরে বলল,
‘প্রেমের শাস্ত্রত আবেদনকে আপনি এভাবে
অবনমন করবেন?’

আমি বললাম, ‘শোনো। এক মেয়েকে তার
প্রেমিক প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, “তোমার বাবার
টাকা-পয়সা কী রকম?” মেয়েটি একদিন বিরক্ত
হয়ে বলল, “তোমরা পুরুষেরা সব এক। আমার
বাবাও তোমার সম্পর্কে এই একই প্রশ্ন
করেন।” বাবাদের জামাই-বিচারে বড় কামাই
থাকে এক নম্বরে। বাকি সব অনেক দূরের দুই
নম্বরে।’

হ্যাঁ, তরুণ সহকর্মীরও এ রকম অভিজ্ঞতা
আছে। তার এক বন্ধুর জন্য পাত্র খুঁজতে
নেমেছেন বন্ধুর বাবা। এক সুপাত্রের খবর
পেলেন, কিন্তু পাত্র দেখতে যেতে হবে ব্যাংকে।
তিনি গেলেন, ঢোকান মুখে দেখলেন টাকাভর্তি
ব্রিফকেস হাতে পাত্রও ঢুকছে, পেছনে দুই
বন্দুকধারী গার্ড। প্রথম দর্শনেই পাত্রপ্রেম। এত
টাকা! বাব্বা! গার্ড নিয়ে ঘুরতে হয়। ভদ্রলোক
দেন অ্যান্ড দেয়ারই প্রস্তাব দিয়ে বসবেন, কিন্তু
মাঝখানে ম্যানেজার যে তথ্য শেয়ার করলেন,
তাতে মুহূর্তে সুপাত্র পরিণত হলো কুপাত্রে।
পাত্রটি ব্যাংকের কেরাণি। গার্ড নিয়ে নগদ টাকা
আনতে গিয়েছিল। ‘কিন্তু, স্যার’, গল্প বলা শেষ
করে সে বলল, ‘একটা-দুটা ব্যতিক্রমে কি আর
নিয়মটা ভেঙে যায়?’

‘নিয়মটা কী রকম?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।
‘নিয়মটা হলো গিয়ে স্যার...এই ধরুন লায়লা-
মজনু, রোমিও-জুলিয়েট।’

‘অর্থাৎ অমর প্রেম? ভ্রমর কইও গিয়া? চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত?’

‘জি, স্যার। যেমন দেখা যায় আমাগো
সিনেমায়।’

আমার মনে পড়ল, স্কুল পালিয়ে উত্তম-সুচিত্রার
সিনেমা দেখতাম। কঠিন প্রেমময় সব সিনেমা।
পাড়ার যমুনাডিও দেখতেন। এবং বাড়ি ফেরার

পথে রিকশায় বসে প্রেমের প্রলম্বিত বিলম্বিত
অভিঘাতে চোখের পানিতে রুমাল ভেজাতেন।
অনেক অনেক বছর পর এক বিশ্ব ভালোবাসা
(বিভা) দিবসে সেই যমুনাদির ছেলে বরুণ তার
প্রেমিকাকে হাজির করেছে মাকে প্রণাম করাতে,
সঙ্গে দুই সহপাঠিনী নিয়ে। রহস্য করে মাকে
জিজ্ঞেস করেছে, ‘আচ্ছা মা, বলো তো, পুষ্পিতা
এই তিনজনের কোন জন?’ যমুনাди এক মুহূর্ত
না ভেবেই আঙুল তুলে দেখিয়েছেন পুষ্পিতাকে।
তাজ্জব বরুণ একগাল হেসে জিজ্ঞেস করেছে,
‘কী করে বুঝলে, মা?’ যমুনাди বলেছেন, ‘এই
তিন মেয়ের মধ্যে এটিকেই আমার সবচেয়ে
অপছন্দ হয়েছে কি না, সে কারণে।’
যমুনাди অনেক রাত উত্তমকে চোখে লেপে
ঘুমাতে যেতেন নিশ্চয়। আর কোনো সিনেমায়
যদি উত্তমের মা এ রকম বলতেন সুচিত্রাকে
দেখে, কী প্রতিক্রিয়া হতো যমুনাদির?
সহকর্মীটি একটি দৈনিকে বিভা দিবসের
প্রতিযোগিতায় ‘ভালোবাসার অর্থ কী?’ এই
প্রশ্নের একটি চটকদার উত্তর আমার কাছ
থেকে আদায় করে পাঠিয়ে দিয়ে একটা পুরস্কার
বাগানোর মতলবে আছে। আমার কথাবার্তায় সে
জন্য সে খুব প্রীত হচ্ছে না। একটু বিরক্তি
নিয়েই সে বলল, ‘ভালোবাসা কি তাহলে স্যার
এ-ই?’
‘তা কেন হবে!’ আমি বললাম, ‘ভালোবেসে
মানুষ তাজমহল বানিয়েছে না! ভালো বাসতে
বাসতে দেবদাস মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে না!’
দেবদাসের কথায় সে প্রীত হলো। শাহরুখ
খানের দেবদাস-মৃত্যু তাকে এখনো কাঁদায়, সে
জানাল। তাজমহলের প্রসঙ্গটাও তার মনে
ধরল। স্ত্রীর জন্য কালের কপোলতলে এমন
এক বিলাসী নয়নজলের ফোঁটা, আহা!
‘শাহজাহানের স্ত্রীর চেহারাটা নিশ্চয় দারুণ
জটিল ছিল, স্যার,’ সে জানতে চাইল।
‘জটিল?’ আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
‘জটিল মানে সুন্দর। মানে জোস্।’
‘ও। তা হতে পারে। তবে মমতাজ ছাড়াও
শাহজাহান সাহেবের আরও বিবি ছিলেন বলে
শুনেছি। সত্য-মিথ্যা জানি না।’
‘তার পরও, স্যার, এমন হেঁব্বি একটা সৌধ
বানাইলেন প্রেমের খাতিরে, তার জানেজিগারের
জন্য।’

‘বটে। তবে হেবির সৌধ বানানোর জন্য হেবির পয়সাও ছিল সম্রাটের।’ সহকর্মীর চোখ থেকে আলো কিছু কমে গেল। ‘আবারও টাকা-পয়সা, স্যার? অর্থ? প্রেমের অর্থ, প্রেমের জন্য অর্থ? তাহলে তো স্যার টাকা-পয়সাটাই আসল।’ ‘ঠিক তা-ও না’, আমি বললাম, ‘অর্থের সঙ্গে স্বার্থও আছে। ভালোবাসা এক ধরনের স্বার্থপরতাও। একটু নান্দনিক, তাতেই রক্ষা। ভালো হয়, যদি সেই নান্দনিকতাটা রঙ্গে-রসে টইটম্বর থাকে।’

‘কথাগুলো একটু কুটিল হয়ে যাচ্ছে না, স্যার? মানে ঝাপসা?’

সহকর্মী যে প্রতিযোগিতায় নামছে, তাতে প্রেম-সম্পর্কিত দুই লাইনের একটা উপদেশের ব্যাপারও আছে। কাতর হয়ে সে তাই জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার, বিভা দিবসে কি আপনার কোনো উপদেশ নেই তরুণদের জন্য?’

‘উপদেশ দেওয়ার আমি কে?’ আমি বললাম, ‘উপদেশ তো দিয়েছেন কুমিল্লার সেই কল্পনা খালা, যিনি আমাদের বাড়িতে এসে লাক্স সাবানের ওই গানটার সঙ্গে আরেকটা গাইতেন। সেটি এই:

চুন বেশি খাইলে মুখ পুইড়া যায়, কম খাইলে বুক জ্বলে, প্রেম কইর না দুইজনের মন সমান না হইলে।’

সহকর্মী দ্রুত গানটি লিখে নিল। তার কাছে এটি হিট। আর্চিস আর হলমার্কের সুদিন আর নেই। এখন ছাপা কার্ডের জায়গা নিয়েছে ভারুয়াল কার্ড, ই-কার্ড। আমি নিশ্চিত, এই দুই লাইন এখন হাইজ্যাক হয়ে যাবে। বিভা দিবসের ই-কার্ডে প্ল্যাকার্ড হবে।

তা হোক। অন্তত দুই জোড়া বিভা দিবসীকেও যদি এই উপদেশ বাঁচাতে পারে, তাহলে কল্পনা খালা তাঁর কবরে শুয়ে শান্তি পাবেন। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

510) বালক ভুল করে পড়েছে ভুল বই পড়েনি ব্যাকরণ পড়েনি মূল বই - আনিসুল হক

তিতলির সঙ্গে আমার পরিচয় বুয়েটে ভর্তিপরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পর, যখন মেডিকেল টেস্ট হয়, তখন। আমার বড় ভাইও বুয়েটে পড়তেন। তিনি আমাকে বলে রেখেছিলেন, স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় পরনের কাপড়

নিঃশেষে খুলে ফেলতে হবে, লজ্জা পেলে চলবে না। আমার রোল ছিল আনলাকি থার্টিন, তিতলির রোল ছিল চৌদ্দ, কাজেই আমরা দুজন একই সঙ্গে স্বাস্থ্যপরীক্ষা দিতে বুয়েটের মেডিকেল সেন্টারে গিয়েছিলাম। ওই রুমে মেয়ে বলতে একা তিতলিই ছিল, আর আমি এসেছি স্ত্রীবর্জিত পৃথিবী থেকে, কাজেই ওই ঘরে অন্য ছেলেদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। স্বাস্থ্য পরীক্ষকদের মধ্যে কোনো মহিলা ছিলেন না। তিতলি সহজেই পার পেয়ে যাবে, অথচ আমাকে জন্মমুহূর্তের পোশাক একটু পরই ধারণ করতে হবে, এই চিন্তা দিয়ে আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখছিলাম।

পরে আমরা, আমি আর তিতলি, সেশনালে একই গ্রুপে পড়লাম। সেশনাল জিনিসটা হলো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস—ফাস্ট ইয়ারে লোহার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি আমাদের একসঙ্গে করতে হয়েছিল।

মফস্বল শহর থেকে এসেছি, আর তিতলি এসেছে হলিক্রস থেকে, খুবই স্মার্ট ছিল, আর আমার পুরুষময় জগতে তিতলিই ছিল একমাত্র নারী। আর আমাকে তখন কবিতায় পেয়ে বসেছে। আমি তিতলির বেণির নিচের গ্রীবার দিকে তাকিয়ে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে কবিতা লিখতাম। ও ফাস্ট বেঞ্চে বসে তরুণ শিক্ষকদের কথা হাঁ করে গিলত ও নোট নিত। একদিন আমি ওকে বললাম, তিতলি, তোমার চোতাটা দিয়ো।

ও বলল, চোতা কী?

আমি বললাম, বুয়েটে পড়ো, চোতা কী চেনো না? চোতা মানে হলো নোটস। আমি ক্লাসে নোট নিই না। তোমার চোতাগুলো আমার লাগবে। তুমি আমাকে ধার দেবে, আমি ফটোকপি করে ফেরত দেব।

তিতলি বলল, নোট নাওনি, কী করেছ?

আমি বললাম, কবিতা লিখেছি।

দেখি, কী লিখেছ?

না না, তোমাকে দেখানো যাবে না।

আচ্ছা, দেখব না। আর শোনো, এসব চোতা-টোতা পড়বা না তো! সব সময় মূল বই পড়বা। নাইলে মূর্থই থেকে যাবা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রফিক আজাদের কবিতা শুনিতে দিলাম,

বালক জানে না তো কতটা পথ গেলে,
ফেরার পথ আর থাকে না কোনো কালে...
বালক ভুল করে নেমেছে ভুল জলে,
বালক ভুল করে পড়েছে ভুল বই,
পড়েনি ব্যাকরণ পড়েনি মূল বই। কিন্তু আমাদের
প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের এক ফাঁকে সে আমার
ক্লাসনোট খুলে কবিতাটা পড়ে নিয়েছিল।
কবিতাটা ছিল এ রকম:
চারদিকে রিকশা গাড়ি, নেই কোনো বেহুলা
ভাসান,
আমাকে দুদণ্ড কষ্ট দিয়েছিল, বুয়েটের শায়লা
হাসান।

(বলা বাহুল্য, শায়লা হাসান তিতলির ভালো
নাম) তিতলি বলল, শিবলি, তুই আমাকে নিয়ে
কবিতা লিখেছিস কেন? তুই কি আমার প্রেমে
পড়েছিস?

আমি বললাম, না, পড়ি নাই, কিন্তু আমার
কবিতার জন্য আমার প্রেমিকার প্রক্সি তোকে
দিতে হচ্ছে। তুই মাইন্ড করিস না।

তিতলি বলল, আমি খুবই মাইন্ড করেছি। ফ্রেন্ড
হলো ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডের সাথে যারা প্রেম করতে
চায় তারা হলো খ্যাৎ। আর কোনো দিন এই
সব তুই বলবি না, বুঝেছিস। একদিন আমি
তিতলিকে বলেই ফেললাম, তিতলি শোন,
আমার না আর তোর প্রক্সি রোলটা ভালো
লাগছে না। তুই আমার জেনুইন হবি?

ও বলল, ধেং, কী বলিস!

আমি বললাম, আচ্ছা, তুই একটা কিছু বল। না
হয় ‘না’ই বলে দে।

না না, এই সব হবে না। ক্লাসমেটের সঙ্গে কেউ
প্রেম করে না।

আমার জন্মদিনে তিতলি একটা কবিতার বই
(নির্মলেন্দু গুণের চৈত্রের ভালোবাসা) আরেকটা
মূল বই (অ্যানালাইটিক্যাল মেকানিক্স বাই
রবিনসন) উপহার দিয়েছিল।

কিন্তু তিতলি কোনো দিনও আমার প্রোপোজালে
সাড়া দেয়নি। অচিরেই বুয়েটের একজন
শিক্ষকের সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং তারা
অস্ট্রেলিয়া চলে যায়।

তারপর ২৫ বছর কেটে গেছে। এ বছর, বুয়েট
অ্যামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত
পুনর্মিলনীতে হঠাৎ দেখি তিতলি। কী আশ্চর্য,
তিতলি সেই ২৩-এই রয়ে গেছে। একদম বড়

হয়নি। ঘটনা কী। আমি তার পেছনে গিয়ে তার মাথায় টাকা মেরে বললাম, এই, আমাকে চিনতে পেরেছ?

উত্তর এল, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। আপনি শিবলি আংকেল। মা-র অ্যালবামে আপনার ছবি দেখেছি।

একটু ভড়কে গেলাম। তিতলির দেখা পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। সে ভীষণ বুড়িয়ে গেছে, গালে মেছতার দাগ। খুব হতোদ্যম হলাম। ‘আমার মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে নাকি? পুণ্যি, আংকেলকে সালাম দিয়েছ?’ পুণ্যির মা তিতলি বলল।

সারাটা দিন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হইহল্লা করে ভালোই কাটল।

একটা ফাঁকে, বুয়েটের ক্যাফেটেরিয়ায় চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে তিতলি বলল, আচ্ছা শিবলি, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

আমি বললাম, এত দিন পরে সেই প্রশ্ন করে লাভ আছে? আজ হয় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি!

মানে কী?

আমি একটা মেয়েকে বুয়েটে পড়ার সময় প্রপোজ করেছিলাম। মেয়েটা কোনো রিপ্লাই দেয়নি। ইন ফ্যাক্ট, মেয়েটা রিজেক্ট করেছিল। বাদ দাও। কে হয় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?

মেয়েটা তোমাকে রিপ্লাই দেয়নি মানে! তোমার বার্থডেতে মেয়েটা একটা পাতলা কবিতার বই, আরেকটা মোটা অ্যানালাইটিক্যাল মেকানিক্স বই দিয়েছিল। তোমার মনে আছে?

আছে।

ওই মোটা বইটার ভেতরে একটা চিঠি ছিল, সেটা পড়েছিলে?হায় হায়! আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। কবিতার বইটা পেয়ে সেটা নিয়েই মত্ত ছিলাম। আর পরীক্ষা পাসের জন্য সহায় ছিল চোতা। বললাম, ওই মোটা মেকানিক্স বইটা তো কোনো দিনও খুলে দেখিনি। কী ছিল সেটাতে?

আমি বলি, তিতলি বলো, প্লিজ বলো, ওটাতে কী ছিল...

এত দিন পরে আর সেটা বলে লাভ কী। আমরা-আব্বা কোনো দিনও চাননি আমি দেশ ছাড়ি। তুমি যদি সেদিন ওই বইটা একবারও খুলতে!

রায়হান স্যার, মানে তিতলির স্বামী, তাদের মেয়ে পুণ্যিকে নিয়ে এদিকে আসছেন। ভাগ্যিস মাথা তুলে দেখে নিয়েছিলাম। না হলে এখনই আমি তিতলির হাত ধরে ফেলতাম। বলতাম, তিতলি বলো, ওই চিঠিতে কী ছিল। বলো... বলো... বুয়েটের বর্তমান শিক্ষার্থীরা আমাকে ধরল, তাদের উপদেশ দিতে হবে। বললাম, শোনো, চোতা পোড়ো না, মূল বই পোড়ো। তা না হলে জীবনে কিছুই পাবে না। (ওয়েবসাইটে পাওয়া কৌতুক অবলম্বনে)

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

511) এক বিবাহিত মেয়ের প্রতি - শওকত হোসেন

এক বালিকার সঙ্গে তখন তুমুল প্রেম করি। সেই বালিকা একদিন আবেগঘন হয়ে জানতে চাইল, ‘বিয়ের পরও কি তুমি আমাকে এভাবে ভালোবাসবা?’

আমি বলেছিলাম, ‘অবশ্যই বাসব। আমি বিবাহিত মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।’ বালিকা এ কথার অর্থ কী বুঝল কে জানে। একদিন এসে বলল, কিছুদিন ধরেই তার আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া যেতে মন চায়। সে চলে যাচ্ছে। তবে একা যেতে কেমন দেখায়, তাই বাধ্য হয়েই বাবার বন্ধুর এক ছেলের সঙ্গে যেতে হচ্ছে। আমার মুখ দেখে মনে হয় একটুখানি মায়া হলো। সে বলল, ‘চিন্তা কোরো না, আমার চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। সে রকম দেখে একজনকে বিয়ে করে ফেলো।’

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, ‘তুমিই বিয়ে করতে রাজি হলে না, কোনো সুন্দরী মেয়ে কি আর রাজি হবে!’

আমার আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে কোনো এক ভালো ও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে। আর আমিও সেই বালিকাকে দেওয়া আমার কথা রেখেছি। সেই যে বলেছিলাম ‘আমি কেবল বিবাহিত মেয়েকেই ভালোবাসি’, সেটা এখনো মনে চলছি। আমার বউয়ের যখন বিয়ে হয়নি, তখন তাকে মোটেই ভালোবাসতাম না, তাকে চিনতামই না। কিন্তু এখন সে বিবাহিত। আমি তাকেই ভালোবাসি।

আমার এই বউয়ের সঙ্গে কিন্তু আমার একটা

অসাধারণ মিল আছে। আমার আর আমার বউয়ের বিয়ে একই দিন হয়েছিল। একই দিন, একই মাস ও একই সালে। সবচেয়ে বড় কথা, দেখতে দেখতে বিয়ের বয়স সাত বছর চলেও গেল। দিন, তারিখ আর সালের সেই মিলটা কিন্তু এখনো আছে।

মেরিলিন মনরোর একটা বিখ্যাত ছবি আছে। দি সেভেন ইয়ার ইচ। বাংলা করলে হয় ‘সাত বছরের চুলকানি’। এ ছবিতেই বাতাসে স্কাট ওড়ার সেই বিখ্যাত দৃশ্যটা আছে। ছবিটার মূল কথা হলো, বিয়ের পর সাত বছর পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই থাকে। তার পরই শুরু হয় চুলকানি। বিয়ের সাত বছর পর বেশির ভাগ মানুষই এদিক-ওদিক হোঁচট খায়। আমরা হোঁচট খাইনি।

অলক্ষ্যে কথ্য বাদ দিয়ে তার চেয়ে বরং বিয়ের শুরুর দিকের কিছু কথা বলি। বিয়ের পরপরই গেলাম এক বন্ধুর বাসায়। দেখি, বন্ধু তার বউকে আদর করে ডাকে ‘জানু’ আর বন্ধুর বউ তাকে ডাকে ‘জান’ বলে। বাসায় এসে আমার বউ উদাস একটা ভাব নিয়ে আমাকে বলল, আহা! তারা কী সুন্দর আদর করে একজন আরেকজনকে কত নামে ডাকে! আর আমি নতুন বউকে সেই পুরোনো নাম ধরেই ডাকছি। আমি যে কতটা রোমান্টিকহীন, সেটা সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল। নতুন বউ তো, বউয়ের মন খারাপ দেখলে নিজের মন খারাপ করাটা নিয়ম। সেই নিয়ম মেনে আমারও মন খারাপ হলো। আমি তখন তাকে দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যেমন—তার পিতৃপ্রদত্ত নাম সামসুন্নাহার। আমি বললাম, ‘ছোট করে আমি তোমাকে সামসু বলে ডাকতে পারি।’ সে রাজি তো হলোই না, উল্টা চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল। তখন দ্রুত প্রস্তাব পাণ্টে বললাম, ‘এখন আমরা যদি জান-জানু বলা শুরু করি, তাহলে আমার বন্ধু ও তার বউ ভাববে, তাদের নকল করছি।’ তাই নতুন প্রস্তাব দিয়ে বললাম, ‘তুমি বরং আমাকে প্রাণ বলে ডাকো।’ আমার বউ, যে আমাকে রসকসহীন বলে এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করেছিল, সে-ও আমার প্রস্তাবে চমকে গেল। খুশি হতে হতে হঠাৎ কপাল কুঁচকে বলল, ‘তাহলে তুমি আমাকে কী ডাকবা?’ আমি জীবনের সেরা সাহস দেখিয়ে

বললাম, ‘আমি প্রাণ হলে তোমাকে তো প্রাণী বলে ডাকব।’ আমার বউ এ প্রস্তাবেও রাজি হলো না।

আমার আর বউয়ের মধ্যে মিল দিয়ে শুরু করেছিলাম। জীবন কি খালি মিলে ভরা থাকে? অমিলও থাকে। শুরুতে সবকিছু ভালো লাগলেও যত সময় যায়, অমিলগুলো চোখে পড়ে। এবার সবচেয়ে বড় অমিলটার কথাই বলি। আমাদের বিয়ে একই দিনে হলেও আমার চেয়ে আমার বউয়ের বিয়েটাই আসলে ভালো হয়েছে। কী চমৎকার! ভালো, শান্তশিষ্ট একটা জামাই পেয়েছে সে। আমাদের পুরো পরিবারের মধ্যে আমার বউয়ের বিয়েটাই আসলে ভালো হয়েছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

512) গাঁইয়া - বিশ্বজিৎ চৌধুরী

রুমকি বলল, ‘তুমি একটা আস্ত গাঁইয়া।’ কথাটা সে আগেও বলেছে, প্রায়ই বলে, আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু সেদিন মেজাজটা সত্যি চড়ে গিয়েছিল। বললাম, ‘কেন? গাঁইয়া কেন? তোমার উপকার করলাম, সেটা অন্যায় হয়ে গেল?’

‘উপকার তো করেছ, কিন্তু শেষে ওই যে কথাটা বললে, সেটা বাংলা সিনেমার ডায়ালগের মতো হয়ে গেল না?’

‘হ্যাঁ, তা একটু হয়েছে, তবে এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল?’

ঘটনাটা খুলে বলি—কয়েক দিন ধরে রুমকিকে একটা ছেলে উত্ত্যক্ত করছিল। কলেজগেটে মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গাড়ি থেকে নামলেই কেমন ইশারা করে, ফোন নম্বর জানতে চায় ইত্যাদি। রুমকিই আমাকে জানিয়েছিল এসব কথা। বলেছিল, ‘একদিন তুমি আমার সঙ্গে যাবে?’

আমি রাজি। গেলাম। মোটরসাইকেলে বসা রোদচশমাপরা ছেলেটাকে ভিলেনের মতো মনে হয়েছিল দেখতে। সোজা সামনে গিয়ে ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে বললাম, ‘মেয়েদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে মাস্তানি করা ছাড়া, নইলে...।’

ছেলেটা অবাক, আমার পেছনে দাঁড়ানো রুমকিকে দেখে বলল, ‘আপনি কেন...ও আপনার কী?’

তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি বলেছি, ‘ও আমার প্রিয়তমা।’

সংঘর্ষের একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কী বুঝে ছেলেটি কথা বাড়াল না। হঠাৎ মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিয়ে হুশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বিজয়ীর দৃঢ়তায় রুমকিকে বললাম, ‘দেখো, ও আর কোনো দিন আসবে না।’

তখনই রুমকি বলল কথাটি, ‘গাঁইয়া’।

উপকারের এই প্রতিদান!

আমি গ্রাম থেকে এসেছি। উচ্চমাধ্যমিকে রীতিমতো ভালো রেজাল্ট করে সুযোগ পেয়েছি মেডিকেল কলেজে পড়ার। হোস্টেলে সিট না পাওয়া পর্যন্ত মেসে থাকব ঠিক করেছিলাম। এমনকি হোটেলের একটি রুম নিয়েও থাকতে পারতাম। ছেলের জন্য খরচ করার মতো যথেষ্ট টাকা-কড়ি আছে বাবার। কিন্তু রহমান সাহেব, আমার দূরসম্পর্কের চাচা বাবাকে বলেছিলেন, ‘আমার এত বড় বাড়ি, বউ-বাচ্চা নিয়ে মোটে তিনজনের সংসার, ছেলেটা এখানেই থাকুক।’ সেই থেকে থাকা। আমি নরম মনের মানুষ। রুমকিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গিয়েছিল আমার। ‘এ’ লেভেলের ছাত্রীটি ঘরে স্কার্ট-টপ্স অথবা হাঁটু দৈর্ঘ্যের জিনসের ট্রাউজার আর স্লিভলেস টি-শার্ট পরে থাকে। বাদামি কটা চোখ, গোলগাল ফরসা মুখ আর পিঠ পর্যন্ত সোজা ঝরঝরে চুল—সব মিলিয়ে একটা আদুরে বেড়ালের মতো।

রুমকি কিন্তু শুরুতে একেবারেই পাত্তা দিত না আমাকে। কেমন একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল চেহারায়। ওর এমন আচরণের কারণে এ বাড়ি ছাড়ার কথা ভেবেছি অনেকবার। ও কি আমাকে আশ্রিত ভেবেছে!

কিন্তু এর মধ্যে কয়েকবার আমার কাছে অঙ্ক বুঝতে এসে একটু সমীহের ভাব তৈরি হয়েছে। আমি ইংরেজিতে ভালো, কিন্তু রুমকির মতো ইংরেজিতে ফুটফাট কথা বলতে পারি না। এখন ওকে আমি অঙ্ক করাই, ও আমাকে কম্পিউটার শেখায়। আমি দ্রুত কম্পিউটার শিখি, কিন্তু রুমকির মাথা মোটা, সহজে অঙ্ক বোঝে না। বোঝে না যে তা নিয়ে কোনো সংকোচ আছে বলেও মনে হয় না, উল্টো কথায় কথায় আমাকে ডাকে গাঁইয়া। আসলে বাবা-মায়ের

প্রশ্নে মেয়েটার এ অবস্থা। তাঁরা আমাকে বলেন, ‘ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, বাবা। ছেলেমানুষ...।’ এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে ছেলেমানুষ! শুনে আমার গা জ্বলে, আবার হাসিও পায়। দিনের অর্ধেক সময় ইংরেজি ছবি দেখে রুমকি। আমাকে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, লেওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর কথা বলে। এসব ছবি আমি দেখি না। আমি বাংলা ছবির ভক্ত। গ্রামে পূবালী সিনেমা হলে নতুন ছবি এলেই বন্ধুদের নিয়ে দেখতে যেতাম। আমি রুমকিকে অপু-শাকিব খান, পূর্ণিমা-রিয়াজের কথা বলি। ও শুনে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে। করে বটে, আবার আমার কাছে বাংলা ছবির গল্প শুনতে আসে। আমি শহুরে ধনীর দুলালি অপূর সঙ্গে গ্রামের সহজ-সরল শাকিব খানের প্রেমের গল্প বলি। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে রুমকি। বলে, ‘ফানি, অ্যাবসার্ড!’ আমি মিইয়ে যাই।

কয়েক দিন ধরে রুমকিকে কেমন উসখুস দেখাচ্ছে। কেমন জানি আনমনা। আমার বাংলা ছবির অভিজ্ঞতা বলে, মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। আমার খুব ভয় হয়। এখন তো ওর ভুলের বয়স, ভুল করে রাংতাকে রূপো ভাবছে না তো মেয়েটা! খুব জানতে ইচ্ছে করে ছেলেটা কে। কিন্তু গেঁয়ো ভাববে বলে সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারি না।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। রুমকি পিকনিকে গেছে কলেজ থেকে। আমি একা কী করি, কী করি ভাবতে ভাবতে আমার রুমে ফেলে যাওয়া ওর ল্যাপটপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছি। এত বেখেয়ালি মেয়ে, পাসওয়ার্ড দিয়ে যায়নি। কী এক কৌতূহলে (এটা সত্যিকারের গ্রাম্যতা) রুমকির ‘মাই কম্পিউটারে’ ঢুকে পড়লাম। চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ ডি-ড্রাইভে ‘মাই লাভ’ নামের একটি ফাইল দেখে কৌতূহল পৌঁছাল চরমে। যা ভেবেছিলাম তা-ই। রুমকি এখানে লিখে রেখেছে অনেক আবেগ-অনুভূতির কথা। কার উদ্দেশে যেন লিখেছে গভীর প্রেমের আকুতি। ভাবছি, ছেলেটা কে? আরও একটু এগিয়ে চমকে উঠলাম হঠাৎ। রুমকি লিখেছে, ‘অল আর হিপোক্রিট অ্যারাউন্ড মি, ইউ আর ওনলি দ্য একসেপশন। দ্যাট ডে ইউ কল্ড মি প্রিয়তমা। ডিড ইউ মিন ইট? আই লাভ ইউ, গাঁইয়া...।’

মেয়েটা প্রেমে পড়েছে বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু
কী বোকা আমি! অ্যাঞ্জেলিনা জোলি যে শাকিব
খানের প্রেমে পড়েছে বুঝতে পারিনি।

লেখাপড়া মাথায় উঠল। রাতে ঘুম হয় না। এর
মধ্যে হলে সিট বরাদ্দ হয়েছে আমার নামে।

এখান থেকে আপাতত না পালালে পরীক্ষা
পাসের যে কোনো আশা নেই, তা তো নিশ্চিত।

চাচা-চাচিকে বললাম। তাঁরা রাজি হলেন
দোনামনা করে। রুমকিকে বলতেই দেখলাম

তার চোখে পানি। নায়িকার সেই অশ্রুবিन्दু
দেখে আবার শাকিব খান জেগে উঠল আমার

ভেতর। বললাম, ‘যত দূরেই যাই, তুমি আমার
মনের কাছেই থাকবে, প্রিয়তমা।’

আমার হাত চেপে ধরে ভেজা চোখ তুলে রুমকি
বলল, ‘গাঁইয়া।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ১৪

ফেব্রুয়ারি ২০১১

513) পাপাই-এর গল্প - দত্ত রঞ্জন

সাড়ে তিন বছরের পাপাই। অনেক কিছুই
বুঝতে শিখেছে। বিশেষ করে আদর। আদর
জিনিসটি ভালো করে বোঝে।

কয়েক দিন ধরেই ব্যাপারটি সে লক্ষ করছিল।
কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। তার দিকে

বাবার কোনোই খেয়াল নেই। খেয়াল যতটুকু
সবটুকু মায়ের দিকে।

একদিন সহ্য বা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করল
তার।

বাসায় মেহমান এসেছে।

একজন পাপাইকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল,
‘আবু কি তোমাকে অনেক আদর করে; না
আম্মু বেশি করে?’

পাপাইর রাগ হলো, দুঃখও হলো।

বলে, ‘আবু তো শুধু আম্মুকে আদর করে,
আমাকে তো চোখেই দেখে না।’

ড্রয়িংরুমে মেহমানেরা বসে ছিল। সেখানে
হাসির রোল পড়ে গেল। ভেতরে রান্নাঘরে
ছিলেন পাপাইর মা। তিনি ট্রে হাতে দ্রুত পায়ে
ঘরে ঢুকলেন।

‘কী হয়েছে, আপা, এত হাসি?’

আপা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে
হাসলেন। স্বামীও হাসলেন। পাপাইর মা আবার
জানতে চাইলেন, ‘হাসির ব্যাপারটা কী বলুন
না। আমিও আপনাদের সঙ্গে যোগ দিই।’

স্বামী ভদ্রলোক মুনির বলেন, ‘পাপাইর বাবা

আসুক, তারপর বলি। আমরা একসঙ্গে হাসব।’
পাপাইর মা ভেতরের ঘরে গেলেন। বললেন,
‘ঠিক আছে, তা-ই হোক।’

মুনির সাহেব বললেন, ‘পাপাই, আম্মু তোমাকে
কেমন আদর করে?’

‘আম্মুও আমাকে অল্প আদর করে।’

আবার হাসির রোল ড্রয়িংরুমে। হাসি শেষ হতে
না হতেই দরজায় কলবেল।

বাসায় প্রবেশ করলেন পাপাইর বাবা রাজিক।

‘আরে, তোমরা এসেছ! আমি তো আকাশের
চাঁদ পেলাম।’

মুনির হাত বাড়িয়ে দিলেন, ‘তাহলে চাঁদটা
ধরো।’ রাজিক হ্যান্ডশেক করলেন। মুনিরের স্ত্রী
তাবাসসুমও হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গেও
হাত মেলালেন তিনি।

পাপাই তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আমি
কিন্তু আম্মুকে বলে দেব।’

‘কী বলবে, বাবা?’

‘তুমি আন্টির হাত ধরেছ।’

আবার হাসি মুনির দম্পতির। কিন্তু রাজিক
কিছুতেই হাসতে পারলেন না। চা নিয়ে এলেন
পাপাইর মা সাদিয়া।

‘এবার কিন্তু বলতেই হবে, কী নিয়ে হাসলেন
আপনারা।’

মুনির বলে, ‘না না, তেমন কিছু না। পাপাইর
মজার মজার কথা শুনে হাসছিলাম।’

‘ও, তাই। আমি ভাবছিলাম না জানি কী।’

তাবাসসুম জানতে চান। ‘পাপাই, তুমি কাকে
ভালোবাসো?’

পাপাই বলে, ‘আব্বু-আম্মু চলে গেলে বলব।’

‘কোথায় গেলে বলবে?’

‘অন্য ঘরে গেলে বলব।’

মুনির সাহেব বললেন, ‘আপনারা একটু
ভেতরের ঘরে যান তো ভাবি।’ পাপাইর মা-বাবা
ভেতরের ঘরে যাওয়ার পর পাপাই বলে,
‘নুশরাতকে বেশি ভালোবাসি।’

ড্রয়িংরুমের পর্দা তুলে সে নুশরাতদের বাসা
দেখিয়ে দিল। জোরে ডাকল, ‘নু শ রাত।’

ডাক শুনে নুশরাত একটি পুতুল হাতে তাদের
জানালায় সামনে এসে দাঁড়াল। বয়স দুই বছর
হবে।

মুনির সাহেব আর তাঁর স্ত্রী হেসে গড়িয়ে পড়েন
আরকি। ভেতরের ঘর থেকে রাজিক বলেন,

‘আমরা কি এখন আসতে পারি?’

বাবার কথা শুনে পাপাই টান দিয়ে পর্দা ফেলে দেয়। আর পর্দা ফেলা দেখে পাশের বাসার নুশরাত চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। সেই কান্না শুনে মুনির সাহেব আর তাবাসসুমের আবার হাসি।

পাপাই মুনিরের বসা সোফার ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর মুখে হাত চেপে বলল, ‘আবু-আম্মুকে কিন্তু কিছু বলবে না।’

‘ঠিক আছে চাচা, বলব না।’

ঘরে এলেন পাপাইর মা-বাবা।

তাবাসসুম বলেন, ‘ভাবি, সবকিছু দেখি আপনি করছেন। কাজের মেয়েটা, কুলসুম কই?’

‘কুলসুম তো আমার ভাইয়ের ড্রাইভারকে বিয়ে করেছে। এখন আমার ভাইয়ের বাসাতেই

আছে। নতুন একজন এসেছে। ওর নাম

হাসনা।’ তাবাসসুম বলেন, ‘ওকে ডাকুন না, একটু ঠান্ডা পানি নিয়ে আসুক।’

‘আমি যাই। ও তো কান্নাকাটি করছে।’

‘নিশ্চয় বাড়ি যাওয়ার জন্য।’

সাদিয়া বলেন, ‘না না, ওসব কিছু না। হিন্দি সিরিয়ালের কোনো এক চরিত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সে জন্য কাঁদছে। বাস্তবে মরেনি। সিরিয়ালেই মারা গেছে। কিছুতেই ওর কান্না থামছে না।’

মুনির দম্পতির আবার হাসি।

কিন্তু রাজিক দম্পতি ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

বললেন, ‘সারা দিনই সিরিয়াল নিয়ে বসে

থাকে। আর রান্নাঘরে ভাত পুড়ে যায়। তরকারি পুড়ে যায়।’

মুনির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘দোস্তু, হাসতে হাসতে অনেক রাত হয়েছে, এবার আসি।’

সেই সময়েই ঘুরে ঢুকলেন পাশের বাসার ভদ্রমহিলা। কোলে ছোট নুশরাত। ফুটফুটে মেয়েটির দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘ভাবি, অনেক রাতে চলে এলাম। নুশরাত আপনাদের বাসায় আসার জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে।’

সাদিয়া বলেন, ‘ভালো করেছেন। আপনি তো আসেনই না।’

নুশরাতকে দেখে হয়তো লজ্জায় পাপাই দৌড়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

নুশরাত মায়ের কোল থেকে হাত উঁচু করে

পাপাইর চলে যাওয়ার দিকে দেখাল—সে-ও
ওদিকে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মুনির দম্পতির
আবার হাসি। রাজিক জানতে চান, ‘তোদের
হয়েছে কী বল তো?’

মুনির বলেন, ‘অনেক কিছু হয়েছে। যা হয়েছে
সবটুকু মজার। আমি আরেক দিন বলব।’

সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

514) ভালোবাসার □□□-

বর্ণীকরণ! - শায়ের খান

একটি প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে গেছে এই ভালোবাসা
দিবসটি। বিশেষ করে আমার মতো সিঙ্গুলার
নম্বরের জন্য। আগে এই বদখত দিনটি ছিল না
এ দেশে। ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ নিজেই একটা
পাক্কা প্রেমিক। ধুরন্ধরও বটে কিছুটা। ঠিকই
লক্ষ করেছে যে বাংলাদেশে পয়লা ফাল্গুন অর্থাৎ
১৩ ফেব্রুয়ারি বাসন্তী শাড়ি পরে একাকী ঘুরে
বেড়াচ্ছে ফুরফুরে মেজাজে। তাই আনলাকি
থার্টিনকে ‘লাকি’ করতেই বোধ হয় ‘চালাকি’
করে পাশে বসে গেছে প্রেমিক সেজে। ১৩ আর
১৪। ফেঁসে গেছি আমরা প্রেমিকাহীন জাটকা
ইলিশেরাও। আগে প্রেমিকদের এক পকেটে
হাত ঢোকালেই চলত, এখন হাত দিতে হয় দুই
পকেটে। আর সিঙ্গেল জাটকাদের আগে শুধু
প্রথম ফাগুনের রংটা গিললেই চলত। এখন
ভ্যালেন্টাইনের ঢংটাও গিলতে হয়। কাঁহাতক
আর রংঢং? তাই এবার ঢংটা অন্তত গিলব না,
প্ল্যান করলাম। প্ল্যানটা কী জানেন?
ধরব। ভালোবাসা ধরব! দুই.

মানুষ মাছ ধরতে যায় সরোবরে। আমি গেলাম
ভালোবাসা ধরতে ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে।
ভালোবাসা দিবসে প্রচুর ভালোবাসা এসেছে
অতিথি পাখির মতো। কখনো চোখে দূরবিন
লাগিয়ে, কখনো গালে হাত দিয়ে বসে
ভালোবাসা খুঁজছি। দেখি, চারদিকে প্রচুর
ভালোবাসা। লেকের সিঁড়িতে ভালোবাসা,
ডিঙিতে ভালোবাসা, ফাস্ট ফুডে ভালোবাসা,
ড্রিংকসের স্ট্রিতে ভালোবাসা। ফুটপাতে
ভালোবাসা, ব্রিজের রেলিংয়ে ভালোবাসা। স্টেপ
কাটে ভালোবাসা, লেয়ার কাটে ভালোবাসা।
আমি যে গাছের গোড়ার বেঞ্চে বসে ছিলাম,
তার ডাল থেকে আমার মাথার ওপর দিয়ে
ফ্লাইং সসারের মতো নামল দুটো উড়ন্ত

ভালোবাসা! বু ফুঁ দিলাম। বাঁয়ে তাকালাম।
দেখি, একটু দূরে আমার চোখে চোখ রেখে
অপলক আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক
জর্জেট ভালোবাসা। একা। ভালোবেসেই কি না
কে জানে—চোখে চোখ রেখে আমার দিকে
ক্যাটওয়াক ছন্দে এগিয়ে আসতে লাগল জর্জেট!
হাত দুটো ওর পেছনে। হার্টবিট বাহাত্তর থেকে
সেধুরিতে পৌঁছল। সোজা এসে আমার গা
ঘেঁষে বসল। আমি বড় বড় চোখে একটু সরে
বসলাম। এবারে হাত পেছন থেকে সামনে নিয়ে
এল জর্জেট। হাতে একটি উদ্যত গোলাপ!
শাসানোর ভঙ্গিমায় বলে, ‘একদম নড়বে না।
খবরদার।’

ভয়ংকরভাবে চমকে উঠি। বলি, ‘ল্যাংগুয়েজ,
প্লিজ। আপনি করে বলুন!’ ‘চোপ! তুই করে
বলিনি এটাই ভাগ্য!’ আরেকটু পেছনে সরে
আসি। সরে এসেই চোখ বড় হয়ে যায় আমার।
কার গায়ে যেন ধাক্কা খেলাম! দেখি একজন
সুতি ভালোবাসা বসে! পিওর কটন। হাতে
উদ্যত রজনীগন্ধা! মুখে কুটিল হাসি। সর্বনাশ,
এবার বাঁয়ে সরে এসে মধ্যবর্তী হই। কিন্তু ওরা
ক্রমশ কাছে ঘেঁষতে থাকে। LOVE স্যান্ডউইচ
বানাবে বোধ হয়! আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলি,
‘আমি কিন্তু লোকজন ডেকে জড়ো করব!’
সুতি ফিসফিসিয়ে বলে, ‘লাভ নেই। ওই যে
দেখ, চারদিকে আমাদের মেয়েরা বসে! একদম
চুপ!’

সর্বনাশ! দেখি, পিলারের ওপর এক গোলাপি
ভালোবাসার হাতে ভ্যালেন্টাইন কার্ড। একদৃষ্টে
তাকিয়ে কার্ড নাচাচ্ছে। চটপটির চেয়ারে এক
প্রিন্টেড ভালোবাসা। হাতে একটা বালিশাকৃতির
লাল হৃদয়। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হৃদয়টার
ওপর মাথা রেখে। দেখি, একটা গাড়ির বনেটের
ওপর একটি সাদা-কালো ভালোবাসা। এক
হাতে একটা ফুলের তোড়া আর অন্য হাতে
একটি ঝুনঝুনি! আমাকে দেখিয়ে ঝুনঝুনি
নাচাচ্ছে—মারের ভঙ্গিমায়। ধক করে উঠল
বুকটা! একটি হাত সন্তর্পণে আমার কোমর
পেঁচিয়ে ধরেছে। দেখি জর্জেটের হাত! কাঁদো
কাঁদো গলায় বলি, ‘আমি কিন্তু এবার চিৎকার
করব।’ ফিসফিসিয়ে শাসায় জর্জেট, ‘চিৎকার
করলে আমরাও করব। আমাদের পাওয়ার
তোমার চাইতে বেশি।’

হাত সরিয়ে নেয় জর্জেট। কটনের দিকে তাকিয়ে হতাশায় মাথা নাড়ে। সুতি ভালোবাসা আমার শার্টের ওপরের একটি বোতাম খুলে রজনীগন্ধার স্টিক সঁধিয়ে দেয়। ‘অ্যাঁই, প্লিজ, সুড়সুড়ি লাগছে। লজ্জাও লাগছে কিন্তু!’ ‘চোপ।’ ফিসফিসিয়ে ওঠে জর্জেট। ‘ছেলেমানুষের আবার সুড়সুড়ি বা লজ্জা কিসের? দেখ, ফারজানা, আরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ!’ আস্তে করে পেছন থেকে কে যেন আমার গলায় ঝোলানো দুরবিনটা তুলে নেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সুতি-জর্জেট দুজনই দাঁড়িয়ে যায়। দুজন একসঙ্গে বলে ওঠে, ‘স্লামলাইকুম, ম্যাডাম।’ চট করে দাঁড়িয়ে যায়। দেখি, আমার দুরবিন হাতে একজন ইউনিফর্ম ভালোবাসা দাঁড়িয়ে। আর কখন যেন গোলাপি ভালোবাসা, প্রিন্টেড ভালোবাসারা ইউনিফর্মের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইউনিফর্ম: কিছু পেলেন?

জর্জেট: নো আর্মস, ম্যাডাম।

শুধু এটা পেয়েছি পকেটে।

সর্বনাশ! আমার ভিজিটিং কার্ড হোল্ডারটা জানি কখন হাতিয়ে নিয়েছে কটন। বোধ হয় সুড়সুড়ি দিয়ে। হোল্ডারটা খুলে একটা কার্ড নিয়ে পড়তে থাকে ইউনিফর্ম ভালোবাসা। আর পড়েই চম্ফু চড়কগাছ। বিগলিতভাবে বলে, ‘ইয়ে, আ-প-নি? এখানে কী করছেন একা একা?’

আমি: আমার তো দোকা নেই, একা-দোকা বুঝি না।

গোলাপি: ম্যাডামও তো একা। তাই বলে উনি কি একা বসে আছেন?

রাগী চোখে তাকান ইউনিফর্ম গোলাপির দিকে।

ইউনিফর্ম: আহ্, লিপি! কাউকে না চিনে ফস করে কিছু বলবে না। ইয়ে—

আমি: বলুন।

ইউনিফর্ম: আসলে দূর থেকে আপনাকে দেখে আমার কাছে একজন ‘ইভ টিজার’ মনে হয়েছিল। তাই এদের পাঠিয়েছিলাম, স্যরি।

আমি: নো নো, ইটস ওকে। ইউনিফর্ম: থ্যাংক্যু।

দুরবিন দিয়ে কী করছেন?

আমি: আসলে, পাখি পর্যবেক্ষকদের মতো

আমিও একজন ভালোবাসা পর্যবেক্ষক। দুরবিন দিয়ে ভালোবাসা খুঁজছি।

ইউনিফর্ম প্রিন্টেড ভালোবাসা থেকে লাল

হৃদয়টা নিয়ে আমাকে দিয়ে বলেন, ‘আমরা লজ্জিত। কাল থানায় এসে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন, প্লিজ।’

উধাও হয়ে যায় ভালোবাসার দল।

আমি মাথা নিচু করে ভাবতে থাকি—ভালোবাসা দিবসের পরের দিনের এই চা-টা কি হবে LUCKY চা, নাকি

চা-LUCKY? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

515) হৃদয়ে ভালোবাসা ইনস্টল: এ টু জেড - ফিউশন রহমান

ভাইরাসসহ নানা সমস্যার কারণে হৃদয় অপারেটিং সিস্টেমের গতি ধীর হয়ে যেতে পারে। অনভিজ্ঞতার কারণে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। হৃদয় হ্যাকিংয়ের ঘটনাও কি একেবারে কম? অন্যদিকে আবার ব্যবহারকারীর বিয়ের পর সফটওয়্যারটি অস্বাভাবিক ধীরগতির হয়ে যায়—এমন অভিযোগ পাওয়া যায় প্রায়ই।

এসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে সাময়িক সুফল পাওয়া যায় হয়তো, তবে পুরোপুরি নয়। এ জন্য দরকার ‘ভালোবাসা এক্সপি প্রফেশনাল’ সফটওয়্যারের হালনাগাদ সংস্করণ। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম আর হৃদয় অপারেটিং সিস্টেমের পার্থক্য যেহেতু আকাশ-পাতাল, সে জন্য ‘ভালোবাসা’ ইনস্টল করা সহজ কোনো ব্যাপার নয়। অনেকের আবার আছে অহেতুক প্রযুক্তিভীতি। সব দিক ভেবে সাধারণের বোঝার উপযোগী করে হৃদয়ে ভালোবাসা ইনস্টল করার ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো। ইনস্টল করুন বুঝে-শুনে

শুরুতেই বলে রাখা ভালো, ইউএসবি পোর্ট ব্যবহার করে ভালোবাসা ইনস্টল করা যদিও সহজ, তবে তাতে ঝুঁকিও কম নয়। এ জন্য এ পদ্ধতি পরিহার করাই ভালো। আবার ডেটা কেবলের মাধ্যমে তাড়াহুড়ো করে ভালোবাসা ইনস্টল করাও ঠিক নয়। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরো হৃদয় অপারেটিং সিস্টেম হ্যাং হয়ে যায়। তাতে আপনার হার্ডড্রাইভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়িয়ে ভালোবাসা ইনস্টল করুন ধাপে ধাপে, বুঝে-শুনে। ভালোবাসা কী, কেন, কীভাবে ‘ভালোবাসা এক্সপি প্রফেশনাল’ একটি নির্ভরযোগ্য প্রোগ্রাম, এখন পর্যন্ত বিশ্বে যা

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাজারে এ ধরনের বেশকিছু সফটওয়্যার (মাইক্রোসফট আবেগ ২০০০, এডবি অনুভূতি সিএস ইত্যাদি) প্রচলিত থাকলেও তার কোনোটিই মানসম্পন্ন নয়। প্রোগ্রামটি সাধারণত হৃদয় অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গেই বান্ডেল হিসেবে যুক্ত থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে সেটা নিঃশব্দে সচল থাকে। মনিটর কিংবা টুলবারে কখনোই প্রোগ্রামটিকে সরাসরি কিংবা শর্টকাট হিসেবে দেখতে পাবেন না। কিন্তু আপনার অপারেটিং সিস্টেমে থাকা প্রায় প্রতিটি প্রোগ্রামেই এর প্রভাব থাকে। ভালোবাসা এক্সপি প্রফেশনাল আপনার পুরো স্মৃতি সার্চ করে ‘ঘেন্না.com’, ‘তিক্ততা.exe’, ‘স্বার্থপরতা.com’ ও ‘বিদ্বেষ.exe’-এর মতো ক্ষতিকর প্রোগ্রামগুলো খুঁজে বের করে। তাতে সুফল মেলে সঙ্গে সঙ্গেই। যেমন আপনাকে ‘নিদারুণ অপমান.mp4’ ফাইলটি কখনোই আর শুনতে হবে না। কিছু কিছু ক্ষতিকর ফন্টও আপনার হৃদয়ে আর কাজ করবে না। যেমন— গালিগালাজ১২, ককর্শ১০ ইত্যাদি। ডাবল ক্লিকে হৃদয় খুলুন ইনস্টল শুরু করার জন্য প্রথমেই ডাবল ক্লিক করে আপনার হৃদয়খানি খুলুন। খুব সাবধানে লক্ষ্য করুন, একই সময়ে আপনার হৃদয়ে অন্য কোনো প্রোগ্রাম চলছে কি না। এ জন্য কি-বোর্ডের Ctrl+Alt+Delete চাপুন একসঙ্গে। এবার হার্ট অ্যাপ্লিকেশন ট্যাবে ক্লিক করুন। যদি এর আগে অন্য কোনো অতিরিক্ত হৃদয় ইনস্টল করে থাকেন, তাহলে ‘অতীতে পাওয়া আঘাত.exe’, ‘মৃদু অভিমান.exe’ ও ‘চরম হতাশা.exe’ প্রোগ্রামগুলোকে তখনো চলতে দেখবেন। ইনস্টলেশন-প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ক্ষতিকর এসব ফাইল মুছে ফেলা জরুরি। কীভাবে মুছবেন হৃদয়ঘটিত টেম্পোরারি ফাইল অপারেটিং সিস্টেম থেকে হৃদয়ঘটিত পুরোনো টেম্পোরারি ফাইল মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন ‘আবেগ ২.০’ নামের একটি ছোট ইউটিলিটি সফটওয়্যার। তবে হ্যাঁ, নানা চেষ্টার পরও হার্ডড্রাইভ থেকে এসব প্রোগ্রাম পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়, কিন্তু ভালোবাসার প্রভাবে সেগুলো অন্যান্য প্রোগ্রামের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শুধু খেয়াল রাখতে হবে,

‘হিংসা.exe’ ও ‘বিরক্তি.dat’ প্রোগ্রাম দুটি কোনোভাবেই যেন আপনার অপারেটিং সিস্টেমে চলতে না পারে। কারণ, সঠিকভাবে ভালোবাসা ইনস্টলের ক্ষেত্রে এ দুটি ক্ষতিকর প্রোগ্রাম পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ জন্য স্টার্ট মেন্যু থেকে ‘করজোড়ে ক্ষমা’ প্রোগ্রামটি চালু করুন ডাবল ক্লিক করে। বেশ কয়েকবার প্রোগ্রামটি চালু রাখার দরকার হতে পারে, যতক্ষণ না ‘হিংসা.exe’ ও ‘বিরক্তি.dat’ পুরোপুরি মুছে না যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত এরর মেসেজ

ইনস্টল করার সময় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত এরর মেসেজের সম্মুখীন হতে পারেন। যেমন ‘এরর-৪১২: বাইরের যন্ত্রাংশ নিয়ে প্রোগ্রামটি রান করা সম্ভব নয়...’ অনেকেই এতে ঘাবড়ে যান। তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এটা সাধারণ একটি সমস্যা। এর মানে হলো, ভালোবাসা প্রোগ্রামটি আপনার এক্সটারনাল হৃদয়ে চলতে সক্ষম, তবে হৃদয়জুড়ে নয়। আরও সরলভাবে বললে, অন্যকে ভালোবাসার আগে আপনি নিজেই নিজেকে ভালোবাসা শুরু করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এর সমাধান কী? খুবই সহজ, সার্চ দিয়ে ‘আত্মবিশ্বাস’ ডিরেক্টরিটা খুঁজে বের করুন প্রথমে। এরপর ‘মাই হার্ট’ ডিরেক্টরিতে কপি করুন এই তিনটি ফাইল: ‘আত্ম-উপলব্ধি.txt’, ‘নিজেকে ক্ষমা করো.doc’ ও ‘নিজেকে জানো.txt’। এ ছাড়া প্রতিটি ডিরেক্টরির ভেতর লুকিয়ে থাকা ‘অতিরিক্ত আত্মসমালোচনা.exe’ ফাইলটি ডিলিট করুন, পুরোপুরি মুছে দিন রিসাইকেল বিন থেকেও। ‘আনঅ্যাবল টু কানেক্ট’ নামের আরেকটি এরর মেসেজ দেখা যায়। এটা একদমই উপেক্ষা করুন। আপনার হৃদয় কোন দেশে তৈরি, কোন ব্র্যান্ড কিংবা মডেল কী—এসবের কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপগ্রেড করুন সময়-সুযোগমতো ভালোবাসা ইনস্টলের পরবর্তী ধাপগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে। সেটা নিয়ে আলাদা করে ভাবার কিছু নেই। তবে মনে রাখতে হবে, এটা মূল প্রোগ্রাম মাত্র। একে সচল রাখার জন্য নিয়মিত আপডেট-আপগ্রেড করা জরুরি। আপনি যদি একে আপগ্রেড করতে চান, তাহলে অবশ্যই অন্য কোনো হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। ইনস্টলের শেষ ধাপ

এতক্ষণে আপনি দেখে থাকবেন, আপনার হৃদয় নতুন নতুন ফাইলে ভরে গেছে। মনিটরের ডান দিকে ‘মুচকি হাসি.mp3’ ফাইলটি দেখা যাবে। ‘হৃদয়ের উষ্ণতা.com’, ‘অনাবিল প্রশান্তি.exe’ ও ‘রংতামাশা.com’ ফাইলগুলো আপনার হৃদয়জুড়ে নিজেরাই নিজেদের কপি করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, অন্যথায় কি-বোর্ডে ‘কন্ট্রোল+শিফট+সি’ চাপুন। এ পর্যন্ত যদি আসতে পারেন, তাহলে বুঝবেন, আপনার হৃদয়ে ভালোবাসা ইনস্টল পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। একনজরে ‘ভালোবাসা এক্সপি প্রফেশনাল’ সফটওয়্যারের ধরন: ফ্রিওয়্যার, লাইসেন্স ছাড়াই বিনা মূল্যে বিতরণযোগ্য।

অপারেটিং সিস্টেম: হৃদয় অপারেটিং সিস্টেম ২০১০ (সার্ভিস প্যাক ৪), এমএস হার্ট বিজনেস এডিশন।

হার্ডডিস্ক: ইনস্টলযোগ্য হৃদয়ে সর্বোচ্চ ২৩০ হার্টবিট এবং সর্বনিম্ন ১৪০ হার্টবিট সমপরিমাণ জায়গা খালি থাকতে হবে।

ফাইল সাইজ: ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

516) ভালোবাসার হাসি - আহসান হাবীব

পাশাপাশি দুই ফ্ল্যাট। দুই বান্ধবী। একজনের জীবন রোমান্টিসিজমে পরিপূর্ণ। অন্যজন তার উল্টো। একজন যখন স্বামীর ভালোবাসার গল্প বলে, অন্যজন তখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। একদিন স্বামীর ভালোবাসায় টইটম্বুর বান্ধবী চেপে ধরল,
‘আচ্ছা, কী ব্যাপার বল তো?’
‘কোন ব্যাপার?’
‘আমি আমার স্বামীর ভালোবাসার কত গল্প করি তোকে, তুই কিছু বলিস না কেন?’
‘ইয়ে, না মানে...তোরটা শুনতেই ভালো লাগে।’
‘না না, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হচ্ছে। তুই কখনোই কিছু বলিস না...আজ তোকে বলতেই হবে...।’

‘কী বলব?’

‘ভালোবাসার কথা।’

‘ধ্যাত্!’ শেষ পর্যন্ত অরোমান্টিক বান্ধবী বলতে বাধ্য হলো যে তার স্বামী মোটেই রোমান্টিক নয়। বাসররাতে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, কারেন্ট

ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে জানালা খুলে বলেছিল,
'বাপ রে, কত বড় চাঁদ উঠেছে!' পাঁচ বছরের
বিবাহিত জীবনে রোমান্টিক ডায়লগ ওই
একটাই!

'বলিস কী! ভালোবেসে তোকে কিছু বলে না?'
'না।'

'কোনো উপহারও দেয় না?'

'না।'

'হায় হায়, কী বলছিস এসব! এত দিন বলিসনি
কেন?'

'বললে কী হতো শুনি?'

'আরে বোকা, যে পুরুষমানুষের মধ্যে ভালোবাসা
নেই, তার ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হয়। তুই
সেই কাজটাই করিসনি। শোন, আমি তোকে
বুদ্ধি দিচ্ছি।'

'কী বুদ্ধি?'

'আরে বোকা, স্বামীর ভালোবাসা আদায়ের বুদ্ধি।
শোন, তোকে একটা বুদ্ধি দিই...সামনে চৌদ্দই
ফেব্রুয়ারি আসছে ভ্যালেন্টাইন ডে, এই
চান্স...তুই করবি কি, ১৩ ফেব্রুয়ারিতে তোর
বরকে বলবি...'। তারপর দুই বান্ধবী অনেকক্ষণ
ফিসফাস করল।

১৩ ফেব্রুয়ারি খুব দ্রুতই চলে এল।

অরোমান্টিক বান্ধবী রাতে স্বামীর ঘরে চা নিয়ে
ঢুকল। গম্ভীর শিক্ষক স্বামী কিঞ্চিৎ অবাক
হলো...।

'চা চেয়েছিলাম নাকি?'

'না, চাওনি। আমার খেতে ইচ্ছে হলো, তাই
তোমার জন্যও বানালাম।'

'ও।'

স্বামী চা খেতে খেতে বইয়ে মনঃসংযোগ করল।

'ইয়ে, জানো কী হয়েছে? কাল রাতে একটা
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম তোমাকে নিয়ে।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম তুমি আমার জন্য ১৪ তারিখে একটা
দামি হিরের আংটি কিনে এনেছ।'

'স্পেসিফিক ১৪ তারিখে কেন?'

'বাহ, ১৪ তারিখ ভ্যালেন্টাইন ডে না?'

'ও আচ্ছা...!' ব্যস, স্বামী আবার বইয়ে ডুবে
গেল। পাশে চা ঠান্ডা হতে লাগল। পরদিন
রোমান্টিক বান্ধবী ছুটে এল,

'কিরে, বরকে স্বপ্নের কথা বলেছিলি?'

'হু'

‘কী বলল?’

‘কী আর বলবে...বই পড়ছিল, ফের বইয়ে ডুবে গেল।’

‘দেখবি...ওষুধ ঠিক কাজ করবে...ভ্যালেন্টাইন ডের কথা বলেছিলি তো?’

‘হ্যাঁ।’ আশ্চর্যের ব্যাপার! ভ্যালেন্টাইন ডেতে সত্যি সত্যিই শিক্ষক স্বামী একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকল। গম্ভীর মুখে বাড়িয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। স্ত্রী অধীর উত্তেজনায় তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলল প্যাকেটটা। না, ভেতর থেকে কোনো হিরের আংটি বেরোল না। বেরোল একটা বই। বইয়ের নাম সোলায়মানী খাবনামা— স্বপ্নে কী দেখলে কী হয়।

সে রাতে শিক্ষক স্বামীর চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে রইল স্ত্রী। স্বামী যথারীতি বইয়ে নিমগ্ন। পাশে শুয়ে স্ত্রী ভাবছিল, কাল বান্ধবীকে কী বলবে। বেচারা এত বুদ্ধি-পরামর্শ দিল...সব জলে গেল। পরদিন ভোরে মুখ ধুতে গিয়ে হঠাৎ অরোমান্টিক বান্ধবী আবিষ্কার করল, বাম হাতে ঝকঝক করছে একটা আংটি। চোখ বন্ধ করেই বলা যায় আংটিটা হিরের। বাথরুমের আয়নায় দেখা গেল পেছনে দাঁড়ানো শিক্ষক স্বামীর মুখ...না গম্ভীর মুখ, না। মুখে মিটিমিটি হাসি। ভালোবাসার হাসি বোধহয় এমনই হয়...! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

517) সপ্তকান্ড মজিদ ভাই - মৃদুল আহমেদ

মজিদ ভাইয়ের মনে বড় দুঃখ। সেই দুঃখে মজিদ ভাই সারাক্ষণ মুখটা কালো করে রাখলেও সেটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কারণ মজিদ ভাইয়ের গায়ের রং কুচকুচে কালো। তাঁর দুঃখ হলো, ‘গায়ের রং ঠিক আছে, কিন্তু আমি বিদেশে জন্মালে কি কোনো সমস্যা ছিল? কে না জানে, বিদেশে কালোদের কত খাতির! সাদা চামড়ার অপরূপ ক্লাসিক মেয়েরা তাদের পাশে খাটকাল চেহারার কালো ছেলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।’ খোদাতালার একটা সাধারণ ডকুমেন্টেশনের ভুলের জন্য তিনি বিদেশের আমির না হয়ে আজ দেশের ফকির!

মজিদ ভাই অবশ্য এই ব্যারিয়ার ভাঙার চেষ্টা করেছেন। বিদেশের মাটিতে তাঁর দর্পিত কৃষ্ণকায় পা-খানা রাখার অদম্য ইচ্ছায় তিনি

দেশের মাটি বেচে দিয়েছেন। মানে শনির আখড়ার তিন কাঠা জমি বেচে পয়সা দিয়েছেন আদম ব্যাপারীকে। পরিণতিতে সেই আদম ব্যাপারী লাখপতি হয়ে গেছে, কিন্তু মজিদ ভাইকে এখন পয়সা জমাতে হচ্ছে কবরের জমি কেনার জন্য। কারণ মজিদ ভাইয়ের আত্মা এই ঘটনা জানতে পারলে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই...

বেশ কিছুদিন বুম হয়ে থাকার পর আবার একদিন জেগে উঠলেন তিনি। ভাবলেন, চেহারাটাকে নতুন উদ্যোগে একটু খোলতাই করার চেষ্টা করা যাক। এরপর আরও নানা কাহিনি। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলীর পুরুষ সংস্করণ গালে মেখেছেন। এতে বন্ধুরা বলেছে, 'মুখের মধ্যে এ রকম পাতলা চুনকাম করেছে কে রে?' শীতকালে মুখটা ঝকঝকে দেখানোর জন্য বিদেশি সুগন্ধভরা ক্রিম মেখেছেন। বন্ধুরা দেখে বলেছে, 'কী রে, মুখটাকে তো একেবারে পালিশ করা লেদারের জুতো বানিয়ে এনেছিস!' বন্ধুরাই যদি এ রকম কথা বলে, তাহলে শহরের সুন্দরী মেয়েরা কী বলবে? মজিদ ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আর দশটা মানুষের থেকে আলাদা। সবাই তাদের বুকের মধ্যে হার্টের পাশাপাশি ফুসফুস, কলজে-মলজে অনেক কিছু নিয়ে জন্মায়, কিন্তু মজিদ ভাইয়ের পুরো বুকেটা জুড়ে শুধুই একটা রেকর্ড মাপের হার্ট। যে হার্টের রক্তে রক্তে, অন্দরে বন্দরে তন্ত্রী তরুণীদের জন্য বন্যার পানির মতো এক হাঁটু ভালোবাসা থই থই করছে।

কিন্তু হায়, সেই হাঁটুপানিতে কোনো লাস্যময়ী জলকেলি বা নিদেনপক্ষে একটু ঝাঁপাঝাঁপিও করতে এল না!

মজিদ ভাইয়ের আত্মা দীর্ঘদিন ধরে তার বিয়ের চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু আজন্ম প্রেমিক মজিদ ভাইয়ের মতে, সম্বন্ধ করে বিয়ে করা মানে নেহরু-ভুটোর মতো মিটিং করে দেশ পাওয়া, আর নানা ধরনের পক্ষ-বিপক্ষ মতের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেম করে বিয়ে করা মানে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করার মতো ব্যাপার।

কিন্তু দীর্ঘদিন নানা জায়গায় চেষ্টাচরিত্র করে মজিদ ভাই যখন মেয়েদের ঠাটা-মশকরা-অবহেলায় পর্যুদস্ত, তখন সব চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি নেহরু-ভুটো তত্ত্বের দিকেই এগোলেন।

নাইল নদীর মতো লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আম্মাকে বললেন, ‘ঠিক আছে, পাত্রী
দেখো...আমাকে কিছু দেখানোর নেই, তোমাদের
পছন্দই আমার পছন্দ!’

পরাজিত সম্রাটের মতো হাঁটতে হাঁটতে আম্মার
ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছাদে এসে
একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে
আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হে রাতের
আকাশ, তুমি কালো তবু কতই না রূপবান...
তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত অষ্টাদশীর
নির্ঘুম রাত কেটে যায়, অথচ...’

এ রকম যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই মাথায় টুপ
করে এক ফোঁটা পানি পড়ল! মজিদ ভাইয়ের
দুঃখে আজ আকাশের চোখেও পানি! ভাবতেই
মজিদ ভাইয়ের চোখে পানি চলে এল...

ঠিক তখনই হুড়মুড়িয়ে প্রায় আধা বালতি পানি
এই শীতের রাতে তার গায়ে এসে পড়ল! মজিদ
ভাই হাউমাউ করে উঠে তাকিয়ে দেখেন,
পাশের আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছয়তলা বাড়ির ছাদ
থেকে দুটো মজুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নিচের
দিকে তাকিয়ে আছে।

বয়স্ক একজন মজুর বলল, কিডা...? নিচের
ছাদে আছেন নিহি কেউ?

কোনো শব্দ না করে মজিদ ভাই গজগজ করতে
করতে নিচে নেমে এলেন। এর কদিন বাদেই
তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রী তিনি আর
দেখেননি, দেখতেও চাননি! বাসররাতে সবাই
তাকে হিন্দি সিনেমার কায়দায় ধাক্কা দিয়ে
অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল! বউ নির্ঘাত
বিছানায় বসে আছে, মজিদ ভাই কিছুটা
কৌতূহল, কিছুটা টেনশন নিয়ে এগিয়ে গেলেন!
কিন্তু বিছানায় যে কেউ নেই! মজিদ ভাই
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে কাঁসার ঘণ্টার
মতো একটি নারীকণ্ঠ বেজে উঠল, ‘উ. ন্যাকা!
অন্ধকারে বউ খুঁজে পায় না! আমি তোমার
থেকে বেশি কালো না, বুঝেছ?’

মজিদ ভাই হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে
বললেন, ‘সোনিয়া!’

বউটি মিটমিট করে হেসে বলল, ‘চিনতে পেরেছ
তাহলে?’

চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। মজিদ
ভাইয়ের ফুফাতো ভাইয়ের বড় শালার চাচাতো
শালীর ননদ। মজিদ ভাইয়ের মতোই ঘোরতর

কৃষ্ণকায়। প্রথম দেখার পর থেকেই আঠার মতো মজিদ ভাইয়ের পেছনে লেগে ছিল সে। মজিদ ভাই সারা জীবন ফরাসি মেয়েদের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, তাই জীবনের একমাত্র প্রত্যাখ্যানটি তিনি সোনিয়াকেই করতে বাধ্য হয়েছিলেন!

সোনিয়া আপা সাপের মতো হিসহিসে গলায় বললেন, ‘খুব ফর্সা মেয়ে খুঁজে বেড়ালে এত দিন, তাই না? পেলেন না তো কাউকে, আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম কিনা!’

মজিদ ভাই চমকে উঠে বললেন, ‘অভিশাপ!’ ‘হ্যাঁ, এ কারণেই তো কাউকে খুঁজে পাওনি! অভিশাপ না থাকলে পেয়ে যেতে, গায়ের রংটা কালো তো কী? তুমি মানুষটা তো অনেক সুন্দর! যথেষ্ট লম্বা, গলার ভয়েস ভালো, ছিমছাম মেদহীন শরীর...’

মজিদ ভাই নড়েচড়ে দাঁড়ালেন। তার মুখটা আপনা থেকেই কেমন যেন হাসি হাসি হয়ে উঠেছে। মনের ভেতর একটা ফুরফুরে ভাব। কী যেন একটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে ভেতরে। পেছন থেকে একটা অদৃশ্য মানুষ তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলল বিছানার দিকে।

...পাঠক, এর পরের দৃশ্যে আমরা না-ই থাকি।

এই সময়টি একান্তই মজিদ ভাই আর সোনিয়া আপার।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

518) কিংকর্তব্যবিমূঢ় - আদনান মুকিত

বিশেষ দিনগুলোয় আমার কোনো কিছুই ঠিকমতো হয় না। আজও হয়নি। ঘুম থেকে উঠতেই কত ভেজাল। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। রীতিমতো ভোর। এত সকালে উঠে কী হবে, ভেবে আবার ঘুমালাম। অনেকক্ষণ পর উঠে দেখি, সেই সাড়ে সাতটাই বাজছে। ঘড়ি নষ্ট হওয়ার আর সময় পেল না। তাড়াতাড়ি মোবাইলে সময় দেখে মাথা ঘুরে গেল। সোয়া নয়টা বেজে গেছে। তিথি আসবে ১১টায়। অতি দ্রুত বের হতে গিয়ে আবারও ভেজাল। ডান পায়ের স্যান্ডেলটা ঠিকই আছে, বাম পায়েরটা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। স্যান্ডেল বাদ। জুতা পরব ভেবে জুতা পায়ে দিতেই বাম পায়ের স্যান্ডেলটা খুঁজে পেলাম। সামনেই ছিল, খেয়ালই করিনি। শেষে স্যান্ডেল পরেই বেরোলাম।

‘কোথাও তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হলে কখনোই রিকশা পাবে না’, নিউটনের চতুর্থ সূত্র। সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। তখনই মনে পড়ল পঞ্চম সূত্রটি। রিকশা পেলেও তাতে অবশ্যই কোনো না কোনো সমস্যা থাকবে। রিকশাওয়ালা বাসার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের চেয়েও ধীরগতির। তার ওপর একটু পরপর পেছনে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে, চেন পড়ছে! কী আনন্দের কথা। চেন পড়ছে! ইচ্ছে করছিল কশে একটা চড় দিয়ে ব্যাটার দাঁত ফেলে দিয়ে বলি, দাঁত পড়ছে! আজকে একটা শুভদিন, তাই কিছু বললাম না। এগারোটা চব্বিশে এসে শুনি তিথি এখনো বাসায়। আমি নিশ্চিত তার মেকআপ শেষ হয়নি। এ যুগের মেয়েরা পাশের ফ্ল্যাটে গেলেও চোখে মাশকারা দেয়। কিডন্যাপার এসে যদি বলে, ‘চিৎকার করবেন না, আমরা আপনাকে কিডন্যাপ করতে এসেছি।’ ওরা বলবে, ‘একটু ওয়েট করুন, আমি রেডি হয়ে আসছি।’ বিরক্তিকর! মেজাজ ঠান্ডা করতে চা খাওয়া দরকার। মেজাজ গরম, চা-ও গরম, বিষে বিষক্ষয়। তবে আজকাল দোকানে চা খেতে গেলেও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হলোও তা-ই। চিকন কাপে অল্প একটু চা। দেখে মনে হয় কোনো শক্তিশালী পালোয়ান চাপ দিয়ে কাপটা চিকন করে ফেলেছে। সেই কাপের চা-ও ভালো না, চিনি হয়নি। দোকনদারকে বললাম, ‘চায়ে চিনি হয় নাই।’ ‘কী কন? কতগুলো চিনি দিলাম। আরও দিলে চা তো গরম শরবত হইয়া যাইব।’ তাতে আপনার কোনো সমস্যা আছে? আপনি চিনি দেন, গরম শরবতই খাব। এমন সময় তিথি এল। আমি হাসিমুখে এগিয়ে বললাম, ‘তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে’ (খাঁটি মিথ্যে কথা)। তিথি তো মহাখুশি। বললাম, ‘তুমি দেরি করেছে, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না। অফিসে যেতে হবে।’ ‘ভ্যালেন্টাইন ডে-তে অফিস না করলে কী হয়?’ ‘অফিসে তো আমি একা প্রেম করি না, অন্যদেরও একটু সুযোগ দেওয়া দরকার। তাই না?’ মুচকি হাসল তিথি। আমরা হাত ধরে হাঁটা শুরু করলাম। মনে হচ্ছে দেশের সব প্রেমিক-

প্রেমিকা এখানে চলে এসেছে। এর সুযোগ নিচ্ছে হকাররা। চুড়ি, মুড়ি, ফুল, বসার টুল, কানের দুল, পাখা, ব্যাগসহ নানা ধরনের জিনিস নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েছে। একপাশে প্রেমিক-প্রেমিকারা কাঠের ব্লকের সাহায্যে হাতে-মুখে রঙের ছাপ দিয়ে আঁকছে হার্ট সাইন। তিথি জোর করে সেখানে নিয়ে গেল আমাকে।

‘তোমার হাতটা দাও, একটা হার্ট সাইনের ছাপ বসাবে। মাঝখানে “টি” লেখা থাকবে।’

‘থাক না, লোকে কী বলবে?’

‘লোকের কথায় কী হয়? আমার সঙ্গে ভয় পাও নাকি?’

‘ভয় পাব কেন?’

‘তাহলে হাত দাও।’

আমি হাত দিলাম। মোঁচওয়ালা এক লোক কাঠের ব্লকে ছাপ দিয়ে হাতে হার্ট সাইনের ছাপ বসিয়ে দিল। হার্টের ভেতর দিয়ে একটা বাঁকা তীর চলে গেছে, তার ওপর লেখা ‘টি’। তিথির হাতেও একই ছাপ, শুধু ‘টি’র বদলে ‘ই’ লেখা। হাতের ওপর হার্ট নিয়ে বাদাম খাচ্ছি। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। কিন্তু এখন তো নীতুর ফোন করার কথা না, ওকে চারটা থেকে টাইম দিয়েছি। ঘটনা কী? ফোন ধরতেই নীতু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ‘তুমি এখনই টিএসসিতে আসো। বিরাট বিপদে পড়েছি।’

‘কী হয়েছে?’

‘প্লিজ, তুমি তাড়াতাড়ি আসো।’

আবারও ভেজাল! তিথিকে বললাম, ‘অফিসের সমস্যা। ক্লায়েন্ট এসে ঝামেলা করছে। এখনই যেতে হবে।’

‘এটা কোনো কথা হলো? অফিসের ঝামেলা বড় ঝামেলা। ঠিক আছে, যাও।’

‘রাগ করো না। ঝামেলা শেষ করেই চলে আসব। ওকে? বাই।’ কার্জন হল থেকে রিকশা নিয়ে দ্রুত টিএসসিতে এলাম। নীতু ওর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ গাড়িটাই আমার কাছে ওর গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বললাম, ‘কী হয়েছে?’

‘কিছু না। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল।

তাই ঢং করলাম। রাগ করেছ?’

‘আরে নাহ্। কী যে বলো।’

‘তুমি সব সময় এসেই আমার হাত ধরো, আজ ধরলে না কেন?’

এ কথা শুনেই আমার হার্টবিট শেয়ারবাজারের

মতো ওঠানামা করতে লাগল। সর্বনাশ! এখন
কী হবে? কোনোমতে বললাম,
‘ইয়ে মানে বিপদের কথা শুনে তাড়াতাড়ি
এসেছি তো, টেনশনে...’

‘এখন ধরো। আজ আমরা হাত ধরে অনেকক্ষণ
হাঁটব। নো গাড়ি।’

‘অবশ্যই।’

‘কী হলো? হাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছ কেন?
নাও, ধরো।’

‘থাক না...’

আমি কিছু করার আগেই নীতু আমার হাত ধরে
টান দিল। হাতের ওপর সুন্দর হার্ট সাইন দেখে
আঁতকে উঠল ও। ‘এটা কী? “টি” লেখা কেন?
“টি”র মানে কী?’

‘কিছু না, কিছু না। “টি” মানে চা। আমি চা খুব
ভালোবাসি তো...’

এমন সময় গাড়িটার একটু সামনে একটা
রিকশা থামল। রিকশা থেকে তিথি বলল,
‘ইমন, তুমি না অফিসে যাবে? এই তোমার
অফিস, এই তোমার ক্লায়েন্ট?’

আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরোল
না। ধরে থাকা হাতটা ছেড়ে দিয়ে নীতু গাড়িতে
উঠে চলে গেল। মামা, যান তো—বলে তিথিও
রিকশায় করে চলে গেল। দুজনেই যা বোঝার
বুঝে নিয়েছে, শুধু আমিই কিছু বুঝতে পারছি
না। একেই বোধ হয় বাংলা ভাষায় বলে
কিংকর্তব্যবিমূঢ়! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ১৪
ফেব্রুয়ারি ২০১১

519) খেকভ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র

ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে চিঠি পেল খেকভ। খাম
খুলে সে পড়তে শুরু করল:

‘প্রিয় কাকা, আমি কি তোমাকে চিঠি লিখতে
পারি?’

একটু ভেবে নিয়ে খেকভ উত্তর লিখল:

‘অবশ্যই পারিস।’ কিছুদিন পর আরও একটা
চিঠি এল:

‘আমি তোমাকে চিঠি লিখলে তুমি আমাকে উত্তর
দেবে তো?’ ভ্রাতুষ্পুত্র প্রশ্ন করল।

‘দেব’, প্রতিশ্রুতি দিল খেকভ।

‘কী বিষয়ে লিখব?’ প্রশ্ন এল পরের চিঠিতে।—

‘ছিদ্র করার জন্য ছুঁচলো একটা হাতিয়ার
কিনেছি, সে কথা?’

‘লিখিস,’ জানাল খেকভ।

‘আমার পোষা বাদুড়ের তিনটে বাচ্চা হয়েছে, তিন খুদে বাদুড়, সে কথাও লিখব?’ নিশ্চিত হতে চাইল ভ্রাতুষ্পুত্র।—‘আর আমি যে একটা স্টাডি সার্কেলে ঢুকেছি, সেটাও জানাব?’

‘হুঁ, সেটাও জানা।’ খেঁকভ সম্মতি জানাল।

‘আচ্ছা, খুব শিগগির চিঠি লিখব,’ ভ্রাতুষ্পুত্র লিখল পরবর্তী চিঠিতে। কাকা চিঠির অপেক্ষা করল অনেক-অনেক দিন। চিঠি নেই তো নেই-ই। একদিন দরজায় বেল বাজল হঠাৎ। দরজা খুলে কাকা দেখল ভ্রাতুষ্পুত্র দাঁড়িয়ে।

‘কাকা!’ খুশিতে চিৎকার দিয়ে বলল সে।

‘জানো, চিঠি লেখার সময় আমার একদমই নেই। তার চেয়ে বরং একদিন তোমাদের বাসায় বেড়াতে আসি? খুব বেশি দূরে তো থাকি না। শখানেক কিলোমিটারের মামলা।’

‘অবশ্যই আসিস’, নিমন্ত্রণ জানাল কাকা।

‘অবশ্যই আসব’, প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেল ভ্রাতুষ্পুত্র। ভিক্টর ভেরিজনিকভ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১১

520) একটি মেয়ে ও তার কুকুর - যুগরি লিখোলেতভ

ডেট করতে গেলাম এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি এল, সঙ্গে তার বন্ধু। কুকুর। আমি মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতেই কুকুর সেই যে কামড়ে ধরল আমার প্যান্টের পায়া, আর কিছুতেই ছাড়ে না।

‘বিচ!’ গালি চলে এল আমার মুখে।

‘আমার কুকুরকে গালি না দেওয়ার অনুরোধ রইল। আর ও মাদি কুকুর নয়। তবে খুব অভিমানী।’ মেয়েটি জানাল।

পা ঝাড়তে ঝাড়তে তাকে বললাম, ‘সরিয়ে নাও না ওকে!’

‘কাজ হবে না। ওর কামড় মরণকামড়। দরকার হলে সারা দিন কামড়ে ধরে থাকবে। তার চেয়ে চলো হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি।’

উজবুক এক কুকুরের কারণে ডেট পণ্ড করা উচিত হবে না বলেই মনে হলো আমার। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু হাঁটা তো বড়ই বিড়ম্বনাকর! কুকুরটা ঝুলছে নোঙরের মতো।

‘এমন কুকুরের দরকার কী তোমার?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘ধর্মকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে। কে জানে,

তোমার মাথায় কী আছে! আর জেনে রাখো, আমার কুকুর এক ধরনের বিশেষ কামড়ে অতিশয় দক্ষ—কোমরের নিচের অঞ্চলে।’ শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেল আমার শরীরের ভেতর দিয়ে।

আমি প্রশ্ন করলাম, ‘ও যদি প্যান্টের পায়া ছাড়া অন্য কোথাও কামড় দিত?’

‘এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মন খারাপের অর্থ আছে, বলো?’

‘তুচ্ছ ব্যাপার!’ বলে আমি এত জোরে পা ঝাঁকলাম যে প্যান্টের পায়ার এক টুকরো কাপড়সহ কুকুরটা দূরে ছিটকে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ছুটে এসে কামড়ে ধরল প্যান্টের অন্য পায়া।

‘প্যান্ট মেরামত করে দেবে কে, শুনি?’

‘পুশকিন?*' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘চলো না, আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করি।’ মেয়েটি প্রস্তাব দিল।

‘একটা কবিতা পড়ে শোনাও না! তোমার প্রিয় কোনো কবির।’

‘পুশকিনের?’

যেই না একটা কবিতা শোনাতে শুরু করব, অমনি কুকুরটা তার পেছনের পায়া তুলে ‘নিজস্ব এলাকা’র ছাপ বসিয়ে দিল আমার প্যান্টে, পায়ে।

আমি গালি দিতে শুরু করতেই মেয়েটা বলল, ‘ও তো এখনো ছোট। কিছু বোঝে না। কামড় ছেড়ে দেওয়ার কমান্ড দিলেও ও বুঝতে পারবে না।’

‘তাহলে কোন কমান্ড সে বোঝে?’

‘ধর!’

কুকুরটি তৎক্ষণাৎ প্যান্টের পায়া ছেড়ে দিয়ে আমার কোমরের নিম্নবর্তী অঞ্চলে কামড় দেওয়ার জন্য লাফ দিল। তবে তার আগেই আমি পাশের এক গাছে উঠে পড়তে সক্ষম হলাম।

‘নেমে এসো,’ অনুরোধ করল মেয়েটি। ‘আমি ওকে ধরে রাখব।’

‘আমি এখানেই বেশ আছি।’ বললাম গাছের ডালে আরাম করে বসতে বসতে।

‘তাহলে আমি বরং বাড়ি চলে যাই।’

‘যাও’ বলে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। মেয়েটি রাগ করে চলে গেল। তবে কুকুরটিকে

রেখে গেল গাছের তলায়। আমাকে শিক্ষা দিতে। আমি কীভাবে রাত কাটানাম, আলিঙ্গন করলাম প্রত্যুষের আলোকে, কীভাবে কুকুরকে ফাঁকি দিলাম—সে এক আলাদা ইতিহাস। তবে সেই থেকে কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করি, ‘কুকুর আছে?’

উত্তরে ‘হ্যাঁ’ শুনলে তৎক্ষণাৎ পাশের উঁচু কোনো গাছে চড়ে বসে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলে চিৎকার করতে শুরু করে দিই।

আমি বুঝতে পারি, লোকে আমাকে দেখে পাগল ভাবে, তবে ওই সময়ে নিজের ওপরে আমার নিয়ন্ত্রণ থাকে না—যেটাকে বলে আত্মরক্ষার সহজাত প্রতিক্রিয়া।* রুশ ভাষায় এ জাতীয় প্রশ্নবোধক বাক্যে একেবারেই ব্যঙ্গার্থে পুশকিনের নাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরও একটি উদাহরণ: ‘টেবিলে প্লেট রেখে উঠে গেলে যে! প্লেট ধোবে কে? পুশকিন?’

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

521) ক্রিকেট মানে ঝাঁঝি – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডেসিম্যালের পরে আবার একটা ভেকুলাম, তার সঙ্গে ভগ্নাংশ। এমন জটিল জিনিসকে সরল করা অন্তত আমার কাজ নয়। পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাই—এসব গোলমালের মধ্যে পা বাড়িয়ে আমার কী দরকার?

পণ্ডিতমশায় যখন দাঁত খিচিয়ে লুট-লুঙকে মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করেন, তখন আমি আকুলভাবে ‘ঘিনুন’ আর ‘আলু’ প্রত্যয়ের কথা ভাবতে থাকি। ওর সঙ্গে যদি ‘দাদখানি চাল’ প্রত্যয় থাকত—তাহলে আর কোনও দুঃখ থাকত না। তবে ‘চাঁটি’ আর ‘গাঁটা’ প্রত্যয়গুলো বাদ দেওয়া দরকার বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু অঙ্ক আর সংস্কৃতর ধাক্কা যদি বা সামলানো যায়—ক্রিকেট খেলা ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ রহস্যের খাসমহল। ‘ক্রিকেট’ মানে কী? বোধহয় ঝাঁঝি? দুপুরের কাঠফাটা রোদুরে চাঁদিতে ফোঁস্কা পড়িয়ে ও-সব ঝাঁঝি খেলা আমার ভালো লাগে না। মাথার ভেতরে ঝাঁঝি করতে থাকে আর মনে হয়—মস্ত একটা হাঁ করে কাছে কেউ ঝাঁঝিট খাম্বাজ গাইছে। অবশ্য ঝাঁঝিট খাম্বাজ কী আমার জানা নেই—তবে

আমার মনে হয়, ক্রিকেট অর্থাৎ বিঁঝি খেলার মতোই সেটাও ভয়াবহ।

অথচ কী গেরো দ্যাখো। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকেই ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। গোড়াতেই কিন্তু বলে দিয়েছিলুম—ও-সব আমার আসে না। আমি খুব ভালো ‘চিয়ার আপ’ করতে পারি, দু-এক গেলাস লেমন স্কোয়াশও নয় খাব ওদের সঙ্গে—এমন কি লাঞ্চ খেতে ডাকলেও আপত্তি করব না। কিন্তু ও-সব খেলা-টেলার ভেতরে আমি নেই—প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু প্রাণ যাওয়ার আগেই কান যাওয়ার জো!

আমাদের পটলডাঙার টেনিদাকে মনে আছে

তো? সেই—খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর

রণডম্বরুর মতো গলা—যার চরিতকথা

তোমাদের অনেকবার শুনিয়েছি? সেই টেনিদা

হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে তার আধ মাইল লম্বা

হাতখানা আমার কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—খেলবিনে মানে? খেলতেই হবে তোকে। বল

করবি—ব্যাট করবি—ফিল্ডিং করবি—ধাঁই করে

আছাড় খাবি—মানে যা-যা দরকার সবই করবি।

সই না করিস, তোর ওই গাধার মতো লম্বা-লম্বা

কানদুটো একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে নেব—

এই পাকা কথা বলে দিলুম।

গণ্ডারের মতো নাকের চাইতে গাধার কান ঢের

ভালো, আমি মনে-মনে বললাম। গণ্ডারের নাক

মানে লোককে গুঁতিয়ে বেড়ানো, কিন্তু গাধার

কান ঢের কাজে লাগে—অন্তত চটপট করে

মশা-মাছি তো তাড়ানো যায়।

কিন্তু সেই কানদুটোকে টেনিদার হাতে বেহাত

হতে দিতে আমার আপত্তি আছে। কী করি,

খেলতে রাজি হয়ে গেলাম।

তা, প্যান্ট-ট্যান্ট পরতে নেহাত মন্দ লাগে না।

বেশ কায়দা করে বুক চিতিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ

হতভাগা ক্যাবলা বললে, তোকে খাসা দেখাচ্ছে

প্যালা।

—সত্যি?

একগাল হেসে ওকে একটা চকোলেট দিতে

যাচ্ছি, সঙ্গে-সঙ্গে বলে ফেললে—বেগুনখেতে

কাকতাড়ুয়া দেখেছিস? ওই যে, মাথায় কেলে

হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে? হুবহু তেমনি মনে

হচ্ছে তোকে। আমি ক্যাবলাকে একটা চাঁটি

দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তার আর দরকার হল

না। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে—‘আর

• <http://facebook.com/tanbir.cox>

তোরে ক্যামন দেখাইতে আছে? তুই তো
বজ্রবাঁটুল-পেন্টুল পইর্যা য়ান চালকুমড়া
সাজছস!

ক্যাবলা স্পিকটি নট। একেবারে মুখের মতো।
আমি খুশি হয়ে চকোলেটটা হাবুল সেনকেই
দিয়ে দিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন টেনিদার হুঙ্কার শোনা গেল—
এখনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিস
প্যালা? প্যাড পর—দস্তানা পর—তোকে আর
ক্যাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! পেটের মধ্যে প্যালাজ্বরের
পিলেটা ধপাৎ করে লাফিয়ে উঠল একবার।
টেনিদা বললে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যেই বল
আসবে ঠাই করে পিটিয়ে দিবি। অ্যায়সা
হাঁকড়াবি যে এক বলেই ওভার-বাউন্ডারি—
পারবি না?

—পারা যাবে বোধহয়—কান-টান চুলকে আমি
জবাব দিলাম।

—বোধহয় নয়, পারতেই হবে। তাড়াতাড়ি যদি
আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব
না। মনে থাকবে?

এর মধ্যে হাবুল সেন আমার পায়ে আবার প্যাড
পরিয়ে দিয়েছে, সেইটে পরে, হাতে ব্যাট নিয়ে
দেখি নড়াচড়া করাই শক্ত!

কাতর স্বরে বললাম: হাঁটতেই পারছি না যে!
খেলব কী করে? —তুই হাঁটতে না পারলে
আমার বয়েই গেল! টেনিদা বিচ্ছিরি রকম মুখ
ভ্যাংচাল: বল মারতে পারলে আর রান নিতে
পারলেই হল!

—বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি, তবে রান নেব
কেমন করে?

—মিথ্যে বকাসনি প্যালা—মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে
আমার। হাঁটতে না পারলে দৌড়নো যায় না?
কেন যায় না—শুনি? তাহলে মাথা না থাকলেও
কী করে মাথাব্যথা হয়? নাক না ডাকলেও
লোকে ঘুমোয় কী করে? যা—বেশি ক্যাঁচম্যাচ
করিসনি! মাঠে নেমে পড়!

একেবারে মোক্ষম যুক্তি।

নামতেই হল অগত্যা। খালি মনে-মনে ভাবছি
প্যাড-ফ্যাড সুদ্ধ পড়ে না যাই! ব্যাটটাকে মনে
হচ্ছে ভীমের গদার মতো ভারী—আগে থেকেই
তো কজি টনটন করছে। আমি ওটাকে হাঁকড়াব
না ওটাই আমায় আগে হাঁকড়ে দেবে—সেইটেই

ঠাহর করতে পারছি না।

তাকিয়ে দেখি, পিছনে আর দুপাশে খালি
চোরবাগান টাইগার ক্লাব। ওদের সঙ্গেই ম্যাচ
কিনা!

কিন্তু এ আবার কী রকম ঝাঁঝি খেলা? ফুটবল
তো দেখেছি সমানে-সমানে লড়াই—এ ওর পায়ে
ল্যাং মারছে—সে তার মাথায় টুঁ মারছে—আর
বল সিধে এসপার ওসপার করবার জন্যে দুই
গোলকিপার দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘুর মতো। এ
পক্ষের একটা চিত হলে সঙ্গে-সঙ্গে ও-পক্ষের
আর-একটা কাত। সে একরকম মন্দ নয়।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা! আমাদের দুজনকে
কায়দা করবার জন্যে ওরা এগারো জন। সেই
সঙ্গে আবার দুটো আমপায়ার! তাদের পেটে-
পেটে যে কী মতলব তা-ই বা কে জানে!

আমপায়ারদের গোল-গোল চোখ দেখে আমার
তো প্রায় ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ হল!

তারপরে লোকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ধরন
দ্যাখো একবার। কেমন নাড়ুগোপালের মতো
নুলো বাড়িয়ে উবু হয়ে আছে—যেন হরির লুটের
বাতাসা ধরবে। সব দেখে-শুনে আমার
রীতিমতো বিচ্ছিরি লাগল।

এই রে—বল ছোড়ে যে! ব্যাট নিয়ে হাঁকড়াতে
যাব—প্যাড-ট্যাড নিয়ে উলটে পড়ি আর কি!
বলটা কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল দমদম
বুলেটের মতো—একটু হলেই কানটা উড়িয়ে
নিত। একটা ফাঁড়া তো কাটল! কিন্তু ও কী?
আবার ছোড়ে যে!

জয় মা ফিরিঙ্গি পাড়ার ফিরিঙ্গি কালী! যা-হোক
একটা-কিছু এবার হয়ে যাবে! বলি দেবার
খাঁড়ার মতো ব্যাটটাকে মাথার ওপর তুলে
হাঁকিয়ে দিলাম। বলে লাগল না... স্রেফ পড়ল
আমার হাঁটুর ওপরে। নিজের ব্যাটাঘাতে ‘বাপরে’
বলে বসে পড়তেই দেখি, বলের চোটে স্টাম্প-
ফাম্পগুলো কোথায় উড়ে বেরিয়ে গেছে।

—আউট—আউট!

চারিদিকে বেদম চিৎকার। আমপায়ার আবার
মাথার ওপরে একটা হাত তুলে জগাই-
মাধাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

কে আউট হল? ক্যাবলা বোধহয়? আমি তক্ষুনি
জানতাম, আমাকে কাকতাড়ুয়া বলে গাল
দিয়েছে—আউট না হয়ে যায় কোথায়!
হাঁটুর চোটটা সামলে নিয়ে ব্যাট দিয়ে

স্টাম্পগুলো সব ঠিক করতে যাচ্ছি—হঠাৎ
হতচ্ছাড়া আমপায়ার বলে বসল—তুমি আউট,
চলে যাও।

আউট? বললেই হল? আউট হবার জন্যেই এত
কষ্ট করে প্যাড আর পেন্টলুন পরেছি নাকি?
আচ্ছা দ্যাখো একবার। বয়ে গেছে আমার আউট
হতে!

বললাম, আমি আউট হব না। এখন আউট
হবার কোনও দরকার দেখছি না আমি।

আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওরা আমপায়ার নয়,
ভ্যামপায়ার। কুইনিন চিবোনের মতো যাচ্ছেতাই
মুখ করে বললে: দরকার না থাকলেও তুমি
আউট হয়ে গেছ। স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার।

—পড়ে গেছে তো কী হয়েছে—আমি রেগে
বললাম, আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ? ও-
সব চালাকি চলবে না স্যার—এখনও আমার
ওভার-বাউন্ডারি করা হয়নি।

কেন জানি না, চারিদিকে ভারি যাচ্ছেতাই একটা
গোলমাল শুরু হয়ে গেল। চোরবাগান ক্লাবের
লোকগুলোই বা কেন যে এ-রকম দাপাদাপি
করছে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

তার মধ্যে আবার চালকুমড়ো ক্যাবলাটা ছুটে
এল ওদিক থেকে।

—চলে যা—চলে যা প্যালা। তুই আউট হয়ে
গেছিস।

আর কতক্ষণ ধৈর্য থাকে এ-অবস্থায়? আমি
চেষ্টা করে বললাম, তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট
হ-গে! আমি এখন ওভার-বাউন্ডারি করব!

আমার কানের কাছে সবাই মিলে তখন সমান
কিচির-মিচির করছে। আমি কান দিতাম না—
যদি না কটাং করে আমার কানে টান পড়ত।
তাকিয়ে দেখি—টেনিদা।

ধাঁই করে আমার কাছ থেকে ব্যাট নিয়ে কানে
একটা চিড়িং মেরে দিল—তিড়িং করে লাফিয়ে
উঠলাম আমি। —যা—যা উল্লুক! বেরো মাঠ
থেকে। খুব ওস্তাদি হয়েছে, আর নয়!

রামছাগলের মতো মুখ করে অগত্যা আমায় চলে
যেতে হল। মনে মনে বললাম, আমাকে আউট
করা! আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব!
গিয়ে তো বসলাম—কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড!
আমাদের দেখিয়ে দেবার আগেই চোরবাগানের
টাইগার ক্লাব আউট দেখিয়ে দিচ্ছে। কাররও
স্টাম্প উল্টে পড়েছে, পিছনে যে লোকটা

কাঙালি বিদায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে, সে আবার খুঁটস করে স্টাম্প লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা মারবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিচ্ছে। খালি আউট—আউট—আউট! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে। এমন যে ডাকসাইটে টেনিদা, তারও বল একটা রোগাপটকা ছেলে কটাং করে পাকড়ে নিলে। হবেই তো! এদিকে মোটে দু'জন—ওদিকে এগারো, সেই সঙ্গে আবার দু'টো আমপায়ার। কোন্ ভদ্রলোকে ঝাঁঝি খেলতে পারে কখনও।

ওই চালকুমড়ো ক্যাবলাটাই টিকে রইল শেষতক। কুড়ি না একুশ রান করল বোধ হয়। পঞ্চাশ রান না পেরুতেই পটলডাঙা থান্ডার ক্লাব বেমালুম সাফ।

এইবার আমাদের পালা। ভারি খুশি হল মনটা। আমরা এগারো জন এবারে তোমাদের নিয়ে পড়ব। আমপায়ার দুটোও দেখি ওদের দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। কিন্তু ওদের মতলব ভালো নয় বলেই আমার বোধ হল।

ক্যাপ্টেন টেনিদাকে বললাম, আমপায়ার দুটোকে বাদ দিলে হয় না? ওরা নয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক।

টেনিদা আমাকে রদ্দা মারতে এল। বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি প্যালা? ওখানে দাঁড়া। একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাঁচ করে কান কেটে দেব। ব্যাট তো খুব করেছিস—এবার যদি ঠিকমতো ফিল্ডিং করতে না পারিস, তা হলে তোর পালাজ্বলের পিলে আমি আস্ত রাখব না! হাবুল সেন বল করতে গেল।

প্রথম বলেই—ওরে বাপ রে! টাইগার ক্লাবের সেই রোগা ছোকরাটা কী একখানা হাঁকড়ালে! বোঁ করে বল বেরিয়ে গেল, একদম বাউন্ডারি। ক্যাবলা প্রাণপণে ছুটেও রুখতে পারলে না। পরের বলেও আবার সেই হাঁকড়ানি। তাকিয়ে দেখি, কামানের গুলির মতো বলটা আমার দিকেই ছুটে আসছে।

একটু দূরেই ছিল আমাদের পাঁচুগোপাল।

চৈঁচিয়ে বললে, প্যালা—ক্যাচ—ক্যাচ—

—ক্যাচ! ক্যাচ! দূরে দাঁড়িয়ে ও-রকম সবাই-ই ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে পারে! ওই বল ধরতে গিয়ে

আমি মরি আর-কি! তার চাইতে বললেই হয়,
পাঞ্জাব মেল ছুটছে প্যালা লুফে নে? মাথা নিচু
করে আমি চুপ করে বসে পড়লাম—আবার বল
বাউন্ডারি পার।

হইহই করে টেনিদা ছুটে এল।

—ধরলিনে যে?

—ও ধরা যায় না!

—ধরা যায় না? ইস—এমন চমৎকার ক্যাচটা,
এক্ষুনি আউট হয়ে যেত!

—সবাইকে আউট করে লাভ কী? তা হলে
খেলবে কে? আমরাই তো আউট হয়ে গেছি—
এখন খেলুক না ওরা!

—খেলুক না ওরা!—টেনিদা ভেংচি কাটল—তোর
মতো গাড়লকে খেলায় নামানোই আমার ভুল
হয়েছে! যা—যা—বাউন্ডারি লাইনে চলে যা!

চলে গেলাম। আমার কী! বসে-বসে ঘাসের শিষ
চিবুচ্ছি। দুটো-একটা বল এদিক-ওদিক দিয়ে
বেরিয়ে গেল, ধরার চেষ্টা করেও দেখলাম।

বোঝা গেল, ও-সব ধরা যায় না। হাতের তলা
দিয়ে যেমন শোলমাছ গলে যায়—তেমনি সুড়ৎ-
সুড়ৎ করে পিছলে বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে
যেতে লাগল।

আর শাবাশ বলতে হবে চোরাবাগান টাইগার
ক্লাবের ওই রোগা ছোকরাকে! ডাইনে মারছে,
বাঁয়ে মারছে, চটাং করে মারছে, সাঁই করে
মারছে, ধাঁই করে মারছে! একটা বলও বাদ
যাচ্ছে না। এর মধ্যেই বেয়াল্লিশ রান করে
ফেলেছে একাই। দেখে ভীষণ ভালো লাগল
আমার। পকেটে চকোলেট থাকলে দুটো ওকে
আমি খেতে দিতাম।

হঠাৎ বল নিয়ে টেনিদা আমার কাছে হাজির।

—ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল করতে
পারবি?

এতক্ষণ ঝাঁঝি খেলা দেখে আমার মনে
হয়েছিল—বল করাটাই সবচেয়ে সোজা।

একপায়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম—খুব পারব। এ আর
শক্তটা কী?

—ওদের ওই রোগাপটকা গোঁসাইকে আউট করা
চাই। পারবিনে?

—এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি—কিছু ভেবো না!

আমি আগেই জানি, আমপায়ার দুটোর মতলব
খারাপ। সেইজন্যেই আমাদের দল থেকে ওদের
বাদ দিতে বলেছিলাম— টেনিদা কথাটা কানে

তুলল না। যেই প্রথম বলটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বললে—নো বল!

নো বল তো নো বল—তোদের কী! বলতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু গোঁসাই দেখি আবার ধাঁই করে হাঁকড়ে দিয়েছে, বাউন্ডারি তো তুচ্ছ—একেবারে ওভার-বাউন্ডারি!

আর চোরাবাগান টাইগার ক্লাবের সে কী হাততালি! একজন তো দেখলাম আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে!

এইবার আমার ব্রঙ্করক্রে আগুন জ্বলে গেল। মাথায় টিকি নেই—যদি থাকত, নিশ্চয় তেজে রেফের মতো খাড়া হয়ে উঠত। বটে—ডিগবাজি। আচ্ছা—দাঁড়াও! বল হাতে ফিরে যেতেই ঠিক করলাম—এবার গোঁসাইকে একেবারে আউট করে দেব! মোক্ষম আউট! প্যাডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে—গোঁসাই পিছন ফিরে সেটা বাঁধছিল। দেখলাম, এই সুযোগ। ব্যাট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে কিছু করতে পারব না—এই সুযোগেই কর্ণবধ! মামার বাড়িতে আম পেড়ে পেড়ে হাতের টিপ হয়ে গেছে—আর ভুল হল না। আমপায়ার না ভ্যামপায়ার হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই বোঁ করে বল ছুঁড়ে দিলাম।

নির্ঘাত লক্ষ্য! গোঁসাইয়ের মাথায় গিয়ে খটাং করে বল লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই—‘ওরে বাবা!’ গোঁসাই মাঠের মধ্যে ফ্ল্যাট!

আউট যাকে বলে! অন্তত এক হাজার জন্যে বিছানায় আউট!

আরে—এ কী, এ কী! মাঠসুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে যে! ‘মার মার’ করে আওয়াজ উঠছে যে! অ্যাঁ—আমাকেই নাকি?

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কান ঝাঁঝি করছে, প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে এবারে টের পাচ্ছি—আসল ঝাঁঝি খেলা কাকে বলে!

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: ভারতীয় বাঙালি লেখক ও ঔপন্যাসিক। ছোটদের জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্র টেনিদা খুবই জনপ্রিয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

522) মামা-ভাগ্নের টিকিট-বাণিজ্য -
আসিফ মেহদী

‘ঘরের বারান্দায় বিশ্বকাপ! স্টেডিয়ামে বসে খেলা না দেখলে পরকালে কী জবাব দিবি?’
মোবাইল ফোনে কথার ‘গুগলি’ ছুড়লেন মামা।

অপর পাশের ব্যক্তি কী বললেন তা আমাদের জানার সুযোগ নেই। তবে লোকটার কথা শুনে মামা আনন্দে এমন হাসি দিলেন যেন মামার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। ফোন রেখেই হাতে তুলে নিলেন আধুনিক যুগের হাতিয়ার ‘ইলেকট্রনিক মসকিউটো ব্যাট’। মশা মারতে কামান দাগানো একেই বলে! পটপট শব্দে কয়েকটি মশার জীবনাবসান হলো। তালি মেরে মারার চেয়ে পটপট ফুটিয়ে মশা মারায় মনে হয় বেশি আনন্দ।

এমন সময় রুমে ঢুকল ভাগ্নে মফিজ। সদ্য বিলাতফেরত মুরগি। চলাফেরায় ডিসকো ডিসকো ভাব। মামা-ভাগ্নের টিকিট-বাণিজ্যের প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা। বিদেশে থাকার সময় মফিজ ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিশ্বকাপ খেলার অনেকগুলো টিকিট কিনেছিল। তখন এ খবর পাওয়ামাত্র মামার তরফ থেকে ভাগ্নের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বারোমাসি গোলাপের শুভেচ্ছা! ভাগ্নে দেশে পা রাখলে তাকে দেওয়া হলো লাল কার্পেট সংবর্ধনা। সেই আমদানিকৃত টিকিট দিয়ে শুরু হয়েছে মামা-ভাগ্নের কারবার। তারা ২০০ টাকার প্রতিটা টিকিটের দাম হেঁকেছে পাঁচ হাজার টাকা। বাঙালি ক্রিকেট-পাগল; কিন্তু কেউ টিকিট কেনায় পাগলামি দেখাচ্ছে না কেন তা তারা বুঝতে পারছে না!

আজকে মামা আফাজ উদ্দিনের মুখে হাসি দেখে মফিজও দাঁতগুলো বের করে দিল। ‘ভাগ্নে, নো টেনশন। আমার এক বন্ধু হানিমুনে কক্সবাজার যাচ্ছে। ওর ওয়াইফ নাকি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে চায়। ব্যস, এই সুযোগে আমি চট্টগ্রামের ম্যাচের দুটো টিকিটের দাম চাইলাম ১৪ হাজার টাকা। শেষমেশ ১০ হাজারে রাজি হয়ে গেল।’ মফিজ বেচারী সারা দিন বন্ধুদের ডোর টু ডোর ঘুরে একটা টিকিটও বিক্রি করতে পারেনি। সবার এক দাবি, টিকিটের দাম কমাতে হবে। দাম কমালে তো আর মামা-ভাগ্নের ব্যবসা চলবে না।

টিকিট বিক্রির জন্য মামা তাঁর ফেসবুকের স্ট্যাটাসে নিজের মোবাইল ফোনের নম্বর দিয়েছেন। সেই সুবাদে হরদম ফোন আসছে। কিন্তু কাজের ফোন একটাও না। ফোন করে ক্রিকেট সম্পর্কে যে যার জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রদান করছে। ‘ইন্ডিয়ার বিপক্ষে প্রথমে ব্যাটিং

নিলে জয় অনিবার্য হতো', 'আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়াই রান কম হওয়ার কারণ'—এমন নানা মত শুনে আমার মাথা গেল আউলে। রেগে গিয়ে মামা একজনকে বলেই বসলেন, 'আরে ভাই, ম্যারাডোনা কেন ক্রিকেট খেলে নাই তা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন? (হঠাৎ আপনি থেকে তুই!) মাথাব্যথা করলে প্যারাসিটামল চুষে খা। যা ভাগ।'

সন্ধ্যায় কাজের মেয়ে কুলসুম এসে খবর দিল যে এক লোক আমার কাছে এসেছে। আমার বন্ধু মনে হয় টিকিট নিতে এসেছে! মামা-ভাগ্নে তাই 'হাই জাম্প' 'লং জাম্প' দিয়ে ড্রয়িংরুমে হাজির। কিন্তু অতিথিকে দেখে তাদের আশার সূচকে ধস নামল। একটু পরই অবশ্য চাঙাভাব ফিরে এল। ভদ্রলোকও টিকিট কিনতে এসেছেন। কথা পাকাপাকি করে গেলেন। কাল টিকিট নিতে আসবেন।

লোকটা চলে গেলেই বাড়ির দারোয়ান হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। বলল, 'মামা, যে লোকটা আইছলো ওরে চেনেন নাকি? আগের বছর ফোকলাগো বাড়িততে কানা ফোকলারে ধরে নিয়ে গিছলো। পরে তো ক্রসফয়ার!' এটুকু শুনেই মামা বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তখনই ফোন বেজে উঠল। মফিজ রিসিভ করল। আমার সদ্য বিবাহিত বন্ধু টিকিট নেবে না। এ খবরে ভাগ্নেও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। টিকিটগুলো কি তবে শেষ পর্যন্ত জাদুঘরে রাখতে হবে!

মামা হাইপ্রেসার আর ভাগ্নে লো-প্রেসারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত। মুমূর্ষু মামা-ভাগ্নেকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে টিকিটের ক্রেতা প্রয়োজন। আসল দামটুকু দিলেই হবে। বিস্তারিত ঠিকানার জন্য যোগাযোগ করুন রস+আলো কার্যালয়ে। [সূত্রঃ](#) দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

523) নির্বাচিত কলাম - আদনান মুকিত

বিশ্বকাপ নিয়ে রয়েছে রস+আলোর বিশেষ আয়োজন। রয়েছে ডিয়েগো ম্যারাডোনাসহ বিভিন্ন কলামিস্টের কলাম। সময়ের অভাবে তাঁরা কলামগুলো লিখতে পারেননি। তাঁদের হয়ে কলামগুলো লিখেছেন আদনান মুকিতজনৈক তরুণী লিখছেন রস+আলোয়

বড় স্ক্রিনে মুখ দেখাতে চাই
ওয়াও! নিজের দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে, আমরা
বিশ্বাসই করতে পারি না! কী সুইট একটা
ব্যাপার! আমার বয়ফ্রেন্ড আমার জন্য অ-নে-ক
কষ্ট করে টিকিট জোগাড় করেছে। আমরা দুজন
মিলে খেলা দেখতে যাব। এ জন্য আমার কত
প্ল্যান! পারলারে যেতে হবে, চুল রিবন্ডিং করতে
হবে, ভ্রু প্লাক করতে হবে। উফ! কত টেনশন!
এর ওপর কোন রঙের জামা পরব তা এখনো
ঠিক করতে পারিনি। ওকে জিজ্ঞেস করতেই
বলল, একটা পরলেই হয়! বললেই হলো? এটা
কি মুগদাপাড়ার সঙ্গে শনির আখড়ার খেলা?
এটা হলো বিশ্বকাপ। কত দেশের ক্যামেরা
থাকবে, বড় বড় টিভি স্ক্রিন থাকবে। ইশ!
ভাবতেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।
আগের দিন মাঠে গিয়ে সিটের রংটা দেখে
আসতে পারলে ভালো হতো। সিটের রঙের
সঙ্গে ম্যাচিং করে ড্রেস পরতাম। স্টেডিয়ামে বড়
স্ক্রিন বসিয়েছে। এমন মেকআপ নেব যে খেলা
না দেখিয়ে বারবার আমাকে দেখাবে। আমার
বান্ধবীরা টিভিতে আমাকে দেখে হাঁ হয়ে যাবে।
আমি শিওর, দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফোন দিয়ে
বলবে, ড্রেসটা কোথা থেকে কিনলি? রিবন্ডিং
করতে কত লাগল? বলা যায় না, কোনো
ডিরেক্টরের চোখে পড়লে অভিনয়ের চান্সও
পেয়ে যেতে পারি। আজ আর না, আমার কত
কাজ! দম ফেলার সময় নেই। দম ফেলার জন্য
মাঝেমধ্যে দু-এক মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি। সেই
ব্রেকেই লেখাটা লিখে ফেললাম।

বাই! বিরোধীদলীয় নেতার কলাম লিখছেন
রস+আলোয়

বিশ্বকাপ আয়োজনে ব্যর্থ সরকার
আমি বিরোধীদলীয় নেতা বলছি, দেশে বিশ্বকাপ
চলছে। অথচ সরকার কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে
না। আপনারা সবাই জানেন যে, এই সরকার
বিশ্বকাপ আয়োজনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।
মাত্র দুটি মাঠে বিশ্বকাপের খেলা হচ্ছে, যা
জাতির জন্য অপমানজনক। আমাদের কি আর
মাঠ নেই? অবশ্যই আছে। শুধু খেলার মাঠ নয়,
আমাদের নকশিকাঁথার মাঠও আছে। আর
আমরা ক্ষমতায় থাকলে দেশের ৬৪টি জেলায়
৬৪টি স্টেডিয়াম তৈরি করতাম। আপনারা
জানেন, আজ যে বিশ্বকাপ হচ্ছে, এর প্রক্রিয়াটা

আমরাই শুরু করেছিলাম। এবার আসি খেলার কথায়। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ভারতের কাছে হেরে গেল। কেন হেরে গেল, জনগণ তা ভালো করেই জানে। কে কার সঙ্গে গোপন আঁতাত করছে, জনগণের কাছে তা অজানা নয়।

বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে ভালো করতে না পারে তাহলে এর দায় কিন্তু সরকারকেই নিতে হবে। আর বিশ্বকাপের মতো একটা টুর্নামেন্ট চার বছর পরপর হবে, এটাও মেনে নেওয়া যায় না। আমরা কথা দিচ্ছি, আগামীবার ক্ষমতায় গেলে প্রতিবছর একটা করে বিশ্বকাপ আয়োজন করব। দোকানদারের চোখে লিখছেন

রস+আলোয়

চা-পান মিস করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা

এটা কোনো কথা হলো? এত বড় একটা স্টেডিয়াম, সেখানে বিশ্বকাপের মতো খেলা হবে আর চা-পান বিক্রি করা যাবে না? বিভিন্ন দেশ থেকে দর্শক, খেলোয়াড় আসবে। তারা চা পাবে কোথায়? স্টেডিয়ামে একবার ঢুকে পড়লে তো খেলা শেষ হওয়ার আগে আর বেরোনো যাবে না। পাবলিক যে বাইরে এসে কড়া লিকারে বানানো চায়ে একটা চুমুক দিয়ে যাবে সে সুযোগও রাখেনি ব্যাটসম্যান। নিজেরা তো ঠিকই রুমে বসে আরামে চা খাবি। গরিবের পেটে লাথি না মারলে ভালো লাগে না, না? লাথি মারার জন্য তো ফুটবল আছে, গরিবের পেটে লাথি মারার দরকারটা কী?

আমি চাইব, অচিরেই যেন চা-পানওয়ালাদের স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেওয়া হয়। বল-বয়ের কলাম লিখছেন রস+আলোয়

ছোট দলগুলোকে বাদ দেওয়া যাবে না

আমি সব সময় ছোট দলের পক্ষে। আইসিসি ছোট দলগুলোকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করছে, আমি তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ছোট দলগুলো কত ভালো! তারা কত অল্প রানেই অল আউট হয়ে যায়। চার-ছয়ও মারে না বললেই চলে। ফলে আমাদের বলও কুড়াতে হয় না। আরামে বসে বসে ‘জলবায়ু পরিবর্তনে গান্ধীপোকার ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা করতে পারি। ব্যাটসম্যান চার মারলে এত রাগ লাগে যে কী বলব! ইচ্ছে করে বোলারকে গিয়ে কষে চড় মেরে আসি। আর কিছু ব্যাটসম্যান আছে এত খারাপ, দেখলেই

মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কথা নেই, বার্তা নেই—ধুমধাম চার মেরে বসে। একদিন এসে ১০০ ওভার বল কুড়াও না, বুঝবে মজা কাকে বলে। জীবনে আর চার মারার চিন্তাও করবে না। তবে যে বোলারদের বল মেরে ব্যাটসম্যানরা গ্যালারিতে পাঠায় তাদের আমার খুব ভালো লাগে। গ্যালারিতে বল গেলে দর্শকও খুশি, আমরাও খুশি। সাধারণত ছোট দলের বোলারদের বলই গ্যালারিতে বেশি যায়। এ জন্য আমি আবারও ছোট দলের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিচ্ছি। ছোট দলগুলোকে যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বল-বয় ঐক্যজোট গঠন করে আন্দোলনে নামব। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

524) খেলা হচ্ছে মাঠে, তাঁরা লিখছেন রস+আলোয়

বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে পত্রিকার পাতা এখন ক্রিকেটের মাঠ। এই মুহূর্তে যাঁরা মাঠে খেলছেন, তাঁরা তো তাঁদের মূল্যবান মত দিচ্ছেনই; যাঁরা আগে খেলতেন, তাঁরাও মত দিচ্ছেন, বিশ্লেষণ করে করে ফাটিয়ে ফেলছেন। যাঁরা কোনোকালেই খেলেননি এবং ভবিষ্যতেও খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাঁরাও কলম হাতে দুর্দান্ত ব্যাট চালাচ্ছেন পত্রিকার পাতায়। কবি-সাহিত্যিকেরা সেজেছেন লেখোয়াড়। এমনি একসময় রস+আলো যোগাযোগ করেছিল দেশ-বিদেশের প্রয়াত-অপ্রয়াত বিভিন্ন পেশার প্রতিথযশা কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে। ক্রিকেট নিয়ে তাঁরাও বেশ মূল্যবান অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। রস+আলোর হয়ে সেসব সংগ্রহ করেছেন কাজী ঐশীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর n সত্যই, শ্বেতশুভ্র গোলক আর একচিলতে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মনোরম ডাংগুলি খেলা দেখিয়া হৃদয়কোণে যে পুলক বোধ হইতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। জগৎ আগাইয়া যাইতেছে, অবুঝ-সবুজেরা গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। আহা, আজি হইতে শতবর্ষ পরেও যেন এই খেলা বজায় থাকে! কাজী নজরুল ইসলাম n

সাদা, কালো, বাদামি—নানা জাতের মিলনমেলায় আজ গাহিয়া উঠি সাম্যের গান। ব্যাটের সংঘর্ষে, বলের ঘূর্ণনে যৌবনের স্ফুরণ, প্রতিপক্ষ বোলারদের অগ্নিগোলক সত্ত্বেও ব্যাটসম্যানদের

চির উন্নত শির দেখিয়া আমার কবিহৃদয়
তাহাদের গান গাহিয়া ওঠে! মার ঘুরিয়ে, তবেই
আমি হব শান্ত! সুকান্ত ভট্টাচার্য n
ক্রিকেট? আহা! ক্রিকেটের বল যেন রসাল
রসগোল্লা, ব্যাট যেন লম্বা বনরুটি। আর লম্বা
স্টাম্পগুলো যেন দেশলাইয়ের কাঠি। জ্বলে-পুড়ে
ব্যাটসম্যানকে করবে ছারখার। শায়েস্তা খান n
আজ আমার মেজাজ বড়ই খুশ! সবকিছু
অগ্নিমূল্য হইলেও নবাবি সিম দিয়া ওয়ার্ল্ডকাপ
কুইজ খেলিয়া ২০টি টাকা পাইয়াছি! সেই টাকা
হইতে আট মণ চাল কিনিবার পর এখন রইল
বাকি ১৯ টাকা। হাজি মুহম্মদ মুহসীন n
একটা স্বর্ণনির্মিত পেয়ালার জন্য এতগুলি লোক
ঘাম ঝরাইতেছে! কী বেদনাদায়ক! কে আছিস,
আমার টাকার বক্সটা বের কর! সবাইকে একটা
করে সোনার পেয়ালা দে। আর ইতিমধ্যে যে
অনেক বেশি ঘাম ঝরিয়ে ফেলেছে, তাকে
বায়তুল মোকাররমের একটা জুয়েলারির
দোকান লিখে দে। মিসির আলী n
এই বয়সে খেলাধুলা আমাকে তেমন আকর্ষণ
করে না, তবে এই মুহূর্তে খেলা দেখছি এবং
বোঝার চেষ্টা করছি, কোন ওভারে কত রান
হবে। আমার যুক্তির বিচারে এই ওভারে ২ রান
হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৭ রান হয়েছে। বৃদ্ধ
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার লজিক কি
এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে? হিমু n
আজকাল এক ব্যাপার হয়েছে। বিশ্বকাপ
ক্রিকেট উপলক্ষে টাকার কয়েকটা এলাকা
ঝেড়ে-মুছে তকতকে করে ফেলা হয়েছে। রাত
১২টার পর ওই রাস্তাগুলোয় হাঁটতে ভালোই
লাগে। রাস্তার আইল্যান্ডে বিশাল আকৃতির ফুল
আর পাখি দেখে যথেষ্টই আনন্দ পেয়েছি।
সেদিন রাস্তায় মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি
বিরাটাকার দোয়েল পাখি দেখে কিশোরীদের
মতো ‘ও আল্লাহ, এইটা কী?’ বলে বিকট
চিৎকার দিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে
বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম...। রূপা ওই হাসি
দেখলে খুব বিরক্ত হতো। পিথাগোরাস n
‘অ’ বিন্দুতে ব্যাটসম্যান এবং ‘ই’ বিন্দুতে
বোলার থাকলে ‘অই’ যদি সমকোণী ত্রিভুজের
অতিভুজ হয়, তাহলে ধরি, আমার প্রিয় দল
বিজয়ী...। আইজ্যাক নিউটন n
আমি এখন ব্যস্ত। সেদিন পাড়ার ছেলেরা

ক্রিকেট খেলার সময় বল এসে আমার মাথায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের দ্বিতীয় সূত্র আবিষ্কার করে ফেললাম। এখন এটার গাণিতিক প্রমাণ নিয়ে কাজ করছি। বিরক্ত করবেন না...। স্পাইডার ম্যান n

ক্রিকেট তো আমার খুবই পছন্দ। আর ঢাকার স্টেডিয়ামের আশপাশে কত উঁচু উঁচু বিল্ডিং! তবে সেই দিন এক বিল্ডিংয়ের সানশেডে ঝুলে আরাম করে খেলা দেখছিলাম। এ সময় এক বেকুব জানালা খুলে দিল...। মেরুদণ্ডে এখনো ব্যথা আছে! মীনা n

আমরা সমানে সমান—ছেলে আর মেয়ে।
তাইলে মাইয়াগো বিশ্বকাপে ক্যান এত বাতি লাগায় না? মাইয়াগো জন্যও এই ব্যবস্থা করতে হইব! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

525) ক্রিকেট বড় অনিশ্চয়তার খেলা - আশীফ এন্ড্রাজ রবি

পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। এক দল মিরপুরে থাকে, অন্য দল মিরপুরে থাকে না। আবার মিরপুরবাসীও দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সিমু নাসেরকে চেনে, আরেক ভাগ চেনে না। আমি মিরপুরে থাকি এবং সিমু নাসের আমার বিশেষ পরিচিত।

ছুটির দিনে, দুপুরবেলায় বিনা নিমন্ত্রণে কেউ বাসায় আসতে পারে, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। বাংলাদেশ-ভারতের ম্যাচে সিমু দুপুরবেলায় আমার বাসায় এসে উপস্থিত। আমার দীর্ঘদিনের লালিত ধারণা নিমেষেই ধুলোয় মিশে গেল। ‘রবি ভাই, আপনি খেলার টিকিট চেয়েছিলেন, বহু কষ্টে একটা টিকিট ম্যানেজ করেছি। তবে আপনারটা ম্যানেজ করতে পারি নাই।’

আমি হেসে বললাম, খুব ভালো কথা। তুমি কী এই খবর দেওয়ার জন্য এই দুপুরবেলায় আমার বাসায় এসেছ?

‘না, রবি ভাই। আসছি আপনার গ্যারেজে মোটরসাইকেল রাখতে, স্টেডিয়ামে মোটরসাইকেল রাখার ব্যবস্থা নেই তো। মোটরসাইকেলটা রইল, মিতু আপাকে বলেন চা দিতে, চা খেয়ে বিদায় হই।’

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর সারল। সিমুকে চা খাওয়ালাম, এরপর নেহাত ভদ্রতার বশে

বললাম, ‘দুপুরে লাঞ্চ করে যাও।’ অবশ্য খেলা তো আড়াইটায় শুরু, লাঞ্চ করতে গেলে তোমার দেরি হয়ে যেতে পারে। (কথাটা আমি খুব ক্ষীণ স্বরে বলেছিলাম। এত ক্ষীণ স্বরে যে আমি নিজেই কী বলেছি, ঠিকমতো শুনতে পাইনি।) কিন্তু সিমু ঠিকই কথাটা ক্যাচ করল। বলল, ‘আরে, আপনার বাসা থেকে স্টেডিয়ামে যেতে লাগে দুই মিনিট। আপনি বড় ভাই মানুষ, আপনার বাসায় না খেয়ে যাওয়াটা খারাপ দেখায়...ফ্রিজে মুরগি আছে না...’

মুরগি খেয়ে সিমু জানাল, লাঞ্চার পর ওর নাকি চা না খেলে ঘুম ঘুম লাগে। এরপর সে একটা বিকট হাই তুলল। কেলেকারির হাত থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে তড়িঘড়ি আবার চায়ের ব্যবস্থা করা হলো।

চা খাওয়ার পর সিমু শুধাল, ‘রবি ভাই, স্টেডিয়ামটা কোন দিকে যেন...একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন নাকি? আমি মিরপুর এলাকাটা ভালো চিনি না।’

‘এলাকা না চিনলে আমার বাসা চিনল কীভাবে?’

‘ভুলেভালে কেমনে কেমনে জানি চলে আসছি।’ অতএব সিমুকে এগিয়ে দিতে গেলাম।

স্টেডিয়ামে ঢোকার আগে সে একটা দোকান দেখিয়ে বলল, ‘আপনার বাসার চায়ের চিনি কম ছিল। মুখ তিতা হয়ে গেছে। আসেন, দুই ভাই মিলে কোক খাই। মুখ শুকায়েন না, বিল আমি দিব।’

কোক পানের পর যথারীতি আবিষ্কার হলো তার কাছে ভাংতি টাকা নেই। ওকে স্টেডিয়ামে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর মনে হলো যাক, আপদ গেছে।

বাসায় ফিরে দম নিচ্ছি। খেলা মাত্র পাঁচ ওভার গড়িয়েছে এমন সময় সিমুর ফোন, ‘রবি ভাই, আপনি কই? নিচে গিয়ে দেখে আসেন তো মোটরসাইকেল আছে, নাকি চোরে নিয়া গ্যাছে?’ আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরপর দুই দিন শেভ না করলে আমার চেহারা একটা চাকরবাকর ভাব চলে আসে, এটা আমি জানি। তাই বলে এত? আবার পাঁচ তলা ভেঙে নিচে নামলাম। মোটরসাইকেল জায়গামতো আছে। ১০ ওভার পার হলো। সিমুর ফোন, ‘মুরগি কি বাসি ছিল? পেট কেমন গুড়গুড় করছে।’

আপনের বাসায় দুপুরে খাওয়াটা ঠিক হয় নাই।
আচ্ছা মোটরসাইকেলের খবর কী?’

১৫ ওভার। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম,
আবারও সিমুর ফোন। ‘রবি ভাই, একটু খোঁজ
নেন তো মোটরসাইকেল গ্যারেজে ঠিকঠাক
আছে কি না। নিজের মোটরসাইকেল হলে
কোনো সমস্যা ছিল না। অফিসের গাড়ি তো।’
খেলার বাকি সময়টা আমি গ্যারেজে সিমুর
মোটরসাইকেলের ওপর বসে ঝিমাতে লাগলাম।
বাই এনি চান্স যদি মোটরসাইকেল চুরি যায়,
তাহলে দেশ ছেড়ে লিবিয়ায় পাড়ি জমানো ছাড়া
আমার কোনো উপায় থাকবে না।

২.

আমার ধৈর্য কম বলে আজ অবধি কোনো
ক্রিকেট ম্যাচ পুরোটা দেখতে পারিনি। দীর্ঘ এই
খেলা দেখতে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।
এমনিতেই আমার ঘুম খুব পাতলা, কিন্তু কোনো
এক বিচিত্র কারণে সেই ঘুম খুব গাঢ় হয়। এর
মধ্যে এক কাণ্ড হলো। একটা টিকিট হাতে
পেলাম। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ।
স্টেডিয়ামের হই-হুল্লোড়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার
কোনো চান্স নেই। কাজেই পুরো একটা ম্যাচ
আগাগোড়া দেখার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে স্টেডিয়ামে
গেলাম। আমার মতো ধৈর্যহীন মানুষদের জন্য
অত্যন্ত আদর্শ একটি ম্যাচ বলাই বাহুল্য।
কোনো প্রকার ঝিমুনি ছাড়াই খেলার প্রায়
পুরোটা দেখে ফেললাম, একটানা। অল্প একটু
বাকি আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং মাঝপথে।
গ্যালারি মোটামুটি জনশূন্য, সুনসান নীরবতা।
পাছে ঘুমিয়ে পড়ি এ জন্য একটু নিচে নামলাম।
সামনেই খাবারের দোকান। বার্গার দেড় শ,
স্যান্ডউইচ ৮০, পেপসি ৪০ ও বিরিয়ানি ২০০
টাকা। কোনটা খাব, ভাবছি। ভাবতে ভাবতে
হঠাৎ করে শেয়ারবাজারের মতো খাবারের
দরপতন হতে শুরু করল। বার্গারের দাম টপ
করে নেমে এল ২৫ টাকায়। স্যান্ডউইচ ২০
টাকায়। আবার চারটা বার্গার কিনলে একটা
স্যান্ডউইচ ফ্রি। খাবারের দরপতনের পেছনে
কোনো সিভিকেটের কারসাজি নেই। খেলা
চলার কথা রাত ১০টা পর্যন্ত। পাঁচটার মধ্যে
গ্যালারি ফাঁকা। খাবার যাতে নষ্ট না হয়, এ
জন্য এই বিশেষ ডিসকাউন্ট। অবশ্য পেপসির
দাম স্থির আছে। ওটা পচবে না, ফ্রিজে রাখা

যাবে। আমি এই সুযোগে চারটা বার্গার খেয়ে ফেললাম।

এই বার্গার খাওয়াটাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। একটুর জন্য পুরো একটা ম্যাচ একটানা দেখার বিরল সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। গ্যালারিতে এসে দেখি, খেলা শেষ। তবু আরও আধা ঘণ্টা বসে রইলাম। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, যদি কিছু হয়! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

526) বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট

ইন্ডিজের খেলার পর একজন দর্শকের সাক্ষাৎকার

রস+আলো: তো খেলা দেখার ২৪ ঘণ্টা পর আপনার অনুভূতি এখন কেমন?

দর্শক: এখন কিছুটা শান্ত। টেনশনে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিলাম তো, মাথাটা একটু ভোঁ ভোঁ করছে। এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না, তা হলে কিন্তু ২৪ ঘণ্টা আগে ফিরে যাব।

রআ: আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ২৪ ঘণ্টার বদলে আপনি এক সপ্তাহ আগে ফিরে যেতে পারলে ভালো হতো।

দর্শক: আমরা তো গতকালই সেই রকম কিছু চেয়েছিলাম। আমরা কি ওদের কম ভালোবাসি। যখন ভালো খেলে কী করি না আমরা?

নিজেদের সবকিছু দিয়ে ওদের জন্য রাস্তায় নেমে মিছিল করি।

রআ: জি, আমরা জানি। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে জেতার পর আমরা সবাই তা-ই দেখেছি। কিন্তু খেলায় তো হারজিত থাকতেই পারে, তাই না?

দর্শক: অবশ্যই পারে। আমরা কি ওদের বলেছিলাম যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে জিততেই হবে? কিন্তু আমরা যেভাবে হেরেছি, এটা কি হারা বলে?

রআ: না না, তা ঠিক। এভাবে হারাটা মোটেও উচিত হয়নি। আসলে হারতে কে চায় বলেন? সাকিব-তামিমরাও নিশ্চয় চায়নি এভাবে হারুক। কিন্তু হয়ে গেছে। কিন্তু তার বদলে আমরা যা করেছি, তা কি ঠিক হয়েছে?

দর্শক: কেন ঠিক হবে না, অবশ্যই ঠিক হয়েছে।

রআ: আচ্ছা মেনে নিলাম ঠিক হয়েছে। ওরা খারাপ খেলেছে তাই মনের ক্ষোভ মিটিয়েছেন। ওদের পোস্টার ছিঁড়েছেন, আগুন দিয়েছেন।

কিন্তু ওদের বাসে জুতা, ইট-পাথর ছুড়ে মারা, জাতীয় পতাকায় আগুন দিয়েছেন কেন?

পতাকাটা কি আমাদের সবার না?

দর্শক: উত্তেজনা ধরে রাখতে পারিনি। আসলে তখন কী করছি মাথায় ছিল না।

রআ: এ অবস্থাকে ডাক্তারি ভাষায় কী বলে আপনার মনে হয়।

দর্শক: শোনে, আপনি যদি এসব বলার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে আসেন তা হলে কিন্তু ভালো হবে না।

রআ: আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গাড়িতে ইট-পাটকেল কেন মেরেছেন? ওরা তো ভালোই খেলেছে।

দর্শক: ওরা আমাদের বিরুদ্ধে এত ভালো খেলতে গেল কেন?

রআ: তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, ধরুন আপনার ছোট ভাই বা বোন পরীক্ষায় খারাপ করেছে বা একটা ভুল করেছে, আপনি কি তার গায়ে জুতা ছুড়ে মারবেন?

দর্শক: জানি না (রেগে গিয়ে)।

রআ: দেখুন রাগবেন না। রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। সেদিন সাকিবরা হেরেছে সামান্য একটা খেলায় কিন্তু আমরা দর্শকেরা পুরো দেশটাকে যে হারিয়ে দিয়েছি এটা বুঝতে পেরেছেন?

দর্শক: জানি না (আরও রেগে)।

রআ: ওদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে রাগ ঝাড়ার প্রয়োজনটা কি খুব বেশি ছিল?

দর্শক: বললাম না, তখন মাথা ঠিক ছিল না।

রআ: আমরা দর্শক ছিলাম, তাতেই যদি আমাদের এত খারাপ লাগে, তা হলে বোঝেন যারা খেলেছে তাদের কেমন লেগেছিল?

দর্শক: তিন উইকেট পড়ার পর ওরা সতর্ক হলো না কেন?

রআ: আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের দেশের দর্শকদের পার্থক্য কী জানেন?

দর্শক: কী?

রআ: আমরা দর্শকেরা খেলাটা একটু বেশি বুঝি কিন্তু মাঠে গিয়ে খেলার যোগ্যতাটা আমাদের নেই।

দর্শক: আপনার এসব আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন। না হলে উঠলাম।

রআ: শেষ একটা কথা শুনে যান। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল শুধু একটা খেলায় হেরেছে। সামনে আরেক দিন ভালো করবে। অতীতেও হারিয়েছে অনেক দলকে। আমরা আসলেই অতীতের কথা কখনোই মনে রাখি না। কই, দেশে এত সমস্যা, এত দুর্নীতি, এত হত্যা-খুন, ছিনতাই, প্রতিদিন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে, পাতালে চলে গেছে শেয়ারবাজার—এসবের বিরুদ্ধে তো কখনো প্রতিবাদ করেননি। পরপর তিনবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও আমাদের বিবেক এতটুকু কেঁপে ওঠেনি। বড় বড় দুর্নীতিবাজ চোখের সামনে দিয়ে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায় আমরা নেতা নেতা বলে পেছন পেছন ছুটি। কখনো কি তাদের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ করেছি? এই ক্রিকেট দলই অতীতে আমাদের অনেকবার পুরো জাতিকে এক করে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়েছে। আর, আমরা কত সহজে সেই আনন্দের দিনগুলোর কথা ভুলে গেছি। শুধু এই ভুলে যাওয়ার কারণে প্রতিবার নির্বাচনের আগে আমাদের সামনে মুলো ঝুলিয়ে ২০ বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলো দেশটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। যে দেশে বসবাস করে আমাদের একমাত্র গর্বের বিষয় ছিল ক্রিকেট, সেই ক্রিকেটারদের আমরা একটা খেলায় হারার জন্য ক্ষমা করতে পারিনি। সেই একমাত্র গর্বের গলায় আমরা জুতা পরিয়ে দিয়েছি। ক্রিকেটের এই হার যদি লজ্জাজনক হয়, তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের সবার হারটাকে কী বলবেন?

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন: তাওহিদ মিলটন [সূত্রঃ](#)

দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

527) ক্রিকেটমৃত - আলিয়া রিফাত

ব্যাটসম্যান, ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট কতজন যে ক্রিকেট নিয়ে কত মজার মজার কথা বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে সেসব নিয়েই আমাদের এই ধারাবাহিক আয়োজন। ☆ বলটা এত উঁচুতে উঠেছিল যে সেটা একজন এয়ার হোস্টেসকে সঙ্গে করে নিচে নামতে পারত।

নবজোত সিং সিধু

ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার ☆ ব্যাটসম্যান বল পেটানোর জন্য জায়গা বানালেন এবং বলটিকে উইকেটকিপারের কাছে যেতে

দিলেন।

কপিল দেব

ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার☆ তাদের
পারফরম্যান্স সম্পর্কে কোমল ভাষায় যা বলা
যায়, তা হলো ‘বাজে’। আপনি চাইলে আরও
কঠিন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন।

রিচি বেনো

অস্ট্রেলীয় সাবেক ক্রিকেটার☆ ইংলিশ
ক্রিকেটের আসল লক্ষ্য হলো অস্ট্রেলিয়াকে
হারানো।

জিম লেকার

ইংলিশ সাবেক ক্রিকেটার☆ অসিরা বিশালাকার
এবং তাদের ভেতরটা শূন্য। ঠিক তাদের
দেশটার মতো।

ইয়ান বোথাম

ইংলিশ সাবেক ক্রিকেটার☆ ইংল্যান্ডের মূল
সমস্যা তিনটি—তারা ব্যাটিং করতে জানে না,
বোলিং করতে জানে না, ফিল্ডিংও না।

মার্টিন জনসন

ইংলিশ খেলোয়াড়☆ অনেক ইউরোপীয় (মূল
ভূখণ্ডের) ভাবে যে জীবন একটি খেলা। আর
ইংরেজরা ভাবে, ক্রিকেট একটি খেলা।

জর্জ মাইকস

হাঙ্গেরিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক ও
হাস্যরসিক☆ তুমি তোমার স্ত্রীকে কীভাবে বলবে
যে তুমি জাস্ট একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে
গিয়েছ, আর পাঁচ দিনের মধ্যে ফেরোনি?

রাফায়েল বেনিতেজ

ফুটবল কোচ, টেস্ট ক্রিকেট সম্বন্ধে বলতে
গিয়ে☆ আমার সব সময়ই মনে হয়, ক্রিকেট
পিচ হলো বউয়ের মতো। কেমন হবে, তা
আগেভাগে বোঝার উপায় নেই।

নবজোত সিং সিধু

ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার☆
বল দেখতে পাও না? ওইটা দেখতে লাল
রঙের, গোল আর পাঁচ আউন্স ওজন, বুঝেছ?
ইংলিশ ক্রিকেটার গ্রেগ টমাস সমারসেটের
পরপর কয়েকটা বল ব্যাট ফাঁকি দিয়ে চলে
যাওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ভিভ
রিচার্ডস খেলতে পারেননি। তখন তিনি এ কথা
বলেন। থমাসের এ কথায় ভিভের মাথায় রক্ত
চড়ল, পরের বলেই ছক্কা। সেটা এমনই ছক্কা যে
একেবারে স্টেডিয়াম পার হয়ে পাশের নদীতে

গিয়ে পড়েছিল। বল খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। তখন ভিভ রিচার্ডস থমাসকে বললেন, ‘গ্রেগ, তুমি তো জানো, বল দেখতে কেমন। যাও, খুঁজে নিয়ে এসো।’☆ আমার মনে হয় সেলিম মালিকের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে ক্রিকেট মিশে আছে। না খোদা ভাই, আমার মনে হয়, সেলিম মালিকের রোমে রোমে ক্রিকেট মিশে আছে। ধারাভাষ্যকার খোদাবক্স মৃধা ও চৌধুরী জাফর উল্লাহ শরাফতের মধ্যে কথোপকথনসূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

528) অহেতুক কৌতুক - হাসান রহমান

গত খেলা শেষে ফেসবুক, এসএমএস ও মুখে মুখে মানুষ নানাভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সেখান থেকে বাছাই করা কিছু প্রতিক্রিয়া ছাপা হলো। প্রতিক্রিয়াদানকারী সবার নাম মনে করার চেষ্টা করেও মনে করতে না পারায় কারও নাম উল্লেখ করা গেল না। এ জন্য দুঃখিত।☆ বাংলাদেশ যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে হারল, এর জন্য দায়ী কে?

—কলম্বাস, কারণ সে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবিষ্কার করেছিল।

☆ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা কেমন দেখলেন?

—আমি তো খেলা দেখিনি, যত দূর মনে পড়ে খেলার একটা হাইলাইটস দেখেছি।

☆ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলায় দর্শক হিসেবে আপনার সাফল্য কী ছিল?

—গ্যালারির ভেতর ১৫০ টাকার বার্গার খেলা শেষে ২০ টাকায় কিনতে পারা।

☆ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলায় বাংলাদেশের ইনিংস শেষে আপনার কী মনে হয়েছিল?

—এ দেশ থেকে কি ঝড়-বৃষ্টি একেবারে উধাও হয়ে গেল!

☆ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশকে মাত্র ৫৮ রানে আটকে দিল, এতে আপনার প্রতিক্রিয়া?

—প্রতিক্রিয়ার কী আছে, আমরাও তো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫৯ রানের বেশি করতে দিইনি।

☆ ১০ টাকার বাদাম কিনে খেলা দেখতে বসেছিলাম। এখনো ৩ টাকার মতো বাদাম আছে, এর মধ্যে খেলা শেষ। এখন কী করব?

—কেউ আছেন? ৩ টাকার বাদাম বিক্রি হবে।

☆ ৫৮ রানকে ১০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভাগ করে দিলে গড়ে মাথাপিছু কত রান পড়বে?

—১০ জনের মধ্যে ভাগ করা যাবে না। কারণ, জুনায়েদ একাই করেছেন ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২৫ রান!

☆ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কী?

—আবদুর রাজ্জাক। এই একটা ব্যাটসম্যানকে ওরা আউট করতে পারেনি।

☆ আইসিসির প্রতি একজন বাংলাদেশি দর্শক হিসেবে আপনার কোনো পরামর্শ!

—ওয়ানডে ক্রিকেটেও ইনিংস ডিক্লেয়ার করে আবার খেলা শুরু করার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

সংগ্রহ: হাসান রহমান **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ০৭, ২০১১

529) উল্টো কবিতা

আমি এখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। দুই বছর আগে অর্থাৎ যখন ক্লাস ফাইভে পড়তাম তখন আমাদের বাংলা বইয়ে একটা কবিতা ছিল ‘শিক্ষকের মর্যাদা’। আমাদের নিচের ক্লাসে শ্রাবণী নামের একটি মেয়ে পড়ত। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তার বাবা একটু গুন্ডা টাইপের ছিলেন। পান থেকে চুন খসলেই সে তার বাবাকে ডেকে এনে টিচারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। আমাদের ক্লাস টিচার ওই দিন ‘শিক্ষকের মর্যাদা’ কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন। তিনি যখন বললেন, ‘ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে’ তখন সঙ্গে সঙ্গে পুরো ক্লাসের ছাত্রছাত্রী হো হো করে হেসে উঠল। কারণ জিজ্ঞেস করলে একজন বলল, ‘ম্যাডাম, প্লিজ, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসুন।’ তিনি বাইরে যেতেই রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। সেই শ্রাবণী পায়ে ব্যথা পেয়েছে এবং সে তার বাবাকে ডেকে আনবে এই ভয়ে এক টিচার তার পায়ে পানি ঢালছেন। এই দৃশ্য দেখে ম্যাডাম নিজেও হাসতে শুরু করলেন। ফিরে এসে বললেন, এ যে পুরো উল্টো হয়ে গেল! এখন বলতে হবে, গুরু ঢালিতেছে বারি ছাত্রীর চরণে।। রোদেলা তাসনিম
দিলালপুর, পাবনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

530) লৌহকঠিন যুক্তি - লিওনিদ ইজমাইলভ

‘তুমি আমাকে ভালোবাসো?’

‘বাসি।’

‘খুব?’

‘খুব।’

‘তাহলে চলো না, বিয়ে করে ফেলি?’

‘আমি তো বিয়ের বিপক্ষে নই।’

‘তাহলে বাধা কোথায়?’

‘আমার কোনো বাধা নেই।’

‘তাহলে বিয়ে করে ফেলা যাক।’

‘ঠিক আছে...কিন্তু আমরা থাকব কোথায়?’

‘মমম...শুরুর দিকে ঘর ভাড়া নেব।’

‘ঠিক। কিন্তু ভাড়ার টাকা আসবে কোথেকে?’

‘ইভনিং কোর্সে ভর্তি হব, দিনের বেলা কাজ করব।’

‘ঠিক বলেছ। আর রান্না করবে কে?’

‘আমার মা চমৎকার রান্না করে। তোমার গ্র্যানি এসেও রান্না করে দিয়ে যাবে মাঝেমধ্যে।’

‘তা-ই যদি হবে, তাহলে বিয়ে করার দরকারটা কোথায়?’

‘আমরা বাচ্চা নেব, তাকে বড় করব।’

‘কিন্তু সে তো সারাক্ষণ চিৎকার করবে, সারাটা সময় বসে থাকতে হবে তার সঙ্গে। সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া শিকেয় উঠবে।’

‘তাহলে আমরা বাচ্চা নেব না। সিনেমা-

থিয়েটারে যাব শুধু। আর কুকুর পুষব।’

‘কুকুর নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে ঢুকতে দেবে না।’

‘তাহলে কুকুরও পুষব না। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যাব।’

‘কিন্তু সিনেমা-থিয়েটারে তো আমরা এখনো যাই।’

‘যাই।’

‘তো?’

‘তখন আমরা যাব একসঙ্গে।’

‘আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকি, তুমি সেটা চাও?’

‘সব সময়? বিরক্তি চলে আসবে না?...তবে আমরা যদি কাজ করতে শুরু করি, তাহলে এমনিতেই সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকা হবে না।’

‘তার মানে, সারাক্ষণ একসঙ্গে না থাকতে

চাইলে আমাদের কাজ করতে হবে? আমরা তো

এখন কাজ করি না, তবু সারাক্ষণ একসঙ্গে
থাকা হয় না, ঠিক?’

‘তাহলে তখন কাজ করব না।’

‘কাজ না করলে টাকা আসবে কোথেকে?’

‘তাহলে তখন আমরা একসঙ্গে বাস করব না।’

‘হ্যাঁ, তাহলে ঘর ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজনও হবে
না।’

‘ঘর না থাকলে আমার মা বাসাতেই রান্না
করবে।’

‘আর আমার গ্র্যানি আমাদের বাসাতেই।’

‘তাহলে তো বিয়ে করারও প্রয়োজন নেই
কোনো।’

‘আমি তো সেটাই বলছিলাম।’

‘সত্যি বলতে কি, আমরা বিয়ে করব কি করব
না, সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আসল
কথা হচ্ছে, আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি।
তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না?’

‘বাসি।’

‘খুব?’

‘খুব।’

‘তাহলে চলো না, বিয়ে করে ফেলি?’ সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৪, ২০১১

531) টিভিতে আমার সাক্ষাৎকার - পাভেল রুমিয়ানসেন্ড

হেঁটে যাচ্ছিলাম পথ ধরে। চমৎকার আবহাওয়া।
বাসন্তিক। কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই।

প্রশান্তচিত্তে পাখিদের গান শুনছি। উপভোগের
এমন মুহূর্ত বড়ই বিরল। সেই সময় হঠাৎ কানে
এল প্রীতিকর নারীকণ্ঠ।

‘আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?’

ঘুরে তাকিয়ে দেখি, মাইক্রোফোন হাতে এক
মেয়ে, আর জিনস পরা এক ছেলে, তার কাঁধে
টিভি-ক্যামেরা। অদূরে এক গাড়ি দাঁড় করানো।

সেখান থেকে তার চলে এসেছে এ পর্যন্ত।

আমাদের শহরে টিভিকর্মী সচরাচর চোখে পড়ে
না। আমার তাই কৌতূহল হলো। এগিয়ে
গেলাম তাদের দিকে।

ছেলেটি টিভি-ক্যামেরা তাক করে ধরল
মেয়েটির দিকে, আর মেয়েটি মাইক্রোফোনে
বলতে শুরু করল, ‘আপনার পরিচয় দিন দয়া
করে।’

সর্বনাশ! এরা দেখছি তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার
নিতে চাইছে! আমি নিজের পরিচয় জানালাম।

‘কোথায় কাজ করেন?’

আমি বললাম। দেখুক আমাদের ফ্যাঙ্টরির সবাই!

‘আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘না।’ উত্তর দিলাম, ‘সারাটা জীবন স্বপ্ন দেখে এসেছি।’

‘আজকের আবহাওয়াটা দারুণ না?’

‘হ্যাঁ।’ বললাম।

‘কী চমৎকার রোদুর, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ উত্তর দিয়ে মুচকি হাসলাম।

মন প্রফুল্ল থাকলে হাসবই না বা কেন!

মেয়েটা বলেই চলল, ‘ছোট নদীতে জল বয়ে চলেছে, ঠিক?’

‘হ্যাঁ।’

‘বসন্ত এসে পড়ছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘পাখিরা গান গাইছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘স্টপ! দারুণ রেকর্ডিং হয়েছে।’ একেবারে পেশাদারি ভঙ্গিতে কথাটা বলে ছেলেটার দিকে মুখ ফেরাল মেয়েটি। ‘অথচ তুমি বলেছিলে, উপযুক্ত লোক খুঁজে পাব না! এটা মফস্বল, মস্কো নয়, বুঝলে?’

ছেলেটা উত্তরে কী যেন বলল বিড়বিড় করে।

তারপর তারা ক্যামেরা, মাইক্রোফোন আর তার গোটাতে শুরু করল।

‘এই যে ভাইয়েরা,’ ভারি রাগ হলো আমার,

‘কোন দিন দেখানো হবে, সেটা তো অন্তত বলবেন!’

‘রাতের সর্বশেষ সংবাদের জরিপ অংশে।’

জানাল মেয়েটি। ‘আজ আসি, ভাই। হাতে একদমই সময় নেই। রেকর্ডকৃত অংশ এডিট করতে হবে।’

বলে তারা চলে গেল। কেমন অদ্ভুত এই টিভির লোকজন! সব সময়ই তাদের তাড়া!

সন্দের আগেই আমি আমার সব চেনা-পরিচিত ও আত্মীয়-পরিজনকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম টিভিতে আমার আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা। আর নিজেরা পুরো পরিবার বসে পড়েছি টিভির সামনে। অপেক্ষা করছি, খবর দেখছি। কনিষ্ঠ সন্তান থেকে থেকেই জিজ্ঞেস করছে, ‘বাবা, তোমাকে কখন দেখাবে?’

আমার নিজেরই কৌতূহল হচ্ছে। এদিকে টিভিতে সরকারের বৈঠক দেখাচ্ছে। সেখানে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে, সবকিছুর দাম তারা তিন গুণ বাড়িয়ে দেবে। বাড়ির ট্যাক্স, বিদ্যুৎ— সবকিছুর।

সেই সময় টিভির পর্দায় ভেসে উঠল সেই মেয়েটির মুখ।

সে বলছে, ‘আমরা সাধারণ জনগণের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখেছি, অধিকাংশ লোকই আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। এই যে দেখুন, এক সাধারণ লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করা যাক।’ পর্দায় আমাকে দেখা গেল। তৃপ্ত, হাসিখুশি চেহারা। নিজের পরিচয় দিলাম, টিভি দর্শকদের উদ্দেশে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে, ‘আপনি মূল্যবৃদ্ধির কথা শুনেছেন?’

ক্লোজ-আপে আমার মুখ দেখা গেল পর্দায়।

আমি বলছি, ‘হ্যাঁ।’ তারপর মুচকি হেসে যোগ করছি, ‘সারাটা জীবন স্বপ্ন দেখে এসেছি।’

বদমাশ মেয়েটা তারপর বলছে, ‘সমর্থন করেন?’

আমি ততোধিক আনন্দিত স্বরে বলছি, ‘হ্যাঁ।’

তারপর ট্যাক্সের ব্যাপারেও ‘হ্যাঁ’, বিদ্যুতের ব্যাপারেও ‘হ্যাঁ’...

এবং আমার প্রতিটি উত্তরই সহাস্য!

এ ঘটনার পর আমাকে কত কথা যে সহ্য করতে হয়েছে! ফ্যাক্টরিতে সিগারেট ব্রেকের সময় সহকর্মীরা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে ‘হ্যাঁ’ বলা। স্ত্রী চলে গেছে তার মায়ের কাছে এক মাসের জন্য। আর সরকার?...একটা মেডেল-ফেডেলও যদি দিত আমাকে! অবশ্য সরকারের ওপরে ভরসা না করাই ভালো। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২১, ২০১১

532) বাগানে ইউনিকর্ন - জেমস থারবার

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক ভদ্রলোক আয়েশ করে সকালের নাশতা করতে করতে জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটি ইউনিকর্ন (এক শিংওয়ালা জাদুকরি ঘোড়া) ইচ্ছেমতো তাঁর গোলাপ বাগানের ফুল খাচ্ছে। এই ইউনিকর্নটির শিং ছিল সোনালি রঙের। ভদ্রলোকের চোখ তো

কপালে! শেষমেশ তাঁর বাগানে ইউনিকর্ন! তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না ব্যাপারটা। উত্তেজনায় তিনি দৌড়ে তাঁর বউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললেন, ‘বাগানে একটা ইউনিকর্ন সব গোলাপ খেয়ে নিচ্ছে!’ আধো ঘুম থেকে ওঠা তাঁর বউ বিড়বিড় করে বললেন, ‘ইউনিকর্ন? শোনো এটা হলো একটা কাল্পনিক প্রাণী।’ এই বলে তিনি আবার ঘুম দিলেন। কথা না বাড়িয়ে ওই লোক আবার তাঁর বাগানের দিকে হাঁটা দিলেন।

বাগানে গিয়ে তিনি দেখলেন, ইউনিকর্নটি তখনো আছে, এবার টিউলিপগাছ মজা করে চিবিয়ে যাচ্ছে। ওই লোক কী করবেন তা ভেবে না পেয়ে একটা লিলি ফুল ছিঁড়ে ইউনিকর্নটার দিকে এগিয়ে দিতেই ইউনিকর্ন ওটাও খেয়ে ফেলল।

ভদ্রলোক আবার দৌড়ালেন তাঁর বউয়ের কাছে, ‘বিশ্বাস করো, ইউনিকর্ন আমার হাত থেকে একটা লিলি খেয়েছে!’ এবার তাঁর বউ ঘুম থেকে উঠে বসলেন। বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি একটা পাগল-ছাগল লোক, তোমাকে পাগলাগারদে পাঠানো উচিত।’

সেই লোকের সবচেয়ে অপছন্দের গালি ছিল ছাগল। এই গালি কেউ দিলে তার মাথা ঠিক থাকে না। তবু লোকটি কোনোরকমে মাথা ঠান্ডা করলেন। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে—এই

ভাবতে ভাবতে বউকে আবার বললেন, ‘ইউনিকর্নটার মাথায় কিন্তু সোনার শিংও আছে।’ কিন্তু বউ আবার তাঁকে তাঁর সবচেয়ে অপছন্দের গালিটা দিয়ে দিতে পারেন এই ভয়ে দ্রুত বলে উঠলেন, ‘ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও, আমি দেখি কী করা যায়।’ রাগে গজগজ করতে করতে ভদ্রলোক আবার বাগানের দিকে হাঁটা দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ইউনিকর্ন আর নেই। কী আর করা, ইউনিকর্নের আশায় ভদ্রলোক তাঁর গোলাপবাগানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওদিকে তাঁর বউ ততক্ষণে সজাগ! বিছানা থেকে নেমেই সোজা ফোন দিলেন পুলিশ আর পাগলের ডাক্তারকে। পুলিশ আর ডাক্তার আসার পর ভদ্রলোকের বউ সব কাহিনি ঝরঝর করে বলে ফেললেন, ‘আমার স্বামী সকালের নাশতা খেতে গিয়ে তাঁর ফুলের বাগানে একটা ইউনিকর্ন দেখেছে। তারপর নিজে নাশতা না খেয়ে ওই ইউনিকর্নকে ফুল খাইয়েছে।’ এই

কথা শুনে পুলিশ আর ডাক্তার সাহেব নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলেন। ‘আরে, বিশ্বাস করুন! ও এটাও বলেছে যে ইউনিকর্নটার মাথায় শিংটি নাকি ছিল সোনালি রঙের!’ এই কথা শুনে ডাক্তারের আর কোনো সন্দেহই থাকল না। পুলিশকে ইশারা দিতেই পুলিশ সেই লোকের বউকে ধরেবেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলল।

এর মধ্যে হইচইয়ের কারণে বাগানে ভদ্রলোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বাসায় এসে দেখলেন, তাঁর বউকে পুলিশ গাড়িতে তুলছে। লোকটাকে দেখে পুলিশ জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নাকি তোমার বউকে বলেছ যে সকালে তুমি বাগানে একটা ইউনিকর্ন দেখেছ?’

‘কী যে বলেন, স্যার!’ অবাক হয়ে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, ‘ইউনিকর্ন হলো কাল্পনিক প্রাণী।’ ‘আমার এতটুকুই জানা বাকি ছিল। এই পাগল মহিলাকে গাড়িতে তোলো।’ বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তারের নির্দেশ।

এর পরের কাহিনি হলো, ভদ্রলোকের বউ আছেন পাগলাগারদে। আর ছাগল ডাকের প্রতিশোধ নেওয়া তৃপ্ত অন্তরে ওই ভদ্রলোক রোজ সকালে ফুলপাতা খাওয়ান সেই ইউনিকর্নটিকে। জেমস থারবার: মার্কিন লেখক ও কার্টুনিস্ট। পুরো নাম জেমস গ্রোভার থারবার। দ্য নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর কার্টুন ও ছোটগল্প ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায়। তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ও মৃত্যু ১৯৬১ সালের ২ নভেম্বর।

অনুবাদ: জাবির হাসান

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২১, ২০১১

533) প্রো কুল হোয়াইট শ্যাম্পু

আমি যখন ক্লাস টুতে পড়তাম, তখন আমার বেশ মজার একজন বন্ধু ছিল। ওর নাম অদিতি। একটা কিছু হলেই যা হাসাহাসি শুরু করত না, থামানোই কঠিন ছিল। একদিন আমরা তিনজন ক্লাসের বাইরে হাঁটছিলাম— আমার পাশের বেঞ্চের মেয়ে, আমি আর অদিতি। হঠাৎ অদিতির মাথার ওপর একটা কাক ইয়ে করে দিয়েছিল, সে টেরই পায়নি। সে আমাকে বলছিল, এই, শ্যাম্পুটা কী সুন্দর, না রে! আহ্, কী ঠান্ডা! আমি মুচকি হেসে বললাম, হ্যাঁ, তাই তো, কী সুন্দর সাদা সাদা, তোর

মাথায় ভারি মানাচ্ছে রে! অদিতি একবারও চিন্তা করল না, ওর মাথার ওপর কে ফেলল, কীভাবে পড়ল। আমি বললাম, ‘শোন অদিতি, শ্যাম্পুটা আমার খুব চেনা, এটার নামও আমি জানি।’ সে বলল, ‘তাই। বল না, প্লিজ।’ আমি বললাম, ‘এখন না। তোর খাতা থেকে একটা পেজ ছিঁড়ে দে। লিখে দিই। অফ পিরিয়ডে পড়িস।’ আমি লিখলাম, ক্রো কুল হোয়াইট শ্যাম্পু। তারপর ক্লাসে গেলাম। অফ পিরিয়ডে ও লেখাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ সে আমাকে বলল, এই ক্রো মানে কাক না?’।
তুবা তাসবিতা
ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

534) পটল তোলা

২০০১ সালের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছি। নতুন স্কুল। সবকিছু অপরিচিত। কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও কোনো বন্ধু জুটল না। দিন কয়েক পরে এক ছেলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল। ওর নাম রাজীব। কথাবার্তা কম বলে, কিছুটা বোকাসোকা ধরনের। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল, আমাদের দুজনের রোল নম্বর ছিল পাশাপাশি। যা-ই হোক, দেখতে দেখতে কয়েক মাস পেরিয়ে সামনে হাজির হলো প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। রোল নম্বর পাশাপাশি হওয়ার কারণে আমাদের সিটও পড়ল এক বেঞ্চে। রাজীব এমনতেই পড়াশোনা কম করে। তাই আগেই বলেছিল, আমি যেন ওকে পরীক্ষায় সাহায্য করি। আমি যতটুকু পারব ততটুকু করব বলে আশ্বাস দিয়েছিলাম। বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার ব্যাকরণ অংশে এসেছিল বাগধারার অর্থসহ বাক্যরচনা। এর একটি ছিল ‘পটল তোলা’। রাজীব আমাকে জিজ্ঞেস করল, এর অর্থ কী? আমি বললাম, ‘মারা যাওয়া।’ ও বোধ হয় ভালো করে শুনতে পায়নি, তাই আবার জিজ্ঞেস করল। আমি বলতে যাব এমন সময় পেছন থেকে স্যার এসে পিঠে দিলেন এক চড় আর বললেন, আবার কথা বললে দুটোকেই বের করে দেব। ওই দিন পরীক্ষায় আমরা আর কথা বলিনি। পরীক্ষা শেষ হলো। কিছুদিন পর খাতা দেওয়া শুরু হলো। একদিন স্যার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের খাতা নিয়ে এলেন। আমার খাতার পরই

রাজীবের খাতা। স্যার হাতে খাতা নিয়ে কয়েকবার উল্টিয়ে জিঞ্জেস করলেন, রোল নম্বর ২৫ কে? রাজীব দাঁড়াল। স্যার বললেন, ‘আমাদের রাজীব বাগধারায় খুব ভালো। সে কী লিখেছে তা কি তোমরা শুনতে চাও?’ সবাই সমস্বরে বলল, ‘জি, স্যার।’ স্যার তখন রাজীব কী লিখেছে তা পড়ে শোনালেন। রাজীব লিখেছে, ‘পটল তোলা (মারা যাওয়া) = আজ পটল তুলে রাতে ভাজি করে মজা করে খাব।’ শুনে আমি রাজীবের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। শিমুল, আইন বিভাগ, সূর্য সেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

535) ফাঁকি বাজি

প্রতিদিন ক্লাসের আগে পিটি করা অতি বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। না করলেও আবার শাস্তি। কেমন লাগে! পিটি পিরিয়ডের পরে দারোয়ান কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেয় না। হেড স্যারের নির্দেশ। ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

যাই হোক না কেন আজ পিটি করছি না। দরকার হলে দারোয়ানের হাতে ১০ টাকা গুঁজে দিয়ে পরে ঢুকব। এই ভেবে একটু দূরে চায়ের দোকানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। পিটি পিরিয়ড শেষ হলে স্কুলের দিকে রওনা হই। কিন্তু দারোয়ানকে ঘুষ দিতে সাহসে কুলোয় না। হিতে বিপরীত হতে পারে। স্কুলের পেছন দিকের দুই ফুট উঁচু দেয়াল টপকানো ছাড়া ক্লাসে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। গাছে ভালো উঠতে পারি। দুই ফুট দেয়াল টপকানো তেমন কঠিন কিছু হওয়ার কথা না। কাজেই ওদিকে পা বাড়াই।

স্কুলে ঢুকে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে লক্ষ করি, কেউ আবার দেখে ফেলল না তো? ক্লাসে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, কেউ কেউ আমাকে দেখে হাসছে। মনে হয় ধরা খেয়ে গেছি। ধরা খেয়েছি ভালো কথা, কিন্তু তাদের এত হাসির কী হলো!

ক্লাসে গিয়ে দেখি স্যার এখনো আসেননি। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব করে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসি।

একটু পরে লক্ষ করলাম, মেয়েরা মিচকি মিচকি হাসছে। হাসির কারণ যে আমি, তা বুঝলাম।

কারণ, মাঝেমধ্যে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে। ছেলেরাও কেউ কেউ হাসছে।

মেয়েগুলোর অনেক বাড় বেড়ে গেছে। আমাকে দেখে হাসার কী হলো! আমি চিড়িয়াখানার হনুমান নাকি! বিচার দিয়েছিস ভালো কথা, কিন্তু এতে হাসির কী হলো! আমিও তোদের দেখে নেব। এক মাঘে শীত যায় না।

এসব যখন ভাবছি, তখন আমার এক বন্ধু কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ‘দোস্ত, তোর প্যান্টের পেছনে ছেঁড়া।’

হাসির কারণটা বুঝলাম। কিন্তু মান-ইজ্জত যা যাওয়ার তা ইতিমধ্যে চলে গেছে। এতক্ষণে বুঝলাম, দেয়াল টপকানোর পর থেকে পেছন দিকে এ রকম ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল কেন। নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

536) রংধনু দেখা

ক্লাস থ্রি কি ফোরে পড়ি, ভৈরব চণ্ডিবের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিজ্ঞান ক্লাস নিতেন জালাল স্যার। অসম্ভব রাগী কিন্তু কোমল মনের ছিলেন স্যার। কোনো কিছু না বুঝে তাঁর ক্লাস থেকে বের হব, সে উপায় কখনোই ছিল না। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। শেষ ক্লাস যথারীতি জালাল স্যারের বিজ্ঞান ক্লাস। ক্লাসে ঢুকেই স্যার প্রশ্ন করলেন কে কে নিজের চোখে রংধনু দেখেছি। বেশির ভাগ উত্তরই ছিল ‘না’। স্যারের চোখেমুখে খুশির ছটা। আজ তিনি আমাদের রংধনু তৈরি করে দেখাবেন। দুপুর ১২টা, ঝিলিক দিয়ে রোদ উঠেছে। স্কুলের ছোট মাঠেই ছিল একটা টিউবওয়েল। স্যার সবাইকে টিউবওয়েলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতে বললেন আর আমাকে বললেন টিউবওয়েল এবং সূর্যের বিপরীতে দাঁড়াতে। স্যার টিউবওয়েল চাপছেন আর আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন, মুখভর্তি পানি নিয়ে মুখ উঁচু করে সূর্যের বিপরীতে কুলকুচি করলেই অন্যেরা রংধনু দেখতে পাবে। বৃষ্টির সাহায্য ছাড়া এটাই রংধনু দেখার সবচেয়ে সহজ উপায়। বাধ্য ছাত্রের মতো মুখভর্তি পানি নিলাম, মুখ উঁচু করলাম এবং চোখ বন্ধ করে দিলাম কুলকুচি করে। চোখ খোলার আগেই সবার অটহাসি কানে এল। ভেতরে ভেতরে খুব অহংবোধ কাজ করছিল—আমার দ্বারা সবার

রংধনু দেখা হচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখ খুললাম।
একি! কোথায় রংধনু! আমার মুখনিঃসৃত
কুলকুচির পানিতে স্যারের সারা মুখ সয়লাব।।
তানজিলা হ্যাপী
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

537) স্কুল কোতুক

শিক্ষক: বানান কর 'বাঁশ'।
ছাত্র: স্যার, কঞ্চিঃসহ? শিক্ষক: মন্টু, তুমি এক
থেকে কত পর্যন্ত গুনতে পারো?
মন্টু: স্যার, দশ পর্যন্ত পারি।
শিক্ষক: মাত্র দশ পর্যন্ত! তুমি তাহলে বড় হয়ে
কী হবে? কিছুই তো হতে পারবে না।
মন্টু: কেন, স্যার, বক্সিংয়ের রেফারি তো হওয়া
যাবে। একদিন ক্লাসে...
শিক্ষক: যারা একেবারে নির্বোধ, অকর্মণ্য তারা
ছাড়া সবাই বসে পড়ো।
সবাই বসে পড়ল। শুধু শুভ দাঁড়িয়ে আছে।
শিক্ষক: কি শুভ, তুমি একাই তাহলে নির্বোধ ও
অকর্মণ্য?
শুভ: না, স্যার, আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন,
এটা ভালো দেখাচ্ছে না, তাই...।। মো. সাইদুর
রহমান
মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ
মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

538) প্রেমপত্র

আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার ঘনিষ্ঠ
বন্ধু শরীফ পাশের গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে
পড়ে। ওই গ্রামের মধুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে
পড়াশোনা করে সে। মধুপুরে শরীফের মামার
বাড়ি হওয়ায় প্রায়ই সে সেখানে যেত। মেয়েটির
সঙ্গে নাকি তার কথাও হয়েছে। কিন্তু মনের
কথা প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা সহ্যে না
পেরে আমাকে ধরল একটি চিঠি লিখে দিতে।
মানে প্রেমপত্র। আমাকে নিজ খরচে সিনেমা
দেখানোর প্রস্তাবও দিয়ে দিল সঙ্গে। আমিও
রাজি। একদিন আমার রুমে বসে একটি নতুন
প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে প্রেমপত্র লিখতে বসে
গেলাম। ব্যাপারটা যে রচনা লেখার মতো সহজ
নয়, সেটা টের পাচ্ছিলাম। যা হোক, অনেক
ভেবেচিন্তে যা লিখলাম তার কয়েকটি লাইন
ছিল এ রকম: প্রিয় লাইলী (মেয়েটির নাম),

কেমন আছ? নিশ্চয়ই ভালো। আমি ভালো নেই। তোমাকে এক দিন না দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। তাই তো আমি মধুপুরে ছুটে আসি।

চিঠিটা শেষ করার আগেই আমার এক বন্ধুর ডাকে বাসা থেকে বের হয়ে যাই। চিঠিটা ছিল বইয়ের ভেতরে ভাঁজ করা। দুপুরের দিকে বাসায় আসি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আম্মাকে বলি ভাত দিতে। আম্মা কোনো কথাই বলছে না। বড় ভাইয়া আম্মাকে দেখামাত্রই ছুটে আসে মারার জন্য। আপা তো এরই মধ্যে দু-একটা থাপড় মেরে বসে। ভাইয়া বলে, ‘ওকে বাসা থেকে বের করে দাও। ওর পড়াশোনার দরকার নেই।’ সবাই আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছে কেন? হঠাৎ চিঠিটার কথা মাথায় আসে। দৌড়ে রুমে গিয়ে দেখি, চিঠিটা নেই। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। বাসার কেউ না-কেউ চিঠিটা পেয়েছে। পরে জেনেছি, এটা হচ্ছে আমার ফাজিল ছোট ভাইটার কাজ। সবাই ভেবেছে, চিঠিটা আমার এবং আমিই লাইলীর প্রেমে পড়েছি। যা হোক, সপ্তাহজুড়ে নিগৃহীত থাকার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়। বেচারী শরীফকে কি মারটাই না মেরেছিলাম। ওর জন্যই তো আম্মাকে প্রেমে না পড়েও প্রেমপত্র লেখার খেসারত দিতে হলো। কাজী হুমায়ুন কবীর ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

539) যথাকার

২০০৯ সালের কথা। আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুল আর গার্লস স্কুল মুখোমুখি হবে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার দুই দিন আগে বিষয় আর পক্ষ জানিয়ে দেওয়া হলো। বিষয় আর পক্ষ শুনে আমাদের মাথায় হাত! বিষয় ছিল ‘নারী জাতির উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধান মাধ্যম’। আর আমাদের বলতে হবে বিপক্ষে! নিশ্চিত হেরে মুখে চুনকালি মাখার আশঙ্কায় আমরা হতবাক। যা হোক, নিরাশার ডালি বোঝাই করে সুফিয়া ম্যাডামের সঙ্গে আমরা তিন তর্কিক—দীপ্ত, আবীর আর আমি গেলাম বিতর্ক করতে। কিন্তু বিচারকদের দেখে আমাদের মনে আশার আলো জ্বলে উঠল! কারণ, বিচারকেরা ছিলেন শহরের এমন কয়েকজন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), যারা

বিতর্কের বিচারের ব্যাপারে কিছু বোঝেন কি না সন্দেহ! তাই তাঁদের টেকনিকে ঘায়েলের ফন্দি আঁটলাম আমরা। এমন কিছু সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর নাম ও উক্তি বের করতে লাগলাম, যা কল্পনাতে। বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনের খেলোয়াড়ের নামের মিশ্রণ যেমন স্টিফেন গুচ (স্টিফেন ফ্লেমিং আর গ্রাহাম গুচের মিশ্রণ) থেকে শুরু করে অ্যাড্রু বেভানের (অ্যাড্রু সাইমন্ডস আর মাইকেল বেভানের মিশ্রণ) নাম আর স্বরচিত তথাকথিত উক্তি দিয়ে বিচারকদের তাক লাগিয়ে দিলাম। তাঁদের প্রসন্ন হাসিতেই বুঝতে পারছিলাম, নম্বরের ঝোলা ভারী হচ্ছে! অপর দিকে প্রতিপক্ষরা বিচারকের ভাব দেখে চরম হতাশ। তাদের শেষ বক্তা ডায়াসে বক্তব্য দিতে উঠে বিচারকদের অমন রূপ দেখে বক্তব্য দিতে দিতে হঠাৎই চিৎকার করে উঠল, ‘উহ! না, আর পারছি না।’ বলেই ডায়াস ছেড়ে দে ছুট!।

মাসুক-আল-ইস্তি

জয়নগর, নেত্রকোনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

540) খুদে জ্ঞানী

জ্ঞানী বলে কথা। শুধু কি জ্ঞানী? মহাজ্ঞানী। কেন বলছি? তবে শুনুন। আমার পরিচিত এক ভাই ও ভাবি যমজ সন্তানের যথাক্রমে জনক ও জননী। যথাসময়ে তাদের স্কুলে পাঠানো হলো। শুরু প্লে গ্রুপ দিয়ে। মহা আনন্দে তারা স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করেছে, কিন্তু ক্লাসে টিচার খেলার ছলে কোনো কিছু শেখাতে গেলেই বাধছে বিপত্তি। তারা উল্টো টিচারদের বলছে, ‘তোমরা জানো না, ছোট বাচ্চাদের খেলার সময় ডিস্টার্ব করতে হয় না, তাতে ওদের মন খারাপ হয়, আর মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়।’ কী আর করা। টিচাররা অন্য ফাঁদ পাতে কিছু শেখানোর জন্য। কিন্তু আবারও শুরু হয় জ্ঞানদান। ‘জানো না, বাচ্চাদের ব্রেইনে বেশি চাপ দিতে হয় না। তাতে ওরা পড়তে ভয় পায়। আর প্লে গ্রুপ মানে তো শুধু খেলা, খেলা আর খেলা।’ টিচাররা কোনোভাবেই এই খুদে জ্ঞানীদের বাগে আনতে পারেন না। অতঃপর মা-বাবার শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা তো শুনে হতবাক!। নাসিমা

অফিসার্স কোয়ার্টার, সাভার সেনানিবাস,

সাভার।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

541) এককথায় প্রকাশ

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ের একটি ঘটনা।
বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস নিতেন খালেদা
ম্যাডাম। ওই দিন পড়া ছিল এককথায় প্রকাশ।
ম্যাডাম প্রায় সময়ই পড়া নিতেন না। নিলেও
দু-চারজন থেকে নিয়ে শেষ। তাই প্রায় সময়ই
পড়া না শেখার শাস্তি থেকে রেহাই পেতাম।
ওই দিন তিনি প্রায় সবার কাছ থেকে একে
একে পড়া নিচ্ছিলেন। দেখে তো আত্মারাম
খাঁচাছাড়া। তড়িঘড়ি করে বই থেকে এককথায়
প্রকাশ দেখা শুরু করে দিলাম। ভালো করে
দেখার আগেই ম্যাডাম আমার পাশের জনকে
জিজ্ঞেস করলেন, যে নারীর বিয়ে হয়নি,
এককথায় কী হবে? আমার বন্ধুর ত্বরিত জবাব,
অবিবাহিত। ম্যাডাম আর দু-একজন ভালো
ছাত্রছাত্রীও মিষ্টি করে হাসতে লাগল। আমি তো
হাসার কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। মনে
তো হয় ঠিকই বলেছে। ম্যাডাম তাকে দাঁড়িয়ে
থাকতে বললেন।

এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যা লাফিয়ে
চলে, কী হবে? আমিও ত্বরিত জবাব দিলাম,
ব্যাঙ। সহজ এককথায় প্রকাশ।

এবার ম্যাডাম আর ওই ভালো ছাত্রছাত্রীরা
সজোরে হাসতে লাগল।

আমি ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। ততক্ষণে
পেছনের

ছাত্ররা বই থেকে দেখে হাসা শুরু করে দিল।
পুরো ক্লাসে হাসি। আমি দেখলাম, শুধু আমিই
হাসি থেকে বাদ। তাই আমিও মিষ্টি করে হাসা
শুরু করলাম। আফাজ মুহাম্মদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

542) মাসুদ রানা যখন শিক্ষক

[কাজী আনোয়ার হোসেনের কাছে ক্ষমা
প্রার্থনাপূর্বক]

‘বলতে পারো “সদাচার” কী?’ প্রশ্ন করল,
কেসি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের জুনিয়র শিক্ষক
মাসুদ রানা। দুর্ধর্ষ কিংবদন্তি স্পাই মাসুদ রানা
এখন স্কুলশিক্ষক।

‘ইহা এমন এক প্রকার আচার, যা আমাদের

স্কুলের সামনের দোকানে বিক্রি হয় না।’ চটপট উত্তর দিল ছাত্রটি।

সবাই হেসে উঠল। গম্ভীর মুখে আরেকজনকে প্রশ্ন করল রানা, ‘বলো তো, ট্রান্সপারেন্ট শব্দের মানে কী?’

‘স্বচ্ছ।’ উত্তর দিল ছাত্রটি।

‘উদাহরণ দাও?’

‘যেমন—আপনার পুরোনো পাঞ্জাবিটি এত স্বচ্ছ যে আপনি ভেতরে ছেঁড়া লাল স্যাভো গেঞ্জি পরেছেন, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!’ সবাই হেসে উঠল আবার। উদাস হয়ে গেল রানা।

দুই.

এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান এক মাস হলো আমেরিকায় গেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমন্ত্রণে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ওবামা হিমশিম খাচ্ছেন বলে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তাঁকে।

বিসিআই চালাচ্ছে এখন রানার বন্ধু সোহেল। প্রজেকশন হলে বসে আছে দুজন। এইমাত্র বেশ কয়েকজন মেয়ের ছোটবেলার ছবি দেখা শেষ করল দুজনে।

‘নায়িকা শাবদুর, ভারতের নায়িকা পারভিন, আমাদের সোহানা—হঠাৎ এদের ছোটবেলার ছবি দেখালি কেন?’ রানা জিজ্ঞেস করল।

‘কারণ, এরা সবাই মিসিং!’ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল সোহেল।

‘হোয়াট!’

‘ঠিকই শুনেছিস! হঠাৎ করেই এরা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আর একটা ছবি দ্যাখ।’ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ছোট সোহানা একটা স্কুলের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। পরের ছবিতে আইসক্রিম কিনছে ও। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানা তাকাল সোহেলের দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। ‘হঠাৎ করেই ও শৈশবে পৌঁছে গেছে। খবিশ চৌধুরী মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ছে সোহানা। আমাদের এক্সপার্ট ডা. শমসের আলী বলেছেন, কেউ হয়তো যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কার করে ফেলেছে। যার জন্য সোহানা ছোট হয়ে গেছে।’ ‘খবিশ চৌধুরী নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে!’ বলল রানা।

‘ঠিকই ধরেছিস। কবির চৌধুরীর বাবার নাম ওটা।’

‘আমরা তো সোহানাকে স্কুলের গেট থেকে তুলে আনতে পারি?’ বলল রানা।

‘সে চেষ্টা করেছিল গিলটি মিয়া। বেচারি ইভ টিজিংয়ের দায়ে গণধোলাই খেয়ে এখন হাসপাতালে।’

‘তাহলে আমি কীভাবে ঢুকব ওই স্কুলে?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘শিক্ষকের চাকরি নিয়ে।’ পকেট থেকে পেপার কাটিং বের করে দিল সোহেল।

‘চাকরি তো আমার নাও হতে পারে।’ হেসে বলল রানা।

‘হবে। টেন্ডারবাজির মতো ব্যবস্থা করব। শুধু তুই একাই ভাইভা বোর্ডে হাজির হবি।’ তিন. এক ছাত্র উঠে দাঁড়াল, ‘স্যার, আমি একটু ল্যাপট্রিনে যাব।’

‘কী বললে? অবাক হলো রানা।

‘ল্যাপট্রিন স্যার, ল্যাপট্রিনে যাব।’

‘তোমার সব পড়া হয়েছে।’

‘হয়নি স্যার। বাসায় রাতে ইলেকট্রিটি ছিল না।’ বলল ছাত্রটি।

বুঝতে পারছে রানা—সমস্যা অন্য কোথাও।

‘তোমাকে ইংরেজি শেখায় কে?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘আমার বাবা, নয়তো দাদু!’

‘তোমার বাবাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।’ বলল রানা।

পরদিন ছেলেটির বাবা স্কুলে এলেন।

‘আপনার ছেলে তো ভুল ইংরেজি বলে।’

অনুযোগ করল রানা।

‘ছোট বাচ্চা, বুঝলেন তো, ক্যাপাটিটি কম!’

হেসে বললেন ভদ্রলোক।

‘আপনার আকাও কি ইংরেজি জানেন?’

‘জানেন।’ উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

‘তাকে একদিন আসতে বলুন তো।’

পরদিন ছাত্রটির দাদু এসে উপস্থিত হলেন।

রানা তাঁকে বসিয়ে বলল, ‘আপনার ছেলে, নাতি দুজনেই তো ভুলভাল ইংরেজি বলে, ব্যাপার কী?’

এক গাল হেসে দাদু বললেন, ‘আরে ওর বাপ-দাদা তো আর ইউনিভার্সিটিতে পড়েনি।’ চার.

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল ওর। স্কুলের বেশ কিছুটা পেছনে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান কে চৌধুরীর

বাসার গেটে কড়া পাহারা। কেউ সেখানে যেতে পারে না। কে চৌধুরী বিদেশে থাকায় বাসা দেখাশোনা করেন তাঁর আত্মীয় সাগর চৌধুরী ও স্কুলের আরেক জুনিয়র শিক্ষক। সোহানা তাঁর সঙ্গেই থাকে।

রানা রাতে চুপ করে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে পেল এই মাত্র।

চারদিকে তাকাল রানা। ছোট্ট সোহানা বিছানায় শুয়ে আছে। রানা শুয়ে আছে ডিভানে। সারা শরীর অবশ। নড়তে পারছে না।

‘কেমন আছো রানা?’ গলাটা কেমন চেনা চেনা মনে হলো রানার কাছে। কয়েক দিন ধরেই ক্লাসে আর স্কুলের বারান্দায় সোহানার সঙ্গে কথা বলেছে রানা। ছোট সোহানা বয়সের সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও হারিয়েছে। চিনতে পারেনি ওকে।

‘চিনতে পারছো, রানা আমাকে?’ কবির চৌধুরীর গলা। সুঠাম দেহের তরুণ সাগর চৌধুরীকে দেখে চেনার উপায় নেই যে এই হচ্ছে মাসুদ রানার আদি শত্রু পাগল বিজ্ঞানী কবির চৌধুরী। হাসল চৌধুরী, ‘দেখেছ, কী যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছি। নিজের বয়স কমিয়েছি। তোমার প্রেমিকা সোহানাকে বাচ্চা বানিয়ে দিয়েছি।’

‘কেন?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘আমি জানতাম, ভিলেনের ভঙ্গিতে বলল চৌধুরী, কান টানলে মাথা আসবেই। তাই সোহানাকে ধরে আনলাম। জানতাম, তুমি আসবেই। এসেছ।’

‘তাতে তোমার লাভ কী হলো?’

‘দেখো রানা, যতবারই আমি আমেরিকাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছি, ততবারই তুমি বাগড়া দিয়েছ। আর পারবে না।’ ঘুমন্ত সোহানাকে ইনজেকশন দিল চৌধুরী। তারপর বলল, ‘সোহানা আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তার আগের শরীর আর স্মৃতি ফিরে পাবে। আর তুমি?’ টেবিল থেকে আরেকটা ইনজেকশন তুলে নিয়ে ত্রুর হাসি হাসল চৌধুরী, ‘দুর্ধর্ষ স্পাই মাসুদ রানা এখন হয়ে যাবে ফিডার খাওয়া বাচ্চা। স্মৃতি অটুট থাকবে তোমার কিন্তু শরীর হবে বাচ্চার।’ বলতে বলতে চৌধুরী ইনজেকশনটা ঢুকিয়ে দিল রানার শরীরে। পাঁচ. সোহেলের হাতে দুগালে থাপড় খেয়ে জ্ঞান ফিরল সোহানার। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে। তারপর ধড়মড় উঠে বসল,

‘আরে, সোহেল তুই! আমি কোথায়?’

‘রানা কোথায়? কবির চৌধুরী কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল সোহেল।

‘জানি না তো।’ বলল সোহানা। ভাঁ করে কেঁদে উঠল বাচ্চা রানা। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। কবির চৌধুরী পালিয়েছে—সেটা বলতে পারছে না।

‘বাচ্চাটা কার?’ সোহেল জিজ্ঞেস করল।

‘জানি না। কার না কার বাচ্চা!’

‘চল দুজনে রানা আর চৌধুরীকে খুঁজে বের করি।’ বিশ্বজিৎ দাস

প্রভাষক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

543) ইঁচড়ে পাকা

স্কুলে ইঁচড়ে পাকা হিসেবে আমার কুখ্যাতি ছিল। পরীক্ষার ফল যা-ই হোক, মেয়ে পটানোতে ছিলাম ওস্তাদ। প্রেমপত্র চালান দিতাম যখন-তখন। তাতে কাব্যপ্রতিভা এবং সাহিত্যচর্চা পাল্লা দিয়ে বাড়ত। বন্ধুরা যখন গোয়েন্দা কাহিনি, রহস্যোপন্যাস আর ভৌতিক গল্প নিয়ে পড়ে আছে, তখন আমি সেসবের পাট চুকিয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস নাড়াচাড়া করছি। পত্রিকায় লেখা পাঠাতাম। প্রথম প্রথম একটাও ছাপেনি। কিন্তু যেদিন এক কবির কবিতা থেকে শব্দ ধার করে ‘প্রেম’, ‘প্রিয়া’, ‘চুম্বন’-জাতীয় শব্দ জুড়ে দিয়ে বানানো একটা কবিতা পাঠালাম, অমনি ছেপে দিল। বুঝলাম, প্রেমবিষয়ক লেখায় আমার হাত আছে। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক তো কল্পনায় বিচরণকারী বালিকা নন যে তাঁর নজর কাড়তে এসব লেখা; বরং ছাপালেই অনেক। ছাপা হয়েছিল দু-চারটা। ধৈর্যও ধরতে হয়েছে অনেক। তাই মজাটা কম। কিন্তু ক্লাসের অকালপক্ব বালিকাদের প্রতি প্রেমপত্র পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিক্রিয়া তো পাওয়া যায়। তাই লিখে ফেললাম পাতা ভরে। তাতে লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রসঙ্গ আর প্রেমের পক্ষে এমন সব যুক্তি দিলাম যে সেটা প্রেমপত্র না হয়ে প্রবন্ধ ধরনের হয়ে গেল। ব্যবহার করলাম জটিল সব উপমা। সবকিছুই ধার করা। তার অনেকটা আমি নিজেই বুঝতাম না। আমার সেই গদ্য-পদ্য মিলিয়ে পাঁচমিশালি মহাকাব্য দেখাতাম সখিনাকে। ‘বাহু যেন সান্ধাৎ মুলো’—লাইনটা

নিয়ে সখিনা যেদিন আপত্তি তুলল, সেদিন মুলো নামক সবজির সাদা রং আর সখিনার উজ্জ্বল ফর্সা ত্বকের মিল দেখিয়ে কোনো রকমে পার পেয়েছিলাম। কাজেই কবিতা কাটছাঁট করে ফেললাম। তারপর কী মনে করে পাঠিয়ে দিলাম সেই পত্রিকায়। অথচ সখিনাকে মুগ্ধ করাই ছিল আমার লক্ষ্য। সোমবার বেরোল সেই পত্রিকা। সেটা সংগ্রহ না করেই স্কুলে গেলাম। সম্পূর্ণ লেখাটা সখিনাকে দেখাতে হবে। ক্লাসের মধ্যেই আমার লেখাটায় নজর বুলিয়ে নিলাম। ১৫টা বানান ঠিক করলাম। তখন কিছু না বুঝতেই বদরুল স্যার কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন। পড়তেই কটমট করে তাকালেন, বললেন, ‘কাল তোর বাবাকে ডাকবি।’ তারপর কী হলো আর না-ই বললাম। কিন্তু এটা ভাবতেও পারিনি যে আমার লেখাটা সেদিনই পত্রিকায় এসেছে। দুর্নাম ঘোচাতে পত্রিকাটা দিলাম বাবার হাতে। নিয়ে গেলেন স্কুলে। সেদিন থেকেই হুঁচড়ে পাকা লেবেলটা ভালোভাবে লেগে গেল কপালে। মন্দ কী! সখিনাকে দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা তো পড়িনি। ইভ টিজারের চেয়ে হুঁচড়ে পাকা অনেক ভালো।। রাসেল শেরেবাংলা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

544) বাঁহাতি শপথ!

আমার বয়স তখন নয় বছর। স্কুলে ভালো ছাত্রী হওয়ার সুবাদে আমাকে প্রায়ই অ্যাসেম্বলিতে নেতৃত্ব দিতে হতো। কিন্তু ওই দিনে আমার দলে যার শপথ পড়ানোর কথা ছিল, স্কুলে না আসায় আমাকেই সেই গুরুদায়িত্বটি গ্রহণ করতে হলো। তো, সে সময়ে আমি হাত তুলে শপথ পাঠের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছিলাম। কিছুক্ষণ পরই খেয়াল করলাম, সব ছাত্রছাত্রী আমাকে দেখে হাসাহাসি করছে। আমি তখনো কিছু বুঝিনি কিন্তু শপথবাক্য পাঠ করে যখন নামব, তখনই দেখি সব স্যার-ম্যাডাম আমার দিকেই এগোচ্ছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার প্রথম শপথবাক্য পাঠ করাটা মনে হয় তাদের খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু তাঁরা যখন আমাকে মহারামডোজ দিয়ে আমার ধারণাটা মিথ্যা প্রমাণিত করলেন, তখন বুঝলাম, সমস্যাটা কোথায়? বলুন তো, হাত তুলে শপথ পাঠে কোথায় আমার সমস্যাটা ছিল? এখনো

ধরতে পারেননি! তাহলে বলেই ফেলি, যেখানে
ডান হাত তুলে শপথ করার নিয়ম, সেখানে
আমি সেদিন বাঁ হাত তুলে শপথ করেছিলাম।
মালিহা তাসনীম
সজ্জনকান্দা, রাজবাড়ী।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

545) অর্থহীন

অঙ্কের ক্লাস, স্যার কয়েকটা অঙ্ক করতে দিয়ে
ঝিমোতে লাগলেন। আমি সব অঙ্কের বিভিন্ন
অংশ জোড়াতালি দিয়ে দুই পৃষ্ঠা ভরিয়ে
গবেষণায় লেগে গেলাম। গবেষণার বিষয়: টেস্ট
পেপারসিন রোগ এবং আমাদের ফাস্ট গার্লের
মানসিক বিকাশে এর ক্ষতিকর প্রভাব। টেস্ট
পেপার প্র্যাকটিস করতে করতে যে রোগ হয়,
সেটাই টেস্ট পেপারসিন রোগ। গবেষণার
একপর্যায়ে অত্যধিক উত্তেজনাবশে বেঞ্চে কিল
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম, এই চশমা,
আর চশমার পাশেরটা, দাঁড়া। কিছু বোঝার
আগেই আমার পাশের মেয়েটা তড়াক করে
দাঁড়িয়ে গেল। ওর পাশে আর কে কে চশমা
পরে আছে, তা দেখার আগেই আমার
ফ্রেন্ডগুলো আমাকেও ঠেলেঠুলে দাঁড় করিয়ে
দিল। বিপদেই বন্ধুর পরিচয়। বন্ধু না ছাই।
নিজেরা বাঁচার জন্য আমাকে বিপদে ফেলে
দিল। স্যার যাক। দেখা যাবে, কত ভুটায় কত
পপকর্ন...।

স্যার বললেন, এত কথা কিসের? কথা বলছি
কেন? পাশের মেয়েটা (নাম মনে নেই) অবাক
হওয়ার ভান করে বলল, ‘স্যার, আমি কথা
বলেছি! আমি!’ কী সাংঘাতিক পাজি! ইচ্ছা
করছিল, ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলি,
‘আমি ধাক্কা মারছি? আমি?’

ওকে বসিয়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,
এক বেঞ্চে এতজন বসেছিস কেন? আশপাশের
সব বেঞ্চে ফাঁকা, আর এই বেঞ্চে জনসংখ্যা
আধিক্য কেন? আমি বললাম, ‘স্যার, আমাদের
আন্তর্মানবিক শক্তি বেশি।’

সবাই হেসে ফেলল। আর স্যার কিছুটা
ভাবাচেকা খেয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন,
পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাধারণ নির্বচন
মুখস্থ বল। ইশ্! একবারে মোক্ষম অস্ত্র!
স্বাস্থ্যবান মানুষের কী চিকনা বুদ্ধি রে বাবা!
‘স্যার, একটু বই দেখে এরপর বলি?’

স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন।

কথা বলার জন্য তো বই দেখা লাগে না, খালি পড়া জিজ্ঞেস করলে বই দেখতে ইচ্ছা করে, না? এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাক।

কী আর করা। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, রাগে, দুঃখে, অপমানে আমার কান দুটো লাল হয়ে গেছে।

সবার দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাইকে কেমন যেন ব্যাঙ ব্যাঙ লাগছে। মনে হচ্ছে, অনেক ব্যাঙ স্কুল ইউনিফর্ম পরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চরম দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পেল। আমি হাসি আটকে রাখতে গিয়ে ফিক করে হেসে স্যারের কাছে ধরা খেয়ে গেলাম। পুনরায় শুরু হলো, বেশরম...বেহায়া। পশুপাখি থেকেও খারাপ...এত কিছুর পরও কী রকম হাসছে...।।

চন্দ্রবিন্দু

খুলশী, চট্টগ্রাম।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

546) হনুমানের কীর্তি

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখনকার কথা। বার্ষিক পরীক্ষা হতে প্রায় এক-দেড় মাস বাকি। ইতিমধ্যেই স্কুলে ছাত্রীদের আনাগোনা কমে গেছে। ক্লাসে মাত্র ১০-১২ জন ছাত্রী। টিফিন পিরিয়ডে সবাই টিফিন খাচ্ছে। তখন শুনি একটা মেয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। নিচে গিয়ে শুনলাম, মেয়েটা স্কুলের পেছনের দিকে গিয়ে তার টিফিন খাচ্ছিল, একসময় পানির বোতল আনার জন্য ক্লাসে যায় সে। এসে দেখে, টিফিন বক্স মাটিতে আর তার খাবার কে যেন খেয়ে গেছে। আশ্চর্যজনকভাবে কিছুক্ষণ পরপর সবার টিফিন খোয়া যেতে লাগল। আমি আর কয়েকজন মিলে টিফিন যেখানে খোয়া যাচ্ছিল, সেখানে গেলাম। সবার টিফিনের দিকে দেখতে দেখতে আমার টিফিন যে কখন হাওয়া হয়ে গেছে, খেয়ালই করিনি। আমার টিফিন যেখানে ছিল, তার ওপর একটা ঝাঁকড়া লিচুগাছ ছিল। সেটার ওপর থেকে খ্যাঁচর-ম্যাচর শব্দ আসছিল। ওপরে তাকিয়ে দেখি, একটা মুখপোড়া হনুমান কী জানি খাচ্ছে। আর সবাইকে ভেংচি কাটছে। কারও আর বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কীর্তি! কী আর করা। সেদিন সবাইকে খালি পেটেই বাকি ক্লাসগুলো করতে হলো।। ফাইরুজ আনিকা

নিলটুলী, ফরিদপুর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

547) মিলার কী দরকার!

তখন ক্লাস নাইন কি টেনে পড়ি। আমাদের এক সহপাঠী ছিল, নাম ‘মিলা’। দেখতে পাটকাঠির মতো। কিন্তু তা হলে হবে কী! ছিল অনেক ঢঙি। চলত খুব স্টাইল নিয়ে। নবাগত হওয়ায় ওকে নিয়ে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সব সময় একটা গুপ্ত আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সমালোচনা চলত। কারণ সে আমাদের অনেক বন্ধুর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের এক ‘রসিক ভয়ংকর’ অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। আমাদের সেই রসিক ভয়ংকর স্যার একদিন ক্লাস নিতে গিয়ে এক মজার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। একটা অঙ্ক কিছুতেই মিলছিল না। অনেক চেষ্টা করে, অনেক যুদ্ধের পর যখন তিনি যবনিকা টানলেন, তখন দেখা গেল অঙ্কটা মেলেনি। আমরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, ‘স্যার, মেলে নাই তো।’ কথা শুনে স্যার খুব হতাশ হয়ে এবং কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ‘মিলার কী দরকার!’ কথাটা শুনে পুরো ক্লাস তো হো হো করে হেসে উঠল। স্যার কিছুটা বিস্মিত হয়ে এবং পরক্ষণেই হাসির কারণ ধরতে পেরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সেই থেকে কথাটা প্রচলিত হয়ে গেল ‘মিলা’র কী দরকার! এস কে সিকদার সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

548) কথায় লিখন

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া মাত্র শুরু করেছি। নতুন ক্লাসে অঙ্কের স্যার ৫৫-৬০ পর্যন্ত কথায় লিখতে দিয়েছেন। আমি বাড়িতে নির্ভুলভাবে বাবার কাছে বছবার ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কথায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করে টেবিলে খাতা জমা দিলাম। স্যার প্রথমেই আমার খাতা হাতে নিয়ে নাম ধরে ডাক দিলেন। লেখা ভালো হয়েছে ভেবে খুব আনন্দে স্যারের কাছে যেতেই কান মলার সঙ্গে পিঠে ডাস্টার পেটা ফ্রি পেলাম! আমি পঞ্চাশ-ছাপ্পান্ন... এভাবে লিখেছি। স্যার এগুলো ভুল লেখা ভাবলেন। তিনি আমার লেখা কেটে এভাবে লিখলেন, পাঁচপোনচাস,

ছপোনচাস..., (আঞ্চলিক ভাষায়)। আমি কাঁদতে কাঁদতে বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। অতঃপর স্যার অঙ্ক বই খুলেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্লাসের সবাইকে বললেন, ‘তোমরা বইয়ের লেখাও লিখতে পারো আবার পাঁচপোনচাস, ছপোনচাস... এভাবেও লিখতে পারো।’ অন্য কারও খাতা না দেখেই স্যার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। এ স্কুলেই প্রাইমারি জীবন কেটেছে আমার। কিন্তু সেই গুণধর স্যারের দেখা আর মেলেনি। পরে জেনেছিলাম, সেদিনের অঙ্ক ক্লাসের স্যার আসলে কোনো শিক্ষক নন। তিনি অঙ্ক স্যারের আত্মীয়। অঙ্ক স্যারের পরিবর্তে ক্লাস নিতে এসেছিলেন!। মো. মতিউর রহমান
চাঁদপুরা, টেকেরহাট।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

549) বদ না, বদনা

বছর চারেক আগের ঘটনা। তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন ক্লাসে বাংলা পড়াচ্ছিলেন স্যার। আমার কয়েকজন সহপাঠী সেদিকে মোটেও মনোযোগী ছিল না। তারা বিভিন্নভাবে দুষ্টুমি করছিল। স্যার খুবই বিরক্ত হয়ে তাদের মধ্যে রিয়ানকে দাঁড়াতে বললেন। তারপর স্যার তাকে বললেন, ‘এ হচ্ছে ক্লাসের সবচেয়ে বদ।’ হঠাৎ করে রিয়ান বলল, ‘স্যার, আমি তো বদ না।’ রিয়ানের কথা শোনামাত্র আমরা সবাই হেসে ফেললাম। স্যারও না হেসে থাকতে পারলেন না। শুধু রিয়ান হতবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। কারণ, সে তখনো বোঝেনি, সে কী বলতে গিয়ে কী বলেছে।। মো. আরাফাত হোসেন
চরেরহাট, খালিশপুর, খুলনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

550) দামড়া বাছুর

স্কুল, ক্লাসরুমের বিশেষ কিছু ঘটনা মনে করতে গেলেই মনে পড়ে ক্লাস ওয়ানের কথা। তখন আমরা প্রায়ই ক্লাসে অ্যালফাবেট সং গাইতাম। একটা লাইন ছিল, যেখানে গাইতে হতো এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি। তো আমরা কয়েকজন ছাড়া কিছু ছেলেমেয়ে গাইত এইচ আই জে কে এলোমেলো পি। ক্লাস সিক্সে ভর্তি হওয়ার পর একদিন আমাদের ইংরেজি স্যার

‘জেভার’ পড়াচ্ছিলেন। একটা মেয়ে ছিল নতুন, নাম রিমি। স্যার ওকে পড়াচ্ছিলেন ‘Bullock’ মানে ‘দামড়া বাছুর’, পাঁচ-ছয়বার স্যার জিজ্ঞেস করার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম? রিমির আর খেয়াল নেই। পড়ার তালে তালে বলল, ‘দামড়া বাছুর’। ফাতেহা আফরীন যাত্রাবাড়ী।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

551) ছেলে সাজার বিড়ম্বনা

মা-বাবার একমাত্র মেয়ে হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই প্যান্ট আর শার্ট পরে ছেলে সাজার এক অদম্য ঝোঁক ছিল আমার মাথায়। তখন প্রাইমারি লেভেল থেকে সবেমাত্র হাইস্কুলে উঠেছি। অর্থাৎ ক্লাস সিক্সে। নতুন ড্রেস তৈরি না হওয়ায় সেই প্যান্ট আর শার্ট পরেই আম্মুর হাত ধরে স্কুলে গেছি। আম্মু আমাকে স্কুলে ঢুকিয়ে চলে গেলেন। তারপর বহু ক্লাস ঘুরে ঘুরে আমার চোখ আটকে গেল একটা ক্লাসের দিকে। দেখি, আমার মতোই বিচিত্র প্যান্ট আর শার্ট পরা অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে বসে আছে। আমিও সেই ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মিস এসে একে একে আমাদের সবার নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এবার আমার পালা। আমার নাম শুনেই মিস বললেন, ‘আরে তুমি তো দেখছি মেয়ে। তুমি কেন এই ক্লাসে?’ তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি সিক্সের ছেলেদের ক্লাসে ঢুকে পড়েছি। লাভণ্য সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মাগুরা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

552) বিবেক!

২০০৩ সাল। আমি তখন বাগেরহাট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। একদিন দুপুরে হোস্টেলের রুমে দুজন বড় আপু এসে বললেন, কুষ্টিয়া ম্যাটস থেকে তিনজন বড় ভাইয়া এসেছেন। বাগেরহাট ম্যাটসের সব ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে জরুরি মিটিং করবেন। তাড়াতাড়ি সবাই ম্যাটসের ক্লাসরুমে চলে এসো। সবাই তাড়াহুড়া করে তৈরি হয়ে মিটিংয়ে গেলাম। ভাইয়ারা এসেছেন বিভিন্ন দাবি যেমন ইন্টার্ন-উচ্চশিক্ষার সুযোগ, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ইত্যাদি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের জন্য সবাইকে আগ্রহী করার জন্য।

একজন ভাইয়া বক্তব্যের মাধ্যমে আন্দোলনের গুরুত্ব সবাইকে বোঝালেন। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বললেন, আপনারা যাঁরা আন্দোলনে রাজি আছেন, তাঁরা হাত তুলুন। কেউ হাত তুলছে না দেখে ভাইয়া বললেন, আপনাদের ভেতরে কি কোনো বিবেক নেই? আমাদের একজন ক্লাসমেট ছিল, নাম বিবেক সমাদ্দার। ও দাঁড়িয়ে বলল, আমি আছি, আমার নাম বিবেক। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ ভাইয়া, এই যে উঠে দাঁড়িয়েছে আমাদের বিবেক।। মেরিনা ইয়াসমিন কাউনিয়া প্রধান সড়ক, বরিশাল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

553) সর্দি

আমার প্রানের বান্ধবী প্রভার বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো বারো মাসে তেরোবার সর্দি লাগে। এসএসসি পরীক্ষার সময় আমাদের স্কুলের (খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল) পরীক্ষার কেন্দ্র হলো জিলা স্কুল। তখন শীতকাল। প্রভার যথারীতি সর্দি লাগল। তো দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে প্রভা আধা বস্তা টিস্যু নষ্ট করে ফেলল। রুমের মধ্যে ফেলার জায়গা না পেয়ে ও টিস্যুগুলো টেবিলের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল। হঠাৎ আমাদের হলে এক স্যার ঢুকলেন। তিনি ঢুকে দেখেন, বোর্ডে কী জানি লেখা, পরীক্ষা উপলক্ষে রুমে চক-ডাস্টার কিছু না থাকায় তিনি ছোট কাগজ বা টিস্যুর খোঁজ করছিলেন। হঠাৎ প্রভার টিস্যুর দিকে তার চোখ পড়ল। তিনি ওকে খুব মিষ্টি করে বললেন, ‘মা, এগুলো কি তোমার লাগবে?’ বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ওর সদ্য ব্যবহৃত টিস্যুটি খপ করে ধরলেন। তাঁর হাতে কী হলো জানি না, তবে তাঁর আলোর গতিতে পরীক্ষার হল পরিত্যাগের দৃশ্য দেখে হাসির রোল পড়ে গেল আমাদের মধ্যে।। পারছা আইরিন শেখপাড়া, বাগানবাড়ী, খুলনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

554) কুম্ভকর্ণ

এসবের জন্য ওর মা-ই দায়ী। সারা রাত বিশ্বকাপ ফুটবল উপভোগ করেছিল সনু। নিয়ম অনুযায়ী, দিনের বেলায় ঘুমানোর কথা ওর। কিন্তু ওর ভীষণ রাগী মা জোর করে স্কুলে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই পেছনের দিকের একটা বেঞ্চও শুয়ে ছিল সনু। বেঞ্চগুলো বেশ বড়। আমি ওর পাশে বসেছিলাম। ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেকেই আমি ওকে ডাকছিলাম। বেচারার ঘুমিয়ে গিয়েছিল। বারবার আমার হাত সরিয়ে দিচ্ছিল। আমি এত করে বলছিলাম, কাশেম স্যারের ক্লাস (উনি এই স্কুলের ট্রাস)। হঠাৎ হুড়মুড় করে ক্লাসে এলেন কাশেম স্যার। সবাই উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে সনুকে জাগানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম। সামনের সবাই আমার আগেই বসে পড়াতে স্যার বিষয়টা খেয়াল করেছিলেন। উনি বললেন, ‘এই, কিরে, তোর কী ব্যাপার?’ পাশ থেকে একজন বলে দিল, ‘স্যার, কুম্ভকর্ণকে জাগাইতেছে।’ স্যার ঝড়ের বেগে উড়ে এলেন। সনুর দিকে তাকিয়ে বড় করে একটা দম নিলেন। আমরা আশায় আছি, বজ্রপাত হবে। কিন্তু না, স্যার আস্তে করে সনুর গায়ে হাত রাখলেন, সনু আস্তে করে হাতটা সরিয়ে দিল। স্যার আবার হাত রাখলেন, এবার ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল ও। স্যারও নাছোড়, আবার হাত দিয়ে জাগাতে গেলেন সনুকে। এক ঝটকা দিয়ে সনু বলল, ‘সর শালা! ডিস্টার্ব করিস নে।’ আমি ফিক করে হেসে উঠলাম। স্যার আমার দিকে তাকাতেই হাসিটা গিলে ফেললাম। স্যার বললেন, ‘সনু রে, তোকে আজ কোরবানি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।’ তড়াক করে লাফ মেরে সোজা হয়ে গেল সনু। এক মুহূর্ত স্যারের দিকে তাকিয়ে ঝেড়ে দৌড় মারল পেছনের দরজা দিয়ে। ওর অমন অপ্রত্যাশিত আচরণে আমরা স্তম্ভিত। হঠাৎ হো হো করে হাসতে শুরু করলেন কাশেম স্যার ॥ পারভেজ স্টেডিয়ামপাড়া, মেহেরপুর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

555) তেলাপোকা ও পানিফল

আমার বাবা তখন নবম শ্রেণীতে। তাঁর কাছ থেকে এই গল্পটা শুনেছি। বার্ষিক পরীক্ষার সময় একদিন মজিদ বারবার পকেটের দিকে তাকাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রজব স্যার (আসলে গজব স্যার) হুংকার দিলেন, ‘কিরে, পকেটে কী তোর? নকল নাকি? বের কর।’ বলতে বলতেই এগিয়ে গিয়ে দ্বিগুণ তেজে হুংকার দিলেন, ‘সিগারেটের প্যাকেট? তোর এত সাহস! এন্ফুনি

দে বলছি।' মজিদ নাছোড়বান্দা। করুণ মুখে 'না স্যার, না স্যার' করতেই স্যার প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে খুলতে লাগলেন, কিন্তু নকল ধরার খুশিতে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ ভয়াবহ হয়ে উঠল মুহূর্তেই। অনেকগুলো তেলাপোকা কিলবিল করে উঠে পড়ল তাঁর গায়ে। স্যারের উদ্দাম নৃত্য দেখে হাসতে হাসতে খুন হওয়া ছাত্রদের মধ্যে মজিদ হাওয়া।

২.

দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই স্বপন একদিন ক্লাসে স্যারের প্রশ্ন 'Waterfall মানে কী'-এর উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দেরি না করে বলল, 'স্যার, পানিফল (শিঙাড়ার মতো দেখতে সবুজ একধরনের ফল)। এটা খেতে খুব মজা।' স্যারের ধমক খেয়েও স্বপন বোঝেনি, কেন সবাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সৈয়দা মাসুদা স্কয়ার কিন্ডারগার্টেন, শালগাজিয়া, পাবনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

556) বিপদ

আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার আবু-আম্মু দুজনই চাকরি করেন। তাই তাঁরা আমাকে একটা মুঠোফোন দিয়েছেন, যাতে আমার কোনো সমস্যা হলে তা ফোন করে জানাতে পারি।

ক্লাসে মুঠোফোন ব্যবহার করা নিষেধ। তাই আমার প্রয়োজনের সময় মুঠোফোন অন করে কথা বলে আবার বন্ধ করে ব্যাগে রেখে দিই। আমাদের সমাজ পরীক্ষা চলছে। সমাজের স্যার ব্যাগ হাতিয়ে মুঠোফোন পেয়ে প্রচণ্ড রাগারাগি করতে লাগলেন, নিষেধ করার পরও মুঠোফোন কেন ব্যাগে? আমি বললাম, এটা তো বন্ধ করে রেখেছি, স্যার। কোনো সমস্যা নেই।

স্যার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বললেন, সমস্যা নেই মানে? এটা বন্ধ করতে যদি কখনো ভুলে যাও আর পরীক্ষা চলার সময় যদি কেউ রিং করে হ্যালো হ্যালো শুরু করে, তখন কী করবা তুমি? কত বড় ডিসটার্ব হবে বুঝতে পারছ? ক্লাসে মুঠোফোনে আলাপ করলে সবার মনোযোগ নষ্ট হয়। বিরাত বড় সমস্যা। ক্লাসে মুঠোফোন ব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষেধ, মনে থাকে যেন। আর পরীক্ষার সময় তো এটা একেবারে হারাম।

স্যার এসব বলে আমাকে বকাঝকা করে রাগে

কাঁপতে কাঁপতে যেই চেয়ারে বসতে গেলেন, অমনি স্যারের পকেটে মুঠোফোন বেজে উঠল। স্যার তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মুঠোফোনটা বের করে কানে লাগালেন। তিনি ক্লাসজুড়ে হাঁটছেন আর হাত-পা ছুড়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, ‘অই আমি কয়বার কইতাম রে, এহন যে বাইত আইতাম না। পোলাইপাইন্তের পরীক্ষা চলতাছে। আমি ঈদের আগের দিন বাইত যামু। টেহা পাডাইয়া দিছি। এহেন কোরবানির গরুডাও কি ঢাহাত্তে গিয়া আমারই কিন্না দিতে অইব নাকি?’

এত চিন্তার কাম নাই। যেইডা কই হেইডা হোন। তরা পুইট্রার বাজারতে গরু কিন্না লা। এই হোন, লেঙুর টিপ্পা চোটপাট দেইক্কা হারগরু কিনবি। গরু বালা কইরা আডাইয়া ওডাইয়া দেইক্কা লইছ। ছয় দাইত্তা লম্বা ছেও দেইক্কা কিনিছ।

শিবু কাহা আর সুফির বাফেরে লইয়া বাজারে যাইছ, বুজজছনি। হেরা গরু চিন্না কিনতে পারে। ঢাহা কিন্তু গরুর দম হাইরা কম। হ হ আর কতা বারাইছ না। এত তুহিমুহি করছ কিয়ের লাইগ্গা? মুক্কি মাইরা গরু একটা কিন্না লা।

আইচ্ছা, এহন রাহি।’

স্যারের কথার জন্য আমরা খাতায় একটা অক্ষরও লিখতে পারিনি। কান ঝালাপালা। আমি বললাম, স্যার আপনি ক্লাসে যে জোরে জোরে কথা বললেন, তখন আমাদের ডিসটার্ব হয় না বুঝি?

স্যার বললেন, ‘এই ফাজিল মাইয়া পরীক্ষা থুইয়া কটর কটর কথা কিসের? পরীক্ষার সময় এক মিনিটের দাম কত জানছ? কতা থুইয়া হোমানে লেইক্কা যা।’

সমাজ পরীক্ষার সময় আমরা কতটা বিপদের মধ্যে ছিলাম, এখন বুঝতে পারছেন?। সুমাইয়া বরকতউল্লাহ

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

557) হেরোডাসের বাড়ি

তখন সবে ক্লাস নাইনে উঠেছি। আমাদের অঙ্ক ক্লাস নিতেন জিন্নাত হোসেন স্যার। তিনি ছিলেন বেশ রাগী। আমরা সবাই তাঁকে ভয় পেতাম। তো, স্যার একদিন ক্লাসে এসে বললেন, ‘যারা

মানবিকে পড়ো তারা বলো তো ইতিহাসের জনক কে?’ আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললাম, ‘হেরোডটাস’। এবার স্যারের প্রশ্ন ছিল হেরোডটাসের বাড়ি কোথায়? আমি তা শুনতে না পেয়ে শুনেছি আমার বাড়ি কোথায়। তাই ঝটপট উত্তর, কলেজপাড়ায়। স্যার চমকে উঠে বললেন, হু!! আর ক্লাসের সহপাঠীদের সেকি হাসি!! রেজোয়ানুল ইসলাম ডোমার, নীলফামারী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

558) তুই বললে বেয়াদবি

কদিন আগে ব্যাকরণ ক্লাসে কান ঝালাপালা করে ‘পুরুষ’ পড়াচ্ছিলেন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ দিলরুবা আক্তার ম্যাডাম। আমরা সবাই বাধ্য হয়ে কানের ওপর অত্যাচার সহ্য করেই শুনছিলাম। তার মধ্যেও বীরদর্পে আলাপ-সালাপ করছিল জাহিদ। ম্যাডাম কথা বলতে দেখে জাহিদকে দাঁড় করিয়ে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক সর্বনামের দুটো উদাহরণ জিজ্ঞেস করলেন। যথারীতি জাহিদ রেকর্ড পরিমাণ চুপ। ম্যাডাম এবার জিজ্ঞেস করলেন তমালকে। তমাল উত্তরও দিল, ‘তুই, তোর।’ ম্যাডাম অগ্নিশর্মা হয়ে জাহিদের দিকে আসতে আসতে বললেন, ‘বল, তুই কেন পারলি না?’ আমি মৃদুস্বরে বললাম, ‘ম্যাডাম ও তো বেয়াদব না, তাই আপনাকে তুই তোকারি করেনি।’ মো. তাহিমদুর রহমান জনতা আদর্শ বিদ্যাপীঠ।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

559) ব্যথা লাগে

আমি তখন বিমানবন্দর স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম। আমাদের স্কুলের পাশেই যশোর এয়ারপোর্ট। একদিন ক্লাসে হঠাৎ শোরগোল পড়ে গেল, এয়ারপোর্টে এইমাত্র যে প্লেনটি এল, তাতে নাকি নায়িকা মৌসুমী এসেছেন। ক্লাসে তখনো স্যার আসেননি। তাই ক্লাসের প্রায় সবাই মৌসুমীকে দেখতে এয়ারপোর্টে ছুটল। আমি ছিলাম ক্লাসের অন্যতম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভালো ছাত্রী। কী করব না-করব ভাবতে ভাবতে আমিও ছুটলাম ওদের সঙ্গে। আসলে কাছ থেকে কোনো তারকাকে দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, খরবটা

পুরোই ছিল ভুয়া। তাড়াতাড়ি স্কুলে ফিরে এলাম। ক্লাসে এসে দেখি হেডস্যার বেত হাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যারা গিয়েছিল, স্যার তাদের মহাসমারোহে মারতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আমিও তাদের একজন। স্যার মারছিলেন আর বাঁকা হাসি হেসে বলছিলেন, ‘কেমন লাগে মৌসুমীকে দেখতে?’ আমাদের ক্লাসের রুবেনই শুধু স্যারের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল, ‘উফ! ব্যথা...ব্যথা লাগে স্যার!’। রেজওয়ানা আফরিন সরকারি এমএম কলেজ, যশোর।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

560) কবিতা আর গান

চারটা স্কুলে পড়েছি আমি। সবই ঢাকা জেলার মধ্যে। আমার প্রথম স্কুল ছিল লিটল জুয়েলস। তখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের ক্লাস টেস্ট চলছিল। সেবার বাংলা সিলেবাসে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ‘মেঘের কোলে রোদ’। কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে। আমাদের একটা গানের ক্যাসেট ছিল, সেটিতে ওই কবিতাটি গান হিসেবে ছিল। কবিতাটি আমি গান শুনে শুনে শিখেছি। গান ও কবিতার মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। গানটি ছিল, ‘মেঘের কোলে রোদ উঠেছে...আ হা হা হা হা...।’ কিন্তু কবিতায় আ হা হা হা হা অংশটুকু ছিল না।

পরীক্ষার দিন এল, আপা একে একে সবাইকে ডাকলেন। একপর্যায়ে আমার পালা। কিন্তু কী সর্বনাশ...! আমি যে আপার সামনে কোনোভাবেই আবৃত্তি করতে পারছি না। শুধু গানই মনে পড়ছে। শেষমেশ উপায় না দেখে গান গাওয়াই শুরু করে দিলাম। আপা তো রেগে নম্বরের জায়গায় গোলা তো দিলেনই, সঙ্গে দিলেন শাস্তি। আমাকে ৩০ বার কান ধরে ওঠবস করতে হলো।। যারিন তাসনিম ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

561) আমি সাত সাগরের

মাঝি...

ভিকারুননিসা নূনেই আমার স্কুল-কলেজের দিন শেষ হয়েছে। কত স্মৃতি, কত ছোট ছোট হাসি-মজা, তবে আজও যেদিনটির কথা মনে পড়লে নিজের অজান্তেই হেসে উঠি, সেটি ছিল ক্লাস

টেনের একটি দিন। যেহেতু আমাদের এসএসসির সিলেবাস ক্লাস নাইন আর টেন মিলিয়ে শেষ করা হয়, তাই ক্লাস টেনের শেষে সেভাবে আর কোনো নতুন পড়া থাকে না। আর বলাই বাহুল্য, সবচেয়ে নীরস বিষয় ছিল বাংলা। আর তাই ক্লাস পালাবার জন্য আমরা বাংলাই বেছে নিয়েছিলাম। আমাদের বাংলা ক্লাসগুলো গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, নাটক—এভাবে ভাগ করা থাকত। সেদিন টিফিন পিরিয়ডের পরের ক্লাসটা ছিল বাংলা পদ্য। তাই আমরা ইচ্ছা করেই টিফিন পিরিয়ডের সময়টা কারও অনুমতি ছাড়াই বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু একসময় না একসময় তো ক্লাসে ঢুকতেই হবে। কারণ আমাদের বেশিক্ষণ ক্লাসের বাইরে থাকাটাও বিপজ্জনক। যখন তখন পিটি আপার কাছে ধরা খাওয়ার আশঙ্কা ১০০ ভাগ। আমরা মানে আমি, আতিয়া, খাদিজা, শর্মিষ্ঠা, টুকটুক, দোলা, দিশা যখন ক্লাসে ঢুকলাম, তখন পদ্য ক্লাসের আর ১০ মিনিট বাকি। আমাদের পদ্য আপা একটু বয়স্ক আর খুব নরম প্রকৃতির ছিলেন, তাই আমরা ভেবেছিলাম পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে যার যার জায়গায় বসে পড়লেই তিনি আর কিছু করতে পারবেন না। তো যেই আপা বোর্ডে লেখার জন্য উল্টো ঘুরেছেন, অমনি আমরা সবাই হুড়মুড় করে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমাদের সিট শেষের দিকে ছিল। কিন্তু ভাগ্যটা বলতে গেলে আমারই খারাপ ছিল। আমার আগেই সবাই ঢুকে যার যার সিটে বসে পড়ল আর মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো আমিই বাদ পড়লাম। কারণ, শয়তান দিশা আমার সিটে বসে পড়েছিল। আমি সিটের সামনে গিয়ে হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম আর দিশাকে বলছিলাম উঠে যেতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এর মধ্যে আপাও বোর্ডে লেখা শেষ করে চেয়ারে বসে পড়েছেন। আপার কাছে যাতে ধরা না পড়ি তাই সব বান্ধবী মিলে আমাকে মাটিতে বসিয়ে দিল। আমাদের বেঞ্চের সারিটা ছিল ক্লাসের একদম শেষে আর আমাদের সারির সামনে একজন বসে পড়ার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল। কিন্তু তাতেও আমার শেষ রক্ষা হলো না। কারণ, আপা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আপার চোখে যাতে না পড়ি তাই আমার দয়াবতী বান্ধবীরা(!) আমাকে সবার ব্যাগ আর

সোয়েটার দিয়ে ঢেকে দিল। ভাগ্যিস তখন শীতকাল ছিল। কিন্তু আমার এ অবস্থা দেখে আশপাশে সবার হাসি চেপে রাখতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল আর আমার অবস্থা না-ই বললাম! এরই মধ্যে শুনি, আপা বলছেন, ‘তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো...।’ আমাদের সবার তো ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। এখন কী হবে! কী আর হবে, ধরা পড়াই ভাগ্যে ছিল—এই চিন্তা করে যখন আমি উঠে দাঁড়াতে যাব, তখন শুনি আপা বলছেন, ‘মাঝিমাল্লার দলে, দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগরজলে।’ এটা শোনার পর আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। আপা আসলে ‘সাত সাগরের মাঝি’ কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন আর আমরা যে দুটি লাইন শুনেছিলাম তা ওই কবিতাটির লাইন ছিল।। নাজিয়া চৌধুরী ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, মহাখালী, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

562) স্কুল পালিয়ে রবার্ট ব্রুস

স্কুল পালিয়ে নজরুল হওয়া না গেলেও রবার্ট ব্রুস হওয়া যায়। এ কথাটি অন্তত আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট খেলা আমার কাছে মহা আনন্দের ব্যাপার। এমনই একদিন বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল পালিয়ে খেলতে গিয়েছিলাম। খেলা শেষে যখন বাসার দিকে যাব, তখনই দেখি এই রাস্তা দিয়ে আসছেন শাহজাহান স্যার। রাস্তার ধারে একটা দেয়ালের ওপারে আমাদের বাসা। উপায়ন্তর না দেখে আমি দেয়াল টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার বড় ভাইয়ার জন্য কাজটা যত সোজা, আমার জন্য ততটা সোজা নয়। কারণ, অন্য সবার চেয়ে আমি একটু ছোটই ছিলাম। দেয়াল বেয়ে উঠতে গিয়ে কয়েকবার পড়ে গেলাম। এদিকে স্যার খুব কাছে চলে এসেছেন। আমি আবারও চেষ্টা করলাম এবং পড়ে গেলাম। শেষমেশ আমি দেয়াল বেয়ে খানিকটা উঠলাম এবং শক্ত করে দেয়ালের ওপরে ধরে উঠতে চেষ্টা করলাম কিন্তু আর উঠতে পারছি না। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি স্যার হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে এসে আমার পিঠে ধরে দেয়াল পার করে দিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে বাসায় গেলাম এবং ভাবতে লাগলাম, পরদিন

স্যার আমাকে কেমন ধোলাই দেবেন। পরদিন ক্লাসে স্যার আমাকে কিছুই করলেন না; তবে পুরো ক্লাসে সেই ঘটনা ফলাও করে ঘোষণা করে দিলেন। লজ্জায় তো আমি বেঞ্চের নিচে লুকাই এমন অবস্থা। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, সব শেষে স্যার বলেছিলেন, ‘রবার্ট ব্রুস যেমন বারবার হেরেও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, আমাদের রকিবও বারবার পড়ে গিয়েও চেষ্টা করে গেছে।’ এরপর থেকে বন্ধুরা আমাকে ‘স্কুল পালিয়ে রবার্ট ব্রুস’ বলে খেপায়। রকিবুল হাসান কক্সবাজার, চকরিয়া।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

563) অদ্ভুত উত্তর

আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার এক বন্ধুর নাম ছিল আবুল। আবুল ক্লাসে মাঝেমধ্যে এমন সব উত্তর দিত যে শিক্ষকেরাও না হেসে পারতেন না। একদিনের ঘটনা। স্যার বললেন, বল তো আবুল, আপেলগাছ থেকে আপেল পড়েছে দেখে নিউটন কী বুঝেছিলেন?

আপেলগাছে আপেলই হয়, আবুলের জবাব।

মো. কামরুজ্জামান

কুরপাড়, কাইলাটি রোড, নেত্রকোনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

564) পড়বি তো পড়...

২০০৮ সালের কথা। তখন আমরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের স্কুলে পঞ্চম পিরিয়ডের পর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের ছুটি দেয়। এ সময় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের অনেক বন্ধু দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে স্কুল থেকে পালাত। যেহেতু স্কুলব্যাগসহ মাঠ পাড়ি দেওয়ার সময় ধরা খাওয়ার ঝুঁকি বেশি, তাই প্ল্যান ছিল এ রকম—যারা স্কুল থেকে পালাবে, তারা ব্যাগ ছাড়াই নির্ভয়ে গেটের সামনে দাঁড়াবে এবং সহযোগীরা তাদের ব্যাগ গেটের সামনে ছুড়ে মারলে তারা ব্যাগটি নিয়ে চলে যাবে। আমাদের রুমটিও ছিল গাছের সঙ্গে ভবনটির দোতলায়। একদিন আমার দুই বন্ধু অর্ণব ও জাহিদ স্কুল থেকে পালাবার জন্য আমার সহযোগিতা চাইলে আমরা প্ল্যান করলাম যে অর্ণব যখন গেটের সামনে দাঁড়াবে, তখন আমি অর্ণবকে ওর ব্যাগ ছুড়ে দেব এবং পরে জাহিদ নিজের ব্যাগটিও ওর কাছে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। অর্ণব নিচে

গেটের সামনে দাঁড়ালে আমি ও জাহিদ ব্যাগ ছুড়ে মারতে প্রস্তুত হই। কিন্তু ওই সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক গেট দিয়ে স্কুলে ঢুকছিলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য না করে ব্যাগ ছুড়ে মারলাম। ব্যস, ব্যাগটিও উড়ে গিয়ে পড়ল স্যারের ঠিক মাথার ওপর।। মো. মামুন কবীর খান এ কে হাইস্কুল, দনিয়া, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

565) শিঙাড়ার বদলে মার!

বর্তমানে আমি হলিক্রস স্কুলের একজন মহা বাধ্যগত ছাত্রী। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী আমি বরিশাল সরকারি বিদ্যালয়ে পড়েছি। আমাদের স্কুলে টিফিনের সময় শিঙাড়া, সমুচা ও কেক দেওয়ার নিয়ম ছিল। আমি ছিলাম ক্লাসের ক্যাপ্টেন। শ্রেণীতে উপস্থিত মোট ছাত্রীসংখ্যা ‘খালাদের’ জানিয়ে দেওয়া হতো, আর সেই পরিমাণ টিফিন দেওয়া হতো। আমার অত্যন্ত সম্মানিত মহা ন্যায়বান দুই বোনও এই স্কুলে পড়ত, তাদের কাছ থেকেই এক দিব্যজ্ঞান লাভ করলাম। তারা বলল, ছাত্রীদের সংখ্যা বলার সময় বাড়িয়ে বলতে হবে বা টিফিনের সময় গিয়ে খালাকে বলতে হবে, খালা, দুজন মেয়ে বেশি এসেছে। বুদ্ধিটা বেশ লোভনীয়। বাড়তি টিফিন নিজের পেটকে দেওয়া, কিন্তু প্রয়োগ করা সাহসে কুলোচ্ছিল না। একদিন অনেক কষ্টে সাহস জোগাড় করে খালাকে বললাম, চারজন বেশি এসেছে। খালা চারটি শিঙাড়া বেশি দিলেন। মহা আনন্দে আমি ও আমার এক বান্ধবী আমাদের যুদ্ধজয়ের গৌরবের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক এ সময় সামনে দেখতে পাই একজন শিক্ষককে, যাঁকে আমরা খুব ভয় পেতাম। তিনি আমাদের সব কথাই শুনেছিলেন। তারপর আর বলার অপেক্ষা থাকে না। শিঙাড়ার বদলে কী মারটাই না খেয়েছিলাম!। আদিবা শায়রা পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

566) আজব ডিসকাউন্ট

দশম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে নিজেকে অনেক সিনিয়র সিনিয়র বলে মনে হতে লাগল। স্কুল পালানোর অভ্যাস আমাদের অষ্টম শ্রেণী থেকে।

স্কুলের পাশেই ভোলা স্টেডিয়াম। একদিন স্কুল পালিয়ে খেলতে গিয়েছিলাম স্টেডিয়ামে। দল ভাগাভাগি করে যখন খেলা শুরু করলাম, তখন দেখি আমাদের স্কুলের এক কর্মচারী দৌড়ে আসছেন, যাঁকে আমরা মামা বলে ডাকি। মাঝেমধ্যে তাঁকে আমরা পান-বিড়ি উপহার দিতাম। এতে করে তিনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হেড স্যার নাকি ক্লাস পরিদর্শনে এসেছিলেন।

আমাদের ক্লাসে এসে দেখেন যে বোর্ডে লেখা, উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা ৬৪ কিন্তু ক্লাসে তখন উপস্থিতি মাত্র ৪৯ জন। তখন হেডস্যার আমাদের শ্রেণীশিক্ষককে তলব করলেন। শ্রেণীশিক্ষক আমাদের পাকড়াও করতে নাকি এদিকেই আসছেন। আমরা কোনো উপায় না দেখে পশ্চিমের গ্যালারিতে গেলাম। সেখান থেকে স্যারের আগমন দেখতে পেলাম। এদিকে গ্যালারিটি ছিল ধর্মসাগরের পাশেই। একদিকে স্যার, অন্যদিকে ধর্মসাগরের টলমলে পানি। কোনো কিছু না ভেবেই দিলাম গ্যালারি থেকে ধর্মসাগরে লাফ এবং কোনোমতে সাঁতরে পার হয়ে অপর তীরে উঠলাম। অন্য সময় হলে কখনো সাঁতরে পার হতে পারতাম না। কিন্তু তখন স্যারের ভয়ে আমাদের ওপর দৈবশক্তি ভর করল এবং ফলস্বরূপ এই ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলাম। সেবারের মতো রক্ষা পেলেও শেষ রক্ষা হলো না। পরদিন অনেকটা সাহস করেই স্কুলে গেলাম। যথারীতি স্যার লাল টেপ মোড়ানো বেত নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলেন। একটি নির্মম হাসি হাসতে লাগলেন আমাদের দেখে। একে একে প্রত্যেককেই আট ঘা বেত মারলেন এবং সহাস্যে বললেন, ‘১০ ঘা করে মারার চিন্তা ছিল, কিন্তু ধর্মসাগর সাঁতরে পার হওয়ায় ২ ঘা বেত কম মারলাম। আবার পালালে এই ডিসকাউন্টটুকুও পাবি না। মনে রাখিস!’ হায় রে আজব ডিসকাউন্ট।। মো. ইমতিয়াজ হোসাইন
কুমিল্লা জিলা স্কুল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

567) ভালোবাসার ফুটবল

২০০৬ সালের বিশ্বকাপ খেলা। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। বন্ধুদের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বরাবরের মতোই এক

দল ব্রাজিল এবং অপর দল আর্জেন্টিনা। আমি অবশ্য ব্রাজিলের পক্ষে ছিলাম। আমরা একে অপরকে খ্যাঁপাচ্ছি। একপর্যায়ে আমাদের নজর পড়ল ক্লাসরুমের ঝকঝকে সাদা দেয়ালের ওপর। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, দেয়ালে আমাদের প্রিয় দলের নাম খোদাই করব। ব্রাজিল দল থেকে প্রচণ্ড দুষ্ট বন্ধু রাফি এবং আর্জেন্টিনা দল থেকে ফখরুলকে প্রধান করে দেয়াললিখন কমিটি গঠন করা হলো। আমরা যে যার মতো লাল ইট, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে নিজের দলের পতাকা ও নাম লিখলাম। এমন প্রতিযোগিতা চলছিল যে আমরা বিশ্বকাপের মাঠকে ক্লাসরুমে নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ। আমরা খুবই খুশি। এমন সময় প্রচণ্ড রগচটা স্যার রুমে প্রবেশ করলেন। দেয়ালের অবস্থা দেখে তাঁর মাথা বিগড়ে গেল এবং শিক্ষকেরা মিলে আমাদের পেটানোর জন্য কমিটি গঠন করলেন। আমাদের পেটালেন গরুর মতো। কিন্তু পেটানোর জন্য পিএইচডি করা স্যার তাঁর আলুখেত নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কপালগুণে গরুপেটা খেয়েছি ঠিকই, কিন্তু গাধাপেটা খাইনি। পরদিন দুই পক্ষই চাঁদা তুলে রং কিনে এবং নিজে রং করে দেয়াল আগের মতো ঝকঝকে সাদা করে দিলাম। মো. রায়হান ইসতিয়াক

আটোয়ারী, পঞ্চগড়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

568) শিলা

ঘটনাটি ২০০৯ সালের। আমি তখন পাবনা জেলা স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের ক্লাসরুমটা ছিল দোতলায়। দোতলার জানালা থেকে স্কুলের বাইরের অনেক কিছু লক্ষ করা যেত। আমাদের সমাজবিজ্ঞান ক্লাস নিতেন লায়লা ম্যাডাম। একদিন তিনি সমাজবিজ্ঞান বইয়ের ভূগোলের ‘শিলা’ অধ্যায় নিয়ে লেকচার দিচ্ছিলেন। এদিকে আমার পাশে বসা বন্ধু ফারহান জানালা দিয়ে রাস্তার পাশে ঝালমুড়ির দোকানে কয়েকটা মেয়ের ঝালমুড়ি খাওয়া দেখছিল। ম্যাডাম ব্যাপারটা কোনোভাবে খেয়াল করতে পেরে লেকচারের মধ্যে তাকে হঠাৎ ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এই ছেলে...! হ্যাঁ তুমি, বলো তো শিলা কী?’ ফারহান কোনো কিছু না ভেবেই হঠাৎ করে বলে ফেলল, ‘ম্যাডাম, শিলা

একটি মেয়ের নাম।’ ক্লাসে হাসির বন্যা বয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ম্যাডামও হাসতে হাসতে বললেন, ‘তো, শিলা কি এখন ঝালমুড়ি খাচ্ছে?’ মো. জায়েদ হোসেন শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

569) ব্যাঙের কিডনি

রফিক স্যার সেদিন আমাদের দশম শ্রেণীতে জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি সেদিন আমাদের সামনে একটি ব্যাঙ কেটে ব্যাঙের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আমাদের বাস্তব ধারণা দেবেন। স্যার একে একে আমাদের সবাইকে ব্যাঙের হাত-পা, মাথা, লেজ, দাঁত ইত্যাদিসহ পেট কেটে অন্য আরও কিছু সম্বন্ধে হালকা-পাতলা একটা ধারণা দিলেন। একপর্যায়ে স্যার আমাদের ব্যাঙের কিডনি দেখাবেন। তবে তন্ন তন্ন করে পুরো ব্যাঙ কেটে ফেলেও কিডনি খুঁজে না পেয়ে অনেকটা হতাশগ্রস্ত হলেন। হঠাৎ একটু চিন্তা করে স্যার সবার উদ্দেশে বলে উঠলেন, ‘বুঝতে পেরেছি, এই ব্যাঙের কিডনি নেই। অন্য ব্যাঙ আনতে হবে!’ তখন আমার এক বন্ধু দাঁড়িয়ে বলল, কেন স্যার, ওই ব্যাঙের একটা কিডনি একে দান করার জন্য?। নাজমুল ইসলাম করটিয়া, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

570) আমার বাবা ও দৌড়

প্রতিযোগিতা

স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা ১০-১২ জন ছিলাম ২০০ মিটার রিলে দৌড়ের প্রতিযোগী। আমরা সবাই দৌড় শুরু করার জন্য কান খাড়া করে সংকেতের অপেক্ষা করছি। আমি ছিলাম এই ইভেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের তুলনায় আমি একটু বেশিই উত্তেজিত ছিলাম। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো দিকে না তাকিয়ে একেবারে চোখ-মুখ খিঁচে দৌড় শুরু করলাম। এমনিতে ২০০ মিটার এমন কিছু না, কিন্তু ক্লাস সেভেনের একটা ছেলের কাছে ২০০ মিটার অনেক লম্বা দূরত্ব। তার ওপর যদি সেটা হয় চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা, তাহলে তো কথাই নেই। একটা সময় যখন আমি মোটামুটি

নিশ্চিত, আমার পক্ষে ২০০ মিটার দৌড় শেষ করা সম্ভব নয়, ঠিক তখনই আমার হাতে বেশ কয়েকটা হাতের ছোঁয়া পেলাম। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আমার চারপাশে এক দল শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রী। বুঝলাম, দৌড় শেষ করতে পেরেছি। দৌড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। আমাকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী (প্রথম স্থান) ঘোষণার তোড়জোড় চলছিল, তখনই ভিড়ের বাইরে থেকে কেউ একজন আপত্তি জানালেন। দরাজকণ্ঠে তিনি বললেন, ‘এখানে আপনারা পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যাকে আপনারা বিজয়ী ঘোষণা করেছেন, সে প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী নয়। শিক্ষকের ছেলে বলে তাকে আপনারা টাচলাইন অতিক্রম করার আগেই টেনে ভেতরে ঢুকিয়েছেন। সুতরাং এ পুরস্কার ওর প্রাপ্য নয়।’ ভিড় ঠেলে বাইরে বক্তার উদ্দেশে তাকাতেই আমরা সবাই যেন বরফের মতো জমে গেলাম। কথাগুলো অবিশ্বাস করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ, যিনি কথাগুলো বলেছেন, তিনি স্বয়ং আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, আমার জন্মদাতা পিতা!!

আশীষ মণ্ডল

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

571) নুটুস

২০০৭ সালের ঘটনা। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। চতুর্থ শ্রেণীতে এই স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছিলাম বলে কাউকে চিনতাম না। শুধু একটা মেয়েকে দেখতাম। সে ক্লাসের সহকারী ক্যাপ্টেন ছিল। সহকারী হলেও মাতব্বরি বেশি করত। এমন একটা ভাব করত যেন সে-ই ক্লাসের মাথা। একদিন ম্যাডাম কী কারণে যেন বাইরে গেলেন। ইতিমধ্যে ক্লাসে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় একটা নোটিশ এল। মেয়েটা সবাইকে বলতে লাগল, ‘সবাই চুপ করো নুটুস এসেছে।’ এই কথাটা বলে সে চুপ। এরই মধ্যে ক্লাসে হাসির রোল পড়ে গেছে। এরপর থেকে সে আর বেশি মাতব্বরি করেনি।।

নুসরাত জাহান

গদাইরচর, মাধবদী

নরসিংদী।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

572) চৌধুরী

আমি যখন ক্লাস টুতে পড়ি সে সময়কার ঘটনা। ক্লাস টুতে আমার রোল ছিল তিন। তখন আমাদের রোলকল করা হতো না। ছোট ছিলাম বলে নাম বলা হতো এবং দাঁড়িয়ে ‘উপস্থিত’ বলে জবাব দিতে হতো। আমাদের ক্লাসে তখন প্রথম তিনজনের নামের শেষ শব্দটা ছিল ‘চৌধুরী’। একদিন স্কুলে গেলাম। আপা ক্লাসে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর নাম ডাকা শুরু হলো। আপা প্রথমজনের সম্পূর্ণ নাম বললেন, জবাবে সে বলল ‘উপস্থিত’। দ্বিতীয়জনেরও সম্পূর্ণ নাম বললে সেও বলল ‘উপস্থিত’। কিন্তু আমার সময় আপা সম্পূর্ণ নাম না বলে শুধু বললেন মোয়াজ্জেম হোসেন আমিও ছিলাম বোধহয় ঘোরের মধ্যে তাই চৌধুরী ছন্দ ঠিক রাখার জন্য বলে উঠলাম ‘চৌধুরী’।

। মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
সিলেট

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

573) বাচ্চা ডয়ংকর

আমার ছোট খালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। স্কুলের নাবালক সব বাচ্চাদের পড়ানো যে কতটা ঝামেলার, তা খালার অভিজ্ঞতা শুনে বুঝতে পারি। কত অদ্ভুত কাণ্ড যে ঘটে! একদিন ক্লাস ওয়ানের রোলকলের পর এক মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে নালিশ জানাতে এল। কিন্তু কী ঘটেছে তা আর বলে না। মাথা নিচু করে কেবল ফোঁপায়। অগত্যা পেছন থেকে ওর এক সহপাঠী জানাল, তন্ময় ওকে বলেছে, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’ এবার নীরবতা ভেঙে মেয়েটা বলল, ‘বলেন ম্যাডাম, আমার কি ভালোবাসা করার বয়স হয়েছে?’। সোহেল
নওরোজ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

574) হাক হা হা হরে

আমাদের এক বাংলা শিক্ষক ছিলেন। স্যারের নাম ছিল কাসেম আলী (ছদ্মনাম)। তিনি বাংলা ব্যাকরণ খুব ভালো পড়াতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তিনি কোনো উচ্চারণ শুদ্ধ করতে পারতেন না। একদিন তিনি ক্লাসে ‘কাল’ পড়াচ্ছেন। আমাদের সবাইকে লিখতে বললেন,

হাক হা হা হরে। হেটা হোন হাল। এক ছাত্র
চিৎকার করে বলল, হ্যার, হেটা বর্তমান হাল।।
মুহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

575) মধুর ডুল

নির্বাচনী পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে নোটিশ
বোর্ডে। সব ছাত্র ও অভিভাবকের হুড়োহুড়ি
এমন, যেন আগে দেখলে ভালো রেজাল্ট আর
পরে দেখলে ফেল! আমাদের ক্লাসের চটপটে
ছেলে প্রিন্স দৌড়ে নোটিশ বোর্ডের কাছে গিয়ে
রেজাল্ট দেখতে যায়। একজনের পিঠে খাতা
রেখে মার্কস তুলছে প্রিন্স। অঙ্কে ৯০,
ইংরেজিতে ৯২ আর বাংলায় ৮১। একেকটা
বিষয়ে মার্কস দেখছে আর আনন্দে খাতা রাখা
পিঠ চাপড়াচ্ছে। পরে খেয়াল করে দেখে, শার্ট
পরিহিত মানুষটি কোনো ছেলে নয়, একজন
মেয়ে! পোশাক দেখে যা বোঝার কোনো উপায়
ছিল না। এতক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে গেছে
প্রিন্সের মুখ। অল্প বয়সী ওই মেয়ে বিষয়টি
বুঝতে পেরে কিছু না বলে প্রিন্সের দিকে
তাকিয়ে হাসতে থাকে।। মো. শাকিল রেজা
গোড়াউনপাড়া, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ২৮, ২০১১

576) চাষি ও তার বুড়ো ঘোড়া

মিথ্যা কথা আমি বলি না। অনেক দিন আগে
আমাদের দেশের এক গাঁয়ে এক চাষি ছিল।
গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ও পায়রার
সঙ্গে তার ছিল একটি ঘোড়া। ঘোড়াটা তার
প্রভুর জন্য খাটতে খাটতে অকালে বুড়ো হয়ে
গেল। বুড়ো হলেও তার মনটা ছিল ভালো।
চাষি দেখল, ঘোড়াটা দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে
যাচ্ছে। কাজেই সে ভাবল, তাকে আর বসিয়ে
বসিয়ে খাইয়ে লাভ নেই। বরং ক্ষতিই হচ্ছে।
তাই চাষি একদিন ঘোড়াকে ডেকে বলল, ‘তুমি
বাপু আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। নিজের পথ
নিজে দেখো। তোমাকে বসিয়ে রেখে খাওয়াতে
পারব না। সাফ কথা।’

চাষির কথা শুনে ঘোড়ার মাথায় পড়ল বাজ।
এই বুড়ো বয়সে সে কোথায় যাবে? কী খাবে?
কীভাবে জীবন যাবে? থাকবেই বা কোথায়?
ঘোড়া বিনীত হয়ে প্রভুর কাছে আরজ করল,

‘আমি সারা জীবন তোমার জন্য খাটলাম। সে জন্য হলেও আমাকে দয়া করো। বিদায় দিয়ো না, বাবা! দোহাই।’

চাষি বলল, ‘হ্যাঁ, তবে তোমার অনুরোধ বিবেচনা করতে পারি এক শর্তে। যদি তুমি একটি জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে পারো।’

ঘোড়া জীবন্ত বাঘ ধরে এনেছে এমন কথা কেউ কোনো দিন কোথাও শুনেছে নাকি? ঘোড়া ভাবল। কিন্তু কী আর করা! দুঃখ ভরা মন নিয়ে ঘোড়া চাষির ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, যা থাকে কপালে! গিয়ে বনের ধারে খেয়েদেয়ে এক গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে লাগল। তখন এক শেয়াল সেখানে এসে হাজির।

শেয়াল ঘোড়াকে বলল, ‘কী ভাই, একা একা বনের ধারে যে তুমি? চাষির বাড়ি থেকে চলে এলে নাকি?’

ঘোড়া চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে তার দুঃখের কথা সব বলল। গড়গড় করে, হেঁষা ডাক দিয়ে, ফোঁস ফোঁস করে।

শেয়াল তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলল, ‘তুমি দুঃখ করো না, ভাই। চাষি তোমাকে একটা বাঘ ধরে নিয়ে যেতে বলেছে, এই তো? আমি বলছি, তুমি একটি জীবন্ত সিংহ নিয়ে যাবে। বাঘের চেয়ে সিংহ আরও বলবান। সিংহ দেখে তোমার মালিক আরও বেশি খুশি হবে।’

এদিকে হয়েছে কি, কিছুদিন আগে এই বনে এক সিংহ এসে থানা গেড়েছে। সে বনের পশুদের ধরে ধরে খাচ্ছে। সে এক মহা বিভীষিকা! বনের সবাই সিংহের অত্যাচারে অস্থির। সিংহ পশুর রাজা। তাই মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। এদিকে সিংহটা বুড়ো হয়ে এসেছে, বুদ্ধিসুদ্ধিও কম। তবুও সবাই ভয় পায়।

শেয়ালও অনেক দিন ধরে ভাবছে, কী করে সিংহকে উচিত সাজা দেওয়া যায়। ঘোড়াকে পেয়ে এবার সে এক ফন্দি বের করল। দেখা যাক, সফল হওয়া যায় কি না।

শেয়াল ঘোড়াকে বলল, ‘তুমি মরার মতো মাটিতে পড়ে থাকো। তবে তার আগে ভালো করে খেয়ে নাও। গায়ে শক্তি আনো। জীবনের মতো একবার শক্তি জমা করে নাও শরীরে। আমি বুড়ো সিংহটাকে এখানে নিয়ে আসব, তারপর এক কাজ করব। আর হুঙ্কাহুঁয়া বলে

তিন চিৎকার দেব। তখন তুমি আচমকা উঠে দেবে দৌড়। জীবনের সব শক্তি দিয়ে। দৌড়ে সোজা চাষির ঘরে গিয়ে থামবে। তারপর নেবে দম। তার আগে নয়। কেমন?’

যেমন বলা তেমন কাজ।

ঘোড়া পথের ওপর মড়ার মতো চার পা ছড়িয়ে পড়ে রইল।

এদিকে শেয়াল বনে ঘুরে ঘুরে সিংহকে খুঁজে বের করল। যথেষ্ট পরিমাণ আদাব-প্রণাম ও অভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসল। তারপর বলল, ‘মহারাজের জয় হোক। আশা করি মহারাজ সব দিকে কুশল। আমি আপনার বিনীত সেবক। মারলে মারতে পারুন। কাটলে কাটুন।’

শেয়ালের তোষামোদে সিংহ মহা খুশি। সে শেয়ালকে মারবে না ঠিক করল। শুধু মুচকি হেসে বলল, ‘শান্ত হও, বাছা। তোমার কোনো ভয় নেই।’

শেয়াল তখন আরও বিনয়ের সঙ্গে বলল, ‘একটা সুসংবাদ রাজাধিরাজ। একটু দূরে ওই পথের ধারে আপনার নাম শুনে একটা ঘোড়ার কলজে থেমে গেছে। মরে পড়ে আছে। গা এখনো গরম। তার মাংসে আজ আপনার চমৎকার ভোজ হবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে তশরিফ আনেন, তাহলে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।’

সিংহের ভীষণ খিদে পেয়েছিল। নড়তে চড়তে পারছিল না। কাজেই শেয়ালের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল। যেতে যেতে শেয়াল বলল, ‘মহারাজ, আপনার পেছনের দুটি পায়ের সঙ্গে ঘোড়ার লেজটা কষে বেঁধে দেওয়া যায়, খুব ভালো হয়। তাহলে আপনি নিজে তাকে আপনার গুহায় নিয়ে গিয়ে মহারানিদের সঙ্গে মিলেমিশে খেতে পারবেন। তারাও তো না খেয়ে আছে, তাই না?’

সিংহ গম্ভীরভাবে বলল, ‘তাই হবে। আমার একটা দাঁতে গুল হয়েছে। মুখে টানাটানি করতে গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে কী লাভ! সিংহীরা ঘোড়ার চামড়া দাঁতে কেটে দিলে আমি খাওয়া শুরু করব।’

পৌঁছল তারা ঘোড়ার কাছে। শেয়াল খুব বিনয়ের সঙ্গে সিংহের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করল। ঘোড়ার লেজের সঙ্গে কষে

সিংহের পেছনের দু পা দিল বেঁধে। তারপর বাপ-দাদার শেখানো বুলি ছাড়ল, হুকা হুকা হুয়া।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া তার সারা জীবনের শক্তির কথা মনে করে দিল লাফ। উঠল চার পায়ে দাঁড়িয়ে। দিল জোর কদমে দৌড়। ছুটল চাষির বাড়ির দিকে। সিংহ হতভম্ব।

চাষি তার বউ, ছেলেমেয়ে, কুকুর, পাড়া-পড়শি ও শেয়ালকে নিয়ে সিংহকে খাঁচায় পুরল।

খাঁচাসহ সিংহকে রাজার কাছে নিয়ে অনেক টাকায় বেচে দিল। রাজাও মহা খুশি।

চাষি বুঝতে পারল, তার বিশ্বস্ত ঘোড়া সত্যি খুব মূল্যবান। সেদিন থেকে সে ঘোড়ার যত্ন নিতে লাগল আরও বেশি করে। ঘোড়াও পরম সুখে আছে। আর সে এখনো না মরে থাকলে চাষির ঘরে খুব সুখেই আছে।

বনেও শেয়াল ও অন্য সব পশুপাখি শান্তিতে আছে বলে শোনা যায়।[সংগৃহীত]

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১১, ২০১১

577) বুদ্ধি - আদনান মুকিত

চায়ের দোকানের বেঞ্চটায় আরাম করে বসে আছি। আমি এই দোকানের নিয়মিত ক্রেতা। দেশ থেকে লজ্জাশরম প্রায় উঠে যাচ্ছে দেখে বাকিতে চা খেয়ে দোকানদারকে কিঞ্চিৎ লজ্জা দিই। দোকানদারটাও এত ভালো যে লজ্জায় বাকির টাকা চাইতে পারে না। হঠাৎ দেখি, রবিন আসছে। আমার পাশে মুখ গোমড়া করে বসে পড়ল ও। বললাম, ‘মন খারাপ কেন? বউ মারা গেছে?’

‘বউ মারা গেলে কাউকে কখনো মন খারাপ করতে দেখেছিস? এটা তো আনন্দের সংবাদ!’ আমি মাথা নাড়লাম। রবিনের কথায় যুক্তি আছে। কয়েক দিন আগে যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক সাইদ আজমল রবিনদের নিচতলার ফ্ল্যাটে উঠেছেন। তার পর থেকেই দেখছি, রবিন বেশ যুক্তিসংগত কথা বলছে। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘২৫ হাজার কর্মহীন এনজিওর মতো তোরও কোনো কাজ নেই। সারা দিন চায়ের দোকানে বসে থাকিস।’

‘চায়ের দোকানে বসে থাকা যাবে না, এমন কোনো আইন কি প্রচলিত আছে?’

‘তা নেই, তাই বলে এলাকার খবর রাখবি না? এলাকায় একটা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে।

সে অনুষ্ঠান নিয়ে গ্যাঞ্জামও লেগেছে। আর তুই বসে আছিস?’

‘গ্যাঞ্জাম লাগলে বাদ দে। তোরা বরণ না করলেও বর্ষ আসবে। কেউ তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।’

‘নতুন বছর আসবে, আর আমরা বসে বসে মুড়ি খাব, তা হবে না। সব ঠিকই এগোচ্ছিল।

উপস্থাপক হিসেবে রিপা আপুকে রাজি করিয়েছিলাম। ভাই ভাই ডেকোরেটর থেকে চেয়ার-টেবিল ভাড়া নিয়েছি। মঞ্চটাও ওরাই সাজাবে। ভেজালটা করেছে শফিক ভাই।’

‘সেকি! আমি তো জানতাম উনি কিছুই পারেন না।’

‘উনি যে রিপা আপুর জন্য পাগল, তা তো জানিস। হঠাৎ বলে বসলেন, রিপা আপুর সঙ্গে উনিও উপস্থাপনা করবেন। ওদিকে রিপা আপু তো কিছুতেই রাজি না। উল্টো মজা করে বললেন, “আপনার যে কণ্ঠ, তাতে উপস্থাপনা নয়, কবিতা আবৃত্তি করা উচিত।” ব্যাস, শফিক ভাই ঠিক করলেন, অনুষ্ঠানের শুরুতেই রবিঠাকুরের “বৈশাখ” কবিতা আবৃত্তি করবেন। শুধু তা-ই নয়, ক্লাবঘর দখলে নিয়ে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন।’

‘তাতে সমস্যা কী?’

‘আরে গাধা! তাঁর গলার আওয়াজে ক্লাবঘরের ইঁদুরগুলো সপরিবারে পালিয়েছে। দেয়ালের চুনও খসে পড়েছে। এই কণ্ঠ নিয়ে আবৃত্তি করলে পাবলিক তো পাইকারিভাবে জুতা মারবে। অনেক টাকা জোগাড় করে দিয়েছেন; তাই তাঁকে বাদও দিতে পারছি না। অনুষ্ঠানের আছে আর দুই দিন। আমার মাথায় পুরো সৌরজগৎ ভেঙে পড়েছে। আমাকে বিপদ থেকে বাঁচা।’

‘আমি নিজেই বিপদে আছি। তোকে কী বাঁচাব? চায়ের দোকানদার ১৫২ টাকা পায়। তা দিতে পারছি না বলেই সারা দিন দোকানে বসে থাকি। ওকে সাব্বনা দিই।’

‘টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুই ওঠ।’

রবিনের মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাড়া অন্য কিছু কখনো বেরিয়েছে বলে মনে হয় না। আর সেই রবিন মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিল! জগৎ বড়ই রহস্যময়!

ক্লাবঘরের সামনে এসে দেখি জায়গাটা খাঁ খাঁ

করছে। অথচ এ জায়গায় অনেকেই রাজনৈতিক আলোচনা করত। রবিন বলল, ‘দেখেছিস, কোনো লোকজন নেই। শফিক ভাইয়ের আবৃত্তি শুনে সবাই পালিয়েছে।’

আমরা বাইরে থেকেই কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। ভেতরে গেলে কী হবে কে জানে। তবুও গেলাম। আমাদের দেখেই শফিক ভাই বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন, ‘কী ব্যাপার! অনুশীলনের সময় আমি কোনো আলোচনা করি না।’

বললাম, ‘ভাই, আপনার আবৃত্তি শুনে এসেছি।’
উনি তো মহা খুশি। এ প্রজন্মের তরুণদের অবক্ষয়সংক্রান্ত একটা লেকচারও দিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন সেই আবৃত্তি—

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ধুলায় ধূসর রুম্ম উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাগ ভয়াল
কারে দাও ডাক

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

বাপ রে! ভয়াল আবৃত্তি শুনে আমাদের ইচ্ছা করছিল ভৈরব নদীতে ঝাঁপ দিতে। সাঁতার জানি না বলে তা বাদ দিয়ে হাততালি দিলাম। শফিক ভাই হেসে বললেন, ‘শুধু তালি? বল কী খাওয়াবি?’

আমি রবিনের দিকে চোখ টিপে বললাম,
‘আইসক্রিম খাবেন?’

‘না না, আইসক্রিম নয়, এখন সাধনার সময়।’

‘হু, রিপা আপুও তা-ই বলছিল।’

শফিক ভাই সতর্ক হয়ে বললেন, ‘কী বলছিল?’

‘বলছিল, আপনি আইসক্রিম খেতে ভয় পান।

বাজি ধরে আইসক্রিম খেলে আপনি রবিনের সঙ্গেই পারবেন না। এসব আরকি।’

‘চল, আইসক্রিম খাব। আজ আমার একদিন কি ইগলু কোম্পানির একদিন।’

দোকানে এসে শফিক ভাই একটার পর একটা আইসক্রিম খাওয়া শুরু করলেন। অবস্থা এমন যে আমরা একটা খেতে খেতে তিনি তিনটি খেয়ে ফেলেন। তারপর প্রায় ১০টির মতো আইসক্রিম খেয়ে রণেভঙ্গ দিলেন। আমরা মহানন্দে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করলাম। শফিক ভাই বিল দিতে দিতে বললেন, ‘রিপাকে বলিস কে কয়টা আইসক্রিম খেয়েছে।’

‘অবশ্যই। আপনি যে বিল দিয়েছেন এটাও বলব। কিন্তু ভাই, কই যান? রিহার্সেল?’

‘গলাটা একটু ব্যথা করছে তো...’

‘রিপা আপুও তা-ই বলছিল...’

‘চল, যত বাধাই আসুক, অনুশীলন চলবেই।’

কিন্তু অনুশীলন বেশিক্ষণ চলল না। কিছুক্ষণ চেষ্টানোর পর গলা দিয়ে আওয়াজই বের করতে পারলেন না শফিক ভাই। ঘড়ঘড় করে আমাদের বললেন, ‘আসলে এত আইসক্রিম খাওয়া ঠিক হয়নি। ঝাঁকের বশে খেয়ে এখন গলা ব্যথায় মারা যাচ্ছি। আমার আর আবৃত্তি করা হবে না রে!’

আমি বললাম, ‘আপনি রেস্ট নেন। গরম পানি আর আদা-চা খান। আবৃত্তি আমরাই করে দেব।’

‘তা-ই কর। তবে ছন্দগুলো ভুল করিস না আবার। আমি যাই।’

শফিক ভাই চলে যেতেই রবিন আমার পিঠে কিল দিয়ে বলল, ‘বাঁচলাম! তোর মাথায় এত বুদ্ধি কী করে আসে?’

‘কেন? চায়ের দোকানে বসে থেকে।’

আনন্দে আমরা একসঙ্গে আবৃত্তি শুরু করলাম—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!...
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১১, ২০১১

578) আধুনিক পান্তাবুড়ি - জি এম তানিম

এক যে ছিল পান্তাবুড়ি, সে পান্তাভাত খেতে বড্ড ভালোবাসত। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে ফ্রিজে ভাত রেখে দিত, সকালে পানি ঢেলে খাবে এ জন্য। কিন্তু এক চোর এসে রোজ ফ্রিজ খুলে পান্তাবুড়ির পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে পুলিশের কাছে নালিশ করতে চলল।

পান্তাবুড়ি ইলেকট্রিকের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একটা ইন্ডাকশন কয়েল তাকে দেখতে পেয়ে বলল, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই নিকটস্থ থানায় নালিশ করতে যাচ্ছি!’

ইন্ডাকশন কয়েল বলল, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেয়ো, তোমার ভালো হবে।’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘আচ্ছা।’

তারপর পান্তাবুড়ি একটা ক্র্যাশ করা

স্পেসশিপের সামনে এসে পড়ল। দেখতে পেল

একটা এলিয়েন একটা কাচের ঘরে আটকে

আছে, বের হতে পারছে না। পান্তাবুড়ি লাঠির

বাড়ি দিয়ে কাচ ভেঙে ফেলল। এলিয়েন তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই থানায় নালিশ করতে যাচ্ছি।’

এলিয়েন বলল, ‘ফিরে যাবার সময় দেখা করে যেয়ো, তোমার ভালো হবে।’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘আচ্ছা।’

তারপর পান্তাবুড়ি পথের ধারে একটা ইলেকট্রনিকসের দোকান দেখতে পেল। দোকান থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলার বলল, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই থানায় নালিশ করতে যাচ্ছি।’

রিমোট বলল, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেয়ো, তোমার ভালো হবে।’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘আচ্ছা।’

তারপর খানিক দূরে গিয়ে পান্তাবুড়ি দেখল, পথের ধারে একখানা ইলেকট্রিক রেজর পড়ে রয়েছে।

রেজর বলল, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই থানায় নালিশ করতে যাচ্ছি।’

রেজর বলল, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ো। তোমার ভালো হবে।’

পান্তাবুড়ি বলল, ‘আচ্ছা।’

তারপর পান্তাবুড়ি থানায় গিয়ে দেখল, দারোগা নেই। ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসী ধরতে গেছে। কাজেই সে আর নালিশ করতে পারল না।

কনস্টেবল তাকে বলল, ‘একটা জিডি করে যান। তবে লাখখানেক টাকা ঘুষ দিতে পারলে...চোর ধরা তো ধরা, দরকার হলে একেবারে হাঁটুতে গুলি করে দেওয়া যাবে বা ক্রসফায়ারে দেওয়া যাবে।’ পান্তাবুড়ি এই আইডিয়া পছন্দ করল না। সে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি ফেরার সময় তার ইন্ডাকশন কয়েল, ইলেকট্রিক রেজর আর রিমোট কন্ট্রোলারের কথা মনে হলো। সে তাদের সবাইকে তার থলেয় করে নিয়ে এল আর এলিয়েনের কাছ থেকে একটা ইএমপি জেনারেটর নিয়ে এল।

পান্তাবুড়ি যখন বাড়ির আঙিনায় এসেছে, তখন রেজর তাকে বলল, ‘আমাকে গেটের সামনে রেখে দাও।’ তাই বুড়ি রেজরটাকে গেটের সামনে রেখে দিল।

তারপর যখন পান্তাবুড়ি ঘরে উঠতে যাচ্ছে, তখন রিমোট কন্ট্রোলার বলল, ‘আমাকে সোফার ওপর রেখে দাও।’

তাই বুড়ি রিমোট কন্ট্রোলারটা সোফার ওপর রেখে দিল।

তখন ইএমপি জেনারেটর বলল, ‘আমাকে জানালার পাশে রাখো।’ বুড়ি তা-ই করল।

শেষে ইন্ডাকশন কয়েল বলল, ‘আমাকে তোমার ফ্রিজের হাতলে লাগিয়ে রাখো।’

বুড়ি তা-ই করল।

তারপর রাত হলে বুড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল।

ঢের রাতে চোর এসেছে। সে তো আর জানে না, সেদিন বুড়ি কী ফন্দি করেছে। জানালা দিয়ে ঢোকান সময় তার নাইট ভিশন গগলস পরে নিল, কিন্তু ইএমপির ম্যাগনেটিক পালসে সেটা নষ্ট হয়ে গেল। চোর তো আর কিছু দেখে না চোখে। তবে পান্তা চুরি করতে করতে তার মুখস্থ কোথায় ফ্রিজ। হাতড়ে হাতড়ে ফ্রিজে যেই হাত দিয়েছে, কয়েলের তারে হাত আটকে হাই ভোল্টেজ কারেন্টে শক খেল। আর শক খেয়ে পড়বি তো পড় ছিটকে গিয়ে সোফার ওপরে। সোফার ওপরে ছিল রিমোট, সাধারণ রিমোট তো নয়, সেটার কারণে শুধু বুড়ির নয়, আশপাশের সব বাসার টিভি চালু হয়ে গেল উচ্চস্বরে। পুরো এলাকায় বিশাল চিৎকার, ‘মার ঘুরিয়ে! মার ঘুরিয়ে!’ রাগে এলাকাবাসী বের হয়ে এল লাঠিসোঁটা হাতে। চোর তখন ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে যেই ঘর থেকে ছুটে বেরোবে, অমনি তার পা পড়ে রেজরে। দাড়ি কাটার রেজার চালু হয়ে তার আঙুল গেল মোরঝা হয়ে। চিৎকার করে উঠল চোর, ‘ও মা গো!’ তা শুনে পাড়ার লোক সেই বাড়িতে ছুটে এসে বলল, ‘এই বেটা চোর! ধর বেটাকে! মার বেটাকে!’

কিছুক্ষণ সিরিয়াস ধোলাইয়ের পর উপস্থিত জনতা নিজেরাই চোরকে দিয়ে এল থানায়। বেচারী চোর দারুণ শিক্ষা পেল।

ডিজিটাল যুগে চোর ধরতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা অনেক উপকারের তা তো

দেখলেই। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো, যন্ত্রপাতি কীভাবে মানুষের মতো কথা বলে, সে গল্প না

হয় আরেক দিন বলব। [লোকগল্প অনুসারে]

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১১, ২০১১

579) অর্বাচীনের অভিধান গ -

মাশুদুল হক

গণতন্ত্র : একটি চমৎকার শাসনব্যবস্থা, যেখানে একটি দেশের সবাই মিলে ঠিক করে পরবর্তী দিনগুলোতে কে তাদের শোষণ ও অত্যাচার করবে। গন্ডগোল : যার গণ্ডদেশ বা গাল গোল হয়ে আছে।

বাক্যগঠনঃ মাম্পস হয়ে ছেলেটির গন্ডগোল হয়ে গেছে। গোয়েন্দা : সবচেয়ে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ লোককে প্রধান অপরাধী বানাতে ওস্তাদ

ব্যক্তিবিশেষ। গন্তব্য : gone-তব্য। যেখানে

gone হওয়া আবশ্যিক। গোলমাল : গোলাকার

মালপত্র বা বস্তু। বাক্যগঠনঃ গোলমাল না হলে

ফুটবল খেলা যায় না। গড়িমসি : মসী বা কলম

গড়া বা তৈরি করা। এ শব্দ নিয়ে গবেষণা করে

দেখা যায়, প্রাচীনকালে যারা মসী নির্মাণ করত

তারা একেকজন ছিল বিরাট ফাঁকিবাজ। তারা

মসী নির্মাণের কথা বলেও ঠিক সময়ে

ভাষাবিদদের সাপ্লাই দিত না, তাই ভাষাবিদেরা

তাদের ওপর নিতান্তই বিরক্ত হয়ে কাজে

অবহেলা বা টিলেমি অর্থে ‘গড়িমসি’ শব্দটা চালু

করে। গরু : শিক্ষক মহোদয়দের ভাষ্যমতে,

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সবচেয়ে সুলভ

প্রাণীবিশেষ। গণপিটুনি : —অসম সংখ্যক

প্রতিপক্ষবিশিষ্ট একপ্রকার যুদ্ধ, যেখানে

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দারুণভাবে জয়ী হয়।

—নিতান্ত দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিও যে ঘটনায়

অংশগ্রহণ করে নিজের বীরত্ব জাহির করতে

পারে। গন্ডারের চামড়াঃ একধরনের চামড়ার

আচ্ছাদন, যেখানে চামড়ার পরপর চারটি বা

এক গন্ডা লেয়ার থাকে। স্বভাবতই এ আচ্ছাদন

অত্যধিক পুরু। গরিব দেশ : যে দেশের নেতা-

নেত্রীরা জনগণকে সব সময় আশ্বাস দিয়ে যায়,

অমুক গড়িব, তমুক গড়িব, মূলত কিছুই গড়া

হয় না। তাই ‘গড়িব’ শব্দটাই টিকে থাকে এবং

দেশের স্ট্যাটাসও গরিব থেকে যায়। গোলকধাঁধাঃ

জ্যামিতিশাস্ত্রের অংশবিশেষ, যেখানে বৃত্ত-

সম্পর্কিত নানা সমস্যা আলোচিত হয়।

বাক্যগঠনঃ আজকে প্রশ্নের গোলকধাঁধায় আটকে

ম্যাথ পরীক্ষাটা যাচ্ছেতাই হলো! গুরু : শিষ্য

উৎপাদক (মতান্তরে ভক্ষক) জাতিবিশেষ।

(গরুর জন্য যেমন শস্য, গুরুর জন্য তেমনি শিষ্য, আদ্যস্বরের ইতরবিশেষ কেবল। আসলে উভয়ই হলো খাদ্য—খাদক সম্বন্ধ, শিবরাম চক্রবর্তী, গল্প-হরগোবিন্দের যোগফল) সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১১, ২০১১

580) ছু-মন্তর-ছু - যুগরি লিখলেতড

পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল এক জাদুকর। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, এক যুবতী কাঁদছে, এতই অব্যবধারায় যে তার সামনে খুদে অশ্রু-ঝিল তৈরি হয়ে গেছে।

‘আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?’ প্রশ্ন করল জাদুকর।

‘আমাকে সাহায্য করতে পারে শুধু অলৌকিক কোনো ঘটনা,’ মেয়েটি উত্তর দিল।

‘অলৌকিক ঘটনা? এ তো আমার আওতায়!’ জাদুকর বলল। ‘আমি জাদুকর। আপনার তিনটি ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারব। বলুন এক-এক করে।’

‘আমি রূপবতী নই। কিন্তু জানেন, এত ইচ্ছে করে, যাতে পুরুষেরা আমাকে দেখলেই পাগল হয়ে যায়!’ জাদুকর তার একটা দাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করল, ‘ছু-মন্তর-ছু...।’ অমনি পূরণ হয়ে গেল মেয়েটির প্রথম ইচ্ছে।

মেয়েটি অশ্রু-ঝিলের দিকে তাকাল এবং নিশ্চিত হলো, সে পরিণত হয়েছে অপরূপায়। আনন্দে তার উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কথা, অথচ সে আবার কেঁদে ফেলল।

‘শুধু সৌন্দর্য দিয়ে কী লাভটা হবে! আমার অর্থসম্পদ নেই, নেই নিজের বাড়ি...। আমাকে কে পছন্দ করবে!’

‘ছু-মন্তর-ছু!’ অমনি শহরের একেবারে মধ্যখানে পাঁচ রুমের এক ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে গেল মেয়েটি। সমস্ত দেয়ালে আয়না সাঁটা, ইউরোপীয় আসবাবপত্র, দামি মোবাইল ফোন, অডিও-ভিডিও সেট...। এ ছাড়া টেবিলের ওপর পিরামিডের আদলে টাকার স্তূপ, গাড়ির চাবি। বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা, অথচ আরও জোরদার হলো তার কান্না।

‘এখন এত সম্পদ নিয়ে ভদ্রগোছের পুরুষ কোথায় খুঁজে পাব? চারপাশে শুধু চোর-বাটপার আর অ্যালকোহলিক। জ্যামের ওপর বসা মাছির মতো তারা ছুটে আসবে এই সম্পদের টানে।

তারপর সব লুটেপুটে খেয়ে কেটে পড়বে।’

‘তোমার আর একটা ইচ্ছে বাকি আছে,’

জাদুকর বলল। কাকে বিয়ে করতে চাও: জাঁ
ক্লদ ভানড্যাম, মাইকেল জ্যাকসন, দমিত্রি
খারাতিয়ান?’

‘তোমাকে বিয়ে করতে চাই!’ বলল মেয়েটি।

‘এমন সুযোগ আর কখনো আসবে না: স্বামী—
জাদুকর!’

তৃতীয় ইচ্ছে পূরণ করে সম্পূর্ণ কাহিল জাদুকর
ঢলে পড়ল ডিভানের ওপর। মেয়েটি তার পাশে
শুয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে, বলল, ‘আমাকে চুমু
খাও।’

‘আমি দুঃখিত, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা
কিন্তু তোমার চার নম্বর ইচ্ছে! আমার ক্ষমতা
সীমিত, প্রতি পাঁচ বছরে তিনটি ইচ্ছে পূরণ
করতে পারি।’

‘আর নিজের প্রিয় স্ত্রীর জন্য?’

‘স্ত্রীর জন্য প্রতি পাঁচ বছরে একটি। আমি তো
সর্বক্ষমতাবান নই।’

‘শুরুতেই সেটা বলোনি কেন?’ চিৎকার করে
উঠল মেয়েটি। তারপর জাদুকরের দাড়ি ধরে
এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে জাদুকর তার
জাদুকরি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল চিরতরে। তাই
জাদুকর ভায়াদের উদ্দেশে বলি, মনে রাখবেন,
মেয়েদের সব ইচ্ছে পূরণ করতে না পারলে ও
পথে পা না বাড়ানোই শ্রেয়। মেয়েরা ভাগে-
ভাগে নিতে পছন্দ করে না। তারা চায় পুরোটা
এবং একসঙ্গে। ছু-মন্তর-ছু! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম
আলো, এপ্রিল ১১, ২০১১

581) প্রত্যরক - ডায়ালি দেনিসড- মেলনিকড

হস্তরেখাবিদ্যা চর্চা করল পেত্রোভ বহুদিন ধরে।
তারপর যখন পুরো বিদ্যে আয়ত্তে এসে গেল
তার, সে জেনে গেল, সুখের জীবন তার বাকি
আর নেই-ই প্রায়। দুটো বছর শুধু। তার পরে
শুরু হবে দীর্ঘ ব্যাধি এবং শেষে
মৃত্যু। ভোগবিলাসী, জুয়াড়ি, নারীলিপ্সু, মোদা
কথা—ভালো মানুষ পেত্রোভ সিদ্ধান্ত নিল,
নিয়তির আঘাতের উত্তরে সেও আঘাত হানবে।
দীর্ঘ সময় ধরে সে কী সব আঁকিবুঁকি করল,
লাটে উঠল তাস, নারী, মদ। হয়ে উঠল সে
তিরিক্ষি-মেজাজি। শুকিয়েও গেল তার শরীর।
সম্ভাব্য সবকিছু বেচে দিয়ে জড়িয়ে পড়ল ঋণে

এবং মাস খানেক বাদে শেষ হলো তার প্রস্তুতি। সর্বশ্রেষ্ঠ প্লাস্টিক সার্জন, যার শরণ নিল পেত্রোভ, শুরুতে প্রত্যাখ্যান করল তাকে। তবে তোড়া তোড়া সবুজ নোট দেখে সিদ্ধান্ত নিল পেত্রোভের অনুকূলে। দুই সপ্তাহ পরে ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেল পেত্রোভ। তার হাতে তখন আদর্শ আয়ুরেখা। কিছুদিন যেতে না-যেতেই তার জীবনে আসতে শুরু করল নানান পরিবর্তন, যেসব সে সযত্নে আঁকিয়ে নিয়েছে নিজের করতলে। একদিন এক পরিচিত জনের আমন্ত্রণে পেত্রোভ গেল এক অনুষ্ঠানে। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হলো এক আমেরিকান মেয়ে-সাংবাদিকের। দুই মাস বাদে একেবারে আমেরিকায় বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্যাপন করল তারা। বিয়ের এক মাসের মাথায় মারা গেল তার স্ত্রীর কাকি, যার অস্তিত্বের কথা ঘুণাক্ষরেও জানত না তার স্ত্রী এবং তাই উত্তরাধিকার হিসেবে তার মাথায় এসে পড়া দু শ মিলিয়ন ডলারকে প্রীতিকর চমক বলা যেতেই পারে। এই টাকার অর্ধেকটা স্ত্রী ব্যাংকে রাখল পেত্রোভের নামে (প্রেমে পড়লে মেয়েরা কত বেকুবি কাজ যে করে!)। আরও এক বছর পরে, প্রেম শুকিয়ে এলে, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে এক পত্রিকাগোষ্ঠীর বিভূ-বৈভবশালী মালিকের কাছে চলে যাওয়ার সময় কিছুটা অনুতপ্ত বোধ করেছিল বৈকি! পেত্রোভ, যার সম্পর্কে লেখক আগেই জানিয়েছে, ছিল পুরুষালি চরিত্রের। আর তাই স্ত্রীর ছলনাময়ী আচরণে মুষড়ে তো পড়লই না, বরং ভূমধ্যসাগরের পাড়ে নতুন এক বাড়ি ও একগাদা বিনোদনকেন্দ্র কিনে ফেলল। তারপর সেখানে অহংকৃত নিঃসঙ্গতায় (বিনোদনকেন্দ্রগুলোর অগণ্য মেয়েকে হিসাবে না ধরলে) উপভোগ করতে থাকল নিয়তির উপর্যুপরি আঘাত। এভাবে চলতে থাকল দীর্ঘদিন। তার এক শ কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত। এক শ একুশ বছর বয়সে সে মারা গেল এক তরুণীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়... চল্লিশ দিন পরে ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হয়ে পেত্রোভ জানল, তার ওপরে নজরদারি করার দায়িত্বে ছিল যে দেবদূত, তার চাকরি গেছে। আর বিচারে পেত্রোভকে দেওয়া হলো চার বছরের নরকবাস। ডকুমেন্ট জাল করার দায়ে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৮, ২০১১

582) এক বাক্যে প্রকাশ

অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বিস্তারিত কথা শুনতে হয়, বিস্তারিত লেখা পড়তে হয়। আমরা যদি এসব বিস্তারিত কথা এবং লেখাকে ‘এক কথায় প্রকাশ’-এর মতো এক বাক্যে প্রকাশ করে ফেলি, তাহলে কেমন হয় আসুন দেখা যাক।

দেখাচ্ছেন ইকবাল খন্দকারকাজের বুয়া খালাম্মা, আমি তো আপনার বাড়িতে কাজ করতেছি কম কইরা হইলেও পাঁচ বছর ধইরা। এর মধ্যে কত কাজের লোক পালায়া গেছে। কিন্তু আমি রইয়া গেছি। কত জায়গা থেইকা ভালো ভালো বেতনে কামের অফার আইছে! কিন্তু আমি যাই না। ক্যামনে যামু। আপনারে রাইখা কি যাইতে পারি? আপনার প্রতি আলাদা একটা মায়া জন্মায়া গেছে গা। আপনে যদি এখন আমারে আপনার বাড়ি থেইকা বাইরও কইরা দেন, আমি বাইর হমু না। ক্যামনে বাইর হই কন। এই বাড়িটা তো আমার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি ছাইড়া কেউ বাইর হয়? আর আমি চইলা গেলে আপনার সেবা করব কেডা।

আমি আবারও সপ্তাহ খানেকের লাইগা দেশে যাইতাম চাই। বিরোধী দল এই সরকার চরম ব্যর্থ এক সরকার। এই সরকারের আমলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সন্ত্রাস বাড়তে বাড়তে কোন পর্যায়ে গেছে তা আর বলতে চাই না। পাবলিকের জীবন আজ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তাই ক্ষমতায় থাকার কোনো প্রকার অধিকার এই সরকারের নেই। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে পুরো দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আসুন, সবাই মিলে এই সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলি। এই অযোগ্য অপদার্থ সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো প্রকার রাইট তো নেইই, অধিকারও নেই।

আমাদের আর তর সইছে নাডাক্তার আপনার রোগের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, রোগটা শিগগিরই খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। আর এই অসুখ একবার খারাপ দিকে মোড় নিলে আপনাকে বাঁচানোটাই কঠিন হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় থাকতে ব্যবস্থা নেওয়া। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। আপনি আপনার অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

আপনি এখানে এসেছেন কেন? আপনি জানেন না দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর কী অবস্থা? জেনেশুনে এ ধরনের কাজ যদি আবার করেন তাহলে পরে কিন্তু পস্তাবেন।

আমার একটা প্রাইভেট ক্লিনিক আছে। রস+আলোর বিভাগীয় সম্পাদক এই সপ্তাহে আপনি যে লেখাটা জমা দিয়েছেন, আমি সেটা পড়েছি। খারাপ না লেখাটা, ভালোই। তবে লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছে, লেখাটা ঠিক জমেনি। আরেকটু জমাতে পারলে চমৎকার একটা লেখা হতে পারত। আমি কী ধরনের লেখা ছাপি তা তো আপনি জানেনই। তবু কয়েকটা সংখ্যা যদি দেখেন, জেনে যাবেন। যা-ই হোক, আপনি দেখেন লেখাটা আরেকটু জমানো যায় কি না। না জমাতে পারলেও সমস্যা নেই। আগামী সপ্তাহে আরও কিছু নতুন লেখা জমা দেন। তবে খুব মজার যেন হয়। ঠিক আছে?

আপনার লেখাটা আমি ছাপব না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৮, ২০১১

583) কবিরাজের ভালোবাসা - আসিফ মেহদী

কাব্য প্রতিভার জন্য রাজুর নাম প্রথমে ছিল ‘কবিরাজু’; শেষমেশ হলো ‘কবিরাজ’! তার লিটল ম্যাগাজিনের প্রথম কিস্তি প্রকাশের পরই এলাকার মুরব্বিদের টনক ডিগবাজি দিতে শুরু করল। মহল্লার কচিমনের বাচ্চাগুলোকে কবিতারূপী ফরমালিন দিয়ে পাকানোর ষড়যন্ত্র চলছে! যেকোনো উপায়ে ষড়যন্ত্রের এই নীলনকশাকে হোয়াইটওয়াশ করতে হবে। মিটিং বসল, সমাবেশ চলল। এসব দেখেও কবিরাজ দমার পাত্র নয়। একবেলা কবিতা না লিখলে তার কেমন যেন লাগে; মনে হয়, ‘রয়ে গেল তো পুষ্টি বাকি’!

প্রতি ভোরের মতো আজও কবিরাজ সূর্যস্নান করতে বারান্দায় এল (সংবিধিবদ্ধ উপকারী তথ্য: সোলার এনার্জিতে ভাইটামিন আছে)। সামনের বাড়ির ছাদে তাকানো মাত্রই তার হৃৎকম্পন রিখটার স্কেলে একেবারে ৯ দশমিক ৫! এমন কাব্যিক চেহারার মেয়ে সে আগে দেখেনি; নতুন ভাড়াটে মনে হয়। কতশত মেয়ে কবিরাজের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে হাঁ করে প্রহর গুনছে (এটি কবিরাজের একান্তই

ব্যক্তিগত ধারণা); অথচ এই মেয়েকে দেখে তার মনের আঙিনায় সিঁড়ির শুরু হয়ে গেল! এরই নাম বুঝি ‘লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট’—‘কানা ভালোবাসা’!

কবিরাজ তার জানিদোস্তু ‘ছড়া টুটুল’কে প্রভাত-প্রেমের ঘটনা আবৃত্তি করে শোনাল। শুনে তো ছড়া টুটুলের তোতলামি যেন ছন্দ খুঁজে পেল! ‘আ-আ-আমি এসবে নাই, অ্যা-অ্যা-এখন তবে যাই।’ বন্ধুর পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অভিমানে কবিরাজের হৃৎপিণ্ড খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়ার দশা! হঠাৎ মনে পড়ে গেল কবিগুরুর কথা। গুরু বলেছেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে’।

বিকেলেই কবিরাজ মেয়েটির বাসায় গিয়ে হাজির। মেয়ের নাম নীলা। সে নীলাকে তার লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা দেওয়ার জন্য নানাভাবে বোঝাল। ‘আমি কী বিশ্বাস করি, জানো? পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোনো দেশের মধ্যে হবে না। যুদ্ধ হবে ভালোবাসা আর ঘৃণার মধ্যে! আমি ভালোবাসার পক্ষে। আমার কবিতার পত্রিকাটিও প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিটি সিলিকা কণায়, ইথারের পরতে পরতে।

এবারের সংখ্যায় তুমি কবিতা লিখবে; আর তোমার কবিতা ছাপা হবে প্রচ্ছদে। ঠিক আছে মেয়ে? কাল কিন্তু কবিতা নিতে আসব।’ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল কবিরাজ। নীলা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কী বলবে। তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাহনি দেখেই কবিরাজের সিক্ত সঙ্গ বলছে যে নীলা নামের মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে।

কবিরাজ অন্য সব প্রেমিকের মতো ক্ষুধামন্দা আর ঝিমঝিম রোগে আক্রান্ত হলো! রাতে খেতে ইচ্ছা করল না। ঠিকমতো ঘুমও এল না। কল্পনায় নীলাকে নিয়ে সে সমুদ্র ভ্রমণে গেল, বৃষ্টিবিলাস করল, সূর্যের ভিটামিন খেল, জ্যোৎস্নার আলো ধরল, আরও কত কি! কুসুম কুসুম ভালোবাসায় অবস্থা অমলেটময়! বেচারার সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে প্রকৃতির মায়া হলো, ভোররাতে দুই চোখজুড়ে ঘুম নেমে এল। কিন্তু ঢেকি যে স্বপ্নেও ধান ভানে! এবার একধাপ এগিয়ে; ফিউচার পার্কে ফিউচার ফ্যামিলির স্বপ্ন! পরদিন সূর্যমামা ঘাড়ে চেপে বসার আগেই কবিরাজকে দেখা গেল, নীলাদের সোফায় বসে

আছে। আজ নীলার সঙ্গে ছোট্ট একটি মেয়েও ঘরে ঢুকল। এ তো দেখি ‘প্লাটিনামে সোহাগা’ (‘সোনায়ে সোহাগা’ বাগধারার আধুনিক ভার্সন); শ্যালিকা না থাকলে কি সম্পর্ক জমে! নীলার ছোট বোন আছে জানলে কবিরাজ এক প্যাকেট চকলেট নিয়ে আসত। যা-ই হোক, নীলার সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা যখন জমে উঠেছে, তেমনি এক শুভক্ষণে ছোট্ট মেয়েটি ‘মা, মা’ বলে কেঁদে উঠল। কবিরাজের তো মাথায় বাজ! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৮, ২০১১

584) ফেসবুক - কাজী সাহেবের সকাল চিন্তা

আমি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই, কাজী নজরুল ইসলামের মতো এমন একজন বিদ্রোহী টাইপ মানুষ কীভাবে সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠায় উৎসাহিত করার জন্য কবিতা লিখতে পারেন! এবং নিজেও ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারেন। আমি হব সকাল বেলার পাখি, সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি। এটা হলো কোনো কিছু? আজব ব্যাপার না? আমি নিশ্চিত, এই কবিতা যখন তিনি লেখেন তখন তিনি নিজের ভেতর ছিলেন না, ফুলের জলসায় তিনি ছিলেন নীরব কবি। তার (ত-এর ওপর চন্দ্রবিন্দু হবে) কি তখন মতিভ্রম ঘটেছিল? কাজী সাহেবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু চিনি, তাতে উনার মতো বান্দার সকালের ঘুম হারাম করে পাখিটাকি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করার কথা না। আমি দিব্যচোখে দেখতে পাই, তিনি সারা রাত হইহুল্লোড় করে ভোরে ঘুমাতে গেছেন। দুপুর বারোট্টা-একটার দিকে উঠে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন, এর ভেতর কেউ একজন কড়া লিকারের চা এনে দিয়েছে। তিনি চায়ে তিনটা চুমুক দিয়েই ঢুকলেন বাথরুমে। এক-দেড় ঘণ্টা পর বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখলেন, মোবাইল স্ক্রিনে তিনটা মিসকল। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বলে কে মিসকল দিয়েছে সেটা আমি বলছি না। কিন্তু তিনি একটু আড়ালে গিয়ে ফোন ব্যাক করলেন। আমি শুধু প্রথম কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলাম, ও আমার জান পাখি... তাহলে কি তিনি পাখি নামের কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন? যে পাখি প্রতিদিন

পুজোর ফুল কুড়াতে তাঁর বাগানে আসত? আর তিনি তাকে দেখতে সকালে ঘুম থেকে ওঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন নাকি তিনি পাখি হতে চেয়েছিলেন? লিখতে চেয়েছিলেন, আমি হব সকাল বেলার পাখির। Ashif Entaz Rabi শিক্ষা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ক্লাস ওয়ানের জন্য তারা বাংলা বই বের করবে। ওই বইয়ে বিখ্যাত লেখকদের ছড়া, কবিতা ইত্যাদি থাকবে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনোনয়ন পেল— আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে। কবিতা বাবদ রবীন্দ্রনাথ ২০ টাকা বিল পেলেন। নজরুলেরও টাকা দরকার। তিনি বিদ্রোহী কবিতা জমা দিলেন। শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি বললেন, আপনার কবিতা পড়ে পোলাপান বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। আমরা বিদ্রোহী শিশু চাই না। আমরা চাই পোষ মানানো যায় এমন ছেলেপেলে। তিনি আবার কলম নিয়ে বসলেন। লিখলেন, আমি হব সকাল বেলার মোরগ। কিন্তু পরের লাইনে গিয়ে তিনি আর ছন্দ মেলাতে পারেন না। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি কলম কামড়ে আবার লিখলেন, আমি হব সকাল বেলার কাক/সবার আগে কুসুমবাগে দেব আমি ডাক। কবিতা লিখে তিনি চলে গেলেন এক পাখি বিশেষজ্ঞের বাসায়। পাখি বিশেষজ্ঞ কাকের জায়গায় লিখলেন পাখি। ছড়াটা দাঁড়াল, আমি হব সকাল বেলার পাখি, সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মাসুদুল হক কবিতার মেইন স্ক্রিপ্টে আসলে ছিল ‘আমি হব রাতের বেলার পাখি’। সেই সময় কাজী সাহেব দৈনিক প্রথম আঁধারে নিয়মিত লিখতেন। এই পত্রিকার এক প্রফ রিডারের ছেলে ছিল কবির মহাভক্ত। সেই ছেলে এমনিতেই অফ-পিক আওয়ার পুরোটা ফিসফিস করে ফোনে কথা বলে কাটিয়ে শেষ রাতে ঘুমাতে যায়, তার ওপর যদি পত্রিকায় পরদিন এমন একটা ইন্সপায়ারিং কবিতা দেখে, তবে স্কুল পালিয়ে নজরুল না হলেও, রাত জেগে কবে না নজরুল টাইপ হয়ে যায় সেই সীমাহীন আশঙ্কায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ওপর কলম চালানো শুরু করলেন। পরদিন দুপুরে পেপার হাতে নিয়ে কবি দেখেন ‘রাত’ ‘সকাল’ হয়ে গেছে। Liya Ferdous আসল ঘটনা হলো,

কাজী সাহেব সকাল বেলা ফুল কুড়াতে আসা পাখির প্রেমে পড়ে লিখলেন—আমি হব সকাল বেলার পাখির বর/দুজন মিলে বাঁধব সুখের একখান ঘর। এরই মধ্যে এল পাখির জন্মদিন। কাজী সাহেবের হাত একেবারে খালি, গিফট তো দিতে হবে। তিনি শুনলেন, শিক্ষা বোর্ড ক্লাস ওয়ানের জন্য নতুন কবিতা চেয়েছে। হাতের কাছে আর কোনো কবিতা না থাকায় তিনি এটাই পাঠিয়ে দেন। পরে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা একটু সম্পাদনা করে কবিতাটিকে শিশু-উপযোগীকরে তোলেন। Sobak Pakhi কাজী সাহেব আসলে আমাকে (সবাক পাখি) দেখে সুতীর অনুপ্রেরণায় মাথায় মুহূর্মুহ চাপ অনুভব করেছিলেন। বস্তুত তিনি চেয়েছিলেন আমার মতো বা অনেকটাই আমার মতো কিছু একটা হতে। সে চরম চাওয়ার পথ ধরে তিনি পরমভাবে উচ্চারণ করেছিলেন—আমি হব সবাক পাখি... কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেকেই সবাককে সকাল বেলা বা সবাক কেলা—এসব বলে গুলিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য সত্য কখনো চাপা থাকে না। GM Tanim সকাল বেলার পাখি কবি ছোটবেলায় হতে চেয়েছিলেন। বড় হওয়ার পর অন্য সবার মতো তিনিও বেলাইনে চলে যান! Local Talk সত্যি কথা বলতে কি, এই রহস্য উদ্ধারে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। বিরোধী দলও এই বিষয়ে সহায়তা দিতে রাজি নয়। তারা বলছে, সরকার রহস্য উদ্ধারে আন্তরিক নয়। অজ্ঞাত কারণে মুখে কুলুপ এঁটেছে সুশীল সমাজও। শেষমেশ মার্কিন দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৩৩ জন কবি-গবেষক (+প্রাবন্ধিক) পরিচালিত এক গবেষণা থেকে জানা যায়, কবি সকালে উঠতেন মূলত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (রূপক অর্থে কুসুম বাগ) সকাল সকাল পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। কবি ছিলেন সেখানকার নিয়মিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। ভুতুড়ে স্পিনিং মিলসহ কয়েকটি কোম্পানির শেয়ার কিনে দেখেছিলেন লাভের মুখও। এ ছাড়া একাধিক বোনাস শেয়ার পাওয়ার পর কবির উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যথাক্রমে তার একটি চতুর্দশপদী কবিতা ও দুটি দ্বিপদী

ছড়ায়। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৮, ২০১১

585) ভূত-বিপ্রিণ্ডয়ানা

সুং টিংপো তখন যুবক। একদিন রাতে বেড়াতে বেরিয়ে পথে হঠাৎ একটা ভূত দেখে থমকে দাঁড়ায়। ভূতটা না থেমে তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠলেও, ভয় পেয়েছে, তাকে বুঝতে না দিয়ে কাছে আসতেই সরাসরি সে মুখের ওপর বলে উঠল, কে তুমি?

ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমি ভূত—তুমি কে?

টিংপো ঘাবড়ে না গিয়ে নিজের আসল পরিচয় চেপে বলে ওঠে, আমিও একজন ভূত।

ভূত প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

টিংপো উত্তর দেয়, ওয়াংসি।

আরে, আমিও ওখানেই যাব।

ভূতটা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, চলো, একসঙ্গে যাই!

অগত্যা দুজন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পর ভূতটা বলে ওঠে, আমরা কী বোকা! দুজন মিছিমিছি কেন হেঁটে মরছি? তার চেয়ে এসো, আমরা পালা করে একজন আরেকজনকে বয়ে নিয়ে যাই। তাতে দুজনেরই পরিশ্রম কম হবে।

টিংপো বলে, খুব ভালো কথা, আমার অমত নেই।

তখন ভূতটা প্রথমেই টিংপোকে নিল কাঁধে তুলে। মাইলখানেক হাঁটার পর তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে ভূতটা জিজ্ঞেস করে, ভূতের চেয়ে তোমার ওজন অনেক বেশি। ঠিক করে বলো তো, তুমি কি সত্যি একজন ভূত? এই সেরেছে, ধরে ফেলে বুঝি, টিংপোর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও চট করে একটা বুদ্ধি তার মাথায় খেলে যায়। ভূতের মনে বিশ্বাস আনার জন্য সে চট করে রেগে ওঠে—আমি তো নতুন ভূত, সেই জন্য আমার ওজন তোমার চেয়ে বেশি এখনো।

বলতে বলতেই টিংপো ভূতটাকে কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু ভূতটা এতই হালকা যে তার মনে হলো না কোনো ভার সে বহন করছে।

এইভাবে তারা পাল্টাপাল্টি করে একজন

আরেকজনকে বইতে থাকে। যেতে যেতে একসময় টিংপো ভূতটাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, ভূতেরা সবচেয়ে ভয় পায় কিসে? ভূতটা ভাবে, ও নতুন, বলে দেওয়া উচিত। তাই তখনই বলে ফেলে, ভূতেরা যা সবচেয়ে ভয় করে থাকে তা হলো, মানুষের মুখের খুতু। এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা নদীর ধারে এসে পড়লে টিংপো ভূতটাকে আগে নদীটা পেরিয়ে যেতে বলে। ভূতটা যখন পার হয়ে গেল, একটুও জলের শব্দ হলো না। তাই টিংপোর বেলা হুসহাস শব্দ শুনে ভূতটা আবার তাকে প্রশ্ন করে—ভূত তো জলের ওপর দিয়ে গেলে শব্দ করে না! আশ্চর্য, সত্যি কি তুমি একজন ভূত? ঠিক করে বলো।

টিংপোর মনে আবার ভয়, গেল বুঝি সব ফেঁসে, তীরে এসে তরী ডুবল! তাই আগের মতো আবার বুঝিয়ে দেয়—আশ্চর্য হচ্ছে কেন, আমি নতুন ভূত, এখনো নদী পার হওয়ার অভ্যাস হয়নি যে!

তারপর তারা শহরের কাছে পৌঁছালে টিংপো ভূতটাকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে এত জোরে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল যে ভূতটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

তখন আরও কষে ভূতটাকে চেপে ধরে টিংপো চলতে থাকল। বাজারের কাছাকাছি এসে পড়তে টিংপো ভূতটাকে যেই পিঠ থেকে নামাল, সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ছাগল হয়ে গেল! অমনি টিংপো ছাগলটার ওপর খুতু ফেলল, যাতে সে আর অন্য কোনো রূপ ধরতে না পারে।

তারপর বাজারে দেড় হাজার ওয়ান নিয়ে সেই ছাগলটাকে বিক্রি করে আনন্দে ঘরে ফিরে গেল! অনুবাদ: সুমথনাথ ঘোষ

এই চীনা গল্পটির লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে সরস গল্পটির ইংরেজি নাম The man who sold the ghost. **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১৮, ২০১১

586) অদ্বিতীয়া - বনফুল

বেশ ছিলাম। আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকাও

জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়। এবংবিধ প্রজাবৃদ্ধি সত্ত্বেও কোনো অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম। পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না, বোঝা গেল। কারণ, তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপূরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন। কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে: ‘হঠাৎ একম্পসিয়া হইয়া দিদি তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। কিডনি খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়েছেন। তাঁহার চিঠি বোধহয় পাইয়াছেন।’

পাইলাম তো। তিনি লিখিতেছেন: ‘কী করিবে বল ভাই! সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি তো বাঁঝা মানুষ। আমার কোনো অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালোই আছে। কোনো ভাবনা করিয়ো না। ইতি...’

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না। দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্য নানা কথার পর লিখিতেছেন:

‘প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান স্বামী, ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তো তা বলে সংসারটা ছারখার করা ভালো দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে করো তুমি।...এখানে একটি বেশ ডাগরডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয় বলো, সম্বন্ধ করি। আমার তো মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।’ ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম, তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম, তাহা অংশত এইরূপ—

“বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে তো সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা ‘মা ফলেষু কদাচ’ দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ, তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখবার চেষ্টা করাই উচিত বোধহয়। দ্বিতীয়পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ-অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে তো?”

ক্রমশ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন, ‘ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতেপায়ে ধরিয়া হুগাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কী ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা, তাহার ওপর কাঁচা-পাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহবাসর।

ওই অবগুষ্ঠিতা চেলিপরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এইভাবেই পাইয়াছিলাম, সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আরেকজন আসিয়াছে। ইহার কিডনি কেমন কে জানে। নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে।

ছেলেগুলো না জানি এখন কী করিতেছে। মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?...এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি, কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নিচু করিয়া। আচ্ছা, প্রভার আত্মার যদি...গৃহামি গৃহামি... যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন, ভারি লাজুক! বাসরঘরেও শুনলাম, ভারি লাজুক! আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয়পক্ষের বিবাহ, কে আমোদ-প্রমোদ করিতে চায়। মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ, বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে।

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি, আমার ছয়টি সন্তান ও আরও এক নবজাতক শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া। স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? প্রভা কহিল—‘ছিঃ, ছিঃ, সেজদিরই জিত হলো?’

তার মানে?

“মানে আবার কী? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে, ‘হাতি হবে। তিন মাস যেতে না-যেতে ফের বিয়ে করবে।’ আমি বললাম, ‘ককখনো নয়!’ তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমি শান্তিপূরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যাবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিত। পাড়ার মানকে ছোঁড়াকে কনে সাজিয়ে সেজদি বাজি জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন। ছিঃ ছিঃ, কী তোমরা! অমন গোঁফটা কী বলে কামালে?” আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি। বনফুল: আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ছদ্মনাম বনফুল। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন চিকিৎসক। ‘শনিবারের চিঠি’তে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ। জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৭৯। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৫, ২০১১

587) এটি শুধুই একটি গল্প

এক বিকেলে গলফ খেলতে বেরোলেন এক ভদ্রমহিলা। মাঠের পাশেই বন। ভদ্রমহিলার বাহুবলেই হোক আর বনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই হোক, বলটা একসময় হারিয়ে গেল সবুজ

গাছগাছালির ভিড়ে। ভদ্রমহিলা বনে ঢুকলেন বলটা খুঁজে বের করতে। বলের সঙ্গে নয়, সান্ধাৎ হলো এক ব্যাঙের সঙ্গে। ব্যাঙ বেচারা আটকে ছিল এক ফাঁদে। সর্দি-লাগা কণ্ঠে কথা বলে উঠল সেই ব্যাঙ, ‘আপা, আমাকে বাঁচান! বাঁচালে আমি আপনার তিনটা ইচ্ছা পূরণ করব।’

এ কথা শুনে ফাঁদ থেকে ব্যাঙটিকে বের করে আনলেন ভদ্রমহিলা। ফাঁদ থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ মাথা চুলকিয়ে বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ, আপা। বলেন আপনি কী চান, তবে একটা শর্ত, আপনি যা চাইবেন আপনার স্বামী এর দশ গুণ পাবেন।’

‘এটা কোনো সমস্যা না, ব্যাঙ। আমার প্রথম ইচ্ছা, আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী বানিয়ে দাও।’

ব্যাঙ তাকে সতর্ক করে দিল, ‘ঠিক আছে। তবে এর ফলে কিন্তু আপনার স্বামী দশ গুণ সেরা সুন্দর পুরুষে পরিণত হবেন।’

‘তাতে তো কোনো সমস্যা নাই। আমি যদি সেরা সুন্দরী নারী হই, তাহলে সে তো আমাকে ছাড়া আর কাউকেই বেছে নিতে চাইবে না।’ উত্তর দিলেন মহিলা।

প্রথম ইচ্ছা পূরণের পর ব্যাঙ জানতে চাইল, ‘দ্বিতীয় ইচ্ছা?’

‘আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দাও।’

ব্যাঙ আবার তাকে সতর্ক করল, ‘এর ফলে কিন্তু আপনার স্বামীও আপনার তুলনায় দশ গুণ বড়লোক হবেন।’

‘কথা কম,’ মিষ্টি করে হাসলেন ভদ্রমহিলা, ‘আমার নিজের ধন-সম্পদ যেমন আমার স্বামীর, তেমনি আমার স্বামীর ধন-সম্পদ আমার নিজের। মানে আমিই হব দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী!’

দ্বিতীয় ইচ্ছেও পূরণ হলো।

ভদ্রমহিলা এবার রহস্যময় হাসি হেসে জানালেন তার তৃতীয় ইচ্ছার কথা, ‘এবার আমার একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক বাধিয়ে দাও!’

তথাস্তু, তা-ই হলো! গল্পের মোদাকথা: ললনারা অতি চালাক। তাঁদের সঙ্গে ঝামেলা পাকাবেন না। নারী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ: আপনার জন্য গল্প এখানেই শেষ। পরের অংশটুকু আপনার জন্য পড়া নিষেধ। পুরুষ পাঠকদের দৃষ্টি

আকর্ষণ: নাখোশ না হয়ে পুরোটাই
পড়ুন। ভদ্রমহিলার তৃতীয় ইচ্ছার ফলে তাঁর
পতিপ্রবর হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছিলেন
ঠিকই, তবে সেটা ছিল দশ গুণ কম মাইল্ড হার্ট
অ্যাটাক! গল্পের মোদাকথা: ললনারা যেমন বেশি
বকেন, তেমনি বেশি চালাকও ভাবেন
নিজেদের। বি.দ্র.: আপনি যদি একজন নারী
পাঠক হয়ে থাকেন এবং কৌতূহল না চাপাতে
পেরে এতটুকু পড়ে ফেলেন, তাহলে একটি
কথাই বলার আছে আমার, নিষেধ করলে
পুরুষদের মতোই নারীরাও কোনো কথা শোনে
না। ওয়েবসাইট অবলম্বনে মাহফুজ রহমান

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৫, ২০১১

588) মেয়েদেবীকে লেখা

রবিঠাকুরের গোপন চিঠি

Private

Uttarayan

Shantiniketan কল্যাণীয়াসু,

কাল রাত্রি সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ চারবার
হাঁচতেই আলু* ছুটে এল—বলল ভালো ঠেকচে
না। আমি বললুম জহরলালকে তার করা চাই
তার সেক্রেটারীকে যেন লুথিয়ানা একস্প্রেসে
পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ইন্টারভিউর দরকার—কেন
না এখনি আরো চারটে হাঁচি আস্ব আস্ব করচে।
ফজলুল হক সাহেবের কানে কথাটা গিয়েছে
তিনি বললেন এরকম হাঁচি কমুন্যালিষ্টিক না
হয়ে যায় না—এটা হিন্দুমহা-সভার ফ্যাচাং,
কৌন্সিলে তিনি এর একটা হেস্ট নেস্ট না করে
ছাড়বেন না, মহাগোল বেঁধে গেছে। সত্যেন্দ্র
মিত্র বুক ফুলিয়ে বলচেন, সাতাশজন গুপ্তা ভাড়া
করে নস্যি লাগিয়ে হাঁচাবেন—ফী হাঁচির
মাঝখানে ধ্বনিত হবে বন্দেমাতরম গান।

চেম্বরলেন cable করেছেন এখনি

appeasement-এর দরকার—কিন্তু ছাতা**

খুঁজে পাচ্ছেন না। সোবিয়ট গবর্নেন্ট বলে

পাঠিয়েছেন হাঁচিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই

যদি সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে এই হাঁচি ঠিক

সমানভাবে নাকে নাকে ভাগ করে দেওয়া হয়।

টোরি গবর্নেন্টের ঘোর আপত্তি, হাঁচিই হোক

কাশিই হোক তারা মনোপলির পক্ষে, মুখে

বলচে ইন্টারভেনসন করে নস্যি রপ্তানি বন্ধ করে

দেবে—সত্য রক্ষা করেছে, পাঠিয়েছে ধানি লঙ্কার

গুঁড়ো ১৭০০ বস্তা। জহরলাল টেলিগ্রাম

করেছেন—কবির মগজ থেকে কনেগ্রসি হাঁচির
উদ্ভাবন হোক—সে হাঁচি বাঁ নাক দিয়ে
বামপন্থীদের লাগাক ফাঁচ ফাঁচ শব্দে তাড়া।
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি, সুর সুর করচে
নাসারন্ধ্র আর গান গাচ্ছি।

সখিরে ধারা বহে সারাদিন মান—

নাকের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিয়া দিল প্রাণনাকের ভিতরে official
secret রক্ষা করবার bill পাশের প্রস্তাব
উঠেছে—কিন্তু রাখতে পারব না।

ডেরাডুন মেলে ধুজ্জটি এসে পৌঁচেছেন, বলচেন
গুরুদেব, তোমার বিশ্বকম্পায়নি হাঁচি লাগাও খুব
কষে রিপোর্ট করে দিই। আজ এই পর্যন্ত—কিন্তু
গোপনীয়—

৩/৭/৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* আলুর আসল
নামটি ছিল বেশ খটমট। তার ভাইয়ের নাম
পটল হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাকে আলু বলে
ডাকতেন।

**Chamberlain☆ ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার
সম্বন্ধে রটনা তাঁর হাতে সব সময় ছাতা থাকে।

সূত্রঃ স্বর্গের কাছাকাছি, মৈত্রেয়ী দেবী। সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৫, ২০১১

589) বুঝিয়া পাইলাম

মানি অর্ডারে পাঠানো টাকা গ্রহণ করার সময়
'বুঝিয়া পাইলাম' লিখে স্বাক্ষর করতে হয়। যে
লোকটা টাকা নিয়ে এসেছে সে যে সত্যি সত্যি
টাকাটা মালিকের হাতেই দিয়েছে, এটা প্রমাণ
করার জন্যই এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। এই
নিয়ম অন্যান্য ক্ষেত্রেও চালু হলে কেমন হয়,
আসুন, দেখি। কয়েকটা নমুনা তুলে ধরেছেন
ইকবাল খন্দকারচেয়ারম্যান সাহেব যে এই
পিরিয়ডে পাবলিকের সঙ্গে ভালো আচরণ
করেছেন, এটা পরে পাবলিক মনে নাও রাখতে
পারে। আর মনে না থাকলে তারা আবার
ভোটও দেবে না। তাই পরবর্তী সময়ে মনে
করিয়ে দেওয়ার জন্য এখন লিখিত প্রমাণ রাখা
অতি আবশ্যিক—

। চেয়ারম্যান সাহেবের একত্রিশ দন্ত বিকশিত
হাসি (একটা দাঁত পোকায় খেয়ে ফেলেছে)

। করমর্দন করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের
নিজ উদ্যোগে বাড়িয়ে দেওয়া হাত (হাতে
কোনো চুলকানি ছিল না)

। দশ কেজি করে গম (যদিও বাড়িতে এনে

মাপার পর সাড়ে আট কেজি হয়েছে)

। অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কিছু বক্তৃতা (অন্য কোনো চেয়ারম্যান এত শুদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারে নাই)

। ভবিষ্যতে নরমাল রাস্তাঘাট তো বটেই, টয়লেটে যাওয়ার রাস্তাটাও পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিসহ আরও অনেক কিছু—বুঝিয়া পাইলাম(গোবেচারা পাবলিকের স্বাক্ষর)

বি.দ্র.: স্বাক্ষরদাতাকে অবশ্যই ভোটের হতে হবে। এবার বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে প্রসঙ্গ। বর্তমানে যে ভাড়াটে আছে তাঁকে যে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার একটা প্রমাণ রাখতে পারলে পরবর্তী সময়ে নতুন ভাড়াটেকে এই প্রমাণপত্র দেখিয়ে বিশ্বাস করানো যেতে পারে এই বাসায় থাকলে কত সুবিধা পাওয়া যায়। তো, প্রমাণপত্রে বর্তমান ভাড়াটের পক্ষ থেকে যা যা লেখা থাকবে—

। বাড়িওয়ালার খাসকামরার সামনে দিয়ে জুতা হেঁচড়িয়ে হাঁটার সুবিধা

। বাড়িওয়ালার সঙ্গে এক সোফায় বসে চা দিয়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খাওয়ার সুবিধা

। ছাদে যাওয়ার সুবিধা তো বটেই, ছাদের কোনায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির জানালায় উঁকি মারার সুবিধা

। বাড়িওয়ালাকে ‘স্যার’ বলে না ডেকে খালু বা জেঠা বলে যখন তখন ডাকার সুবিধা

। বাড়িভাড়া দেওয়ার সময় ভাড়ার সঙ্গে পুরোনো এবং ছেঁড়া টাকা চালিয়ে দেওয়ার সুবিধাসহ আরও অনেক সুবিধা—বুঝিয়া পাইলাম(পুরোনো ভাড়াটের স্বাক্ষর)কাস্টমারকে ভালোভাবে ঠকাতে না পারলে লাভও হবে না। ম্যানেজার যে কাস্টমারকে ঠকাতে পারছে তা হোটেলমালিককে দেখানোর জন্য লিখিত প্রমাণ লাগবেই। তো, মালিকের হাতে যে কাগজটি তুলে দেওয়া হবে তাতে লেখা থাকবে—

। ভাতের সঙ্গে মাঝারি আকারের তিনটি ইটের কণা (কামড় লাগার সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে আওয়াজ দিতে সক্ষম)

। তরকারিতে তেলাপোকার পাখার অংশবিশেষ।

। তরকারির সঙ্গে রুচি-নিরোধক বিশেষ একটি গন্ধ, যে গন্ধ তরকারির মেয়াদোত্তীর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করে

। খাওয়ার পানিতে একাধিক পতঙ্গ, যারা গ্লাসের

ভেতর সাঁতার কাটতে পারদর্শী

। ডালের সঙ্গে সমুদ্রসদৃশ অযাচিত পানিসহ আরও অনেক কিছু—বুঝিয়া পাইলাম(ঠকাখোর কাস্টমারের স্বাক্ষর)নিজের কোম্পানিতে বাবা তাঁর ছেলেকে নিয়োগ করলেন। ছেলে যে কোম্পানির সবাইকে দৌড়ের ওপর রেখে কাজ করাতে পারছে, এর লিখিত প্রমাণ বাবাকে একদিন না একদিন দেখাতে হবেই। তাই দরকার কর্মচারীদের স্বাক্ষরসংবলিত কাগজ। স্বাক্ষরের আগে লেখা থাকবে—

। যখন-তখন টেবিল চাপড়ানো ঝাঁড়ি (এমন চাপড় টেবিলের পায়া নড়বড়ে করে দিতে সক্ষম)

। মুরগির রক্তের মতো লাল চোখের চোখরাঙানি (চোখরাঙানির সময় চোখ থেকে চশমা খুলে রাখা হয়)

। একদম নাকের কাছে আঙুল এনে সাঁই সাঁই করে আঙুল ঘোরানো

। ‘চালু কইরা কাজ করো মিয়া’-জাতীয় মুখস্থ ডায়ালগ

। অফিস টাইম শেষ হয়ে যাওয়ার পর বোনাস (!) হিসেবে আরও ম্যালা কাজের চাপসহ আরও অনেক কিছু—বুঝিয়া পাইলাম(দৌড়ের ওপর থাকা কর্মচারীর স্বাক্ষর)আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে একপাল মেহমান এল বেড়াতে। আপনি তাদের যতই পেট ফাটিয়ে খাওয়ান না কেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কিন্তু পরবর্তী সময়ে বদনাম করতে পারে। তাই লিখিত প্রমাণ রাখার স্বার্থে একটা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে রাখতে পারেন—

। আসার সঙ্গে সঙ্গে ‘আহলান সাহলান’ বাক্যের সहीহ উচ্চারণ (আহলান সাহলানের তরজমাও করে দিয়েছে কেউ কেউ)

। হাত-পা ধোয়ার জন্য তো বটেই, জুতার তলা ধোয়ার জন্যও গরম পানি

। খেতে খেতে বেয়াই-বেয়াইনের মুখের খোশগল্প

। খাওয়ার পর খাটে হাত-পা-মাথা ছড়িয়ে নাকে আওয়াজ তুলে ঘুমানোর সুবিধা

। বিদায়ের সময় আবার বেড়াতে আসার নেমন্তন্নসহ আরও অনেক কিছু—বুঝিয়া পাইলাম(মেহমানের পালের মধ্য থেকে যার

হাতের লেখা পাঠযোগ্য তার স্বাক্ষর) সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৫, ২০১১

590) দুই প্রতিবেশিনী - ফেলিক্স প্রিভিন

এখানে থাকে অহংকার, আর রাস্তার ওপাশে মূর্থতা। সহৃদয় দুই প্রতিবেশিনী, চরিত্রের মিল নেই যদিও। মূর্থতা হাসিখুশি ও বাচাল, আর অহংকার বেজায় বিষণ্ণ ও স্বল্পবাক। তবে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে দুজনই। একদিন অহংকারের কাছে এল মূর্থতা; বলল, ‘জানো, প্রতিবেশিনী, একটা খুশির খবর আছে আমার। গোয়ালঘরের ছাদের ফুটো দিয়ে পানি পড়ত কত বছর ধরে, আমার পালিত জন্তুগুলো রোগে ভুগত...। গতকাল হয়েছে কি, ছাদ ভেঙে পড়েছে, জন্তুগুলো চাপা পড়ে মারা গেছে। একবারে দুটো বাজে ব্যাপার থেকে মুক্তি পেলাম!’

‘হুঁ,’ সম্মতি জানিয়ে বলল অহংকার। ‘এমন ঘটনাও ঘটে...’

মূর্থতা বলল, ‘জানো, আমার খুব ইচ্ছে করছে এই ঘটনা উদ্‌যাপন করতে। লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাব কি না ভাবছি। তবে কাকে কাকে ডাকব, বলো তো?’

‘এত বাছাবাছির কী আছে!’ অহংকার বলল।

‘সবাইকে ডাকো। নইলে লোকজন ভেবে বসবে, তুমি দরিদ্র।’

‘সবাইকে? একটু বেশি হয়ে যাবে না?’ দ্বিধাশ্রিত স্বরে মূর্থতা বলল। ‘সবাইকে খাওয়াতে গেলে তো আমাকে সব বেচে দিতে হবে। ঘরের জিনিসপত্রসহ।’

‘তাতে কী!’ মৃদু ভৎসনা করল অহংকার।

‘দেখুক সবাই!’ সব বেচেবুচে দিল মূর্থতা, নিমন্ত্রণ জানাল অতিথিদের। প্রচুর পান-ভোজন হলো, হই-হুল্লোড় হলো প্রাণ খুলে। অতিথিরা যখন চলে গেল, মূর্থতা একা বসে রইল নিজের শূন্য বাড়িতে।

এদিকে অহংকারও রাগ করে বসে আছে।

বলছে, ‘কেন যে গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে গিয়েছিলাম! আমার এখন দুঃসময়। তোমাকে নিয়েই সবাই কথা বলে এখন। আমার দিকে তাকিয়েও দেখে না। বুঝতে পারছি না, কী করা উচিত। কোনো উপদেশ দিতে পারো?’

‘এক কাজ করো। নিজের বাসায় আগুন লাগিয়ে

দাও। সবাই ছুটে আসবে দেখতে।’

তা-ই করল অহংকার। আগুন লাগিয়ে দিল নিজের বাড়িতে। লোকজন জড়ো হয়ে আঙুল উঁচিয়ে অহংকারকে দেখাচ্ছিল।

তৃপ্ত অহংকারের নাক এতটাই উঁচু হলো যে দমকল বাহিনীর পাইপ দিয়েও অত ওপরে ওঠা সম্ভব ছিল না।

তবে তৃপ্তির কাল কেটে যেতে সময় লাগল না। বাড়ি পুড়ে ছারখার, লোকজন যে যার বাসায় ফিরে গেল আর অহংকার দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মধ্যখানে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আর কোনো উপায় না দেখে সে গেল মূর্খতার কাছে।

‘আমাকে গ্রহণ করো, প্রতিবেশিনী। আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই,’ বলল সে।

‘এসো, এসো,’ মূর্খতা বলল। ‘আমার এখানেই থাকো। তবে তোমাকে কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করব, সে উপায় তো নেই! পুরো বাড়ি ফাঁকা। কিছুই নেই।’

‘অসুবিধে নেই, হলোই না হয় ফাঁকা!’ অহংকার বলল। ‘তবে অন্য কাউকে তা বুঝতে দিয়ো না।’ সেই থেকে তারা দুজন থাকে একসঙ্গে। একজনকে ছাড়া অন্যজনের এক মুহূর্তও চলে না। যেখানে মূর্খতা, সেখানে অবধারিতভাবে অহংকার, আর যেখানে অহংকার, সেখানে অবধারিতভাবে মূর্খতা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২৫, ২০১১

591) শিক্ষিকা ও ছাত্র - কনস্টানতিন মেলিখান

টান টান উত্তেজনা ক্লাসে। উবু হয়ে বসে রোল-কলের খাতা খুলে সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ইজাবেলা মিখাইলভনা। তারপর একসময় বললেন, ‘বারসুকোভ।’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই তাদের পাঠ্যপুস্তক বন্ধ করল। বারসুকোভ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। তারপর কেন জানি বলল, ‘ইজাবেলা মিখাইলভনা, খুব সুন্দর লাগছে আজ আপনাকে।’

ইজাবেলা মিখাইলভনা চশমা খুলে তাকালেন বারসুকোভের দিকে।

‘এবার শুরু করো, বারসুকোভ।’

নাকের শিকনি টেনে বারসুকোভ শুরু করল, ‘আপনার চুলের বাহারটিও দারুণ। এক্কেবারে নিখুঁত।’

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন
ইজাবেলা মিখাইলভনা।

‘তুমি কি পড়া করে আসোনি আজ?’

‘একদম ঠিক ধরেছেন!’ প্রবল উৎসাহ নিয়ে
বলতে শুরু করল বারসুকোভ। ‘আপনার কাছে
কেউ কিছু লুকোবে, সে ক্ষমতা আছে নাকি
কারোর! এত দিনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বৃথা যেতে
তো পারে না!’

মুচকি হেসে ইজাবেলা মিখাইলভনা বললেন,
‘বারসুকোভ! বারসুকোভ! শোনো, ম্যাপে দেখাও
দেখি আমাদের শহরটা কোথায়?’

হাতে ধরা ছড়ি দিয়ে অনির্দিষ্ট এক জায়গা
নির্দেশ করল বারসুকোভ।

‘নিজের ডেস্কে গিয়ে বসো।’ বললেন ইজাবেলা
মিখাইলভনা। ‘তিন*...’ বিরতির সময়

বারসুকোভ ইন্টারভিউ দিচ্ছিল সহপাঠীদের...

‘সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই ডাইনির চোখে
ধুলো দিতে হবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে...’

ঠিক সেই সময়ে ইজাবেলা মিখাইলভনা হেঁটে
যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে

বারসুকোভ বলল অবজ্ঞার সুরে, ‘ব্যাপার না!

এই বোকা মহিলাটা একেবারেই ঠসা। দুই ধাপ
দূরের কথাও শুনতে পায় না।’

থমকে দাঁড়িয়ে ইজাবেলা মিখাইলভনা

এমনভাবে তাকালেন বারসুকোভের দিকে যে

বারসুকোভ জেনে গেল, এই বোকা মহিলা দুই

ধাপের চেয়ে বেশি দূরের কথাও শুনতে

পান। ঠিক পরদিনই ইজাবেলা মিখাইলভনা

আবার বারসুকোভকে ডাকলেন ব্ল্যাকবোর্ডে।

ভয়ে সাদা হয়ে গেল বারসুকোভ। ভাঙা ভাঙা

গলায় বলল, ‘আপনি তো গতকালই আমাকে

ডেকেছিলেন!’

‘আমার আবার ইচ্ছে করছে।’ কপাল কুঁচকে

বললেন ইজাবেলা মিখাইলভনা।

‘আপনার হাসি তো রীতিমতো চোখ ধাঁধানো!’

কাঁপা কাঁপা গলায় কথাটা বলেই বারসুকোভ

নীরব হলো।

‘আর কী?’ শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ইজাবেলা

মিখাইলভনা।

‘আপনার গলার স্বর খুব মিষ্টি।’ কোনোমতে

বলতে পারল বারসুকোভ।

‘হুম্,’ ইজাবেলা মিখাইলভনা বললেন। ‘আজও

পড়া করে আসোনি।’

‘আপনি তো দেখছি সবই বোঝেন! সবই জানেন!’ বারসুকোভ বলতে শুরু করল অলস স্বরে। ‘কেন যে আপনি স্কুলে চাকরি করছেন! আমার মতো গবেটদের পেছনে ক্ষয় করছেন নিজের শরীর-স্বাস্থ্য। সমুদ্রতীরে বিশ্রাম নিতে যাওয়া উচিত আপনার। উচিত কবিতা লেখা, উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়া...’ ইজাবেলা মিখাইলভনা মাথা নিচু করে চিন্তামগ্নভাবে পেনসিল দিয়ে এলোমেলো আঁকছিলেন কাগজের ওপরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচু গলায় তিনি বললেন, ‘নিজের ডেস্কে গিয়ে বসো, বারসুকোভ। তিন।’*
রুশ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত নম্বরদানপদ্ধতি অনুযায়ী: ৫ – অসাধারণ, ৪ – ভালো, ৩ – মোটামুটি, ২ – খারাপ...**সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ০৯, ২০১১

592) অণুগন্দ - আহমেদ খান হীরক

সিগারেট

শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। দিতে পারলাম আর কি! কঠিন ছিল। কঠিন হবে না? এত দিনের অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে... জেগে থাকা অবস্থায় একটু সুযোগ পেলেই... অফিস থেকে নানা সময় নানা অজুহাতে বেড়ানো... এ নিয়ে কম হাস্যামা! তা ছাড়া অর্থহানি, স্বাস্থ্যহানিও বটে। অতএব ছেড়ে দিলাম। দেওয়াই তো উচিত। কেউ নিষেধ করেনি। বন্ধুবান্ধব তো বাহবাই দিল, যদিও মনে হলো, কেউ কেউ ভালোভাবে নেয়নি বিষয়টি। না নিলই বা, আমার কী বা এল গেল! আমি পেরেছি, এটাই বড় কথা। নিজের পিঠ নিজেরই চাপড়ে দিতে ইচ্ছা করে। নিজেকে এখন মুক্ত, স্বাধীন মনে হচ্ছে। পেরেছি। কঠিন ছিল। কিন্তু পেরেছি। মুন্নীকে বলে দিয়েছি, ওর সঙ্গে মুঠোফোনে আর কথা বলব না, প্রেমট্রেম সব শেষ। মেয়েটার সবই ভালো ছিল, যখন-তখন, কারণে-অকারণে খালি খালি সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার কথা বলত... ওকেই দিলাম ছেড়ে, দিলাম ল্যাঠা চুকিয়ে। কঠিন ছিল, কিন্তু পারলাম। পারব না কেন? যবনিকা নীলাকে ভালোবেসেছিলাম। তারপর ক্রমাগত অনেককে। আমার জীবনে ভালোবাসা এসেছে অক্লান্ত। একেকটি ভালোবাসা একেকভাবে। প্রতিটি ছিল আগেরটির চেয়ে উজ্জ্বল, মধুময় ও

চমৎকার। জীবনকে মনে হতো ইক্ষুযষ্টি—গাঁটে গাঁটে মিষ্টতা। আমি যেন প্রজাপতি, গাঁদা থেকে রজনীগন্ধা, পরে গোলাপ। নীলার পর কুসুম, কুসুম কণ্টকাকীর্ণ হলে স্নিগ্ধ স্নিগ্ধা। মনে হয়েছিল বনলতা সেন; পাখির নীড়ের মতো চোখ। আমি কিন্তু থেমে যাইনি। স্নিগ্ধার মুখোমুখি অন্ধকার হওয়ার আগেই রূপসী রোদেলা। আহ! জীবনটা একেবারে ঘিয়ে ভাজা খাস্তা—মুড়মুড়ে... তিল মেশানো খাজা। একটু কামড় দিয়ে মুখে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে স্বাদ নাও। সে স্বাদের ঘোর ঘুরপাক খেতেই থাকে। রোদেলা যেতে যেতেই বৃষ্টি হাজির। খাসির রেজালার সঙ্গে দই। হাজির বিরিয়ানির পর বোরহানি। আঙুল চেটেপুটে খাও। উফ... তার পরই ঘটে গেল সেই বীভৎস ঘটনাটা! জীবনটা থমকে গেল। একই জায়গায় ঘুরছে তো ঘুরছে...

আর লিখতে পারব না। নীলা এসে গেছে। হ্যাঁ, সেই নীলা...ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

অতঃপর, সবকিছুর যবনিকা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৩, ২০১১

593) বিবাহ বিপর্যয় - বয়েস হাউস

‘আমার সৎমায়ের মা আমারই স্ত্রী। বলুন তো, আমার স্ত্রী আমার কে হলো? আপনারও গোলমাল হয়ে গেল তো, আমার স্ত্রী আমার দিদিমা হলেন, তাই আমি স্ত্রীর নাতি হলাম। একজন মন্ত্রী টেক্সাসের একটি উন্মাদ আশ্রম পরিদর্শন করতে এসে সেখানকার রোগীদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একজনকে প্রশ্ন করে ফেললেন, ‘আচ্ছা, বলুন তো আপনার জীবনে এমন কী ঘটেছিল, যার ফলে আপনাকে এখানে চলে আসতে হলো?’

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, ‘দেখুন, আমার আজকে যে পরিণতি আপনি দেখছেন, এ সবকিছুর মূলে রয়েছে আমার বিয়ে। এই বিয়েঘটিত আনুষঙ্গিক ব্যাপারটা বিশদভাবে আপনাকে না বললে আপনি বুঝতেই পারবেন না, আমি কেন আমার বিয়েকে কেন্দ্র করে এসব কথা বলছি।’

তিনি আরও বললেন, ‘বিয়ে করে আমি যে কী সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম, সেটা আমি এখন

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, কিন্তু এত দেহিতে
এই উপলব্ধির কোনোই অর্থ হয় না। আমার
বিয়েকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলো
শুনুন—

‘আমি বয়স্ক কন্যাসহ একজন বিধবাকে বিয়ে
করি। সেই সূত্রে সেই কন্যা আমার কন্যা হলো।
‘এদিকে কিছুদিন বাদে আমার বাবা আমাদের
কাছে বেড়াতে এলেন। এসেই আমাদের মেয়ের
প্রেমে পড়ে গেলেন। তাকে বিয়েও করে
ফেললেন। কাজেই যে ছিল আমার মেয়ে, সে
আমার মা হয়ে গেল।

‘কিছুদিন বাদে আমার স্ত্রীর একটি পুত্র হলো।
স্বাভাবিকভাবে সে আমার কন্যার ভাই হলো।
অতএব আমার ছেলে আমার বাবার শালা
হলো।

‘আমার মেয়ে বাবাকে বিয়ে করে আমার সৎমা
হলো। আমার নবজাত পুত্রটি আমার সৎমায়ের
ভাই বলে সে আমার মামা হয়ে গেল।

‘ইতিমধ্যে আমার বাবার স্ত্রী যে নাকি আমার
কন্যা এবং অপর দিকে সৎমা, তার একটি
ছেলে হলো। সেই ছেলেটি অবশ্যই আমার ভাই
হলো। কেননা, সে তো আমার বাবারই ছেলে।
সে কিন্তু আমার আবার নাতিও হলো, কারণ সে
তো আমার কন্যার পুত্র।

‘আমার সৎমায়ের মা আমারই স্ত্রী। বলুন তো,
আমার স্ত্রী আমার কে হলো? আপনারও
গোলমাল হয়ে গেল তো, আমার স্ত্রী আমার
দিদিমা হলেন, তাই আমি স্ত্রীর নাতি হলাম।

‘কিন্তু এতেও আমার সব বলা হলো না। যেহেতু
আমি আমার দিদিমার স্বামী, আমি আমার
নিজের দাদামশাই হয়ে গেলাম। এর পরও কি
মাথা ঠিক রাখা যায়, আপনিই বলুন?’

মন্ত্রী বললেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার
বিয়েকে কেন্দ্র করে আপনার জীবনে যা কিছু
হয়েছে, তাতে কারোর পক্ষেই মাথা ঠিক রাখা
সম্ভব নয়। বিভিন্ন সম্পর্কজনিত যে জটিলতা
আপনার জীবনে সৃষ্টি হয়েছে,

তার জাল থেকে বেরিয়ে আসা খুবই মুশকিল।
এর জন্য প্রচণ্ড মনোবল দরকার। আমার মনে
হয়, তাহলেই আপনার সব সমস্যার সমাধান
হয়ে যাবে।’ অনুবাদ: মাধুরী সিংহচৌধুরী

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৩, ২০১১

594) চেয়ার - ক. রুসলানভ

মাঝরাতে ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল আমার স্ত্রী। তারপর ফিসফিস করে বলল, ‘চেয়ারকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।’

আড়মোড়া ভাঙলাম আমি চোখ না খুলেই। স্ত্রী আমাকে হালকা ধাক্কা দিল।

‘তুমি শুনছ? কোনো অবস্থাতেই চেয়ারকে দোষ দেওয়া যাবে না।’

কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঠে স্ত্রীর পাশে বসলাম। আলোচনা দীর্ঘ হবে, তা অনুমান করতে পারছি।

‘কোনো অবস্থাতেই....,’ বিড়বিড় করে নিজের অসন্তোষ জ্ঞাপন করলাম। ‘তুমি সব সময়ই চরমপন্থার পক্ষে। বাচ্চা বড় করার সময় এমন চরমপন্থা খুব ক্ষতিকর হতে পারে। গত বছরের প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের লালন-পালন পত্রিকার নবম সংখ্যায় কী লেখা আছে, পড়ে দেখো।’

চেয়ারকে দোষ দেওয়া যাবে না কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছিল না কিছুতেই। কথাটা শিশু লালন-পালনসংশ্লিষ্ট, তা তো বুঝতেই পারছি। আন্দ্রেইয়ের জন্মের পর থেকে আর কোনো প্রশ্ন আমাদের এত উদ্ভিন্ন করেনি।

লাইব্রেরিতে শিশু লালন-পালন বিষয়ে যা কিছু আছে, তার সবই আমরা গত দুই বছরে পড়ে শেষ করেছি। পত্রপত্রিকায়, ম্যাগাজিনে ‘পিতা-মাতার জন্য উপদেশ’ ছাড়া আর কিছুই পড়িনি।

সেগুলো পত্রিকা থেকে কেটে অ্যালবামে স্টেটেছি। শিশু লালন-পালন প্রসঙ্গে কোনো রেডিও-অনুষ্ঠান যাতে মিস না হয়, স্ত্রী আর আমি কাজ করেছি ভিন্ন শিফটে। নতুন কিছু জানা মাত্রই জানিয়েছি পরস্পরকে।

আজ রেডিও শোনার ভার ছিল স্ত্রীর ওপর। খুব সম্ভবত নতুন জানা কোনো তথ্য আমাকে জানাতে ভুলে গেছে বলেই সে স্বস্তি বোধ করছে না।

‘তো, চেয়ার বিষয়ে কী জা-নি বলছিলে?’

আকস্মিকভাবে উদ্ভূত শিশু নিয়ন্ত্রণ প্রাসঙ্গিক আলোচনা চালিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলাম স্ত্রীকে।

‘চেয়ার?’ প্রশ্ন করল স্ত্রী। ‘ও হ্যাঁ, শিশু যদি চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে আঘাত পায়, সে ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই চেয়ারকে দোষারোপ করা যাবে না। বলা যাবে না: দুষ্ট চেয়ার! বদ চেয়ার! চলো, ওকে আচ্ছামতো পিটুনি দিই। এর

অন্যথা হলে নিজের কৃতকর্মের প্রতি শিশুর
আত্মসমালোচনাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে না।’
একটু ভেবে নিয়ে সম্মতি জানালাম তার কথায়।
‘তুমি মাকে জানিয়েছ এ কথা?’ জিজ্ঞেস
করলাম।

‘সময় পেলে তো! তুমি তো জানো, আমি সারাটা
সন্ধ্যা প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের লালন-পালন-এর
পুরোনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছি।’
সকালে আমরা ফোন করলাম আমার মাকে
এবং জানালাম, কোনো অবস্থাতেই চেয়ারকে
দোষ দেওয়া যাবে না।

আন্দ্রেই থাকে আমার মায়ের কাছে। আমি আর
আমার স্ত্রী শিশু লালন-পালন প্রসঙ্গে
সাম্প্রতিকতম তথ্য তাকে সরবরাহ করে
চলি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৩, ২০১১

595) ঠকানো প্রশ্ন - সুকুমার রায়

গণেশ দাদা বললেন, ‘একটা গোরুর গলায় দশ
হাত লম্বা মোটা দড়ি বাঁধা। সেখান থেকে পঁচিশ
হাত দূরে এক আঁটি ঘাস আছে। কেউ ঘাস
এগিয়ে দিল না, দড়ি ছিঁড়তে হলো না, অথচ
গোরু অনায়াসে সেই ঘাস খেয়ে ফেলল। বল
তো, এটা কী করে সম্ভব হয়?’ দামু বলল,
‘বুঝেছি। খুব হাওয়া হলো আর ঘাস উড়ে এসে
পড়ল।’ গণেশদা বললেন, ‘তাহলেই তো এগিয়ে
দেওয়া হলো।’ গদাই অনেক ভেবে বলল, ‘এ
রকম হতেই পারে না।’ গণেশদা বললেন, ‘কেন
হবে না? গোরুর গলায় দড়ি বাঁধা বলেছি,
দড়িটা যে খোঁটায় বাঁধা তা তো আর বলিনি—
দড়িটা আলগাই ছিল।’ তা শুনে সকলে বলল,
‘এটা নেহাৎ ফাঁকি হলো।’

তখন মতিলাল বলল, ‘দুটো গাধা ছিল—তাদের
ভয়ানক জেদ। খাওয়াবার সময় একটা
পশ্চিমমুখো আরেকটা পূর্বমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে
রইল—ঠেললে সরবে না, মারলে নড়বে না।
এখন একটা বালতিতে করে দুটোকে একসঙ্গে
খড় খাওয়াতে হবে। কী করা যায়? করা যা
হলো তা কিছুই কঠিন নয়, অথচ গাধা দুটো
যেমন উল্টো দিকে মুখ করে ছিল ঠিক তেমনিই
রইল।’ দামু বলল, ‘ওটা আমি জানি।’ আর
সবাই বলল, ‘জানিস তো চুপ করে থাক না।
আমাদের ভাবতে দে।’ তারা ভাবছে, সেই সঙ্গে
তোমরাও একটু ভেবে নেও।
যা হোক, এটাতে সকলকে ঠকানো গেল না।

তখন বিপিন বলল, “আমি একটা কৌশলের ধাঁধা জানি। এক সুলতান আট হাত লম্বা, আট হাত চওড়া একখানা শতরঞ্জি বিছিয়ে, তার ওপর ঠিক মধ্যখানে একটা হীরের কৌটা রেখে বললেন, ‘ঐ শতরঞ্জি না মাড়িয়ে কিংবা তার ওপরে হাত, পা বা শরীরের কোনো রকম ভর না দিয়ে, আর লাঠি, দড়ি বা কোনো যন্ত্রের বা অন্য লোকের সাহায্য না নিয়ে, যে পারো, সে কৌটাটি নেও।’ কত ওস্তাদ ডব্বীর এসে কত রকম কসরৎ করে নেবার চেষ্টা করল, কত ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা লোক এসে কত রকম কায়দা করে, ঝুঁকে পড়ে, সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। শেষটায় একটা বেঁটে, রোগা লোক এসে চটপট অতি সহজে কৌটাটাকে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল। বল তো কী রকম করে হলো?”

গোপাল মামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘ভারি তো বললি! এই যে শরবতের গেলাস দেখছিস, এটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখ; আমি ধামায় হাত দেব না, তুলব না, অথচ শরবত খেয়ে ফেলব।’ তখন সকলে ছুটোছুটি করে একটা ধামা এনে গেলাসটাকে চাপা দিয়ে তামাশা দেখতে বসল। মামা তখন মাথায় চাদর ঢেকে ধামার কাছে বসে খানিকক্ষণ ঢকঢক শব্দ করে বললেন, ‘বাস! শরবতের দফা শেষ।’ সবাই বলল, ‘কই দেখি।’ বলে যেই তারা ধামা তুলেছে, অমনি মামা খপ করে গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ করে শরবত খেয়ে বললেন, ‘কেমন! ধামা ধরলাম না, ছুঁলাম না, শরবত খেয়ে ফেললাম! হলো তো?’

ঠিকানো প্রশ্নের উত্তর

গাধা দুইটি মুখোমুখিই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহলে একটার মুখ পূর্ব দিকে থাকিলে আর একটার মুখ তাহার উল্টা, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে থাকিবে। এখন দুই জনের মাঝখানে মুখের নিচে খাবারের বালতি বসাইলেই দুইজনে এক সঙ্গে খাইতে পারে।

শতরঞ্জির উপর হইতে কৌটা সরাইবার কৌশলটিও খুব সহজ। শতরঞ্জির উপর ভর না দিয়া তাহার উপর হাত-পা না রাখিয়া তাহাকে গুটাইয়া ফেলা যায়; আর একদিকে খানিকটা গুটাইলেই কৌটাটি উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়।।

সুকুমার রায়: শিশুসাহিত্যিক। জন্ম: ১৮৮৭,
মৃত্যু: ১৯২৩।

596) মাননীয় সাংসদ ও স্পিকারের মধ্যে একটা সম্ভাব্য কথোপকথন

স্পিকার: মাননীয় সাংসদ, আপনার প্রশ্ন উত্থাপন
করুন।

সাংসদ: মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, ডটার অব
পিস, শান্তির পায়রা, দেশের লক্ষ্মী শেখ
হাসিনাকে জানাই শত সহস্র সালাম। তিনি এ
দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ...

স্পিকার: আপনি প্রশ্ন করুন, মাননীয় সাংসদ।

সাংসদ: ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার। আজ
আমাদের দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে
যাচ্ছে। আমাদের দেশ পরিচালনায় নিপুণ
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে
মাইলফলক স্থাপন করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে...

স্পিকার: আপনি আপনার প্রশ্ন করুন, মাননীয়
সাংসদ...

সাংসদ: জি, জি, মাননীয় স্পিকার। ধন্যবাদ।

এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি শুধু বলতে
চাই, আমাদের দেশ ও জাতি এখন যে সোনার
বাংলায় বাস করছে, যা একদিন স্বাধীনতার
একমাত্র ঘোষক, শ্রেষ্ঠ বাঙালি, এ দেশের
স্বাধীনতার নায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা শুধু সম্ভব হয়েছে তাঁরই
যোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
কল্যাণে এবং...

স্পিকার: প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করুন, মাননীয়
সাংসদ। আপনি প্রশ্ন করুন।

সাংসদ: ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার। ধন্যবাদ
আপনাকে এই মহান সংসদে কথা বলার সময়
এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি এই মহান
সংসদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার
খালি একটা কথা বলার আছে। আজকে জনগণ
যেভাবে জেগে উঠেছে, বঙ্গবন্ধুর লালিত সোনার
বাংলা বাস্তবায়নে যে প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, ও
উন্নতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, তা...

স্পিকার: ধুৎ!লেখা মাহমুদ জসিম, শিপলু
হাওলাদার, শরীফুল ইসলাম

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৩, ২০১১

597) ডিজিটাল লিচু-চোর - কাজী ব্রজী

‘পারবি তো?’ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন
বস।

‘আবার জিগায়! পারব না মানে?’

‘যা তাইলে।’

আমি রওনা দিলাম। গায়ে দৌড়-ঝাঁপের জন্য
সুবিধাজনক পাতলা পোশাক, চোখে নাইট
ভিশন গগলস, হাতে গ্লাভস। কবজির ব্যান্ডটা
১০ ফিটের মধ্যে কোনো প্রাণী এলেই সিগনাল
দেবে।

আমি আর আমার বস বড় বড় ফলের বাগান
থেকে ফল চুরি করে চোরাই মার্কেটে বিক্রি
করি।

আগের অপারেশনে বসের মাথায় একটা কাঁঠাল
পড়ায় (উফ! একটা দৃশ্য ছিল বটে!) তিনি
আপাতত বিছানাবাসী। আজকের ‘অপারেশন
লিচু’ আমাকে একাই সারতে হবে।

বাবুদের বাগানের দেয়ালের কাছে এসে পকেট
থেকে আলট্রা রিমোট বের করলাম। বোতাম
টিপতেই বাগানে সেট করা সিসি ক্যামেরাগুলো
আগের ভিডিও দেখাতে থাকবে। দেয়ালের
কাছে দুজন গার্ড আর সিসি স্ক্রিন দেখার জন্য
দুজন টেকনিশিয়ান। ঘুমের ওষুধ ভরা ডার্ট ছুড়ে
তাদের ঘায়েল করা গেল। ঝোপের মধ্যে
লুকানো অ্যালার্মের মেইন তার কাটলাম।

দেয়ালের কাছে এসে গ্লাভসের বোতাম
টিপলাম। মাথায় হুক লাগানো তার বের হলো।

দেয়ালের মাথায় হুক আটকে জুতা বদলে

নিলাম। সাকশান জুতা এখন আমার পায়ে।

খাড়া জায়গা বেয়ে ওপরে ওঠা এখন কোনো
বিষয় না। তার ধরে উঠতে লাগলাম।

এই সেরেছে! নতুন জুতা। বেশি জোরে দেয়ালে

পা ফেলায় সাকশান কাপ মারাত্মক শক্ত হয়ে

লেগেছে। দুই পা-ই আটকে গেছে আমার। পা

টানাটানি করতে করতে হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল,

খোলে না। কী মুশকিল! শক্ত করে তার ধরে

ডান পা তোলার জন্য হ্যাঁচকা টান দিলাম।

এবার খুলল—জুতা না হুক। দেয়ালে পা রেখে

চিত হয়ে গেলাম আমি এবার।

অনেক কষ্টে জুতা খুলে ফেললাম অবশেষে।

খসে পড়লাম দেয়াল থেকে। এই জঘন্য জুতা

আর পরা যাবে না। পকেট থেকে মিনি পিসিটা

বের করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলাম, ‘সাকশান জুতার গুটি কিলাই!’ তারপর জুতা ছাড়াই শুধু তার ধরে হাচড়ে-পাচড়ে কোনো রকমে উঠে পড়লাম দেয়ালে, লাফিয়ে বাগানে নামলাম।

ওফ, হাত-পা ছিলে গেছে। বদমাশ জুতা! আস্তে আস্তে একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। আশপাশে কোনো প্রাণী আছে কি না জানার জন্য কবজির ব্যান্ডটা সুপার সার্চ মুডে দিলাম। চারদিক থেকে হাজার হাজার সিগনাল আসা শুরু করল। ওফ, বাগানভর্তি পোকামাকড় ছাড়া কিছু নেই। সুনসান নীরব।

লিচুতে ভর্তি একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়লাম। সাকশান জুতা নেই। তাই একটা হুক লাগিয়ে দিলাম গাছের ডালে। তার ধরে গাছ বাইতে শুরু করলাম।

এক ডালে উঠেই হাঁপিয়ে গেছি। উফ, কোমর গেল রে বাবা। এত নিচে কোনো লিচু নেই। আরও ওপরে উঠতে হবে। আরে, ওই তো একটা ছোট ডাল। একদম সিড়ির মতো ওপরে উঠে গেছে। খুশি হয়ে ওটার ওপর পা দিলাম। ও বাবা, এ দেখি ভাঙা ডাল। মড়াং করে ডাল আলাদা হয়ে গেল। আমি নিচে এসে পড়লাম সোজা...কিসের ওপর? প্রথমে বুঝিনি। চোখের সামনে বেশ সরিষা ফুলের সভা দেখছিলাম। কিন্তু পিঠে এক মণি একটা কিল খেয়ে সরিষা পালাল। বিরাট এক রোবট, আমি ঠিক এর ঘাড়ে পড়েছি। বাবুরা তাদের বাগানে রোবট মালী রাখে গোপনে, এটা জানতাম না।

‘আমাদের ভাঙা ডালে ফাঁদ ছিল। মড়াং শব্দে আমি চালু হই। আমাদের ভাঙা ডালে ফাঁদ ছিল। মড়াং শব্দে আমি চালু হই...’ আমার পিঠে মারতে মারতে একঘেয়ে গলায় বলতে লাগল সে।

রোবটের সঙ্গে মারামারি করা চাউখানি কথা না। একটু ফাঁক পেয়েই সোজা দৌড় দিলাম আমি। দেয়ালের কাছে এসে মাথায় হাত। হুক ফেলে এসেছি। রোবট মালীর গলা পেছনে।

‘আমাদের ভাঙা ডালে ফাঁদ ছিল। মড়াং শব্দে আমি চালু হই...’ বলতে বলতে আমাকে দুই হাতে ধরে ছুড়ে মারল, একবারে দেয়ালের বাইরে।

হাড়গোড় সব আলাদা হয়ে গেল বোধ হয়। সারা জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারব কি না

ভাবছি, এমন সময় কানের কাছে ঘেউ ঘেউ ।
রোবট বেটা কি বাইরে এসে ঘেউ ঘেউ করছে
নাকি? ‘আমাদের ভাঙা ডালে ফাঁদ ছিল। মড়াং
শব্দে আমি চালু হই..’ এটা ঘেউ ঘেউয়ের চেয়ে
ভালো ছিল। চোখ মেললাম। মনে হলো আজকে
আমি শেষ। এখানেই। পাশের বাড়ির হাবুদের
ব্লাডহাইন্ড কুকুর। এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম।
(ইয়েস, দাঁড়াতে পারছি), তারপর দৌড় আর
দৌড়! পেছনে মস্ত জিভ বের করে আসছে
ব্লাডহাইন্ড। আরও জোরে দৌড়ালাম আমি।
হায়রে লিচু! হায়রে চুরি! হায়রে জুতা! হায়রে
রোবট! শেষ পর্যন্ত কুকুরের তাড়া। ছি ছি।
সবাই জানলে জীবনে আর ফেসবুকে ফেস
দেখাতে পারব না।

পাশের এক বাসার দেয়ালে এক ফোকর দেখে
ডাইভ দিয়ে ঢুকলাম। কুকুরটা বাইরে ঘেউ ঘেউ
করছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর কুকুরটা
বিদায় নিল। উফ্, লিচু চুরিতে আমি আর নাই।
তওবা, তওবা। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে
৩০, ২০১১

598) বিভিন্ন দেশের নামের অর্থ ও বাক্য রচনা - রাকিব কিশোর

। নেপাল = পাল টানাও।

বাক্য রচনা = নৌকায় বাতাস লাগছে, নে পাল
নে পাল।

। জার্মানি = টাকার বয়াম।

বাক্য রচনা = আমার টাকা বের করতে যদি
জার্মানি ভাঙতে হয়, তবে তা-ই সই।

। ইটালি = ইটাওয়ালি (ইট বিক্রেতা)

বাক্য রচনা = সিমেন্টের দোষে দেয়াল ভাঙল,
তুই ইটাওয়ালিরে পিটাইলি কেন?

। তাইওয়ান = তাই ওয়ান।

বাক্য রচনা = পড়াশোনা ঠিকমতো করি নাই,
তাই ওয়ান পাইছি?

। ঘানা = ঘা না।

বাক্য রচনা = আবুলের হাতে এমনি দাগ পড়ছে,
এইটা ঘা না।

। সুইডেন = সুঁই দেন।

বাক্য রচনা = দোকানদার মামা, একটা সুঁই
দেন, আমরা কাঁথা সিলাইব।

। মরক্কো = মোরগ কই?

বাক্য রচনা = আধা ঘণ্টা আগে অর্ডার দিছি,
আমার মোরগ কো?

১ ডেনমার্ক = মার্ক (নম্বর) দেন।

বাক্য রচনা = স্যার, আমার যা মনে আসে
লিখছি, এইবার আপনি অনুমান কইরা দেন
মার্ক।

১ মঙ্গোলিয়া = মন গলিয়া।

বাক্য রচনা = ছেলেটাকে দেখিয়া মেয়েটার মন
গলিয়া গেল।

১ পানামা = পা নামা

বাক্য রচনা = মুরবির সামনে পা তুইলা
বসছোস, কত বড় সাহস! পা নামা!

১ শ্রীলঙ্কা = সুন্দর মরিচ

বাক্য রচনা = বইসা বইসা শ্রী লঙ্কা দেখলে
হইবো! ভাত খা।

১ থাইল্যান্ড = উরুর অংশ

বাক্য রচনা = আমার থাইল্যান্ডে একটা পিঁপড়া
কামড়াইছে, উফ্ কী যে যন্ত্রণা!

১ নাইরোবি = সূর্য নাই।

বাক্য রচনা = চাঁদ দেখে মন হয় কবি, রাতের
বেলায় নাইরবি।

১ ইন্ডিয়া = দিয়ার মাঝে।

বাক্য রচনা = পড়াশোনা ভালো লাগে না, আমি
তো ইন দিয়ায় হারিয়ে গেছি।

১ সুদান = জুতা দান করা।

বাক্য রচনা = গরু মেরে সু দান!

১ ব্রুনাই = ব্রু নাই।

বাক্য রচনা = মেয়ের তো ব্রু নাই, প্লাক করব
কী?

১ চায়না = চায়ে না।

বাক্য রচনা = আমার শরবতে যত ইচ্ছা চিনি
দাও, কিন্তু চায় না।

১ কানাডা = দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

বাক্য রচনা = তোরে নিয়া বিরাট সমস্যা, দিনের
বেলায় তো কিছু দেখোস বুঝলাম, রাতে তো
কানাডা।

১ ভুটান = মাটির টান।

বাক্য রচনা = বিদেশে ছিলাম, এবার ভূ-টানে
বাড়ি যাচ্ছি। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩০,
২০১১

599) তাহাদের অভিযোগ - আলিয়া রিফাত

আমড়া

আই অবজেক্ট। আমার কাঠের টেকি কোনো
দিনই দেশের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার মতো

ছিল না। সবই আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সেগুন ও মেহগনির ষড়যন্ত্র। তাল

আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, পিচ্চি একটা তিল থেকে আমার মতো গাড়াগোড়া ফলের জন্ম। এ ব্যাপারে ডারউইন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাকাল ফল

হুহ! যে যা-ই বলুক, আমি কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। ভাবছি, সামনের বছর একটা ফলসুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নিজেই বিচারক হয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করব। বেল

গতকাল পাশের গাছের কাকটা এসে আম্মুকে বলল, আমি নাকি বেশি পেকেছি। আরে ব্যাটা, আমি পাকলে তোর কী? কলা

কাঁচা থাকতে কেবলই ভাবছিলাম, আদার সঙ্গে সব গ্যানজাম মিটিয়ে ফ্রেন্ডশিপটা করেই ফেলব। কিন্তু তার আগেই একটি বিশেষ

মহলের চক্রান্তে আমাকে গাছ থেকে পেড়ে কপার সালফেট দিয়ে পাকিয়ে দেওয়া হলো।

আফসোস। খেজুর

আমি ভাই বিশিষ্ট ভদ্র ফল। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আপনার গোঁফের সঙ্গে আমার জন্ম বা বৈবাহিক সূত্রে, এমনকি বিবাহবহির্ভূত সূত্রেও কোনো সম্পর্ক নেই। সবই বিরোধীদলীয় ষড়যন্ত্র। কাঁঠাল

গাছে ধরতে না ধরতেই গোঁফে তেল মেখে আমাকে নামানোর পর এখন কিলিয়ে জোর করে পাকানোর অপচেষ্টা আমি কিছুতেই সফল হতে দেব না। নেভার এভার। আমি ফল নির্যাতন আইনে মামলা করব। আঙুর

গুজবে কান দেবেন না। গাঁটের পয়সা খরচ করে নিজেই পরখ করে দেখুন, আমি টক কি না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১১

600) কাস্টমস চেকিং - আলেক্সান্দর পেরলুচক

‘কে যাচ্ছেন? দাঁড়ান!’ ‘আমি। কেন, কী হয়েছে?’

‘কাস্টমস চেকিং! কী নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে?’

‘কিছুই না। কিন্তু কাস্টমস চেকিং মানে? আমি তো বাসায় ফিরছি অফিস থেকে!’

‘আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। মনে রাখবেন, দায়িত্ব পালনে বাধা পড়লে আমরা সতর্কতা ছাড়াই গুলি করতে পারি।’

‘বুঝেছি। এই চুপ করলাম। কিন্তু মাফ করবেন,

এই রাস্তায় তো আগে কখনো কাস্টমস

চেকিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না!’

‘ছিল না, এখন থেকে থাকবে। এখন বলুন, আপনার ব্যাগে কী?’

‘কিছুই নেই। মানে, সসেজ আছে। ৩৫০ গ্রাম।’

‘দেখান। সার্টিফিকেট আছে?’

‘কিসের সার্টিফিকেট?’

‘সসেজ তৈরির সময় যে-জন্তুর মাংস ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি বিপজ্জনক কোনো সংক্রামক রোগে ভুগছিল না, এ বিষয়ে।’

‘না, তেমন সার্টিফিকেট আমার নেই।’

‘খুবই খারাপ কথা। আপনার সসেজ তাহলে জব্দ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর কী আছে আপনার?’

‘রুটি।’

‘রুটিও জব্দ করা হচ্ছে। সসেজ ছাড়া রুটি দিয়ে করবেনটা কী? যুক্তি ঠিক আছে না?’

‘জানি না।’

‘আমরা জানি। বৈদেশিক মুদ্রা আছে?’

‘কোথেকে? এই নিন, নিজেই দেখুন, হতচ্ছাড়া রুবল ছাড়া আর কিছুই নেই।’

‘রুবল নিয়ে ঘুরছেন কেন? নিশ্চয়ই এই রুবল দিয়ে ডলার বা জার্মান মার্ক কিনে পরে বেআইনিভাবে বিদেশে পাচার করে দেবেন! রুবলও জব্দ করছি তাই।’

‘কিন্তু...।’

‘কোনো কিন্তু নয়। আপনার গায়ের জ্যাকেটটি কোন দেশি?’

‘জানি না।’

‘দাঁড়ান, দেখছি... হুমম, চায়নিজ। আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতিকে আরও জরাজীর্ণ বানাচ্ছেন কেন?’

‘আমি?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি। বোকা হওয়ার ভান করবেন না। সেটার প্রয়োজন নেই। আপনি কি বুঝতে পারেন না, বিদেশি জিনিস কিনে আপনি আমাদের দেশের হাজার হাজার লোককে বেকার বানিয়ে রাখছেন?’

‘ওহ! বুঝতে পেরেছি। খুলব?’

‘অবশ্যই!’

‘আন্ডারওয়্যারও?’

‘আন্ডারওয়্যারও মানে?’

‘ওটাও তো বিদেশি। বিজাতীয় ভাষায় ওতে

লেখা আছে কী সব!

‘না, না। ওটা খুলতে হবে না। আমরা কি মানুষ নই, নাকি! এখন যেতে পারেন। আমরা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি একটি শর্তে: এই ঘটনার কথা কখনো কাউকে বলবেন না। হাজার হোক, একটি বেআইনি কাজ তো আমরা করে ফেললাম—আপনার আভারওয়ারটা তো বিদেশি!’

‘আমাকে আপনারা কী ভেবেছেন? আমি গবেট নাকি! আমি বুঝি না, ভেবেছেন? একদম চুপ থাকব। মাছের মতো।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ৩০, ২০১১

601) তোতা কাহিনী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, “এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।”

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “পাখিটাকে শিক্ষা দাও।”

২.

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩.

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ

বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে,

“শিক্ষার একেবারে হৃদমুদ।” কেহ বলে, “শিক্ষা

যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী

কপাল।”

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল।

খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য

লইয়া বলিলেন, “অল্প পুঁথির কর্ম নয়।”
ভাগিনা তখন পুঁথিলেখকদের তলব করিলেন।
তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল
করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল
সেই বলিল, “সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।”
লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ
বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল।
তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।
অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের
খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই
আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘট
দেখিয়া সকলেই বলিল, “উন্নতি হইতেছে।”
লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর
রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা
মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই
করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো ভাইরা
খুশি হইয়া কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪.
সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল
নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, “খাঁচাটার
উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে
না।”

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে
ডাকিয়া বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!”
ভাগিনা বলিল “মহারাজ, সত্য কথা যদি
শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের,
লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং
মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো
খাইতে পায় না বলিয়া মন্দ কথা বলে।”

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন,
আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫.
শিক্ষা যে কী ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার
ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র
মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং
আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক
ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁসি
বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প।
পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে
লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর
তদারকনবীশ আর মামাতো পিসতুতো এবং

মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলল ‘মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!’

মহারাজ বলিলেন, “আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।”

ভাগিনা বলিল, “শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।”

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময় নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি!”

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন “ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।”

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, “পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।”

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬.

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, “এ কী বেয়াদবি!”

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদম পিটানি।

লোহার শিকল তৈরী হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।”

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে

সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগির্নীর গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭.

পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, “পাখি মরিয়াছে।”

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!”

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।”

রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর লাফায়!”

ভাগিনা বলিল, “আরে রাম!”

“আর কি ওড়ে!”

“না।”

“আর কি গান গায়!”

“না।”

“দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়!”

“না।”

রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।”

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না।

কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্খস্ গজ্জাজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

602) বাংলা ছবির একঘেয়েমি দূর করতে চান?

বাংলা ছবির প্রায় একই রকম কাহিনি, সংলাপ ও দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে কি আপনি চরম বিরক্ত? আপনি কি চান এই একঘেয়েমি দূর হোক? কিন্তু কীভাবে দূর হবে, সেটা জানেন না। সমস্যা নেই। আমরা কিছু নমুনা উপস্থাপন করছি। দেখুন আপনার পছন্দ হয় কি না।
নমুনা উপস্থাপনের দায়িত্বে আছেন ইকবাল খন্দকার-তুই আমার বাবাকে খুন করেছিস।
প্রস্তাবিত নতুনত্ব
1 তুই আমার বাবাকে চিমটি মেরেছিস।

(ময়লাওয়ালা নখ দিয়ে)

1 তুই আমার বাবাকে আংকেল বলে না ডেকে
'জ্যাডা' বলে ডেকেছিস।

1 তুই আমার বাবাকে তোর বাজখাঁই গলায় গান
শুনিয়েছিস। তাও উচ্চাঙ্গসংগীত।

1 তুই আমার বাবার কাশি দেখে তাকে যক্ষ্মা
রোগী বলেছিস। (অথচ নিয়মিত চিকিৎসায় যক্ষ্মা
ভালো হয়)

1 তুই আমার বাবার সামনে চটি জুতা হেঁচড়িয়ে
হেঁচড়িয়ে হেঁটেছিস। মা, আমি পরীক্ষায় ফাস্ট
ক্লাস পেয়েছি।

প্রস্তাবিত নতুনত্ব

1 মা, আমার রেজাল্ট আপাতত স্থগিত আছে।

1 মা, ফলাফলের তালিকায় আমার রোল নম্বর
খুঁজে পাওয়া যায়নি। চিন্তা কোরো না, আবার
অতিরিক্ত লোকবল নিয়ে খুঁজতে যাব।

1 মা, আমি যৌথভাবে ফাস্ট ক্লাস পেয়েছি।

মানে আমার প্রাপ্ত নম্বর এবং ওসমানের নম্বর
মিলে ফাস্ট ক্লাস নম্বর হয়েছে।

1 মা, আমি ফাস্ট ক্লাস পেয়েছি...এমনটা আশা
করা অনুচিত।

1 মা, আমি বেশ কয়েক নম্বর গ্রেস নিয়ে ফাস্ট
ক্লাস পেয়েছি। নায়কের গায়ে গুলি না লাগার
দৃশ্য।

প্রস্তাবিত নতুনত্ব

1 নায়কের দিকে গুলিই ছোড়া হবে না। গুলতি
দিয়ে ঢিল ছোড়া হতে পারে।

1 গায়ে লাগা তো দূরের কথা, নায়কের দিকে
তাক করে গুলি ছুড়লে গুলিই ফুটবে না। বন্দুক
নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

1 গুলির শব্দে নায়কের কানের পর্দায় এতই
সমস্যা হবে যে সে মারামারি রেখে চলে যাবে
নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে।

1 নায়কের গায়ে গুলি লাগবে। তবে তার সঙ্গে
চিকিৎসকও থাকবে। চিকিৎসকের চিকিৎসায়
সে সুস্থ হয়ে বাকি মারামারি টুকু করবে।

1 মোবাইলে ভিলেনকে প্রস্তাব দেবে—এসো,
আমরা গোলাগুলি না করে কিলাকিলি
করি। 'বাঁচাও' বলে নায়িকার গগনবিদারী
চিৎকার।

প্রস্তাবিত নতুনত্ব

1 বাঁচাও বলে নায়িকা চিৎকার দেবে ঠিকই,
কিন্তু নায়কের কানে পৌঁছাবে না। কারণ, নায়ক

তখন এফএম রেডিও শুনবে।

। নায়িকা তার গলার টনসিল সমস্যার কারণে চিৎকারই দিতে পারবে না।

। ‘বাঁচাও’ বলা মানে তো ‘তুমি’ করে বলা।

শুরুতেই তুমি করে বলা ঠিক হবে কি না এই নিয়ে নায়িকা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে।

। বাঁচাও বলে চিৎকার না দিয়ে নায়ককে একটা এসএমএস করে দেবে। এসএমএসে আর কয় টাকাই বা কাটে।

। শুধু ‘বাঁচাও’ না বলে বলবে, ‘বাঁচাইলে বাঁচাও নইলে আমি ভিলেনের সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলে গেলাম।’ সব শেষে পুলিশ আসার দৃশ্য।

প্রস্তাবিত নতুনত্ব

। পুলিশ আসবে ঠিকই, তবে কাউকে থ্রেপ্তার না করে চা শিঙাড়া খেয়ে চলে যাবে।

। পুলিশ আসবে, তবে হাজতে স্থান সংকুলানের কথা চিন্তা করে কাউকে ধরে নিয়ে যাবে না।

। তাড়াতাড়ি আসার কারণে ইউনিফর্ম পরার সুযোগ পাবে না। ফলে পুলিশ এলেও বোঝা যাবে না যে তারা পুলিশ।

। হঠাৎ অন্য জায়গায় ডিউটি পড়ে যাওয়ায় এখানে পুলিশ আসবে না। তবে ফোন করে বলবে, যাঁরা যাঁরা মারামারি করেছেন, তাঁরা থানায় চলে আসেন।

। পরিচালক পুলিশকে বুঝতে দেবে না ছবির শেষ দৃশ্য কোনটি। অতএব পুলিশেরও আসা হবে না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৬, ২০১১

603) কৌতুক - গ্রিগোরি কাজোভস্কি

একটা কৌতুক বানালাম। দুই বন্ধুর দেখা।

প্রথমজন জিজ্ঞেস করল:

‘শোন, দোস্ত, আমি মরে গেলে তুই অন্তত পাঁচ রুবল খরচ করে ফুল কিনে আমার কফিনের ওপরে দিতি না?’

‘নিশ্চয়ই দিতাম,’ বলল দ্বিতীয়জন। ‘আমি তোকে ভালোবাসি না!’

‘তাহলে শোন, সেই পাঁচ রুবল তুই এখন

আমাকে দে; আর আমি যখন মরব, তখন

তোকে ফুল কিনতে হবে না।’ অফিসে কলিগদের

কৌতুকটা বললাম। সবাই হাসল খুব। আর

পাচিভালভ বলল, ‘তুমি এক কাজ করো।

কৌতুকটা লিখে পত্রিকা অফিসে নিয়ে যাও।

বিখ্যাত হয়ে পড়বে দেশজুড়ে।’ তার কথা শুনে

গেলাম পত্রিকা অফিসে। ‘হিউমার’ বিভাগের সম্পাদক আমার কৌতুক পড়ে বললেন, ‘হুম্! খুব জমেনি মোটেও। কী এটা? এর ধরনটা কী?’

‘কৌতুক। বলতে পারেন, বিদেশি কৌতুকের ধাঁচে।’

‘ধাঁচে...না, চলবে না। বড়ই দুর্বল। মজাদার নয়। দুঃখিত।’

মন খারাপ হলো কথাটা শুনে। কিন্তু কী আর করা! এক সপ্তাহ পরের কথা। পাচিভালভ আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলে?’

‘গিয়েছিলাম।’

‘কী খবর?’

আমি সব তাকে খুলে বললাম। মিনিট দুয়েক চুপ করে থাকল পাচিভালভ। কী যেন ভাবল। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলল, ‘তুমি এক কাজ করো...’ আবার গেলাম সেই পত্রিকা অফিসে। বিভাগীয় সম্পাদক আমাকে চিনতে পারলেন না। তাঁর টেবিলের ওপরে রাখলাম কৌতুকটি। পড়ে তিনি গলা ফাটিয়ে হাসতে শুরু করলেন। তারপর কাশতে কাশতে বললেন, ‘দারুণ! আহ, কী দারুণ! স্রেফ অদ্ভুত!’ এক মাস পর বেরোল পত্রিকার নতুন সংখ্যা। শেষ পৃষ্ঠায় কৌতুকটি প্রকাশিত হলো এভাবে:

বিদেশি কৌতুক

পান* মালিনোভস্কি, ‘আমি মরে গেলে অন্তত পাঁচ জেলাতি খরচ করে ফুল কিনে আমার কফিনের ওপর দিতেন না?’

‘নিশ্চয়ই দিতাম।’ বললেন পান কুরকা। ‘আমি আপনাকে ভালোবাসি না!’

‘তাহলে শুনুন, সুপ্রিয় পান মালিনোভস্কি, সেই পাঁচ জেলাতি আপনি এখন আমাকে দিন; আর আমি যখন মরব, তখন আপনাকে ফুল কিনতে হবে না।’ নিজের এই সাহিত্যকীর্তির কথা আমি প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিলাম। তখন একদিন আমার বাড়িতে এল পাচিভালভ। বলল, ‘দেখো, এখানে কী ছাপা হয়েছে।’ বলে আমার হাতে ধরিয়ে দিল সংগীতচিত্র নামের একটা পত্রিকা। আমি পড়তে শুরু করলাম—

একদিন মোৎসার্ট জিজ্ঞেস করলেন
সালিয়েরিকে:

‘শোনো, সালিয়েরি, আমি মরে গেলে...’

এরপর আমার পুরো কৌতুকটা।

পড়ে কেমন যেন লাগল আমার। একদিক থেকে ভেবে দেখলে ব্যাপারটা প্রীতিকর—মনীষীদের মুখে আমার বানানো সংলাপ। আবার অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখলে অস্বস্তি হয়—তাঁদের নিজস্ব কথা কি নেই? এরপর শুরু হলো...সাহিত্য সমীক্ষা পত্রিকায় ছাপা হলো, বার্নার্ড শ জিঙ্গেস করলেন হার্বার্ট ওয়েলসকে:

‘শুনুন, মিস্টার ওয়েলস...’

ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, বিজ্ঞানী-প্রকৃতিবিদ হামবোল্ড প্রশ্ন করলেন লবাচেভস্কিকে...

শস্য পত্রিকায় মিচুরিন জিঙ্গেস করলেন...

অপেরা ও অপারেট পত্রিকায় শালিয়াপিন প্রশ্ন করলেন...

পিতা আলেক্সান্দর দুমা প্রশ্ন করলেন পুত্র আলেক্সান্দর দুমাকে...রাতে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে পাচিভালভ পর্যন্ত যাবতীয় খ্যাতিমান মনীষীদের। প্রতিদিন সকালে পত্রিকার দোকানে যাই, নতুন পত্রিকা কিনি, আর তাতে খুঁজে পাই প্রতিভাধরদের মুখে আমার বানানো যাচ্ছেতাই সেই কৌতুকের সংলাপ। আমার এখন কী কর্তব্য, বুঝতে পারি না। মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তো সম্ভব নয়। তাঁরা সবাই মৃত। তাঁদের মুখে যেকোনো সংলাপই জুড়ে দেওয়া যায়। আর জীবিতদের কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না যে কৌতুকটির রচয়িতা আমি।* পোলিশ ভাষায় ‘জনাব’। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৬, ২০১১

604) দুটি ডায়েরি - আলিম আল রাজি

হরতাল-সমর্থকের

সকাল আটটা

সকালে উঠেই মন ভালো হয়ে গেল। আহা!

আজ হরতাল! কী মজা! অফিস নেই। অনেক দিন পর একটা ছুটি পাওয়া গেল। এ রকম যদি সব সময় হরতাল থাকত!

যা-ই হোক। পত্রিকাটা হাতে নিলাম। ‘সকাল-সন্ধ্যা হরতাল’ হেডলাইন দেখেই খুশি লাগল। কিন্তু কেবল খুশি হলে হবে? হবে না। কারণ, আজকে হরতাল। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার

হরতাল। হরতালে একাত্মতা পোষণ করার জন্য আমি যতটা সম্ভব কপাল কুঁচকালাম। দেশের প্রয়োজনে দুশ্চিন্তা করতে হবে না? যা-ই হোক, মনে মনে হরতালের সফলতা কামনা করে টিভি রুমের দিকে গেলাম। ফাটাফাটি একটা মুভি দেখতে হবে আজ। আজ মহান মুভি দিবস। দুপুর দুইটা

দেশের অবস্থা ভালো না। এটাকে কি গণতন্ত্র বলা যায়? সরকার হরতাল পালন করতে দিচ্ছে না। নেতাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে পুলিশ। আমি আবার কপাল কুঁচকালাম। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করলাম। হরতাল একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। এটাতে বাধা দিলে কীভাবে হবে?

যা-ই হোক। পুরো সকাল মুভি দেখেছি। দারুণ কেটেছে।

এদিকে বউ বিরাট খেপে আছে আমার ওপর। আমি নাকি আইলসা। এসবের কোনো মানে হয়? আমাকে কথা পর্যন্ত বলতে দেয়নি! এটা কী রকম গণতান্ত্রিক আচরণ! ঘরে ঘরে আজ নিগৃহীত জনতা। দেশে হরতাল না হলে হবেটা কী? বউ মনে হয় আবার খেপেছে। যাই। রাত ১০টা

আমার অনেক আনন্দ হচ্ছে। হরতাল সফল করেছে। ওয়াও! দেশের মানুষ এই সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাতের খবর দেখলাম। আমাদের নেতারাও অনেক খুশি। তাঁরা হরতাল সফল করার জন্য দেশের মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। আমাকেও ফোন করতে হবে কিছু। ডায়াল করলাম আমার দোস্তের নম্বর।

—দোস্ত! কী হরতাল করলাম দেখেছিস? একেবারে ফাটাইয়া দিছি। হরতালবিরোধীর সকাল আটটা

আজকে হরতাল। ভালো ব্যাপার। ছুটি পেলাম। কী আনন্দজনক ব্যাপার! কিন্তু হরতালটা সেভাবে মানতে পারছি না। বিরোধী দল দেশের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে হরতাল দিয়ে। এরা আসলে দেশের কোনো উন্নয়নই চায় না। হরতাল করে দেশ অচল করে দেওয়ার কোনো মানে হয়? পুরো দেশের মানুষ ঘরে বসে থাকবে। এভাবে দেশ চলে কীভাবে? যা-ই হোক, আজ যেহেতু ফ্রি আছি, সেহেতু

আমার প্রেমিকা মিলিকে সময় দেওয়া যেতে পারে। ও নিজেও আজ বাসায় আছে। অনেক কথা বলা যাবে আজ। ইয়াহু! আমি মিলির নম্বর ডায়াল করলাম। দুপুর দুইটা টিভিতে দেখলাম, পাত্তা পাচ্ছে না হরতালকারীরা। পাত্তা পাবেই বা কেন! দেশের মানুষ কি তাদের সঙ্গে আছে? নেই। দেশের সব মানুষ তো আছে সরকারের সঙ্গে। যা-ই হোক, আজ মিলির সঙ্গে দেখা করব। খুব আনন্দ লাগছে। হরতালের এই ব্যাপারটা দারুণ লাগে। জ্যাম নেই। ইচ্ছামতো ঘোরা যায়। প্রেম করা যায়।

বিকেলে মিলি বের হবে। আমিও বের হব। কালো পাঞ্জাবি পরে যেতে হবে বলেছে। কিন্তু পাঞ্জাবিটা যে কই রাখলাম! রাত ১০টা মিলির সঙ্গে দেখা করে অসম্ভব ভালো লাগছে। দুর্দান্ত কেটেছে আজকের দিনটা। অনেক রোমান্টিক। আমি এখনো রোমাঞ্চিত। যা-ই হোক, কথা সেটা নয়; কথা হলো, বিরোধী দলের হরতাল দেশবাসী পুরো প্রত্যাখ্যান করেছে। হা হা হা। আমি আগেই জানতাম, হরতাল সফল হবে না।

কিছু ব্যাপারে খারাপ লাগছে আসলে। হরতালের কিছুটা প্রভাব তো পড়েই। এই দুঃখী দেশটাতে যেন আর হরতাল না হয়। হলে উন্নয়ন হবে কীভাবে?

যা-ই হোক। আজ ডেটিং করে অনেক টায়ার্ড। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোন দিলাম মিলিকে। মিলি আহ্লাদি গলায় বলল, আবার কবে দেখা হবে, জান?

আমি বললাম, চিন্তা কোরো না, জান। আরেকটা হরতাল হলেই দেখা করব। হরতালটা যে কবে হবে! দোয়া কোরো, তাড়াতাড়ি যাতে হয়। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৩, ২০১১

605) গণশার চিঠি - লীলা মজুমদার

ভাই সন্দেশ,
অনেক দিন পর তোমায় চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কী যে ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম ভাই খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয়ে যেত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেত!
আজকাল আমি মামাবাড়ি থাকি। আমার মনে হয়, ওঁরা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে

মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মনদা বলেছে, ওঁর স্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর বছরের শেষের দিকে গুটিকয় টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু বাবা সুবিধের কথা নয়! ছেলেগুলো যায় কোথা?

মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটাও ভাই কী রকম যেন। সরু-ঠ্যাং পেন্টালুন উনি কখনো ধোপার বাড়ি দেন না। সাদা-কালো চৌকো-কাটা কোট পরেছেন তো পরেছেনই। আবার চুলগুলো সামনের দিকে খুদে খুদে আর পেছন দিকে লম্বা মতন, পাশের গোঁফ ঝুলো-ঝুলো। ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কিসের চামড়ায়, কিসের তেলে ডুবিয়ে কিসের লোম দিয়ে সেলাই করা!

বাবা গো! মা গো! ইচ্ছে করে ওঁর স্কুলে কে যাবে? মানকে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভেতরে সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই গা নাচাচ্ছেন। পরের সপ্তাহে মানকে আবার দেখেছে, ঘরের ভেতরে ছয়টা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের করছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে, ঘরের ভেতর পাঁচটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই সেফটিপিন দিয়ে কান চুলকোচ্ছেন। শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে আর ঘরের বাইরে নয়টা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে; মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন।

তা ছাড়া সেই যে বিভু আরশোলা পুষত, একবার গুবরে পোকাও খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে—মাস্টারমশাইয়ের বাক্সে হলদেটে তুলোট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। ওর লেবুর গাছে মাকড়সারা কেন জানি জাল বোনে না; পেঁপেগাছে সেই গোল-চোখ চকচক জন্তু নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে মাস্টারমশাইয়ের বোকা গিনি

মোটা বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে দিন-রাত ওত পেতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বলা যায় না; মনদা তো ও-বাড়িতে কোনোমতেই যায় না, মেজও বাড়ির ছায়াটি মাড়ায় না আর ছোট ছেলে ধনা, তার তো ও-বাড়ির হাওয়া গায়ে লাগলেই সর্দিকাশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ও-বাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা সজনে ডাঁটা নেয় না। মামা কিন্তু ওঁদের কুমড়ো-ডাঁটা দিব্যি খান; আর বড় মামা তো ওঁরই দাদা, ওই একই ধাত। ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কি ম্যাজিক কি মন্তুর-পড়া—এসব একেবারে বিশ্বাস করেন না। কে জানে কোনোদিন হয়তো কানে ধরে ওই স্কুলেই আমাকে ভর্তি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারাজীবন ব্যা-ব্যা করে নটে চিবোব? স্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড় মামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন, পাথরের ওপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি। কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ! কান্না পেয়ে গেল ভাই! এদিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে। বড় মামা যখন-তখন আমার দিকে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচর ফ্যাচর হাসেন। বুঝছি, গতিক ভালো নয়। দুয়েকবার তিনতলার ছাদে গিয়ে ব্যা-ব্যা করে ডেকে দেখেছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না, খানকতক দুর্বো ঘাস চিবিয়ে দেখেছি; বদ খেতে, তাতে আবার ছোট্ট গুঁয়োপোকা ছিল। খোকনকে বলেছি, গলায় দড়ি বেঁধে একটু টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজি হলো না। এদিকে অভ্যাস না থাকলে কী যে হবে তা-ও তো জানি না!

এসব নানা কারণে এতকাল চিঠি লিখতে পারিনি বুঝতেই পারছ!

একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর সইল না। কেডস পায়ে দিয়ে সুট-সুট মাস্টারমশাইয়ের বেড়া টপকে, ছাগলদাঁড় ডিঙিয়ে, জানালার গরাদ খামচে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়ি মাছের মতন ডান্ডার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারলাম।

দেখলাম, মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে হুকো খেতে চেষ্টা করছেন আর গিল্লি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন—কোনোটা আস্ত উঠছে,

গিনি হাসছেন; কোনোটা আধ-খাঁচড়া উঠছে, গিনি দাঁত কিড়মিড় করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বলে সারাক্ষণ বকবক করছেন ভাই, বড় ভালো লাগল।

কিন্তু আনন্দের চোটে যে-ই খচমচ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চমকে বললেন—ওটা কী রে?

ভাবলুম, এবার তো গেছি! কান ধরে বুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নখ দিয়ে খামচে দিয়ে গিরগিটির মতো মুখ করে বললেন—ও বাঁদর!

বললুম, আঙে স্যার, ছাগল বানাবেন না স্যার!

বললেন, বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?

গিনিও ফিসফিস করে বললেন, ওটিকে রাখো, আমি পুষব!

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিনি মাথায় হাত

বুলিয়ে শিং আছে কি না দেখে বললেন—তোমার

মতন আমার একটি খোকা ছিল। জিঙেস

করলুম, তার কী হলো? বললেন, এখন তার

দাড়ি গজিয়েছে। বলে বড় বড় বাতাসা খেতে

দিলেন, তারপর বাড়ি চলে গেলাম। জিঙেস

করতে সাহস হলো না, দাড়ির সঙ্গে ক্ষুরও

গজিয়েছিল কি না।

স্কুলের কথা এখনো কিছু ঠিক হয়নি, এই ফাঁকে

তোমাকে লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিয়ো

না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে-টোঁয়াড়ে

খোঁজ কোরো। লীলা মজুমদার: প্রখ্যাত লেখিকা।

জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮; মৃত্যু: ৫ এপ্রিল,

২০০৭

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৩, ২০১১

606) অনুরাগ ও বিরাগ - এ করিয়াগিন

অনুরাগ

প্রথমজন ভালোবাসে মদ্যপান। আর তাই তার

লিভার ও কিডনি প্রায়ই ব্যথা করে। দ্বিতীয়জন

ভালোবাসে ধূমপান। তাই তার হার্ট আর

ফুসফুসে সমস্যা। প্রথমজনের সঙ্গে দ্বিতীয়জনের

দেখা হয় যখন, তাদের দেখা হয় সচরাচর

ক্লিনিকে, তখন তাদের দুজনের একত্রে ব্যথা

করে লিভার, হার্ট, কিডনি আর

ফুসফুস। তৃতীয়জন মদ্যপান ও ধূমপান দুটোই

ভালোবাসে। প্রথম দুজনের যত রোগবালাই

আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি আছে তার একার।

ক্লিনিকে তৃতীয়জনকে দেখলে প্রথম দুজন

শ্রদ্ধাভরে লাইন ছেড়ে দেয়। চতুর্থজন ভালোবাসে

● <http://facebook.com/tanbir.cox>

নারীদের। তার হাট, ফুসফুস, কিডনি ও লিভার ব্যথা করে। কখনো কখনো শরীরের দুই পাশেও। কারণ, তাকে প্রথম তিনজন পছন্দ করে না। তাকে তারা ক্লিনিকে দেখে না কখনোই। তবে কখনো কখনো দেখে ফেলে নিজেদের ফ্ল্যাটে। তখনই তার শরীরের দু'পাশে ব্যথা শুরু হয়। পঞ্চমজন তীব্রভাবে ভালোবাসে অর্থকড়ি। মাঝেমধ্যে তার মাথাব্যথা করে। কারাগারে ষষ্ঠজন ভালোবাসে প্রকৃতি। প্রথম পাঁচজনের যা কিছু ব্যথা করে, তার সব কটিই তাকে ভোগায়। কারণ, আমাদের প্রকৃতিকে ভালোবাসা আর মদ্যপান, ধূমপান এবং মদ্যপায়ী ও ধূমপায়ী মেয়েকে ভালোবাসা, একই কথা। সপ্তমজন কাউকে এবং কোনো কিছুই ভালোবাসে না। প্রথম ছয়জনের কোনো রোগেই তাকে ভুগতে হয় না। তবে মাঝেমধ্যে মাথার ভেতরে কী যেন হয় এবং চিন্তাভাবনাগুলো তার জট পাকিয়ে যায়। শুধু ইভান কুজমিন সম্পূর্ণ সুস্থ এক মানুষ। কারণ, তিন বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিরাগ প্রথমজন মদ্যপান ছেড়ে দিল। ব্যথা তার তো কমলই না, বরং বন্ধুরা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করল। রগচটা হয়ে উঠল সে। দ্বিতীয়জন ধূমপান ছেড়ে দিল। হাট আর ফুসফুস তবু আগের মতোই ব্যথা করে। এ ছাড়া সে-ও রগচটা হয়ে উঠল প্রথমজনের মতোই। প্রথমজনের সঙ্গে যখন দ্বিতীয়জনের দেখা হয় ক্লিনিকে, তখন তারা দুজনে মিলে রগচটা হয়ে ওঠে। তৃতীয়জন একসঙ্গে মদ্যপান ও ধূমপান ছেড়ে দিল। এখন ক্লিনিকে প্রথম দুজনকে দেখলে সে তাদের কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে লাইন ভেঙে এগিয়ে যায় সামনে সাইকিয়াটিস্টের কেবিনের দিকে। কারণ, প্রথম দুজন একত্রে যতটা রগচটা, সে এখন একাই তেমন। চতুর্থজন চুকিয়ে দিল নারী-ভালোবাসার পাট। সে এখন পুরুষদের ভালোবাসে। তার এখন ফুসফুস, কিডনি, লিভার ও নার্ভের সমস্যা। মাঝেমধ্যে শরীরের দুই পাশেও ব্যথা করে। কারণ, প্রথম তিনজন তাকে পছন্দ করে না। তাকে তারা ক্লিনিকে তো দেখেই না, দেখে না এখন তাদের ফ্ল্যাটেও। তবে পুরুষদের টয়লেটে তাকে তারা প্রায়ই দেখে। সেখানেই তারা তাকে বেদম মারধর করে। তখনই তার

শরীরের দুই পাশে ব্যথা শুরু হয়। পঞ্চমজন অর্থ ঘৃণা করতে শুরু করল। মাথাব্যথা প্রচণ্ডতর হলো তার। সেই কারাগারেই। ষষ্ঠজন প্রকৃতি ঘৃণা করতে শুরু করল। এখন তার ব্যথা করতে শুরু করল সবকিছু, যেসব ব্যথা করত প্রথম পাঁচজনের, যখন তারা তাদের ভালোবাসায় মগ্ন ছিল এবং সেসব, যেসব তাদের ব্যথা করতে শুরু করেছে ভালোবাসা প্রত্যাহার করার পর। কারণ, আমাদের প্রকৃতি হলো মদ্যাসক্তা ও ধূমপায়ী নারীর মতো, যার কোনো মাথাব্যথাই নেই, তাকে কেউ ভালোবাসে কি না, তা নিয়ে। সপ্তমজন সবাইকে ও সবকিছু ভালোবাসতে শুরু করল। তবে বলে রাখা উচিত, মানসিক হাসপাতালে। শুধু ইভান কুজমিন সম্পূর্ণ সুস্থ এক মানুষ। কারণ, তিন বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ করিয়াগিন: রুশ রম্যলেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৩, ২০১১

607) ওরে বাবা! - আদনান মুকিত

পার্ক বসে বাদাম চিবাচ্ছি। নিজেকে একটি বিশেষ গোত্রের প্রাণী মনে হলেও কিছু করার নেই। প্রেমে পড়লে প্রেমিকার সঙ্গে পার্ক বসে বাদাম চিবানো মোটামুটি ঐতিহ্যের পর্যায়ে পড়ে। প্রেমিকা রিয়া অত্যন্ত ঐতিহ্য-সচেতন। আজকে অবশ্য তার মুড খারাপ; ঠিক এই বাদামগুলোর মতো।

রিয়া হতাশ কণ্ঠে বলল, বাবা বিয়ের কথা ভাবছেন।

আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, (রিয়ার কথা শুনে না, পচা বাদামের কারণে) তোমার মায়ের কী মত?

মাও রাজি।

আমার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পৃথিবীতে হচ্ছেটা কী? সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়া একটা লোক আবার বিয়ে করার কথা ভাবছে। তার প্রথম স্ত্রীও এতে রাজি! একমাত্র কন্যা হতাশ হতেই পারে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, তোমার বাবাকে বোঝাও। এ বয়সে বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে? লোকে কী বলবে? মানে?

এই সমাজে বয়স্ক লোকেরা দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা কেউ ভালোভাবে নেয় না, তাই বলছিলাম।

তুমি, তুমি এমন অসভ্য টাইপের একটা কথা
কী করে বললে? বাবা আবার বিয়ে করবে
কেন?

তুমিই তো বললে, উনি বিয়ের কথা ভাবছেন।
গাধা, বাবা আমার বিয়ের কথা ভাবছেন।
ও। মেয়ের বিয়ের কথা তো বাবাই ভাববেন।
পাশের বাসার আঙ্কেল ভাবলে না হয় অবাক
হতাম।

দেখ, আমার সঙ্গে রাজনীতি করবা না। বিয়ের
কথা বাবার সামনে গিয়ে বলতে পারবে?
তোমাদের বাড়িতে দোনলা বন্দুক আছে?
না।

তাহলে পারব। এটা কোনো ব্যাপারই না।
সমস্যা হলো, তোমার বাবাকে না হয় বললাম,
কিন্তু আমার বাবাকে কী করে বলব? বাবার যে
রাগ, নিশ্চিত হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।
তুমি বলেছিলে ওনার হাটে কোনো সমস্যা নেই।
তাতে কী? আমার তো আছে।

ওফ। তোমার মতো গাধাকে কেন যে আমার
ভালো লাগল তা ভাবলেই অবাক লাগে।

বলো কী! আমারও অবাক লাগে! কী মিল!
মিল বুঝি না। তুমি আজই তোমার বাবার সঙ্গে
কথা বলবে।

অসম্ভব। বাবার একটা লাইসেন্স করা বন্দুক
আছে। প্রতিবছর জঙ্গলে গিয়ে পশুপাখি শিকার
করেন। এ বছর এখনো শিকারে যাননি। বিয়ের
কথা বললে নিশ্চিত আমাকে গুলি করবেন।
আমি পারব না। তারচেয়ে চলো খাজাবাবা বা
অন্য কোনো বাবার লাইনে চলে যাই। তাঁদের
আশীর্বাদে আমি বাবার সামনে দাঁড়ানোর সাহস
অর্জন করতে পারব।

কী যে তুমি বলো। ওসব লাগবে না, চলো।
আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আজই
বলবে। রিয়াকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে
পারলাম না। আমি না গেলে নাকি সে একাই
যাবে। তা কি হয়? একটা দায়িত্ব আছে না।
রাজি হতেই হলো। বাবাকে যা বলব, তা একটা
কাগজে লিখে নিলাম। রিয়া অবশ্য মানা
করছিল, তবে আমি পাত্তা দিলাম না।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও কাগজে লেখা থাকে। এতে
দোষের কিছু নেই। বহুদিন পর আবার
মুখস্থবিদ্যার চেতনা জেগে উঠল। প্রেম করলে
যে কত কিছু করতে হয়! এর চেয়ে সব

ছেড়েছুড়ে মুসা ইব্রাহীমের মতো এভারেস্টে চলে যেতাম, কোনো ভেজালই হতো না। আমি নিশ্চিত, বাবাকে বিয়ের কথা বলার চেয়ে এভারেস্টে ওঠা অনেক সহজ। দড়ি বেয়ে সোজা উঠে যাব। কোনো ঝামেলা নেই। ধুর, মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আজই বোধহয় আমার জীবনের শেষ দিন। রিয়াকে নিয়ে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা ক্রসফায়ার করবেন। আমি শেষ। পার্কে বসে আর বাদাম খাওয়া হবে না। নিজেই বাদাম হয়ে যাব। পত্রিকায় খবর বেরোবে, প্রেমের করুণ পরিণতি, পিতার গুলিতে পুত্র খুন!

বাসার যত কাছে আসছি, টেনশন তত বাড়ছে। মনে হচ্ছে, এখনই দৌড়ে পালাই। কিন্তু রিয়া আবার শক্ত করে আমার হাত ধরে রেখেছে। কী বিপদ!

বাড়ির ঠিক সামনে এসে মনে হলো, রিয়াও ভয় পাচ্ছে। নিজেকে সাহসী প্রমাণের এই সুযোগ। আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি না? দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। উঠোনের চেয়ার খালি। তার মানে বাবা ঘরে। ভেতরের দিকে এগোতেই ঘর থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন। হাতে বন্দুক। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। বাবা বজ্রকণ্ঠে বললেন, আয়, তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম...

এখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার কোনো মানেই হয় না। কাগজপত্র ফেলে ঘুরে দৌড় দিলাম। বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে হঠাৎ খেয়াল হলো, রিয়া আমার সঙ্গে নেই। কী আশ্চর্য, ও বলেছিল চিরদিন আমার সঙ্গেই থাকবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব শেষ। আহা! বড় ভালো মেয়ে ছিল। শুধু খরচ একটু বেশি করত, এই যা। রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি চলে এলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, উঠোনের চেয়ারে বসে বাবা আর রিয়া চা খাচ্ছে! আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। রিয়া তো দেখছি ডেঞ্জারাস মেয়ে! বাবাকেও কায়দা করে ফেলেছে। আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বন্দুকটা বাবার পাশেই আছে। ঘুরে আবার দৌড় দেব কি না তা ভাবছি, বাবা বললেন, এভাবে দৌড় দিলি কেন? আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। বহুকষ্টে বললাম, 'বন্দুক'।

অনেক দিন বন্দুকটা পরিক্ষার করা হয় না, তাই
বের করেছিলাম। তুই দৌড় দিলি কেন?

না মানে...দৌড় ভালো ব্যায়াম!

চোপ! পাঁচ লাইনের একটা লেখায় চারটা বানান
ভুল! এই লেখাপড়া শিখেছিস?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। বাবা রিয়ার
দিকে তাকিয়ে বললেন, বানানগুলোর সঙ্গে এই
গাথাটাকেও একটু ঠিকঠাক করে দিয়ো। পারবে
না?

রিয়া লাজুক মুখে মাথা নাড়ল। মানে সে
পারবে। আমারও তাই ধারণা। যে মেয়ে বাবার
সঙ্গে বসে হাসিমুখে চা খেতে পারে, তার কাছে
আমাকে ঠিক করা কোনো ব্যাপারই না। আর
আমিও এমন গাথা, শুধু শুধু বাবাকে ভয় পাই।
বাবা মানুষটাকে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু
নেই। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২০,
২০১১

608) ঢুকিঢাকি - শরিফুল ইসলাম ডুইয়া

তাগড়া জওয়ান টিটু। তাকে নিয়ে নানা কথা।
মা বলেন, ‘পোলাডা এক্কেরে সিধা।’ পড়শিরা
বলে, ‘তলি ছাড়া বেঞ্চল।’ এ নিয়ে টিটুর অবশ্য
মাথাব্যথা নেই। সে আছে তার মতন। তার
বন্ধুরা অনেকেই বিয়ে করেছে। তারা এক পাক
করে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসে, আর গল্পের ছালা
ঝাড়ে টিটুর সামনে। সেই গল্পের চোটে টিটু
বেচারিা দিশেহারা। মুরগির ইয়া বড় বড় রান
ভাসে চোখে। থালা ভরা সাজানো দই হাতছানি
দেয়। ঠিক থাকা দায় টিটুর। জিবের জল
সামলে সে উতলা হয়ে বলে, ‘যাব রে, আমিও
শ্বশুরবাড়ি যাব!’

কিন্তু বললেই তো আর হলো না। শ্বশুরবাড়ি
টিটু পাবে কোথায়? সে তো বিয়েই করেনি।
মাকে গিয়ে ধরে টিটু। রীতিমতো হামলে পড়ে,
‘আমারে জলদি বিয়া করাও, মা। আমি
শ্বশুরবাড়ি গিয়া দাওয়াত খামু। হাবলু, বিশা,
রতইন্না বারবার শ্বশুরবাড়ি যায়, আর পেট
ভইরা খাইয়া আইসা নাকের সামনে টেকুর
ছাড়ে। এই সব সহ্য করা যায়?’

অস্থির টিটুকে এখন সামলাবে কে? বড় ভাই
এগিয়ে আসেন। টিটুকে তিনি বোঝান, ‘বিয়া
তো চাইলেই ছুট কইরা হয় না। সময় লাগে।
তোরা দাওয়াত খাইতে মন চায়, আমার

শ্বশুরবাড়ি যা। ওরা দিলদরিয়া মানুষ। খাতির-
যত্ন কম হইব না।’

টিটু এতেই রাজি। আরে, শ্বশুরবাড়ি একটা
হলেই হলো। তোফা ভোজ নিয়ে কথা। এক
সকালে বেশ ফুরফুরে মেজাজে বড় ভাইয়ের
শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হয় টিটু। যাওয়ার
সময় মা পইপই করে বলে দেন, ‘পথে যে যা
কইব, তা-ই বিশ্বাস করবি না। ভাইবা দেখবি,
কথাটা ঠিক কি না।’ টিটুর পকেটে কিছু টাকা
গুঁজে দিয়ে তিনি বলেন, ‘ইষ্টি বাড়ি যাইতাছস,
পথে কিছু কিনা লইস।’

টিটু বলে, ‘কী কিনমু?’

‘এই টুকিটাকি কিছু।’

‘আইচ্ছা, লমুনে।’ এই বলে বেরিয়ে পড়ে টিটু।

হঠাৎ মনে পড়ে, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, পাড়ার
বন্ধুদের না দেখিয়ে গেলে কি হয়? ডাঁট
দেখানোর এমন উমদা মওকা হাতছাড়া করা
ঠিক হবে না। এক জায়গায় জটলা করে আড্ডা
দিচ্ছিল বন্ধুরা। সে ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে
হনহনিয়ে যেতে লাগল তাদের সামনে দিয়ে।
বন্ধুদের তা নজর এড়াল না। এক বন্ধু জানতে
চাইল, ‘এমন মচমচিয়ে যাস কই?’

টিটু বেশ মুড মেরে বলে, ‘শ্বশুরবাড়ি।’

বন্ধুরা ভাবে, হাবলা টিটু রসিকতা করছে।

তারাও পাল্টা রসিকতা করে, ‘শ্বশুরবাড়ি যাস,
তা সাজগোজ কই? মুখে রং কই? মুখে রং না
মাইখা কেউ শ্বশুরবাড়ি গেছে, শুনি নাই।’

টিটু ভাবে, মুখে রং মেখে যাওয়াই বুঝি
শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ। সে চট করে
দোকান থেকে কিছু লাল রং কিনে নেয়। এবার
হুঁশ হয়, ও বাড়ির জামাই তো আসলে সে নয়,
বড় ভাই। তার কি রং মেখে যাওয়া ঠিক হবে?
এ নিয়ে দোনোমনায় ভোগে টিটু। এদিকে টাকা
দিয়ে কিনেছে রং, ফেলেও দিতে পারছে না। সে
জানে, রং পকেটে রাখাটা বিপজ্জনক। বুবুর
বিয়ের সময় দুলাভাইকে রাঙাবে বলে এক
পুরিয়া রং পকেটে রেখেছিল সে। কাগজের
পুরিয়া ঘামে ভিজে শেষে নিজেই নাকালের
একশেষ। কিন্তু ঘটে বুদ্ধি থাকতে টিটুকে
আটকায় কে? সে তার ঘন চুলের ভেতর রঙের
পুরিয়া গুঁজে রাখে।

ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে টিটুর
খেয়াল হয়, মা ওকে টুকিটাকি নিয়ে যেতে

বলেছেন। এই যাহ্, মাকে তো জিজ্ঞেস করা হলো না—টুকিটাকি জিনিসটা কী? সে রাস্তার পাশে এক দোকানে গিয়ে দোকানিকে বলল, ‘ও ভাই, আপনার দোকানে টুকিটাকি আছে?’ দোকানি চালু মাল। সহজেই টের পায়, খদ্দেরের ঘটে ঠঠন্। সে রাস্তার ওপারে খানিকটা দূরে খেতের পাশে বড়সড় এক জলাশয় দেখিয়ে বলে, ‘ওইহানে অনেক টাকি মাছ আছে। ওইগুল্যান ডুব দিয়া টুকাইয়া লন। টুকাইয়া যে টাকি পাওয়া যায়, এইডাই তো টুকিটাকি।’ দোকানির বুদ্ধির বহরে টিটু ধন্য। মনে মনে তাকে বাহবা দেয় সে। ছাত্রজীবনে অঙ্ক আর বিজ্ঞানে বরাবরই নাস্তানাবুদ হয়েছে টিটু। এ কারণে গণিতবিদ আর বিজ্ঞানীরা তার দুই চোখের বিষ। এর মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দ করে সে আইজ্যাক নিউটনকে। মনে মনে তাঁর উদ্দেশে টিটু বলে, ‘এই দোকানি আপনার সময় জন্মাইলে ভাতে মরতেন।’

শার্ট-প্যান্ট খুলে শুধু জাঙিয়া নিয়ে জলে নেমে পড়ে টিটু। কোমর-জলে ঝাপঝাপ ডুব দিয়ে টাকি খুঁজে বেড়ায়। এদিকে তার চুলের ভেতর লুকানো রং পানিতে ভিজে ছড়িয়ে একাকার। পাশের এক খেতে মাটির ডেলা কুড়াচ্ছিল এক বুড়ো চাষি। বাড়িতে লেপা-পোছার কাজে লাগাবে। ভরদুপুরের রোদে রং-মাখা তাগড়া যুবককে পানিতে বারবার ডুব দিতে দেখে সে ঠাওরাল, নির্ঘাত বায়ু চড়েছে মাথায়। কিন্তু এভাবে ডুব দিতে দিতে তো কাহিল হয়ে পড়বে বেচারা। সে তড়িঘড়ি ডেলাগুলো গামছায় বেঁধে জলাশয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, ‘ও বাবা, এইভাবে বারবার ডুব দিতাছ ক্যান? কী খোঁজো?’

টিটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ‘টাকি মাছ খুঁজি। টুকাইনা টাকি জড়ো করলে টুকিটাকি হইব। ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি নিতে হইব। মায় নিতে কইছে।’

বুড়ো টের পেল, সে যা ভেবেছে ঠিক তা-ই। যুবকের মাথার নাটবোল্ট সব টিলা। মায়া হলো বুড়োর। সে বলল, ‘এই পগারে টাকি দূরে থাইক, একখান তিত পুঁডিও নাই।’

ডুবাডুবি ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় টিটু। হতাশ কণ্ঠে বলে, ‘কিন্তু আমার তো টুকিটাকি না হইলে চলব না।’

বুড়ো ভাবে, বেকুব বেটাকে আগে জল থেকে বাঁচানো যাক। সে ডেলার পোঁটলা দেখিয়ে বলল, ‘টুকিটাকি পানিতে থাকে কে কইছে তোমারে? এই পোঁটলাডা দেখতাছো, এর মইধ্যে আছে টুকিটাকি। এইডা লইয়া যাও।’

খানিক পর ডেলার পোঁটলা নিয়ে বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাজির রং-মাখা টিটু। তাকে দেখে সে বাড়ির সবাই আতঙ্কিত। এ আবার কোন্ পাগল! অনেক দিন ওই বাড়িতে না যাওয়ায় তার চেহারা কারও মনে নেই। টিটু যতই বলে, সে এ বাড়ির মেজো জামাইয়ের ছোট ভাই, বাড়ির লোকজনের সন্দেহ তত বাড়ে। গোল বাধায় টুকিটাকির পোঁটলাটা। সবাই এবার নিশ্চিত হয়, পাগল না হলে কেউ কুটুমবাড়ি মাটির ডেলা নিয়ে যায়! উত্তম-মধ্যম খেয়ে দৌড়ে পালায় টিটু।

সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফেরে বিধবস্তু টিটু। রং-মাখা টিটুকে দেখে আপনজনেরা ভাবেন, ও-বাড়িতে খুব ফুটি হয়েছে। বড় ভাই দাঁত বের করে বলেন, ‘তা খাওয়া-দাওয়া কেমন হইল রে, টিটু?’

টিটু গাল ফুলিয়ে বলে, ‘খুব ভালো হইছে। এমুন খাবার জন্মেও খাই নাই।’

‘তা, কী কী খাইলি?’

‘কিল, ঘুসি, ঝাঁটা...!’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২০, ২০১১

609) ঈশপের অপ্ৰচলিত গল্প - একটি উইল

Aesop (বা Aisopos) পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিস্টাব্দে তাঁর গল্পের জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, তিনি মিসরের ফারাও আমাসিসের সময়কার লোক। সামস দ্বীপে বাস। ওখানেই ইয়াডমন নামে এক নাগরিকের ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। তবে অনেকের মতে, ঈশপ ছিলেন ওই ইয়াডমনের আত্মীয়। জন্মসূত্রে ঈশপ ছিলেন থ্রেসিয়ান বা ফ্রাইজিয়ান। শোনা যায়, ডেলফিয়ার এক মন্দির থেকে একটি বাটি চুরির অপরাধে ডেলফিয়ারাসী তাঁকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে হত্যা করে। অ্যারিস্টোফেনেসের মতে, মন্দিরের বাটিটি ঈশপের ঝোঁলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চোর অপবাদে তাঁকে হত্যা করা হয়। ঈশপ দেখতে ছিলেন কদাকার কিন্তু বুদ্ধিতে ছিলেন

অপরাজেয়, রঙ্গরসে অদ্বিতীয়। তিনি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আর তোতলামি করে শোনাতেন তাঁর শিক্ষাপ্রদ অমর কাহিনিগুলো। একদঙ্গল লোকের চেয়ে একটি লোকের দাম অনেক। সেই কথাটা জানানোর জন্যই এই গল্প—

এক ভদ্রলোক তাঁর তিন মেয়ে রেখে মারা গেলেন। তাদের মধ্যে এক মেয়ে বেপরোয়া, তবে সুন্দরী। সে কটাক্ষপাতে অনেক পুরুষকেই ঘায়েল করে থাকে। দ্বিতীয় মেয়েটি খুব হিসাবি, চরকায় উল বুনতে জানে। তৃতীয়টি একটি মদের পিপে, আর দেখতেও ভালো নয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে উইলের অছি বা ট্রাস্টি নিযুক্ত করে গেছেন। তাতে নির্দেশ দেওয়া আছে, তাঁর সম্পত্তি এমন সমানভাবে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে তারা তাদের ভাগের সম্পত্তি নষ্ট না করতে পারে। আর একটি শর্ত, যদি মেয়েরা সম্পত্তি না রাখতে চায়, তবে তারা প্রত্যেকে তাদের মাকে হাজার টাকা করে দেবে।

এই উইলের খবরটা সারা এথেন্সে ছড়িয়ে পড়ল। মা তো মুশকিলে পড়লেন।

আইনজীবীদের বাড়িতে ঘুরতে লাগলেন তাঁর স্বামীর উইলের বিষয়ে বোঝার জন্য। কিন্তু কেউ কোনো হদিস দিতে পারলেন না। সত্যিই তো, মেয়েরা যদি সম্পত্তি না চায় বা সেই সম্পত্তি ভোগ না করতে পারে, সে ক্ষেত্রে এমন কোনো নগদ টাকার ব্যবস্থা নেই, যা দিয়ে তারা মায়ের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারবে।

অনেক দিন অনেক রকম চিন্তাভাবনা করেও যখন ওই উইলের মর্মার্থ বোঝা গেল না, তখন মা ঠিক করলেন, তাঁর ইচ্ছামতোই তিনি এই সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

তিনি সম্পত্তির হিসাব করতে বসলেন।

মা তাঁর বেপরোয়া সুন্দরী মেয়েটাকে দিলেন ভালো ভালো পোশাক, দামি অলংকার আর সেই সঙ্গে কাজের জন্য খোজা আর বালক ভৃত্যদের। তাঁর খাটিয়ে আর হিসাবি মেয়েকে দিলেন জমিজমা, গরু-ভেড়া, খামার বাড়িটা, লাঙল-বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, চাষি ইত্যাদি।

আর মাতাল, দেখতে ভালো নয় মেয়েকে দিলেন মদের ভাঁড়ার, পিপেভর্তি আঙুরের মদ, একখানা বড় বাড়ি বাগানসমেত।

মা যখন পাড়াপড়শি ও আত্মীয়স্বজনের মতামত

নিয়ে এভাবে মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, সে সময় সেই লোকজনের মধ্যে দেখা গেল ঈশপকে।

ঈশপ সব শুনে বললেন, ‘এ তোমরা কী করছ? ভদ্রলোকের উইলের মর্ম তোমরা কেউ বুঝতে পারনি। হয়তো ভদ্রলোক এই কাণ্ড দেখে তাঁর কবরের মধ্যে নড়েচড়ে দুঃখ প্রকাশ করছেন।’ ‘তাহলে কী করা হবে?’ সবারই প্রশ্ন। সবাই অবাক।

‘এ তো অতি সোজা কাজ।’ ঈশপ বললেন, ‘বাগানসমেত ওই বড় বাড়িখানা, মদের ভাঁড়ার ওই হিসাবি খাটিয়ে মেয়েটিকে দেওয়া হোক। সাজ-পোশাক, হীরা-মুক্তা-অলংকার, দাসদাসী সব দেওয়া হোক দেখতে ভালো না মাতাল মেয়েটিকে। আর জমিজমা, পশুর পাল, লাঙল ইত্যাদি দেওয়া হোক ওই সুন্দরী বেপরোয়া মেয়েটিকে। তাহলে এতে তিন মেয়ে তাদের স্বভাব অনুযায়ী ওই রকম সম্পত্তি পাওয়া পছন্দ করবে না। দেখতে ভালো নয় মাতাল মেয়েটি সাজপোশাক সব বিক্রি করে দেবে মদ কেনার জন্য। সুন্দরী মেয়েটি জমিজমা বিক্রি করবে সাজপোশাকের জন্য। আর হিসাবি খাটিয়ে মেয়েটি বড় বাড়ি, বাগান সব বিক্রি করে চাষবাসের জমি কিনবে।

অতএব, যে মেয়ে যা পেয়েছিল কিছুই রাখবে না। যার যার জিনিস বিক্রি করে নগদ টাকা জোগাড় করবে, আর তা থেকে তাদের মাকে তাঁর প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবে।

সারমর্ম:বুদ্ধিমানই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ভাষান্তর: কুশ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২০, ২০১১

610) স্পর্শ - অমূল্য দাশগুপ্ত

আর পনেরো ষোলো হাত গেলেই তীর পান, এমন সময়ে চকিতের মতো একটা কথা তাঁহার মনে হইল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম শিহরিয়া উঠিলেন। কতকটা কণ্ঠে এবং কতকটা ইঙ্গিতে কুম্মারাপ্লাকে প্রশ্ন করিলেন, দড়িটা কত হাত? পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম একেবারে মরিয়া গেলেন।

অপরাধ তাঁহার নয়। তিনি আত্মরক্ষা করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবেককে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া দেহকে অনাহত রাখিতে পারেন নাই। দুই

দিক একসঙ্গে সামলাইবার সামর্থ্য যদি বিধাতা তাঁহাকে না দিয়া থাকেন, সে ত্রুটি বিধাতার। বিধাতার ত্রুটি, এমন কথা বলিবার সাহস অবশ্য সকলে রাখে না। তাহারা বলিবে, দোষ সমস্তটাই কুম্মারাপ্লার। সে যদি অমন অতর্কিতে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত না হইত, তবে দুর্বিপাকটাও ঘটিত না।

ব্যাপারটা ঘটয়াছিল এইরূপ। প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম একটি ঘটি ও একটি দাঁতনকাঠি হাতে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। দেহশুদ্ধি সমাধা করিয়া তিনি নদীর জলে নামিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। তারপর মৃদুস্বরে গীতার দশম অধ্যায় আবৃত্তি করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইলেন।

নদীর পাড় ধরিয়া পথ। বেদনাং সামবেদোহস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী—বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে পথের বাঁক ঘুরিয়া কুম্মারাপ্লা দেখা দিল।

পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি শুদ্ধাচারী শুদ্ধবংশসম্ভূত নম্রুদ্রি ব্রাহ্মণ। কুম্মারাপ্লা পারিয়া শূদ্র। শাস্ত্রমতে তাঁহার নিকটস্থ হইবার অধিকার কুম্মারাপ্লার নাই।

এই নিষেধ একদিনের নহে, চির আচরিত বিধি। তিন হাজার সাত শত পঁচাশি বৎসর পূর্বে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমের দ্বাদশশতাব্দের ত্রিপঞ্চাশ পিতামহ স্বজাতীয় আর্যসেনার সহিত দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিলেন। তিন হাজার সাত শত পঁচাশি বৎসর পূর্বে দ্রাবিড় কুম্মারাপ্লার দ্বাদশশতাব্দের ত্রিপঞ্চাশ পিতামহ সেই অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের সেই সাধু প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চাহিয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার ও তাহার বংশের যে যেখানে জন্মগ্রহণ করিবে সকলেরই আত্মা কলুষিত। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম যে স্থানে থাকিবেন তাহার আশি হাতের মধ্যে কুম্মারাপ্লা আসিতে পারে না। আসিলে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমকে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

অসময়ে অবহেলায় স্নান করা তাঁহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নয়। তাই কুম্মারাপ্লার গলায় একটা ঘণ্টা বুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন দূর

হইতেই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম সতর্ক হইতে পারেন।

কুম্মারাপ্লাকে দেখিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম দ্রুতকৃত করিলেন। ঘণ্টার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। দূর হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিলেন কুম্মারাপ্লার গলায় ঘণ্টাটি বাঁধা আছে। তাহার দোলকটি কোনো প্রকারে আটকাইয়া গিয়া থাকিবে, ঘণ্টার শব্দ হইতেছে না।

কুম্মারাপ্লা আকাশ ও নদীর দিকে চাহিয়াছিল। দ্রুতকৃত কবিতানন পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমকে সে দেখিতে পাইল না। অসঙ্কোচগতিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নদীর চরায় তাহার নৌকাটি তোলা রহিয়াছে, ঝড় আসন্ন, তাহার দৃষ্টি তাই নদীর দিকে।

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিতেছিল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলিয়া ব্যবধানটুকু মাপিয়া দেখিতে লাগিলেন। ব্যবধান আশি হাতের কম হইলেই স্পর্শদোষ ঘটবে। তাঁহাকে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মাঘ প্রভাতের দুরন্ত শীতে তাঁহার স্নান করিবার উৎসাহ ছিল না।

কুম্মারাপ্লা অগ্রসর হইতেছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমও এক পা এক পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিলেন।

মাথার পিছনে বুদ্ধিহীন বিধাতা চক্ষু দেন নাই, হটিতে হটিতে ক্রমে তিনি নদীর কিনারায় গিয়া পড়িলেন। তারপর আর এক পা হটিতে যাইয়া একেবারে খাড়া পাড় ডিঙাইয়া নদীতে পড়িয়া গেলেন। পড়িতে পড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চীৎকার কুম্মারাপ্লার কানে গেল। ব্যস্ত হইয়া সে নদীর কিনারায় ছুটিয়া আসিল। ঝুঁকিয়া দেখিল, পণ্ডিত বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম প্রখর স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। কুম্মারাপ্লা চীৎকার করিয়া কহিল, ভয় নাই। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কুম্মারাপ্লা সত্যই বলিয়াছে, ভয় নাই। তখন কুম্মারাপ্লা ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান অনূন দুই শত হাত।

আশি হাতের কম হইলেই স্নান করিতে হইত।
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর
বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম আরেক ঢোক জল
খাইলেন।

কুম্মারাপ্পা নদীর তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল।
পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম
প্রাণপণে ডাকিয়া কহিলেন, দেখিস বেশি কাছে
আসিস না।

সে ক্ষীণ কণ্ঠ কুম্মারাপ্পা শুনিতে পাইল না।

যেখানে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর
ভেঙ্কটনারায়ণম ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাহা
ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া সে দাঁড়াইল।
তাহার কোমরে মস্ত বড় একটা দড়ির বাণ্ডিল
ছিল—তাহার নৌকার গুণদড়ি, সেই দড়ি খুলিয়া
সে একটা দিক নদীর মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অব্যর্থ
লক্ষ্য। দড়িটা একেবারে পণ্ডিত রামেশ্বর
বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমের গায়ে গিয়া
পড়িল। প্রাণপণে সেটাকে তিনি আঁকড়াইয়া
ধরিলেন।

কুম্মারাপ্পা আবার চীৎকার করিল, ভয় নাই।
তীরের ওপরে একটা বাবলাগাছ। তাহার গায়ে
ভর রাখিয়া কুম্মারাপ্পা ধীরে ধীরে দড়ি টানিতে
লাগিল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর
ভেঙ্কটনারায়ণম তীরের দিকে অগ্রসর হইতে
লাগিলেন।

অগ্রসর হইতে হইতে পণ্ডিত রামেশ্বর
বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম মুখ তুলিয়া
চাহিলেন। কথা বলিবার শক্তি নাই, হস্তের
ইঙ্গিতে কুম্মারাপ্পাকে বলিলেন, সরিয়া যাও।
কুম্মারাপ্পা বুঝিল। গাছের গায়ে দড়ি ঠেকাইয়া
সে টানে টানে পিছনে হটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে
সেই শীতে স্নান করাইয়া তাহার কোনো লাভ
নাই। ক্রমে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর
ভেঙ্কটনারায়ণম তীরের নিকট আসিয়া পড়িলেন।
চাহিয়া দেখিলেন, কুম্মারাপ্পা নদীর তীর ধরিয়া
চলিতেছে।

আর পনেরো ষোলো হাত গেলেই তীর পান
এমন সময়ে চকিতের মতো একটা কথা তাঁহার
মনে হইল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর
ভেঙ্কটনারায়ণম শিহরিয়া উঠিলেন। কতকটা
কণ্ঠে এবং কতকটা ইঙ্গিতে কুম্মারাপ্পাকে প্রশ্ন
করিলেন, দড়িটা কত হাত?

কুম্মারাপ্পা কহিল, তিয়াত্তর হাত।

হা অদৃষ্ট!

কপালে করাঘাত করিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর
বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম দড়ি ছাড়িয়া
দিলেন। দিয়াই জলে তলাইয়া গেলেন।
শাস্ত্রবচন হইতে দড়ি সাত হাত খাটো
পড়িয়াছিল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেই সাত
হাতের ব্যবধান পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর
ভেঙ্কটনারায়ণম পার হইতে পারিলেন না। [ঈষৎ
সংক্ষেপিত]

অমূল্য দাশগুপ্ত—ভারতীয় লেখক। জন্ম: ১৯১১,
মৃত্যু: ১৯৭৩

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৭, ২০১১

611) অগ্রিম পেমেন্ট - মিথাইল জডানেংস্কি

আমাদের বুঝতে চেষ্টা করুন। উন্নত দেশগুলোর
কাছ থেকে আমরা সাহায্য চাই না, চাই
সহযোগিতা। তা কীভাবে ঘটে থাকে, সেটা
বুঝিয়ে বলি।

আপনারা টাকা দেবেন, আমরা সমান অধিকার
নিয়ে অংশগ্রহণ করব। অর্থাৎ আমাদের সমস্যা
বিষয়ে আমাদের মতামত পেশ করব। আপনারা
শুধু শুধু টাকা দিচ্ছেন, তা কিন্তু নয়! বদলে
আপনারা পাচ্ছেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

এই যেমন এই রেস্টুরেন্টে। আমরা আপনাদের
নিমন্ত্রণ করেছি, আপনারা বিল পরিশোধ
করবেন এবং বদলে খাদ্য পাবেন। তবে
আমাদের মনোযোগ ও পরামর্শ থেকে আমরা
আপনাদের বঞ্চিত করব না। এ ক্ষেত্রে
আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আসলে অমূল্য।
কারণ এখানেই আমাদের বসবাস। আমাদের
সাম্প্রতিক অর্থনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য—
অকপটতা।

হ্যাঁ, আজ আমরা আপনাদের টাকায়
আপনাদেরই খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপনাদের
আপ্যায়ন করছি। পরিবর্তে আপনারা আমাদের
কাছ থেকে পাচ্ছেন এর চেয়ে অনেক বেশি
মূল্যবান কিছু—বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ,
এমনকি বলা যায়, পূর্বাভাস।

শুধুই কি তাই? সেই সাহায্যকেই আমরা
শ্রেয়তর মনে করব, যে সাহায্যের পরে
অবধারিতভাবে প্রয়োজন হবে আরেকটি
সাহায্যের। আগেরটির চেয়ে জোরালো ও
দীর্ঘমেয়াদি।

অর্থাৎ, কথা হচ্ছে সেই সাহায্য বিষয়ে, যা আপনারা আমাদের দিতে পারেন, তবে এর জন্য আপনাদের সংগ্রাম করতে হবে আরও কিছু সঙ্গে।

ঠিক এটাই, আবারও উল্লেখ করি, আমাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে—সারকথা। আরও একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমাদেরকে সাহায্য করার অধিকার অর্জনের জন্য আপনাদের দেওয়া প্রথম ইনস্টলমেন্টের টাকাটা একেবারেই তুচ্ছ সেই সংগ্রামের তুলনায়, যার মুখোমুখি আপনাদের হতে হবে দুই-তিন বছর পর আমাদেরকে সত্যিকারের সাহায্য করার অধিকার অর্জন করতে।

আমরা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে সবকিছুই গ্রহণ করতে পারি।

ওষুধ থেকে শুরু করে টাকা পর্যন্ত, সব। এ ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্য সীমাহীন। আমরা আপনাদের কাছ থেকে চলচ্চিত্র নেব, নেব টিভি প্রোগ্রাম, এমনকি ‘আমাদের সঙ্গে থাকুন’ বাক্যটিও।

এ ছাড়া ওপরে উল্লিখিত সবকিছু বাস্তবায়নের জন্য টাকাও আমরা নেব। এবং সেটা হবে সূচনামাত্র। আমাদের সাহায্য করার অধিকার আদায় করতে আপনাদের আরও সংগ্রাম করতে হবে।

মূলত আমাদেরই সঙ্গে। শুরুর দিকে। আমাদের ‘মেন্টালিটি’। দেখেছেন, শব্দটা কিন্তু আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছি। তো যা বলছিলাম, আমাদের মেন্টালিটি এমন যে, আপনাদের দেওয়া সাহায্য গ্রহণে তা সম্মতি দেয় শুধু সেই ক্ষেত্রে, যদি আপনাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া আমাদের গালিগালাজ ও অভিশাপ আপনারা কৃতজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করেন। আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে, ভিসা বাতিল করে, আপনাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে, মুনাফা করার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং আমাদের নব্য ধনীদেব অস্ত্রের মুখোমুখি করিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের ভারসাম্য আনব।

যা বলছি, বুঝতে পেরেছেন?

এটা হবে আপনাদের জন্য উদ্দীপকের মতো, যা আপনাদের আমাদের দেশি বাজারে ঢুকতে

সাহায্য করবে। আর আমাদের বাজারটা কিন্তু বিশাল!

তাই বলি, টাকা আনুন। আনুন ট্রাকভর্তি খাদ্যদ্রব্য। প্রতিদান হিসেবে আমাদের দাবি থাকবে শুধু একটাই, উন্নত দেশগুলোর সংগঠনে আমাদেরকে গ্রহণ করতে এবং বিশ্বে শান্তিস্থাপন-প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দিতে হবে। ন্যাটো যেন সম্প্রসারিত হতে গিয়ে আমাদের সীমানার কাছে না আসে, সে দাবি করার অধিকার আমাদের থাকবে। অর্থাৎ আপনাদের সংকুচিত হয়ে সম্প্রসারিত হতে হবে। এটা অবশ্য সামরিক ব্যাপারস্যাপার।

আমাদের আরও একটি অধিকার দিতে হবে— আপনাদেরকে হুমকি দেওয়ার। বা সম্ভব হলে প্রথম পারমাণবিক আঘাত হানার।

শুধু কথায় নয়, কাজেও, আমাদের সামরিক শিল্পে আপনাদের অর্থ বিনিয়োগের পর আমাদের প্রস্তাবিত পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে, যাতে আমরা হানতে পারি প্রথম আঘাত। এবং আকস্মিক। এটাই আমাদের শর্ত। ও, হ্যাঁ, আর নয় বিলিয়ন ডলার অগ্রিম পেমেন্ট। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৭, ২০১১

612) অভিনয় - জেমস প্যাটিনসন

আমি জাহাজের ‘পারসার’। সব রকম খরচাপত্তর আমার হাত দিয়ে হয়। জাহাজে থাকাকালীন যাবতীয় লোকের ব্যাংকার আমি। এই জাহাজে এবার যাচ্ছেন তরুণ আর্ল ম্যাকলাউড। ইনি কোটিপতি হেনরি ম্যাকলাউডের একমাত্র সন্তান। হঠাৎ দেখি, এই জাহাজেই চলেছে সেই সুযোগসন্ধানী রবিনসন পরিবার। বড়লোকের গন্ধে গন্ধে গোড়া থেকেই হাজির। মি. ও মিসেস রবিনসন ও তাঁদের মেয়ে প্যাটসি। সে এখন বেশ সুন্দরী তরুণী হয়েছে। ছোটবেলায় হাত সাফাইয়ের কাজে দু-একবার ধরাও পড়েছিল। বুঝলাম, বেচারী ম্যাকলাউড অনতিবিলম্বে হবেন এই প্যাটসির শিকার। অনুমান আমার নির্ভুল হলো। দেড় দিন কাটতে না কাটতেই দেখি, তরুণ আর্লের কণ্ঠলগ্না হয়েছে বিড়ালান্ধী পেলবান্ধী প্লাটিনাম-চুলী প্যাটসি। না বলে আর পারলাম না। বড়শিবিদ্ধ তরুণ ম্যাকলাউডকে আড়ালে ডেকে বললাম,

‘ইয়ংম্যান, ওই প্যাটসি রবিনসন সম্পর্কে একটু সাবধানে থাকবেন।’

আমার কথা শুনে বললেন, ‘তুমি দেখছি ঠিক আমার বুড়ো বাপটার মতো। তুমি কি ভাবো, এখনো আমার নিজের ভালো-মন্দ বোঝার বয়স হয়নি? আমার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না তোমার।’

ক্রমে জাহাজ এসে পৌঁছাল সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুর থেকে তরুণ ম্যাকলাউড জাহাজে এবার প্রেমে পড়লেন গ্লোরিয়া রাইটের। সে কন্যাও উপযুক্ত। বাপ-মায়ের লাইনেরই। বরং আরও বেশি মারাত্মক। তার রূপ ফেটে পড়ছে। নিখুঁত ফিগার।

ম্যাকলাউড শেষে প্যাটসিকে ছেড়ে গ্লোরিয়ার দিকে ঢলে পড়লেন। আমি আরেকবার চেষ্টা করলাম তাঁর জ্ঞান ফেরাতে। কিন্তু তিনি আবার আমাকে শাসিয়ে বললেন, ‘খারাপ হয়ে যাবে, বুড়ো! আমার ব্যাপারে নাক গলিয়ো না।’

কয়েক দিন পর হঠাৎ একদিন সকালে মি. রাইট শুকনো মুখে আমার কেবিনে এসে হাজির। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে বললেন, ‘এখনই আমাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে হবে।’

বললাম, ‘এখনই দিচ্ছি, স্যার। কারণ জিজ্ঞেস করাটা অশোভন, তবু যদি সাহায্য করতে পারি...।’

‘ওই স্কাউন্ড্রেল রবিনসনরা ডার্ট ক্রিমিনাল সব।

যুবক ম্যাকলাউডকে সহজ-সরল ভালো মানুষ পেয়ে ফাঁদ পেতে ব্ল্যাকমেল করছে! তাঁদের মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়ে সুবিধেমতো কয়েকটা স্ল্যাপ নিয়ে এখন টাকা চাইছে। ছি-ছি-ছি।...আচ্ছা চলি, থ্যাংক ইউ।’

হাসি পেল আমার। খেলা তাহলে বেশ জমেছে। হবু জামাইয়ের হয়ে টাকা দিচ্ছেন মি. রাইট।

গত রাতে রবিনসনও গোপনে এসেছিলেন আমার কাছে। ঠিক রাইটের মতোই পাঁচ হাজার পাউন্ড নিয়ে গেছেন। আমি চোখের ইশারায় জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপার কী? উনি ক্রুদ্ধ চাহনিতে বুঝিয়েছিলেন, সেটা আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু বুঝতে আমার কিছুই বাকি রইল না। গ্লোরিয়ার সঙ্গে আপত্তিকর ছবি তুলে রাইটরাও আলকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। তাই ভাবী জামাই আলকে বাঁচানোর চেষ্টা।

ডারহাম আসতেই তরুণ আর্ল ম্যাকলাউড দুটি
বিরিচি ব্যাগ নিয়ে বাজার করতে নামলেন।
প্যাটসি ও গ্লোরিয়া দুজনকে বললেন, ‘ঘুরে
আসছি, প্রিয়ে।’

জাহাজ ছাড়ার পর কিন্তু আর্ল ম্যাকলাউডকে
আর দেখা গেল না। উৎকণ্ঠিত হয়ে রাইট আর
রবিনসনরা বললেন, ‘লোকটা জালিয়াত নয়
তো?’

আমি বললাম, ‘তা কী করে জানব?’

আর্ল ম্যাকলাউড, তুমি খাসা অভিনয় করেছ।
যদিও তুমি আমার নিজের ছেলে, হাড়ে হাড়ে
চিনি, তবু রূপসীদের পাশ্চাত্য পড়োনি
ভাগ্যিস! জেমস প্যাটিনসন: বিখ্যাত এই
রহস্যোপন্যাস লেখক জাতি ব্রিটিশ। লিখেছেন
প্রায় ১০০-এর মতো থ্রিলার। জন্ম-১৯১৫; মৃত্যু-
২০০৯।

অনুবাদ: অরুণোদয় ভট্টাচার্য

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৪, ২০১১

613) প্রতিশ্রুতির পার্থক্য

ঘটনা: কোনো কারণে ছেলে কিংবা মেয়ের
মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: এই! ফোন অফ ছিল
কেন? শরীর খারাপ ছিল? বেশি ঘুমে ধরেছিল,
তাই না? এখন কেমন লাগছে, জান?

প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: এই! তুমি আর জীবনে
আমারে ফোন দিবা না। সারা রাত তোমার
ফোন অফ ছিল। আমি ১০০ বার চেষ্টা করেও
পাই নাই। আর কখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগ
করবা না। রাখলাম ফোন। বাই। ঘটনা: ছেলে
অথবা মেয়ের হয়তো বিপরীত লিঙ্গের কারও
সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: এই, শুনছ? ওই ছেলের
ভাবভঙ্গি বেশি সুবিধার না। সে মনে হয় তোমার
প্রেমে পড়েছে। হা হা হা। যা-ই হোক। ওকে
অ্যাভয়েড করো একটু। ঠিক আছে?

প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: এই মেয়ের সঙ্গে এত কী
শুনি? কোন সাহসে ওই মেয়ে তোমাকে রাতে
ফোন দেয়? লাগবে না আমার সঙ্গে আর কথা
বলা, দেখা করা। ওই মেয়ের সঙ্গেই যাও। ঘটনা:
কোনো একজনের ডেটিংয়ে দেরি করে আসা।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: এই! এতক্ষণ দেরি হলো
কেন? পথে কোনো সমস্যা ছিল? ফোনেও পাই
নাই তোমাকে। টেনশনে আমি ঘামছি, দেখো।

আমার খারাপ লাগেনি? তুমিই বলো। একবার
অন্তত জানাতে পারতাম! তাই না?

প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: এতক্ষণে আসার সময়
হলো? আমি এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি। কোনো
মানে হয় এগুলোর? লাগবে না আর আমার
সঙ্গে দেখা করা। তুমি থাকো তোমার
মতো। ঘটনা: কোনো একজনের শরীর খারাপ
হয়েছে।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: হায় হায়! বলো কী!
কীভাবে? এখন কী অবস্থা? ওষুধ খেয়েছ?
খাওনি! তাড়াতাড়ি ওষুধ খাও। প্লিজ প্লিজ প্লিজ।
প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: কচু কচু কচু। তোমার
মাথা মাথা মাথা। আমি তোমাকে বলিনি, বৃষ্টিতে
ভেজার দরকার নাই? (কান্নাকাটি)। এখন জ্বর
উঠছে। ভালো হইছে। আমার কথা তো শুনবা
না। এখন মরো। ঘটনা: কোনো সমস্যার কথা
কারও একজনের শেয়ার না করা।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: তুমি আমারে এইটা আগে
বলবা না? বললে অন্তত সঙ্গে থাকতে পারতাম।
সাহায্য দিতে পারতাম। তুমিই বলো, পারতাম
না?

প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: ও! আমার সঙ্গে শেয়ার
করবা কেন? আমি তোমার কে? আমি তোমার
কেউ না। আমার সঙ্গে আর প্রেম করতে হবে
না। যার সঙ্গে শেয়ার করবা, তার
সঙ্গেই করো গে, যাও। ঘটনা: কোনো কিছু নিয়ে
বারবার প্রশ্ন করা।

প্রেমিকের প্রতিক্রিয়া: এই, এটা নিয়ে এত প্রশ্ন
করছ কেন, জান? এটা খুব স্বাভাবিক একটা
ব্যাপার। তেমন গুরুতর কিছু না। জাস্ট
রিলাক্স।

প্রেমিকার প্রতিক্রিয়া: কী হইছে, এতবার প্রশ্ন
করছ কেন শুনি? মনে হচ্ছে আমাকে কন্ট্রোল
করছ। রাখলাম ফোন। আর এইটা নিয়ে কোনো
প্রশ্ন করবা না। করলে আমি ফোনটা ধরে
একটা আছাড় মারব। ঠিক আছে? বাই। সূত্রঃ
দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৪, ২০১১

614) মনোরোগ চিকিৎসা - লিওনিদ ইজমাইলভ

বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন,
যাঁরা মদ্যপান করেন? না, না, দাঁড়ানোর দরকার
নেই। বলতে চাইছিলাম যে, তাঁরা আমাকে
ভালোমতো বুঝতে পারবেন। ঘটনা হলো এই

যে একদিন আমার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। নিজের থেকে আমি কস্মিনকালেও যেতাম না। কিন্তু সে যেভাবে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল, ‘চলো না, প্লিজ, চলো! এখন খুব সহজেই এটার চিকিৎসা করা যায়। ট্যাবলেট খাবে, তারপর হিপনোসিস, সবশেষে মনোরোগ চিকিৎসা। ব্যস, আর কখনো মদ খেতে ইচ্ছে করবে না। এমনকি উৎসবের সময়েও।’ ভাবলাম, যাই, মজা দেখে আসি। আমি মদ খেতে চাইব না, এ কখনো হতেই পারে না। আমার পানপীতির মুখোমুখি হলে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিপ্লবও ব্যর্থ হয়ে যাবে। গেলাম একদিন ডাক্তারের কাছে। ঢুকতে না ঢুকতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি সত্যি সত্যি মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে চান?’

আমি বললাম, ‘স্ত্রী চায়।’

‘আর আপনি?’

‘আমি তো চাই না।’

‘একদম ঠিক কথা!’ বললেন তিনি। ‘মনের সুখে মদ খেতে থাকুন।’

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! বলে কী!

‘মনের সুখে মদ খেতে থাকুন!’ এঁর কাছে এলাম কেন তাহলে?

আমি বললাম, ‘নাকি একটু চেষ্টা করে দেখব?’

‘আপনার মাথা খারাপ নাকি,’ ডাক্তার বললেন।

‘কোনো দরকার আছে?’

‘দরকার আছে তো! মদ খাওয়া তো ক্ষতিকর।’

‘এ কী শুরু করলেন! মদ খাওয়া আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে যাবে কেন?’

‘আমার জন্য?’

‘হ্যাঁ।’

‘এই ধরুন, ঠেসে মদ গিলে কখনো কখনো

আমি মারপিট শুরু করে দিই।’

‘ঠিকই করেন। মারপিটই যদি না করলেন,

তাহলে মদ খাওয়ার শান্তিটা কোথায়? স্মৃতি

হিসেবে কিছু থাকা প্রয়োজন।’

‘পরদির সকালে এমনিতেই আমার কোনো কিছু

মনে পড়ে না। ঘুম থেকে উঠে দেখি, চোখের

নিচে কালশিরে দাগ। কে মেরেছে, কখন, কিছুই

মনে করতে পারি না।’

‘সেটাই ভালো বরং,’ ডাক্তার বললেন। ‘মনে

পড়লেই আবার মারপিটের প্রয়োজন দেখা

দিত। আর মারপিট করতে গিয়ে আবার মার

Website: <http://tanbircox.blogspot.com>

খেয়ে আসার আশঙ্কা।’

‘ঠিকই বলেছেন। মাতাল হলে কোনো হুঁশ-জ্ঞান থাকে না আমার। ট্রলিবাসের উদ্দেশেও অশ্লীল গালিগালাজ করতে পারি।’

‘তাতে অসুবিধে কোথায়? মাতাল না থাকলে আপনি তো এটা করতে পারতেন না।’

‘তা ঠিক।’

‘সারা জীবন মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে নাকি!’

‘তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মাতাল হয়ে আমি অনেক সময় রাস্তার ওপরে ঘুমিয়ে পড়ি।’

‘এতেও খারাপ কিছু নেই। খোলা হাওয়ায় শুয়ে ঘুমের মজাই আলাদা। মাতাল না হলে রাস্তার ওপরে কখনো ঘুমোতে পারতেন?’

‘কিন্তু বউ যে পরে রাগারাগি করে!’

‘রাগারাগি করে, কারণ আপনি কম মদ খান। বেশি করে খাবেন এর পর থেকে।’

‘তাহলে কী হবে?’

‘তাহলে বউ আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে।’

বাচ্চাকাচ্চাসহ।’

‘ওদের ছাড়া আমি থাকব কী করে?’

‘কেন! কত আরামের ব্যাপার না? ওরা থাকলে প্রাণখুলে গালিগালাজ করতে পারেন না, কুড়োল হাতে নিয়ে ছোট্টাছুটি করতে পারেন না ফ্ল্যাটের ভেতরে, রাস্তায় ঘুমোতে পারেন না মনের আনন্দে। এখন ভেবে দেখুন, কী শান্তি!

পরিবারে কেউ নেই, তাদের পেছনে টাকা খরচ করতে হবে না। বেতন পেয়ে সে দিনই সব টাকা উড়িয়ে দিতে পারবেন।’

‘কিন্তু তার পরে চলব কীভাবে?’

‘আজ একজনের কাছে কিছু চেয়ে নেবেন, অন্যদিন আরেকজনের কাছে।’

‘যখন কেউ আর দিতে চাইবে না?’

‘তখন ভিক্ষে করা যেতে পারে। ঘুমোবেন তো পিচঢালা পথের ওপরেই। সেই অবস্থায় হাতটা একটু বাড়িয়ে ধরা কি খুব কষ্টের ব্যাপার হবে?’

‘কিন্তু আমার মতো ভদ্রগোছের কাউকে লোকজন পয়সা দেবে?’

‘ভদ্রগোছের? আরে না! তত দিনে আপনার দিকে তাকালেই মানুষের মনে দয়া জেগে উঠবে।’

‘কিন্তু স্বাস্থ্যের কী দশা হবে তখন? মদ খেলে বুড়ো বয়সে ভুলো-মন রোগ হয়, হার্ট অ্যাটাকের

আশঙ্কাও থাকে।’

‘সে ভয় আপনার নেই। আপনি তত দিন
বাঁচবেন না।’

‘তার মানে আমি খুব শিগগির মারা যাব?’

‘না, না, খুব শিগগির কেন! এখনো বহুদিন
বাঁচবেন। অন্তত বছর তিনেক তো বটেই।

চাইকি পাঁচ বছরও হতে পারে।’

‘আর তারপর?’

‘তারপর আর কী! অক্লা যাবেন! মানে, পটল
তুলবেন! তবে তাতে কী! এই দু বছর তো
মনের আনন্দে কাটাবেন।’

‘বউ আমার কবর দেখতেও আসবে না?’

‘কেন আসবে? তার তো তখন অন্য স্বামী
থাকবে।’ আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

ডাক্তারের কেবিন থেকে বের হয়ে চিৎকার করে
বউকে বললাম, ‘আমি তোমাকে দেখাচ্ছি অন্য
স্বামী! তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। মদ খাওয়া
ছেড়ে দেব। এবং তুমি আমার দিকে নজর
রাখবে।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৪,
২০১১

615) স্ট্যাটিস্টিক্স - নারায়ণ দাশগুপ্ত

ইংরেজিতে বলে থাকে মিথ্যা তিন রকম—মিথ্যে,
ডাফ মিথ্যে আর স্ট্যাটিস্টিক্স। আমরা,
স্বভাবত মিষ্টভাষী বাঙালিরা, তেমন করে বললে
পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের ওপর বড়ই অন্যায় করা
হবে। ওই ইংরেজি প্রবচনটির বাংলা অনুবাদ
হওয়া উচিত এই: সত্য তিন রকম—সত্যি,
বউয়ের কাছে তিন সত্যি আর পরিসংখ্যান।
সেই গল্পটা আপনারা সবাই শুনেছেন। সেই যে
দক্ষিণ আফ্রিকার জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী স্মাটস
যখন কালা আদমির চেয়ে সায়েবরা
ক্রমবিবর্তনের ধাপে দু-সিঁড়ি উঁচুতে রয়েছে, এই
তথ্যটা পার্লামেন্টে প্রমাণ করার জন্য জুতসই
স্ট্যাটিস্টিক্স চেয়ে পাঠালেন পরিসংখ্যানের
সেরা পণ্ডিতের কাছে; আর তিন দিন তিন রাত
একনাগাড়ে লাইব্রেরির পর লাইব্রেরি ঘেঁটে শেষ
করেও সেই পণ্ডিত মশাই পরিসংখ্যান কায়দা
করতে পারলেন না; তখন স্মাটস সায়েব যা
করেছিলেন—সেই গল্পটা? বুড়ি বুড়ি সংখ্যার
ফুলঝুরি ফুটিয়ে পার্লামেন্টকে হতবাক করে
তারপর বুড়বাক হয়ে যাওয়া পণ্ডিতের বিস্ময়কে
আশ্বস্ত করেছিলেন উনি এই কথা বলে, ‘আরে

মশায়, আপনিই যে পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না তিন দিন বসে, পার্লামেন্টের সাধ্য কি তিন ঘণ্টার মধ্যে সেই সব বানিয়ে বলা সংখ্যার ভুল ধরবে?’

এ গল্পটা, আমার বিশ্বাস, একেবারেই বানানো গল্প। কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে যত কথা শুনেছেন, তার সবগুলো বানানো নয় তাই বলে।

যেমন ধরুন, যে ভদ্রলোক ভাটার সময় খিদিরপুরের ছোটগঙ্গা হেঁটে পেরোতে গিয়ে সে বছর ডুবে মারা গিয়েছিলেন, তিনি যে সেচ বিভাগের পরিসংখ্যান থেকেই জেনেছিলেন, ভাটার সময় টালির নালার গড়পড়তা গভীরতা মাত্র দুই ফুট দেড় ইঞ্চি—এটা তো আর বানানো কথা নয়। চার ফুট আর শূন্য ফুটের গড় যে মাত্র দুই ফুট, এই সোজা কথাটা না বোঝাতেই এই বিপত্তি। গড়ের গড়খাইতে নিমজ্জন।

গড়ের মজায় শুধু ইনি নন, অনেকেই মজেছেন আরও। বিলেতের পাঞ্চ পত্রিকা একবার গড়ের পায়ে গড় করে লিখেছিল, ‘সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারলুম, এ দেশের প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী লোকের গড়পড়তা ২.২টি করে সন্তান আছে; আমরা বলি কি, ওই দশমিক ভগ্নাংশ বাচ্চা নিয়ে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভারী অসুবিধে হচ্ছে, সরকার থেকে সাহায্যটাহায্য দিয়ে আরও দশমিক আট সন্তান প্রসব করার জন্য ওদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে করে প্রত্যেকটি মায়ের ছেলেপুলের সংখ্যা ভাঙাচোরা না থেকে গোটা গোটা হতে পারে।’ এমন একটা সংগত প্রস্তাবে কেন যে ব্রিটিশ সরকার কান দেয়নি, আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি সেদিন এক লরি ড্রাইভারের সাফাই শুনেছিলাম। বেচারা নাকি কাকে চাপা দিয়ে ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ বলে, লরিটা ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে ছুটছিল সে সময়; কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়ে ড্রাইভার প্রমাণ করে দিলে মশাই যে তার গাড়ির স্পিড গড়পড়তা ঘণ্টায় পাঁচ মাইলেরও কম ছিল।

কেননা, চাপা দেওয়ার আগেকার ২৪ ঘণ্টায় লরিটা মোট ১০৮ মাইল রাস্তা চলেছে, অর্থাৎ ১০৮ ডিভাইডেড বাই ২৪ ইকোয়েলস টু চার পয়েন্ট পাঁচ মাইলস পার আওয়ার; গড় হিসাবে এক রকম গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল গাড়িটা। তবু

যদি কেউ তার নিচে চাপা পড়ে মারা যায়, তবে
ড্রাইভারের দোষ কী?

আমি তো সত্যি বলতে কি, কোনো দোষ
দেখতে পেলাম না ওর। একটা লোক মারা
গিয়েছে, তা না হয় মেনেই নেওয়া গেল, কিন্তু
লোকটা ওই লরির নিচে চাপা না পড়লেও তো
মরতে পারত। ভেবে দেখতে গেলে, লোকটার
মারা যাওয়ার সময় তো আসলে ঢের আগেই
হয়ে গিয়েছে। বাঙালির গড় আয়ু ২১ বছর পার
হওয়ার পরও সে যে বেঁচে ছিল তা থেকেই
বোঝা যায় পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের ওপর লোকটার
একদম শ্রদ্ধা নেই; গড় সম্বন্ধে একদম আইডিয়া
নেই ওর; কাজেই, আইডিয়ার একান্ত
অভাববশতই, গড়ে পাঁচ মাইল স্পিডে চলা
একটা গাড়ির ধাক্কায় অক্লান্ত পেয়ে সেই জ্ঞানহীন
লোকটা অবশেষে প্রমাণ করে গেল—

স্ট্যাটিসটিকসকে হেলাফেলা করা কতখানি
বিপজ্জনক। নারায়ণ দাশশর্মা: ভারতীয় লেখক।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৪, ২০১১

616) গ্র্যানি - ভ্রাদিমির সিভরিদভ

ফ্ল্যাটে ঢুকে মাথা থেকে হ্যাট খোলার সুযোগও
হলো না আর্কাডি সেমিওনভিচের, স্ত্রী
আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন
তাঁর ওপরে।

‘তুমি তোমার ছেলের পিতা, নাকি পিতা নও?’

‘সেটা তো তোমারই ভালো জানার কথা,’

হাসতে হাসতে বললেন আর্কাডি সেমিওনভিচ।

‘ঠাট্টা করছ!’ দুই হাত ঝাঁকিয়ে স্ত্রী বললেন।

‘তোমার ছেলের কীর্তিকলাপের কথা যদি
জানতে!’

‘আমাকে ওভারকোটটা অন্তত খুলতে

দাও।’ কাপড়চোপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন
আর্কাডি সেমিওনভিচ।

‘কী এমন ঘটনা ঘটিয়েছে সে, বলো।’

‘ভয়াবহ সব ব্যাপারস্যাপার। গ্র্যানির কথা
একদমই শোনে না। তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ে।

অতিষ্ঠ করে ফেলেছে একদম। তিনি চলে
যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।’

‘চলে যাবেন মানে!’ অবাক হলেন আর্কাডি
সেমিওনভিচ।

‘মানে তো সহজ।’

‘বদমায়েশটাকে ধরে বসিয়ে দেব নাকি দু-এক
ঘা!’

‘আর্কাদি, তোমার ধরনধারণ একেবারেই অসভ্য বর্বরদের মতো!’ চমকে উঠে স্ত্রী বললেন, ‘প্রস্তর যুগের। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে সবকিছু। বলতে হবে, অমন ব্যবহার করা উচিত নয়। পোক্ত কিছু উদাহরণ দিতে হবে। তুমি তো ওর বাবা, তাই না?’

‘তা বটে,’ মাথার পেছনটা চুলকাতে চুলকাতে বললেন আর্কাদি সেমিওনভিচ। ‘আচ্ছা, ডাকো দেখি ওকে। চেষ্টা করে দেখি।’ ঘরে এসে ঢুকল আলিওশা। চটপটে পাঁচ বছরের খুদে বালক। ‘কী ঘটনা ঘটিয়েছ, বলো শুনি।...কী, চুপ করে রইলে যে!’

আলিওশা কপাল কুঁচকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে। মেঝেতে আঁকিবুঁকি কাটতে থাকল পা দিয়ে। বিপদ ঘনিয়ে এলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে প্রস্তুত।

‘আইসক্রিম কিনে দেয়নি কেন!’ অবশেষে বলল সে।

‘শুধু আইসক্রিমের কারণে তুমি তাঁর সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছ? ছি! ছি! কী লজ্জা!’ ভুরু কুঁচকে পিতা বললেন। ‘তুমি কত্ত বড় খারাপ কাজ করেছ, সে সম্পর্কে ধারণা আছে তোমার?’ দুই পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে আলিওশা জানাল, ধারণা নেই তার।

‘গ্র্যানি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। তোমার সৌজন্যে! তিনি চলে গেলে আমরা কী করব, ভেবে দেখেছ?’

‘জানি না...।’

‘তোমার জন্য লাঞ্চ বানায় কে? উত্তর দাও।’

‘গ্র্যানি...’

‘কে তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয় প্রতিদিন?’

‘গ্র্যানি...।’

‘তোমার জামাকাপড় ধুয়ে দেয় কে?’

‘গ্র্যানি তোমার কাপড়ও তো ধুয়ে দেয়,’

সংশোধনী টানল আলিওশা।

‘তাহলেই বোঝো,’ পিতা বললেন। ‘ঘরদোর পরিষ্কার করে কে? তুমি কি বুঝতে পারছ যে সব দায়িত্ব গ্র্যানির কাঁধে?’

‘হুঁ,’ বলল আলিওশা।

‘অবশেষে!’ স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্কাদি সেমিওনভিচ বললেন।

‘আমি আর অমন ব্যবহার করব না,’ আলিওশা বলল নাকের শিকনি টেনে।

‘এই তো লক্ষ্মী ছেলে। এখন ঝটপট গ্র্যানির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।’ আলিওশা ছুট লাগাল রান্নাঘরের দিকে। গ্র্যানি ওখানে ডিনার রান্নায় ব্যস্ত তখন।

‘গ্র্যানি!’ গ্র্যানির বুকে মুখ লুকাল আলিওশা।

‘আমাকে প্লিজ মাফ করে দাও। আমি এখন থেকে তোমার সব কথা শুনব।’

‘এই পাগলটা! মাফ চাইতে হবে কেন! আমি তো ও কথা সেই কখন ভুলে গেছি! তার চেয়ে বরং এই নাও, পিঠে খাও। বাদাম দেওয়া, তোমার যেমন প্রিয়।’

‘গ্র্যানি, তুমি নাকি এই বাসার সব কাজ করো? সত্যি?’

‘সত্যি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ?’

‘তুমিই যদি সব কাজ করো, তাহলে মা-বাবার দরকার কী?’

‘আলিওশা, তাদেরও একদিন নাতি-নাতনি

হবে।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৪, ২০১১

617) পাণ্ডা - সৈয়দ মুজতবা আলী

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, ‘শীরনী’ বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেম। বিশ্বপাণ্ডার ইউএনও ঐখানেই। সেখান থেকে গেলুম বেং লেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম।

জেরুজালেম-বেং লেহেমের বাস-সার্ভিস

আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো

(বাসের ওপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি ঐঁকে

কর্তারা ভালোই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড়

দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইডবুক—

পাণ্ডার ‘এরজাৎ স’—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে

লাঠি। আধঘণ্টার ভিতর বেং লেহেম গ্রামে

নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাব, বাইবেল-বর্ণিত

ভাঙাচোরা সরাই আর জরাজীর্ণ আস্তাবল—

যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কল্পুর।

সবকিছু ভেঙেচুরে তার ওপর দাঁড়িয়ে এক

বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর

ভিতরে মেঝের ওপর যে মোজায়িক বা পাথরে-

খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রসসৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখিনি। সে-কথা আরেক দিন হবে। গাইডবুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, ‘হোয়াট ল্যানগুইজ? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?’—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, ‘হিন্দুস্থানী।’

বললে, ‘দসিপয়াস্তর’। অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও।

‘দস্’ ছাড়া অন্য কোনো হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, ‘প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয়?’

বললে, ‘হ্যাঁ।’

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, ‘আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরীব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোকাটি দিয়ে দেবে—আর তারই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?’ শুধু যে চোরাই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইডবুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রীক অর্থডক্স প্রতিষ্ঠানের জিন্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পৌঁছতে হয়। এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশভূষায় ঈষৎ পার্থক্য। পুনরপি সেই সদালাপ। ‘ফেলো কড়ি মাখো তেল।’ অম্মো না-ছোড়বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, ‘তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?’ তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি। এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম। বললুম, ‘দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কীরকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।’

বলে লাঠিটা বার-তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। পাণ্ডা ডাকলে, ‘শোনো।’

আমি বললুম, ‘হুঁঃ।’

‘তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?’

‘আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।’

খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, ‘যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি তবে—’

আমি বললুম, ‘আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারব তো?’

তখন হার মানল। আমরা বহু লক্ষা জয় করেছি!! [সংক্ষেপিত]

সৈয়দ মুজতবা আলী: রম্যলেখক

জন্ম: ১৯০৪, মৃত্যু: ১৯৭৪

618) অসিলক্ষণ পণ্ডিত - সুকুমার রায়

রাজার সভায় মোটা মোটা মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দু’চারজন খেটেখুটে কাজ করে আর বাকি সবাই ব’সে ব’সে মাইনে খায়।

যারা ফাঁকি দিয়ে রোজগার করে, তাদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষ-গুণ) বিচার করতে জানেন। অমিন রাজা বললেন, “উত্তম কথা,

আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।”

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হয়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন, “এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।” ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে-ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চট্পট তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি

সহজ! তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন।

তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোনটা কার তলোয়ার। পণ্ডিতমহাশয় শুঁকবার সময় সেই মার্কটুকু দেখে নেন। যাদের ওপর তিনি খুব খুশি থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা-টয়সা দেয়, আর খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, “খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের তলোয়ার!” আর যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালোই হোক না কেন, তাঁর কাছে পার পাবার যো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অমিন একটু শুঁকেই নাক সিঁটকিয়ে ব’লে ওঠেন, “অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার তো নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!”

এমনি ক’রে কত ভালো ভালো কারিকর, কত চমৎকার চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার দু’টাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারা মনপ্রাণ দিয়ে এক একখানি তলোয়ার গড়ে, আর বিচারক মশাই “দূর! দূর!” ক’রে সব বাতিল করে দেন। এই রকম হতে হতে শেষটা কারিকর গেল ক্ষেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ ক’রে লক্ষার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত তাচ্ছিল্য ক’রে, “আবার কী গড়ে আনিল? দেখি?” ব’লে, যেমিন তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অমিন লক্ষার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ-চ্-চো ক’রে এক

বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘ্যাঁচ ক'রে নাক কেটে দু'খান!

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, “জল আনের,” “কবিরাজ ডাকের,”—ততক্ষণে তলোয়ারওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ি পর্যন্ত পিঠান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুশকিল। একে তো কাটা নাকের যন্ত্রণা, তার উপর সভায় বেরুলে সবাই ক্ষ্যাপায় “নাক-কাটা পণ্ডিত” ব'লে।

বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে পারে না।

তাকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা ক'রে, “তলোয়ারটাঁ কেমন ছিল!” সুকুমার রায়, বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক

জন্ম: ১৮৮৭, মৃত্যু: ১৯২৩

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০১, ২০১১

619) নিমন্ত্রণ

একদিন একটি সারস ও একটি শিয়ালের মধ্যে রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হলো। এরপর একসঙ্গে পথ চলতে চলতে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিদায়ের সময় শিয়াল সারসকে সেদিন তার বাসায় রাতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল। যথাসময়ে সারস শিয়ালের বাড়িতে উপস্থিত হলো। শিয়াল মজা করে সারসের সামনে একটা বিশাল চওড়া থালায় কিছু স্যুপের ব্যবস্থা করল। সারসের তো লম্বা ঠোঁট! এই ঠোঁট দিয়ে তো এমন একটি চওড়া থালার স্যুপ খাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবু সে কয়েকবার থালার মধ্যে ঠোকর দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করল। অন্যদিকে এই থালায় শিয়াল খুব সহজেই স্যুপটুকু চেটে চেটে খেল। শিয়াল বলল, ‘আমি দুঃখিত, বন্ধু। এই স্যুপ আসলে তুমি খেতে পারবে না।’ সারস বুঝতে পারল, শিয়াল তাকে দাওয়াত দিয়ে বোকা বানিয়েছে। সারস বলল, ‘দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, বন্ধু।’ এরপর যাওয়ার সময় সারসও শিয়ালকে একদিন রাতে তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। নির্ধারিত দিনে শিয়ালও নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সারসের বাড়িতে হাজির হলো। গল্পগুজব শেষ করে খাওয়ার টেবিলে বসে শিয়াল লক্ষ করল, তার জন্য সারস একটা চিকন মুখওয়ালা লম্বা সরু গলার কলসির ব্যবস্থা করেছে, যার ভেতর রাখা খাবার শুধু

সারসের পক্ষেই খাওয়া সম্ভব। কারণ, শিয়ালের মুখ ওই কলসির ভেতর ঢুকবে না। শিয়াল তবু কলসির বাইরে কয়েকবার চেটেচুটে খাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল। সারস তখন শিয়ালকে বলল, ‘বন্ধু, আমি আসলে এর জন্য একটুও দুঃখ প্রকাশ করছি না।’ শিয়াল তখন বুঝতে পারল, সারস সেদিনের প্রতিশোধ নিয়েছে।

ঈশপের শিক্ষা: ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

বর্তমান সময়ে আমরা যা শিখলাম: কেউ দাওয়াত দেওয়ার পর যদি এ রকম কিছু ঘটান সম্ভাবনা না-ও থাকে, তবুও দাওয়াতে না যাওয়াই ভালো। শুধু একটা পাল্টা দাওয়াত দিলেই হবে, আফটার অল ফরমালিটি তো রক্ষা হলো! ঈশপের গল্প অবলম্বনে লিখেছেন তাওহিদ মিলটন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০১, ২০১১

620) যেমন শ্বশুর তেমন জামাই - ভি এস নাইদল

হোটেলমালিক রামলগন হাঁ করে একবার গণেশের মুখের দিকে আরেকবার থালার দিকে তাকাচ্ছিল। গণেশের খাওয়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল, ‘সাহেব, পেট ভরেছে?’

‘ভরেছে,’ আঙুল দিয়ে থালা চাটতে চাটতে বলল গণেশ।

‘আমি বুঝি, সাহেব। বাবা মারা যাওয়ার পর আপনার তো আর আপন কেউ রইল না। একা একা অনেক কষ্ট হয় আপনার।’ বলেই চলেছে রামলগন, ‘সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে কাজ করে খাচ্ছি। একা। আপনার মতো শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়তো বা দোকানদারি অনেক ছোট পেশা, কিন্তু আমার কি কম আছে?’

পেনালে ১০ একর জমি; সাইপেরিয়ায় তিনটে, ফুয়েন্ট গ্রোভে একটা বাড়ি। সব মিলে মোটামুটি ১২ হাজার ডলারের সম্পত্তি।’ কিছুক্ষণ চুপ করে রামলগন আবার বলল, ‘সাহেব, আপনার তো এখন দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমার মেয়ে লীলাকে আপনি বিয়ে করবেন?’

‘করব,’ এককথায় রাজি হয়ে গেল গণেশ।

২

‘চিন্তা করবেন না। আমার তেমন কোনো দাবিদাওয়া নেই।’ রামলগনকে আশ্বস্ত করল গণেশ।

‘সাহেব, এই হিন্দুসমাজের যতসব প্রথা নিয়েই তো আমার ভয়। বিয়ের পরদিন দুপুরে বরকে পুরো এক থাল খিচুড়ি খেতে দিতে হয়। জামাই যতক্ষণ না খাওয়া শেষ করে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্বশুরকে টাকা ঢালতে হয়।’

‘চিন্তা করবেন না। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। কিন্তু আবার এত দ্রুতও না, যাতে লোকে আপনাকে ফকির ভাবে।’

‘আমি এমনটাই আশা করেছিলাম, সাহেব। আপনিই পারেন এতটা উদার হতে। এটা আমার বিয়ে হলে আমি বলতাম, “চুলোয় যাক খিচুড়ি, আমি যৌতুক নেব না”।’

৩
বিয়ের কার্ড ছাপানো শেষ হতে না হতেই অতিথিরা পাল ধরে এসে পড়ল গণেশের বাড়ি। অতিথিদের কর্তৃত্বে ছিলেন গণেশের এক পিসি, যিনি কিনা গণেশের বাবার শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। গণেশ সেসব টাকা ফেরত দেওয়ার কথা তুলতেই কষে একটা ধমক খায় পিসির কাছে।

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে থাকছে ভাবতেই গণেশের অবাক লাগে। আরও অবাক কাণ্ড হলো, এদের বেশির ভাগকেই গণেশ চেনে না। মাঝেমধ্যে দু-একটা মুখ চেনা চেনা ঠেকে এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে, তার যেসব দূরসম্পর্কের বোন কদিন আগে নিজেরাই ছিল খুকি, তারা আজ এক গন্ডা ছানাপোনার মা। লম্বামতো, চটপটে একটি মেয়েকে গণেশ কিছুতেই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘পিসি, এই মেয়েটি কে?’

‘ও ফুলকুমারীর জ্যাঠাতুতো বোন।’

‘ফুলকুমারীটা আবার কে?’

‘ফুলকুমারী তোর দূরসম্পর্কের খুড়তুতো বোন।’ সম্পর্কের ফিরিস্তি শুনে গণেশের বিষম খাওয়ার জোগাড়। বিয়ের আগের দিন বাড়ির সব মেয়ে হিন্দি গান গেয়ে গণেশকে জাফরান দিয়ে স্নান করাতে লাগল। তখনই প্রথমবারের মতো প্রশ্নটা করল গণেশ, ‘আচ্ছা পিসি, প্রতিদিন এতগুলো লোকের খাবার আসছে কোথা থেকে?’

‘কেন? রামলগন বাবুর হোটেল থেকে!’

‘খরচাপাতি কে দেবে?’

‘তুমি। রামলগন বাবু বলেছেন, নানা ঝামেলায়

তোমার মাথাটা এমনিতেই গরম। বিলের
ব্যাপারে বিয়ের পরই তিনি তোমার সাথে কথা
বলবেন।’

‘হায় ভগবান! এখনো বিয়ে হলো না, এরই
মধ্যে বুড়ো আমার ঘাড় মটকাতে শুরু করেছে!’
মনে মনে ভাবল গণেশ।

৪

অবশেষে বিয়েটা হয়েই গেল। পরদিন যথারীতি
উঠোনের ওপর কম্বল পেতে গণেশকে বসতে
দেওয়া হলো। সামনে রাখা হলো সাদাটে,
অখাদ্য খিচুড়ি। রামলগন খিচুড়ির পাশে কাঁসার
থালায় ১০০ ডলার রাখল, কিন্তু গণেশ খিচুড়ির
দিকে তাকাল না পর্যন্ত। অতিথিদের মধ্যে কেউ
কেউ অল্প কিছু টাকা দিল। কিন্তু গণেশ চুপচাপ
বসেই রইল। রামলগন আরও ১০০ ডলার
রেখে বলল, ‘বাবা, এবার খাও।’

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল, ‘রামু, আরও
পয়সা ঢালো।’

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে রামলগন বলল, ‘ও
যেন ভুলেও না ভাবে যে আমি আরও টাকা
দেব। ব্যাটা উপোস করে মরুক না। আমার
কী?’ গজগজ করতে করতে চলে গেল
রামলগন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আরও ২০০
ডলার ফেলে ফিসফিস করে বলল, ‘বাবা
সাহেব, আমাকে দেওয়া কথা ভুলো না। খাও।’
‘খাবে না, খাবে না।’ ভিড়ের মধ্য থেকে চৈঁচিয়ে
বলল কে যেন।

‘দূর হ, ব্যাটা।’ খেঁকিয়ে উঠল রামলগন। আবার
ফিসফিসিয়ে গণেশকে বলল, ‘সাহেব, আর
লজ্জা দেবেন না। দয়া করে খেয়ে নিন।’ গণেশ
নড়ল না। শেষমেশ রামলগনের কাছ থেকে
একটি গরু, একটি বাছুর, নগদ ১৫ হাজার
ডলার আর ফুয়েন্ট গ্রোভের বাড়িটা লিখে
নেওয়ার পর গণেশ খায়। গণেশের বাড়ির এত
দিনের খাবারের বিলও বাতিল করতে হলো
রামলগনকে।

‘আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম। ও আগে থেকেই
জানত, আমি ওকে এগুলো দিয়ে দেব।’ দরদর
করে ঘামতে ঘামতে বলল রামলগন। ভি এস
নাইপল: ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে
জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল ও
বুকারজয়ী ব্রিটিশ লেখক। জন্ম ১৭ আগস্ট,
১৯৩২। অনুবাদ: আলিয়া রিফাত

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১২,
২০১১

621) যা চলে তাই গাড়ি - তারাপদ রায়

এক ড্রাইভার তার দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে
এক ছুটির দিনে যাদুঘর দেখতে গেছে। যাদুঘরে
হাজার রকম দেখার জিনিস, দেখতে দেখতে সে
তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছে ম্যমির ওখানে।
ম্যমিটি যে একটা মৃতদেহ সেটা সে বুঝতে
পেরেছে কিন্তু ম্যমিটি একটু দেখেই ম্যমির গায়ে
কি একটা কথা পড়ে সে দৌড়ে যাদুঘর থেকে
বেরিয়ে যায়। তারপর এক দৌড়ে সোজা
নিজের আস্তানায়। দেশোয়ালি ভাইয়েরা পরে
তাকে এসে ধরলো, ‘তুমি ঐ রকম দৌড়ে
পালিয়ে এলে কেন?’ সে বললো, ‘আরে
সর্বনাশ, মরাটার গায়ে আমার গাড়ির নম্বর
দেখলে না! ঐ লোকটাকেই তো পরশুদিন আমি
চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। গাড়ির নম্বর যখন
পেয়েছে এবার পুলিশ নিশ্চয় আমাকে ধরবে।’
বলে লোকটি বাক্স-বিছানা নিয়ে কোথায়
পালালো কে জানে? ড্রাইভারটি যে গাড়ি
চালাতো তার নম্বর ছিলো ডব্লিউ বি সি ৫৪০
আর ম্যমিটির গায়ে লেখা ছিল বি সি ৫৪০,
মানে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দের। এটাই তার ভয়
পাওয়ার কারণ।

(অত্যধিক কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিনীত
নিবেদন, এ নিয়ে বেশি খোঁজখবর করবেন না,
গাড়ির নম্বর ও ম্যমির অব্দ অন্যও হতে পারে,
তবে দুটোই এক ছিলো)।

এই মুহূর্তে যে দ্বিতীয় গল্পটি কলমের নিবের
নিচে সুড়সুড় করে এসে লাইন দিয়েছে সেটাও
গাড়ি চাপা নিয়ে। আমার এক বন্ধু খুব বেআইনি
গাড়ি চালাতেন, একবার এক মোটর সাইকেল
আরোহী সার্জেন্ট অনেক চেষ্টামেচি করে তাড়া
করে এসে তাঁকে ধরে ফেলেন, ‘আমি যে এত
চেষ্টাছি পিছনে পিছনে, আপনি শুনতে পাননি?’
সার্জেন্টসাহেব প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন। অস্বীকার করার উপায় ছিলো
না, বন্ধুবর ঢোক গিলে বললেন, ‘হ্যাঁ, শুনেছি।’
সার্জেন্টসাহেব আরও ক্ষিপ্ত হলেন, ‘তাহলে
দাঁড়ালেন না কেন?’ বন্ধুটি অকপটে বললেন,
‘আমি ভেবেছি আমি বুঝি কাউকে চাপা দিয়েছি,
সে-ই চেষ্টাচ্ছে। চেষ্টাতে চেষ্টাতে পিছনে ছুটছে।’

তবে গাড়ি বিষয়ে সবচেয়ে মর্মান্তিক গল্পগুলো এই শহরেরই এক সওদাগরি অফিসের বড়োসাহেবের লোকান্তরিতা বেগমসাহেবাকে নিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনি লোকান্তরিতা হয়েছেন ঐ গাড়িরই কল্যাণে।

বেগমসাহেবাকে আমি জানতাম একাধিক সূত্রে। কতবার কত জায়গা থেকে, নিমন্ত্রণ-পার্টির শেষে ভদ্রমহিলা আমাকে লিফট দিতে চেয়েছেন, একবারই সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। ড্রাইভার ও স্বামীকে পিছনের সিটে বসিয়ে আমাকে পাশে নিয়ে ঈষৎ মত্ত বেগমসাহেবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কি ভীষণ গতিতে গাড়ি চালনা! বেশি বৃষ্টি বলেই আমি বাধ্য হয়ে লিফট নিয়েছিলাম। কিন্তু যা হয়েছিলো তা অবর্ণনীয়। গাড়ির সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার কাজ করছে না, বৃষ্টির স্রোতে পুরো কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে। জগৎ সংসারে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মোড়ে গাড়িটা একটু দাঁড়াতে সন্তুষ্ট হয়ে আমি বললাম, ‘বেগমসাহেবা, গাড়িটা একটু দাঁড় করান, আমি রুমাল দিয়ে সামনের কাচটা মুছে দিয়ে আসি।’ বেগমসাহেবা আমার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললেন, ‘কেন মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজতে যাচ্ছেন। সামনের কাচ মুছে কি লাভ হবে?’ আমি অবাক হয়ে তাকাতে বেগমসাহেবা বললেন, ‘আমার তো মাইনাস চার চশমা, পার্টিতে আসবো বলে সেটা চোখে দিয়ে আসিনি।’

আরেকবার, সে ঘটনার সঙ্গী অবশ্য আমি নই, অন্য এক বন্ধুর মুখে শুনেছি। একদা প্রভাতকালে আমার সেই বন্ধুটি বেগমসাহেবা এবং তার স্বামীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। যথারীতি বেগমসাহেবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি ছুটছে, সকালবেলার মফস্বল এলাকার ফাঁকা রাস্তা। কোনো গাড়িঘোড়া নেই, লোকজনও নেই। গাড়ির উদ্দাম বেগ দেখে রাস্তার আশপাশ থেকে গরু, ছাগল, কুকুর ছুটে পাশের মাঠে নেমে যাচ্ছে। পথের একপ্রান্তে ইলেকট্রিক পোলের উপর উঠে দুজন তার-চোর বিদ্যুতের তার কাটছিলো। বেগমসাহেবা তাদের দেখে ভাবলেন যে বোধ হয় তাঁর গাড়ি চালানোয় ভয় পেয়ে পোলের উপর উঠে বসেছে। তিনি উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে যেই জানতে গেছেন,

‘তোমাদের এত ভয় কিসের?’ চোর দুটো একলাফে আঠারো ফুট নিচে পড়ে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাঁই-বাঁই করে দৌড় দিলো। বেগমসাহেবা এবং তাঁর সঙ্গীরা বিস্মিত হয়ে তাদের পলায়ন দেখলেন।

মৃতা মহিলার সম্পর্কে বেশি দুঃখজনক স্মৃতিকথায় না গিয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি। তিনি এক সন্ধ্যায় একটা গাড়িকে গুঁতো মেরেই লাফিয়ে রাস্তায় নেমে এসে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে চেপে ধরলেন, ‘আমি জানতে চাই, এসব কি হচ্ছে? এই এক সন্ধ্যায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে পরপর ছটা গাড়ির সঙ্গে আমার গুঁতো লাগলো, আমি জানতে চাই কলকাতার ড্রাইভাররা সব হয়েছে-টা কি?’ তারাপদ রায়: পশ্চিমবঙ্গের রম্যলেখক। জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৭ নভেম্বর টাঙ্গাইলে। মৃত্যু ২৫ আগস্ট ২০০৭। **সূত্র:** দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১২, ২০১১

622) একটি ফাটক (ফেসবুকে যে নাটক) - আলিম আল রাজি

চরিত্র: ছেলে ১, ছেলে ২, মেয়ে।

মঞ্চ: ফেসবুক। নীল আর সাদা রং মিলে কিছুটা স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

দৃশ্য এক:

মঞ্চের ধীরপায়ে এল একটি মেয়ে। সে হলো মেয়ে ১।

এরপর এল একটি ছেলে। সে হলো ছেলে ১।

মঞ্চের লেখা এল: মেয়ে ১ ওয়ান্টস টু বি ইওর ফ্রেন্ড।

ছেলেটি একসেপ্ট বাটন চাপল।

দৃশ্য দুই:

মেয়ের স্ট্যাটাস: মন খারাপ (ব্যাকগ্রাউন্ড

মিউজিক: রোমান্টিক গান)

কমেন্ট:

ছেলে ১: কেন, কী হয়েছে?

মেয়ে ১: আম্মু বকা দিয়েছে!

ছেলে ১: আহা রে! কাঁদে না। কী করছিলা?

মেয়ে ১: কচু! কিছুই করি নাই। এমনি বকা দিয়েছে। আমি ছোট তো! সবাই আমাকে বকা দেয়। সবাই পচা।

ছেলে আর মেয়ে ধীরে ধীরে পর্দার আড়ালে (ইনবক্সে) চলে যাবে।

দৃশ্য তিন:

পর্দার আড়ালে (ইনবক্সে) নড়াচড়া দেখা যাবে।

দৃশ্য চার:

ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে আবার মঞ্চে আসবে।

ছেলের স্ট্যাটাস: পাইলাম, উহারে পাইলাম।

(ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: লুতুপুতু রোমান্টিক গান)

কমেন্ট:

মেয়ে:

ছেলে:

মেয়ে: কাকে পাইলা?

ছেলে: বলতেই হবে?

মেয়ে: বুঝে নিলাম।

ছেলে: তাই? হুহ।

মেয়ে: তা নয়তো কী?

ছেলে: :-*

মেয়ে: যাহ! দুষ্টু। :p

দর্শক হাততালি দেবে।

মেয়ের স্ট্যাটাস: এত দিন কোথায় ছিলে?

(ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: রোমান্টিক মিউজিক)

কমেন্ট:

ছেলে:

মেয়ে:

ছেলে: তুমি খোঁজ নাওনি কেন?

মেয়ে: অ্যাহ! আমার এত ঠাকুরা পড়েছে!

ছেলে: সব আমাকে করতে হবে?

মেয়ে: জি, স্যার। আপনাকেই করতে হবে :p

দর্শক হাততালি দেবে।

ছেলে আর মেয়ে আবার পর্দার আড়ালে

(ইনবক্সে) চলে যাবে।

দৃশ্য পাঁচ:

সিম্বলিক শট ১: মঞ্চে এসে ছেলে ১ একঝাঁক

পায়রা উড়িয়ে দেবেন আকাশে। পায়রাগুলো

স্বপ্নের প্রতীক।

সিম্বলিক শট ২: মঞ্চে মেয়ে পিস্তল নিয়ে এসে

সব কটি পায়রা গুলি করে মেরে ফেলবে। তাঁর

মুখে তখন জ্বুর হাসি। (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক:

ভায়োলিনের করুণ সুর)

দৃশ্য ছয়:

ধীরে ধীরে মঞ্চে আসবে মেয়েটি। অপর পাশ

থেকে আসবে ছেলে ২ (প্রথমবারের মতো)।

একের সঙ্গে অপরের দেখা হলো। ছেলে ১

তখন পর্দার আড়ালে।

ছেলে ২ অপলক নয়নে মেয়ের দিকে চেয়ে

থাকবে। মেয়েটিও তাকিয়ে থাকবে। উভয়ের

হৃদয় একসঙ্গে খচাৎ করে উঠল।

ছেলে ২-এর ফেসবুক স্ট্যাটাস: প্রথম দেখায়
প্রেম! (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: বাঁশির মধুর সুর)
কমেন্ট:

মেয়ে: তাই নাকি!

ছেলে ২: তাই তো মনে হচ্ছে!

মেয়ে: তা কার প্রেমে পড়লেন?

ছেলে ২: সে আশপাশেই আছে।

মেয়ে:

ছেলে ২: হারিয়েছি আমি তোমাতে।

মেয়ে:

দর্শক কপাল কুঁচকাবে।

পর্দার আড়ালে (ইনবক্স) চলে যাবে ছেলে ২ ও
মেয়ে।

দৃশ্য সাত:

কিছুক্ষণ পর আবার মঞ্চে আসবে তারা।

ছেলে ২-এর স্ট্যাটাস: ভালোবাসার প্রহরে

মুখোমুখি দুজন। (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক:

রোমান্টিক রবীন্দ্রসংগীত)

মেয়ে:

ছেলে ২:

মেয়ে: :p

ছেলে ২: জিব দেখাও কেন?

মেয়ে: তোমাকে দেখাচ্ছি নাকি।

ছেলে ২: আমি তো দেখে ফেললাম।

পর্দার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে আসবে ছেলে

১। এসে কমেন্ট করবে—

ছেলে ১: কী হচ্ছে?

ছেলে ২: প্রেম হচ্ছে!

মেয়ে: নো কমেন্ট। (কিছুটা বিরত)

মেয়ের স্ট্যাটাস: চাই তোমায় প্রতি নিঃশ্বাসে

(ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: গিটারের টুংটাং)

কমেন্ট:

ছেলে ২:

মেয়ে:

ছেলে ২: আমিও।

মেয়ে: আমিও গো!

ছেলে ১: বাহ!

মেয়ে: ছেলে ১, কী সমস্যা তোমার?

ছেলে ১: কোনো সমস্যা নাই। দেখলাম।

(ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: বাঁশি)

দর্শক কপাল কুঁচকাবে।

পর্দার আড়ালে চলে যাবে ছেলে ২ ও মেয়ে।

ছেলে ১ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দৃশ্য আট:

ছেলে ১ মঞ্চের কোণে একা একা বসে আছে।

তার মনে তখন ঝড়।

অন্যদিকে ছেলে ২ আর মেয়েটি মঞ্চের

মাঝখানে নাচানাচি করছে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে একটার পর একটা গান—

‘তোমার বারিষ মাখা হাসি আমার...’

‘উ লা লা লা। লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা...আ আ আ...’

গান শেষ হলে পঞ্চম দৃশ্যে মারা যাওয়া পায়রা

দিয়ে ছেলে ২ আর মেয়েটি লাঞ্চ সেরে ফেলবে।

ছেলে ১ এসব দেখে আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে

আড়ালে চলে যাবে।

দর্শক তখন হাত তালি দিয়েই যাচ্ছে।

সমাপ্তসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১২, ২০১১

623) ভূমিকম্প নিয়ে ফেসবুক স্ট্যাটাস

১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ভূমিকম্প হওয়ার পর ফেসবুকেও রীতিমতো স্ট্যাটাসকম্প শুরু হয়।

সেখান থেকেই বাছাইকৃত কিছু স্ট্যাটাস এখানে দেওয়া হলো। আসিফ মশাফিকুজ সালাহিন

ভূমিকম্পের সময় যা যা করণীয়—

১. প্রথমেই একটা দৌড়... (আপনার কম্পিউটারের দিকে)

২. তারপর কম্পিউটার অন করুন

৩. তারপর ফেসবুকে লগ-ইন করুন

৪. তারপর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিন OMG

earthquake অথবা ওমাগো ভূমিকম্প এমন কিছু টাইপের

৫. কিছুক্ষণ কमेंট আর লাইকের জন্য অপেক্ষা করুন

৬. এবার লগ আউট করে PC শাট ডাউন করুন

৭. এবার দৌড় দিন আর কোনো নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করুন।

বি.দ্র.: ফেসবুকে ‘ভূমিকম্প’ নামে ফ্যান পেজ থাকলে সেটা লাইক দিতে ভুলবেন না। কারিবুল হাসান

বাংলাদেশকে আবার কে call করল?

VIBRATIO☆ mode-এ যে ‘ring tone’

হলো!বিবর্ধন রায়

ভূমিকম্পও দেখি মিস কল মারে! পুরা কল
দিলে তো আজ এই জীবন থেকে লগ আউট
হয়ে যেতাম! আরিফুর রহমান
ভূমিকম্পের সময় ছোট বোনরে কইলাম, ‘ওই,
ভূমিকম্প হইতেছে, তাড়াতাড়ি নিচে নাম...।’
ছোট বোন আতঙ্কিত হইয়া কইল, ‘তুমি নামো,
আমি স্ট্যাটাসটা দিয়ে আসতেছি...।’ রিফাত
মাসুদ
তাই তো বলি, স্বপ্ন দেখার সময় খাট নড়ে
ক্যান! আরআই ইমরান
এবার নিয়ে বেশ কয়েকবার দেখলাম, সবার
আগে ভূমিকম্প টের পাই আমি! অনেক মৃদু
ভূমিকম্প, যা আশপাশের কেউ টের পায় না,
সেটাও আমি টের পাই (যদিও বাকি সবার
প্রতিক্রিয়া না দেখে আমারই সন্দেহ জাগে,
আদৌ ভূমিকম্প হয়েছে কি না, তবে পরে
নিউজ দেখে কনফার্ম হই, আমি ঠিকই ছিলাম)।
এখন ভূমিকম্প মোকাবিলায় আমার এই
অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা কোনোভাবে কাজে লাগানো
যায় কি না, এ বিষয়ে সরকার একটা গবেষণা
করতে পারে। ফলাফল ইতিবাচক হলে এ
ব্যাপারে এই সরকারকে সহায়তা করতে আমি
প্রস্তুত। হাজার হলেও দেশের ব্যাপার। সাকিব
শরীফ
আজকে সকালে একজন বলল, স্যার, ভূমিকম্প
তো বাংলাদেশে হয় নাই, আসলটা হইছে
‘কিসিমে’...এখানে জাস্ট একটু লড়ছে।
স্মরণ—দ্য সরকার
সন্ধ্যা ৬.৪২, শর্মা হাউসে বিফ শর্মা চাবাইতেছি,
হঠাৎ দেখি একদল পোলাপান চিক্কুর দিয়া
গেটের দিকে খিচ্চা দৌড় দিল আর তাদের
পেছনে সব ওয়েটার। মুহূর্তে শর্মা হাউস খালি!
আমারে আমার মেয়ে ফ্রেন্ড দেখাইল, পেছনের
ঝাড়বাতিটা পেডুলামের মতো দুলতেছে! আমি
উঠে বললাম, চলো। সে বলে, আরে বসো তো,
আমার শর্মা শেষ হয় নাই, কিছু হবে না!
যে তেলাপোকা দেইখা ভয়ে চিল্লাইয়া বাড়ি
মাথায় তোলে, ১৮ তলা বিল্ডিং তার মাথার
ওপর ভেঙে পড়তে পারে, তাতে তার কোনো
বিকার নাই!! মনে করছিলাম, দৌড় দিয়া জান
আর বিল দুটাই বাঁচামু : P মাগার
আফসুস...আশিকুর রহমান
এক বন্ধু ছাত্রীকে পড়াচ্ছিল। ভূমিকম্পের সময়

তিনবার ধমক দেয়, এই মেয়ে, টেবিল নড়াচ্ছ কেন? চারবারের বেলায় ছাত্রী নিজেই ঘর থেকে দৌড়! শাহাদাত সাধন

ভূমিকম্প হওয়ার সময় আমাদের হোস্টেলের সবাই রুম থেকে বের না হলেও টয়লেট থেকে বের হয়ে যাইস। নইলে, যা কন্ডিশন, ওপরের কমোড মাথায় পড়তে পারে। তখন না মরলেও জনসম্মুখে মুখ আর দেখাতে পারবি না। রাহাত রহমান

৬.৮ কি জোরালো ভূমিকম্প? ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর তো পেলাম না। তাহলে কি আমাদের দেশের ভূমিকম্পেও প্রিজারভেটিভ দেওয়া আছে? মাইর চেনেন, মাইরের ওপর ওষুধ নাই ভূমিকম্পে সারা দেশ কাঁপলেও বিটিভি কাঁপেনি। তাদের প্রধান সংবাদ ছিল, ১১ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশ জাহান্নামে যাক, সেটা মুখ্য নয়, প্রধানমন্ত্রী কোথায় গেলেন সেটাই মুখ্য। সহচর ঈদের দিনের মতো ফিলিংস হচ্ছে। উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব সব মানুষকে এক কাতারে নামিয়ে আনল ভূমিকম্প। সবাই এখন রাস্তায়। মানুষের কারণে রাস্তায় জ্যাম হয়ে গেছে। মানুষে গিজগিজ করছে। হাবিবুর রহমান

কেউ পারেনি! একমাত্র ভূমিকম্পই কিন্তু পেয়েছে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাঁপিয়ে তুলতে। পার্থ সরকার
তিস্তার পানির বদলে ভূমিকম্প—অ্যা গিফট ফ্রম মনমোহন সিং। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১১

624) লাইন - আলেক্সান্ডার মিতিস্কি

লাইনকে কীভাবে দাঁড় করানো যায়, কিছুতেই ভেবে বের করা যাচ্ছিল না। সরলরেখায় দাঁড় করালে লাইন এত লম্বা হবে যে তার লেজ গিয়ে পড়বে পশ্চিম ইউরোপে। সর্পিলাকার বৃত্তের আকার দিলে তার কেন্দ্রে লোকজন মারা যাবে ভিড়ের চাপে শ্বাসরোধ হয়ে।

আঁকাবাঁকাভাবে দাঁড় করালে সেটা আর লাইন থাকবে না, হয়ে পড়বে বিশৃঙ্খল জটলা। বাধ্য হয়ে অতিকায় এক আকাশচুম্বী দালান নির্মাণ করা হলো এবং লাইনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সিঁড়িতে, উলম্বভাবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কোথায় বিক্রি করা হবে—নিচে নাকি ওপরে। স্থির করা হলো,

বিক্রি করা হবে ওপরে, যাতে নিচে লাইনের পেছনে দাঁড়াতে সুবিধা হয়।

আর সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি ছিল—কী বিক্রি করা হবে। কিন্তু বাছাই করার কোনো উপায় তখন আর ছিল না। স্থির করা হলো, শুধু প্যারাসুট বিক্রি করা হবে।

একে একে ক্রেতাকে একটার বেশি প্যারাসুট দেওয়া হলো না। এর পরও অনেকে আকাশচুম্বী সেই দালান থেকে প্যারাসুটসহ লাফ দিয়ে নিচে নেমে আবার লাইনে দাঁড়াল এবং কিনেই ছাড়ল দ্বিতীয় প্যারাসুট।

প্যারাসুট শেষ হয়ে গেলে লোকজন প্যারাসুট ছাড়াই ঝাঁপ দিতে শুরু করল, যাতে ব্যর্থতা আর হতাশার অনুভূতি না থাকে মনে।

এবং কী অবাক কাণ্ড! ব্যর্থতা আর হতাশার অনুভূতি রইল না কারোর মনেই। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১০, ২০১১

625) অপ্রেমের যুগ - মারাত্মক শুরু

এই ধরাধামে সবাই কাউকে না কাউকে বা কিছু না কিছু অপছন্দ করে। একদল সহ্য করতে পারে না ইহুদিদের। ইহুদিরাও ছেড়ে কথা কয় না। অনেকে স্লাভীয়দের দেখতে পারে না। কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখে এশীয়দের। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের পারস্পরিক অপছন্দের ব্যাপারটিও নতুন কিছু নয়। প্রটেস্ট্যান্ট সুযোগ পেলেই অপমান করে ক্যাথলিককে, অর্থোডক্স সেক্টারিয়ানকে, সার্বীয় বসনিয়কে, রক্ষণশীল উদারপন্থীকে, ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালাকে...।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অনাদিকাল থেকে এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। এখন আপনারাই বলুন, অপছন্দ, অপ্রেম আর অভালোবাসার এই সর্বগ্রাসী জোয়ারে কী এমন অপরাধ আমি করছি মদ্যপান ভালোবেসে? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১০, ২০১১

626) দুই বিয়ের ফল - শামসুজ্জামান খান

এক বিয়েপাগল প্রবীণ লোক। তার বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছর অতীত হয়েছে। দুটি সন্তানও আছে; এবং চুলে ইতিমধ্যে পাক ধরেছে। তো, সেই লোকের খায়েশ হলো আরেকখান বিয়ে করার এবং বউ হতে হবে তরতাজা তরুণী। যে কথা সেই কাজ। বিয়ে সে

করেই ছাড়ল। ঘরে এল এক তরুণী এবং দুই বউ হলে যা হয়, তা-ই শুরু হলো। সতিনে সতিনে ঈর্ষা-বিবাদ থেকে চুলোচুলি, গালাগালি, খামচাখামচি, অর্থাৎ সপত্নী বিবাদ চরমে উঠল। এ নিয়ে পারিবারিক বিচার, সালিস-বৈঠকের পর সাব্যস্ত হলো: দুই বউ দুই বাড়িতে থাকবে। তাদের স্বামী মাসের অর্ধেক দিন বড় বউয়ের কাছে আর বাকি অর্ধেক ছোট বউয়ের কাছে থাকবে। এক টেঁটিয়া তরুণ বলে ওঠে, ‘মুরব্বি, ছোট বউয়ের ওপর কিছু অবিচার অইল না? বড় হেরে ২০ বছর স্বামীসঙ্গ পাইছে, নতুন বউটা স্বামীর বাড়িত আইয়াই অর্ধেক দিন স্বামীছাড়া থাকব! হেরে অন্তত ৩১শা মাসের বাড়তি দিনডা দেন; আর মাস তিরিশার কম অইলে তার পনেরো দিন ঠিকই থাছক।’ মুরব্বিরা মুচকি হেসে গম্ভীর হয়ে যান। পারিবারিক মুরব্বিদের ফয়সালা অনুযায়ী, মাসের প্রথম দিকের হিস্যা পেল ছোট বউ। স্বামীকে পেয়ে প্রথমেই তার কাজ হলো, নাপিত দিয়ে দাড়ি ভালো করে খেউরি করিয়ে পরে সাবান দিয়ে গোসল করানো। তারপর স্বামীর চুলে তেল দিয়ে শরীরে একটু পাউডার মেখে ফিটফাট এবং চেহারা-সুরতে প্রায় তরুণও করে ফেলল ছোট বউ। বউ এখন খুশি, ভালো লাগছে তার। দীর্ঘশ্বাস পড়ছে না ঘন ঘন। মুখে বরং একচিলতে হাসি।

খাওয়াদাওয়ার পর এক খিলি পান সেজে বিছানায় শোয়া স্বামীর মুখে গুঁজে দিয়ে বলে, ‘আমার কাজ শেষ হয় নাই।’

স্বামী: আবার কী বাকি রইল?

বউ: আছে, তুমি ঘুমাও। আমি ‘শোন’ দিয়া পাকা চুল বাছি।

পাকা চুল ফেলে স্বামীকে বউটি অনেকটা তারুণ্যমণ্ডিত করে ফেলে।

কটা দিন তাদের আনন্দেই কাটে। বউ যে ‘আমার বুইড়া সোয়ামি’ বলে হাসে, তার উত্তরে সে বলে, তুমি তো আমারে আবার জোয়ানই কইরা ফালাইছ।’

এবার বড় বউয়ের পালা শুরু হয়। সে মনে মনে বলে, সর্ব্বোনাশ! এ দেখি শিং ভাইঙ্গা বাছুরের দলে ঢুকছে! বয়স তো কমাইয়া ফালাইছে, পাকা চুলও তুইলা ফালাইছে। অহন তো ওই ডেমনির সঙ্গেই পরায় (প্রায়)

মানানসই! সে বুদ্ধি ঠিক করে ফেলে।

‘তুমি দাড়ি কাটবা না! দাড়িতে তোমারে সুন্দর লাগে। আর মাইনষে খারাপ কইব। কইব, বুইড়া ব্যাটা ছোকড়া সাজছে। আড়ালে-আবডালে হাসব।’

দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়। কাঁচা-পাকা দাড়ি দেখা যায়। এখন বুড়া বুড়া লাগে। বড় বউ খুশি। তার মনে হয়, এখন তার সঙ্গে মানানসই। বড় বউ দুপুরবেলা পান সেজে দেয়। গা টিপে দিয়ে বলে, ‘আরাম করে ঘুমাও, আমি চুল বাছি।’

প্রবীণ মনে মনে হাসে। ভাবে, মন্দ হয় নাই। দুই পক্ষেরই যত্ন পাইতেছি। এও তো দেখি এক ব্রিটিশ পলিসির সুযোগ। তৃপ্তি ও নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ওদিকে বড় বউ চুল তুলতে গিয়ে শুধু কাঁচা চুল তোলে। বুড়া দেখানোর জন্য পাকাগুলো রেখে দেয়।

এভাবে চলে ছোট বউ, বড় বউয়ের পালা এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তার মাথা কেশবিহীন। লোকটি তখন ঘটনা বুঝতে পেরে ছড়া কাটে—
‘বিয়ার নাম নাগরালি
বিয়ার নাম সাগরালি
দুই বিয়াতে মোর
চান্দি খালি।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
অক্টোবর ১০, ২০১১

627) রস+আলোর রবীন্দ্রগবেষণা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো গবেষণা কম হলো না। অনেকেই গবেষণা করেছেন তাঁর সৃষ্টি নিয়ে। তাহলে ‘রস+আলো’ বাদ যাবে কেন? তাই ‘রস আলো’র পক্ষ থেকে এবার রবীন্দ্রগবেষণায় নেমেছেন আলিম আল রাজি। ‘কূলের কাছাকাছি আমি ডুবতে রাজি আছি’

এই অংশ পাঠের পর আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন? রবীন্দ্রনাথ কূলের কাছাকাছি ডুবতে রাজি আছেন, কেন তিনি মাঝনদীতে ডুবতে চাইছেন না? তবে কি তিনি সাঁতার জানেন না? সাঁতার না জানার ভয়েই কি মাঝনদীকে ভয় পাচ্ছেন? বিশ্বকবি সাঁতার জানতেন না, এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। মেনে নেওয়া যায় না। ‘আমার এ দেহখানি তুলে ধরো’

এই অংশটা রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি অসাধারণ

উদাহরণ। বিশ্বকবি আগেই জানতেন, বাংলাদেশ নামের দেশটা দুর্নীতিবাজে ভরে যাবে। অতঃপর সেই দুর্নীতিবাজদের কয়েকজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে ব্যাপক প্যাঁদানি দেবে। প্যাঁদানির চোটে বেচারারা হয়ে পড়বে কাহিল। এ কারণে ঠিকমতো হাঁটতেও পারবে না। আদালতভবনে আসার আগে পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে আসতে হবে তাদের। এসব দুর্নীতিবাজের পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটার দৃশ্যটি মনে করে কবি লিখেছেন, ‘আমার এ দেহখানি তুলে ধরো’। ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না?’

দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ এ গানটি লিখেছেন আমাদের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা নিয়ে। কবি জানতেন, এমন এক সময় আসবে যখন বিদ্যুতের দেখা পাওয়াই হয়ে উঠবে বিরাট মুশকিলের ব্যাপার। ২৪ ঘণ্টায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাবে মানুষ। এই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই কবির সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?’ ‘আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব \’

এই দেশের রাজনীতিবিদদের কথা মনে করে লেখা হয়েছে এই লাইন দুটো। দেশের কাঁধে ভর করে ক্ষমতায় এসে রাজনীতিবিদেরা দুহাতে টাকা কামানো শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁদের টাকার ভান্ডার হয়ে যায় অশেষ। অবশ্য বিরোধী দলে চলে গেলে তাঁদের টাকা আবার কিছুটা ফুরিয়ে যায়। তবে সেটা বেশি দিনের জন্য না। পাঁচ বছর পর আবার যখন তাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তখন আবার তাঁরা হয়ে ওঠেন টাকার কুমির। জীবন হয় নব নব। ‘নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা’

রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন, একদা এই দেশে রস+আলো নামে একটা ম্যাগাজিন বের হবে। সঙ্গে এ কথাও তিনি জেনেছিলেন, ওই ম্যাগাজিনে তাঁর গান আর লেখা নিয়ে গবেষণা হবে, যেখানে সূক্ষ্মভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের বারোটা বাজানোর চেষ্টা করা হবে। তাই আগেভাগেই তিনি ‘নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা’—এ কথা বলে সবাইকে রস+আলো পড়তে বারণ করে দিয়ে গেছেন। এ কথাও জানিয়ে গেছেন, রস+আলোতে রস

নাই। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১০, ২০১১

628) পিঠ - নারায়ণ দাশশর্মা

বলতে পারেন কি এই শরীরটার সব অঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনাদরে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে কে? একটু ভাবলেই সকলে একবাক্যে জবাব দেবেন: ‘পিঠ’। আয়তনের দিক দিয়ে একক গরিষ্ঠতা যে-অংশটির, সেটিই সবচেয়ে অবহেলিত—এমনতর পরিহাস সাহারা মরুভূমি ছাড়া আর কারো ভাগ্যে দেখা যায়নি। পিঠ হল শরীরের ‘পশ্চাৎপদ দেশের’ অনুকল্প—তাই Back ward মানেই পশ্চাৎপদ।

সব দিক দিয়ে শোষিত এই পিঠের পক্ষ নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ দুটো সহানুভূতির কথা বলল না।

কত সাহিত্যে, কত কাব্যে রূপ বর্ণনার কত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখলাম: ‘মাথার চুল থেকে কপাল, ভ্রু, চোখ, নাক, গাল, ঠোঁট, দাঁত, চিবুকের তো কথাই নেই—ওরা হচ্ছে Privileged section; কিন্তু বর্ণনার বৈচিত্র্যে কমল-কর চম্পক অঙ্গুলি, মৃণাল-বাহু; কপাটবন্ধও কম যায় না। কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি; কবিদের কল্যাণে পা পর্যন্ত উতরে গেছে, অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে কালিদাসকে ঠেকানো যায়নি শ্রোণী-শিলা বর্ণনায়; কাঁধ আর তলপেট পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দৌড় দেখেছি। কিন্তু এত বড় বিরাটত্বের মহিমায় মহীয়ান পিঠ আজ পর্যন্ত যে আঁধারে, সেই আঁধারে।’

অথচ কেন? কোনো আধুনিকার বুকের উপর যে-বেণীটি লুটিয়ে পড়েছে, তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতে পারো আর পিঠের উপর লুটোলে তোমাদের কবিতার উচ্ছ্বাসে পিঠ-বেচারীর নামোল্লেখ পর্বটা করতেই তোমাদের কলমের কালি আর মনের রং ফুরিয়ে যায়—এ কেমন কথা? তোমার আগে-আগে চলা যে মেয়েটির পেছন দিক দেখতে দেখতে তুমি মোটর চাপা পড়ার উদ্যোগ করছ, তার পায়ের নৃত্যভঙ্গী দেখবে, মসৃণ গলার এতটুকু ফালির উপর সূক্ষ্মতম স্বর্ণরেখাটি তোমার চোখ এড়াবে না, অথচ মাঝখানে অত বড় পিঠখানা তুমি সত্যি লক্ষ্য করোনি—এ কি তাজ্জব ব্যাপার নয়? এই পর্যন্ত পড়ে যে রুচিবাগীশ বিকৃত মস্তিষ্কের দল লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, তাঁদের কাছে

দেহতত্ত্বের এই গূঢ় রহস্য বোঝানোর চেষ্টা নিশ্চয় বৃথা। অতএব আমাকে পলায়ন করতে হবে—অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হবে। এই ‘পৃষ্ঠপ্রদর্শন’ শব্দটা থেকেই বুঝবেন, পিঠের মতো বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই। একদিন পিঠ ছিল সন্ধিকামনার দ্যোতক, ব্যক্তিগত শ্বেত-পতাকা; যুদ্ধ করতে গিয়ে শেষে নিতান্ত বেকায়দায় পড়েছেন, কেবলমাত্র আপনার চির-উপেক্ষিত পিঠখানাকে ঘুরিয়ে শত্রুর সামনে ধরুন—ব্যস। আপনার গণ্ডারচর্মের ঢাল যা করতে পারেনি, আপনার স্বচর্ম-রচিত পিঠ অনায়াসেই আপনাকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু মানুষই পিঠের এ মহিমা থাকতে দিল না; বারংবার এপিঠ-ওপিঠ করতে গিয়ে শান্তির দূত পিঠকে করে ফেলল আক্রমণের মুখে একটা কামোফ্লেজ মাত্র। তখন থেকে শুধু পৃষ্ঠপ্রদর্শন নয়, সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন না করে আর বাঁচোয়া নেই। তবু পিঠ আজো যতটা আঘাত সহ্য করে মানুষকে পলায়নের সুযোগ দিচ্ছে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত হয়ে নেহরুকে ততটা সুযোগ দিতে পারেনি।

অথচ, এই পিঠের নিকটতম প্রতিবেশী পেটের মতো ওর অত বড় শত্রু আর নেই। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—পেটে খেলে পিঠে সয়। এমন কথা কেউ বলে না যে পিঠ গদীয়ান থাকলে পেট উপোস সহ্য করবে; যেন পিঠের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজে উত্তম-মধ্যম হজম করে পেটকে উত্তম-মধ্যম হজম করার সুযোগ দেওয়া। সরকারি শ্রমসচিব যখন শ্রমিকদের কম মাইনে নিয়ে বেশি কাজ করতে বলেন, তখনো সেটা এত বড় পরিহাসের মতন শোনায় না। আসলে পিঠ বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে পড়ে থাকে; আমাদের নিজেদের চক্ষু কোনোদিন তার পরিচয় লাভ করতে পারে না। পিঠের এই হেনস্তার মূল হচ্ছে এই অন্তরালে বাস। যে-রত্ন উজ্জ্বলতম জ্যোতি ছড়িয়ে চিরকাল পড়ে রইল সমুদ্রের অতলে, যে-ফুল নির্জন বনভূমিকে চকিত করেই শুধু গন্ধ বিলিয়ে গেল—তাদের সঙ্গে তুলনা হয় এই অনাদৃত অঙ্গের। তাই তো আজীবনের অনুচর এই পিঠের স্থান মেলে না কোথাও, যেমন মেলে না লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক মিল্টন আর ক্রমওয়েলের।

ইংরেজি Patro☆ শব্দটির বাংলা অনুবাদ

হয়েছে পৃষ্ঠপোষক। এমন সুন্দর অনুবাদ বড় দেখা যায় না। Patron-দের সব কারবারই পেছনে, পিঠের দিক থেকে। কক্ষনো কোনো Patron-কে কোনো কাজের সামনে দেখা যায় না, তাঁদের যেটুকু পুষিয়ে নেওয়ার সেটুকু সবার পৃষ্ঠ থেকেই নিয়ে থাকেন। ওঁদের পেট-ro☆ না ‘পিঠ-ron’ বলাই বোধহয় উচিত হবে। অবশ্য নজর তাঁদের পেটের দিকেই: নিজের পেট মেদবহুল করবার এবং আপনার পেট ফাঁসাবার। যুগ যুগ ধরে এমনি অনাদৃত থাকার ফলে পিঠ আজ নিতান্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে। একটু পিঠ চাপড়ে কত সহজেই তাকে খুশি করা যায়, পিঠে খাইয়েও বোধহয় ততটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পিঠের অনাদরের দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। অনেকেই আজ বুঝতে পারছে পেটে খেয়ে পিঠে সওয়া আর বেশি দিন নয়। তাই নেহরুকে দেখছি পিকিং সরকারকে তোয়াজ করতে উঠে পড়ে লাগতে, স্ট্যালিন সাহেবের মন রাখা কথা বলতে। কেন? না, পিঠ সামাল। মহাজনও যেন গতঃ স পন্থা। অতএব আমাদেরও পিঠ সামলাতে হচ্ছে। পিঠে ছুরি না পড়ে, সেদিকের সাথে আরো লক্ষ রাখতে হবে পিঠ চাপড়ানোর ফলে সহজে না গলে যাই; আমরা বাঙালিরা পিঠে লাঠিঘুষি সহিতেই এত অভ্যস্ত যে পিঠ চাপড়ানোতে বড় সহজেই বেড়ালের মতো ঘরঘর শব্দ করে চোখ বুজি; মহা-আনন্দে গেয়ে উঠি—রঘুপতি রাঘব রাজারাম। কিন্তু এবারে, ইলেকশন আসছে—পিঠ চাপড়ানোতে ভুললে অদূর ভবিষ্যতে পিঠে কুলো বেঁধেও কুলোবে না। শ্যাম-কুল দুই-ই যাবে। নারায়ণ দাশশর্মা: ভারতীয় লেখক। তাঁর এ সরস রচনাটি অচলপত্র তৃতীয় বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫৭ থেকে সংকলিত। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৭, ২০১১

629) একটি রূপকথা

সে এক আদ্যিকালের কথা। এক রাজ্যে ছিল এক বুড়ি। সেই বুড়ির খুব দুঃখ। তার স্বামী মারা গেছে বহু আগে, কোনো ছেলেপেলেও নেই। আছে শুধু একটা ছাগল। ভিক্ষা করে কোনোরকমে নিজের আর ছাগলের পেট চলে। তো, একদিন বুড়ি ভিক্ষা করছে। এক বাড়ি থেকে তাকে ভিক্ষা দিল একটা প্রদীপ। বুড়ি

ভাবল, এটা দিয়ে কী করা যায়। যা থাকে
কপালে, ভেবে ঘষা দিল প্রদীপে।

তারপর যা হয় আরকি। এক দৈত্য এসে
হাজির। বলল, ‘হুকুম করুন। আপনার তিনটা
ইচ্ছা পূরণ করব।’

বুড়ি তার প্রথম ইচ্ছা জানাল, ‘আমাকে পৃথিবীর
সবচেয়ে সুন্দর রাজপ্রাসাদের মালিক বানিয়ে
দাও।’

জো হুকুম। বুড়ি রাজপ্রাসাদে এসে গেল।

‘আপনার দ্বিতীয় ইচ্ছা কী?’

‘আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যা
বানিয়ে দাও।’

তা-ই হলো।

‘তৃতীয় ইচ্ছা কী?’

‘আমার পোষা ছাগলটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে
হ্যান্ডসাম পুরুষ বানিয়ে দাও।’

বুড়ির এই ইচ্ছাও পূরণ হলো।

‘আমি এখন মুক্ত।’ এই বলে দৈত্য অদৃশ্য
হলো।

সুদর্শন যুবক (যে আগে ছাগল ছিল) এগিয়ে
এল বুড়ির (যে এখন সুন্দরী রাজকন্যা) দিকে।

বুড়ির নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বুড়ির কানে
কানে সে বলল, ‘আপনার কি মনে আছে
শৈশবে আপনি আমাকে খাসি করে

দিয়েছিলেন?’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো,
অক্টোবর ১৭, ২০১১

630) পাঁচ মিনিট - সাজেলি ৫মিদিন

সন্তর্পণে দরজা খুলে মেয়েটি ঘরে ঢোকাল
ছেলেটিকে।

‘বাসায় কেউ নেই?’ ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

‘নেই।’

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল,

‘আমাদের হাতে আছে পাঁচ মিনিট সময়।’

তারপর মা এসে পড়বে।’

‘কিন্তু এই সময়ে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারব
তো?’ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে প্রশ্ন করল ছেলেটি। ‘তুমি
হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমাকে
অকপটে একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই।’

‘কী স্বীকারোক্তি?’

‘জানো, আমি আগে কখনো...মানে, আমার
জীবনে এই প্রথম...’

‘হতেই পারে না!’ ভারি অবাক হলো মেয়েটি।

‘সত্যি বলছি, আগে কখনো...’

‘বিশ্বাসই হয় না,’ মেয়েটি বলল। ‘তোমার বয়স কত?’

‘আঠারো।’

‘আঠারো?! অথচ কখনো...সত্যি বিরল ঘটনা।

তুমি সত্যি সত্যিই কখনো...’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি।’

‘অসুবিধে নেই। সব ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর। দেখো, কী যে তৃপ্তি! ভুলতে পারবে না।’ মেয়েটি আলিঙ্গনে জড়াল ছেলেটিকে, চুমু খেল, তারপর তাকে বেডরুমে ঢুকিয়ে বসাল বিছানার ওপরে। পর্দা টেনে দিয়ে চালু করে দিল মৃদু সংগীত।

‘একটু অপেক্ষা করো,’ মেয়েটি বলল ফিসফিস করে। ‘আমি এখনই আসছি।’

দরজার আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

পানি পড়ার ঝিরঝির শব্দ ছেলেটির কানে বেজে উঠল পরিচিত গানটির মতো ‘পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট...’

‘তুমি রেডি? আমি আসছি,’ শোনা গেল মেয়েটির গলা। ‘আর একটু ধৈর্য ধরো...আর এক সেকেন্ড। ব্যস, চোখ বন্ধ করো।’

ভেসে এল পায়ের মৃদু শব্দ, অবর্ণনীয় সুগন্ধ। চোখ-বন্ধ-করা অবস্থাতেই দুহাত সামনে বাড়িয়ে ধরল ছেলেটি। তার হাতের তালু অনুভব করল উষ্ণতা আর আর্দ্রতা।

চোখ খুলে সে দেখল বড় এক বাটি। সেখান থেকেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে নুডলসের ক্ষুধাবর্ধক সুবাস।

‘দেখলে তো,’ বলে মেয়েটি চুমু খেল ছেলেটির গালে। ‘বলেছিলাম না, পাঁচ মিনিট! এটা হলো ইনস্ট্যান্ট নুডলস। খাও, জলদি খাও, নয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৭, ২০১১

631) পেনসিলেরা - ভ্রাদিমির শিম্বোভস্কি

একদিন কান পেতে আমার পেনসিলদের কথোপকথন শুনলাম।

লাল পেনসিল বলল বড়াই করে:

—আমি সমস্ত ভুল শুদ্ধ করি। আমি অপাপবিদ্ধ, নিষ্পাপ।

কেমিক্যাল পেনসিল চিৎকার করে বলল:

—আমাকে কেউ মুছে ফেলতে পারে না। আমি অমর।

টেকনিক্যাল পেনসিল যুক্তি দেখাল:

—আমার চেয়ে সূক্ষ্ম ও সরু করে কেউ আঁকতে পারে না। আমি অনন্য।

সাধারণ পেনসিলের গলা শোনা গেল না। লিখে লিখে, ক্ষয় হতে হতে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বিতর্কে অংশ নেওয়ার শক্তি তার আর নেই।

আমার মনে হলো, মাঝেমধ্যে অতিপ্রয়োজনীয় না হওয়াটাই কি শ্রেয় নয়? **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১৭, ২০১১

632) অবৈধ কাপড় ধোলাই - ডিঙর ভেরেজনিকভ

কাপড়চোপড় ধোয়ার সিদ্ধান্ত নিল জামকভ। টুকটাক কিছু। একটা শার্ট, আইসল্যান্ডের দুটো পতাকা (কেন জানি ছিল তার কাছে)। বউকে তো আর এই তুচ্ছ ব্যাপারে অনুরোধ করা যায় না! আর তার চেয়ে বড় কথা, তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে আগেই। তো, ধোলাই-করিতব্য বস্তুগুলো ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে যেই অন করল সে, বেল বেজে উঠল দরজায়। কালো ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক।

‘ওয়াশিং মেশিন চালানোর লাইসেন্স আছে?’ প্রশ্ন করল তারা।

ইউনিফর্ম পরা লোকদের জামকভ শ্রদ্ধা করে এবং ভয় পায় কিছুটা। সে ওয়াশিং মেশিনের সব কাগজপত্র বের করে দেখাল।

‘এসব নয়,’ হাত নেড়ে বলল তাদের একজন।

‘ওয়াশিং মেশিন চালানোর লাইসেন্স। পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স পাওয়ার কথা আপনার।’

‘জীবনে প্রথম শুনছি এমন কথা,’ থতমত খেয়ে জামকভ বলল।

‘আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কাউকে দায়িত্বমুক্ত করে না,’ অতিথিরা বুঝিয়ে বলল তাকে।

জামকভকে দিতে হলো জরিমানা এবং অতিথিরা চলে গেল।

‘ব্যাটারা আবার এসে হাজির হবে না তো!’

ভাবল জামকভ এবং আবার চালু করল মেশিন।

ঠিক তখনই বেল বেজে উঠল দরজায়।

‘লাইসেন্স ছাড়াই মেশিন চালানো অব্যাহত রেখেছেন?’ জিজ্ঞেস করল ইউনিফর্ম পরা ওই লোক দুটোই।

‘তো, হয়েছেটা কী!’ দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে জামকভ বলল।

‘হয়েছেটা কী মানে!’ শ্লেষমাখা স্বরে বলল এক ইউনিফর্মধারী। ‘পাশের অঞ্চলে এক লোক লাইসেন্স ছাড়া ওয়াশিং মেশিন চালাচ্ছিল, তখন সেটা বিস্ফোরিত হয়। পুরো দালানটাই উড়ে গেছে।’

আবার জরিমানা দিয়ে দরজা লাগিয়ে পুনরায় ওয়াশিং মেশিন অন করল সে। মিনিট না ঘুরতেই আবার বেল।

‘অর্থাৎ আপনি আইন মানেন না!’ সিদ্ধান্ত টানল লোক দুটি। ‘আপনাকে থেপ্তার করা হলো।’ হকচকিত জামকভ মেশিন বন্ধ করে চলল অপরিচিত এ লোক দুটির সঙ্গে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর তারা এসে থামল জীর্ণ পরিত্যক্ত একটি বাড়ির কাছে।

‘এখানে,’ ঘরের দরজা খুলে তারা বলল, ‘এটা হাজত।’

‘হাজতের চেহারাটা কেমন জানি,’ অবাক হয়ে জামকভ বলল।

‘আসলে আমাদের ডিপার্টমেন্টটা খোলা হয়েছে বেশি দিন হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই মোটা দেয়াল আর গরাদওয়ালা সেল বানানো হবে এখানে।’

ভেতরে একেবারে ঘুরঘুটি অন্ধকার নয়, অল্পস্বল্প আলো আসছে ফুটোফাটা দিয়ে। জামকভ বসে রইল সেখানে। পেরিয়ে গেল এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা...

‘অদ্ভুত কাণ্ড তো!’ ভাবল জামকভ। ‘খাবার নিয়ে আসছে না কেউ, জেরা করতেও ডাকছে না...আর সম্প্রতি খোলা এ ডিপার্টমেন্টটাই বা কিসের?’

ভাগ্যিস, ঘরের এক কোণে একটা কোদাল পড়ে ছিল। ঘণ্টা খানেক সময় লাগল সুড়ঙ্গ খুঁড়তে। বের হয়ে জামকভ হাঁটা ধরল বাড়ির দিকে। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল, টিভি, ফ্রিজ, সোনার প্রলেপ দেওয়া চামচের সেট—সব উধাও। ‘কেন যে আমি অবৈধভাবে ওয়াশিং মেশিন চালু করেছিলাম!’ খুব অনুশোচনা হলো জামকভের। ‘শাস্তি হিসেবে আমার সব জিনিসপত্র জব্দ করে নিয়ে গেছে।’

ওয়াশিং মেশিনটা অবশ্য রেখে গেছে। অবশ্য ওটা থাকা বা না থাকা একই কথা। লাইসেন্স ছাড়া চালানো তো যাবে না। কিন্তু লাইসেন্স পাওয়ার পরীক্ষা কোথায় দিতে হয়, সেটাও তো

তার জানা নেই! সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,
অক্টোবর ২৪, ২০১১

633) ভাগ্য - আনাতোলি ফ্রশকিন

পৃথিবীর কোনো কিছুই মানুষের ওপর নির্ভর
করে না। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ভাগ্য।

আমরা ছিলাম তিন বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে গেছি,
এখন কাজ করি একসঙ্গে, বিয়ে করেছি একই
দিনে। বিবাহিত জীবন অতিষ্ঠ লাগতে শুরু করে
আমাদের একই সময়ে।

প্রথমজন একদিন তার স্ত্রীকে গলা চড়িয়ে বলে
বসল, ‘চুপ করো তো! অন্তত এক মিনিটের
জন্য!’

স্ত্রী হতভম্ব, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল এবং
কী একটা ওলট-পালট হয়ে গেল তার ভেতর।

সে অন্যদের শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলো
দেখতে পেতে শুরু করল। ঠিক এক্স-রের
মতো। তাকে চটজলদি পাঠানো হলো খুব
অভিজাত এক হাসপাতালে। চাকরিতে নিয়োগ
পেল সে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করে।

স্বামী পারলে তাকে কোলে করে নিয়ে বেড়ায়।

এই খবর পেয়ে দ্বিতীয়জন গলা চড়াল তার স্ত্রীর
ওপর, ‘চুপ করো তো! অন্তত এক মিনিটের
জন্য!’

স্ত্রী হতভম্ব, তারপর ঘোর কাটিয়ে উঠে বলল,
‘তুমি নিজে চুপ করো! গর্দভ কোথাকার!’

দ্বিতীয়জন প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল এবং কী
একটা ওলট-পালট হয়ে গেল তার ভেতর। সে

অন্যদের শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলো দেখতে
পেতে শুরু করল। তাকে চটজলদি পাঠানো
হলো খুব অভিজাত এক হাসপাতালে। চাকরিতে
নিয়োগ পেল সে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন
করে এখন। স্ত্রী পারলে তাকে কোলে করে
নিয়ে বেড়ায়।

একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর গলা চড়ালাম,
‘চুপ করো তো! এখনই!’

স্ত্রী হতভম্ব তো হলোই না, ধীরগতিতে ফ্রাইপ্যান
তুলে নিল হাতে...তারপর কষে হাঁকাল আমার
মাথা বরাবর। মনে হলো, আমার শরীরের
ভেতরের অঙ্গগুলো ছিঁড়ে গেল।

আমি এখন হাসপাতালে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা
বেরিয়ে যাচ্ছে আমার চিকিৎসার পেছনে।

ভাগ্য। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর
২৪, ২০১১

634) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকা - ড. কুক্স

সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুলব্যাগে স্যান্ডউইচ (প্রকাশ্যে) এবং এক প্যাকেট সিগারেট (গোপনে) ঢোকাতে ঢোকাতে রোনি প্রশ্ন করল মা-বাবাকে লক্ষ্য করে, ‘বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকা—এর মানে কী?’

‘বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার মানে হচ্ছে,’ প্রাণবন্ত কণ্ঠে মা বললেন, ‘সকালবেলা নারী যখন কফি বানায়, আর সেই সময়ে পুরুষ সুখনিদ্রামগ্ন থাকে...’

‘বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার মানে হচ্ছে,’ বাবা বলতে শুরু করলেন সোৎসাহে, ‘যখন নারী অরুচিকর কী একটা বস্তু বানিয়ে মনে করে, সে তুর্কি স্টাইলে কফি বানিয়েছে...’

‘যখন পুরুষ বাসায় নারীর সঙ্গে খ্যাঁচখ্যাঁচ করে, কারণ অফিসে তাকে কেউ পাত্তা দেয় না...’

‘রোনি, আমার কথা শোনো। যখন নতুন কেনা কোনো হ্যাট পরলে নারীকে হেলমেট পরা সৈনিকের মতো লাগে বলে সে পুরুষের সঙ্গে খ্যাঁচখ্যাঁচ করে...’

‘যখন নতুন হ্যান্ডব্যাগ কেনার অধিকার নারীর থাকে না...’

তাদের বচসা বিঘ্নিত হলো কলবেলের লম্বা শব্দে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল রোনি।

‘তুমি কোথায় গিয়েছিলে?’ মা জিজ্ঞেস করলেন।

‘স্কুল থেকে ফিরলাম। পাঁচ-পাঁচটা ক্লাস ছিল। কোনোমতে পার করে এলাম। খিদে পেয়েছে। খাবার রেডি?’

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ৩১, ২০১১

635) কর্মস্থলে - যুগরি প্রকদেষ্কা

আমাকে ডেকে পাঠালেন পিওতর সভিরিদভিচ।

‘আচ্ছা, বলুন তো,’ আলমারি আর লক বক্সের মাঝামাঝি উদাস চোখে তাকিয়ে তিনি চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি এখন কী করছেন?’

‘কী করছি মানে?’ সপ্রতিভ উত্তর আমার?

‘নানান ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।’

‘যেমন?’

‘যেমন? এই ধরুন গিয়ে...নানাবিধ সমস্যার সমাধান করছি।’

‘কী কী সমস্যা?’

‘ইয়ে মানে, বেশ কিছু সমস্যা...’

‘ঠিক কোন সমস্যাগুলো?’

‘যেসব সমস্যার মুখোমুখি প্রতিদিন আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় জীবন।’

‘কী সব সমস্যার মুখোমুখি জীবন আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়?’

‘বাস্তব কিছু সমস্যা।’

‘বাস্তব এই সমস্যাগুলোর সারকথা কী?’

‘ইয়ে মানে, বাস্তব এই সমস্যাগুলোর...আচ্ছা, শুনুন, আপনি কী চান আমার কাছে? আমার চাকরি খাবেন? তাহলে সতর্ক করে দিয়ে বলি: কাজটা অত সহজ হবে না। আমি এখানে চাকরি করছি বহু বছর ধরে।’

‘আমি শুধু জানতে চাইছি, কী নিয়ে কাজ করেন আপনি?’

‘কী নিয়ে মানে? সবাই যা নিয়ে কাজ করে, আমিও তা-ই করি।’

‘সবাই কী নিয়ে কাজ করে?’

‘সবাই যা নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন, তা নিয়েই করে।’

‘হুমম।’ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পিওতর সভিরিদভিচ। ‘প্রশ্নটাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা যাক: অফিস আওয়ারে আপনাকে কী কী কর্তব্য পালন করতে হয় প্রতিদিন?’

‘এক দিনের সঙ্গে আরেক দিনের মিল নেই তো...’

‘তাহলে এক মাসের কথাই না হয় ধরা যাক?’

‘নির্দিষ্ট কোনো ধরন নেই। তবে আমি কাজ করি বিবেকবানের মতো, সুচিন্তিতভাবে ও সোৎসাহে...।’

‘কী নিয়ে কাজ করেন?’

‘আবার শুরু করলেন! আমি তো বলেইছি, আমার ধারণা...’

‘প্রশ্নটা এবার ভিন্নভাবে করি: আপনার ডিপার্টমেন্টে আপনার কলিগরা কী করে?’

‘যে যার দায়িত্ব পালন করে।’

‘নিজের দায়িত্বই তো পালন করবে, অন্যেরটা নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের দায়িত্বের সারকথাটা কী? ধরুন, আপনি অফিসে এলেন, বসলেন নিজের জায়গায়।’ ‘তারপর?’

‘তারপর আর কী? কাজ করি। আমি তো বলেইছি সে কথা।’

‘আচ্ছা, আপনার ডিপার্টমেন্টের কাজ কী?’

‘কর্তব্য পালন করা।’

পকেট থেকে রুমাল বের করে পিওতর

সভিরিদিভিচ ঘর্মান্ত কপাল মুছলেন।

‘আপনি কি শেষমেশ বলবেন, আপনার

ডিপার্টমেন্টের কাজ কী?’ চিৎকার করে উঠলেন

তিনি। ‘মাটির পাত্র বানানো? মোজা বোনা?

নাকি মুরগির পালক বাছা?’

‘মুরগির কথা আসছে কেন?’ মনটা খারাপ হলো

আমার। ‘নাকি আমি বাসা থেকে চিকেন

স্যান্ডউইচ নিয়ে আসি বলে খোঁটা দিলেন? চান

তো আর আনব না।’

‘যে ডিপার্টমেন্টে আপনি কাজ করেন, সেটার

নাম কী?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন প্রায় ফিসফিস

করে।

স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় করার প্রাণপণ

চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। নাম মনে করতে পারলাম

না।

‘লম্বা একটা নাম—সাত কিংবা এগারো শব্দের,’

বললাম আমি।

‘আর আপনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন,

সেটার নাম কী?’ তিনি প্রশ্ন করলেন একেবারে

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীরে। এই

নামটা মগজের কোথাও আছে বটে, কিন্তু সেখান

থেকে বের করতে পারলাম না কিছুতেই। ‘এই

নামটাও দীর্ঘ, তবে আমার ডিপার্টমেন্টের নামের

চেয়ে ছোট,’ আমি বললাম।

‘ডিপার্টমেন্টের নামের চেয়ে ছোট বলছেন?’

‘অনেক ছোট। তিন বা পাঁচ শব্দ কম হতে

পারে।’

‘কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা কী?’

শ্লেষমাখা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নীরবে। কিন্তু জীবনের

কঠিন মুহূর্তগুলোয় যেমন হয়ে থাকে, কোথেকে

উদ্ধারকারী এক আইডিয়া এল মাথায়। পিওতর

সভিরিদিভিচ তাকিয়ে ছিলেন ছাদের দিকে।

আমি তাঁর অলঙ্কে পকেট থেকে পরিচয়পত্র

বের করে পড়তে শুরু করলাম, ‘এন্টারপ্রাইজ

অব সুপারভিশন...’

‘যথেষ্ট, যথেষ্ট,’ প্রফুল্ল স্বরে তিনি বললেন।

‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম এবার আমারও মনে

পড়েছে। অর্ধেক দিন ধরে মনে করার চেষ্টা

করছিলাম। আপনাকে ডেকেছিলাম মনে করিয়ে

দিতে। এখন গিয়ে কাজ করুন। ধন্যবাদ।’

(সোভিয়েত আমলে রচিত এই গল্পে এক সরকারি অফিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে) সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ৩১, ২০১১

636) আট কলা - জসীম উদ্দীন

রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ। কোনো কাজে একটু এদিক-ওদিক হইলেই সে তার বউকে ধরিয়া বেদম মারে। সেদিন বউ সকালে সকালে উঠিয়া ঘর-দোর ঝাঁট দিতেছে, রহিম ঘুম হইতে উঠিয়া বলিল, ‘আমার হুঁকায় পানি ভরিয়াছ?’ বউ বলিল, ‘তুমি তো ঘুমাইতেছিলে, তাই হুঁকায় পানি ভরি নাই। এই এখনই ভরিয়া দিতেছি।’ রহিম চোখ গরম করিয়া বলিল, ‘এত বেলা হইয়াছে, তবু হুঁকায় পানি ভর নাই! দাঁড়াও, দেখাইতেছি তোমায় মজাটা।’ এই বলিয়া সে যখন বউকে মারিতে উঠিয়াছে, বউ বলিল, ‘দেখ, যখন-তখন তুমি আমাকে মার ধর কর, আমি কিছুই বলি না। জান, আমরা মেয়ে জাত? আট কলা হেকমত আমাদের মনে মনে। ফের যদি মার, তবে আট কলা দেখাইয়া দিব।’ এই কথা শুনিয়া রহিম শেখের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে একটা লাঠি লইয়া বউকে মারিতে মারিতে বলিল, ‘ওরে শয়তানী, দেখা দেখি তোর আট কলা কেমন? তুই কি ভাবিয়াছিস আমি তোর আট কলাকে ডরাই?’ বলুক্ষণ বউকে মারিয়া রহিম মাঠের কাজ করিতে বাহির হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বউ মনে মনে একটি মতলব আঁটিল। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সহজেই মিটিয়া যায়। দুপুরে রহিম ভাত খাইতে আসিলে বউ রহিমের কাছে জানিয়া লইল, কাল সে কোন ক্ষেতে হাল বাহিবে। বিকাল হইলে বউ বাড়ির কাছের এক জেলেকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, ‘জেলে ভাই! কাল ভোর হওয়ার কিছু আগে তুমি আমাকে একটি তাজা শোল মাছ আনিয়া দিবে। আমি তোমাকে এক টাকা আগাম দিলাম। আরও যদি লাগে, তাও দিব। শেষ রাতে আমি জাগিয়া খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিব। তখন তুমি গোপনে শোলমাছটি আমাকে দিয়া যাইবে।’

গ্রামদেশে একটি শোল মাছের দাম বড়জোর আট আনা। এক টাকা পাইয়া জেলে মনের খুশিতে বাড়ি ফিরিল। সে এ-পুকুরে জাল ফেলে, ও-পুকুরে জাল ফেলে। কত টেংরা, পুঁটি, পাবদা

মাছ জালে আটকায়; কিন্তু শোল মাছ আর আটকায় না। রাত যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন সত্য সত্যই একটি শোলমাছ তাহার জালে ধরা পড়িল। তাড়াতাড়ি মনের খুশিতে সে মাছটি লইয়া রহিম শেখের বাড়ির খিড়কি-দরজায় আসিল। বউ তো আগেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাছটি লইয়া বউ তাড়াতাড়ি যে ক্ষেতে রহিম আজ লাঙল বাহিবে, সেখানে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল।

সকাল হইলে রহিম ক্ষেতে আসিয়া লাঙল জুড়িল। সে এদিক হইতে লাঙলের ফাড়ি দিয়া ওদিকে যায়, ওদিক হইতে এদিকে আসে। হঠাৎ তাহার লাঙলের তলা হইতে একটি শোলমাছ লাফাইয়া উঠিল। রহিম আশ্চর্য হইয়া মাছটি ধরিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর বউকে বলিল, ‘লাঙলের তলায় এই তাজা শোল মাছটি পাইলাম। খোদার কি কুদরত! এই মাছের কিছুটা ভাজা করিবে, আর কিছুটা তরকারি করিবে। অনেক দিন মাছ-ভাত খাই না। আজ পেট ভরিয়া মাছ-ভাত খাইব।’ এই বলিয়া রহিম ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। দুপুর হইতে না হইতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে বউ-এর কাছে খাইতে চাহিল। বউ একথালি ভাত আর কয়েকটা মরিচ-পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।

একে তো ক্ষুধায় তাহার শরীর জ্বলিতেছে, তাহার ওপর এই মরিচ-পোড়া আর ভাত দেখিয়া রহিমের মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে চোখ গরম করিয়া বলিল, ‘সেই শোলমাছ কি করিয়াছিস শীর্ণীর বল?’ বউ যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল, ‘কই, মাছ কোথায়? তুমি কি আজ বাজার হইতে মাছ কিনিয়াছ?’

রহিম বলিল, ‘কেন, আমি যে আজ ইটা-ক্ষেত হইতে শোলমাছটা ধরিয়া আনিলাম।’ বউ উত্তর করিল, ‘বল কি? ইটা-ক্ষেতে কেহ কখনো শোল মাছ ধরিতে পারে? কখন তুমি আমাকে শোলমাছ আনিয়া দিলে? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে?’

তখন রহিমের মাথায় রাগের আগুন জ্বলিতেছে। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, ‘ওরে শয়তানী! এমন মাছটা তুই নিজে রাঁধিয়া খাইয়া আমার জন্য রাখিয়াছিস মরিচ-পোড়া আর ভাত! দেখাই তোর

মজাটা!’ এই বলিয়া রহিম বউকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। বউ চিৎকার করিয়া সমস্ত পাড়ার লোক জড়ো করিয়া ফেলিল, ‘ওরে তোমরা দেখরে, আমার সোয়ামী পাগল হইয়াছে, আমাকে মারিয়া ফেলিল।’

বউ-এর চিৎকার শুনিয়া এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে বহু লোক আসিয়া জড়ো হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমরা এত চেষ্টামেচি করিতেছ কেন? তোমাদের কি হইয়াছে?’ রহিম বলিল, ‘দেখ ভাই সকলরা! আজ আমি একটা তাজা শোলমাছ ধরিয়া আনিয়া বউকে দিলাম পাক করিতে। এই রান্ধসী সেটা নিজেই খাইয়া ফেলিয়াছে। আর আমার জন্য রাখিয়াছে এই মরিচ-পোড়া আর ভাত। আপনারাই বিচার করেন এমন বউ-এর কি শাস্তি হইতে পারে?’ বউ তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, ‘দোহাই আপনাদের সকলের। আপনারা ভালোমতো পরীক্ষা করিয়া দেখেন আমার সোয়ামীর মাথা খারাপ হইয়া সে যা’তা’ বলিতেছে কিনা? ওর কাছে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, ও কোথা হইতে মাছ আনিল, আর কখন আনিল?’

রহিম বলিল, ‘আজ সকালে আমি ঐ ইটা-ক্ষেতে যখন লাঙল দিতেছিলাম, তখন একটি এত বড় শোলমাছ আমার লাঙলের তলে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। সেইটি ধরিয়া আনিয়া বউকে রান্না করিতে দিয়াছিলাম।’

বউ পাড়ার সবাইকে বলিল, ‘আপনারা সবাই বলুন, শুকনা মাঠে তাজা শোলমাছ কেমন করিয়া আসিবে? আমার সোয়ামী পাগল না হইলে এমন কথা বলিতে পারে?’

गाँয়ের লোকেরা সকলেই বলাবলি করিল, ‘রহিম শেখের ইটা-ক্ষেতের ধারে-পাশে কোনো হুঁদারা-পুকুর নাই। সেখানে শোলমাছ আসিবে কোথা হইতে? রহিম নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে।’ তখন তাহারা যুক্তি করিয়া রহিমকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেল। সে যখন বাধা দিতেছিল, সকলে তখন তাহাকে কিল-থাপ্পড় মারিতেছিল। একজন বলিল, ‘পানিতে চুবাইলে পাগলের পাগলামি সারে। চল ভাই, একে পুকুরে লইয়া গিয়া কিছুটা চুবাইয়া আনি।’ যেই কথা সেই কাজ। সকলে ধরিয়া রহিমকে খানিকটা পুকুরে চুবাইয়া আনিল। রহিম বাধা দিতে চাহে, কিন্তু কার বাধা কে মানে।

রহিম রাগে শোষাইতে লাগিল। তখন একজন বলিল, ‘উহাকে আজই পাগলা গারদে লইয়া যাও। নতুবা রাগের মাথায় কাকে খুন করিয়া ফেলে বলা যায় না।’

রহিমের বউ বলিল, ‘আপনারা আজকের মতো ওকে খামের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া যান। কাল যদি না সারে, পাগলা গারদে লইয়া যাইবেন।’ গাঁয়ের লোকেরা তাহাই করিল। রহিমকে ঘরের একটি খামের সঙ্গে কষিয়া বাঁধিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গেল।

সব লোক চলিয়া গেলে বউ রহিমের হাতে-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাছ-ভাতের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিল। সদ্য পাক করা মাছের তরকারির গন্ধ সারা দিনের না খাওয়া রহিমের নাকে আসিয়া লাগিল। সে মাথা নীচু করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। পাখার বাতাস করিতে করিতে বউ বলিল, ‘দেখ, আমরা মেয়ে-জাত, আট কলা বিদ্যা জানি; তারই এক কলা আজ তোমাকে দেখাইলাম। তাতেই এত কাণ্ড! আর বাকি সাত কলা দেখাইলে কি যে হইত বুঝিতেই পার।’ রহিম বলিল, ‘দোহাই তোমার, আর সাত কলার ভয় দেখাইও না। এই আমি কছম কাটলাম। এখন হইতে আর যদি তোমার গায়ে হাত তুলি, তখন যাহা হয় করিও।’

[গ্রামবাংলার হাসির গল্প থেকে সংগৃহীত] **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৪, ২০১১

637) পরীক্ষা - আন্দ্রেই ইয়াখোনভ

পেনাল্টি স্পটে রাখা ছিল বলটা—নতুন, হলুদ ও শিশিরসিক্ত, তাই চকচকে। চারপাশে নিখুঁতভাবে ছাঁটা ঘাস। আমি ছুটে গিয়ে কিক নিলাম। মিটার দুই গিয়ে বলটা আটকে গেল ঘাসে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল গোলরক্ষক।

‘পাঁচ বছর ধরে তোমাকে কী শিখিয়েছে?’
পরীক্ষা কমিটির সবাই জিজ্ঞেস করলেন সমস্বরে।

আমি, বিষাদগ্রস্ত, মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম।
‘আচ্ছা, এবার তুমি গোলপোস্ট লক্ষ্য করে দৌড় শুরু করো, আমরা তোমাকে পাস দেব,’ বললেন এক পরীক্ষক। ‘তুমি চলন্ত অবস্থায় কিক নেবে।’

আমি দৌড় শুরু করলাম, পাস পেলাম বল,

কিন্তু কিক করতে গিয়ে পা পড়ল বলের ওপর।

আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিলাম।

‘হুম,’ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন পরীক্ষা কমিটির সদস্যরা। ‘পাঁচ-পাঁচটা বছর! সোজা কথা নাকি!’

‘নাকি গোলপোস্টের সামনে লব দেব আর সে হেড দিয়ে গোল করুক?’ প্রস্তাব দিল একজন।

‘না না, সেটার প্রয়োজন নেই। তার জন্য এটা খুব দুরূহ হবে,’ বাকিরা বলল সমস্বরে।

‘তাহলে থ্রো করুক সে,’ সবার কথা ছাপিয়ে কার যেন উঁচু কণ্ঠ শোনা গেল।

আমি থ্রো করলাম। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সবাই।

‘সর্বনাশ! এক হাত দিয়ে! ঠিক যেন শট থ্রো! সে তো আইনকানুনও জানে না।’

পরীক্ষা কমিটির সদস্যরা চেষ্টা করছিলেন পরস্পরের দিকে না তাকাতে।

‘পাঁচ বছর...পাঁচ বছরের শিক্ষা...’ দুর্বল কণ্ঠে একজন বললেন, ‘নাকি তাকে ১০০ মিটার দৌড়াতে বলে দেখব?’

‘সে তো ফুটবলার, দৌড়বিদ নয়।’

‘পাঁচ বছর...পাঁচ বছর...’ আক্ষেপ শোনা গেল আবার।

কমিটির প্রধান সবাইকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করলেন। ‘হ্যাঁ, পাঁচ বছর তো কম সময় নয়।

এই পুরো সময় তোমাকে আমরা বড় করেছি, তোমার যত্ন নিয়েছি। এসবকে তো বৃথা যেতে দেওয়া যায় না। এখন তোমার সময় এসেছে সব পরিশোধ করার।’

‘আমি প্রস্তুত। কিন্তু কীভাবে?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমিটির প্রধান বললেন,

‘প্রশিক্ষক হবে।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৪, ২০১১

638) সূত্রের জন্য সংগ্রাম –

আলেক্সেই আদ্রেইয়েভ

ওহমের সূত্র পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল বুলকিন। স্বভাবগতভাবেই সে কৌতূহলী ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। একদিন ট্রলি বাসে যাওয়ার সময় ওহমের সূত্রের কথা কানে এল তার। কারা যেন বলাবলি করছিল, খুব খাসা একটি সূত্র নাকি! তবে বুলকিন আর কিছু বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছে, সূত্রটি বিদ্যুৎসম্পর্কিত।

বুলকিন তখনই ঠিক করল, সূত্রটি পরীক্ষা করে দেখবে। ‘ভুঁইফোঁড় এ সূত্রের গুঢ়ার্থ কী, তা পরখ করে দেখতে হবে’, ভাবল সে।

বাসায় এসে আগাপাছতলা চিন্তা না করেই একটি কাঁচি ঢুকিয়ে দিল সে সকেটে।

‘উরিঝাপ রে! ধাক্কা দেয় দেখছি!’ মেঝে থেকে উঠতে উঠতে অবাক হয়ে ভাবল সে। ‘যদি পেরেক ঢোকাই, কী হবে তাহলে?’

ঢুকিয়ে দিল পেরেক।

‘আবার ধাক্কা দিল!’ উপলব্ধি করল সে জ্ঞান ফেরার পর। ‘পেপার-ক্লিপ ঢোকালে কী হবে?’ ঢোকাল সে পেপার-ক্লিপ।

‘তাজ্জব কাণ্ড!’ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো সে। ‘আর যদি শুধু আঙুল ঢোকাই?’

আঙুল ঢোকাল সে।

‘সূত্রটা কি আসলেই সঠিক?’ পুরো হাত কেটে ফেলার পর সন্দেহ উঁকি দিল তার মাথায়। ‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব!’

হতাশ হয়ে প্রায় ভেঙেই পড়ছিল সে। হঠাৎ মনে হলো, ‘যদি রুবল ঢোকাই?’

তখন রুবল ঢোকাল সে সকেটে। নোটটাকে রোল করে। কিছুই ঘটল না।

‘সূত্র! বললেই হলো!’ তৃপ্ত হলো সে মনে মনে।

‘সূত্র! কিসের সূত্র! এসব সূত্রের দৌড় আমার ঢের জানা আছে...।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৪, ২০১১

639) দুই রাজার গল্প - ইলিয়া

বুতমান

এক দেশে ছিল এক রাজা। তাঁর খুব প্রিয় একটা গান ছিল। গানটির নাম ‘ট্রা-লা-লা-লা’। তবে ‘ট্রু-লু-লু-লু’ নামের অন্য একটি গান তিনি সহ্যই করতে পারতেন না। যারা ‘ট্রু-লু-লু-লু’ গাইত, তাদের সবার গর্দান নেওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়ে রেখেছিলেন।

ব্যাপারটা পছন্দ ছিল না অনেকেরই। একদিন এক লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন রাজার বিরুদ্ধে। তারপর তাঁকে গদিচ্যুত করে নিজেই আসীন হলেন সেটায়।

নতুন এই রাজা ‘ট্রু-লু-লু-লু’ গাইতে বড়ই পছন্দ করেন। গানটি এখন গাইতে পারে যে কেউ। স্বাধীনতার যুগ বলে কথা! তবে ‘ট্রা-লা-লা-লা’

গায় যারা, তাদের গর্দান নেওয়া হয়। সূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ১৪, ২০১১

640) এই তো জীবন - আলেক্সান্দর শ্মিদ

ঘুম ভাঙল সকালে। চকচকে সূর্য বাইরে, গান গাইছে পাখিরা, অফিসে যেতে হবে না। সন্ধ্যায় টিভিতে ফুটবল। আহা! আলোকিত হয়ে উঠল আত্মার ভেতরটা।

বিছানা ছাড়লাম, মুখ-হাত ধুয়ে আফটার শেভ মাখলাম আচ্ছামতো। তারপর নাশতা সেরে আর্মচেয়ারে বসলাম পত্রিকা নিয়ে। ঠিক তখন স্ত্রী এসে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিল হাতে:

—বাজারে যাও। আলু কিনতে হবে।

অন্ধকার নেমে এল আত্মার ভেতরে।

কিন্তু উপায় তো নেই! কাপড়চোপড় পাল্টে রওনা দিলাম। বাসস্টপের দিকে হাঁটছি, দেখি, আমার বাসটা আসছে। খুশি হয়ে স্প্রিন্ট লাগলাম। এক দৌড়ে ঢোকান চেপ্টা করলাম দরজা দিয়ে। ব্যর্থ। অন্য দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলাম। আবার ব্যর্থ। মনটা খারাপ হলো। এ-দরজা ও-দরজা করতে করতেই সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ হয়ে গেল বাসের দরজা দুটো। কী আর করা! হেঁটেই রওনা দিলাম।

বাজারে গিয়ে দেখি, ভিড়ে ভিড়াক্কার! তবু নাগাল পাওয়া গেল আলুবিক্রেতা এক বৃদ্ধার। খুশি হয়ে উঠল মনটা। ব্যাগভর্তি করে আলু নিয়ে ওজন করলাম, তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে হাঁটা ধরলাম নিজের ক্রয়সাফল্যে আত্মতৃপ্ত হয়ে। দেখি, আরেকজন আলু বিক্রি করছে। এগিয়ে গেলাম কাছে। মানে শ্রেয়, দামেও কম। মনটা খারাপ হলো।

হনহন করে হাঁটতে শুরু করলাম বাজারের গেট লক্ষ করে। আরও বেশি মন খারাপ যাতে না হয়, তাই দুপাশে তাকালাম না একেবারেই। গেটের মুখে দেখি, ব্যারেল থেকে বিয়ার বিক্রি করছে। লাইন খুব দীর্ঘ নয়। মনটা খুশি হলো। বড় এক গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িলাম। চুমুক দেওয়ার অধীর প্রতীক্ষা। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ফেনার ওপরে ফুঁ দিয়ে এক ঢোক গিললাম। বিয়ার তো একদমই ঠান্ডা নয়! মনঃক্ষুণ্ণ হলাম খুবই। কোনোমতে আধা গ্লাস খেয়ে বাকিটা ঢেলে দিলাম মাটির ওপরে। তারপর বাসার পানে।

বাসার কাছে আসতেই দেখা প্রতিবেশীর সঙ্গে।
এ-কথা ও-কথা বলতে বলতে আমাদের এই
সাম্ভাৎ উদ্যাপন করার প্রস্তাব দিল সে। খুশি
হয়ে উঠলাম। পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা
জড়ো করে বুঝলাম, এ পয়সায় কুলোবে না।
মনটা খারাপ হলো আবার। আরও পাঁচ মিনিট
তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলাম বাসায়।
দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকেই শুনি, স্ত্রী রান্নাঘরে
কার সঙ্গে জানি কথা বলছে। ভাবলাম, মা
বেড়াতে এসেছে। খুশি হয়ে উঠল মনটা।
রান্নাঘরে ঢুকলাম তড়িঘড়ি করে। দেখি, শাশুড়ি
উদয় হয়েছে কোথেকে! মনটা বড়ই খারাপ
হলো। আর্মচেয়ারে বসে ভাবলাম: এ কেমন
জীবন? ঠিক যেন জেরা ক্রসিং—জন্ম থেকে মৃত্যু
পর্যন্ত। কিন্তু সাদা অংশ তাতে এত কম কেন?
সাদা রং চুরি করে নাকি কেউ? **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, নভেম্বর ২১, ২০১১

641) প্রতিভা - ন. লেভিৎস্কি

‘এ আমাদের কনিষ্ঠ, নাম ভালেরিক’—সগর্বে
নিজের সন্তানের পরিচয় দান করলেন সেগেই
পেত্রোভিচ। ‘গানপাগল।’
‘তাই নাকি!’—অতিথিরা প্রশ্ন করল সমস্বরে।
‘তো একটা কিছু বাজিয়ে শোনাও না,
ভালেরিক।’—একজন প্রস্তাব দিল।
চোখমুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জিত ভালেরিকের।
সে প্রশ্নমাখা চোখে তাকালো তার মায়ের দিকে।
‘সবাই চাইছে যখন...’—সসংকোচে বললেন
এদিতা ইয়াকভলেভ্জা।
‘শুনতে চাই! শুনতে চাই!’—অতিথিরা হাততালি
বাজিয়ে বলল।
ভালেরিক প্রশ্নমাখা চোখে তাকালো বাবার
দিকে।
‘সবাই অনুরোধ করছে যখন...’—বাবা বললেন।
ভালেরিক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ক্যাসেট
প্লেয়ারের দিকে, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে
আঙুল দিয়ে চাপ দিল ‘প্লে’ বাটনে। **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২১, ২০১১

642) যেমন শ্রুতির তেমন জামাই - ডি এস নাইদল

হোটেলমালিক রামলগন হাঁ করে একবার
গণেশের মুখের দিকে, আরেকবার থালার দিকে
তাকাচ্ছিল। গণেশের খাওয়া শেষ হতেই

জিজ্ঞেস করল, ‘সাহেব, পেট ভরেছে?’

‘ভরেছে,’ আঙুল দিয়ে থালা চাটতে চাটতে বলল গণেশ।

‘আমি বুঝি, সাহেব। বাবা মারা যাওয়ার পর আপনার তো আর আপন কেউ রইল না। একা একা অনেক কষ্ট হয় আপনার।’ বলেই চলেছে রামলগন, ‘সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে কাজ করে খাচ্ছি। একা। আপনার মতো শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়তো বা দোকানদারি অনেক ছোট পেশা, কিন্তু আমার কি কম আছে? পেনালে ১০ একর জমি; সাইবেরিয়ায় তিনটে, ফুয়েন্ট গ্রোভে একটা বাড়ি। সব মিলে মোটামুটি ১২ হাজার ডলারের সম্পত্তি।’ কিছুক্ষণ চুপ করে রামলগন আবার বলল, ‘সাহেব, আপনার তো এখন দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমার মেয়ে লীলাকে আপনি বিয়ে করবেন?’

‘করব,’ এক কথায় রাজি হয়ে গেল গণেশ।

২.

‘চিন্তা করবেন না। আমার তেমন কোনো দাবিদাওয়া নেই।’ রামলগনকে আশ্বস্ত করল গণেশ।

‘সাহেব, এই হিন্দুসমাজের যতসব প্রথা নিয়েই তো আমার ভয়। বিয়ের পরদিন দুপুরে বরকে পুরো এক থাল খিচুড়ি খেতে দিতে হয়। জামাই যতক্ষণ না খাওয়া শেষ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্বশুরকে টাকা ঢালতে হয়।’

‘চিন্তা করবেন না। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। কিন্তু আবার এত দ্রুতও না, যাতে লোকে আপনাকে ফকির ভাবে।’

‘আমি এমনটাই আশা করেছিলাম, সাহেব। আপনিই পারেন এতটা উদার হতে। এটা আমার বিয়ে হলে আমি বলতাম, “চুলোয় যাক খিচুড়ি, আমি যৌতুক নেব না”।’

৩.

বিয়ের কার্ড ছাপানো শেষ হতে না হতেই অতিথিরা পাল ধরে এসে পড়ল গণেশের বাড়ি। অতিথিদের কর্তৃত্বে ছিলেন গণেশের এক পিসি, যিনি কিনা গণেশের বাবার শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। গণেশ সেসব টাকা ফেরত দেওয়ার কথা তুলতেই কষে একটা ধমক খায় পিসির কাছে।

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে

অতিথিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এত ছোট একটা বাড়িতে এত মানুষ কীভাবে

থাকছে, ভাবতেই গণেশের অবাক লাগে। আরও অবাক কাণ্ড হলো, এদের বেশির ভাগকেই গণেশ চেনে না। মাঝেমধ্যে দু-একটা মুখ চেনা চেনা ঠেকে এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে, তার যেসব দূরসম্পর্কের বোন কদিন আগে নিজেরাই ছিল খুকি, তারা আজ এক গন্ডা ছানাপোনার মা। লম্বামতো, চটপটে একটি মেয়েকে গণেশ কিছুতেই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘পিসি, এই মেয়েটি কে?’

‘ও ফুলকুমারীর জ্যাঠাতুতো বোন।’

‘ফুলকুমারীটা আবার কে?’

‘ফুলকুমারী তোর দূরসম্পর্কের খুড়তুতো বোন।’ সম্পর্কের ফিরিস্তি শুনে গণেশের বিষম খাওয়ার জোগাড়। বিয়ের আগের দিন বাড়ির সব মেয়ে হিন্দি গান গেয়ে গণেশকে জাফরান দিয়ে স্নান করাতে লাগল। তখনই প্রথমবারের মতো প্রশ্নটা করল গণেশ, ‘আচ্ছা পিসি, প্রতিদিন এতগুলো লোকের খাবার আসছে কোথা থেকে?’

‘কেন? রামলগন বাবুর হোটেল থেকে!’

‘খরচাপাতি কে দেবে?’

‘তুমি। রামলগন বাবু বলেছেন, নানা ঝামেলায় তোমার মাথাটা এমনিতেই গরম। বিলের ব্যাপারে বিয়ের পরই তিনি তোমার সাথে কথা বলবেন।’

‘হায় ভগবান! এখনো বিয়ে হলো না, এরই মধ্যে বুড়ো আমার ঘাড় মটকাতে শুরু করেছে!’ মনে মনে ভাবল গণেশ।

৪.

অবশেষে বিয়েটা হয়েই গেল। পরদিন যথারীতি উঠোনের ওপর কম্বল পেতে গণেশকে বসতে দেওয়া হলো। সামনে রাখা হলো সাদাটে, অখাদ্য খিচুড়ি। রামলগন খিচুড়ির পাশে কাঁসার থালায় ১০০ ডলার রাখল, কিন্তু গণেশ খিচুড়ির দিকে তাকাল না পর্যন্ত। অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প কিছু টাকা দিল। কিন্তু গণেশ চুপচাপ বসেই রইল। রামলগন আরও ১০০ ডলার রেখে বলল, ‘বাবা, এবার খাও।’

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল, ‘রামু, আরও পয়সা ঢালো।’

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে রামলগন বলল, ‘ও যেন ভুলেও না ভাবে যে আমি আরও টাকা দেব। ব্যাটা উপোস করে মরুক না। আমার কী?’ গজগজ করতে করতে চলে গেল

রামলগন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আরও ২০০ ডলার ফেলে ফিসফিস করে বলল, ‘বাবা সাহেব, আমাকে দেওয়া কথা ভুলো না। খাও।’ ‘খাবে না, খাবে না।’ ভিড়ের মধ্য থেকে চেষ্টা করে বলল কে যেন।

‘দূর হ, ব্যাটা।’ খেঁকিয়ে উঠল রামলগন। আবার ফিসফিসিয়ে গণেশকে বলল, ‘সাহেব, আর লজ্জা দেবেন না। দয়া করে খেয়ে নিন।’ গণেশ নড়ল না। শেষমেশ রামলগনের কাছ থেকে একটি গরু, একটি বাছুর, নগদ ১৫ হাজার ডলার আর ফুয়েন্ট গ্রোভের বাড়িটা লিখে নেওয়ার পর গণেশ খায়। গণেশের বাড়ির এত দিনের খাবারের বিলও বাতিল করতে হলো রামলগনকে।

‘আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম। ও আগে থেকেই জানত, আমি ওকে এগুলো দিয়ে দেব।’ দরদর করে ঘামতে ঘামতে বলল রামলগন। ভি এস নাইপল: ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল ও বুকারজয়ী ব্রিটিশ লেখক। জন্ম ১৭ আগস্ট, ১৯৩২।

অনুবাদ: আলিয়া রিফাত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২১, ২০১১

643) আগুন- আ. কিনশেড

একদিন সকালে এক লোকের ঘুম ভাঙল খুবই বাজে একটা অনুভূতি নিয়ে: আজ তার ফ্ল্যাটে আগুন লাগবেই!

‘আর আগুন একবার জ্বলতে শুরু করলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সবকিছু’—নাশতা করতে করতে তার মনে হলো।

‘একেবারে দাউদাউ করে জ্বলবে’—ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করতে করতে ভাবল সে।

অফিসে খুবই অসুস্থ সময় কাটল তার।

সারাক্ষণ মনে হতে থাকল: ‘নিশ্চয়ই এখন পুড়ছে।’

আগুন লাগার খবর পেলে লোকে যেভাবে ছোটে, সেই গতিতে সে ফিরল বাসায়। ‘এরই মধ্যে নির্ঘাত পুড়ে গেছে আমার ফ্ল্যাট!’—ফিরতে ফিরতে মনে হয়েছিল তার। যখন সে ঘরে ঢুকল, আগুনের কোনো চিহ্নও ছিল না সেখানে। তখন সে নিজেই আগুন ধরাল ঘরে। তারপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলল:

—আমি ঠিকই জানতাম! সূত্রঃ দৈনিক প্রথম
আলো, নভেম্বর ২৮, ২০১১

644) সুনাম - গেরমান দ্রোবিজ

পার্কের বেঞ্চে বসে আছে এক লোক। সিগারেট
ফুঁকছে। এক বালক এগিয়ে এল তার দিকে।

—সময় কত, বলবেন কি?

—সময়?—অভ্যাসবশে লোকটি বাঁ হাতের কবজি
ধীরগতিতে চোখের সামনে তুলে ধরল। — এই
যা! ঘড়ি পরতে ভুলে গেছি। জানি না।

—আমি কিন্তু জানি। বলব?

—জানোই যদি, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

—যদি আপনি হঠাৎ না জানেন?

—ব্যাপার না!

—ব্যাপার না মানে? হয়তো আপনার কোথাও
দেরি হয়ে যাচ্ছে!

—কোথায়?

—যেখানে আপনার যাওয়া দরকার।

—কোথাও যাওয়ার দরকার আমার নেই।

—হয়তো ভুলে গেছেন।

—শোনো, হে বালক, এখান থেকে এখন বিদেয়
হও। জ্বালাতন করে মারলে!

—ঠিক আছে, আমি চলে যাব, এম্ফুনি। শুধু
আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন, কটা বাজে।
প্লিজ।

—কী যে জ্বালাতন! আচ্ছা, ঠিক আছে, কটা
বাজে?

—সোয়া বারো।

—বুঝেছি, ধন্যবাদ।

—আপনার বিল—পাঁচ হাজার রুবল।

—বিল? কিসের বিল?

—কোম্পানি ‘সঠিক সময়’ সর্বদা আপনার
সেবায়। সঠিক সময় জানুন যেকোনো সময়
যেকোনো স্থানে বসে: মেট্রোতে, বাসে, দোকানে,
পথে। নিখুঁত সময়ের নিশ্চয়তা।

—হা-হা-হা। ঠাট্টা করতে শিখেছ বেশ!

কোম্পানি... হা-হা-হা! তো তোমাদের রেট এত
চড়া কেন, ডিরেক্টর সাহেব?

—আমি ডিরেক্টর নই।

—কে তাহলে ডিরেক্টর?

—ভ্লাদিমির কাকা! এদিকে একটু আসুন তো!
পাশের বেঞ্চ থেকে উঠে এল অতিকায় বপুর
এক লোক।

—ভ্লাদিমির কাকা, গ্রাহক আমাদের সেবা গ্রহণ করেছে, আমাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছে, কিন্তু এখন মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

—কী, মারধর করতে হবে নাকি? —ভ্লাদিমির কাকা হাত দিয়ে চেপে ধরল গ্রাহকের গলা।

—এই যে...করছেন কী!...একটু দাঁড়ান...প্লিজ, মারধরের দরকার নেই...!

হাতের বাঁধন শিথিল করল ভ্লাদিমির কাকা। লোকটি পকেট থেকে টাকা বের করে গৃহীত সেবার মূল্য পরিশোধ করল। কোম্পানি ‘সঠিক সময়’ হাঁটা ধরল একদিকে, লোকটি আরেক দিকে।

হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের শব্দ শুনল সে।

সভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল, বালকটি ছুটে আসছে তার দিকে। হাঁপাচ্ছে রীতিমতো।

—প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে ভুল সময় বলেছি। আমার ঘড়ির দুটো কাঁটার সাইজ প্রায় একই, তাই গড়বড় করে ফেলেছি। সময় তখন ছিল সোয়া বারো না, তিনটা তিন। লোকটি ভীতকণ্ঠে জানতে চাইল:

—আবার পাঁচ হাজার রুবল দিতে হবে এখন?

—না, না, তা কেন! ওই একই মূল্যে।

—ওহ্, তাহলে ঠিক আছে, ব্যাপার না।

—আপনার কাছে ব্যাপার না হতে পারে। তবে আমাদের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গ্রাহকদের ঠকাতে চাই না। ভ্লাদিমির কাকা সব সময়ই বলেন, সর্বাত্মক রক্ষা করতে হবে কোম্পানির সুনাম। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ২৮, ২০১১

645) উটপাখির গল্প - আহসান হাবীব

মতলুব সাহেব ঠিক করলেন তিনি দুর্নীতি করবেন। অন্তত একবার হলেও দুর্নীতি করে দেখতে চান এর ‘ফজিলত’। সবাই এত দুর্নীতি করে, কেন করে... তিনি বিষয়টা বুঝতে চান। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি তাঁর অফিসের এক বড় কর্মকর্তার কাছে গেলেন, যিনি দুর্নীতির জন্য বুকার পুরস্কার পেতে অপেক্ষমাণ (অবশ্য দুর্নীতির জন্য বুকার পুরস্কার দেওয়া হয় কি না ঠিক জানি না)!

—স্যার, আসসালামু আলাইকুম।

—ওয়ালাইকুম...। কী ব্যাপার?

—স্যার, কীভাবে অন্তত একটা দুর্নীতি করা যায়, সেটা জানতে এসেছি...

—মানে? ঞ্চ কুঁচকে যায় বড় কর্মকর্তার।

—মানে, স্যার, আপনি তো প্রচুর দুর্নীতি করেছেন, তাই আপনার কাছে পরামর্শের জন্য...

—হোয়াট? আমি দুর্নীতি করেছি মানে?

—বাহ্, দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে আপনি অফিসের এক নম্বর দুর্নীতিবাজ অফিসার আর আপনিই সেটা জানেন না? আপনি তো মনে হচ্ছে উটপাখি...স্যার...

—উটপাখি মানে?

—কেন স্যার, আজকাল বিজ্ঞাপন দেখেন না, ‘উটপাখি নয়, মানুষের জীবন চাই’...

—গেট আউট, গেট আউট...মতলুব সাহেব মন খারাপ করে বের হয়ে আসেন দুর্নীতিবাজ অফিসারের রুম থেকে। এ সময় আরেক ছোট কর্মকর্তা এগিয়ে আসেন তাঁর দিকে।

—স্যার।

—কী ব্যাপার?

—স্যার, আপনাদের কথাবার্তা আড়াল থেকে সব শুনেছি। অনুমতি দিলে কিছু পরামর্শ আমি দিতে পারি আপনাকে।

—ও আচ্ছা আচ্ছা...বলুন।

—স্যার, ছোটখাটো দুর্নীতি আমিও করি। বিষয়টা আসলে স্যার শুরু করতে হবে ঘর থেকে।

—মানে?

—মানে, স্যার, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম।

স্যার, বাসায় বাজার কার হাতে?

—আমার স্ত্রীই করে সব সময়।

—এই তো পেয়েছি...। স্যার, কাল থেকে বাজারের দায়িত্ব আপনি নেন...বাজারের টাকা থেকে টুকটাক সরাতে শুরু করেন...তারপর এভাবেই একদিন...আইডিয়াটা পছন্দ হলো মতলুব সাহেবের। তিনি বাসায় এসে ঘোষণা দিলেন:

—কাল থেকে আমি বাজার করব।

—তুমি বাজার করবে? স্ত্রী অবাক!

—হ্যাঁ, সমস্যা কী? তুমি তো বহুদিন বাজার করলে, এবার বিশ্রাম নাও...স্বামী হিসেবে আমারও একটা দায়িত্ব আছে সংসারের প্রতি। স্ত্রী খুশি হলেন, যাক, এত দিনে তার স্বামী একটু সাংসারিক হয়েছে, মন্দ কী। খুশি মনে পরদিন বাজারের ব্যাগ আর টাকা তুলে দিলেন

তাঁর হাতে। আর বললেন, ‘দেখো, পচা মাছ
আবার কিনে এনো না। শাকসবজি সব
দেখে শুনে আনবে...আর হ্যাঁ, ভালো দেখে একটা
কাপড় কাচার সাবান আনবে।’

—কিছু চিন্তা করো না...খুশি মনে বের হয়ে
গেলেন স্বামী টাকা আর বাজারের ব্যাগ
নিয়ে। কিছুক্ষণ বাদেই বাজার নিয়ে ফিরলেন।
স্ত্রী হতভম্ব। সবই পচা মাল নিয়ে ফিরে
এসেছেন। শুধু সাবানটা ভালো...এক নং পচা
সাবান!

—এসব কী কিনেছ? আর এত উল্টাপাল্টা দাম।
এই ইলিশ তিন শ টাকার বেশি হতেই পারে না
আর তুমি কিনেছ পাঁচ শ টাকায়। দশ টাকার
শাক বিশ টাকায়...দেখি টাকার হিসাব দাও।

—আরে হিসাব দিব কি, সব টাকা খরচ। স্বামী
হাসেন। হাসার কারণ তিনি ভালো মার্জিন
করেছেন। তাঁর প্রথম দুর্নীতি! চারিটি বিগিনস
অ্যাট হোম। হোক না নিজের টাকা নিজেই
মেরেছেন। মেরেছেন তো! খুব শিগগির সেই
ছোট কর্মকর্তা আবার এলেন তাঁর কাছে।

—স্যার, ভালো একটা সুযোগ এসেছে।

—কিসের সুযোগ?

—কেন স্যার, দুর্নীতির। আমরা ঢাকা শহরে
দশটা ওভারব্রিজ করার কাজ
পেয়েছি...টেন্ডার...ওয়ার্ক পারমিট...বিল
পাস...সব স্যার আপনার হাতে। এই যে স্যার
ম্যাপ, কোথায় কোথায় ওভারব্রিজ হবে।

—কিন্তু দুর্নীতিটা হবে কীভাবে?

—এই যে, স্যার, অরিজিন্যাল ম্যাপে দেখছেন,
যেখানে যেখানে ওভারব্রিজ হবে, আমরা সেখানে
সেখানে করব না...আমরা করব এখানে
এখানে...আমি দাগ দিয়ে রেখেছি...এটা, স্যার,
নকল ম্যাপ।

—কিন্তু নকল ম্যাপের এসব জায়গায় ওভারব্রিজ
হলে জনগণের লাভ কী?

—স্যার, জনগণের লাভ দেখতে গেলে কি আর
দুর্নীতি করা যায়?

—কী বলছেন এসব?

—ঠিকই বলছি, স্যার। দুর্নীতি করবেন আবার
জনগণের ভালোও চাইবেন? দুইটা কি একসাথে
হয়?

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মতলুব সাহেব। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে
মাথা নাড়েন:

—ঠিকই বলেছেন, দুইটা একসাথে হয় না।

বরং একটাই করি...

—কোনটা, স্যার?

কথা বলেন না মতলুব সাহেব। নকল ম্যাপটা ছিঁড়ে ফেলেন টুকরো টুকরো করে। ছোট কর্মকর্তা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মতলুব সাহেবের দিকে। ভাবেন, ‘খেং, বেটাকে উটপাখি বানানো গেল না।’
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো,
ডিসেম্বর ০৫, ২০১১

646) বিশেষজ্ঞ - তারাপদ রায়

দিল্লী থেকে বিশেষজ্ঞ এসেছেন সুদূর দীঘাতে কাজু চাষ পর্যবেক্ষণ করতে। বিশেষজ্ঞ মহোদয় বাঙালি, ইনি সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে ছয় মাসের কাজু চাষের ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমেরিকায় কাজুর চাষ হয় কি না, সেখানে এর ট্রেনিং কি হবে—এ সব প্রশ্ন আশা করি কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকেরা দয়া করে তুলে অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।

সে যা হোক, বিশেষজ্ঞ মহোদয় সপারিষদ এক শীতের দুপুরে দীঘায় গেলেন। এই ঠাণ্ডার দিনেও খালি গায়ে রোদুরে বসে গ্রামের একজন কৃষক তামাকু সেবন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে সম্ভ্রান্ত লোকজন দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলেন, এসে যে গাছটায় এতক্ষণ কৃষক হেলান দিয়ে বসে ছিলেন সেটার গায়ে নিজের মুখের পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ গাছটার গোড়া অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে নিড়িয়ে, খুঁড়ে দিয়েছিলেন?’

এই প্রশ্ন শুনে কৃষক কেমন থমকে গেলেন। কিছু বলার আগেই বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের একজন পারিষদ বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন, ‘অক্টোবর, মানে ঐ আশ্বিন মাসে গাছটার গোড়াটোড়াগুলো বেশ সাফ করে দিয়েছিলেন?’

কৃষক এবার বললেন, ‘না।’

শূন্য পাইপটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বললেন, ‘তাই বলি,’ তারপর একটু থেমে আবার কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘গাছটার ওপরের ডালগুলো এর মধ্যে কোনো দিন ভালো করে পোকা মারার ওষুধ দিয়ে স্প্রে করে দিয়েছেন?’

কৃষকের মুখ দেখে বোঝা গেলো তিনি সাত

জন্মে এ রকম কিছু শোনেননি, জেরার জবাবে
থতমত খেয়ে বললেন, ‘আজ্ঞে, না তো।’
‘তখনই বলেছিলাম,’ বিশেষজ্ঞ মহোদয় কাতর
আর্তনাদ করে উঠলেন, ‘সাধে এই অবস্থা,’
তারপর অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে কৃষকের সামনে
দু’ পা এগিয়ে গিয়ে প্রায় চোঁচিয়ে বললেন, ‘আর
কিছু না করুন, এই শীতের মধ্যে, বৃষ্টির আগে
গাছের উপরের পাতাগুলো একবার ছেঁটে
দেবেন তো?’

একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এ রকম
মারমুখো ভাব দেখে ইতিমধ্যে কৃষক রীতিমতো
ঘাবড়িয়ে গেছেন এবং চার পা পিছিয়ে গেছেন।
নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি কোনো রকমে
জবাব দিতে পারলেন, ‘আজ্ঞে, না তো।’
মাথায় হাত দিয়ে বিশেষজ্ঞ মহোদয় মাটিতে
বসে পড়লেন, ‘এই ভাবে নিজের সর্বনাশ করে!
আমি অবাক হয়ে যাবো যদি আপনি এই গাছে
এক কেজির বেশি কাজু বাদাম পান।’

একটু দম নিয়ে কৃষক তাঁর হাতের হুকোতে দু-
তিনবার জোরে জোরে টান দিলেন কিন্তু আগুন
নিবে গেছে, ধোঁয়া বেরোলো না, নিরাশ কণ্ঠে
তিনি বললেন, ‘আমিও খুব অবাক হবো।’
এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ
মহোদয়ের মুখে আর বাক্য জোগালো না,
একজন পারিষদ তাঁকে সাহায্য করলেন,
কৃষককে পালটা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনিও
অবাক হবেন?’

এইবার কৃষক বেশ ধাতস্থ হয়েছেন, কোমর
থেকে দেশলাই বের করে হুকোটা ধরিয়ে
একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘অবাক হবো না?
এটা হলো শ্যাওড়া গাছ, এই শ্যাওড়ায় এক
কেজি কেন, যদি একটা কাজু বাদামও হয়
নিশ্চয়ই অবাক হবো, খুবই অবাক হবো।’
উপরের গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো। এর সঙ্গে
কোনো জীবিত ব্যক্তি বা প্রকৃত ঘটনার কোনো
সংযোগ নেই।

বরং বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে সেই সাঁতারের শিক্ষকের
গল্পটি একবার স্মরণ করি। গল্পটি বাংলা ভাষায়
অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী,
মূল ইংরেজিটা বোধহয় পি জি ওডহাউসের,
নাকি স্টেফান লীককের।

গল্পটা রীতিমতো চওড়া, অন্ততঃ শিবরাম
চক্রবর্তীর কলমে। বিস্তারিত বর্ণনা থাক, আসল

ঘটনা এই রকম। সাঁতারের বিখ্যাত ইস্কুলের সাঁতার শিক্ষকেরও খুব খ্যাতি। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা রকম নির্দেশ দেন, তাঁরই নির্দেশে কতজন যে দক্ষ সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে, অতি আনাড়ি অবস্থা থেকে, তার হিসাব নেই। একদিন হঠাৎ জলে পড়ে গেলেন শিক্ষক মশায়। তিনি তীর থেকে নির্দেশ দিতেন কিন্তু সেদিন কি করে পাড় থেকে জলে পড়ে গেলেন। তারপর নাকানি-চুবানি খেয়ে ডুবে মরেন আর কি! সেদিনই প্রকাশ পেলো তিনি সাঁতার একদম জানেন না, জীবনে কখনো জলে নেমেছেন কিনা তাই সন্দেহ। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাঁতার শেখাতে গেলে সাঁতার জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। আমি গানের গ জানি না। গান সম্পর্কে আমার সুরজ্ঞান এবং কণ্ঠস্বর দুইই ভয়াবহ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গো-মাংস যেরকম, আমার কাছে সারেগামাও তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একবার এক অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, বাজনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম ‘ধনধান্যে পুষ্পেভরা’—দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতটি বাজানো হচ্ছে, আমি জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়লাম।

আমি ছিলাম সেই সভায় প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি বা ঐ রকম কিছু। পাশেই সভাপতি মহোদয় বসে ছিলেন। তিনি আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন, ‘উঠছেন কেন?’ আমি বললাম, ‘আপনিও দয়া করে উঠুন। দেখছেন না জাতীয় সঙ্গীত বাজছে।’ সভাপতি মহোদয়ের দুই চোখ কপালে উঠলো। বেশ চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কাম সেপ্টেম্বর আবার কবে থেকে জাতীয় সঙ্গীত হলো?’ আমি আর কিছু বললাম না, রূপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সভাটি ছিলো একটি সঙ্গীত বিদ্যায়তনের বার্ষিক উৎসব এবং আমাকে বড়ো সমঝদার ভেবে কর্তৃপক্ষ অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের তেমন দোষ দেওয়া চলে না। এ রকম ভুল সর্বত্রই হয়। যাকে আমরা কোনো

বিষয়ে অথরিটি বলে ধরে নিয়েছি তিনি হয়তো সেই বিষয়ে একজন প্রকৃত হস্তিমূর্খ। দশচক্রে যে রকম ভগবান ভূত হয় তেমনি মূর্খও পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়। তবে ঐ দশচক্রের মূল চক্রটি উচ্চাভিলাষী মূর্খ নিজেই আবর্তন করান।

অজ্ঞদের গালাগাল করা রুচিসম্মত নয়, বিশেষজ্ঞের কথা হচ্ছিলো সেই কথাই বলি। ইংরেজিতে বলা হয় কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের আরো-আরো-আরো জানতে জানতে অবশেষে এভরিথিং অফ নাথিং জানাই হলো বিশেষজ্ঞের বা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের স্বপ্ন। এই নাথিং কিন্তু ঠিক নাথিং নয়, দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজনের বিষয় হলো মৌর্য যুগের স্বর্ণমুদ্রার সিংহের ডান পায়ের (সামনের) মধ্যমার দৈর্ঘ্য। ইনি কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন। ইনি ইতিহাসের লোক। ঐরই বন্ধু সাহিত্যের, তাঁর বিষয় হলো শিলাইদহের কুঠিবাড়ির মধ্যের ঘরের বড় শাল কাঠের জলচৌকিটির পায়ার কাছে যে কালির দাগ লেগে ছিল সেই মসিচিহ্ন কি শিলাইদহ বোটে জলচৌকিটি নিয়ে সোনার তরী কবিতাটি লেখার সময়, (যদি নেওয়া হয়ে থাকে), দোয়াত উলটে লেগে গিয়েছিল? এই বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি একশো রকম তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন।

আজ কিছুদিন হলো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবের হাতে আছি। বিশেষজ্ঞ নিয়ে লেখা শেষ করার আগে তাঁদের সম্পর্কে কিছু না লেখা অনুচিত হবে।

আমাদের ছোটবেলায় পারিবারিক ডাক্তার পায়ের গোড়ালি থেকে মস্তকের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত সর্বাস্থের চিকিৎসা করতেন। তিনিই বহু পরে একবার কানে ব্যথা হওয়ায় বললেন ই-এন-টি স্পেশালিস্টের কাছে অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণ-কণ্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে। এর অনেকদিন পরে একবার মিনিবাসে একটা লোক আমার নাকটা গুঁতিয়ে দিলো, রীতিমতো ফুলে গেলো। সেই ই-এন-টির কাছে গেলে তিনি বললেন, ‘আমি এখন শুধু কান করছি। আপনি ডঃ নাগের কাছে যান। তিনি এখন নাক করেন।’ ডঃ নাগকে গিয়ে দেখালাম। তারপর এই গত সপ্তাহে ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ মাথা ভার; একটা নাক, ডান নাকটা সম্পূর্ণ বন্ধ। আবার গেলাম ডঃ নাগের

কাছে। তিনি সব দেখে বললেন, ‘ডান নাক আমার দ্বারা হবে না, আমি এখন শুধু বাঁ নাক দেখছি।’ তারাপদ রায়:লেখক। জন্ম: ১৭ নভেম্বর ১৯৩৬, মৃত্যু: ২৫ আগস্ট ২০০৭।

647) আলিওশার গল্প - আলেক্সান্দর জনস্তুভিনভ

এক ছিল বালক। নাম তার আলিওশা।
পড়াশোনায় ভালোই ছিল সে। নানাবিধ
যন্ত্রপাতিতে তার বিপুল উৎসাহ। তাই সে নাম
লেখাল ‘দক্ষ হাত’ চক্রে।
কিন্তু আলিওশার মা চাইত, তার ছেলে হবে
সংগীতকার। তাই তাকে ভর্তি করিয়ে দিল
সংগীতশিক্ষার স্কুলে। তাই বলে ‘দক্ষ হাত’ চক্র
ছাড়ল না আলিওশা। কারণ, যন্ত্রপাতি তাকে
আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি।
আলিওশার বাবার ধারণা ছিল, সত্যিকারের
অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সমস্ত আভাস
আলিওশার মধ্যে স্পষ্ট। তারই পীড়াপীড়িতে
আলিওশাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো
মল্লযুদ্ধচর্চা বিভাগে। কিন্তু মা যাতে মনে কষ্ট না
পায়, সংগীতশিক্ষা অব্যাহত রাখল সে।
দাদু মনে করত সৃজনশীল শিল্পের প্রতি
আলিওশা খুব আকৃষ্ট। তার জোরাজুরিতে
সৃজনশীল শিল্পশিক্ষা চক্রে আলিওশার নাম
লেখানো হলো।

দিদিমার স্বপ্ন ছিল তার নাতি বিদেশি ভাষায়
পণ্ডিত হবে। আলিওশাকে পড়াতে আসতে শুরু
করল ইংরেজির গৃহশিক্ষক।

ভেরা খালামণি ভাবত...

আলিওশা বড় হলো। এবং সে এখন কোথায়,
জানেন? ঠিক ধরেছেন। তার সঙ্গে একই
ওয়ার্ডে আছে নেপোলিয়ন (প্রাক্তন বালক
দিমা)। **সূত্র:** দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর
২৬, ২০১১

648) জপলে মাছির গুরুত্ব - গ্রিগোরি গোরিন

এই ধরাধামে সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে
সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, আমি
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি।
কিছুদিন আগে জনপ্রিয় এক পত্রিকায় বড়ই
কৌতূহলোদ্দীপক এক ঘটনার কথা পড়েছিলাম।
কোথায় যেন, আমেরিকা নাকি আফ্রিকা মনে

পড়ছে না। এক জঙ্গল ছিল। ঘন গাছগাছালি ও নানাবিধ প্রাণীতে ভরা। সেখানে বাস করত এক প্রজাতির মাছি। একদম একরঙা, সারাক্ষণই ভোঁ ভোঁ করে। একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এক প্রাণী। সর্বোপরি, তারা সবাইকে কামড়ায়—মানুষ, জীবজন্তু কাউকেই বাদ রাখে না। মানুষের শরীরে ফুসকুড়ি উঠে যায় এদের কামড়ে। তো মানুষ স্থির করল, মাছিগুলোকে নির্বংশ করতে হবে। ডিডিটি-জাতীয় কী একটা পাউডার ছড়াল তারা জঙ্গলে। সব মাছি মরে ভূত হয়ে গেল। এরপর কী হয়েছিল জানেন? খুবই ভয়াবহ এক ব্যাপার।

অচিরেই এই জঙ্গল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এক জাতের ছোট ছোট পাখি, যাদের প্রধান খাদ্য ছিল ওই মাছি। এরপর হারিয়ে গেল বড় পাখির দল, যারা ওই ছোট ছোট পাখি ধরে ধরে খেত। পাখিকুলের অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্রাকৃতির নানাবিধ কীটপতঙ্গের সংখ্যা বেড়ে উঠল প্রবলভাবে। আগে এই কীটপতঙ্গগুলো পাখিদের ভয় পেত খুব। তো অলক্ষ্যে এই কীটপতঙ্গের পাল ঘাস-পাতাসহ সব শ্যামলিমা কুরে কুরে খেয়ে সাফ করে ফেলল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঘাস, উধাও হয়ে গেল দুই প্রজাতির হরিণ—ঘাস ছাড়া জীবনধারণ যাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিলুপ্ত হতে শুরু করল শিকারি প্রাণীগুলোও—বাঘ, জাগুয়ার। হরিণ ছাড়া তাদের অভুক্ত থাকতে হয় যে।

কিছুদিন পর জঙ্গলটি নিস্প্রাণ হতে শুরু করল। তারপর একদিন এর ওপর দিয়ে বয়ে গেল শুকনা, গরম হাওয়া। জঙ্গলের জায়গায় এখন মরুভূমি।

খুদে এক মাছির কারণে কী লঙ্কাকাণ্ডটাই না ঘটে গেল!...

গল্পটা বললাম এই কথা প্রমাণ করতে যে সবকিছুই একটা ‘চেইন’-এর সঙ্গে যুক্ত।...এই যে দেখুন, সভ্যতার অগ্রগতি কেন হচ্ছে? হচ্ছে, কারণ নতুন নতুন কলকারখানা বানানো হচ্ছে হরদম, সেসবে উৎপাদন করা হচ্ছে নতুন নতুন সব জিনিস। নতুন নতুন জিনিস বানানো সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? কারণ বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। বিজ্ঞান কীভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারছে? কারণ বিজ্ঞানী নিত্যনতুন আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছেন। বিজ্ঞানী নতুন নতুন

আইডিয়া দিচ্ছেন কীভাবে? কারণ তিনি বসে বসে চিন্তা করেন, রাতে ঘুমান না। রাতে তিনি ঘুমান না কেন? কারণ এই মুহূর্তে আমি তাঁর জানালার নিচে দাঁড়িয়ে গান গাইছি।

আমি গান গাইছি কেন? কারণ পান করেছি। এখন আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই: সামগ্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের এই সার্বিক ব্যাপারটি মাথায় রেখে আমাকে বলুন তো, একটি দিনও পান না করার অধিকার আমার আছে?

না, নেই। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারি ০২, ২০১২

649) প্রশ্নোত্তর - আলেম্ব্রেই

আন্দ্রেয়েভ

—আমার একটা প্রশ্ন ছিল...

—বলুন...

—কবে আমরা সুখে থাকতে শুরু করব?

—কারা?

—ধরুন, আমি।

—বয়স কত?

—চল্লিশ।

—স্বপ্ন দেখা বাদ দিন।

—আমার সন্তানেরা?

—বয়স কত তাদের?

—দশ আর পনেরো।

—দুরাশা।

—নাতি-নাতনিরা?

—আপনার?

—আমার।

—সম্ভাবনা খুবই কম।

—নাতি-নাতনির ছেলেমেয়েরা?

—আপনার?

—আমার।

—এত ঘ্যানঘ্যান করছেন কেন?

—আচ্ছা, ধরা যাক, আপনার।

—অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা করছেন।

—কী নিয়ে করা দরকার?

—কিছু নিয়েই না। কাজ করা দরকার, কাজ!

—কেন?

—ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনির কথা ভেবে...

—কার?

—উফ! এত স্বার্থপরায়ণ আপনারা! সূত্রঃ দৈনিক
প্রথম আলো, জানুয়ারি ০২, ২০১২

650) ইন্টেলেকচুয়াল - র.

বিকচেনতায়েড

রিংয়ের মেঝেতে শুয়ে আছি। অবস্থা একেবারেই
সুবিধের নয়।

—ওয়ান! টু!—রেফারি গুনতে শুরু করল।

—এত দ্রুত গুনবেন না; তাড়াহুড়োর কিছু নেই
তো—অনুনয় করে বললাম তাকে।

—এভাবে গোনারই নিয়ম। কোনো উপায় নেই।
টু!

—আপনার নিজের ছেলে আছে?

—আছে।—রেফারি বলল বিড়বিড় করে,—থ্রি!

—ধরে নিন, আমি আপনার ছেলে, কাতর কণ্ঠে
বললাম তাকে।

—ফোর!—একটু দুর্বল শোনাল কি তার গলা?

—এবং সে চোয়ালভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে
ধুলোমাখা রিংয়ে। চোখে তার অসহায়ত্ব...

—ফাইভ! প্রায় ফিসফিস করে বলল রেফারি।

—শুয়ে শুয়ে সে তার বেচারী মা-বাবার কথা
ভাবছে, যারা তাকে কত কষ্টে মানুষ করেছে।
ভাবতে গিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তার
নক-আউট হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে...

—সিক্স!—কেঁদে ফেলল রেফারি।

—পাঁচ হাজার দর্শক গলা ফাটিয়ে চিৎকার
করছে, হাততালি দিচ্ছে নিষ্ঠুর, নির্দয় বিজয়ীর
উদ্দেশে, আর সে দর্শকদের নিজের পেশি
দেখাতে দেখাতে মাঝেমধ্যে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে
তাকাচ্ছে তার শিকারের দিকে...

—সেভেন!—দাঁতে দাঁত চেপে কোনোমতে বলল
সে, তারপর আমার প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল
ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে।

—হলের বাতিগুলো প্রায় নিভে এলে বিমর্ষ পিতা
তার আধমরা সন্তানকে জড়িয়ে ধরবে এবং...

—তুমি বিজয়ী!—রেফারি ঘোষণা করল চিৎকার
করে, তারপর আমাকে টেনে তুলল মেঝে
থেকে।

বিজিতের সঙ্গে আলিঙ্গনের সময় তার কানে
কানে বললাম:

—দেখলে তো, শক্তি দিয়ে কাজ হয় না, বুদ্ধি
খাটাতে হয়।

651) সার্টিফিকেট - ড্রাদিমির

পাসেনুফ

সার্টিফিকেটটা ছিল যেকোনো সার্টিফিকেটের মতোই। গতানুগতিক। ‘টু হুম ইট মে কনসার্ন। অত্র সার্টিফিকেটের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাইতেছে যে, পৃথিবী গোলাকার।’

ব্যস। এরপর স্বাক্ষর আর সিলের জন্য ফাঁকা জায়গা।

—গোলাকার?—জিজ্ঞেস করলাম।

—ইচ্ছে হলে লিখে দিন সমতল। আমার কোনো সমস্যা নেই। শুধু সার্টিফিকেটটা সঙ্গে থাকলেই হলো। নইলে অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। সিল-ছাপড় না থাকলে সন্দেহ করে।

শুনে রাগ চেপে গেল আমার।

—বিশ্বাস করে না মানে? মগের মুল্লুক নাকি!

এই পারমাণবিক আর মহাশূন্যযাত্রার যুগে! যখন আমাদের মাথার ওপরে সব সময় ঘুরছে অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহ! যখন প্লেনে পুরো পৃথিবী চক্কর দিতে সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা! তা ছাড়া যেকোনো স্কুলবালকও তো জানে এই কথা! ছোট-বড় বিশ্বকোষগুলোতেও স্পষ্টভাবে লেখা আছে...

দর্শনার্থী দুই হাত ঝাঁকাল শুধু। তারপর বলল:

—হুবহু ঠিক এই কথাগুলোই আমি তাদের বলেছি। কিন্তু তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। সার্টিফিকেট চায়।

সিলটা টেবিলে তুলে কলমটা হাতে নিলাম, সার্টিফিকেটটা আবার পড়লাম পুরোটা এবং চিন্তায় পড়ে গেলাম বেশ।

ওদিকে দর্শনার্থী শান্ত হচ্ছে না কিছুতেই। সে বলল:

—আমি তাদের ভালোমতো বুঝিয়ে বলেছি, বলেছি কোপারনিকাস প্রমাণ করে গেছেন এ কথা, গ্যালিলিওকে অনেক ভুগতে হয়েছে এই সত্য বলার কারণে, আর খ্রিষ্টানরা তো ব্রুনোকে পুড়িয়েই মেরেছে। ওরা পাত্তা দেয়নি আমার কথায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বলেছে, বর্তমান যুগে সার্টিফিকেট ছাড়া সব কথাই অচল।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। পৃথিবী গোলাকার—এ কথাটা জানা এক কথা, আর সেটা সার্টিফিকেটে লেখা—সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তার ওপরে আবার সই করা! হঠাৎ যদি ওপর থেকে নির্দেশনা আসে—এখন থেকে পৃথিবী কিউব-আকারের

বলে গণ্য করা হবে? তাহলে? তখন দায়িত্ব
নেবে কে? গ্যালিলিও?

—না,—দৃঢ়কণ্ঠে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সিলটা
সরিয়ে ফেললাম টেবিল থেকে। পৃথিবীর
গোলাকৃতি বিষয়ে কোনো দায়িত্ব আমি নিতে
পারব না। সে ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়নি।
দর্শনার্থীকে হতচকিত মনে হলো।

—সে কেমন কথা! আপনিই না একটু আগে
বললেন, পারমাণবিক যুগ আর কৃত্রিম উপগ্রহের
কথা! বললেন ছোট-বড় বিশ্বকোষের কথা!
দর্শনার্থী যখন হাঁটা ধরল দরজার দিকে, তখন
তাকে এত অসুখী দেখাচ্ছিল যে তাকে কয়েকটি
সান্ত্বনাবাক্য না বলে পারলাম না।

—শুনুন, এতটা হতোদ্যম হবেন না। আরেকটু
ওপর মহলে চেষ্টা করে দেখুন। জীবনে কখনো
আশা হারাবেন না।

652) বিজয় - আ. পাস্তেরনাক

—তুমি পুরুষ, নাকি পুরুষ নও!—বন্ধু তাকে
উদ্ধুদ্ধ করতে চাইল।—হাতে মুঠো পাকিয়ে
টেবিলে ঘুষি মেরে প্রমাণ করে দেখিয়ে দাও,
পরিবারের প্রধানটা কে আসলে।

তারাস পেত্রোভিচ ঘুষি মেরে দেখাল। কিন্তু স্ত্রীর
অবস্থান তাতে একটুও নড়ল না; উপরন্তু সে
স্বামীকে রাখল লাঞ্ছিত।

—এভাবে চলতে থাকলে তো ঘর ভাঙতে সময়
লাগবে না,—বোন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল।—
কোমল আচরণ করাটাই তোমার উচিত হবে
মনে হয়।

স্ত্রীকে ফুল উপহার দিলেন তারাস পেত্রোভিচ,
সিনেমায় নিয়ে গেলেন, এমনকি মেঝে মুছে
ফেললেন একদিন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর উদ্দেশ্য ভেদ
করে ফেলল সহজেই। ছাড় দিল না কোনো
ধরনের।

—যুক্তি হিসেবে ফুল একেবারেই হালকা,—
বললেন তাঁর চাচা, যিনি নারীজাতিকে
ভালোভাবে বোঝেন বলে বৃদ্ধ বয়সেও
অকৃতদার রয়ে গেছেন।—আরও ভারী কিছু বের
করো চিন্তা কর।

ভ্রাতুষ্পুত্র কান দিলেন তাঁর কথায়।

বিশালাকৃতির এক স্টেরিও রেকর্ডার নিয়ে তিনি
হাজির হলেন স্ত্রীর সামনে।

ফলাফল: উপহার গৃহীত, অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত।
বাকি রইল আর একটি অস্ত্র, সিদ্ধান্ত নিলেন

তারাস পেত্রোভিচ এবং শরণ নিলেন শাশুড়ির।

—মা, আপনার মধ্যস্থতা প্রার্থনা করি। সবাই যে কাজ করতে পারে, সেটা আমি কেন পারি না? শাশুড়ির মধ্যস্থতায় ফল হলো। তারাস পেত্রোভিচকে হলুদ রঙের শার্টের সঙ্গে ছাই রঙের কোট পরার অনুমতি মঞ্জুর করল স্ত্রী।

653) মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন - যুরি প্রকপেক্সো

একটা গল্প লিখতে শুরু করে এক মাস ধরে যাতনায় ভুগছি বড়। লেখা দুই অনুচ্ছেদের বেশি এগোয়নি।

—বড় বড় লেখকদের অনেকেই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতেন,—আমার বাসায় বেড়াতে এসে কথায় কথায় বললেন এক খ্যাতিমান সমালোচক। —হেমিংওয়ের কথাই ধরুন না! তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতেন। ওদিকে বালজাক লেখালেখির সময় কফি খেতেন অটেল পরিমাণে।

পরের দিনটা আমি দাঁড়িয়ে কাটলাম টেবিলের পাশে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে অনভ্যাসের কারণে কষ্ট হচ্ছিল বেজায়। কিন্তু অতীতের বিশ্ববিশ্রুত লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপুল পরিমাণে পান করা কফি আমাকে চাঙা করে রাখছিল।

একসময় পরম ক্লান্তিতে ঢলে পড়ার আগে মগজ চিপে অন্তত একটি চলনসই বাক্য বের করার চেষ্টা করে গেলাম প্রাণপণ।

—ভিন্ন কিছু উদাহরণও আছে,—স্বেচ্ছাধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন এক সাহিত্যবিদ।—এই যেমন, মার্ক টোয়েন লিখতে পছন্দ করতেন শুয়ে শুয়ে।

প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে ফেললাম আনুভূমিক আসন। যাবতীয় কর্মপদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রীতিকর। তবে এর একমাত্র ত্রুটি এই যে, সব সময় ঘুম পায় শুধু। আমার সমস্ত অন্তর্শক্তি ব্যয় হতে লাগল মূলত ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধে। এবং এই যুদ্ধে এতটা শক্তিক্ষয় হতে শুরু করল যে, লেখালেখি বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগও রইল না।

—শুয়ে শুয়েই যদি লিখতে হয়, তাহলে খাটে নয়, বাথটাবে শুয়ে লেখা উচিত,—এক সাংবাদিক-বন্ধু উপদেশ দিল। সে আরও জানাল আগাথা ক্রিস্টির সৃজনশীলতার রহস্য।—

পাঠকের মাথায় ঘোরপ্যাঁচ লাগানো সব কাহিনি তিনি কিন্তু রচনা করেছেন বাথটাবে শুয়েই। এ ছাড়া তিনি প্রতিদিন আপেলও খেতেন কয়েক কেজি।

ফল আমার পছন্দ। প্রচুর পরিমাণে আপেল কিনে বাথটাবে শুয়ে রইলাম অনুপ্রেরণার অপেক্ষায়। মাথা খুব সক্রিয়, কাজ করছে নিখুঁতভাবে। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য: আমার গল্পের প্রথম পাঠকদের সঙ্গে আমার করমর্দন, পরিচিতজনদের উচ্ছ্বাস, সমালোচকদের স্তুতি। এমনকি প্রাপ্য সম্মানী খরচ করব কীভাবে এবং তাতে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে দৃশ্যও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কল্পনা করে ফেলেছি।

টেবিলে বসে গল্পটা লিখে শেষ করলাম।

এরপর পাণ্ডুলিপি নিয়ে সম্পাদকের কাছে গেলাম যখন, তিনি দুবার পড়ে দেখলেন গল্পটা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন:

—আপনার নিজের পছন্দ হয়েছে?

—খুব যে পছন্দ হয়েছে, তা নয়,—স্বীকার করলাম আমি।

—নিজেদের লেখা পছন্দ না হলে প্রথিতযশা লেখকেরা কী করতেন, মনে আছে আপনার?

এই ধরুন গিয়ে, নিকোলাই গোগল তাঁর ‘মৃত আত্মা’র দ্বিতীয় পর্ব লিখে আবার পড়ে

দেখেছিলেন এবং তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি

তখন পাণ্ডুলিপি নিয়ে কী করেছিলেন?

—পুড়িয়ে ফেলেছিলেন,—জ্ঞান জাহির করার সুযোগ ছাড়লাম না।

—ঠিক তাই,—বললেন সম্পাদক।

654) অভিসন্দর্ভ - ড চেমেরিস

পাখিদের দিকে তাকিয়ে ফুটবল ভাবল, ওগুলোও যেহেতু উড়ছে, তার মানে ওদেরও কেউ না কেউ লাথি নিশ্চয়ই মারে। কেউ লাথি না দিলে ওড়া সম্ভব নয় কোনোমতেই (এটা আমি নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত জানি)। এখন ফুটবল একটি অভিসন্দর্ভ লিখছে। বিষয়: আঘাত—উড্ডয়নের চালিকাশক্তি।

655) সুভেনির

—কে জানি বলছিল, সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত?

—আমি, কেন?

—মামলা ঠোকা হবে আপনার বিরুদ্ধে, মিথ্যে অভিযোগের কারণে।

—আমি আর বলব না, প্লিজ, ক্ষমা করে দিন।

—মামলা, মামলা! মামলা ছাড়া কোনো কথা নেই।

—অনুনয় করে বলছি, প্লিজ, না। এই নিন এক মিলিয়ন ডলার।

—এটা কী? ঘুষ দিচ্ছেন নাকি?

—আরে না, এটা সুভেনির।

—তাহলে এই বাক্সে রাখুন। দুটো সুভেনির...না, তিনটে।

—ধন্যবাদ।

—ওয়েলকাম। তো এখন বলুন দেখি, সরকার কি দুর্নীতিগ্রস্ত?

—কী বলছেন এসব! অবশ্যই না!

—দেখলেন তো! আপনি এখন যেতে পারেন।
নেক্সট!(অজানা লেখক)

656) একটি তুলনামূলক গল্প

আমার যখন জন্ম হলো, সেই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমার ধর্মপিতা বললেন, ‘সবাইকে অভিনন্দন। কোনো শিশুর জন্ম মানেই একটি অর্জন এবং অর্জনটি শুধু সেই পরিবারেরই নয়, আমাদের পুরো সমাজের। আর এ কথাটি একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো নয় যে, গত বছরের তুলনায় এ বছরে ৩.৫টি বেশি শিশুর জন্ম হচ্ছে।’

শুনে খুব সুখবোধ হলো আমার। আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম।

ইনস্টিটিউট শেষ করলাম যখন, সেই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর বললেন, ‘সবাইকে অভিনন্দন। গত বছর এতগুলো গ্র্যাজুয়েটের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।’

কথাটা একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

শুনে খুব সুখবোধ হলো আমার। আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম।

কাজে যোগ দিলাম যখন, ডিরেক্টর সাহেব করমর্দন করে বললেন, ‘তরুণ বিশেষজ্ঞদের বেতন গত বছরের তুলনায় এ বছর অনেকটা বেড়েছে। ফেলে দেওয়ার মতো কথা তো নয় এটা।’

শুনে খুব সুখবোধ হলো আমার। আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম।

আমার যখন মৃত্যু হলো, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমার এক নিকটজন বলল, ‘ওর জন্য ভারী কষ্ট হচ্ছে আমার। তবু সুখের কথা এই যে, আমাদের

পরিবারে গত বছরের তুলনায় এ বছর মৃত্যুর হার কমে এসেছে।’

আমি যদি শুনতে পেতাম, আমার সুখবোধ হতো। আর যদি উঠতে পারতাম, হাততালি দিতাম। (আর্কাদি ইনিন । ল. অসাদচুক)

657) কঙ্গুস - লেড করসুনস্কি

লুসিয়ার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে দারুণ কাটল সময়টা। হিসাব করে রেখেছি, পাঁচ রুবল পঁচাত্তর কোপেক বিল আসার কথা।

ওয়েট্রেস এসে বলল, ‘বিল হয়েছে সাত রুবল চব্বিশ কোপেক।’

এই গলাকাটা বিল উদয় হলো কোথেকে!

ভাবলাম আমি মনে মনে।

ওয়েট্রেস দাঁড়িয়ে আছে, মুখে বেহায়ার হাসি।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, বান্ধবীর সামনে লজ্জায় পড়তে চাইব না বলে বিল নিয়ে আমি খ্যাঁচখ্যাঁচ করব না। আমি কি কঙ্গুস নাকি!

ব্যাপার না! ভাবলাম আমি, কাল আবার আসব এর একটা ফয়সালা করতে।

‘সাত রুবল চব্বিশ কোপেক কেন?’ বিড়বিড় করে বলল লুসিয়া, ‘পাঁচ রুবল পঁচাত্তর কোপেক হওয়ার কথা না?’

‘তাই বুঝি! আমি দুঃখিত!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়েট্রেস বলল, ‘আমার ভুল হয়েছে হিসাবে।’

ভাগ্যিস ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেল!

ভাবলাম আমি। তবে দুঃখের কথা এই যে, লুসিয়া, বোঝা গেল, কঙ্গুস।

658) এক হৈমন্তিক সন্ধ্যায় - ডিক্তর ককলুস্পকিন

‘তুমি চাও, তোমাকে আমি আকাশ থেকে একটি তারা এনে দিই?’—জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

‘চাই,’—মেয়েটি জানাল।

‘আর অন্য কিছু চাও?’—ছেলেটি প্রশ্ন করল।

‘না,’—মেয়েটি উত্তর দিল, ‘আমি শুধু তারা চাই।’

‘সত্যি বলতে কি,’—ছেলেটি বলল, ‘আকাশ থেকে তারা এনে দেওয়া সম্ভব নয়।’

‘কিন্তু তুমি তো কথা দিয়েছ।’—বলল মেয়েটি। ছেলেটি নীরব রইল।

‘দেখলে তো!’—বলল মেয়েটি, ‘তোমরা সবাই আসলে এক রকম! প্রথমে প্রতিশ্রুতি দাও, আর

পরে...'

মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

659) ভালোবাসার গল্প - আ.

কাবাকোড

‘তুমি আমাকে ভালোবাসো?’—মেয়েটি প্রশ্ন

করল। ‘বাসি, খুব বাসি।’

‘সত্যি!’

‘সত্যি, সত্যি।’

‘আমি তোমার সবচেয়ে, সবচেয়ে প্রিয়?’

‘সবচেয়ে, সবচেয়ে, সবচেয়ে।’

‘আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকব?’

‘সব সময়, সব সময়।’

‘তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো?’

‘বাসি, বাসি।’

‘খুব-খুব?’—মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

‘তুমি থামবে! এক কথা কতবার বলা যায়!’

660) ভালোবাসা - ডিক্তর

ককলুশকিন

সান্ধ্য পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল প্রেমিকযুগল।

‘এই বাড়িটা কী চমৎকার!’—মেয়েটি বলল।

‘হ্যাঁ, দারুণ!’—বলল ছেলেটি।

‘কিন্তু ওই বাড়িটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,’—

মেয়েটি বলল।

‘তাই?’—বলে ছেলেটি মুঠো পাকিয়ে তেড়েফুঁড়ে

এগিয়ে যেতে থাকল বাড়িটার দিকে।

‘করছোটা কী!’—মেয়েটি বলল চিৎকার করে,

‘দাঁড়াও, বাড়িটায় মানুষজন আছে তো। তাদের

তো কোনো দোষ নেই।’

661) প্রতিশ্রুতি রক্ষা - দ. পেরলিন

‘তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। তুমি

পাশে থাকলে আমি হয়ে উঠি প্রবল শক্তিদর!’—

ছেলেটি তার বাহু ভাঁজ করল। শার্টের ওপর

দিয়েই দেখা গেল তার ফুলে ওঠা পেশি!

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল

মেয়েটি।

‘তোমার জন্য আমি আকাশ থেকে তারা এনে

দিতে পারি!’—ছেলেটি লাফ দিল, নৈশ নীলিমা

কমে গেল একটি তারা!

মেয়েটি আবার ছেলেটিকে উপহার দিল মনোহর

হাসি!

ছেলেটি তখন বলল—

‘তোমার জন্য আমি যেতে পারি পৃথিবীর শেষ

প্রান্তে!’

‘ঠিক আছে, আমাদের বিয়ে হবে,—মেয়েটি
সম্মতি জানাল অবশেষে। কিন্তু...

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ছেলেটি রওনা
দিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের উদ্দেশে।

662) দু’জনা - ন. শ্রীমদোজা

মেয়েটি বসন্তকাল ভালোবাসে। ছেলেটি—
হেমন্তকাল। মেয়েটির পছন্দ মাছের কাটলেট।
ছেলেটি পছন্দ করে মাংসের চপ।

হইচই ও আড্ডায় মেয়েটির বিপুল উৎসাহ।

ছেলেটি নৈঃশব্দ্য ও নিষ্পন্দতার পক্ষপাতী।

মেয়েটির যেন পায়ের তলায় সরষে। ছেলেটি
গৃহাসক্ত।

মেয়েটি অমিতভাষী। ছেলেটি স্বল্পবাক।

ছোটবেলা থেকেই এই পৃথিবীটা বদলে দেওয়ার
স্বপ্ন মেয়েটির। ইচ্ছে অভূতপূর্ব কোনো কীর্তি
গড়ার।

ছেলেটি ছোট থাকতেই উপলব্ধি করেছে,
কোপারনিকাস সে হতে পারবে না, গ্যালিলিও
তো দূরের কথা।

মেয়েটি রোমান্টিক। ছেলেটি বাস্তববাদী।

কবিতা ছাড়া বাঁচার কথা মেয়েটি ভাবতেও পারে
না। ছেলেটির অ্যালার্জি কবিতায়।

মেয়েটি স্বর্ণকেশী। ছেলেটির চুলের রং কালো।

মেয়েটি পছন্দ করে সোনালি চুলের ছেলেদের।

ছেলেটির কালো চুলের মেয়েরা।

তাতে কী! তারা দুজনেই নিজেদের মতো করে
সুখী।

মেয়েটি থাকে সিকতিভকারে। ছেলেটি

ব্রিয়ানস্কে।

663) দুঃস্বপ্ন - জাদিমির কুজমেক্সো

বসন্তলোকে আমি সহ্যই করতে পারি না! অবশ্য
কে-ই বা তাদের ভালোবাসে!

একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমাদের অফিসে

একটা আইন চালু করা হয়েছে: কোনো রকম

শাস্তির ঝুঁকি ছাড়া যেকোনো বসের মুখে কষে

আঘাত করা যাবে এক হাজার ডলারের

বিনিময়ে।

ছোটখাটো অফিসারদের কাছে এক হাজার

ডলার একেবারেই অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ।

তবে আমরা অফিসের সমস্ত কর্মচারী মিলে

সারা বছর ধরে অল্প অল্প করে জমিয়ে একসময়

কাজ্জিত অঙ্কে পৌঁছাতে পারলাম। সেটা জমা দিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রধান আর্নোল্ড তিমফেয়েভকে একবার ঘুষি হাঁকানোর অনুমতিপত্র হাতে পাওয়া গেল। তারপর টস করে ঠিক করা হলো কষে ঘুষি লাগানোর সৌভাগ্যের অধিকারী কে হবে। নাম উঠল আমার।

ভালোমতো ঘুমিয়ে উঠলাম, গোসল সেরে শেভ করলাম। নাশতা খেলাম পেট ভরে। তারপর সেরা স্যুট (স্যুট আমার একখানাই) পরে হাজির হলাম অফিসে। নিজের কেবিনের পাশে দেখা গেল আর্নোল্ড তিমফেয়েভকে। ত্রুর হাসি হেসে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেললাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, আগে মুখস্থ করে নেওয়া বাক্যটা উচ্চারণ করলাম, ‘নরকে দেখা হবে, হারামজাদা!’ তারপর শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে তার মুখের দিকে হাত চালিয়ে...ঘুষি দিলাম। না। পারলাম না। সাহসে কুলাল না।

অর্থাৎ, এমনকি স্বপ্নেও সাহসে কুলাল না। হায় ঈশ্বর, আমাদের কী হাল তারা করেছে!

664) ভদ্রতাবোধ - ভিচেস্ত্রাড

ভেরখোভস্কি

অপরিচিত এক লেখক এসে ঢুকল সম্পাদকের দপ্তরে, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল এক তাড়া কবিতা।

সম্পাদক পড়তে শুরু করলেন। তারপর একসময় ছুড়ে ফেলে দিলেন পাণ্ডুলিপি, বললেন: —কী এসব! এই জঞ্জাল কেন এনেছেন?

—আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আজ। খালি হাতে কীভাবে আসি!

665) একমাত্র পথ - আনাতোলি

ফ্রশকিন

—এই যে ভাই, ছাদের ওপর কী করছেন?

—আত্মহত্যা করব।

—ওহ্, আচ্ছা। তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু সঙ্গে ক্যানিস্টারা কেন?

—গায়ে আগুন লাগিয়ে তারপর ঝাঁপ দেব; পুরোপুরি নিশ্চিত হতে এই ব্যবস্থা।

—খুব সম্ভব কাজ হবে না। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার উপায় এখন নেই রে ভাই। সময়টাই যে ও-রকম।

—ভাবছেন, আমার কাজে বাধা পড়বে?

—হ্যাঁ। ধরুন, ঝাঁপ দেওয়ার পর আটকে যাবেন
কোনো কিছুতে।

—তাহলে তো গলায় পাথর ঝুলিয়ে পানিতে
ডুবে মরাটাই শ্রেয় মনে হচ্ছে।

—কিন্তু নদীর পানিতে এখন এত আবর্জনা!
পানিতে ঝাঁপ দিলে আবর্জনা জড়িয়ে যাবে দুই
পায়ে, তারপর ডোবার বদলে কলসির মতো
ভাসতে থাকবেন।

—নিজের মাথায় গুলি করব তাহলে।

—তাতেও কাজ হবে না। দেখবেন, গুলি পাশ
দিয়ে বেরিয়ে গেছে অথবা বারুদ ভেজা। এসব
এখন খুব তাড়াহুড়ো করে উৎপাদন করা হয়
বলে মানসম্পন্ন হয় না একেবারেই।

—ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেব!

—ট্রেন তো বরাবরই লেট!

—গলায় দড়ি দিয়ে মরব!

—আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখন
বাড়িঘর কীভাবে বানায়, লক্ষ করেননি? হয় হুক
খুলে, নয়তো দড়ি ছিঁড়ে ছুঁড়মুড় করে পড়ে
যাবেন।

—বিষাক্ত মাশরুম খাব পেট ভরে!

—মনে হয় না, কাজে দেবে। কোন মাশরুম
বিষাক্ত, আর কোনটা বিষাক্ত নয়, এখন সেটা
নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য।

—অনাহারে থেকে নিজেকে মেরে ফেলব।

—বুঝলাম না!

—বললাম, অনাহারে থেকে নিজেকে মেরে
ফেলব।

—হাসালেন! আমাদের দিনকাল কি অনাহারেই
কাটছে না?

—ভাই রে...!

—কী?

—আমি তাহলে কী করব?

—একটি অব্যর্থ উপায় আছে। আপনাকে খুব
সুন্দর জীবনযাপন শুরু করতে হবে। সুন্দর
জীবনযাপন শুরু করলেই দেখবেন একদিন
কেউ এসে আপনাকে খুন করে রেখে
গেছে। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি
২৭, ২০১২

666) পাত্রী চাই - কনস্টান্টিন মেলিখান

আমি পাত্রী খুঁজছি। তাকে কেমন হতে হবে?
চেহারার ব্যাপারে বিশেষ খুঁতখুঁতি আমার নেই।
স্লিম ফিগার আর মুখখানা সুন্দর হলেই চলবে।

তাকে হতে হবে হাসিখুশি। আমি যখন মজার কথা বলি, তাকে হাসতে হবে। আর আমি যখন মদ খেয়ে বাসায় ফিরব, তাকে মজার কথা বলতে হবে।

তার বাড়ির বিষয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সেটা শুধু বড়সড় হলেই চলবে।

সে বেতন কত পায়, সেটাও বড় ব্যাপার নয়।

আমার বেতনের চেয়ে বেশি হলেই হলো।

বিয়ের খরচ ভাগ করা হবে সমান দুই ভাগে।

এক ভাগ দেবে সে, অন্য ভাগ তার বাবা-মা।

আমি নিশ্চিত, বিয়ের পর আমাদের রুচির মিল

থাকবে অনেক। ধরা যাক, ফুটবল দেখতে

আমার সঙ্গে স্টেডিয়ামে যেতে সে আগ্রহী নয়।

আমরা সে ক্ষেত্রে বাসায় বসে টিভিতে হকি

দেখব।

তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেব আমি। তাকে

অ্যালকোহল, সিগারেট এবং যাবতীয়

ক্ষতিকারক খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে রাখতে

সম্ভাব্য সবকিছু করব। তার ভাগেরটা আমি

সেঁটে দেব।

তার পোশাক হবে দেবীদের মতো সাদাসিধে ও

সুলভ।

তার কাজের একাংশের ভার আমি নেব আমার

পুরো কাজের দায়িত্ব সে নিলে।

তার রান্নার হাত কেমন, সে নিয়ে গরজ নেই

আমার। শুধু সুস্বাদু হলেই চলবে। এবং শুধু

রুশ খাবারই রান্না করতে হবে, এমন কোনো

কথা নেই। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা

থাকবে, আজ জর্জিয়ান খাবার, কাল সকালে

হাঙ্গেরীয়, রাতে চায়নিজ...

কাপড় ধোয়া আর ইস্ত্রি করার ব্যাপারে তার

কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তবে

কাপড়চোপড় পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করা অবস্থায়

থাকতে হবে প্রতিদিন।

ঘর পরিষ্কার করতে তাকে বাধ্য করব না।

সুগৃহিণী হলে সে নিজেই এই কাজ করবে।

তবে গৃহকর্ত্রী হিসেবে সে মানসম্মত না হলে

ঘর পরিষ্কারের কাজটা করবে তার মা।

ঘর পরিষ্কার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে

তাকে অনুমতি দেব বাসনপত্র ধোয়ার।

আমরা দোকানে যাব একসঙ্গে। যাওয়ার সময়

ব্যাগ টানব আমি, ফেরার সময় সে।

তার মতামত আমি গ্রহণ করব, যদি আমারটার

সঙ্গে মেলে।

তার নিরাপত্তার কথা আমি ভাবব সব সময়।
পথে-ঘাটে দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে তাকে যাতে সব
খুইয়ে বসতে না হয়, বাসা থেকে বেরোনোর
সময় তাকে এক রুবলের বেশি দেব না সঙ্গে।
তার কাছ থেকে কোনো রকম আনুগত্য দাবি
করব না। শুধু আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ করলেই
চলবে।

আমি পাত্রী খুঁজছি।

তাকে আমি আমার অর্ধেক জীবন দিয়ে দিতে
প্রস্তুত, যদি সে আমাকে তার পুরো জীবন
উৎসর্গ করে।

আমার চাহিদাগুলো তার মনঃপূত না হলে সে
বরং অন্য পাত্র খুঁজুক।

আমি পাত্রী খুঁজে চলেছি বহু বছর ধরে। **সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০২, ২০১২

667) বন্ধুত্বের সনদপত্র - আন্দ্রেই স্মিরনোভ

‘বিয়ে যেহেতু রেজিস্ট্রি করতে হয়, তাহলে
বন্ধুত্ব রেজিস্ট্রির ব্যবস্থাও কি করা যায় না?’
চিন্তিত স্বরে বললেন প্রিকোপি বরিসোভিচ।
‘কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, পাসপোর্টে সিল-ছাপের
মেরে বন্ধুত্বের সনদপত্র দেওয়া দরকার।
রাগারাগি হলো, বন্ধুত্ববিচ্ছেদের সিল
পাসপোর্টে। তবে বন্ধুত্ব রেজিস্ট্রেশনের আগে
দুজনকেই দুই মাস সময় দিতে হবে। এই
সময়ে তারা পরস্পরকে যাচাই করে সিদ্ধান্ত
নেবে, তারা সত্যিই বন্ধুত্বের উপযোগী কি না।
রেজিস্ট্রির পর দুজনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য
থাকতে হবে পরস্পরের প্রতি। আইনগত
বন্ধুকে কেউ দুর্যোগের সময় ফেলে গেলে তাকে
আইনের মুখোমুখি হতে হবে...’ **সূত্রঃ** দৈনিক
প্রথম আলো, এপ্রিল ০২, ২০১২

668) একটি কম্পকাহিনি - ভিতালি মার্তিনভ

একদিন পথে এক মেয়ে এগিয়ে এল আমার
দিকে। তারপর ভীতস্বরে জিজ্ঞেস করল,
‘দৈবক্রমে আপনি কি বেজগিটার বাজান?’
আমি মাথা নাড়ালাম দুপাশে।
‘দারুণ তো!’ খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। ‘আমিও
বাজাই না। আমার নাম আলা। তোমার?’
তার মাথার চুলগুলো চমৎকার, মনোহর

মুখমণ্ডল, আকর্ষণীয় নাক।

তাকে এড়াতে একেবারেই অন্য দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, ‘আমি মেয়েদের সঙ্গে রাস্তায় পরিচিত হই না।’

‘তাহলে চলুন, ওই রুটির দোকানে যাই’, মেয়েটি প্রস্তাব দিল।

শুনে দয়া করে হাসলাম বটে, তবে মনে মনে ভাবলাম: ‘রসবোধ আছে বেশ। মনে হচ্ছে, একঘেয়ে লাগবে না তার সঙ্গে। তবে কি ফিগারটা নিখুঁত নয় তার?’

আড়চোখে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলাম, তার ফিগার নিখুঁত।

‘মা আমার জন্য অপেক্ষা করছে’, জানালাম তাকে নীরসভাবে।

‘কিন্তু এখন তো সবে দুপুর!’ অবাক হলো সে।

‘বিশ্লেষণী চিন্তাক্রমতা আছে’, মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম আমি। ‘অসাধারণ মেয়ে সে।’

‘দিদিমা টেনশন করবে’, বললাম বিড়বিড় করে।

‘কিন্তু তোমার তো মনে হয় দিদিমা নেই’, ধূর্তভাবে হাসল সে।

‘কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার!’ ভারি বিস্ময় হলো আমার। ‘ওকে আমাদের আড্ডায় নিতে হবে।

সকলেই বান্ধবী নিয়ে আসে, শুধু আমিই সঙ্গিনীহীন। বয়স পঁচিশ হলো, অথচ এখনো ব্যাচেলর।’

‘তোমার কি সিরিয়াস উদ্দেশ্য আছে? নাকি শুধু সময় কাটানোর ধান্ধা?’ আক্রমণে নামলাম আমি।

সিরিয়াস উদ্দেশ্য আছে বলে মেয়েটি নিশ্চিত করল।

‘বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে আপত্তি করবে না তো?’

না-সূচক মাথা নাড়ল মেয়েটি।

‘বিয়ের পরে আমরা থাকব কোথায়?’

‘এক রুমের একটা ফ্ল্যাট আছে সমস্ত সুযোগ-সুবিধেসহ।’

‘শাশুড়িও আমাদের সঙ্গে থাকবে নাকি?’

‘না, তার নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে।’

‘রান্না করতে পারো?’

সে রন্ধন প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট দেখাল।

‘কাপড়চোপড় ধোয়া?’

‘ওয়াশিং মেশিন কিনব আমরা। তবে আমি তো একা সবকিছু করে উঠতে পারব না।’

তোমাকেও হাত লাগাতে হবে।’

‘সম্ভাবনা কম।’

‘লাগাতেই হবে’, বলল সে।

‘সম্ভাবনা কম’, উচ্চারণ করলাম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

‘তাহলে আর কী...’, বলে মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ‘সব মেয়েই এক রকম’ মনে হলো আমার। আমি হাঁটা ধরলাম অন্যদিকে।

669) রহস্যভেদ - আর্কাডি ইনিন

‘কাজে আসতে একদিনও দেরি হয়নি তার’, বলল লোকতিয়েভ। ‘এমনকি সোমবার বা কোনো উৎসবের পরের দিনও।’

‘বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার’, চিন্তিত মনে হলো কার্পুখিনকে।

‘বললেই হলো!’ বিশ্বাস করল না সিওমিন।

‘সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই’, আবার বলল লোকতিয়েভ, ‘সে কাজ ছেড়ে সিগারেট ফুঁকতে ওঠে না একবারও, কাজের সময় ফুটবল-হকি নিয়ে একটা কথাও বলে না, লাঞ্চ ব্রেকের বেল বাজার পরেই শুধু সে বুফেতে যায়।’

‘বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার’, চিন্তিত মনে হলো কার্পুখিনকে।

‘বললেই হলো!’ বিশ্বাস করল না সিওমিন।

‘শুধু ভেবে দেখুন’, কথা চালিয়ে গেল লোকতিয়েভ, ‘ভুয়া কৈফিয়ত সে দেখায়নি একবারও, তার কারণে কাজ থেমে ছিল এমন ঘটনাও ঘটেনি, সমস্ত দায়িত্ব সে নিখুঁতভাবে পালন করেছে।’

‘বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার’, চিন্তিত মনে হলো কার্পুখিনকে।

‘বললেই হলো!’ বিশ্বাস করল না সিওমিন।

‘অবাক হওয়ার কিছু নেই। ব্যাটাকে ধরতে হবে’, বলল মেজর লোকতিয়েভ।

‘সে আমাদের লোক নয়’, বলল ক্যাপ্টেন কার্পুখিন।

‘আমাদের লোক ওভাবে কাজ করে না’, সমর্থন জানাল লেফটেন্যান্ট সিওমিন।

এক ঘণ্টা পরে গ্রেপ্তার করা হলো বিদেশি গুপ্তচরটিকে।

670) রুচি - গ্রিগোরি প্রোশিন

চারটে গল্প লিখলাম। সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনটি দিয়ে এলাম পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে

কর্মরত এক ব্যক্তির হাতে।

দুদিন পরে তিনি জানালেন, ‘এই দুটো গল্প আমি নির্বাচন করেছি। তৃতীয়টা, বুঝতেই পারছেন, বেশ দুর্বল। খুব সম্ভব প্রকাশ করা হবে না।’

‘ঠিকই বলেছেন’, আমি বললাম, ‘তিন নম্বরটা বাকি দুটোর তুলনায় দুর্বল।’

‘দেখা যাক, বিভাগীয় সম্পাদক সাহেব কী বলেন। আমি তাকে গল্প দুটো পৌঁছে দেব।’

এক সপ্তাহ পেরোলে বিভাগীয় সম্পাদক জানালেন, ‘বুঝলেন, আমার মনে হয়, প্রধান সম্পাদককে আমি এই গল্পটা দেখাব। দ্বিতীয় গল্পটা, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বেশ দুর্বল। প্রকাশের উপযুক্ত নয়।’

‘একেবারেই দুর্বল’, তাঁর কথায় সমর্থন জানিয়ে বললাম। ‘তবে প্রথমটা শ্রেয়তর।’

এক মাস পরে প্রধান সম্পাদক ডেকে পাঠালেন আমাকে।

‘আপনার আর কোনো গল্প নেই?’ গল্পটা আমাকে ফেরত দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ‘এই গল্পটা, বুঝতেই পারছেন, বেশ দুর্বল। প্রকাশ করার মতো নয়।’

‘ইয়ে, মানে’, আমি কী বলব, বুঝতে পারছিলাম না। আমার আর কোনো গল্প নেই ভেবে বড়ই লজ্জাবোধ হচ্ছিল প্রধান সম্পাদকের সামনে। একটু ভেবে নিয়ে তখন নিজের থলি থেকে বের করলাম চতুর্থ গল্পখানা, যেটা এখন আপনারা পড়ছেন। দেখলেন তো, প্রকাশ করেছে! অথচ এই গল্পটা দেখাতে অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল আমার। ভেবেছিলাম, দুর্বল, প্রকাশিত হবে না।

671) গল্প ও বাস্তবতা - এ. আব্রামভ

ছোট্ট এক রসগল্প লিখেছিলাম। সেটার শেষাংশ ছিল এ রকম: ‘সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলাম আমি। এবং আর ফিরলাম না স্ত্রীর কাছে।’

লেখাটা প্রকাশিত হলো।

সক্কালবেলা ফোন করল এক বন্ধু।

‘তোমার লেখাটা পড়লাম,’ বলল সে। ‘বেশ মানসম্মত। আচ্ছা, তুমি এখন কোথায়?’

‘অফিসে।’

‘আমি সেটা জানতে চাইনি। বলছিলাম, এখন বাস করছ কোথায়?’

‘কোথায় মানে?’ ভারি অবাক হলাম আমি।

‘যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।’

‘ওহ, বুঝেছি,’ বলে বন্ধুটি ফোন রেখে

দিল। কর্মদিবসের একেবারে শেষের দিকে ফোন করল আমার মায়ের বান্ধবী।

‘আমার কথা মন দিয়ে শোন,’ খুব আন্তরিক শোনাতে তার গলা। ‘দুপুরের খাবার খাবে তুমি ভেরা আন্টির বাসায়। তার সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। রাতের খাবার খেতে আমাদের বাসায় স্বাগতম। তবে নাশতার ব্যবস্থাটা তোমাকে নিজেই করে নিতে হবে।’

পরদিন সকালে দরজায় মুহূর্মুহ ধাক্কা। খুলে দেখি, শাশুড়ি দাঁড়িয়ে। ভেজা ছাতাটা থেকে পানি ঝাড়লেন আমার দিকে।

‘এখন খুলে বলো তো, কী হয়েছে তোমাদের মধ্যে?’

‘কিছুই হয়নি তো, মা!’ আমার স্ত্রী জানাল।

‘কথা ঘুরিয়ে না। আমাদের সেমাফোরভে সবাই তোমাদের নিয়েই আলোচনা করছে। কী লজ্জা আর কলঙ্ক!’

‘কিন্তু ওটা ছিল একটা গল্পমাত্র,’ আমি বললাম সবিস্ময়ে।

‘ভাগ্যিস উপন্যাস নয়! বিশদ বর্ণনাসহ।’

শাশুড়ির বোমাবর্ষণ চলল টানা দুই ঘণ্টা। ফলও হলো তাতে। আমার স্ত্রী আবেগ সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলে যোগ দিল শাশুড়ির পক্ষে।

‘আমি জানতে চাই, আর কত দিন তোমার সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ হয়ে থাকতে হবে আমাকে? তুমি অন্য কাউকে নিয়ে লিখতে পারো না?’

‘এক মিনিট!’ থামিয়ে দিলাম তাকে। অসহায় ক্রোধে মুঠো পাকিয়ে বললাম, ‘গতবার আমি লিখেছিলাম ঘটনাক্রমে আমার সহযাত্রী বনে যাওয়া মারিয়া নিকোলায়েভনাকে নিয়ে। কী হয়েছিল এরপর? ঈর্ষাকাতর হয়ে তুমি বারবার বলছিলে, “আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, ক্ষমা করে দেব, শুধু বলো, তার সঙ্গে তোমার কী হয়েছিল।”...এটা একেবারে সহ্যের অতীত!’ সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলাম আমি।

672) ভদ্রলোকনামা - কনস্টান্টিন

মেলিখান

সত্যিকারের ভদ্রলোক সব সময় মহিলাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, যদি বাসাটি হয় ভদ্রলোকের।

সত্যিকারের ভদ্রলোক সব সময় মহিলাকে আগে ঢুকতে দেয়, যদি মহিলার পৃষ্ঠদেশ অনেকটা অনাবৃত থাকে।

সত্যিকারের ভদ্রলোক মহিলার ভারবহনের দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যিকারের ভদ্রলোক স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। স্ত্রী চলে গেছে, সেটা সে নিশ্চিত হতে চায়।

সত্যিকারের ভদ্রলোক কখনো মহিলার বয়স জিজ্ঞেস করে না। সে জিজ্ঞেস করে, কবে সে স্কুল পাস করেছে।

সত্যিকারের ভদ্রলোক সব সময় মহিলাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়; শ্রেয়তর জায়গা দখল করতে।

সত্যিকারের ভদ্রলোক সব সময় মহিলাকে আদরমাখা নাম ধরে ডাকে, যদি সে মহিলার সত্যিকারের নাম ভুলে যায়।

673) বেয়াদব - ন. পলতাই

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, ‘হ্যালো! শুনছি।’

‘কে?’

‘আপনি কোথায় ফোন করেছেন?’

‘আমি জিজ্ঞেস করছি, কে?’

‘আর আমি জিজ্ঞেস করছি, কোথায় ফোন করেছেন?’

‘কোথায় ফোন করেছি, তা আমি জানি।’

‘সত্যিই জানেন?’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ? চাকরি খেয়ে নেব বললাম!’

‘কোন চাকরি, বলবেন, প্লিজ?’

‘কোন চাকরি মানে? আমার অফিসের চাকরি!’

‘আপনি কে?’

‘হুমম... ইভানভ, এটা তুমি?’

‘না।’

‘পেত্রোভ?’

‘পেত্রোভও নই।’

‘আমার সঙ্গে খেলা কোরো না!... সেমিওনভ?’

‘সেমিওনভও নই।’

‘তার মানে মিখাইলভ?’

‘তার মানে আমি মিখাইলভ নই।’

‘তুমি যে-ই হও, চাকরি নট করে দেব। আমি এন্ফুনি আসছি এবং এসে যেন তোমাকে না দেখি।’

‘আমি তো আপনাকে বাসায় আমন্ত্রণ জানাইনি।’

‘তুমি তো বড়ই নির্লজ্জ হে!’

‘কার কথা বলছেন?’

‘তোমার। ঠিক তোমার কথা বলছি, সিদোরভ।’

‘আমি সিদোরভ নই।’

‘গ্রিগোরিয়েভ?’

‘না।’

‘বরিসভ?’

‘আপনার কোনোভাবেই জানার কথা নয়, আমার পদবি দেনিসভ।’

‘দেনিসভ? কোন দেনিসভ?’

‘যে দেনিসভ এখন আপনার সঙ্গে কথা বলছে।’

‘কিন্তু তুমি ওখানে... ওখানে তুমি কী করছ?’

‘লাঞ্চ করছি।’

‘লাঞ্চ করছি মানে? অফিসে বসে লাঞ্চ করছ?’

‘না, বাসায় বসে।’

‘বাসায়? তুমি কি অফিস থেকে কথা বলছ না?’

‘না, নিজের বাসা থেকে।’

‘তুমি প্যাঁচ কোষো না। তোমার বাসার কথা

আসছে কেন! আমি আমার অফিসে ফোন

করেছি।’

‘আর আমি কথা বলছি নিজের বাসা থেকে।’

‘কিন্তু নাম্বারটা তো আমার!’

‘তার মানে, রং নাম্বারে ডায়াল করেছেন।’

‘রং নাম্বারে ডায়াল করেছি আমি? তুমি কার

সঙ্গে কথা বলছ, তোমার ধারণা আছে?’

‘ফোন করেছেন কোন নাম্বারে, বলুন তো?’

‘কোন নাম্বারে! কোন নাম্বারে!... থ্রি-থ্রি-থ্রি-টু-টু।’

‘আর আমার নাম্বার টু-টু-টু-থ্রি-থ্রি!’

‘যত্নোসব! নিজের বাসা এনে ঢুকিয়েছে আমার

অফিসে! ফোন রাখো এম্ফুনি, বেয়াদব

কোথাকার!’

674) নতুন করে শুরু করা - এ. গ্রিগ

এক চমৎকার সকালে... না, এক বিচ্ছিরি

সকালে ছেলেটি বলল মেয়েটিকে, ‘চলো না,

আবার নতুন করে সব শুরু করা যাক।’

কথাটা বলার আগে সে সব গভীরভাবে বিশ্লেষণ

করে দেখেছে। সবকিছু। এখন সে নিশ্চিত

জানে, কী কী করা উচিত হয়নি তার, কী কী

বলা উচিত হয়নি, কী কী ভাবা উচিত হয়নি।

আর তাই সবকিছু যদি নতুন করে শুরু করা

যেত, ভাবছিল সে।

‘নতুন করে শুরু করার কথা বলছ?’ মেয়েটি

বলল, ‘তথাস্তু!’

তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে চলে গেল
মায়ের কাছে।

675) আচরণ - আলেক্সান্দর খোর্

অফিসের নতুন সহকর্মী স্বেতলানাকে ভারি মনে
ধরল ইগরের। একসঙ্গে কয়েক দিন কাজ
করার পর সে তাকে বাইরে কোথাও দেখা
করার প্রস্তাব দিল।

নির্ধারিত সাক্ষাতের আগে উত্তেজনার প্রাবল্যে
নিজেকে নিয়ে কী করবে, বুঝতে পারছিল না
ইগর। সকালবেলা সেলুনে গিয়ে চুল কাটিয়ে
এল। জুতো পালিশ করে এমন চকচকে করল
যে তাতে ধুলোও আটকে থাকছিল না, পিছলে
পড়ে যাচ্ছিল। দুপুরে খাবার সময় প্রায় কিছুই
খেতে পারল না। লাঞ্ছের পর আবার গেল
সেলুনে। এবারে দাড়ি কামিয়ে নিতে। সাক্ষাতের
সময়ের তখনো অনেকটা বাকি, ইগর ছুটল
বাজারে স্বেতলানার জন্য ফুল কিনতে। তারপর
নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট সময়ের
অনেক আগে।

এককথায়, এমন আচরণ সে করছিল, ঠিক যেন
অনভিজ্ঞ তরুণ প্রেমিক— পূর্ণবয়স্ক, বিবাহিত
পুরুষ নয়।

676) সহমর্মিতা - বরিস নেমিরভ

মেন্যুতে চোখ বোলাতে বোলাতে ওয়েট্রেসের
জন্য অপেক্ষা করছি। বিপরীত দিকের চেয়ারে
বসা লোকটি খুব ভাবনামগ্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
খাবার খাচ্ছে সশব্দে।

‘হুমম,’ ব্যথা ভারাক্রান্ত গলায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল
সে। ‘খুব কষ্ট হচ্ছে তার জন্য।’

‘কার জন্য?’ কিছুক্ষণ দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করেই
ফেললাম শেষমেশ।

‘স্ত্রীর জন্য,’ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল।

‘সে একেবারে দেবীর মতো। না, দেবীর চেয়েও
শ্রেষ্ঠ।’

আমি বুঝে গেলাম, কারুর সঙ্গে নিজের কষ্ট
ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তার
এখন।

‘কোনো বিষাদময় ঘটনা ঘটেছে কি?’

‘সে আর বলতে! এই যে শালার মহামারি! আর
এই হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাল!’

অসহায় ভঙ্গিতে চামচ নেড়ে জিব দিয়ে ঠোঁট

চাটল সে। ‘কিছুদিনের মধ্যেই আমরা চাঁদে যেতে শুরু করব অথচ তুচ্ছ ভাইরাস আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। স্ত্রী ভুগছে তিন দিন ধরে।’

‘অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে না কিছুতেই?’

‘ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি জানি না।’

‘বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।’

‘যে মুহূর্তে সে ফ্লুতে আক্রান্ত হলো, আমি বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম যাতে সংক্রমিত না হই,’ দুঃখক্লিষ্ট দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার দিকে।

‘আপনার ধারণা, বাসায় ওকে একা রেখে আসার সিদ্ধান্ত আমি খুব সহজে নিতে পেরেছি? ও একলা বাসায়, দেখার কেউ নেই, ফ্ল্যাটের ভেতরে ঠাণ্ডা...’

‘আমি নিশ্চিত জানি,’ ভদ্রতার সুরে বললাম তাকে, ‘আপনার হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে।’

‘ঠিক তাই। একবার কল্পনা করে দেখুন: ওর কাছ থেকে আমি সংক্রমিত হলাম, রোগে পড়লাম। সে তখন অতি অবশ্য আমার সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু ওর যে ৪০ ডিগ্রি জ্বর! না, এটা আমি হতে দিতে পারতাম না।’ চোখের জলের বড় একটা ফোঁটা তার গাল বেয়ে সশব্দে পড়ল ধোঁয়া ওঠা স্যুপের ওপর।

677) বিখ্যাত হতে চাইলে - অলেগ নাজারড

বিখ্যাত হতে চাইলে প্রচুর লেখা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

প্রচুর লেখা প্রকাশ করতে চাইলে পত্রিকা অফিসগুলোয় সময়মতো গল্পগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পত্রিকা অফিসগুলোয় সময়মতো গল্পগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে চাইলে ট্যাক্সিতে যাতায়াত করা প্রয়োজন।

ট্যাক্সিতে যাতায়াত করতে চাইলে অনেক টাকার প্রয়োজন।

অনেক টাকা রোজগার করতে চাইলে প্রচুর লেখা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

প্রচুর লেখা প্রকাশ করতে চাইলে পত্রিকা অফিসগুলোয় সময়মতো গল্পগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পত্রিকা অফিসগুলোয় সময়মতো গল্পগুলো পৌঁছানোর...

... এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

হোন দেখি এর পরে বিখ্যাত!

678) ভদ্রলোকনামা - কনস্টিগ্গিন মেলিখান

ভদ্রলোকের কি উচিত স্ত্রীকে স্টকিংস উপহার দেওয়া, যদি স্ত্রী সেটা খুঁজে পায় ভদ্রলোকের পকেটে?

ভদ্রলোকের কি উচিত মহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করা, যদি মহিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায়?

ভদ্রলোকের কি উচিত তার সন্তানকে বেহালা বাজিয়ে শোনাতে বলা, যদি অতিথিরা ওঠার কোনো লক্ষণ না দেখায়?

ভদ্রলোকের কি উচিত মহিলাকে ‘শুভরাত্রি’ বলা, যদি মহিলা শুভরাত্রি না চায়?

ভদ্রলোকের কি উচিত পায়ের ওপর পা তুলে বসা, যদি একটি পা তার, অপরটি অন্যের?

679) ব্যথা বনাম চুলকানি - ডিক্টর গুরেংস্কি

‘ডাক্তার সাহেব, আমার কী হয়েছে, বলুন তো?’

‘আপনার কী মনে হয়?’

‘আমার কিছুই মনে হয় না।’

‘তাহলে এসেছেন কেন?’

‘ব্যথা করে।’

‘কী?’

‘এখানে, এখানে আর এখানে।’

‘সব জায়গায় একসঙ্গে? তাজ্জব কথা! শুনুন,

এই এখানে ব্যথা করতে পারে না। এখানে শুধু চুলকাতে পারে।’

‘কিন্তু আমার তো ব্যথা করছে।’

‘এখানে আপনার ব্যথা কেন করছে, বুঝতে পারছি না। হাঁ করুন দেখি।’

‘আ-আ-আ...’

‘আপনাকে “আ” বলতে বলিনি। বরং “য্যু” বলুন।’

‘ও-য়া-উ... মুখ খোলা অবস্থায় “য্যু” বলা যাচ্ছে না।’

‘দেখলেন তো।’

‘কী, ডাক্তার সাহেব?’

‘বুঝতে পারছি না, আপনার এখানে ব্যথা করছে কেন। অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে?’

‘এখানে আর এখানে—অনেক আগে থেকে।’

আর এখানে কিছুদিন হলো।’

‘তাহলে শুরুতেই ডাক্তার দেখাননি কেন? কেন এখানে আর এখানে ব্যথা শুরু হওয়ার পর ডাক্তারের কাছে ছুটে এসেছেন?’

‘যখন এখানে ব্যথা শুরু হয়েছে, ভেবেছিলাম, সেরে যাবে। আর যখন এখানে ব্যথা শুরু হলো, তখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু লাইনে বসে থাকতে থাকতে ওয়ার্কিং আওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এখানে ব্যথা শুরুর পর এলাম, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।’

‘পাচ্ছি। কোনো ওষুধ খেয়েছিলেন?’

‘খেয়েছিলাম। যখন এখানে ব্যথা শুরু হয়েছিল, ব্যাণ্ডের গন্ধ শুঁকেছি, মাদি ভালুকের চর্বির সঙ্গে ওক, পপলার, বার্চ আর পাইনগাছের শিকড় মিশিয়ে বানানো মলম মেখেছি। যেমন লেখা ছিল নিরাময় নামের পত্রিকায়—নিজের চিকিৎসা নিজে করুন। পত্রিকায় ছাপা উপদেশ অনুযায়ী দিনে তিনবার মূত্র গ্রহণ করেছি; এ ছাড়া বন থেকে সংগ্রহ করা সকালের শিশিরে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখা ক্যামোমিলের নির্যাস খেয়েছি। এটা কোন পত্রিকায় পড়েছিলাম, সেটা অবশ্য মনে নেই।’

‘বুঝেছি। আপনাকে একটা মলম দিচ্ছি, যেখানে যেখানে ব্যথা করে, সেসব জায়গায় দিনে তিনবার মাখবেন। কাজ না হলে শিশিরে ডোবানো ওই ক্যামোমিলের নির্যাসটাও খাবেন, তবে খাদ্যগ্রহণের আগে নয়, পরে।’

দুই সপ্তাহ পরের কথা।

‘ডাক্তার সাহেব, আবার এলাম আপনার কাছে।’

‘আবার এলেন মানে কী? আপনি কি ডাক্তারের কাছে যান ক্যানটিনে যাওয়ার মতো নিয়মিত?’

‘ঠাট্টা করবেন না, ডাক্তার সাহেব। রোগীদের সঙ্গে ঠাট্টা করতে নেই। দুই সপ্তাহ আগে আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। আপনি আমাকে মনে রেখেছেন?’

‘যত রোগী আমার কাছে আসে, সবাইকে মনে রাখলে আমি নিজেই রোগী বনে যেতাম।’

‘ডাক্তার সাহেব, এবার আমার চুলকানি শুরু হয়েছে। এখানে এখন ব্যথার বদলে চুলকানি।’

‘ওহ্, মনে পড়েছে! আপনাকে অভিনন্দন।’

‘ধন্যবাদ, ডাক্তার সাহেব। তবে চুলকানির চেয়ে ব্যথাটাই ভালো ছিল।’

‘মানে?’

‘প্রতিবেশিনী এসে অভিযোগ করল, আমি নাকি তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাই।’

‘কীভাবে?’

‘ভীষণ চুলকায় যে!’

‘হা-হা-হা...’

‘আপনি হাসছেন আর এদিকে আমার আবার চুলকানি শুরু হচ্ছে।’

‘অ্যাঁই, অ্যাঁই! টেবিলে ঘষবেন না! আরে!

আলমারিতে ঘষছেন কেন! সরে আসুন ওখান থেকে বলছি!’

‘ডাক্তার সাহেব, বলেছিলাম না, ব্যথাটাই ভালো ছিল।’

‘আমারও সেটাই মনে হচ্ছে। এক কাজ করুন, আমার দেওয়া মলমটা মাথার দরকার নেই। ওই নির্যাসটাও আর খাবেন না। তাহলে ব্যথাটা আবার শুরু হবে, আশা করছি।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৪, ২০১২

680) পরীক্ষায় পাস করার সহজ তরিকা

১

পরীক্ষার হলে সামনের আসনে কে বসবে, তা নিশ্চিত হোন। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাথার পেছন দিকটা কামিয়ে ফেলুন সুযোগ বুঝে। ন্যাড়া অংশটিতে লিখে ফেলুন কঠিন সব সূত্র।

২

একজন স্কাই রাইটার ভাড়া করুন। পরীক্ষার হলে বসুন একদম জানালার পাশে। স্কাই রাইটার কঠিন সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান লিখে দেবে আকাশে, আপনি নিশ্চিত মনে তা তুলবেন খাতায়।

৩

প্রথমেই শিখে নিন মোর্স কোড। পুরো বইটা অনুবাদ করুন মোর্স কোডে। তারপর তা রেকর্ড করে ফেলুন যত্নের সঙ্গে। সেই রেকর্ড লুকিয়ে রাখুন ভেন্টিলেটরের ফোকরে। পরীক্ষার পুরোটা সময় তা বেজে যাবে, আপনি লিখবেন। আর মাঝে মাঝে অভিযোগ করুন গৃহনির্মাণের লোকজনের ওপর—ওহ, এরা আর সময় পায় না বাড়িঘর বানানোর!

৪

একটা গানই লিখে ফেলুন, যেখানে থাকবে আপনার পড়াশোনার কঠিন বিষয়গুলো। তারপর একজন জনপ্রিয় সুরকার ভাড়া করে সুর

করিয়ে নিন গানটি। নিশ্চিত থাকুন এফএম রেডিওগুলো আগামী ৩ মাসে দিনে ৫০ বার করে বাজাবে তা। ব্যস, হয়ে গেল, গান শুনতে শুনতে পড়া আপনার মাথায় গেঁথে যাবে গভীরভাবে।

৫

দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শরীরের অধিকাংশ হাড় ভেঙে ফেলুন (চাইলে ভানও করতে পারেন)! ডাক্তার আপনার গোটা শরীর ঢেকে দেবে প্লাস্টারে। তারপর জটিল সব সূত্র লিখে ফেলুন সেই প্লাস্টারের ক্যানভাসে।

৬

পাঠ্যবইয়ের লেখক মহাশয়কে ঘুষ দিন। বলুন আপনার প্রিয় সব বিষয়ের কথা; তিনি যেন সেসব বিষয় নিয়েই বই লেখেন। লেখা হয়ে গেলে শিক্ষকদের উৎসাহী করুন ওই লেখকের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে।

৭

সব ছেড়েছুড়ে যুদ্ধে চলে যান! যুদ্ধের ময়দানে দেখুন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর কী নিখুঁত প্রয়োগ। কত ডিগ্রি কোণে বোমা নিক্ষেপ করলে কোথায় পড়বে, তা শিখে ফেলতে পারবেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই! সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন ওই যুদ্ধক্ষেত্রেই।

৮

পরীক্ষার আগে বসে পড়ুন বইপত্র নিয়ে। সারা বছর ক্লাসে যা পড়েছেন তা মিলিয়ে নিন। ভান করুন সব বুঝেছেন। তারপর বই খুলে খুলে লিখে ফেলুন খাতায়। ব্যস, ভান করে যা লিখেছেন, পরীক্ষার বেঞ্চে বসে সেসবই লিখে দিন। পাস কে ঠেকায়! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ১৪, ২০১২

681) অনশন - আলিম আল রাজি

ভূমিকা: বাংলাদেশকে বলা হয় উৎসবের দেশ। এখানে নানা রকম উৎসব পালন করা হয়। প্রতিদিনই এখানে থাকে বিভিন্ন রকম উৎসব। যেমন ঈদ, পুজো, বিয়ে, পয়লা বৈশাখ, বিজয় দিবস ইত্যাদি। অনশনও এ রকম একটি উৎসব। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনন্দঘন উৎসব হিসেবে অনশন ইতিমধ্যে মর্যাদা পেয়ে গেছে।

অনশনের প্রেক্ষাপট: এটি একটি রাজনৈতিক

উৎসব। সাধারণত বিরোধী দল এই দিনটি পালন করে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের যখন দলবেঁধে ভালো-মন্দ কিছু খেতে ইচ্ছা হয়, তখন তাঁরা অনশন উৎসব পালন করেন। এই খাওয়াদাওয়া ও বিনোদন পাওয়ার জন্য তাঁরা সাধারণত নির্ধারিত পথ বেছে নেন। যেমন নাট্যমঞ্চ। নাটকের মঞ্চ তাঁদের এই উৎসবে বাড়তি আনন্দ জোগায় বলে অনেকের ধারণা।

তারিখ নির্ধারণ: অন্যান্য সামাজিক উৎসবের মতো অনশনও অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। চাঁদ দেখার সঙ্গে এই উৎসবের কোনো সম্পর্ক এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে চাঁদ দেখা কমিটির মতো বিরোধীদলীয় নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি অনশনের তারিখ ঠিক করে। তারপর সেই তারিখ রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অনশন উৎসবের খবর পেয়ে দেশবাসী মজা লুটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

উৎসবের দিন: নির্দিষ্ট ভেনুতে নির্দিষ্ট দিনে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই জড়ো হতে থাকেন। উৎসবে আসার সময় তাঁরা ব্যাগে করে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারদাবার ও পানি নিয়ে আসতে ভোলেন না। তা ছাড়া আগে থেকেই নানা রকম খাবার নিয়ে স্পটে ফেরিওয়ালারা হাজির থাকেন। সকাল ১০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নেতা-কর্মীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে খাওয়াদাওয়া শুরু করেন।

খাবারের তালিকায় থাকে ভেলপুরি, বিস্কুট, চানাচুর, কলা ইত্যাদি। ঋতুর সঙ্গে মিল রেখে নেতা-কর্মীরা নানা রকম মৌসুমি ফলও খান। যেমন শসা, আম ভর্তা, তরমুজ ইত্যাদি। গরম থাকলে তাঁরা আইসক্রিমও গলাধঃকরণ করেন। বাদ যায় না পিঠাও।

অনশন ১০টায় শুরু হলেও দলের প্রধান নেতা অনশন উৎসবে যোগ দেন দুপুর ১২টার দিকে। অন্যরা চুটিয়ে খাওয়াদাওয়া করতে পারলেও দুঃখের বিষয় হলো প্রধান নেতা খাওয়াদাওয়া করতে পারেন না। কারণ বদ টিভি-ক্যামেরা সারাক্ষণ তাঁর দিকে তাক করা থাকে। যাহোক, তিনি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চার ঘণ্টা না খেয়ে থাকার পর ম্যাঙ্গো জুস খেয়ে

অনশন ভাঙেন। এ সময় অন্য নেতা-কর্মীরাও আবার ম্যাঙ্গো জুস পান করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা সারা দিনের ভূরিভোজের সমাপ্তি টানেন। গুরুত্ব: অনশন উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উৎসব বিরোধী দলের নেতাদের শরীর, স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। এক দিন দলবেঁধে আয়োজন করে খাওয়াদাওয়া করার ফলে তাঁরা মানসিকভাবেও লাভবান হন। তাঁদের মন-মেজাজ চাঙা ও ফুরফুরে হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বিকিকিনি হওয়ায় এই দিনটি হকার ও ফেরিওয়ালাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হন তাঁরা। তা ছাড়া নেতাদের খাওয়াদাওয়া দেখে দেশবাসীও অনেক আনন্দ পায়।

উপসংহার: এ কথা চোখ বন্ধ করে বলা যায়, ভোজনরসিক বাঙালি জাতির জন্য অনশন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। দলবেঁধে খাওয়াদাওয়ার এই ব্যতিক্রমী উৎসব আমাদের একতাবদ্ধ হতে শেখায়। আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করে। এর তাৎপর্য বিবেচনা করে দিবসটির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত। **সূত্র:** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৮, ২০১২

682) পরিচয়পর্ব - তাতিয়ানা নোভিকভা

বেড়াতে এল অতিথিরা।
কুকুরটা ঘরের এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছিল।
‘আমার দিকে এসো তো!’ আর্মচেয়ারে আয়েশ করে বসে নিয়ে বলল এক অতিথি।
কুকুরটি এগিয়ে গেল তার দিকে।
‘বসো,’ অতিথি বলল।
কুকুরটি বসল।
‘শোও,’ অতিথি বলল।
কুকুরটি শুয়ে পড়ল।
‘দাঁড়াও,’ অতিথি বলল।
কুকুরটি দাঁড়াল।
‘বসো,’ অতিথি বলল।
কুকুরটি বসল।
‘হ্যান্ডশেক করো,’ অতিথি বলল।
কুকুরটি পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের এক পা এগিয়ে ধরে ভালো করে চেয়ে

দেখল অতিথির দিকে।

অতিথি চিন্তামগ্ন হলো খানিকক্ষণের জন্য।

তারপর একসময় বলল, ‘শোও।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুকুরটি আবার শুয়ে পড়ল।

‘বসো,’ আবার বলল অতিথি।

কুকুরটি বসল।

অতিথি আবার ভাবতে শুরু করল, কিন্তু নতুন

কিছু খুঁজে পেল না বলার মতো।

তখন কুকুরটি বলল, ‘এখন ওঠো এবং বেরিয়ে

যাও।’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৮,

২০১২

683) গর্ব - লেড করসুনস্কি

কয়েক দিন আগের কথা। ট্রলিবাসে চেপে

যাচ্ছিলাম। একসময় আমার পাশের সিটে বসল

এক অপরাধী মেয়ে।

‘জানতে ইচ্ছে করছে,’ বললাম আমি, ‘আপনি

কোন স্টপে নামবেন?’

কথার উত্তর দিল না সে।

‘আপনার নামটা জানতে পারি?’ জিজ্ঞেস

করলাম। ‘নাকি এটা সিক্রেট?’

নীরবতা।

‘আমার কাছে আধুনিক থিয়েটারের দুটো টিকিট

আছে,’ আমি বললাম।

‘কোন নাটকের?’ মেয়েটি মুখ খুলল অবশেষে।

নেমে পড়লাম আমি পরের স্টপেই। আমার

পছন্দ অহংকারী মেয়ে। আর এই মেয়েটি যাকে

সামনে পায়, তার সঙ্গেই কথা বলে। **সূত্রঃ**

দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৮, ২০১২

684) এক ভিতুর গল্প - এরলম

আখডেলদিয়ানি

এক ছিল ভিতু লোক। এতটাই ভিতু যে ঘর

থেকে বের হতেও ভয় পেত।

বলত: ঘর ছেড়ে বেরোলে কোনো বদমায়েশের

সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যদি! আর সে যদি আমাকে

মারধর করে!... না, কোথাও যাব না ঘর ছেড়ে।

বলত: ঘর ছেড়ে বেরোলে কোনো মেয়ের সঙ্গে

দেখা হয়ে যায় যদি! আর যদি তাকে আমার

মনে ধরে যায়! এবং আমাকেও সে পছন্দ করে

ফেলে! আমি তো তাহলে তাকে ভালোবেসে

ফেলব, সেও ভালোবাসবে আমাকে। আমি তাকে

বিয়ের প্রস্তাব দেব, সে সম্মতি জানাবে... না,

কোথাও যাব না ঘর ছেড়ে।

বলত: ঘর ছেড়ে বেরোলে সেই সুযোগে স্ত্রী যদি প্রেমিক জুটিয়ে নেয়! প্রেমিক তো তখন যেতে শুরু করবে তার কাছে, অথচ আমি কিছুই টের পাব না...না, কোথাও যাব না ঘর ছেড়ে।

বলত: ঘর ছেড়ে বেরোলে আমার ছোট ছেলেটা বাসায় একা পড়ে থাকবে, দেশলাই নিয়ে খেলতে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে পুরো বাড়িতে, তারপর সে নিজেই বেরোতে পারবে না বাড়ি থেকে...না, কোথাও যাব না ঘর ছেড়ে।

এর পরে অনেক দিন ধরে ভাবতে ভাবতে একটা চিন্তা এল তার মাথায়। বলল: আমি ঘর ছেড়ে বের না হলে হঠাৎ যদি ছাদ ভেঙে পড়ে আমার মাথার ওপরে...**সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৮, ২০১২

685) পারস্পরিক বোঝাপড়া - ইলিয়া বুতমান

একদিন উমবার্ৎসেভায়া পদবির মেয়ের কাছে গিয়ে লিয়ালকিন বলল, ‘উমবার্ৎসেভায়া, ও উমবার্ৎসেভায়া।’

‘কী, লিয়ালকিন?’ জানতে চাইল উমবার্ৎসেভায়া।

‘ইয়ে মানে...’

‘ঝটপট বলে ফেলো তো! তবে মনে রেখো, ওই বিষয়ে কোনো কথা নয় কিন্তু!’

‘কিন্তু আমি তো ওই প্রসঙ্গেই কথা বলতে এসেছিলাম।’

‘না, ওই বিষয়ে কথা নয়।’

‘খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু আমি যে চাইছিলাম...’

‘চাইতে চাইতে একসময় চাওয়ার ইচ্ছে উবে যাবে।’

‘যাবে না।’

‘না, এই প্রসঙ্গ নিষিদ্ধ।’

‘তাহলে আমি চললাম।’

‘একটু বসতে না-হয়...’

‘নিষিদ্ধ যখন, বসে কী লাভ!’

‘অন্য কিছু বলো তাহলে...’

‘অন্য কোনো চিন্তা মাথায় এখন আসছে না। চললাম।’

লিয়ালকিন চলে গেল। অনুশোচনা হলো উমবার্ৎসেভায়ার। সে ভাবল, ‘কেন যে অমন ব্যবহার করলাম! ভালো একটা সুযোগ ছিল— আমার স্বামী এখন বিজনেস ড্রিপে। অথচ নির্বোধ আমি, ওকে এই প্রসঙ্গ তুলতেই দিলাম

না!’
হাঁটতে হাঁটতে লিয়ালকিন ভাবছিল, ‘খুবই আশা ছিল, এক বোতল ভোদকার পয়সা ধার করতে পারব ওর কাছে। অথচ সেই প্রসঙ্গ তোলার সুযোগই দিল না সে।’
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মে ২৮, ২০১২

686) ডাকাতির হাতে - তারাপদ রায়

এতক্ষণ ভদ্রলোককে কেউই লক্ষ্য করেনি।
ভদ্রলোক মেজের এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন।
ঘরময় দুরন্ত উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা। পুলিশের লোক, খবরের কাগজের লোক—কে কাকে লক্ষ্য করে! একটু আগে বাজারের পেছনে ব্যাঙ্কের এই একতলার ঘরে ডাকাতি হয়ে গেছে।
পুলিসের কর্তারা ব্যাঙ্কের এজেন্ট ও ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ডাকাতির বিবরণ ও অপহৃত অর্থের পরিমাণ জেনে নিচ্ছিলেন। স্থানীয় থানার ছোট দারোগাবাবু তাঁর কালো নোটবুকে টুকে নিচ্ছিলেন, তা হলে একশো টাকার নোটের বাঙিল সাতাশটা, পঞ্চাশ টাকার নোটের বাঙিল সতেরোটা, কুড়ি টাকার নোটের...’ এমন সময়ে ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে উঠে এসে দারোগাবাবুর সামনে কিরকম যেন হাঁটু মুড়ে আধা ত্রিভুজ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।
ভদ্রলোকের উর্ধ্বাঙ্গে একটি হ্যান্ডলুমের ঘন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিটির ঝুল বেশ লম্বা এবং তাই রক্ষা, কারণ তাঁর নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ শূন্য, কোনো কাপড়-চোপড় নেই। পাঞ্জাবির কাপড় বেশ মোটা বলে পাঞ্জাবির তলায় কোমরের নিচে কিছু আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।
ভদ্রলোককে লক্ষ্য করা মাত্র তাড়াতাড়ি পুলিশকে দেখিয়ে ব্যাঙ্কের এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে চৌকিয়ে উঠলেন, ‘এই তো যার কথা বলছিলাম, এই যে...।’ ভদ্রলোকের আশ্চর্য পোশাক এবং বিহ্বল চেহারা আর তার সঙ্গে এজেন্ট সাহেবের উত্তেজনা দেখে, পুলিশের এক কর্তা যিনি কাউন্টারে হেলান দিয়ে এতক্ষণ কাউন্টার টিপে টিপে কতটা শক্ত পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তিনি মুহূর্তে বুঝে ফেললেন, এই ব্যক্তি অবশ্যই ডাকাতদের একজন। তিনি চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন, ‘অ্যারেস্ট হিম।’ সঙ্গে সঙ্গে দুজন সেপাই দুদিক থেকে ছুটে গেল।

কিন্তু এরই মধ্যে এজেন্ট, ক্যাশিয়ার সবাই হা-হা করে উঠলেন, ‘আরে করেন কি? করেন কি? উনি ডাকাত নন।’

‘উনি ডাকাত নন, তাহলে উনি কি?’ পুলিশের ছোট সাহেব গর্জে উঠলেন।

‘উনি মিস্টার ছকু চৌধুরী। বাঁশের ব্যবসায়ী। আমাদের ক্লায়েন্ট।’ ব্যাঙ্কের তরফে এই উত্তরে চমকিত হয়ে পুলিশেরা একটু নিরস্ত হলেন, শুধু ছোটসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনাদের ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টরা আজকাল এই রকম পোশাক পরে আসেন নাকি?’

ছকু চৌধুরী এতক্ষণে হাত জোড় করে পুলিশ সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক দাঁড়িয়েছেন বলা যায় না, পা দুটো হাঁটুর কাছে ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করে পাঞ্জাবির ঝুল দ্বারা যতটা লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

পিছনে থানার জমাদারসাহেব রুল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর উপরওলাদের সম্মুখে এই অর্ধোলঙ্গ ব্যক্তিটির দাঁড়ানোর ভঙ্গির এই বেয়াদবি তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। জমাদার রুল উঁচিয়ে বললেন, ‘এই, সিধা হো যাও, সোজা দাঁড়াও।’

জমাদারের আদেশ পেয়ে ছকু চৌধুরী কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, ‘না স্যার, আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন না। সে আমি পারব না।’

অবশ্য এত কাকুতি-মিনতি করার প্রয়োজন ছিল না। প্রায় সবাই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন ছকু চৌধুরী এতক্ষণ যে কারণে মেজেতে বসে ছিলেন এখন সেই কারণেই বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লজ্জা নিবারণ ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

সদ্য ডাকাতি হওয়া ঘরের আবহাওয়া আগেই থমথমে ছিলো, এর পরে আরো থমথমে হয়ে উঠলো। সবাই চুপচাপ। অবশেষে পুলিশের ছোটসাহেব নীরবতা ভাঙলেন, ‘আপনি ডাকাত নন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি শুধু পাঞ্জাবি পরে ব্যাঙ্কে এসেছেন কেন? ভদ্রসমাজে যাতায়াত নেই আপনার?’

ছকু চৌধুরী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘না স্যার, আমার লুঙ্গি...,’ সঙ্গে সঙ্গে ছকুবাবুর অর্ধসমাণ্ড বাক্যটি ব্যাঙ্কের

এজেন্টসাহেব অনুমোদন করলেন, ‘হ্যাঁ, ছকুবাবুর লুঙ্গি...।’

ডাকাতির তদন্তের মধ্যে এইরকম একটি সামান্য লুঙ্গির প্রসঙ্গ আসায় পুলিশের লোকেরা খুব চটে উঠলেন, ছোটসাহেব আবার ধমকে উঠলেন, ‘কিসের লুঙ্গি? এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে?’ এবার ছকুবাবু একেবারে মুষড়িয়ে পড়লেন, ‘স্যার, আমার লুঙ্গিটা ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেছে।’ পুলিশ সাহেবদের অবাক হবার পালা, ‘লুঙ্গি ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেলো? সোনার সুতো দিয়ে বোনা, নাকি বেনারসি লুঙ্গি? ডাকাতদেরও কি আজকাল কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে?’

ব্যাক্সের ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন, ‘না, ঠিক তা নয়; ডাকাতদের টাকা বেশি হয়ে গিয়েছিলো। তারা বোধহয় আশা করেনি যে এত টাকা পাবে। দুটো মাত্র বড় বড় বাজারের থলে এনেছিলো, সে দুটো পুরোপুরি ভরে গেলে তখন কি আর করবে, সামনের কাউন্টারে ছকুবাবু টাকা জমা দিতে এসেছিলেন, ওঁকে দুজনে মিলে জাপটিয়ে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে বাকি টাকা বস্তার মতো করে বেঁধে ফেললো।’ পুলিশ সাহেব হতবাক, ‘বলেন কি মশায়? লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে নিলো?’

ছকুবাবুর পক্ষ সমর্থন করে ক্যাশিয়ারবাবু বললেন, ‘ছকুবাবু খুব ভালো লোক, স্যার। আমাদের পুরনো কাস্টমার। প্রথমে উনি কেন, আমরা কেউই ধরতে পারিনি, ডাকাতেরা কেন ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা ভাবলাম ডাকাতেরা ভেবেছে ওঁর কাছে অনেক টাকা আছে, কিন্তু ওঁর ওই সামান্য দু’ হাজার আড়াই হাজার টাকা ডাকাতেরা ছুলো না। শুধু ওঁকে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিলো। ছকুবাবু যখন বুঝতে পারলেন যে লুঙ্গিটা খুলে নিচ্ছে, তিনি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন স্যার, কেন দেবেন না, বলুন। আমরাও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, না হলে স্যার, ব্যাক্স ডাকাতি তো সব জায়গাতেই হচ্ছে, আমাদের সব টাকাই তো ইঙ্গিওর করা, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ব্যাক্সের ভিতর থেকে পুরনো খদ্দেরের লুঙ্গি নেবে, এ কি রকম অত্যাচার!’

ক্যাশিয়ারবাবুর ভরসা পেয়ে পুলিশদের হতবাক অবস্থা দেখে ছকুবাবু এতক্ষণে একটু সাহস

অর্জন করেছেন, পুলিশ সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ‘স্যার, আমার কি হবে?’ পুলিশ সাহেব এবার একটু ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, ‘কি হবে আপনার, যা শুনলাম, আপনার টাকা-পয়সা তো কিছু যায়নি! এখন কিছুক্ষণ ওই সিঁড়ির নিচে চুপচাপ বসে থাকুন। তারপর সন্ধ্যার সময় যেই লোডশেডিং হবে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।’

‘কিন্তু আমি স্যার, আর বাড়ি ফিরতে পারবো না স্যার। লুঙ্গিটা আমার নয় স্যার।’ ছকু চৌধুরীর এই কথা শুনে পুলিশসাহেব আরো বিচলিত হলেন, ‘লুঙ্গিটা আপনার নয়?’

ছকু চৌধুরী আবার হাতজোড় করলেন, ‘স্যার, সত্যি বলছি স্যার, লুঙ্গিটা আমার শালার।

দুদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে, দুপুরে চৌরঙ্গীতে পাতাল রেলের গর্ত দেখতে বেরিয়েছে। ভাবলাম পাঁচ মিনিটের জন্যে যাই ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে আসি। টাকা-পয়সা সব ঠিক রইলো, শুধু গেলো আমার শালার লুঙ্গিটা।’ ছকু চৌধুরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, ‘আমার শালা যখন জানতে পারবে আমি তার লুঙ্গি পরে বেরিয়েছিলাম, আমি কি করে তাকে মুখ দেখাবো, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে আমি কি করে মুখ দেখাবো? ডাকাতেরা আমার এ কি সর্বনাশ করে গেলো, স্যার!’

ব্যাঙ্ক আর পুলিশের লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছকু চৌধুরীর কান্না দেখতে লাগলেন। খবরের কাগজের লোকেরা ঝপাঝপ ছবি তুলতে লাগলেন।

পুনশ্চ: কোনো পাঠক বা পাঠিকার যদি এরকম সন্দেহ হয় যে এই কাহিনীর সঙ্গে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো ডাকাতির খবরের কোনো সম্পর্ক আছে, তাঁর ভুল নিরসন করার জন্যে জানাই, এই কাহিনীর সঙ্গে কোনো বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের কোনো যোগাযোগ নেই। তারাপদ রায়: ভারতীয় লেখক। জন্ম: ১৯৩৬, মৃত্যু: ২০০৭।

৬৪৭) গভীর রাতে রান্নাঘরে - ড. পাভলভ

৬৪৭) গভীর রাতে রান্নাঘরে - ড. পাভলভ

৬৪৭) গভীর রাতে রান্নাঘরে - ড. পাভলভ

রাতের বেলা ঘুমোচ্ছে পুরো পরিবার: বাবা, মা, মেয়ে, ছেলে। হঠাৎ শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল রান্নাঘর থেকে: টপ-টপ-টপ...

বাবা উঠে রান্নাঘরে গেল। কিন্তু আর ফিরল না।

আবার শোনা গেল: টপ-টপ-টপ...

এবার মা গেল রান্নাঘরে। কিন্তু সেও আর ফিরল না।

আবার: টপ-টপ-টপ...

এবার রান্নাঘরে গেল মেয়ে। কিন্তু ফিরল না সেও।

বিছানায় একা শুয়ে ছেলে কাঁপতে থাকল ঠকঠক করে। একটু নড়তেও ভয় করছে তার। একসময় মনে সাহস সঞ্চয় করে উঠল সে বিছানা ছেড়ে, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

ঢুকে দেখল, পুরো পরিবার সেখানে বসে ট্যাপ মেরামত করছে।

688) পরিচয়পর্ব - আলেক্সান্দর পেরলুৎক

‘শুভ দিন! আপনার মতো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি? আমার নাম আল্দ্রেই।’

‘তো?’

‘আজ চমৎকার আবহাওয়া। হেমন্তকাল।

গাছগুলো তাদের বাহারি পোশাক ঝেড়ে ফেলতে শুরু করেছে। বছরের কোন মৌসুমটি আপনার পছন্দ?’

‘কী? কী বললেন?’

‘বললাম, হেমন্তকাল বছরের অসাধারণ একটা সময়। আচ্ছা, আপনি কবিতা ভালোবাসেন?’

‘কার কবিতা পছন্দ ব্লক, এসেনিন নাকি আখমাতভার?’

‘মশকরা করছেন?’

‘একদমই না। আচ্ছা, আজ সন্ধ্যাবেলা কী করার পরিকল্পনা আপনার? ভাবছিলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাব অপেরা... না, না, নাইট ক্লাবে।’

‘ওহ, তো এত না পেঁচিয়ে, এভাবেই কথা শুরু করতেন!’

689) ভালোবাসার রেকর্ড - লেড করসুনস্কি

বাসায় বসে ফুটবল খেলা দেখছিলাম টিভিতে, সেই সময় স্ত্রী এসে বসল পাশ ঘেঁষে, তারপর অভিযোগের সুরে বলল, ‘একটা আদরের কথাও যদি বলতে! সেই হানিমুনের পর থেকে তেমন কিছু আর শুনিইনি।’

‘তেমন কিছু মানে?’

‘আমি সেটা কীভাবে জানব!’ লজ্জা পেয়ে স্ত্রী বলল, ‘তুমিই ভেবে বের করো।’

‘আমি তো আরও জানি না, তুমি কী শুনতে চাও। এই ধরো... ডার্লিং...’ কথাগুলো বললাম, যখন আমাদের গোলবারের সামনে বিপজ্জনক অবস্থা।

উপলব্ধি হলো, স্ত্রী তৃপ্ত হয়নি আমার কথায়।

‘আচ্ছা, তাহলে বলি... আদরের পাখিটা...’

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখটা ছেয়ে গেছে বিরক্তিতে।

‘জানো, কী করা যায়?’ বললাম তাকে, ‘তুমি তো অজস্রবার আমাকে অনুরোধ করেছ আদরমাখা কথা বলতে, তো এই আদুরে কথাগুলো আমি রেকর্ড করে রাখব ক্যাসেট রেকর্ডারে। তারপর তোমার যখনই ইচ্ছে হবে, ক্যাসেট বাজিয়ে শুনবে। নইলে যেটা প্রায়ই হচ্ছে, তোমার-আমার ইচ্ছে আর সময় খাপ খাচ্ছে না। এই এখন যেমন আমার মুড নেই।’ ‘কেমন উদ্ভট লাগছে শুনতে,’ স্ত্রী বলল অবাক হয়ে। ‘তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।’

ক্যাসেট ভর্তি করে আদরমাখা কথা রেকর্ড করলাম। এবং এরপর যা শুরু হলো: সময়ে-অসময়ে সে ক্যাসেট চালু করে কথাগুলো শুনতে থাকে। আমার বিরক্তি লাগতে শুরু করল রীতিমতো। একদিন রাতে তো আমার ঘুমই ভেঙে গেল নিজের রেকর্ডকৃত প্রেমমগ্নিত বাণীগুচ্ছ শুনে। সহ্য করলাম আমি বেশ কিছুদিন, তারপর স্ত্রীকে বললাম আমার জন্যও আদরমাখা কথা ক্যাসেটে রেকর্ড করে রাখতে। আমি কি মানুষ না নাকি! আমারও তো আদর পেতে ইচ্ছে করে।

মনে আছে, শুনে খুব চোঁচামেচি করেছিল স্ত্রী। চোখ-মুখ তার লাল হয়ে উঠেছিল। আমার খুব কষ্ট হতে লাগল তার জন্য।

‘তুমি এক কাজ করলেই তো পারো,’ বললাম তাকে, ‘তোমার এই চিৎকার আর অভিশাপ ক্যাসেটে রেকর্ড করে রাখো। প্রয়োজন হলেই চালু করে দেবে। তোমার কষ্ট আর মন খারাপ কম হবে তাহলে।’

স্ত্রী সেটাই করল। তবে অন্য একটি ব্যাপার আমাকে ক্লান্ত করে তুলল—প্রতিদিন ঘুরেফিরে একই কথা বলে স্ত্রী: মেঝে মোছো, আলু কিনে

নিয়ে এসো...

স্ত্রীকে অনুরোধ করলাম এই কথাগুলোও রেকর্ড করে রাখতে। একই কথাই তো প্রতিদিন। অচিরেই বলার আর কোনো বিষয় রইল না আমাদের। প্রায়ই এমন হয়, আমি বসে থাকি আর্মচেয়ারে, উপভোগ করি নীরবতা, প্রশান্তি। মাঝেমধ্যে ক্যাসেটে বেজে ওঠে আমার আদরমাথা কথা অথবা স্ত্রীর চিৎকার-অভিশাপ। একদিন স্ত্রী আমাকে এসে বলল, ‘তোমার জন্য একটা খারাপ সংবাদ আছে।’

‘বলো।’

‘এভাবে বসবাস করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি ভালোবেসে ফেলেছি আরেক পুরুষকে।’

‘তাতে কী হয়েছে!’ বললাম তাকে। আমার সঙ্গে তাকে কথা বলতে শুনে ভারি অবাক হলাম। তার সত্যিকারের গলা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। ‘আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে তার সঙ্গে থাকব।’

আমি ভাবতে শুরু করলাম, তার অভিসন্ধিটা কী!

‘আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তাই তো?’ প্রশ্ন করলাম তাকে। ‘সরাসরি বললেই পারতে! আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও, আমার আপত্তি নেই।’ আমাকে ছেড়ে গেল সে। এরপর আমি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি একাকিত্বে। যদিও থেকে থেকেই মনে হয়, কিসের যেন অভাব বোধ করছি...

দুঃখের কথা এই যে ক্যাসেটীয় আদর সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু চিৎকার-অভিশাপ। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৪, ২০১২

690) অর্থহীন - ডিঙুর শেনদেরোভিচ

পাভল্যুক যখন তার শীর্ণ গলায় দড়ির ফাঁস ঢুকিয়ে টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময় তার কাছে এল এক দেবদূত, বলল, ‘পাভল্যুক!’ পাভল্যুক তাকিয়ে দেখল চারপাশে। ঘর একেবারেই শূন্য। দেবদূত তো আর ফ্রিজ নয়, চোখ মেলে চাইলেই তাকে দেখা যায় না। ডান কাঁধের কাছে এক জ্যোতিষচক্র নজরে পড়ল তার।

‘পাভল্যুক!’ আবার ডাকল জ্যোতিষচক্র। ‘তুমি টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছো কেন?’

‘মরতে চাই আমি,’ পাভল্যুক বলল।

‘হঠাৎ?’ জানতে চাইল দেবদূত।

‘চারপাশের সবকিছু অসহ্য লাগে,’ পাভল্যুক বুঝিয়ে বলল।

‘সবকিছুই কি?’ বিশ্বাস হলো না দেবদূতের।

‘সবকিছু,’ একটু ভেবে নিয়ে পাভল্যুক জানাল নিশ্চিতভাবে। তারপর হাত দিয়ে দড়ির প্যাঁচটা টাইট করতে শুরু করল।

‘কয়েক পেগ ভদকা? প্রকৃতির মাঝে বসে?’ বলল দেবদূত।

পাভল্যুক চিন্তাচ্ছন্ন হলো, কিন্তু হাত সরাল না দড়ি থেকে।

‘সঙ্গে যদি খাদ্য হিসেবে আলু থাকে, তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে,’ জানাল সে অবশেষে।

‘ঠিক, আলুটা মাখন আর ডিল*-সহযোগে, সঙ্গে হেরিং মাছ, চাকা চাকা করে কাটা পেঁয়াজ...,’ দেবদূত বলল।

গলায় দড়ি প্যাঁচানো অবস্থাতেই ঢোক গিলল পাভল্যুক।

‘আর ভদকার প্রতিক্রিয়া জোরদার করতে বিয়ার?’ দেবদূত বলতে থাকল। ‘মাছ ধরতে বসে, যখন চারপাশে জ্বালাতন করার মতো কেউ নেই? সঙ্গে পছন্দের সিগারেট?’

পাভল্যুক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘আর কিছু মেয়ে? অপরূপা, দীর্ঘ পদযুগল...’ থামল না দেবদূত।

‘এসব কথা তুমি কোথেকে জানো!’ পাভল্যুক জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে।

‘উঁহু, প্রসঙ্গ পাল্টিও না,’ অনুরোধ জানাল দেবদূত। ‘আর শনিবার সকালবেলা বাথহাউসে গোসল, বুধবার সন্ধ্যাবেলা স্পার্তাক...’

‘স্পার্তাক মানে?’ পাভল্যুক ঠিক বুঝতে পারল না।

‘ফুটবল, চ্যাম্পিয়নস লিগ,’ মনে করিয়ে দিল দেবদূত।

‘জিতবে নাকি?’ পাভল্যুক প্রশ্ন করল।

‘সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাবে,’ নিশ্চয়তা দিল দেবদূত।

‘তাই নাকি!’ পাভল্যুক বলল। মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। ফাঁসটা তখন ঝুলছিল পাশে।

‘টুল থেকে নামো না, বাপু!’ দেবদূত প্রস্তাব দিল। ‘নয়তো মূর্তির মতো লাগছে একেবারে।’

টুল থেকে নেমে পাভল্যুক বসে পড়ল ঠিক

রেখেছি। ...টেলিভিশনের সামনে থেকে সরে এসো! ওতে কিছুই দেখার নেই। কুকুরের গায়ে হাত দিয়ো না। ও তো তোমাকে জ্বালাতন করছে না! আবার দাঁড়ালে কেন! হায়! ঈশ্বরের অশুভ সৃষ্টি! ...কার্পেটের ওপরে ওঠো না।

...আমার চোখের সামনে এদিক-ওদিক হেঁটো না। অসহ্য একেবারে! ...কোনো একটা কাজ খুঁজে নাও। ব্যালকনিতে যেয়ো না! কে জানে, হয়তো পড়ে যাবে ওখান থেকে। তিনতলায় তো! ...এই দ্যাখো, বলেছিলাম না! ঠিকই পড়ে গেছে! মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে। ভাগ্যিস! আর শুয়ে থেকে ভান করতে হবে না। ওঠো। আর তুমি যেহেতু নিচেই এখন, রুটি কিনে নিয়ে এসো দোকান থেকে। ...হায়, এ কী কপাল আমার! ...বাসায় ফিরে দরজার সামনের পাপোশে পা ভালো করে ঘষে নেবো!’**সূত্রঃ**
দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৮, ২০১২

692) কুন্ডিলকবৃত্তির রকমফের - সেগেই আইকোড

‘এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়...দশ।’

‘১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...১০।’

‘এক শ, দুই শ, তিন শ, চার শ, পাঁচ শ...এক হাজার।’

‘১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০...১০০০।’

‘দুই দুগুণে চার।’

‘২ - ২ = ৪’

‘পাঁচ পাঁচে পঁচিশ।’

‘৫ - ৫ = ২৫’

‘এক শ ভাগ দুই সমান পঞ্চাশ।’

‘১০০/২ = ৫০’...

বিশেষজ্ঞ দলের সভাপতি তাঁদের অনুসিদ্ধান্তের কথা জানালেন, ‘উপস্থিত সহকর্মীগণ, আলোচ্য প্রকাশিতব্য বই দুটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বই দুটির লেখকদের একজন অন্যের লেখা চুরি করেছেন বলে দাবি করা গোপন যে বার্তা আমরা পেয়েছিলাম অজানা এক ব্যক্তির কাছ থেকে, তা সর্বৈব ভিত্তিহীন বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। উপস্থিত সকলে নিশ্চয় ওপরের উদাহরণ থেকে লেখক দুজনের সৃজনশীলতার স্বকীয়তা ও লেখনীর বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছেন। লেখকদের দুজনই স্বতন্ত্র চিন্তাধারার

অধিকারী। অতএব, এই বই দুটি প্রকাশে আর কোনো বাধা আছে বলে আমরা মনে করি না।'সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৫, ২০১২

693) মান নিয়ন্ত্রণ - ম.

সেরদোরশনেড

ছোট, মজাদার একটা গল্প রচনা করেছিলাম।
কৌতুক বলা চলে।

আসবাবপত্র নির্মাতা ফ্যাক্টরির এক ডিরেক্টর,
ধরা যাক, তার নাম কুপৎসোভ, তার ফ্যাক্টরির
আসবাবপত্রের মানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার
মওকা ছাড়ে না কখনো। তো, একদিন বেশ
দেরিতে বাসায় ফিরে সে দেখল, তার স্ত্রী, ধরা
যাক, তার নাম সোফিয়া, তার পোশাকের
আলমারিতে পিঠ ঠেকিয়ে যিশুর মতো দুহাত
দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘তুমি অমন অস্বাভাবিক পোজে দাঁড়িয়ে আছো
কেন?’ প্রশ্ন করল তার স্বামী।

‘কারণ, এই আলমারির দরজা আপনা থেকেই
খুলে যাচ্ছে,’ স্ত্রী উত্তর দিল।

‘অসম্ভব!’ স্বামী বলল। ‘আলমারিটা তৈরি
আমাদের ফ্যাক্টরিতে। আর আমাদের তৈরি
জিনিস সব সময়ই উত্তম মানসম্পন্ন। মান
নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান নিজে তদারক করে
এই কাজ।’

কথা শেষ করেই সে স্ত্রীকে সরিয়ে দিল
আলমারির সামনে থেকে। আলমারির দুয়ার
খুলে গেল হাট হয়ে। স্বামী দেখল, আলমারিতে
লুকিয়ে আছে তার ফ্যাক্টরির মান নিয়ন্ত্রণ
বিভাগের প্রধান।

কৌতুকটা আমাদের বাসার সবার পছন্দ হলো
ভীষণ। সেটা আমি নিয়ে গেলাম পত্রিকা
অফিসে।

‘কী এনেছেন আপনি এটা?’ কঠোর স্বরে
জিঙ্গেস করলেন সম্পাদক। ‘একেবারেই
সিরিয়াস কৌতুক নয়। ভেবেছেন, গরু-গাধারা
কাজ করে পত্রিকা অফিসে?’

নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের
সাহিত্যকর্মটি ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম আরেকটু
হলেই। কিন্তু আমি এমন ধাতুতে গড়া—ভাঙব,
কিন্তু মচকাব না।

কৌতুকটায় সামান্য পরিবর্তন এনে কয়েক দিন
বাদে আবার গেলাম সম্পাদকের দপ্তরে।

‘আচ্ছা, বলুন তো,’ স্পষ্ট অভিযোগের সুরে সম্পাদক বললেন, ‘এই অসাধারণ লেখাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? কী যে মজাদার কৌতুক! স্রেফ ভেবে দেখুন, মিস্টার গর্ডন অফিস শেষে বাসায় ফিরে দেখে, স্ত্রী মেরি আলমারির সামনে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আলমারিটার দরজা বন্ধ হয় না এবং সেটার নির্মাতা স্বামীর ফ্যাঙ্টরি। আর আলমারির ভেতরে...হা হা হা। খুবই অর্থবহ কৌতুক। ত্রুটিপূর্ণ পণ্য নির্মাতাদের সূক্ষ্ম সমালোচনা। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত!’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুন ২৫, ২০১২

694) স্বপ্ন - আ. কুরনিয়ান্দি

ক্লিম সেমিওনভিচ একটা স্বপ্ন দেখলেন।
বিদঘুটে ও বিচিত্র সেই স্বপ্ন; যেন তিনি ক্লিম সেমিওনভিচ নন, নন পাভেল কন্ড্রাতিয়েভিচ, দমিত্রি খ্রিস্তফরোভিচ বা সোফিয়া মার্কভনা। একেবারেই ভিন্ন কেউ। তবে ক্লিম সেমিওনভিচ নন নিশ্চিতভাবেই।
স্বপ্নে দেখছেন, তাঁর কাছে এল স্ত্রী। স্ত্রী তাঁর, তবে স্বপ্নে তাঁর নয়। যদিও সে এই সময় তাঁর পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তবু সে যেন পরস্ত্রী, তাঁর আপন কেউ নয়।
এবং স্ত্রী (তাঁর নয়) স্বপ্নে তাঁর কাছে পর্দা কেনার টাকা চাইছে। কিন্তু তিনি তাকে টাকা দেবেন কেন! নিজের আপন স্ত্রীকেই তো তিনি দেন না, আর এ তো পরস্ত্রী।
‘দেব না!’ স্পষ্টভাবেই বললেন ক্লিম সেমিওনভিচ।
স্ত্রী চোখের জল ঝরাতে শুরু করল যথারীতি। সেই সময় একটা আইডিয়া এল তাঁর মাথায়: তাকে টাকা দেবেন একটা শর্তে, ঘুম ভাঙার পরে সে আর টাকা চাইতে পারবে না।
পকেটে হাত ঢোকালেন তিনি এবং ঠিক সেই সময়ে সেখানে উদয় হলেন ক্লিম সেমিওনভিচ। সত্যিকারের ক্লিম সেমিওনভিচ, এই উদ্ভট স্বপ্নটি যিনি দেখছেন।
ক্লিম সেমিওনভিচ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, ‘এই যে তোমার স্বামী এসেছে। তার কাছে টাকা চাও।’
কিন্তু ওই ক্লিম সেমিওনভিচ সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন, ‘দেব না। নতুন পর্দার দরকার নেই আমাদের। পুরোনোটা আছে তো। প্রায় নতুনের

মতোই।’

ক্লিম সেমিওনভিচ মনে মনে তাঁর সঙ্গে সহমত জ্ঞাপন করলেন। পর্দা কেনার সময় হয়নি এখনো। কিন্তু ওই ক্লিম সেমিওনভিচ এখন টাকা না দিলে পরে পকেট খসবে তাঁরই। তাই তিনি বললেন, ‘পর্দা বদলানোর দরকার ছিল বহু আগেই!’

কথাটা বললেন বটে, যদিও সেটা তাঁর মনের কথা নয়।

ওই ক্লিম সেমিওনভিচ তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিন্তু তুমি কে, সেটা তো বুঝলাম না!’

‘তাই তো!’ ভাবতে শুরু করলেন ক্লিম সেমিওনভিচ। ‘তাদের পর্দা-কাহিনিতে নাক গলানোর আমি কে?’

ভাবতে ভাবতে ঘুম ভাঙল তাঁর। তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনিই ক্লিম সেমিওনভিচ।

সত্যিকারের। অন্য কোনো ক্লিম সেমিওনভিচ নেই সেখানে।

চুমু খেলেন তিনি তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীকে। সে চোখ খুলে দেখল হাসিমুখ ক্লিম সেমিওনভিচকে, তারপর বলল, ‘কী, পর্দার জন্য টাকা দেবে?’ **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০২, ২০১২

695) সংক্ষেপিত গল্প - বরিস

ইয়ারেমচুক

এক চমৎকার সকালে লিখে ফেললাম এক রসগল্প। বত্রিশ পৃষ্ঠার। তারপর সেটাকে বগলদাবা করে চললাম আইভাইভাই শহরের উদ্দেশে। ‘কোরানো হর্সর্যাডিশ*’ নামের বিদ্রূপাত্মক পত্রিকা বের হয় সেখান থেকে। ‘গল্পের আইডিয়াটা সুন্দর,’ পত্রিকা অফিসে আমাকে বলা হলো, ‘তবে বেজায় লম্বা। মূল ভাবটা রেখে অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলতে হবে। বড্ড বেশি ট্যালটেলে। পানি ঝরিয়ে ফেলুন।’

বাড়ি ফিরে অনেকটা সময় ধরে বসে রইলাম গল্পটা নিয়ে। কেটে বাদ দিলাম কয়েকটি শব্দ। অতিরিক্ত আর কিছু খুঁজে পেলাম না বহু চেষ্টা করেও।

পরের সপ্তাহে আবার হাজির হলাম ‘কোরানো হর্সর্যাডিশ’ পত্রিকার সম্পাদকের সামনে।

‘আপনার পরামর্শ পালন করেছি,’ ঠিক যেন রিপোর্ট করলাম তাঁর কাছে, ‘অতিরিক্ত পানি

ঝরিয়ে ফেলেছি গল্প থেকে।’

গল্পটা দেখে নিয়ে সম্পাদক জানালেন, ‘উহু! পানির ট্যাপটা পুরো খুলে দিতে হবে। এক ফোঁটা পানিও যাতে না থাকে।’

টানা তিন দিন চালালাম গল্প-সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়া। বহু কষ্টে কয়েকটি বাক্য কেটে বাদ দিতে সক্ষম হলাম বটে, তবে শেষমেশ রেগে গিয়ে ইস্তফা দিলাম এই অসম্ভব কর্মে।

মাস তিনেক পরের কথা। একটা ফোন এল আমার কাছে।

‘হ্যালো, কোরানো হর্সর্যাডিশ পত্রিকা থেকে বলছি। গল্পটা মেরামত করেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘খুবই ভালো কথা। আমাদের প্রকাশিতব্য পরবর্তী সংখ্যায় কিছুটা জায়গা ফাঁকা আছে। খুব দ্রুত লেখাটা দিতে হবে কম্পোজ করার জন্য। প্রেস অপেক্ষা করছে।’

‘আমার সব রেডি। এম্মুনি পোস্ট অফিসে গিয়ে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘পার্সেল? যদি হারিয়ে যায়? আপনি নিজেই নিয়ে আসুন না!’

‘আমাদের এখানে পথঘাটের একেবারেই যা তা অবস্থা এখন। প্রবল বৃষ্টি হওয়ার পর থেকে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ...’

‘হুমম... তাহলে টেলিগ্রাফ করে পাঠিয়ে দিন।’

‘কী!’ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল

টেলিগ্রাফ অপারেটর। ‘পুরো এই লেখাটা টেলিগ্রাফে পাঠাতে চান? তাও আবার আর্জেন্ট?’

‘হ্যাঁ।’

‘পাঠানো তো অবশ্যই সম্ভব, তবে খরচ কত পড়বে, সেটা ভেবে দেখেছেন?’

সময়মতো সংবিৎ ফিরে পেলাম আমি। গল্পটা ফিরিয়ে নিয়ে সেটাকে কাটছাঁট করতে শুরু করলাম।

‘এই বাক্যের কোনো প্রয়োজনই নেই,’ বিড়বিড় করে বলছিলাম তখন, ‘এটা একেবারেই অর্থহীন বাক্য...এই প্যারাটা অতিরিক্ত...এই পৃষ্ঠাটাও...’ বত্রিশ পৃষ্ঠার গল্প থেকে অবশিষ্ট রইল মাত্র কয়েকটি বাক্য।

পরদিন সম্পাদক ফোন করলেন আবার।

‘সাব্বাশ!’ প্রশংসা ঝরে পড়ল তাঁর গলায়।

‘দারুণ একখানা রসগল্প হয়েছে।’

* অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বাদের মূল্যজাতীয়

সবজিবিশেষ। রু শ মি শা লি

। সঠিক ব্যালাসের উদাহরণ: ১০ কিলোমিটার
সাইকেল চালিয়ে পাবে গিয়ে পেট ভরে বিয়ার
খেয়ে আবার সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসা।

। একটি বিজ্ঞাপনী আইডিয়া:

তিন শিশুর সংলাপ।

—আমার মা আমাকে কপির বাগানে খুঁজে
পেয়েছে।

—আর আমাকে মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে
সারস পাখি।

—আর আমাকে বাবা-মা কিনেছে দোকানে।

নেপথ্যে কণ্ঠ: রুশ কনডম—জন্মনিয়ন্ত্রণের
শতভাগ নিশ্চয়তা।

। বন্ধুলাভের উপায় নামের বই প্রকাশের পর
ডেল কার্নেগিকে আরেকটি বই লিখতে হয়েছিল
আহরিত বন্ধুদের থেকে মুক্তিলাভ নামে। সংকলন
ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০২, ২০১২

696) রোমান্টিক গল্প - যু.

লিখলেতড

মেয়েটা এক হাসপাতালে নার্সের কাজ করত।

তরুণী, অপরাধী। ছেলেটিও যেনতেন নয়,
দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধ। ঢালাইকার। কাজ করত
এক গৃহনির্মাণ কোম্পানিতে।

তাদের দেখা হতো না কখনোই। কিন্তু একদিন
এক ঘটনা ঘটল। নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ থেকে
পড়ে গেল ছেলেটি।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। মেয়েটি

তাকে ইনজেকশন দিল, সার্জনকে সহায়তা
করল অপারেশনের সময়।

যতটা সময় ছেলেটা জীবনুত অবস্থায় পড়ে
ছিল, মেয়েটি এক মুহূর্ত সরল না তার কাছ
থেকে। তার সেবা করল, অপলক তাকিয়ে রইল
তার দিকে এবং প্রেমে পড়তে থাকল।

জ্ঞান ফিরে এলে ছেলেটিও তাকিয়ে থাকত
মেয়েটির দিকে, হাসত, ডাকত ‘মা’ বলে,
তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

মেয়েটি ছেলেটির বাহুতে হাত বোলাত, আঁচড়ে
দিত তার কোঁকড়ানো চুল, বেডপ্যান পরিষ্কার
করত আর স্বপ্ন দেখত—ছেলেটি সুস্থ হয়ে
উঠলে তারা বিয়ে করবে।

যেদিন তারা বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে গেল,

চারপাশে সবাই চিৎকার করছিল ‘গোরকা’* বলে। সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল নির্মাণশ্রমিকদের প্রধান, যার গাফিলতির কারণে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল ছেলেটিকে।

ছেলেটা হঠাৎ অন্ধকার দেখল চোখে—কী অবিশ্বাস্য আবেগ নিয়ে মেয়েটি কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার অনুশীলন শুরু করল তার সঙ্গে, করল হার্ট ম্যাসাজ!

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং সারা জীবন বাসব’, বলল মেয়েটি।

এবং কেঁদে ফেলল।

এ সবকিছুই সে করল বিয়ের দু’বছর পর স্বামীকে বলতে, ‘কেন যে তখন মরোনি! আমার সারা জীবনটা তছনছ করে দিলে!’

* নবদম্পতিকে চুমু খেতে আহ্বান জানাতে এই শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে অভ্যাগতরা।

সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৯, ২০১২

697) অ্যান্টি-রসগল্ল - ন.

লাবকোভস্কি

কয়েক দিন আগে সম্পাদক আমাকে ডেকে বললেন, ‘বহুদিন হলো পাঠকদের নতুন কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়নি। একটা রসগল্ল রচনা করুন না! তবে সেটা হতে হবে অনন্য ও অভিনব। অন্যদের লেখা রসগল্লগুলোর মতো যেন না হয়।’

ঠিক তখন কেন যে কথাটা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ‘অনন্য ও অভিনব? তাহলে সেটা রসগল্ল হবে না, হবে অ্যান্টি-রসগল্ল।’

সম্পাদক আমার দিকে তাকালেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, বললেন, ‘বাহ্! অ্যান্টি-রসগল্লই লিখুন।’

ঘরে ফিরে ভাবতে বসলাম: অ্যান্টি-রসগল্ল— সেটা আবার কী বস্তু?

এক বন্ধু আছে আমার। সে একাধারে পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও কবি। তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম এই প্রশ্ন নিয়ে।

‘অ্যান্টি’, এক মুহূর্ত না ভেবে উত্তর দিল সে, ‘অর্থাৎ বিপরীত। আদি যুগে রসগল্ল বলতে বোঝাত ছোট, হাস্যোদ্রেককারী রচনা, যেটার সমাপ্তি অভাবিত। আর তাই অ্যান্টি-রসগল্ল মানে খুব সম্ভব, দীর্ঘ, বিরক্তিকর রচনা, যেটার শুরুতেই সমাপ্তি অনুমান করে নেওয়া সম্ভব।’

‘বললেই হলো!’ জানালাম তাকে। ‘তুমি যা

বললে, সেটা তো অ্যান্টি-রসগল্প নয়ই, বরং অতি প্রচলিত আধুনিক রসগল্পের ধরন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, সম্পাদক আমার কাছে অন্যকিছু চাইছেন। কিন্তু কী সেটা!’

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে একটা আইডিয়া এল মাথায়। হ্যাঁ, আমি এবার এমন একটা কিছু লিখব, বিশ্বের রসগল্পজগতে নতুন ধারার প্রচলন করবে। মিশেল দেব পুরোনোর সঙ্গে নতুনের।

সুন্দর দেখে একটা কাগজ নিয়ে ওপরে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম গল্পের নাম ‘অ্যান্টি-রসগল্প’ এবং একেবারে নিচে ‘সমাপ্তি’। আর একটি বাক্যও নয়, একটি শব্দও নয়।

ছোট? এর চেয়ে ছোট হতে পারে না।

হাস্যোদ্বেগকরী? অবশ্যই। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যাবে।

অভাবিত সমাপ্তি? নিশ্চয়ই! ও’হেনরির গল্পের চেয়েও অভাবিত ও আকস্মিক।

লেখাটা খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম সম্পাদকের ঠিকানায়। এর পর থেকে প্রতিদিন নজর রাখতে শুরু করলাম পত্রিকায় আমার লেখাটা ছাপল কি?

পার হয়ে গেল এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ। লেখার দেখা পেলাম না।

এক কাপ কড়া কফি গিলে সাহস সঞ্চয় করে রওনা দিলাম সম্পাদকের উদ্দেশে। গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলাম আমার অ্যান্টি-রসগল্প তিনি পেয়েছেন কি না।

সম্পাদক তৃপ্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন।

তারপর বললেন, ‘অ্যান্টি-রসগল্প? হ্যাঁ, পেয়েছি তো। পড়েছি এবং জানেন, আপনার জন্য মঞ্জুর করেছি অ্যান্টি-সম্মানী।’ সংকলন ও অনুবাদ:

মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৯, ২০১২

698) দুটো খুদে গল্প - ফ. প্রিভিন

মাছি‘মেঝে হচ্ছে ছাদ’, ছাদের বুকে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল এক মাছি।

‘মেঝে হচ্ছে দেয়াল’, ছাদ থেকে দেয়ালে নেমে এসে উপলব্ধি হলো তার।

আর যখন সে মেঝেতে নেমে এল, তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল আবার।

‘আসলে মেঝে হচ্ছে মেঝে আর দেয়াল হচ্ছে দেয়াল...’

কিন্তু এমন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল
ছাদের বুকে ঘুরে বেড়ানো মাছিগুলো। তারা
বলল, ‘কী উল্টোপাল্টা যে বকছে সে! মেঝে
নাকি মেঝে! হায়, পতন ঘটে
এভাবেই।’ গেঞ্জিকোট, সোয়েটার আর শার্টের
তলায় গেঞ্জিকে প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু সে
তো অন্যদের চেয়ে কোনো অংশেই তুচ্ছ নয়!
না-ই বা থাকল তার বোতাম, পকেট বা কলার,
সে তো যেকোনো কাজে সবার আগে কাঁধ
বাড়িয়ে দেয় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পালন
করে তার দায়িত্ব।

আর সবচেয়ে বড় কথা, অন্য অনেকের মতো
কখনোই সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে
না। সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৯, ২০১২

৬৭৭) মুদ্রণপ্রমাদ - আ. কারাভায়েভ

ফোন বেজে উঠল আবার। আমি রিসিভার হাতে
নিলাম। এক শিশুকণ্ঠ প্রশ্ন করল আদুরে স্বরে,
‘যন্ত্র ভায়া, ও যন্ত্র ভায়া, আবহাওয়া কেমন
থাকবে আগামীকাল, বলো না!’

‘কোথায় ফোন করেছে তুমি?’ ভদ্রতা বজায়
রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস
করলাম।

‘যন্ত্র ভায়ার কাছে, যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
জানায় টেলিফোনে।’

‘বালিকা, তুমি ভুল করেছে। এটা ফ্ল্যাট!’ বললাম
প্রায় চিৎকার করে। ধৈর্য ধরে রাখা আর সম্ভব
হলো না।

‘তুমিও ভুল করেছে। আমি বালিকা নই, বালক।
তাই বলে আমি কিন্তু চিৎকার করছি না।’

এক মিনিট পর আবার এল তার ফোন।

‘কত নম্বরে ডায়াল করেছে?’ আত্মনিয়ন্ত্রণের
প্রয়াস সচল করলাম আবার।

‘৪৩-০৭-১২।’

‘এটা আমার বাসার নম্বর।’

‘না!’

‘কে সঠিক জানে? এত বেশি আত্মবিশ্বাসী হলে
চলে না, বালক!’

সদ্য প্রকাশিত টেলিফোন গাইডটা হাতে নিয়ে
আমার চক্ষু চড়কগাছ! একেবারে প্রথম পাতায়ই
বড় বড় অক্ষরে লেখা: ‘স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া
পূর্বাভাস ব্যুরো-৪৩-০৭-১২।’ তবে শেষ পৃষ্ঠায়
খুদে হরফে আরও কিছু মুদ্রণপ্রমাদের তালিকায়

লেখা আছে: ‘আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যুরোর প্রকৃত নাম্বার-৩৩-০৭-১২।’

মাঝরাতে উপর্যুপরি এক টেলিফোন কলের পর আমি হিসাব কষে দেখলাম, আমাদের ১০ লাখ মানুষের এই শহরের প্রত্যেককে ভয়াবহ মুদ্রণপ্রমাদটার কথা পৌঁছে দিতে আমার সময় লাগবে প্রায় ১৮ বছর।

সকাল আটটায় আরেকটা মহান আবিষ্কার করলাম আমি: সবাইকে ভুলটা জানানোর চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও দ্রুত...আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানানো! একটা টেক্সটও দাঁড় করিয়ে ফেললাম: ‘আংশিক মেঘলা, কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি।’ পুরোটা পড়তে সময় লাগছে ঠিক চার সেকেন্ড। জানি, এমন তথ্য বিভ্রান্ত করবে লোকজনকে, ভুল ধারণা দেবে। তবে সেটা আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে আমার সাযুজ্যও বাড়াবে।

সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন অতিথি এল আমার বাসায়। মিনিট খানেক পার না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

‘আংশিক মেঘলা, কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, তাপমাত্রা...।’

অতিথিরা হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ঘটনাটা তাদের বোঝাতে যাব, কিন্তু তখনই আবার টেলিফোনের রিং।

‘আংশিক মেঘলা, কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, তাপমাত্রা...।’

উদ্বিগ্ন অতিথিরা আমাকে সরিয়ে আনল টেলিফোনের কাছ থেকে। অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াল জোর করে। ডেকে আনল আমার চাচিকে, যাতে তিনি সারা রাত পাহারা দেন আমার পাশে বসে।

পরদিন সকালে টেলিফোন গাইডের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। শান্ত, ধীরস্থির মানুষ।

‘বুঝলেন, টেলিফোন গাইড—এটা আমাদের দপ্তরের কর্মীমণ্ডলীর বিরাট সাফল্যের ফসল।

আমি নিশ্চিত, অনেক পাঠকের কাছে তা ডেস্কবুকে পরিণত হবে। হ্যাঁ, কিছু মুদ্রণপ্রমাদ তাতে আছে বটে, তবে সেগুলো ‘আবহাওয়া তৈরি করবে না*।’

‘আবহাওয়া তৈরি করবে না মানে!’ প্রায় চিৎকার করে বললাম আমি। ‘ঠিক আবহাওয়াই তৈরি

করছে ওগুলো।’

বাসায় ফিরলাম বিধ্বস্ত অবস্থায়। টেলিফোন বাজছে আরও ঘন ঘন। এর কারণ, খুব সম্ভব, আমি গতকাল ঝড়ে বক মেরে সঠিক পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলাম।

হঠাৎ মজা পেতে শুরু করলাম পুরো ব্যাপারটা থেকে। পূর্বাভাস দিতে থাকলাম কবিতা আর গানের মাধ্যমে।

রিং—‘আমাদের শহরে এসেছে বৃষ্টি, চলছে দিবস-রজনীজুড়ে...’

রিং—‘হে তুষার, তুষারকণা, কীভাবে তুমি উঠছ নেচে তুষারঝড়ে...।’

রিং—‘বায়ু বয় এ বিশ্বজুড়ে...।’

রিং—‘ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির কঙ্কণ...।’

যখন অ্যাম্বুলেন্স এল, আমি তখন টেলিফোনে শোনাচ্ছিলাম বাচ্চাদের ছড়া: ‘বৃষ্টি হয়তো হবে, হয়তো বা ঝড় > শোনো সব ছেলেমেয়ে, ছেড়ো নাকো ঘর...।’

‘হুমম,’ আমাকে মন দিয়ে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ‘নার্ভাস সিস্টেমে সমস্যা। বিশ্রাম প্রয়োজন। আর প্রয়োজন নিয়মিত খাওয়াদাওয়া। পার্কে হাঁটাচলা করবেন, ঘুরতে যাবেন বনে এবং অতি অবশ্য ভালো আবহাওয়ায়।’

তারপর আঙুলের ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন, ‘ধরুন, শহরের বাইরে কোনো বনে বেড়াতে যাবেন। তার আগে ৪৩-০৭-১২ নম্বরে ফোন করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নেবেন। সাম্প্রতিককালে তাদের অনুমান সঠিক হচ্ছে এবং জানেন, পূর্বাভাস শুনতে পাবেন কবিতায়! কী দারুণ ব্যাপার! আমি নিজে দিনে বার তিনেক ফোন করি!’* রুশ ভাষায় ‘আবহাওয়া তৈরি করা’র রূপক অর্থ প্রভাব ফেলা। সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ০৯, ২০১২

700) বাল্যবিবাহ - আ. পোতের

আমাকে স্কুলে ডেকে পাঠানো হলো। ‘নিশ্চয়ই আবার কোনো কুকীর্তি ঘটিয়েছ?’ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘ভুল কথা। তেমন কিছুই করিনি। বিয়ে করেছি শুধু...’

‘কী?!’

‘বিয়ে করেছি...’

‘বিয়ে করেছ মানে?’ শরীর ঠান্ডা হয়ে এল আমার। ‘কাকে বিয়ে করেছ?’

‘তানিয়া মুরজিনাকে, আমাদের ক্লাসেই পড়ে,’ এমনভাবে উত্তর দিল সে, যেন কিছুই হয়নি! তারপর জীর্ণ পাঠ্যপুস্তকগুলো ভরতে শুরু করল স্কুলব্যাগে।

‘য্যুরিক, শোনো। আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু বিশ্লেষণ করে বলবে কি?’ ‘বিশ্লেষণ করার কী আছে এখানে! একা থাকা দুর্ভাগ্য, তাই বিয়ে করেছি।’

‘একা থাকা দুর্ভাগ্য মানে? কী সেই দুর্ভাগ্য ব্যাপারগুলো?’

‘তুমি তো জানো, পড়াশোনা করা কত কঠিন এখন। তোমাদের সময় অনেক সহজ ছিল। এই যেমন, তোমাদের যুগে পদার্থবিদ্যা শেষ হতো ওহমের সূত্রে। এরপর আরও কতশত নতুন আবিষ্কার হয়েছে, সেটা জানো?’

‘ন্-না, জানি না।’

‘দেখলে তো? তুমি জানো না, কিন্তু আমাকে জানতে হয়।’

‘য্যুরিক, আমি তবু বুঝতে পারছি না,’ যথাসম্ভব মৃদুস্বরে বললাম, ‘তোমাদের পড়াশোনার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার এটার... ইয়ে, মানে...’

‘শুধুই কি পড়াশোনা! তাহলে তো সমস্যাই থাকত না। একাই ম্যানেজ করে নেওয়া যেত।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে আন্তঃস্কুল অলিম্পিকে যেতে হয়? হয়। নানান স্টাডি সার্কেলে যেতে হয়? হয়। এক্সক্যুরশনে জাদুঘরে যেতে হয়? হয়। ফেলে দেওয়া কাগজ রিসাইক্লিংয়ের জন্য কুড়িয়ে এনে জমা দিতে হয়? হয়। একা একা এত কাজ করা সম্ভব? এ ছাড়া আরও চালু হয়েছে ঐচ্ছিক ক্লাস। সবকিছু সামলাতে আমার আর তানিয়ার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তানিয়া যখন নাচের ক্লাসে যায়, আমি আমাদের দুজনেরই অঙ্কের হোমওয়ার্ক সেরে ফেলি। একজনে সবকিছু করা অসম্ভব।’

‘একে অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারটা আমি বুঝি। কিন্তু শুধু বন্ধুত্ব করে থাকা যেত না? এই ইয়ে, মানে... ওই কাজটা না করলে চলত না?’

‘নাআআআ! বন্ধুত্ব দিয়ে পার পাওয়া যেত না। আর বন্ধুত্ব ব্যাপারটা যে আসলে কী, ঢের জানা আছে! প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম, চিঠি

চালাচালি...। কিন্তু এসবের সময় কোথায়?

এখানে প্রয়োজন সিরিয়াস সম্পর্ক, তোমার আর মায়ের মধ্যে যেমন, যেখানে দুজনের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে...’

‘হুমম,’ যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললাম, ‘তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, তুমি বিয়ে করেছ হিসাব করে। ঠিক?’

‘কিসের হিসাব! আলেক্সান্দার পুজিরিয়ভের কথা ভিন্ন। সে বিয়ে করেছে হিসাব করে। তানিয়ার বাবা-মা কী করে, জানো? বাবা রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক, মা বিভাগীয় প্রধান। তারা তাদের মেয়ে আর জামাইকে কতভাবে সাহায্য করে, সেটা জানো?’

আমি চূড়ান্তভাবে বাকরহিত হয়ে পড়লাম। কী বলব বা কী জিজ্ঞেস করব, মাথায় আসছিল না। ‘তো এখন কী করবে, ভাবছ?’ প্রশ্নটা বেরোলো আপনা থেকেই।

‘সে তো জানা কথাই, স্কুল শেষ করব। বাচ্চাটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে...’
‘কোন বাচ্চা, যুরিক?’ মুখের ভেতরটা শুকিয়ে এল আমার!

‘ক্লাস থ্রির ভোভার কথা বলছি। আমি আর তানিয়া মিলে অক্টোবর চিলড্রেন*-এর পক্ষ থেকে ওর ভার নিয়েছি।

‘এই ভোভাকে তোমাদের প্রয়োজন কী?’
‘বয়সে কম হলেও ওদের দুরবস্থা আমাদের চেয়ে কম নয়। তানিয়া আর আমি তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওর দেখভাল করব, সাহায্য করব। নইলে দেখা যাবে, কয় দিন বাদে সেও বিয়ে করে বসেছে। ওই বয়সে সেটার কোনো দরকার আছে? ... আচ্ছা, শোনো, বাবা, ছেলে ঘড়ির দিকে তাকাল, ‘আমাকে এখন যেতে হবে। তানিয়াকে রুশ হোমওয়ার্ক কপি করতে দিতে হবে। গতকাল সে আমার হয়ে কয়্যারে গান গেয়ে এসেছে।’

সমস্ত পাঠ্যপুস্তক স্কুলব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে দৌড় লাগাল সে। যাওয়ার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘শুধু একটা ব্যাপার বুঝি না, বড়রা বিয়ে করে কেন? তাদের না আছে ক্লাস, না আছে হোমওয়ার্ক, না আছে এক্সট্রা কারিকুলাম...’ *অক্টোবর চিলড্রেন—সোভিয়েত শাসনামলে ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের কমিউনিস্ট সংগঠন। সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ

মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৩, ২০১২

701) আইসক্রিম খেতে চাই

কী যে ইচ্ছে করছে আইসক্রিম খেতে! আমি জানি, আমার খেতে বারণ। আমার টনসিল। কিন্তু এ কারণে ইচ্ছের প্রাবল্য কমছে না একটুও। ওই বালকের নিষেধ নেই, সে গোথাসে খাচ্ছে, প্রায় মুখ ডুবিয়ে। কিন্তু আমার খাওয়া নিষেধ।

সবাই খেতে পারে: রংচঙে কাপড় পরা ওই তরুণী, যে হেঁটে যাচ্ছে এক সৈনিকের হাত ধরে; ওই পুঁচকে মেয়ে, টি-শার্ট পরা কিশোর, সাইকেলচালক, যে হ্যান্ডেল ধরে রেখেছে এক হাতে, কারণ অন্য হাতে তার আইসক্রিম।

আজ দুঃসহ গরম। বাবা হাঁটছে আমার হাত ধরে, আর আমি আইসক্রিম খেতে চাই।

‘তুমি তো জান, লক্ষ্মীটি, আইসক্রিম খাওয়া তোমার জন্য বারণ। তোমার টনসিল।’

কিশোরটা তার জিবের ডগায় জড়িয়ে নিচ্ছে দ্রুত গলনোন্মুখ শীতলতা, সৈনিকের সঙ্গিনী

আইসক্রিমে বসিয়ে দিচ্ছে তার দাঁত,

সাইকেলারোহী তার আইসক্রিম-ধরা হাতটি

রেখেছে নিজের শরীর থেকে একটু দূরে। সবাই

আইসক্রিম উপভোগ করে মজা লুটছে, আনন্দ

করছে; শুধু আমার খেতে বারণ। আমার

টনসিল।

ভবিষ্যতে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটবে,

যেগুলো এখনো আমার অজানা। ইরিনা আমাকে

ফেলে ডিস্কোতে যাবে কোনো এক পদার্থবিদের

সঙ্গে, আর আমি তার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে

যন্ত্রণা ও ঈর্ষায় পুড়তে থাকব। কোনো একসময়

পরস্পরকে লেখা আমাদের চিঠিগুলো টুকরো

টুকরো হয়ে উড়বে বাতাসে...আমি এসব এখনো

জানি না। আমি এখন স্রেফ মারা যাচ্ছি

আইসক্রিম খেতে। ল. নভজেনভ

সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ৩০, ২০১২

702) ভালো মানুষদের গল্প - ইগর লেবেদেভ

পিওতর সিদোরভিচ—খুব চমৎকার মানুষ!

গতকাল দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। কথা হলো

মাত্র পাঁচ মিনিট, অথচ এমন অনুভূতি, যেন চার

পেগ ভোদকা খেয়েছি।

মাকার ফেদতভিচও ভালো মানুষ। তাঁর কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে; এবং প্রতিবারই মনে হয়, যেন ভোদকা খেয়েছি ছয় পেগ।

নিনা মিরোনভনাকে আমার ভারি পছন্দ। কী অপরাধী মহিলা: সুতস্বী, স্মার্ট, হাসি তাঁর সূর্যকিরণের মতো। তাঁকে দেখলেই মনে হয়, এক গ্লাস ড্রাই ওয়াইন খেয়েছি।

ভারভারা ফিওদরোভনা—বিরল প্রজাতির আন্তরিক মানুষ। তাঁর সঙ্গে এক মিনিট কাটালেই মনে হয়, কেউ যেন চার পেগ ভোদকা এবং সঙ্গে টক শসা সার্ভ করেছে। তবে ৯ নম্বর ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনীর কথা ভিন্ন। সে কোথাও-খুঁজে-পাবে-নাকো ধাঁচের খাণ্ডারনি। তাকে দেখলেই মনে হতে থাকে, যেন হাত থেকে ভোদকার বোতল পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার শাশুড়ি জিনাইদা তিমফেয়েভনার মনটা এত ভালো! কিছু বলার জন্য তিনি মুখ খুললেই মনে হয়, যেন কেউ এক গ্লাস পোর্ট ওয়াইন এনে দিল আমার হাতে। বিনে পয়সায়। তবে সবচেয়ে ভালো লোক হচ্ছেন ভিক্টর নিকোলায়েভিচ। তাঁর সঙ্গে দুটো শব্দ বিনিময়ের পরে মনে হয়, যেন পানির ট্যাপ থেকে রেড ওয়াইন ঝরছে।

আর নিজের সম্পর্কে কী-ই বা বলব! সবাই জানে, আমি বাস করি ভোদকার ব্যারеле। সংকলন ও অনুবাদ: মাসুদ মাহমুদ
সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ৩০, ২০১২

703) ডাইনিং টেবিলের পথ - আ.

দাউতভ

‘আজ কেউ কি খাবারদাবার দেবে আমাকে?’
বাসায় ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল মামোনভ।
‘না,’ কেমন যেন বাঁকা সুরে উত্তর দিল স্ত্রী।
‘তোমাকে না দারুণ দেখাচ্ছে আজ!’ মামোনভ
তোষামোদির চেষ্টা করল একটু। ‘তোমার
কসমেটিক মাস্কটা একদম নিখুঁত লাগছে। চুল
কোঁকড়া করার পিনগুলোও খুব মানিয়ে গেছে
তোমাকে।’

‘আমার মা তোমাকে দেখেছে অন্য এক মেয়ের
সঙ্গে!’ ট্রাম্পকার্ড ফেলল ক্ষুব্ধ স্ত্রী।

‘তবু ভালো, কোনো ছেলের সঙ্গে দেখেনি!’
মামোনভ বলল রসিকতা করে।

‘ছেলের সঙ্গে দেখলে কী হতো?’ স্ত্রী রসিকতাটা ধরতে পারল না।

‘এর মানে হচ্ছে, আমি স্বাভাবিক পুরুষ,’—
বোঝাতে গিয়ে মামোনভ উপলব্ধি করল, ব্যর্থ
রসিকতা করেছে সে।

‘কার সঙ্গে ছিলে তখন?’ স্ত্রীর হাতে বেলন।

‘কখন?’ স্পষ্টতই ক্রোধ প্রকাশ করল
মামোনভ। ‘তুমি তো জান, আমি কাজ করি
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। বলতে পার,
কৃষ্ণাঙ্গদের মতো।’

‘কৃষ্ণাঙ্গরা খুব কাজ করে নাকি?’ প্রতিবাদ করে
স্ত্রী বলল।

মামোনভ উৎফুল্ল হয়ে উঠল মনে মনে। তাদের
কথাবার্তা বর্ণবাদী প্রসঙ্গে মোড় নিচ্ছে।

ঠিক তখন খুব কৌতূহলোদ্দীপক একটা বাক্য
বলল স্ত্রী, ‘বাচ্চা বানানো ছাড়া আর কোনো
কাজ কৃষ্ণাঙ্গরা পারে?’

‘তুমি সেটা কোথেকে জান?’ রক্ষণাত্মক অবস্থান
থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল
মামোনভের কথা।

‘ওই ইয়ে মানে...,’ কথার খেই হারিয়ে ফেলল
স্ত্রী। ‘মা একবার বলেছিল...।’

‘আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছ?’ বিজয়ীর
ভঙ্গিতে মামোনভ এগিয়ে গেল তার ঘরের
দিকে।

অপরাধমাখা নীরবতার পর স্ত্রী প্রশ্ন করল,
‘খাবে এখন?’

‘অবশ্যই,’ সাগ্রহে উত্তর দিল মামোনভ। ‘এখনই
দাও। এত খিদে পেয়েছে!’ সংকলন ও অনুবাদ:
মাসুদ মাহমুদ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ৩০, ২০১২

704) ঘটনার ঘনঘটা আজ হীরক রাজ্যে - তাওহিদ মিলটন

রাজা: বুঝলে গবেষক, ভেবে দেখলাম, এ জাতি
বড়ই অদ্ভুত,

গবেষক: জি, যা শুনে সবই বিশ্বাস করে,
প্রতিশ্রুতি থেকে প্রেত-ভূত!

রাজা: কত কিছুই তো দেখলাম, আরও কত কী
যে বাকি, হয় রে বাঙালি!

গবেষক: শেষে ঠিকই মেনে নেয় সবই, সারা
দিন খামোখা মুখে থাকে গালি!

রাজা: পাঁচ বছরে দেশের জন্য ওদের খালি
একবার কাজে লাগে হাত!

গবেষক: বাকি পাঁচ বছর তো হাত গুটিয়ে বসে থাকে, শুধু ভাবে দুধ-ভাত!!

রাজা: দুধ তো খাবে বিড়াল ছানা, কালো কিংবা ধলো,

গবেষক: ঠিক! ঠিক!! রেল নিয়ে সে রকমই তো হলো!

রাজা: এ দেশে দখল হয় সবই, খাল-বিল-জমি-জমা এমনকি ফুটপাথও!

গবেষক: কী করে যে বলি, মানুষের কান্না শুনবে, যদি একটু কান পাত!

রাজা: ফুটপাথ মুক্ত করতে মন্ত্রী তো কবেই হুকুম দিয়েছেন, কী দেননি?

গবেষক: এটা কি আলাদিনের দৈত্য নাকি, বললেই ক্রিয়ার হবে অমনি!

রাজা: তবে কী চাও গবেষক, খুলব নাকি আরেকটা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়!

গবেষক: না মহারাজ থাক, যা আছে ওতেই জনগণ বহুত যন্ত্রণা লয়!

রাজা: শুনলাম অফিস করে চাঁদাবাজি হচ্ছে রাস্তাঘাট আর ফুটপাথে?

গবেষক: মানুষজনের ঘুম হারাম, আপনার দলীয় লোকদের উৎপাতে!

রাজা: বোঝোনি গবেষক এটা আসলে বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র!

গবেষক: তাই যদি হয় গুঁড়িয়ে দিন, কে দেয় এসব কানপড়া আর মন্ত্র?

রাজা: কে আবার? এ দেশের হতচ্ছাড়া মিডিয়া, ওরাই তো এখন দুর্নীতির খবরের একেকটা পিডিয়া!

গবেষক: কী লাভ আর রাজামশায়, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে!

ওরাও আর কত সহ্য করবে, গোটা জাতিই তো উঠছে হাঁপিয়ে!!

রাজা: সেই কবে একাত্তরে স্বাধীন হলাম, শ্লোগান ছিল মুক্তি চাই!

গবেষক: পিঠ তো এখন দেয়ালে, যদি দেয়ালটাই এবার সরানো যায়!!

রাজা: ঠিক ঠিক, এ ছাড়া তো আর উপায়ও নাই!

গবেষক: উন্নয়নের স্বপ্ন ছিল পদ্মা নদীর দুই পারে,

হওয়ার আগেই ভাঙল সেতু, দুর্নীতির বিষম ভারে!

রাজা: এর পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন কোন
এক ব্যাংকের সাবেক এমডি!

কোথায় সেতু কোথায় হেতু! সবই আজব, সবই
আজ কোলাবেরি ডি!

গবেষক: নামধাম জানলে বলে দিন, বুঝি না
তো করলে এত হেঁয়ালি!

মানুষ আজ দেখতে চায়, কত বড় কাবিল সে,
কত বড় খেয়ালি!

রাজা: ভেব না, ওরা তো সব আমজনতা,
জুসপ্যাকে খায় ম্যাগ্নো ফ্লেভার!

আরে মিয়া রাজনীতির তো এটাই মজা, ওরা
চালাক আমরা ক্লেভার!

গবেষক: কিন্তু সেতু-চুরি নিয়ে দেশতো পড়েছে
ভাবমূর্তির সংকটে, তবে সংকটটাও যদি চুরি
করাতে পারতেন, সবই ক্লিয়ার হতো বটে!!

রাজা: গবেষক আইডিয়া তো দিয়েছো একখান
খাসা!

গবেষক: দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে এটা ছিল বাকি,
হায়রে তামাশা!

রাজা যায় রাজা আসে, রাজায় রাজায় মাসতুতো
ভাই, মনে মনে অনেক মিল, মিল নাই শুধু
চেহারায়!

রাজা: আর তাতেই তো বোকার দল, পাঁচ বছর
পর পর ধরা খায়!

গবেষক: তা রাজা মশায়, জনগণের জন্য কী
আনলেন নতুন করে প্যাকেটে!

রাজা: বিশাল বড় স্বপ্নের বাজেট (স্বপ্নগুলো
লেখা আছে সাদা কালিতে, ব্রাকেটে!!)!

গবেষক: আজকাল দেখি রাজামশায়, কথায়
কথায় টানেন যতিও!

রাজা: আপনি বাঁচলে বাপের নাম, চেপে যাও
ওইটুকু ক্ষতিও!

গবেষক: বাজেট তো বেশ বড় হলো, এত টাকা
পাবেন কই?

রাজা: চেক পাঠিয়েছি, দেখা হলেই গৌরী
সেনের নিয়ে নিব টিপসই!

গবেষক: তা না হয় নিলেন, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে
ঘটছে কী এসব ঘটনা!

রাজা: ওগুলোর সব সত্যি না, কিছু কিছু সত্যি
হলেও, বাদ বাকি সব রটনা!

গবেষক: এমসি কলেজের ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দিল
কারা?

রাজা: কারা এরা?

গবেষক: আগুনের লেলিহান শিখায় বিজয়
মিছিলে উদ্যত ছিল যারা!

সবাই চিনে, তবু ওদের ধরতে আজও কত
প্রশাসনের টালবাহানা,
অথচ হরতালে একটা বাস পোড়াতেই কতজন
দেখে এল জেলখানা!!

রাজা: মুখ সামলে কথা বলো গবেষক, বেশি
বাড়িও না আর,
মরিবার তরেই পাখা গজায় পিপীলিকার, সঙ্গে
চামচিকার!

গবেষক: তা না হয় বন্ধ করলাম, মুখে টানলাম
এই জিপার,
কিন্তু বুয়েটে হচ্ছেটা কী, বুঝতেছি না কে
ব্যাটসম্যান আর কে যে কিপার!

রাজা: তুমি গবেষক, বুয়েট নিয়ে ভাবনাটা
অবশ্য তোমাকে মানায়,
বিষয়টা তো আমারও ক্লিয়ার না, তোমাকে আর
কী-ই-বা জানাই!

গবেষক: তবে শুনেছি ওই তাঁর বাড়ি আর
আপনার বাড়ি নাকি একই জেলায়,
তাই মানুষে একটু এদিক-ওদিক কয়, বাকিটা
অবশ্যই ফুঁ দিয়ে ফোলায়!

রাজা: চেপে যাও গবেষক, ঘটনা বড়ই
সেনসেটিভ!

তবে দেশের জন্য সবাইকে বলি ‘প্লিজ বি
পজিটিভ!’

গবেষক: যশোরের সেই ওসির কাহিনি কি
শুনেছেন রাজামশায়?

রাজা: পুলিশ নিয়ে আর পারি না, আবার কী
করেছে, বলো তাই!

গবেষক: না তেমন কিছু না, পুলিশের কাজ
পুলিশ করেছে,

টিপে ধরেছে এক সাংবাদিকের গলা!

রাজা: ধুর মিয়া, তাই বলে পুলিশ নিয়ে সাজে
নাকি

তোমার-আমার কথা বলা?

গবেষক: ওকে বাদ দিলাম, কিন্তু আগুন যে
লেগেছে এবার রাবি ক্যাম্পাসে!

রাজা: এরা কি সবাই ড্রাগন নাকি, এত আগুন
কেন এদের নিঃশ্বাসে?

গবেষক: এরা চোখ তুললেই আগুন জ্বলে আর
আঙ্গুল তুললেই পড়ে লাশ,

দেশের ফিউচার যে কী, নেতাদের ওপর

জনগণের হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস!

রাজা: এই বাদলা দিনে রাবি উত্তপ্ত, কী কারণ,
কী সেই হেতু!

গবেষক: রাজামশায়, কারণ তো এখন একটাই,
ঘুরেফিরে পদ্মা সেতু!

রাজা: তিলকে ওরা তাল করেছে, স্মলকে
 করেছে বিগ!

গবেষক: কুকুরের সেই লেজের থিওরিতে
আবার পড়েছে ছাত্রলীগ!

রাজা: সমালোচনা বহুত হয়েছে গবেষক,
আচ্ছা তোমার কি কোনো ক্লান্তি নাই?

গবেষক: ক্লান্তি মোরে ক্ষমা করেছে,
কিন্তু মানুষের মনে যে কোনো শান্তি নাই!
নির্বাচনের কত প্রমিজ আজও আছে জমা,
মানুষ কিন্তু সব মনে রাখে, দাঁড়ি কিংবা কমা!

রাজা: কথার কী আর শেষ আছে, কথা তো
সবই কথার কথা!

গবেষক: কর্মটা হোক ঠিকঠাক, কথাটাই হোক
যথার্থতা!

দেশটা যদি ঠিক করে দেন, আইনের প্রয়োগ
করেন কঠিন!

আইন মানলে স্যালুট পাবে, অন্যায়ের জন্য
কঠিন গিলোটিন!

রাজা: এত দিনের পুরোনো অভ্যাস এক দিনে
কী আর বদলায়?

গবেষক: কী করে হবে অন্যায় করেও যদি
এভাবে পেতে থাকে লাই!

রাজা: বহুত হয়েছে গবেষক, আমি এখন যাই,
মাথায় তোমার বুদ্ধি আছে, কাজে লাগাও

গবেষণায়! **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই
৩০, ২০১২

705) কে জানে! - বরিস গুরেয়েভ

আমার কী দরকার, সেটা সবাই জানে।

দিদিমা জানে, কোন খাবার কী পরিমাণে আমার
স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। মা জানে, কার সঙ্গে
আমার বন্ধুত্ব করা উচিত, প্রেম করা উচিত কার
সঙ্গে এবং কাকে বিয়ে করা দরকার। বাবা
জানে, কোন ইনস্টিটিউটে আমার পড়া দরকার,
কোন ফ্যাকাল্টিতে, কোন সাবজেক্ট আমার জন্য
সম্ভাবনাময়, ডিগ্রি পাওয়ার পর আমার কী করা
উচিত...সবকিছুই আমার মঙ্গলের জন্য।

বস জানে, কোন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব,
আর কোন কাজে দাঁত বসানোর যোগ্যতা আমার

নেই।

আত্মীয়স্বজন জানে, আমি কী ছিলাম, কী হয়েছি, কোন যোগ্যতায় হয়েছি এবং তাদের জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিতে আমার প্রস্তুত থাকা দরকার।

বন্ধুরা জানে, আমাকে কখন ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন আমাকে ঠেলা দেওয়া, কখন পাশে সরিয়ে রাখা, কখন একলা থাকতে দেওয়া এবং কখন আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়া।

সবাই সবকিছু জানে। প্রতিবেশী, পথচারী, বিক্রেতা, ওয়েটার, ডাক্তার, পিয়ানো মেরামতকারী—সবাই জানে, কী করলে আমার মঙ্গল হবে। সবাই জানে, কী করলে আমি ভালো থাকব। খুব ভালো থাকব। আরও ভালো থাকব।

সবার চেয়ে ভালো থাকব। কিন্তু আমাকে নিয়ে সবার এত উদ্বেগ কেন, সেটা কে জানে?

706) স্মরণ - আলেক্সান্দর শ্বিদ্গ

ডিভানের এক প্রান্তে বসে টেলিফোন সেটটা নিজের কাছে টেনে নিলেন রেবরোভ। তারপর ছন্দময় গতিতে নম্বর ঘোরাতে শুরু করলেন। প্রতিটি ডিজিট ডায়াল করার আগে তাকিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের কোলের ওপরে সযত্নে রাখা পেপার কাটিংয়ের দিকে।

‘হ্যালো, ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে বলছি,’ একবার রিং হতেই উত্তর এল।

‘সাইপ্রাসে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলাম,’ একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন রেবরোভ।

‘কয় দিনের প্যাকেজ ট্যুর প্রয়োজন আপনার?’ ওপাশের অমায়িক কণ্ঠের মেয়েটি নিশ্চিতভাবেই অপরূপা।

‘এক সপ্তাহের,’ কথাটি অতি অনায়াসে উচ্চারণ করতে পেরে রেবরোভ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন।

‘আজ বুকিং দিলে আসছে বুধবারেই আপনি চার্টার্ড ফ্লাইটে মিনস্ক থেকে রওনা দিতে পারবেন।’

‘খরচ কত পড়বে, বলবেন কি?’

‘প্লেন ভাড়া, হোটেল ও খাওয়া—সব মিলিয়ে জনপ্রতি খরচ পড়বে ৭৪৫ ডলার। আজই বুকিং দেবেন?’

‘না, আজ নয়। বিশদ তথ্যের জন্য ধন্যবাদ।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা
করতে হবে।’ লাইন কেটে দিয়ে এইমাত্র শোনা
সংখ্যাটি মনে মনে দুই দিয়ে গুণ করতে করতে
রেবরোভ হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর
রিসিভারটা রাখলেন টেলিফোনে। চোখ বন্ধ
করলেন তিনি। কল্পনায় দেখতে পেলেন
সমুদ্রতীরের সব সৌন্দর্য: তীরে ঝাঁপিয়ে পড়া
তরঙ্গমালা, ঝুরঝুরে হলদেটে বালু, গা ঝলসানো
রোদ, দূর-দিগন্তে সাদা ধবধবে ত্রিভুজ
পালওয়ালা নৌকা, চারপাশে পামগাছ,
প্রলুব্ধকারী ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে হেঁটে চলা
তাম্রবর্ণ তরুণীরা, প্রফুল্ল সংগীত...।
হাঁড়ি পড়ে যাওয়ার বিকট শব্দ রেবরোভকে
ফিরিয়ে নিয়ে এল কঠোর বাস্তবতায়। অলস
ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি। হাই
তুললেন। তারপর উঠে রান্নাঘরের দিকে
গেলেন। স্ত্রী সেখানে সাদাসিধে ডিনারের
আয়োজন করছে।

‘শুনছ, পরের সপ্তাহে সাইপ্রাস না গিয়ে আমরা
যদি আমাদের সামার হাউসে যাই, তাহলে কত
টাকা সাশ্রয় হবে আমাদের, তুমি জানো?’
রান্নাঘরের ছোট টুলে বসতে বসতে রেবরোভ
প্রশ্ন করলেন ধাঁধার সুরে।

‘কত?’ স্বামীর প্রশ্নটি তার জন্য এতটাই
অপ্রত্যাশিত যে, সসেজ কাটতে উদ্যত তার হাত
হাওয়ায় ভেসে রইল খানিকক্ষণ।

‘প্রায় দেড় হাজার ডলার,’ সগর্বে জানালেন
রেবরোভ।

‘অত টাকা আমি বাপের জন্মে দেখিনি। অবশ্য
তুমিও দ্যাখনি,’ হাসতে হাসতে স্ত্রী বলল।

‘তবু ভাবতে ভালো লাগছে,’ অতীব সুমিষ্ট
শোনাতে রেবরোভের কণ্ঠ।

কিন্তু স্ত্রীর দৃষ্টি ঘটনার বিশ্লেষণ দাবি করল।

‘ভাবতে সত্যিই ভালো লাগছে,’ রেবরোভ
আবারও বললেন। ‘এই ভেবে পরম তৃপ্তি পাচ্ছি
যে, দেড় হাজার ডলার ব্যয় করবার সামর্থ্য
আমাদের না থাকলেও সেই পরিমাণ অর্থ আমরা
সাশ্রয় করতে পারি।’

707) মানসিক স্থিতি - সের্গেই

উদলোভকা

উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ, বিকারগ্রস্ত এক লোক তার
শিকারের হাতে পেরেক গাঁথছে, আর হাসছে

হা-হা করে। ওদিকে আত্ননাদ করছে শিকার-
পুরুষটি। খ্যাপাটে লোকটি থেকে থেকেই
বিদ্যুতের তার দুই হাতে ধরে ঠেকাচ্ছে
শিকারের শরীরে। তারপর জ্ঞান হারানোর ঠিক
আগমুহূর্তে সে তার গায়ে ঢেলে দিল ফুটন্ত
পানি। এরপর চুল ছিঁড়তে শুরু করল তার মাথা
থেকে। লাফাল তার পেটের ওপরে দাঁড়িয়ে,
হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসল, সবশেষে তার
গায়ে পেট্রল ঢেলে জ্বলন্ত মশাল
এগিয়ে ধরল তার শরীরের দিকে।
'যাক, নার্ভটা ঠান্ডা হলো অবশেষে,' স্কুল শেষে
ঘরে ফিরে একটা থ্রিলার মুভি দেখে ভাবল
স্কুলশিক্ষক। তারপর টিভি বন্ধ করে শুয়ে
পড়ল।

708) শিষ্টাচারের রীতিনীতি - ড. জিনিনস্কাইতে

প্রখর দাবদাহের দুপুর।...এ ক্ষেত্রে আবহাওয়া
অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। শহরের কেন্দ্রে এক রাস্তা
ধরে হাঁটছিলাম আমরা। আমি ও আমার স্বামী।
দুঃখিত, আমার স্বামী ও আমি।

'আপেল খাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' কর্কশ স্বরে বলল সে।

একটা আপেল নিয়ে মনের আনন্দে খেতে শুরু
করলাম আমি নিজেই। সে সরোষে তাকাল
আমার দিকে।

'রাস্তায় আপেল খাওয়া অশোভন, অসংস্কৃত...'

আপেলের টুকরো আটকে গেল আমার গলায়।

আমি কাশতে শুরু করলাম।

'কাশাও অশোভন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা
আবশ্যিক।'

তার মন্তব্য স্পষ্টতই ন্যায়সংগত। লজ্জায় মুখ

লালাভ হয়ে উঠল আমার। আমি হাত দিয়ে

আধা খাওয়া আপেলটি ঢেকে ফেললাম।

'হাতে করে আপেল বয়ে নিয়ে যায় নাকি কেউ!

পকেটে ঢোকাও। কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে

গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।' ভৎসনার সুরে
বলল সে।

দুর্ভাগা আপেলটাকে পকেটে চালান করতে না-

করতেই দেখি, সত্যিই আমাদের এক

পরিচিতজন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

আমি তাকে সম্ভাষণ জানালাম হাসিমুখে, 'হাই!

কেমন

আছো?'

আমার স্বামী কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শিক্ষকের ভঙ্গিতে বলল, ‘দেখা যাচ্ছে, তুমি ঠিকমতো সম্ভাষণ জানাতে শেখোনি। “শুভদিন” বলা কি এতই কঠিন?’

‘না, কঠিন নয়।’ আমি সম্মতি জানালাম।

এক বেবিসিটার এক শিশুর হাত ধরে যাচ্ছিল আমাদের পাশ দিয়ে। শিশুটি হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি-জাগানো এমন এক মুখভঙ্গি করল, আমি হেসেই ফেললাম সশব্দে।

‘আবার!’ সকাতরে অনুনয় করে বলল আমার স্বামী। ‘শহরের মাঝখানে গলা ফাটিয়ে হাসা! লোকে কী বলবে? তোমাকে ভদ্রতা শেখানোর শক্তি আর নেই আমার।’

শোভন আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক হাতে ধরে রাখা অতিকায় বুড়িটা অন্য হাতে বদল করতে আমি থামলাম একটু সময়ের জন্য।

‘প্লিজ, আমার ডান পাশে আসবে?’ অনুরোধ করে বললাম তাকে। ‘নয়তো হঠাৎ তোমার গায়ে বুড়ি লাগিয়ে ফেলি যদি? তোমার পোশাকও তো নোংরা হবে।’

‘পুরুষ ডান পাশ দিয়ে হাঁটে, তুমি সেটা কোথায় দেখেছ?’ সন্কোভে বলল সে, ‘তোমাকে কিছু শেখানো আর না-শেখানো একই কথা।’

অনুগতের মতো আমি বুড়িটা আবার নিলাম অবশ হয়ে আসা ডান হাতে। তারপর আমরা এগোতে থাকলাম সদাচরণের সব রীতিনীতি অনুসরণ করে।

709) একটি জীবনঘনিষ্ঠ গল্প : ডাক্তারের কাছে একদিন - আলিম আল রাজি

দেখি দেখি, জিহ্বা দেখি

—

হা করেন তো দেখি

—

জোরে শ্বাস নিন

—

নখ দেখি

—

দেখি তো! এক চোখ বন্ধ করে তাকান

—

এবার দুই চোখই বন্ধ করেন

—

ঘাড় বাঁকা করেন তো

—

ব্যথা লাগে?

—

উল্টাপাল্টা কিছু খান?

—

আর কিছু?

—

শার্টটা খোলেন তো একটু

—

সর্বনাশ! উল্টাপাল্টা কী করেন?

—

খাইছে আমারে! আপনি তো শেষ

—

সমাপ্তসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৭, ২০১২

710) ফেসবুকীয় রোগ এবং এর লক্ষণ ও প্রতিকার

ফেসবুকের যুগে আমরা সবাই কম-বেশি ফেসবুক ম্যানিয়ায় আক্রান্ত। বিভিন্ন ফেসবুক রোগ এবং এর লক্ষণ সম্পর্কে আসুন জেনে নেওয়া যাক-লাইকোসিস (likosis)

লক্ষণ: চোখের সামনে ছবি কিংবা স্ট্যাটাস আসা মাত্রই লাইক বাটন ক্লিক করা। লাইকোফোবিয়া (likophobia)

লক্ষণ: যত মজার স্ট্যাটাস কিংবা ছবিই হোক, এই রোগে আক্রান্ত রোগী তা কখনোই লাইক দেবে না। শাইএফবিমায়াসিস (shyfbmiasis)

লক্ষণ: অনেক দিন পর পর ফেসবুকে লগড-ইন হবে। দুই সপ্তাহ কিংবা তিন সপ্তাহের অধিক এই সময়কাল হলে বুঝতে হবে রোগী শাইএফবিমায়াসিসে আক্রান্ত। চ্যাটোফোবিয়া (chatophobia)

লক্ষণ: এ ধরনের রোগী কখনোই অনলাইন হবে না। যদিও কালেভদ্রে অনলাইন হয়, তা-ও কেউ নক করলেই আবার অফলাইনে চলে যায়। অনলাইনোমায়াসিস (onlineomiasis)

লক্ষণ: এ ধরনের রোগীকে সব সময় অনলাইনে পাওয়া যায়। হোক তা মোবাইল থেকে অথবা কম্পিউটার। ট্যাগ সিনড্রোম (tag syndrome)

লক্ষণ: এই রোগাক্রান্ত রোগী দিনে একাধিক ছবি আপলোড করে সবাইকে ট্যাগ দিয়ে থাকে। লাইক পাক বা না পাক, এ নিয়ে তাদের

মাথাব্যথা নেই। স্যাডসিনড্রোম (sadsyndrome)
লক্ষণ: এ ধরনের রোগী সারা দিন ফেসবুকে
দুঃখের কবিতা কিংবা আই হেট লাভ টাইপ
স্ট্যাটাস দেয়। রিকোয়েস্ট সিনড্রোম
(requestsyndrome)

লক্ষণ: এই রোগে আক্রান্ত রোগী যাকে সামনে
পায় তাকেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। হোক সে
ছেলে কিংবা মেয়ে। কমেন্টটোলারিয়া
(commentolaria)

লক্ষণ: এই রোগাক্রান্ত রোগী সব পোস্টেই
অসাম, সুপারব, ওয়াও টাইপ কমেন্ট করতে
ব্যস্ত। রাবিশথোসিস (rubbisthosis)

লক্ষণ: এ ধরনের রোগীর কাছে পৃথিবীর
সবকিছুই রাবিশ, অর্থহীন আর
নেগেটিভ। পোস্টলিও (postlio)

লক্ষণ: পোস্টলিও রোগে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ
হচ্ছে, মেয়েদের ওয়ালে কবিতা ও সুন্দর সুন্দর
ছবি পোস্ট করা। এডিক্টোমায়োলজি
(Addictomiology)

লক্ষণ: এই রোগে আক্রান্ত রোগীর ফেসবুকের
চিন্তায় ঘুম আসে না। চব্বিশ ঘণ্টাই এরা
ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকে। স্ট্যাটিওলাইসিস
(statiolysis)

লক্ষণ: এই রোগে আক্রান্ত রোগী দিনে
অজস্রবার স্ট্যাটাস আপডেট করে হোম পেজ
ভরিয়ে রাখে। ডি-অ্যাক্টিবেসিস (deactibasis)
লক্ষণ: ঘন ঘন আইডি ডি-অ্যাক্টিভেট করা
এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিকার: কমপক্ষে সাত
দিন ফেসবুক থেকে দূরে থাকা। এবং মস্তিষ্ক
রিফ্রেশ করা। এতেও কাজ না হলে প্রতিটি
রোগের অ্যান্টি রোগ ফলো করা। রাব্বী আহমেদ
ইন্টারনেট থেকে অনুবাদিত, সংকলিত ও
পরিমার্জিত

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৭, ২০১২

711) নানাবিধ কামড় - ভ.

কোনিয়াখিন

সূর্যতুকভকে মৌমাছি কামড়াল।

‘ভালোই হলো এক দিক দিয়ে; বাতের ব্যথায়
ভুগবে না কখনো,’ তাকে প্রফুল্ল করতে বলল
প্রতিবেশী। সূর্যতুকভকে কুকুর কামড়াল।

‘ভালোই হলো এক দিক দিয়ে, তুমি এখন
পাগল বনে যাবে, অনেক ধরনের ভাতা পাবে,
সুযোগ-সুবিধা পাবে। কোনো অপরাধ করলে

সেটার দায়ভারও বর্তাবে না তোমার ওপর,’
তাকে প্রফুল্ল করতে বলল প্রতিবেশী। তবে
সূর্যতুকভ পাগল হলো না। একদিন দাম্পত্য
কলহের সময় তাকে কামড়ে দিল তার স্ত্রী,
অত্যন্ত রগচটা এক মহিলা।

‘ভালোই হলো এক দিক দিয়ে, এখন তুমি
ডিভোর্স দিয়ে আবার স্বাধীন হয়ে পড়বে,’ তাকে
প্রফুল্ল করতে বলল প্রতিবেশী। সেই থেকে
এভাবেই জীবন যাপন করে চলেছে সূর্যতুকভ—
বাতহীন, ভাতাসুবিধা ভোগকারী, ব্যাচেলর।
সুখী ও পরিতৃপ্ত।

মঝেমঝে ভাবে সে: ‘কাউকে প্রফুল্ল করতে
কামড়ে দেব নাকি!’

712) প্রশংসা - যুগরি প্রকপেক্ষা

যেদিন থেকে প্রেম করতে শুরু করেছি, সেদিন
থেকে শুরু করে আজ অদি উপহারের সমস্যা
আমার পিছু ছাড়ছে না। সেই সময়ে বাজারে
ঘুরতে ঘুরতে ভাবতাম, ঠিক কোন ফুল তাকে
উপহার দেওয়া যায়। কিছু ফুল বেজায় দামি,
বাকিগুলো ঠিক সুদর্শন নয়।

সেই থেকে যেকোনো উৎসব মানেই আমার
মস্তিষ্কপীড়া। গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে ভাবি, কী
উপহার দেওয়া যায় স্ত্রীকে। কিছুদিন আগে এক
পত্রিকায় পড়লাম ‘পুরুষদের জন্য উপদেশ’।

পড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম খুশিতে। নিবন্ধের
লেখক ছিলেন স্রেফ জিনিয়াস। তাঁর মতে, স্ত্রীর
জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার প্রশংসা। লেখকের বক্তব্য:

‘মেয়েদের কাছে প্রীতিকর বাণী সবচেয়ে
মূল্যবান উপহারের চেয়েও বেশি দামি।’

অচিরেই উপহারবিষয়ক এই উপদেশ প্রয়োগ
করলাম বাস্তব জীবনে।

‘জানো,’ বললাম স্ত্রীকে, ‘তোমার মুখের রংটা
আজ কী যে সুন্দর লাগছে!’

সবিস্ময়ে সে আমার দিকে তাকাল, তারপর
আয়নার দিকে এবং হেসে ফেলল।

পরদিন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম,
‘তোমার চোখ দুটোও কী ডাগর ডাগর!’

লক্ষ করে দেখলাম, প্রশস্তিগাথা তার মনে ধরছে
খুব। এমনকি আমার এও মনে হলো, তার
মনটা বরাবরের চেয়ে বেশি ফুরফুরে হয়ে
উঠেছে। এই উপদেশরচয়িতার প্রতি আমি যে
কী কৃতজ্ঞ! স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে পারছি, আবার
অর্থব্যয়ও হচ্ছে না এর পেছনে।

তবে কিছুদিন পর উপলব্ধি হলো, একই স্ততিবাক্য আমি বারবার ব্যবহার করছি। এই যেমন, এক সপ্তাহে তার কেশবিন্যাসের প্রশংসা করেছি দুবার এবং তিনবার প্রশংসা করেছি তার হাঁটার মোহময়ী ভঙ্গি। উপায়ান্তর না দেখে একটা নোটবুকের ব্যবস্থা করতে হলো। ওখানে লিখতে শুরু করলাম কবে এবং কী প্রসঙ্গে প্রশংসাবাক্য উপহার দিয়েছি স্ত্রীকে। সত্যি বলতে, প্রশংসা-পদ্ধতি শুরুতে যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ততটা সহজ নয় আসলে। কারণ-অবাস্তব নয়, আবার সত্যের সঙ্গে সুদূরতম সম্পর্কযুক্ত—এমন বাণী নিরন্তর রচনা করা কি চাউখানি কথা! এই যেমন এক উৎসব উপলক্ষে আমি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম আগে থেকেই:

‘তোমার ধারণাও নেই, কত অপরাধ তুমি আজ। তোমার নিজের সেলাই করা জ্যাকেট তোমাকে করেছে স্নিগ্ধতর এবং হালকা ছায়া ফেলেছে তোমার মুখে, যে মুখ সবচেয়ে প্রতিভাবান চিত্রকরের তুলিতে অঙ্কিত হওয়ার যোগ্য। আমাদের পুরো দালানে তোমার তুলনীয় কেউ নেই...’

প্রতিক্রিয়া হলো আশাতীত। আমার বাণী শোনার পর পুরো একটা ঘণ্টা সে নড়ল না আয়নার সামনে থেকে।

তার জন্মদিনে তাকে উপহার দিলাম চার পৃষ্ঠার প্রশস্তিগাথা, যেটার শেষাংশ ছিল এ রকম: ‘মেধা, সৌন্দর্য আর রুচিবোধের বিচারে তোমার তুল্য কেউ নেই এ মহল্লায়...’

স্ত্রীর সারা সন্ধ্যা কাটল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। অবশ্য কিছুদিন ধরেই সন্ধ্যা অবসর সে মূলত ওখানেই কাটাচ্ছে। থিয়েটার-মুভিতে যায় না, এমনকি টিভিও তাকে সেখান থেকে সরাতে ব্যর্থ।

৮ মার্চ*—বিশেষ উৎসব, সে তো সবারই জানা। এ উপলক্ষে স্ত্রীকে অনন্যসাধারণ কিছু উপহার দেব ঠিক করেছি। সাপ্তাহিক ছুটির দুদিন কাটালাম পাবলিক লাইব্রেরিতে। বিশ্বসাহিত্যের কাব্যসাগর সেচে তুলে আনা মণি-মুক্তাখচিত প্রশস্তিগাথাটি হলো অতীব চিত্তবিমোহনকারী। আমার উপহারটি দাঁড়াল প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠার। তাকে উপহারে ভূষিত করলাম প্রায় আধঘণ্টা ধরে। শেষে তাকে অভিহিত করলাম শহরের

সবচেয়ে সুন্দরী উপাধিতে।

আলো ছড়ানো হাসি হাসল সে।

‘ঠিকই বলেছ তুমি,’ বলল সে। ‘আমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অনন্যা; আমি শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। তা হলে আমি আমার সৌন্দর্য কেন নষ্ট করব তোমার মতো গবেষকের সঙ্গে থেকে? আমি ভালো করে ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। আমার মেধা ও গুণ নিয়ে আমি তোমার চেয়ে শ্রেয় কাউকে পাওয়ার অধিকার রাখি...’

এবং ভাবতে পারেন, সে চলে গেল! আমি বসে বসে ভাবছি, যে কথাগুলো আমি তাকে বলেছি, সে কি সত্যিই সেসব বিশ্বাস করেছে?* বিশ্ব নারী দিবস। এই দিনটি সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোয় খুব ঘটা করে পালিত হয়।

713) সংলাপ - ডিয়োনেস্তা

দমবোডস্কায়া

পুরুষ: তুমি পাঁচটা মিনিট চুপ করে থাকতে পারো না? নারী: আমি চুপ করে নেই বলতে চাইছ? আমি ১০ মিনিট ধরে চুপ করে আছি। আর তুমি সব সময় আমার খুঁত ধরছ! এমনকি এখনো, যখন আমি চুপ করে আছি, তুমি এমন ভাব করছ, যেন এটা লক্ষ্য করছ না। অথচ আমাকে করেই চলেছ উদ্ভট সব প্রশ্ন, যেমন আমি পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকতে পারি কি না। স্বল্পবাক ব্যক্তিদের আমি বুঝতে পারি, পছন্দও করি। তেমন হওয়ার চেষ্টা আমার নিজেরও আছে। কিন্তু অতীষ্ট আদর্শ অর্জন করা কি সম্ভব আদৌ, যখন চারপাশের লোকজন হরদম প্রশ্ন করতে থাকে? মার্জিত প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া সজ্জনের পক্ষে সম্ভব নয়। নইলে তাকে সবাই অভদ্র অসংস্কৃত মনে করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। লক্ষ্য করে দেখো, আমি চুপ করে থাকতে রাজি, যদিও প্রশ্ন বা অনুরোধের ধরনটা ছিল অভদ্র গোছের।

প্রশ্ন নাকি অনুরোধ? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন।

প্রশ্ন হলে সেটার উত্তর আমার দেওয়া উচিত।

অনুরোধ হলেও উত্তর দেওয়াটা কর্তব্য।

আমার ধারণা, সত্যিকারের স্বল্পবাক ব্যক্তি হিসেবে আমি প্রশ্ন ও অনুরোধের উত্তর দিয়েছি তৎক্ষণাৎ।

এখন বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, আমাদের মধ্যে কে চুপ করে আছে, আর কে কথা বলছে?

714) আবিষ্কারের নেপা - আ.

বেদকিন

নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কারের স্বপ্ন আমার আশৈশব। বিশেষ করে তখন থেকে, যখন স্কুলে অন্যদের আবিষ্কার করা সূত্রগুলো না জানার অপরাধে ‘দুই’* পেতাম প্রায়ই। সেই সময় আমার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠত একটা দৃশ্য:

শ দুয়েক বছর পর কোনো এক স্কুলবালক ‘দুই’ পেয়ে গোমড়া মুখে বাসায় ফিরবে। মা তাকে জিজ্ঞেস করবে, ‘দুই পেলে কেন? কী জানা ছিল না তোমার?’

সে উত্তর দেবে বিষণ্ণ সুরে, ‘সিদোরভের সূত্র’। মা তখন ভৎসনা করে বলবে, ‘এই সূত্র না জানা সম্ভব?’ তারপর আচ্ছামতো শাসন করবে তাকে।

বড় হয়ে ওঠার পর এমন নিম্নশ্রেণীর স্বপ্ন আমাকে আর উদ্বুদ্ধ করে না। অবশ্য সম্ভাব্য আবিষ্কারের পর প্রাপ্য বড় অঙ্কের সম্মানীর কথা আলাদা।

তবে সেই যুগ এখন আর নেই, যখন একের পর এক নতুন নতুন সূত্র মাথার ওপর এসে পড়ত, ডাল থেকে আপেল ঝরে পড়ার মতো।

আমার মাথায় অবশ্য একবার একটা টব পড়েছিল পাঁচতলা থেকে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল মুহূর্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, এখনই নতুন কোনো সূত্র আসবে মাথায়।

জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমার হাতে একটা কাগজ। নিশ্চয়ই সূত্র আবিষ্কারের স্বীকৃতিপত্র! ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। নিউটনের পদ্ধতিতে ব্যর্থ হয়ে কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

পিথাগোরাস কীভাবে নাম কুড়িয়েছিলেন? তাঁর প্যাণ্টের আকৃতি থেকে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত সূত্রটি। নিজের জিন্সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নতুন একটা ছেঁড়া জায়গা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না আমার। কিন্তু এই ‘আবিষ্কার’ তো মানবজাতির কোনো উপকারে আসবে না।

দিনের পর দিন যেতে থাকল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কিন্তু আমার সূত্রটা অনাবিস্কৃতই রয়ে

গেল। আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলাম। তখন একদিন...

বাথটাবে নেমেছি গোসল করতে। ট্যাপ খুলে দিয়েছি। হঠাৎ গরম পানির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল এবং গরম পানির বদলে দ্বিগুণ গতিতে ঠান্ডা পানি বেরোতে শুরু করল। আমি বাথটাব ত্যাগ করলাম এক লাফে।

গরম পানি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আবার নামলাম বাথটাবে। ঠিক তখন ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হলো। পার্থক্য ছিল শুধু এই যে এবার গরম পানির বদলে থেমে গেল ঠান্ডা পানি। আমি ফুটন্ত পানি থেকে বেরিয়ে এলাম তিরবেগে।

এবং ঠিক সেই সময় সূত্রটা মাথায় এল আমার। দিগম্বর অবস্থায় ছুট লাগলাম কাগজ আর কলমের খোঁজে। চটজলদি লিখে ফেলতে চাই সূত্রটা। আমার নিজের।

সূত্রঃ কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত বা শীতল তরল পদার্থে নিমজ্জিত করলে বস্তুটির ওপরে পানির বহির্মুখী চাপ সাধারণ তাপমাত্রার তরল পদার্থে নিমজ্জিত বস্তুর ওপরে পানির বহির্মুখী চাপের চেয়ে অনেক বেশি।

মহান ব্যক্তিদের মতো আমিও আমার সূত্রটি আবিষ্কার করলাম একেবারেই আকস্মিকভাবে। হয়তো আমাকে অনেকেই বলবে, প্রায় একই ধরনের একটি সূত্র আর্কিমিডিস ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে, সে ক্ষেত্রে আমার আবিষ্কৃত সূত্রটিকে ‘সিদোরভ-আর্কিমিডিসের সূত্র’ নামে ডাকা যেতে পারে। আমার আপত্তি নেই। * রুশ শিক্ষাব্যবস্থায় ‘পাঁচ’ সর্বোচ্চ নম্বর; ‘দুই’ হচ্ছে ফেল।

715) আসুন, একটি মেগাসিরিয়াল দেখি - আলিম আল রাজি

মূল গল্প

পিটুর স্ত্রী শ্রেয়ার ইলিশ খাওয়ার শখ হয়েছে।

তাই পিটু বাজারে গেল এবং একটি ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে এল। পর্ব ১: পিটু ও শ্রেয়ার দেখা হলো।

পর্ব ২: প্রেমে পড়ল তাঁরা।

পর্ব ৩: ব্যাপারটা জানতে পারল শ্রেয়ার আগের প্রেমিক।

পর্ব ৪: সে ঝামেলা করার ফন্দি আঁটল।

পর্ব ৫: গিটু লাগল পিন্টু ও শ্রেয়ার পরিবারের মধ্যে। পর্ব ৫০: অবশেষে পিন্টু ও শ্রেয়ার বিয়ে হলো।

পর্ব ৫১: পিন্টুদের পাশের বাসার ভাবি একদিন ইলিশ রান্না করলেন।

পর্ব ৫২: সেটা জানতে পারল শ্রেয়া।

পর্ব ৫৩: সে পিন্টুকে বলল ইলিশ কিনে দিতে।

পর্ব ৫৪: পিন্টু জানাল সে ইলিশ কিনে দিতে পারবে না, ইলিশের অনেক দাম। পর্ব ১৫০: ইলিশ কিনে দিতে না পারায় পিন্টু ও শ্রেয়ার ডিভোর্স হয়ে গেল।

পর্ব ১৫১: দুই পরিবারের মধ্যে তখন দা-কুমড়া সম্পর্ক।

পর্ব ১৫২: শ্রেয়া ও পিন্টু তখন একা একা জীবন কাটাতে লাগল। পর্ব ২০০: নতুন করে এক ছেলের প্রেমে পড়ল শ্রেয়া।

পর্ব ২০১: পিন্টুও আরেক মেয়ের প্রেমে পড়ল।

পর্ব ২০২: তাদের প্রেম চলতে লাগল। পর্ব ৫০০: শ্রেয়ার বিয়ে হলো দ্বিতীয়বারের মতো।

পর্ব ৫০১: পিন্টুরও আবার বিয়ে হলো।

পর্ব ৫০২: দুজনের দুই সংসারে তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। পর্ব ১০০০: একদিন মাছের বাজারে এল পিন্টু।

পর্ব ১০০১: ওই দিনই শ্রেয়াও এল মাছের বাজারে।

পর্ব ১০০২: হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দুজনের।

পর্ব ১০০৩: ইলিশবিষয়ক জটিলতার ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হলো। পর্ব ১২০০: পিন্টু বলল, আমি যদি আজকে তোমাকে ইলিশ কিনে দিই?

পর্ব ১২০১: ‘সত্যি দেবে?’ বলল শ্রেয়া।

পর্ব ১২০২: পিন্টু বলল, ‘হ্যাঁ গো।’ পর্ব ১৫০০: ইলিশ কেনার জন্য দুজনে এগিয়ে গেল।

পর্ব ১৫০১: হঠাৎ এক গাড়ি এসে চাপা দিল পিন্টুকে।

পর্ব ১৫০২: আআআআআ করে চিৎকার করে উঠল শ্রেয়া।

পর্ব ১৫০৩: হাসপাতালে নেওয়া হলো

পিন্টুকে। পর্ব ২৪৪৫: পিন্টু ইলিশ কিনল কি না

তা আর জানা যায়নি। কারণ দর্শক তত দিনে

বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এখন দর্শকের নাতি ওই

সিরিয়ালটি দেখেন। **সূত্রঃ** দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১২

716) পরিত্রাণ - ইগর মার্টিয়ানভ

একদিন অফিস থেকে ফিরে স্ত্রী প্রফুল্ল কণ্ঠে জানাল, ‘অবশেষে আমাকে ছুটি দিয়েছে।
ভাবছি, কুবানে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসব। আশা করছি, তোমার আপত্তি নেই।’
হুমম! আমার স্ত্রীর কথায় আপত্তি করা খারাপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতোই নিরর্থক।

‘তা যাও না, ঘুরে এসো,’ নিরাসক্ত স্বরে বললাম।

স্ত্রীর আসন্ন ভ্রমণের সম্ভাবনা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না একেবারেই। নিজে নিজে রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর গৃহস্থালি কাজের কথা ভেসে উঠছিল মনে।

একটা কিছু করা আবশ্যিক, উদ্ভূত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

একদিন ডিনারের সময় খুব শান্ত গলায় তাকে প্রশ্ন করলাম, ‘তোমার ছুটির খবর কী? বাতিল করে দেয়নি তো?’

‘মনে তো হয় না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছ কেন?’

‘এমনিই... ভাবছিলাম, তোমার বাবা-মা অপেক্ষা করছেন...’

পরদিন আবার জানতে চাইলাম, ‘যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করলে? মাস খানেক বিশ্রাম নিতে পারতে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারতে টাটকা হাওয়ায়...’

‘এক মাস কেন? গেলে আমি বড়জোর ১০ দিনের জন্য যাব,’ নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানাল আমার স্ত্রী।

‘না, তোমার উচিত হবে খুব ভালো করে বিশ্রাম নেওয়া,’ আমি পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলাম।

‘আশ্চর্য ব্যাপার! আগে কখনো আমার জন্য এতটা দরদ তো তুমি দেখাওনি!’

‘নিজেকে শুধরে নিচ্ছি। যে ভুলগুলো আগে করেছি...’

‘না, অন্য একটা কিছুর গন্ধ পাচ্ছি আমি,’ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্টতই সংশয় প্রকাশ করল স্ত্রী।

এরপর আবার যখন তার ভ্রমণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, সে রীতিমতো নার্ভাস বোধ করতে লাগল।

‘বুঝতে পারছি না, আমাকে বাড়ি থেকে সরাতে তুমি এত তৎপর কেন? তুমি যে একটা ফন্দি

আঁটছ, সেটা অনুভব করতে পারছি।’

অস্বস্তিতে পড়ার অভিব্যক্তি চোখে-মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, ‘কোনো ফন্দিই আমি আঁটছি না। কিন্তু তুমি লক্ষ করে দেখো, তোমার নার্ভাস সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়েছে, অকারণে গলার স্বর চড়াচ্ছে। এর মানে তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। এবং যথাসম্ভব অবিলম্বে।’

‘মনে হচ্ছে, আমি রহস্য ভেদ করতে পেরেছি। তুমি স্বাধীনতা চাইছ। মনের সুখে যা খুশি তা-ই করে বেড়ানোর শখ জেগেছে? সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না!’

‘কী যে উল্টাপাল্টা বকছ! তোমার প্রতি আমার কতটা টান, তা তো তুমি জানো।’

‘বউ সামনে থাকলে সব পুরুষই সুবোধ! আমার ঢের জানা আছে। তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি চালাকি করছ। জেনে রাখো, আমি কোথাও যাচ্ছি না!’

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করলাম। তারপর মুখ লুকোলাম পত্রিকায়, যাতে বিজয়ের হাসি-মাখা আমার অভিব্যক্তি স্ত্রীর নজরে না আসে।

717) নিজেই দায়ী - আলেক্সান্দর কানেভস্কি

প্রেমে পড়লাম এক মেয়ের। তারপর তার সঙ্গে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁদের কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে। আমাকে ডিভানে বসিয়ে প্রশ্ন করা হলো, ‘তোমার পেশা কী?’

‘সাহিত্যিক।’

‘নাম কী তোমার?’

আমি নিজের নাম-পদবি জানালাম।

হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল আমার প্রেমিকার পিতা।

‘তুমি! তুমি কীভাবে পারলে? কীভাবে পারলে

আমাদের বাসার ত্রিসীমানা মাড়াতে? তুমি!

তোমার অনেকগুলো বউ! অনেককে খোরপোশ

দাও! তুমি তিনবার সংসার ভেঙেছ, ত্যাগ করেছ

পাঁচ-পাঁচজন সন্তানকে! লম্পট! কোনো সুন্দরী

মেয়ে রক্ষা পায় না তোমার কবল থেকে! মদ্যপ!

তোমাকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যায় মাদকাসক্তি

নিরাময় কেন্দ্রে! তুমি কলহপ্রিয়! তুমি অন্যদের

সম্পর্কে নানা জায়গায় বেনামে চিঠি লেখো।

তুমি কালোবাজারি! দুস্ত্রাপ্য পণ্য তুমি চড়া মূল্যে

বিক্রি করো। তুমি ভবঘুরে, বেকার! রাতে

চিৎকার করে রদ্দিমার্কী গান গেয়ে বেড়াও!

মামলাবাজ তুমি! মামলার প্যাঁচে ফেলে নিজের

মাকে ঘরছাড়া করেছ! আর এই তুমি এসেছ আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে?’
যাবতীয় অভিযোগের ভারে বিষাদগ্রস্ত আমি নীরবে উঠে দাঁড়িলাম, বেরিয়ে এলাম তাঁদের ফ্ল্যাট থেকে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলাম নিচে।

সব হারিয়ে গেল। আমার স্বপ্ন, প্রত্যাশা। ভেঙে গেল আমার সুখস্বপ্ন।... তবে এর দায়ভার অন্য কারও নয়। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী আমি নিজেই। উত্তম পুরুষে ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলো লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

718) যুবক-যুবতী - ভ্রাদিমির পানকভ

এক অপরূপা যুবতী আর এক বলবান যুবকের গল্প। পৃথিবীর আর বাকি তিন বিলিয়ন মানুষের মতোই জীবনযাপন করত তারা। তবে এ তো জানা কথা, দুজন যখন প্রেমে পড়ে, তখন বাকি তিন বিলিয়ন তাদের হিসাবে থাকে না।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের সবচেয়ে প্রিয় কর্ম পরস্পরের ভালোবাসার পরীক্ষা নেওয়া। কাছে থাকার মুহূর্তে, দূরে থাকার সময়ে, সুসময়ে, দুঃসময়ে...

আমাদের গল্পের এই দুজনও মেতে উঠেছিল এ পরীক্ষায়।

‘সত্যি করে বলো তো,’ জানতে চাইল অপরূপা যুবতী, ‘আমি দেখতে কেমন? সুন্দরী?’

‘তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী,’ জানাল তাকে বলবান যুবক।

‘তুমি আমাকে ভালোবাস?’

‘এ কথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!’

‘কেন আমাকে ভালোবাস? রূপের কারণে?’

‘হ্যাঁ, রূপের কারণে।’

‘হায়!’ অপরূপার কপাল কুঁচকে গেল আপনা থেকেই। ‘সুন্দরী মেয়েকে যেকোনো পুরুষই ভালোবাসবে। আমি অসুন্দরী হলে আমাকে ভালোবাসবে?’

‘বাসব না কেন!’ বলল বলবান। ‘এ তো কঠিন কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি ভালো মেয়ে এবং বুদ্ধিমতী।’

‘বুদ্ধিমতী? হুমম...বুদ্ধিমতীকে যেকোনো পুরুষই ভালোবাসবে। আমি যদি বোকা হই, তুমি আমাকে ভালোবাসবে?’

‘তুমি বোকা হলেও তোমাকে ভালোবাসব।’

তোমার সঙ্গে আত্মার যোগাযোগটাই বড় কথা।

তুমি সংস্কৃতিমনা, তোমার সঙ্গে কথা বলেও শান্তি।’

‘কথা বলার কথা বলছ? সংস্কৃতিমনা মেয়েকে যেকোনো পুরুষই ভালোবাসবে। আমি অসংস্কৃতিমনা হলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?’

‘বলছি তো, ভালোবাসব! সংস্কৃতির কী এমন মূল্য আছে! লিখতে-গুনতে পারো, সেটাই যথেষ্ট।’

‘লিখতে-গুনতে? শিক্ষিত মেয়েকে যেকোনো পুরুষই ভালোবাসবে। আমি অশিক্ষিত হলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?’

‘উফ! তুমি চুপ করবে, প্লিজ? বললাম তো, ভালোবাসব। কথা শেষ। তুমি ভালো মেয়ে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

‘ভালো মেয়ে? ভালো মেয়েকে যেকোনো পুরুষই ভালোবাসবে। আমি খারাপ মেয়ে হলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?’

‘খারাপ মেয়েকে?’ বক্র হাসি হাসল বলবান যুবক। ‘দ্যাখো, কোনো ইডিয়ট খুঁজে পাও কি না, যে খারাপ মেয়েকে ভালোবাসবে।’

‘দেখলে তো?’ উৎফুল্ল হয়ে উঠল অপরূপা যুবতী। ‘অথচ বলছিলে, ভালোবাস এবং বাসবে। এবার বুঝলে, তুমি কেমন মানুষ?’

‘শোনো, আমি যেমন মানুষ, আমাকে যেকোনো মেয়ে ভালোবাসবে। আর তুমি তেমন মানুষকে ভালোবাসতে থাকো, যেমন মানুষের অস্তিত্বই নেই।’

বলে বলবান যুবক দড়াম করে দরজা লাগিয়ে চলে গেল।

দেখলেন কাণ্ড!

719) দড়ি - গ. কদমতলভ

‘ওই দড়ির দাম কত?’

‘কোনটা?’

‘সবচেয়ে শক্ত আর লম্বাটা।’

‘ওটা কেন দরকার আপনার?’

‘এত সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা কেন? কাপড় শুকোতে দেওয়ার জন্য দড়ি প্রয়োজন।’

‘কোথায় ঝোলাবেন?’

‘ঠিক বুঝতে পারছি না! আপনার এসব জানার দরকার কেন? নাকি আমাকে এখন একটা ফরম ফিলাপ করতে হবে, যেখানে লেখা থাকবে, আপনি বিক্রি করেছেন, আমি

কিনেছি...’

‘অনেকটা সে রকমই। এক লোক আমাদের এখান থেকে দড়ি কিনেছিল কাপড় শুকোতে দেবে বলে। সেটা চুরি হয়ে গেল।’

‘কী চুরি হয়ে গেল?’

‘কাপড়, অবশ্যই। ক্রেতা ছিল বয়স্ক। সে দোকানে এসে নানা অভিযোগ করতে শুরু করল। বলে, আপনারা দড়ি বেচলেন, সেই দড়ি থেকে কাপড় চুরি হয়ে গেল। স্পষ্ট দিবালোকে। এখন আমাকে ক্ষতিপূরণ দিন।... ব্যবসা করি বলে সবাই আমাদের ওপরে কুকুর লেলিয়ে দিতে চায়!’

‘কুকুর লেলিয়ে আমি দেব না। আমার দড়ি দরকার কাপড় শুকানোর জন্য।’

‘কেন দড়ি কিনতে চাইছেন, কে জানে!

আমাদের দোকানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসুক, সেটা আমরা চাই না। কিছুদিন আগের কথা। এক লোক তালা কিনল আমাদের কাছ থেকে। দরজায় লাগাবে বলে। চোর এসে তালাসমেত পুরো দরজাটাই চুরি করে নিয়ে গেল। লোকটি অভিযোগ করল আমাদের বিরুদ্ধে...’

‘কী সব ভ্যাজরভ্যাজর করছেন! দড়ি কিনতে চাইছি, বিক্রি করুন। কথা শেষ। আমার যদি ইচ্ছে করে আমি এই দড়ি গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে পড়ব। কার বাপের কী!’

‘সেটা শুরুতে বললেই পারতেন! গলায় দড়ি দিলে অভিযোগ আসবে না আমাদের বিরুদ্ধে, এটা নিশ্চিত। ক্যাশ ডেস্কে গিয়ে পে করুন।’

720) প্রথম দর্শনেই - আমুর কুপিদোনড

একেবারেই আচম্বিতে ঘটল ঘটনাটা। আমি চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকালাম প্রথমবারের মতো। সে মুচকি হাসল। এবং এভাবেই শুরু হলো প্রথম দর্শনেই প্রেম। মেট্রোর বগিটা ঝাঁকুনি দিচ্ছিল বেশ। মেয়েটি বসে ছিল আমার উল্টোদিকের সিটে এবং মুচকি মুচকি হাসছিল। কেউ কোনো দিন আমার দিকে তাকিয়ে ওভাবে হাসেনি। অর্থাৎ এটাই প্রেম? এর মানে, বিদায়, আমার ব্যাচেলর জীবন? এর মানে...যাক গে, যা হওয়ার হবে। আর কাঁহাতক বাইরের খাবার খাওয়া যায়! যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা থাকব কোথায়? আমার ওখানে তো

জায়গা এমনিতেই কম। তা হলে ওর ওখানেই থাকব বরং। ঘরে থাকবে শুধু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। জানালার পাশে একটা টেবিল, পাশে সাইডবোর্ড, একটা আলমারি, কফি-টেবিল, দুটি আর্মচেয়ার। ওহ, আসল কথাটাই প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। টেলিভিশন! ওটাকে কোথায় রাখলে ভালো দেখাবে? মমম...এ নিয়ে বরং পরে ভাবা যাবে। আর কী? চওড়া দেখে একটা ডিভান, ভ্লাদিমির আর ল্যুবাদের বাসায় যেমন, ঘরের এক কোনায় থাকবে ফ্লোর ল্যাম্প, দেয়ালে হেমিংওয়ের প্রতিকৃতি। এই তো!

বিয়েতে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ জানানো যায়? আমার আত্মীয়রা থাকে অর্ধেক শহরজুড়ে। ওর আত্মীয়ের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বেশি। সে ক্ষেত্রে বিয়ের উৎসব হবে আত্মীয়দের বাদ দিয়েই। থাকবে শুধু বন্ধুরা। হিসাব করি...সর্বনাশ! ইতিমধ্যেই ৪০ জন! বুঝেছি, ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ নয়, এখানে প্রয়োগ করতে হবে কৃত্রিম নির্বাচন-পদ্ধতি। সাশাকে ডাকব না; ও ‘ডায়নামো’ দলের সমর্থক। বাদ লেনা আর লিডাও, বড্ড বেশি খায় ওরা। গ্রিগোরিয়েভকে ডাকলে সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উৎসবটাকেই মাটি করে দেবে, অতএব সেও বাতিল। নভজাভেতস্কি-দম্পতিকে দাওয়াত দিলে তারা অবধারিতভাবে তাদের বিচ্ছু বাচ্চাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এবং সে আবার টেবিলের তলায় ঢুকে অতিথিদের প্যান্টে আগুন ধরিয়ে দেবে। সুতরাং এই পরিবার থাকবে নিমন্ত্রণবহির্ভূত। আর তা ছাড়া আমন্ত্রিত সবাই যে আসবে, তা তো নয়। অতএব সমস্যা হবে না আশা করি।

এরপর শুরু হবে দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবন। সন্ধ্যাবেলা টিভি দেখব একসঙ্গে বসে। শনিবারগুলোয় সিনেমা দেখতে যাব। আর রোববারগুলো বরাদ্দ থাকবে ওকে নিয়ে আমার মায়ের বাসায় যাওয়ার জন্য। মা নিশ্চয়ই বেজায় খুশি হবেন। কিছুদিন ধরে একটা কথাই মা বলে চলেছেন: ‘কবে যে তুই বিয়ে করবি!’

আচ্ছা, আমাদের ছেলে হবে? নাকি মেয়ে? না, ছেলে হলেই ভালো। একসঙ্গে ফুটবল দেখতে যাব। তবে ছেলেদের নিয়ে ঝঙ্কি-ঝামেলাও বেশি: সিগারেট ফুঁকতে শুরু করবে, মারামারি

করবে, স্কুলে নানাবিধ কাণ্ডকীর্তি করবে।
ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি শান্ত।
তবে তারা বড় হয়ে উঠলে বিয়ে দিতে
হবে।...ধুর! কী সব ভাবছি। যে হওয়ার, হবে।
ছেলে হলে নাম রাখব যেভগেনি। যেভতুশেক্ষোর
সম্মানে। আর মেয়ে হলে, যেভদোকিয়া। আমার
নারী বসের সম্মানে। আর যদি যমজ হয়? না,
এমন হবে না। যদিও কে বলতে পারে
আগেভাগে! এই তো সেদিন শুনলাম, মেক্সিকোয়
এক নারী একসঙ্গে আট সন্তানের জন্ম দিয়েছে।
অতএব যদি যমজ হয়ই, তা হলে নাম রাখব
মাশা আর সাশা।

আর কী নিয়ে ভাবব? সবকিছু নিয়েই তো
ভাবলাম। না, বাকি আছে আরও। এই যেমন,
মেয়েটার সঙ্গে এখনো ঠিক পরিচিত নই। তবে
এটা তুচ্ছ ব্যাপার। আধুনিক সভ্যতা প্রবর্তিত
লৌকিকতা। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা
পরস্পরকে ভালোবাসি। তার প্রথম দর্শনের
হাসিটাই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে।
ভাবছি, পরিচয়টা শুরু করব কীভাবে। ‘আপনার
সঙ্গে পরিচিত হতে পারি?’ বড় বেশি সেকেলে
ও বহুলব্যবহৃত। সবাই এভাবেই শুরু করে।
‘আমাকে অমুক জায়গায় যেতে হলে কোথায়
নামতে হবে?’ না! মনে ধরছে না। আইডিয়া!
বুদ্ধি পেয়েছি! তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস
করব, ‘আপনি হাসছেন কেন?’ সে চোখ নামিয়ে
নেবে এবং আমি তার চোখের ভাষা থেকে
জেনে যাব তার অব্যক্ত উত্তর: ‘কারণ...’
কিন্তু সে চোখ নামিয়ে নিলে তার চোখের ভাষা
পড়ব আমি কী উপায়ে? তার মানে, সে চোখ
তুলে তাকাবে। এবং সেটাই হবে স্বাভাবিক।
আমি উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালাম নতুন জীবনের
পথে।

‘আচ্ছা, আপনি হাসছেন কেন?’
এবার সে সশব্দে হেসে ফেলল। তারপর বলল,
‘কারণ, আপনার নাকের ডগায় কালি লেগে
আছে।’

721) বিষাদময় কাহিনি - লিওন ইজমাইলভ

জানেন, সম্প্রতি আমার একটি উপলব্ধি হয়েছে:
একেবারেই তুচ্ছ কোনো ব্যাপার অবলীলায় নষ্ট
করে দিতে পারে তীব্র ও বিশুদ্ধ কোনো
অনুভূতি। এই যেমন আমার কথাই ধরুন।

বহুদিন ধরে বিয়ে করার খায়েশ মনে; যদিও সেটা নিয়ে খুব লজ্জিত থাকি। হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো, কিন্তু এরপর কী করা প্রয়োজন, তা আমার জানা নেই।

তবে এই মেয়ে, গালিয়া, এতই সোজাসাপ্টা গোছের যে আমাদের সম্পর্ক বহুদূর পর্যন্ত গড়াল। একদিন সে আমার বাসায় বেড়াতে এল। আমরা দুজন সারাটা সন্ধ্যা কাটলাম তরমুজ খেয়ে। তরমুজটাও ছিল অপ্রতিরোধ্য রকমের সুস্বাদু। আমি বড় বড় চার টুকরো খেয়ে ফেললাম। তারপর গালিয়াকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে গিয়ে বুঝলাম, অত তরমুজ খাওয়া আমার উচিত হয়নি। কিন্তু এখন আর ভেবে কী লাভ! দেরি হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে আমি রাস্তার দুই পাশে তাকাতে থাকলাম। চারদিকে বড় বড় বাড়ি, অথচ আমার প্রয়োজন ছোট একটি ঘর এবং সেটি কোথাও নেই! বিষণ্ণতা পেয়ে বসল আমাকে। এমন কি গালিয়াও সেটি লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু হয়েছে তোমার?’

আমি বললাম, ‘হয়নি, তবে হতে পারে।’
সে বলল, ‘আমরা এত দ্রুত হাঁটছি কেন? তোমার হাতে কি সময় কম? হয়তো আমাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার সময় তোমার নেই, তাই না?’

আমি বললাম, ‘পৌঁছে দিতে পারব, তবে ধীরে হাঁটতে পারব না।’

সে বলল, ‘তোমার যখন এতই তাড়া, তা হলে চলো, বাসে চেপে যাই।’

‘না,’ বললাম আমি, ‘বাসে অনেক লোক। ভিড়ের মধ্যে আমার শরীরে চাপ পড়তে পারে।’
সে কিছুই বুঝল না। আমরা আগের মতোই দ্রুতগতিতে হাঁটতে থাকলাম। ছোট ঘর নেই কোথাও। আছে পুলিশের বুথ। সেখানে গিয়ে আমি বললাম, ‘মিস্টার লেফটেন্যান্ট, এখানে আশপাশে কোথায়...ইয়ে...প্লিজ, নিচু স্বরে বলুন, নয়তো আমার বান্ধবী শুনে ফেলবে।’

লেফটেন্যান্ট বলল, ‘নিচু স্বরে কেন? কোনো অপরাধ করেছেন নাকি?’

আমি বললাম, ‘করিনি, তবে করতে চলেছি বোধহয়।...না, আপনি আমাকে বুঝতে পারেননি। সবারই এমন হতে পারে কিন্তু। ধরুন, আপনি আপনার বান্ধবীর সঙ্গে যাচ্ছেন

কোথাও। হঠাৎ প্রবল ইচ্ছে হলো বিশেষ একটা কাজের। কিন্তু কাজটি আপনি রাস্তায় করতে পারবেন না। হয়নি এ রকম?’

সে বলল, ‘হতো, যখন সাধারণ পুলিশ ছিলাম।’ তখন আমি গালিয়ার হাত ধরে প্রায় দৌড়াতে শুরু করলাম। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে ওকে বললাম, ‘তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো। আমি বন্ধুর বাসায় যাব আর আসব।’

লিফটে ঢুকতেই লিফট-মহিলা জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কার কাছে যাচ্ছেন?’

আমি বললাম, ‘হলেই হলো। শুধু লোক ভালো হলেই চলবে।’

সামনে যে ফ্ল্যাট পড়ল, সেটাতেই কলবেল বাজলাম। দরজার পেছন থেকে প্রশ্ন ভেসে এল নারী কণ্ঠে:

‘কে?’

আমি বললাম, ‘খুলুন, নিজেদের লোক।’

মেয়েটি প্রশ্ন করল, ‘নিজেদের লোক মানে?’

আমি চিৎকার করে বললাম, ‘নিজেদের, মানে সোভিয়েত। দরজা খুলুন, নইলে খুব খারাপ হবে।’

সে বলল, ‘যখন খারাপ হবে, তখনই বরং আসবেন।’

আমি ফেরত গেলাম গালিয়ার কাছে। আমরা প্রায় দৌড়ে গেলাম তার বাসা পর্যন্ত। ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। ওর মা আমাদের দেখে বললেন, ‘এসো, এখন আমরা চা খাব।’

আমি বললাম, ‘আপনি আমাকে দেখতে পারেন না কেন?’

তিনি বললেন, ‘চা খেতে না চাইলে তরমুজ খাও।’

এরপর কী হয়েছিল, সে বর্ণনা দেব না। শুধু বলি, তুচ্ছ এই ঘটনার কারণে মৃত্যু হলো তীব্র ভালোবাসার।

প্রেমিক-প্রেমিকার সুবিধার জন্য কী না করা হয়! তাদের জন্য আছে বিয়ে রেজিস্ট্রার অফিস, বিয়ে উদ্যাপনের জন্য প্রাসাদ, মাতৃসদন। অথচ ভালোবাসা নামের এই অনুভূতির সুরক্ষার কথা চিন্তা করে প্রতিটি রাস্তায় ছোট একটি ঘর নির্মাণ করা হলে কত ভালোই না হতো!

722) দরখাস্ত - ম. ডজদভিজেনস্কি

বুরভ বলল, ‘এই অকাট মূর্খ আমলা সুন্দুকভকে দরখাস্ত লিখতে হবে। শালা আস্ত একটা

ইডিয়ট!’ ‘সে আর বলতে!’ তার কথায় সায়
দিল মাসলভ। ‘ব্যাটা অসৎ ক্যারিয়ারিস্ট...’
‘এই শালাকে নিয়ে আলোচনা করা মানেই
সময়ের অপচয়!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুরভ।
তারপর সাদা একটা কাগজ নিয়ে দরখাস্ত
লিখতে শুরু করল: ‘সর্বজনশ্রদ্ধেয় ত.
সুন্দুকভ...’

723) তাতে কী! - ইনা গামাজকোভ

সবাই খুব হিংসে করে আমাকে। আমি কিন্তু
কাউকেই করি না। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি,
ঈর্ষায় হলুদ হয়ে গেছে তারা। আমি নির্লিপ্ত।
কারণ, আমার আছে দুটি শব্দ—‘তাতে কী’!
ধরা যাক, সেরেদকিনা একেবারে হাল ফ্যাশনের
এক জোড়া জুতা কিনেছে। আমি ভাবি, তাতে
কী! সে তো গ্রীষ্মকালে ছুটি পাবে না, পাবে
ডিসেম্বর মাসে।

নুত্রোভের ভাইয়ের বিশাল বাড়ি আছে ইয়াল্টায়।
তার বোন অতিকায় এক দোকানের ডিরেক্টর।
আমি ভাবি, তাতে কী! তার নিজের তো
গ্যাস্ট্রিক!

সেকলেতারেক্কোর স্বামী পিএইচডি করেছে।
আমি ভাবি, তাতে কী! স্কুলে তাদের মেয়ের তো
রেজাল্ট খুবই খারাপ।

রেপকিন এক কাঁড়ি টাকা জিতেছে লটারিতে।
আমি ভাবি, তাতে কী! অন্য শহর থেকে অতিথি
এসে তার বাসায় পড়ে আছে এক মাস ধরে।
হিংসা-ঈর্ষার প্রয়োজনটা যে কী, সেটাই তো
বুঝি না!

724) সহের পেয়ালা - আন্তোন নেভস্কি

ফালেয়েভ তার মানিব্যাগ হারিয়ে ফেলল।
আলমারি থেকে নীরবে একটা মানিব্যাগ বের
করে আনল স্ত্রী।

উৎফুল্ল ফালেয়েভ তার বোনাসের টাকা ভরল
নতুন সেই মানিব্যাগে। কিন্তু বোনাসের টাকা
হারিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো সে।

আলমারি থেকে নীরবে বোনাসের টাকা বের
করে আনল স্ত্রী।

উৎফুল্ল ফালেয়েভ ছুটল ডিপার্টমেন্ট স্টোরে।
স্ত্রীর জন্য উপহার কিনল। কিন্তু ফেরার পথে
হারিয়ে ফেলল সেটা।

আলমারি থেকে নীরবে উপহার বের করে

আনল স্ত্রী। নিজেই নিজেকে দিল।

এক সপ্তাহ পরে ফালেয়েভ মাইনের পুরো টাকা ভুল করে বাসে রেখে নেমে পড়ল। বাড়ি যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, স্ত্রীর ধৈর্যে ফাটল ধরবে নিশ্চয়ই।

‘যথেষ্ট হয়েছে!’ বলল তার স্ত্রী। ‘আমার ধৈর্যের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে।’

ডিভোর্স? না...আলমারি থেকে নতুন পেয়ালা বের করে আনল স্ত্রী। আকারে আগেরটার চেয়ে বড়।

ফালেয়েভ নিজেকে শুধরে নেবে স্থির করল।

নইলে তার স্ত্রী যে কখন আলমারি থেকে নতুন স্বামী বের করে আনবে, কে জানে!

725) পুরুষালি সহযোগিতা -

আলেক্সান্দর পেরলুচক

‘গ্রিগোরি, হাঁড়িটা একটু ধরবে, প্লিজ?’ ‘গরম নাকি?’

‘না।’

‘ভর্তি?’

‘ভয় পেয়ো না, উপচে পড়বে না।’

‘কী আছে তাতে?’

‘সুপ।’

‘মাংসের টুকরো দেওয়া?’

‘হ্যাঁ। তুমি মাংসের টুকরো দেওয়া সুপ পছন্দ করো, সেটা আমি জানি তো।’

‘তুমি এত চং করো কেন, বলো তো? শুরুতে বললেই পারতে, গ্রিগোরি, মাংসের টুকরো

দেওয়া তোমার প্রিয় সুপের ঠান্ডা ও অপূর্ণ

হাঁড়িটা একটু ধরবে, প্লিজ? তা হলে এক

নিমেষ বিলম্ব না করে হাঁড়িটা ধরতাম। আমার জন্য এ আর কী এমন কঠিন কাজ। প্রত্যেক

সত্যিকারের পুরুষের উচিত সাহায্য করা তার

স্ত্রীকে, যখন সে গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত। এমনকি

দু-একবার বাসনকোসন ধুলেও জাত যায় না।

কোথায় ওটা? দাও দেখি।’

‘কী?’

‘তোমার হাঁড়ির কথা বলছি। তুমিই না বললে একটু ধরতে।’

‘ধন্যবাদ, গ্রিগোরি। আর প্রয়োজন নেই সেটার।’

726) চিরসঙ্গী - দ. এরদিনেয়েভ

পারস্পরিক অভিযোগ আর ভৎসনার কারণে

আমি চূড়ান্ত বিরক্ত। কোনো কিছু করতে

যাওয়ার আগে তার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করা ছেড়ে দিয়েছি তাই। এমনকি আমাকে সে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কান দিই না তাতে। আমার জন্য এটাই সুবিধাজনক। নার্তও শান্ত থাকে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা বানিয়ে খেয়ে নিই। নাশতা শেষে কাপড়চোপড় পরে প্রায় নিঃশব্দে বাসা থেকে বেরিয়ে যাই।

বিশ্রাম নিক সে—এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই।

অফিসে মাঝেমধ্যে মনে পড়ে তার কথা। মূলত একেবারেই বেমক্লাভে এবং অসময়ে। তারপর কাজের চাপে আবার তাকে ভুলে যাই।

ঘরে ফিরি সচরাচর বেশ দেহিতে। ফিরে অনুভব করি, সে বরাবরের মতোই ঘুমিয়ে আছে।

দংশন না করলেই আর কোনো সমস্যা নেই—ভেবে ঘুমাতে যাই ক্লান্ত আমি।

কিন্তু সে আমাকে ঘুমোতে দেয় না। অতিবাহিত দিনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম ঘটনারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকে। সবকিছুতেই তার নাক গলানো চাই!

এমনও হয়, ভোর পর্যন্ত অভিযোগমালা দাখিল করতে থাকে সে—আমার বিবেক।

মুদ্রাঃ নেটের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত।

The Ultimate Complete Collection 2015

সারা দুনিয়ার শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি বদলাচ্ছে।
বই আর খাতা যেমন বিট বাইটে বদলে যাচ্ছে
তেমনি বদলে যাচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের যাবতীয়
উপায়। উন্নত দেশগুলোর ছাত্ররা এখন আর
আগের মত বইয়ের ব্যাগকাঁধে নিয়ে গুরে না ,
এখন তাদের হাতে থাকে স্মার্টফোন, ট্যাব বা
ল্যাপটপ। সেখানে থাকে প্রয়োজনীয় সব বই
আর খাতা হিসাবে থাকে তারস্ক্রিন। এখন তারা
সামান্য সহযোগিতার জন্য তার শিক্ষক কে বিরক্ত
করে না কারন তাদের কাছে আছে সর্বসময়ের
শিক্ষক তার সফটওয়্যার , আর জ্ঞানের ভাণ্ডারের
জন্য আছে তার ইন্টারনেট। পৃথিবীতে আমরা
প্রযুক্তির যত বৃহত্তম প্রসার দেখছি তার সবই
ব্যবহৃত হচ্ছে এই রূপান্তরে। বর্তমানে সেই
প্রভাব আমাদের মতো দেশে পড়তে শুরু
করেছে.....

আশা করছি একদিন আমাদের দেশের ছেলেরা
প্রযুক্তির সহযোগিতা নিয়ে, নিজেকে ও দেশকে
বিশ্বের দরবারে নতুন রূপে হাজির হবে। আমার
বিশ্বাস তারা পারবে “ কারন
কোনরকমের প্রযুক্তির সহযোগিতা ছাড়া তারা
বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেআর প্রযুক্তির
সহযোগিতা পেলে তারা কি করবে তা সৃষ্টিকর্তাই
জানে...। ”

কিন্তু ইন্টারনেট ছাড়া আমরা এই
প্রযুক্তির সহযোগিতা কল্পনাও করতে পারিনা। অথচ
এ মুহূর্তে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের ইন্টারনেট
সুবিধা নাই। আর থাকলেও তা সময় ও পর্যাণ্ড
জ্ঞানের অভাবে এথেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে
পারছি না। তাছাড়া সীমিত ইন্টারনেট প্যাকেজের
ও নেটের স্লো স্পিডের জন্য চাইলেও তার
প্রয়োজনীয় ফাইল ডাউনলোড করতে পারছেন না
...। আবার অনেকে ব্যস্ততার জন্য ডাউনলোড
করার সময় পাচ্ছেন না.....অথবা খোঁজা খুঁজি
একটা একটা করে ডাউনলোড করতে যাদের
বিরক্তিকর মনে হয় ... তাদের জন্য সবচেয়ে
সহজ একটি সমাধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল
মানুষকে পর্যাণ্ড প্রযুক্তির সহযোগিতা দিতে আমার
খুব ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস হচ্ছে আমার এই ডিভিডি
কালেকশন ...

Website🌐:<http://tanbircox.blogspot.com>

অর্থাৎ আমার সংগ্রহ করা সফটওয়্যার, ই-বুক(বই) ও টিউটোরিয়াল এর বিশাল কালেকশনের মধ্য থেকে আপনাদের জন্য খুব ইম্পরট্যান্ট কিছু সংগ্রহ ক্যাটাগরি আকারে সাজিয়ে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করলাম ... আপনাদের জন্য করা আমার কালেকশনের ক্ষেত্রে একটাই কথা বলতে পারি ... আপনি এখানে ডিলিট করার মত কোন ফাইল খুজে পাবেন না ... অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফাইলই আপনার প্রয়োজন হবে ... এবং প্রত্যেকটা ফাইল সংগ্রহে রাখতে বাধ্য হবেন ... আপনার কম্পিউটার নির্ভর জীবনের সব চাহিদা পূর্ণ করবে এই ফাইলগুলো ... বিশ্বাস না করলে নিচের যে কোন একটি লিংক এ ক্লিক করে সেখানে দেওয়া ফাইল গুলোর নামের উপর একবার চোখ বুলান তাহলেই সব বুঝতে পারবেন ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ... নিচের লিংকে DVD গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে... দেখুন আপনার প্রয়োজন কিনা.....

আমার যাবতীয় পোস্ট ও ই-বুক কালেকশন

[The Ultimate Complete Collection 2015]

<http://www.facebook.com/10152049959232103>

জাস্ট একবার লিংকে গিয়েই

দেখুন ... হয়তো এমনি কিছু খুঁজছিলেন

অথবা ,

<http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html>

এখানে ক্লিক ➦ করুন

বিস্তারিত তথ্য ও সুন্দর ভাবে বুঝার জন্য প্রথমে

নিচের যে একটি লিঙ্ক থেকে ২ এমবির ই-বুন্টি

ডাউনলোড করে নিন

Download link:

www.zippyshare.com/v/EneqrnfT/file.html

অথবা,

www.mediafire.com/?uwdtb4mvhdk8i4t

অথবা, <http://d-h.st/TCEr>

অনলাইনে লাইভ দেখার জন্যঃ

[www.slideshare.net/tanbircox/the-](http://www.slideshare.net/tanbircox/the-ultimate-complete-collection-15)

[ultimate-complete-collection-15](http://www.slideshare.net/tanbircox/the-ultimate-complete-collection-15)



<http://facebook.com/tanbir.cox>

Website🌐:<http://tanbircox.blogspot.com>

Tanbir Ahmad

Razib

📞 Mobile No:➔

01738 -359 555

✉ E-Mail: ➔

tanbir.cox@gmail.com

🎧 Skype: ➔ **tanbir.cox**

👤 Facebook: ➔

<http://facebook.com/tanbir.cox>

📖 e-books Page: ➔

<http://facebook.com/tanbir.ebooks>

🌐 Web Site : ➔

<http://tanbircox.blogspot.com>

📖 Live e-books: ➔

<http://www.slideshare.net/tanbircox>



I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website . Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

🌐 <http://facebook.com/tanbir.cox>